স্বত্বাধিকারী ... মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

১৩১৫

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
উপাসনা সমিতি কর্তৃক শ্রীগকুন্দলাল বসু বি, এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত

সূচীপত্র

বৈশাখ—১৩২৬

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি. মহাশয়ের INDIAN SHIPPING এর অনুবাদ।

দ্রষ্টব্য ঃ—অল্পমূল্যে পুরাতন উপাসনা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gauranga Press,

71 1 Mirzapur St., Calcutta.

Published by Pulin Behary Dass,

11. College Square. Calcutta.

উপাসনা

১৫শ বর্ষ। | বৈশাখ—১৩২৬ | ১ম সংখ্যা।

আলোচনী

নগরের বস্তি-সমস্যা।

উপাসনায় আমরা বহুবার পল্লীর সংস্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এমন কি উপাসনার নবপর্য্যায়ের প্রারম্ভ হইতেই পল্লীর অভাব ও অভিযোগ, আদর্শ ও অবনতির কথাই আমাদের একটা আলোচনা ও আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল।

দেশের বৈষয়িক জীবনের আর একটা দিকের প্রতি আমাদের দেশ ও আমরাও একপ্রকার উদাসীন ছিলাম। পল্লীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যে দূষিত ও বিকারপ্রাপ্ত নগরীর বিষম সমস্যা সমূহ আমাদের জাতীয় জীবনকে মূঢ় ও ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে সে সমস্যাগুলি সেরূপ ভাবে দেশে এখনও আলোচিত হয় নাই। অথচ এ সকল সমস্যার আলোচনা ও সমাধান না হইলে জাতীয় জীবনের সম্যক ক্রমবিকাশ ও পরিসর বৃদ্ধির পথ আমরা খুঁজিয়া পাইব না। নষ্ট প্রায় পল্লীসমাজের আর একটী দিক, বৈষয়িক জীবনের অধঃপতনের আর একটী অভিব্যক্তি হইতেছে অতিরিক্ত জনতার ক্লিষ্ট পঙ্কিল নাগরিক জীবন। যে ব্যবসায়িক কারণের সমবায়ে আমাদের কৃষির অবনতি, আমাদের গৃহ শিল্পের বিনাশ, আমাদের পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্য ও জনশূন্যতা সেই সকল কারণই আমাদের সমাজ-জীবনে এক বিকৃত ও শোষক নগরের সৃষ্টি বিধান করিয়াছে।

বৈষয়িক জীবনের উন্নতির এমন এক প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে শুধু পল্লীর রক্ষা নয় এক সর্ব্বাঙ্গীন স্বাভাবিক ও কর্ম্মঠ নাগরিক জীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে। আমরা তাই ক্রমে ক্রমে বৈষয়িক উন্নতি সাধনকে লক্ষ রাখিয়া প্রধানতম নাগরিক সমস্যাগুলির আলোচনা করিব। নগরের বিকার ও সংস্কারের বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিবৃত করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা মহানগরীর ব্যভিচারের উল্লেখ করিতে যাইয়া একটা প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম নগর সমুদয়ের স্ত্রী ও পুরুষ সংখ্যার অধিক তারতম্য।

এক হাজার পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঃ—

বোম্বাই—৫৩০

কলিকাতা—৪৩০

হাওড়া—৫৬২

লণ্ডন—১০৭০

১৫ হইতে ২০ বৎসরের স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প কলিকাতা Improvement Trustএর বস্তী ভাঙ্গার হটকারিতার ফলে শ্রমজীবিগণের ঘরের ভাড়া অত্যন্ত অধিক হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িতেই চলিয়াছে। শ্রমজীবিগণের

বসবাস নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত বিষয় Improvement Trust এমনকিছু আজও করিতে পারেন নাই। বস্তিতে বসবাসের অসুবিধায় এবং স্ত্রীলোক শ্রমজীবীর কাজের অভাবে শ্রমজীবিগণ গ্রাম হইতে নগরে যখন আসে তখন তাহাদের স্ত্রী ও কন্যাগণ বাড়ীতেই থাকে। কৃষি ও গৃহ শিল্পের সংস্কার একদিকে যেমন গ্রাম হইতে নগরে ব্যাপকভাবে জন প্রবাহ প্রতিরোধ করিতে পারে, অপর দিকে নগরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্টি সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহ গত কঠিন সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন এবং নগরে স্ত্রীলোক শ্রমজীবির কাজের ও বৃত্তির সুবিধা বিধান করিয়া স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান করিতে পারে।

নগরের কারখানায় এবং জনবহুল বস্তিতে শ্রমজীবিগণ যেভাবে তাহাদের জীবন অতিবাহিত করে তাহা অনুধাবন করিলে এ বিষয় সম্বন্ধে একটা আমূল সংস্কার বিধানের নিতান্ত আবশ্যকতা উপলব্ধি হইবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমজীবী পুরুষগণ ১২ ঘণ্টা স্ত্রী শ্রমজীবিগণ ১১ ঘণ্টা এবং বালকগণ ৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে। বিলাতের শ্রমজীবিগণ ৮ ঘণ্টা কাজ করিতেছে এবং ৬ ঘণ্টা ও ৭ ঘণ্টার অধিক কাজ করিবে না বলিয়া দল বাঁধিয়াছে, আট নয় ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম প্রায় একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। আমি অনেক কারখানায় দেখিয়াছি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শ্রমজীবি ১১ ঘণ্টার অধিক কাজ করিতেছে। ফলে তাহার এবং তাহার সন্তানের জীবনীশক্তি যে হ্রাস পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই! মজুরার বস্তিতে আমি এইরূপ একজন স্ত্রীলোককে তাহার কাজের পর এক প্রকার অবশ ও মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। সব বস্তিতেই শিশুদিগের কোনই তত্ত্বাবধান করা হয় না। এবং অধিকাংশ স্থলেই শিশুদের মৃত্যুসংখ্যা ১০ জনের মধ্যে পাঁচেরও অধিক।

যখন কারখানার সরকারী ইনস্পেক্টর তত্ত্বাবধান করিতে আসেন তখন অনেক সময় দেখা যায়—অল্প বয়স্ক বালককে ঝুড়ির মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রথমতঃ ফ্যাক্টরী আইন (Factory-act) শ্রমজীবীদিগের বসবাস, তাহাদের পরিশ্রমের নির্দ্ধারিত সময় প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদিগকে অবিচার হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ; দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বাবধায়কগণ অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কোনও উপায়ই বিধান করেন না। অতিরিক্ত ও দীর্ঘকালের পরিশ্রম, কম মজুরী, এবং দারিদ্র্যের নির্য্যাতনে তাহাদের মানসিক তেজ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কারখানার মজুরগণ সকলেই গ্রাম হইতে আসিয়াছে এবং এখনও মাঠের পরিশ্রম, খোলা আকাশ বাতাসের ও পরিবার বদ্ধ জীবনের প্রভাব এড়াইতে পারে না। মানসিক ক্ষেত্রে যে প্রবল বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে তাহাদের শারীরিক সুবিধা অসুবিধার একটা বোঝাপড়া হয় নাই। মদের দোকান নিকটেই রহিয়াছে এবং আয় লাভের প্রত্যাশায় তাহাদের সংখ্যাও কারখানার আশেপাশে বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু যে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনের মধ্যে তাহারা এতকাল জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল তাহা আর বস্তিতে সম্ভব নয়। অধিকাংশ বস্তিতেই পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীদের দ্বিগুন অপেক্ষাও বেশী।

নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে এবং যে কদাচার ও ব্যাভিচার গ্রামে এতকাল জন মণ্ডলের শাসনে শাস্তি পাইত তাহা এখন সহরের বুকে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে।

বস্তির ভিতরকার অবস্থাও এরূপ যাহাতে শ্রমজীবিগণের জীবন অসুন্দর ও পঙ্কিল না হইয়া থাকিতে পারে না। নানা সহরে ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা কিম্বা বোম্বাই, কানপুর অথবা বাঙ্গালোর পুনা অথবা আমেদাবাদের কল অথবা বস্তির ভিতর ভারতের মনুষ্যত্ব আবেষ্টনের প্রভাবে যে পশুত্বে পরিণত হইতেছে তাহা আমার স্থির ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়া আমি মাদ্রাজের বিভিন্ন সহরে Industrialism অথবা আর্ট ও নীতি বিগর্হিত আধুনিক কারখানা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে যাইয়াছিলাম। প্রত্যেক আধুনিক সহরেই আমি শ্রমজীবিগণের বাসস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া—তাহাদের নিম্নলিখিত সার্ব্বজনীন অভাব ও অভিযোগের সহিত পরিচিত হইয়াছি—

(ক) প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বস্তির ঘর-ভাড়া এত অধিক

যে তাহাতে শ্রমজীবিগণের মজুরীর এক চতুর্থ অংশের অধিক ব্যয়িত হয়।

(খ) ঘরগুলি এত ছোট অন্ধকারময় এবং কম পরিসর যে অস্বাস্থ্য ত দূরের কথা দুর্নীতিও উৎপাদিত হইয়া থাকে। চার ফিট চওড়া, ৭ ফিট লম্বা এবং ৬ ফিট উঁচু ঘরের মধ্যে যদি মাতা পিতা, স্ত্রী ও পুত্রবধূ, দুই তিনটী বয়ঃপ্রাপ্তা ভগিনী এবং কয়েকটী অপোগণ্ড রোগগ্রস্ত শিশুকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা হইলে সেখানে যথাযথ স্থান সঙ্কুলান ও সুমঙ্গল্য রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। সেখানে স্বাস্থ্যই বা কোথায়—নীতিই বা কোথায়?

মাদ্রাজ মদুরা এবং কোচিনে বস্তির ভিতর যাইয়া আমি সত্যসত্যই নরকের দূষিত আবর্জ্জনা ও কঠিন রোগের বিভীষিকা দেখিয়া ভীত ও ত্রস্ত হইয়াছি। মানুষের দুঃখ ও বেদনা যে কতটা গভীর হইতে পারে, মানুষের আবেষ্টন মানুষের মনকে যে কতটা আবিল ও পঙ্কিল করিতে পারে তাহা ভাবিতে গেলে মানুষের কর্ম্মশক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

(গ) প্রত্যেক বস্তিতে জলের এবং মলত্যাগের অসুবিধা; কলিকাতার অনেক বস্তিতে দেখিয়াছি ৫০, ১০০ জনের জন্য একটি পাইখানা। মহীশূরের অন্তর্গত কোলারের সোনার খনিতে ৩০০ জনের জন্য গড়পড়তা একটি মাত্র পাইখানা।

এই কারণে সকল কারখানার সন্নিকটে কলেরা রোগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়। একবার কলেরা আরম্ভ হইলে বস্তির পর বস্তি উজাড় হইয়া যায়। সমস্ত নিয়ম কানুন ব্যর্থ হয়।

গত জানুয়ারী মাসে যখন বোম্বাইতে কলেরার সূত্রপাত হয় তখন শ্রমজীবিগণের মধ্যে একটা বিষম ধর্ম্মঘট চলিতেছিল। সমস্তদিন, শ্রমজীবিগণ বস্তির ভিতর এবং নিকটে থাকাতে ও পাইখানার বে-বন্দোবস্তে ধর্ম্মঘটের সপ্তাহে ১২ হইতে ৩৭০ পর্য্যন্ত কলেরা হইতে মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া যায়। তখন বোম্বাইয়ের সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্বাবধায়ক জোর করিয়া বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মঘট না থাকিলে, শ্রমজীবিগণ বস্তির বাহির হইয়া কারখানায় না যাইলে, বস্তির আশে পাশে মলত্যাগের কুফল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। ভারতবর্ষে ধর্ম্মঘট অর্থে শুধু অনশনে মৃত্যু নহে, সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যু।

দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও ব্যভিচার অলক্ষ্মীর এই তিনটি মূর্ত্তি আমাদের বস্তি সমূহয়ে প্রকাশিত। অলক্ষ্মী কখনও প্রকাশিত হন দারিদ্র্যে, তাহার পর অস্বাস্থ্যকর ও অসৎ জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গী হইয়া পড়ে। অপর দিকে অস্বাস্থ্যকর ও অসৎ জীবনও দারিদ্র্যকে আনিয়া বংশপরম্পরায় পরস্পর কার্য্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দারিদ্র্যকে কঠোরতর করিতে থাকে। অলক্ষ্মীর চক্র এইরূপে ঘুরিতে থাকে এবং ঐ চক্রের মধ্যে একবার পড়িলে মানুষের বংশ পরম্পরায় দেহ, মন, আত্মা একবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল শিশু বস্তিতে জন্মগ্রহণ করে তাহাদের অর্দ্ধেকের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বস্তির বালকগণের ভার ও উচ্চতা সাধারণ বালকগণের অপেক্ষা অধিক কম হইয়া যায়। রোগের প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও মজুরদিগের পরিশ্রম-শক্তি হিসাবে এই সকলের ফলও বিষম।

বস্তির উন্নতিবিধান কি উপায়ে সম্ভব? একটা সহজ উত্তর—বস্তির উন্নতি বস্তির লোপে। Calcutta Improvement Trust এই উত্তর দিয়াছেন। বস্তি ভাঙ্গার একটা রোক চাপিয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রমজীবিগণ এক বস্তি হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্য বস্তিতে যাইতেছে। যে বস্তিতে অপেক্ষাকৃত কম লোক ছিল তাহা ভরাট হইয়া আরও অস্বাস্থ্যকর হইতেছে।

ভারত বর্ষের প্রত্যেক সহরেই বস্তি সমুদয়ের উন্নতি বিধান এইরূপ অস্বাভাবিক ও হঠকারী ডাক্তারী-অস্ত্র ব্যবহারের মত চলিতেছে। রোগের উপশম হওয়া দূরে থাক ইহাতে শুধু শ্রমজীবিদিগের যন্ত্রণা বাড়িয়াই চলিতেছে।

সহরের অনতিদূরে উপনিবেশের মত মজুর দিগের জন্য গ্রাম যদি তৈয়ারী করিতে পারা যায়, লাইট রেলওয়ে, মোটর বিশ্বরথ (Omni bus) গাড়ী প্রভৃতি যদি শ্রমজীবিদিগকে অনায়াসে ও অল্প সময়ে গ্রাম হইতে কারখানায় আনিতে

পারে এবং তাহাদের প্রত্যেকের কুটিরে শাকসবজীর বাগান, পশুপালন, গৃহশিল্প ইত্যাদিতে স্ত্রীলোকদিগের জীবিকার্জ্জনের যদি উপায় হয় তবেই শ্রমজীবিগণের রক্ষা। শ্রমজীবিগণের সহিত তাহাদের স্ত্রী পুত্রপরিবার আসিতে পারিলে এবং তাহাদেরই মত স্বাধীনভাবে আপনাদের কার্য্যকুশলতা অনুযায়ী জীবিকানির্ব্বাহের উপায় লাভ করিতে পারিলে শ্রমজীবিগণের গার্হস্থ্য জীবন আবার তাহার পবিত্রতা ও শান্তি ফিরিয়া পাইবে। বিশুদ্ধ খাদ্য, বিশুদ্ধ জীবনের সঙ্গে বিশ্রামও পবিত্র ও আনন্দের হইবে। পারিবারিক জীবন ফিরিয়া আসিলে গ্রাম্য সমাজে আবার পঞ্চায়েতের প্রভাব ফিরিয়া আসিবে—যে সমূহ-তন্ত্র গ্রাম্যসমাজে ভারতীয় সভ্যতার জীবন-ধারার সাক্ষ্য হইয়া আজও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে তাহার আবার নূতন আবেষ্টনে নূতন জন্মলাভ হইবে। সমূহ-তন্ত্র এতকাল ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনে আবদ্ধ থাকিয়া পরিসর লাভ করিবার অবসর পায় নাই,—ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা-মূলক শিল্প-সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া, আমাদের রাষ্ট্র ও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমূহ-তন্ত্রের সহজ ও স্বাধীন অভিব্যক্তির গতিরোধ করিয়াছে। একবার সুযোগ ও উৎসাহ পাইলে সমূহ-তন্ত্র আধুনিক নাগরিক জীবনেও একটা যুগান্তর আনিতে পারে।

কারখানা যে ভবিষ্যতে সমূহের ভাব ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইবে ইহা নিশ্চিত এবং এই কারণেই ভারতবর্ষের কৃষি-জীবনে যে সমূহ-তন্ত্র গ্রাম্যসমাজে সমুদয় মজুর, শ্রমজীবী, নাপিত, ধোবা, পুরোহিত প্রভৃতিকে সমূহের কল্যাণের জন্য সমবেত ভাবে মন্দির, চাবড়ি, ও পঞ্চায়েত ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে, কৃষি সমবায়ের বিচিত্র উপায় নিয়োগ করিয়াছে ও নির্দ্ধারণ সেই সমূহে-তন্ত্র কারখানার পরিচালনে, শিল্পের আয়োজনে সমূহের দায়িত্বকেবরণ করিয়া এক নূতন ভাবে শিল্পের আকার ও ধরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। পাশ্চাত্য জগতের সোসিয়ালিজম শিল্প-জগতে যে বিপ্লববাণী প্রচার করিয়াছে,—সে বিপ্লব নিবারণ করিবার জন্য সহজ ও সরল উপায় প্রাচ্য জগতের সামাজিক অনুষ্ঠানে বীজের আকারে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শিল্প পরিবর্ত্তন যুগে ভারতবর্ষের ও চীনদেশের সমবায়-পদ্ধতি যে পাশ্চাত্যের সমবায় অপেক্ষা অধিকতর জীবন্ত, সহজ ও পুরাতন তাহা অনুধাবন করিয়াই পাশ্চাত্যবিষ জর্জ্জরিত ব্যক্তিসর্ব্বস্ব শিল্প কারখানা অনুষ্ঠানের সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

তখন বস্তির পঙ্কিল পশুজীবন অসম্ভব হইবে, শ্রমজীবিগণ পশুর মতন নহে, শুধু হাতলের মত নিষ্ক্রিয় মানুষের মতন নহে, তাহারা কর্ম্মঠ ও স্বাধীন মানুষের উচিত ব্যবহার পাইবে।

কয়েকটি ধনী ও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর স্বার্থের জন্য নহে, সমূহের কল্যাণের জন্য শিল্পানুষ্ঠান পরিচালিত হইবে। শিল্প তখন বাস্তবিক সমাজের কল্যাণে লাগিবে, এবং শিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য তখন হইবে মানুষকে উপযুক্ত বিশ্রামের সুযোগ দিয়া তাহাকে অতীত ও ভবিষ্যতের সকল সভ্যতার দানের অধিকারী করা।

সম্পাদক

বর্ষ-বোধন

হে বর্ষ নবীন,

কোন গূঢ় মাতৃ-বক্ষে আত্মহারা ছিলে এতদিন ?
আধ ফোটা কুসুমের সুগোপন বিকাশের মত
একি মৌন সুষমায় বিকাশিলে শুভ্র অনাহত
অকলঙ্ক সুন্দর নবীন ! জীর্ণতায় করিয়া মোহন
কণ্টকে সার্থক করি'—আনিয়াছ নব সঞ্জীবন !
যে পাতা পড়েছে ঝরি বসন্তের বাসক-শয়নে,
যে শোভা হারায়ে গেছে যৌবনের অকাল মরণে,
যে সুর লুকায়ে ছিল ভাষাহীন বক্ষের মাঝার,
যে হাসি ফুটিতে গিয়া আঁখি জলে হারাল আবার,
যে তৃষা সলিল মাগি' মরুবক্ষে লভেছে নির্ব্বাণ,
যে আশা বাসনারাজি বিকশিয়া হ'ল অবসান,—
আজি সে সবারে তুমি নবরূপে নব চেতনায়
ফুটায়েছ জাগায়েছ জীবনের অমৃত ধারায়।
কি আজ এনেছ বন্ধু ? আসিয়াছ কোন্ বার্ত্তা বহি' ?
বন্ধুর কর্ত্তব্য-পথে কুণ্ঠা, লাজ, ব্যথা, ভয় সহি',
আবার বিদায় দিনে দিয়ে যাবে কোন্ অর্ঘ্যভার—
হাসি-অশ্রু-মালিকার অজানিত শেষ পুরস্কার ?
শেষ তো হয়েছে বন্ধু, লাভ ক্ষতি দ্বন্দ্ব বিসম্বাদ,
স্বার্থের শোণিত স্রোত, প্রলয়ের অশনি নিনাদ,
এবার জাগাও প্রাণ সভ্যতার পাষাণ-শিলায়,
নবীন জীবন-স্রোত বহে যাক্ নির্ঝর-ধারায় ;
অন্ধেরে নয়ন দেহ, মৃত জনে দেহ নব প্রাণ,
তৃষাতুর বিশ্ববাসী অমৃতের লভুক সন্ধান।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ এম্, এ,

বঙ্গ-সাহিত্যের যুগ

এই শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার যে কোনও অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা যায় সকলই কবিত্বে পরিপূর্ণ দেখিতে পাই। বাঙ্গালী জীবন যেন কবিত্ব দ্বারাই গঠিত ও সমুদ্ভাসিত। বাঙ্গালীর হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে, অশনে, বসনে, গৃহে, প্রাঙ্গণে, বনে বনে, জীবনে মরণে কবিত্ব লইয়াই ঘরকন্না। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে এমন কথায় কথায় ছড়া কাটিতে, প্রতি কথার প্রত্যুত্তরে কবিতায় তুলনা প্রদর্শন করিতে জগতে আর কোনও জাতি অভ্যস্ত কি না সন্দেহ।

কবিত্ব প্রকৃতিমাতার প্রাকৃতিক দান। যিনি কবি, যিনি ভাবুক, যিনি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বিহীন নহেন, তিনি প্রকৃতিমাতার প্রতি অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে এই কবিত্বের লীলাতরঙ্গ দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া বুঝিয়া স্বভাবতঃই তন্ময় হইয়া উঠেন। প্রকৃতিমাতার সুকোমল হৃদয়ে অবিরত যে বীণার ঝঙ্কার হইতেছে সেই বীণা করে ধারণ করিয়াই আমাদের জ্ঞানমাতা বীণাপাণি। এই বীণার প্রতি ঝঙ্কারে যে আলেখ্য চিত্রিত হইতেছে তাহাতেই প্রকৃতিমাতা আত্মহারা হইয়া রহিয়াছেন।

জ্ঞানমাতার প্রাকৃতিক তালমানলয় সমন্বিত বীণার ঝঙ্কার এক অনন্ত সম্ভব ভাবের আত্মবিহ্বলতায় সততই এই বিশ্বকে বিহ্বল করিয়া রাখিতে চায়। যিনি এই ভাবের বিভোরে একবার বিহ্বল হইয়াছেন তাঁহার অন্য অনুভূতির দিকে লক্ষ্য থাকিতে পারে না। অশন বসনে, শয়নে স্বপনে অবিরত তাঁহার অন্তরে নৃত্যশীল ভাব সৌন্দর্য্য আন্দোলিত হইয়া তাঁহাকেও তদ্বৎ করিয়া রাখে। অন্য ভোগ সুখ, অন্য লালসা, অন্য কোনও সম্পদের আকর্ষণ তাঁহাকে আকৃষ্ট বা তৃপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। পরন্তু যে সম্পদ—যে ঐশ্বর্য্যের শক্তি এই তন্ময়তার ভাবের বিকর্ষণ জন্মায় সেই ঐশ্বর্য্য সম্পদ হইতেই তিনি বিদূরে হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত এক অজ্ঞাত সংঘর্ষণের সূত্রপাত করিতে বাধ্য হন। এই সংঘর্ষণকে আপনারা লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ বা যাহা বলিতে হয় বলুন, ভাবুকের সে দিকে কোনও লক্ষ্য নাই, তাঁহার স্বার্থ তদবস্থা হইতে অন্যত্র বিচরণ করে।

প্রকৃতিমাতার এই সতত নৃত্যশীল ঝঙ্কার একবার যে সাধকের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে তিনি মজিয়াছেন। এই ঝঙ্কার হইতেই সম্ভবতঃ সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের উৎপত্তি। এই আভ্যন্তরিক ঝঙ্কারানুভূতির বহির্বিকাশেই বোধহয় সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের জন্ম। এই নিমিত্তই বোধ হয় আদিতম সময়ে উলঙ্গ প্রকৃতির কোলে সরল বিশুদ্ধ প্রাণস্পর্শী প্রাণের গানই প্রথম অভিব্যক্তি রূপে আমরা পাইয়াছিলাম। তার পর সুর তান লয় সামঞ্জস্যে নৃত্য ও বাদ্য। প্রাণ যখন ভাবে উন্মত্ত, তখন নৃত্য আপনি আসিয়া যোগদান করে, সঙ্গীত নৃত্য ও বাদ্যের সাহায্যে তন্ময়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। তখন সকল বহির্বিকাশ লুপ্ত হইয়া অন্তরেই লীলা চলিতে থাকে। এ লীলার দৃষ্টান্ত আমরা রাধাকৃষ্ণের সময়ে ও চৈতন্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণবভাব প্রসারণে অনেক দেখিতে বুঝিতে পাই ও পাইয়াছি। এই কারণেই বোধহয় সমগ্র মানবজাতির আদিম উপাসনা, আদিম ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি প্রায়শঃই সঙ্গীতে আরম্ভ হয়। সঙ্গীত সুরতানলয়-যুক্ত ভাবের অভিব্যক্তি ব্যতীত কিছুই নহে। যাহার সাহায্যে এই অভিব্যক্তি তাহার নামই ভাষা।

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটীকে আর্য্যভাষায় সঙ্গীত বলা হয়।

সাধারণ নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের ভাবের প্রাথমিক অভিব্যক্তি এই সঙ্গীতে। এই সঙ্গীত হইতেই কবিতা এই সঙ্গীতও কবিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদও সঙ্গীত, রামায়ণ মহাভারতও সঙ্গীত। যাহা প্রাণের গান তাহাই সঙ্গীত। এই অভিব্যক্তিকে আপনারা আন্দোলিত চালিত গ্রথিত করিয়া যেরূপেই রূপান্তর করিতে চাহেন করিতেছেন, কিন্তু, প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ সতত সঙ্গীতায়মান

ভাবধ্বনির সুরতানলয় হইতে উহা যতই দূরে সরিবে, ততই বিকর্ষিত হইবে ততই তাহার গ্রন্থি শিথিল, নাড়ী দুর্ব্বল, শ্বাস-প্রশ্বাসক্ষুণ্ণ হইয়া আসিতে থাকিবে। ভাবের সহিত ভাবের অভিব্যক্তির এই সামঞ্জস্য, এই অভেদ্য মিলন বন্ধনকেই সাহিত্য বলিতে পারা যায়। যে কোনও প্রকারের অভিব্যক্তি এই সাহচর্য্যের কার্য্য করে তাহাই সাহিত্য। যেস্থানে যেরূপেই প্রবাহিত হউক না কেন সকল নদীর গতি যেমন সমুদ্রের দিকে, তেমনি যে স্থানে যে ভাবে যে অবস্থায় যে পদ্ধতিতেই সাধনা করুন না কেন সর্ব্বপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তির গতি এই সাহিত্যের দিকে। কাব্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত শাস্ত্রও এই হিসাবে সাহিত্য। নীরব চিত্র বা ভাস্কর্য্যের দ্বারা ভাবের অনুভূতি অভিব্যক্তি হয়; বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে প্রাণ ভাবের বশে প্রমত্ত হইয়া উঠে। প্রকৃতিমাতার প্রতি অণুপরমাণুর অভ্যন্তরে যে সাহিত্যের ধ্বনি অবিরত শ্রুত হইতেছে সেই সাহিত্যের মধুর ভাব চিত্রে, ভাস্কর্য্যে বা শব্দ মধুর বাদ্যেও বিদ্যমান আছে, কিন্তু এই সাহিত্যের অনুভূতি প্রাণে জাগরিত করিয়া তোলা সাধনাসাপেক্ষ। এই সাহিত্যের সাধনা যাঁহাদের নাই, এই ভাবের ও অভাবের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনকে চালাইয়া লইয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা যাঁহার জন্মে নাই তাঁহার জন্য কর্ম্ম সকলই নিষ্ফল।

একজন সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন—

"সঙ্গীত-সাহিত্য রসোহনভিজ্ঞঃ
প্রায়ঃ পশু তুচ্ছ বিষাণ হীনঃ।
চরত্য সৌ কিন্তু তৃণং ন ভুংক্তে
পরং পশুনামপি ভাগ্য হেতুঃ॥"

কথাটা একটু কর্কশ ও অপার্থিব ভাষায় লিখিত হইয়া থাকিলেও নিতান্ত অসার নহে।

আমরা ভাষা-সাহায্যে আমাদের ভাবের ও অভাবের অভিব্যক্তিকে সাধারণতঃ পদ্য ও গদ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি (চিত্র ভাস্কর্য্য বা বাদ্যযন্ত্রের অভিব্যক্তির বিষয় আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে) ফলতঃ যিনি প্রাণের নৃত্যশীল তরঙ্গোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি ভাষা সাহায্যে বহি-র্বিকশিত করিবার নিমিত্ত লেখনি ধারণ করেন, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে ভাবের উচ্ছ্বাস বহির্গত হয় তাহা পদ্যেই হউক বা গদ্যেই হউক তাহার অনুপ্রেরণার শক্তি একই এবং তাহার নৃত্যশীলতা ও সুরতানলয়ের মাধুর্য্যে পার্থক্য অতি কম। এই কারণে আমি ভাবাত্মক অভিব্যক্তি মাত্রকেই কবিত্ব বলি। পদ্যেই হউক, আর গদ্যেই হউক, ভাষা সাহায্যে এই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্রকেই আমি কাব্য বলি। প্রাকৃতিক ঝঙ্কার হইতেই প্রথমেই সুরতানলয় সংযুক্ত সঙ্গীতে ভাবের বহির্বিকাশ একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সংগীত, গীত, বা কবিতাই আদিতে ছিল, তারপর ক্রমশঃ গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে। কখন কিরূপে গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি যে বিষয়ে সংক্ষিপ্ততম আলোচনা করিয়াছি পাছে তাহাই আপনারা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেন এই ভয়ে আমার লেখনিকে আমি যতদূর সম্ভব সংযত করিয়াছি, ভাবের উচ্ছ্বাসকে যতদূর সম্ভব চাপা দিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। সুতরাং প্রাসঙ্গিক হইলেও প্রত্যক্ষ অনালোচ্য বিষয়ের আলোচনা দ্বারা আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছা করি না।

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যতদূর প্রাচীনতম ইতিহাস এ পর্য্যন্ত জানিতে পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় বাঙ্গালা একটা অতি প্রাচীন সভ্যদেশ, মঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। আর্য্যগণ এদেশে অতি অল্প দিনই আসিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে শিল্পবাণিজ্য কৃষিকার্য্য ও উপনিবেশ স্থাপনে সিদ্ধ হস্ত ছিল। একথা সত্য হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই উন্নত জাতির একটা স্বতন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাষাও ছিল। অমূল্য পরিবর্ত্তনের দেশের, জাতির ও ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়ায় সে ভাষা কি ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় না থাকিলেও সেই সময়ের ভাষার অনেক শব্দ সম্পদ আমাদের বর্ত্তমান ভাষায় অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া আছে। যে সকল প্রবল শক্তি আমাদের প্রাচীন ভাষাকে ধ্বংস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সংস্কৃতই প্রধান। সাঁওতাল ভিল প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বত্য জাতি

কখনও সংস্কৃতের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, তাহাদের ভাষা এখনও স্বতন্ত্র আছে। হয়ত ঐ সকল জাতির ভাষায়ও আমাদের প্রাচীন ভাষার আভাস পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এখনও বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঙ্গের কথ্য ভাষার মধ্যে এমন সকল শব্দ পাওয়া যায় যাহার উৎপত্তি বা আবির্ভাবের কোনও তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় না। ঐ সকল শব্দ যে আমাদের প্রাচীন সম্পদ নয় তাহা নিঃসন্দেহে কেহই বলিতে পারেন না। এই কথ্য ভাষার সংগ্রহ হওয়া উচিত এবং অনতিবিলম্বে এখনও বঙ্গদেশে যে সকল কথ্যভাষা প্রচলিত আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লেখ্য ও কথ্যভাষার শব্দ সম্পদ লইয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য একথা আমি বিগত বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনে আমার লিখিত "লেখ্য ও কথ্য-ভাষার মিলন" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—এখন যাঁহারা সিংহলে বাস করেন এককালে তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। আর্য্যজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহুজাতির আবির্ভাবে ও অত্যাচারে এদেশের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সিংহলের উপর এতটা চাপ না পড়ায় তথাকার ভাষা বড় একটা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সিংহলী ভাষায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থ আছে; এই সকল অধ্যয়ন করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন ভাষার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গদেশে আর এক প্রকার ভাষার সন্ধান পাইয়াছেন, "উহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দগুলি মাত্র বুঝা যায়, আর কিছু বোঝা যায় না। উহার ক্রিয়াপদগুলি এক অদ্ভুত রকমের, বিশেষ্য-পদগুলিও এক অদ্ভুত রকমের।" তাঁহার মতে এ ভাষারও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। প্রাচীন বঙ্গদেশ ও তাহার ভাষা সম্বন্ধে যাঁহাদের একটা ধারণা নাই, তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত এতটুকমাত্র বলিলাম; এ প্রবন্ধে ইহার অতিরিক্ত বলার অধিকার আমার নাই।

"মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন অতি প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি গান ও ছড়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেক Idioms বাঙ্গালাতেই আছে, অন্য দেশে নাই। এগুলির অধিকাংশই বাঙ্গালীর লেখা তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পুঁথিগুলি পাইয়াছি সেগুলি সে কালের বাঙ্গালা অক্ষরে মুসলমান অধিকারেরও পূর্ব্বের লেখা। যাঁহারা গান লিখিতেন তাঁহাদিগকে সিদ্ধাচার্য্য বলে। সিদ্ধাচার্য্যগণের আদি যিনি, তাঁহারও গান পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে ধর্ম্মপ্রচার করেন তাহাকে সহজীয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বলে।"

বৌদ্ধ সহজীয়া ধর্ম্ম চৈতন্যের জন্মের ৮।৯ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হন। এই হিসাবে আমরা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন পাইয়াছি। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা এখনও আমাদের ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের জ্ঞানগোচর হয় নাই।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিগত বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিরূপে আপন অভিভাষণে লিখিতেছেন :—"আমাদের পদ্যের ও কাব্যের ইতিহাস অতি প্রাচীন, দীনেশবাবু যতদূর দেখিতে পাইয়াছেন তদপেক্ষা আরও পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন। দীনেশবাবুর মতে শূন্যপুরাণ সকলের চেয়ে প্রাচীন। কিন্তু সেও মুসলমান আক্রমণের পরের লেখা। কারণ, উহাতে "নিরঞ্জনের উষ্মা" নামে যে ছড়া আছে তাহাতে মুসলমান-আক্রমণের বর্ণনা আছে। কিন্তু, আমাদের দেশের নাথ-পন্থের যোগীরা খৃষ্টের অষ্টম শতকের বাঙ্গালীর ছড়া লিখিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরাও সেই কালেরই লোক। * * *। সিদ্ধাচার্য্যদের গীতগুলি কিন্তু সেই কালের লেখায় সেই কালের টীকার সহিত পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে পরিবর্ত্তন হয় নাই, সুতরাং হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার যে অবস্থা ছিল, তাহার একটা ঠিক ফটোগ্রাফ্ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে পারসী কথার লেশমাত্র নাই। বড় বড় সংস্কৃত কথা একেবারেই নাই। সে কালের ভদ্রলোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, ঠিক সেই ভাষায় লেখা। * *। গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনেক বদল হইয়া গেলেও উহাও মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের লেখা।"

যাহাহউক সে প্রাচীন ভাষার বিষয় আলোচনা করিতে

আজ আমরা উপস্থিত হই নাই। আমাদের পক্ষে এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলাই যথেষ্ট যে আর্য্যসভ্যতা এদেশে ছড়াইয়া পড়ার পর বর্ত্তমান ধারার বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ভাষা ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ চীন তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলা ভাষা কিরূপ ছিল তাহার একটা ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যগণের ও নাথপন্থের যোগীগণের ছড়া, গান ও কবিতা। এই সকল প্রাচীন গীত বা দোঁহার কালনির্ণয় করিতে ভাষা ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যে কোনও সমস্যায় বা সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হউন না কেন— আমরা তাঁহাদের আলোচনা, (যাহা এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক) হইতে ইহা সঠিক বুঝিতে পারিয়াছি যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার কালেই বঙ্গভাষার প্রথমস্তর সংগঠিত হয়। বঙ্গ ভাষার বা বাঙ্গালা কবিতা বা পদ্য সাহিত্য সম্পদে সীমাবদ্ধ সেই প্রথম বিভাগকে "বৌদ্ধ যুগ" নাম দেওয়া যাইতে পারে।

বঙ্গসাহিত্যের এই প্রথমযুগের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস বা কীর্ত্তিকলাপের শৃঙ্খলার আভাস পরবর্ত্তী কালের বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতে পারেনাই, কাজেই তখনকার সকলই যেন তিমিরাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়। তখনকার লোকের এসব বিষয়ে লক্ষ্য কম ছিল বলিয়াই হউক, অথবা প্রবল প্রতিযোগীতা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলে তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃতই হউক, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসটা তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়া গেল। বর্ত্তমানের তথাকথিত উন্নত অবস্থায় সে কথা মনে জাগিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত করে। এখন আমরা চীন হইতে—তিব্বত হইতে সেই পবিত্র যুগের চিতাভস্ম সংগ্রহ করিতে করিতে তাহারই মধ্যে যে অমূল্যরত্ন পাইতেছি তাহাই আদরে ঘরে আনিয়া যাঁহাদের নিকট হইতে পাইতেছি তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত করিতেছি!

বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য সম্পদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

১। প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত (২) রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাজা গোবিন্দচন্দ্র পালের গীত (একাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বের কবি দুর্ল্লভমল্লিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত) দুর্ল্লভমল্লিক :—

হেথা রাজা গোবিন্দচন্দ্রের হয়েছে মরণ
উছুনী পুছুনী তাকে নাহিক চেতন।
রাজারে দেখিয়া রাণী ভয়ে চমকিত
প্রাণ ছাড়্যা গ্যাছে রাজার কায়া বিচলিত।

* * *

ভূমে গড়া গড়ি যায় নাহি বাঁধে চুলি।
ফুকরি ফুকরি কাঁদে অভরণ ফেলি।
রাক্ষসী রাজার মাতা ময়না মন্ত্রি রাণি।
শাপ গালি দিল নাই পোহাল্য রজনী॥
কপালে আঘাত হানে মৃতপতিকোলে
প্রাণ ত্যজিবারে কেহ বিষচায়্যা বোলে॥

ইত্যাদি।

৩। মহীপালের গীত (ধান্ ভান্তে মহীপালের গীত)।

৪। নাথ পন্থের যোগীদের ছড়া।

৫। ডাকের বচন, খনার বচন, বারমাসী।

৬। কানু ভট্টের কার্য্যাকার্য্য বিনিশ্চয় (১০ম শতাব্দীর শেষ)।

৭। ময়ূর ভট্টের ধর্ম্ম মঙ্গল কবিতা (সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে)।

৮। পালরাজাদের সম্বন্ধে সঙ্গীত ও কথা (গোরক্ষ নাথ ও হবি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ)

সীতারাম, খেলারাম, মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, রামচন্দ্র, শ্যামপণ্ডিত, রামদাস আদক, সহদেব চক্রবর্ত্তী, ঘনরাম প্রভৃতি ধর্ম্মমঙ্গল কবিগণ—পালরাজাদের সময়ে ধর্ম্মঠাকুরের গুণগান করিবার নিমিত্ত রচিত গান ও কবিতাগুলিকে হিন্দুভাবে পরিবর্ত্তিত করতঃ প্রচার করেন। ইহার পরেই শিবের গান।

এই সকল গান ছড়া ও কবিতা ভট্টগণের ও গায়কগণের মুখে মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া দেশের জনসাধারণকে প্রার্থিতরূপে পরিচালিত করিয়া তুলিত। ভট্ট কবিগণের প্রতিপত্তি নিতান্ত সাধারণ ছিল না। যে ভট্ট ও চারণগণ

রাজপুত জাতিকে কবিতার মন্ত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাঁহাদের শক্তি এদেশেও বড় কম কার্য্য করে নাই।

এ যুগের শেষের দিকে বৌদ্ধ গাঁথা ও দোঁহাগুলিকে হিন্দুভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াও প্রচার করা সর্ব্বশেষে শিবের ও মনসার গানের প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের অবস্থা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনেক কীর্ত্তিকলাপ যেমন ক্রমে হিন্দুত্বের ছাপ লইয়া হিন্দু হইতে বাধ্য হইয়াছে, তেমনি গাঁথা কাহিনী গুলিও হিন্দুভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ধর্ম্মের সহিত সাহিত্য অমোচনীয় বন্ধনে আবদ্ধ রহিতে বাধ্য।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতে ধর্ম্মের ক্রম পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের যুগ পরিবর্ত্তনের একটা সামঞ্জস্যের কথার আলোচনা সঙ্গত বিবেচনা করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গীতায় মানবের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনটী মহৎপথ প্রদর্শন করিয়াছেন :—

(১) জ্ঞানপথ (২) কর্ম্মপথ (৩) ভক্তি পথ। তিনি তাঁহার সময়ে এই তিনটীরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যান। ক্রমে ভারতে কৃষ্ণের শিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধর্ম্ম কেবল জীবঘাতী যাগ যজ্ঞে পরিণত হয়। তখন "সদয় হৃদয় দর্শিত পশু ঘাতং" শ্রীবুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মপথ সম্প্রসারিত করিয়া যান। ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতা নিবন্ধন কালে তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যাজকগণ সে পথে ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব উপস্থিত করিলে শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানপথ সম্প্রসারিত করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জড়ত্ব তাঁহার সার্ব্বভৌমজ্ঞানবাদেবিলীন করেন। ক্রমে শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞানপথে মায়াবাদের কঠোরতার আধিপত্য প্রবল হইয়া পড়িলে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথের প্রেমের বন্যায় ধর্ম্মের সেই কঠোরতাকে ভাসাইয়া লইয়া যান। গীতার এই তিন মতের সম্মিলনেই আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম।

আমাদের সাহিত্যও ধর্ম্মের গতির সহিত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে ধর্ম্মের উত্থান পতন ও সামাজিক বিপ্লব জাগরণ পতনের সহিত সাহিত্যের উত্থান পতন পরিবর্ত্তন একতারে গাঁথা থাকে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তথাকথিত অবসান ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিপত্তির অঙ্কেই বঙ্গ সাহিত্য দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করে। ধর্ম্মের নামে জগতে প্রায়ই জাতিবক্ষে অনেক অধর্ম্ম সম্প্রসারিত করিয়া জাতিবক্ষ দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। আমাদের দেশও ক্রমে তদ্রূপ অবস্থায় উপস্থিত হয়। বাঙ্গালীর রাজা লক্ষণ সেন ধর্ম্মভীরু। ধর্ম্মভীরুতার অন্ধতা তখন দেশের রাজাকেও এমন কাপুরুষ করিয়া ফেলিয়াছিল। দেশের যাঁহাদের উপর ধর্ম্মের ভার ন্যস্ত ছিল তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও এমনই কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন যে অবশেষে সপ্তকোটী বাঙ্গালীর অধিনায়ককেও সপ্ত দশজন অশ্বারোহীর ভয়ে সোণার বাঙ্গালা রাজ্য চিরতরে অতল জলে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভেই পাপের ছিদ্র ধরিয়া সর্পবেশে বক্তিয়ার খিলিজিকে অগ্রগামী করতঃ মুসলমানগণ বঙ্গের ভাগ্য বিধানের ভার গ্রহণ করিলেন। বঙ্গের

মুসলমান যুগ।

রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত বঙ্গসাহিত্যও এক নবযুগে পদার্পণ করিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপূর্ণ শক্তিতে দেশের যথাসর্ব্বস্ব করতলগত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ পরিচালিত করিতেছিল। এমন সময়ে মুসলমানগণ আসরে অবতীর্ণ হইলেন। বহুদিন তাঁহাদের বিশৃঙ্খলায় কাটিয়া গেল। ধীরে ধীরে সমগ্র বঙ্গ করতলগত করিয়া একটু স্থির হইয়া বসিতে তাঁহাদের শতাধিক বর্ষ লাগিল। এই সময়ে তাঁহারা দেশের প্রকৃত উন্নতির দিকে ও দেশবাসীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতে যত্নপর হইলেন। তাঁহারা "করাল কৃপাণ মুখে ধর্ম্মের বিস্তার"ই করুন বা মুসলমান ধর্ম্মের উচ্চনীচভেদ ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার বিহীন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আকর্ষণেই হউক, বাঙ্গালার অনেক দরিদ্র অবস্থার লোক ও স্থল বিশেষে অনেক সুবস্থাপন্ন লোকেরও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। বিজেতৃ মুসলমানগণের সংখ্যা অপেক্ষা বিজিত নব দীক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে। মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারকগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া রাজ সাহায্যের অন্তরালে অবস্থান

পূর্ব্বক এই মহৎকার্য্য সাধিত করেন। এই সকল দীক্ষিত মুসলমানগণের মাতৃভাষা কিন্তু বাঙ্গালা,—কিন্তু ধর্ম্মের ভাষা হইল আর্বি, পারশী। এই স্থলে আবার বলিতে হইতেছে —ধর্ম্মের গতির সহিত সাহিত্যের গতি অতি ঘনিষ্ঠ।

ধর্ম্মশাস্ত্র যে ভাষায় লিখিত থাকে, সেই ভাষার দিকে সাধারণ জন মণ্ডলীর একটা প্রবল আকর্ষণ থাকা, সেই ভাষাকে ধর্ম্মপ্রাণ জাতির পক্ষে জীবনে মরণে দেবভাষারূপে চির-সঙ্গী করিয়া তুলিবার বাসনা স্বাভাবিক। এই কারণে বৌদ্ধযুগে প্রাদেশিক ভাষার প্রতি আকর্ষণের পরিচয় ও সংস্কৃত বর্জ্জিত বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থ সকলই আর্য্যগণের ভাষা সংস্কৃতে লিখিত বলিয়া হিন্দুগণ স্বভাবতঃই সংস্কৃতের জন্য পাগল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতাপ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কারণে বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষার উপর সংস্কৃতের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতে থাকে। হিন্দুগণ, বিশেষতঃ হিন্দুর ধর্ম্ম যাজকগণ এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষাকে অতিশয় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। উহাকে লিখিবার পড়িবার ভাষা বলিয়াই গ্রাহ্য করিতেন না। ভিখারিনী বঙ্গভাষার এই দুরবস্থার সময়ে তাহাকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান মুসলমান সংঘর্ষ আনয়ন করেন। মুসলমানগণের এবং মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত বাঙ্গালীগণের ধর্ম্মের ভাষা হইল আরবী পারসী, রাজার ভাষা হইল আরবী পারসী। কিন্তু প্রবল শক্তি হিন্দুগণের ধর্ম্মের ভাষা সংস্কৃত। অথচ উভয় সম্প্রদায় ভুক্ত বাঙ্গালীগণেরই মাতৃভাষা বাঙ্গালা। একদিকে মুসলমানগণ ধর্ম্ম প্রচার ও রাজকার্য্য ব্যপদেশে ও একত্র বসবাসে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, তাহাদের জাতীয় ভাষার বক্ষে, অনেক আরবী পারসী ভাষার শব্দ ও ভাবসম্পদ প্রবিষ্ট করিয়াদিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সমস্ত হিন্দুস্থানী কর্ম্মচারীগণ এদেশে আসিয়া পড়িলেন তাঁহারা অনেক হিন্দীশব্দ আমাদের ভাষা ও ব্যবহারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অপর দিকে এই প্রবল প্রতিযোগীতার সময়ে হিন্দুধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন মনীষিগণ সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের নিকট প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদির মাহাত্ম্য প্রচার করিবার নিমিত্ত সংস্কৃত গ্রন্থ রাশির বাঙ্গলা তর্জ্জমা করিয়া দেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের অফুরন্ত শব্দ সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া নবকলেবর প্রদান করিতে লাগিলেন। হিন্দু—মুসলমানগণের বিবাদের মতন, ভাগাভাগির মতন ভাষাটা যেন দুই ভাগ হইয়া পড়িল। একটা হইল আরবী-পারসী-শব্দ-বহুল।

মুসলমানী বাঙ্গালা—যথা—"সাহেবান্ দরজদান ও বেরাদারান্ গরীবের আজ্জে্ খানার তশরীফ রাখিয়া আরজানি ফরমাইয়া, গরীবানা তায়াম তালাওল পূর্ব্বক বন্দাকে সরাফরাজ্ করিবেন"।

আর একটা হইল—সংস্কৃত বহুল কঠোর হিন্দুর বাঙ্গালা :—

যথা :—"কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।"

এই বারোয়ারীর চাপে পড়িয়া বাঙ্গালাভাষা যেরূপেই বিভক্ত হউকনা কেন, তাহার একটা পরম সমাদর পড়িয়া গেল, তাহার একটা স্বাধীন অস্তিত্ব জন্মিল, তাহার শক্তি অভঙ্গ ও অদম্য হইয়া উঠিল।

এই সময়ে যেমন হিন্দুগণ সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালীর চিত্ত হিন্দুধর্ম্মে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ প্রচলিত করিতে লাগিলেন, তেমনি মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীগণ আরবী ও পারসীর ভাণ্ডার হইতে রত্ন আহরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ, কেচ্ছা প্রভৃতি লিখিতে লাগিলেন।

এই ধর্ম্ম ও ভাষা সংঘর্ষণের মধ্য হইতে সমুদ্র মন্থন দলের ন্যায় আমরা যে অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছিলাম তাহাই বোধ হয় আজ পর্য্যন্তও বঙ্গ সাহিত্যের, বাঙ্গালীর ব্যবহারিক জীবনের, বাঙ্গালীর গৃহ প্রাঙ্গনের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে।

আমরা এই সময়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলি, কাশীরাম কৃত্তিবাসের পঞ্চদশ শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর-জাতীয় জীবনের অনুরূপে পরিবর্ত্তিত মহাভারত রামায়ণ, মুকুন্দ রামের (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে) চণ্ডী ও শ্রীমন্ত সদাগর, ক্ষেমানন্দ কেতকীদাস ও বিজয় গুপ্তের

মনসার ভাসান, প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীর কালিকা মঙ্গল, রামেশ্বরের শিবসংকীর্ত্তন পাই। এইউন্নতির সময়ে সঞ্জয় কৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধর বসু ওরফে গুণরাধা খাঁ, দ্বিজ জনার্দ্দন, রতিদেব বাণেশ্বর পণ্ডিত, কবি পরমেশ্বর প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। মুসলমান বাদসাহগণের আনুকুল্যে বৃত্তি ও সম্পত্তি পাইয়া অনেকে নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যসাধনায় অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এই সময়ে বড়গাজী, বড়পীর, পীর গোরাচাঁদ প্রভৃতি মুসলমানী বাঙ্গালায় আলাপপ্রলাপ পীরত্বের কিচ্ছা লিখিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পুষ্টিসাধন করেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বন বিবির জহুর নামা অতি উপাদেয় গ্রন্থ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে এই ভাবের স্রোত চলিতে থাকে।

সমাজে ধর্ম্ম, আচারে ব্যবহারে আকাশ পাতাল ভেদ থাকিলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে একই দেশে বাস করিয়া একই ফলে জলে পুষ্ট হইয়া, একই সুখে দুঃখে যোগদান করিয়া ক্রমে হিন্দু মুসলমান প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পরস্পর মিলিত হইতে আরম্ভ করে। সমাজের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। দেশ মুসলমানী হাবভাব চালচলন কথাবার্ত্তায় সংক্রামিত হইয়া পড়ে। মুসলমানগণও হিন্দুর অনেক ভাব গ্রহণ করিয়া অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়েন। হিন্দুদিগের পক্ষে একদিকে নূতনত্বের আকর্ষণ অন্যদিকে প্রভুত্বের কশাঘাত উভয়ই এই পরিবর্ত্তনে সমান সাহায্য করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কঠোরতা বা গোড়ামীর হস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত অনেক হিন্দু এই সময়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিলে যদি আমার গঙ্গাস্নান করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সুযোগ পাইলে ঘৃণিত অস্পৃশ্য, অদ্রষ্টব্য সে চণ্ডাল আমার সংস্পর্শ ত্যাগ করিবে না কেন? পূর্ব্বে উদারতা লুপ্ত হইয়া তখন হিন্দুধর্ম্ম কঠোর রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল; তাই, সুযোগ বুঝিয়া পরন্তু বাধ্য হইয়াও হিন্দুগণ মুসলমান হইতে লাগিল। হিন্দুর সর্ব্বনাশের সময় উপস্থিত হইল। কঠোর বন্ধন ও অত্যাচার হইতে মুক্ত হইতে গিয়া জনসাধারণ ইতভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কিন্তু, হিন্দুধর্ম্মে এমনই একটা স্বাভাবিক সম্প্রসারিণী শক্তি আছে, এমনই একটা আধ্যাত্মিক ঔদার্য্য শক্তি রহিয়াছে যে সকল অবস্থাতেই এই ধর্ম্ম প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া গিয়া আবার আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

হিন্দুর ভগবান বলিতেছেন :—

"পরিত্রাণায় সাধুণাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

দ্বাপরে ব্রাহ্মণ্যের কঠোর অত্যাচার, অহঙ্কার, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ভেদ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপন করিয়া ছিলেন। কলিযুগের এই ধর্ম্ম ও সমাজের ভীষণ সংগ্রামের মধ্য হইতেও ধীরে ধীরে সেই ভগবানের পবিত্র শক্তি, সেই বিশ্বপ্রেম, সেই বাঁশরীর মোহন আহ্বান, সেই রাধিকার প্রেমোন্মাদনা জাগিয়া উঠিয়া হিন্দুধর্ম্মের অবৈধকঠোরতা ও জনসাধারণের মুসলমান ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইবার উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষা, এতদুভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গবাসীগণকে নব পথে পরিচালিত করিয়া দিবার নিমিত্ত নবধর্ম্মের বীজ বপন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংরক্ষণে ব্রতী হইল। এই নবধর্ম্ম বিস্ময়ী উদারতার সম্প্রসারণে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিতে করিতে হিন্দু ধর্ম্মকে অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইল; পরন্তু অমিত শক্তি মুসলমানগণের অসংযত ভাবের স্রোতের মধ্যেও অনেক পরিমাণে সংযম আনয়ন করিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এক বাহুতে হিন্দু ধর্ম্মকে অপর বাহুতে মুসলমান ধর্ম্মকে প্রাণের আবেগে আলিঙ্গন করতঃ প্রেমের বন্যায় দেশের সমাজের সমস্ত আবিলতা ভাসাইয়া লইয়া গেল, প্রেমের বন্যার সহিত বঙ্গ সাহিত্যের এক প্রবল বন্যার সূত্রপাত হইল। এই নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবতীর্ণ হইলেন। আম্র মুকুল ভক্ষণ করিয়া বসন্তের আগমনের পূর্ব্বেই যেমন বসন্ত সখা পঞ্চম স্বরে তাঁহার আগমনী গান করিয়া শীতে অভীষ্ট প্রাণে এক সম্মোহন বানের আঘাত জনিত চাঞ্চল্য উপস্থিত করে, তদ্রূপ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই সংস্কৃতের কুক্ষিভেদ করিয়া সুমধুর তানে বাঙ্গালী কবি জয়দেব গাহিয়া উঠিলেন:—

"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং"

জয়দেবের গীত গোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ কাব্য হইলেও আমরা উহাকে বাঙ্গালার আদি কাব্য বলিয়া মান্য করি। গীত গোবিন্দের ভাষাই বাঙ্গলা কাব্যের ভাষার সূচনা করিয়াছে। বৌদ্ধ যুগের সম্পদের পর কিছুদিন রাজ পরিবর্ত্তনের বাধা অতিক্রম করিয়া আমরা জয়দেবের অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিত হই। জয়দেবের আগমনী সঙ্গীত শ্রবণে ভাবোন্মত্ত হইয়া গীত গোবিন্দের ভাবভাষা ও ছন্দ লইয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস জাগরিত হইয়া প্রেম সঙ্গীতে বাঙ্গালীর তাপিত প্রাণে শীতল করতঃ ভাবের পথে প্রাণের অতি নিভৃত মন্দিরে উপস্থিত হইয়া আসন পাতিয়া বসিলেন। চৈতন্য দেবের জন্মের পর গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ সরল বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় ভাবভক্তিরস বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে ঢালিয়া সংস্কৃতের কঠোর কবল হইতে বঙ্গভাষাকে টানিয়া বাহির করিয়া উহার স্বরূপ প্রদান করতঃ উহাকে সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার ও ব্যবহার করিবার মতন করিলেন। বাঙ্গালাভাষা নবজীবন প্রাপ্ত হইল। মুসলমানগণও এই সময়ে খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে পারসী আরবীর অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া মুসলমানী ভাবে উহাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। বড়গাজী, বড়পীর, পীর, গোরাচাঁদ প্রভৃতি মুসলমানী বাঙ্গালার আপনাপন পীরত্বের কেচ্ছা লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন। বর্নবিবির জহুরনামা এ সময়ের অতি উপাদেয় গ্রন্থ। এই সময়ে একদিকে যেমন বৈষ্ণব কবিতা ও মুসলমানীভাষা জাগরিত হইয়া দেশের উপর প্রভুত্ব প্রসারিত করিতে থাকে, তেমনি হিন্দুগণ আপন শাস্ত্র ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য যাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর এবং সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর বুঝিবার মতন হয়, প্রাণের কামনার অনুযায়ী হয়, আপন দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের সহিত বিমিশ্রিত করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বসাইবার উপযুক্ত হয়, শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে দয়া আনন্দে হাসি, বিপদে সহায়, কার্য্যে বল, শিক্ষায় গুরু, কার্য্যাবসরে উপভোগের উপযুক্ত করিয়া আমাদের শাস্ত্র ও পুরাণগুলিকে সুললিত ভাষায় প্রকাশিত করিয়া দেশের জনসাধারণের হৃদয়ের উপর হিন্দুত্বের প্রভাব সংরক্ষণ করিবার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কনের চণ্ডী ও শ্রীমন্ত সদাগর, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস ও বিজয়গুপ্তের মনসার ভাসান, প্রভৃতি নানাভাবের নানাপ্রকার উপাদেয় গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। বর্ত্তমানে আমাদের যাহা ভাষা তাহা এই যুগেই মুসলমান ও বৈষ্ণবগণ মিলিয়া গঠিত করিয়া তুলেন, কর্ত্তব্যের দায়ে হিন্দুগণও সংস্কৃতের চাবুক ও বেড়াজাল দূরে ফেলিয়া দিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া ভাষার ভাব সৌন্দর্য্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া নূতন বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের গতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন। বঙ্গভাষার এই যুগ জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, এবং ইহাই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান যুগ। বঙ্গভাষার এই যুগকে আমরা "মুসলমানীযুগ" বা "বৈষ্ণব ধর্ম্ম যুগ" আখ্যা প্রদান করিতে পারি। এই যুগ বঙ্গভাষার দ্বিতীয় স্তর। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের যুগে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার সকলই প্রাণের পদার্থ। বাহিরের সহিত সে ভাবের সম্পর্ক যত থাকুক বা না থাকুক জীবের প্রাণ সতত যাহা চায় তাহা আমরা এযুগের সাহিত্যের নিকট পাইয়াছি। এযুগে যে শুধু শান্তিপুর ডুবু ডুবু হইয়া নদীয়া ভাসিয়া গিয়াছিল তাহাই নহে, এযুগের প্রেমের সাহিত্য-বন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। এযুগ নৃত্যগীতে বাদ্যের সহিত ভাবের তন্ময়তার যুগ। এযুগ প্রকৃতি মাতার উলঙ্গ অঙ্কের প্রাণবিহ্বল সুরতানলয় সংযুক্ত স্বাভাবিক নৃত্য, স্বাভাবিক বাদ্য, ও স্বাভাবিক সঙ্গীত সাধনার যুগ। কাব্য ও নাটক লইয়াই শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্ম্মের প্রাণ। নানা ভাবের নানা মতের সঙ্কীর্ত্তনের জন্ম এই যুগে। এমন কোনও পাষণ্ড এখনও নাই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া যাহার প্রাণ উতলা হইয়া না উঠে। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভগবান চৈতন্যদেব সকলকেই আলিঙ্গন দান করতঃ মুক্ত করিয়া গিয়াছেন—আজিও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের ভাব প্রবাহে কত পাপী তাপী তরিয়া যাইতেছে, কত শোক দুঃখ বিদূরিত হইতেছে তাহার অন্ত

জয়দেব।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস, পঞ্চদশ শতাব্দী।

নাই। বৈষ্ণব যুগের এই কীর্ত্তন সঙ্গীত গুলি সংগ্রহ করিয়া "রাম রসায়ণ" প্রণেতা মহাকবি রঘুনন্দন "রাধা মাধবোদয়" নামে এক মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন! এই "রাধা মাধবোদয়" কাব্যকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক খানি "মহাকাব্য" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মুসলমানী বা বৈষ্ণব সাহিত্য যুগের যখন অবসান হয় তখন মুসলমানগণেরও পতনের অবস্থা। বৈষ্ণব ধর্ম্মও ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতেছিল। বৈষ্ণব সাহিত্য যুগের জাগরণের ফলে বাসুদেব সর্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতির ন্যায় মনস্বীগণ আত্মপ্রকাশ করেন। মুসলমান ও বৈষ্ণবগণের শক্তি যখন হ্রাস হইতে আরম্ভ করে তখন এই সকল মনীষিগণের চেষ্টায় দেশে সংস্কৃতের প্রভাব আবার প্রবল হইয়া পড়ে। বাঙ্গালাভাষা আবার তাহার নবকলেবরে সংস্কৃতের শক্তি, সংস্কৃতের ছাপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ধীরে ধীরে বঙ্গভাষা আবার পরিবর্ত্তিত হইয়া তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করে।

যে কোনও স্তরেরই সংগঠনের পূর্ব্বেই তাহার উপাদান সংগৃহীত হওয়ার দরকার। বঙ্গভাষার এই তৃতীয় স্তরে ভগবান শ্রীচৈতন্যের লীলাবসানের কিছুদিন পরেই গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, মুসলমানগণের অবনতির চরম অবস্থায়ই সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গভাষার এই তৃতীয় স্তর জাগিয়া উঠে। এযুগের আরম্ভেই আমরা আলাওয়ালের ন্যায় প্রসিদ্ধ কবিকে প্রাপ্ত হই, তাঁহার পরেই মুসলমান রাজত্বের শেষ কবি সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেন ও যুগ সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকে প্রাপ্ত হই। আলাওয়াল ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। মুসলমান হইলেও সংস্কৃত প্রসূত সুললিত সুরঞ্জিত শব্দ প্রস্তুত করিতে ইঁহার ন্যায় কেহই সমর্থ হন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সংস্কৃত বহুল শব্দ লালিত্যময়ী ভাষার ভিত্তি আলওয়ালের দ্বারাই গঠিত হয়। তাঁহার জীবিত কালের মধ্যে দূরের কথা ভারতচন্দ্রের নানাবিষয়িণী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ না হইলে বোধহয় আলওয়ালের স্থান ভারতচন্দ্রেরও উপরে হইত।

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর এযুগে বড়ই প্রতিপত্তি লাভ করে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের লেখা। তার পর ভারত চন্দ্রের পূর্ব্বে আরও অনেকেই বিদ্যাসুন্দর লিখেন। সাধক প্রবর রাম প্রসাদেরও একখানা বিদ্যাসুন্দর ছিল। এই সময়ের এবং ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কিছুদিনের লেখার একটা বিশেষত্ব এই যে এক বিষয় লইয়া অনেকেই গ্রন্থ রচনা করিতেন। এই যুগের একটা দোষ এই হইয়াছিল যে ভাষার বিশেষতঃ বিষয় নির্ব্বাচনের গতি ব্যক্তিগত প্রধান্যের অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এসময়ে শুধু যে মুসলমানেরাই অবনত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। হিন্দু রাজগণেরও অবনতির কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবনতিতে সমাজদেহ ও রাজ্য ভিত্তি বড়ই কলুষিত, বড়ই আবিল, বড়ই ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছিল। লোকের চিত্ত হইতে সরল উদার ভাব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই বোধহয়। ইহার জন্য মুসলমানগণের অন্যায় ব্যবহার ও অত্যাচারই দায়ী হউক বা হিন্দুগণের অধোগতিই দায়ী হউক, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। এই কলুষভাব ও সমাজদেহের নৈতিক আবিলতা বঙ্গ সাহিত্যকেও কলুষিত করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে চন্দ্রকান্ত নয়নতারা ও কামিনী কুমারের ন্যায় গ্রন্থ এ সময়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে বঙ্গ সাহিত্যে একটা নূতন প্রকারের তর্কসঙ্গীতের প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। উহা "কবিগান"। কবিগানের মূল পুরাণাদি হইলেও উহার বিকাশও বড় কম বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এই কবিওয়ালাদের মধ্যে রঘু মুচীই আদি। তারপর কিরূপ ভাবে ইহার বিকাশ হইয়াছিল তাহার আলোচনা আমরা পরে করিতেছি।

শ্রীআশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ।

কাল-বৈশাখী

আজ কাল-বৈশাখীর সবচেয়ে দুর্যোগের দিন।—একি আমার মনের ভিতরের,—না বাইরের দুর্যোগ? দুর্যোগ দিনকে সুদিনের সুযোগ করার একটা কৃতিত্ব আছে,—নয়? কিন্তু করি কি? জীবনের প্রতিদিনের অনুভূতির মধ্যে যদি অসহ্য বেদনাই "স্বাধিকারপ্রমত্ত" হয়ে থাকে তবে সুযোগ করার কর্তাও যে মুসড়ে পড়ে। ধ্বংশের আর্তনাদের মধ্যে ভাগ্য-দেবতাকে বরণ করে কেমন করে বলি "প্রসীদ"—গোল ত ওইখানেই।

আমি বসে আছি একা, নিতান্ত একা, একান্ত নিরাশ্রয় নিঃসঙ্গ—চারিপাশের জানালা দিয়ে বাহিরের রাশি রাশি আলো এই একটু আগে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়ে বলছিল—"ওঠ!"

আর এখন চারিদিকের সেই অবারিত উৎসারিত আলোক-প্লাবনের উপর অন্ধকারের বন্যা জমাট বেঁধে আস্‌ছে!

বৈশাখী-দুর্য্যোগের এই আকস্মিক অন্ধকার-আক্রমনের বেদনায় নয়, সমদুঃখীর মত স্নেহে, গোপনে হৃদয় স্পর্শ করে' মেঘদূতের বিরহ-অনুভূতিতে পূর্ণ করে দিচ্ছে।—

আমার এ সঙ্গহীন নিরাশ্রয় নির্জ্জন সন্ধ্যার,
কে আসিয়া সংগোপনে আপনার ছায়া এঁকে যায়!—
ধরার ধূসর-ধূলি ঘূর্ণী হয়ে উড়িছে আকাশে,
হৃদয়ে গোধূলি আজ আকুলিয়া মরিছে হতাশে।
উন্মাদ নর্ত্তন সনে কি জানায় শ্যামতরু শ্রেণী,
কোন অভিমানে মেঘ এলাইল প্রসাধিত বেণী
চাতক চাহিছে জল, বিন্দু আশে আকাশে মিশায়,
মরণের ব্যথা বুকে আমি মরি কি শুষ্ক তৃষ্ণায়!

আজ কে আমার অজানিতে আমার সমস্ত মনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জাল ফেলার মত ফেলছে আর গুটীয়ে আনছে। সে যে আমার প্রাণের অতি নিকটে, এই এখানে!—তবে সে আজ এ বিরহীকে নিয়ে এমন করছে কেন? আমার উন্মনা মনটাকে আর কোনও একটা বিশেষ কিছুর দিকে জাগিয়ে রাখতে পারছিনে—উন্মুখ উদাস দৃষ্টি শুধু অনন্ত প্রসারিত অসীমের মধ্যে নিতল হয়ে ডুবে যাচ্ছে—ওই রৌদ্রতপ্ত শস্যক্ষেত্র, ছায়াসুপ্ত পল্লীকুঞ্জ—দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের নির্জ্জন নীরবতার মধ্যে আম্র-বিথীকার পাতার আড়ালে পাখী ডেকে ডেকে বলছে "ফটিকজল ফটিকজল,"—তৃষিত জীবনকে সে ফটিকজলে তৃপ্ত করিতে চায়—কত জনমের অপূর্ণ বাসনা কত জীবনের অতৃপ্ত তৃষ্ণায় আজ পাখী বুক চিরিয়া চিরিয়া আমারি মনের কথা কাকলিতে বলিতেছে—

"ফটিকজল ফটিকজল"
আমিও চাই—আমিও তৃষিত
"জল ওগো
এক ফোঁটা জল"

—জীবনের সাধ মিটাইয়া আশ পুরিয়া চাই একফোটা জল। আমার এ তৃষ্ণা বুঝি মিটিবে না?—

জীবনের মধ্যে বিরহের এই দুর্য্যোগ আজ যেন আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে!

দূরের ওই অজস্র অশোক ফুলও কি আমার অনুরাগ রাগে রক্তিম হয়ে ফুটে উঠেছে?

কদম্বের গায়ে গায়ে আমারই প্রিয়তমের স্পর্শানুভূতির পুলক শিহরণ—আমি এখনও এই দীর্ঘ বিরহেও ত তাহা ভুলিতে পারি নাই!

চারিদিকে আমার অনুভূতি গুলি আকার নিয়ে বেঁচে উঠেছে! ফুলে তারা ফুটেছে, মধুতে তাদের পরিনতি হচ্ছে—বিশিষ্ট শক্তির মধ্যে দেহ নিয়ে তারা বেঁচে উঠছে! সব বিকাশের মধ্যেই তারা প্রকাশ হয়ে উঠ্‌ছে—।

আজ দেখছি আমার প্রিয়তমের জীবন-ধারা আর ভাব-প্রেরণায় আমার ভিতর বাহির সমান হয়ে গিয়েছে—কিন্তু বিরহকে মান্‌তে পারি না কেন?

একি আমার দুর্ব্বলতা?—আমার মনের ভিতরকার অজস্র ভাবনার মত ঈষাণ কোনে মেঘগুলো ঘুলিয়ে বেশ কালো হয়ে আস্‌ছে!—আকাশের উপরে একটা ত্রস্ত অথচ গম্ভীর ভাব ঘনিয়ে উঠছে। দূরে তাল গাছের উপর দিয়ে গোটাকতক চাতক উড়ে গেল—আমার মতন তৃষিত বুঝি ওরা?

সারা আকাশের গায় কিসের একটা প্রতীক্ষা যেন মৌনমূক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা আসন্ন আক্রমণের ভয়ে সমস্ত চরাচর ছম্ ছম্ করছে।—ওই এল ঝড়!—একটা আদিযুগের পাগলের মত অনিয়মে পা ফেলে, ছুটে হেঁকে চীৎকার করতে করতে যেন গ্রাস করতে ধেয়ে আস্‌ছে—ওর প্রাণে কি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা! একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত আকর্ণ মুখ বিস্তার করে, আস্ফালন করতে করতে—ওই যে তার হাজার বাহু হাজার দিকে প্রসারণ করে, মেঘের স্তরে স্তরে,

পিঙ্গল জটাভার উড়িয়ে দিয়ে চোখে আগুনের ফুলকি খেলা করতে করতে ঝড়ের উপর সাঁতরে চলে আসছে!

—গাছ গুলকে দুইহাতে নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে, ফুলের ফসল নষ্ট করে, সমুদ্রে ঢেউ তুলে, নদীতে তরঙ্গ-ভঙ্গ এঁকে, সারাপথ মরুভূমির তপ্ত বালুকা উড়িয়ে, চার হাতে বজ্র-পাত করতে করতে ধেয়ে আসছে!—উঃ কি মাতামাতি,—দন্ত নিষ্পেষনে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হচ্ছে—তার পাঁজরের হাড়গুলো শুধু কেঁপে কেঁপে উঠছে তার নিজের নিশ্বাসে। সে কি আজ ধ্বংশ করতে চায়? কোন সে দুষমন? কেন তার এই অত্যাচার? কিসের ত্রুটি সে দেখলে? কেমন করে বা সে সংবাদ গেল?—সে কি আজ ধ্বংশের উপর দাঁড়িয়ে সিদ্ধি পেতে চায়! এত তেজ, এতদম্ভ এত অহঙ্কার তার?

না না ওই যে তুমি হাসছ! এ হাসি যে চেনা,—বড্ড চেনা, তুমি কি ছলনা করছ?—

প্রিয়তম, এ কি তোমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কি চাও তুমি?—এস তুমি তোমার ওই রুদ্র কাঠিন্য বিশালত্ব ত্যাগ করে নেমে এস—এস প্রিয়তম তুমি আমার বক্ষপঞ্জরের প্রতি অস্থি খণ্ডে তোমার চরণ স্পর্শে দধিচির অমরত্ব দাও! আমি ভয় করব না।

এই কাল বৈশাখীর বজ্র নির্ঘোষের মধ্যে তোমাকে আমি হারাইতে চাহি না—প্রভঞ্জনের শক্তি বহুলতার মধ্যেই তোমাকে চাই—তুমি আমার শক্তি-স্বরূপ। তোমাকে শক্তির মধ্যেই চাই!—আজ ত আমি মরণকে ডরাই না—যদি জানি তুমি আমার আছ। না না, তুমি এস, এস কঠিন, এস রুদ্র, এস নিষ্ঠুর—আঘাত কর আমায়! আমার উপর দিয়ে তোমার বিজয় শকট অবাধে চালিয়ে নিয়ে যাও—ভাঙ্গি, আবার গড়ে উঠব—তোমার শক্তি নিয়ে আবার তোমার পথেই নিশান ধরে দাঁড়াব! আজ যে তোমায় চিনেছি—

চিনেছি চিনেছি তোমা ওগো প্রিয়,
ওগো প্রিয়তম!
রুদ্র বেশে দাঁড়াইয়া জীবনের
পরীক্ষক সম!—
তোমা হ'তে চাই দীপ্তি, চাই শক্তি
চাই পরমায়ু,
অবসন্ন দেহ মন, জাগাইয়া দিক ধীরে
তব শ্বাস-বায়ু।

সাত সমুদ্রের জলে চোখ ভরা ছিল—কেঁদেছি—ফল কি হয়েছে তাতে?—শুধু অকারণ ভর্ৎসনা! কাঁদতেও আর পারি না।

আঘাতে আঘাতে হৃদয়ের ক্ষত যে কেবল বেড়েই গিয়েছে; তাই ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার শক্তি টুকুও বুঝি হারিয়ে বসেছি!

অসম্ভবকে সম্ভব ভেবে বিপন্ন বিব্রত হয়ে মৃত্যুকে কতবার বরণ করেছি। যেখান থেকে স্নেহ, প্রেম, একনিষ্ঠা একাগ্রতা, চিরন্তন বন্ধনের আশায় মন লুব্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে—সেখান থেকেই অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত পেয়েছি। উঃ! কি সে বেদনা! বুকের মধ্যে সে কি বৃশ্চিকের জ্বালা! আপনার বুকের রক্ত নিঙড়ে নিঙড়ে দিয়ে দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি—সে রক্তের মধ্যে গড়ে উঠবার, দাঁড়াবার শক্তিকে বুঝি বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি, তাই আজ আমি তারই কাছ থেকে দুর্ব্বলতার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়েছি, সবল হয়ে বিশ্বের সব ব্যথাকে হাসিমুখে উপেক্ষা করতে।

হে আমার রুদ্র দেবতা!—তাই ত আমি চাই। তুমি আজ এই সন্ধ্যায়, নিষ্ঠুর হয়ে রুদ্রতালে তাণ্ডব নৃত্য করছ—তাই ভাল ওগো তাই ভাল—আজ কাল-বৈশাখীর এত ভয়ঙ্কর উন্মাদ অশান্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে তুমি রুদ্রবেশে আসছ—এস!

এস রুদ্র, এস প্রিয়তম, তোমার শক্তি-মহত্বে এ দীন দুর্ব্বলকে বাঁচাও। আমি যে আর পারিনে প্রভু! হৃদয়ের যে তন্ত্রী নীরব হয়ে গেছে আর বাজে না,—তোমার রক্ত চক্ষুর শাসনে আজ ত "ভৈরবী" গাইবে'।—বুকের সকল হিমতুহীন মৃত্যুর অবসন্নতা আজ জেগে উঠে আমাকে ওই রুদ্র মহিমার মধ্যে দাঁড় করিয়ে বলবে, "তুমি সার্থক তুমি ধন্য!" আজ আমাকে তোমার বিপুল বিশাল অসীম শক্তি প্রকাশের মধ্যে টানিয়া লও! আমি বলি—

তোমার বুকের মাঝে ওগো রুদ্র
ওগো মহীয়ান,—
আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন
লভিয়াছি গৌরবের স্থান!

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

শুকাল না তবু ভূষ নিদারুণ 'ঘা'
নিঠুর বিধি বারেক ফিরিয়া চা,
ঘুচাও বেদনা দয়াল জগন্নাথ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে সে দিবস রাত।

(৩)

তীর্থে তীর্থে ঘুরিল সে বহু দিন
বহু চিকিৎসা বহু ঔষধ করে,
অবশেষে ম্লান অনশনে তনু ক্ষীণ
ধন্না দিলেক আসি তারকেশ্বরে।
দুই দিন পর নিশি শেষে কার মুখ
দেখি ব্রাহ্মণ কাঁদে, চাপড়ায় বুক
সঙ্গীরা তার রাখিতে পারে না ধরে
দরদর ধারে আঁখিজল পড়ে ঝরে।

(৪)

"দেবের আদেশ গত জন্মেতে আমি,
জননীর গালে মারিয়াছিলাম চড়
সে ভীষণ পাপ ক্ষমেকি জগৎস্বামী
মার করুণায় যায় নি খসিয়া কর।
'ঠাকুর' বলিল যাবে না যাবে না ঘা
পাপের শাস্তি তোর ও গালের ঘা
এ জনম ধরি ফলভোগ তার কর'
ভয়ে বিস্ময়ে লুটায়ে করিনু গড়।

(৫)

স্বপনে জড়ায়ে ধরিনু মায়ের পা
হৃদয় মাঝারে জাগিল দারুণ শোক
মা গো আমার গত জন্মের মা
তবু যে তোমার করুণা বিভল চোক।
রহিল মরমে বড়ই বেদনা ওমা
এ জনমে আর মাগিতে দিলে না ক্ষমা
রহুক এ ক্ষত দেখুক দেশের লোক,
কৃতঘ্ন সুত! তাহার করম ভোগ!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,

ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য

অবতরণিকা

১।—বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও সম্মিলন।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবয়বের প্রতি ক্ষণমাত্র দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন যে ভারতবর্ষ ব্যতীত জগতের আর কোন অংশই অপেক্ষাকৃত সুন্দররূপে এবং প্রাকৃতিক উপায়ে একটী স্বতন্ত্র দেশরূপে সুসৃষ্ট হয় নাই। বাস্তবিক এই দেশ প্রাকৃতিক লক্ষণে এবং জলবায়ুর অবস্থায় বড়ই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু যে সমস্ত বিশিষ্ট লক্ষণে এই দেশ পার্শ্ববর্ত্তী অন্য সমস্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র একটী রাজ্যরূপে পরিগণিত তাহা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। কয়েকজন ভৌগলিক যাহাই বলুন না কেন, বাস্তবিক সমগ্র ভারতবর্ষকে বেশ স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট একটী দেশরূপে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ভারতের বিভিন্ন বিভিন্ন বৈষম্যের মধ্যেও একটী মৌলিক ও ভৌগলিক সমগ্রতা এবং রাষ্ট্রীয় সমবায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণে পর্ব্বতরক্ষিত ও সমুদ্রবেষ্টিত ভারতভূমিকে দেখিয়া মনে হয় যেন প্রকৃতিদেবী ইহাকে সমস্ত জগৎ হইতে নিঃসম্পর্ক রাখিবার জন্য এবং ইহার সভ্যতাকে অন্যান্য দেশে মনুষ্য-সমাজ-প্রচলিত ঘাতপ্রতিঘাত হইতে মুক্ত রাখিয়া 'নিরিবিলিভাবে' ক্রমবর্দ্ধিত করিবার জন্যই আপনার মনের মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর অল্প দেশই বিদেশের সহিত সম্পর্কতা ও ঘনিষ্টতায় ঘটনাবহুল ইতিহাস এখনও জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে পারে। ভারতের ভৌগলিকতত্ত্ব তাহার নৈসর্গিক বিচ্ছিন্নতা জ্ঞাপন করে বটে কিন্তু ভারতের ইতিহাস অন্য তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। এবং যদি আমরা প্রাচীনকাল হইতে ভারতের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করি, তাহা হইলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠা প্রদান বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সহিত আদানপ্রদান এবং সম্পর্কতাও ইহার বিচ্ছিন্ন অবস্থানের মত যথেষ্ট কার্য্যকর হইয়াছিল।

ইহা অতি সত্য কথা যে জগতের কোন বিরাট আন্দোলনই—যে আন্দোলন সমগ্র মনুষ্যজাতির ইতিহাসের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহা ভারতের অসাধারণ ও বিবিধ সভ্যতা ও অনুশীলনকে উন্নত ও শ্রীসম্পন্ন করিতে কখনও বিরত হয় নাই। যে নিগূঢ় শক্তির আর্য্যজাতি দ্বারা তাহাদের স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে বাস করিতে বা বিস্তৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা মানবীয় সূক্ষ্মদৃষ্টির বহির্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর্য্যগণের এই বিদেশ গমন অত্যাবশ্যকীয় ও ঘটনাপূর্ণ; এবং জগতের ইতিহাসে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। জগতের সভ্যতার অগ্রণী এই আর্য্যগণের একটী প্রধান শাখা উত্তর পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে যে প্রবেশ করিয়াছিল—এবং হিমালয় হইতে প্রবাহিত গঙ্গাযমুনা যেমন ইহার প্রাকৃতিক গঠন সৃষ্টি করিয়াছে সেইরূপ ইহাকে যে আধ্যাত্মিকতার প্রকৃতি প্রদান করিয়াছিল—একথা ইতিহাস প্রায়ই বলিয়া থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্ত ভারতীয় আর্য্যগণ, এদেশে আদিম অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে তাঁহাদের উপনিবেশ গঠন কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং এমন একটী সভ্যতার উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন যাহা তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে আজও বেশ প্রতিভাত রহিয়াছে। তাহার পর জগতের প্রথম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়; এই ধর্ম্ম ভারতের মাটীতে উদ্ভূত হইয়া ভারতের সীমা ছাড়াইয়া উত্তরদক্ষিণে—মোগলদিগের বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বরভূমি ও তিব্বতীয়দিগের পার্ব্বতীয় মরুময়

প্রদেশ হইতে, জাপানের মধ্য দিয়া এবং পরিশেষে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যেও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ 'প্রাচীন পৃথিবী'র অন্তকরণরূপে, ইহার চিন্তাস্রোত ও জীবনস্রোত গঠিত ও চালিত করিয়াছিল। ইতিমধ্যে ভারতভূমে কতকগুলি বৈদেশিক প্রভাব একটীর পর একটী করিয়া উপনীত হইয়াছিল—যেমন, ইরন্ প্রভাব। ইহা প্রাচীন ভূখণ্ডের প্রথম প্রতিষ্ঠিত ও বর্ত্তমান য়্যাক্যামিনিডি-দিগের (Achaemenides) সাম্রাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য; দারায়াসের (Darius) রাজত্বকালে, সমস্তসিন্ধুদেশ এবং সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারস্থিত পাঞ্জাবের অধিকাংশভূভাগ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ভারতের এই অধিকৃত ভূভাগ দারায়াসের (Darius) বিংশতি সংখ্যক রাজ্য (Satrapy) গঠিত করিয়া, দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (Sbiting অর্থাৎ এককোটী ৫০ লক্ষটাকা) বাৎসরিক করস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিত। এই রাজ্যের প্রভাব ভারতের শিল্প ও স্থপতিবিদ্যায় ও ভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের ও শাসন কার্য্যের উপর অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে। পরে হেলেনায় (Hellenic) প্রভাব; ইহা দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হইতে আরম্ভ হইয়া পাঞ্জাব ও নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি গ্রীসীয় শাসনকর্ত্তা-দিগের দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে পরিচালিত হইয়াছিল—কিন্তু ইহা ভারতীয় সভ্যতার কেবল প্রান্তভাগ মাত্র স্পর্শ করিতে পারিয়াছিল। ইহার পর গ্রীস-রোমের (Greco-Roman) প্রভাব—যাহা 'কুশন' বা ভারতীয় সিথীয় (Indo-Scythian) নৃপতিবৃন্দের রাজত্ব কালে ভারতের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। তৎপরে দুই বিরাট সভ্যতার প্রভাব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়—এবং তাহারাও ভারতবর্ষের উপর রেখাপাত করিয়া গিয়াছিল এবং ভারতীয় সভ্যতার একটী উপাদান স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এই দুইটী প্রভাব হইল মুসলমান অনুশীলন ও সভ্যতা এবং ইউরোপীয় উৎকর্ষ ও সভ্যতা। এই ইউরোপীয় সভ্যতা বৈদেশিক আক্রমণ ও বাণিজ্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভারতে আবির্ভূত হয় এবং আজ পর্য্যন্ত ভারতের চিন্তা ও জীবনের ধারার উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য বলিতে হয় যে ভারতবর্ষ; প্রকৃতিজননীর একটী অনুগৃহীত ভূভাগ—ভিন্ন ভিন্ন মানবের ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা নিচয় একত্র বিন্যস্ত হইয়া ইহার অসাধারণ ও বিরাট সভ্যতা গঠিত করিয়াছেন। সেই জন্য, ভারতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ন্যায়—অপরদেশের সহিত ভারতের আদানপ্রদানও ভারতীয় ইতিহাসের একটী বিশেষ তত্ত্ব।

ভারতের এই রাজনৈতিক সম্বন্ধের অপেক্ষা, বিদেশের সহিত ইহার ব্যবসা বাণিজ্যগত সম্বন্ধও কম বিশ্বাসযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য নহে। এবং এই বাণিজ্যসম্বন্ধই আমাদের বিশেষ বক্তব্য বিষয়। ত্রিংশৎ শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ যে প্রাচীন পৃথিবীর অন্তস্থলরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যে সমস্ত দেশের সমুদ্রের উপর পরাক্রম ও প্রভাব ছিল তাহাদের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া অধিষ্ঠিত ছিল তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। ভারত তখন পেগু, ক্যাম্বোডিয়া, যাভা, সুমাত্রা, বোর্নিয়ো আরও পূর্ব্বদিকস্থ ভূভাগে, এমন কি জাপানেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য, দক্ষিণচিনে, মালয় উপদ্বীপে, আরবে, পারস্যে প্রধান প্রধান নগরে এবং আফ্রিকার সমগ্র পূর্ব্ব উপকূলে ভারতবাসিরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ শুধু এসিয়ামহাদেশের দেশগুলির সহিত বণিজ্যসম্বন্ধ পোষণ ও অনুশীলন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, কিন্তু তৎকালীন পরিচিত সমস্ত জগতে—এমনকি রোমরাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের সহিতও তাহার বাণিজ্যের সম্বন্ধ ছিল। তখন প্রাচী ও প্রতীচ্য উভয় ভূভাগই ভারতের সুবিশাল ব্যবসাবাণিজ্যের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল এবং তাহার সকল আন্তর্জাতিক জীবনের ও সামুদ্রিক ব্যাপারে মহতী প্রতিভার উন্মেষ সাধনের জন্য যথেষ্ঠ অবসর পাইয়াছিল।

এইরূপে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষকে যদিও প্রকৃতিদেবী একেবারে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছেন, তথাপি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি ভারতবাসী স্বীয় অদম্য উৎসাহে কেমন বিদেশসমূহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল এবং প্রাকৃতিক বেষ্টন সগৌরবে অতিক্রম করিতে সক্ষম

হইয়াছিল। উত্তরদিকের বিশাল ও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণীতে দুই একটী গিরিপথ আছে—তাহারা বহুদিন ধরিয়া বহির্জগতের সহিত ব্যবসাবাণিজ্য ও মিলনের পন্থারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণদিকে মহাসমুদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনের পক্ষে মহাসিন্ধু স্বভাবতঃ একটী অপেক্ষাকৃত প্রধান ও ভয়ঙ্কর প্রতিবন্ধকস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। তথাপি যখন জাতীয় নৌবিদ্যার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইল, তখন ঐ বাধাবিপত্তিকে দমিত করিয়া, স্বয়ং মহাসিন্ধুকে আন্তর্জাতিক মিলনের এবং বাণিজ্যের একটী প্রধান রাজপথে পরিণত করা হইল। প্রাচীনকালে সংঘটিত ভারতের অর্ণবপোত সকলের ক্রমিক বৃদ্ধি এবং অর্ণবপোত নির্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি—বণিকদিগের উদ্যম ও প্রতিভার সহিত,—ভারতের নাবিক বৃন্দের সাহস ও নৈপুণ্যের সহিত তাহার ঔপনিবেশিকদিগের অসমসাহসিকতার সহিত এবং তাহার ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মহোৎসাহেরসহিত মিলিত হইয়া ভারতবর্ষ কতযুগ ধরিয়া সমুদ্রের উপর প্রধান রাষ্ট্রীয় শক্তিরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল এবং প্রাচীসমুদ্রের অধিরাণীর পদগৌরব প্রদান ও ঐ মহাগৌরবময় মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিল। ভারতের নৌশক্তির ক্রমবিকাশের জন্য প্রকৃতিদত্ত সুবিধা এবং উপায়গুলির সম্যক্ নিয়োগ করিবার পক্ষে, প্রাচীন ভারতের সন্তানদিগের উদ্যমের কোন অভাব ছিল না। সেই খ্যাত সুবিধাগুলি এই পূর্ব্বভূখণ্ডের অন্তঃস্থলে ভারতের ভৌগলিক অধিষ্ঠান—তাহার পশ্চিমে আফ্রিকা, এবং পূর্ব্বে "পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জ" এবং অষ্ট্রেলিয়া,—উত্তরদিকে বিস্তীর্ণ এসিয়া মহাদেশের প্রধানাংশের সহিত সংযোগ, দুই সহস্র ক্রোশের উপর বিস্তীর্ণ জলরাশি এবং পরিশেষে জলের মত প্রতীয়মান দেশের অভ্যন্তরে গমনাগমনের পথস্বরূপ তাহার প্রবাহিনীমালা। বাস্তবিক, যে কোন দেশের বাণিজ্যের উন্নতির উপায়স্বরূপ বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানিচয়ের সংমিলন বা সমবায় ভারতবর্ষে বেশ পরিদৃষ্ট হয়।

২।—প্রমাণমালা।

ভারতের অর্ণবপোতের ও নৌশক্তির ইতিহাস গঠনের উপযোগী উপাদান ও মূলকারণ গুলি স্বভাবতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ভারতীয় এবং বৈদেশিক। সেইগুলিই ভারতীয় প্রমাণ যাহা এখন চিত্রবিদ্যাসমন্বিত ভারতের শিল্প ও সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা হয়; এই গুলি ছাড়া, লিপিতত্ত্ব, কীর্ত্তিস্তম্ভতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব—এই তিন শাখাবিশিষ্ট পুরাতত্ত্বের প্রমাণ পুঞ্জও সংগ্রহ করিতে হইবে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রমাণগুলি সংস্কৃত, পালি, এবং পারস্য গ্রন্থাদিতে এবং কতকগুলি স্থলে—দেশীয় প্রচলিত ভাষার যেমন তামিল মারাঠি এবং বাঙ্গলা গ্রন্থাদিতে, প্রধানতঃ নির্ভর করে। বৈদেশিক প্রমাণগুলি, বৈদেশিক পর্য্যটক ও ঐতিহাসিক দিগের ভারতসংক্রান্ত বিষয়ের মন্তব্য নিচয়ের উপর, এবং জাভা ইত্যাদি স্থানে প্রাচীন ধ্বংশাবশেষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রথমোক্ত গুলির অধিকাংশ চীন, আরব ও পারস্যদেশীয় উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যে নিহিত রহিয়াছে। অনুবাদের সাহায্যে আমরা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারি।

যে পদ্ধতিতে এই সমস্ত বিবিধ প্রমাণমালা—যথা সাহিত্য ঘটিত, স্মৃতিস্তম্ভ ঘটিত এবং ভারতীয় ও বৈদেশিক প্রমাণগুলি—সজ্জিত করা হইবে এবং যে ক্রমানুসারে তাহাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা প্রথমেই পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজনীয়।

"শিল্প ও সাহিত্যে জাতীয় জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়"—এই যথার্থবাক্যটী স্মরণে রাখিয়া, আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে—যতক্ষণ না দেশীয় বিরাট শিল্পসাহিত্যের প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, ততক্ষণ ভারতীয় নৌশক্তির যাথার্থ্য সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভারতীয় নৌশক্তির,—এবং সেই শক্তির উপাদান ভারতীয় অর্ণবপোতের অস্তিত্ব ও উন্নতির—প্রথম প্রমাণ নিচয়, সেই জন্যই ভারতীয় বিশাল সাহিত্যের ও শিল্পের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এবং বিদেশীয় গ্রন্থাদি হইতে সংগৃহীত প্রচুর প্রমাণ সমষ্টিও এই গুলি অভাব ও অল্পতা পূরণ করিতে পারে না। তজ্জন্য ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে দৃষ্ট ভারতীয় প্রমাণগুলিই প্রথমেই উপস্থাপিত করা হইবে, এবং তৎপরে বৈদেশিক প্রমাণ নিচয় উপস্থিত হইবে। আবার, দুঃখের বিষয় এই যে, যে সমস্ত গ্রন্থের

উল্লেখ করা হইবে, তাহাদের অধিকাংশেরই তারিখ যথার্থরূপে জানা যায় নাই। তজ্জন্য, ঐ সমস্তগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত প্রমাণগুলিকে, আমাদের বক্তব্য বিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিব না,—অথবা ভারতের অর্ণবপোত, সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং নৌশক্তির বিষয়ীভূত ঘটনাগুলির কালক্রমানুগত বিন্যাসের পক্ষে সহায় স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত করিব না। তদনুসারে ভারতীয় সাহিত্য হইতে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করা হইবে, তাহা আমাদের বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তি গঠন এবং ইহার যথার্থতা প্রতিপাদান করিয়া, সমস্ত বক্তব্য বিষয়ের ভূমিকা স্বরূপ পরিগণিত হইবে। যে সমস্ত বৈদেশিক এবং ভারতীয় গ্রন্থনিচয়ে কালক্রমানুগত কোন প্রতিবন্ধক নাই, তাহা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতের নৌশক্তির প্রকৃত ঐতিহাসিক বর্ণনা নির্ম্মাণ করা হইবে।

আমরা কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, যতদূর সম্ভব ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ হইতে, বাক্যাবলী উদ্ধার করিব এবং উপস্থিত করিব। জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ্ মৃত জর্ম্মান পণ্ডিত ও অধ্যাপক বুলার (Prof. Buhler) মহোদয়ের মতে "প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থসমূহে এরূপ অনেক বচন আছে যাহার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, প্রাচীনকালে ভারত-মহাসাগরের উপর নৌচালন হইত এবং তৎপরে পারস্য-প্রণালীর উপকূলে ও ইহার নদসমূহে হিন্দুবণিকগণ বাণিজ্যের জন্য নৌযাত্রা করিতেন।" যাহা হউক এই সমস্ত প্রমাণ কেবল মাত্র পরোক্ষভাবে প্রমাণ করিয়া থাকে, সাক্ষাৎভাবে ও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেয় না যে, ভারতের জাতীয় অর্ণবপোত ও নৌচালন বিজ্ঞান ছিল ও তাহার তৎকালে যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল,—কিন্তু এই প্রকৃত অবস্থা ও ঘটনাটী, ঐ সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত নৌবাণিজ্যের অস্তিত্ব, ক্রমোন্নতি এবং স্থায়িত্বের দ্বারা পরোক্ষভাবে নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হইতেছে। কারণ ইতিহাসে একথাটী পুনঃ পুনঃ বলা হইয়া থাকে এবং ইহা সম্পূর্ণ বিবেচনাসিদ্ধ যে, কোনকালে বিশেষতঃ সেই আদিম যুগে, কোন বানিজ্যই জন্মিতে—উন্নতি করা ত দূরের কথা—পারিত না, যদি না তাহা জাতীয় অর্ণবপোত সমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট ও বিশেষভাবে রক্ষিত হইত। সেই কারণে, ভারতের অর্ণবপোত ও নৌশক্তি সম্বন্ধীয় যে সমস্ত পরিষ্কার ও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে পরোক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করা হইবে; এবং প্রাচীন ভারতের শিল্প, তক্ষন, চিত্র এবং মুদ্রাবলীতে অঙ্কিত আদর্শ জাহাজ ও নৌকাগুলির প্রতিকৃতি সেই সমস্ত প্রমাণের মধ্যে সংযোজিত হইবে।

৩।—বিশেষ বিশেষ কাল।

ভারতের অর্ণবপোত ও নৌশক্তি সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রমাণ-গুলি যে যে বিশিষ্ট কালের মধ্যে গ্রথিত হইবে তাহা মোটামুটি এই :—

১। প্রাক্ মৌর্য্যকাল—এই কালবিভাগ আদিম যুগ হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ের জন্য, আমরা সেই সমস্ত প্রমাণ লইয়া আলোচনা করিব, প্রমাণগুলি, মনুষ্যজাতির সর্ব্ব প্রাচীন সাহিত্য ঘটিত গ্রন্থাদি, যেমন ঋগ্বেদ, বাইবেল, কতকগুলি পালি ও তামিল গ্রন্থ হইতে এবং ইজিপ্ত ও আসেরিয় দেশীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের,—পাশ্চাত্যদেশের সহিত ভারতের প্রাচীন সমুদ্র সম্পর্ক সম্বন্ধীয় আবিষ্কার হইতে, বিশেষ মনোযোগের সহিত সংগ্রহ করা হইয়াছে। এই সময়ের প্রমাণাদি, খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে বর্ত্তমান গ্রীক্ লেখক হেরোডোটাস্ (Herodotus) এবং টিসিয়াস্ (Ctesias) মহোদয়গণের ভারত সম্বন্ধীয় লেখা হইতেও সংগ্রহ করা হইয়াছে।

২। মৌর্য্যকাল (খৃঃ পূঃ ৩২১—১৮৪)—এই সময়ের প্রামাণ্য ঘটনাবলী বহু গ্রীসীয় ও রোমীয় গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে আজও রক্ষিত রহিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থকারগণ আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমনের কাহিনী বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং মৌর্য্যসম্রাটগণের দরবারে যে সমস্ত গ্রীস-দেশীয় রাজদূত ছিলেন তাঁহাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মন্তব্য গুলি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। গ্রীক ও রোমানদিগের এই সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় মন্তব্য, ম্যাকক্রিণ্ডল (Mr. Maccrindle) সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন এবং ভারতীয় ছাত্রগণ ঐ অনুবাদ পাঠ করিয়া ঐ সমস্ত মন্তব্য বুঝিতে পারেন। এই সমস্ত বৈদেশিক প্রমাণের অপেক্ষা অধুনা

প্রকাশিত কৌটীল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক। মৌর্য্য-ভারতে ভারতবাসিদিগের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং তাহাদের সভ্যতা কতদূর উন্নতি করিয়াছিল, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এই গ্রন্থে বিশেষ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাশ্মির-দেশীয় পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা" নামক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থে তৎকাল প্রচলিত অনেক জনশ্রুতি আজও রক্ষিত রহিয়াছে। গ্রন্থখানি সম্প্রতি 'বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা' (Bibliotheca Indica) পর্য্যায়ে 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (Asiatic Society of Bengal) কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৭৩ অধ্যায়ে অথবা পল্লবে এক গল্পের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে সম্রাট অশোকের সময়ের ভারতীয় নৌশক্তির ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বৃত্তান্ত কতকটা জানা যায়।

৩। উত্তরে কুশনরাজত্বকাল ও দক্ষিণে অন্ধ্রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ প্রায় দুই শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত—এই যুগে, ভারতের উপর রোমের প্রভাব সর্ব্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। বাস্তবিক অন্ধ্রবংশের অধীন সমস্ত দাক্ষিণাত্যের সহিত রোমের সোজাসুজি সম্বন্ধ ছিল, এবং উত্তর ভারতবর্ষের বিজিত প্রদেশগুলি রোমসাম্রাজ্যের সহিত আরও বেশী বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে বেশী উদ্যত হইয়াছিল। সেই জন্যই রোমের রাশি রাশি স্বর্ণ-মুদ্রা সকল রেশম, মসলা, রত্নাদি ও রঙ্ প্রস্তরের দ্রব্যাদির মূল্যস্বরূপ, ভারতের নানাস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। উত্তর ভারতবর্ষ অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত রোমের মুদ্রাসকল এই তথ্য জ্ঞাপন করিতেছে। সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে "রোমক" অর্থাৎ রোমনগরীর উল্লেখ;—প্রাচীন তামিল গ্রন্থে 'যবন' অর্থাৎ গ্রীক ও রোমিয়দিগের উল্লেখ—এবং প্রাচীন তামিল কাব্যসমূহে দক্ষিণ ভারতের 'মিউচিরিস্' (Muchiris) এবং পুকর (Pukar) ইত্যাদি বন্দরসমূহের বিশদ বর্ণনা ঐ একই সত্য প্রচার করিতেছে। রোমের সহিত ভারতের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রমাণ, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ছাড়া বিদেশীয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদিতেও স্পষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে 'প্লিনির' 'ন্যাচারেল্ হিষ্ট্রী' (Pliny's Natural History) 'পেরিপ্লাস্ অফ ইরিথ্রিয়ান্ সি' (Periplus of the Erythraen See) এবং টলেমি'র জিওগ্রাফি (Ptolemy's Geography) এইগুলি প্রধান। ইহা ছাড়া আগাথারসাইডিস্ (Agatharcides) এবং ষ্ট্রাবে (Strabo) প্রমুখ লেখকবর্গও প্রসঙ্গক্রমে ভারতের বাণিজ্য ও নৌশিল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। গুপ্তদিগের ও হর্ষবর্দ্ধনের অধীন উত্তর ভারতবর্ষের হিন্দু সাম্রাজ্যের কাল—ইহা চারি শতাব্দী হইতে সাত শতাব্দী পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুগে ভারতের সীমা বর্দ্ধিত হয় এবং লোকেরা বাঙ্গালা দেশ, এবং কলিঙ্গ ও করমণ্ডল উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী পূর্ব্বভূখণ্ডে দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায়। ব্রহ্মদেশের ও মালক্কার কতকাংশে, কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশের লোকেরা গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই ঘটনাটী সার, এ, পি, ফাইরি (Sir A. P. Phryre's History of Burma') কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সাহায্যে এবং পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ ও মুদ্রাবলীর দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয়। এই সময়ের নৌশক্তির প্রমাণ চীনদেশীয় পর্য্যটকদিগের বর্ণনা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। ভারতের এই সমস্ত চৈনিক ভ্রমণকারীদের মধ্যে ফাহায়েন (Fa Hien) প্রথম এবং হুয়েনথ্ সঙ্ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই সমস্ত বর্ণনা ও বৃত্তান্ত অনুবাদের সাহায্যে আমরা পাঠ করিতে পারি। যে সমস্ত বিদেশীয় গ্রন্থ এই সময়ের ইতিহাসের উপাদান প্রদান করে, তাহার মধ্যে কস্মসের (Cosmos) 'ক্রিশ্চিয়ান্ টপোগ্রাফি' (Chrstian Topography) খানি উল্লেখযোগ্য। চীনদেশের সহিত ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যসম্বন্ধীয় প্রমাণ,—চীনদেশীয় ত্রিপিটকের' (Chinese Tripitaka) 'কাইয়ুয়েন্' ক্যাটলগের মত (Kuai yuen Catalogue) চীনদেশীয় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। 'ইয়ুলের' (Yule's) 'ক্যাথি এ্যাণ্ড ওয়ে দিদার (Cathay and Way Thither) নামক গ্রন্থেও চীনের সহিত ভারতের সংযোগের অনেক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। হুয়েনথ্ সঙের 'ভ্রমণ' (Trveil)

শ্রীহর্ষের রাজত্বকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সংবাদদাতা। "এই ভ্রমণবৃত্তান্তখানি ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষেই অত্যাবশ্যকীয়, যেহেতু ইহা ঐ সময়ের বিশুদ্ধ খাঁটি সংবাদের রত্নাগারস্বরূপ। ভারতীয় লুপ্ত ইতিহাসের বিশেষভাবে পুনরুত্থান করিবার পক্ষে, (যাহা সম্প্রতি সম্পাদিত হইয়াছে) এই গ্রন্থ—অন্য সমস্ত পুরাতত্ত্বসম্বন্ধীয় আবিষ্কারের অপেক্ষা খুব বেশী ফলদায়ক হইয়াছে।"

৫। দাক্ষিণাত্যে হিন্দু সাম্রাজ্যের কাল এবং 'চোল'-দিগের অভ্যুত্থান—এই কাল খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উত্তর ভারতবর্ষের মুসলমান আক্রমণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। —এই যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সহিত, সমুদ্র পথে ভারতের সংযোগ সমানভাবে ও বেশ সতেজে বর্ত্তমান ছিল। 'যাভা'য় উপনিবেশের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। এবং 'বরোবুডারের' (Barobudur) প্রকাণ্ড দেবালয়টী, ঐদ্বীপের উপর বৌদ্ধপ্রভাবের স্মৃতি স্তম্ভ-রূপে বহুদিন দণ্ডায়মান ছিল। সুদূর জাপানে পর্য্যন্ত ভারতের সামুদ্রিক কার্য্যবিষয়ক মহোদ্যম ও শক্তি কার্য্যকরিবার অবসর পাইয়াছিল। এই বৃত্তান্তটী জাপানে প্রচলিত প্রবাদের দ্বারা ও সরকারী বার্ষিক বিবরণীর দ্বারা প্রমাণিত হয়—'ডাক্তার টাকাকুসুর (Dr. Taka-Kusu) মত জাপানি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় ঐ সমস্ত বিবরণী সাধারণের পাঠযোগ্য হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পর্য্যটক ইট্‌সিঙের লিখিত বৃত্তান্তে, সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালে বর্ত্তমান-পূর্ব্বসমুদ্রে ভারতীয় নৌশক্তির, এবং চীনের সহিত ভারতের সংযোগের, চিত্তাকর্ষক বর্ণনাসকল লিখিত আছে। চীনদেশীয় ইতিহাসগুলিও চোলদিগের সহিত চীনদিগের অর্থাৎ 'সুঙ্‌সি'দের (Sung-Shih) বাণিজসম্বন্ধীয় বহু প্রমাণ প্রদান করে।

৬। মুসলমান (প্রাক্‌মোগল) কাল,—ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত—এইকালের ভারতীয় নৌশক্তির প্রমাণের মূলগুলি এবং বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত মুসলমান আমলের প্রমাণের আদিভূমি পারস্যগ্রন্থাদিতে নিহিত আছে। সেই সমস্তগ্রন্থ, সার এইচ ইলিয়টের আট বালুমে সমাপ্ত, হিষ্ট্রী অব ইণ্ডিয়া' (History of India) নামক বিরাট গ্রন্থের দ্বারা, অধ্যয়নার্থীদিগের জ্ঞানায়ত্ত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের নৌশক্তির ও নৌকার্য্যে মহোৎসাহের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে, অলবিলাতুরি (Al-Biltaduri) এবং চাচনামা (Chach-nama) নামক গ্রন্থদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠপুস্তক। ইলিয়টের প্রথম বালুমে এই দুইটী গ্রন্থের অনুবাদ আছে। প্রাচীন মুসলমান ভ্রমণকারিগণ ও এই সময়ের ভারতীয় বৃত্তান্তের অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। অল্‌বিরুনীর (Al-Biruni) গ্রন্থ একাদশ শতাব্দীর জন্য, এবং অল্‌ ইড্রিসির (Al-Idrisi) গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিকগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্ণবপোত ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় বিবরণ, ভিনিসিয়ান্ মারকো পোলো (Vonetian Marco Polo) নামক বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বহুমূল্য ও বহুপ্রয়োজনীয় পুস্তকে লিপিবদ্ধআছে। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে ওয়াসাফ্ (Wassaf) এবং 'তারিখি ফিরোজসাহী' (Tarikhi-Firozshahi) আমাদের পথপ্রদর্শক ও চালক। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা মাহুয়ানের (Mahuan) রচিত চীনের বৃত্তান্ত প্রাপ্তহইয়াছি।—এই গ্রন্থখানি ভারতীয় বৃত্তান্তের বৈদেশিক লেখকগণের গ্রন্থসমূহের মধ্যে, মার্কো পোলোর (Marco Polo) গ্রন্থের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে, বঙ্গদেশের নৃপতিবৃন্দের সহিত চীনের সম্রাটগণের উপঢৌকন বিনিময়ের বর্ণনা আছে। আবডার-রাজাক, (Abd-er-Razzak) নিকোলো কণ্টাই (Nicolo conti) এবং হাইয়ারোনিমো ডি স্যাণ্টো ষ্টেফানো (Hieronimo di Santo Stefano) নামক বৈদেশিক ভ্রমণকারিরা এই শতাব্দীতে ভারতের পর্য্যটন করিতে আসেন এবং তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থনিচয়, ঐ সময়ের ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্ণবপোত সম্বন্ধীয় সংবাদের জন্য মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মাত্র দেখা দিয়াছেন, তখনকার ভারতীয় নৌশক্তির সবিশেষ বর্ণনা 'ডি কুটো'র (De coutto) ন্যায় পর্ত্তুগালদেশীয় ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থখানি হইতে, ভারতের পর্ত্তুগীজ অধিকারের কতকগুলি

উৎকৃষ্ট পুস্তক, যথেষ্ট উপাদান ও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। ভারথেমা (Varthema) নামক একজন বৈদেশিক ভ্রমণকারী, প্রায় সেই সময়েরই, কলিকাটে (Calicut) জাহাজ নির্ম্মাণের চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

৭। মোগল সম্রাটদিগের রাজত্বকাল,—ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ আকবরের রাজত্বকাল হইতে আরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত—আকবরের রাজত্বকালের ভারতের নৌশক্তির প্রমাণ।—প্রথম :—আবুল-ফাজলের "আইনী-আকবরী" যাহা ঐ সময়কার সংবাদের কল্পতরুরূপে গণ্য করা হয় এবং এই গ্রন্থ আকবরের রণপোত মন্ত্রিসভার (admiralty) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করিয়া থাকে; এবং দ্বিতীয়ত :—'উসুলতুমার জুম্মা' (Ausil Toomar Jumma) হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণী; ইহা গ্রাণ্টের 'য়্যানালিসিস্ অফ দি ফাইন্যান্সেস ইন বেঙ্গল' (Analysis of the Finances in Bengal) নামক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে (Report) গ্রথিত হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানিতে,—'ঢাকা'র রাজকীয় 'নাউয়ারার' অথবা নৌশিল্পের গঠন ও উন্নতি বিষয়ক বিবরণ,—ইহার সংরক্ষণের জন্য রাজস্বের প্রাপ্তিস্থান,—জাহাজ নির্ম্মাণের উপাদান ইত্যাদির নানা মনোহর বিস্তৃত বর্ণনা আমরা আনন্দের সহিত পাঠ করি।

'ইলিয়টের' গ্রন্থের প্রথম বালুমে 'বাচনামা' এবং আবুলফজলের আইনি-আকবরী, সিন্ধুদেশের বন্দর সমূহের ও নৌশিল্পের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। 'ইলিয়টের' গ্রন্থের ষষ্ঠ বালুমে "টাকমিলাই আকবরনামা" (Takmilla-i-Akbarnama) নামক গ্রন্থ হইতে,—'ঘটকারিকা' (Ghata-Karika) নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে,—ডি ব্যারোজের (De Barros) এবং সাউজার (Souza) পর্ত্তুগীজদিগের বিবরণী হইতে,—ভারথেমা (Varthema) এবং র‍্যাল্ফফিচ (Ralph Fitch) প্রমুখ বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে এবং পরিশেষে স্থানীয় কিংবদন্তী রক্ষাকারী প্রাচীনকালের বঙ্গীয় কবিতা গান ও পদাবলী হইতে ও বঙ্গদেশের হিন্দুনৌশক্তির, বাণিজ্যের এবং নৌ-বিদ্যার কতক কতক বিস্তৃত বর্ণনা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি। ব্লকম্যান (Blockmann) সাহেবের দ্বারা অনুবাদিত 'ফাটিয়াই-ইব্রিয়াহ' (Fathiyyah-i-ibriyyah) নামক গ্রন্থ, এবং বড্‌লিয়ান্ (Bodleian) পুস্তকাগারের পাঁচশত উনন্নবই সংখ্যক (৫৮৯) সাচাউ (Sachau) এবং এথিস (Ethe's) তালিকা পুস্তকস্থিত (Catalogue) তৎকালীন পারস্য পুস্তক 'সিহাব-উদ্দীন-টালিসের বৃত্তান্ত' (Account of the Shihab-ud-din Talish) নামক গ্রন্থে—এই দুইখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থই, আরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ফিরিঙ্গীদের (Ferenghes) নৌবল সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের, এবং রাজকীয় পোতসমূহের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া গ্রাহ্য হয়। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ যাহারা এই সময়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'টমাস্ বোরের' (Thomas Bowrey) নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত, বঙ্গোপসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ দেশ সকলের বিবরণীর মধ্যে, আমরা বাণিজ্য ও নৌশিল্পবিষয়ক অনেক মনোহর বর্ণনা পাঠ করিয়া থাকি। ঐ সময়েই শিবাজী ও পেশোয়াদিগের অধীনে মহারাষ্ট্রীয় নৌশিল্প ও নৌশক্তি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। ইহার বৃত্তান্তসমূহ, শ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে বিস্তৃতভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত বি, এ।

নাই শুধু প্রাণ

তেমনিত ফুল ফুটে,
তেমনিত বায়ু ছুটে—
সুরভি মধুর বাসে ভুবন ভুলান ;
সকলিত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

বসন্ত মলয় সঙ্গে,
হাসে খেলে কত রঙ্গে,
কোকিল আকুলে গাহে শ্রবণ জুড়ান ;
সকলিত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

প্রভাতের কলতান,
মুখরিত বিভুগান,
গোধূলি ধূসর রবি নিতি অস্তমান ;
সকলিত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

আকাশ নীলিম কায়,
শত হীরা ঝলে তায়,
যমুনা জাহ্নবী বহে তুলি কুলু তান ;
সকলিত সেই আছে নাই শুধু প্রাণ।

সেই প্রেম সেই হিয়া,
সেই মর্ম্ম আলোড়িয়া
কি লইয়া এলে প্রিয় কোথা দিব স্থান,
আজি মোর সবি আছে নাই শুধু প্রাণ।

নাই প্রাণ—নাই প্রাণ,
যন্ত্রে চলে দেহখান,
এমনি কি খেলা প্রভু হবে অবসান !
কলের পুতুল মাঝে ফিরিবে না প্রাণ ?

শ্রীমতী বনলতা দেবী।

পাটীলবিল ও মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যে সমাজসংস্কার

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বহুপূর্ব্বে সগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়া বিধিবন্ধন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণ ত পরস্পরের সহিত বিবাহের প্রথা বন্ধ করিয়া আরও দেখিলেন তদুপরি প্রত্যেক প্রদেশের বিভিন্ন জাতির ভিতর আবার বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইল, বিবাহের নিমিত্ত নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র এইরূপে ক্রমশঃ এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, যে এখন সগোত্রগণই অনেক স্থলে, ভিন্ন গোত্রের সবর্ণদিগের অপেক্ষা শোণিত সম্পর্কের হিসাবে কম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সমস্যার একটা মীমাংসা হইতেছে অসবর্ণ বিবাহ। মাননীয় পাটীল মহাশয়ের প্রস্তাব গৃহীত হইলে এইরূপ বিবাহের একদিককার বাধা দূর হইবে। কিন্তু ঐ একটি বাধা দূর হইলেই এই প্রকাণ্ড দেশটার যে বৎসরে পঞ্চাশটা অসবর্ণ বিবাহও হইবে, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

কিন্তু যাঁহারা পাটীল বেলের বিরুদ্ধ বাদী তাহারা অত কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন বোধ করেন না। বর্ত্তমানের প্রতি তাহারা সম্পূর্ণ উদাসীন, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা একেবারে অন্ধ, এবং অতীতের সম্বন্ধে তাহারা অসম্ভব রকম অজ্ঞ। অথচ তাহাদের সকল যুক্তিই অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া আছে। অতীতকে আমরাও উপেক্ষা করিতে চাহি না। কারণ অতীতের ভিতর দিয়াই আমাদের এই সমাজ নানা বিবর্ত্তনের মধ্যে বর্ত্তমানে উপস্থিত হইয়াছে। তাই অতীতের আলোচনা করিয়া সমাজের স্বাভাবিক গতি কোন দিকে তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। অতীতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার একটুকু আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা জানি অতীত অখণ্ড, বিভাগ করিলে তাহার স্বরূপ বোঝা যায় না। তাই আমাদিগকে শাস্ত্রও ঘাঁটিতে হইবে, পুরাণও পাঠ করিতে হইবে, কিন্তু অন্ধভাবে নয়, অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া। অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি লইয়া আমাদিগকে প্রত্যেক প্রথার আলোচনা করিতে হইবে। দেখিতে পাইতেছি, আমাদের প্রতিপক্ষ দল কেবলমাত্র শাস্ত্র মানিতে চাহেন না, কারণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অসবর্ণ বিবাহের বহু প্রমাণ রহিয়াছে। এমন কি যে মনুর নামে যাঁহাদের মস্তক সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে, সেই মনুই বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের সাহায্যে আমরা অনায়াসেই প্রমাণ করিতে পারি যে কেবল অসবর্ণ বিবাহ নয়, প্রাচীন মিশরের ন্যায়, ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের ভিতরই পূর্ব্বকালে ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহ হইত। বৌদ্ধ সাহিত্যের দশরথজাতকে, দিঘানিকায়াতে, রকহিল সাহেবের অনুবাদিত বুদ্ধের জীবন কথায় ব্রহ্মদেশে প্রাপ্ত ও রেঙ্গুনের একজন পাদ্রী বিগানডেট অনুবাদিত একখানি পালি গ্রন্থে, মহম্মদ কাসিম কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয়ের অনতিকাল পরে কোন অজ্ঞাতনামা মুসলমান গ্রন্থকার রিবচিন চাচা নামা নামক গ্রন্থে এই প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। প্রায় সকল সভ্যজাতি, সকল সভ্য সমাজেরই ইতিহাসে ঐরকম একটা যুগ গিয়াছে, হিন্দু সমাজের ইতিহাসেও ঐ সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় বিবাহের কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মই ছিল না, মহাভারতের শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান। তারপর আমাদের শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকারের পুত্রের উল্লেখ

হইতেই যথেষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যে বিবাহ প্রথা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান আকারপ্রাপ্ত হইয়াছে। যুগে যুগে এই প্রথার নানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যুগে যুগে ইহার জন্য নব নব বিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দু সমাজ যতদিন সজীব ছিল, ততদিন সচলও ছিল। জড় হইয়া পড়িয়াছে স্মরণাতীত কালে নয় অত্যন্ত আধুনিক যুগে।

দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। হিন্দু শাস্ত্র একখানি মাত্র গ্রন্থেই পর্য্যবসিত নহে, তাহার সংখ্যা অনেক, সুতরাং হিন্দু শাস্ত্র মানিয়া অসবর্ণ বিবাহকে অশাস্ত্রীয় বলা চলে না। কিন্তু কোন গ্রন্থ অনুসরণ করিব, অথবা কোন গ্রন্থের কোন অংশটুকু মানিয়া চলিব তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। প্রথাগুলিকে যাঁহারা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে ভালবাসেন এগুলি যে কত আধুনিক তাহা তাঁহাদের জানা নাই। আরও একটা মুস্কিলের কথা এই যে কেবল বাঙ্গালা দেশের হিন্দুগণই যে হিন্দু, অন্য প্রদেশের হিন্দুগণ হিন্দু নহেন একথা ত বলা যায় না। আবার কেবল ব্রাহ্মণই যে হিন্দু, চণ্ডাল হিন্দু নহেন, এমন কথাও কেহ স্বীকার করিবেন না। ইহারা সকলে কিন্তু একই প্রথা মানে না। দক্ষিণে মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রথা আছে, এবং ঐ প্রথার সমর্থনে বৃহস্পতির স্মৃতি হইতে শ্লোক বাহির করিয়াও দেওয়া যায়। উৎকলে দেবরের সহিত বিধবা ভ্রাতৃ জায়ার বিবাহ হয়। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণের কোন জাতির মধ্যেই বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। বঙ্গের ব্রাহ্মণ মৎস্য মাংস আহার করেন, মদ্য পানেও তাঁহার জাতি ভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই। ঐ অপরাধেই দক্ষিণ ব্রাহ্মণকে জাতি হারাইতে হয়। হায়দরবাদে হিন্দুপুরুষ মুসলমান কন্যা বিবাহ করিতে পারেন; তবে কাহার প্রথা মানিয়া চলিব? প্রথার পথ ত সরলও নয়, প্রশস্তও নয়। প্রথার দোহাই দিয়া বৃহস্পতি কোন কোন প্রদেশের মদ্যপায়িনী রমণীগণের ব্যভিচার উপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এ নির্দ্দেশ আজ কেহ মানিতে রাজি হইবেন কি? কেবল মাত্র শাস্ত্র, কেবলমাত্র প্রথা কেহ কোন দিনই মানে নাই। কারণ প্রথার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে সমাজের প্রয়োজনে, শাস্ত্রকারেরা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেনই না, অভ্রান্তও ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন এক এক যুগের জননায়ক। আজ মনু রঘুনন্দন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার নিজের অনেক বিধান নাকচ করিতেন সন্দেহ নাই।

অসুবিধা এই যে রাজা আমাদের সমধর্ম্মী নহেন, তাই আমাদের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না। অথচ সরকার বাহাদুর হিন্দু আইন যে একেবারে অব্যাহত রাখিয়াছেন এমনত নয়। আমি বিধবা বিবাহের কথা বলিতেছি না কারণ তাহা অশাস্ত্রীয় নয়। কিন্তু হিন্দুদের ফৌজদারী দণ্ড বিধি আইনত ছিল। হিন্দু আইনের ঐ অংশটা যে সরকার বাহাদুর তুলিয়া দিয়াছেন, সে ভালই করিয়াছেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া প্রথার বন্ধন হইতে যাহারা মুক্ত হইতে চাহে তাহাদিগের সুবিধা করিয়া দিন। পাটীলের বিলত বাধ্যতামূলক নয়, সুতরাং আপত্তিকারীগণের অসুবিধা হইবার ভয়ত নাই।

আমাদের দেশে হিন্দুরাজা থাকিলে আজ এই সামাজিক অসুবিধার প্রতিবিধান যে নিশ্চয়ই করিতেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চক্ষের উপর দেখিতে পাইতেছি, হোলকার ও গাইকোয়ারের রাজ্যে অসবর্ণ বিবাহ আইন বিগর্হিত নয়। আর ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাটগণ যে সামাজিক ব্যাপারে শাস্ত্রকারের বিধান অপেক্ষা সামাজিক মঙ্গলের কম চিন্তা করিতেন না তাহারই গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিয়া আমি আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

আমি যে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব তৎসম্পর্কীয় মূল কাগজ পত্র এখনও পুনার পেশবী দপ্তরে বিদ্যমান। সুতরাং তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। পেশবাগণ সমস্ত সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন, ব্রাহ্মণ বলিয়া নহে, রাজা বলিয়া। তাহাদের পূর্ব্বে সাতারার অব্রাহ্মণ রাজাও তৎপূর্ব্বে বিজাপুর, আহাম্মদ নগর ও দিল্লীর অহিন্দু নরপতিগণও যে দক্ষিণের বহু সামাজিক বিবাদের বিচার করিয়া গিয়াছেন,

তাহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি প্রাচীন দলিল ও আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজনও নাই, আপনাদের ধৈর্য্যও থাকিবে না। এখানে আমি কেবল পেশবা সরকারের কয়েকখানি সামাজিক বিচার পত্রের,—যাহা মাড়াঠী ভাষায় 'অভয়' পত্র বলে—অনুবাদ দিব, মন্তব্যের ভার আপনাদের উপর।

মুসলমানদিগের সহিত মারাঠাদিগের নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। এই যুদ্ধে অনেক হিন্দুর মুসলমান-হস্তে বন্দী হইতে হইত, এবং সেই অবস্থার বিপাকে পড়িয়া নিজের আচার রক্ষা করা সম্ভব হইত না, মাঝে মাঝে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেও হইত। এই সকল জাতিভ্রষ্ট হিন্দু ইচ্ছা করিলেই নিজ সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারিত। ইংরাজ বণিক-গণের পত্রে প্রকাশ শিবাজীর সেনাপতি নেতাজী পালকর মুসলমানের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিয়াছিলেন—দিল্লীতে ঔরংজেব বাদশাহ জোর করিয়া তাহাকে মুসলমান করিয়াছিলেন। এ বিষয় সম্বন্ধে ইংরেজের সাক্ষী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু নেতাজী পালকর বড়লোক। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিয়া একটি জুবন্ত লোকের কথা বলিতেছি।—জিতী নামক গ্রামের চৌগোলী সুগোজী বডিবরের পুত্র পুতাজী সুরাটের নিকট মোগল হস্তে বন্দী এবং জাতিভ্রষ্ট হয়। একবৎসর পরে দেশে ফিরিয়া সে জাতে উঠিবার জন্য নিজ জ্ঞাতি সজাতি ও রাজার শরণাপন্ন হইল। ব্রাহ্মণগণের দ্বারস্থ হইবার কথা বোধ হয় তাহার মনে হয় নাই। তাহার আবেদনে গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক ছত্রপতি শিবাজীর পৌত্র সাহু মহারাজ ইন্দাপুর পেওগাঁও পরগণার কতকগুলি গ্রামের মোকদম পাটাস ও অন্যান্য দশজনের নিকট নিম্নলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন।—তোমাদের প্রতি আজ্ঞা এই যে তোমরা যে বিনতী পত্র পাঠাইয়াছ, তাহার মর্ম্ম অবগত হইলাম। চাম্ভার গোদে তরফের অন্তর্গত কসবা জিন্তী নিবাসী সুখোজী বাডবরের পুত্র পুতাজী পূর্ব্বে দাবলজী সোমবংশীর ভৃত্য ছিল। সে ফৌজের সহিত সুরাটে যায়, ও তথায় মোগলের হাতে পড়ে। মোগলেরা তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করে। এক কি সওয়া বর্ষকাল সে মোগল ফৌজে ছিল। রাজশ্রী বালাজী পণ্ডিত প্রধান যখন দিল্লী হইতে আসেন, তখন সে পলায়ন পূর্ব্বক তাহার ফৌজের সহিত মিলিত হইয়া গ্রামে আসে। তাহার কাহিনী সমস্ত বিবৃত করায়, সমস্ত গোত একত্র হইয়া বিচার করিয়া ইহাকে গোতে লইবে এইরূপ মত হইয়াছে। স্বামী যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিব—এইরূপ তোমরাও লিখিয়াছে, তাহা অবগত হইলাম। পূর্ব্বোক্ত পুতাজীকে মোগলেরা বলপূর্ব্বক ভ্রষ্ট করিয়াছে, সে কিছু স্বসন্তোষে ভ্রষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইহাকে গোতে লইবার আজ্ঞা করিলাম। তোমরা সকল গোত মিলিয়া শাস্ত্র মতে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে গোত মধ্যে গ্রহণ করিবে ও পূর্ব্ববৎ ব্যবহার করিবে।

সাহু মহারাজের আর একখানি অভয় পত্রে কোন একটি অসহায়া বিবাহিতা রমণীর স্বামীর দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য দ্বিতীয় বার বিবাহিতা হইতে অনুমতি দিতেছেন—

সুঠেঘোরের তরফের অন্তর্গত বহুলী মৌজা নিবাসী গোদজী গায়ক বাড়কে অভয় পত্র দেওয়া যাইতেছে যে তুমি হুজুরে আসিয়া নিবেদন করিয়াছ যে মেঢ় তরফের অন্তর্গত সায়গাও নিবাসী আনাজী ঘোর পড়ার কন্যা জানীকে কসবা দহিগাঁও নিবাসী জোত্যাজী সাম্বতের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু জোত্যাজী তাহাকে ফেলিয়া গিয়াছে। জানী দশ বার বৎসর পর্য্যন্ত তাহার পথ চাহিয়া আছে, কিন্তু জোত্যাজী ফেরে নাই ইতিমধ্যে জানীর মাতা পিতার মৃত্যু হইয়াছে, শ্বশুর বংশেও অন্ন বস্ত্র চালাইবার কেহ নাই। সুতরাং গত বৎসর জান স্বামীর নিকট আসিয়া নিবেদন করে যে আমার অন্ন বস্ত্র চালাইবার কেহ নাই, কি, উপায় করিব? স্বামী তাহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার আদেশ দেন তদনুসারে জানী স্বগ্রাম সুঠেঘোরে আসিয়া দেশমুক দেশাপাস্তে এবং গোত্রগণকে স্বামীর আদেশের সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনুসারে তাহারা আমার সহিত ইহার পাদ্য বিবাহ দিয়াছে। এতৎসত্ত্বেও রাজশ্রী সচিব পন্ত আসিয়া তুই কাহার হুকুমে পাত্য বিবাহ করিয়াছিস্ বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ চাহে। আমি তাহাকে মহারাজের আজ্ঞানুসারে করিয়াছি বলি। যদি আবার কেহ আসিয়া

গোলমাল না করে তাহার জন্ম হুজুর পত্র থাকা প্রয়োজন বলিয়া তুমি নিবেদন করিয়াছ। তদনুসারে এই অভয় পত্র তোমাকে দেওয়া গেল। তুমি ও জানী সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে থাক।—

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের প্রচলন করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে একজন হিন্দুনরপতি স্বরাজ্যে অসহায়া বিধবারও পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহারি জন্ম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পাঁতির অপেক্ষা রাখেন নাই।

শাহু মহারাজের দুইখানি অভয় পত্রের অনুবাদ দিয়াছি এইবার খাস পেশবা দপ্তরের একখানি কাগজের অনুবাদ দিব। এই আদেশ পত্রখানি ১৭৮৬ সালে লিখিত। পেশবা সরকারের একটা কলমের খোচায় কিরূপে অন্যায় বিবাহ সিদ্ধ হইয়া যাইত তাহা আপনারা এই আদেশ পত্র খানিতেই দেখিতে পাইবেন—

ধারুর পরগণার লাক্ষে তরফের অন্তর্গত খাচসবাডী গ্রাম নিবাসী মহুলার ভবানী ভিঙ্গোরে হুজুরের নিকট নিবেদন করিয়াছে যে বয়াজী দত্তাজীঠাকুর দেশামুখ কলখতকর এবং রাণোজী সুলতানজী শেলকা পাটাল এবং বিবুতেলী এই তিন জন ব্যক্তি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে কয়েদ ও প্রহার করিয়াছে তাহারা আমাকে নানাপ্রকারে ধমকাইয়া বলে যে আমরা তোর মেয়ের বিবাহ দিব। তখন আমি উত্তর করি যে কন্যা তিনবৎসরের শিশু এখনও বিবাহের যোগ্য হয় নাই। এই প্রকার বলাতেই তাহারা আমাকে প্রহার করে এবং গ্রামস্থ লবণ বিক্রেতা ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ৪৫ বৎসর বয়স্ক গোবিন্দ ধোন্তাকে আনিয়া দাঁড় করায়। তাহাকে দেখিয়া আমরা অনেক দোহাই দেই, কিন্তু আমাদের উভয়কে তাহারা প্রহার করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলে। আমাদের জ্ঞান ফিরিলে ঐ তিন ব্যক্তি আমাদিগকে বলে যে ঐ সময়ের মধ্যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমরা চক্ষে দেখি নাই। এইরূপ অত্যাচার আমার উপর হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বিহিত অনুসন্ধান করিয়া যাহারা আমার উপর জবরদস্তী করিয়াছে তাহাদের শাস্তি দিবার এবং আমার কন্যাকে যথাবিধি অপর বরের সহিত বিবাহ দিবার আদেশ হউক।—এই মর্ম্মে নিবেদন করিয়াছে, তদনুসারে এই পত্র পাঠান যাইতেছে যে ঐ গ্রামের ও পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের ব্রাহ্মণদিগের লিখিত জবানবন্দী লইয়া তদন্ত করিয়া যদি স্থির হয় যে এই ব্রাহ্মণের উপর জবরদস্তী করিয়া অবৈধ বিবাহ দেওয়া হইয়াছে তবে এই কন্যার যথাবিধি অন্য বিবাহ করাইয়া যাহারা ইহাদের উপর জবরদস্তি করিয়াছে তাহাদের যথাযুক্ত শাসন করিয়া জরিমানা লইয়া হুজুরে পাঠাইবে—আজ যদি কেহ কোন হিন্দু বিবাহ জবরদস্তীর অজুহাতে রদ করিয়া দেন তবে চারিদিক হইতে কিরূপ চীৎকার উঠিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ পেশবা সরকার যে অন্ততঃ এই ব্যাপারে মোটেই অবিচার করেন নাই তাহাতে সন্দেহ কে করিবে?

বিবাহের আর একটা অবিধিও পেশবাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। আজকাল কন্যার পিতা বরকর্ত্তার উৎপীড়নে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন—তখন বরের পিতা কন্যার পিতার দাবী মিটাইতে হয়রান হইতেন। এই কুপ্রথা নিবারণের জন্য কেরাসিনের দরকার হয় নাই, দড়ি কলসী আফিমের দরকার হয় নাই, সভাসমিতি বক্তৃতার দরকার হয় নাই। পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের একখানি ইস্তাহারেই এই কুপ্রথার উচ্ছেদ হইয়াছিল। এই ইস্তাহার খানির অনুবাদ দিয়াই আমি আপনাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব।

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কেহই কন্যার জন্য টাকা অথবা কোন প্রকারের ঋণ ইত্যাদি গ্রহণ করিবে না। কন্যা দান করিয়া বিবাহ দিবে এই সম্বন্ধে তুমি তোমার তালুকের, ধর্ম্মাধিকারী জোশী, উপাধ্যায় ও সমস্ত ব্রাহ্মণ, দেশমুখ, দেশপাণ্ডে খেতে, কুলকর্ণী এবং মহাজন দিগকে সাবধান করিয়া দিবে। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ কন্যার জন্য নগদ টাকা বা ঋণ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া বিবাহ দেয় তবে বিবাহ হইবামাত্র বরপক্ষ ও ঘটক সরকারে ও তোমাকে জানাইবে। এবং তুমি এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কন্যা পক্ষ বর পক্ষের নিকট টাকা গ্রহণ করিয়া থাকিলে ফেরৎ দেওয়াইবে ও ঐ পরিমাণ জরিমানা কন্যা পক্ষের নিকট

আদায় করিয়া সরকারে গ্রহণ করিবে। ঘটক টাকা লইয়া থাকিলে তাহাকে জব্দ করিবে। বর পক্ষ বা ঘটক যদি সরকারে খবর না দেয় ও অপর কাহারও নিকট সংবাদ পাওয়া যায় তবে পণের পরিমাণ টাকা বরপক্ষের নিকট হইতে তাহার দ্বিগুণ টাকা কন্যা পক্ষের নিকট হইতে এবং ঘটকের নিকট হইতে তাহার বিদায়ের পরিমাণ টাকা জরিমানাস্বরূপ সরকারের গ্রহণ করা হইবে। এতদসম্বন্ধে তোমাকে এই সনন্দ পাঠান যাইতেছে।

এই প্রকারের আরও অনেক কাগজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই চারি খানি দলিল হইতেই বোধহয় প্রমাণিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের শেষ হিন্দু সম্রাটগণও সমাজ সংস্কারের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। বিবাহ বিধির নানাপ্রকার সংস্কারের চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। পেশবা প্রথম বাজীরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগের ভিতর বিবাহ প্রচলিত করিবার নিমিত্ত নিজেই তিন সম্প্রদায়ের তিনটি কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। পেশোবাগণের সংস্কার চেষ্টা হইতে বাস্তবিক আমাদের অনেক বিষয় শিখিবার আছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ, পি, আর, এস।

কল্যাণ

এ বিশ্ব কর্ম্মের মাঝে জেগে আছে যে মহাকল্যাণ,
সে কি শুধু মনোরম সৌন্দর্য্যের দেবতা মহান্?
সে কি শুধু সুখময় হাসিময় মধুময় গান?
সে কি শুধু জ্যোৎস্নারাতে প্রাণভোলা বাঁশরীর তান?
স্বপন কুহেলিমাখা সে কি শুধু আবেশের চাওয়া?
সারা নিশিদিনমান সে কি শুধু প্রেমগান গাওয়া?
সে নৃত্যে কি শুধু চলে নর্ত্তকীর চঞ্চল চরণ?
সে তানে কি শুধু ভাসে রূপসীর নূপুর শিঞ্জন?
কামনা যজ্ঞের মাঝে সে কি শুধু হরষের রব—
বিশ্বনাট্যশালা মাঝে একি শুধু বসন্ত উৎসব?

জাগেনা কি তার সনে সংহারের দেবতা ভীষণ?
রক্তনেত্রে ছোটেনাকি বিশ্বগ্রাসী দৃপ্ত হুতাশন?
বাজেনাকি সেই গানে ঈশানের বিষান নিনাদ?
ঝড়ঝঞ্ঝা মাঝে তার ছোটেনা কি অশনি সম্পাত?

বিশ্ব-দক্ষযজ্ঞ মাঝে উঠেনাকি তাণ্ডব নর্ত্তন ?
ছন্দে ছন্দে বাজেনাকি প্রলয়ের জলধি কম্পন ?
পদতলে গ্রহতারা খসেনাকি নিজ কক্ষহতে ?
মহাশূন্যে ভীমতান ছোটেনাকি সঙ্ঘাতে সঙ্ঘাতে ?
সাথে সাথে চলেনাকি ভূতপ্রেত আদি নিশাচর—
মৃত্যুভীত মানবের হিয়া ভয়ে কাঁপে থরথর !

ওহে শম্ভু, হে বিধ্বংশী, হে সুন্দর হে রুদ্র মহান্ !
ওহে ভীম, ওহে শান্ত, হে পিনাকি হে মহাকল্যাণ !
হে ধূর্জ্জটী, হে ত্র্যম্বক গৃহচারা, হে শ্মশানবাসি,—
হে মহেন্দ্র, গঙ্গামৌলি, বিশ্বেশ্বর হে মহাসন্ন্যাসি !
ডমরুনিনাদে মোরে ডাক দাও করমের পথে,
মরণবিজয়ী শক্তি জাগাইয়া তোল এক হ'তে
দুঃখের সাগর সেঁচি দাও মোর কণ্ঠে হলাহল
বিশ্বভার বহিবারে শক্তিধর দাও মোরে বল,
কামনার মাঝে জ্বাল কামনার হোম হুতাশন,
স্বপ্ন হতে দাও মোরে, ঝঞ্ঝামাঝে মহা জাগরণ !

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, বি এস-সি

দৈববাদী ও কর্ম্মবাদী

দৈববাদী—হে জ্ঞানালোক সম্পন্ন সুধী! তোমার সাবধানতা দূরে রাখিয়া দাও। তোমার ভাগ্যের বিরুদ্ধে উহা কোন প্রকারে তোমার সহায়তা করিবে না। তোমার পূর্ব্ব সতর্কতার উদ্বেগ কেবল কঠিন পরিশ্রম মাত্র। যাও, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত ভাল। তোমার উষ্ণ মস্তিষ্ক লইয়া ঐশ্বরিক বিধান বিরুদ্ধে দাঁড়াইও না। ঐ বিধান তোমারই পথ রোধ করিবে। ঈশ্বরের আজ্ঞার সম্মুখে মৃতের ন্যায় দাঁড়াইবে; নহিলে সর্ব্বস্রষ্টার হস্তের কঠিন আঘাত তোমার মস্তকে আসিয়া পড়িবে।

কর্ম্মবাদী—সত্য; যদিও বিশ্বাস আমাদের প্রধান অবলম্বন, তথাপি উপায়কে অবহেলা করা উচিত নহে। কথাই আছে—"Trust in God, yet tie the Camel's leg." "Trust in God and keep your powder dry." কর্ম্মী ঈশ্বরের প্রিয় (Laborare est orare) আবার গীতা বলিতেছেন :—

"হে অর্জ্জুন, যিনি মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই অনাসক্ত কর্ম্মীই প্রশংসার্হ।" (১)

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কেন না কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। প্রত্যুত কর্ম্মে নিবৃত্ত হইলে তোমার শরীর যাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না।" (২)

"কর্ম্মতেই তোমার অধিকার, ফলে নহে।" (৩)

"যাহা কিছু করিবে—অশন, সজন, দান, তপস্যা-সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।" (৪)

(১) যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥—গীতা, ৩।৭

(২) নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্ম্মণঃ॥—গীতা, ৩।৮

(৩) কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।—গীতা, ২।৪৭

(৪) যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥—গীতা ৯।২৭

হে দৈববাদ; ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, কিন্তু কর্ম্মে নিবৃত্ত হইও না। কর্ম্ম করিতে করিতে ঈশ্বরে বিশ্বাস অভ্যাস কর। ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম ও তাহার ফলাফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম কর। প্রাপ্ত বস্তু লাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর।

দৈববাদী—স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা অত্যল্প মাত্র যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে কি লোভ? তাহাতে আত্ম প্রবঞ্চনাই করা হয়। আবার জানিও যে আত্মপ্রয়াস দুর্ব্বলতা হইতেই উৎপন্ন এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কলঙ্কিত করে। আত্মপ্রয়াস ঈশ্বরে বিশ্বাস অপেক্ষা মহান্ ও সমুচ্চ নহে। ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ অপেক্ষা আর কি অধিকতর প্রীতিজনক হইতে পারে? এমন অনেক লোক আছে, যাহারা এক বিপদ হইতে পলাইয়া অন্য ঘোরতর বিপদে পতিত হয়। অনেকে সর্পমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অন্য হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হন। মানুষ চাতুরী করিতে গিয়া সেই চাতুরী জালে আপনাকেই ফেলে। জীবন রক্ষার জন্য যাহা গ্রহণ করে, তাহাই আবার তাহার জীবন বিনাশের হেতু হয়। শত্রু ঘরে না দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ করে। আমাদের চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত। তোমার দৃষ্টি ধ্বংশ করিয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতেই দেখ। আমরা ঈশ্বরের পরিবার। যিনি স্বর্গ হইতে বারিবর্ষণ করেন, শিশুর জন্মের বহু পূর্ব্ব সময় হইতে যিনি তাহার মাতার স্তনে ক্ষীর সঞ্চারণ করিয়াছেন, তিনি আমাদের দৈনিক আহার যোগাইতে পারেন না?

কর্ম্মবাদী—ক্রমবিন্যাস ও ক্রমবিকাশই স্রষ্টার নিয়ম; সৃষ্টির সর্ব্বত্রই উহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্তরে স্তরে ক্রমে ক্রমে এই অনন্ত বিশ্বসৃষ্ট হইয়াছে। আমাদিগকেও এক সোপান হইতে আর এক সোপান উঠিয়া ধীরে ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সমুচ্চ ছাদে উঠিতে হইবে। নহিলে ভগবৎ সম্মিলন বা নির্ব্বাণ মুক্তি অসম্ভব। কর্ম্ম নাই কাহার? যাহার জ্ঞান পরিপক্ক হইয়াছে, যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী, জগতে তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই, কিছুই অপ্রাপ্য নাই, কোন কামনার বস্তুই নাই। গীতা বলিতেছেন :—

"আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্ম স্বরূপেই তৃপ্ত, আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ তাঁহার কোন কার্য্যই নাই। তাঁহার কর্ম্মে বা অকর্ম্মে (কর্ম্মানুষ্ঠানে বা কর্ম্মত্যাগে) কোন স্বার্থই নাই, কারণ সর্ব্বভূতে তাঁহার কোন কামনার বস্তুই নাই।" (৫)

আবার :—

"সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় প্রবৃত্ত হউক, বা নিবৃত্ত হউক তাহাতে তিনি সমচিত্ত—তিনি তাহাদের নিবৃত্তিরও কামনা করেন না বা প্রবৃত্তিরও দ্বেষ করেন না।" (৬)

তথাপি নানারূপে নানাপ্রকারে ইঁহারা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া ভগবানের পালন কার্য্যে সহায়তা করেন। তাঁহাদের আত্মা শক্তির পুণ্য প্রস্রবণ এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরাভিমুখী। ঐ আধ্যাত্মিক শক্তি সর্ব্বদা ভগবৎ সাহায্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে।

ভগবান আহার যোগান্ কাহার? গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন:—

"যাহারা অনন্য কাম হইয়া আমাকে চিন্তা করত উপসনা করে, সেই সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের অন্নাদি আহরণ ও তাহার সংরক্ষণ আমিই করিয়া থাকি।" (৭)

কিন্তু আমরা যে উহার কিছুই নহি। আমরা ভক্তও নহি, জ্ঞানীও নহি।

আবার শোন ; গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন:—

"হে অর্জ্জুন, তিন লোকে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই ; এমন কোন বস্তুই নাই যাহা আমি পাই নাই ; যাহা পাইবার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিব। তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি। কারণ যদি আমি অবহিত হইয়া সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান না করি তবে অপরে আমার অনুসরণ করিবে এবং তাহার ফলে সমস্ত লোক উৎসন্ন যাইবে।" (৮)

অনাশক্ত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জীব পরমবস্তু লাভ করে।" (৯)

হে দৈববাদী, "অনাশক্ত হইয়া (ফলাশক্তি রহিত হইয়া) কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।" (১০)

তোমার ত পা আছে তবে খঞ্জের ভাণ করিতেছ কেন? তোমার ত হাত আছে তবে হস্ত তল লুকাইতেছ কেন? যখন প্রভু তাঁহার ভৃত্যের হস্তে কুদ্দাল দেন, তখন ভৃত্যকে কিছু না বলিয়া দিলেও ভৃত্য তাহার অর্থ বুঝিতে পারে; ঐ কুদ্দালের ন্যায় আমাদের হস্ত ও আমাদের প্রভুর ইঙ্গিত। তাহা হইতেই আমাদের প্রতি তাঁহার অনুজ্ঞা বুঝিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহার ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া ঐ ইঙ্গিতানুযায়ী অনুজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া আপনার জীবনকে গঠন কর। ঐ সকল ইঙ্গিত তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে তুমি তোমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া তদনুসারেই কর্ম্ম কর। যিনি রসাতল গত হইয়া অনন্তরূপে জগৎ সংসার ধারণ করিতেছেন সেই বীর্য্য স্বরূপকে তুমি নমস্কার কর, তিনি তোমার সমস্ত কার্য্যেই তোমাকে ধারণক্ষম করিবেন। যিনি সমস্ত কার্য্যে অবিচলিত ও ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত উদ্যত হইয়া থাকেন, সেই কার্য্য স্বরূপকে তুমি

---

(৫) যস্ত্বাত্ম রতিরেব স্যাদাত্ম তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট স্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈবতস্য কৃতে নার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
নচাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থ ব্যাপাশ্রয়ঃ॥—গীতা, ৩।১৭।১৮

(৬) প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥"
—গীতা, ১৪।২২

(৭) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভি যুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং॥
—গীতা, ৯।২২

(৮) "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
না নবাপ্ত মবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥
উৎসীদেয়ু রিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম।
—গীতা, ৩।২২-২৪

(৯) "অসক্তোহ্যাচরন্‌কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"
—গীতা, ৩।১৯

(১০) "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং সমাচর।"
—গীতা,৩।১৯

নমস্কার কর তিনি তোমার সকল কার্য্যেই তোমাকে উদ্যমশীল ও কর্ম্মক্ষম করিবেন। তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ মস্তকে ধারণ কর, তুমি তোমার সকল কার্য্যেই সফলকাম হইবে, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা কর, তুমি সম্মিলিত হইবে।

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়াই উদ্যমশীলতা। হে দৈববাদী, তোমার কি তাহা আছে? ঐ আশীর্ব্বাদের জন্য ধন্যবাদে তাঁহার আশীর্ব্বাদ দিন দিন অধিকতর রূপে পাওয়া যায়; কিন্তু তোমার দৈববাদীত্ব তাহা তোমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লয়। পথপ্রান্তে নিদ্রা গমনই তোমার দৈববাদীত্ব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি সেই রাজরাজ্যের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইতে পারিতেছ ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না। হে অনুধ্যানহীন দৈববাদী, যতক্ষণ না তুমি সেই ফলভারাবনত জীবন বৃক্ষের সন্মুখীন হইতেছ ততক্ষণ নিদ্রা যাইও না। ঐ বৃক্ষের শাখা প্রতিনিয়ত মন্দ মরুতহিল্লোলে দুলিতেছে ও ফল সকল তলস্থ নিদ্রিতের মস্তকের উপর বৃষ্টিকণার ন্যায় অনবরতঃ বর্ষিত হইতেছে।

যদি প্রকৃতই ঈশ্বরে তোমার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে কর্ম্মনিষ্ঠ হও এবং সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রতি নির্ভরপরায়ণ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে উদ্যমশীল হও।

বশিষ্ঠ দেব বলেন—

"বিলম্বেই হউক, বা সত্বরেই হউক, দেশকালবশে পৌরুষ বলে যে ফললাভকরা যায়, তাহাকেই দৈব কহে। দৈব চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয়না বা লোকান্তরেও অবস্থিত নহে; স্বর্গে যে কর্ম্মফল ভোগ করা যায় তাহাই দৈব শব্দে কথিত হয়।"(১১)

"পুরুষ ইহলোকে জন্মিতেছে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনরায় জরাগ্রস্থ হইতেছে, কিন্তু তথায় জরা, যৌবন ও বাল্যের ন্যায় দৈবের প্রত্যক্ষতা হয়না।" (১২)

"যে যে ব্যক্তি যেরূপ প্রযত্নবান্ হন্, তিনি তত্তৎ ফলভাগীহন; তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে কেহই কোন ফললাভ করিতে পারেনা। শুভ পুরুষকারে শুভ ফললাভকরা যায়, অশুভ পৌরুষে অশুভ ফললাভহয়। হে রাম! তুমি যাহা ইচ্ছাকরিবে তাঁহাই করিতে পার।" (১৩)

"বাল্যাবধি যে যে বিষয়ে যেরূপ যত্নকরা যায়, ফললাভ ও তাদৃশ হইয়া থাকে; দৈব কুত্রাপি দৃষ্টহয়না; অতএব জগতে কেবল মাত্র পৌরুষই বিদ্যমান।" (১৪)

"যাহারা দৈবপরায়ণ হইয়া, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে, সেই আত্মবিদ্বেষ্টা জনগণ, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিতয়ের নাশ করিয়া থাকে।" (১৫)

"বৃহস্পতি পুরুষকার দ্বারা দেবগুরু হইয়াছেন, শুক্রাচার্য্যও পুরুষকার বলে দৈত্যগুরু হইয়াছেন। হে সাধো! প্রযত্নশালী কত শত মানবগণ দৈন্য দারিদ্র্য

(১১) "পুরুষার্থাৎ ফলপ্রাপ্তি দেশকাল বশাদিহ
প্রাপ্তো চিরেণ শীঘ্রং বা যাসৌ দৈবমিতি স্মৃতা॥
ন দৈবং দৃশ্যতে দৃষ্টং ন চ লোকন্তরে স্থিতং।
উক্তং দৈবাভিধানেন স্বর্লোকে কর্ম্মণঃ ফলম্॥"
—যোঃ বাঃ মু, মু ৭।২১—২২

(১২) "পুরুষো জায়তে লোকে বর্দ্ধতে জীর্য্যতে পুনঃ।
ন তত্র দৃশ্যতে দৈবং জরা যৌবন বাল্যবৎ॥
অর্থ প্রাপক কার্য্যৈক প্রযত্ন পরতা বুধৈঃ।
প্রোক্তা পৌরুষ শব্দেন সর্ব্বমাসাদ্য তেহনয়া॥"
—যোঃ বাঃ মু, মু ৭।২৩—২৪

(১৩) যো যো যথা প্রযত তে মম তত্তৎ ফলৈকভাক্।
নতু তুষ্ণীং স্থিতেনেহ কেনচিৎ প্রাপ্যতেফলম্॥
শুভেন পুরুষার্থেন শুভ মাসাদ্যতেফলম্।
অশুভেনা শুভং রাম যথেচ্ছসি তথাকুরু॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৭।১৯—২৬

(১৪) আবাল্যমেতত্‌ সংসিদ্ধং যত্র যত্র যথা, যথা।
দৈবস্ব নচ কচিদ্দৃষ্ট মতো জগতি পৌরুষং॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৭।৬

(১৫) যে সমুদ্যোগ মুৎসৃজ্য স্থিতা দৈব পরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্ম মর্থং কামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্ম বিদ্বিষঃ॥
—যোঃ বাঃ মু, মু ৭।৩

দুঃখে পীড়িত হইয়াও পুরুষকারের বলে ইন্দ্রতুল্য হইয়াছেন।

"হে রাম! বিশ্বামিত্র ঋষি দৈবকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র পুরুষকার বলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন প্রকারে নহে। হে রাম! আমরাও পৌরুষবলে মুনি হইয়াছি ও এই ত্রিভুবন মধ্যে বহুসময় ব্যাপিয়া আকাশগমন করিতে শিখিয়াছি।" (১৭)

"দৈত্যাধিপতিগণ কেবল পৌরুষ বলেই দেব সমূহকে উৎসাদিত করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে।" (১৮)

"আবার, দেবগণ পৌরুষ বলেই অসুরগণের নিকট হইতে, বিচ্ছিন্ন, বিশীর্ণ, এবং বিশাল জগত আহরণ করিয়াছিলেন।" (১৯)

এইজগতে দৈবেরই যদি কর্তৃত্ব থাকে তাহা হইলে পুরুষের চেষ্টার প্রয়োজন কি? দৈবই স্নান, দান, উপবেশন ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। শাস্ত্রোপদেশ কেন? কাহাকে কোন উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই কর্ম্মকরিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। (২০)

"হে রাঘব, পৌরুষ সকল কার্য্যের কর্ত্তা ও ফল ভোক্তা, অন্য কিছুই নহে, দৈব তদ্বিষয়ে কারণ নহে। দৈব কিছুই করে না; কিছুই ভোগ করে না, দৈবের অস্তিত্ব নাই কেহ ইহাকে দেখিতে পায় না এবং আদরও করে না; উহা এক প্রকার কল্পনা মাত্র। ফলশালী পৌরুষ দ্বারা যে শুভ অশুভ ফল সিদ্ধ হয় তাহাকে লোকে দৈব শব্দে নির্দ্দেশ করে; পৌরুষ প্রযুক্ত যে ইষ্ট ও অনিষ্ট বস্তুর নিত্যই প্রাপ্তি হইতেছে উহা ইষ্টই হউক বা অনিষ্টই হউক উহাকে অজ্ঞলোকে দৈব কহে।" (২১)

হে দৈববাদী, ঋষি বশিষ্ট দেবের কথায় আমিও বলি :—

"স্বীয় উদ্যমশীল বুদ্ধি দ্বারা যাহা করিতে হইবে তাহার আলোচনা কর, দৈব অধঃকৃত হইয়া যাইবে, পুরুষার্থ জাগিবে, তখন সংসারোত্তরণ জন্য একদিকে মনোনিগ্রহ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি কার্য্যে লাগিয়া যাও, অন্যদিকে শান্তমন ও শান্ত ইন্দ্রিয়কে আপনপ্রিয় আত্মাতে লাগাইয়া দাও—সংসার উত্তীর্ণ হইবে। পুরুষ গর্দ্দভের মত উদ্যোগ হীন হইও না। শাস্ত্রানুসারী উদ্যোগ ইহলোক ও পরলোকের উপকারী।" (২২)

(১৬) পুরুষার্থেন দেবানাং গুরুরেব বৃহস্পতিঃ।
শুক্রো দৈত্যেন্দ্র গুরুতাং পুরুষার্থেন চাস্থিতঃ॥
দৈন্য দারিদ্র্য দুঃখার্ত্তা, অপি সাধো নরোত্তমাঃ।
পৌরুষেণৈব যত্নেন যাতা দেবেন্দ্রতুল্যতাম॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৭।৭-৮

(১৭) বিশ্বামিত্রেন মুনিনা দৈবমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
পৌরুষেণৈব সম্প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং রামনান্যথা॥
অস্মাভির পরৈ, রাম, পুরুষৈর্মুনিতাং গতৈঃ।
পৌরুষে নৈব সম্প্রাপ্তা চিরং গগন গামিতা॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৮।২০-২১

(১৮) উৎসাদ্য দেব-সঙ্ঘাতং চক্রু স্ত্রিভুবনোদরে।
পৌরুষেণৈব যত্নেন সাম্রাজ্যং দানবেশ্বরাঃ॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৮।২২

(১৯) আলুন শীর্ণ মা ভোগী জগদাতন্তু রোজমা।
পৌরুষেণৈব যত্নেন দানবেভ্যঃ সুরেশ্বরাঃ॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৮।২৩

(২০) দৈবমেবেহ চেৎ কর্তৃ পুংসঃ কিমিব চেষ্টয়া।
স্নানদানাসনোচ্চারান্ দৈব মেব করিষ্যতি॥
কিংবা শাস্ত্রোপদেশেন, মূকোঽয়ং পুরুষঃ কিল।
মঞ্চার্য্যতে তু দৈবেন কিং কস্তে হোপ্য দিশ্যতে॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৮।৬-৭

(২১) পৌরুষং সর্ব্বকার্য্যানাং কর্ত্তৃরাঘব নেতরৎ।
ফল ভোক্তৃচ সর্ব্বত্র ন দৈবং তত্র কারণম্॥
দৈবং ন কিঞ্চিৎ কুরুতে ন ভুঙ্ক্তে ন চ বিদ্যতে।
ন দৃশ্যতি নাদ্রিয়তে কেবলং কল্প নেদৃশী॥
সিদ্ধস্য পৌরুষেণেহ ফলস্য ফলশালিনা।
শুভাশুভার্থ সম্পত্তি দৈব শব্দেন কথ্যতে॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৯।২-৪

(২২) অসদ্দৈব মধঃ কৃত্বা নিত্যমুদ্রিক্তয়া ধিয়া।
সংসারোত্তরণং ভূত্যৈ যতেতাধাতুমাত্মনি॥

"সাধুর উপদিষ্ট পন্থানুসারে মন, বাক্য এবং শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার। অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র।" (২৩)

"চিত্তে যাদৃশ বিষয় স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্ত ও তাদৃশ স্পন্দ প্রাপ্ত হয়, শরীর চেষ্টাও তথাবিধ হইয়া থাকে, ফলভোগ ও তদনুরূপ ঘটে।" (২৪)

"শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য ও নিজের অনুভব এই তিনের মিলন কর পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবেই; দৈবের কোন প্রয়োজন নাই।" (২৫)

স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন—"আমি "পৌরুষং নৃষু"; অতএব তাঁহাকে পাইতে যত্নশীল হও।

শ্রীচৈতন্ত।

ন গন্তব্যমনুদ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষ গর্দ্দভৈঃ।
উদ্যোগস্তু যথা শাস্ত্রং লোক দ্বিতীয় সিদ্ধয়ে॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৫।১৩-১৪

(২৩) সাধুপদিষ্ট-মার্গেন যন্মনঙ্গ বিচেষ্টিতম্।
তৎপৌরুষং তৎসফল মন্যদুন্মত্ত চেষ্টিতম্॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৪।১১

(২৪) যথা সংবেদনং চেতস্তথা তৎ স্পন্দমিচ্ছতি।
তথৈব কায়শ্চলতি তথৈব ফল ভোক্তৃতা॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৭।৫

(২৫) শাস্ত্রতো গুরুতশ্চৈব, স্বত শ্চেতি ত্রিসিদ্ধয়ঃ।
সর্ব্বত্র পুরুষার্থস্য, ন দৈবস্য কদাচন॥—
যোঃ বাঃ মু, মু ৭।১১

নির্ভীক ঘোষণা

ঝড়ের প্রবলতা ও প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও এমন কতকগুলি বৃক্ষ আছে যাহারা গর্ব্বভরে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকে—অবনত হইয়া পড়ে না। যখন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বায়ু-প্রাবল্য আর সহ্য করিতে পারে না তখন তাহারা একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই নুইয়া থাকিবে না, তাহাদের গর্ব্বোদ্ধত মস্তক কিছুতেই অবনত করিয়া রাখিবে না। বায়ুর বেগও যতই বাড়িয়া যায়, তাহারাও ততই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর রূপ ধারণ করে। ইহাই এই বৃক্ষ-জীবনের বিশেষত্ব।

আঘাতের একটা প্রতিঘাত আছে। যে যত জোরে যাহাকে আঘাত করে সেই আঘাত প্রাপ্ত বস্তুও আবার তত জোরেই তাহার প্রতিঘাত করে। বিশালকায় ও সুদৃঢ় তালবৃক্ষও তাহার স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আঘাতের পর প্রতিঘাত করিবার জন্য প্রবল বাত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আপন জয় ঘোষণা করে। ওক্ বৃক্ষ বাত্যা তাড়না সহিয়া সুদৃঢ় হইতে সুদৃঢ়তর হয়, তাহার ভিত্তি ক্রমশঃ শক্ত হইয়া উঠে।

ইহাদের জীবনের শিক্ষা একটা জীবনব্যাপী মহা সংগ্রামের মধ্যে, ইহাদের জীবনের সার্থকতা ইহাদের শক্তির বৃদ্ধি প্রতিপাদনে।

একটা সামান্য গাছও ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক একবার অবনত হয় আবার সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করে, আপনার শক্তির পরিচয় দেয়, প্রবল বাত্যাকে উপেক্ষা করিয়া আপনার শক্তির জয় ঘোষণা করে। সরোবরস্থ সুকোমল পদ্মের মৃণাল অথবা মৃদুকায়া কুমুদ লতা কত শত তরঙ্গাভিঘাত সহ্য করিয়াও এক একবার ডুবিয়া যায়, আবার ভাসিয়া উঠে, শত শত ফুল ধারণ করিয়া কমনীয়া লতা কত মনোহারিনী হইয়া উঠে, আর সরোবর বক্ষ কত সুশোভিত হয়। ইহাই লতার জীবনের সার্থকতা, জন্মাবধি তরঙ্গের সহিত সংগ্রাম ইহারও জীবনের একটী বিশেষত্ব। বাহ্যপ্রকৃতিতে এইরূপ একটা মহা সংগ্রাম অনবরত চলিতেছে। যাহার ভিতর যে পরিমাণ শক্তি বিরাজিত সে সেই পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে। যত ঝঞ্ঝাবাত, যত আপদ বিপদ, সকলকে সেই পরিমাণে তুচ্ছ করে। নিজের মহিমা, নিজের শক্তি সে গর্ব্বভরে ঘোষণা করে। এই যে জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম, এই যে সুদীর্ঘ মন্ত্রের সাধন ইহাই প্রকৃত জীবন প্রকৃত জাগরণ।

কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানুষ তাহার জীবনের সার্থকতা কোথায়, তাহার জাগরণ কি? তাহারও জাগরণ জীবনের মহা সংগ্রামের মধ্যে। যখন তাহার হৃদয়ের জড়তা দূর হইয়া যায় তখনই তাহার জাগরণ, তাহার শক্তির উন্মেষ। এক কথায়, ভীষণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে বুক পাতিয়া দিয়া সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে নিজ-শক্তির গরিমা প্রকাশ করাই প্রকৃত জীবন ও জাগরণ।

যেখানে সংগ্রাম নাই সেখানে জীবন নাই, যেখানে জড়তা সেখানেই প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু। যেখানে আত্মার জয় শক্তির জয়, সেইখানেই প্রকৃত জয়। যে জীবনে বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, সে জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায়? তাহার মূল্য কি? জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যব্রতের অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে, যিনি শোকে তাপে, দুঃখে বেদনায় প্রকৃত বীরের মত জয়ী হইয়া, প্রফুল্লচিত্তে, হাসিমুখে আপন গন্তব্য স্থানের দিকে চলিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ—প্রকৃত বীর এবং প্রকৃত পণ্ডিত।

যিনি বুঝিয়াছেন যে আমি মানুষ, আমি বিশ্ববিধাতার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, কঠোর জীবন-সংগ্রামে বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া শোকতাপ, অভাব ও অবসাদ দূরে সরাইয়া দিয়া আমার জীবনের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইব, তাঁহারই দেওয়া নিভৃত শক্তির উন্মেষসাধন করিব, তিনিই পণ্ডিত—তিনিই জয়ী। তিনিই পরিণামে শান্তি ও সুখের অধিকারী।

জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত কার্লাইল দারিদ্র্যময়, দুঃখময়, কঠোরতাময় জীবন যাপন করিয়াও ক্ষণিকের জন্যও কোন অবসাদ মনে স্থান দিতেন না। কোনও বিঘ্ন তাঁহাকে

পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণেও অবিচলিত থাকিয়া কহিয়াছেন—

"I am a stubborn dog, no misfortune shall ever break my heart or bend it either." আমি একটা জেদী কুকুর, কোনও দৈবদুর্বিপাক আমার মনকে ভাঙ্গিতে পারিবে না। ভাঙ্গাত দূরের কথা নোয়াইতেও পারিবে না। ইহারই নাম শক্তির জয়।

আমি জীবন্মৃত হইয়া থাকিব না ইহাই আমার আত্মার ঘোষণা। আমার লক্ষ্য স্থির করিয়া সেখানে আমাকে পৌঁছিতেই হইবে। বিপদের তরঙ্গ একটার পর একটা আসুক, ভৈরবরবে আমাকে আঘাত করুক, আমি বুক পাতিয়া দিব, আমার ঐশী শক্তি আমি প্রয়োগ করিব। ঝঞ্ঝাবাতের আক্রমণ আসুক, প্রলয় ঘটুক, নিখিল বিশ্বে সকল লয় পাইয়া যাক, আমি আমার আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব কিছুতেই নষ্ট করিব না, আমি আত্মাবমাননা সহ্য করিতে পারিব না।

দেশের কথায় আমার আমিত্বের কি আসে যায়? আমি কেন তাহাতে কর্ণপাত করিব? আমি কেন আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইব?

"Let the sages blame or let them praise let the goddess of fortune come, let her go wherever she likes, let death come to-day or let it come in hundreds of years, he is the steady man, who does not move an inch from the way of truth." সাধারণ লোকত দূরের কথা, মহাজনগণ পর্য্যন্ত প্রশংসা করুন বা নিন্দা করুন, শ্রী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু আজই ঘটুক বা শতবর্ষ পরেই ঘটুক—এই সকল উপেক্ষা করিয়া যিনি সত্য পথ হইতে একচুলও বিচলিত হন না তিনিই ধীরস্থির এবং বীর, তিনিই তাঁহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারেন। আমার জীবনের যাহা লক্ষ্য তাহা সত্য। আমি যে পথ ধরিয়া, উঠিয়া পড়িয়া লক্ষ্যের অনুসন্ধানে ছুটিব সেটা আমার সত্যের পথ।

করুণাময় জগৎস্রষ্টার অমূল্যদানের অবমাননা করিয়া আমি আত্মাকে শক্তি হীন করিয়া তুলিব না ইহাই আমার শিক্ষা, ইহা আমার পাণ্ডিত্য। আমি চাই শক্তি, আমি চাই আত্মার জয়, আমি চাই তাঁহারি দেওয়া প্রাণে যে কোনও দান সাদরে, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে। আমি চাই জীবনের শত শত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, আমি চাই আত্মার পরীক্ষা।

জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। পরীক্ষায় জড়তা, আবিলতা, নীচতা দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হয়—সেখানে মরুভূমির সুতপ্ত বালুকণা, আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আর তাহার ভৈরব গর্জ্জন। এই সমুদয় উত্তীর্ণ হইয়া বীরের মত আমাকে স্থির থাকিতে হইবে, তবে আমি উত্তীর্ণ, তবে আমি মানুষ। ভগবৎ প্রদত্ত মহাশক্তির আধার আমি, তিনি আমাতে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। আমার ভয় কি? যে সুখের আশায় আমি ছুটাছুটি করিতেছি সে সুখ কোথায়?—সে সুখ কেবল জীবনব্যাপী মহাসংগ্রামের মধ্যে।

এই কঠোর সংগ্রামে জয়—তবে আত্মার শক্তিলাভ। আত্মার শক্তিই প্রকৃত শান্তিদান করে। জীবন কঠোরতাময়, কর্ত্তব্যব্রত-পূর্ণ। জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে শিক্ষা তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। এ পরীক্ষার শিক্ষয়িত্রী এই প্রকৃতি, আর ছাত্র মন। প্রকৃতি অনবরত আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এই অযাচিত শিক্ষালাভ করিয়া যিনি প্রাণটীকে গড়িয়া তুলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ছাত্র, প্রকৃত মানুষ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্যাপি ভবন্তি মূর্খাঃ
যস্তু ক্রিয়াবান্ পুরুষঃ স বিদ্বান্॥"

কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিলেই পণ্ডিত হয় না। যিনি কর্ম্মী তিনিই বিদ্বান্। যিনি আত্মার বলে বলীয়ান তিনিই পণ্ডিত, তিনিই যথার্থ উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন মানব যখন বলীয়ান হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে আর তাহার শক্তির অপচয় করিতে পারে না। তখনই তাহার জীবনের ভিত্তি দৃঢ়—তখনই সে ধ্রুবতারার মত স্থির, পাহাড়ের মত অচল অটল। কোনও ঝঞ্ঝাবাত তাহাকে আর বিচলিত করিতে পারে না।

আমার জীবনের শিক্ষা হউক, আমার শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতির ঘোষণা। আমি মানুষ আমি কেন আমার শক্তির জয় ঘোষণা করিব না? আমার শিক্ষা হউক ঐ সরোবর মধ্যস্থিতা, রমণীয়া পদ্মলতার বায়ুর মৃদুহিল্লোলের সহিত আজীবন সংগ্রাম, আমার আদর্শ হউক তরঙ্গময়ী, শব্দময়ী, স্রোতস্বিনীর অপ্রতিহত বেগ, আর ঐ তাল বৃক্ষের ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন, এবং আমার প্রাণ হউক ঐ অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জসমন্বিত নীলাকাশের বিপুলতা ও উদারতা।

বিপদের করাল ঢেউগুলি এক একটী করিয়া আসুক বাত্যার প্রচণ্ডতায় সকল চুরমার হইয়া যাক—আমি অচল অটল থাকিব, আমি এজন্য অশান্তির ছায়া প্রাণে স্থান দিব না। আমি নুইব না, বরং ভাঙ্গিয়া যাইব—ইহাই আমার আত্মার ঘোষণা॥

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়।

সান্ত্বনা

কে বলেছে কানাই আমার নাইকো বৃন্দাবনে
সকল কাজে কানু আমার জাগ্‌ছে সবার মনে
আজো তমালকুঞ্জ তলে ঝুলনের সে দোল্‌না দোলে
আজো শ্যামল দুর্ব্বাদলে তাহার চরণ রেখা
রাঙা করি বিশ্ব হিয়া এই রয়েছে আঁকা,
তাহার স্মৃতি তাহার হাসি; আজো প্রাণে বাজিয়ে বাঁশী
ফুটায় বনে কুসুমরাশি; যমুনা উজান চলে;
দুকুল তাহার ছাপিয়ে পড়ে সবার নয়ন জলে,
আজো তাহার নূপুরধ্বনি মেঘের রাতে চম্‌কে শুনি,
সজাগ হয়ে প্রহর শুনি নবীন চেতনায়,
পরাণ আমার জেগে থাকে দরুণ বরষায়,
সুনীল ঘন আকাশ তলে কানুর কালো বরণ জ্বলে
তাহার গলার মালা দোলে অশোক শাখে শাখে
মাথার মোহন চূড়া নাচে ময়ূর দলের পাখে,
আকুল সারা হৃদয় ঘিরে কানাই আমার নৃত্যাকরে
আমারি এই বক্ষ জুড়ে রোচে শ্যামল ছায়া
বৃন্দাবনে কালার আমার নাইক রইল কায়া।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

হাবড়া সাহিত্য-সম্মেলনে

স্যর আশুতোষের অভিভাষণ।

শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন ইউনিভারসিটি। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে সবে ৫।৬টি ইউনিভারসিটী আছে মাত্র। কিন্তু সে দিন আর দূরে নহে, মনে হয়, যখন ভারতের এক এক প্রদেশে একাধিক ইউনিভারসিটি দেখিতে পাইব। যখন ইউনিভারসিটি ছাড়া দেশে আর অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই, বা থাকিলেও তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, তখন, যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদলবদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ ইউনিভারসিটির মধ্যদিয়াই করিতে হইবে। অন্যথা, একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত ব্যবস্থা থাকিতে, এখন আবার নূতন করিয়া আর একটা পথ খুলিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা, যতদূর সম্ভব, ঐ ইউনিভারসিটির আনুকূল্যেই করিতে হইবে। চাই আমরা কাজ,—যে ভাবে, যত সহজে সেই কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে। সংজ্ঞা লইয়া বিতণ্ডা করিলে চলিবে না, সংস্থিত পদার্থ প্রাপ্তির প্রতি সাবধান থাকিতে হইবে। নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই। ভগবানের নাম করিয়া, দেশ মাতৃকার চরণ স্মরণ করিয়া বঙ্গভারতীর পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব,—মায়ের ছেলে আমরা—"মা মা" রবে অগ্রসর হইব, সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। সভ্য মহোদয়গণ, আজ আমরা সকলেই এক সঙ্কল্পে, এবং উদ্দেশ্যে এই পবিত্র সারস্বত-সম্মিলনে সমবেত হইয়াছি,—আজ গৈরিকস্রাবের ন্যায়, আমার হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ আপনাদের সম্মুখে ছুটিতে চাহিতেছে,—আত্মগোপন করিতে আমি জানি না, কোন দিন করিও নাই। বিশেষতঃ আজ,—এমন পবিত্র দিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে মনের কবাট খুলিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছে, যে,—ঐ দেখুন, আমার হৃদয়ে আমি ভারতের কি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। এক ভাষা, এক ধ্যান, এক জ্ঞানে একতাবদ্ধ হইয়া এক পরিবারের মত, ভারতবাসীরা, হিন্দুমুসলমান, পার্শিখ্রীষ্টান—সকলে, সর্ব্ববিধ মনোমালিন্য ভুলিয়া, জাতিভেদ ভুলিয়া, বীণাপাণির মন্দিরে সমবেত হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মায়ের পদে,

"সকলবিভবসিদ্ধৌ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ"

বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিতেছে। বাঙ্গালার

"যদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী"

সঙ্গীত, আমি যেন শুনিতে পাইতেছি,—ঐ শুনুন—ভারতের অপর প্রান্তে,—সুদূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—বাঙ্গালার শ্যামার ভৈরবস্বপূর্ণ সঙ্গীত,—ঐ যেন রামেশ্বরের সিন্ধুতীরে মূর্চ্ছিত হইতেছে। আবার ঐ শুনুন,—মহারাষ্ট্রের মধুর গীতলহরী বাঙ্গালাভাষার মধ্যদিয়া আসিয়া, বঙ্গের প্রতিপল্লী মাতাইয়া তুলিতেছে। আমি যেন দেখিতে পাইতেছি,—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের মধ্যে—স্বস্ব দেশের ভাষার যে ব্যবধান বা প্রাচীর ছিল, যাহার জন্য,—বাঙ্গালী—কৃষক—বা পল্লীবাসী, উৎকলের বা দ্রাবিড়ের পল্লী-সঙ্গীত বুঝিতে পারিত না, পরস্পরের ভাবের বিনিময়, সুতরাং প্রাণের বিনিময় করিতে পারিত না,—তাহা, সেই ব্যবধান-প্রাচীর যেন ধূলিসাৎ হইয়াছে। এখন আর "পর পর" ভাব নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে গুর্জ্জরের কণ্ঠ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব্ব, স্বপ্নময় সঙ্গীতের প্রস্রবণ ছুটাইতেছে। আমি অনেক দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি। এখন প্রস্তাবের অনুসরণ করি,—বলিতেছিলাম,—আমরা চেষ্টা করিব, ভারতে যে ক'টী ইউনিভারসিটি আছে, তাহার সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি না। আমি এবিষয়ে খুব আশ্বস্ত। ভারতবাসীর একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও আত্মসমর্পণের কথা যখন মনে করি, তখন আমি

বিশ্বাস করিতে পারি না, যে, ভারতবাসীরা কোন কাজে অসমর্থ, তা' সে কাজ যতই দুষ্কর বা আয়াসসাধ্য হউক না কেন। পারাঞ্জপে, গোখ্‌লে, রাণাডে, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, প্রফুল্ল, জগদীশ, রাসবিহারী, বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতির দিকে যখন তাকাই, তখন আশায় আমি উৎফুল্ল হই। এপর্য্যন্ত এমন কোনও কাজ ত দেখিলাম না, যাহা কঠোর বা অসাধ্য বলিয়া ভারতবাসী ছাড়িয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের নিরাশ বা ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। কাজ করিতে আসিয়াছি, করিয়া যাইব। সঙ্কল্পে যদি দোষ না থাকে, মনে যদি কলঙ্ক না থাকে, শত সহস্র মত্ত ঐরাবতেও আমাদিগকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। মানুষ ত কোন্ ছার! এ সংসারে কেহ কাহাকেও কিছু করিয়া দেয় না, প্রকৃতপক্ষে দিতে পারে না। "Friends and patron cannot do, what man himself should do"—কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"—সত্য কথা। শুধু দৈহিক বল নহে, দৈহিক বলে সামর্থ্য অতি অল্প,—মানসিক বল চাই। মনের বলে বলীয়ান হও, দেখিবে, বিশ্ব তোমার সম্মুখে অবনত।. একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াও, দেখিবে জগৎ তোমার বশংবদ। কৈ—বনের পশু. সিংহকে ত কেহ রাজপদে অভিষিক্ত করে না, সে কিন্তু নিজের মনের বিক্রমে সমগ্র পশুজাতির উপর রাজত্ব করিয়া থাকে।—

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে।
বিক্রমৈর্জিতসত্ত্বস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা॥
একোঽহং অসহায়োঽহং ক্ষীণোঽহমপরিচ্ছদঃ।
স্বপ্নেঽপ্যেবং বিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে॥

সুতরাং—

"কিসের দৈন্য, কিসের দুঃখ, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ ?"—

একবার ঐক্যবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও,—দিগ্‌দর্শনযন্ত্রের ন্যায় এক দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্রতানুষ্ঠান কর,—সাফল্য নিশ্চিত। এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া,—যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত আমি কত-কি না—ভাবিতেছি! আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না,—কেন না,—যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাবগত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার একইখাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি-চর্চা আপাততঃ উত্তেজিকা হইলেও পরিণতিতে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি,—শিক্ষার কথা। দীক্ষার কথা। ভাবগত একতার' কথা। স্বস্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে, তাহা বজায় রাখিয়া, ভারতে—এক ভাব, এক চিন্তা, এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, কি করিয়া সমগ্রভারতে এক জাতীয়-সাহিত্যের নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালীই থাকিবে, পাঞ্জাবী পাঞ্জাবীই থাকিবে, অথচ তাহারা পরস্পরে পরস্পরের যাহা কিছু উত্তম, নিষ্পাপ, নির্ম্মল, মনোহর, তাহা নিজের নিজের ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়া, ক্রমে, ধীরে ধীরে এক হইতে শিখিবে, ইহাই আমার বক্তব্য। তাই বলিতেছিলাম—. আমাদিগকে, নিপুণভাবে দেখিতে হইবে যে, কি উপায়ে এই ভাবগত, জাতীয় সাহিত্যগত একতার সমাধান করিতে পারি। যদি এই মহৎ কার্য্যের,—এই দুঃসাধ্য কার্য্যের সু-সম্পাদনের কোনো উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমরা এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি,—যাহাতে বিদ্যার্থীরা, প্রথমতঃ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভের পর, ভারতীয় কতিপয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইবে, বাঙ্গালী,—বি, এ, এম, এ, উপাধিমণ্ডিত যুবক, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া, বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে আরও দুই একটা ভারতীয় ভাষা, হিন্দি বা মারাট্টি, উর্দ্দু বা তৈলঙ্গী ভাষা শিক্ষা করিবে, তাহা হইলে, ক্রমে, শিক্ষা-সমাপ্তির পর,—ঐ ঐ যুবক, পরকীয় ভাষায় অর্থাৎ ঐ হিন্দি বা মারাট্টি ভাষার সম্পদ্‌-সৌষ্ঠব ক্রমে বঙ্গভাষায় বিবর্ত্তিত ও বঙ্গভাষার সম্পদ্‌ বর্দ্ধিত করিতে পারিবে। যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় মহারাষ্ট্র উন্মত্ত, যে কবিতায় বা যে লেখার উন্মাদনায় হিন্দুস্থান আপনার ভাবে আজও আপনি নৃত্য করে, সেই উন্মাদনা বঙ্গভাষার শিরায় শিরায়

বহাইতে পারিবে। বঙ্গের ধোয়ী, উমাপতি, জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধন আর বাঙ্গালা ভাষাতেই "অন্তরীণ" থাকিবেন না, ভারতের বিভিন্ন দেশের ভাষাতেও তাঁহাদের মধুর বংশীরব শ্রুত হইবে। শুধু এক প্রদেশের একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই রীতির প্রবর্ত্তন করিলে চলিবে না। ক্রমে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ভাবে দেশীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোম্বাই-মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব-এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, নতুবা, মাত্র বঙ্গে করিলে এই পারস্পরিক "রেসিপ্রোকাল" ফলের সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি এই ভাবে সকল ইউনিভারসিটিতে দেশীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়,—তবে প্রতিবর্ষে, আমরা এমন ২।৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি পাইব, যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা ছাড়া, ভারতের অপর ২।৪টী ভাষাতেও সুপণ্ডিত। এইরূপে কিছুকাল পরে, ২০।২৫ কি জোর পঞ্চাশ বৎসর পরে, আজ যেমন ইংরাজীতে বি, এ, এম, এর অনেক লোক পাইতেছি, সেই প্রকার, স্বীয় মাতৃভাষা ত আছেই, তাহা ছাড়া, দেশীয় অপরাপর ভাষাতেও সুপণ্ডিত লোকের অভাব থাকিবে না। ফলে দাঁড়াইবে এই,—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-দীক্ষা মতি-গতি, সমস্ত, ক্রমে এক হইতে আরম্ভ করিবে। একদেশের যে সাহিত্য উত্তম, একদেশের যে কবিতা উত্তম, একদেশের যে লেখায় দেশবাসী ধন্য, তাহা অন্য দেশের ভাষায়, ঢুকিয়া পড়িবে। সুগম সরল পথ প্রস্তুত করিতেই যত পরিশ্রম, একবার পথ প্রস্তুত হইলে, যদি সে পথে আপদ বিপদ না থাকে, তবে চলাচল করার লোকের অভাব কোন দিনই হয় না। এখন ভারতবর্ষে এইভাবে জাতীয় শিক্ষার কোন বিশিষ্ট পথ নাই। যাহা আছে, তাহা সমস্তই লুপ লাইনের মত। এখন আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে কর্ড, ক্রমে গ্রাণ্ডকর্ড ও পরে, গ্রেট্-গ্রাণ্ড কর্ড নির্ম্মাণ করিতে হইবে। জানি, এ পথ তৈয়ারী করিতে অনেক ডাইনামাইটের প্রয়োজন, অনেক উত্তুঙ্গ পাহাড় উড়াইয়া দিতে হইবে, অনেক "টনেল" নির্ম্মাণ করিতে হইবে, বড়ই আয়াসসাধ্য। কিন্তু তা' বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? তপস্যায় কি না হয়? অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ যে দেশের সাহিত্যের চিত্র, প্রহ্লাদের সমক্ষে, স্ফটিক স্তম্ভে নরসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব যে দেশের চিত্র, মৎস্যচক্রভেদ যে দেশের চিত্র, সে দেশে অসাধ্য কি? সে দেশে অবসাদ কিসের? প্রারম্ভের যত হিসাব-নিকাশ, যত ইতস্ততঃ, একবার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, যদি মনের বল থাকে, তবে, ষ্টিমরোলের মত সমস্ত উচ্চনীচ সমান করিয়া চলিয়া যাওয়া বেশী কথা নহে। তোমার পিতৃ-পিতামহের নিত্য-জপের মন্ত্র একবার স্মরণ কর—

"একো বলবান্ শতং বিজ্ঞানবতামাকম্পয়তে,
বলেন বৈ পৃথিবী স্থিতা, বলং বাবতিষ্ঠস্ব।"

এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এত দিন পরে, ভারতীয় ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা এই এম,এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইবেন, তাঁহাদিগকে প্রধানতঃ একটি মূলভাষা ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্নপ্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। অর্থাৎ যিনি প্রধানতঃ বাঙ্গালা ভাষা লইবেন, তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি ও মারাট্টি বা তেলগু ও গুজরাটি লইতে হইবে,—এইরূপ যিনি মারাট্টি-ভাষা লইবেন, তাঁহাকে তৎসহকৃত আর একটি ভাষা লইতে হইবে।—যদি যথার্থ অধ্যবসায়শীল উদ্যম-সম্পন্ন কর্ম্মঠ যুবক পাওয়া যায়, অন্ততঃ বৎসরে একটিও মিলে, তবে দশবছর পরে বাঙ্গালায় এমন দশজন শিক্ষিত ব্যক্তিও পাইব, যাঁহারা অবাধে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় যে সমস্ত অনর্ঘ্য রত্ন আছে, তাহা আনিয়া প্রতিভার সাহায্যে, বঙ্গভাষা খচিত করিতে পারিবেন। বাঙ্গালার সম্পদ অনেক বাড়িয়া যাইবে। এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য ইউনিভারসিটিতেও দেশীয় ভাষায় এম, এ, র ব্যবস্থা হয়, তবে বাঙ্গালার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে। ফলে—সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাষাগত ভাবগত একতার—সাড়া পড়িবে। পরস্পরের আদান প্রদানের সুবিধা হইবে। অদূর ভবিষ্যতে, যাহারা ইংরাজী জানে না, ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, কিন্তু দেশীয় ভাষা জানে—তাহারাও ভিন্ন দেশের—মনোহর ভাব—সম্পদ

উপভোগ করিতে পারিবে। জনসাধারণের মধ্যে একটা ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হইবে। তখন আর দ্রাবিড়বাসীকে, ইংরাজীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হইবে না। নিজের নিজের মাতৃভাষায় অপর প্রদেশের কবিত্বসৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহারা কৃতার্থ হইবে।

অবশ্য আমার এই মতই যে অবিসংবাদী, ভ্রম প্রমাদ-শূন্য, তাহা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে এইরূপই একটা প্রণালীতে প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে। আমি জানি—আমার এই প্রস্তাব কর্কশ সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিবে না, আমি জানি, এই প্রস্তাবের উপর নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনা উঠিতে পারে—আবার সেই সঙ্গে আমি ইহাও জানি, যে, কে কি বলিবে, ভাবিয়া কোন কাজ করিতে গেলে—আর কাজ করা হয় না।—

"সুদুর্লভা সর্ব্ব-মনোরমা গিরঃ"

এই কবি-বাক্য আমি বিস্মৃত হই নাই। আমার জীবনের চিরদিনের "মটো"—

"ধিয়াঅনন্তাবদচারু নাচরম্
জনস্তু যদ্বেদ স তদ্বদিষ্যতি।"

আমাকে সর্ব্বদাই সবল করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। যদি কোন মনস্বী এই প্রস্তাবের উৎকর্ষবিধানের অনুকূল কোন প্রস্তাব করেন, সাদরে গ্রহণ করিব। নূতন পথে অনেক আবর্জ্জনা থাকিয়া যায়, অনেক কণ্টক—প্রথম প্রথম চোখ এড়াইয়া যায়, ক্রমে চলাচল করিতে করিতে তাহার উদ্ধার হয়। সুতরাং সাঁতার না শিখিয়া সাঁতরাইব না,—এই বুদ্ধি ভাল নহে। ওপারের ঐ সুন্দর বনে যাইতে হইলে, বাহুতে ভর করিয়া সাঁতার শিখিতে হইবে। দু'চারবার হয়ত, হাবুডুবু খাইবে, তাহাতে নিরাশ হইও না,—ভরসায় বুক বাঁধিয়া সাঁতরাইয়া যাও, পারে পৌঁছিতে পারিবে, তখন তোমার সকল ক্লান্তি দূর হইবে। শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ অঞ্চলে তুমি আনন্দে ঘুমাইয়া পড়িবে।

এস্থলে একটা তর্কের মীমাংসা আবশ্যক মনে করিয়াছি, তাহা এই,—এদেশে আজকাল ইংরাজীর ভূয়ঃ প্রচার হইয়াছে। জ্ঞানের জন্যই হউক, আর উদরের জন্যই হউক, অথবা আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই হউক,—সকলেই অল্পবিস্তর ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। এরূপক্ষেত্রে আবার নূতন করিয়া এই ভারতীয় ভাষার প্রচলনের প্রয়াস কেন? যে কার্য্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস, সেই কার্য্য বা সেই উদ্দেশ্য ত অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইংরাজীতেই হইতে পারে, তবে এ শিরোবেষ্টন-পূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ কেন? ইহার উত্তরে, আমার মাত্র দুইটী কথা বলিবার আছে।

১মটী—জাতীয় ভাব বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় ভাষার সেবা আবশ্যক। বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গঠনের চেষ্টা করা বাতুলতার কার্য্য। দশভুজার পাদপদ্মে রক্ত জবার অর্ঘ্যই মানায়, গোলাপ শত সুন্দর হইলেও মাতৃপদের অযোগ্য। ইহার অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না।

২য় কথা—ইংরাজী ভাষা আমাদের অর্থকরী হইলেও, ভারতের অধিকাংশ লোক,—ইতর-সাধারণ তাহা জানে না, বা এখনও জানিবার জন্য তাহাদের প্রাণে তেমন আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় না। সুতরাং ইংরাজীর সাহায্যে তাহাদিগকে বুঝাইতে প্রয়াস করা বৃথা। যদি তেলেগু ভাষায় বা উৎকলীয় ভাষায় বাঙ্গালার রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের ভাব-সম্পদ্ ফুটাইতে পারা যায়, তবে তাহাতে, ইংরাজীতে যতটা ফল-লাভের আশা করা যায়, তদপেক্ষা লক্ষগুণ ফল যে অধিক হইবে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ ইংরাজীতে তরজমা করিয়া আমরা কয় জনে পড়িয়া থাকি বা পড়িয়া প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে পারি? তাই আমার মনে হয়,—জাতীয় ভাব ফুটাইতে হইলে, সকলকে এক—অদ্বিতীয় জাতীয়তার সূত্রে গাঁথিতে হইলে, জাতীয়-সাহিত্যে একতাবন্ধনের চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির ভাবের আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা স্ব স্ব জাতীয়-সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে। উচ্চ-শিক্ষিত হইতে নিরক্ষর কৃষককুল পর্য্যন্ত এক ঊর্ণনাভের আনায়ে বেড়িয়া ফেলিতে হইবে। অন্যথা একীভাব অসম্ভব। এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে, এখন যে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য-রাজ্য আছে,

তাহা এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত হইবে। সমস্ত ভেদ মিটায়া গিয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখময় স্বপ্নময় সঙ্ঘের গঠন হইবে। তবে, এই মহৎ কার্য্যে মহা ত্যাগ চাই। বড় জিনিষ পাইতে হইলে, খুব বড় রকমের ত্যাগ আবশ্যক। যদি আমাদের সেই ত্যাগের সময় আসিয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, সে দিন আর দূরে নহে,—যখন ভারতের এক প্রান্তের একটি সঙ্গীতে অপর প্রান্তের প্রতিপল্লী সাড়া দিবে। আহা, সে অবস্থার কল্পনাতেও আমার কত না সুখ, কত না আনন্দ!!

অবশ্য যে প্রণালীতে আমি ভারতীয় ভাষার আলোচনা করিতে বলিলাম, তাহাতে ঠিক ভাষাগত একত্ব সংঘটিত হইবে না বটে, কিন্তু ভাবগত একত্ব সাধিত হইবে। ক্রমে সমগ্র ভারতে একই ভাবের বন্যা বহিবে! যদি একবার সেই ভারত-প্লাবনী বন্যার আবির্ভাব হয়, তবে তখন, সকল অবসাদ, সকল অভাব ঘুচিয়া যাইবে। পরস্পরের সুখদুঃখের অংশীদারের অভাব থাকিবে না। একের কান্নায় অপরে কাঁদিবে, একের অভ্যুদয়ে অপরে আনন্দিত হইবে। Unification of Language না হউক, unification of thougts নিশ্চয় জন্মিবে। সুতরাং সমগ্র ভারতের সকল ক্ষেত্রে, সকল পল্লীতে এক স্রোত প্রবাহিত হইবে। মরুভূমিও তখন সরস হইয়া উঠিবে; ইহা আমার স্বপ্ন নহে।

কেহ কেহ বলেন,—সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেননা—ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দিভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এ মতের সমর্থন করিতে পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্য কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্ব্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরেজীভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন,—প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ ক্রমে তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া, অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে,—সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ তাহার নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে। যে মধুরতার জন্য, যে প্রসাদগুণের জন্য, যে মনোহারিতার জন্য—বাঙ্গালাভাষা এত স্পর্দ্ধার বস্তু, তাহা ক্রমে সিকতারাশিতে বারিবিন্দুর ন্যায় কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইবে। অন্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এই একই কথা। সুতরাং, আমার মতে, যে প্রদেশে যে ভাষা চিরদিন প্রচলিত, তথায় তাহা সেইরূপই থাকুক,—সেই ভাষায় সেই প্রদেশের জাতীয় সাহিত্য ক্রমে বর্দ্ধিত হউক,—শ্রীসম্পন্ন হউক। সে পক্ষে কোন বাধার প্রয়োজন নাই। কেননা, যে জাতির জাতীয় সাহিত্য নাই তাহারা বড়ই দুর্ভাগ্য, জগতে তাহাদের স্থান অতি অল্প, কালের অক্ষয়শিলাফলকে তাহাদের কথা খোদিত থাকে না, তাহারা প্রাতঃকুজ্মটিকার ন্যায়, অচিরকালমধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। সুতারং তাহাদের জাতীয় ভাষার বিলোপ না ঘটাইয়া—অন্য প্রদেশবাসীদিগকেও সেই ভাষা শিখিবার পথ সুগম করিয়া দেওয়া হোক্। প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রাহ্য, তাহা স্ব স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছুকাল পরে,—ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটা ভাবের একতা, চিন্তার একতা, ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও এক ভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে, সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে। ভারতের ভিন্ন প্রদেশের জাতীয় সাহিত্যের ধারা যাহাতে প্রতিহত হয়, দেশহিতৈষী কোন ব্যক্তিরই তাহা করা উচিত নহে।—আপনার ধর্ম্মে আপনিই যাহা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, তাহাকে ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি বাড়াইবার জন্য বিরূপ করা কোনমতেই যুক্তি সঙ্গত বা নীতি সঙ্গত নহে।—আমার বক্তব্য ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে;—আমার মনে এত ভাব আসিতেছে, কল্পনা আমাকে এত দূর-দূরান্তরের মনোহর দৃশ্য দেখাইতেছে যে, আমি আত্মসংযম বা আত্মগোপন করিতে পারিতেছি না, আর আমি আত্মগোপন করিতে শিখিও নাই। তথাপি, অদ্যকার এই সাহিত্যের 'মহা-সম্মিলনে' আমি আর আপনাদিগকে বিরক্ত করা সঙ্গত মনে করি না। আমি সাহিত্যসেবী নহি; বঙ্গসাহিত্যের সেবক বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবার আমি অধিকারীও নহি, তথাপি

ভালবাসিয়া আপনারা আমাকে যে অদ্যকার এই গৌরবের আসন প্রদান করিয়াছেন, সে জন্য আমার আন্তারিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

উপসংহারে বক্তব্য।—বঙ্গের সাহিত্যসেবিগণ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, দলাদলি, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া, আপনারা এক মনে, এক প্রাণে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হউন। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। এখনও মনে মন মিশাইয়া, প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া দুর্ব্বলকে স্নেহে তুলিয়া, সবলকে আপনার করিয়া লইয়া এক পথে, এক যোগে যাত্রা করুন,—মায়ের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময়ে, মনোমালিন্য রাখিতে নাই। ব্রতানুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিতে হয়, ইহা আপনাদেরই শাস্ত্রের আদেশ। বহিঃসংযম অনাবশ্যক, হৃদয়ের সংযম করিয়া বাগ্‌দেবতার মন্দিরের সম্মুখীন হউন,—এই আমার প্রার্থনা। মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বে কেবল হস্তপদাদি নহে, হৃদয়ও প্রক্ষালিত করুন,—এই বিংশশতাব্দীতে জগতের গতি যে দিকে, আপনাদিগকেও সেই দিকে যাইতে হইবে। কেন না,—আপনারা জগৎ ছাড়া নন্। যাহা আজ স্বেচ্ছায় করিতে অনিচ্ছুক, কাল বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হইবে। ভগবানের—

"কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্ মোহাত্
করিষ্যস্যবশোঽপি তত।"

বাক্য বিস্মৃত হইবেন না, আর সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিবেন—যে,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ, স জীবতি॥"

সভ্যগণ! ভারতবর্ষের, স্মরণাতীত কাল হইতে জগতে যে প্রাধান্য, বাহুবল তাহার কারণ নহে, জ্ঞানবল তাহার কারণ। দুঃখিনী ভারতভূমির সে শিক্ষা-দীক্ষা ক্রমে মন্দীভূত হইতেছে,—মার আমার অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এখনও রোগের প্রতিকারের সময় আছে, বদ্ধপরিকর হইয়া আবার ভারতভূমিকে—সেই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানললামে বিভূষিত করুন। ত্রিশ কোটী কণ্ঠে একবার তারস্বরে "মা" বলিয়া ডাকুন,—মা'র আসন টলিবে। মা মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তখন আবার নবীন উষার স্বর্ণচ্ছটায় ভারত রঞ্জিত হইবে। অজ্ঞান-অবিদ্যার অবসাদ কাটিয়া যাইবে। হৃদয়ে বল করিয়া স্মরণ করুন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" কিসের অবসাদ?—কিসের সংশয় কিসের সঙ্কোচ?

কবিরঙ্গভূমি এই না সে দেশ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেথানে,—যেথানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয়?
যেথানে সরসী-কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী।

ফিরে দাও

সখা তবে ফিরে দাও সেই দিন মোরে,
ছিল যবে দেহমন কান্তিপুষ্টি ময়,
ভাবিতাম বিশ্বঘেরা কুয়াসার ঘোরে
সোনার স্বপন দিন মোর মনে হয়,—
অযাচিত অফুরন্ত সঙ্গীতের ধারা
রঙসরংহশে ছুটিত আপন মনে
ভেদ করি গুপ্তসুপ্ত মরম ফোয়ারা
মিলাইত এক কিন্তু সপ্তসুর সনে ;
সখা ফিরে দাও মোরে সেই শুভক্ষণ,
যেদিন বলিত মোরে কুসুম কলিকা
মোর হ'তে অঘটন হবে সংঘটন
হৃদিকুঞ্জ মাঝে মোর গাহিত সারিকা,
আমার চয়ন তরে পূর্ণ উপত্যকা
রাশি রাশি হাসি হাসি গোলাপ বিকাশে
ভাবিতাম ফুল মাঝে বুঝি আমি একা
যাচি আমি সেই দিন তোমার সকাশে,
অবাস্তবে ভাঙ্গিতাম বাস্তব শিলায়,
গড়িতাম অবাস্তবে বাস্তব স্মরণে
ক্ষণে সম ক্ষণে বা অসম কাঞ্চন ধূলায়
চুমিতাম সমভাবে জীবন মরণে ;
যে দিন ছিল না কিছু সব ছিল মোর
অমৃতের সেই যুগ মদানন্দলস,
সত্যের পিপাসু কিন্তু মায়ায় বিভোর
উচ্ছৃঙ্খল রিপুদল সম্পূর্ণ সরস
সুখ দুঃখ হরি হরে যুগল মিলন,
আলোক আঁধার যবে ছিল একাকার
ছিল যবে এক ঘৃণা প্রেম উদ্দীপন,
সখা দাও ফিরে সে সুখের যৌবন আবার।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্যাল

"কবি"

"ভাব দেখে যেমন ভাবো,
কবি তেমন নয় গো।"

ভাবের মায়ায় হাত বুলাইয়া শব্দ বিন্যাস করিয়াই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়। বিশেষ কোনও 'কিছু'র মধ্যে তাঁহারা আছেন বলিয়া ঠিক করা খুব দুষ্কর। একটু আকাশ! একটু বাতাস! একটু আলো! এই তিন নিয়েই তাঁদের খেলা! এই তিন নিয়েই তাঁদের জীবন! এই তিন নিয়েই তাঁদের শান্তি! এই তিন নিয়েই তাঁদের সাফল্য, পরিসমাপ্তি। জীবনটাকে তাঁহারা যে মনরূপ দূরবীণ দিয়ে কত ছোট অথবা কত বড় করে দেখেন তা কেবল ঠিক তাঁ'রা ছাড়া আর কাহারও বোধগম্য হওয়ার উপায় আছে বলিয়া মনে হয়না। তাঁদের মন হলো খেয়া ঘাটের মাঝি! কেবল ভাবের বোঝাই নৌকা নিয়েই ব্যস্ত! কত রকম আসছে, কত রকম যাচ্ছে—কিছুই খেয়াল নাই, কেবল ঠিক যখন হৃদয় বীণার তন্ত্রীতে এক একটী বিশেষ ভাবের সুর বেজে ওঠে তখন তাঁ'রা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে সেটাকে প্রকাশ করেন। সামঞ্জস্য ও ভঙ্গিমার বৈচিত্রকে অবলম্বন করে এই প্রকাশ সার্থক হয়।

কবির লীলা-চাতুর্য্যের মধ্যেই কবিভাবের সার্থকতা—এই ভাব যখন উপযুক্ত ভাষার মধ্যে আপনাকে বিকাশ করে চলে তখন বাগ মানানো দায়—কিছুতেই আটক করা যায় না। কবি এই বিকাশ-শক্তিকে চরম পরিণতির জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে নিজের অস্তিত্বের বিষয় তখন বিমনা হইয়া আপনার ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বসেন।

মানুষের এটা একটা স্বভাব যে যখন সে আপনার মধ্যে আপনাকে আর কুলিয়ে উঠতে পারেনা; আপনাকে আর আপনার মধ্যে আটকে রাখতে পারেনা, তখন একটা আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হয়। তখন তাহার ভাল মন্দ, উপযুক্ত, অনুপযুক্ততার দিকে এক বারেই লক্ষ্য থাকে না তখন কাম্য বস্তুর গুণ-ধারণার প্রয়োজনীয়তাও ভুলিয়া যায়। সে তখন সবকেই কাম্য বলে ধরে নেয়। মনে হয় তখন বিশ্বের চারিদিকের সমগ্র প্রার্থিত, অপ্রাপ্য সবই বুঝি তার ন্যায্য পাওনার গণ্ডীর মধ্যে! আমাদের মত সাধারণ লোক তখন নির্ব্বাক-নিস্পন্দ, নিষ্কর্ম্ম হইয়া পড়ে! কারণ মন তখন নৈরাশ্য ও ব্যর্থতায় ভরে ওঠে, কিন্তু কবি তখন তাঁহার সমস্ত সামর্থ্যের দ্বারা, সমস্ত শক্তির দ্বারা, সমস্ত জীবনের দ্বারা নিজকে বিলিয়ে দেন সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়নিদানের পদতলে—

"তোমার বীণায় কত তা'র আছে
কতনা সুরে,
আমি তারি সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে।"

দেবতার উদ্দেশে ইহাই কবি প্রতিভার অর্ঘ দান।

"তারপর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে!
তোমার সুরেতে আমার পরাণ
জড়ায়ে র'বে!
তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি'।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিবগো ঢালি'!
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
দুলিবে সুখে!
মোর পরাণের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে!

—এইখানে কবি সাধারণ মানুষের conventionএর বহু উর্দ্ধে। বিশ্বানুভূতি ও দেব-প্রীতিতে তিনি অন্তরে অন্তরে বহুকে আশ্রয় করিয়া আছেন, নিজের বিশিষ্ট চরিত্র বলিয়া

কিছু নাই। তখন নির্ভরতার একটা উজ্জ্বল আলো আসিয়া তাঁর জীবনের পথকে আলোকিত করে—তাঁর দৈনন্দিন "একঘেয়ে" জীবনটা নূতন পথ ধরে আনন্দে চলতে থা'কে।' তাঁরা সাধারণ মনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভাব ধারণার বাইরে। ঠিক সেই সময়েই আমরা তাঁদের প্রতিভাকে পূজা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি; তখনই তাঁদের মধ্যে নিজের কিছু খুঁজে বাহির করিবার জন্য আকুল হই

কবি দেখেন এই পৃথিবীতেই প্রভাতে সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মির কিরণ ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে; শীত-ক্লিষ্ট-পৃথিবী কুয়াসার মধ্য দিয়া বহু আরাধনার সামগ্রীর প্রথম দেখা পায়; পথক্লান্ত পথিক বিশ্রামার্থ ছায়া ও শ্রান্তি নিবারনার্থ জলের সন্ধান পায়—পাখীর আত্ম-বিহ্বলতা সমীরণের মৃদুল বীজন, ফুলের সৌরভ, কুসুম-কলির মধু, ভ্রমরের গুঞ্জন সবই কবিকে নূতন করে আত্ম-বিস্মৃতি আনিয়া দেয়।

কেবল ভাব ও ভাষার প্রাচুর্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে যেমন কোনও একটা জিনিষকে ঠিক করে গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়, সত্যের উপর যে জিনিসটা গড়ে ওঠে সেইটাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন রাত্রির অবসান কেবল পাখীর ডাকেই সূচিত হয়—সেই রকম আমাদের জীবনও এক একটা অন্তর্নিহিত সত্যেরই একটা কিছুর জন্য সর্ব্বদাই তৃষিত নয়নে চেয়ে আছে! কবি সত্যকে প্রেয় ও শ্রেয় জ্ঞান করে সাধনা করেন বলে এইখানে তিনি অনেকটা ধরা দেন! কিন্তু তাঁহার কল্পনা রাজ্যে বিচরণই অধিক পরিমাণে!—"He roams in the rain-bow world and dreams the dream-land-beauty."—ঠিক এই কারণেই তাঁ'রা নিজকে অনেক সময়ে সামলে ফেলেন ঐ ভাবের মধ্যে!—'In the thoughts of the unseen and untold' সাধারণের কাছে যা হ'তে পারে না বলে বোধ হয় তাই নিয়েই তাঁদের খেলা, un-travelled land অনগম্য জগতের লীলার বিবরণ, "unseen" অদৃশ্য—অরূপকেই তাঁরা জীবনের সঙ্গীকরে নেন! যা হ'তে পারে না তার জন্যই মানুষের আগ্রহ বেশী হয় বটে, তা নিয়ে জীবনযাত্রা চলে না (কারণ আমরা পৃথিবীতে "সত্য" খুঁজে বেড়াই)। কল্পনা আর কাব্যের সহিত সত্যিকারের ঐ প্রভেদ। 'কাব্য' জিনিষটা বোঝার, বাস্তবতার মধ্যে সেটা বেশীর ভাগ ধরা নাও পড়তে পারে।

আমাদের সব চেয়ে বেশী ঠকাচ্ছে এই চোখ দুটো। এ কথা কবির কাছেও যেমন খাঁটি, বৈজ্ঞানিকের কাছেও ঠিক তেমনি। চোখদিয়ে দেখার চাইতেও একটা বড় রকমের দেখা আছে সে হচ্ছে, প্রাণ দিয়ে দেখা, তার বাড়া আর দেখা নাই। যা'কে প্রাণ দিয়ে দেখবার সুযোগ হয় নি, এটা স্থির যে তাকে দেখাই হয় নি! চোখকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়! চোখকে অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বাস করে একদিন হয়ত চোখের জলেই সে বিশ্বাসকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। বাইরের দেখা থেকে তাই কবিরা কাব্যের একদিকের খোরাক জোগাড় করে নিচ্ছেন কিন্তু—মন যোগাচ্ছে তাঁহাদের অন্য দিকের খোরাক এবং লূতাতন্তু জড়িয়ে বাস্তব জীবনের সহজ সরল পথকে অবরুদ্ধ করে না। বরং সেটা আপনা হ'তেই 'কাজে লেগে যায়। তাঁর সম্পদ তাই সত্যের নিক্তিতে ওজন হয়ে যায় কবি কাব্যের মধ্যে থেকেও নেই 'Can we find man-Shakespeare in his plays" এই নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়ে গিয়েছে। মানুষ-জীবনকে অনেক জিনিসে ধরা যায় কিন্তু মানুষের অসাধারনত্ব যেখানে কবি-প্রতিভার সঙ্গে এক হয় শুধু একখানা রঙ্গিণ ওড়না বুনে চলেছে সেখানে—

"কাব্য দেখে যেমনভাবো, কবি তেমন নয় গো।"

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

অবরুদ্ধ

ওগো, আমার ঘরের সকল দুয়ার
বন্ধ করিল কে,
আমি অন্ধকারের অন্ধ হইয়া
পড়িয়া রহিনু যে!

আমার জীবনে নিশি দিনমান মিছে,
বিকট দৈত্য ফিরিছে আমার পিছে;
আঁধারের জীব ডাকিয়া দেখায় ভয়,
পাতাল পুরীতে পড়ে আছি মনে হয়;

—পড়ে আছি যেন মরে আছি হেথা
অবশ অঙ্গ মোর,
জেগে থাকা যেন রজনী শেষের
মিথ্যা স্বপ্ন ঘোর,

আপনার কথা পশে না আপন কানে
হৃদয়ের শ্বাস কি ব্যথা হৃদয়ে হানে,
নিজেরে হারায়ে মনে মনে ভাবি তাই
তবে বুঝি আর এজগতে আমি নাই!

আলোকের প্রাণী বাহির হইতে
আমারে ডাকিয়া কয়,—
"এমন প্রভাতে অলস-শয়নে
ঘরে থাকা ভাল নয়!"

—আমি ভাবি চোখে যদি না দেখিনু আলো
তা'র চেয়ে ওগো মরণই আমার ভালো !
দুয়ার হইতে আলোক ফিরিয়া যায়
দুরবল প্রাণ শুধু করে হায় হায় !

বাহির হইতে কে ডাকিয়া বলে,
"খুলে দাও আজ দ্বার
আঙিনায় তব পুলকের মেলা
দেখ দেখ একবার।"

"তোমারে বরিতে উঠিয়াছে কত গান,
বিশ্ব তোমারে করিবে হৃদয় দান !"
শঙ্কিত প্রাণে যদি বা বসিনু উঠি
কম্পিত দেহে আবার পড়িনু লুটি !

ঘরের আগল খুঁজিয়া মিলে না
পাগল হইনু যে,
বন্ধ কোথায় ঘুচায়ে সন্ধ
আমারে দেখাবে কে ?

ওইত সেথায় ভাঙা-দেয়ালের ফাঁকে
আলোর ইসারা আমারেই যেন ডাকে ;
রুদ্ধ-দুয়ার এইত খুলিয়া গেল
আঁধারে ভাসায়ে আলোকের বান এল !

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

যুগধর্ম্ম ও হিন্দু-সভ্যতা

প্রতীচ্য রঙ্গমঞ্চে যে ভীষণ নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে—তাহার ফলে বেলজিয়ম আজ বিধ্বস্ত, রাশিয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন, জার্ম্মাণি পর্য্যুদস্ত। আজ কত প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিচিহ্ন লুপ্ত হইয়াছে; শস্যশ্যামলা ভূমি মরুভূমিতে পরিণত, সৌধমালাশোভিত কোলাহলময়ী নগরী জনহীন শ্মশানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তপ্ত উষ্ণশ্বাস এখনও থামে নাই। অন্তর্বিদ্রোহে, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে সারা য়ুরোপ আজ বিচলিত, সন্ত্রস্ত। আমরা সে যজ্ঞভূমির দূরে দাঁড়াইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি—পাশ্চাত্য সভ্যতার শেষ গতি কোনখানে! যে সভ্যতাকে আদর্শ স্থানে আমরা নিশ্চিন্ত মনে অনুসরণ করিতেছিলাম তাহার পরিণাম কি ভীষণ! বাণী ও কমলার সাধনা করিয়া বিগত কয়েক শতাব্দীতে য়ুরোপ শিল্পসৌন্দর্য্যসভ্যতার যে রত্নরাজি আহরণ করিতেছিল, আজ সেখানে শ্মশানকালীর ভীমা রণচণ্ডী মূর্ত্তি—প্রেতদানবের অট্টহাস ও তাণ্ডবনৃত্য। নিজেদের এই পরিণাম দেখিয়া প্রতীচ্য মনীষিবর্গ আজ ভীত হইয়াছেন—প্রতিকারের উপায় বিধানে সচেষ্ট হইয়াছেন। য়ুরোপের চিন্তারাজ্যে আজ যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমরা কি জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? কিছু দিন পূর্ব্বেও আমরা য়ুরোপের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতাম, আজ আমাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। এখন আমরা আর প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদের নিকট হাত পাতিয়া থাকিব না—আমরা নিজে বিচার করিতে শিখিয়াছি। আজ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে,—"নিজের জিনিষ আমাদের কি কিছুই নাই? যে ভারত এক সময়ে সভ্যতার উত্তুঙ্গশিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল, তাহার কি পূর্ব্বসঞ্চিত কোন ঐশ্বর্য্যই নাই? কেন? এক সময়ে আমাদের কি সবই ছিল না? সে প্রাচীন যুগে অপ্রচুর যন্ত্রাদির সাহায্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত সত্য আবিষ্কার ও কীর্ত্তিচিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞানের শাখাগুলির উন্নতির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কি এখনও অনেক স্থলে বিজ্ঞানবিদ্ য়ুরোপের বিস্ময় উদ্রেক করে না? কাব্য, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতির ভিতর দিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের যে সমস্ত ভাব ও চিন্তারাশি বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহা কি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি নয়?" সে অজ্ঞানান্ধকারের যুগে জ্ঞানে ও সভ্যতায় ভারত প্রাচ্য আকাশে প্রভাতী তারার ন্যায় দীপ্তি পাইত। কিন্তু পরে আমাদের পতন আরম্ভ হইল। উর্ব্বরাভূমি আমাদিগকে শ্রমবিমুখতা শিখাইল, শান্তিপ্রবণতা অলস করিয়া ফেলিল, অত্যুন্নতি অহঙ্কার আনিয়া আমাদের দৃষ্টিলোপ করিল—আমরা মোহের ঘোরে সব ভুলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কত সুন্দর সুন্দর ভাব ও চিন্তারাশি চর্চ্চা ও অনুসন্ধিৎসার অভাবে লুপ্ত হইয়া গেল। উপর্য্যুপরি বিদেশী সৈন্য, শাসন ও সভ্যতার ঘাতে প্রতিঘাতে আমাদের সমাজ ও সভ্যতা তাহাদের জীবনী শক্তি হারাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে জগৎ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল। ভারতের বাহিরে যাহারা বাস করিত তাহারা একে একে দলবদ্ধ হইয়া জাতি গঠন করিতে লাগিল, সমাজনীতি ও শাসননীতি প্রচলন করিল, উন্নতি ও ঐশ্বর্য্য লাভের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। নূতন নূতন ভাব ও চিন্তারাশি একটীর পর একটী করিয়া উদ্ভাবিত, প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইতে লাগিল—সমাজ ও জাতি উন্নতির পথে উঠিতে আরম্ভ করিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পাশ্চাত্য জাতি ভারতে আসিল তখন আমাদের অনেক অধঃপতন হইয়াছে। সে সময়ে আমরা তাহাদের ধৈর্য্য, সাহস, সহিষ্ণুতা, কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম—তাহাদের কাছে আপনাদিগকে বিকাইলাম। তারপর উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দ্রুত বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদিগের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল, ভালমন্দ ভুলিয়া আমরা তাহাদিগের সবই অনুকরণ করিতে যাইতেছিলাম, আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, অস্থিরমতি চঞ্চলচিত্ত যুবক প্রাণশক্তির অদম্য উন্মাদনার-

বশে ভালমন্দ বিচার না করিয়া যাহা করে, তাহা বিস্ময় ও প্রশংসা উদ্রেক করিলেও, মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। সে এক সময়ে যাহা গড়ে, হয়ত পর মুহূর্ত্তে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই গড়ন ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া আজ তাহারা যে সত্যটি খুঁজিতেছে, হয়ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্বেই তাহার সন্ধান পাইয়াছেন।

তাহাদের এ অন্বেষণ ত খুব বেশীদিনের নয়। তাই তাহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষার উপর সংস্থাপিত। Mrs. Besant (মিসেস্ বেশান্ত) বলিয়াছেন, In the earlier stage, the seeking is unconsious a blind desire for happiness, for satisfaction, for joy." তাহাদের এখন সেই অবস্থা নয় কি? মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশের ধনৈশ্বর্য্যের মনোহারিণী মূর্ত্তি যখন তাহাদিগকে মুগ্ধ করে, তখন তাহার ধনরত্ন সংগ্রহের চেষ্টায় বিরাট বিশ্বে বহির্গত হইল। তাহাদের সে উদ্দেশ্য সফল হইল,—য়ুরোপ ধনসম্পদের গরীয়সী হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ জন্মিল—একের ঐশ্বর্য্যে অপরে ঈর্ষাবান্ হইয়া উঠিল; প্রত্যেকেই স্ব স্ব রাজ্যের উন্নতির জন্য নূতন নূতন নীতি প্রচলন করিতে লাগিল। তাহাদের শাসননীতি তখন ধর্ম্মনীতিকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধু দেশের স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ রহিল—ইহকাল সর্ব্বস্ব হইয়া তাহারা পরকালের ভাবনা দূর করিয়া দিল। তাহাদের বৈজ্ঞানিক উন্নতি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও শক্তি সংরক্ষণেই নিযুক্ত রহিল—নিখিল মানবজগতের কল্যাণের দিকে কেহ চাহিয়া দেখিল না। যে জাতি যত উন্নত সে ততই নূতন ও ভীষণতর অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। তাহার ফলেই না এই সংঘর্ষ, বিপ্লব ও অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সন্দিগ্ধ ও ভয়কাতর হইয়া আমরা প্রশ্ন করিতেছি, "ইহাই কি সভ্যতার পরিণাম? যাহা ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, তাহা কি সভ্যতা? যে সভ্যতা নিজের বিনাশের পথ নিজে প্রস্তুত করে, তাহা কি সত্য? ইহা কি মোহের উন্মাদনার বশে শুধু আত্মঘাতেরই নামান্তর নয়?"

পাশ্চাত্যজাতি আপনাদিগকে সভ্য মনে করিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। তাহারা অর্থবান্, বীর্য্যবান্, আধুনিক বৈজ্ঞানিক অস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত। কিন্তু শুধু এই গুলিই কি সভ্যতার প্রকৃত নিদর্শন? যে বাহ্যিক সভ্যতার দোহাই দিয়া য়ুরোপ এতকাল নিশ্চিন্ত ছিল, আজ যে সভ্যতার মুখোস খুলিয়া গিয়া ভিতরকার যে হিংস্রস্বভাব করাল মুখব্যাদান করিয়াছে, তাহাতে সারা বিশ্ব ত্রস্ত, ভয়চকিত। পাশ্চাত্য মনীষিবর্গ আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া চিন্তান্বিত। তাই এখন তাঁহারা বলিতেছেন,—"There must be some international organisation to limit the burden of armaments and diminish the probability of war." এই মহাযুদ্ধ তাহাদিগকে কতকগুলি সমস্যার সম্মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি সমস্তই এতকাল শুধু একদেশদর্শী স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলির সংস্কার সাধন করিতে হইবে—সেগুলির সুমীমাংসার উপরেই তাহাদের—শুধু তাহাদেরই বা বলি কেন—জগতের—ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।

এখন কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিব না, জগতের এই জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে আমাদের স্থান কোথায়? পাশ্চাত্যের দিকে চাহিয়া দেখ,—স্বাস্থ্যে সম্পদে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে তাহারা কত ঐশ্বর্য্যবান্! কিন্তু আমরা? আমরা শুধু অতীত সভ্যতার দোহাই দিয়া অস্থিকঙ্কাল সার দেহ লইয়া কোনও রূপে বাঁচিয়া আছি মাত্র। Sir Daniel Hamilton সেদিন বলিয়াছেন—"India with her huge population is a minus quantity to the Empire, minus education, minus doctors and medicine, minus sanitation; and in this era of scarcity minus water, minus clothes, minus oil and all else that makes the wheel of life turn smoothly." বাস্তবিকই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাই নয় কি? আমাদের রত্নগর্ভা খনি আছে, তবুও আমরা দরিদ্র, আমাদের উর্ব্বর জমি আছে, তবুও আমরা অন্নহীন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত অগাধ জ্ঞানরাশি আছে, তবুও আমরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন—

দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও দুর্ভিক্ষের অত্যাচারে আমরা দিন দিন অবসন্ন, নির্জীব হইয়া পড়িতেছি। এখনও কি আমরা মোহের ঘোরে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? অতীতের দোহাই দিয়া বৃথা দম্ভে সত্বগুণের বড়াই করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কালযাপন করিব? বাস্তবিক এখন কি আমরা ঘোর তমোজালে আচ্ছন্ন নই? রজোগুণ না থাকিলে কিছুতেই সত্বগুণের অধিকারী হওয়া যায় না। মহাত্মা গান্ধী তাই বলিয়াছেন— "Those who do not know what cruelty is cannot be kind." স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন— "যদি তোমার প্রতিশোধ দিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তুমি ক্ষমা করিবার অধিকারী নও—তোমার ক্ষমা সে ক্ষেত্রে ভীরুতারই নামান্তর মাত্র।" ভারতের কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবান মুখনিঃসৃত গীতায় কর্ম্মের যে মহান্ ভেরী নিনাদিত হইয়াছিল, সে আজ কোথায়? জগৎ আজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র দিন দিন কঠিন ও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে পার্থিব উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে আমাদের আর উদ্ধারের আশা নাই। তাই বলি ভারতবাসী, রজোগুণের অধিকারী হও—দেশময় কলকারখানা স্থাপন কর, সামাজিক কুসংস্কারগুলির মূলোচ্ছেদ কর, কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন কর—দেশকে শস্যশ্যামলা ধনরত্নসমন্বিতা কর—দেশবাসীর দুঃখদৈন্য দূর করিয়া স্বাস্থ্য সম্পদের অধিকারী করাও।

ভারত চিরকাল পরমুখাপেক্ষী ছিল না। এই ভারতই একসময়ে জ্ঞানে ও সভ্যতায় জগতের মুকুটমণি হইয়াছিল। ভারতের শ্রমবিভাগ, সামাজিক বিভাগ, শিক্ষানীতি, ধর্ম্মনীতি মিলিয়া একটী সুখশান্তিময় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্যসমাজ গঠন করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। নিজের অভাব নিজে পূরণ করিয়া ভারত জগতের অভাব মোচনে সচেষ্ট ছিল। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ভারতীয় যানে নীত হইয়া সুদূর লণ্ডনের বাজারে উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। আজ সে সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সে দিন আবার ফিরাইয়া আনিতে হইবে—সে গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু পাশ্চাত্যের আদর্শ লইয়া নয়,—আমাদের নিজস্ব প্রাচ্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া—আমাদের মহাজ্ঞানী পূর্ব্বপুরুষদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া।

আজ য়ুরোপ তাহার ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞান হারাইয়াছে। ভগবানের আসনে শয়তানকে বসাইয়াছে, শিবের স্থানে অশিবকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ক্ষমা ও প্রেমের অবতার যিশুখ্রীষ্ট আজ য়ুরোপ হইতে নির্ব্বাসিত। আজ প্রেম সেখানে মিথ্যা, ত্যাগ ঘোর মূর্খতা, দয়া দুর্ব্বলতারই নামান্তর মাত্র—দয়া মায়া স্নেহের আর সেখানে স্থান নাই। দুর্ব্বল ও অসহায়কে ধ্বংস করিয়া আজ তাহারা এক 'Superman' (অতি মানুষ) জাতি গঠন করিবার নেশায় উন্মত্ত। এইজন্যই তাহারা যুদ্ধকে Biological necessity বলিয়া মনে করে, কারণ যুদ্ধে যে জাতি দুর্ব্বল তাহার ধ্বংস সাধিত হইয়া সবল জাতিই অবশিষ্ট থাকে। নিজেকে বলশালী করিতে হইবে—বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য পরকে ধ্বংস করিতে হইবে—অনুক্ষণ জিঘাংসা প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখিতে হইবে। কোথায় গেল তাহাদের সে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা? আজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দ্বারা পদদলিত করা হইয়াছে। কাব্য নীতি শিল্প সৌন্দর্য্য আজ সব মিথ্যা—সত্য কেবল State—রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া অতিমানুষ গড়িতে হইবে—Bismark এর 'Might is right' মূলমন্ত্র করিয়া—দুর্ব্বল ও অসহায়কে পদনিপিষ্ঠ করিয়া—সব কোমল বৃত্তিগুলির ধ্বংসসাধন করিয়া—ক্রূরতা ও নির্ম্মমতার মধ্য দিয়া। তাই আজ এই বিরাট ধ্বংসলীলার অভিনয়। উৎকট ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া আজ তাহারা পরকাল ভুলিয়াছে—প্রেম ও ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াছে। স্বার্থ ও ভোগকে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া তুলিয়া নিত্য নূতন অভাব ও অভিযোগের সৃষ্টি করিতেছে এবং নানা অস্বাভাবিক ও বিষময় নীতি সমাজে প্রচলিত করিয়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে।

সমাজে সুস্থ ও সবল শিশু সন্তান জন্মাইবার উদ্দেশে তাহারা কতই না জঘন্য উপায় অবলম্বন করিতে চাহিতেছে। যাহাতে দুর্ব্বল সন্তান না জন্মিতে পারে তজ্জন্য স্ত্রীলোকদিগের

মধ্যে restriction (সহবাসে বাধা প্রদান) sterilisation (জনন শক্তিবিনাশ) প্রভৃতি বিধান প্রবর্ত্তন করিতে বলিতেছে। সুস্থ ও সবল শিশুর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য trial marriage (পরীক্ষনীয় বিবাহ) Leasehald marriage (চুক্তিবদ্ধ বিবাহ) প্রভৃতি প্রচলন করিতে বলিতেছে। compulsion (সহবাসে বাধা করণ) concubinage (উপপত্নীত্ব) অবলম্বন করিতে চাহিতেছে—নারীজাতিকে রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সভ্যতার অভিধানে ইহারই নাম কি নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন? এই সভ্যতাভিমানী য়ুরোপই না আমাদিগকে বলে, তোমরা নারীজাতিকে সম্মান করিতে জান না! ইহাদিগের নিকটেই কি আমাদিগকে নারীসম্মান শিক্ষা করিতে হইবে? স্বীকার করি আমরা নারীদিগকে তাহাদের মত পুরুষের সমান অধিকার দিই নাই কিন্তু সে অধিকার দেওয়ার নামই কি সম্মান প্রদর্শন, না সুবুদ্ধি? বিধাতার রাজ্যে পুরুষ ও নারীর প্রকৃতিগত কি অনেক প্রভেদ নাই? স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই কম শ্রমসহিষ্ণু, তাহাদিগকে সন্তান ধারণ ও পালন করিতে হয়। গৃহস্থালীর বাহিরে আনিয়া তাহাদিগের কোমল মনোবৃত্তি গুলি কঠোর করিয়া দিলেই কি মানব শিশুর ও মানব জাতির অধিকতর কল্যাণ হইবে? পুরুষদের কর্ম্মক্ষেত্রের সংঘাতে আনিয়া প্রকৃতিগত কর্ম্মভেদকে দূর করিতে চাহিলে সামাজিক বিপ্লব আনা হইবে না কি? সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদিগের অধিকার এরূপ অন্যায় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেই না সেখানে Suffragistদের এত বিদ্রোহ, এত অত্যাচার। বিবাহ বন্ধন শুধু ঐহিক ভোগসুখের চুক্তিমাত্র বলিয়া তাহা এত শিথিল। আমরা সমাজের সেরূপ সংস্কার চাহি না। আমরা চাই নারীকে জননীরূপে, বধূরূপে, কন্যারূপে তাহাদের ন্যায্য অধিকার বুঝাইয়া দিতে ও ফিরাইয়া দিতে। আমরা কি নারীপূজা জানি না? আমাদের শাস্ত্রই ত বলিয়াছে "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"। গৃহকর্ত্রীত্বের গুরুভার মনে রাখিয়াই সে বলিয়াছে—"দশপুত্র সম কন্যা শিক্ষনীয়া প্রযত্নতঃ।" গৃহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে, আদর্শনীয়া সতীসাধ্বীরূপে, শুচিস্নাতা সর্ব্বস্বহীনা বিধবারূপে নারীর যে রূপ, আমরা তাহারই পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাই। পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ত তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রধান সহায় নয়। পুরুষ যে শিবের জড়দেহ—নারী সেই সমাজ শরীরের শক্তিরূপিনী। শক্তির সহিত সংঘর্ষে শুধু বিপ্লবেরই আগুণ জলিয়া উঠে, কিন্তু শক্তির সহিত মিলনেই সৃষ্টির আনন্দময় বিকাশ।

জগতের এই ভীষণ সমস্যার দিনে, তুমি হিন্দু আর ঘুমাইয়া থাকিও না। "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" উঠ, জাগো প্রবুদ্ধ হও—নিজেকে উদ্ধার করাও, সঙ্গে সঙ্গে জগতকে উদ্ধার কর। প্রসিদ্ধ দার্শনিক গেটে মরিবার সময় বলিয়াছিলেন—Light, light, more light."—"আলো, আলো, আরো আলো চাই।" সে আলোক কোথা হইতে আসিবে? এশিয়া হইতে নয় কি? আধ্যাত্মিকতার আদি জন্মস্থান—ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষদিগের লীলাভূমি প্রাচ্য হইতে নয় কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "The voice of Asia has been the voice of religion; the voice of Europe is the voice of politics." য়ুরোপের মত এসিয়া শুধু বাহিরের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে নাই, তাহার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। সে মহাত্মা যিশুর মহতী বাণী শুনিয়াছে—"The kingdom of Heaven is within you."—"Seek and you will find it."—"স্বর্গরাজ্য বাহিরে নয়, অন্তরে; অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই পাইবে।" ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপকে আবার সে বাণী শুনাও। ভোগে অচেতন য়ুরোপকে জানাও—"ন জাতু কাম কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি"—"কামনার আগুনে ইন্ধন জোগাইলে কামনার নিবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। পার্থিব সুখবোধে বাধা নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংযম ও ত্যাগ অভ্যাস কর—তবেই ভোগে তৃপ্তি আসিবে, জীবনে শান্তি পাইবে। কর্ম্ম কর—কিন্তু কর্ম্মকেই চরম করিয়া তুলিও না। আনন্দলাভই যদি কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই সঙ্গে ত্যাগ না হইলে চলিবেনা। মহাপুরুষেরা বলিয়াছেন "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগ দ্বারাই অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। জীবনের উদ্দেশ্য অতিমানুষ সৃষ্টি করা নয়, কিন্তু বিশ্বমানব গড়িয়া

তোলা। হিংসা দ্বেষ ধ্বংসের মধ্য দিয়া সে পথ নয়—দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, মৈত্রীর মধ্য দিয়া। বৃথা মোহে অন্ধ হইয়া মরীচিকার পাছু পাছু বিনাশের দিকে অগ্রসর হইও না। যদি যথার্থ মঙ্গলকামী হইয়া থাক, যদি আন্তর্জ্জাতিক দ্বেষ হিংসা দূর করিতে চাও, তবে তোমাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বাণিজ্যনীতি, অর্থনীতি সব ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কর, তবেই তোমাদের কল্যাণ, তবেই তোমাদের মুক্তি।

আজ এস তুমি নবীন হিন্দু—অতীতের অন্তঃস্থল হইতে। বর্ত্তমানের মোহজাল ভেদ করিয়া পুরাতনের গৌরবশ্রীমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হও। পৃথিবীর এই বিরাট সমস্যায় মেঘমন্দ্রস্বরে তোমার সেই সনাতন বাণী শুনাও। আজ কর্ত্তব্যের যে মহান ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে তাহারই সঙ্গে বিশ্বের পথে শুভযাত্রা কর। তোমার পথ বিপদসঙ্কুল, অমিতবল দানব তোমার পথরোধ করিয়া আছে, কিন্তু ভয় করিও না। ভগবানের মন্ত্রবাণী স্মরণ রাখিও—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥"

—ভগবানের চরণে সব কর্ম্মফল ন্যস্ত করিয়া ত্যাগ ও সংযমের মোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরের ন্যায় অগ্রসর হও। শঙ্করের জ্ঞান, চৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের ত্যাগ সব যে তোমারই। আজ আর্ত্তের যে আকাশভেদী আকুল আহ্বান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, তাহা কি তুমি উপেক্ষা করিবে? বিশ্বকে আজ রক্ষা কর। শিবহীন দক্ষযজ্ঞে প্রলয়ের যে রুদ্রবিষাণ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে সেখানে বিশ্বেশ্বরের পূজা প্রচলিত করিয়া বিশ্বমানবের উদ্ধার সাধন কর। এমহান্ কর্ত্তব্যের গুরুভার যে তোমারই—তুমিই যে এ মহাপূজার প্রধান পুরোহিত!!!

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, বি, এস্-সি

গঙ্গায় সন্ধ্যা

আকাশের গায় কুঙ্কুম ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছে কে?
আজ সন্ধ্যায় যা' দেখিনু তাহা দেখিনি জীবনে যে!
কূলে কূলে ভরা গঙ্গার জল, মেঘের চুমোয় আজি লালে লাল
ময়দানবের মায়ার মাধুরী আকাশে জড়েছে রে!
কুঙ্কুম ভেঙে সন্ধ্যার গায় ছুড়িয়া মেরেছে কে!

ও কাহার পা'র আল্‌তার ধারা জলে ঐ পড়ে গ'লে?
অথির বিজুরী থির হ'য়ে কিরে নাহিতে নেমেছে জলে?
ফেনে ফেনে ফোলা মদিরার ধারা, লহরীর দলে নাচে দিশাহারা,
রূপের মাতাল কূলে কূলে তার কল কলে ছল্ ছলে,
মনের স্বপ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটেছে জলে স্থলে।

স্বেচ্ছায় আজি পথহারা পাখী সোনা ঝরে গায়ে তার,
রঙের পাথারে ঢেউ তোলে তার কণ্ঠের ঝঙ্কার।
গাছের মাথায় উলসিয়া দিক্, চক্‌মকি ঠুকে হাসির ঝিলিক,
মণির খনিটে খুলেছে তাহার গোপন মর্ম্ম দ্বার,
স্বর্গে মর্ত্তে মুক্ত আজিকে কুবেরের ভাণ্ডার।

ছোট নাও খানি ঐ আসে পারে—আলো জ্বলে তার পালে,
দাঁড়েরে ঘিরিয়া হীরের চূর্ণ চুমার চুম্‌কি জ্বালে।
এ পারের পানে ও পারের ভাষা, জল কাটা পথে করে যাওয়া আসা,
তরী দোলে সুখে বিরহী বুকের বেদনার তালে তালে,
বিরহের ছায়া বিছায়েছে মায়া আজি এ সন্ধ্যা-ভালে।

আকাশে জেগেছে রূপের জোয়ার ধরায় দিয়েছে ধরা,
বেহুস নৃত্যে সুধার কলস ভাঙিয়াছে অপ্সরা।
মেঘ হ'তে ঐ হানে পিক্‌চারী, চোখে মুখে বুকে স্বর্গের নারী,
তালে তালে তালে বাজে তাহাদের বেতাল সপ্তস্বরা,
আজি সন্ধ্যায় রূপের জোয়ার ধরায় দিয়েছে ধরা।

আজি সন্ধ্যায় মত্তলীলায় আকাশে পরীর দল,
তাদেরি সাড়ীর জরী পাড় ঐ মেঘশিরে ঝল মল্।
মদের মতন গাঢ় এ পুলক, ভুলায়ে দিয়েছে সব দুখ শোক,
নীলের পাথারে ভাসায়েছে তারা আলোকের ভেলা দল,
নীল সাগরের দীপে দীপে আজ উজল নভস্তল।

কবে গঙ্গার রজত ঝর্ণা ঝরেছিল ধরা বুকে,—
দেখিনি কি শোভা সাড়া দিয়েছিল সেদিন সে ধারা মুখে।
আজ দেখিতেছি শুধু আঁখি ভরে, সোনার গঙ্গা ধারে ধারে ঝরে,
ঐ থই থই অগাধ অবাধ ঝরিয়া নামিছে মুখে,
চোখে দেখি আর মুক হ'য়ে থাকি বিস্ময়ে কৌতুকে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

ভাববার কথা

বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট "গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন" নামে একটী আইন করিতেছেন; উহার মর্ম্ম এই,—গ্রাম্য সমিতি গ্রামে গ্রামে পাঠশালা, ডাক্তারখানা স্থাপন করিবে, কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করিবে। এইরূপ নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য হইবে। ভাল কথা। কিন্তু ঘর পোড়া গরুর রক্ত সন্ধ্যা দেখিয়া ভয় হয়। স্বায়ত্তশাসন নামটাই জমকালো, ফলের বেলায় অষ্টরম্ভা! বর্ত্তমানে গ্রামে গ্রামে যে পঞ্চায়েতী প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার ফলে সাধারণ গ্রামবাসীর কি লাভ হইয়াছে, তাহা খতাইয়া কেহ দেখেন কি? ফল ফলিয়াছে এই, পূর্ব্বে গ্রামবাসী-দিগকে ট্যাক্স দিয়া চৌকীদার, দফাদার, আদায়কারী, পঞ্চায়েতে ও প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতকে প্রতিপালন করিতে হইত না, চৌকীদাররা বেতনের পরিবর্ত্তে চাকরাণ জমী ভোগদখল করিত। এখন সে সকল চাকরাণ জমী জমীদাররা দখল করিয়াছেন, এবং চৌকীদারী করের গুরুভার প্রজার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। এই আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়াও কি সাধারণ প্রজা চোর-বদমায়েসের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছে? পূর্ব্বে চোর যেমন চুরি করিত এখনও তেমনই করে। পূর্ব্বে চৌকীদাররা নিয়মিতভাবে (Town constableদের মত) গ্রামে চৌকী দিত না, এখনও দেয় না, পূর্ব্বে গ্রামে চুরি বা ডাকাইতী বা খুন হইলে চৌকীদার তাহার দৈনন্দিন গৃহকর্ম্ম ফেলিয়া বিরক্তির সহিত থানায় গিয়া সংবাদ দিত, তাহার পর পুলিশ কর্ম্মচারী আসিয়া তদন্ত করিয়া মহকুমায় রিপোর্ট দিতেন, এখনও তাহাই হয়। তবে কোন কোন প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত চৌকীদারীর করের কিয়দংশ পান বলিয়াই প্রাথমিক তদন্ত করেন বা না করিয়াই থানায় চৌকীদার পাঠান। বর্ত্তমানকালে স্বায়ত্তশাসনেরই পরিচয় আমরা পাই,—পূর্ব্বের চেয়ে এখন চৌকীদারের কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। পূর্ব্বে তাহাদিগকে চাকরীর দায়ে স্বগ্রামের ব্যক্তিবিশেষের বৈঠকখানায় পালাক্রমে হাজিরা দিতে হইত না বা ব্যক্তিবিশেষের বে-সরকারী কাজে খাটিতে হইত না, এখন তাহা প্রায়ই হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট হাকিম তাহাদিগকে ইচ্ছামত বে-সরকারী কাজেও খাটাইয়া লন, এমন কি কোন কোন গ্রামে চৌকীদাররা প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতের জমী চষিয়াও দেয়। এতদূর বাধ্য বাধকতা! কাজেই তাহারা যথানিয়মে গ্রামে চৌকী না দিলেও তাহাদের চাকরী যায় না। পঞ্চায়েতী বৈঠকে রামাশ্যামা প্রভৃতি সাধারণ প্রজা অভিযোগ করিতেই সাহসী হয় না। পূর্ব্বে গ্রামের সাধারণ প্রজা যাহারা চুরি ডাকাইতী বা খুন করিয়া বেড়ায় না অথচ দরিদ্র, তাহারা চৌকীদার বা দফাদারকে ভয় করিত না, এখন করে, কারণ যথাকালে ট্যাক্স দিতে না পারিলে পঞ্চায়েতে হাকিম চৌকীদারদের সাহায্যে তাহার অস্থাবর ক্রোক বিক্রয় করিতে পারেন, এ আশঙ্কা তাহার আছে।

তাহার পর দ্বিতীয় স্বায়ত্তশাসন। গ্রাম্য সমিতি গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলিবেন, ডাক্তারখানা বসাইবেন, কূপাদি খনন করাইবেন। আনন্দ সংবাদ বটে। কিন্তু ঐ সকল কাজে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা দিবে কে? প্রজারা? অন্নাভাবে অনাহারে যাহার জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়াছে, গ্রামের ডাক্তারখানায় কুইনিন খাইয়া সে জীবন ধারণ করিবে? চৌকীদারী কর দিতেই যাহার চোখে জল আসে সেই আবার নূতন কর দিবে? আর জমীদারেরা চাকরাণ জমীর আয়টাও গড়ের মাঠে হাওয়া খাইয়া, 'রায় বাহাদুর' হইয়া, বিলাসে ব্যয় করিবেন? প্রত্যেক জমীদার কি তাঁহার আয়ের সিকি অংশ প্রজার হিতসাধনে ব্যয় করিতে পারেন না? প্রজার হিতেই ত রাজার হিত। কিন্তু এ নীরস কথা বাঙ্গালার জমীদার সভা এতদিন ভাবেন নাই, পরে ভাবিবেন কিনা কে জানে।

প্রজা সাধারণকেও পুত্রকন্যার শিক্ষার ভার লইতে হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রত্যেক প্রজা যদি হিসাব করিয়া সেই পরিমাণ টাকা সমিতির হাতে দেয়, তবে গ্রামের উন্নতি হয়। কিন্তু যে প্রজা জ্বর হইলে ডাক্তার না ডাকিয়া

জড়ি-বড়ী খাইয়া সারিয়া উঠে এবং পুত্রকে কৃষি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া নিজেই চাষের কাজ শিখায়, সে টাকা বাহির করিবে কেন? আবার প্রতি গ্রামে অবস্থাহীন প্রজার সংখ্যা অসংখ্য। গ্রামের মধ্যে যে কয়জন অবস্থাপন্ন, ব্যয়ের ভারটা তাঁহাদিগেরই লওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহারা তাহা লইবেন না। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সমিতির 'সভ্য' হইবেন, পয়সা কম দিয়া মান বেশী লইবার ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেনই। ব্যবস্থা ত তাঁহাদেরই হাতে, রামা-শ্যামা ত ধমকের গোলাম!

যাহা হউক, পাঁচ টাকা কর দিয়াও দুই টাকার কাজ পাওয়া যায় ত, তাহা কদাচ উপেক্ষার বিষয় নহে। এ স্বায়ত্তশাসন চৌকীদারী স্বায়ত্তশাসনের চেয়ে ঢের উচ্চ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জমীদাররা এখন চাকরাণ জমীগুলি ছাড়িয়া দিলে প্রজার ঘাড়ে চাপ কম পড়িবে, জমীদারদেরও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

কিন্তু একটু গোল উঠিয়াছে। গ্রাম্যসমিতিতে নারী-জাতিকে সভ্যনির্ব্বাচনের ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই, এই কারণে এ দেশের স্বয়ংসিদ্ধ একজন নেতা "মহিলামঙ্গল" গাহিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁহার কথা এই—বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট গ্রাম্যসমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের অধীকার নারীদিগকে না দিয়া নারীদের স্বাভাবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হীন ভাবিয়াছেন, কোনও সভ্য-জাতির গবর্ণমেণ্টে এমন ব্যবস্থা থাকিতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু একথাটী খুবই সহজ যে, সমাজে নারীরা যতদিন স্বাধীনভাবে চলিতে না পারিবেন, যতদিন তাঁহারা প্রত্যেক কাজে পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া চলিবেন, ততদিন তাঁহারা সভ্যনির্ব্বাচন বা ঐরূপ পুরুষোচিত কোনও কাজের ভার পাইতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে নারীরা যে ভাবে চলেন, বাঙ্গালা দেশের নারীরা যখন সেইভাবে চলিবেন, তখন এদেশের নারীদেরও শ্রমবিভাগ উঠিয়া যাইবে, এবং তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে দলাদলি করিয়া পুরুষের সকল কাজে হাত বাড়াইতে পারিবেন। সহরের কতকগুলি মেয়ে কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছেন, এবং শিক্ষার গুণে বা দোষে তাঁহারা যে শ্রেণীর উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আজিও দেশের বহু পুরুষ সে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু সহরের গোটাকতক মেয়ে বাঙ্গালার বিরাট নারী সমাজের প্রতিনিধি নহেন, ইহা সুনিশ্চিত। সহরের নহে বাঙ্গালার পল্লী সমাজের নারীর অবস্থা ভাবিয়া মাননীয় স্যার হেনরী হুইলার সত্যই বলিয়াছেন, "পূর্ব্ব দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে ভোটদানের কথা আলোচনার যোগ্য নহে।"

বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান ভূম্যধিকারিণীর অভাব নাই, কিন্তু দান ও তীর্থযাত্রা ছাড়া স্বাধীনভাবে আর কোনও কাজ তাঁহারা করেন না, প্রধান আমলার মন্ত্রণাতেই চলেন। বিশেষতঃ প্রকাশ্য সভায় যোগদান না করিয়া অন্দর হইতে লোক মারফৎ যে ভোট আসে, সে ভোটের মূল্য কতটুকু? শুধু নারী নহে, অনেক পুরুষও ভোটের অধিকার পায় নাই, কিন্তু তাহাতে কি তাঁহারা লোকসমাজে অসম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে? বাঙ্গালায় এমন লোকও ঢের আছেন যিনি বৎসরে রাজসরকারে ১৲ টাকা সেস দেন না, কিন্তু তেজারতী, মহাজনী বা চাকরীর আয়ে বা পাণ্ডিত্যে সাধারণ ভোটদাতার চেয়ে অধিকতর সম্মানার্হ। এ ব্যবস্থায় তাঁহাদের মান হানি হইবে কি? আমাদের বিশ্বাস, মাননীয় স্যার হুইলারের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনে যদি কিছু ত্রুটি থাকে, তবে ঐখানে।

শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গের কৃষক

অশন ভূষণ অতি সামান্য সন্তোষভরা মুখ,
অটুট স্বাস্থ্য সরল হাস্য পরাণে বিমল সুখ।
কথার বাঁধুনী নাহি তার কোন না চাহে বিপুল বিত্ত
নিজ ক্ষেতটীর সোনার ফসলে তুষ্ট তাহার চিত্ত।
নাহিক শ্রমেতে ক্লান্তি শ্রান্তি না মানে রৌদ্র বৃষ্টি,
বিলাস বাসনা পশে না'ক মনে পরধনে নাহি দৃষ্টি।
কল্যাণে তার আজিও দীপ্ত বাংলা দেশের মান,
বাংলার সে যে বুকের রক্ত, বাঙ্গালী জাতির প্রাণ!

প্রকৃতি তাহার শিক্ষার ভার নিয়েছিল হাতে তুলি
দেখায়েছে তারে শোভাসম্ভার নিজ ভাণ্ডার খুলি'।
দেখেছে মায়ের হাসির সুষমা ভরিয়াছে হিয়া পুলকে
ঊষার শীতল শিশিরের মাঝে প্রথম অরুণ আলোকে।
শস্যশ্যামল আলো ঝলমল সোনার ক্ষেতেতে সে
বঙ্গমাতার দিব্য বয়ান নয়নে হেরেছে যে।
গৌরবে তার আজিও দীপ্ত বাংলা দেশের মান,
বাংলা সে যে বুকের রক্ত বাঙ্গালী জাতের প্রাণ॥

তরল আঁধারে আধ-সন্ধ্যায় মেঠো সুরে তার গানে
কোথাকার এক উদাস বারতা শ্রবণ ভরিয়া আনে।
যেন বাংলার মরমের কথা, অতীতের স্মৃতি যত
যেন বাংলার জ্ঞান বিজ্ঞান কীর্ত্তিকলাপ শত;
যেন বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কর্ম্ম বাংলার যাহা ছিল,
নিমেষের মাঝে সঙ্গীতে সব মূর্ত্ত করিয়া দিল।
সৌম্য সাধক স্বদেশসেবক সরল কৃষক তুমি,
ক্রোড়ে নিয়ে তোমা গৌরবময়ী ধন্য বঙ্গভূমি।
তোমার পুণ্যে তোমার অন্নে বাংলা দেশের মান
বাংলার তুমি বুকের রক্ত বাঙ্গালী জাতির প্রাণ॥

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ

আত্মা ও পরমাত্মা

অতীতের অন্তরাল হইতে শতাব্দির সুমধুর ধ্বনি আমাদিগের কর্ণে পশিতেছে; নগরাজ হিমালয় হইতে সিদ্ধ মহাপুরুষগণের পবিত্র ধ্বনি আমাদিগের শ্রুতিপথ স্পর্শ করিতেছে; যে ধ্বনি বুদ্ধ সদৃশ মহাপুরুষগণের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, যে ধ্বনি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পুঞ্জিত, এ সেই ধ্বনি। স্বর্গ হইতে, সাধুসিদ্ধ মহাপুরুষগণের মুখ হইতে এই সকল ধ্বনির উৎপত্তি। স্বর্গ হইতে কত সংবাদই এ ধ্বনি বহন করিয়া লইয়া আইসে, এ ধ্বনি অতীতের কত কথাই বর্ত্তমানে আনিয়া উপস্থিত করে, সাধুসিদ্ধগণের নিকট হইতে কত শুভসমাচারই বহন করিয়া আনে। এই শুভসমাচারের সর্ব্ব প্রথম, "তোমরা শান্তিলাভ কর, এবং অন্যান্য ধর্ম্মের ধার্ম্মিকেরাও শান্তিলাভ করুক," একদেশদর্শী-ধর্ম্মে এমন কথা থাকিতে পারে না, কোথাও নাই; সুতরাং ইহা সকল ধর্ম্মের পক্ষেই শুভ সমাচার; এ ধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। এই শতাব্দির প্রারম্ভেই সকলে ধর্ম্ম লোপ হইবে ভাবিয়া আশঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখ, সে সকল আশঙ্কা আজি কিছুমাত্র নাই। যাহাদিগের নিকট শাস্ত্রগ্রন্থ ও উদ্দেশ্যহীন উপাসনা মাত্রই ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অস্তিত্ব শূন্য। ধর্ম্ম ও জড়বাদ এখন ক্রমেই বুঝিয়া আসিতেছে। অনেকে বিবেচনা করেন, "ধর্ম্ম এখন আর নাই, পোয়া পোয়া করিয়া ধর্ম্ম এখন বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিয়াছে।' ধর্ম্মের যে অংশ লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই।" সৌভাগ্য, এখনকার দিনে এ কথা আর কেহ বড় বলে না। স্রোত এখন বিপরীত দিকে বহিতেছে। কুসংস্কার এবং খণ্ড ধর্ম্ম হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই অলৌকিক ধর্ম্ম সকলের উৎপত্তি। নতুবা একই মাত্র ধর্ম্ম আস্বাদন করিলে ধর্ম্মে লোকের রুচি থাকিত না। প্রত্যেক ধর্ম্মই অনুশীলন করিয়া আমরা যখন দেখি ঐ সকলের মর্ম্ম একই, তখনই স্বধর্ম্মে অবিচলিত আস্থা জন্মে। আমিই বাল্যকালে এমন ধারণা করি নাই যে, এ জীবনে কখন কিছুমাত্র ধর্ম্ম সংস্থান করিতে পারিব। ধর্ম্মচিন্তা পরিত্যাগ করিব ইহাই ভাবিয়াছিলাম, সৌভাগ্য বশতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অনুশীলন করিলাম, মহম্মদ ও বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম তত্ত্ব সকল অধ্যয়ন করিলাম, তখন আশ্চর্য্য বোধ হইল; দেখিলাম, আমার ধর্ম্ম আমাকে যাহা শিখাইয়াছে, অন্যান্য ধর্ম্মও আমাকে তাহাই শিখাইতে চায়। প্রবর্ত্তক ও প্রবর্ত্তিতগণের নামানুসারে ধর্ম্ম যে কোনও নামে নামিত হউক না কেন, তাহার মূলতত্ত্ব একই প্রকার না হইয়া পারে না। এ জগতের যথায় যে কোনও ধর্ম্মই প্রচারিত হউক না কেন, তাহার মূলতত্ত্ব অভিন্ন। এক ধর্ম্মই অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ। আমারই কেবল দুইটী চক্ষু, জগতের আর কাহারও যদি দুই চক্ষু না থাকিত, সকলেই বলিত, ইহা পীড়া। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। দুই চক্ষুর ন্যায় এ জগতে কেবল একটী ধর্ম্মই যদি থাকিত, তাহা হইলে ইহাও ধর্ম্মপীড়া বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমার যেমন দুই চক্ষু, পৃথিবীতে এমন উভয় চক্ষু অনেকেরই আছে; তেমনি আমার যেমন ধর্ম্ম, এমন ধর্ম্ম এ জগতে অনেকেরই আছে। আমার দুই চক্ষু এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তরবর্ত্তী একজনেরও দুই চক্ষু, ইহা যেমন সত্য; আমরা ধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তরবর্ত্তী লোকদিগের ধর্ম্ম, এ উভয় ধর্ম্মই তদ্রূপ সত্য।

ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বুঝিয়াছি আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। জরা মরণশীল দেহ ছাড়াও জরামরণের অতীত যে কোনও কিছু আছে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলী এ কথা স্বীকার করেন। এই যে জরা মরণের অতীত বস্তু, তাহা অবিনশ্বর, অবিভাজ্য এবং অনন্তকালস্থায়ী। অনেক আধুনিক ধর্ম্ম এ কথা স্বীকার করিয়াও বলেন, "আমাদের এমন একটা অংশ আছে, যাহা অমর। পরন্তু সেই অনশ্বর অংশের আদি অর্থাৎ উৎপত্তি

আছে।" এ জগতে যাহার আদি আছে, তাহার অন্ত আছে। আমাদের সেই অনশ্বর অংশের অন্ত নাই, অন্ত থাকিলে অবশ্য আদি থাকিত, সুতরাং আমাদের যে অংশ অমর, তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই উহা অনাদি এবং অনন্ত। আর এই অনাদি অনন্ত প্রকৃতির ঊর্দ্ধে এক অনাদি অনন্ত আছেন, তিনিই ঈশ্বর। মানুষ এই বিশ্বের আদি এবং মনুষ্যের আদি লইয়া কতই না তর্কালোচনা করে, কিন্তু এই আদি শব্দের মর্ম্ম যে গতির আদি। যে গতি বশাৎ মানুষ জন্মজন্মান্তর ঘুরিতেছে সেই পরিভ্রমণের আদি। ফলতঃ এই বিশ্বসৃষ্টির আদি নাই, বিশ্বের আদি নাই, বিশ্ববাসীরও সুতরাং আদি নাই। দেহের মৃত্যু হয় বটে, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই।

আত্মা সম্বন্ধে আমাদিগের আর একটী ধারণা, আত্মা সম্পূর্ণ, আত্মা নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল। হিব্রু ভাষায় লিখিত নূতন বাইবেলও আত্মার প্রাথমিক নির্ম্মলতা স্বীকার করেন। আত্মা প্রথমে নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, মানুষ নিজ কর্ম্মদোষে তাঁহাকে কলঙ্কিত ও অসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তবে পুনরায় পূর্ব্ববৎ নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ অবস্থা লাভ করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। এই কথা কেহ কেহ উপাখ্যান দ্বারা, কেহ বা অন্য প্রকার কৌশল রহস্য দ্বারা বলিয়া থাকেন। পরন্তু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে দেখা যায়, আত্মা সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ, সর্ব্বদাই নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র তথাপি পূর্ব্ববৎ নিষ্কলঙ্ক ও সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকে। এই যে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা লাভ, মলিন আত্মার পবিত্রতা লাভ, ইহা হয় কিরূপে? ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা! ঈশ্বরকে জানিতে পারিলে আত্মার মলিনতা নষ্ট হয়। আত্মা তখন নির্ম্মল, সম্পূর্ণ ও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে। হিব্রু বাইবেল বলেন, "কোনও মনুষ্যই ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তবে তাঁহার সন্তান যদি সহায়তা করেন, তাহা হইলেই দেখিতে পায়।" এ কথার অর্থ কি? ঈশ্বর দর্শন এবং সেই দর্শন ফলে স্বর্গরাজ্যে গমন, ইহাই মানব জাতির লক্ষ্য। এ কথার তবে সামঞ্জস্য রহিল কোথায়? মানুষ স্বীয় কর্ম্মদোষে নিজের পবিত্রতা নষ্ট করে। আমরা যত কিছু দুঃখ কষ্ট ভোগ করি, সে সকলই স্বীয় কর্ম্মের ফলে; সুতরাং এজন্য ঈশ্বরের কোনও অপরাধ নাই। হিব্রু বাইবেলের এই বিসদৃশ উক্তির তবে সামঞ্জস্য থাকিল কৈ?

আত্মা সম্বন্ধীয় আর একটী ধারণা, পুনর্জ্জন্ম। (Reincarnation) অনেকেই এ কথা জানেন, কেহ বা পুনর্জ্জন্ম জ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আত্মার অনন্তকাল স্থিতি এবং পুনর্জ্জন্ম, এই দুইটী বিষয় পরস্পর সংযোগবাহী। আত্মা যদি অনন্তকালস্থায়ী অনশ্বর হন, তবে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা সামঞ্জস্য থাকে না; কিন্তু মানবীয় আত্মার এ সকল অবস্থা সহসা সকলে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহে। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রের আদেশ, আত্মা স্বাধীন। এই আত্মার যদি প্রারম্ভ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যের নিষ্কৃত যত কিছু অপবিত্রতা ও অকর্ম্ম তৎ সমস্তই ঈশ্বরের উপর গিয়া অর্শে। বাইবেল এই জন্যই আত্মার আদি স্বীকার করিতে গিয়া শেষে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন যে ঈশ্বর দয়াময়, তাঁহার কৃপার ভাণ্ডার অনন্ত, তিনি মনুষ্যকৃত এই সকল অকর্ম্ম ও অপবিত্রতা ক্ষমা করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র যদি সহায়তা করেন, তাহা হইলে এই ইহজগতে মানুষের সকল অপবিত্রতাই তিনি ক্ষমা করেন। পাপরাশির যদি এই রূপেই ধ্বংশ হয়, তবে চক্ষের সম্মুখে একজন অন্যের অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? ঈশ্বরের এ একদেশদর্শিতা কেন? যিনি সর্ব্বকৃপার ভাণ্ডার, যিনি দয়াময়, তিনি একজনকে কম এক জনকে অধিক কষ্ট দেন কেন? কোটী কোটী নরনারী জীবনে কখনো আহারের ভাবনা না ভাবিয়াও রাজভোগে উদর পূর্ণ করিতেছে, আবার কোটী কোটী ভিখারী লোকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও উপবাস করিতেছে, কেন? এ সকলে যদি আমার নিজের কিছু মাত্র কৃতকর্ত্তৃত্ব না থাকে, তবে ঈশ্বরই ত এজন্য দায়ী। যদি তিনি দায়ী হন, তবে প্রথম কথা, যিনি ঈশ্বর, এই বিশ্বের যিনি দয়াময় পিতা, তিনি এমন একদেশদর্শী কেন? এই জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত উত্তর, আমরা নিজের কর্ম্মদোষেই এসংসারে এই আত্মযন্ত্রণা—পাপতাপ ভোগ করিয়া থাকি। যদি আমি এই একখানা চাকা ঘুরাইয়া দিই, তাহার

গতি ও ফলের জন্ত আমিই দায়ী। এখন কথা এই, আমিই যখন পাপের জনক, তখন সে পাপ দমন করিবার শক্তি অবশ্য আমার আছে। আমি পাপ করিতেও পারি, না ও করিতে পারি। তাহা হইলেই হইল, পাপ করা না করায় যখন আমার অধিকার আছে, তখন অবশ্য আমি স্বাধীন। এখানে অদৃষ্টের কোনও কথা নাই, বাধ্য বাধকতারও লেশ নাই। যাহা করি, তাহা আমিই করি, আবার সে কর্ম্ম আমি না করিলেও পারি; কেন না আমি স্বাধীন।

এখন এ সম্বন্ধে আর একটী কথা, আশা করি আপনারা মনোযোগী হইয়া শুনিবেন। আমাদের যত কিছু জ্ঞান, সমস্তই বহুদর্শনে সিদ্ধ। পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া সেই পাঁচ রকম সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান; বস্তুতঃ এই বহুদর্শনই বহু জ্ঞানলাভের একমাত্র পথ। এই যে বহুদর্শনজাত জ্ঞান, বিবেক হইতে এই জ্ঞান জন্মে। যদি কোনও ব্যক্তি পিয়ানো যন্ত্রে কোনও গৎ বাজাইতে চান, তাঁহাকে যন্ত্রের প্রতি সুরে বেশ বিবেচনা পূর্ব্বক অঙ্গুলি চালনা করিতে হইবে, নতুবা গৎটী ঠিক বাজিবে না। তাহা হইলেই দেখা গেল, বিবেককে আশ্রয় করিয়া অঙ্গুলি চালনা করিলে, তবেই গৎটী যথোচিত ভাবে বাজিতে পারে। আবার পুনঃ পুনঃ বিবেককে আশ্রয় করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক ঐ যন্ত্রে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে যখন উহা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন আর বাদন কালে বিবেককে আশ্রয় না করিলেও সে বাদনকার্য্যে কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় না, কেননা বিবেকজাত অভ্যাসই এই স্থলে যথেষ্ট। এখন দেখা গেল, দর্শন হইতে জ্ঞান, বিবেক হইতে দর্শন এবং অভ্যাস হইতে বিবেক, ধারাবাহিকরূপে সংশ্রবযুক্ত। মনুষ্যজীবনও ঠিক এইরূপ। বিবেকবশে যে কোনও কার্য্য পুনঃ পুনঃ করিলে, শেষে অভ্যাসবশে সেই কার্য্য যেমন অনায়াসেই সম্পন্ন হয়, তখন আর বিবেকের সাহায্য আবশ্যক হয় না; মনুষ্যও ঠিক এই নিয়মের অধীন। শিশু এই প্রকার কতকগুলি অভ্যাস লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। কোনও বালকই লিখনশূন্য অদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। তাহার জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই আগামী জীবনের সকল কথাই লিখিত থাকে। প্রাচীন গ্রীক ও মিশরীয় দার্শনিকগণও বলিয়া গিয়াছেন, 'শূন্য অন্তঃকরণ লইয়া কোনও বালকই জন্মগ্রহণ করে না। প্রত্যেক বালকই তাহার অতীত জীবনের কৃতকার্য্য সকলের সহস্র সহস্র অভ্যাস লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ইহজীবনে যে সকল কার্য্য সে করে নাই, করিবার সম্ভাবনাও নাই, শিশু অভ্যাস বশতঃ সেই সকল কার্য্যে অনায়াসে বহুদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকে।" পরন্তু ইহা সত্য। এত সত্য সর্ব্ববাদী সম্মত জড়বাদীরা একথা স্বীকার করিয়া বলেন, "এই যে পূর্ব্বজন্মজন্য সংস্কার ও অভ্যাস, ইহা পৈত্রিকতা সূত্রে শিশুতে সংক্রমিত হয়। পিতৃপিতামহগণ এই পৈত্রিকতা-সূত্রেই আমাদের মধ্যে আগত এবং তাঁহাদিগের সংস্কার ও অভ্যাস আমাদিগের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। পিতৃপিতামহের দোষগুণ পুত্র পৌত্রে এইরূপেই পৈত্রিকতা-সূত্রে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। "ফলতঃ যদি পূর্ব্বজন্মজন্য অভ্যাস কেবল পৈত্রিকতাসূত্রেই শিশুতে সংক্রমিত হয়, তাহা হইলে আত্মায় বিশ্বাস করিবার কোনও আবশ্যক থাকে না, কেন না সে অভ্যাস ত পৈত্রিকতাসূত্রে শিশুতে সংক্রমিত হইবেই হইবে। জড়বাদীদিগের এ আংশিক সত্য সম্বন্ধে অধিক তর্কযুক্তির প্রসঙ্গ অনাবশ্যক, কেন না আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে, পূর্ব্বজন্মজন্য যে অভ্যাস, তাহা যে কেবল পৈতৃক সূত্রে আসিতে পারে না, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। পূর্ব্বে আমরা ছিলাম অথবা আমাদের পূর্ব্বজন্ম ছিল, কি নবীন কি প্রাচীন, সকল দার্শনিক ও সিদ্ধপুরুষেরাই একথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালের ইহুদীরাও একথা বিশ্বাস করিতেন, স্বয়ং যিশুখ্রীষ্টও বিশ্বাস করিতেন।

তিনি বলিয়াছেন, "আব্রাহামের পূর্ব্বে আমি ছিলাম।" (Before Abraham I was) অন্যত্র তিনিই বলিয়াছেন "এই সেই এলিয় আসিয়াছে—যাহার আসিবার কথা ছিল।" This is the Ealias who is said to hav ecome

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও অবস্থার সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির এই যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এসিয়ার ধর্ম্ম হইতেই তৎসমস্ত প্রসূত, সুতরাং সে সম্বন্ধে এসিয়াবাসীরাই ভাল জানে। ঐ সকল ধর্ম্ম যখন মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধাবিত

হয়, তখন স্বভাবতঃই নানা কুসংস্কারে মিশ্রিত হইয়াছিল। এমন যে অত্যুদার খ্রীষ্টধর্ম্ম, তাহাও ইয়ুরোপে যথাযথ ভাবে গৃহীত হয় নাই! সে নিগূঢ়তত্ত্ব এখনো ইয়ুরোপীয়দিগের হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, কেন না ঐ ধর্ম্মের প্রণেতা যে সকল ধারণা ও প্রতিরূপ উহাতে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মগ্রহণ ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে সম্ভব নহে। আমি যিশুখ্রীষ্টের 'শেষ ভোজনের' (Last Supper of Jesus Christ) চিত্র শত শত স্থানে দেখিয়াছি, একখানিরও মিল নাই। চিত্রকরেরা আপন আপন ধারণানুসারে ঐ চিত্র আঁকিয়াছে। চিত্রকরগণের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা, সুতরাং চিত্রও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল যিশুখ্রীষ্ট টেবিলে ভোজনে বসিয়াছেন। এখন কিন্তু যিশুখ্রীষ্ট আর টেবিলে বসেন না, চিত্র এখন সংস্কৃত হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে বসা যিশুখ্রীষ্ট দেখিয়াছে, এখন তাহারা দাঁড়ান যিশুখ্রীষ্ট দেখিতেছে; সুতরাং ইহার একটা যে ভ্রান্তি, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রতি ধর্ম্মেই এমন বহু বহু ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। এজন্যই যিশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যে এদেশের লোকে খুব কম বুঝিবে, কি যিশুর তাদৃশ উচ্চ ধর্ম্ম শেষে দোকানী পসারীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আত্মা যে অনন্তকাল স্থায়ী, সকল ধর্ম্মই ইহা অল্প বিস্তর স্বীকার করেন। এই দেহধারণের পূর্ব্বে আত্মা যেমন পবিত্র ছিলেন, ঐশ্বরিক জ্ঞান জন্মিলে আত্মার যে পুনর্ব্বার সেই তাদৃশ পবিত্রতা জন্মে, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। এই যে জ্ঞান, এ জ্ঞানের হেতু, ঈশ্বর। এই ঈশ্বর কেমন? খুব প্রাচীন কালের ঈশ্বর ধারণা বড়ই হীন। প্রাচীন জাতিরা তখন চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি জল প্রভৃতির পূজা করিত। প্রাচীন ইহুদীদিগের ত অসংখ্য দেবতা তাহারা সর্ব্বদাই পরস্পর কাটাকাটি করে! দেবতারা সকলেই যুদ্ধ নিপুণ! তার পর একটী দেবতা, (Elohim) ইহুদী ও ব্যাবিলনবাসীরা পূজা করিতে লাগিল। অসংখ্য দেবতা, তাহার মধ্যে একজন প্রধান। এখান হইতেই একের প্রধান্য লোকে স্বীকার করিল। তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপন ঈশ্বরকে বড় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং এই বড়ত্ব তাহারা যুদ্ধ দ্বারা প্রমাণ করিতে লাগিল। যাহারা জয়ী হইল, তাহাদের ঈশ্বরই বড় বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। এ সকল জাতির সকলেই অল্প বিস্তর অসভ্য বর্ব্বর। এ দিকে পৃথিবীর উন্নতি, তৎসহ উচ্চ হইতে উচ্চ ধারণার বিকাশ, ঈশ্বর ধারণারও উন্নতি হইতে লাগিল, ক্রমে প্রাচীন হইতে নূতন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ধর্ম্ম সকলের উৎপত্তি হইতে লাগিল। আজি যে সকল ধর্ম্ম জগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ইহার একটীও এই প্রকার ক্রমোন্নতি ভিন্ন, জন্ম হইতেই এই উন্নত অবস্থা লাভ করে নাই।

"তাহাদের ঈশ্বরই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও অনাদি, তিনিই এই বিশ্বের ঈশ্বর, বর্ব্বরজাতির এইরূপ ধারণা। তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদিগের গৃহীত ধারণায় বিশ্বাস, আর মুক্তি নাই। ইহাদের ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। তাঁহার যিনি মূল কর্ত্তা, তিনি তাঁহাকে বহু শক্তিতে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই ঈশ্বরের হাতে একটী পাখী। বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস খুব অল্প দিনই চলিয়াছিল। তৎপরে সেই ঈশ্বর ও তাঁহার মূল কর্ত্তার লোপ হইয়া সেই স্থানে কেবল এক সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরেরই প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি কিন্তু কাহাকেও দেখা দেন না। এ ঈশ্বরের কাছে কেহ যাইতে পারে না। কিছু দিন এই বিশ্বাস থাকিয়া, ইহারও পরিবর্ত্তন হইল। এক অসীমশক্তিশালী ঈশ্বর, সেই স্থান অধিকার করিলেন। নূতন বাইবেলের সর্ব্বত্রই লেখা আছে, "আমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে আছেন।" এ পিতা পুত্রগণের নিকট থাকেন না, পুত্রগণকে মর্ত্তে রাখিয়া তিনি স্বর্গে থাকেন। অথচ তিনি স্বর্গমর্ত্তের ঈশ্বর! হিন্দুদর্শনে দেখি, তিনি মানুষের কাছে আসেন। তিনি স্বর্গমর্ত্তের কেবল ঈশ্বর নহেন, তিনি বিশ্বেশ্বর। তাঁহাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। আমি এবং সেই পরম পিতা, এক। আমার যাহা খাঁটি জিনিস তাহা তিনি, এবং তাঁহার যে টুকু খাঁটি জিনিস তাহা আমি; সেই স্বর্গরাজ্য আমাতেই আছে,' সুতরাং সেই স্বর্গ রাজ্যাধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে জানিবার ভাবনা কি?

"পবিত্র আত্মাগণকে আশীর্ব্বাদ, তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিবেন।" তুমি ঈশ্বরের দর্শনলাভ করিতে পার না। তুমি ঈশ্বরকে জান? না। কেননা যদি আমি তাঁহাকে

জানিতে পারি তাহা হইলে তাঁহাতে ও আমাতে তফাৎ কি? জ্ঞানেরও একটা সীমা আছে। যিশু বলিয়াছেন একস্থানে "আমিও আমার পিতা এক।" এক স্থানে বলিয়াছেন, "স্বর্গরাজ্য তোমাতেই আছে।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, "আমাদের পিতা স্বর্গে আছেন।" এই সকল দৃষ্টতঃ বিসদৃশ উক্তির মর্ম্মগ্রহণ এদেশের লোকের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্ম ক্রমোন্নতির অধীন। কালধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মের সহিত হেঁয়ালী উপন্যাস সংযোগ না হইলে ধর্ম্মের কালোপযোগিতা নষ্ট হইয়া যায়। সময় যেমন, ধর্ম্মও স্বভাবতঃই সেই সময়ের উপযোগী হইয়া থাকে; সুতরাং সেই সমাজের মানুষ তখন সেই তদুপযোগী ধর্ম্মই আচরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতে নিন্দা প্রশংসারবিষয় কিছু নাই। যিশু অশিক্ষিত লোকের নিকট তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যে লোক যেমন, তাহাকে তাহার মত করিয়া বুঝাইতে পারিলে তবেই সে বুঝিতে পারে। অশিক্ষিত লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কূটকথা বুঝাইতে গেলে সে তাহা আয়ত্ব করিতে পারিবে কেন? এই জন্যই যিশুধর্ম্ম তখনকার লোকে বুঝিতে পারে নাই। লোক যখন উন্নত জ্ঞানে জ্ঞানবান হয়, তখনই সে বুঝিতে পারে, স্বর্গরাজ্য (Kingdom of heaven) অন্যত্র কোথাও নহে, স্বর্গ তাহার অন্তরে। ফলতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এই যে দুর্ব্বোধ্য "কূট" ইহা উন্নতিরই লক্ষণ। এ জন্য কোনও ধর্ম্মই নিন্দার জিনিস নহে। ধর্ম্মের এ সকল কূট, উন্নতিপ্রাপ্ত লোক সকল অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

ধর্ম্ম, বিভিন্ন মত কি বিভিন্ন বিধির অনুসারী নহে, উহা জ্ঞানের বিষয়। আমার ধর্ম্ম যতদূর আমি বুঝি অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান, তাহাই আমার ধর্ম্ম; ইহার অতীতে আমার আর কোনও ধর্ম্ম নাই। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "পবিত্রাত্মারা ধন্য, কেননা তাঁহারাই ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবেন।" হিন্দুধর্ম্ম একই নিশ্বাসে বলিতেছেন, "হাঁ, এ জীবনেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ইহারই নাম মুক্তি।" ইহজীবনে ভগবানের দর্শন; ইহার নামই মুক্তি, সশরীরে মুক্তি; কিন্তু অন্য কোনও ধর্ম্মগুরুই এই সশরীরে মুক্তির প্রসঙ্গ করেন নাই। ঐ সকল ধর্ম্ম শিশুর ধর্ম্ম। শিশু বড় হইলে শিশুর ধর্ম্ম থাকিবে কেন? শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় নাই, ধর্ম্ম হইতেই ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। ভগবান কোনও শাস্ত্রই সৃজন করেন নাই, ধর্ম্মশাস্ত্রসকল তাঁহার আদেশে প্রণীত হইয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্র আত্মাকেও সৃজন করেন নাই, আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর। ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, আত্মায় পরমাত্মার অধিষ্ঠান সংঘটন; তাহাই একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মেই যদি একটী মাত্র বিশ্বজনীন সত্য নিহিত থাকে, সে সত্য ঈশ্বর। কল্পনা ধারণা, কি প্রয়োগ প্রণালী, ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক; ঈশ্বর লাভ ভিন্ন অন্য ধর্ম্মের অন্য কোনও পরম উদ্দেশ্য নাই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যত বিরোধই কেন থাকুক না, ধর্ম্মমত লইয়া যতই কেন আন্দোলন আলোচনা চলুক না, সকল ধর্ম্মেরই সারতত্ত্ব ঈশ্বর, ইহাতে ধর্ম্মবিরোধ নাই। এক ব্যক্তি এ পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করুক, জগতের যত ধর্ম্মশাস্ত্র শিরে ধরিয়া বহন করুক কিন্তু তাহার যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে সে ঘোরতর নাস্তিক। আর এক ব্যক্তি যদি জীবনে কখনো কোনও ধর্ম্ম মন্দিরে না যায়, কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করে, অথচ ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, ইহা যদি সে অনুভব করিতে পাকে, তবে সে মহাপুরুষ। তুমি তাহাকে যে নামেই কেন ডাক না, সে সাধু পবিত্রপুরুষ। যদি কেহ বলে, আমি যাহা বুঝি তাহাই সত্য এবং আমার ধর্ম্মই সত্য অন্য সব মিথ্যা; তাহা হইলে, নিশ্চয় জানিও, বক্তার সকলই মিথ্যা। অন্যকে মিথ্যাবাদী বলিবার পূর্ব্বে নিজের সত্যবাদিতার প্রমাণ যে নিতান্ত আবশ্যক, সে তাহা বুঝে না। মনুষ্যজাতি মাত্রকেই ভালবাসা এবং দয়া করা, ইহার পরীক্ষা। পৃথিবীর সকলেই ভাই, আমি সে হিসাবে একথা বলিতেছি না, পরন্তু তাহাদিগের জীবনের উপর, আমার জীবন নির্ভর করিতেছে। আমার কর্ম্মে সুতরাং তাহারা যে আমার। ধর্ম্মমন্দিরে জন্মান ভাল, কিন্তু তথায় মরা কিছু নয়! শিশু হইয়া জন্মান ভাল, কিন্তু চিরদিন শিশু হইয়া থাকা কিছু নয়! ধর্ম্ম মন্দির, ধর্ম্মোৎসব, কি উপাখ্যান, এ সকল শিশুর পক্ষে ভাল, কিন্তু শিশু বড় হইলে সে সকল উৎসব উপাখ্যান আর ভাল লাগিবে কেন? তখন

সে উচ্চ জিনিস দেখিতে চায় একটা জামা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনো গায়ে ঠিক হইয়া লাগিতে পারে না। জগতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, আরও সহস্র সহস্র জাতি হউক আপত্তি নাই, তাহাতে বরং সত্যধর্ম্মের বিকাশ হইবারই সমধিক সম্ভাবনা। যদিও বস্তুগত্যা সকল ধর্ম্ম এক এবং সারবত্তায় অভিন্ন, তথাপি জাতি ও অবস্থা অনুসারে উহা বাহ্যরূপে ভিন্ন ভিন্ন। এই জন্যই বলিয়াছি, প্রতি লোকের পক্ষেই নিজস্ব ধর্ম্মের প্রয়োজন।

বাল্যকালে আমি আমাদের দেশের এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বেদ সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। অপৌরুষের বেদ, এবং তৎসহ বাইবেল ও কোরাণ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তার পর, ঐ মহাত্মা আমাকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন। উহাতে লেখা আছে, "অমুক অমুক সময়ে বৃষ্টি হইবে।" বাস্তবিকও ঐ সময় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়াছিল। মহাত্মা বলিলেন, "ইহাই গ্রন্থ। বৃষ্টি হইবে ইহা লিখিত ছিল, এবং বৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং ঐ লিখিতবাক্য সত্য। সত্য বাক্য লিখিত ছিল বলিয়াই ঐ গ্রন্থ সত্য, নতুবা উহা বাক্যসার পুঁথি মাত্র। উহার সারবত্তা কি? ধর্ম্ম সেইরূপ। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরকে না মিলে, সে ধর্ম্ম কোন কাজের নহে। এ ধর্ম্মের ধর্ম্ম কথা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে, সে গ্রন্থও সুতরাং অকর্ম্মণ্য। যাহারা ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবার মানসে কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা চিনির বলদ। আজীবন চিনি বহিয়াও চিনির স্বাদগ্রহণ তাঁহাদিগের কপালে ঘটিয়া উঠে না।

"আমি পাপী তাপী দীনদুঃখী" এই বলিয়া চীৎকার করাই কি ভাল? আমি বলি, না। এই আক্ষেপ উক্তির পরিবর্ত্তে, বরং নিজের পবিত্র প্রকৃতির বিষয় তাহার স্মরণ করা উচিত। আমি একটা গল্প বলি। এক গর্ভিনী সিংহী আহারান্বেষণে আসিয়া এক মেষপাল দেখিল, এবং যেমন লম্ফ প্রদানে সেই মেষপালের মধ্যে পড়িল, অমনি সে একটী শাবক প্রসব করিল। প্রসবমাত্রই সিংহী মরিয়া গেল। সিংহ-শিশু মেষপালের সহিত মিশিয়া গেল। সিংহ শিশু ঘাস খাইতে শিখিল। সিংহ-শিশু ক্রমে মেষ হইয়া পড়িল! এক সিংহ আহার অন্বেষণ করিতে আসিয়া দেখে, একটী সিংহ মেষের দলে চরিতেছে, মেষের মত ডাকিতেছে, তাহাদের সঙ্গে ঘাস খাইতেছে! সিংহ বড় বিস্মিত হইল। সিংহ দর্শনে মেষপাল ছুটিয়া পলাইল, সিংহ-মেষও পলাইল। একদিন মেষপালের সহিত সিংহ-শিশু নিদ্রিত এমন সময় সিংহ আসিয়া ধীরে ধীরে সেই সিংহ-মেষকে ডাকিয়া কহিল "ছিঃ তুমি মেষের মত আছ কেন? ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছ কেন? তুমি যে সিংহ।" সে একথা বিশ্বাস করিল না। সিংহ এক নির্ঝরের নিকট লইয়া গিয়া, প্রতিবিম্বে তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে বলিল, সিংহ মেষ দেখিল, সত্যই ত, আমি ত মেষ নহি, আমি যে সিংহ। সেই দিন হইতে সে আর মেষের দলে থাকিল না; যে সিংহ, সেই সিংহই হইল। তোমরা সকলেই সেইরূপ সিংহ।

ঘর যদি অন্ধকার থাকে, তবে সেই অন্ধকার গৃহ মধ্যে গিয়া অন্ধকার! অন্ধকার! অন্ধকার! এই বলিয়া যতচীৎকার কর, অন্ধকার ঘুচিবে না। নীরবে সেই ঘরে একটী আলো জ্বালিয়া দাও, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হইবে। তোমাদের হৃদয় মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত কর, দেখিবে, পাপ-অন্ধকার সকলই দূরে পলাইবে। নিজের কৃতপাপের দিকে চাহিও না, কৃতপুণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় করিতে থাক, উন্নতজীবনের আদর্শে জীবন পরিচালন কর, অবশ্যই উন্নতি হইবে। *

যিশুখ্রীষ্ট

সভা ভঙ্গের পর কয়েক জন বিখ্যাত খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক, স্বামী বিবেকানন্দকে যিশু খ্রীষ্টের "ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ" সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করেন। স্বামী বলেন, "কখন যিশু খৃষ্ট যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না, কেননা ইহা অসম্ভব।"

সভামধ্য হইতে একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নরকাগ্নির বিষয় যদি লোকসমাজে প্রচার করা না যায়, তাহা হইলে লোকে সে কথা মানিবে কেন?"

* "The Soul and God" Delivered at Hartford, America.

"তাদের না মানাই উচিত। ধর্ম্মকে যে ভয় করে ধর্ম্মত্যাগী হওয়াই তার পক্ষে ভাল। লোকের পাপের কথা না কহিয়া নরকের কথা তুলিয়া, পুণ্যের কথা—স্বর্গের কথা বলা ভাল। পাপের ভয় না দেখাইয়া, সৎকর্ম্মে লোককে উৎসাহিত করা ভাল।

প্রশ্ন। "এ পৃথিবী স্বর্গরাজ্য নহে।" প্রভু যিশু একথা বলিয়াছিলেন, ইহার মর্ম্ম কি ?

উত্তর। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য আপনার ভিতর। ইহুদীরা মর্ত্তের উর্দ্ধে—আকাশে স্বর্গের কল্পনা করে, যিশু তাহা ভাবেন নাই।

প্রশ্ন। জন্তু হইতে মানুষের জন্ম, ইহা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

উত্তর। ক্রমবিকাশবশে ইতর জীব হইতেই সর্ব্বোচ্চ মানবের উৎপত্তি।

প্রশ্ন। আমরা আবার কি পশু হইব ?

উত্তর। মানুষ যে পশু হইতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন। পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে, এমন লোক আপনি দেখিয়াছেন ?

উত্তর। দেখিয়াছি। তাঁহারা জ্ঞানের ও শক্তির এমন এক অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাহাতে গতজন্ম তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষদৃষ্ট ইহলোকের ন্যায় উজ্জ্বল।

প্রঃ। খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু আপনি কি বিশ্বাস করেন।

উঃ। না। খৃষ্ট ঈশ্বরের অবতার। তাঁহাকে কেহ মারিতে পারে না। যে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিল, সে খৃষ্টের সাদৃশ্য—সে দৃশ্য মৃগতৃষ্ণিকা তুল্য।

প্রঃ। তবে ইহার তুল্য অলৌকিক ক্রিয়া আর কি আছে ?

উঃ। অলৌকিক ক্রিয়া, সত্যের বিকাশ। তাহার জন্য চিন্তিত হইবার কিছু নাই। এ সংসারের সকলই অলৌকিক সুতরাং অলৌকিকের চিন্তা ত্যাগ করিয়া যথার্থ সত্যের অনুসরণ করাই মঙ্গল। বুদ্ধের এক শিষ্য আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, এক সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক শক্তিবলে একটা ভাঁটা শূন্যভরে স্থির রাখিয়াছে!' বুদ্ধ সেই ভাঁটা লইয়া পদাঘাতে চূর্ণ করিলেন, এবং বলিলেন, "অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া অনন্ত সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।"

প্রঃ। সত্যই কি যিশুখৃষ্ট পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া তাঁহার "উপদেশ" (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন ?

উঃ। আমার বিশ্বাস, দিয়াছিলেন।

প্রঃ। নরকাগ্নি কথা মানুষ্যহৃদয় হইতে মুছিয়া দিলে, কাহার কি সেই অগ্নিকে আর ভয় করিবে ?

উঃ। ভয় করাই ত উন্নতির একমাত্র উপায় নয়। ভয় না করিয়া, যদি কেহ প্রীতিভরে কি আশায় নির্ভর করিয়া ঈশ্বর আরাধনা করে, সে কি ভাল নয় ? ভয়ের পরিবর্ত্তে ভালবাসায় যদি কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা কি উচিত নয় ? (সভাস্থ সকলের জয় ধ্বনি।)

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

কোথায় ?

নিখিল বিশ্ব মাঝারে তোমায় কোথায় খুঁজিব আমি,
নির্ম্মল জল প্রবাহে লুকায়ে তুমি কি রয়েছ স্বামী ?
অথবা উষার অরুণ আভায়
রয়েছ মিশিয়া চারু সুষমায়
খেলিছ কি নাথ সাগর বেলায় উর্ম্মিলহর চুমি ?
অথবা সাঁজের শীতল পরশে
কুন্দকলির গন্ধ অলসে
নীল নভে কিগো রয়েছ মিশিয়া অথবা পড়েছ ঘুমি।

বিজন গহনে তুমি কি রয়েছ শীতল স্নিগ্ধ ছায়,
মর্ম্মরি ধীর শ্যামল বিথিকা তব সঙ্গীত গায়
অনিলে কি বয় তোমারি বাতাস
গুঞ্জরি অলি গাহে তব ভাষ
নবীন দুর্ব্বাদলে কি ঘিরিয়া রয়েছ অবনী অঙ্গ ?
আছ কি রাজার প্রাসাদ শিখরে
অথবা রয়েছ দীনের দুখরে
তাপিত পতিত পেয়েছে তোমার চরণ ধূলার সঙ্গ ?

নিদাঘের খর রৌদ্র কি তুমি বরষার নীর ধার ?
নয়ন মুগ্ধ ইন্দ্র ধনুর বিকাশে আছকি আর,
শারদ প্রাতের আলোকোজ্জ্বল
রয়েছ কি ওগো চির নির্ম্মল
হিমানি নিশীথে তুমি কি ঝরিছ শিশির শীতল কান্ত,
ফাগুনের নব ফুল সম্ভার
রঞ্জিয়া দিয়েছে অঙ্গ তোমার
দক্ষিণ হাওয়ায় ওড়ে কি তোমার রঙিন বসন প্রান্ত।

শ্রীমনোরমা দেবী।

"পঞ্চামৃত"

শিক্ষায় ব্যয় সঙ্কোচ।—বাঙ্গলার বাজেটের এবার সর্ব্বাপেক্ষা নৈরাশ্যের কথা—আবগারী বিভাগে আয় বৃদ্ধি আর শিক্ষা বিভাগে ব্যয় হ্রাস। প্রথমটীর আয় বৃদ্ধির দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি, আমাদের দেশে কুক্রিয়াশক্ত মাতালের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, নৈতিক অবনতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয়টীর ব্যয় হ্রাসে আমরা জানিতে পারিতেছি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতেছি। যুদ্ধ উপলক্ষে অসভ্য রুষিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশে যে সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ হইল ঠিক সেই সময়েই ভারতে মাতালের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল আর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যাপারেও আমাদের অরুচি ধরিবার উপক্রম হইল।

১৯১৮-১৯ সালে শিক্ষার জন্য এক কোটী ৩ লক্ষ এক হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব এত টাকা ব্যয় করিবার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই ফলতঃ তহবিলে ১৮ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ১৯১৯-২০ সালের জন্য শিক্ষা বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া ৯৭,৮৬,০০০ টাকা ধরা হইয়াছে। বাঙ্গলার অধিবাসী সংখ্যা সাড়ে চারি কোটী। ইহার অধিকাংশই সম্পূর্ণ নিরক্ষর। ইহাদের শিক্ষার জন্য যে টাকা বরাদ্দ হইল ইহা কি একেবারেই নগণ্য নহে? এর পর যাহা বরাদ্দ হইল শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাও যে আবার খরচ করিয়া উঠিতে পারিবেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? গত সনে ত পারেন নাই। আমাদের ডিঃ বোর্ডগুলির হাতে দেশের জল সংস্থানের জন্য যে টাকা ন্যস্ত থাকে অধিকাংশ বোর্ডই সে টাকা খরচ করিয়া উঠিতে পারেন না। অবশ্য বোর্ডের প্রকৃত কার্য্য পরিচালন ব্যাপারে বেসরকারী সদস্যগণের ক্ষমতা যদিও একেবারেই নগণ্য তথাপি এই সব ত্রুটী বিচ্যুতি অকার্য্যতার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ধমকটা তাহাদেরই শুনিতে হয় এবং দেশের লোক যে স্বায়ত্ত-শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইহাদ্বারা তাহাই প্রমাণিত করা হয়। অথচ শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ পড়িয়া থাকিলেও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্জুরী টাকাটাও যে ব্যয় করিতে পারেন নাই ইহার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাঁহাকে কোন প্রকার মন্তব্যই শুনিতে হয় নাই।

শিক্ষকগণ বেতন বৃদ্ধির জন্য অনেক দিন হইল নানাপ্রকার কাঁদাকাটি করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধের সময় ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, কি প্রকারে এই টাকা ব্যয় করা যায় বাঙ্গলার ডিরেক্টর সাহেব খুজিয়া তাহার উপায়ই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। ইহা অপেক্ষা শিক্ষা বিভাগের অকৃতকার্য্যতার আর কি উৎকৃষ্টতর প্রমাণ হইতে পারে? এই টাকা হইতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির উন্নতি করার কথা হইয়াছে। এই উন্নতি কি ভাবে করা হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যদি এই টাকা এখনও প্রাসাদ নির্ম্মানে, সাজসজ্জা ক্রয়েই ব্যয়িত হয় তবে বুঝিতে হইবে হতভাগা শিক্ষকগণ আজও যে তিমিরে এখনও আরও বহুদিন তাহাদিগকে সেই তিমিরই থাকিতে হইবে। তবে জিজ্ঞাসা, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্যই গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিলেন সে টাকা অন্য বাবদে কেন খরচ করা হইবে? ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মাননীয় মিঃ মেষ্টন যে বলিয়াছেন দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব—এ কথা ঠিক হইতে পারে কিন্তু জিজ্ঞাসা—বেতনের ব্যবস্থা এইরূপ চলিতে থাকিলে দেশে কি আর কোন দিন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে?

ভারতবর্ষে কলেজ ও ছাত্রের সংখ্যা।—ভারতে আর্ট কলেজের সংখ্যা ইহাতে ৪১১৩ ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। ১৯১৯ সনে কলেজ সংখ্যা ছিল ১৪০ এবং ছাত্র সংখ্যা ২৯৬৪৮। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য কতটী কলেজ বিদ্যমান তাহার ও সেই সব কলেজের ছাত্রের সংখ্যা নিয়ে দেওয়া গেল। মান্দ্রাজ কলেজ ৪১, ছাত্রসংখ্যা ৭৯১০; বোম্বাই ৮ ও ৪৮৮৮; বঙ্গ ৩৩ ও ১৮৪৭৮; যুক্ত প্রদেশ ১৯ ও ৫১৮২; পঞ্চনদ ১১ ও ৪২৩৬; ব্রহ্ম ২ ও ৬৬২; বিহার উড়িষ্যা ৭ ও ২৫৭৫; মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪ ও ১০৯৪; আসাম ২ ও ৬৭৮; উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২ ও ১৭৭; অন্যান্য প্রদেশ ৫ ও ১২৪৪। সমগ্র ভারতে কলেজে অধ্যয়ন করে এরূপ মহিলার সংখ্যা ৮৪২। বঙ্গ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিন প্রদেশেই ছাত্রী সংখ্যা বেশী। বিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে কলেজে ছাত্রের সংখ্যা চোদ্দ হাজারেরও কম ছিল। ১৯০৭ হইতে ১৯১২ সনের মধ্যে ২৯,০০০ ছাত্র বাড়িয়াছে স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতেই কলেজের ছাত্র সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটী নূতন কলেজ স্থাপিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও বর্দ্ধিত ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে কিছুই নয়। এই হেতুই কলেজে স্থানাভাব হইয়াছে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কলেজে প্রবেশের আবেদন করার পর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া অনেক ছাত্র রীতিমত কলেজে আসে না। ইহা অন্যান্য প্রবেশার্থী ছাত্রের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। ১৯১৬ সনে পাটনা কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর ৮১ জন ছাত্র কলেজে রীতিমত আসে নাই। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কলেজ সমূহে কোন জাতির কত ছাত্র অধ্যয়ন করে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইউরোপীয় ও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ৮৯৬, ভারতীয় খৃষ্টান ১৩৯, ব্রাহ্মণ ১৬৫১৭, ব্রাহ্মণেতর হিন্দু ২১৪৫৩ মুসলমান ৪৯২১, বৌদ্ধ ৫১৫, পার্শি ৫৭৩, অন্যান্য জাতি ৮৬৬। আর্ট কলেজের ব্যয় ৪৭৯৮৫৭৫ টাকা স্থলে বাড়িয়া ৭১০৩০৪০ টাকা হইয়াছে। এক বঙ্গদেশেরই কলেজের ব্যয় ১৮৮৪৯৯৬৲ টাকা। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কলেজ ছাত্রের বার্ষিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৪৩৩৲ ব্রহ্মে ৩১১৲, যুক্ত প্রদেশ ২৩৬৲, আসামে ২৩১৲ মধ্য প্রদেশে ১৯১৲ মান্দ্রাজে ১৭০৲, বোম্বাইয়ে ১৬৫৲ পঞ্চনদে ১৫৮৲, বিহারে ১৫২৲, অন্ধ্র প্রদেশে ১৫০৲ বঙ্গে ১০২৲।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা।—ভারত-গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া কলিকাতা ইয়ুনিভার্সিটী এতদ্দেশে দেশে যে যুগান্তর সূচনা করিয়াছেন, তাহা অনেকেই জানেন না। আমাদের সংবাদ পত্র সমূহে এবিষয়ে কিছুমাত্র আলোচনা হয় নাই। যাঁহারা এতদ্দেশে দেশের জন্য চিন্তার ভার লইয়াছেন, তাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য বিষয়ে সকল সময়ে জাগরিত নহেন, ইহা আমাদের সামান্য দুরদৃষ্টের ও ক্ষোভের বিষয় নহে। যাহা নিতান্ত সন্নিহিত এবং আসন্ন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হইলেও আমাদিগকে এতই ব্যতিব্যস্ত এবং ব্যগ্র করিয়া তুলে যাহা দুরান্বিত অথচ যাহার ফল ও বল অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অদৃষ্টে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিবে এমন বিষয়েও আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না।

কলিকাতা য়ুনিসিভার্সিটী বর্ত্তমান এম-এ পরীক্ষার পত্র যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে এই—

পরীক্ষার্থী ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহে এক ভাষা মুখ্য রূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন;—১ম দিনের পরীক্ষার বিষয়—ওই ভাষার সমগ্র সাহিত্যের সাধারণ ইতিবৃত্ত।

২য় দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষার প্রাচীন যুগের পত্রাদি হইতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য এবং পাঠ্যের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও গৃহীত হইবে।

৩য় দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষার মধ্য যুগের এবং আধুনিক কালের গ্রন্থাদি হইতে নির্দ্ধারিত পাঠ্য এবং পাঠ্যের অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধেও গৃহীত হইবে।

৪থ দিনের পরীক্ষার বিষয়—(ক) ওই ভাষার নির্দ্দিষ্ট যুগ বিশেষের সাহিত্যগত অথবা ভাষা-প্রকৃতি গত ইতিহাস, (খ) নির্ব্বাচিত যুগবিশেষের সাহিত্য বিজ্ঞান সমাজ অথবা ধর্ম্ম-সম্পর্কিত প্রবৃত্তির ইতিহাস।

পরীক্ষার্থী অপর একটি ভাষা আনুষঙ্গিক পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিবেন, এবং—

৫ম দিনের পরীক্ষা—ওই ভাষা সম্বন্ধে নির্দ্ধারিত সরল পাঠ্যগ্রন্থ এবং পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ে গৃহীত হইবে।

৬ষ্ঠ দিনের পরীক্ষার বিষয়—ওই ভাষার ব্যাকরণ ভাষা-বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের স্থূলে ইতিহাস।

উল্লিখিত দুইটী ভাষা ব্যতীত পরীক্ষার্থীকে প্রাকৃত, পালি, পারসিক, পাস্ত, এই চারি ভাষার যে, কোন দুইটার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এবং—

৭ম দিনের পরীক্ষা—নির্ব্বাচিত ভাষাদ্বয়ের ব্যাকরণ সাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থ সম্বন্ধে গৃহীত হইবে।

৮ম দিনের পরীক্ষার বিষয়—প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎপত্তি এবং বিকাশের সম্পর্কিত আর্য্যভারতীয় ভাষা বিজ্ঞান।

উপরে যে পরীক্ষার বিষয়গুলি উল্লিখিত হইল তাহাদের পশ্চাতে শিক্ষা থাকিবে, বলাই বাহুল্য, এবং কলিকাতা যুনিভার্সিটী সত্বর এই শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন। এখন ধরুণ, কোন ছাত্র বাঙ্গালা ভাষাকেই প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করিল, তা হইলে সে বাঙ্গালায় এম-এ হইতে পারিবে, এবং বাঙ্গালায় এম-এ হইতে হইলে যে জ্ঞান উপার্জ্জন করা অপরিহার্য্য হইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শেষ পরীক্ষার্থীর জ্ঞানগৌরব হইতে তাহার কোন অংশে ন্যূনতা হইবে না। এইরূপে বাঙ্গালায় এম-এ হইতে হইলে ছাত্রের পক্ষে একদিকে যেমন ইংরাজী এবং (অনুল্লিখিত থাকিলেও সংস্কৃতের জ্ঞান লাভ অপরিহার্য্য হইয়া গেল, অন্যদিকে আরও তিনটী ভাষার সাধারণ জ্ঞান! বাঙ্গালায় এম-এ বলিয়া উপাধিটী নিতান্ত 'ফেলো' হইবে না।

এখন, এই প্রবর্ত্তনার ফল বঙ্গসাহিত্যে এবং বঙ্গদেশে কি ভাবে উপজাত হইতে পারে? কেবল যাহারা মুখস্থ প্রশ্নোত্তর উদ্গীরণ করিয়া ইউনিভার্সিটীকে ফাঁকি দিয়া পরীক্ষা-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াসী, তাহাদের কথা ধরিতেছি না, তাহাদের দ্বারা কোন কোন দিকেই বা কি উপকারের সম্ভাবনা আছে? কিন্তু যদি ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্ম বুদ্ধিমান একটী ছাত্রও এই বাঙ্গালা বিভাগে আকৃষ্ট হইয়া ছয়টী ভাষা প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক আগুন তত্ত্বে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হস্তে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য কত দিকে উদ্বর্ত্তনা লাভ করিতে পারে? এবং এইরূপে দশ বৎসর কার্য্য চলিলে, উহাতে বাঙ্গালার শব্দ-সম্পত্তি, উহার প্রকাশের শক্তি অন্ততঃ বাঙ্গালা গদ্যের শক্তি কতদিকে সহায়তা লাভ করিয়া বঙ্গভাষাকে ভারতের যাবতীয় প্রদেশে ভাষার শীর্ষ স্থানে তুলিয়া ধরিতে পারে। উপযুক্ত ছাত্র শিক্ষকের সুযোগ ঘটাইতে, পারিলে, এই ব্যাপারের ফল দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনে কত দিকে নূতন প্রবর্ত্তনার সূচনা করিবে! তখন ইতিহাস এই যুগ-প্রবর্ত্তয়িতার দূরদৃষ্টি এবং সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটী ভাবুকতার লক্ষণ অত্যন্ত উগ্র হইয়া উঠিয়া, ইদানীং আমাদিগকে যে জীবন-ক্ষেত্রে নিদারুণ ভাবে দুর্ব্বল এবং অন্ধ করিয়া দিতেছ, তাঁহা মনে রাখিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীকে জাগ্রত ভাবে চলিতে হয়। আমাদের সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণ বা গুণ যেমত এই ভাবুকতা, তেমন ইহা ভুলিলেও চলিবে না যে, আমাদের পাঠকসংঘ সাহিত্যিক ভাবুকতাকে সমুচিত ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, দুর্ব্বলধী এবং ক্ষীণচেতা হইয়া পড়িতেছে; মনুষ্য জীবনের কঠোর সত্য সমূহের আলোচনায় বীতস্পৃহতা এবং শিথিল মস্তিষ্কের পরিচয় দিতেছে। ওইদিকে মদ্র, মহারাষ্ট্র বা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সাহিত্যসেবী কিম্বা সাহিত্যপ্রেমিক হইতেও কূট কঠিন নব্যন্যায়ের জন্মদাতা বলিয়া গৌরব-গর্ব্বশীল বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া গেল! সম্প্রতি এই দৌর্ব্বল্যের দিকেই আমাদের প্রতিকার বুদ্ধি এবং ক্রিয়াবুদ্ধি সচেতন করা আসন্ন কর্ত্তব্যরূপেই দাঁড়ান হইয়াছে। আমাদের কবিত্ব শক্তি এবং গদ্য রচনা যোগের শক্তি বা সত্য-আলোচনার শক্তি হইতে অনেক অগ্রগামী হইয়া গেল, এই সাহিত্যে কাব্যের, গল্পের বা কাল্পনিকতার ক্ষেত্রে যে প্রতিভাসম্ভব ঘটিয়াছে, বিজ্ঞান দর্শন বা সত্যালোচনার দিকে যে তাহার দশমাংশও হয় নাই, তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এই দিকে বাঙ্গালীর মনীষা এবং গবেষণার দুর্ব্বলতা তাহার চরিত্র

দৌর্ব্বল্যই প্রমাণ করিতেছে। এই দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে জাগ্রত ভাবে ক্রিয়াপর, হইয়া দেশের অভ্যন্তর হইতে সমুচিতকর্ম্মী এবং প্রতিকারক্ষম প্রতিভার উদ্বোধন করিতে না পারিলে, আমাদের কুত্রাপি শ্রেয়ঃ নাই।

এখন্ত আমাদের পক্ষে আদৌ ভাষা এবং সাহিত্যের উন্নতি, তার পরেই অন্য কথা। সরস্বতী, যিনি জ্ঞানমাতা এবং ভাবমাতা, তিনিই পরমুহূর্ত্তে কর্ম্মদেবতারূপে প্রকটিত হন। বাঙ্গালী এযাবৎ জগতে যাহা যাহা করিয়াছে, তাহার সমস্তই আদৌ ভাবজগতে তাহার বাণীধাতার স্তন্যরূপে লাভ করিয়াই কর্ম্মরূপে পরিণত হইয়াছে। জীবন সাধনার এই সামান্য সূক্ষ্ম কথা যে ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, এবং বুঝিয়াও উদ্যমক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহে না, তাহার সঙ্গে আমাদের কথা নাই।

দেখিতেছি, কলিকাতা য়ুনিভার্সিটীর এই সৎ সঙ্কল্পে এখনও দেশ সম্যক জাগে নাই। দেশের নিকট সংবাদ দান করা, বা কোন বিষয়ে কর্ম্মউদ্যম জাগ্রত করা যাঁহারা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই এ ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝিতেছেন না! গবর্ণমেণ্ট য়ুনিভার্সিটীর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া থাকিলেও, এই নূতন ব্যাপারে অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন না—হয়ত বর্ত্তমান অবস্থা গতিকেই পারেন না। এ অবস্থায় যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া দেশকে উন্নতিপথে পরিচালিত করিতে ক্ষমতা রাখেন, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে বাঙ্গালীর য়ুনিভার্সিটীর এই কর্ম্ম-কল্পনা যে হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই বিলীন হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য বাঙ্গালার ধনীগণের পক্ষে যে অর্থ সাহায্য যৎসামান্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, প্রতি বৎসর আমোদ উৎসবেই যে দেশে এইরূপ কার্য্য প্রয়োজনের চতুর্গুণ অর্থ উড়িয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে যদি দেশের মহোন্নতি সূচক সৎকর্ম্মের জন্য উদ্যমশীল একজনও না থাকেন, তা হইলে বাঙ্গালী জাতির আর আশা কোথায়? যেদিন স্যর আশুতোষের প্রস্তাবে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে দিনই দেশের হিতার্থিগণ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা হস্তে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া য়ুনিভার্সিটীর দ্বারস্থ হওয়া বাঞ্ছিত ছিল।—নব্যভারত।

"পল্লীবার্ত্তা"

পাবনায় কৃষিক্ষেত্র।—পাবনা জেলার কৃষিশিল্পের উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইতেছে এবং ইহার জন্য পাবনা জেলার অন্তর্গত চাঁদমারীর নিকট একটী স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট উহার ইমারত ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকা দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। উহার জমি ইত্যাদি ক্রয় করিতে যাহা লাগিবে তাহা পাবনার ডিঃ বোর্ড দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদিগের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব রায় রমণীমোহন দাস বাহাদুরের বিশেষযত্নে ও চেষ্টায় পাবনাতে এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইল।

• • •

দেশের এই দুঃখ কষ্টের সময় কৃষিশিল্পের উন্নতি একান্ত প্রার্থনীয়। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রভূত উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আরও সুখের বিষয় এই যে আমাদের পাবনার জমিদারবর্গ কৃষির উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী জমিদারদ্বয় ইতঃমধ্যে প্রজার উন্নতিকল্পে পাবনার ডিঃ এগ্রিকালচার অফিসারের পরামর্শে চাঁদপুরে একটী কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। আমাদের সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহার কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন। আমরা উক্ত জমিদার দ্বয়ের সাধু উদ্দেশ্যের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি। জমিদারবর্গ প্রজার উন্নতিকল্পে এইরূপ বদ্ধপরিকর হইলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।

———

দরিদ্রের অবস্থা।—"যথাপূর্ব্বং তথাপর"—আমাদের দিন একই ভাবে চলিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন অভাব আর্ত্তনাদের মধ্যেই আমাদের জীবন বোধহয় শেষ করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের দর আর কমিল না। চাউল দাইল মরীচ তেল অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে। জেলার সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ধান সিকি পরিমাণও গৃহজাত হইতে পারে নাই। লোকে রবিশস্যের আশা করিয়াছিল, তাহাতেও নিরাশ হইতে হইয়াছে। মটর খেসারী দাইল কাঁচি ওজনে দশ পয়সা বার পয়সা সের বিক্রয় হইতেছে; সরিষার তেল বার আনা সের বিকাইতেছে। দেশের কয়জন লোক এই দাম দিয়া জিনিষ খাইতে পারে?

কাপড়ের অবস্থা আরও ভয়ানক। গবর্ণমেণ্টত জবাব দিয়াছেন, ষ্টাণ্ডার্ড কাপড় বাঙ্গলায় দেওয়া হইবে না। কাপড় পূর্ব্ববৎ চড়া দরেই বিক্রয় হইতেছে। পুরা মাপের কাপড় ৬৲ টাকা জোড়ার কমে পাওয়া যায় না। এরূপে আর কতদিন চলিতে পারে?

সহরে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ কমিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু মফঃস্বলে এখনও ইহার নিবৃত্তি হয় নাই। কার দেখা কে দেখে, আর কার চিকিৎসাই বা কে করে? যেমন আক্রমণ সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যাইতেছে। জেলার বহু পল্লি এবার একেবারে জনশূন্য হইয়া গেল।

পল্লীর এখন সর্ব্বাপেক্ষা ভাবনার কথা—জল কষ্টের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। খালে বিলে বর্ষার সঞ্চিত পচা জল যাহা কিছু ছিল এ কয়দিনত তাহাতেই চলিল। এখন তাহাওত শুকাইয়া গেল। কি পান করিয়া পল্লীর নরনারী এখন জীবন রক্ষা করিবে? বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, জলাভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। উপদেশ দিবার লোকের অভাব দৃষ্ট হয় না কিন্তু কাজ করিবার একজন লোকও কেখুজিয়া দেখিতে পাই না। প্রবন্ধ ও বক্তৃতার অভাব নাই কিন্তু কাজ করিবার লোকেরই যে অভাব। বাঙ্গালীর কোন্ মহাপুরুষ প্রকৃত কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পল্লী সংস্কারের পথপ্রদর্শক হইবেন?—সুরাজ।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা।—শ্রাবণের ধারা বর্ষণের পর পর্জ্জন্যদেবের কৃপা আর হয় নাই। হৈমন্তিক ধান্যের আশায় শৈলকুপা অঞ্চল বাসীগণ আশান্বিত ছিল কিন্তু বর্ষনাভাবে ধান্য পুষ্ট হইল না, পোকায় খাইল। চৈতালি শস্য আদৌ হয় নাই, মসুরি, কলাই প্রভৃতি অগ্নি মূল্য। ধান্য এখন ৬০এর ওজনে ২৫ সের বিক্রয় হইতেছে, চাউল ৯ সের, বস্ত্রাদির মূল্যও হ্রাস পায় নাই। বৈশাখ মাস আসিতে না আসিতে দুর্ভিক্ষ করাল বদন ব্যাদন করিবে এটা ধ্রুব সত্য। এখনই চাউলের বাজারে হাহাকার, এতদুপরি সেটেলমেণ্টের খরচা দিতে হইবে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে কত পরিবারে হাহাকার উঠিয়াছে। এক বিন্দু ঔষধের অভাবে, এক ঝিনুক পথ্যের অভাবে, বস্ত্রাভাবে কতলোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহার খোঁজ কেহ রাখে না তারপর ভীষণ অনশন, আমাদের ভবিষ্যত জুড়িয়া বসিয়া আছে, জেলা কর্ত্তৃপক্ষ এখন হইতেই প্রস্তুত হউন।

জল কষ্ট।—যশোহরের হাজা মজা নদ নদীর সংস্কার কল্পে যশোহর ড্রেনেজ ডিভিসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুমার নদের মাপ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু তারপর কি এক অজ্ঞাত কারণে আর ড্রেনেজ ডিভিসনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এবার কুমার একেবারে শীর্ণকায় স্থানে স্থানে এক হাঁটু জলও নাই, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? শীতাতপের যেরূপ দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে ওলাওটা প্রভৃতি ব্যাধির আশঙ্কার কারণ যথেষ্ট বিদ্যমান। এই স্বল্পতোয় কুমার জলে ওলাওঠার বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে কি ভীষণ পরিণাম হইবে, আমরা বলি "ভিখ নহি মাঙতা, কুত্তা ফিন্ লেও" রেল চাই না—নদীপথ সুপরিস্কৃত করিয়া দাও। এসম্বন্ধে বারান্তরে আমরা সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি।—যশোহর পত্রিকা।

বৈশাখ স্মৃতি

গোধূলির ব্যগ্র বাহুপাশে,
ধরা দিয়া রাঙারবি মৃদু মৃদু হাসে ;
দাঁড়ায়ে পথের ধারে নিভৃত প্রান্তরে,
তোমারে স্মরিয়া বুক বেদনায় ভরে ;
শুধু মনে হয়—
সে দুঃসহ মিলনের আধ অভিনয়।

এক সঙ্গে যাত্রা দুজনার
শেষে হয়ে গেছে কিগো বান্ধব আমার!
স্মরিয়া তোমারে তবু কেন অশ্রু ঝরে,
আবার মিলিব মোরা কোন লোকান্তরে
ওগো নিরদয়,
চরণে ঢালিয়া দিতে নিষ্ফল সঞ্চয়।

মরমের স্তব্ধ তীরে মোর,
ঘনাইয়া আসে ধীরে অন্ধকার ঘোর ;
দীর্ঘশ্বাস যায় মিশি উতলা বাতাসে,
লাঞ্ছিত প্রণয় পড়ি' পরাণের পাশে
হাহাকার ময়,
বৈশাখ চলিয়া যায় দলিয়া হৃদয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসু বি. এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ—অল্পমূল্যে পুরাতন উপাসনা একসাথে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gauranga Press,

71/1 Mirzapur St. Calcutta.

Published by Pulin Behary Dass,

11, College Square, Calcutta.

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষশয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ। জ্যৈষ্ঠ—১৩২৬ ২য় সংখ্যা।

গেঁটে ও গীতা

জর্ম্মান মহাকবি গেঁটের ফাউষ্ট (Faust) বিশ্ব-সাহিত্যের একটী অমর কাব্য গ্রন্থ। অনেক বিজ্ঞসমালোচকের মতে Faust আধুনিক সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অধিকাংশ সাহিত্যরস-পিপাসুদের মধ্যে Faust প্রায় অপরিচিত। সাধ থাকিলেও অনেকে এর রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত; তার কারণ তিনটী। প্রথমতঃ—Faust একটা কঠিন বিদেশী ভাষায় লিখিত; দ্বিতীয়তঃ উহার নিগূঢ় তত্ত্ব বড় দুর্ব্বোধ্য; তৃতীয়তঃ ইংরেজী ভাষায় উহার ব্যাখ্যা পুস্তক দু'চার খানা থাকলেও এ দেশে তা দুর্লভ। শুধু তর্জ্জমা পড়ে উহার অর্থ ও তত্ত্ব বোঝা ভারি কঠিন। মানব-জাতির জীবন রহস্যের একটা সনাতন সমস্যা পূরণ হচ্ছে Faustএর প্রতিপাদ্য। Faust আকারে একটা নাটক হ'লেও আসলে একটা দার্শনিক তত্ত্ব বিচার; অথচ artএর সাহায্যে এমনি সুন্দর ভাবে এটার মীমাংসার চেষ্টা হয়েছে যা দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এক Faustএর তত্ত্ব আলোচনা করলে বোঝা যায় Goethe কত বড় একজন মহাকবি।

গত চার পাঁচ বছর হতে ফাউষ্ট কাব্য পড়ে হৃদয়ঙ্গম করবার একটা প্রবল ইচ্ছা হয়। অনেকবার এর কাঠিন্য দেখে হতাশ হয়ে পশ্চাৎপদ হয়েছি; আবার ব্যাকুল চিত্তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে হাতে তুলে নিয়েছি। অনেক সাধ্য সাধনা করে এতদিন পরে তবে যেন একটু এর মর্ম্ম উদ্ঘাটন করতে পেরেছি বলে মনে হয়। সমগ্র ভাবে, খুঁটিনাটি ধরে, Faust যে বুঝতে পেরেছি বা বোঝাতে পারি সে দুঃসাহস আমার নাই; তবে এর স্থূল বক্তব্য যেন বোঝা গেছে বলে মনে হয়।

যে সমস্যা পূরণ চেষ্টা Faustএর প্রধান লক্ষ্য তা, অতি সুন্দর, অতি মহান্। আর আমাদের গীতার আসল শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে Faustএর শিক্ষণীয় বিষয়ের সাদৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। যে আশ্বাস 'গীতা……অশান্ত, অস্থির মতি মানুষকে দিতে চান, গেঁটেও Faust সাহায্যে ঠিক সেই আশ্বাস দিয়াছেন। গীতা খাঁটি দর্শন; Faust সেই দর্শনকে কাব্যাকারে গড়ে তুলেছে মাত্র। এই যা তফাৎ।

এইখানে সময় থাকতে একটা কথা বলে রাখা ভাল। অনেকেই প্রবন্ধের শিরোনামা দেখে মুচকে হেসে বিদ্রূপ

স্বরে বলবেন "বাবা এতেও গীতার মসলা! ভারত-গোঁড়ামির জ্বালায় গেলাম, লিখছ বিদেশী সাহিত্যের সমালোচনা তাই লেখ, তাতে আবার আর্য্যামির গরম মসলা না মেশালেই নয়—গেলাম বাবা গীতার জ্বালায়! সাধে কি ছিজুরায় গান বেঁধেছিল 'গীতায় মরে আছি গীতায় মরে আছি'।" উত্তরে—স্বপক্ষে আমার সানুনয় নিবেদন বাস্তবিকই গীতার সঙ্গে গেঁটের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ঐক্য অসাধারণ, একেবারে এত বেশী রকমের মিল যে আশ্চর্য্য হতে হয়। আমি কোনো এক অতি বিজ্ঞ ভাবুক ইংরেজ সমালোচকের ফাউষ্ট সমালোচনা পড়ে এই সাদৃশ্য অনুভব করি। বিশদভাবে যখন আমি এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করব তখন পাঠক নিজেই এই সাদৃশ্য অনুভব করবেন।

উভয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য বোঝাতে হ'লে আমাকে তিনটী জিনিসের সংক্ষেপে অবতারণা করতে হবে। প্রথম, ফাউষ্টের গল্পভাগ (যা গেঁটে লিখেছেন) দ্বিতীয় এই গল্পচ্ছলে কবির মূল বক্তব্য—তৃতীয়তঃ গীতারমূল শিক্ষণীয় বিষয়; তারপর উভয় গ্রন্থের সাদৃশ্য পাঠক নিজেই বিচার করবেন। দেখবেন এই সাদৃশ্য উপলব্ধি কিছু মাত্র কষ্ট-কল্পিত নয়। আর আশ্চর্য্যই বা কি? একই জগত-তত্ত্বের মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশীয় ঋষিদের দ্বারা একই রকমে হয়েছে তা'র দৃষ্টান্তও বিরল নহে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে স্পাইনোজা বা হেগেলের মত-সাদৃশ্য মনে করুন।

ফাউষ্টের আখ্যান ভাগ।

মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের ফাউষ্ট বিষয়ক পৌরাণিক কাহিনী অল্প বিস্তর সকলেই জানেন। এই ফাউষ্ট একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্ব-বিদ্যাপারদর্শী হয়ে ইনি বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অস্থির হন। সংসারের ভোগ-পন্থা ত্যাগ ক'রে ইনি যোগ-পন্থা অবলম্বন করেন। বিশ্বব্যাপারের মূলে যে কি রহস্য আছে তা' ভেদ করবার জন্য ইনি যাদুবিদ্যা পর্য্যন্ত আয়ত্ত করেন। অদৃশ্য লোকের অশরীরী জীবরাও এঁর যাদুবলে বশীভূত হন। তিনি তাদের সাহায্যে পরাতত্ত্ব আয়ত্ত করিতেও সমর্থ হন; কিন্তু কিছুতেই তাঁর আশ মিটিল না। বিশ্বরহস্য ভেদ করা দূরে থাক উহা আরো তার কাছে জটীল হয়ে পড়ে। তাঁর মানসিক অশান্তি আরো যেন বেড়ে গেল। তিনি জ্ঞানের উপর চটে গেলেন। জ্ঞানমার্গেও যে সুখ নাই ইহা তিনি বুঝলেন। তিনি তখন ভোগপথের পথিক হতে ব্যাকুল হলেন। তিনি মনে মনে তর্ক করলেন—"দূর হোক্‌গে জ্ঞান আলোচনা, এতেও তো কোনো শান্তি নেই, কেন তবে বৃথা শুষ্ক জ্ঞানের সাধনা করে জীবনটাকে নষ্ট করি; দেখা যাক্ ভোগের পথে চলে সুখশান্তি পাওয়া যায় কি না—"। তাঁর মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ ঠিক তখন শয়তান মেফিস্‌টফ্‌লিস্ ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন আর প্রস্তাব কল্লেন "ফাউষ্ট, তুমি সংসারের সুখ ভোগ চাও?" ফাউষ্ট বল্লেন—"হাঁ চাই"। মেফিস্ টফ্‌লিস্ বল্লেন—"আমি তোমাকে এমন শক্তি দিতে পারি যে ইচ্ছে করলে তুমি সমস্ত সংসারসুখ আয়ত্ব করতে পারবে কিন্তু বিনিময়ে তোমার আত্মা আমার কাছে বাঁধা দিতে হবে—"। ফাউষ্ট রাজী হলেন—চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন। মেফিস্ ফাউষ্টকে সঙ্গে করে, সংসারের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। সংসার সম্ভোগের এক মাত্র পথ প্রেমের ভিতর দিয়া। তাই মেফিস্ ফাউষ্টকে প্রেমে পড়ালেন। মারগারেট নাম্নী একটী গুণবতী শান্তশীলা দরিদ্রা কুমারীর সহিত ফাউষ্টের সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাৎ ফলে উভয়ে উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ হন। প্রেমের পথ সরল ও সহজ নয়। ভয়, বাধা, বিড়ম্বনা প্রভৃতি নানা বাধা এ-পথে। ফাউষ্টকে এ সমস্তই সহ্য করতে হল। বালিকা মারগারেট মনের শান্তি হারাল। তার হল উভয় সংকট,—শ্যাম রাখি কি কুল রাখি। শ্যাম রাখতে গিয়া কুল হারাল। ফাউষ্টের প্রেমালাপে মুগ্ধ হয়ে সে তাকে একদিন লুকিয়ে ঘরে ঢুকতে দেয়। মারগারেটের কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মধ্যে কানা ঘুষা চলতে লাগল। তার ভাই Valentine ইহা জানতে পেরে বাড়ি আসে ও প্রেমিক প্রেমিকার বিশ্রম্ভ-আলাপের মধ্যে এসে পড়ে। মহা বিপদ! মারগারেট ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। ফাউষ্ট কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল। মেফিস্ সর্ব্বদাই ফাউষ্টের সহচর। সে অস্ত্রাঘাতে এই বাধাকে সহজে পথ হতে সরিয়ে দিল। Valentine

ইহলীলা সংবরণ করল। এই অবধি প্রেমের দায়ে ভাইকে হারিয়ে মারগারেট অশান্ত হয়ে পড়ল! উপায় নাই। ভোগের পথে অনেক কণ্টক। ফাউষ্টেরও বড় বিরক্তি বোধ হল! তারও উপায় নাই। সংসারে সুখের পথে চলতে গেলে এসব বাধা বিঘ্ন উৎপাৎ সহ্য করতেই হবে। অপ্রিয়কে গায়ে পেতে না নিলে প্রেয়ঃ ও শ্রেয় লাভ অসম্ভব। এখানেই বিপদের শেষ নয়—ভোগের তৃপ্তির এখানেও বিরাম নাই…মারগারেট অন্তঃসত্ত্বা হ'ল। পাপের ফল ভুগতেই হবে। অবৈধ প্রেমের যা পরিনাম; কুল রক্ষা করতে গিয়া মারগারেটকে ভ্রূণ হত্যায় লিপ্ত হ'তে হ'ল! পাপের উপর পাপ! ……ভ্রূণ হত্যা করে মারগারেট ধরা পড়ল।……পুলিসে তাকে ধরে বিচারালয়ে নিয়ে গেল। বিচারে মারগারেটের কারাবাস দণ্ড হইল! কারাগারে বন্দিনী হয়ে, শোকে ও ভয়ে…হতভাগিণী উন্মাদ হয়ে গেল! কিন্তু এত বিপদ, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা সত্ত্বেও মারগারেটের প্রেম অটল ও অচল! সে কি গভীর ও সুন্দর প্রেম!…প্রণয়-বিদ্ধা সরলা বালিকা সংসারের ভয়াবহ বিপদ-জালে জড়িত হয়ে কুল মান ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যেও কেমন করে' বরণীয় হৃদয়-দেবতার চিন্তাকে সার করে' ও সেই আশার আশ্বাসে বেঁচে থাকে তার অতুলনীয় চিত্র এই মারগারেটে, বিশ্ব সাহিত্যে এর তুলনা নেই বল্লেও হয়। আর প্রাণসমা প্রিয়তমা প্রণয়িনীর এই শোচনীয় পরিণাম দেখে ফাউষ্টেরও হৃদয়ের কি যম-যন্ত্রণা! শান্তির আশায় সুখের মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে ফাউষ্ট ভোগ পথের পথিক হয়েছিল। ভ্রমেও ভাবেনি যে প্রেমের দায়ে তিন তিনটা খুনের অপবাদ ও দায়িত্ব তার ঘাড়ে চাপ্‌বে। হতাশ হয়ে ফাউষ্ট মেফিস্‌কে দোষী করলেন। কেন তুমি আমাকে আগে ইঙ্গিতেও জানালেনা, আমার সুখের জন্যে একটা নিরপরাধী সরলার সুখের জীবনের এই ভয়াবহ পরিনাম হবে?", মেফিষ্ট নির্ম্মম বিদ্রূপ স্বরে বল্লেন—"মারগারেট-ই কি এই দলের প্রথম? এমন শত শত হতভাগিনীর এই পরিণাম প্রতিদিন জগতের সর্ব্বত্রই ঘট্‌ছে" জগতের সুখভোগের এই ভয়াবহ চিত্র স্মরণ করে, ফাউষ্ট, দুঃখে রাগে ও বিরক্তিতে অস্থির হয়ে উঠলেন। উপায় নাই! ফাউষ্ট শুনলেন মারগারেট কারাগারে। সে আস্ত উন্মাদ! পাগলের মত কখনো হাসছে, কখনো গান করছে, কখনো বা কাঁদছে! কী সে দুরবস্থা, কী সে মর্ম্মস্পর্শী করুণ দৃশ্য! ফাউষ্ট ছুটে কারাগারে প্রবেশ করলেন। তার পর প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের সে হৃদয় বিদারক দৃশ্য! মূলে পাঠ না করলে তার সঠিক্ বর্ণনা অসাধ্য। আত্মবিক্রীত ফাউষ্টের এ সুখ মুহূর্ত্ত, বেশীক্ষণ থাকল না, নির্ম্মম মেফিষ্ট এসে তাকে নিয়ে চলে গেল! মৃত্যুর করাল ছায়া তখন মারগারেটের উপর এসে পড়েছে! তাকে সেই অবস্থায় ফেলে ফাউষ্টকে মেফিষ্টর পদানুসরণ করতে হ'ল! তারও যে চুক্তিপুরণ করতে হ'বে।

মোটামুটীতে ফাউষ্ট কাহিনী এই। এই কাহিনী অবলম্বন করে গেঁটে যে বিশ্বসমস্যাটী কেবল মাত্র ইঙ্গিত করে দেখিয়েছেন তা এই:—বিশ্ব-রহস্য বা জীবের জীবন-রহস্যটাকে অনাদিকালহতে মানুষ দুইদিক দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে, জ্ঞানের দিক দিয়ে আর ভোগের দিক দিয়ে। চিরকালই মানুষ দুই দলে বিভক্ত, একদল ত্যাগী আর একদল ভোগী। একদল জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করে' জীবন রহস্য ভেদ করতে ব্যাকুল; তারা ভোগ চায় না; ভোগ অসার ও ক্ষণিক, মায়ার মোহমাত্র, ভোগে জীবনকে বুঝা যায় না—দ্বিতীয় দল বলেন জীবনের রহস্য ভেদে দরকার কি? ওতো অভেদ্য, তার চেয়ে জীবনকে যথারীতি ভোগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই বলে' তারা ভোগের চরম করে নিতে ব্যস্ত। চারিদিকেই ভোগের আয়োজন, সাজসরঞ্জাম ভোগ করতে ছাড়ি কেন? ভোগের জন্যই তো জীবজন্ম? বিশ্বরহস্য সসীমজ্ঞানের বাইরে; এর মীমাংসা চেষ্টা বৃথা।

কবি বলছেন্ যোগী ও ভোগীর এই যে উক্তি কার কথা ঠিক? কার নির্দ্ধারিত পথ যথার্থ? মানুষ সত্যই কোন্ পথের পথিক হলে' জীবন সমস্যা পুরণ করতে পারবে? গেঁটে তাঁর ফাউষ্ট কাব্যে সাক্ষাৎ ভাবে মানব মনের এই সনাতন প্রশ্নটী কেবল মাত্র ব্যক্ত করে' বল্লেও পরোক্ষ ভাবে তাঁর নিজ জীবনে ও রচনাবলীর ভিতর দিয়ে এর একমাত্র উত্তরও দিয়েছেন। তাঁর নির্দ্দিষ্ট ত্যাগ-পন্থাই এই উত্তর।

গেঁটে বলতে চান বিশ্বের দুইটী বিধা বা aspect; একটী হচ্ছে জ্ঞেয় সুতরাং লভ্য, অপরটী অজ্ঞেয় সুতরাং অলভ্য, একটী Knowable hence attainable আর একটী unknowable hence unattainable। মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি স্বভাবে সসীম। অজ্ঞেয়কে জানবার তার কোনো শক্তিই নাই। সুতরাং absoluteকে পরমতত্ত্বকে স্বরূপে জানবার তার চেষ্টা একেবারে বৃথা। যা তার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-গ্রাহ্য শুধু তাই সে জানতে পারে, এবং সেই টুকুই জেনে সন্তুষ্ট থাকে। তার সমস্ত চেষ্টার বিষয় হওয়াই ভাল। অজ্ঞেয়কে আয়ত্ত করবার জন্যে এই যে পাগলামিটা তার পক্ষে হাস্যজনক। জীবন রহস্য আসলে জ্ঞানাতীত ব্যাপার। তার কাছে জ্ঞানমাত্রেই relative—absolute নয় এইটুকু জেনে Relative জ্ঞান লাভেই সে চেষ্টা করুক। আর এই Relative জ্ঞানই যে পরিমানে অসীম, মানুষ সমস্ত জীবন ব্যয় করেও তার ইয়ত্তা করে উঠতে পারে না। এই জ্ঞান লাভ হলেই যে তার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ হবে। Absolute যা অজ্ঞেয় তাকে জানবার জন্যে জীবন নষ্ট করার ফল কি? এই টুকু জেনে যে যার অবস্থানুযায়ী কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে করে গেলেই জীবন সার্থক হবে। তার পর সুখ-ভোগ—, আদর্শ-সুখ-দুঃখ কষ্টহীন যে নিষ্কলঙ্ক সংসার সুখ তাও ঐ Absolute জ্ঞানের মত অলভ্য আর এমন সুখ হতেও পারে না। এর আশায় অশান্ত হয়ে পাগলের মত ছুটাছুটী তাও হাস্যকর। পূর্ণ-জ্ঞান আর পূর্ণ সুখ দুই-ই মানুষের লাভ-শক্তির বাইরে। এই কাল্পনিক দুঃখহীন সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে দুঃখ মিশানো সুখকে বরণ করে নিতে হবে। সুখও যে relative! গেঁটে বলছেন "কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?" সুখ চাওতো দুঃখকে বরণ করে নাও। পূর্ণজ্ঞানের পথও যেমন হতাশের পথ, পূর্ণ সুখের পথও তেমনি। যে পথেই চল—জ্ঞানের পথেই যাও আর কর্ম্মের পথেই যাও, যোগীই হও আর ভোগীই হও ত্যাগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এই ত্যাগ মন্ত্র সাধন করে যে পথেই যাবে সেই পথেই সিদ্ধি। আন্তরিকতা ও একাগ্রতা এই দুইটীর সাহায্যে ত্যাগ মন্ত্র জপ্‌তে জপ্‌তে কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়ে সিদ্ধি লাভ ছাড়া অন্যপথ আর নাই। জীবনের সমস্ত বাধা বিঘ্নকে, জ্ঞানের সসীমতা ও ভোগের বিড়ম্বনাকে মেনে নিয়ে অনাসক্ত চিত্তে কাজ করে গেলে নিজের ও বিশ্বের শ্রেয়ঃ লাভ হবেই হবে। জ্ঞানের ও ভোগের সার্থকতা এতেই আছে আর কিছুতেই নেই।

দেখা যাক্ Faust-কাব্যে এই সব উক্তির সঙ্গতি কোথায়। ফাউষ্ট জ্ঞান-পিপাসু; সে-যে সে জ্ঞান নয়, Absolute এর জ্ঞান! তার কমে তার তৃপ্তি হচ্ছে না। সে সমস্ত-বিশ্ব-রহস্যটা নখ-দর্পণে দেখ্‌তে চায়; সমস্ত রহস্য ভেদ করতে চায়! কিন্তু বৃথা, তার আশা কিছুতেই মিটল না! কি সে আশা?

That I with piercing ken may see
The world's indwelling energy,
The hidden seeds of life explore,
And deal in words & forms no more.

কিন্তু সসীম মানবী-শক্তির কাছে সে অসীম জ্ঞান রহস্য ধরা পড়বে কেন? তাই Faustএর মর্ম্মভেদী বিলাপ Thus my supremest bliss ends in delusion— তাই মনের খেদে Faust আত্মঘাতী হ'তে ইচ্ছা করলেন। জীবন বৃথা গেল বলে যে আক্ষেপ করে, তার কাছে হঠাৎ জীবন সার্থক হবার লোভ এলে সে, সে লোভ ছাড়ে কি? মেফিষ্টো আসিয়া Faustকে ভোগের ভিতর দিয়া জীবন সার্থক করবার লোভ দেখাইল। শুষ্ক জ্ঞানের জন্য জীবনের ভোগ সুখ হাত ছাড়া করাতে Faustএর মনে ক্ষোভ হয়েছিল—সেই ভোগ সুখ পূর্ণ মাত্রায় তার ইচ্ছাধীন হবে Faustএ লোভ ত্যাগ করলেন না, তিনি অনন্ত নরক ভোগের বিনিময়ে সংসারের ক্ষণিক ভোগ কিনিলেন। দেখা যাউক সুখ ভোগ কত রকমের এবং কি পরিমানের। মেফিষ্টো Faustকে যাদুকরীর তৈরী সঞ্জীবনী সুধা খাওয়ালেন। খাইবা মাত্র Faustএর দেহে ও মনে ভোগ উপযোগী সাধ ও শক্তি দেখা দিল। সব ভোগের সার নারী প্রেম। Faustকে Mephisto মারগারেটের প্রেমে পড়াইল।

তারপর প্রেমের যা অনিবার্য্য পরিনাম ও গতি; লজ্জা ঘৃণা, বিড়ম্বণা, ভয় দুঃখ একে একে Faustএর চিত্তকে

ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করল। Faustএর জ্ঞান চক্ষু খুলতে লাগল। কই সুখ? কোথা সুখ? অনাবিল, অকলঙ্ক, দুঃখহীন সুখ কই? এই কি ভোগ? এ যে যম-যন্ত্রণা ভোগ? এ কি পরিণাম? Faust আত্মার বিনিময়ে যে সুখের আশায় সংসার-ভোগ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল কোথা সেই সমুজ্জ্বল সুখ রত্ন? হতাশের আক্ষেপ করে Faust বুঝল জ্ঞানেও সুখ নাই, ভোগেও সুখ নাই ‼ সুখ বা শান্তি এ একটা মায়া-মরিচীকা! পূর্ণ ভ্রান্তি!

এখন কবির এই Faustএর জায়গায় মানব জাতিকে বসানো যাউক। মানব জাতি কি ঠিক এই Faust এর মতনই ভ্রান্তভাবে সুখের আশায় কথনো বা জ্ঞান-পথে কখনো বা ভোগ-পথে লাফালাফি করছে না?, আর কোনো পথে শান্তি না পেয়ে ক্ষোভে ও দুঃখে আক্ষেপ করছে না?—"না সুখ পৃথিবীতে নাই, শান্তি ভ্রান্তি মাত্র! জীবন একটা দুর্ব্বহ দুঃখের ভার মাত্র!" জ্ঞানমার্গে থেকে জ্ঞানীরও এই অশান্তি, ভোগমার্গে চলেও ভোগীর এই বিলাপ!

তবে গতি কি? জীবন কি বৃথা? শান্তি কি নাই? এর উত্তরে মহাকবি আশ্বাস বাণী উচ্চারণ করতেছেন—"হে অশান্ত মানব মন, শান্তি আছে, অলভ্য অজ্ঞেয় অসীমের বৃথানুসন্ধানে নয়,—লভ্য ও জ্ঞেয় যে জগত-তত্ত্ব তার প্রণিধানে। শান্তি আছে—অনাসক্ত ভাবে জ্ঞান বা কর্ম্ম পথে থেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে—শান্তি আছে—জ্ঞান পথে নিজের সসীমতা উপলব্ধিতে ও ভোগপথে দুঃখকে বরণ করাতে,—তা ছাড়া নান্য পন্থা। পূর্ণ জ্ঞান লাভ ও দুঃখ হীন পূর্ণ সুখ লাভ সসীম উপাধিযুক্ত জীবের লভ্য নয় এইটী জেনে নির্ব্বিকার ভাবে নিজের ও জগতের শ্রেয়ঃ সাধন করাই একমাত্র আনন্দের পথ—"।

এখন পাঠক গীতার অমর উপদেশবাণী স্মরণ করুন। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও গেঁটের Doctrine of Renunciation (Das wir entsagen miissen) তুলনা করিয়া দেখুন উভয়ে সাদৃশ্য কি সুন্দর, কত নিকট।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি, এ

অম্বুঢ়া

যতদিন তুমি কণ্ঠে কাহারো
দাওনি পরায়ে প্রণয় মালা,
ততদিন তুমি রূপসীর রাণী
ভুবনমোহিনী পল্লীবালা।
ফুটিয়া রহিলে গোলাপ তাহার
সৌরভে রূপে কুঞ্জভরে',
ছিঁড়িয়া তাহারে বুকেও ধরিলে
আর কভু নাহি মানস হরে।

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ

রামেন্দ্রসুন্দর

যে সকল দীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে বঙ্গবাণীর মন্দির আলোকিত তাহার একটী দীপ নিবিল। বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালা পাঠকের সুহৃৎ, আদর্শ চরিত্র, নিরহঙ্কার, জ্ঞান-ধ্যানমগ্ন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরলোকগত হইয়াছেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে রামেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল কিন্তু কর্ম্মের বিরাম ছিল না। এই অবস্থায় কয়েক মাস পূর্ব্বে দুঃসহ কন্যাশোকে রামেন্দ্রসুন্দরের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর তাঁহার মাতৃদেবী পুত্রের পূর্ব্বে পরলোকগত হয়েন। রামেন্দ্রসুন্দর মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে স্বগ্রাম জেমোকান্দীতে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া কয় দিন মাত্র কলিকাতা বাসের পর জাহ্নবীর কূলে দেহরক্ষা করিলেন। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যাহা গেল তাহা আর পাইব না; যে ক্ষতি হইল, তাহার আর পূরণ হইবে না, হইবার নহে।

বিজ্ঞানে, দর্শনে, বেদে রামেন্দ্রসুন্দরের অসাধারণ অধিকার ছিল। তিনি দর্শন বিজ্ঞানের জটিলতত্ত্ব ভাষাতত্ত্বের কথা যেমন সরলভাবে বাঙ্গালায় বুঝাইয়াছেন তেমন বুঝি আর কেহ পারে নাই। প্রকৃতির রহস্য তিনি সরল বাঙ্গালায় বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছেন। আজ রামেন্দ্রহীন সাহিত্য-সমাজ রামহীন অযোধ্যার দশা প্রাপ্ত হইল।

আমরা দীর্ঘকাল, প্রায় ২০ বৎসর, রামেন্দ্র বাবুর বন্ধুত্ব সম্ভোগের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। দীর্ঘকাল পরিষদের সম্পর্কে একযোগে কাজ করিয়াছি, কোন দিন রামেন্দ্র বাবুর উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ পাই নাই, মতান্তরের অবসর ঘটে নাই। কেননা, রামেন্দ্রসুন্দর কখন অন্যায় মত পোষণ করেন নাই। পরিষদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের যে সম্বন্ধ, তাহার স্বরূপ যাঁহারা তাহা দেখেন নাই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপনাবধি তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। কেননা, রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে দিন পরাবসথী পরিষদকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আমরা পরিষদের সহকারী সম্পাদকরূপে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন সে দিনও রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়াছি। যখন পরিষদের গৃহনির্ম্মাণ জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, তখনও রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে গিয়াছি। যখনই পরিষদের কোন বিপদ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তখনই দূর-চক্রবালে বিপদের মেঘ-সঞ্চার লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিয়াছেন। এই পরিষদ লইয়া কেহ কেহ রামেন্দ্রসুন্দরের কার্য্যে ও কলঙ্কলেপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু সে কলঙ্ক শেষে তাঁহাদিগকেই কলঙ্কিত করিয়াছে—রামেন্দ্রসুন্দরকে স্পর্শ করিতেও পারে নাই। হিমাচলের উত্তুঙ্গশৃঙ্গের শুভ্র তুষার কি কেহ মলিন করিতে পারে? পরিষদের জন্য বাঙ্গালার অনেক ধনী, অনেক কোবিদ পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের পরিষদ-প্রেমের তুলনা ছিল না। কাশিমবাজারের মহারাজা সার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষদের জন্য ভূমি দান করিয়াছেন, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও গৃহনির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থদান করিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ অবসর দান করিয়াছেন। কিন্তু সে দানে কেহই নিঃস্ব হয়েন নাই। ব্রাহ্মণ রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের কাজে আপনার সমস্ত স্বাস্থ্য ও উদ্যম ব্যয় করিয়া শয্যা লইয়াছিলেন সেই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা। রামেন্দ্রসুন্দরের এই আদর্শের অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন একজন—ব্যোমকেশ মুস্তফী।

আজ রামেন্দ্রহীন পরিষদের ভবিষ্যৎ কি হইবে, কে বলিতে পারে? দীর্ঘ ২০ বৎসরকাল প্রথম ১৫ বৎসর পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সন্ধান লইয়াছি, "রামেন্দ্র বাবু আসিয়াছেন ত?" শেষ পাঁচ বৎসর পরিষদ-মন্দিরে পদার্পণ করিয়াই সন্ধান লইয়াছি,

"রামেন্দ্র বাবু কেমন আছেন ?" আজ সেই রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের ভাবনা হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ ও আশীর্ব্বাদ অক্ষয় কবচরূপে পরিষদকে সর্ব্ববিধ বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুক।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনকে পরিষদের সহিত সম্পর্কশূন্য করিবার চেষ্টায় রামেন্দ্রসুন্দর হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। যাঁহারা রামেন্দ্রসুন্দর অসুস্থ বলিয়া তাঁহাকে "যমদণ্ডে পীড়িত" বলিতেও লজ্জানুভব করে নাই তাঁহাদের উপর ও রামেন্দ্রসুন্দর রাগ করেন নাই, এমন তাঁহার ক্ষমাশীলতা। পরিষদ তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার নিকট আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণস্বীকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বড় আশঙ্কা ছিল, বুঝি কাল সে চেষ্টার অবসর ও দিবেনা। গত-পূর্ব্ব রবিবারে পরিষদের বার্ষিক সভায় রামেন্দ্রসুন্দর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি যে সে কথা শুনিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আমরা আমাদের এই দারুণ শোকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনার অবসর পাইব।

রাজনীতিতে রামেন্দ্রসুন্দর জাতীয়দলভুক্ত ছিলেন। তিনি কখন দলাদলির আবর্ত্তে পতিত হয়েন নাই—কখন প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দেন নাই। কিন্তু তিনি মতে ও কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশী ছিলেন। সোমবার প্রাতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের উপাধিবর্জ্জনের কথার আলোচনা হয়। সেই দিন অপরাহ্নেই তাঁহার জ্ঞানলোপ হয়—আর জ্ঞানোদয় হয় নাই।

শনিবার অপরাহ্নেই বুঝা গেল—দীপনির্ব্বাণের আর অধিক বিলম্ব নাই। সংবাদ পাইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের বন্ধুবান্ধবেরা শেষবার রামেন্দ্রভবনে গমন করিলেন। তখন জীবনের আর কোন আশা নাই। সেই দিন রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময় রামেন্দ্রসুন্দর আপনার সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন।

এশোকে সান্ত্বনা নাই—এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে।

তিনি পরিষদের রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার বাসনা বুকে লইয়া শ্মশানশয়নে শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণ যদি তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্কল্পিত রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার উপায় করেন, তবেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহার তৃপ্তিসাধন করা হইবে।

জীবন কথা।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুনগোত্রীয় জিঝেতীয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম মুর্শিদাবাদ জিলার টেঁয়াগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমোর রাজবাটিতে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের দুই পুত্র—কৃষ্ণসুন্দর ও ব্রজসুন্দর। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গালায় মাধব-সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণসিন্দুর সিংহ প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভায়, তেজস্বিতায় ও চরিত্রগুণে সমাজে সমাদৃত হইয়াছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং সেক্সপীয়ারের একখানি নাটক সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন।

'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের জন্য রামেন্দ্র বাবু স্বীয় জীবনের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে, বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।"

"পাঠশালায় বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতিবৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা বহি পড়ার নেশা জন্মিয়াছিল।"

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল

পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এনট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮২ অব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।"

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুসঙ্গিক সুবর্ণ পদক লাভ করি।"

"১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি, এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্ন পূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ বন্ধ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।"

"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম, এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটা 'ক্লাস এক্সারসাইজ' দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন ; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন ;—আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি ; তন্মধ্যে ঐ 'Out of the way the best'—কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার—"Out of the way the best"। তাঁহার, ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুসঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।"

"পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮) পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—'The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination.' অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্র তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

"পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এনট্রান্সে পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফার্ষ্ট আর্টসে পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এনট্রান্সে অন্যতম হেড এক্জামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।"

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। * * কৃষ্ণকমল বাবুর পদত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছি।"

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞানশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। 'সাধনা' পত্রিকা বাহির হইলে 'মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

"১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া 'প্রকৃতি' প্রকাশ করিয়াছি।"

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।"

"১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্থাপন অবধি উহার সহিত সংস্পৃষ্ট আছি। ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

শেষে রামেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।"—দৈনিক বসুমতী।

'জ্যৈষ্ঠ-মধু।'

মধু, মধু, মধু,—তুমি মধু তাই এই নিখিল বিশ্ব-চরাচর আমার কাছে মধুময় হয়ে উঠেছে!

আমার আজিকার এই চরিতার্থ-প্রেম-কামনার মধ্যে তোমার মধুময় প্রাণকে অনুভব করার আনন্দাতিশয্যে শুধু ভাব্‌ছি,—

"যতক্ষণ তুমি বর্ত্তমান
ততক্ষণ আমি আছি
অন্যথা সুষুপ্তি!"

তোমার নিজের শোভা-সম্ভারের মাধুর্য্য রাশিতে আমার নয়ন-মন সার্থক, জীবন ধন্য। তোমার সমস্ত দেহ প্লাবন করিয়া মধু স্রোত আজ আমাকে শুদ্ধ-স্নানে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে! তোমার সকল মনের মধুর উৎস আজ বসু-ধারায় গলিয়া পড়িতেছে!

নয়নে তোমার মধু-দৃষ্টি, ওষ্ঠে তোমার মন-রসায়ণ তৃপ্তির মধু, কণ্ঠে তোমার লক্ষযুগের নিরাময় বাণীর মধুর শব্দ-বিন্যাস, তোমার সকল অঙ্গের উপর একটা লাবণ্যের মধু যেন তোমায় এমনি নিত্যকাল ধরে সরস করে রেখেছে, তুমি চলে যাও, ফিরে আস—তোমার অঙ্গ-সঞ্চালনে, তোমার গতি-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কেমন একটা মধুর চাঞ্চল্য, কেমন একটা মধুর ভঙ্গিমা; সব সহ্য হয় কেবল পারিনা তোমার অনিমেষ নয়নের মধু-দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকৃতে,—কেন জান? ও মধু বড় তীব্র!!!—নয়নের ওই মধুতে পাগল হইতে পারি, শক্তির উম্মাদনায় নৃত্য করিতে পারি, কিন্তু যদি জ্ঞান হারাই তবে যে আমার সব দিক পণ্ড হয়ে যাবে।

নিখিল-নয়নের সহস্র-রূপ-বিভিন্নতার মধ্যে তোমার নয়নের অনুরূপ নয়ন খুঁজিয়া পাই না।—কি যেন কি তা'তে আছে;—সুন্দর বলিলে ঠিক বলা হয় না, মধুর বলিলে সাধ মিটে না, অভিনব বলিলে অর্থ বোধ হয় না, অদ্ভুত বলিলে তৃপ্তি পাই না, অতুল বলিলে একটু গর্ব্ব অনুভব করি মাত্র,—কিন্তু যাহা বলিবার যাহা বুঝাইবার তাহার সবই থাকিয়া যায়।

ফিডিয়াসের শিল্প-সৌন্দর্য্য দেখি নাই, তবে মনে হয়, সেই প্রখ্যাত গ্রীক-শি[illegible] সুন্দরের উপাসনা, তোমার নয়নের পরিকল্পনায় আরো সার্থক হইতে পারিত; তোমার নয়নের এই রক্তিম অঞ্জন-রেখার দিকে চাইলে আমার সারা অঙ্গে একটা অসহ্য-পুলক-স্পন্দন জেগে ওঠে—আবেশ-বিহ্বলতায় আমার নয়ন আপনা হইতেই মুদিয়া আসে।—আর তোমার ওকি ভঙ্গিমার দৃষ্টি-নিক্ষেপ?—একেবারে যেন অন্তরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এক নিমেষে দেখিয়া লইতে চাও!!

ওই লালিমার মোহন-রঞ্জনে আমি অভিভূত হয়ে যাই; তোমার নয়ন-মণির স্নিগ্ধতার মধ্যে বেশ একটু মাদকতাও আছে;—নইলে আমি কেন এমন বিভোর হয়ে যাই! তোমার ওই ভ্রূ-যুগলের বঙ্কিম অঙ্কনের মধ্যে বিশ্ব-শিল্পের সৌন্দর্য্য-পিপাসার খেদ মেটেনি কি?

চোখের পাতায় পাতায়, তোমার কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ করুণা, গভীর প্রেম, অসীম অনুকম্পা, সব গোপন হয়ে আছে,—দুঃস্থ, কাঙাল তৃষিত আশাহতের জন্য তোমার এই অক্ষুন্ন অনন্ত সম্পদ তোমাকে আরো চিরন্তনের জন্য মধুময় করে রেখেছে।

যার চোখে এত প্রীতির মাধুর্য্য তার হৃদয়ের মধু-উৎস ত অবিরাম, অবিশ্রান্ত উৎসারিত হয়ে পড়্‌বেই গো!

স্মরণাতীত কাল থেকে তুমি অন্তরে অন্তরে যে মধু জমিয়ে আনছিলে, আজ তার বুঝি পরিণতি হতে চলেছে—তাই,

কুসুম-পেলব তব দু'টী ওষ্ঠ-পুটে
অন্তরের সব মধু উঠিতেছে ফুটে,
আমি তব যুগে যুগে মধু-মত্ত-অলি
খুঁজিয়া মরেছি বৃথা, কত ফুল কলি;
তুমি যে জমায়ে রাখ হৃদয়ে তোমার
এত মধু,—সে ধারণা ছিল না আমার!
বাহিরে অন্তর পাছে না হয় প্রকাশ,
ওষ্ঠে মধু তুমি তাই দিতেছ আশ্বাস?—

তুমি আজ কোনও কথা কয়ো না—দোহাই তোমার,

রহ মৌন রহ মুক ফুটায়ো না মুখ

স্তব্ধ-গৌরবের হর্ষে ভরে তোল বুক,

আজিকে ইঙ্গিত দিয়ে গেয়ো না সঙ্গীত

রাখো বীণা, সুর-সাধা থাকুক রহিত।

চেয়ে রও, চেয়ে রই যদি পারি আমি,

কণ্ঠ-মদিরায় আজ ভুলায়ো না স্বামি!

আজি আমি তোমায় প্রাণে প্রাণে নূতন করে অনুভব করতে চাই!—কিন্তু পাগল হ'ব তোমার কথায়, কথার মধুতে গাত্র-দাহ নাই বটে কিন্তু কেমন আমায় করে দেয়, আমি সব ভুলে যাই! তোমাকে আজ তুমি বলে পেতে চাই,—দোহাই বন্ধু, তুমি তোমার কথা দিয়ে মন কেড়ে নিয়ো না! আজ শুধু আমি তোমায় পেতে চাই মন দিয়ে—মন হারিয়ে ডুবে যেতে চাই না!

দূরে বন্ধু,—দূরে!—প্রিয়তম তুমি আমায় মার্জ্জনা কর আজ! আমার যুগযুগান্তের প্রাণের সামগ্রী তুমি, আজ আমি তোমার স্পর্শের মধু পেতে চাই বটে কিন্তু,—ধীরে,—বন্ধু ধীরে!!

তুমি নিজে জান না, তোমার ওই দেহের স্পর্শে কি উন্মাদনা, কি অসহ্য উত্তেজনা আছে!—তোমার স্পর্শ-সম্ভোগের মধ্যে হঠাৎ তোমায় পেলে, আমি আর কিছুই পাব না যে!

নিয়ো বঁধু নিয়ো তোমার বুকে,

দু'হাত দিয়ে আগ্‌লে ধরে চুমো দিও মুখে!

—কিন্তু আমায় অজ্ঞান করে নয়! আমি জানি তোমার স্পর্শ আমার কাছে কত প্রয়োজনের কিন্তু আমি যে তোমার স্পর্শের মধুর আবেষ্টনকে হঠাৎ সহ্য করে উঠতে পারব না—উঃ! কি সে বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ তোমার!—আমার সমস্ত দেহময় একটা কেমনতর স্পন্দন জেগে ওঠে, আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন সহসা বন্ধ হয়ে আসে। আমার নখরে নখরে সেকি অভাব-তৃপ্তির আবেশ-বিহ্বলতা! প্রতি লোমকূপের মধ্যে কেমন একটা বিদ্যুতের উত্তেজনা, প্রতি শিরায় শিরায় কেমন একটা অধীর কম্পন, আর সবার চেয়ে বুকের মধ্যে সাগরের ঢেউগুলো যেন ফুলে ফুলে ওঠে,—সেই অপ্রমেয় আনন্দ-প্রবাহকে আমি একে একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেব—একেবারে নয়।—হঠাৎ তুমি এসো না, আমি বুকের সে কাঁপুনি সহ্য করতে পারব না—এমন যে হয়, তা'ত আগে জানতাম না!—সেদিন তুমি দূর থেকে—বুকে করে' নয়, ছুঁয়ে নয়,—আমার একটা আঙুল মাত্র নিয়ে তোমার রক্তিম অধরে ছুঁইয়ে দিইছিলে!—উঃ! সে কি অসহ্য অনুভব-চাঞ্চল্য

হঠাৎ যেন একশ তড়িৎ

ঝিলিক দিল সকল গায়!

চোখে আমার এত আলো সইল না, তাই চোখ বুঁজতে গেলাম কিন্তু বিদ্যুতের সব অগ্নিদাহ যেন বুকের পরদায় পরদায় ছুটে বেড়াতে লাগ্‌ল—যতক্ষণ না বুকে নিয়ে, তোমার দেহ স্পর্শে আমার দেহমন পূর্ণ করে দিয়ে, অভিভূত করে তন্ময় করে দিলে, চুমায় চুমায় অধর গণ্ড ভরে দিলে, ততক্ষণ, আমি বুঝি অশান্ত ত্রস্ত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছিলাম—! তাই বল্‌ছি

ধীরে ধীরে অতি ধীরে পরশ তোমার

বুলাইয়া দাও মোর সর্ব্ব অঙ্গময়,

তোমার পরশ-মধু ধীরে অতি ধীরে

পান করি হ'ব আমি চির-মৃত্যুঞ্জয়!

আচ্ছা, আজ কেন তুমি আমার চোখের সাম্‌নে এত সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়েছ?—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে নিজেকে এত প্রীতিমধুময় করে বিস্তার করে দিচ্ছ?—এমন নিবিড় পরিণত শান্তির সন্ধান আজ যেন তোমার কাছ থেকে আমিই একা অভিনব ভাবে পেলাম! সত্য কি তাই?

তুমি আজ আমার কাছে শুধু চঞ্চল, উন্মুখ, সমপ্রাণ প্রেমিক নও, তুমি আজ প্রাণময়, প্রেমময় উদার স্বভাব-সিন্ধু, শান্ত পরিণত প্রেমের দাতা-কল্পতরু—তোমার প্রেম যে আজ মধু হয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি-সাফল্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে—

কুঁড়ির মাঝারে

তোমারি গুপ্ত-ধন

ফুলের মাধুরী—

ভরিয়া রেখেছে মন;

কুঁড়ির মধ্যে তোমার মধুময় জীবনের মৌন-সাধনা শুধু একটা চরম-পরিণতি, পরম-সার্থকতার জন্য নিজ-মনের অনন্ত-বাসনা-বিকাশের ও দান-গৌরবের মহত্ব অর্জ্জনের জন্য নিত্যকাল ধরে এমনি করে প্রতীক্ষা করে আস্‌ছে।

কুঁড়ির সার্থকতার মত তোমার মধুময় জীবনের সার্থকতা শুধু একটা বিশেষ বিকাশকে আশ্রয় করে গড়ে উঠ্‌ছে—ফলের মধ্যে তোমার মধু আজ—

"ভুখা ও তৃষার ফল" হয়ে রয়েছে।

আজ আম্র-কুঞ্জের ফলে ফলে তুমি তোমার হৃদয়-মধুকে রঙিয়ে, গলিয়ে, ছড়িয়ে দিয়েছ,—সে মধুতে সঞ্জিবনী-শক্তি আছে, পিপাসার তৃপ্তি আছে, কামনার সার্থকতা আছে, আর সবার উপরে আছে—তোমার পরিপূর্ণ প্রাণের পুণ্য-পরিণতি!

জ্যৈষ্ঠের এই আতপ-তাপিত শুষ্ক মৃত্তিকার উষ্ণ-দীর্ঘ-শ্বাসের উপর, থেকে থেকে তুমি সান্ত্বনার মধু-বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ছ—

আজ বিশ্ব-সম্ভোগের মধ্যে তোমার মধুতে আমার হৃদয়-পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—

প্রেমের মহিমা খেদে, সত্য চিরন্তন,
আমি চাই তৃপ্তিমাঝে নিত্য আকিঞ্চন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নারীর সরম

ঐ শোন্ গো আমার দোরের গোঁড়ায় পায়ের ধ্বনি উঠ্‌ছে সুরে,
আসছে যেন কানে,
কিসের হাওয়া কোন্ রাগিণী সকল দেহ ফেলছে ছেয়ে
বাজছে আমার প্রাণে।
আবার, শোন্‌লো সখি কথার মাঝে চেনা কি যে কেমন হয়ে
মধুর সুরের তারে,
পাগলা হাওয়া কেমন করে' পাগল করে' তুলছে মোরে,
বলছে বারে বারে—
লজ্জা সরম থাকায় বল, কি ফল তোমার মিলবে আজি,
বাধায় পায়ে পায়,
ঘোমটা দিতে ভুল যদি হয়, বসন যদি ঠিক নাহি রয়,
ক্ষতিই কিবা তায়।
কথা শুনে পলক গুনে পোড়া মনে নেয়না প্রবোধ,
রইতে নারি ঘরে,
বাঁধন দিয়ে সরম যে তার ফেলছে ঢেকে নয়ন আমার,
রাখছে আমায় ধরে।
শক্তি নিয়ে আছে জড়ো, লজ্জা নারীর শত্রু বড়,
ভাঙে যে তার বুক,

বোঝার বড় বোঝা বয়ে থাকে নারী সকল সয়ে,
ফোটে না তার মুখ।
অনেক দিনের পরে দেখা আজকে আমার তাহার সাথে,
কত কথা তাতেই মনে হয়,
তাই বলে কি লোকের মাঝে বাহির হতে পারি আমি,
মনের আশা মনেই জেগে রয়।
জান্‌লা একটু খুলে দিয়ে এক পলকের সেই যে দেখা,
দেখে নিলাম চোখে,
দেখায় শুধু প্রাণের তৃষা মিটে থাকে, এমন কথা
বলেছে কোন লোকে ?
প্রাণের ধারা তাহার পানে চলছে ছুটে, সরম দিয়ে
বাঁধতে তারে নারি,
দূরের কথা নিশেষ করে' আসবে কখন আমার কাছে,
বুঝতে নাহি পারি।
ভাবছি আমি আপন মনে অনেক কথা অনেক ভাবে,
ঠিকানা তার কই,
মাথার কাপড় খুলে গেলে লাজের মাথা খেইছি বলা,
কেমন করে সই।
পেছন হতে কখন এসে দুহাত দিয়ে দু'চোখ ধরে'
আমায় চুপি কয়,
"এমন করে' ঘরের কোণে বসে বসে চোরের মত
'না দেখলে কি নয় ?"
অনেক কথা কইব বলে ভেবেছিনু, কইতে গিয়ে
কথা নাহি সরে,
নারীর সরম বিষম বাদী, এক নিমেষে কেমন হ'ল,
দিলে কেমন করে।
তার পরে তার বুকের মাঝে টেনে নিয়ে দু'হাত দিয়ে,
গণ্ডে দিলে চুমি,
লজ্জা নারীর এত দোষের ? চিহ্ন যে তার এমন করে'
রেখে গেলে তুমি।

শ্রীসুশীলকুমার বাগচী

মাতৃভাষার প্রতি ছাত্র সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য

আজ বঙ্গ সাহিত্যের এই মঙ্গল-যুগে চারিদিকে একটা ধ্বনি উঠিয়াছে—কেমন করিয়া ইহার দ্রুত উন্নতি সম্পাদন করিতে পারা যায়। এই যে আকাঙ্ক্ষা ইহাই আমাদের জাতীয়তার প্রথম উদ্বোধন। ইহাকে সমালোচকের চশমা দিয়া খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না—ইহাকে একটা উন্নতিশীল জাতির অন্তরের দিক হইতে দেখিতে হইবে।

দেশের এই ধ্বনিটি আজ একটা বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে;—এবং এইসমস্যা সমাধানের উপর আমাদের জাতীয় ঐক্য পরোক্ষভাবে নির্ভর করিতেছে।

আজিকার আমাদের এই শিশু-সাহিত্য যখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে তখনই আমাদের জাতীয় সাহিত্য এক বিরাট সাহিত্যরূপে বিশ্ব-সাহিত্য-মন্দিরে অভ্যর্থিত হইবে। কিন্তু একটা জাতীয় সাহিত্য কখনই দু'একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তির চেষ্টায় পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। একটা জাতীয় ভাষার উন্নতি সম্পূর্ণরূপে সমগ্র জাতীয় যত্ন ও সহানুভূতির অপেক্ষা করে। ভাষা জননীর এই যে পূজা ইহা প্রথমেই মণি-মানিক্য সহযোগে সম্পাদন করা নিঃসম্বলের পক্ষে অসার কল্পনা! ভক্তের প্রদত্ত সামান্য ফুল চন্দনই এই পূজার প্রাথমিক উপচার। কিন্তু দেখিতে হইবে সেই সামান্য উপচার ভাষা-জননীর গ্রহনীয় কি না। এই যে আজ কাব্য ও উপন্যাসের বন্যায় সমগ্র দেশ প্লাবিত হইতেছে ইহার মধ্যে কয়খানা ভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদনে সহায়তা করে? কয়খানা স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য?

কেবল কাব্য ও উপন্যাসের মত উপকরণ দ্বারা একটা জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তোলা যায় না। দেখিতে হইবে সাহিত্যের প্রতি অঙ্গই পুষ্টিলাভ করিতেছে কি না। একদিকে যেমন কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি ভাষার গঠনের পক্ষে আবশ্যক—অপরদিকে আবার বিজ্ঞান, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতিও ভাষার পূর্ণতার জন্য তেমনি আবশ্যক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত প্রথমতঃ আমাদের এইখানেই সম্পর্ক রাখিতে হইবে এবং এইখানেই দেশের সুশিক্ষিত উৎসাহী যুবক সম্প্রদায়ের প্রকৃত কর্ম্ম ক্ষেত্র।

কাজেই সাহিত্যের এই উদার ও প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ছাত্র সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া অসম্ভব। তাহাদের উপরেই মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

আমাদের সাহিত্য মন্দিরে আজ বোধনের শুভ-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। সকল ভক্তকেই আজ পূজার উপচার লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গনে সম্মিলিত হইতে হইবে। এবং সমস্বরে গাহিতে হইবে:—

> "জননী বঙ্গভাষা এ জীবনে
>
> চাহিনা অর্থ চাহিনা মান,
>
> যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
>
> অমল কমল চরণে স্থান।"

বিশ্ব তখনই আপনার কোলে—জননী—বঙ্গভাষাকে উপযুক্ত স্থান দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিবেন—যখন উপযুক্ত সেবক সম্প্রদায় উদ্‌গ্রস্ত হইয়া ঐ দু'টি চরণের আশায় বসিয়া থাকিবে।

মা কখনও পুত্রের আকাঙ্ক্ষার ব্যত্যয় করেন না—বরং উপযুক্ত পরিসমাপ্তির জন্য নিজেও ব্যাকুল হইয়া প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়া সুখী হন। আমাদেরও সময় আসিবে যখন আমরা আমাদের সাহিত্যকে সার্ব্বজনীন সাহিত্যক্ষেত্রে বিজয় গৌরব দিতে সক্ষম হইব।

কবিতা ও উপন্যাসে আমাদের সাহিত্য যে প্রকার প্রসার লাভ করিয়াছে—তাহা সাহিত্যের অন্য কোনও প্রকার শাখায় ততটা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। বিজ্ঞান, দর্শনও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আমাদের সাহিত্য এখনও অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অভাব পুরণের নিমিত্ত আমাদের সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ও পুরাতন বঙ্গসাহিত্য তুলনা করিলে এইটুকু

প্রতীয়মান হয় যে আমাদের সাহিত্য কেবল স্মরণাতীত কাল হইতে প্রধানতঃ কাব্য ও উপন্যাসের মধ্য দিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ইহা কেবল আমাদের পৌরাণিক ও আধুনিক সাহিত্যিকদের ন্যায্য অধিকার। বস্তুতঃ ইহা তাহাদের বিশেষত্ব। আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি এই রকম ভাবে তৈয়ারি যে ইহা যেন একটি মূর্ত্তিমতি—'কবিতা সুন্দরী'!—তাহার পানে চাহিয়া উদ্বেলিত ভাবোচ্ছ্বাসে কবি বন্দনা গাহিয়াছেন,—

নমোনমোনমঃ সুন্দরী মম
জননী বঙ্গভূমি
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর
জীবন জুড়ালে তুমি!
অবারিত মাঠ গগন ললাট
চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়
ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লব ঘন আম্রকানন
রাখালের খেলা গেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল
নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ
জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান—
—চোখে আসে জলভরে।"

যে দেশের জলবায়ু আপনার স্নেহস্পর্শে আমাদিগকে নিত্য সকল প্রকার অভাব ও প্রাচুর্য্যের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তুলিয়াছে—যে দেশের মাটি স্বর্ণপ্রসূ, যে দেশের নদ, নদী, বৃক্ষলতা মানুষের জীবন-যাত্রা সহজ করিয়া তুলিতেছে—সেই দেশের অধিবাসীরা যে স্বভাবতঃ একটু ভাব-প্রবণ, একটু ease-loving হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাহারা প্রাচুর্য্যের মধ্যে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করে—সুখ-স্বচ্ছন্দতাকে জীবনের সার করিতেই কেবল তাঁহারা প্রয়াস পায়। তাই আমার মনে হয় আমাদের সাহিত্যও ঠিক এই কারণেই যথেষ্ট পরিমাণে গুরুগম্ভীর হইতে পারে নাই। তাই আবহমানকাল হইতে আমরা দেখি যে প্রধানতঃ—কাব্য ও উপন্যাসই আমাদের সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। এবং বর্ত্তমানেও তাহাই হইতেছে।

চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বঙ্গভাষায় খণ্ডকবিতা ও গীতি কবিতার প্রাধান্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে। বৈষ্ণব পদাবলি কবি-গুরুদের ভাব ও ভাষার মাধুর্য্য দেখাইয়া আমাদের সাহিত্যে অমর হইয়াছে; কিন্তু বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারে তাহাদের কেবল ঐ একটু নির্দ্দিষ্ট স্থানই প্রাপ্ত হইবার অধিকার আছে।

উপন্যাস ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদির প্রাধান্য সর্ব্বতো-ভাবে স্বীকার্য্য। যদিও এই সময়ের মধ্যেই মধুসূদনের অমর কাব্য, 'মেঘনাদবধ'—নবীনচন্দ্রের-'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতক' ইত্যাদি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ইংরাজীতে যাকে বলে Epic সেই ধরণের লেখা আমাদের ভাণ্ডারে খুব কম আছে; অনেকে হয়ত আমার এই কথায় সায় দিবেন না। কিন্তু এইটা মনে রাখা খুবই দরকার যে সংস্কৃত সাহিত্য ও বঙ্গ-সাহিত্য সম্পূর্ণ ভাবে দুইটী ভিন্ন সাহিত্য। কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যকে আমাদের নিজস্ব বলিয়া লইতে আমরা অপারগ। যদিও আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতের নিকট চিরঋণী, তবু উহা বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির সহায় হইতে পারে নাই।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য কেবল সাহিত্যের একদিক লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। এই জন্যই আমাদের সাহিত্য অসম্পূর্ণ! পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা না হইলে ইহা যে অচিরেই লুপ্ত হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের চেষ্টাই যে, তাহাদের ভাষা কি করিয়া নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে! যে কোনও প্রকার কাজেই হউক না কেন যুবক সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুই হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের এই ধারণাটাকে বদ্ধমূল করিতে হইবে যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্য সভায় দাঁড় করাইতে হইবে।

আজিকার এই বিজ্ঞান চর্চ্চার দিনে, এই অনুসন্ধিৎসার যুগে আমাদের কি এই প্রকার চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময়? আমাদের উচিত যে আমরা আমাদের ভাণ্ডারকে নানা প্রকার জ্ঞান-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া রাখি যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ইহা একটা জাতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারে।

"অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা যে সকল গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষার তাদৃশ গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনার একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একট তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নপর হইতে হইবে।"

কাজেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের এই মাতৃভাষাকে বিশ্ব-জনীন করিতে হইলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ও পরি-বর্দ্ধনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। পৃথিবীর যে কোনও জাতীয় ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়-মান হয় যে প্রত্যেকেই আপন আপন সুবিধানুযায়ী অন্য ভাষা হইতে কতকগুলি, শব্দ, পদ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভাষাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ-বোধ্য করিয়াছে ও সহজ-শিক্ষনীয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তবে আমরা কেন আমাদের মাতৃভাষাকে একটা শৃঙ্খলের মধ্যে বাঁধিয়া রাখি? ইহা একটা সহজ-বোধ্য ও সহজ-শিক্ষনীয় ভাষা না হইলে বিদেশীয়েরা আমাদের ভাষার উপর ততটা দৃষ্টি দান করিবে না। ইহা মানুষেরই স্বভাব যে যাহা সহজ-সাধ্য তাহার দিকেই তাহারা বেশী আকৃষ্ট হয়।

ইহা কি কম দুঃখের বিষয় যে গীতাঞ্জলি বিশ্ব সাহিত্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইল তাহা কেবল অনুবাদের সাহায্যে। যদি মূল বইয়ের ভাষা ও মাধুর্য্য বিদেশীয়েরা সন্ধান পাইত তবে আমার মনে হয় ইহার প্রভাব বিশ্বের পক্ষে বিশেষ কল্যানপ্রদ হইত।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।"—

এই যে নিতান্ত সহজ ছত্র কয়টি ইহাকি অনুবাদে ঠিক এই রকম ভাবেই পরিস্ফুট হইতে পারিয়াছে? আজ যদি আমাদের সাহিত্য নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইত তবে ত আর পরের মুখের দিকে আমাদের একটা বড় জিনিষকে—খাটো করিয়া বড় ভাবিয়া লইতে হইত না! বড়কে ঠিক বড়র মধ্যে দেখা এবং তাহার মধ্যে তাহার বিকাশ এ উভয়ই যেমন আনন্দদায়ক তেমন আর কিছুতেই নয়।

আমাদের সাহিত্যের বিলীয়মান, উদীয়মান ও বর্ত্তমান যুগের দিকে তাকাইলে এই সর্ব্বপ্রথম মনে হয় যে ইহার জন্ম, ও অনুশীলন ঠিক যে ভাবে হওয়া দরকার সে ভাবে হইতে পারে নাই! এক সময় সংস্কৃতের চাপে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইবার জোগাড় হইয়াছিল। অন্য এক সময় পার্শি, উর্দ্দু ইত্যাদির কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাকে অনেক তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল? এমন কোনও সময় হয় নাই যে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য—সাম্রাজ্যের সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তবুও বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সাহিত্যকে একটু উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। ইহাই আমাদের ভবিষ্যতকে একটু উচ্চ ভাবে দেখিবার একমাত্র পথ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনু-কম্পায় ছাত্র-সমাজ এক প্রকার দায়ে ঠেকিয়া মাতৃভাষার প্রতি একটু সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। জানিনা কতদিন পরে বঙ্গসাহিত্য বিশিষ্ট ভাষারূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। তবে আমাদের এই ভরসা আছে যে বর্ত্তমান সময়ে যে রকম ভাবে আমাদের সাহিত্য প্রসার লাভ করিতেছে—অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য অবশ্য আমাদের কাম্য-বস্তু লাভ করিতে বিশেষ ক্লেশদায়ক হইবে না।

সমগ্র বিষয়েরই এক একটা ধারা আছে—তাই আমাদের ভাষাও একটা বিশেষ ধারায় প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। যদিও ইহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক তথাপি সামান্য ভাবে একটু না বলিয়া পারিলাম না।

আদর্শ সাহিত্যের পথে দিন দিন বঙ্গ-ভাষাকে পরিবর্দ্ধিত করিবার মানসে বিজ্ঞগণের মতদ্বৈধ আছে বলিয়াই বোধহয়। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য ঠিক একটি স্থির পথ ধরিয়া চলিতে পারিতেছে না। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের এই খানেই প্রভেদ যে আমরা সাহিত্য কে ঠিক সাহিত্য ভাবে দেখিতেছিনা—আমরা ভাষার দিক হইতে উহার ন্যায্য প্রাপ্তির অংশ কমাইতেছি। ইংরাজি সাহিত্য অদ্যকার দিনে সমগ্র জগতের সাহিত্য ও ভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সাহিত্য লাটিন এবং গ্রীক ভাষার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী! ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার মনে হয় বর্ত্তমান ইংরাজি-সাহিত্য এতটা আদর লাভ করিতে পারিত না। আমাদের সাহিত্যেও এইরূপ ভাবে বিদেশীয় নূতন নূতন ভাব ও ভাষা ফুটাইয়া তোলা নিতান্ত দরকার। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সম্পর্কে সর্ব্বদা আমাদের আসিতে হয় বলিয়া কতকগুলি শব্দ ও পদ লওয়া কর্ত্তব্য। সামান্য একটি শব্দ, "idea" দ্বারা আমরা যেমন ভাবে মনের ভাবটিকে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঠিক "কল্পনা" "ধারণা" বলিয়া আমরা ততটা ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম! তাই কতকগুলি পদ ও শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে—অথচ ইহাও দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে অত্যধিক পাশ্চাত্য শব্দ ও পদ গ্রহণে যেন আমাদের সাহিত্য ও ভাষা অন্য পথ গ্রহণ করিয়া বিশৃঙ্খল না হইয়া পড়ে। ভাষার মর্য্যাদা বিশেষরূপে রক্ষণীয়। আমাদের সাহিত্য বিজ্ঞান-শাখায় বিশেষ পশ্চাৎপদ—তাহার কারণ আমাদের পরিভাষার অভাব! পরিভাষার আদর এবং প্রয়োজন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই আজকাল বিজ্ঞান ইত্যাদির আদর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিদেশীয় সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া সেই সমস্ত দেশের আচার ব্যবহার—রীতি পদ্ধতি জানিয়া আমাদের সমাজে যে সমস্ত ভুল এবং কুভাব আছে সেই সমস্ত অনায়াসে আদর্শ দেখিয়া ত্যাগ করিতে পারিত ইহাতে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের যে প্রকার লাভ, সামাজিক পক্ষ হইতেও ততোধিক বলিয়া আমার ধারণা।

পরিশেষে, ভাষা শিক্ষায় স্বীয় ভাষা দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে—তাহা যেমন সহজ-বোধ্য ও সুগম হয় সে রকম আর অন্য কোনও উপায়ে সম্ভব নাই। আমাদের শিক্ষার ইহাই একটি প্রধান অসুবিধা যে আমরা বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রাপ্ত হই। শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্বন্ধ যদি কেবল বইয়ের সময়ই হয় তবে আর শিক্ষকতার স্বার্থকতা রহিল কি? তাই আমাদের শিক্ষার medium যদি বিদেশীয় সাহিত্য হয় তবে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধও কেবল বই পড়িবার সময় ছাড়া হইতে পারে না। ইহাতে আমাদের বুঝিবার শক্তির পরিবর্দ্ধনের সাহায্য না করিয়া মুখস্থ বিদ্যার সহায়তা করে। এই জন্যই আজকাল বিদ্যালয়ে মুখস্থ-বিদ্যাছাড়া অন্য কিছুরই বড় আদর হয় না। বিদেশীয় সাহিত্য শিক্ষা medium বলিয়াই আমাদের দেশে mass-education বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশে লোক সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় বেশী বলিয়াই আজ পৃথিবীতে তাহারা বরণীয়।

ছাত্র জীবনই উন্নতির প্রকৃষ্ট সময়। এই সময়ের সদ্ব্যবহার আমাদের সাহিত্য-জীবনের দিক হইতে কতক পরিমাণে দাবী করিতে পারে। কাজের মধ্যে যতদিন মানুষ ব্যাপৃত থাকে ততদিনই পাঁচ রকম নূতন কাজ করিতে কোনও প্রকার ক্লেশ পায় না। সাহিত্য-জীবনের ভিত্তি, মাতৃ ভাষার প্রতি কর্ত্তব্যের ভিত্তি যদি এখন আমরা না গড়িতে পারি তবে আর ভবিষ্যতে আমাদের ততটা উদ্যোগ থাকিবে না—ততটা স্ফূর্ত্তি থাকিবে না।

এখন হইতে প্রত্যেকের এক একটি সাহিত্য-আলোচনী সভায় যোগদান করা উচিত—এবং ইহাতেই আমাদের সাহিত্যের উপর এক একটা স্থায়ী অনুভূতি আরব্ধ হইবে—এবং তদ্দ্বারাতে আমাদের চীরজীবন সুখ ও আনন্দ হইবে।

কি প্রকারে আমাদের আলোচনী সভার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, কি প্রকারে উহাকে স্থায়ী করা যাইবে—এই সমস্ত নানা প্রকার উদ্ভাবনী শক্তি হইতে নূতন নূতন ভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্য দিন দিন বিশ্ব-সাহিত্য সভায় আপনার উপযুক্ত স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইবে।

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু

গুপ্ত প্রেম

কেমনে বোঝাব তোরে কত ভালবাসি
অয়ি মোর পরাণের প্রিয়া!
কত শোভা কত গান কত সুধারাশি—
কত প্রেম ধরে এই হিয়া।
উছলি উথলি ওঠে অমৃত ধারায়
কলকল আনন্দ-প্লাবন
পুলকে দোদুল প্রাণ দোলে অনিবার
থর থর অধীর গোপন;
বাহিরে উষর মরু ধূ ধূ বালুকায়
হাহা শ্বসে উতলা বাতাস,
পাষাণে ঠিকরে জ্বালা অনল-শিখায়
সীমাহীন আকুল হুতাশ।
জানো কি তাহার মাঝে গভীর অতলে
বহে ঘোর স্নিগ্ধ স্রোতধার
উৎসারিত ভাষাহীন নীরব কল্লোলে
অজানিত গুপ্ত অনিবার?
কেমনে বুঝিবে হায় ফোটেনি যে ফুল
দলে দলে মেলিয়া নয়ন
যে কলি লুকায়ে রল সরম-আকুল
আঁকড়িয়া নিভৃত শয়ন,
জাগে যে তাহারো বুকে আঁখি-অন্তরালে
পরিপূর্ণ কুসুম-সৌরভ
হেলায় হারায়ে যায় একান্তে বিরলে
বসন্তের নবীন গৌরব।

বাহিরে এমন করে দেখোনা প্রেয়সী
বাহিরে কি খুঁজিছ আমায়?
যে শোভা হিয়ার মাঝে উঠিছে বিকাশি'
আঁখি দিয়া কি হেরিবে তায়?
এনহে সরসীবুকে আবেশ-হিল্লোল,
ঊর্ম্মিকার মৃদু শিহরণ
বায়ুর পরশ-সুখে ক্ষণিক কল্লোল
ক্ষণিকের প্রেম-আলাপন।
এযে গো নিতলতলে নীল বারিরাশি
অচঞ্চল শান্ত সুগভীর,
ভাষাহীন মহিমায় উঠিছে আভাসি'
সমাহিত সাধনা নিবিড়।
বুঝিতে পারিতে যদি প্রেয়সী আমার
কত কথা উথলে হিয়ায়
কি ভাষা লুকায়ে আছে পাষাণ-মাঝার
নিঝরের নিরুদ্ধ ধারায়,
কভু যদি হেরিতে গো ফিরায়ে নয়ন
কোথা জাগে নিভৃত অন্তর
বারেক ঘুচাতে ভুল মোহ আবরণ
ক্ষণতরে হত অবসর;—
বুঝিতে পারিতে সখি কত ভালবাসি
কত প্রেম ধরি এ হিয়ায়
গোপন রহিল প্রাণে যে অমিয় রাশি
এ জীবনে লভিবে কি হায়?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ, এম্, এ,

গয়ার ইতিহাস দেও দেবক্রম।

আওরাঙ্গবাদ মহকুমার মধ্যে দেও একটি বর্দ্ধিষ্ঠ স্থান। এই খানে একটি প্রাচীন রাজ বংশের অধিষ্ঠানের স্থান। এই স্থানের রাজাগণ গয়া জেলার মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং ইহারা উদয়পুরের রাণাবংশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। এই রাজবংশের ইতিহাস পরে বিবৃত হইবে। এই গ্রামের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য স্থানের মধ্যে "সূর্য্য মন্দির" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার নির্ম্মাণকাল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া মনে হয়। কোঁচ এবং উমগায় যে মন্দির দ্বয় দৃষ্ট হয় তাহাদেরও নির্ম্মাণ কৌশল ইহার অনুরূপ। কার্ত্তিক এবং চৈত্র মাসে এইখানে প্রতিবৎসর জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ মেলা বসিয়া থাকে। বহুদূর হইতে লোক আসিয়া এই মেলায় যোগদান করে। এই মন্দিরের কিছুদূরে বস্তীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সূর্য্য দেবের নামে উৎসর্গীকৃত এক মনোরম পুষ্করিণী গ্রামের শোভোবর্দ্ধন করিতেছে এবং ঐ পুষ্করিণীর সন্নিকটেই কমল পুষ্করিণী বিরাজ করিতেছে।

দেওনগর মধ্যে দর্শন উপযোগী দৃশ্যের মধ্যে দেওর মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির প্রস্তর ফলক দ্বারা সূর্য্যকে অর্পিত হইয়াছে। এই মন্দির গাত্রে সংযোজিত প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে:—

"শূন্যব্যোম নভোরসেন্দুকরভূহীনে দ্বিতীয়ে যুগে।
মাঘে বাণ তিথৌসিতে গুরুদিনে দেবে দিনেশালয়ম্।
প্রারেভে দৃবদাঙ্কয়ৈ রচয়িতুং সোম্যাদিলায়াংভবো।
যস্যাসীৎসনরাধিপ প্রভুতয়ালোকে বিশোকোভূবি॥"

অর্থাৎ ত্রেতাযুগের ১২১৬০০০ গত হইলে পর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষীয় পঞ্চমী তিথি বৃহস্পতিবারে বুধের ইলায় গর্ভজাত পুত্র পুরুরবা (চন্দ্রবংশীয় নরপতি) দেও গ্রামে প্রস্তর দ্বারা সূর্য্যদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; এই রাজার প্রতাপে সকল প্রজাবৃন্দ বিগত শোক অর্থাৎ সুখে বাস করিত। এই শ্লোকে কোন চতুর্যুগীর উল্লেখ নাই। যদি বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর চতুর্যুগীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে এই দেব বাটিকা বা মন্দির ৯৪৯০১৭ বৎসরের প্রাচীন কিন্তু যদি ইহা প্রথম চতুর্যুগীতে নির্ম্মিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা ৩১৭৫৮৯০০০ বৎসরের প্রাচীন মন্দির বলা যাইতে পারে। অবশ্য এই হিসাবে আমাদের ইংরাজি কালের সহিত কখনই মিলিতে পারে না। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ পারিপাট্য খুব বিচিত্র। মন্দিরটি ৫২৩ ফুট উচ্চ এবং মন্দির গাত্রে প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য দেখিলে স্বতই হিন্দু ভাস্কর্য্যের ও শিল্প এবং স্থাপত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইহাকে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে দেব বিক্রম সূর্য্য মন্দির নামে অভিহিত করা হয়। দেওর পশ্চিমে অবস্থিত কুরকা গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত কানাইয়া প্রসাদ মিশ্র "দেওর সূর্য্য মন্দিরের একটি সুন্দর ইতিহাস এবং মাহাত্ম্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্দির কদাচ বৌদ্ধ যুগের নির্ম্মিত হইতে পারে না ইহাই আমার সরল বিশ্বাস"। পশ্চিম দিকের দিওয়ালে হৃদয় পদ্মোপরি গণেশ মূর্ত্তি অবলোকন করিলে ইহা যে হিন্দু যুগের ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিতেছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। সূর্য্যদেবের বাহু ভগ্ন মূর্ত্তি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আছে। তাহা দেখিলে বেশ বোধহয় যে এই মন্দির হিন্দু যুগে নির্ম্মিত। মন্দিরের চতুষ্পার্শে খনন করিলে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। দেওর ভাস্কর্য্য ও শিলা লিপির ভাষা উমগার অপেক্ষা প্রাচীনতম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দেওর শিলালিপি পরবর্ত্তী গুপ্ত বা কুটিল অক্ষরে লিখিত কিন্তু উমগার লিখন দেবনাগর অক্ষরে খোদিত!!! আমার মনে হয় যে স্থাপত্য ভাস্কর্য্য ও শিল্প দেখিলে বেশ মনে করা যাইতে পারে উমগার মন্দির সমূহ হইতে দেওর সূর্য্য মন্দির সহ সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়া-

ছিল। কিন্তু শিলালেখ পাঠ করিলে ইহা সহস্র কোটী ২ বৎসর প্রাচীন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার বোধহয় যে কনারক মন্দির অপেক্ষা ইহা প্রাচীনতম, সাময়িক সংস্কার গুণে ইহা নবরূপ ধারণ করিয়া আছে।

আমি দেওর মন্দির বহুবার দেখিয়াছি। আমার বন্ধু ৺পরমেশ্বর দয়াল (গয়া ওয়ার্ড আপিসের ভূতপূর্ব্ব হেড্ ক্লার্ক) বলেন যে এই মন্দির সম্বৎ ১২৯৩ অর্থাৎ ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বারের উর্দ্ধদেশের লিপি দৃষ্টে পরমেশ্বর দয়াল বাবু বলেন যে ইহা ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত। তাহা হইলে ইহা উম্‌গামন্দির লিপি হইতে ২০২ বৎসরের প্রাচীনতর। এবং সেই কারণে ভৈরবেন্দ্রের দ্বারা কদাচ নির্ম্মিত হইতে পারে না। দেওর মন্দির উমগামন্দির হইতে অন্ততঃ ৫০০ বৎসরের প্রাচীনতম।

উমগাপর্ব্বতের নিবিড় বনবিজড়িত শিব ও বিষ্ণু মন্দির হইতে শিলালিপিটি আমার বন্ধু ৺পরমেশ্বর দয়াল J. A. S. B. N. S. Vol. ২৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই পর্ব্বতমালা তেলডিহা সরকারগঞ্জ হইতে ২॥০ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে গ্র্যাণ্ডট্রঙ্ক রোডের পার্শ্বেই অবস্থিত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিম্বা নবম খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে দুর্দ্দামা নামক রাজপুত সৈনিক পুরুষ মাড়োয়াড় হইতে আসিয়া এই দেশের মধ্যে উমগার পার্ব্বত্য দুর্গ কোলগণের নিকট হইতে জয় করিয়া তথায় এক রাজবংশের স্থাপনা করেন। এই রাজবংশই দেওর প্রাচীন রাজবংশ। দুর্দ্দামা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং আদি পুরুষ। দুর্দ্দামা খুব ধার্ম্মিক ও সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাহার পুত্র কুমার পাল সিংহ, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ পাল সিংহ। লক্ষ্মণ পাল অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং ভগবতীর বরপুত্র ও সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মত সাহসী যোদ্ধা পুরুষ সেকালে গয়া জিলার মধ্যে কেহ ছিল না। লক্ষ্মণ পাল সিংহ উমগার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। আমার মনে হয় যে উমগা পর্ব্বতের উপর যে সকল প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহা উমগা রাজ্যের অভ্যুত্থানের বহু পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। উমগা রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ধ্বংশের পর এই সকল মন্দিরে হিন্দু দেবদেবী প্রতিষ্ঠা করাইয়া প্রস্তর লিপি সংযোজিত করিয়া দিয়া থাকিবেন। এই প্রস্তর লিপিতে রাজবংশের প্রশংসা ও গুণাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সুদীর্ঘ সংস্কৃত লিপি পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম।

লক্ষ্মণ পাল সিংহের পুত্র চন্দ্রপাল সিংহ তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহ, (অভয় পাল) তাঁহার পুত্র সান্ধ্যপাল বা সন্দেশ সিংহ, তাঁহার পুত্র অভয়দেব সিংহ, তাঁহার পুত্র মল্লদেব সিংহ, তাঁহার পুত্র কেশীশ্বর সিংহ, তাঁহার পুত্র নরসিংহ দেব, তাঁহার পুত্র ভানুদেব, তাঁহার পুত্র সোমদেব বা সোমেশ্বর দেব সিংহ হইতেছেন। সোমেশ্বর দেব অতি ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে একমাত্র পুত্র ভৈরবদেবকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভৈরব দেব খুব সুখ্যাতির সহিত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে একমাত্র রাণী পার্ব্বতী দেবীকে রাখিয়া অপুত্রক পরলোকগমন করেন। রাণীর অধীনে মৃতরাজার প্রধান মন্ত্রী কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন; পরে রাজ্যে কর্ম্মচারীদের চক্রান্তে অরাজক উপস্থিত হয় এবং রাণী স্ত্রীলোক বিধায় সম্পূর্ণ ইঁহাদের অধীন হইয়া দুঃখে কাল যাপন করিতে থাকেন। প্রধান মন্ত্রী রাণীকে কুপথগামী করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু রাণী চিতোর রাজবংশ জাতা, তিনি স্বীয় নির্ম্মল বংশে কালিমা কখনই দিলেন না। এই সময় উদয়পুর রাজবংশজাত এক বীরপুরুষ গয়া হইয়া ৺জগন্নাথ তীর্থ করিতে যাইতেছিলেন। তিনি তখনকার রাজকীয় পথের পার্শ্বে দন্তশীরপুর মঠের ভগ্নাবশেষ স্তূপ সন্নিকট স্বীয় লোক পরিজনাদির সহিত পথশ্রম দূর করিবার মানসে অবস্থান করিতেছিলেন। এই সমস্ত ভূভাগ সেই সময়ে দেওরাজের রাজ্যভূক্ত ছিল। রাণী পার্ব্বতী দেবী এই সময় স্বীয় ভাট মন্ত্রী এবং অপর কর্ম্মচারীগণের দ্বারা অত্যন্ত নিগৃহীত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি ভানুদেব সিংহের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে উমগার রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্ত আমন্ত্রণ করেন।

রাজপুত্র ভানুদেব সিংহ রাণীর আমন্ত্রণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং কিছুকাল উমগার অবস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভানুদেব সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদয়পুর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ভানুদেব গয়াতীর্থকে তুর্কীদের হস্ত হইতে উদ্ধার জন্য উদয়পুর রাজ দ্বারা সসৈন্যে প্রেরিত হইয়া তীর্থ দর্শনের ছলে গয়ায় যাইতেছিলেন তাহা পূর্ব্বে গয়ালীগণের প্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছি। ভানুদেব সিংহের অপর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিঞ্জর এবং আলোয়ারের প্রাচীন রাজ সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভানুদেব সর্ব্ব কনিষ্ঠ বীর এবং সুপুরুষ ছিলেন; তিনি দেও রাণী পার্ব্বতী দেবীকে মাতৃ সম্বোধনে পরিতুষ্ট করিয়া প্রাসাদে বাস করিতে থাকিলে মন্ত্রী এবং কর্ম্মচারীগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। ঘোর ষড়যন্ত্রে ভানুদেবকে হত্যা করিবার সংকল্প স্থির হইল। শিশোদিয়া বংশ জাত বীর এবং চতুর ভানুদেব সহজে প্রতারিত হইবার পাত্র নহেন; ষড়যন্ত্র তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলে তিনি সমস্ত চক্রান্তকারীদের বন্দী করিলেন এবং মন্ত্রী মহাশয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া রাণীর পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিলে রাণী পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমার ভানুদেবকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া দেওসিংহাসনে উত্তরাধিকারীরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন। রাণী কুমারের বিবাহ নির্ম্মল চৌহান বংশে দিলেন এবং কিছুকাল পরে রাণী পরলোক গমন করিলে পর কুমার উমগার রাজ সিংহাসনে আরোহন করিয়া •পুত্র• নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যবংশ হইতে ইক্ষ্বাকু, সিসোদিয়া, রঘু কুল উৎপন্ন হইয়াছে, ভানুদেবের পুত্র সহস্রমল্ল সিংহ, তাঁহার পুত্র তাঁরাচাদ তাঁহার পুত্র বিশ্বম্ভর নাথ, তাঁহার পুত্র বীরাগ্রগণ্য কল্যাণ দেব সিংহ; তাঁহার পুত্র অতিবল সিংহ, তাঁহার পুত্র অরিমর্দ্দন নয়ন পাল সিংহ, তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহ, তাঁহার পুত্র প্রতীল। ইনি দেও দুর্গ ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র ছত্রপতি। রাজা ছত্রপতি সিংহ শেষ মোগল রাজগণের রাজত্বকালে খুব প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। ইংরাজ কোম্পানির প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে ছত্রপতি সিংহ কোম্পানি বাহাদুরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধ বিগ্রহে রাজা ছত্রপতি সাহায্য দান করিতে কখনই ত্রুটী প্রদর্শন করেন নাই। বারাণসির রাজা চৈৎসিংহের সহিত ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যে সময় যুদ্ধ হয় তাহাতে ছত্রপতি সিংহের পুত্র দেওরাজ কুমার ফতে নারায়ণ সিংহ ইংরাজ সেনানায়ক মেজর ক্রফোর্টের অধীনে চির প্রসিদ্ধ রাজপুত সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করেন নাই। পিণ্ডারিদিগের সহিত যুদ্ধে ইনি ইংরাজ রাজকে বিশেষ সাহায্য করেন, এই উভয়বিধ সৎকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ দেওরাজকে ১১ মৌজার নানকার (নিষ্কর ভূমিদান) প্রদত্ত হয়; পিন্দারিযুদ্ধে সহায়তার জন্য ৩০০০৲ বার্ষিক আয়ের গয়া জেলায় সম্পত্তি প্রদত্ত হয়। রাজা ফতেহনারায়ণ সিংহের পুত্র রাজা ঘনশ্যাম সিংহ।

পালামুজেলায় এই সময়ে ঐ দেশের মহারাজ বংশে কর্ত্তৃত্ব লইয়া স্থানীয় সামন্তগণ মধ্যে বিশেষ অশান্তি উপস্থিত হয়। চেরো সামন্তগণের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজ রাজের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হইল। গোপাল রায়কে তাঁহার শত্রুগণ তাড়িত করিলে, ১৭৭৭ সালে তিনি উদ্‌বন্ত রাম নামক এক গয়া জেলার দেও রাজের অধীনস্থ জমীদারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উদ্‌বন্ত রাম গোপাল রায়কে কোম্পানি বাহাদুরের পাটনার প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্তান ক্যামাক সাহেবের নিকট ১৭৭০ সালে লইয়া যাইলে, তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মেজর ক্রফোর্ডের অধীনে একদল সৈন্যসহ দেওরাজ ও অন্যান্য স্থানীয় সামন্তগণ সহ গোপাল রায়কে সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। সাত বারোঁয়া এবং পালামুর যুদ্ধে গোপাল রায়ের শত্রুগণ রণে পরাজিত হইয়া ইতঃস্তত পলায়ন করিলে গোপাল রায় ইংরাজ রাজের কৃপায় এবং দেওরাজের কৃতিত্ব ও সাহায্যে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। উদ্‌বন্ত রাম পাটনার এজেণ্ট কাপ্তেন ক্যামাকের নিকট হইতে ১৭৭২ সালে দেওগন, জাপলা, বিলৌঞ্জা এবং পালামু পরগণার নূতন সনন্দ সূত্রে কানুনগোর পদ পাইলেন। উপরোক্ত চেরো ও খরোয়ার সামন্তগণের যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষ হইয়া দেওরাজ যুদ্ধে খুব বীরোচিত সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধান্তে ইংরাজ বাহাদুর তাঁহাকে পালামু রাজ্য পারিতোষিক স্বরূপ দান করেন। দেওরাজ ইহা লইতে অস্বীকৃত হইলে

পরে তাহা গোপাল রায়কে প্রদত্ত হয় তাহা উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। কিছুদিন শান্তির পরে, পালামুর রাজনৈতিক গগনে পুনরায় বিদ্রোহ ও অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। গোপাল রায় পূর্ব্ব রাজ দিওয়ানের সহিত চক্রান্ত করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত কানুনগো ও দিওয়ান উদ্‌বন্ত রায়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচনা করিয়া তাঁহাকে সাহপুরের গড় মধ্যে হত্যা করেন। নব কানুনগোর আত্মীয় পরিজনবর্গ ইংরাজ রাজের এই নৃশংস হত্যা ব্যাপার কর্ণ গোচর করিলে তাঁহাকে শাসন জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। গোপাল রায় শিরগুজা রাজের সাহায্য প্রার্থী হইলেন। শিরগুজা রাজ বিপুল কোরোয়া বাহিনী সহ গোপাল রায়ের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাপতি কার্ণাক দেওরাজকে তাঁহার পথরোধ করিতে দক্ষিণাভিমুখে পাঠাইলেন। দেও রাজকুমার মিত্র ভানুসিংহ মেজর ক্রফোর্ডের অধীনে থাকিয়া কাপ্তেন কার্ণাকের সাহায্যার্থ লেশলী গঞ্জে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দেওরাজ কোরোয়া তিরন্দাজ সৈন্যের অব্যর্থ লক্ষ্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বিক্ষরামপুর অবরোধ করিয়া দুই মাসের মধ্যে গড় জয় করিয়া গড়শীরে বৃটিশ কেশরী চিহ্নিত কেতন উড়াইয়া রাজপুত নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। এদিকে রাজ কুমারের রণ কৌশলে মুগ্ধ হইয়া মেজর ক্রফোর্ড তাঁহাকে গোপাল রায়কে দমনের কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। রাজকুমার মিত্র ভানুসিংহ প্রথমে রুহিতাস্ গড় অবরোধ করিয়া তাহা স্বকবলে আনয়ন করিয়া জাপলার যুদ্ধে, পরে হায়দারনগরেরর যুদ্ধে গোপাল রায়কে পরাজিত করিলেন। অবশেষে উভয় সৈন্য সাত বারোঁয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে মিলিত হয়। তিন দিবস তুমুল যুদ্ধের পর দেওরাজ কুমার পলায়নপর হইলে সময়ে তাঁহার পিতা রাজা ঘনশ্যাম সিংহ শিরগুজা রাজকে বন্দী করিয়া কাপ্তেন কার্ণাকে এবং মেজর ক্রফোর্ডের হস্তে সমর্পন করিলেন। ইংরাজ সৈনিকগণ অল্প মাত্র রক্ষি সহচর সমভিব্যাহারে লেশলীগঞ্জের ছাউনীতে অবস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে সাত বারোঁয়ার যুদ্ধস্থলের শোচনীয় সংবাদ পঁহুছিলে সাহেবগণ তৎক্ষণাৎ দেওরাজকে কুমারের সাহায্যে কিতাত, পাঁড়ু, কাজরু প্রভৃতি স্থানের যোদ্ধা ব্রাহ্মণ সৈনিকগণসহ প্রেরণ করিলেন। রাজকুমার পিতার আগমন বার্ত্তায় সামান্য মাত্র সৈন্য লইয়া অদম্য সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; অবশেষে চতুর্থ দিনের সন্ধ্যার সময়ে বিজয় লক্ষ্মী দেওরাজ কুমারের অঙ্ক শায়িনী হইলেন। গোপাল রায় বন্দী হইয়া সপরিবারে ইংরাজ সৈনিক পুরুষগণের পদ প্রান্তে অর্পিত হইলেন। গোপাল রায়কে চাত্রায় বন্দী অবস্থায় রাখা হইল। এইখানে তাঁহার বিচারে পাটনায় রাখিবার আদেশ প্রবর্ত্তিত হইলে তিনি ঐ স্থানে ১৭৮৪সালে বন্দী অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

পাটনার এজেন্ট বাহাদুরের আদেশে মৃতরাজ্ঞী গোপাল রায়ের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র চূড়ামান রায়কে পালামুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল; কিন্তু সাবালক হইয়া চূড়ামান রায় কোম্পানীবাহাদুরের সহিত চুক্তি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে, কোম্পানীবাহাদুর সম্পূর্ণ পালামুরাজ ৫১০০০৲ সিক্কা টাকায় নিলাম খরিদ করিয়া লইলেন।* কোম্পানী-বাহাদুরের টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণের মঞ্জুরীতে পাটনার এজেন্ট সাহেব দেওর রাজা ফতে বাহাদুরের সহিত পালামুরাজ বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮১৪ সালে দেওরাজ ফতে বাহাদুর সিংহ পরলোকগমন করিলে এবং বন্দোবস্তী চুক্তি পত্রে রাজার সহি না হওয়ায়,—ঐ পুনরায় তাঁহার পুত্র রাজা ঘনশ্যাম সিংহের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করা হইল। দেওরাজ নূতন অর্জ্জিত পালামুরাজ্য বন্দোবস্ত লইয়া লাভ জনক সম্পত্তিতে পরিণত করিতে না পারায় ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ১৮১৮ সালে পূর্ব্ব চুক্তি রহিত করিয়া তাঁহার রাজত্বের উপর নির্দ্ধারিত রাজস্বের মধ্যে এক সহস্র মুদ্রাভার লাঘব করিয়া পুরস্কার দিলেন। এই রাজপুরস্কার দেওরাজগণ বংশানুক্রমে অদ্যাবধি ভোগ করিতেছেন। ইহার পর হইতে পালামু জেলায় ভাগ্যচক্র ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৪ সালের মধ্যে ইহা জেলা রামগড়ের অধীনে থাকে এবং ইহার সদর চাত্রায় থাকে। ১৮৩৪ সালে ইহা লোহারদাগা জেলার অধীনে যায় এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পালামু লোহারদাগা জিলার অধীনে এক মহকুমারূপে

* See Hamilton's Description of Hindusthan 1820.

শোভা পায়; এই মহকুমার যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম পেশলীগঞ্জ নামক স্থানে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে, কিন্তু ঐ বন্যস্থান অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হইলে সদরমহকুমা ডালটন সাহেব প্রতিষ্ঠিত "ডালটনগঞ্জ" নামক কোইলের তীরবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ডালটনগঞ্জনাগাজিলার অধীনে এক স্বতন্ত্র মহকুমারূপে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত থাকে; কিন্তু ইহার পরিধি খুব ক্ষুদ্র বিধায় এবং কাজকর্ম্ম কম হওয়ায়, গয়া জিলার মধ্য হইতে জাপাজা, বিলৌঞ্জা, ডেমা, পাহাড়ী, প্রভৃতি পহ্যাসা এই মহকুমার সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে এই মহকুমাকে একটি সিভিলিয়ান ডেপুটী কমিশনারের অধীনে স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত করিয়া শাসন পরিচালন করিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হয়। মিঃ W. R. Bright এই জেলায় প্রথম ডেপুটী কমিশনার,—সবজজ-ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার ছিলেন। মিঃ রেণী, বিচক্রফট্, হিগনেল, লায়াল, ফিলীপ্, কামিং, গ্যারেট্ প্রভৃতি মহোদয়গণ এই জেলার প্রখ্যাত পূর্ব্বতন ডেপুটী কমিশনার হইয়া গিয়াছেন।

রাজা ঘনশ্যাম সিংহ দেও সিংহাসনে বহুকাল যাবৎ রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা মিত্রভানু সিংহ দেও সিংহাসনে আরূঢ় হন। মিত্র-ভানুর পুত্র মহারাজা সার জয় প্রকাশং সিংহ বাহার K. C. S. I. ছিলেন। দেও রাজবংশে ইনি জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যরূপ ছিলেন। তাঁহার মত সাহসী পুরুষ ভারতের মধ্যে তাঁহার সময়েপ্রসিদ্ধ শিকারী আর কেহ ছিল না। সিপাহীবিদ্রোহ দমনে তিনি ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজদরবারে রাজপুতানার রাজন্যবর্গের মত সমভাবে সম্মানিত হইয়াছিলেন। মহারাজার সম্মান গয়া জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ছিল দেওনগরে স্কুল, হাঁসপাতাল প্রভৃতি বহু সাধারণ হিতকর কার্য্য তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তাঁহার পুত্র রাজা ভিখননারায়ণ সিংহ অল্পবয়সেই পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসী নরপাল ছিলেন এবং দেওরাজকে বহু দেনায় আপ্লুত করায় দেওর বহু বহু ভাল ভাল সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায়। রাজা ভিখন নারায়ণের পুত্র বর্ত্তমান দেওরাজ রাজকুমার জগন্নাথপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর!

যেমন টিকারীর রাজবংশের আদিস্থান উৎরেস্, সেইরূপ দেও রাজবংশের প্রাচীন বা আদি বাসস্থান উম্‌গা নগরে। উম্‌গা একটি পার্ব্বত্য দুর্গ এবং বর্ত্তমান দেও নগর হইতে ৪ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। রাজা ভানুসিংহের উত্তরাধি-কারীগণ উম্‌গার পার্ব্বত্য গড়ে প্রায় দেড়শত বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া দেওনগরে রাজধানী দেবীর আদেশে স্থানান্ত-রিত করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। উম্‌গায় দর্শনোপযোগী দৃশ্যের মধ্যে ৬০ ফুট উচ্চ প্রাচীন সূর্য্য মন্দির। আমি ইহা স্বচক্ষে দুই তিন বার দেখিয়াছি। শিবগঞ্জের সরকার ভূম্যধিকারীগণের প্রতিষ্ঠিত শিব হইতেই শিবগঞ্জ নাম প্রচারিত হইয়াছে। ইহা গয়ার খ্যাতনামা উকীল ৺উমেশ-চন্দ্র সরকার ১২৮০ সালে স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পরম নিষ্ঠাবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ৺রাজনারায়ণ সরকার মহাশয়ের দ্বারা বহু অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পুত্রগণ অদ্যাবধি তাহার সেবা চালাইয়া আসিতেছেন।

উম্‌গার মন্দিরটি প্রাচীন বৌদ্ধযুগে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ-হয়। উহার দ্বারদেশে আল্লার নাম খোদিত চিহ্ন সকল বিশেষরূপে প্রমাণ করিতেছে যে মুসলমান যুগে এই মন্দির মসজীদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল কিন্তু হিন্দুদের হস্তে পুনঃ পতিত হওয়ায় দেবায়তন রূপে পরিচিত হইয়াছে। হিন্দু দেওরাজগণ আরবিক ভাষায় লিখনগুলি উঠাইয়া দিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার চিহ্নলোপ করিতে সমর্থ হন নাই। ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজাভৈরবেন্দ্র প্রস্তর ফলক আঁটিয়া জগন্নাথ, বলভদ্র এবং সুভদ্রাদেবীর নামে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি তাঁহার ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ জন পূর্ব্বোপুরুষ নরপালের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কাপ্তেন কিটো বলেন যে এই রাজবংশের তৃতীয় নরপাল রাজা লক্ষণদেব পার্ব্বত্যজাতির সহিত যুদ্ধে সিরগুজায় হত হন। সিরগুজায় যে রাজা লক্ষণদেবের নামীয় প্রস্তর ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেওরাজ লক্ষ্মণ পাল দেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। দেওরাজের প্রাচীন কাগজ পত্র দেখিলে জানা যায় যে উমগার অধিকাংশ মন্দিরাদি দেবকীর্ত্তি ঐ

বংশের ষষ্ঠভূপতি রাজা সান্ধ্যপাল দেব কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। সান্ধ্যপাল নির্ম্মিত মন্দির এবং ৺শিব এইথান হইতে ২২।২৩ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে সান্ধাইল গ্রামে অবস্থিত। কোঁচ গ্রামের মন্দির রাজা ভৈরবেন্দ্রের নির্ম্মিত বলিয়া এদেশে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। রাজা ভৈরবেন্দ্রের রাজ সভায় জনার্দ্দন পণ্ডিত অপরাপর ভূষণের সহিত অন্যতম পঞ্চম ভূষণ ছিলেন। তাঁহার বর্ত্তমান বংশধর কেওরাজের সংস্কৃত শিক্ষক। ইঁহারা মদনপুরের সন্নিকটস্থ পূর্ণাডিহ গ্রামে বাস করেন।* তাঁহার বংশ তালিকা প্রদত্ত হইল। কবি জনার্দ্দন এই রাজবংশের আদি, সভা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার উল্লেখ উম্‌গার ৫২টি ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে একটি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র কমলোদল, তৎপুত্র বিষ্ণুমণি, তৎপুত্র সদাশিব, তৎপুত্র পিতাম্বর, তৎপুত্র গোস্বামী দত্ত, তৎপুত্র কেশব দত্ত, তৎপুত্র জনার্দ্দন পাঠক, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন পাঠক তৎপুত্র তুলারাম, তৎপুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র মেধরাজ, তৎপুত্র হেমনাথ, তৎপুত্র দেবদত্ত। দেবদত্ত পাঠক বেশ ভাল পণ্ডিত এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ী শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ। ইঁহার পুত্র বনমালী পাঠক।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার আই, আর, এস্, এম বি ডি এফ এ, এম এ বি এল,

দুঃখের রাণী।

এসো প্রফুল্ল, অয়ি দুঃখস্মৃতি আমার পরাণ প্রিয়া
লজ্জিতা বধূ বাক্যবিহীনা সঙ্কোচে ভরি হিয়া,
বসো মোর পাশে হে মনমোহিনি! অতীতবিলাপ-বসনা,
জীবন তো শুধু ধ্বংসের মাঝে তব প্রেম উপাসনা!
শোকসজল মুগ্ধ নয়নে বরষি স্নিগ্ধ মায়া
হেরিতেছ বুঝি বদনে আমার বিষাদের কালো ছায়া?
তোমার চেয়েও তৃপ্ত গো আমি, দীপ্ত হে হিয়া মাঝে,
শুক্তির মাঝে মুক্তার মত অসীম তৃপ্তি রাজে।
লভিয়া জনম দুজনে যমজ ভ্রাতা ভগিনীর মত
কাটিতেছে কাল জনহীন গেহে কতনা বরষ গত!
চির পরিচিতা হে মহিমময়ি! মোরা দুটী উদাসীন,
এমনি করিয়া কাটাইয়া দিব শেষের কয়টা দিন।
ভাগ্যের মহাধিক্কারাহত হোক এ জীবন ভ্রান্তি,
তবু এর মাঝে এসো সুন্দরি সন্ধান করি শান্তি।
উপেক্ষা সহি সুখবঞ্চিত—যদি থাকে ভালবাসা,
মোদের মধুর মিলনে তা'হলে কেননা পুরিবে আশা?

শ্যামল নব তৃণদল হের শয্যা রচেছে দূরে,
অযুত কীটের কণ্ঠে জাগিছে ক্রন্দন শত সুরে

* J. A. S. B. Part ii vol XVI Rec Arch Surv Ind Vd X 1 p. 140—141 J. A. S. B Vol ii No. 3. P. 23.

ঊর্দ্ধে গগনে কাঁপিছে তারকা এসো এই অবসরে
ঢাল দেহভার উষর ধরার, ব্যথিত বক্ষোপরে।
তোমার কোমল ভুজলতাখানি হবে মোর উপাধান,—
ওঠে অবিরাম ঝিল্লির তানে ক্লান্তিজড়িত গান।
অজানা হুতাশে ছাড়ি গাঢ়শ্বাস পবন কাঁদিয়া চলে।
এসো সখি মোরা ঘুমাইয়া পড়ি মুক্ত গগন তলে!

প্রণয় দীপ্ত হিয়ার তোমার কি নিগুঢ় সমাচার,
অধর ওষ্ঠ বন্ধনটুটি' বাহিরে আসেনা আর;
কাঁদিছ কি সখি! কাঁপিছে কি তব তুষার শীতল হিয়া?
করগো তপ্ত, সুপ্ত আমার বক্ষের জ্বালা দিয়া।
বাহুবেষ্টনে কণ্ঠ আঁকড়ি' বক্ষে টানিয়া নাও
মৃত্যু-শীতল-অধরে তোমার চুম্বন আঁকি' দাও,
গলিত সীসকবিন্দুর মত তোমার অশ্রু-নীর
দহন করুক অবিরাম মোর তন্দ্রা-শিথিল-শির।
মৃত্যুর বুকে বাসর শয্যা আমরা রচেছি আজ,
নিবিড় আঁধার রাখুক ঢাকিয়া প্রণয়ের ভয় লাজ;
বিস্মৃতি দিক ঢালিয়া পরাণে গভীর শান্তি ধারা,
নাহি নিবারণ—আজি এ মিলনে মোরা যে আপনা হারা!
দুটী ছায়াসম মোদের হৃদয় নিবিড় আলিঙ্গনে,
এক হয়ে যাক্ নিঃশেষে মিশি নিশার আঁধার সনে;
মৃত্যু-ভীষণ-মিলনানন্দ তরল বাষ্প সম—
মিলাক্ আকাশে থাকুক কেবল নিদ্রা গভীরতম।
সেই, সুপ্তির মাঝে স্বপন-সায়রে ডুবিবে চিত্ত দুটী
মোরা নহি সখি তাহাদের মত, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে লুটি,
দুঃখ-দৈন্যে দগ্ধ যাহারা অতীতের সুখ স্মরি'
বিলাপ গাঁথায় নিখিলের হিয়া ক্রন্দনে দেয় ভরি।
এসো, ছুটায়ে তরল হাস্যতুফান উৎসব করি আজি,
এই যে জগত,—কিছু নহে প্রিয়া নির্ম্মম ছায়াবাজী!
জোৎস্নাহসিত আকাশের তলে লঘু মেঘদল প্রায়
লক্ষ্যবিহীন দলে দলে কত আসে আর ভেসে যায়।
আশে পাশে এই বিপুল বিশ্ব—অসংখ্য নরনারী,
মাংসলুব্ধ কুকুরের মত করিতেছে কাড়াকাড়ি—
নিঠুর ব্যাঙ্গ বুঝেকি তাহারা?—অন্ধ অবোধ দল?
কোথায় বা আমি? তুমি কেন বসি কাঁদিতেছ অবিরল?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

আলো-আঁধারী

প্রথম চিত্র।

[সহরের বাস্তির সম্মুখের বড় রাস্তা। সেই রাস্তা হইতে একটা সরুগলি বস্তির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। দুই পাশে লম্বা খড়ের চালের ঘর। অধিকাংশ ঘরের চালের খড় জীর্ণ, বাঁশ আল্‌গা হইয়া গলির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মধ্যে সেই সরুগলিটি দেখা যাইতেছে। দুজনের অধিক পাশাপাশি সে গলি দিয়া যাইতে পারে না। ঐ গলিতে প্রবেশ করিয়া একটা খড়ের ঘরের সম্মুখে প্রবোধমাষ্টার দাঁড়াইল। প্রবোধমাষ্টার যুবাপুরুষ,—বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ, মুখে চোখে একটা জীবন্ত প্রতিভা ও সহৃদয়তার আভা; কোঁকড়া কোঁকড়া রুক্ষচুল কাঁধের উপর পড়িয়া মুখের শান্ত কোমলতার উপর একটা দেবত্বের আভাস আনিয়াছে।—খড়ের ঘরের নীচে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও নর্দ্দামার পচা ময়লা মিলিয়া একটা নরকের সৃষ্টি করিয়াছে। ঘরের দাওয়া মোটে দু'হাত চওড়া। দাওয়ার একপাশে একটা কাঁচা মাটির উনুন। উনুনে আগুন পড়ে নাই। ঘর খুব ছোট ও অন্ধকার। একখানা খাটিয়া কোন রকমে ধরে,—খাটিয়াতে ময়লা মাদুর ও লেপ, বাহির হইতে দেখা যাইতেছে।]

প্রবোধ মাষ্টার—

আরে লছমিয়া, লছমিয়া

[বস্তির ভিতর হইতে কাতর স্বরে—]

বাবু, বোড়ো, অয় বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

ডাক্তার আসে নি ?

[ভিতর হইতে]

কই, কেউ ত আসেনি বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

তোর ছেলে কোথায় ?

[ভিতর হইতে]

কারখানায়, বাবু

প্রবোধ মাষ্টার—

এখন ও আসেনি ?

[ভিতর হইতে]

ওবর-টাইন কাজ করুছে, হুজুর

প্রবোধ মাষ্টার—

দাঁড়া তোর হাতটা দেখি একবার।

[ভিতর হইতে]

দেখবেন বাবু, খবরদারী, শির বাঁচাকে—

প্রবোধ মাষ্টার—

(ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু পরে বাহিরে আসিতে আসিতে)

আমি ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে কাউকে দিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[গলি দিয়া রাস্তায় আসিতে আসিতে একটা মেটে ঘর হইতে অস্ফুট কাতরোক্তি শুনিয়া প্রবোধ মাষ্টার দাঁড়াইয়া বলিল ;—

কি হয়েছে ? কে কাঁদছিস্ ?—বাবুলাল ?

[ঘর হইতে ক্রন্দন স্বরে,]

সে ঘর নেই, বাবুসাহেব।

প্রবোধ মাষ্টার—

কোথায় গেল ? কি হয়েছে ?

[ঘর হইতে]

হামাকে মেরে হাড় তোড়ে দিয়েছে বাবু, কাল দারু পিয়েছিল।

প্রবোধ মাষ্টার—

কি ভয়ঙ্কর ! সত্যি নাকি ? সে হতভাগা কোথায় ? ও কিছুতেই শুনবে না দেখছি ?

[ঘর হইতে]

কাল তলব মিলেছিলো, কিছু ঘরে আন্‌লে না, বাবু।

প্রবোধ মাষ্টার—

সব নষ্ট করেছে ? তা এ সপ্তাহে তোরা খাবি কি ?

[ঘর হইতে]

আমি অহি বলেছেলো তাই ম্যর্‌লে হুজুর, লখিয়া ভি কাল চলে গেলো,

প্রবোধ মাষ্টার—

কোথায় গেল ?

[ঘর হইতে]

ঘর্‌সে নিকলে গেলো, বাবু , বদ্‌মাস সব লে গেলো, (ক্রন্দন)

প্রবোধ মাষ্টার (স্তব্ধ হইয়া)

সর্ব্বনাশ! আচ্ছা দেখি কি কর্‌তে পারি, তুই রাত্রে আমাদের ওখানে গিয়ে খেয়ে আসিস্‌।

[ঘর হইতে করুণ ক্রন্দন,]

—হামার কেহো নেই, হুজুর—

[প্রবোধ মাষ্টার ঐ সরু গলি দিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। যেখানে রাস্তার আর একদিক হইতে আর একটা সরু গলি আসিয়া মিশিয়াছে, সেই মোড়ে একটা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া কতকগুলি বালক ও যুবক বিড়ি তৈয়ার করিতেছে। পরিধানে অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র। তাহাদের মুখে একটা পাপাচারের কালিমা। কোলে এক একখান কুলায় তামাক পাতার কুচী ছড়ানো রহিয়াছে। ঘরের বাহিরের দেওয়ালে দুই তিনটী স্ত্রীলোকের সাড়ী শুকাইতেছে। পাশে কয়েকজন জুয়া খেলিতেছে। সকলে মিলিয়া খুব গোলমাল করিতেছে ও নানা অশ্লীল বাক্য সেই গোলমালের মধ্য হইতে শুনা যাইতেছে। মাষ্টার ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া উহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এমন সময় ঘরের দরজা খুলিয়া কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর পতিতা স্ত্রীলোক চৌকাটের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতে পারিয়া প্রবোধ মাষ্টার চমকিত হইল। সেও প্রবোধ মাষ্টারকে দেখিয়া লজ্জিত হইল।]

প্রবোধ মাষ্টার অগ্রসর হইয়া বলিল—

তুমি এখানে, কেন, মুনিয়া ? তোমার মাকে ছেড়ে এলে ? তোমার ছেলে কৈ ?

[সে নত বদনে ঘরের মধ্যে পলাইয়া গেল। অন্য সকলে তাহাকে ও প্রবোধ মাষ্টারকে লইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।]

"ওলো—ও মুনিয়া—এ কেরে ?

"ওলো—শোন্‌ শোন্‌—"

"আসুন বাবু বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?"

"মুনিয়াকে ধরে আন্‌ছি—ভেতরে আসুন ঠাণ্ডা সরবৎ আছে।—ওরে একটা পান দেনা।"

"এঃ আপনি বেজায় বদ্‌রসিকত।"

"কোথায় যাচ্ছ, ধন, লজ্জা কি ? এসই না—"

[প্রবোধ মাষ্টার লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় চলিয়া আসিল।]

[পথে পশু, অমূল্য, যদু, শ্যামা প্রভৃতি বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি স্কুল-ফেরতা বালকগণের সহিত প্রবোধ মাষ্টারের সাক্ষাৎ]

পশু—

"একি মাষ্টার-মশায় কি হয়েছে ? আপনি অমন করে—"

প্রবোধ মাষ্টার—

কিছু হয় নি—সামান্য একটু আঘাত লেগেছে মাত্র

সকলে—

কোথায় ? কোথায় ? কোথায় লাগ্‌ল ? কি করে লাগ্‌ল ?

প্রবোধ মাষ্টার (হাসিয়া)

ভয় নেই রে কেউ আমায় মারে নি।

পশু (আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে)

তবে নিশ্চয় ঐ বস্তির কেউ অপমান করেছে—

অমূল্য—

বলুন না, মাষ্টার মশায়,—দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা।

প্রবোধ মাষ্টার—

আরে না—না—কিছু হয় নি। পাঁকে নাম্‌তে গেলে কাদা একটু লাগে না ? তাই হয়েছে।

বন্ধু—

তবু শুনি কে কি বলেছে?

প্রবোধ মাষ্টার—

একটুতেই যদি আস্তিন গুটিয়ে বসি ভাই, তাহ'লে কি আর একাজে নাম্‌তে সাহস কর্‌তাম? যে কাজের ভার আমার ওপর, তোমাদের ওপর পড়েছে তাতে কেবল দয়া, কেবল স্নেহ, কেবল নিঃস্বার্থপরতা সম্বল কর্‌তে হ'বে। কোথায় কে কি বলছে তার ভয়েই যদি কাজ থেকে সরে থাকি তাহ'লে ঐ দ্বিতীয় ভাগের গোপালের মত সুশীল সুবোধ বালক হয়ে বৈ-এর পাতার মধ্যেই থেকে যেতে হ'বে। কাজের জগতে কাদামাটির মধ্যে মানুষের মধ্যে মানুষ হয়ে কাজ করতে পারা যাবে না। অপমান বা নিন্দার ভয়ে পিছিয়ে পড়্‌লে ত চল্‌বে না। আবার সেই সঙ্গে ঐ বৈ-এর রাখালের মত রাতদিন ঘুঁসি উঁচিয়ে থাক্‌লেও চল্‌বে না। সইতেও হ'বে, আবার কর্ত্তব্যও করতে হ'বে।

শ্যামা—

তা হ'লে নিশ্চয়ই কেউ অপমান করেছে আপনাকে? না মাষ্টারমশায়, আমাদের কাউকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি একা ঐ সব এঁদো গলির মধ্যে ঐ সব জানোয়ারদের কাছে যেতে পাবেন না।

মাষ্টার—

ছি! ছি! শ্যামা বলিস্ কি? ওরাও যে আমাদের একেবারে আপনার জন। ওদের অপমান করিস্‌নে, মনে মনেও ওদের অপমান করিস্‌নে। চিরদিন যারা দুঃখ দৈন্য অন্যায় অবিচারের মধ্যে লালিত পালিত হ'চ্ছে তারাই ত আমাদের আপনার জন, তাদের ছুটো ঠাট্টা বিদ্রূপ কিম্বা গালাগালি কি গায়ে লাগে? তাদের সেবা করে—তাদের হাতে মার ধর খেয়েই ত আমাদের অন্তরের নারায়ণ জাগবেন। দেবতা হয়ে তবে দেবতার পুজো করতে পারা যায়। তোদের মধ্যে যে কাঙ্গালের ঠাকুর আছেন তাঁকে না জাগাতে পারলে বাইরের ঠাকুরের পূজো কেমন করে হ'বে। অপমান! অপমান কে করেছে? আমিই আমাকে কর্‌ছি, করিছি। যতদিন একটী মানুষও দারিদ্র্যে ও দুঃখের অন্তরালে অজ্ঞতায় ডুবে থাকবে ততদিন মানুষের সম্মান কোথায়? কোথাও না ভাই কোথাও না। যারা মানুষকে এমন অবস্থায় এমন নরক কুণ্ডে পড়ে পচতে দেখেও সুখে সুশীল সুবোধ হয়ে কাপড়ে কাদা না লাগিয়ে বসে আছে, তারা মানুষের যত অপমান করে, তত যে ডোম ডোখলা হাড়ি মেথর—তাদের সমস্ত ময়লা আমাদের গায়ে ঢেলেদিয়েও কর্‌তে পারে না। মানুষের মধ্যে মান অপমানের কথা তুলোনা। যতদিন মানুষ, বাধ্য হয়েই হোক্ আর আত্মরক্ষার জন্যই হোক্, মানুষকে বাঁচাবার বা তোলবার ব্যবস্থা না করে, কেবল ঘৃণা ও শাস্তির উঁচু পাথরের পাঁচিল তুলে তারই মধ্যে তাদেরই মত মানুষকে, তাদেরই মত মায়ের ছেলেকে, ছেলের মাকে, পতির পত্নিকে, পত্নীর পতিকে, ভাইয়ের ভগ্নীকে, ভগ্নীর ভাইকে চিরজীবনের জন্য বেঁধে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করবে ততদিন আমাদের মান অপমানের কথা তুলোনা। যারা এখন পর্য্যন্ত মানুষকে মানুষ কর্‌বার ব্যবস্থা না করে', চিড়িয়াখানার বাঘ ভালুক বা সমাজের শিয়াল কুকুর করে' রাখবার ব্যবস্থা করেছে তাদের জগতে বাস করে', গোটাকতক মূর্খ অজ্ঞানান্ধ ভাই ভগ্নীর বিরুদ্ধে বিচলিত হ'বার অধিকার আমার নেই।

শ্যামা—

কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় পাপ করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কি করে সহানুভূতি হ'বে? তাদের মাষ্টারমশায়, আপনি বস্তিতে গিয়ে গিয়ে কি করে ভাল করবেন? ভাল কর্‌তে গিয়ে উল্টে আপনি যে তাদের হাতে অপমান খাবেন এ আমরা সইতে পার্‌বো না।

মাষ্টার—

দ্যাখো—আমরা যাদের পাপী বলে মনে করি, সমাজের শত্রু বলে যাদের ঘৃণা করি, শাস্তি দিই তাদের বিচার কর্‌বার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সমাজের ব্যবস্থা যদি তাদের পতনের কারণ হয় তাহ'লে আমরাই বা কি করে তাদের বিচারক হ'ব?

বন্ধু—

কেন হ'ব না? যারা মদ খায়, বদমায়েসি করে, সমাজ যদি তাদের শাস্তি না দেয়, তাহ'লে কারুর যে পাপের ভয় থাক্‌বে না।

মাষ্টার-

তা ঠিক, কিন্তু চোর হোক্, মাতাল হোক, বদমায়েস হোক এটা নিশ্চয়, ধর্ম্মপথ ছেড়ে পাপের পেছল পথে যার পা হড়কায় তার তত দোষ নয়, যত দোষ সেই যার অবস্থার ও ঘটনার মধ্যে সে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়।

অমূল্য—

কি রকম অবস্থা, কি রকম ঘটনার কথা বল্‌ছেন আপনি ?

মাষ্টার—

ধর, ঐ বস্তির একটা কুলী, বাবুলালের কথা—তুমি ত তাকে জান—যখন সে পল্লীগ্রামে ছিল, ও হঠাৎ তার বাপ মরে যেতে অনেক ঋণে জড়িয়ে পড়্‌লো। সেই সময় যদি কেউ দয়া করে, ভালবেসে ওকে কিছু সাহায্য করত, কিম্বা কোন রকমে সেই দুর্ভাবনা হ'তে মুক্তি দেবার কোন ব্যবস্থা সমাজে থাকৃত, তাহ'লে ওকে অন্নের চেষ্টায় এই সহরে এসে এই বস্তিতে বাসা নিতে হ'ত না—সেই দয়াই, সেই ব্যবস্থাই তাকে তার পতন হ'তে রক্ষা করত!—কিম্বা তার ওপরে যখন কারখানায় বার ঘণ্টার কাজের পর সে প্রলোভনে পড়ে, অসৎ সঙ্গে বেশ্যা বাড়ী বা মদের দোকানের দিকে সন্ধ্যাবেলায় ছুট্‌ত, তখন যদি কেউ খুব স্নেহ করে' তার হাত ধরে' ডেকে বল্‌ত, "বাবুলাল—ছিঃ কি কর্‌ছ? যেওনা, এ অন্যায় কর্‌ছো"—তাহ'লে সে কখ্‌খনো সেখানে যেত না। কেউ ত তার কাছে অমন করে দাঁড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে' তাকে ফেরায় নি—সেত ক্রমাগত তার চারিদিকে দেখ্‌ছে যে মানুষ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে তারপর বাড়ীতে এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি গালাগালি করে, তারপর শুঁড়ি বাড়ী ছুটে মদ খায়, তারপর বেশ্যা বাড়ী গিয়ে রোগ নিয়ে ফিরে আসে, তারপর হাঁসপাতালে গিয়ে মরে। এর ভিতর থেকে এমন ব্যবস্থার মধ্যে এই বাবুলাল ছাড়া আর কি রকম মানুষ আশা কর ?

শ্যামা—

সত্যি এমন হয় ?

মাষ্টার মশায়—

তাই আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ? চারিদিকে দেখ্‌ছ, নিজেরা তাই নিয়ে খাটছ, তবুও বিশ্বাস হ'চ্ছে না ? আমি এই দরিদ্র দুঃখী পাপীদের মধ্যে যত ঘুরি ততই দেখি তাদের মধ্যে নারায়ণের জাগবার একেবারে সুযোগ নেই বলেই তারা এখন এত সমাজের ঘৃণার পাত্র হয়েছে ! এর জন্যে কে দায়ী ? আমরা, সমাজই দায়ী। ঐ যে বিড়ির দোকানটা দেখা যাচ্ছে—ওর ভেতর দিকে বেশ্যারাও থাকে। ঐখানে মুনিয়া বলে একটা আমার চেনা স্ত্রীলোক বোধ হয় আজ কদিন হ'ল এসেছে—এখনি আমি তাকে দেখে এলাম। ওর বিষয় আমি বল্‌তে পারি যে ও যদি সময় ও সুযোগ পেত তাহ'লে ঐ মুনিয়াও সংসারে আমাদেরই মত একটা সাধারণ জীব হয়ে সুখে ঘরকন্না কর্‌তে পারত। কিন্তু এমনি আমাদের পোড়া পেটের দায়, এমনি আমাদের সংসারে পতনের সুব্যবস্থা যে ঐ অশিক্ষিতা মূঢ় অন্নহীন মেয়েটির পক্ষে সৎপথে থাকা অসম্ভব হয়েছিল। তাকে যেন আমরা ঠেলে নরকের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। তারপর তাকে বিচার কর্‌তে বসেছি,—এ বিচার কি পরম বিচারকের কাছে ন্যায়ের অপমান ও পীড়িতের পুনঃ নিষ্পেষণ নয় ?

শ্যামা—

কি, ভয়ঙ্কর !

যদু—

ভয়ঙ্কর, কিন্তু সত্য।

[সকলে ক্ষণকাল স্তব্ধ। ইতিমধ্যে হরির প্রবেশ]

পশু—

এই যে হরি !

অমূল্য—

এখনও বাড়ী যাস্‌নি যে ?

হরি—

মধুর জন্যে কবরেজের কাছে গিইছিলাম।

অমূল্য—

দেখা পেলি ?

হরি—

না, আবার রাতে আর একবার যেতে হ'বে। তারপর শুনেছেন, মাষ্টার মশায়, মলিনার সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গিয়েছে।

প্রবোধ মাষ্টার—

সে কিরে, কেন ?

শ্যামা—

শুনছি, গৌরবাবু তলে তলে ভাঙ্‌চি দিয়েছেন।

প্রবোধ মাষ্টার—

সত্যি নাকি ? কি ভয়ানক ! লোকটা মুখে এক, পেটে এক !

পশু—

আপনি এত চেষ্টা করে যোগাড় কর্‌লেন—গৌরবাবু সাহায্য কর্‌বেন বলে শেষে এই কর্‌লেন !

হরি—

আমরা যে গরীব, আমাদের ত এমনি হ'বেই।

শ্যামা—

অমন কথা বলো না—আমাদের মাষ্টারমশায় আছেন —তিনি তোমাদের কত যত্ন করেন। তোমাকে তোমার ভাইকে ফ্রি করে দিলেন, তোমাদের বোনদের কত ভাল ভাল বই কিনে দিয়েছেন, রামানন্দ বাবুর রামায়ণ, দীনেশ বাবুর মহাভারত ;

প্রবোধ মাষ্টার—(দীর্ঘনিঃশ্বাসেরপর)

ও কথা ছেড়ে দাও,—এখন যা হয় একটা কিছু কর্‌তে ত হ'বে। মলিনার বিয়ে ত দিতেই হ'বে।

শ্যামা—

কেন ?

প্রবোধ মাষ্টার—

না দিয়ে আর উপায় কি ? সমাজত ছাড়্‌বে না।

পশু—

তাই বলে ওরকম নির্দ্দয় নিষ্ঠুর লোকদের কাছে বিলিয়ে দিতে হ'বে নাকি ?

অমূল্য—

মাষ্টার মশায়, একটা কথা বল্‌তে ভয় কর্‌ছে, যদি কিছু মনে না করেন ত বলি—

প্রবোধ মাষ্টার—

কি আবার মনে কর্‌ব ? বলনা ; আমি ত তোমাদের শুধু শিক্ষক নই, আমি তোমাদের বন্ধুও ত বটে। আমার কাছে সঙ্কোচ কর্‌ছ কেন ?

অমূল্য—

না, না, সঙ্কোচ নয়। তবে বলি, আপনার সঙ্গে ত হরির বোনের সম্বন্ধ হয়েছিল—আমি বলি—যদি সেটা হয়—

হরি—

না, না, ও কথা ছেড়ে দাও—মাষ্টারমশায় যে কাজ কর্‌ছেন বিয়ে থাওয়া কর্‌লে সে সব কাজ কি চলে ?

যদু—

কেন চল্‌বে না ?

অমূল্য—

হরির বোনের মত অমন মেয়ের বিয়ে না হওয়ার দরুণ যদি সমাজে কষ্ট পায় তা হ'লে তাকে বিয়ে করাটাই বড় কাজ,—মাষ্টার মশায় কিছু বল্‌ছেন না যে ?

প্রবোধ মাষ্টার—

আমিও তাই ভাবছি,—হরি, আমি যে আদর্শ নিয়ে চলেছি তা আমাদের সমাজে ধরে রাখা ক্রমশঃ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠছে, আমি বুঝতে পার্‌ছি না কি কর্‌ব,—হয়ত বা আমাকে বিবাহ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে হবে,—যা হোক্ এখন চল, ঐ দেখ পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ উঠ্‌ছে—শীগ্‌গির চল, বৃষ্টি এল বলে।—আমি একবার সতীশ ডাক্তারের ওখানে ও স্কুল ঘুরে তোমাদের ওধারে যাচ্ছি—তোমরা শীগ্‌গির বাড়ী যাও।

দ্বিতীয় চিত্র।

[নগরের একপ্রান্তে একটা পুরাতন ও জীর্ণ বাড়ীর কক্ষ।

একটা জানালা প্রান্তরের দিকে। দেওয়ালের মধ্যস্থলে আল্‌না, ও আল্‌নায় ময়লা জামা কাপড়। এক পাশে একটী কালীর ও আর একটা কৃষ্ণ ঠাকুরের পট। আর একদিকে একটা ব্রমাইড ফটোগ্রাফ অযত্নে অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। জানালার নীচে একটা টেবিল। টেবিলে

ছেঁড়া খাতাপত্র, ধোপার হিসাব, মুদীর হিসাব, মেয়েলী হাতে লেখা গানের খাতা, গোটাকতক খালি শিশি। টেবিলের নীচে একটা কেরোসিন-বাক্স—তাহাতে গোটা-কতক এনামেলের বাটী এলো মেলো ভাবে সাজান। দক্ষিণ দিকে একটা তক্তাপোষ। তক্তাপোষে ছেঁড়া মাদুর ও কাঁথা, কোণে একটা হাতল ভাঙ্গা চেয়ার। বাহিরে কাল-বৈশাখী ঝড় হইতেছে। সন্ধ্যা অতীত। তক্তাপোষে বসিয়া করুণা। করুণা—বিধবা। একটা ময়লা ছোট কাপড় তাহার পরিধানে। সে বার বার দেশালাই জ্বালিতেছে, দেশলাই বাতাসে বার বারই নিবিয়া যাইতেছে।]

করুণা—

শিব্ শিব্।

[প্রদীপ এবার জ্বলিল। বাহিরে ঝড়ের শোঁ শোঁ শব্দ]

[নবীন ওরফে নবা ঘরে ঢুকিল। বয়স ১৭।১৮। গায়ে একখানা চাদর লুটাইতে লুটাইতে আসিতেছে। ময়লা কাপড়। মদেতে তাহার চক্ষু ঈষৎ রক্ত বর্ণ।]

নবা—

উঃ বাপ্‌রে! এমন ঝড় বৃষ্টিত কখনও দেখিনি! একবারে ভিজিয়ে দিয়েছে। ঘরে কিছু খাবার আছে? (জুতা খুলিয়া খাটের উপর গিয়া বসিল।)

করুণা—

[কেরোসিন-বাক্সটা একটু টানিয়া আনিল। বাক্সের উপর একখানি ঘরে তৈরী রুটী। বাটীতে একটু গুড়। টেবিলে একটা চটা ওঠা চায়ের বাটী—এখনো তাহাতে চায়ের ভুক্তাবশেষ একটু রহিয়াছে।—বাহিরে পায়ের শব্দ।]

"খান দুই রুটী মোটে আছে দেখ্‌ছি। হরির জন্য রেখেছি—স্কুল হ'তে এসে খাবে।"

নবা—

ও যা হয় খাবে অ'খন—আমার বড্ড খিদে পেয়েছে

করুণা—

দাঁড়া একটু, আমি এখনি আলু পুড়িয়ে দিচ্ছি।

নবা—

না আমি রুটিই খাব—ঁঁ্যাঃ কেবল হরে, হরেই খাবে একা—আমরা যেন ভেসে এসেছি!

[হরি বই খাতা পত্র লইয়া ঢুকিল। জামা, কাপড়, বই সব ভিজিয়া গিয়াছে, করুণা—নিঃশব্দে একটা বাটীতে রুটি ও গুড় দিয়া নবাকে দিতেছে, এমন সময় হরি বলিল]—

দিদি, আমাকেও দাওনা—ভারী খিদে পেয়েছে যে।

করুণা—

তোমার জন্যেই ত রেখেছিলাম, নবা ছাড়্‌লে না—

হরি—

ওর আর একটু তর সইল না—বাড়ী বসে বসে এত ক্ষিদে পেয়ে গেল?—

নবা—

(খুব চীৎকার করিয়া) পাজী,—শূয়ার! হিংসুক—

হরি—

আমি পাজি না তুমি পাজি—দাও আমার রুটি—

করুণা—

নিয়োনা—ভাই আমার, মুখের গ্রাস নিতে নেই।

[করুণা ঘরের এক কোনে নারিকেলের ছোব্‌ড়ায় আগুন দিয়া গোটাকতক আলু পোড়াইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।]

হরি—

(নবার দিকে দাঁত কিট্‌মিট্ করিতে করিতে চাহিয়া)

মাগো,—গন্ধ দ্যাখো—শুঁড়ীবাড়ী না কোথ্‌থেকে আস্‌ছেন—বাড়ী একটা হোটেল, শুধু খাবার জন্য বাড়ী নাই বা ঢুকলে!

নবা—

তুই—কি রোজকার করে এলি শুনি, আমি না হয় শুঁড়িবাড়ী গিয়েছিলাম। স্কুলে মাস মাস টাকাগুলো যাচ্ছে—বাবুয়ানী হচ্ছে—ওঁর জন্যেই কেবল ভাল ভাল জিনিষ চাই, খাবার চাই

হরি—

কুঁড়ের বাদ্‌শা শুধু বসে বসে ভাত গিল্‌ছে আর গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছে—সমস্ত দিন ধরে আমি স্কুলে খাটুব আর উনিই কেবল খাবেন। আর কেউ খাবে না।

নবা—

(হরিকে ভেংচাইয়া) হ্যাঁ খাবইত, বেশ করব তুই যেখান থেকে পারিস খেগে যা।

হরি—

(মৃদুস্বরে, নবাকে শুনাইয়া) পুলিসে দিলে বেশ হয়! —মাষ্টার মশায়ের চাদর চুরি করা—

নবা—

চুপ, কর, মুখ, সাম্‌লে কথা ক! মাষ্টারটা ত খুব জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী দেখ্‌ছি—সে এই কথা বলেছে?

হরি—

মাষ্টারমশায় বলতে যাবেন কেন—কে সেদিন নাইট স্কুলের ঘর হ'তে চাদর চুরি করেছিল?—আমি কি জানি নে?

[হরিকে খালি বাটীটা ছুড়িয়া দিয়া]

নবা—

এই নে খেগে যা—বাটীটাই খা।

হরি—

(ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া এবং মুঠা বাঁধিয়া), কি আমার খাবার খেয়ে তার ওপর এই রকম ঠাট্টা!—চোর বদ্‌মাস্—

করুণা—

[তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া] ছিঃ হরি! ও না হয় জানোয়ার, তুমিও যে তাই হচ্ছ;—বড় ভাইকে ঐ সব গাল দিচ্ছ? ছিঃ ছিঃ মাষ্টারমশায় শুন্‌লে কি বল্‌বেন।

হরি—

(কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল) দিদি তুমিও ওর দিক নিলে! যাও আমি কিছু খাব না। (বেগে প্রস্থান)

করুণা—

ও হরি, ও হরি, ছিঃ ভাই—ফের্—ফের্; নবা যা শীগ্‌গির—এই ঝড়ের মধ্যে দেখ কোথায় গেল।

নবা—

যাবে আবার কোথায়, ক্ষিদের জ্বালায় এখুনি ফির্‌বে।

করুণা—

না না তুই দেখনা ভাই লক্ষীটী যা—যা।

[নবার প্রস্থান। করুণা আলুর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইল।]

[ঝড়ের ঝাপটায় বাড়ীটা শুদ্ধ নড়িয়া উঠিতেছে। মধু ও কেলো দুইজনকে ঝড় যেন ঘরের ভেতর জোরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। কেলো খুব চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। মধু বুকে হাত দিয়া অতিকষ্টে কাসিতে লাগিল। দুইজনেই জামা খুলিতেছিল।]

কেলো—

ঝড় দেখ একবার—কোন দিন বুঝি বাড়ী পড়ে। বা, বা, কেমন মজা! আমাকে আছড়ে ফেলে দিলে—নর্দ্দামার কাছে।—রাম্ রাম্ নর্দ্দামায়!

[মধু ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও সামলাইতে পারে নাই। হাঁপাইতেছিল।]

কেলো—

হরি হন্ হন্ করে উঠান্ দিয়ে ছুটে গেল কেন দিদি?

করুণা—

নবা ওর খাবার খেয়ে ফেলেছিল, তার ওপর ঠাট্টা করে রাগিয়ে দিয়েছে।

[করুণা তাহার আলুপোড়া লইয়া উঠিয়া আসিল এবং কেলো ও মধুকে গোটাকতক দিল। কেলো খাইতে খাইতে বলিল]

ওর কি আর পদার্থ আছে—খেতে না পেয়ে কোকেন খাওয়া, শেষে চুরিও আরম্ভ কর্‌লে।

করুণা—

তুমি কোথা গেছ্‌লে?

কেলো—

আপিসে খোঁজ নিতে। উঃ সে অনেক দূর—সেই ট্যাঁকশালের কাছে।

করুণা—

কিছু সন্ধান হ'ল?

কেলো—

দরোয়ান ঢুক্‌তে দিলে না। পয়সা চাইলে, তা পাব কোথায়? শেষে অপমান কর্‌লে!

করুণা—

তা—ফিরে এলি—কিছু করে আসতে পার্‌লিনি (বলিয়া—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।)

কেলো—

তা কি কর্‌ব শুধু পণ্ডশ্রম— (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) ঘরে-না খেয়ে বনের মোষ চরানো আর ক'দিন চল্‌বে এমন করে!

মধু—(কাসিতে কাসিতে)

দিদি, কাপড় দাও, এটা একেবারে ভিজে গেছে।

করুণা—

কাপড় ত আর নেই। আমার কাচা কাপড়টা শুকোয় নি,—তুমি কাপড় ছেড়ে ঐ কাঁথাটা ঢাকা দিয়ে তক্তাপোষে বসে থাক।

[মধু কাসিতে কাসিতে রক্ত বমি করিল; করুণা দেখিয়া অলক্ষ্যে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আঁচল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিল। মধু কাঁপিতে কাঁপিতে জীর্ণ কাঁথা দিয়া লজ্জা ও শীত নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল।]

করুণা—(মধুকে দেখাইয়া কেলোর প্রতি)

উঃ ওরত কাসির সঙ্গে রক্তওঠা বাড়তেই চলেছে।—তবে—কি হ'বে—আর কোথায়ও চাকরী খালি নেই!

কেলো—

একটা খালি আছে merchant আফিসে একটিনির কাজ—সে আবার ১৫ দিন পরে—

করুণা—

আর যে দিন চলা ভার; গয়না গেল, পেতলের ঘটী বাটী বন্ধক নিয়েও যে কেউ টাকা দিতে চায় না। (এক মুহূর্ত্ত থামিয়া ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) মলিনাকে আজ গৌরবাবুর আত্মীয় দেখতে এসেছিল। তাঁরা নাকি অনেক টাকা চেয়েছেন। কথা বার্ত্তা হ'তে হ'তে বাবা, কি জানি রেগে গিয়ে, তাঁদেরকে অপমান করেছেন, গালাগালি দিয়েছেন, তারপর একরকম তাঁদের বাড়ী হ'তে বার করে দিয়েছেন। শেষে যত রাগ পড়ল মলিনার ওপর ওকে খুব বক্‌লেন্ তারপর ধরে মার্‌লেনও।

ও ঘরে একা বসে বসে কাঁদ্‌ছে। তুই এখনি একবার তাঁদের বাড়ী যা, দেখ্ যদি কিছু কর্‌তে পারিস্ বুঝিয়ে শুঝিয়ে—

কেলো—

এই ঝড়ে? এখনি যাওয়া দরকার?

করুণা—

হ্যাঁ, ভাই, যেতেই হ'বে—এত কষ্টে একটা সম্বন্ধ এল, এটাও ভেঙ্গে গেল; তুই যা এখনি একবার, হাতে পায়ে ধরে বাবার হ'য়ে, তাঁদের কাছে মাপ চেয়ে আয়গে, যদি তাঁদের মন ঘোরে।

কেলো—

আচ্ছা দেখি একবার চেষ্টা ক'রে'।

(প্রস্থান)

[আবার দমকা ঝড়ে ঘর দুয়ার কাঁপিয়া উঠিল।]

এক মুহূর্ত্ত সব চুপচাপ্।—তাহার পর প্রবোধমাষ্টার ও হরি দুইজনে মলিনাকে ধরাধরি করিয়া আনিল। বালিকার এলো চুল হইতে জল ঝরিতেছে। খোলো খোলো কাল চুলের মধ্যে মুখখানি মেঘে ঘেরা পাণ্ডু চন্দ্রের মত দেখাইতেছে। বালিকার সর্ব্বাঙ্গেও কাপড় হইতে জল ঝরিতেছে। তাহার ভিজা লম্বাচুল মাষ্টার মহাশয়ের বক্ষ স্পর্শ করিয়া বস্ত্রাদি ভিজাইয়া দিয়াছে। তাহার লম্বিত হস্তপদ অসাড়, স্পন্দহীন। প্রবোধমাষ্টার ও হরি দুইজনে কাহারও দিকে না চাহিয়া যে তক্তাপোষের উপর মধু বসিয়াছিল তাহার উপর উহাকে শোয়াইয়া দিল। করুণা হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মলিনাকে যখন খালি চৌকিতে শোয়ান হইল তখন সে ভীত স্বরে ছুটিয়া গিয়া বলিল]—

একি—একি মলিন—মাষ্টার মশায় একি?—

মষ্টার মশায়—

চুপ্—এখন ব্যস্ত হবার সময় নয়—আগে ওকে একটু সুস্থ করি তারপর—বল্‌ছি।

মধু—

(ব্যস্ত ভাবে) কি—কি—কি হয়েছে—

মাষ্টার মশায়—

[যে বিছানা গুটান ছিল তাহা বিছাইয়া দিয়া) মধু তোমার কাঁথা খানা দাও ঢাকা দি।

মধু—

(অপ্রস্তুত হইয়া ও কাঁথা না ছাড়িয়া) কি হয়েছে ওর?

প্রবোধ মাষ্টার—

আগে দাও না, তারপর বল্‌ছি। (করুণার প্রতি) একটু আগুন করে নিয়ে এস—সেক দিতে হ'বে—

[করুণা বাহিরে গিয়া একটু পরেই এক-কড়া আগুন লইয়া আসিল]

মাষ্টার মশায়—

(মলিনার প্রতি) মলিনা, মলিনা,—(মলিনা চমকিয়া উঠিল) ভয় কি শোও—ভয় কি? এই যে আমরা—চিন্‌তে পারছ না?

মলিনা—

(কাঁদিতে কাঁদিতে) মার্‌বে—

মাষ্টার মশায়—

কেউ মারবে না—আমি তোমার মাষ্টার মশায়— এই যে হরি, এই যে তোমার দিদি— ভয় কি, কিছু ভয় নেই।

মলিনা—

ঐ বাবা, বাবা—আস্‌ছে—মেরোনা বাবা, আর করব না—

মাষ্টার মহাশয়—

বাবা এখানে নাই। এই দেখ দিদি, হরি ও আর সকলে রয়েছে—চোখ খোল।

মলিনা—

(চোখ না খুলিয়া) না, না, ঐ যে বাবা আস্‌ছে। (কাহার পায়ের শব্দ শুনা গেল)

[নবার সশব্দে প্রবেশ।]

নবা—

পেলাম না দিদি সে শূয়ারকে—এই যে, একি মাষ্টার মশায়—ওকে শুয়ে ওখানে (মলিনার—নিকটে গিয়া) কে এরে?

মলিনা—

(চম্‌কাইয়া বিছানা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিল) ঐ বাবা এসেছে (কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে মা—

প্রবোধ মাষ্টার—

(মলিনার প্রতি) কেউ আস্‌বে না এখন (নবার প্রতি) অত গোল করছ কেন? ও-ঘরে যাওনা—

নবা—

উনি উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লেন। একি তোমার বাড়ী যে আমি কথা কইতে পাব না!

প্রবোধ মাষ্টার—

এর অসুখ করেছে যে।

নবা—

(অবিশ্বাস করিয়া) অসুখ করেছে! রোজ রোজ ওর যত স্থাকামি, প্যান প্যানানি—লোক জড় করা হয়েছে দেখ!

প্রবোধ মাষ্টার—

(মলিনার পিঠে হাত দিয়া) বড় কাঁপছে! (করুণার প্রতি) একটা গায়ের কাপড় দাওনা (নবার প্রতি) দাওনা তোমার চাদরখানা—

নবা—

চাদর—চাদর—অ্যাঁ—তাইত—তাইত (তাহার পর আপনার গায়ের, পরে মাষ্টার মহাশয়ের চাদরখানার দিকে একবার চাহিয়া আর একবার মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে পিছাইয়া পলায়ন করিল)

প্রবোধ মাষ্টার—

ওকি— চাদরখানা দিয়ে যাও না—

হরি—

আপনার চাদর গায়ে দিয়ে আছে বলেই পালালো।

করুণা—

আমি একটা গায়ের কাপড় এনে দিচ্ছি।

[করুণা অন্য ঘর হইতে একটা কাঁথা আনিয়া হরির হাতে দিল।]

[প্রতিবেশী গৌরবাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একজন ভৃত্য, তাহার হাতে একটা লণ্ঠন। গৌরবাবুর মাথার চুল পাকা, কিন্তু গোঁপ ছোট ও কালো—কলপ দেওয়া। গায়ে একটা পাঞ্জাবী, হাতে একটা ছড়ি। সমস্ত চেহারা ও পোষাকের ভিতর দিয়া যেন একটা বাবুগিরির অহঙ্কার ফুটিয়া বাহির হইতেছে।]

গৌরবাবু—

এই যে মাষ্টার—আমি এই মাত্র খবর পেয়ে আস্‌ছি।

চাকরটা বারান্দা থেকে তোমাদের গোলমাল শুনে আমায় খবর দিলে—কে ডুবেছে ; কি হয়েছে বল দেখি—

প্রবোধ মাষ্টার—

মলিনা—কি করে ঐ খিড়্‌কির পুকুরটায় পড়ে গিয়েছিল, আমরা এখন জল হ'তে তুলে আন্‌লাম

হরি—

(অগ্রসর হইয়া) আমি স্কুল হ'তে এসে পায়ের কাদা ধোবার জন্যে ঐ কালী দীঘিতে নাম্‌ছি—বৃষ্টিতে ভিজে—যে কাদা রাস্তায়—বাজারের মোড়টায় যে কি কাদা হয়েছে !

গৌরবাবু—

জানি, জানি—গল্প কাঁদতে হবে না, কি হয়েছে বল না তাড়াতাড়ি

হরি—

তখন ঝড় একটু থেমেছে—আমি কার গোঙানি শুন্‌তে পেলাম্—আমার এমনি ভয় হ'ল—ভাব্‌লাম ভূত—

গৌরবাবু—

আঃ, বল না ছাই—তুমি বড় জ্যেঠা হয়েছ !

হরি—

শুনুন্ না, বল্‌ছি ! তারপর দেখলাম কার যেন চুল ভাস্‌ছে, তখন অন্ধকার, বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছিল, আমি স্পষ্ট দেখলাম চুলগুলো নড়্‌ছে,—একবার উঠ্‌ছে একবার নাম্‌ছে। আমি অমনি চেঁচিয়ে উঠে—নাম্‌লাম।

গৌরবাবু—

যাক্—তবুও ভাল—তোমাকে যখনই দেখি তখন হয় তুমি কারু সঙ্গে ঝগড়া কর্‌ছ, মার্‌ছ ধরছ, না হয় রাস্তায় ছেলেদের নিয়ে কারু বাড়ী চড়াও করে ফল পাকড় ভাঙ্গচ—শুধু দুষ্টুমি, আর খেলা। এবার যাক্ একটা কাজ করেছ দেখ্‌ছি।—ভাগ্যে তুমি ছিলে !

হরি—

কোমর জলে গিয়ে ওর চুল নাগাল পেলাম, কিন্তু টেনে কি আন্‌তে পারি ? এমন সময় মাষ্টার মশায় কোথ্‌থেকে ছুটে এলেন—তারপর, আমরা দুজনে ধরাধরি করে তুল্‌লাম—

প্রবোধ মাষ্টার—

আমি স্কুল হ'তে ফিরছিলাম—স্কুলে একটা মিটিং ছিল, ফির্‌তে দেরী হয়ে গেল। কালী দীঘির ওপার থেকে হরির চীৎকার শুনে দৌড়ে গেলাম। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ওঠালাম। তারপর একটু ঝাকাঝাঁকি করে পেট থেকে জল বার করে' দিয়ে এখানে নিয়ে এলাম।—যাক্, একটু গরম দুধ আছে ? (করুণা বাহির হইয়া গেল।)

গৌরবাবু—

মলিনা জলে পড়্‌ল কি করে ?

হরি—

(দ্বিধা করিয়া) শুন্‌লাম নাকি বাবা ওকে মেরেছিল, জানি না—হয়ত রাগ করেই বা ডুব্‌তে গিয়েছিল !

গৌরবাবু—

কে মেরেছিল—ওর বাবা ? বিপিন ত তোমাদের খুব ভালবাসে ! সে এমন হ'ল্ কেন ?

হরি—

আমি ছিলাম না, দিদি বল্‌ছিল, আপনার আত্মীয়েরা এসেছিলেন মলিনার সম্বন্ধ কর্‌তে—তাঁদের সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া হয়—তাই তিনি খুব রেগেছিলেন।

গৌরবাবু—

তা মলিনা কি কর্‌লে ? (মলিনার বিছানার দিকে অগ্রসর হইয়া) কি হয়েছে খুকী, ওঠ—কাঁপ্‌ছ কেন ? আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না ?—বলত আমি কে ? বল—আচ্ছা তোমার নাম বল। বল, বলনা, শুন্‌তে পাচ্ছনা (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) মেয়েটাও একটু এক-গুঁয়ে আছে।

প্রবোধ মাষ্টার—

এখনো পুরো জ্ঞান হয় নি,—মলিনা !

মলিনা—

উঁ।

প্রবোধ মাষ্টার—

গৌরবাবুর কথার উত্তর দাও।

মলিনা—

(কাঁপিতে কাঁপিতে) উঃ আমার বড় শীত কর্‌ছে !

[দুধের বাটী লইয়া করুণার প্রবেশ]

হরি—

(করুণার হাত হইতে দুধের বাটী লইয়া) দুধ এনেছি, একটু খা'ও'।

মলিনা—

উঃ আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে—

প্রবোধ মাষ্টার—

গরম দুধ, খাও, এই নাও!

মলিনা—

উঃ—আমার বড্ড লেগেছে।

প্রবোধ মাষ্টার—

কে মেরেছে?

মলিনা—

আমার ভয় কর্‌ছে!—

গৌরবাবু—

ভয়—কি? কে মেরেছে? বল না আমায়? শুন্‌তে পাচ্ছ না?—বল না, অমন করছ কেন? তোমার বাবা—তোমাকে কষ্ট দেয়?—তোমায় বকে?—গালাগাল দেয়? —মারে?

হরি—

এমনিতেই ও বেশী কথা বলে না; খুব বেশী-কিছু হ'লে তবে যদি একটা বেরোয়—

গৌরবাবু—

সে হতভাগা বিপিনটা গেল কোথায়? আমি যদি তাকে একবার পেতুম!

হরি—

বাবার মাথার ঠিক নেই—সকলকেই আজকাল বকেন, মারধর করেন।

গৌরবাবু—

কেন বল দেখি?

হরি—

মার সেই বন্ধ্যা হ'বার পর অনেক আমাদের দেনা হয়ে পড়্‌ল—অনেক খরচ হ'ল, শেষ দিক্‌টা চিকিৎসাই হ'ল না।—নবা ঘুরে বেড়ায় কিছু করে না—মলিনার শীগ্‌গির বিয়ে দিতে হ'বে—অত টাকাই বা কোথায়? এই সবের জন্য বাবার মাঝে মাঝে মাথা গরম হয়ে ওঠে—তখন তাঁর আর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না—দেখুন না, মারধর করে' তারপর কোথায় বিকেল হ'তে বেরিয়ে গেছেন, কখন ফির্‌বেন কে জানে?

প্রবোধ মাষ্টার—

মা যখন ছিলেন তখন অভাবের মধ্যে তবুও লক্ষ্মীশ্রী ছিল। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এখন সব গেছে।

গৌরবাবু—

ও পাড়ায় শুন্‌লাম্ তুমি নাকি টাকা না নিয়ে মলিনাকে বিয়ে কর্‌বে বলে—নিজে সুখ্যাতি নিয়েছ—এখন বুঝি—ব্যাপার ঘনিয়ে এসেছে দেখে সরে পড়্‌লে। বিপিনের ত নেহাৎ দোষ নেই! আজকাল শুন্‌ছি সে মদও ধরেছে। সেদিন দেখলাম শুঁড়ি বাড়ীর বেঞ্চে বসে সে কার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে।—খুকী, আমার দিকে তাকাও ত।

মলিনা—

না, না--না, আমি পার্‌ব না।

প্রবোধ মাষ্টার—

মলিন!

মলিনা—

কি!

প্রবোধ মাষ্টার—

আমি কে বল দেখি?

মলিনা—

তুমি!

প্রবোধ মাষ্টার—

বল—আমাকে চিন্‌তে পারছ না?

মলিনা—

হ্যাঁ, তুমি—তুমি, মাষ্টার মশায়।

প্রবোধ মাষ্টার—

যাক্, একটু যেন জ্ঞান হ'চ্ছে!—(মলিনার প্রতি) আরত তোমার ভয় করছেনা?—তুমি পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন?

মলিনা—

আমার বড় ভয় হয়েছিল।

গৌর—

কেন?—কিসের ভয়?

মলিনা—

আমায় মেরেছে যে—

গৌরবাবু—

আর কেউ মার্‌বে না। তুমি চুপ্ করে ঘুমোও। (প্রবোধ মাষ্টারকে) যাক্ এখন বেশী ভয় নেই—আমি চল্লাম—

(প্রস্থানোন্মুখ)

মলিনা—

(চক্ষু বুঁজিয়া, অর্দ্ধনিদ্রিতভাবে) আমায় যে ডাক্‌লে—

প্রবোধ মাষ্টার—

কে ডাক্‌লে?

মলিনা—

আমার ঠাকুর।

প্রবোধ মাষ্টার—

তোমার ঠাকুর কে?—কোথ্‌থেকে ডাক্‌লে?

মলিনা—

আমার কৃষ্ণ ঠাকুর, জল থেকে ডাক্‌লে।

প্রবোধ মাষ্টার—

জল থেকে!

মলিনা—

কালো জলের ভেতর থেকে—

গৌরবাবু—

না—এখনি ডাক্তার ডাক্‌তে হ'বে দেখ্‌ছি। (গায়ে হাত দিয়া) জ্বর খুব, আবল তাবলও বক্‌ছে।—অবস্থা ভাল নয়!—

প্রবোধ মাষ্টার—

হ্যাঁ, আমি ডাক্তার বাবুকে বলে পাঠিয়েছি। তিনি বোধ হয় এখনও বাড়ী ফেরেন নি।

গৌরবাবু—

আমি না হয় একবার ডাক্তারের সন্ধানে যাই (গৌর বাবুর ভৃত্য লণ্ঠন হাতে লইয়া অগ্রসর হইল) মাষ্টার, আমি তা হ'লে চল্লাম। পারিত একবার কাল খোঁজ নেব। হতভাগা বিপিনটাকে একবার পেলে হয়।

[গৌরবাবু চলিয়া গেলেন]

[মলিনা নিদ্রিত। করুণা আসিয়া মাথার শিয়রে বসিয়া তাহার চুল শুকাইয়া দিতে লাগিল।]

হরি—

উনি আবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী যাবেন!—কখ্‌খনো না!

প্রবোধ মাষ্টার—

কেন? যাবেন না—কেন?

হরি—

ওঁর কোন কথায় বিশ্বাস আছে! উনিই ত বরপক্ষদের টাকা চাইতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন—ওরাত প্রথমে বলেছিল কিছু নেবে না।

প্রবোধ মাষ্টার—

লোককে বোঝাই দায়! যে দিন-কাল পড়েছে। যাক্ ডাক্তার বাবু এলেই হয়।

হরি—

(অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া) আর—কি বাঁচ্‌বে।…ঐ যে কে আস্‌ছে!

[ডাক্তার বাবু আসিলেন। তাঁহার হাতে একটা Stethescope, নাকে ঝোলা চস্‌মা। ব্যস্তভাবে অগ্রসর হইয়া।—]

ডাক্তার বাবু—

এই যে মাষ্টার দেখ্‌ছি।

প্রবোধ মাষ্টার—

আসুন নরেন বাবু।

ডাক্তার বাবু—

শুন্‌লাম নাকি মেয়েটি ডুবে গিয়েছিলো।

প্রবোধ মাষ্টার—

অনাথের শেষ-আশ্রয় তাই—

মলিনা—

জ্যোচ্ছনা ফুটেছে, নদী বয়ে যাচ্ছে, বকুল ফুলের কেমন গন্ধ, "বকুল ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে পেয়ে গেলাম মালা"—

(মাষ্টার মহাশয় ও ডাক্তার বাবু শুনিতেছেন ; সারসী দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া মলিনার মুখে ও তাঁহাদের গায়ের উপর পড়িয়াছে)—তোমরা আমায় বিরক্ত কর্‌ছ কেন ? উঃ, আমার বড্ড লেগেছে যে—

ডাক্তার বাবু—

গায়ে খুব মারের দাগ দেখছি।

হরি—

কি সব বক্‌ছে ; কেন ?

ডাক্তারবাবু—

(না শুনিয়া) আহা সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে যে।

মলিনা—

আমি বাড়ী যাব, বনের পথ দিয়ে, কদম গাছের পাশ দিয়ে, কালো পুকুরের তল দিয়ে, চেলী পরে' ;—বাবা ! আমাকে যেতে দাও। উঃ—তোমার মুখে যে বড় বিশ্রী গন্ধ, তুমি মদ খেয়েছ কেন ? কদম ফুলের গন্ধ কেমন ভাল, মৌমাছিগুলো কেমন গুন্‌গুন্ করে' ঝাঁকে ঝাঁকে উড়্‌ছে—ঐ শোন ;—আমার মা কোথায়, দিদি ?—স্বর্গে ? উঃ সে যে বড্ড দূর !—আমি কোথায় বল না—

করুণা—

এই দেখ বাড়ীর সবাই—

মলিনা—

(ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া) ও কে ?

করুণা—

উনি ডাক্তারবাবু।

মলিনা—

জল দাও !

[হরি জল আনিতে গেল]

(ডাক্তার বাবু অগ্রসর হইয়া, মলিনার বুকে Stetheoscope দিয়া)

এখানে ব্যথা আছে ? (মলিনা ঘাড় নাড়িল) নেই ? এইখানে ?—এদিকে ?

মলিনা—

তুমি ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু—

হাঁ, তুমি চিন্‌তে পার্‌ছ না আমায় ?

মলিনা—

আমার বড্ড অসুখ হয়েছে—নয় ? কি হয়েছে আমার, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু—

একটু অসুখ করেছে—এখনি সেরে যাবে !

মলিনা—

(ক্রন্দনোন্মত) না, আমি ভাল হ'ব না—

প্রবোধ মাষ্টার—

ছি, মলিন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর্‌ছ ?

মলিনা—

না আর ঝগ্‌ড়া কর্‌ব না মাষ্টার মশায়। আর অমন কর্‌ব না—তুমি রেগেছ আমার উপর ? রেগো না—

প্রবোধ মাষ্টার—

ডাক্তার বাবু যা বলেন ভাল করে শোন, আর ঠিক ঠিক উত্তর দাও ! কেমন ! চুপ কর্‌লে যে ?

মলিনা—

আমি মার কাছে যাব,—যাব—

[ডাক্তারবাবু একটু পিছাইয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন ; করুণা চোখে কাপড় দিল ; মাষ্টার মহাশয় একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন। অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে—]

মার কাছে ?—হয়ত শেষে তাই হ'বে—

ডাক্তারবাবু—

(প্রবোধ মাষ্টারের দিকে চাহিয়া) শুনুন, আপনাকে একটা কথা বলি—(উভয়ে একটু সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে) অবস্থা তেমন সুবিধে নয়—একটু সাবধানে থাক্‌বেন—তবে এখন তেমন কোনও ভয়ের কারণ নেই।

মাষ্টার মহাশয়—

রাতে কি আমি এসে এদের এখানে থাক্‌ব ?

ডাক্তারবাবু—

(মৃদুস্বরে) না—না—অতটা ভয় নেই। তবে heartটা খুব weak দেখলাম, তাই সাবধানে থাক্‌তে বল্লাম। এখন

তাহ'লে চল্লাম—আপনিও ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলুন গে। দরকার হয়ত হরি আমায় খবর দিতে ভুলো না, আমি ওষুধটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। (করুণার প্রতি)—দেখবেন যেন বেশী কথা না কয়।

হরি—

আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে—

[ডাক্তারবাবু, হরি ও মাষ্টার মহাশয় উঠিয়া দরজার নিকটে গেলেন।]

প্রবোধ মাষ্টার—

(করুণার প্রতি) আমিও চল্লাম—একটু দুধ দিও—রাত্রে যেন ঘুমোয়।

[করুণা বাটীতে দুধ গরম করিয়া আনিয়া চায়ের বাটীতে ঢালিতেছিল। মলিনা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।]

মলিনা—

দিদি, তোমার সেই গানটা বলনা একবার। আমার কানে কানে যেন কে ঐ গানটা করে শুনাচ্ছে। (গুন গুন স্বরে) "তোরা আয়গো তোরা আয়গো আয়"—গাওনা দিদি।

করুণা—

এখন কি গান করে? ভাল হলে গান গাব'।

মলিনা (ব্যস্তভাবে)

না, না, এখুনি গাও।

করুণা (গুন গুন স্বরে)

তোরা আয় গো, তোরা আয় গো আয়,
ওরে বান এসেছে গোরাচাঁদের প্রেমের নদীয়ায়।
কেমন করে রইব ঘরে
মন যে আমার কেমন করে,
আমার একুল ওকুল ভাসল দুকুল
(গোরার) রূপের দরিয়ায়।
সে যে হাজার চাঁদে সাগর বুকে
লুটিয়ে পড়েছে,
সে যে জ্যোৎস্না হয়ে মাঠে ঘাটে
পয়াণ হয়েছে,
আজ এ চাঁদনী-রাতে চাঁদের-মেলা
দেখবি যদি ছুটে আয়,
তোরা আয় গো, ওরে আয় গো তোরা
সময় বয়ে যায়॥

করুণা—

তুমি ঘুমোও—এই দুধটুকু' খাও, তা হ'লেই ঘুম আস্‌বে।

মলিনা—

আমি ঘুমুব না, আমি খাব না।

করুণা—

কি কর্‌বে?

মলিনা—

আমি কিচ্ছু কর্‌ব না—আমি গান গাব'।

করুণা—

দুধ খাও; ডাক্তার বল্লেছে দুধ না খেলে তুমি উঠতে পার্‌বে না—বড় দুর্ব্বল হয়েছ।

মলিনা—

আমি ভাল হ'ব না।

করুণা—

ভাল হ'তে চাও না? কেন? (মাথার শিয়রে বসিয়া আদর করিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে)—একটু দুধ খাও।

মলিনা—

(দুধ না খাইয়া) না, আমি ভাল হ'ব না (কাঁদিতে লাগিল।)

করুণা—

কেন?

মলিনা—

আমায় কৃষ্ণঠাকুর ডেকেছে, আমি সেখানে যাব।

করুণা—

কি করে যাবে তুমি?

মলিনা—

আমাকে যে তিনি ডেকেছেন—রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

করুণা—

তুমি কত দোষ করেছ—তুমি সেখানে যাবে কি করে’ ?

মলিনা—

ঠাকুর আমায় ডেকেছেন—যাব—তাতে আবার কি !

করুণা—

আচ্ছা, এইবার ঘুমোও—আমি তোমার বালিশ ঠিক করে দিচ্ছি।

মলিনা—

আমি ঘুমুতে পারব না—

করুণা—

লক্ষ্মী, বোনটী, চেষ্টা কর,—এখনই ঘুম আস্‌বে।

মলিনা—

দিদি !

করুণা—

কি ?

মলিনা—

এমন কোন পাপ আছে যা তিনি ক্ষমা কর্‌বেন না ?

করুণা—

ওসব কথা এখন নয়—ঐ জন্যে ত ঘুম অস্‌ছে না।

মলিনা—

না, না, বল—এখুনি, বলনা—একবারটী

করুণা—

তুই কি দুষ্টু হয়েছিস্।

মলিনা—

(সজোরে) বল—

করুণা—

(গম্ভীর ভাবে অন্যমনস্ক হইয়া) কিছুতে ছাড়্‌বে না ? এমনি দুষ্টু হয়েছ তুমি ?—আত্মহত্যার পাপের বোধ হয় ক্ষমা নেই।

মলিনা—

আমি যদি ঐ পাপ করে থাকি !

করুণা—

তুমি কেন তা কর্‌বে !

মলিনা—

আমি করেছি—আমার ভয় কর্‌ছে—

করুণা—

কিছু ভয় নেই।

মলিনা—

(দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া ও দেওয়ালের দিকে চাহিয়া) দিদি, দিদি—

করুণা—

কিছু ভয়—নেই—

মলিনা—

দিদি—

করুণা—

কি হয়েছে ?

মলিনা—

ঐ আস্‌ছে—তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

করুণা—

কি ?—আমিত কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি না।

মলিনা—

ঐ শোন গলার শব্দ—ঐ বাইরে—শুন্‌তে পাচ্ছ না ?

করুণা—

কে ?

মলিনা—

বাবা, বাবা—ঐ যে—

করুণা—

কোথায় ?

মলিনা—

ঐ যে—

করুণা—

কোথায় ?

মলিনা—

ঐ যে টেবিলের পাশে—

করুণা—

ওখানে একটা জামা টাঙানো রয়েছে। ওটা বড় ময়লা বিশ্রী, এখুনি সরিয়ে দিচ্ছি—একটু পরেই আস্‌ছি

—তুমি চুপটি করে থাক,—চুপটী করে, নড়ো না। আমি তোমার জন্ত একটা জলপটী তোয়ের করে আনি।

মলিনা—

(একদৃষ্টে জামাটার দিকে চাহিয়া) তাই না কি! একটা জামা টাঙ্গানো রয়েছে? আমি ভাবছি—

করুণা—

আচ্ছা, চুপ করে থাক—আমি এখনি আস্‌ছি—চুপ করে' শুয়ে থাক।

[করুণা বাহির হইয়া গেল। ঘরের প্রদীপটী চৌকাঠে রাখিয়া করুণা দরজার একটু শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে বিপিনের ছায়ামূর্ত্তি মলিনার বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখখানা ফোলা ফোলা, চোখের কোল কালো, খুব রুক্ষ চুল—কোটের বোতাম নাই—কোমরে চাদর বাঁধা—সব সময়েই সে যেন মারিতে উদ্যত। মলিনা তাহা দেখিয়া ভয়ে গোঙাইতে গোঙাইতে বালিশে মুখ ঢাকিল। ঐ মূর্ত্তি হইতে একটা ঘোরালো লাল আলো আসিয়া মলিনার বিছানা ও ঘর আলোকিত করিল।]

মূর্ত্তি—

(বিকট কণ্ঠে: থামিয়া থামিয়া) এই বার!—এখন তোকে কে রক্ষে করবে? হতভাগী!—কি,—কথা কচ্ছিস্‌নি যে—দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা—। লোককে কিনা—তুমি বলে বেড়াচ্চ আমি তোমায় বকি?—মারি ধরি?—তুমি আমার মেয়ে নও—থাক্ হতভাগী আইবুড়ো,—তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে আমায় বুঝি কসাই বেয়াইয়ের চাকর হ'তে হ'বে? তুই হতভাগী বাড়ীতে এসে অবধি আমার লক্ষী ছাড়ার দশা—সর্ব্বস্ব গেল—এখন আমি কসাইয়ের তাঁবেদার হব? পোড়ার মুখী! শুনছিস্?—ওঠ,—আর শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতে পারবি না। ওঠ, হতচ্ছাড়ী! কাজ কর,—আমি হন্যে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াব, আর উনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরাম করবেন—ওঠ, নড়ছিস্‌নি যে?—দাঁড়া মেরে মেরে তোকে সিধে করছি!

[ঘুরের অন্ধকার ঘরে করুণার পায়ে লাগিয়া হঠাৎ কতকগুলি কাঁসার থালা সশব্দে পড়িয়া গেল। মলিনা চক্ষু বুঁজিয়া কোন মতে বিছানা হইতে আপনাকে টানিয়া তুলিল, তারপর টলিতে টলিতে টেবিলের পাশে আসিয়া অজ্ঞান হইয়া মেজের উপর আছড়াইয়া পড়িল। টেবিলের নীচে যে জলভরা কলসী ছিল সেটা উল্টাইয়া গেল।—ভিজে নেকড়া লইয়া করুণা প্রবেশ করিল। বিছানায় মলিনাকে না দেখিতে পাইয়া ভয়ে সে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার পর ভূমি-শায়িতা মলিনাকে দেখিয়া প্রদীপ ও জলপটী রাখিয়া তাড়াতাড়ি মলিনার নিকট গিয়া—তাহাকে কোলে করিয়া বসিল। মলিনার কাপড় মেজের জলে ভিজিয়া গিয়াছে। করুণার ভীত-ক্রন্দনে নবা ও মধু দৌড়িয়া আসিয়াছে।]

করুণা—

আমি এখুনি জলপটী আন্‌তে একবারটী উঠে গেছিলাম—দেখ না কাণ্ড, তক্তাপোষ হ'তে পড়ে গিয়ে কোথায় এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। নবা আয়ত, একবার একটু ধরত—

মধু—

দেখো, সাবধান, ফেলে দিও না।

নবা—

আর বাঁচবে না—দেখে রাখ, আমি বলে দিলাম। বেশী-ক্ষণ আর টিঁকতে হ'বে না—

করুণা—

(মলিনাকে শোয়াইয়া) ষাট্, ষাট্, কি বলিস্ নবা,

নবা—

আমি আর কি বললাম্?

মধু—

তোমার যেমন বুদ্ধি,—রোগীর কাছে মরবার কথা কেন বল?

নবা—

(ভ্যাঙচাইয়া) তোরত ভারী বুদ্ধি; কেন বলব না?

করুণা—

যা, সব,—আর গোলমাল করিস্‌নি—

(মধু ও নবার প্রস্থান)

[করুণা মলিনাকে সিক্ত বস্ত্র ত্যাগ করাইয়া বাক্স হইতে এক খানা চেলী পরাইয়া দিল। মাতার বিবাহের

চেলী, দরিদ্র পরিবারের শেষ পরিধান। পরিধেয় আর কিছু নাই।]

মলিনা—

(ভয়ে ভয়ে চক্ষু মেলিয়া) চলে গেছে—চলে গেছে ?

করুণা—

হাঁা, ওরা সব চলে গেল!—তোমার কি হয়েছিল ?

মলিনা—

বাবা চলে গেছে ?

করুণা—

বাবা'ত এখানে আসেনি ?

মলিনা—

হাঁা দিদি এইত এখানে ছিল।

করুণা—

তুমি জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছ।

মলিনা—

আর পারিনা—আমায় নাও ঠাকুর—উঃ, বাবা কি বলে গেল দিদি ?

করুণা—

হা ভগবান কি করি!

মলিনা—

সে আস্‌বে—এসে হাত ধরে আমায় স্বর্গে নিয়ে যাবে—

করুণা—

কে আস্‌বে ?

মলিনা—

তুমি জাননা সে কে ?

করুণা—

কে ?

মলিনা—

আমার ঠাকুর—সে আঁধারে বাঁশী বাজায়—আলোয় খেলা করে—কাঁদলে উত্তর দেয়—দোষ করলে, বকে—ঝড়ের মধ্যে আমায় ডাক্‌ছিল, শুনতে পেয়েছিলাম, সেই কালীদীঘির কাল জল হ'তে—আমিযে তাই ছুটে গেলাম—তা'পর না তিনি তুললেন আমায়,—আমাকে কোলে করে' নিয়ে এলেন, তুমি তাকে চেনো না ?

করুণা—

তোমায় ত মাষ্টার মশায় নিয়ে এলেন।

মলিনা—

(মৃদুস্বরে) হাঁা, হাঁা,—সেই সেই। দিদি, বলনা—আমার ঠাকুর সুন্দর নয় ? কেমন চমৎকার তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, কেমন তার কথার গম্ভীর স্বর, কেমন আমায় 'মলিন' 'মলিন' বলে ডাকে! তুমি যখন আমার কাছে আস তখন ত আমি মলিন থাকিনে—সকালে বিকালে কত তুমি শেখালে তবুও আমি মলিন!—আমাদের বিয়ে হ'বে, চেলী পরে চতুর্দ্দোলে চড়ে'—তখন কত আলো জ্বলে উঠবে; তখন কত বাঁশী বাজবে, কত গান হবে, শোন, শোন ঐ শোন সে আমায় ডাকছে!

করুণা—

কেউ তোমায় ডাকেনি; ঘুমোও, অনেক রাত্রি হ'ল ঘুমুবিনি।

মলিনা—

ঐ যে ঠাকুর এসেছে, ডাক্‌ছে, শুন্‌তে পেয়েছ; ঐ শোন; আমাকে কেবল 'মলিন' 'মলিন' বলে ডাক্‌ছে, খুব জোরে; ঐ যে পষ্ট, একেবারে পষ্ট, চল, আমার সঙ্গে চল, দিদি।

করুণা—

যখন ঠাকুর আমায় ডাক্‌বেন তখন যাব।

মলিনা—

(চাঁদের আলো বিছানায় পড়িয়াছে, বিছানা হইতে উঠিয়া সে সেইদিকে কান পাতিয়া যেন কি শুনিতেছে) তুমি কিছু শুন্‌তে পাচ্ছ না ? চাঁদের আলোয় কান পাত' না ? আলোর পথে সে আস্‌ছে যে।

করুণা—

না, মলিন, আমি ত কিছুই শুন্‌তে পাইনি।

মলিনা—

ঐ শোন, কেমন বাঁশীর শব্দ, কামিনী ফুলের গন্ধ পাচ্ছ না ? তাঁর গলার মালা আমি নেবো। ঐ যে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

করুণা—

হ্যাঁ দাঁড়িয়ে রয়েছেন!—তুমি ঘুমোও তা'হলে তোমার কাছে এসে বস্‌বেন।

মলিনা—

রাত ফুরুতে না ফুরুতে—আলো না হ'তে হ'তে আমি চলে যাব, তাঁর সঙ্গে, কেউ দেখতে পাবে না—ঘুম হ'তে উঠব না—তুমি ঘুমের গান জান?

করুণা—

কোন গানটা?

মলিনা—

সেই যে মাষ্টার মশায়ের তৈরী গানটা—আমরা শিখেছিলাম!

করুণা—

তুমি শুন্‌বে?

মলিনা—

(ভাল করিয়া বিছানায় শুইয়া দিদির বুকের কাছে মাথা রাখিয়া) ওমা, মা, সেই গানটা গাও—মা, সেই গানটা।

করুণা—

(আলো নিবাইয়া দিয়া, মলিনাকে উচ্ছলিত স্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া নিম্নস্বরে গান গাহিতেছে।)

[ঘুমের গান]

দিনের আলোয় ঘরের কোণে,
সকাল থেকে আপন মনে
শুধুই কেবল করে এলাম
দেয়া-নেয়ার মেলা,—
ওগো, ঘুমপাড়ানী ঘুম দিয়ে যাও
এমন রাতের বেলা,—
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

তরুণ-অরুণ-কিরণরাগে
লাজের অরুণিমা জাগে,
সাঁঝের মেঘে নয়ন-মোহন
স্বপন কে দেয় বুনি,
এখন,—তোমার পথে সবাই জেগে
তোমার প্রহর গুণি,—
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

আঁধার ঘেরা ভয়ের মাঝে
ভয়-ভুলানী সদাই রাজে,
ঘুমের ঘোরে পরাণ ভরে,
তোমায় দেব আমি,
তুমি ঘুম-পাহাড়ের শিখর হ'তে
বারেক এস নামি
ওগো মন-ভুলানি, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

সুখের প্রান্তে মধুর রাতে
হয়নি দেখা যাদের সাথে,
স্বপন-মায়া বিছিয়ে চোখে
তাদের দেখাও আনি,
এ রাতে, তোমার সাথে শুনাও শুধু
তাদের মধুর বাণী!
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

কুঁড়ির মাঝে যে ফুল র'ল
যে দীপ জ্বলেই নিভে র'ল,
তুমি সে,—ফুল ফুটিয়ে দীপ জ্বালিয়ে
তোমার আপন হাতে
এসগো, সকল-চাওয়া সকল-পাওয়া
আজকে এমন রাতে।
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

চোখ-জুড়ানী চোখের পাতে
ঘুম দিয়ে যাও গভীর রাতে
ব্যথার ক্ষতে বাতাস কর
তোমার আঁচল বায়ে,

ওগো হাড়-জুড়ানী পরশ বুলাও
আমার সকল গায়ে,
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম-হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

বুকের বোঝা যাবে নামি'
প্রাণের কাঁদন যাবে থামি',
তোমার কোলে পড়ব ঢুলে
নিবিড় ঘুমের ঘোরে
ওগো "জীয়ন-কাঠি" ছুঁইয়ে যেও
আবার তুমি ভোরে।
ওগো মন-ভুলানী, চোখ-ঢুলানী, ঘুমের দেশের রাণী।
ঘুম হারা এই চক্ষে বুলাও মায়ার পরশ খানি॥

[মলিনা ঘুমাইল মনে করিয়া করুণা উঠিয়া গেল।]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

প্রেমের চিহ্ন

হৃদয়রক্ত মন্থন করি, আঁকিয়া দিয়েছি প্রেমের চিহ্ন
অঙ্গে অঙ্গে তব
লালিমা তাইতো ফুটিয়া উঠেছে এমন করিয়া
অদ্‌ভুত অভিনব।
সেতো শুধু নয় দেহের চিহ্ন ওগো অভিন্ন
মন তাহা ভাল জানে,
সকল অঙ্গ ছাইয়া এখন লভেছে আসন
অন্তর মাঝখানে।
অস্থির মাঝে পেয়েছে স্বস্তি, মজ্জার মাঝে
সকল সজ্জা তার'
বক্ষরক্ত প্রবাহের মাঝে মৃদুকম্পনে
হয়ে গেছে একাকার।
অঙ্গ-চিহ্ন পেয়েছে সঙ্গ, কতনা রঙ্গে
অনু পরমানু ময়,
কেমন করিয়া মুছে ফেলে দেবে ? প্রেমের চিহ্ন
মুছিলে যাবার নয়।
তুমি যত তা'রে মুছিবারে চাও, লজ্জার রাগে
আরও লাল হয়ে ওঠে
তোমার মনের গোপন কথাটী, অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার মাঝে
শত গুণ হয়ে ফোটে!
যুগল বাহুতে ঢাকিতে চাও যে মুছিবারে চাও
চোখের লজ্জা করি,
চেয়ে দেখ ওই প্রেমের চিহ্ন রাঙিয়া উঠিল করপদ্মের
দুইটী স্তবক ভরি'।
একটী প্রেমের লজ্জা ঢাকিতে শতেক লজ্জা
প্রকাশ হইয়া যায়,
তোমার ত্রস্ত গোপন-বাসনা বিফল হইয়া
করিতেছে হায় হায়।
মনে যাহা চাও জীবনে মরণে, কতনা আদরে
প্রাণে যাহা ভালবাস
তাহারে লইয়া কিসের লজ্জা ? সফল হলে যে
তাই ভেবে শুধু হাস।
আমার বুকের রক্তে ফুটেছে প্রেমের চিহ্ন শক্ত তাহারে
মুছে ফেলে দেওয়া হাতে.
প্রদীপ লুকায়ে রাখিবারে চাও হে মোর পরাণ প্রিয়
গভীর আঁধার রাতে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

রোল্যাণ্ড টেইলর।

O, that thou wert worthy to suffer something for the Name of Jesus! How great glory would remain unto thyself: what joy would arise to all God's Saints; how great edification also to thy neighbour.

—Of the Imiation of the Christ.

ইংলণ্ডের অন্তর্গত যে সমস্ত নগরে সর্ব্বপ্রথম প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়াছিল, সাফোকের (Suffolk) অন্তর্গত হ্যাড্লি, (Hadleigh) তাহাদের অন্যতম। ডাক্তার রোল্যাণ্ড টেইলর নামক জনৈক অভিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রচারক, রাজা ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের রাজত্বকালে হ্যাড্লি নগরের গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় আগমন করেন। সাধারণ প্রধান ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায় তিনি অশিক্ষিত পুরোহিত অথবা অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের হস্তে সমস্ত কর্ম্মভার অর্পণ করিয়া অলস বিলাসে কাল কাটাইতেন না। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় নগরের নরনারীবৃন্দ পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিতে শিক্ষা করিয়াছিল এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা তাহারা অক্লেশে করিয়া দিত। এমন কি বালক বালিকাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট শুনিয়া শুনিয়া বাইবেল গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। একদা প্রভু ঈশা তদীয় শিষ্য পিটারকে বলিয়াছিলেন—"Peter, lovest thou me? Feed my sheep." জনসাধারণের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ হিতসাধনে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া মনে হইত যে তিনি সত্য সত্যই উক্ত মহাবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রভু যীশুর পদে "তন, মন, ধন" সমর্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি রবিবার এবং বিশেষ পর্ব্বাদি উপলক্ষে তিনি নিয়মিতরূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতেন; ইহার উপর কোনস্থানে জনসাধারণ সমবেত হইয়াছে দেখিলেই, তাহাদিগকে বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ প্রভু যীশুখৃষ্টের জীবনী ও উপদেশানুসারে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন।

জন সাধারণ কেবলমাত্র বক্তৃতাদ্বারাই ইঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, পরন্তু ইঁহার প্রকৃত খৃষ্টিয়ানের ন্যায় সুপবিত্র জীবন সর্ব্বদা আদর্শরূপে সম্মুখে বিরাজমান থাকিয়া ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। বালকের ন্যায় সরল, অভিমানশূণ্য ও নম্রপ্রকৃতির ডাক্তার টেইলরের নিকট একজন নগণ্য ব্যক্তিও সর্ব্বদা সকল সময় দ্বিধাশূণ্য ভাবে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে কোন দিন বাধা পায় নাই। ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগকে তিনি নির্ভয়ে দোষ দেখাইয়া দিয়া সংশোধন করিতে বলিতেন; কখনও বা তাহাদিগকে গম্ভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ভৎর্সনা করিতেন; অথচ তাঁহার ব্যবহারে কেহই রুষ্ট হইত না। তিনি সর্ব্বদাই শত্রুকে ক্ষমা করিতেন; কাহারও অনিষ্ট করা দূরে থাকুক; সে চিন্তাকরা পর্য্যন্ত মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। নগরস্থ অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ রোগী অথবা বহু পুত্রকন্যাবিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারের তিনি একধারে পিতা, লালনপালন কর্ত্তা এবং রক্ষক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় নগরে একটী "দরিদ্র ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সাধারণ ভাণ্ডার হইতে অভাবগ্রস্থ দরিদ্রগণকে সাহায্য প্রদানকরা হইত। ডাক্তার স্বীয় আয়ের কিয়দংশ এই ভাণ্ডারে অর্পণ করিতেন; ইহা ব্যতীত তাঁহার আলয়ে বহু রুগ্ন, আতুর, ঔষধ, পথ্য ও সেবা প্রাপ্ত হইত। গুণবতী টেইলর পত্নীও মহানুভব স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। ১৫৫৩খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী মেরী ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের অনুরাগিনী ছিলেন এবং প্রটেষ্টাণ্ট্ ও অন্যান্য সংস্কার সম্প্রদায় সমূহকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইঁহার সাহায্য পাইবা মাত্র পোপের অনুচরগণ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত দলে দলে আসিয়া সমগ্র ইংলণ্ড ছাইয়া ফেলিল এবং পোপের প্রাধান্য পুনঃসংস্থাপনের জন্য ছলে বলে কৌশলে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ানগণ

কিছুতেই অন্ধকুসংস্কার, পৌত্তলিকতা ও বাইবেল বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ সমূহ অনুমোদন না করায়, নির্ম্মম ভাবে নিগৃহীত ও নিহত হইতে লাগিলেন। এই সময় যে সমস্ত মহানুভব ধর্ম্মবীর সত্যের জন্য, প্রজ্জ্বলিত অনলে স্ব স্ব দেহ আহুতি দিয়া, খৃষ্টধর্ম্মেতিহাস গৌরব মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন—ডাক্তার টেইলরও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

অন্যায় উৎপীড়ন, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়াও ডাক্তার টেইলর বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় ধীর ও প্রশান্ত ভাবে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফষ্টার নামক জনৈক ক্রূর হৃদয় সুচতুর আইন ব্যবসায়ী হ্যাড্‌লিজের গির্জ্জাটী রোমান ক্যাথলিকগণের হস্তে প্রদান করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। ইনি জন ক্লার্ক নামক একজন সমপ্রকৃতির লোকের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া জন অ্যাভার্থ নামক একজন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতকে তথায় আনয়ন করিলেন। ইঁহারা যথাসম্ভব তৎপরতার সহিত গোপনে কথিত গির্জ্জাভ্যন্তরে ক্যাথলিক প্রথানুযায়ী বেদী নির্ম্মান করিলেন বটে, কিন্তু জনসাধারণ উহা দেখিতে পাইয়া পরক্ষণেই ভগ্ন করিয়া ফেলিল। অতঃপর একদিন উহারা অস্ত্রধারী রক্ষীগণ সমভিব্যহারে গির্জ্জায় উপস্থিত হইয়া ক্যাথলিক চার্চ্চের প্রথানুযায়ী পূজা ও ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

প্রভাতে ডাক্তার টেইলর বসিয়া বাইবেল পাঠ করিতেছেন, এমন সময় গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কোন বিশেষ উপাসনা আরম্ভ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি দ্রুতপদে উপস্থিত হইয়া গির্জ্জার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পশ্চাদ্বার দিয়া গির্জ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন জনৈক রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত বেদীনিম্নে রুটী, মদ্য ইত্যাদি নিবেদন করিতেছেন এবং অস্ত্রধারী কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার কাজে কেহ বাধা না দেয় এজন্য সতর্ক ভাবে পাহারা দিতেছে।

ডাক্তার টেইলর উক্ত পাদ্রীকে লক্ষ্য করিয়া দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—শয়তান! কোন সাহসে তুই এইসব জঘন্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র উপাসনালয় কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিতে সাহসী হইয়াছিস্? ফষ্টার অগ্রসর হইয়া বলিল "রাজদ্রোহি! মহামান্য রাজ্ঞী মেরীর আদেশানুসারে ইহা অনুষ্ঠিত হইতেছে; তুমি ইহাতে কোন অধিকারে বাধা দিতেছ?"

"আমি ঈশ্বর এবং আমার প্রভু ঈশার মেষপালের সামান্য একজন রক্ষক মাত্র—অতএব এস্থানে উপস্থিত হইবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে! হে পোপ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শোনিত পিপাসু ব্যাঘ্রগণ! আমি ঈশ্বরের পবিত্র নাম লইয়া বলিতেছি; জনসাধারনের চিত্ত ভ্রান্ত কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত করিবার অসদভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়া সত্বর এস্থান হইতে প্রস্থান কর।"

ঈর্ষ্যাবিষ জর্জ্জরিত ফষ্টর ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "ভণ্ড রাজদ্রোহি! মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা পত্র অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে অন্যায় ভাবে বাধা দিবার জন্য অনর্থক গোলমাল সৃষ্টি করিতেছ কেন?"

টেইলর উত্তর করিলেন, "আমি গোলমাল করিতেছিনা—ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ পোপীয় পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বরের পবিত্র বাণী দ্বারা বাধা দিতেছি মাত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রভু ঈশার উপদেশ অবজ্ঞাকারী পোপের কবল হইতে ইংলণ্ড নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিবে। আমি রাজদ্রোহী? মুর্খ! স্বধর্ম্ম নিষ্ঠার নাম রাজদ্রোহ নয়! আর প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরাই কি আইন অবজ্ঞা করিতেছ না? আইন মত আমি এই গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্ম যাজক, অতএব আমার অনুমতি ব্যতীত এই পবিত্র বেদীতে কাহারও ক্যাথলিক প্রথায় দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিবার অধিকার নাই।"

এইকথা শুনিয়া পুরোহিত অ্যাভার্থ তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। জন ক্লার্ক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিল—"আপনি ভীত হইতেছেন কেন?' নির্ভয়ে আপনার কার্য্য করিয়া যান।"

"কখনও না"—সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া টেইলর অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"আমি কোন প্রকারেই এ পবিত্র ভূমি কলুষিত হইতে দিবনা। প্রভু ঈশার উপদেশানুযায়ী যথাসাধ্য অন্যায় ও পাপকে বাধা প্রদান করিব।"

ফষ্টর তাহার রক্ষীগণের সাহায্যে বলপূর্ব্বক টেইলরকে গির্জ্জা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। টেইলর পত্নী ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামিকে স্বীয় ন্যায্য অধিকার হইতে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হইতে দেখিয়া, জানুপাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলেন:—"হে স্বর্গস্থ পিতা! হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক! পৌত্তলিক পোপানুচরগণের, প্রভু ঈশার সন্তানগণের প্রতি এই দুর্ব্বিসহ অন্যায় অপমানের প্রতিবিধান কর প্রভু!!"

বর্ব্বর, পাপিষ্ঠগণ তাঁহাকেও নানাপ্রকারে অপমানিত করিয়া বলপূর্ব্বক গির্জ্জা হইতে বহিষ্কৃত করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিল না। গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া নাগরিকগণও দুই একজন করিয়া গির্জ্জাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা সাধু টেইলর ও তদীয় পত্নীর এই অপমান প্রত্যক্ষ করিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল; কিন্তু ফষ্টর বিপদ আসন্ন বুঝিয়া গির্জ্জার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

এইরূপে তাহারা প্রটেষ্টাণ্টগণের ভজনালয় সমূহ অধিকার করিয়া জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথায় বিবিধ প্রকার মূর্ত্তি ইত্যাদি সন্নিবেশিত করিয়া ক্যাথলিক মত পুনঃ প্রচারের জন্য বদ্ধ পরিকর হইল। পোপের প্রাধান্য অস্বীকারকারী প্রটেষ্টাণ্টগণ দলে দলে কারারুদ্ধ হইতে লাগিলেন। যুক্তি, আইন, ধর্ম্মশাস্ত্রানুশাসন উপেক্ষা করিয়া, করায়ত্ত রাজশক্তি পোপানুচরগণ পোপের প্রাধান্য পুনঃ সংস্থাপনের জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল। উক্ত ঘটনার দুই এক দিবস পরই ফষ্টার ও ক্লার্ক ডাক্তার টেইলরের বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠানে বাধা দিয়াছেন বলিয়া উইনচেষ্টারের লর্ড বিশপের নিকট অভিযোগ আনয়ন করিল। বিশপ তৎক্ষণাৎ টেইলরকে কৈফিয়ত দিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিলেন। টেইলরের বন্ধু ও হিতৈষীবৃন্দ এই সংবাদে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন; কারণ তাঁহারা ইহার ভয়াবহ পরিণাম বেশ বুঝিতে পারিলেন। সত্য ও নীতি পদদলিত করিয়া যেভাবে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মযাজকগণের প্রতি অত্যাচার হইতেছিল তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহারা টেইলরকে পলায়নের পরামর্শ দিয়া বলিলেন:—"জিঘাংসু, কঠিন হৃদয় লর্ড চ্যান্সেলরের নিকট সুবিচার অথবা কোন প্রকার সদয় ব্যবহার পাওয়া অসম্ভব। আপনি উপস্থিত হইবামাত্র অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায় বন্দী হইবেন এবং অবশেষে উহারা আপনাকে হত্যা করিবে। অতএব আপনার অন্যত্র লুক্কাইত ভাবে অবস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত।" ডাক্তার টেইলর বন্ধুগণকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন:—বন্ধুগণ! ভীত হইয়া বিবেককে বিসর্জ্জন দেওয়া প্রভু ঈশার সন্তানগণের কর্ত্তব্য নহে। যাহা হইবার হউক; আমি কিছুতেই ন্যায়পথ ভ্রষ্ট হইব না।"

স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্য জন হালকে সমভিব্যাহারে লইয়া ডাক্তার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে জনহাল তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে অনুনয় করিয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু টেইলর কিছুতেই কাপুরুষের মত পলায়ন করিতে সম্মত হইলেন না। লণ্ডন নগরী দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র প্রভুভক্ত ভৃত্য ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় শোকার্ত্ত হৃদয়ে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া বলিল," "প্রভু! জানিয়া শুনিয়া মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পন করিবেন না, আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করুন! চলুন উভয়ে একত্র পলায়ন করি, সর্ব্বপ্রকার বিপদে আপদে আমি ছায়ার ন্যায় আপনার অনুসরণ করিব! প্রভু ঈশার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনও কোন অবস্থাতেই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না।"

দৃঢ় হৃদয় বিশ্বাসী টেইলর অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন:—"ছিঃ জন! অধীর হইও না। সমগ্র প্রটেষ্টাণ্ট ভ্রাতৃবৃন্দকে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের কবলে ফেলিয়া আমি তুচ্ছ প্রাণের মমতায় পলায়ন করিব? স্মরণ কর জন আমাদের প্রভু মানবজাতির কল্যাণ কামনায় অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত এবং অবশেষে ক্রুশদণ্ডে গ্রথিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আরও ভাবিয়া দেখ, সেই মহান আদর্শের অপূর্ব্ব মহিমা আমরা প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছি কিনা তাহার পরীক্ষা প্রদানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময়ে কাপুরুষের মত পলায়ন করা কখনই সম্ভব পর নহে। ঈশ্বরের কৃপায় আমি প্রভু যীশুর কার্য্যে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই আসিয়াছি। কোন চিন্তা করিও না

জন! প্রকৃত খৃষ্টিয়ানের ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হও।" লণ্ডনে উপনীত হইয়া তিনি, উইন চেষ্টারের বিশপ, ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলর মিঃ গার্ডিনারের করে আত্ম সমর্পণ করিলেন। গার্ডিনার টেইলরকে দেখিবামাত্র তাঁহার অভ্যস্থ বর্ব্বরতার সহিত প্রথমেই নানাপ্রকার ইতর জনোচিত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন। টেইলর ধৈর্য্য সংযত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "লর্ড বিশপ আমি রাজদ্রোহী অথবা ধর্ম্মদ্রোহী নহি; একজন বিশ্বাসী খৃষ্টিয়ান মাত্র! আপনার আদেশানুসারে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমাকে আপনার প্রয়োজন কি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।"

লর্ড বিশপ—"নীচ, ধর্ম্মভ্রষ্ট শয়তান! আমার মুখের দিকে ওরূপভাবে চাহিয়া কথা বলিতে তোর লজ্জা ও ভয় হইতেছে না! জানিস্ আমি কে?" মৃদুহাস্তে নির্ভীক টেইলর উত্তর করিলেন: "ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলর মিঃ ষ্টিফেন গার্ডিনারকে চিনি না? একদিন তুমিও শপথ করিয়া প্রটেষ্টাণ্ট হইয়াছিলে না? লর্ড বিশপ, তোমার প্রভুত্ব গর্ব্বিত দৃষ্টি দেখিয়া যদি আমার ভীত হওয়া উচিত ছিল; তাহা হইলে সামান্য পদ গৌরবের লালসায় সত্যের অবমাননাকারী বিশ্বাসঘাতক! একজন খৃষ্টিয়ানের চোখের দিকে চাহিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না? নির্লজ্জ অধম! কোনমুখে সেই শেষ বিচারের দিন প্রভু যীশুখৃষ্ট ও স্বর্গস্থ পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা অষ্টম হেনেরী ও ষষ্ঠ এড্ওয়ার্ডের সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই সত্যভঙ্গের জন্য কৈফিয়ৎ দিবে? ক্ষমতা গর্ব্বিত মূঢ়! আত্মাপরাধ ক্ষালন করিবার জন্য দিবার মত তোমার কোন কৈফিয়ৎ আছে কি"? স্পষ্ট সরল ধিক্কারে আহত হইয়া রক্তিম মুখে বিশপ বলিলেন "স্তব্ধ হও। সেই বেয়াদিনী "হিরডের শপথ" ভঙ্গ করাই উচিত্। আমি সে শপথ ভঙ্গ করিয়া ভালই করিয়াছি। আমি যে পুনরায় রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছি, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। এবং আমি আশা করি তুমিও শীঘ্রই ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করিয়া ক্যাথলিক চার্চ্চভুক্ত হইবে।"

অতঃপর বিশপ রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন, "এব্যক্তিকে রাজকীয় কারাগারে লইয়া যাও, কারাধ্যক্ষকে আমার আদেশ জানাইয়া বলিও; ইহার প্রতি যেন কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রদর্শন করা না হয়।"

রক্ষীগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া টেইলর জানু পাতিয়া প্রার্থনা করিলেন: "হে দয়ালু ঈশ্বর! রোমীয় পোপের অত্যাচার, অসহনীয় ভ্রান্ত মত ও অন্ধ পৌত্তলিকতার হস্ত হইতে আমাদিগকে মুক্তি প্রদান কর। সাধু রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আত্মার কল্যান হউক।"

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ক্রমে বিভিন্নস্থান হইতে সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত প্রটেষ্টাণ্টগণ ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কারাগার একটী গির্জ্জায় পরিণত হইয়া উঠিল। দিবারাত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা, বক্তৃতা, উপাসনা, বাইবেল পাঠ ইত্যাদিতে তাঁহারা আনন্দের সহিত সময় কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। টেইলর আনন্দ ও উৎসাহের সহিত তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। সাধারণ বন্দীদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে আগ্রহের সহিত তাঁহাকে উপদেশাদি প্রদান করিতে দেখিয়া সময় সময় মনে হইত তিনি যে বন্দী তাহা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছেন।

এইসময় ইংলণ্ডের চার্চ্চসমূহের ভার অজ্ঞ, অসংযমী পোপীয় পুরোহিতগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ইহারা অর্থজ্ঞানশূন্য ল্যাটিনমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আড়ম্বরপূর্ণ পূজা ও প্রাণহীণ ক্রিয়াকলাপে সাধারণকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিত। যাঁহারা প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী হইয়া পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়াছিলেন; ছল বলে কৌশলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এই পাদ্রীগণ সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া অনেক প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টিয়ান ইংলণ্ড হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গুপ্তভাবে লুকাইত ছিলেন। যাঁহারা এই নৃশংস পাদ্রীগণের কবলে পতিত হইতেন, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ ক্যাথলিক মতাবলম্বী করিবার জন্য প্রলোভন, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি উপায়ে চেষ্টা করা হইত। অবশেষে দৈহিক নানা প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও যাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস

অটল থাকিত তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য স্থান অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত।

কারাগারে ডাক্তার টেইলর বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক মাষ্টার ব্রেডফোর্ডের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্ট ও আশ্বস্ত হইলেন। কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া—ইঁহারা যে পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রত্যহ শ্রীভগবচ্চরণে ভক্তি বিমিশ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। বহু ভক্ত খৃষ্টিয়ান সাধুর সমাগমে কারাগার যেন প্রভু যীশুর আনন্দরাজ্যে পরিণত হইল। মাষ্টার ব্রেডফোর্ডের সম্বন্ধে ডাক্তার টেইরিল তাঁহার বন্ধুগণকে বলিয়াছিলেন যে এই দেবচরিত্র পুরুষের সঙ্গগুণে তিনি কখনও পত্নী, পুত্র, কন্যার বিরহে কাতর হন নাই, এমন কি কারাগারের অসহ্য ক্লেশেও তাঁহারা পরস্পরের উৎসাহে কোন দিন হতাশ বা বিমর্ষ হন নাই।

কিছুদিন কারাবাসের পর একদিন টেইলর তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত কতকগুলি অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্য বোচার্চ্চে নীত হইলেন। বিচারের নির্লজ্জ অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম অভিযোগ, ডাক্তার পাদ্রী হইয়াও বিবাহ করিয়াছেন। তিনি ধীর ভাবে স্বীয় বিবাহ ন্যায় ও শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিলেন। ধর্ম্মপ্রচারক ও পুরোহিতগণও যে বিবাহ করিতে পারেন, ইহা তিনি বাইবেল, সাধু মহাপুরুষগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া এমন বিশদভাবে বিচারকগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ডাক্তারকে পত্নীত্যাগ করিবার আদেশ দিতে পারিলেন না। অবশেষে বিচারকগণ বিবাহিত বলিয়া তাঁহাকে গির্জ্জার অধ্যক্ষের পদ হইতে বঞ্চিত করিলেন।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে, টেইলর, ব্রেডফোর্ড, স্যাণ্ডার্স, প্রভৃতি প্রচারকগণ পুনরায় কয়েকজন বিশপের সম্মুখে বিচারার্থে আনীত হইলেন। ধর্ম্মদ্রোহী ও স্বকপোল কল্পিত মত প্রচারকারী বলিয়া তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা অস্বীকার করিলেন এবং প্রয়োজন হইলে বাইবেল অনুসরণ করিয়া স্বমত সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা বিশপগণের বিন্দুমাত্রও ছিল না; কাজেই সে সমস্ত কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন "হয় তোমরা ভ্রান্তমত পরিত্যাগ করতঃ রোমের পোপকে ধর্ম্মজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া স্বীকার কর অন্যথায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া পরিষ্কার উত্তর প্রদান কর।"

টেইলর ব্রেডফোর্ড ও স্যাণ্ডার্স তিনজনই নির্ভীকভাবে উত্তর করিলেন যে, তাঁহারা রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের রাজত্ব কালে যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন এখনও তাহাই করিবেন এবং কোন ক্রমেই অহঙ্কার ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে অন্ধ যীশুখৃষ্টের পদ গ্রহণাভিলাষী পোপের অধীনতা স্বীকার করিবেন না। অতঃপর তিনজন সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন:—ভগবান দয়া করিয়া আমাদিগকে সত্যের জন্য এই দুর্ব্বিসহ অত্যাচার সহ্য করিবার উপযুক্ত অধীকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ

বিশপ মণ্ডলী ইঁহাদের দৃঢ়তা দেখিয়া, মৃত্যুই উপযুক্ত দণ্ড বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আনন্দোৎফুল্ল বদনে তাঁহারা বলিলেন:— ইহা নিঃসন্দেহ যে ন্যায় বিচারক ভগবান তোমাদের হস্ত হইতে আমাদের রক্ত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু হে গর্ব্বান্ধ বিশপগণ! মনে রাখিও; আমাদিগকে হত্যা করা সহজ কিন্তু সত্যধর্ম্মকে বিনাশ করা অসম্ভব। সত্য যেদিন স্ব মহিমায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, হে ধর্ম্মভানী মূঢ়গণ— সেদিন তোমাদের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া পুনরায় কারাগারে লইয়া যাইবার আদেশদিয়া বিচারকগণসভাভঙ্গ করিলেন। পথিমধ্যে বিরাট জনতা এই ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষগণকে দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তার টেইলর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে ভ্রাতৃগণ, আমরা তথাকথিত বিচারক নামধেয় শয়তানগণের প্রলোভনে সত্যপথ হইতে বিচলিত হইনাই। তোমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও আমরা সত্য রক্ষা করিতে পারি।

৫ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের বিশপ এডমাণ্ড বোনার, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণের ন্যায় একটী পরিচ্ছদ লইয়া ডাক্তার

টেইলরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন :—"মাষ্টার ডাক্তার! এখনও নিজের দুরবস্থা বুঝিয়া ক্যাথলিক মত অবলম্বন কর। আমি তোমার হইয়া, তোমার অতীত ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। টেইলর নির্ভীক দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন :—আমি তোমাদের সকলকে প্রভু ঈশার প্রেমরাজ্যে আনয়ন করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, সেজন্য কোন চার্চ্চভুক্ত হইবার প্রয়োজন দেখিতেছি না। রূঢ়কণ্ঠে বিশপ বলিলেন "উত্তম! এক্ষণে ধর্ম্মযাজকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর; যে হেতু উক্তপদ হইতে তোমাকে অযোগ্য বলিয়া অপসারিত করা হইয়াছে।"

"আমি প্রভু যীশুর উদার পবিত্র সুসমাচারের অ... প্রচারক, এবং আমি এখনও যথাসাধ্য তাঁহার কার্য্য করিয়া থাকি। যে দায়ীত্বভার স্কন্ধে লইয়া ধর্ম্ম-যাজক হইয়াছিলাম আমি এখনও তাহা হইতে তিলমাত্র বিচলিত হই নাই অতএব নিজেকে অযোগ্য ভাবিয়া স্বেচ্ছায় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিব না। ঈশ্বর কৃপায় তোমাদের রক্তচক্ষুর খরদৃষ্টিকে আমি অল্পই গ্রাহ্য করিয়া থাকি।"

বলা বাহুল্য বিশপের ইঙ্গিতে কয়েকজন অগ্রসর হইয়া বর্ব্বরোচিত নিষ্ঠুরতার সহিত বলপূর্ব্বক ডাক্তারকে উলঙ্গ করিল এবং অবশেষে ছিন্ন মলিনবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল।

পরদিবস রাত্রিতে ডাক্তারের সহধর্ম্মিণী এবং পুত্র কারাধ্যক্ষের সহৃদয়তায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি ইহজন্মের মত শেষবার পত্নী পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন। এই সমস্ত প্রটেষ্টান্ট বন্দীগণের চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কারারক্ষীগণ সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই সাধ্যমত ইঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতেন।

পরদিন লণ্ডনের শেরিফ্ ডাক্তার টেইলরকে লইয়া যাইবার জন্য অতি প্রত্যুষে কারাগারে উপস্থিত হইলেন। টেইলর পত্নী পূর্ব্ব হইতেই উহা জানিতে পারিয়া দুইটী কন্যাসহ নিকটবর্ত্তী একটী চার্চ্চের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন শেরিফ ডাক্তারকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন কন্যা এলিজাবেথ চীৎকার করিয়া বলিল "ঐ যে বাবা! মা, মা, বাবাকে কি দেখিতে পাইতেছ না?" ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাতে নিকটের বস্তু পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না। টেইলর পত্নী কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "প্রিয়তম স্বামিন্, আপনি কোথায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন?" টেইলর পত্নীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন "প্রিয়তমা, আমি তোমার অতি নিকটেই আসিয়াছি।"

তিনি দাঁড়াইবামাত্র রক্ষীগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। শেরিফ করুণা পরবশ হইয়া বলিলেন :—"একটু অপেক্ষা কর! উহাকে কিছুকালের জন্য পত্নীর সহিত আলাপ করিতে দাও।"—রক্ষীগণ স্থির হইয়া দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পত্নীর ক্রোড় হইতে কনিষ্ঠা কন্যা মেরীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া ডাক্তার জানু পাতিয়া বসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও এলিজাবেথও সেই উপাসনায় যোগদান করিলেন! এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে শেরিফের নয়নযুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল; এমন কি, কঠোর হৃদয় কারারক্ষীগণ পর্য্যন্ত বিচলিত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ নেত্রমার্জ্জন করিতে লাগিল! প্রার্থনান্তে ডাক্তার দাঁড়াইয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন "বিদায় প্রিয়তমে! আমি তুচ্ছ ইহলোকের ক্ষণিক সুখের কামনায় বিবেককে বলি দেই নাই ইহা মনে করিয়া হৃদয়কে শান্ত করিও। যদি আমি প্রকৃতই প্রভু যীশুর সেবা করিয়া থাকি তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমার অনাথ শিশুগণের ভরণ-পোষণের উপায় করিবেন।"—অতঃপর কন্যাদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "তোমরা প্রভু ঈশারবাণী অনুসরণ করিয়া চলিও এবং একমাত্র তাঁহাকেই ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া জানিও। সমস্ত প্রকার পৌত্তলিক ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে দূরে রাখিও।

টেইলর পত্নী উচ্ছসিত কণ্ঠে বলিলেন "বিদায় প্রিয়তম! প্রভু যদি কৃপা করেন তাহা হইলে হ্যাড্‌লিজে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।" হ্যাড্‌লিজের পথে উলপ্যাক নামক স্থানে একটী সরাইখানায় আসিয়া পোপকর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষীগণ জানিতে পারিল যে টেইলর পত্নী স্বামীর অনুগমন করিতেছেন; তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধৃত করিয়া তদীয় জননীর আবাসে পাঠাইয়া দিল; ফলে, ডাক্তারের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

এই স্থানে লণ্ডন হইতে আগত রক্ষীগণ টেইলরকে ইসেক্সের শেরিফের হস্তে সমর্পন করিয়া বিদায় লইল। বেলা এগারটার সময় টেইলর পুনরায় রক্ষীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইলেন। সরাইখানার রেলিংএর উপর বিশ্বাসী ভৃত্য জন তাঁহার পুত্র টমাসকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। টেইলর পুত্রকে দেখিয়া নিকটে আনয়ন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। জন বালককে অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহার পুরোভাগে স্থাপন করিল। টেইলর মাথার টুপা খুলিয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"হে সাধু হৃদয় দর্শকগণ! এই আমার পবিত্র বিবাহবন্ধনের ফলস্বরূপ একমাত্র পুত্র। যদিও অন্যায়রূপে আজ এই অজ্ঞান শিশু পিতৃহীন হইতেছে; তথাপি ঈশ্বর ইহার কল্যাণ করুন। আপনারাও এই অনাথ শিশুর প্রতি করুণা করিয়া ইহার কল্যাণ কামনা করুন।" অতঃপর পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া ধৈর্য্যশান্ত কণ্ঠে বলিলেন:—"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; প্রভু যীশুর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভক্তি অটুট থাকুক। যীশুখৃষ্টই খৃষ্টিয়ানগণের একমাত্র প্রভু ও মুক্তিদাতা ইহা সর্ব্বদা সকল অবস্থায় মনে রাখিবে।" এই বলিয়া পুত্রকে জনের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন:—বিশ্বস্ত জন! জানি না আর কাহারও ভাগ্যে তোমার মত ভৃত্যলাভ হইয়াছে কি না ঈশ্বর তোমাকে সাধুতার জন্য পুরস্কৃত করিবেন।"

ইতিমধ্যে ইসেক্সের শেরিফ অযথা কালবিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় রক্ষীগণকে গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন। টেইলরের আনন্দোজ্জল বদন, প্রীতি-প্রফুল্লিত হাবভাব দর্শনে সকলেই মনে করিতে লাগিল যেন বিবাহার্থী কোন প্রেমিক যুবক প্রিয়তমার সহিত মিলনের আশায় উৎসুক চিত্তে অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী রক্ষীগণের সহিত নানাপ্রসঙ্গ তুলিয়া নিরুদ্বেগে আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাদিগকে মোহিত করিয়া অবশেষে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুলতাপূর্ণ, গভীর প্রেমের সহিত উচ্চারিত প্রত্যেকটী মিনতি তাহাদিগের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিল। তাহারা অনুতপ্ত হইয়া স্ব স্ব পাপ ব্যক্ত করতঃ তাঁহার করুণাপ্রার্থী হইল। টেইলর আনন্দের সহিত তাহাদিগকে প্রভু যীশুর শরণ লইতে বলিলেন। মৃত্যুকে নিশ্চিত জানিয়াও যিনি অবিচলিত থাকিতে পারেন এমন লোক তো রক্ষীগণ ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই! এই ধর্ম্মবীরের মহনীয় ঈশ্বর প্রেমানুরাগ দর্শনে তাহারা যে মুগ্ধ ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এইরূপে টেইলর ল্যাভেনহাঁরএ উপস্থিত হইলে বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। একজন বলিলেন:—ডাক্তার টেইলর! আপনি এখনও রোমীয় চার্চ্চ ভুক্ত হউন; পোপের প্রাধান্য স্বীকার করুন; তাহা হইলে আপনার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে এবং আপনাকে বিশপেপাপেদে নিযুক্ত করা হইবে! এখনও বিবেচনা করিয়া দেখুন!" মৃদুহাস্যে টেইলর উত্তর করিলেন:—বন্ধুগণ আপনারা মনে করিতেছেন আমি খুব বিপদগ্রস্থ হইয়াছি; না? আপনারা মস্ত ভুল করিতেছেন। যাহারা শিথিল বালুকাভূমির উপর গৃহ নির্ম্মান করে, তাহারা ঈষৎ বায়ু সঞ্চারেও বিপদাশঙ্কায় ভীত হয়; কিন্তু আমি ঈশ্বর কৃপায় প্রভু যশুখৃষ্টে বিশ্বাসরূপ সুদৃঢ় শৈলের উপর দুর্ভেদ্য দুর্গের মত স্বীয় ধর্ম্মমতকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমি প্রটেষ্টান্ট; আমি জানি যে ক্রীতদাসের মত বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া সবলের পদলেহন করা ধর্ম্ম নহে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনারা সত্বরই পোপের অধীনতা হইতে মুক্ত হউন। প্রভু ঈশার প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হইয়া তাঁহার পবিত্র উপদেশানুসারে জীবন যাপন করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কি শান্তিপূর্ণ, কি আনন্দের!

যখন ডাক্তার টেইলর হাড্‌লিজ নগরের সেতুর উপর উপস্থিত হইলেন তখন তথায় জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি পাঁচটী শিশুসন্তানসহ অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র তাহারা জানু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল:—হে আমাদের পিতা ও পালক ডাক্তার টেইলর! আপনি যেমন বিবিধপ্রকারে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বহু বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ঈশ্বরও তাহার প্রতিদানস্বরূপ আপনাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। টেইলর হাসিয়া বলিলেন:—"বৎসগণ! আমি কোন বিপদে পড়ি নাই; সেজন্য প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের

মঙ্গল হউক।" তাহারা চীৎকার করিয়া টেইলরের গুণ-কাহিনী বর্ণন করিয়া পোপানুচরগণের কার্য্য প্রণালীর নিন্দা করিতে লাগিল। নগরের শেরিফ উক্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ধমক দিয়া বলিলেন "দূরহ হতভাগ্য শূকরগণ! ঐরূপভাবে পুনরায় চেঁচাইলে কঠিন শাস্তি পাইবি"।

হ্যাড্‌লিজ নগরের রাজপথে অশ্রুপূর্ণ লোচনে শত শত নরনারী ডাক্তারকে দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ ও ব্যথিত দীর্ঘনিশ্বাসতপ্ত পথের উপর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সকলেই সমস্বরে বলিতে লাগিল:—যিনি এতদিন ধর্ম্মোপদেশ দিয়া আমাদিগকে সৎপথে রাখিয়াছেন; যিনি আপদ বিপদে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, হা ঈশ্বর আজ তিনি আমাদের মধ্য হইতে অন্যায়রূপে অপসারিত হইতেছেন! কে আর তাঁহার মত আন্তরিকতার সহিত এই হতভাগ্য পল্লীবাসিগণকে সত্যপথে পরিচালিত করিবে? শোকার্ত্ত, রোদন পরায়ণ নরনারীবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া ডাক্তার টেইলর বলিলেন:—ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! এতদিন যে সত্য তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি; অদ্য তাহা হৃদয়ের রুধির দিয়া তোমাদের মর্ম্মে চিরদিনের মত অঙ্কিত করিয়া দিব। তোমরা সেই একমাত্র ত্রাতা যীশুর প্রতি প্রেমসম্পন্ন হও—ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা। বৎসগণ! তিনি আমার মত আরও কত ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিবেন অতএব আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের জন্য বৃথা শোক করিও না।

তিনি কারাগারে অবস্থান কালীন অনেক ধার্ম্মিক সাধু ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতেন। তাঁহারা তাঁহাকে যে সমস্ত অর্থ প্রদান করিতেন, তাহা তিনি একটী থলিতে রাখিয়া দিতেন। এক্ষণে উক্ত মুদ্রাধারটী বাহির করিয়া তিনি পথিপার্শ্বস্থ দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে একটী পূর্ব্বপরিচিত দরিদ্রের কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া ডাকিলেন:—"এই কুটীরে একজন অন্ধ বাস করিত, সে এখানে আছে কি?" উত্তর আসিল "হাঁ আমি ভিতরেই আছি।" ডাক্তার তাঁহার দানাবশিষ্ট অর্থ সহ থলিটী কুটীরাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর তিনি অ্যাল্ডহামে উপস্থিত হইয়া বিপুল জনসঙ্ঘ দর্শনে কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন:—এতলোক এস্থলে সমবেত হইয়াছে কেন?" একজন রক্ষী উত্তর করিল:—ইহা "অ্যাল্ডহাম-কমোন"; এইস্থলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে; তাই ইহারা দর্শনার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রফুল্লহাস্যে বলিলেন "বাঃ! তাহা হইলে তো দেখিতেছি আমি আমার প্রিয় স্নেহাস্পদগণের মধ্যেই রহিয়াছি"। বলিতে বলিতে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া টুপীটি মস্তক হইতে অপসারিত করিলেন। তাঁহার চিরপরিচিত পুণ্যপ্রজ্জ্বোল মুখখানি দেখিবামাত্র সমবেত জনতা সকরুণস্বরে বলিয়া উঠিল:—"হে ঈশ্বর, সাধু চরিত্র ডাক্তার টেইলরকে রক্ষা কর।" তিনি সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় একটী রক্ষী তাঁহার মুখের ভিতর একখানি মোটা লাঠির অগ্রভাগ ঢুকাইয়া দিয়া কঠোর কণ্ঠে তাঁহাকে কথা বলিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইবার আদেশ করিল। তিনি শেরিফের দিকে চাহিয়া কথা বলিবার অনুমতি প্রর্থনা করিলেন।

শেরিফ উত্তর করিলেন "আপনি সমবেত বিশপগণের নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বে বক্তৃতা করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন এক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন না কি?"

ডাক্তার টেইলর বলিলেন:—উত্তম, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাই উচিত"। তিনি কেন মৃত্যুর পূর্ব্বে বক্তৃতা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তখনও প্রকাশিত হয় নাই। পরে শুনা গিয়াছিল যখন তিনি এবং আর কয়েকজন ধর্ম্মপ্রচারক একসঙ্গে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন তখন বিচারক বিশপগণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা বা উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। কেহ কেহ এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দিহান হইবার জন্য তাঁহাদিগের জিহ্বা ছেদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। যাহা হউক মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিবার জন্য যাহাতে ঢ়া ব্যবহার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত না হন,

তজ্জন্য তাঁহারা বাধ্য হইয়া বক্তৃতা করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

যদিও পোপকর্ত্তৃক প্রেরিত ও নিযুক্ত পাদ্রীগণ রাজ্ঞী মেরীর সহায়তায় বলপূর্ব্বক প্রটেষ্টাণ্টদিগের গির্জ্জাসমূহ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ পূজাপদ্ধতিও ভয় প্রদর্শন করিয়া সাধারণকে রোম্যানচার্চ্চভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন তথাপি তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন যে জনসাধারণের আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নাই। বিশেষতঃ এই সমস্ত নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারকদিগকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে দেখিয়া জনসাধারণ পোপীয় ধর্ম্মমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এমতাবস্থায় যদি আবার এই সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতাদি শ্রবনে জনসাধারণ সম্মিলিত হইয়া ক্যাথলিক চার্চ্চের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় তাহা হইলে কেবল মাত্র দৈহিক বল প্রয়োগে তাহাদিগকে দমন করা সুকঠিন হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই তাঁহারা, টেইলর প্রমুখ প্রচারকগণকে এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার উপর যে মহাশত্রু ক্যাথলিকগণেরও আগাধ বিশ্বাস ছিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র।

যুগপ্রয়োজনে প্রটেষ্টাণ্টগণ ইউরোপের মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভগবানের এই মঙ্গলময়ী ইচ্ছার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? যাঁহারা ঈশ্বর ও ঈশার প্রতি অনন্ত প্রেমের প্রেরণায়, সমস্ত প্রকার অন্যায় নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, যাঁহারা অটল বিশ্বাস ও অসীম ধৈর্য্যের সহিত শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্যরক্ষা করিয়া মহিমান্বিত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা অত্যাচারী মানবের মদদৃপ্ত ভ্রূকুটী অগ্রাহ্য করিয়া ভগবানের আদেশ পালনের জন্য অকাতরে হৃদয় শোণিত দান করিয়াছেন—তাঁহাদিগের মহিমাময় আত্মোৎসর্গ বিফল হয় নাই। তাই না, আজও এই সমস্ত মহান ধর্ম্মবীরের পুত চরিত্র কাহিনী সকল দেশে বিদেশে শত শত ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত পাঠ করিতেছে, তাই না, এই সমস্ত মহাপুরুষের জলন্ত আত্মত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণীত শত শত ব্যক্তি উত্তরকালে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মকে অরাজক অত্যাচার, ভ্রান্ত কুসংস্কার ও ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

যাহাহউক কথা কহিবার অনুমতি না পাইয়া টেইলর পার্শ্ববর্ত্তী একজন প্রহরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "সম্, আইস, তোমার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ তুমি আমার পা হইতে বুট জোড়া খুলিয়া লও; আমি তোমাকে বহুবার আমার জুতার প্রতি লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। নগ্নপদে দণ্ডায়মান মৃত্যু সম্মুখীন টেইলর সমবেত জনতার নিকট ইঙ্গিতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলে হাহাকার করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভাবাবেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিলেন "সাধুহৃদয় ভ্রাতৃগণ! আমি পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠতম সত্যই তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি; তোমরা কখনও তাহা ভুলিও না। এমন সময় সর্দ্দাররক্ষী তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে হস্তস্থিত লগুড় দ্বারা আঘাত করিয়া বলিল, "ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড! এই বুঝি তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা? ডাক্তার কোন প্রতিবাদ না করিয়া উপাসনা করিবার জন্য জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে একজন বৃদ্ধা মহিলা অগ্রসর হইয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। ইঁহাকে অশ্বপদতলে পিষ্ট করিবার ভয় দেখাইয়াও রক্ষীগণ নিরস্ত করিতে পারিল না। উপাসনান্তে ডাক্তার বধ্যভূমিতে প্রোথিত লৌহদণ্ডখানি চুম্বন করিলেন এবং ধীরপদক্ষেপে পুঞ্জীভূত কাষ্ঠরাশির উপর আরোহণ করিয়া যুক্তকরে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সজ্জিত চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। এমন সময়ে একজন পোপানুচর তাঁহার বদন লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল। টেইলর তাহার দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া প্রসন্নহাস্যে বলিলেন "বন্ধু! দৈহিক যন্ত্রনা তো আমি যথেষ্ঠ পাইতেছি, ঐরূপ করিবার আর অধিক কি প্রয়োজন ছিল?"

মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তিনি প্রার্থনা পুস্তক বিশেষের

নির্দ্দিষ্ট অংশ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু "Have mercy upon us"—এইটুকু বলিবামাত্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্যার জন শেলটন, হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে আঘাত করিয়া বলিলেন: "লাটিন ভাষায় প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ কর।"

দেখিতে দেখিতে তাঁহার অকম্পিত জানুদ্বয় বেষ্টন করিয়া অগ্নির রক্তশিখা নৃত্য করিতে লাগিল। মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া টেইলর হস্তদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "Merciful Father of heaven, for Jesus Christ my Saviour's sake, receive my soul into thy hands."

টেইলর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনারত; এমন সময়ে সম্ (যাহাকে তিনি কিছুকাল-পূর্ব্বে পাদুকা দান করিয়াছিলেন) হস্তস্থিত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিল। বিদীর্ণমস্তক ডাক্তার টেইলরের পবিত্র দেহও সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরাশির মধ্যে লুটাইয়া পড়িল সমবেত জনতা রোষে, ঘৃণায় ও শোকে হাহাকার করিয়া উঠিল [illegible]ব যন্ত্রণার অবসান হইল—মহামতি টেইলরের বিজয়ী আত্মা হীনতার কলুষ লাঞ্ছিত পৃথিবীর ইতিহাসের অমর পৃষ্ঠায় শোনিতাক্ষরে ধর্ম্মের মহিমা মুদ্রিত করিয়া, ইহলোক হইতে অপসারিত হইলেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

উৎসবে

"The true Hinduism that made man work, not dream"—J. C. Bose.

আজ একবৎসর পর আমরা পুনরায় মিলিত হইয়াছি। আজ আমাদের "রামকৃষ্ণসেবাশ্রমের" বার্ষিক সম্মিলনী ও উৎসব। যে জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষের পবিত্র নামে ভূষিত হইয়া আমাদের ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী মহিমান্বিত হইয়াছে—এসো আমরা সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিবিনম্র চিত্তে প্রণত হই—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি!

আজ এই উৎসব-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কেবলি মনে হইতেছে, কিসের এ উৎসব—এ উৎসব কেন? এই বুভুক্ষু বাঙ্গলার সোনার শশ্মানে,—দরিদ্রের অসহায় হাহাকার, পদদলিত, উৎপীড়িতের ব্যর্থ অনুনয়, ব্যাধি পীড়িতের কাতর আর্ত্তনাদের মধ্যে উৎসব কেন? উৎসবের প্রয়োজন কি? আর উৎসব কি সম্ভব? উৎসবকে যদি আমরা একটা ক্ষণিক উল্লাসের—আনন্দের ব্যাপার বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বলিতে হয় বৈ কি যে আমাদের এ উৎসব তামসিক—ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। আমরা উৎসবের পূণ্যলগ্নকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত বরণ করিয়া লইতে পারি নাই—ইহার মহান উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রাণের ঠিক ঠিক পরিচয় হয় নাই। সুরাপায়ীর মত উৎসবানন্দের আগ্রহভরা চাঞ্চল্যে আমরা অধীর হইয়া উঠিয়াছি বটে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গভীর অবসাদে লুটাইয়া পড়িব! একটা বিশৃঙ্খল কোলাহল সৃষ্টি করিয়া উশৃঙ্খল হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তিবিধানের জন্যই কি এই উৎসবের অনুষ্ঠান? ইহা কি শুধু একটা সাধারণ আমোদের ব্যাপার?

হে ভ্রাতৃগণ; এসো আমরা স্ব স্ব বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া—ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া একবার ভাবিয়া দেখি—এই উৎসবকে একটা উচ্চতম অনুভূতির দিক দিয়া আমরা বুঝিতে প্রস্তুত আছি কি না? সেই সত্যংশিবসুন্দরের জগদ্ব্যাপী নিত্য মহোৎসবের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য যে বিরামহীন সাধনার প্রয়োজন—সেই সাধন-

রাড়ীখাল সেবাশ্রমে বার্ষিকউৎসবে শ্রীমুকুন্দলাল বসু বি-এ, কর্ত্তৃক পঠিত।

শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্তই আমাদের এ উৎসবের আয়োজন কিনা? যদি তাহাই হয়, তবে এসো, আমরা শান্ত সংযত হৃদয়ে বিচার করিয়া—হিসাব করিয়া দেখি, সেই লক্ষ্যের দিকে এই একবৎসরে আমরা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি। বিচার করিয়া দেখি—আমরা সে শক্তিসঞ্চয় করিতে পারিয়াছি কি না, যাহা আমাদের তরুণ হৃদয়ের ম[illegible] উদ্দেশ্যগুলিকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার আ[illegible]কে চিরদিন সমভাবে অব্যাহত ও অটুট রাখিবে? অতএব মনে রাখিও, আজ আমাদের ভাবিবার দিন—বিচার করিবার দিন—বুঝিবার দিন; ক্ষণিক আনন্দে উন্মত্ত হইবার দিন নহে!

একটা মহান উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা এই "রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও তুচ্ছ নহে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ইহা একটী আধ্যাত্মিক ব্যায়ামশালা—এখানে আমরা—প্রত্যেকেই হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিবার জন্ত একটা সুযোগ পাইয়াছি। এই সুযোগকে আমরা দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া থাকিব—কারণ আমাদের আশা আছে—এই সেবাশ্রমের কুটীরের মধ্যে লোকলোচনের অন্তরালে এমন কতকগুলি চরিত্র গড়িয়া উঠিবে, যাহারা আগতপ্রায় ভবিষ্যতে শত শত ব্যথিতের হৃদয়ে শান্তি দিবে, ভগ্নবুকে আশা দিবে, পতিতকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে—জাতির সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া নবযুগের বার্ত্তা ঘোষণা করিবে!

আমরা যখন মানুষ—তখন এ মহাদায়ীত্ব গ্রহণ করিতে লজ্জিত হইব কেন? আমরা পদমর্য্যাদাহীন; দরিদ্র বটে; কিন্তু দুর্ব্বল, হীন, কাপুরুষ নহি। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটীকে আমরা ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া বুকের রক্ত দিয়া বাঁচাইয়া রাখিব। আমরা চাহি না গর্ব্বান্ধ ধনীর অবজ্ঞাভরে প্রদত্ত রজত মুষ্টি! আমরা চাই বিশ্বাসী সাধকের ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও পবিত্রতার শক্তি! আমরা চাই মানুষ—যাহারা বাধা, বিপত্তি, অনতিক্রমনীয় নিরাশার সহিত সংগ্রাম করিয়া পথ প্রস্তুত করিবে—যাহারা ঘৃণা, নিন্দা, অপমান, অপবাদ নীরবে সহ্য করিয়াও অবিচলিত থাকিবে।

প্রত্যেকেরই জীবনের একটা আদর্শ আছে—অন্ততঃ থাকা উচিত। দায়স্বরূপ কর্ত্তব্য রূপে প্রাপ্ত কতকগুলি কার্য্য সম্পাদন করিতে করিতে মানুষ সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়। তেমনি জাতিরও একটা আদর্শ আছে, সাধনা আছে। বিশ্বলীলার সহিত ঐক্য রাখিয়া তাহাকেও সেই লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে হয়। আদর্শকে পাইবার জন্ত ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম, কর্ম্মশক্তি পুঞ্জীভূত হইয়াই জা[illegible]রূপে প্রকাশিত হয়। এই বিরাট হিন্দুজাতি আবহমানকাল হইতে ভূত প্রকৃতিকে অতিক্রম করতঃ ভূমাকে লাভ করাই জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া লইয়াছে। সে তাহার সমাজ, ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান, আচার, ব্যবহার সমস্তই এই উদ্দেশ্যসাধনের অনুকূল ভাবে গঠন করিয়া লইয়াছে। যেমন ব্যক্তি-বিশেষ মোহভ্রান্ত হইয়া বিপথ পরিচালিত হয়; সেইরূপ সময় সময়. জাতিও তাহার জীবনোদ্দেশ্য যেন ভুলিয়া যায়—যেন তাহার দিক্‌ভ্রম হয়! দেশকাল পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সে আর চলিতে পারে না—তাহার অগ্রসর স্থগিত হইয়া যায়! এইরূপ একটী অশুভ মুহূর্ত্ত আমাদের জাতীয়জীবনে দেখা দিয়াছিল নিজেদের অক্ষম দুর্ব্বলতার উপর বৈরাগ্যের আবরণ নিক্ষেপ করিয়া আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া পড়িয়াছিলাম। আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছি তাহার ফল স্বরূপ আমাদের এই সমাজ—"যাহা এক কথায় ভয়াবহ পৈশাচিকতা পূর্ণ।" আমাদের শোচনীয় অধঃপতনের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে আলোচনার ইহা উপযুক্ত সময় নহে। বর্ত্তমান সমাজের অপূর্ণতা ও দোষ-গুলির আলোচনাও আজ আমরা করিতে চাহিনা। কারণ যাঁহার হৃদয় আছে, তিনিই অনুভব করিতেছেন। যাঁহার মস্তিষ্ক আছে তিনিই উপলব্ধি করিতেছেন। দেশের, জাতির, সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে নৈরাশ্যেই প্রাণ ভরিয়া উঠে। যাঁহারা ব্যথিত হৃদয়ে কর্ম্মের পথে দাঁড়াইয়া-ছেন বা দাঁড়াইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন তাহারাও সময় সময় প্রশ্ন করিয়া বসেন—উপায় কি? কোন পথে চলিব সবদিকেই অন্ধকার! অন্ধকার তো আছেই—

চলিতেও হইবে। পড়িলে উঠিতে হইবে, উঠিলে চলিতে হইবে; ইহা মানব প্রকৃতির মজ্জাগত ধর্ম্ম! অবশ্য যাহারা মানুষ তাহারা কখনই নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকে না—থাকিতে পারে না! অপরের দুর্গতি দেখিয়া সে অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া পড়ে না—সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যায়! অপ্রতিবাদে সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে বহন করে! তাহারা কখনও ভুলিয়া যায়না যে এ জাতির পাপ যে আমাদেরই পাপ—আমাদিগকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! দাস সুলভ ঈর্ষা দ্বেষে জর্জ্জরিত স্বার্থপর হীনবিলাসী আমরা—কল্পিত আভিজাত্যের অহঙ্কারে যতই গর্ব্ব করিনা কেন, আমরা তামসিক ভাবাপন্ন শূদ্র! তাই এবারকার যুগাবতার আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিয়ছেন—সেবা! এক্ষণে এই সেবাকে, জাতির কল্যাণের জন্য, সঙ্গে সঙ্গে আত্মকল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে! ভগবান লাভ করিবার জন্য এ এক বিরাট সাধনা! ইহা হৃদয়ের দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অভিমানে কর্ত্তা সাজিয়া পরোপকার করা নয়—এ বিরাটের পূজা—বিচিত্র ইহার উপকরণ! সাধারণতঃ ভগবান লাভ ও সাধনার কথা মনে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াপড়ে কৌপীন, করঙ্গ, চিম্‌টা, নির্জ্জন গিরিগুহা—ছিন্ন মোহপাশ নির্ম্মম যোগী—যাঁহার সহিত সংসার ও সমাজের কোন সম্বন্ধ নাই! জগতকে উপেক্ষা করিয়া, দেশের দুঃখ, দৈন্য, ব্যাধি মড়ক প্রপীড়িত কোটী কোটী ভ্রাতার আর্ত্তনাদের মধ্যে যোগাসনে উপবিষ্ট আত্মস্থ যোগী তাঁহার ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করুণ—মাঝে মাঝে "প্রপঞ্চছায়" বলিয়া মর্ত্তবাসী জীবের দুর্গতিগুলির প্রতি উপেক্ষার করুণ দৃষ্টিপাত করুণ—আমাদের কোন আপত্তি নাই; তাঁহার আদর্শ উচ্চ মহান; তবে তাঁহাকে আমরা দূর হইতে প্রণাম করি!

আমরা করিতে চাই বিরাটের পূজা—আমরা যাহাদিগের মধ্যে জন্মিয়াছি, যাহাদিগকে একান্ত আপনার বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাদের সুখ দুঃখ আমাদের সুখ দুঃখ—যাহাদিগকে আমরা এতদিন অদৃশ্য ও নীচ বলিয়া সরাইয়া রাখিয়াছিলাম—আজ নবযুগের প্রভাতে তাহাদের মধ্যে দেখিতে চাই বিরাটের বিচিত্র প্রকাশ! মানুষে, মানুষে জন্মগত, জাতিগত ভেদাভেদ, কৃত্রিম উচ্চনীচ নির্ণয় করিবার প্রথাগুলি বিস্মৃত হইয়া আমরা সকলকেই আজ "নরনারায়ণ" আখ্যায় অভিহিত করিতে চাই! আধ্যাত্মিক, মানসিক ও দৈহিক অভাবগুলি পূরণ করিয়া আমরা আশে পাশের স্পন্দহীন ম্রিয়মান মনুষ্যত্ব গুলিকে পুষ্ট ও বিকশিত করিয়া তুলিতে চাই! ইহাই আমাদের সেবাব্রত ইহাই আমাদের পূজা,—এই উদ্দেশ্যে আমরা চালিতে চাই জীবন!

কিন্তু এ এক কঠোর সাধনা—এক অস্থিচর্ম্ম মর্ম্মভেদী পরীক্ষা! ইহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—ক্ষুরধার দুর্গম ও তমসাচ্ছন্ন! সময় সময় আপনাকে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় বলিয়া বোধ হইবে,—সংসারের রক্তনেত্রের ঈর্ষ্যাবিষতিক্ত ভ্রুকুটী ভঙ্গিতে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে চাহিবে—দুঃখ দৈন্য ও দরিদ্র্য সঙ্গের সাথী হইবে—তবু নবযুগের কর্ম্মীগণকে এ সমস্ত পর্ব্বত প্রমান বাধা ও বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে—এই চেষ্টায় প্রাণ দিতে হইবে—ইহাই তাহাদের অদৃষ্টলিপি! যাঁহারা স্বার্থপর ও হীন বিলাসী—তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হও, এপথে আসিও না! নিজের মনমত, আদর্শকে খাটো করিয়া লইয়া জাতির সম্মুখে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করিও না! সফলতা বা বিফলতায় কিছু যায় আসে না সত্য—যদি সত্যে দৃঢ় নিষ্ঠাথাকে! কিন্তু ভাবের ঘরে চুরী, লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষায়, অন্ধ অনুকরণ প্রসূত মহত্বের ভান—মারাত্মক অপরাধ!

অতএব সাধকের চাই অটুট আত্মসংযম। এই সংযম সাধনাই তাহার প্রাণে মহাতেজ আনিয়া দিবে! নৈরাশ্যের বিভীষিকা তাহাকে সাময়িক বিচলিত করিলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারিবেনা! বিপদকে বুকদিয়া আলিঙ্গন করিবার শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিবে! এ সাধনায় কেন আমরা অক্ষম হইব? ঐ শোন নবযুগাচার্য্য জলদগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন অভীঃ অভীঃ। যাঁহারা তর্জ্জনী তুলিয়া "তিষ্ঠ" বলিলে গগনকেন্দ্রে চিরভ্রাম্যমান গ্রহপিণ্ড পর্য্যন্ত সসম্ভ্রমে স্তব্ধ হইত—আমরা তাঁহাদেরই বংশধর—সামান্য ইন্দ্রিয় লালসাকে দমন করিতে পারিব না?

এসো সাধক ; নবযুগের পুণ্য প্রভাতে আমরা মুক্তির এই প্রশস্ত রাজপথে মহাযাত্রা করি ! "যত্রজীব তত্র শিব" এই মহামন্ত্রকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার এই শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণ আমরা তুচ্ছ সুখবিলাসে মজিয়া হেলায় হারাইব না।

এই দরিদ্র নারায়ণ সেবা—স্বামী বিবেকানন্দের এক গৌরবময় কীর্ত্তি ! হে ভ্রাতৃগণ, একবার ভাবিয়া দেখ, "কি মহান সে হৃদয়, কি বিরাট সে অনুকম্পা, কি গভীর সে অনুভূতি, যাহা ভেদ অভেদের সমস্ত দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া, এক অখণ্ড সত্তার অতলে ডুবিয়া, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, প্যারিয়া ভারতবাসীকে বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে নারায়ণ জ্ঞানে সেবার আদেশ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।" বর্ত্তমান ভারত যদি এই আদেশের মর্ম্ম না বুঝে—বুঝিয়া কর্ম্মে অগ্রসর না হয়, তবে ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস অন্ধকার।

হাঁ, নিজের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া আমাদিগকে কর্ম্মে অগ্রসর হইতে হইবে—আত্মশক্তিকে সংযম সাধনার উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে ! আমরা এই কার্য্যে যত কৃতকার্য্য হইব, পন্থাও ততই সুগম হইয়া আসিবে।

যুক্তি, তর্ক, সন্দেহ ও তাহার মীমাংসা দিয়া সত্যকে জটীল ও ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে চাহি না ! সত্য চিরদিনই হিমাচলের মতে সমুন্নত শির তুলিয়া দণ্ডায়মান—জানিনা তবু তাহার সহিত যুক্তির কৃত্রিম পদ যোজনা করিবার আবশ্যক কি ? নবযুগের মহাসত্য এই সেবাব্রত—ইহাকে মস্তিষ্ক দিয়া বিচার করিতে গেলে মহাভ্রম করিবে—ইহাকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হইবে। তর্ক করিয়া ইহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলে চলিবে না—প্রাণ দিয়া ইহাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে ! যদি তোমার সঙ্কল্প সাধু, উদ্দেশ্য মহান, ধারণা ঠিক হয়—তবে আর বৃথা তর্ক যুক্তির আবশ্যক কি।

বীর সন্ন্যাসীর কম্বু কণ্ঠে—"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত"—মহাবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—আর ভাবিবার সময় নাই। এসো সম্মুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া আমরা অগ্রসর হই ! দরিদ্র, পতিত, আর্ত্ত, অনাথ, মুচি, মেথরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি। অমৃতের নির্ঝর হৃদয়ে লুক্কাইত রহিয়াছে—এসো স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতার উপলখণ্ড সরাইয়া দেই—প্রাণপ্রদ, জীবন প্রদ ভাবের বন্যায় জাতির জরাগ্রস্থ অভ্যাস্থ চিন্তাগুলি ভাসিয়া যাক ! এসো আমরা আমাদের স্ব স্ব উদ্যম, চেষ্টা ও শক্তি সম্মিলিত করিয়া ভূতগরিমার ধ্বংসাবশেষের বক্ষে মহাসমন্বয়ের স্বর্ণসৌধ গড়িয়া তুলি—দেখিবে, আগতপ্রায় ভবিষ্যযুগের মহাপ্রাণ কর্ম্মীগণ সেবাউন্মুখ বাহুযুগে কর্ম্মসাগর মন্থন করিয়া কত বিচিত্র মণি মানিক্যে উহা সজ্জিত করিবে ! তবে আজ উৎসবের শুভলগ্নে, হে ভ্রাতৃগণ নির্ভীক দৃঢ়তার ত্যাগের গৈরিকরাগরঞ্জিত হিন্দুর জাতীয় পতাকাখানি উর্দ্ধে তুলিয়া ধর দেখি—শত শত উদারহৃদয় চরিত্রবান যুবক পতাকাতলে সমবেত হইয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সার্থক করিয়া তুলিবে,—সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও—দশের দুর্দ্দশাও ঘুচিবে।

ব্যাধের শরণ

(বারনস্ হইতে)

কুল দেখে আর বিত্ত দেখে বুড়ার সঙ্গে মেয়ের বিয়া
দেয় যাহারা তাদের মত নাইক কারো পাষাণ হিয়া।
শ্যেনের মত জামাই তাড়েন, কন্যা পলায় আগে আগে
ভয় চকিতা পায়রা যেন, ব্যাধের পায়ে শরণ মাগে।

শ্রীকালিদাস রায় বি-এ

অপ্রকাশ

(গল্প)

রথের ছুটি। দুপুরবেলা বন্ধুদের শুভাগমনে দিনটা বেশ কাটিয়ে দেওয়া গেল। তিনটে চারটের সময় এক এক করে সকলে চলে যাবার পর বাড়ীর ভেতর যাবার জন্যে উঠলুম। প্রথমেই চৌকাটে হোঁচট খেয়ে বাধা পেলুম, দুএর নম্বর এক হাঁচি! ভাবী দুর্ভাবনায় মনটা টন্ টন্ করে' উঠল। দুর্গা দুর্গা বলে অন্দরমহলে ঢুকলুম। ঘরে ঢুকতেই দেখি গৃহিনী খোকাকে কোলে নিয়ে বসে আছেন—তাঁর মুখাকাশে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। এরকম ব্যাপার প্রায়ই হয় কাজেই এই ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত। মান ভাঙ্গবার উপক্রম করতেই আমার কপালে একেবারে ঝড় উঠল। কোনমতেই সে ঝড় থামে না, ক্রমশঃই ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতে লাগল। এখানে ব্যাপারটা আপনাদের খুলে বলি। রথে পুরী যাবার জন্যে গৃহিনী বায়না লন। কাজকর্ম্মের ক্ষতি হবে এইরূপ নানা ঝঞ্ঝাটের কথা তুলে—পরে আর এক সময় নিয়ে যাব বলে সেদিন, রেহাই পাই। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, আজ খোকন বাবু সকালে সগুয়ার সঙ্গে বাজারে গিয়ে এক মাটির রথ ও ভেঁপু নিয়ে বাড়ী ফিরতেই সেই ভেঁপুর স্বর শুনে গৃহিণীর পূর্ব্ব শোক আবার উথলে উঠ্‌লে। ব্যাপারটা অন্য-দিনের মত সহজে মেটে নি। সুতরাং আমার কপালে অনাহার না হলেও সেদিনের মত অর্দ্ধাহার! অর্থাৎ এক পেয়ালা চা খেয়েই বাড়ী থেকে বেরুতে হ'ল। কোথায় আর যাব—আমাদের সকলের মিলন-স্থল ছিল সুখেন্দুদের বাড়ী। সেইখানেই বেড়াতে বেড়াতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি সেখানে তখন পুরোদস্তর মজলিস্ জমেছে। ক্রমশঃ চায়ের সরঞ্জাম এক এক করে দেখা দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুপত্নীর হাতের তৈরী গরম চপ্ প্রভৃতি তার সঙ্গে যোগ দিয়ে মজলিসটা এমন গরম করে তুল্লে যে কোথা দিয়ে যে সুয্যিঠাকুর ডুবে গিয়েছে তা টেরও পেতুমনা যদিনা একটা বহুকণ্ঠের মিশ্রিত কান্নার রোল এসে আমাদের সেই হাসি ঠাট্টার মজলিসে বেখাপ্পা রকম সুরে বেজে উঠত। কান্না শুনে আমি প্রথমে বলে উঠলুম "মরাকান্না কোত্থেকে উঠল হে?" সুখেন্দু বললে "অপ্রকাশকে মনে পড়ে? সেই যে ফিট্ ফিট্ ছোকরাটি আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ত? এ সেই হতভাগ্যেরই মৃত্যু-ক্রন্দন। আহা বেচারা!" তারপর একটু থেমে বল্লে "তুমি কি ওদের কোন খবরই জান না?" "কই না, পড়াশুনো ছাড়বার পর আর তো ওদের কোন খোঁজ খবর রাখিনি।"

"ওঃ! তবে শোন—ঐযে মোড়ের ফটকওয়ালা উঁচু পাঁচিলঘেরা লালরঙ্গের বাড়ী খানা দেখছ ঐ খানা হ'ল অপ্রকাশদের বাড়ী। ছেলেবেলা থেকে আমরা ঐ বাড়ী খানার দিকে কেন জানিনা ভয়ে ভয়ে তাকাতুম—যেন এটা একটা দৈত্যপুরী। জানলা দরজাগুলো প্রায়ই দিনের বেলায় বন্ধ থাকত—লোকজন বাড়ীটায় আছে বলে জানা যেত—সে কেবল ঐ পাঁড়ে দরোয়ান আর ঝি চাকরগুলো দেখে; তবে তারাও সাধারণ ঝি চাকরদের মতন বড় একটা চেঁচামিঁচি করতো না—কলের মতন কাজ করে যেত। তারা যে এখানকার ঝি চাকর নয় তা বোঝা যেত কেননা তারা বাড়ী ছেড়ে কোন জানা শুনো লোকের কাছে যেত না—তাদের পরিচিত লোকজন নিশ্চয়ই এসহরে কেউ ছিল না। বড় হয়ে শুনলুম ও বাড়ীটা ভৈরব রায়ের—নামের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তা তাঁর রুদ্ধ কয়েদখানার মত বাড়ী ও বোবা ঝি চাকরই প্রমান। আমাদের দেশে যেমন ছেলে ঘুম পাড়ানোর সময় "বর্গী এল দেশে" বলে' ভয় দেখায় পূর্ব্ববঙ্গে নাকি ভৈরব রায়ের নামেও ছেলেপিলে ভয়ে জড় সড় হয়ে পড়ে। এটা একটু অতিরঞ্জিত হলেও ভৈরব রায়ের নামে যে তাঁর প্রজারা ও বাড়ীর

সকলে তঠস্থ হয়ে থাকতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিলনা। এমন যে ভৈরব রায় তারই ছেলে ছিল আমাদের অপ্রকাশ। অমন শান্ত নরম প্রকৃতি—আমি তো এপর্য্যন্ত একটীও দেখলুম না। বেচারার ঐ নরম প্রকৃতিই কাল হয়েছিল—এর জন্য তাকে স্কুলে কত হাসিঠাট্টা না সহ্য করতে হয়েছে আবার বাড়ীতেও ঐ জন্যেই বাপের কাছে সে কুপুত্তুর খ্যাতি পেয়েছিল। লোকে বলত দৈত্য-ঘরে প্রহ্লাদ এয়েছে।

তারপরে সে ছিল মায়ের একমাত্র সন্তান। উপরি উপরি তিনটি সন্তান মারা যাবার পর অনেক দেবদেবীর মানত করে ঐ কার্ত্তিকের মতন ছেলেটিকে বুভুক্ষু মাতৃ হৃদয়ের ক্ষুধা মিটাবার জন্যই বুঝি ভগবান পাঠিয়েছিলেন। যাক্, তারপর ছেলে যতই বড় হয়ে উঠতে লাগল মা ততই তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন—কি একটা ভবিষ্যৎ ভেবে স্নেহময়ী মাতা সর্ব্বদার জন্য উৎকন্ঠিত থাকতেন। সে ভয়ের অবশ্য কারণও ছিল। কারণ, ভৈরব রায়ের প্রকৃতি—সেই সাধ্বী যতটা জানতেন ততটা বোধ হয় আর কারো জানবার অবকাশ হয়নি! কিন্তু বুকের মধ্যে লুকিয়ে তো ছেলের বয়স চেপে রাখা যায় না। তিনি যতই অপ্রকাশকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলেন ততই সে যেন নিজেকে প্রকাশিত করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠছিল। সুতরাং ভৈরব রায় ছেলেকে বারমহলে এনে মাষ্টার ও চাকরের জিম্মায় রেখে দিলেন কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ দুটি হৃদয় ভেতরে ভেতরে গুমরে গুমরে শুকিয়ে পড়তে লাগল। ভৈরব রায় আর যাই হোন এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁর ছিল, তাই তিনি অপ্রকাশকে মায়ের কাছে এসে ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছিলেন। মা হারা-নিধিকে বুকে পেয়ে বুকের মধ্যে চেপে রেখে একটা শঙ্কিত আনন্দে বিনিদ্র হয়ে সারা রাত্রি কাটিয়ে দিতেন। অপ্রকাশের কাছে শুনেছি সে যখন পড়তে যেত মা তখন তার ঠিক্ বৎস-হারা গাভীর মতন ছুটে বেড়াতেন। সারা দুপুরটা কেমন যেন একটা বেদনার ভাব তাঁর মুখে ফুটে থাকত—এটা ছেলেও এই দৈনন্দিন অনুভব-নির্য্যাতনের হাত এড়াতে পারেনি সেও ইস্কুলে সমস্তক্ষণ মা'র এই মলিন মূর্ত্তিখানি কল্পনায় চোখের সামনে দেখত—এমনকি তোমরা জাননা যে সে এপর্য্যন্ত বিয়ে করেনি পাছে মার কাছ থেকে সে দূরে গিয়ে পড়ে—আর একজন এসে পাছে তার স্নেহে ভাগ বসায়—এই ভয়ে। তোমরা শুনে হয়তো আশ্চর্য্য হবে যে এই বিয়ের কথা নিয়ে ভৈরব রায়ের মতন বাপের সঙ্গেও তার একটু বেশ মনান্তর হয়ে গিয়েছিল। মা অনেকদিন থেকে পিতাপুত্রের এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করছিলেন কিন্তু কোন কথাই বলে উঠতে পারছিলেন না পাছে তাঁর বলার দরুনই কোন একটা ব্যাপার শীঘ্র ঘটে যায়। তারপর আমাদের য়ুনিভার্সিটির পড়া শেষ করে সে যখন জমিদারী সেরেস্তার কাজে মন দিলে তখন বাপ মা দুজনেই খুসি হলেন।

মা এই অবকাশে ছেলের বিয়ের কথা পাড়তে গিয়ে স্বামীর মুখ দেখে থেমে গেলেন। কথাটা সেই থেকে চাপা পড়েই গেল। মা এই বয়স্ক ছেলেটিকে নিয়ে তাঁর পুত্রকন্যার সাধ মিটাতেন কারণ সেই ছিল তাঁর সব। সন্ধোবেলায় ছেলেতে মায়েতে ছাদে বসে কত রকমের সুখ-দুঃখের আলোচনা হ'ত। ভৈরব রায় মাঝে মাঝে তার মধ্যে এসে পড়তেন এবং বোধ হত একটু বিরক্ত ও হতেন। তবে মা ও ছেলের আলোচনা বাপের সুমুখে বেশ স্ফুর্ত্তি পেত না সুতরাং সেটা কলের মতনই ভৈরব রায়ের আগমনে থেমে যেত। ছেলের ও সঙ্গী, সাথী বন্ধু সবই ছিল ঐ মা। আর এই ছিল তাঁদের জীবনের দৈনন্দিন কাজ। কিন্তু তাঁদের এই একটানা জীবনের মাঝখানে হঠাৎ শনির দৃষ্টি পড়ল। কি একটা কথা নিয়ে পিতা-পুত্রে একদিন একটু বচসা হয়ে গেল। মা তো পিতা-পুত্রের মুখ দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। ঠাকুর দেবতার চরণে অনেক মাথা খুঁড়লেন, অনেক মানত করলেন কিন্তু ফলে কিছুই হল না।

তার পরদিন বচসা হয়ে সেটা এতদূর গড়াল যে ভৈরব রায় তাঁর একমাত্র পুত্রকে বাড়ী থেকে জন্মশোধ বিদায় দিলেন। অভিমানী পুত্র ও মায়ের কথাটা একবার না. ভেবে একটা বিশ্রী দিব্যি করে সেই যে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল তারপর আর তার কোন খোঁজ-খবরই পাওয়া গেল না। তবে তার মৃত্যু-ক্রন্দন কি করে তাদের বাড়ীতে

উঠ্'ল আর তার হয়ে এত ক্রন্দন কে করলে যদি বল তবে শোন আমি সেই কথাটাই বলছি।

অপ্রকাশ যে দিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায় সেদিন ছিল তার জন্মতিথির উৎসব। মা ওদিকে সমস্ত আয়োজন করে ছেলের মঙ্গল কামনায় বসে আছেন, ছেলে কি একটা দরকারে বাইরে এসে বাপের সঙ্গে বচসা করে' সেই যে নূতন কাপড় পরেই চলে গেল আর ফিরল না। মা যখন এই খবরটা ঝি চাকরদের' মুখে শুনলেন তখনই শোকে অসাড় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ঝি চাকরেরা মুখে জলটল দিয়ে যখন তাঁর জ্ঞান সঞ্চার করলে তখন তিনি একবার চারদিক চেয়ে নিজেকে বোধ করি বেশ শক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—তখন তাঁর মুখে চোখে কোন ক্লিষ্ট ভাবেরই লক্ষণ ছিল না কেবল ভেতরে প্রাণ আছে সেটা বোঝা গেল —তাঁর চলা ফেরার দরুণ। ভৈরব রায় সবই বুঝলেন কিন্তু দুর্ব্বলতাকে আর প্রশ্রয় দিলেন না পাছে সে তাঁকে ক্রমশঃ একেবারে অধিকার করে বসে। বরং তিনি নিজেকে শক্ত করবার জন্যে এই আজ্ঞা প্রচার করলেন যে বাড়ীতে অপ্রকাশের নাম যেন কেউ না আনে আর যদি কেউ তাকে কোন প্রকার সাহায্য করে তাহ'লে সে ও এবাড়ী মুখো যেন না হয়। রায় গৃহিণী যেমনি স্নেহপ্রবল ছিলেন, তেমনি কঠোরও বড় কম ছিলেন না। ছেলের নাম সেই দিন থেকে তিনিও যে বন্ধ করলেন আর মৃত্যুপর্য্যন্ত অপ্রকাশের নাম তাঁর মুখে কেউ কখনও শোনেনি কিম্বা তার জন্যে তাঁকে বাইরে কোন দুঃখ ও কেউ কখনও কর্ত্তে দেখেনি। যে তেজ ভেতরে থাকলে জমিদার গৃহিণী হ'তে পারা যায় তা তাঁতে যথেষ্ট পরিমানেই ছিল আর সে তেজের সদ্ব্যবহার ও তিনি যথেষ্ট করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যে শমীতরুর মধ্যে আগুন থাকে বলে একটা প্রবাদ আছে সেটার প্রমান রায় গৃহিণী; কারণ ভেতরের এই গুপ্ত তেজে তিনি নিজেই দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন—তবে সেটা ব্যক্ত হ'ল সেই দিন যে দিন তিনি আর নিজেকে সামলাতে না পেরে একটা উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়ে, অব্যক্ত একটা চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। ডাক্তার এসে বল্লেন যে মনে খুব জোর কোন আঘাত লাগার দরুণই এই রোগ, আর তাতে যে কোন সময়েই হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভৈরব রায় সমস্তই শুনলেন ও বুঝলেন কিন্তু একটা বড় হুঁ বলে আর কোন উচ্চবাচ্য করলেন না। ডাক্তার নিয়মমত ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন কিন্তু তাতে রোগিণীর বিশেষ কোন উপকার বা অপকার হল না কারণ রোগিণীর রোগ ঠিক যে কোথায় অর্থাৎ রোগের উৎপত্তিস্থল যে কোথায় তা তখন ডাক্তার তো জানতেন না। ওষুধে কোন ফল হ'ল না দেখে ভৈরব রায় একটু বেশীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন বাড়ীর লোক একটু বেশীরকম অস্থির হয়ে উঠল। রোগিণী ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগলেন, ডাক্তার একটু ভয় পেয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ একদিন পাড়ার সকলে একটা পাগলাকে ঐ বাড়ীটার চারধারে ঘুরে বেড়াতে দেখলে। আমার স্ত্রী একদিন আমায় ডেকে বল্লে "হ্যাগা, ওকে ও বাড়ীর অপ্রকাশের মতন অনেকটা দেখতে নয়; ঠিক্ সেই লম্বা মুখ, ভাসা ভাসা চোক্।" আমার তখন হুঁস হল, হাঁ তাইতো এ যে আমাদের অপ্রকাশই! একদিন তাকে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে এলুম; ঘরের মধ্যে ঢুকে আমায় একলা দেখে তার চোক্ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল। আর তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। সে আবার আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। এই রকমে দিন দশেক কেটে গেল। তারপর সেদিন যখন ডাক্তারদের মোটার ও গাড়ীতে ভৈরব রায়ের বাড়ীর সুমুখটা ছেয়ে গেছে—দরোয়ান ঝি চাকর সকলেই ব্যস্ত—কেউ ডাক্তারখানায় ছুটছে কেউ গরম জল করছে ইত্যাদি—সেই সুযোগে ফাঁক পেয়ে পাগল আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে একেবারে মার ঘরের জানালার গোড়ায় গিয়ে উপস্থিত। মার চোক্ যেই পাগলের মুখে পড়েছে অমনি পাগল একেবারে মার বুকের উপর গিয়ে মুখ লুকোল। ডাক্তার বৈদ্য সকলেই স্তম্ভিত—একে! কেবল ভৈরব রায় নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মতন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কারণ এ যে কে তা তিনি খুব ভালই জানতেন। পরে যখন সকলে পাগলকে সরিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তখন তিনি বাধা দিয়ে পাগল ছাড়া আর সকলকে ঘর থেকে চলে যেতে বল্লেন। সকলে যখন অবাক্ হয়ে পাশের ঘরে গেলেন—

তখন ছেলে মার গলাটি জড়িয়ে, মার রোগশীর্ণ মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে চেপে ফোঁপাচ্ছে—তারপর ভৈরব রায় যখন গিয়ে এই মিলনস্থলে দাঁড়ালেন তখন কে যেন টেনে তার হাত পা দুখানাকে পাগলের দিকে নিয়ে গেল। তিনি গিয়ে পাগলের গায়ে হাত দিয়ে দেখেন শক্ত—তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে দেখেন সাধ্বী এত সুখ সইতে না পেরে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছেন—তার হাত পা হিম্ হয়ে গিয়েছে আর অপ্রকাশ ও অসাড় হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার পরে নাড়ী দেখে বুঝলেন তার প্রাণ আছে। ডাক্তারেরা তার মার দিকে আর না চেয়ে যাতে অপ্রকাশের জ্ঞান সঞ্চার হয় তারই চেষ্টা করতে লাগলেন। খানিক্ পরে সে একবার চেয়ে মার কাগজের মতন সাদা মুখখানা দেখে যে চোক্ বুঝল তা আর খুলল না। আর আজ ঝি চাকরদের কান্নাই জানিয়ে দিয়ে গেল যে হতভাগ্যার সকল যন্ত্রনার অবসান হয়েছে।

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

পঞ্চামৃত

ধান্যের ফলন-বৃদ্ধির উপায়।

উৎকৃষ্ট বীজ, সার, এবং জল—ধান্যের ফলন প্রধানতঃ এই তিনটির উপরই অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। এতন্মধ্যে জলের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাছাই করা উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিতে পারিলে ধান্যের ফলন কিছু বাড়ে; তারপর মৃত্তিকায় আবশ্যকানুরূপ সার প্রদান করিতে পারিলে, ধান্যের ফলন আরও কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু জলসেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই ধান্যের ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়; ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত। (১) আমাদের দেশের নদ-নদীগুলি নানাকারণে চড় পড়িয়া 'ভরাট' হইয়া উঠিতেছে, এবং খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়গুলিও 'হাজিয়া-মজিয়া' যাইতেছে; (২) দেশে অরণ্যের সংখ্যা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে; এবং (৩) এক্ষণে আর পূর্ব্বের ন্যায় যথাসময়ে যথোচিত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না,—প্রধানতঃ, এই তিনটি কারণেই আমাদের বাঙ্গালার মৃত্তিকা ক্রমেই নীরস হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ নীরস মৃত্তিকা জলসেচনে সরস রাখিতে না পারিলে, তাহাতে আশানুরূপ ধান্য জন্মিতে পারে না। সারপ্রয়োগে সকল শস্যেরই ফলন অত্যাধিকরূপে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কারণ উহাদের ফলনের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। কিন্তু ধান্যসম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না;—ধান্যের ফলনের একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। পৃথিবীতে এমন কোনও সার আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা ব্যবহার করিলে ধান্যের ফলন সীমা অতিক্রম করিবে। ধান্যের ফলন কমিয়া গেলে, সার-প্রয়োগে ফলনের পরিমাণ আংশিক বর্দ্ধিত হইতে পারে মাত্র। ধান্যের ফলন-বৃদ্ধির পক্ষে, বর্ত্তমানসময়ে আমাদের দেশে, সার-ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক হইয়াই পড়িয়াছে; কিন্তু তদপেক্ষাও জলের আবশ্যকতা অধিক। জলসেচনের সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে, ধান্যের যথোচিত ফলনবৃদ্ধির আশা সম্ভবপর নহে। ধান্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাদৌ জলসেচনের সুবন্দোবস্ত এবং তৎপর সার ও বাছাইকরা উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে।

কৃষি-ঋষি পরাশর বলিয়াছেন—"বৃষ্টিমূলা কৃষিঃ সর্ব্বা," অর্থাৎ বৃষ্টিই কৃষি-কার্য্যের মূল। এখানে কৃষি বলিতে প্রধানতঃ ধান্য-কৃষিই বুঝিতে হইবে। কৃষি-কার্য্যে পারদর্শিনী বিদুষী খনার মতে,—

"আগে বেঁধে দিবে আলি।
তাতে র'য়ে দিবে শালি॥"

অর্থাৎ শালি-ধান্যের ফলনবৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। আলি বা আইল না বাঁধিলে ধান্যক্ষেত্র হইতে সহজেই বৃষ্টির জল বাহির হইয়া যায়;

সুতরাং উক্ত প্রয়োজন সম্যক্‌রূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই শালি-ধান্য রোপণ করিবার পূর্ব্বেই, ধান্যক্ষেত্রে আলি বাঁধিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। খনা আরও বলিয়াছেন :—

"দিনে রোদ রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল॥"
"বৈশাখের প্রথম জলে।
আশুধান দ্বিগুণ ফলে॥"

খনার মতে, শালি বা হৈমন্তিক (আমন) এবং আউশ—এই দ্বিবিধপ্রকার ধানের পক্ষেই বৃষ্টির জল অত্যাবশ্যক; তাহা উদ্ধৃত তিনটি শ্লোক পাঠেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমানসময়ে যথাসময়ে যথোচিত পরিমাণে বৃষ্টি হয় না বলিয়াই, ধান্যের ফলনবৃদ্ধির পক্ষে, জলসেচন অত্যাবশ্যক হইয়াই পড়িয়াছে।

"জমি-লক্ষ্মী

মাতার কাছে ছোট ছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরা তেমনি বরাবর আবদার করিয়া আসিয়াছি। কত হাজার বছর ধরিয়া এই মাটি আমাদের দাবী মিটাইয়া আসিয়াছে। আর যাহাই হউক আমরা কখনো অন্নের অভাব অনুভব করি নাই, কিন্তু আজকাল যেন আমাদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে। মাটি আমাদের এখনকার দিনের সকল আবদার মিটাইতে পারিল না বলিয়া, মাটির উপরে আমাদের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

কিছুকাল হইল বোলপুরের কাছে একগ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এক চাষী-গৃহস্থের বাড়ীতে যাইতেই সে আমাদিগকে বসিবার আসন দিল। নানা কথার পরে সে অনুরোধ করিল যে, অন্ততঃ তাহার একটি ছেলেকে আমাদের বিদ্যালয়ে চাকরী দিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ত চাষের কাজ আছে, তবে অমন জোয়ান ছেলেকে সাত-আট টাকা মাহিনায় অন্য কাজে কেন পাঠাইতে চাও?" সে বলিল—"হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, চাষে আমাদের কুলায় না। একদিন ছিল—যখন ইহাতেই আমাদের অভাব স্বচ্ছন্দে মিটিত, কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে।"

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে চাষী ঠিকমত করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিত না। কিন্তু আসল কথা, একদিন এমন ছিল, যখন খাদ্য যেখানে উৎপন্ন হইত সেইখানকার প্রয়োজনেই তাহার খরচ হইত। তখন দেশে রেলের রাস্তা খোলে নাই। গরুর গাড়ি এবং নৌকার যোগে বেশী পরিমাণ ফসল বেশী দূরে সহজে যাইতে পারিত না। তার পরে পৃথিবীর দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ এমন বহু বিস্তৃত ছিল না, সুতরাং তখন মাল চালানের পথও ছিল সঙ্কীর্ণ, মাল কিনিবার লোকও ছিল অল্প। তাই মাটির কাছে আমাদের দাবী বেশী ছিল না, আর সেই দাবী মিটাইবার আয়োজনও সহজ ছিল। তখন চাষ চলিত না এমন বিস্তর জমি দেশে পড়িয়া থাকিত। আমারই বয়সে দেখিয়াছি একদিন যে জমি চাষীকে গছাইয়া দিলে সে সেটাকে অত্যাচার মনে করিত, এখন সেই জমি দাম দিয়া মেলে না। তখন দুর্ভিক্ষের দিনে চাষী আপন জমিজমা ফেলিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইত, প্রজা পত্তন করা কঠিন হইত। এখন চাষী প্রাণপণে জমি আঁকড়িয়া থাকে, কেননা জমির দাম বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে।

অথচ চাষী বলিতেছে, জমিতে তাহার অভাব মিটে না। তাহার একটা মস্ত কারণ এই যে, চাষীর অভাব অনেক বাড়িয়া গেছে। ছাতা জুতা কাপড় আসবাব তাহার দ্বারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বুঝিয়াছে সেগুলি নইলে নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশের খরিদ্দার আসিয়া তাহার দ্বারে ঘা দিয়াছে। তাহার ফসল জাহাজ বোঝাই হইয়া সমুদ্রপারে চলিয়া যাইতেছে। তাই, দেশে চাষের জমি পড়িয়া থাকা অসম্ভব হইয়াছে অথচ সমস্ত জমি চষিয়াও সমস্ত প্রয়োজন মিটিতেছে না।

জমিও পড়িয়া রহিল না, ফসলেরও দর বাড়িয়া চলিল অথচ সম্বৎসর দুইবেলা পেট ভরিবার মত খাবার জোটে না, আর চাষী ঋণে ডুবিয়া থাকে, ইহার কারণ কি ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এমন কেন হয়,—যখনি দুর্ব্বৎসর আসে অমনি দেখা যায় কাহারো ঘরে উদ্বৃত্ত কিছুই নাই,—কেন এক ফসল নষ্ট হইলেই আর এক ফসল না ওঠা পর্য্যন্ত হাহাকারের অন্ত থাকে না?

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন মাটির উপরে আমাদের দাবী সামান্য ছিল, যখন অল্প ফসল পাইলেই আমাদের পক্ষে হইত, তখনো যে নিয়মে চাষবাস চলিত এখনো সেই নিয়মেই চলিতেছে, প্রয়োজন অনেক বেশী হইয়াছে অথচ প্রণালী সমানই আছে। জমি যখন বিস্তর পড়িয়া থাকিত তখন একই জমিতে প্রতি বৎসরে চাষ দিবার দরকার ছিল না, জমি বদল করিয়া জমির তেজ অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ ছিল। এখন কোনো জমি পড়িয়া থাকিতে পায় না। অথচ চাষের প্রণালী যেমন ছিল তেমনিই আছে।

চাষের গরু সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। যখন দেশে পোড়ো জমির অভাব ছিল না, তখন চরিয়া খাইয়া গরু সহজেই সুস্থ সবল থাকিত। আজ প্রায় সকল জমি চষিয়া ফেলা হইল; রাস্তার পাশে, আলের উপরে যেটুকু ঘাস জন্মে, সেইটুকু মাত্র গোরুর ভাগ্যে জোটে অথচ তাহার আহারের বরাদ্দ পূর্ব্বাপর প্রায় সমানই আছে। ইহাতে জমিও নিস্তেজ হইতেছে গোরুও নিস্তেজ হইতেছে এবং গোরুর কাছ হইতে যে সার পাওয়া যায় তাহাও নিস্তেজ হইতেছে।

মনে কর কোনো গৃহস্থের যদি গৃহস্থালির প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় চাল-ডালের বাঁধা বরাদ্দ অনেকদিন হইতে ঠিক সমানভাবে চলিয়া আসে, অথচ ইতিমধ্যে বৎসরে বৎসরে পরিবারের জনসংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে পূর্ব্বে ঠাকুর-দাদা এবং ঠাকরুণদিদি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাতি-নাৎনিদের তেমন চেহারা আর থাকিবে না, ইহাদের হাড় বাহির হইয়া যাইবে, বাড়িবার মধ্যে লিভারপিলে বাড়িয়া উঠিবে। তখন দৈবকে কিম্বা কলিকালকে দোষ দিলে চলিবে কেন? ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল আরও বেশী বাহির করিতে হইবে।

আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার বেশী পাইব কি করিয়া? এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্ব্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে বেশী করিয়া ফলাইতে হইবে—নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতেই যে আমাদের দেশের মোটা চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মুর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। বড় বড় কলেজে এই বিদ্যার আলোচনা চলিতেছে, সেই আলোচনার ফলে ফসলের এত উন্নতি হইতেছে যে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না।

তাই বলিতেছি, গ্রামটুকুকে ফসল যোগান দিতাম যে প্রণালীতে, সমস্ত পৃথিবীকে ফসল যোগান দিতে হইলে সে প্রণালী খাটিবে না। কেহ কেহ এমন কথা মনে করেন যে, আগেকার মতন ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্যই খাটানো ভাল, ইহা বাহিরে চালান দেওয়া উচিত নহে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ করিয়া, 'একঘরে' হইয়া, দুইবেলা দুইমুঠা ভাত বেশী করিয়া খাইয়া নিদ্রা দিলেই ত আমাদের চলিবে না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে দেনাপাওনা করিয়া তবে আমরা মানুষ হইতে পারিব। যে জাতি তাহা না করিবে বর্ত্তমানকালে সে টিকিতে পারিবে না। আমাদের ধনধান্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, জ্ঞানধ্যান সমস্তই আজ বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে যোগসাধনের উপযোগী করিতেই হইবে; যাহা কেবলমাত্র আমাদের নিজের ঘরে নিজের গ্রামে চলিবে তাহা চলিবেই না। সমস্ত পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া হাঁক দিয়াছে, 'অয়মহং ভো'। তাহাকে সাড়া না দিলে শাপ লাগিবে, কেহ আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। প্রাচীনকালের গ্রাম্যতার গণ্ডীর মধ্যে আর আমাদের ফিরিবার রাস্তা নাই।

তাই আমাদের দেশের চাষের ক্ষেত্রের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়, সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে বিদ্যার সঙ্গে

অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হওয়া চাই। বস্তুতঃ লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীকে না মিলাইয়া দিলে আজকালকার দিনে ভূমি-লক্ষ্মীর যথার্থ সাধনা হইতে পারিবে না। * * কৃষিতত্ত্ব-প্রচারের উদ্যোগী ব্যক্তিদিগের শুভ দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা-দেশের জেলায় জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া দেশের কৃষিক্ষেত্র এবং চিত্তক্ষেত্রকে এককালে সফল করিয়া তুলুক

"নববর্ষ।"

আজ নববৎসরের নবোদিত সূর্য্য আমাদের কাছে তার অভিবাদন পাঠিয়েছে। সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে এবং অতিক্রম করে একটি আনন্দ পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে। পৃথিবীর সমস্ত তৃণে তৃণে, গাছে পালায়, পাখীর কণ্ঠে কণ্ঠে, জীবনবীণার সমস্ত তারে তারে সাড়া উঠেছে। সেই আনন্দ মানুষকেও স্পর্শ করেছে। কিন্তু মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ সাড়া মেলা ত সহজ ব্যাপার নয়। সেই সাড়া যে একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তার জ্ঞান, তার প্রেম, তার শক্তি ত অল্প নয়। তার জাগরণ ত ফুলের পাপ্‌ড়ি খোলা এবং পাখীর পাখা-মেলার মত নয়। প্রভাতের আলোকের মধ্যে যে একটি সহাস্য প্রশ্ন আছে, "ফুল কি ফুটেছে," পৃথিবীর বনে বনে ঘাসে ঘাসে কত রঙে কত গন্ধে তার উত্তর উঠ্‌ল, "হাঁ, ফুটেছে ফুটেছে!" তেমনি করেই একটি জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি লোকালয়ের দ্বারে দ্বারে এই প্রশ্ন তুলেছে, "কে জাগ্‌ল? কে জাগ্‌ল? কোন্ মানুষ জাগ্‌ল?" সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যাস্তে এই দৃষ্টি তার বেদনা নিয়ে যুগে যুগে ফিরে যাচ্ছে, "পরিপূর্ণ মানুষ জাগ্‌ল না।" সেই পরিপূর্ণ মানুষের জাগ্রত দৃষ্টিই আকাশের চির নবীন আলোকের প্রত্যুত্তর।

এই পূর্ণ মানুষটি যে আছে, এ যে বিশ্বের চিরপ্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করবে না, মানুষের ইতিহাসে সেই আশা কি কথনো সফল হয়ে দেখা দেয় নি? দিয়েচে বৈ কি? মাঝে মাঝে মানুষের পরমা শক্তির পরম প্রেমের জাগ্রত রূপ আমরা যে দেখেছি। আমরা দেখেছি মানুষ কি আনন্দে দুঃখকে বরণ করেচে, মৃত্যুকে স্বীকার করেচে। মানুষ তার সমস্ত সুখসম্পদকে বিসর্জ্জন করে আপন পূর্ণতাকে কি বিশুদ্ধ করেই দেখিয়েচে। মানুষের মধ্যে যখন এই পূর্ণতার উদ্বোধন হয় তখন সে ত একদিন ফুটে তার পরের দিন ঝরে পড়ে না। এর বাণী অমর হয়ে রইল; এর শক্তি যুগের পর যুগ নূতন নূতন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বিস্তীর্ণ হয়ে চল্‌ল। এখন থেকে সে চিরদিনই মহাকালের ললাটে ধ্রুবতারার মত, পথিকমানুষকে তার পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে, নির্নিমেষ হয়ে রইল, যে পথ মানুষের স্বার্থ এবং নিজের সঙ্কীর্ণ সুখদুঃখের বক্ষ ভেদ করে অমৃতলোকের দিকে চলে গিয়েচে।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই পরিপূর্ণ মানুষটি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েচে! নববর্ষের আলোকের মধ্যে যখন তার সন্ধান জেগে উঠ্‌ল তখন কি আমাদের অন্ত-রুদ্ধ সেই বন্দী-আত্মার বেদনা আমরা অনুভব করব না? তখনো কি আমাদের এই সংসারের, এই মৃত্যুলোকের প্রতিদিনের তুচ্ছতাকেই একান্ত করে দেখব? আমাদের পদ্মবীজ কেবল কি তার পঙ্ককেই জান্‌বে, আর মুক্ত আকাশে সূর্য্যালোকে বিকাশোৎসুক তার ফুলটিকে ইচ্ছাও করবে না?

বিশ্বব্যাপী আনন্দের সঙ্গে আমাদের আত্মার আনন্দ সম্মিলিত হবে, এই জন্যেই ত ইতিহাসে দেখ্‌তে পাচ্ছি নানা রকমে মানুষ আপনার জ্ঞানকে প্রেমকে কর্ম্মকে এই বিরাট বিশ্বের অভিমুখে কেবলই বৃহত্তর করে উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করচে। তার সমস্ত বিপ্লব রক্তপাত সমস্ত সমৃদ্ধি ও পতনের মধ্যে এই চেষ্টারই জয়-পরাজয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশ হচ্চে। সেই বিরাটের সঙ্গে মানবাত্মার পূর্ণ সামঞ্জস্যে বাধা দিচ্চে কিসে? মানুষের স্বার্থ মানুষের অহঙ্কার! যতই মানুষ আপন লক্ষ্যকে ভুলে আপন স্বার্থকে আপন অহঙ্কারকেই একান্ত করে তুল্‌চে ততই বারে বারে সেই স্বার্থে সেই অহঙ্কারে ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী রক্তাক্ত হয়ে উঠচে। ততই যুগে যুগে কোটি কোটি মানুষ ঝোড়ো হাওয়ার মুখে গাছভরা আমের বোলের মত অকৃতার্থ হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্চে। এই যে আমার সামনে ঐ বালকগুলি বসে আছে ওদের প্রত্যেকেরই মধ্যে যে অসীমকালের আকাঙ্ক্ষার ধন নিহিত হয়ে রয়েছে—তার কি আশ্চর্য্য

শক্তি, কি অসীম মূল্য! কিন্তু সেই ধনের জন্যে চারিদিকের সমাজে দাবী জাগেনি—তাই সেই অপরিসীম সম্পদ প্রচ্ছন্ন রেখেই এমন কত মানুষ আপনাকে কি দীনতার মধ্যে বিলুপ্ত করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বিধাতার বর বহন করে এই যে শিশুরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীতে আসচে এদের সামনে মানুষের আকাঙ্ক্ষা কত ছোট হয়ে কি ছোট অঞ্জলিই পেতে ধরেছে। তাই ত এরা ভুলে গেল যে এরা অমৃতস্য পুত্রাঃ।

কেবল মানুষের সীমানার মধ্যেই মানুষ আপন পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকে আবদ্ধ রেখেচে, এইটেই আমরা অন্যান্য দেশে দেখতে পাই। কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সীমানা ছাড়িয়ে যেতে চেয়েচে। ভারতবর্ষ বলে, মানুষ এই বিশ্বের মধ্যে জন্মে' তাকে আপন চৈতন্যের দ্বারা উদ্ভাসিত করে জানবার জন্য ইচ্ছা করেচে, এবং সেই জানাই তার নিজেকে বড় করে জানা এটা যে সত্য কথা। মানুষের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি নিতান্ত কেবল একটা বাহুল্য জিনিষ হত তাহলে তার ইন্দ্রিয় এবং মন একেবারে একে দেখতে ও জানতেই পারত না। কিন্তু গ্রহনক্ষত্র নিয়ে বিশ্ব এই যে মানুষকে ঘিরে রয়েছে মানুষের আত্মার সঙ্গে তার গভীর যোগ আছে বলেই সে এমন করে প্রকাশমান। তাই ভারতবর্ষ বলচে, কাছে ও দূরে যা-কিছু মানুষের ইন্দ্রিয় ও মনের গোচরে আছে আত্মার দ্বারা তার সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হলে তবেই আত্মার ধর্ম্ম বিশ্বের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে। বিশ্বের অধিকারকে সকল দিকে ছেঁটে ফেলে কেবল একটা কোন ছোট গর্ত্তের মধ্যে জীর্ণ হয়ে অন্ধ হয়ে বদ্ধ হয়ে থাকা আত্মার ধর্ম্ম নয়, সে কথা সমস্ত বিশ্ব তাকে বলচে। সে যদি কেবল আপন ছোট সংসারের কীট হত, তাহলে ছোট সংসার তাকে একেবারে নিঃশেষে পরিপাক করে ফেলত। কিন্তু তার জানালা খুলে যায়, সে বাইরের দিকে তাকায়, আর কিসের জন্যে তার মন কেমন করে। মন এমনই করে, যে, যা কিছুকে সে সুখ ও ঐশ্বর্য্য বলে জানে সে সমস্ত ফেলে দিয়ে তার বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। তখন সে বলে, সুখের চেয়ে মুক্তি বড়। সেই মুক্তি যাতে আপনার থেকে মুক্তি—যাতে বিরাটের মধ্যে অনন্তের সঙ্গে মিলন। তখন সে বলে, "আমার প্রবৃত্তি যত প্রবল হোক, আসক্তি যত দৃঢ় হোক, আমার পক্ষে এরাই সত্য নয়। আমার পক্ষে সত্য যিনি তিনি ভূমা। এইজন্যে তিনি আমার কাছ থেকে কোনো অংশ চান না, তিনি আমার সমস্তকে চান; কোনো পূজার উপকরণ কোনো মন্ত্র নয়, আমার বিশ্বকে পূর্ণ করে যে আমি, সেই পরিপূর্ণ আমাকে চান। তিনি বলচেন, "তোমার ক্ষুদ্র বাসনার দরজা খোলো; আমি যে বিরাট মন্দিরে বসেছি, সেইখানে তোমার স্থান আমার পাশে।" ঐ স্থানটি আমরা পাব, আমাদের আশ্রম এই কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিক। বড় বড় রাজ্য-সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারের বাইরে দিয়ে যে পথ গিয়েচে সেই পথ দিয়েই আমরা নির্ভয়ে চল্লুম। সংসারের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ, বিশ্বের পথ, ধনমানের পথ আমাদের নয়, আমাদের পথ মুক্তির পথ। সেই পথে তুমি অসত্য থেকে আমাদের সত্যে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে।

বিশ্বভারতী।

আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কি, হওয়া উচিত সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মটুকু এখানে বলি।

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড় করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড় বড় শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ ভারতবর্ষের যে-মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে-মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে-শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মত গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্য্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎস-ধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণে আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মত পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র তাহার কৃষিতত্ত্ব তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবন-যাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে, এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র, শিক্ষক ও চারিদিকে অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি "বিশ্বভারতী" নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্রবাসী। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্গীয় সমবায়-সমিতি।

বিগত ১৯১৭-১৮ সালের ৩০শে জুন যে সরকারী বর্ষ শেষ হইয়াছে, ঐ বৎসরের বঙ্গীয় সমবায়-সমিতিসমূহের (Co-operative societies of Bengal) কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহার স্থূলমর্ম্ম প্রদত্ত হইল :—

বঙ্গের সমবায় সমিতি-সংখ্যা—৩৬৪৩

সমবায়-সমিতির সভ্যসংখ্যা—১,৩২,৯৮৬

মোট মূলধন—১ কোটি ১৯ লক্ষ মুদ্রা।

আলোচ্য বর্ষে কো-অপরেটিভ কার্য্যে অভিজ্ঞ তিনজন ডেপুটি কলেক্টরকে রেজিষ্ট্রারের সাহায্যার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এলাকা মধ্যে উক্ত ডেপুটী কলেক্টরগণ

রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, উহা পরিচালনা করিয়াছেন। ইনস্পেক্টারের সংখ্যা ২২ জনের স্থলে বর্ত্তমান বর্ষে ৪১ জন হইয়াছে। সমবায়-সমিতি সমূহের হিসাব পরীক্ষার জন্ম একজন প্রধান হিসাব-পরীক্ষক আছেন। প্রধান পরীক্ষকের বেতন আংশিকভাবে এবং অপর হিসাবপরীক্ষকদের বেতন পূর্ণভাবে সমিতিসমূহ বহন করেন।

আলোচ্য বর্ষে পাট ও ধান উভয়েরই সুফসল হইয়াছিল; কিন্তু রপ্তানির অভাবে মূল্য একান্ত হ্রাস হওয়ায় কৃষকদিগের ক্লেশ হইয়াছিল। সমবায়-সমিতিসমূহ কৃষকদিগকে ঋণদান করিয়াছিল। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সকল ১৮ লক্ষ টাকা ঋণদান করে; এবং ১০৮০ লক্ষ টাকা আদায় করে। তৎপূর্ব্ব বৎসরে ২৬৷৷০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। এবং ১৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হইয়াছিল। কৃষি-সমিতি-সমূহও ২৩৮০ লক্ষ টাকা ঋণদান করে, এবং ১৫।০ লক্ষ টাকা আদায় করে। ওয়াদ্দা খেলাপী ঋণের পরিমাণ ১৭ হইতে ২৮ লক্ষে উঠিয়াছে। পাটের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এবং তাহারা ঋণ শোধ করিতে সমর্থ হইতেছে।

প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক বা কো-অপারেটিভ-সঙ্ঘ ১৯১৮ সালের ১লা জুন স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য এই যে, এই ব্যাঙ্কভুক্ত সোসাইটি সকল এলাকার বাহির হইতেও অর্থ প্রাপ্ত হউক। উক্ত প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার পরে তিন মাসমধ্যেই ৫২টা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কমধ্যে ২৮টাই ব্যাঙ্ক-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ইতঃপূর্ব্বে কোনও বিশেষ স্থলের ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহারা সঙ্ঘের নূতন বিধির বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ফলে, ২০ লক্ষ আমানতী টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষই অপেক্ষাকৃত অল্পসুদে স্থানান্তরিত হইয়াছে!

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ৪৭টি ছিল; আলোচ্য বর্ষে ৫২টি হইয়াছে। উহাদের মূলধনও ৫৯ লক্ষ হইতে ৬৭৷৷০ লক্ষে উঠিয়াছে। অংশীদারদের চাঁদা ১০ লক্ষ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। ১১টা ব্যাঙ্কে বেতনগ্রাহী সেক্রেটারী বা সহকারী সেক্রেটারী আছেন।

১৯১৬-১৭ সালে কৃষি-সমিতির সংখ্যা ২[illegible]৭ ছিল, আলোচ্য বর্ষে ৩৩৭৪টি হইয়াছে। সভ্যসংখ্যা বর্ত্তমানে ১,২৫,৫৯০ জন; এবং মূলধন ৮০৷৷০ লক্ষ টাকা। পরিদর্শক কর্ম্মচারী বৃদ্ধি হওয়াতে সম্পাদকগণের দুষ্কার্য্য অনেক নিবারিত হইয়াছে। এদেশে এক্ষণে ৪০০টি এমন সমিতি আছে, যে গুলিকে ঠিক কৃষি-সমিতি বলা যায় না। ঐ সকল সমিতি কৃষি-সমিতিতে পরিণত না হইলে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

কৃষি-সমিতি ভিন্ন কতকগুলি বয়ন-সমিতি আছে। উহাদের সংখ্যা ৩৪ হইতে ৬৫ হইয়াছে। ধীবর-সমিতির সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়াছে;—১৬ হইতে ২৫এ উঠিয়াছে। ইহা প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে যে, মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা উভয়ই সমবায়ের রীতি অনুসারে করা যাইতে পারে।

সমবায়ের প্রতি লোকসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতি হইতে কো-অপারেটিভ জর্ণেল এবং একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে। একটি লাইব্রেরীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং লোকশিক্ষার জন্য বক্তৃতা-প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মদন বন্দনা

মদন ঠাকুর তোমার পায়ে হাজার নমস্কার,
অন্ধ তোমার দৃষ্টি চমৎকার।
কন্দর্প যে চলে তাহার নাইকো ঠিকানা,
বিশ্ব তোমার আঁখির সীমানা।
ইন্দ্র শুধু হাজার চোখে চায়,
তোমার চোখের অন্ত কেবা পায়?
ঠাকুর, তোমায় মেনে চলে সপ্ত লোকের লোক,
হৃদয়—তোমার তারই পরে রোখ্।
একটি আঁখির ইঙ্গিতেই চিত্ত বিজয় কর,
কোন্ দেবতা তোমার চেয়ে বড়?
তোমার তূণে ফুলের কটিবান,
অব্যর্থ তার অমোঘ সন্ধান।
খোম্-খেয়ালে চল তুমি পরম খেয়ালী,
চলন তোমার নিরেট হেঁয়ালী।
ঘোড় সোয়ারের মনের সাথে ছোটে তোমার ঘোড়া,
দীপ্ত তুমি বিদ্যুতেরি ছোরা।
মায়ার জালে বোনা তোমার জাল,
তারই মাঝে কাঁপছে চিরকাল।
আদিম ভোরে ছিলে তুমি নাইকো সন্দেহ,
তবু তোমার চির তরুণ দেহ।
রামধনুকের রঙ দিয়ে গো তোমার তনু গড়া,
তুমি অরূপ রূপের পশরা।

ফাগুন লোটায় তোমার পথে পথে,
ঘুরে বেড়াও যৌবনেরি রথে।
তোমার পথে পুষ্প আছে কাঁটাও আছে মেলা,
দুরন্ত সে জানি তোমার খেলা।
লজ্জা বিহীন নগ্ন দেহ নাইকো অঞ্চল,
রূপে রসে সদাই চঞ্চল।
অস্ত্র তোমার সুরা এবং সাকী,
মনের মদে ঝাপ্‌সা রাখ আঁখি।
শিব তোমারে দগ্ধকরে' পাননি পরিত্রাণ,
ফিরিয়ে ফের্ দিতেই হ'ল প্রাণ।
বৃন্দাবনের বনের মাঝে লক্ষ লীলাতে,
দাগ ফেলেছ মনের শিলাতে।
চির জয়ীর মাল্য তোমার গলে,
নিলয় তোমার মনের অতলে।
তোমার বানের দুঃখ কত নাই সে অজানা,
এড়াতে তবু চাইনে নিশানা।
লাঞ্ছনা সে চিত্ত আমার সইতে রাজি আছে,
প্রসাদ যদি থাকে তাহার পাছে।
ঠাকুর তোমার প্রণাম করি পায়,
আবার প্রণাম—প্রণাম পুনরায়।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

———

কাব্যে বিপত্তি

(গল্প)

আমার আজকাল বেশ নাম হইয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকলেখিকাদের মধ্যে আমার সুউচ্চ যশো-সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রগুলি আমার লেখা বক্ষে ধারণ করিতে পাইলে গৌরবান্বিত মনে করে। বঙ্গভাষার লেখিকাদের মধ্যে আমিই আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—এরূপ কথাও শুনিতে এবং দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং আমার প্রকৃত নাম বলিলে আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবেন—সেই ভয়ে আমার আসল নাম গোপন করিয়া একটি কল্পিত নাম আমি এই গল্পে ব্যবহার করিব। আশা করি আমার এই গোপনতার জন্য আপনারা কেহ কোনও দোষ লইবেন না।

কিন্তু আর কিছুই আমি গোপন করিব না—সকল কথাই আজ অকপটে আপনাদেরকে শুনাইয়া দিব। আজ আমি পুত্রপৌত্রাদি লইয়া বৃদ্ধত্বের শেষসীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। যৌবনের নবীন প্রেমকাহিনী যে আমার নিকট সুমিষ্টতর হইয়া অতীতের সেই পুরাতন স্নিগ্ধহাস্যোজ্জ্বল স্মৃতির সৌরভ বহন করিয়া আনিয়া—আজ এই বসন্তপ্রভাতে আমার শুভ্রকেশমণ্ডিত জীর্ণ মস্তিষ্কে এই গল্পটি লিখিবার অদ্ভুত খেয়াল জাগাইয়া তুলিবে—তাহা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার নিজের কাব্য যে নির্লজ্জ বেহায়ার মত আমি নিজেই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এই কথাটা ভাবিয়া সকালবেলা হইতেই আমার ভারি হাসি পাইতেছে।

যাক্—আর না—এইবার গল্পটা আরম্ভ করি।

ধরুণ, আমার নাম শ্রীমতী জীবনবালা দেবী। হাসিবেন না, যখন আমি প্রেমে পড়িয়াছিলাম—তখন আমার বয়স সতের। আমার পিতামাতা ছিলেন ব্রাহ্মপ্রকৃতির—তার উপর আমার পিতা রাজসরকারে খুব বড়দরের একটা কাজ করিতেন—মাসে মাসে সাড়ে তিনশো টাকা করিয়া মাহিনা পাইতেন। সুতরাং ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হইয়া অন্যের চেয়ে অনেক বেশিদিন পর্য্যন্ত আমি আদর যত্ন ভোগ করিয়াছিলাম। দাদারা বলিতেন—জীবু তোর আদর আব্দার দেখে আমাদের মনে হয় যে যদি তুই হয়ে জন্মাতে পেতাম।

বাবা খুব যত্ন করিয়া আমার লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বাবা নিজে আমাকে সংস্কৃত পড়াইতেন। একজন মাষ্টার ছিল, সে ইংরাজি পড়াইত—মেজদাদা অঙ্ক কষাইতেন। বড় দাদার উপর আমাকে বাংলা পড়াইবার ভার ছিল—কিন্তু বড় দাদা কবি মানুষ—তিনি বড় একটা আমাদের সঙ্গে মিশিতেন না। কাজেই বাংলা পড়িবার ভারটা আমি নিজে নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং নিজেই দোকানে যাইয়া প্রায়ই নিজের পছন্দমত রাশি রাশি বাংলা বই কিনিয়া আনিতাম।

সেগুলি যে সবই উপন্যাস, গল্প ও কবিতার বই সে কথা বলাই বাহুল্য। আমার অন্য পড়া যত অগ্রসর হউক আর না হউক বাংলা পড়াটা খুব পুরাদমেই অগ্রসর হইতেছিল। তাহা ব্যতীত বড় দাদা ছোট বড় অনেক কাগজেই নিয়মিত ভাবে কবিতা পাঠাইতেন—ফলে অনেক-গুলি মাসিকপত্র নিয়তই বড় দাদার টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখিতাম। আমি সেগুলি লুকাইয়া লুকাইয়া আনিয়া পড়িতাম—আবার সেইরূপ চুপি চুপি গোপনে রাখিয়া দিয়া আসিতাম।

কিরূপ ভাবে আস্তে আস্তে যে আমি একজন শ্রেষ্ঠা লেখিকা হইয়া উঠিলাম তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কোনও আবশ্যক দেখি না। এইটুকু বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে সমস্ত বাড়ীর মধ্যে সব চাইতে বেশি ভক্তি করিতাম আমি বড় দাদাকে—আর পৃথিবীর মধ্যে সেই শ্রেণীর লোককে আমি সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতাম যাঁহাদের লেখা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইত। বড় বড় লেখকেরা যে কোন্

শ্রেণীর জীব, তাঁহারা কি রকম ভাবে হাঁটেন, কি রকম ভাবে দাঁড়ান, কি রকম ভাবে কথা বলেন, কি রকম ভাবে যান্—কি খান, কি করেন এই সব বিষয় জানিবার জন্য প্রথম প্রথম মনের ভিতর একটা দুর্নিবার কৌতূহল উপস্থিত হইত। দিন কতক বড় দাদার গতিবিধি সবিশেষ যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সুরু করিয়া দিলাম।

কিন্তু বড় দাদা এতই চুপচাপ, গোপন প্রকৃতির লোক, এত কম কথা বলেন, এত অধিকক্ষণ ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া একেলা থাকেন যে, তাহাতে লেখক শ্রেণীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবৃত্তি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকিত। লেখক শ্রেণীর জীবেরা যে আমার মতই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ—সে কথাটা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ লেখিকাদিগকে কি জানি কেন আমি একটু ঈর্ষার চক্ষে দেখিতাম—অথচ তাঁহাদের উদ্দেশে সম্ভ্রম ও কৌতূহলের মাত্রা খুব বেশি পরিমাণেই ছিল।

চট্ করিয়া একদিন আমার মাথায় খেয়াল চাপিল যে ইচ্ছা করিলে আমিও একজন লেখিকা হইতে পারি। যেই মনে হওয়া, আর যায় কোথায়?—ছোট দাদা ত দেখিয়া শুনিয়া একদিন ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—জীবু, তুই দেখ্‌ছি কাগজের দর বাড়িয়ে দিবি—হঠাৎ লেখাপড়ার দিকে এত বেশি ঝোঁক দেওয়াটা যে কেমন কেমন বলে বোধ হচ্ছে।

আমার জন্য সাদা-কাগজের দর বাড়িয়া গিয়াছিল কিনা জানি না—কিন্তু এটা ঠিক যে আমার ছোট বাক্সটি লেখা-কাগজে ক্রমশঃই ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

দিন কতক লিখিবার আনন্দে খুবই লিখিয়া গেলাম। কিছুদিন পরে তখন প্রকাশ করিবার ঝোঁক চাপিল। বড় দাদাকে দেখিতাম বড় বড় খামের মধ্যে করিয়া কবিতা পাঠাইতে। আমিও আমার লেখা নানা কাগজে পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম—দুটি একটি ছাপা হইতেও লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই ছাপা হইল না। সেগুলি পাইয়া সম্পাদক মহাশয়েরা যে কেন প্রকাশ করিতেন না জানি না। কতক কতক ফেরত আসিত—আবার কতক বা ফেরতও আসিত না। কিন্তু আমার লেখা যতই অপ্রকাশিত হইতে লাগিল—লেখকলেখিকাদের উপর আমার ভক্তি ততই বেশী করিয়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল যে মাসিকপত্রের লেখকলেখিকারা কি কুহক মন্ত্র জানেন যে যাহাতে করিয়া তাঁহাদের লেখা প্রকাশিত হয়।

দুটি একটি লেখা কাগজে ছাপা হইতেই সমস্ত বাড়ীময় রটিয়া গেল যে আমিও একজন লেখিকা হইয়া উঠিতেছি! ইহার পর হইতেই দেখিলাম বড় দাদা আমার সঙ্গে একটু আধটু মিশিতে আরম্ভ করিলেন—আমার সঙ্গে দুই চারিটি কথাও বলিতে আরম্ভ করিলেন। গর্ব্বে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। এতদিনত বাড়ীর সকলের আদর সোহাগই পাইয়া আসিয়াছিলাম—এখন হইতে একটু সম্ভ্রমও পাইতে লাগিলাম।

লেখকলেখিকাদের সম্বন্ধে আমার যে কিরূপ ধারণা ছিল তাহাত বলিলাম। বড় দাদার দেখাদেখি আমিও আমার জীবনটাকে কবিত্বময় করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। লেখার রস না থাকিলেও জীবনে সরসতা আনয়ন করিবার জন্য আমি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। কাব্যজীবনের আদব কায়দাগুলি নকল করিয়া শীঘ্রই অন্ততঃ নকলকবি হইবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা ব্যাকুলচেষ্টা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইহার আশুফল ইহাই দাঁড়াইল যে, আমি আমার যৎসামান্য পুঁজিপত্তর লইয়া একটা নির্জ্জন কোণের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। বড় দাদার মতন আমিও খুব অল্পকথা বলিতে আরম্ভ করিলাম—সুউচ্চ হাস্যটাকে সংযত করিয়া আনিলাম। দিনরাত ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া লেখায় ও জীবনে কাব্যরস সংগ্রহ করিবার জন্য মনে প্রাণে সরস ও সজীব হইতে সচেষ্ট হইলাম।

(২)

ঠিক মনে আছে—সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমা। প্রকৃতির দিগন্তবিস্তৃত বিশাল বক্ষ সুবিমল জ্যোৎস্না ধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া একেবারে ছাপাইয়া পড়িবার যোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই নিবিড় জ্যোৎস্না রাত্রে আমি অবশ

ভাবে আমার ক্লান্ত তনুখানি একখানি সোফার উপর মেলিয়া দিয়া বহিঃপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছিলাম যে প্রকৃতির সুধাভাণ্ড উচ্ছ্বসিত হইয়া দিক ছাইয়া বুঝি একেবারে উল্টাইয়া পড়িয়াছে।

মনের মধ্যে লিখিবার খুব একটা প্রবল ঝোঁক চাপিল। কিন্তু লিখিতে বসিলে একছত্র লেখাও বাহির হইল না। অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবগুলির মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কতকগুলি খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাব [illegible] মনোরঞ্জন রূপ ধরিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে ভয়ঙ্কর জোরে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

কলম ফেলিয়া উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিং-এ ভরদিয়া দাঁড়াইলাম। বাগান হইতে সুরভি-কুসুম-গন্ধ-বাহী একটা মৃদুমন্দ সমীরণ আসিয়া খেলাচ্ছলে আমার খোলাচুলগুলির উপর তাহার মধুময়স্পর্শ জাগ্রত করিয়া তুলিতেছিল। গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া একএকটা জ্যোৎস্নার ধারা যেন অলকনন্দা-মন্দাকিনীর মত বহিয়া যাইতেছিল।

পাশের বাড়ীর ছাদের উপর দেখিলাম একটি গৌরবর্ণ দীর্ঘাকার যুবক, চাঁদের দিকে চক্ষু তুলিয়া একটি পরিস্ফুট পদ্মের মত বুকে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘরের মধ্যে বসিয়া লেখা পড়া করিবার সময় এই যুবকটিকে প্রায়ই আমি দেখিতে পাইতাম। তাহাকেও দিনরাত ঘরের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় কালযাপন করিতে দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল আহা বেচারা নিশ্চয়ই একজন কবি। কবিরা যে নেহাত, বেচারা এই কথাটা এই কবিটিকে দেখিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আমার মনে হইল। আমরা মেয়েছেলেরা না হয় দিনরাত ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি—কিন্তু পুরুষমানুষেও যে তাহা পারে তাহা জানিতাম না। বড়দাদাও ত বাহিরে বেড়াইতে যান্—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। কিন্তু এই যুবক কবিটি—ইহার কি কোনও বন্ধুবান্ধবও নাই? কিজানি কেন আমার সমস্তচিত্ত ইহার জন্য একেবারে বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু তথাপি এই যুবকটিকে চাঁদের পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আমিও তাহার দিকে সসম্ভ্রমে তাকাইয়া রহিলাম। এটাও সেদিন বুঝিলাম যে কবিতালেখাটাও একটা সাধনা। হায় রবিবাবু কি তবে ঠিক লেখেন নাই যে "কাব্য পড়ে যেমন ভাব, কবি তেমন নয়গো। চাঁদের পানে চক্ষুতুলে রয়না পড়ে—", যাক্ তা ঠিকই হউক আর ভুলই হউক এই নবীন কবির উপর আমার কেন একটু ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল—আর রীতিমত কৌতূহলও যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে কথাটাও সত্য।

লোকটি কবি কি না সে সম্বন্ধে আমার একটুও সন্দেহছিল না—সেইজন্যই তাহার প্রতি কৌতূহল খুব বেশি করিয়াই জাগিয়া উঠিতে লাগিল। বড় দাদাকে ছাড়িয়া দিনকতক ইহারই গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কয়েকদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতে করিতে আমিও যে আমার অচেনা কবি বন্ধুটির লক্ষ্যের বস্তু হইয়া উঠিলাম কিজানি কেন এমনি একটা ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইল। বেশ জানিতে পারিলাম যে আমাদের দুজনের নয়নে নয়নে মিলন হইতে লাগিল। কিন্তু আমার নয়নের সহিত তাহার নয়নের মিলন হইলেই আমি সলজ্জ ভাবে চক্ষু অবনমিত করিতাম—কিন্তু আমার কবি বন্ধুটি লজ্জাদ্বিধাশূন্য কি একরকম উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। কিছুদিন লক্ষ্য করা সত্ত্বেও আমার অচেনা নীরব কবি বন্ধুটির সম্বন্ধে কোনও তত্ত্বই আমি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—যাহা পাইলাম তাহাকে কোনওক্রমেই তত্ত্ব বলিতে পারা যায় না—তাহা এই যে আমার এই কবি বন্ধুটি নীরব এবং একটু বেশি রকমেরই উদাসীন।

কিন্তু তাহার সকল প্রকার পরিচয় পাইবার জন্য আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম। ছোট ভাইটিকে দিয়া যতদূর খবর সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহার ক্রটী হইলনা। সে কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে পারিল যে তাহাদের বাড়ীতে একটা ভোজপুরী চাকর আছে আর কিছুই সে বলিতে পারিল না। বাড়ীটিতে যে কেবল ঐদুটি মানুষ ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি ছিলনা সেটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম—কিন্তু আমার অচেনা, অজানা, বেচারী নীরব কবিটির ঐ অতি অকিঞ্চিৎকর, যৎসামান্য পরিচয় কোনও ক্রমেই আমার মনে তৃপ্তি দিতে পারিল না। কি করিব; নিরুপায়ে হতাশভাবে কেবল

বেশিক্ষণ ধরিয়া জানেলাটার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের দুজনের নীরব পরিচয় এই গবাক্ষের ভিতর দিয়াই হইতে লাগিল। সে আমার সম্বন্ধে কি ভাবিত জানিনা—কিন্তু আমি যে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া একটু ভাবিতাম তাহা কি সে জানিতে পারিত না? সে কি আমার এই নীরব গভীর পর্য্যবেক্ষণের কোনও অর্থ ই ধরিতে পারিতনা? আমি যে আমার সমস্ত অন্তরের সহিত তাহাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেছি, সেকি তাহা বুঝিতে পারিতনা -আমার সকল যত্ন, সকল চেষ্টা ঐ নীরব পরম উদাসীন ব্যক্তিটির মনে কি একটুও মোহের সঞ্চার করিতনা? আমার মনে হইত—কি জানি ঠিক কিছুই বুঝিতে পরিতাম না—তবুও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভাবে ধীরে ধীরে কিসের যেন একটা বেদনা মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম না কেন এ বেদনা?

সূর্য্যাস্তের সুবিমল রক্তাভা পশ্চিমদিকের গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেয়ালে অঙ্কিত কনকচাঁপা ও স্বর্ণমঞ্জরীর উপর পড়িয়া তাহার অপূর্ব্ব সোনালি আভা কক্ষপ্রাচীর বিলম্বিত সুবৃহৎ মুকুরে উজ্জ্বলতর ভাবে প্রতিফলিত করিতেছিল। কেমন যেন একটা অবশ ক্লান্তিতে সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া উঠিয়াছিল। তখন রাস্তায় অগণন লোকের ভিড়; সমস্তদিনের কঠোর কর্ম্মাবসানের পর কত লোক ক্লান্ত ধীরপদে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। সমস্ত জগতের হৃদয় আশা ও আনন্দে যেন একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-ময়ী-জগতের প্রত্যেক লোকেরই একটা কিছু আছে—এমন একটা কিছু আছে যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই সুন্দর ধরণীতে সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু আমার কে আছে? মনে হইল যেন আমার কিছুই নাই—আমার কেহই নাই—নাই—নাই—নাই—আমার কিছু নাই—আমার কোনও কাজ নাই, কোনও ইচ্ছা নাই, কোনও আশা নাই, কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই, আমার কিছু পাইতেও ইচ্ছা নাই—কাহাকেও কিছু দিবার ইচ্ছাও নাই—কিছুই নাই। আজ আমি একা—কেবল আমি—আমার কেবল আমি আছে—কিন্তু এ বিরাট আমির স্পন্দন কিছুতেই আমার হিয়া সহ্য করিতে পারিলনা—প্রাণ একেবারে ভয়ঙ্কর রকমে হাঁপাইয়া উঠিল। কেবল একটা অবশক্লান্তিতে সমস্ত দেহমন যেন অসাড় হইয়া গেল!

মনটা বড় ভয়ঙ্কর বিশ্রী রকমের খারাপ হওয়াতে উঠিয়া গিয়া পিয়ানোটার কাছে বসিলাম। ভাবিলাম একটু গানবাজানা করিলে মনটা সুস্থ হইতে পারে। মনের ভিতরকার ঐ জড়তা, ঐ নির্জ্জীব অলস অবশতা গুরুভার পাথরের চাপের মত বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাই ধীরে ধীরে গান ধরিলাম।—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর, আমার সাধের সাধনা,
মম অসীম গগন বিহারী। আমি আপন মনের,
মাধুরীমিশায়ে, তোমারে করেছি রচনা, তুমি আমারি
তুমি আমারি।",

গানের সুরে যেন সমস্ত সান্ধ্য আকাশ একেবারে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। সুরের হাওয়া যেন মনের সমস্ত জড়তার চাপ মুছিয়া লইয়া গেল। গানের কথা যে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া, কি বেদনার ধ্বনি লইয়া বাহির হইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না—কিন্তু মনের জড়তা দূর করিয়া কেন একটা শান্তির সুবাতাস যেন চারিদিকে বহিতে আরম্ভ করিল।

বারান্দায় আসিয়া দেখি আমার কবিবন্ধুটি উন্মুক্ত বাতায়ন তলে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কি মনে হইল, তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া ঐ দিক্‌কার জানালাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলাম। মানস চক্ষে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, ঐ নীরব কবির গভীর ঔদাসীন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়াছে।

(৩)

ভাবিয়াছিলাম আমার ঐ আঘাতটা কঠিন ভাবে গিয়া তাহার বুকে বাজিবে—ফলে হয়ত আমার নীরব কবিবন্ধুটি সরব হইয়া উঠিবে। কিন্তু কিযে হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। 'পরের' পর দিন দেখিলাম আমাদের বাড়ীর দিকের তাহার সেই গবাক্ষটি সে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সমস্তদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিলাম কিন্তু সে গবাক্ষ যেন

আমারপক্ষে চিরদিনের জন্যই রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার কারণটা যে কি মনে মনে তাহা আন্দাজ করিয়া লইয়া আমার সমস্ত দেহমন বেদনায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিলাম মনে-করিয়া অনুশোচনায় আমার সর্ব্বশরীর যেন দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল।

সেদিন আমি আর মেজোবৌদিদি সকালবেলায় শিউলি-ফুল কুড়াইতেছিলাম; তখনও সূর্য্য উঠেনাই, একটু অন্ধকারের আভাসও রহিয়াছে। সমস্ত আকাশ বাতাস যেন গভীর নীরব নিস্তব্ধতায় কাহার প্রতীক্ষায় আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে।

"ওটা কিরে, সাদা মতন" বৌদিদি বলিতেই আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম—একখানি লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম আমার কবিবন্ধুটির সুসজ্জিত কক্ষের আমাদের বাগানের দিকের একটা বাতায়ন খোলা রহিয়াছে। একটা ক্ষীণ, ম্লান-আলোক রশ্মিও গবাক্ষপথে বাহির হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম আমার কবিবন্ধুটির লেখা এই ফুলস্ক্যাপ কাগজখানি বাতায়নপথে উড়িয়া আসিয়া বাগানে পড়িয়াছে।

কাগজে কি লেখা ছিল গাছতলার অন্ধকারে তাহা সুস্পষ্ট পড়িতে পারিলাম না। তবে কাগজখানির উপরদিকের মার্জ্জিনে লালকালি দিয়া মোটামোটা অক্ষরে বক্রভাবে যাহা লেখাছিল তাহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। লেখাছিল "কার্ত্তিকের নবশক্তির জন্য।" "নবশক্তি" সে সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। আমার কবিবন্ধুটি যে 'নবশক্তি'র একজন লেখক একথা মনে করিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে একবার উপরের জানালাটার দিকে চাহিলাম—কিন্তু যাহার উদ্দেশে আমার সম্ভ্রমপূর্ণদৃষ্টি ছুটিয়া গিয়াছিল তাহার দেখা পাওয়া গেলনা।

কাগজখানিতে একটা গানের অর্দ্ধাংশ বোধ হয় লিখিত ছিল লাইন ১০।১২ হইবে। কিন্তু ঐ কয়েকটি লাইনেই লেখকের শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান ছিল। নিপুন হস্তের তুলিকাস্পর্শে একখানি ক্ষুদ্র চিত্রের একাংশ অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অসম্পূর্ণ চিত্রটীর সম্পূর্ণতা দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতর একটা সুতীব্র কাতরতা ভারি যন্ত্রনার সৃষ্টি করিতেছিল। আহা, এমন সুন্দর কবিতাটি—যদি সম্পূর্ণ কবিতাটি কেবল একটি বারের জন্যও দেখিতে পাইতাম।

কতবার ভাবিয়াছি ঐ অংশটুকু ফেরত পাঠাইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি একবার কেবল পড়িবার জন্য চাহিয়া পাঠাই। ওগো শক্তিমান লেখক, এই তরুণীর প্রাণ যে তোমাকে তাহার কবিগুরু রূপে পাইবার জন্য একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ওগো নিষ্ঠুর, দয়া কর, দয়া কর। কিন্তু হায়রে, তাহাত পারিয়া উঠিলাম না। আমার ব্যাকুল প্রাণের করুণ নিবেদন যে কেবল আমারই বক্ষের মাঝে গুঞ্জন-ধ্বনি করিতে লাগিল—সেত কোনও ক্রমেই ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ধরা দিতে চাহিলনা। আমার ভিতরকার শিষ্যা-আমিকে পরাভূত করিয়া আমার নারী-আমি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমার লুপ্ত, সুপ্ত, অনাদৃত নারীত্ব যে যৌবন-গর্ব্বভরে গ্রীবা হেলাইয়া দীপ্ত উজ্জ্বল ভাবে সমস্ত হৃদয় খানি জুড়িয়া বসিল। কাজে কাজেই এই অমূল্য সুযোগটিকে আমি হেলায় হারাইলাম। ওগো আমার নীরব কবি, ওগো নাম-হীন অপরিচিত, ওগো আমার চিরদিনের চিরকালের, চিরপরিচিত, আমাকে দয়াকরিয়া তোমার শিষ্যত্বের অধিকার দাও—আমার প্রাণহীনলেখার মধ্যে, প্রাণহীন মনের মধ্যে তোমার রুদ্রশক্তির প্রচণ্ড অগ্নিকণিকার প্রেরণে আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল। ওগো অসম্পূর্ণ কবিতার অদ্বিতীয় শক্তিমান কবি, তুমি পরিপূর্ণভাবে আমার কল্পলোকে ভাসিয়া উঠিয়া তোমার মানসীর সার্থকতা সম্পাদন কর। তুমি নিজে পরিপূর্ণ হইয়া আমার অপূর্ণতাকেও পরিপূর্ণ করিয়া দাও।

সমস্তদিনটা অধীর আগ্রহে জানালার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকিলাম—কিন্তু সেই রুদ্ধ বাতায়ন আর খুলিলনা। সমস্তদিন গেল, সন্ধ্যা আসিল,—সন্ধ্যাও কাটিয়া গেল, তবু সেই রুদ্ধ গবাক্ষ আর উন্মুক্ত হইল না। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিল। আমার আলোকিত কক্ষে আমার মনের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া, অপরিসীম ধৈর্য্যের পশরা মাথায় করিয়া তথাপি আমি বসিয়া রহিলাম! অবশেষে আমার সমস্ত

দিনের আশা, আনন্দ, ব্যাকুল আগ্রহ, কাতর আহ্বানের অস্ফুটধ্বনির পরিপূর্ণ স্বার্থকতারূপে আমার কবি বন্ধুর কক্ষে প্রদীপ জলিয়া উঠিল। আশা আনন্দে উদ্বেলিত বক্ষকে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া আমি উঠিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিং এ ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই রুদ্ধ গবাক্ষ উন্মুক্ত হইয়া যাইবার আশা করিতে লাগিলাম। প্রতিমুহূর্ত্তেই আশা করিতে লাগিলাম যে এইবার বুঝি আমার অপরিচিতের চিরপরিচিত দর্শন পাইব। কিন্তু হায়রে মানুষের মন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল আমার আশা আর পূর্ণ হইল না।

ঢং ঢং করিয়া ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল; সেদিনও বেশ জ্যোৎস্নারাত্রি। অমলধবল জ্যোৎস্নাধারায় প্রকৃতি-সুন্দরী সদ্যস্নাতা সিক্ত বসনা সুন্দরীর মত চারিদিকে রূপের জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল! কবিবন্ধুর ছাদের উপর চাহিয়া দেখিলাম; সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; কেবল ছাদের কোণের খানিকটা ঘুমন্ত জ্যোৎস্না যেন আমার পরিম্লান অবস্থা দেখিয়া ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু হাসিয়া উঠিল।

আর সহ্য করিতে পারিলাম না—একেবারে ভয়ঙ্কর অসহ্য। ওগো আমার নারী-আমি জাগ, জাগ, আরও জাগ, জলিয়া ওঠ; তোমার প্রদীপ্ত মহিমায় বিশ্বচরাচর আলোকিত করিয়া দাও। ওরে আমার ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিকণা, নারীত্বের সাম্রাজ্ঞীর মহিমায় ফুৎকারে ভস্মরাশি উড়াইয়া দিয়া সর্ব্ববিধ্বংসী জ্বালাময়ীভাবে সব জ্বালাইয়া দে—পোড়াইয়া একেবারে ছারখার করিয়া দে।

অশান্ত মনটাকে শান্ত করিবার জন্য আবার গিয়া পিয়ানোর কাছে বসিলাম—যখনই আমার মনটা খারাপ হইয়া উঠিত, তখনই পিয়ানোটার কাছে গিয়া বসা ছিল আমার স্বভাব। কিছুক্ষণ অপ্রাস্তভাবে পিয়ানো বাজাইবার পর—হঠাৎ একেবারে দেয়ালের দিকে দৃষ্টিপড়ায় দেখিলাম কক্ষপ্রাচীর বিলম্বিত সুবৃহৎ আয়নাখানিতে আমার দেহের প্রতিবিম্ব পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। আমার কোমল চম্পক অঙ্গুলিগুলি দ্রুতভাবে পিয়ানোর উপর ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে। নিজের প্রতিবিম্ব নিজে দেখিয়াই চমৎকৃত হইয়া গেলাম। আমার রূপের একটা প্রশংসা ছিল, সত্য—কিন্তু সেটা এমন অপরূপ ভুবনমোহিনীরূপে অন্ততঃ আমার চক্ষে ত কখনও প্রতিভাত হয় নাই। মনে মনেই একটু হাসিলাম। মনের ভিতরকার ঝঞ্ঝাবাত অনেকটা প্রশমিত হইয়া আমাতে গান ধরিলাম। কিন্তু এই সঙ্গে মনোমন্দিরের এক কোণে যে একটি সুষুপ্ত ইচ্ছা গোপনভাবে লুক্কাইত ছিল তাহা তখন বুঝিতেই পারি নাই। গলা ছাড়িয়া গাহিলাম—

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে।
তবেত ফুল বিকাশে।
কলি ফুটিতে চায়, ফোটে না—মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ছাড়ি মান অপমান, দাও মনপ্রাণ নিশিদিন রহ পাশে।

খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল; আমার বহু আকাঙ্খিত রুদ্ধ বাতায়ন বুঝি এবার খুলিয়া যায় ব্যাকুল আগ্রহে গাহিয়াই বলিলাম—,

"আশা ছেড়ে তবু, আশা রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে।"

গানের বাণীতে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া যেন সুরের বিচিত্র লীলাখেলা চলিতে লাগিল। আমি আমার সকল শক্তি একত্রে সংগ্রহ করিয়া প্রাণপণে মনোবীণার সঙ্গে সুর রাখিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কেবলই গাহিতে লাগিলাম

"আশা ছেড়ে তবু, আশা রেখে দাও, হৃদয় রতন আশে।"

ঐ একটি পদই বহুক্ষণ ধরিয়া গাহিতে লাগিলাম। আর মাঝে মাঝে আমার ঐ চিররুদ্ধ গবাক্ষটির পানে উৎসুক নয়নে চাহিতে লাগিলাম। কিন্তু হায়, কণ্ঠ দিয়া আর সুর বাহির হয়না—তথাপি গাহিতে লাগিলাম—

"ফিরেএস, ফিরেএস, ফিরে এসহে ফিরেএস—"

আমার অন্তরের বাণী বিচিত্র রাগিণীতে ধ্বনিত হইয়া ক্রমেই নামিয়া আসিতে লাগিল; উৎসুক নয়ন গবাক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময়ে আমার অপরিচিত কবির কক্ষের প্রজ্বলিত দীপটি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—সঙ্গেসঙ্গে আমার অন্তরের মধ্যে যে আশার ক্ষীণদীপটুকু জলিতেছিল তাহাও নিভিয়া গেল।

দূরে কলাবাগানের মধ্যে সপ্তমীর চন্দ্র ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল।

আমার অজ্ঞাতসারে কখন যে আমি পিয়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, কখন যে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা জানিনা। যখন চমক ভাঙ্গিল তখন দেখি আমার স্থির অচঞ্চল হস্ত ক্লান্তভাবে পিয়ানোর উপর পড়িয়া রহিয়াছে—গান অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তথাপি কক্ষমধ্যস্থ বায়ুর স্তর যেন তখনও বেদনা-কাতরকণ্ঠে গাহিতেছিল—ফিরে এস হে ফিরে এস

(৪)

একটা বিচিত্র বিশ্রী রকমের স্বপ্ন দেখিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন দেখি যে সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। কাক কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে—আমার বাতায়নের অল্পপরিসর ছিদ্রের ভিতর দিয়া একটি কোমল সূর্য্যরশ্মি শয্যার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতে গেলাম, কিন্তু পারিলাম না—খানিকক্ষণ অলস ভাবে বিছানায় পড়িয়া থাকিলাম। স্বপ্নের ঘোরটা তখনও কাটে নাই—কি অদ্ভুদ্ স্বপ্ন! স্বপ্নের কথা যতই মনে পড়িতে লাগিল ঘৃণায় ও ব্যথায় সর্ব্ব শরীর ও মন ততই সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল। উত্তেজিত হইয়া তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কি মনে হইল, আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ত্বরিত হস্তে আমার সযত্ন রক্ষিত বহুমূল্যদ্রব্যাদির আলমারিটা খুলিয়া ফেলিলাম।

যে ফুলস্ক্যাপ কাগজখানাকে বহুমূল্য কৌস্তুভ মণি মনে করিয়া অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপনে অঞ্চলের একমাত্র পরমনিধির মতন বহুসম্মানে তুলিয়া রাখিয়াছিলাম—সেটাকে বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে প্রত্যেক অক্ষরটিকে পর্য্যন্ত বিখণ্ড লুপ্ত করিয়া ফেলিলাম। তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চায়ের জন্য আখা জ্বালা হইয়াছিল—ঐ শতখণ্ড কাগজের টুকরোগুলোকে জ্বলন্ত উনানে নিক্ষেপ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলাম।

কলতলায় গিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি পবিত্র হইলাম—অন্তরের ভিতরেও কেমন একটা পবিত্রতার ভাব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল। কাপড় ছাড়িয়া উঠানের উপর দিয়া মা'র ঘরের দিকে যাইতেছিলাম—এমন সময়ে ছোটদাদার ঘরে একটা ভয়ঙ্কর গোলমাল শুনিয়া সেই দিকে যাইলাম। গিয়া দেখি, ছোটদাদা চা খাইতেছেন আর একখানা ইংরাজি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। মেজদাদা সচীৎকারে বলিতেছেন "আরে আমাদের বাড়ীর পাশে এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, আর আমরা তার কিছুই জান্‌তে পেলাম না।"—ছোটদাদা খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন "আমার মনে কিন্তু লোকটাকে দেখেই কি রকম সন্দেহ হয়েছিল—সুন্দর মতন লম্বা মতন ছোক-রাটি—কাহারও সঙ্গে মিশ্‌ত না—রাতদিনই বাড়ীর ভেতরেই থাকৃত—বাইরে ত কখনও আমি ওকে বেরুতে দেখিনি, ওর এই কাণ্ড—"। আমি আর থাকিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে ছোট্‌দা—"। "ওঃ—তুই শুনিস্‌নি—এই আমাদের পাশের বাড়ীতে একটা লম্বামতন ফর্সা গোছের ছোকরা থাকৃত—একটা মার্ডার কেসে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে; বেটা পুরী থেকে খুন করে এখানে এসে লুকিয়ে বসেছিল, বাবা পুলিসের সঙ্গে চালাকি; তারা ঠিক খুঁজে খুঁজে বের করেছে। বেটা কি কম ধড়িবাজ—রাজসাহীর জেল থেকে একেবারে পালিয়ে গিয়েছিল—একেবারে পাকা বদমাইস—।" শুনিয়া আমার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকার পর আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বা, সে লোকটা এখন কি বল্‌ছে?"—"বল্‌বে আবার কি?—বেটা সয়তান—এখন কালা বোবা সেজে বসে রয়েছে—একটা কথারও উত্তর দিচ্ছে না। আকার ইঙ্গিতে জানাচ্ছে যে সে বোবা আর কালা। আশ্চর্য্য কিন্তু—এমন চমৎকার কালা বোবার অভিনয় করছে—বড় বড় অ্যাকটাররা সে রকম পারে না—তা যাই বল—" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "সেজদা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি—আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় লোকটা সত্যই খুনে!" সেজদাদা ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "ঠিক্ কি করে বল্‌ব—" আমি একটু বিশেষ জোরের সঙ্গে বলিলাম "সেজদা, তুমি ওর জন্যে দাঁড়াচ্ছ কিনা; দেখ, তোমার হাতে ত বড়কেসটেস্ পড়ে না—একবার চেষ্টা করে দেখনা

লোকটাকে যদি বাঁচাতে পার—আহা সত্যসত্যই যদি সে কালা আর বোবা হয়—" ছোটদাদা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "যা যাঃ—জীবু, তুই আর পাগলামো করিস্‌নে—"। আমি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলাম, সেজদা, লোকটাকে বাঁচাতে পারলে তোমার খুব একটা নাম পড়ে যাবে—আহা, বেচারা যদি সত্যসত্যই বোবা আর কালা হয়—না, না, সেজদা, তুমি কিছুতেই অমত করতে পাবেনা—তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষেতি কি?—লোকটা যদি নির্দোষই হয় তাহলে বেঁচে যাবে—তোমার এতে কোনও অমত আমি শুনব না সেজদা—"

অনেক বলাকহার পর সেজদাদা সম্মত হইল সেই দিনই শেষবিচারের দিন। গভীর আগ্রহে সমস্তদিন সেজদাদার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

বড়দাদা দ্বিপ্রহরে একবার আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁরে জীবু, "নবশক্তি"তে ছাপাবার জন্যে দুটো কবিতা ঠিক করে রেখেছিলাম—তার থেকে একখানা কাগজ হারাচ্ছে—কি হল জানিস?" আমি তখন নতমুখে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম "জানিনা।" বাস্তবিক বেশি কথা বলিবার তখন আমার শক্তি ছিলনা বাহিরে সদরদরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—সামান্য-একটু আগে সেজদাদার গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় লাগিল। ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হল সেজদা?" সেজদাদা বিষণ্ণমুখে বলিলেন, "নাঃ—কিছু হলনা; সাক্ষীপ্রমাণ সব ওর বিরুদ্ধে—আমি কি করব? তার সাতবছর দ্বীপান্তর হল। কিন্তু লোকটা কি সত্যসত্যই বোবা আর কালা? দিব্যি গম্ভীর ভাবে, পরম নিশ্চিন্ত উদাসীন ভাবে নির্ব্বাক নীরব ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—" আমি আর কিছু বলিলাম না। একটা হাড়ভাঙ্গা—বক্ষপঞ্জরবিদীর্ণকারী সুদীর্ঘ নিশ্বাস কেবল ভেতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

উচ্ছ্বসিত উত্তালপ্রচণ্ড তরঙ্গ সমাকুল ক্ষুব্ধ হৃদয়াবেগের কোনও চিহ্নই বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিলনা। ভয়ঙ্কর কালো আর প্রচণ্ড শীতলতায় হৃদয়সমুদ্র জমিয়া বরফ হইয়া গুরুভার একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মত আমার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না—দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শ্রীরাধাবল্লভ নাগ

দশহরা

কত বর্ষ কত যুগ হইয়াছে গত
তোমার তরঙ্গ ধারা ফেনিল উচ্ছল,
নামিয়াছে কোন দূর অজ্ঞাত দিবসে!
যবে থর থরি বিশ্ব উঠেছিল কাঁপি'
মহা মঙ্গলের ধারা পাতে। ওগো মাতঃ
সে দিন কি চমকিতা জাগে নি সহসা
মোহ নিদ্রাগতাধরা তব উচ্ছৃঙ্খল
বিরাট তাণ্ডব শুনি'? তোমার বিশাল
ফেনপুঞ্জী হাস্য লেখা দিকে দিকে তার
দেয় নি কি লিখে লিখে মঙ্গল সংবাদ?
দিয়েছিল, তবু ভয়ে ভয়ে পারে নি সে
ধরিবারে তব ধারা তার বক্ষপরে।
তাই শিব যোগনিদ্রা ত্যজি' হুহুংকারে
আপন পিঙ্গল জটা করি উৎসারিত
উন্মাদ তাণ্ডব নৃত্যে দু' বাহু ছুড়িয়া
সে মহামঙ্গল রাশি মহাকাশ হ'তে
নিলেন বরিয়া। তারপর ধীরে ধীরে
দিক হতে দিগন্তরে পড়িল ছুটিয়া,
কলুষ নাশিনী তব কোমল করুণা।

যে করুণা পাঠায়ে দিলেন বিশ্বেশ্বর
সে করুণা কে ধরিবে বিনা বিশ্বম্ভর ?
সেই মহাপুণ্যক্ষণে আকাশের গায়
কি শুভ্র জ্যোতির লেখা লিখেছিল তব
দ্রুত অভিপাত গতি ! কি মহাসঙ্গীত
মহা বিষ্ণু পদ মূলে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
কাঁদিয়া ফিরিয়াছিল তোমার আশায় ?
শঙ্করের মহা বীনা তব সাধনায়
কি মহান দুঃখ গীতি রনিয়া রনিয়া
উঠে ছিল কাঁদি' ! ধীরে তব সম্ভাবনা
সমগ্র আকাশ ব্যাপি বিষ্ণুপদ মূলে
জেগেছিল ফুলি' ফুলি' কি মহাব্যথায়
বেদনা সঙ্গীত শুনি' নাহি জানি মাতঃ।
তবু আজ বসি যুগ যুগান্তর পারে
ঘনাইত জলদের গম্ভীর সঙ্গীতে
পেতেছি সংবাদ যেন মহা সম্ভবের ;—
বিশ্বের করুণা রাশি বিষ্ণুপদ হতে
নামিবে ছুটিয়া রৌপ্য শুভ্র জ্যোতি রেখা
আঁকিয়া আকাশ পথে ! আজি নরনারী
চলিয়াছে প্রক্ষালিতে দশবিধ পাপ
কলুষ নাশিনী, তব তরঙ্গ আঘাতে !
এত যাত্রী চলিয়াছে, সনাতনি, তব
সনাতন করুণার জলে, তবু হায়
এই যে করুণা ধারা আনন্দে উল্লাসে
নারায়ণ পদে লগ্ন মেঘ হতে নামি'
তৃষিত ধরার বুকে আছাড়িয়া পড়ি'
আপন আনন্দ জন্ম করিছে সফল,
কে তাহাতে করি স্নান ভাবে মনে মনে
আমার সকল পাপ সব তৃষ্ণারাশি
সকল কলুষ ব্যথা হল আজি ক্ষয় ?'
যে করুণা ধারা চাহি তীব্র তৃষাভরে
আপন সহস্র বাহু তুলি' উর্দ্ধমুখে
গুমরি' গুমরি' ধরা মন্ত্রামন্ত্র ধ্বনি
গহনে বিপিনে শৈলে তুলে ছিল ধীরে
সে নন্দন জাত ধারা বহু ভাগ্য বলি'
কেহ নাহি মানে মাতঃ ! তোমারি আশায়
তোমারি এ নব জন্ম আকাশ ব্যাপিয়া
ভুলিয়া চলেছে সবে শঙ্কিত অন্তরে
তোমারি সে বহু যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত
মলিন অঞ্চল খানি যেখানে পড়িয়া
আপনার ক্ষুদ্রতায় আপনি লজ্জিত।
জানি জানি অয়ি মাত নহে বহু দূরে
তোমার উল্লাস ভরা মহাজাগরণ,
তোমার উন্মত্ত সেই বিশাল করুণা
আসিবে নামিয়া বেগে ; তব তট ভূমি
পারিবেনা বহিবারে, তব কৃপারাশি
ভাঙ্গিয়া আপন বক্ষ ছুটি দিকে দিকে
আনন্দের মত্ততায় করিবে পীড়িত।
কিন্তু সে তো এই ধারা, বারি বিন্দুপাত,
দিকদিগন্তর ব্যাপি বিষ্ণুপদ হতে
হিমগিরি তুলি শির ধূর্জ্জটীর গ্রীব
মেঘমন্দ্রে গুহামুখে পিনাকের ধ্বনি
তুলিয়া, লবেন তোমা বরি নিজশিরে।
তারপর আপনায়ে করিয়া সঞ্চয়
বাহিরিবে যবে তুমি করুণার কাজে
কোন্ বাধা ঐরাবত তুণ্ডবাহু তুলি'
বারিবে তোমার গতি ?
কে সহিবে ? কে বরিবে ? কে আসিবে ছুটে
জাগ্রত মরণ মাঝে দাঁড়াতে হাসিয়া ?
সে তীব্র আনন্দ সুরা কে করিবে পান ?
কেহ না ? সকল বিশ্ব লুকাবে তরাসে
আপনার অতি ক্ষুদ্র প্রাণ গুলি লয়ে ?

মহাপরানের সেই মৃত্যু ময় লীলা
কেহ না হেরিবে ?

আজি ক্ষুদ্র বেলা দুটি
যতনে ধরিয়া আছে তব তনু দেহ,
তব আশীর্ব্বাদ ভরা কোমল পরশ
তীরে তীরে অতিধীরে উঠিছে সঞ্চরি ?
ভকতের প্রেম ভক্তি তব অঙ্কপরে
পুষ্পবিল্বদল হয়ে চলেছে ভাসিয়া—
জগতের পাপরাশী বহিয়া বহিয়া—
কোন সাগরের নীরে ফেলিবে জননী ?
কোন মহা আনন্দের বিরাট শরীরে
এত নিরানন্দ রাশি—পাপ তাপ—গিয়া
লভিবে চরম স্থান ? কি আশ্চর্য্য মাতঃ
পাপ পুণ্য এক ঠাঁই চলেছে জননী
তব করুণার জলে আনন্দে ভাসিয়া।
তাই হোক মা জননি! তব পূত জলে
আমাদের যাহা আছে সব যাক্ ভাসি'—
পাপ যাক্ পুণ্য যাক দুঃখ সুখ সব
লভুক চরম স্থান এক ঠাঁই গিয়া।
মহাপারাবার প্রতি যাহার প্রয়াণ
সেই তো বহিতে পারে সকলের দান।
মহাআনন্দের মাঝে যার হবে লয়
সেই তো বহিবে সর্ব্ব নিরানন্দ ভয়,
সর্ব্ব সুখ সর্ব্ব আশা বহিতে সে পারে
মহাসুখ মহাআশা ডাকিতেছে যারে।
যেথায় চলেছ সে যে মহাপারাবার
আপন আনন্দে মগ্ন, উন্মত্ত উদার
কোটী হস্ত বিস্তারিয়া ডাকিছে সবারে
বিশাল উরসে তার, মোরা আপনারে
দিনে দিনে পলে পলে তিল তিল করি'
দিতেছি তো আপনায়, জন্ম জন্ম ধরি'।
তবু নাহি হল শেষ আত্মবিকিরণ।
প্রতিক্ষণে অনুভবি' তার আকর্ষণ,
ঢালিছে জীবন স্রোতে জীবনের ধারা
সমস্ত জগৎ,' যেন হয়ে আত্মহারা
কত গ্রহ কত তারা কত রবি-শশি
ত্রিদিবের তটবাহী তব জলে পশি'
আপনারে প্রতিক্ষণে করিতেছে দান।
যে মহান আকর্ষণে তাহাদের প্রাণ
ঢালিছে তোমার স্রোতে, আজ তারি তরে
আমারও এ ক্ষুদ্র প্রাণ দুরু দুরু করে'
উঠিছে কাঁপিয়া—আজি মেঘ গরজনে
গুমরিছে প্রাণ মোর যেতে তোমা সনে।
সুদূর অতীত হতে বহিয়া এসেছি
তব স্রোতে মন্দাকিনি! আজিও চলিব'
তব সাথে দূরে দূরে, সপ্তর্ষি ভেদিয়া
তব স্রোতে নাচিয়া ছুটিবে প্রাণ মোর
চিরধ্রুব লোকপানে অবিশ্রান্ত স্রোতে।

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল

———

পল্লীবার্ত্তা

বাঙ্গালার আমন ধান।

বর্ত্তমান বর্ষে ৪,৭৬,৮৭,৪০০ বিঘা জমিতে আমনধানের চাষ হইয়াছিল; কিন্তু গত ভাদ্রমাসের পর হইতে বৃষ্টি না হওয়াতে অধিকাংশ স্থানেই ভালরূপে ধান্য জন্মে নাই। এবৎসর মোটের উপর শতকরা ৭২ ভাগ ধান্য জন্মিয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশে একমাত্র বাকরগঞ্জ জেলায়ই ধান্যের ফলন কম হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য জেলায় ধান্যের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। ছয়টি জেলায় শতকরা কিঞ্চিদধিক ৮০ ভাগ, বারটি জেলায় ৬০ হইতে ৮০ ভাগ, ছয়টি জেলায় ৪৯ হইতে ৫০ ভাগ এবং বগুড়ায় ৪৪ ভাগ মাত্র ধান্য হইয়াছে। প্রতি একরে (কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) সাড়েবার মণ ধরিলে, মোট প্রায় ১৫ কোটি মণ ধান্য বাঙ্গালাদেশে জন্মিয়াছে।

বাঙ্গালার সরিষা।

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশে ৩৯,০৩,৩০০ বিঘা জমিতে সরিষার চাষ করা হইয়াছিল। কিন্তু সময়ে বৃষ্টি না হওয়াতে দশ আনা রকম সরিষা জন্মিয়াছে। ফলে, তৈলের দাম বোধ হয় আরও বৃদ্ধি হইবে।

বাঙ্গালার গম।

বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গদেশে ৩,৩১,৮০০ বিঘা জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। কিন্তু অনাবৃষ্টিবশতঃ গম ভাল হয় নাই; মোট আট আনা রকম জন্মিয়াছে।—কৃষিসম্পদ।

মথুরাপুর গ্রাম্য সমিতি ঃ—

ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর গ্রামবাসীগণের উৎসাহ ও উদ্যোগ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই গ্রামের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজ নিজ প্রদত্ত টাকা হইতে গ্রামের মধ্যস্থিত একটী পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে এবং তাহাতে মাছের চাষ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রামের মধ্যস্থ বাঁশ বন প্রায় সমস্ত উঠাইয়া ফেলিয়া মাঠের মধ্যে বাঁশ লাগান হইতেছে।

যশোহর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড উক্ত গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া পানীয় জলের অভাব পূরণ করিয়াছেন এবং গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার কল্পে ২০০৲ টাকা বোর্ড হইতে সাহায্য করা হইয়াছে। গ্রামে দুইটী মডেল প্রাইমারী পাঠশালা স্থাপিত হইতেছে, পাকা এমারত শীঘ্রই প্রস্তুত হইবে। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদারবাবুগণ মথুরাপুর বাসীগণের উদ্যমে বিশেষ প্রীত হইয়া তথায় হাট স্থাপন করিয়া তৎপার্শ্বে ব্যবসায়ী, কামার, কুমার ও ছুতার বসাইতে অনুমতি দিয়াছেন। কিছুদিন হইতে হাট বেশ বসিতেছে এবং গ্রামের মধ্যে বেশ একটী নূতন জীবনের ও আশার সঞ্চার হইয়াছে।

বাঙ্গালার ডেপুটী স্যানিটারী কমিশনার সাহেব বাহাদুর গ্রাম পরিদর্শনে আসিয়া প্রীত হইয়া গিয়াছেন এবং তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়া গিয়াছেন। ঝিনাইদহ মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর মথুরাপুরে আসিয়াছিলেন, তিনি সমিতির কার্য্য প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।—যশোহর

কৃষি-কথা।

বঙ্গে উন্নত প্রণালীর কৃষিপ্রথা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। বর্দ্ধমান বিভাগের জন্য একজন অভিজ্ঞ কৃষি পরিদর্শক বহুদিন হইতে নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান কৃষিপরিদর্শক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কৃষি-তত্ত্বে বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘকাল জাপানে অধ্যয়ন করিয়া যোগ্যতার মানপত্র পাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান

বিভাগের সকল জেলায় বিশেষতঃ আমাদের বর্দ্ধমান জেলার কৃষির পক্ষে তাঁহার উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

উন্নত প্রণালীর কৃষি যাহাতে অধিক বিস্তৃতি লাভ করে, তজ্জন্য তিনি স্থানে স্থানে কৃষিসমিতি গঠনে উৎসাহ দিতেছেন। ইতি মধ্যে যে কয়েকটি কৃষিসমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহারই কৃতিত্বের পরিচায়ক। আমাদের কাল্না মহকুমাতেও কৃষির উন্নতির জন্য তিনি আজ কয় বৎসর হইতে একজন ডিমনষ্ট্রেটর পাঠাইয়াছেন। থানায় থানায় কৃষিসমিতি স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি স্বয়ং আসিয়া সে দিন কাল্নায় কৃষিসমিতি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের জেলার জন্য একজন ডিষ্ট্রিক্ট কৃষি অফিসর নিয়োগ মঞ্জুর করায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মল দেব মহাশয় ঐ পদে বাহাল হইয়া আসিয়াছেন।

এখন আমাদের জেলার কৃষিসমিতিগুলির প্রধান কর্ত্তব্য যে, কি উপায়ে আপন আপন এলাকায় কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা ও চেষ্টা করা। কোন্ জমিতে কিরূপ সার দিলে ফসল বেশী হয়, কৃষি বিভাগ তাহা জানাইয়া দিতেছেন। এখন সমিতির শক্তিশালী সদস্যগণ যত্নপরায়ণ হইলে দেশবাসী সরকারের পরীক্ষিত সুফল উপভোগ করিবার সুযোগ পান। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, কৃষকগণ সরকারী কৃষিকর্ম্মচারিদের কথা মত জমির পাট করিতে স্বীকৃত হইত না। পল্লীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া তবে তখন তাহাদের জমিতে পরীক্ষা লইতে হইয়াছিল। শেষে অবশ্য আশাতীত ফল লাভ হওয়ায় সকলেই এই উন্নত প্রণালীর উপযোগিতা বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখন সর্ব্বত্র সে ভাব জাগে নাই। কাজেই সমিতির সদস্যগণকে উদ্‌যোগী হইয়া এ কার্য্যের প্রসার পক্ষে পরিশ্রম করিতে হইবে।—পল্লীবার্ত্তা কালনা।

পুস্তক—সমালোচনা।

উইলিয়াম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা।

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন বি, এ প্রণীত। মূল্য আট আনা। সুইজার ল্যাণ্ডের জাতীয় দুর্দ্দিনে কয়েকটি দেশ-প্রাণ মহাবীর কেমন করিয়া স্বদেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাহারই ইতিহাস সহজ ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বইখানি উইলিয়াম টেল নামক বিখ্যাত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ। কিন্তু ইহার ভাষা অধিকাংশ স্থলে এমন ঝর ঝরে এবং অনাড়ম্বর যে পড়িবার সময় ইহাকে মোটেই অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। দেশের জন সাধারণের চিত্ত লঘুসাহিত্যের দিকে যেমন ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে আমরা এই ধরণের গ্রন্থের বহুল প্রচার দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করি। ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি শুষ্ক বিষয়কে যদি জন-প্রিয় করিয়া তুলিতে হয় তবে এইরূপ গল্পের ভিতর দিয়াই তাহা সকলের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। আমরা এই তরুণ সেবককে সাদরে সাহিত্যের তীর্থ-ক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছি। সাধনা করিলেই যে তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের মণি-মকুট হইতে রত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভারতীর ধনাগার পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ। লেখকের ভাষা মাঝে মাঝে এক আধটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু সে সব স্থান খুবই অল্প। এবং তাহাতে প্রথম লেখার সঙ্কোচের দরুণ তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই জড়তাটুকু কাটিয়া গেলে লেখকের ভাষা নির্দ্দোষ হইবে। বইখানির ভিতর কতকগুলি মুদ্রণদোষও রহিয়া গিয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি তিরোহিত হইবে।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীদিগীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মূল্য ৵৹

প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের রচয়িতা বাংলা ভাষায় সুপরিচিত। তাঁহার "জাতিভেদ" যুক্তি, তর্ক, শাস্ত্রবাক্য

প্রভৃতি মন্থন করিয়া অবজ্ঞাত নিম্নশ্রেণীর জন্য অমৃত তুলিয়া আনিয়াছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার সেই অবজ্ঞাত জাতির প্রতি ভালোবাসারই আর একটি নিদর্শন। গৌরাঙ্গদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি, তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতা, আমাদের জীবনের উপর তাহার প্রভাব ইত্যাদি এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভিমানে আমাদের পক্ষে যাহা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন, ভক্তির দিক দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকারের কাছে তাহাও বিশ্বাস করা একান্ত সহজ ও সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা একটু সংস্কৃত ঘেঁষা। কিন্তু তাহা হইলেও তাহাতে স্বচ্ছন্দ লীলা ও অবাধ-গতি আছে। গ্রন্থের ভিতর গৌরাঙ্গদেবের উপর কতকগুলি আধুনিক কবিতা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকার চেষ্টা করিলে আধুনিক কবিদেরই রচিত এগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কবিতা দিতে পারিতেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও পুস্তক খানির দাম দুই আনা মাত্র দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। "?"

———

"রিক্তা"

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—কবিতার পুস্তক—মূল্য আট আনা মাত্র। কবি প্রথম কবিতায় আপনার রিক্তার ক্রটী নানাভাবে স্বীকার করিয়াছেন। সব কবিতাগুলির মধ্যে আমাদের কিন্তু "রিক্তাই" ভাল লাগিয়াছে। কবি-জীবনের শূন্যতার অনুভূতির পরেই একটা পূর্ণতার পরিতৃপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি নিজেকে বিলাইয়া দিতে চান—

ভিতর বাহির নিঃশেষ করি,
তোমারে সকল দানি'
রিক্তা আজিকে চিন্তা আমার
এইটুকু শুধু জানি।

কবি মিলনের প্রতীক্ষায় আছেন—

বিন্দুর মাঝে সিন্ধুর শোভা
উঠিবেরে কবে ফুটিয়া!

* * * * *

অপেক্ষী মোর ব্যাকুল দু'আঁখি
তোমারে দেখিতে অনিমেষ রাখি;
প্রতি মুহূর্ত্তে বাজে মোর কানে
তোমার চরণ ধ্বনি।
এই বুঝি তুমি আসিছ ভাবিয়া—
কম্পন বুকে গণি।

ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে কবির প্রাণের মধ্যে একটা আসন্ন আবির্ভাবের প্রতীক্ষা, একটা ভাবানুভূতির প্রকাশ ব্যগ্রতা জাগিয়া আছে কিন্তু পরবর্ত্তি কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটী ছাড়া সে ভাব-বিশেষের প্রকাশ-চেষ্টা বিশেষ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কবি তাঁহার রচনার মধ্যে নিজের দৈন্য-ভাবকে বড় করিতে এত ব্যস্ত কেন?

"হিন্দু ললনা" কবিতাটি বেশ সুন্দর হইয়াছে। কবি বালিকার "পুণ্যি-পুকুর" ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া নারী জীবনের একটী ক্রমিক চিত্র আঁকিয়াছেন।—তিনি হিন্দু ললনাকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন—

ধন্য ধন্য হিন্দু ললনা পুর্ণ-মূরতি
মধুর তার
অঙ্গে যাহার লক্ষ্মীর ছটা, কণ্ঠে
বসতি ভারতী মার।

কয়েকটী কবিতা দু' একজন বড় কবির ছায়াপাতে মলিন হইয়াছে। এবং দুই এক স্থানে ছন্দ পতন ও ভাব সমাবেশের শিথিলতাও আছে। রিক্তার মধ্যে বিশেষ নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও কবির সাধনা যে আশাপ্রদ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"চন্দন"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল—কবিতা পুস্তক—মূল্য দশ আনা।

গতানুগতিক ভাবে ইহাতেও শ্রীযুক্ত জলধর সেন লিখিত ভূমিকা আছে।

কবিতা গুলির বেশ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে। ইতিহাস, ভূগোল, পুরাতত্ব, দর্শন, জীবনী, সবই আছে এবং সুবিধার জন্য সরল ভাবে প্রায় একই ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তবে দু একটী ব্যতীত কবিতা গুলির রচনা-চাতুর্য্য বা ভাব বৈচিত্র্য আছে বলিয়া বোধ হয় না—অনেক স্থলেই ছন্দ-পতন দেখিয়া মনে হয় এখানি কবির প্রথম লেখা।

মুদ্রাকর প্রমাদ এমন কি কবিতার শিরোনামায় শাসনের স্থানে 'শাশন' দেখিয়া "মধু-মিলনের" স্থানে "কদু-কিলনের" কথা মনে পড়ে। কবির লিখিবার চেষ্টা আছে সফল হইতে পারেন।

পদ্মপাদ—
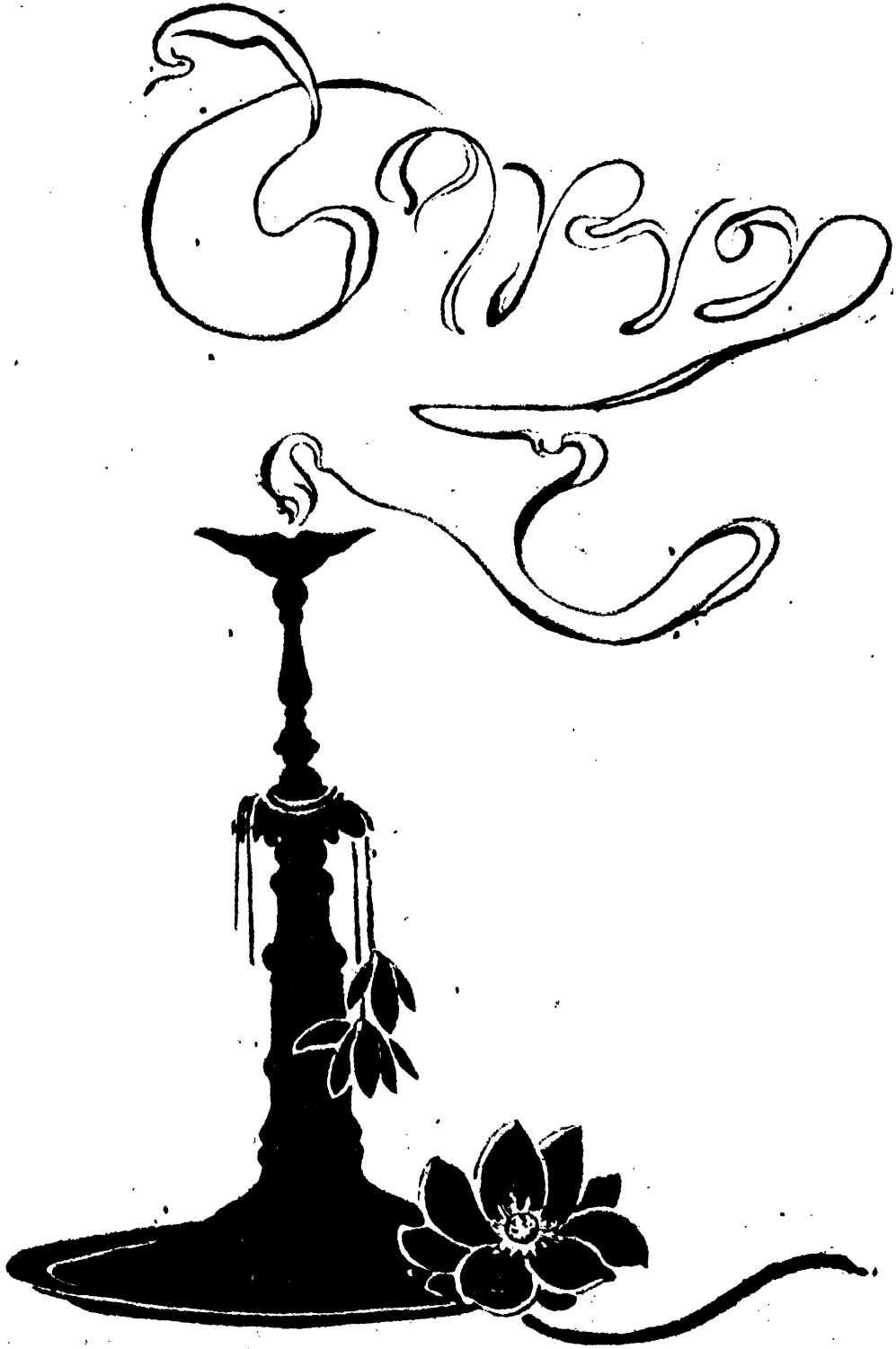
স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

মানুষে যে তদতিরিক্ত চিৎ বস্তুটী আছে তা উদ্ভিদে নাই! প্রাণের ধর্ম্ম দৈহিক অণু পরমাণু গুলিকে, বাঁচাইয়া রাখিয়া, মেরামত করিয়া বদল করিয়া, যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া দেহরূপটী পারতপক্ষে অক্ষুন্ন রাখা।...আপাতঃস্থির এই যে জীব দেহ ইহা একটী বিপুল বিশাল অণুপরমাণুর বহমান স্রোত। বহির্জগত হইতে নিত্য নিত্য নব নব মাল মসলা লইয়া এই দেহ রক্ষা করা বা গঠন করা প্রাণের কাজ। চিৎবস্তুর কাজ অন্যরকম,...প্রাণ শক্তিকে বুঝিয়া শুঝিয়া এই কাজে চালিত ও নিয়োজিত করা আর জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দেহীর তদিদং ভাবটা (personal identity) জাগাইয়া রাখা। ঘড়ির অস্তিত্ব একটা অপর বুদ্ধির উপর নির্ভর করে; সাজানো কলের ধরা বাঁধা কাজের উপর ঘড়ির নিজস্ব হাত নাই; মেরামত, বদল, সংশোধন অংশযোগাযোগ সমস্তই তার স্বতন্ত্র শক্তি হইতে হয়। জীবের তাহা নয়। জীবের যে জীবত্ব—বিশেষতঃ...মানুষ বা জন্তুর,—তাহা হইতেছে দ্বৈতভাব; প্রাণ চিৎ লইয়া জীবত্ব। ভাব, বুদ্ধি, বিচার, মনন, স্মরণ, ধারণ এই সব চিৎ ধর্ম্ম। এই চিৎবস্তু প্রাণ সাহায্যে বাহির হইতে মাল মসলা লইয়া, অনুকুল আবেষ্টন তৈয়ারী করিয়া তার ক্ষনিক আবরণ গঠন করে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত 'চিৎ' নিত্যপরিবর্ত্তন শীল, নিত্যপরিনামী এই দেহ স্রোতের ভিতর থাকিয়া নিজের তদিদংভাব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। নদীর জল স্রোত যেমন কোনো একমুহূর্ত্তে...কোনো একস্থানে আগেকার জলকণা। রাশি নয়; অনবরতঃই রাশি রাশি নূতন জলকণা সেখানে আসিতেছে, আবার যাইতেছে, আবার নূতন কণা আসিতেছে; অথচ নদীর নদীত্ব বজায় আছে; নদীর 'স্বরূপত্ব' হারাইয়া যাইতেছে না, জীবও তেমনি; তাহার জড়দেহটা মুহূর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল নিত্য নবাগত...জড়কণার সমষ্টী মাত্র; শুনা যায় সাত বছর অন্তর দেহীর দেহকণা গুলা সমূলে বদলাইয়া যায়; অথচ এই বিপুল পরিবর্ত্তনের ভিতরেও তার অন্তরস্থ একটা কোনো কিছু তার সনাতনত্ব, একত্ব বা 'তদিদংত্ব' বজায় রাখিয়াছে। এইযে ভিতরের অপরিনামী সনাতনটী এইটাকেই আত্মা বলা যায়, চিৎ ইহার প্রধান ধর্ম্ম, প্রাণ ইহার একটা কার্য্যকরী শক্তিমাত্র। এই ভাবে দেখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি জীবের মধ্যে এই অদৃশ্য অথচ সর্ব্বশক্তিমান চিৎস্বরূপ অপরিনামী অংশটী তার দেহরূপ জড় নিত্যপরিনামী, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, পরাধীন, অংশটীর অপেক্ষা বেশী সত্য। অর্থাৎ আত্মা, জড়দেহ অপেক্ষা বেশী সত্য ও শাশ্বৎ। দেহটা তাহার যন্ত্র-মাত্র। এই সনাতন নিজেকে প্রকাশ ও ক্রিয়াশীল করিবার জন্যই এই দেহরূপী যন্ত্রটাকে গঠন করিয়াছে। জড়-জগতে যা কিছু নামরূপ ধারী তাহা এই মহাপরিবর্ত্তনের ফল স্বরূপ। কেবল নূতন নূতন যোগ ও বিয়োগ,...অণুপরমাণু ও শক্তির বিচ্ছেদ ও মিলন। জীবন ও মৃত্যুর একটা বিরাট অভিনয়। বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা বেশ বুঝিয়াছি মৃত্যুটা একটা পরিবর্ত্তন; এক নামরূপ অপর নামরূপে অবিরাম জাগিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে মাত্র। জড়ের ও শক্তির মূল পরিমান ঠিকই আছে, কেবল সংযোগ বিয়োগে নিত্য নূতন নামরূপে বিকাশ। একই জাতীয় অণুপরমাণু কোথাও স্ফটিকে কোথাও ঘাসে, কোথাও কীট বা পতঙ্গে; কোথাও বা মানুষে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। সেই শক্তি যাহা অণুপরমাণুকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এমন করিয়া সাজাইতেছে যাহা মূল দিয়া আকৃষ্ট হইলে ঘাস হইবে, চঞ্চুদিয়া আহৃত হইলে পাখীর এবং অগ্নিপক্ক হইয়া, মুখ দিয়া খাদিত হইলে মানুষের দেহ গড়িয়া উঠিবে? কী সেই চিৎশক্তি যার সতত-জাগ্রত দৃষ্টির বলে চক্ষুর অগোচর একটী অণুবৎ জীবকোষ (cell) কেবল মাত্র Oxygen Hydrogen, Nitrogen, Carbon গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে তৃতীয় স্থানে একটী লতায়, অপর স্থানে একটী কীটে তৃতীয় স্থানে একটী নিউটনে গড়িয়া উঠিতেছে?

যাই হোক তাহা, উহাকে বলা যাউক, প্রাণ, আত্মা বা আর কিছু। তাহা হইলে আত্মার definition হইতেছে "—জীব মধ্যস্থ সেই চালক ও ধারক ও পালক শক্তি যাহা সজ্ঞানে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জড়ানুযোগে—একটা ক্ষণিক দেহরূপ যান বা যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া স্বীয় আত্ম-প্রকাশ করে, এবং জড় জগতের ধর্ম্মানুসারে অরক্ষনীয় হইলে সেই দেহ ত্যাগ করে। ইহার সৃজনী শক্তি শুধু দেহ গঠনেই প্রকাশ পায় না; উন্নতাবস্থায় ইহা বুদ্ধি, বিচার, সুখ দুঃখাদি বোধ, ও ইচ্ছা শক্তিরও চরম পরিচয় দেয় এবং আজীবন সঞ্চিত

অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্বরূপ বর্ত্তমান থাকে; এমন কি আত্ম-বিকাশের জন্য বেশী ভাগ জড় অস্ত্র হইলেও সময়ে সময়ে জড়ের অপেক্ষা না রাখিয়া স্ব-তন্ত্র ভাবে কাজ করে—।"

সর্ব্ব রকমেই দেখিতেছি নামরূপশীল এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড়জগতের মূলে নাম রূপাতীত একটা সত্ত্বা আছে—তার দুইটী বিধা;—জড় ও শক্তি। হইতে পারে পরন্তু আর এক সত্তার উহারা দুই বিধা। জড়ম জগতেও দেখিতেছি তেমনি সমস্ত দেহী জীবের দুইটী অংশ একটী ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, পরিনামী ও ক্ষণিক অর্থাৎ দেহটী—অপরটি অতীন্দ্রিয়; অপরিনামী ও শাশ্বৎ অর্থাৎ আত্মাটী।

এখন কথা হইতেছে এই যে শাশ্বৎ নিত্য অপরিনামী আত্মা ইহা তাহার ক্ষণিক ও পরিনামী আবরণ হইতে বিচ্যুত হইলে কি হয়? হয় যে তাহার ভুল নাই, হইলে আমরা বলি জীবের মৃত্যু হইল। মৃত্যু মানে কি ঐকান্তিক ধ্বংস annihilation? না—মৃত্যু এক পরিবর্ত্তন—দেহের মৃত্যু মানে দেহের নাম রূপের লয়—। দেহ কতকগুলা জড় পরমাণুর ক্ষণকালিক সংঘমাত্র। পদার্থের নাশ নাই 'না ভাবো বিদ্যাতে সত না সতো বিদ্যাতে ভাব—'যা আছে তাহার ধ্বংস নাই যা নাই তার অস্তিত্ব অসম্ভব। যদি দেহের মৃত্যু নাই তাহা হইলে তদপেক্ষা সত্য, নিত্য ও শাশ্বৎ যা তার মৃত্যু হইতে পারে না অর্থাৎ ধ্বংস হইতে পারে না—

কোনো বস্তু অদৃশ্য হইলেই যে ধ্বংস হয় তা বলা যায় না। দেহান্তে আত্মা অদৃশ্য হয় বলিয়া আত্মারও ধ্বংস হইয়াছে বলা বস্তু ভুল। আত্মা অশরীরী চিৎ বস্তু, দেহ যোগেই সে তার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছিল, দেহ গিয়াছে সুতরাং তাহার অস্তিত্বের প্রমান পাইতেছি না। অতএব সেও গিয়াছে এ সিদ্ধান্ত অসমীচীন।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে সে আত্মা অপরিণামশীল, এক ও নিত্য চিৎবস্তু। দেহের মৃত্যুরূপ পরিণাম ঘটিয়াছে…আত্মা উহা হইতে মুক্ত হইয়া অপরিণাম ধর্ম্মানুসারে স্বস্বরূপেই থাকিবে। কোনো পরিবর্ত্তনই তাহার ঘটিবে না—অর্থাৎ দেহবিযুক্ত হইয়াও আত্মা অমর অবস্থায় থাকিতে পারে।

তবেই দেখা গেল বিশ্ব পদার্থের মধ্যে নশ্বর ও অবিনশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি। জড়জগতে মূল পদার্থই কেবল অবিনশ্বর; আর মূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগে নিত্য যে নামরূপশীল সত্তা দেখা দিতেছে তাহাই নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল; এই মাত্র যাকে তুষার কণায় দেখিলাম, তাহাই জল বিন্দুতে দাঁড়াইল পরমুহূর্ত্তেই তাহা বাষ্পে পরিণত হইল। জলের জলত্ব গেল না, উহা অবিনশ্বর; গেল শুধু নামরূপ যাহা নশ্বর।

শক্তি সম্বন্ধেও তাই। জড়পিণ্ডের রূপ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত শক্তিরও রূপান্তর হইতেছে; রাশি শক্তি, অণুশক্তিতে, অণুশক্তি পরমাণুশক্তিতে পরমাণু-শক্তি তড়িৎশক্তিতে অনবরতঃ রূপান্তরিত হইতেছে। সমস্ত বিশ্বব্যাপারটীরাই কেবল একটা রূপ হইতে অরূপে, অরূপ হইতে রূপে যাতায়াত কাণ্ড। কেবল রূপান্তর—লীলা। নশ্বর মানে রূপান্তর প্রাপ্তি ধর্ম্ম। অবিনশ্বর তার উল্টা ব্যাপার অর্থাৎ রূপান্তর না হওয়া। জড় ও জড়শক্তি সম্বন্ধে তাই অর্থাৎ মূলের ধর্ম্ম অবিনশ্বরতা, নামরূপধারীর ধর্ম্ম নশ্বরতা।

'চিৎ' 'আত্মা' বা 'প্রাণ' বলিতে আমরা যা বুঝি তার সম্বন্ধে কি? সৎবস্তুর নাস্তিভাব বা অসৎ বস্তুর অস্তি ভাব কল্পনা করা যায় না। তাহা বিজ্ঞান বা দর্শনের অননু-মোদিত যে শক্তি অদৃশ্যকায় ভ্রূণবিন্দুর মধ্যে থাকিয়া একই মালমশলার সাহায্যে ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন জীব গাড়িয়া তুলিতেছে; অনবরত অবিরামী পরিবর্ত্তনশীল জড়কণা স্রোতের মধ্যে থাকিয়াও অপরিণামী ও নিত্য তাহা কি দেহধ্বংসে নিজেও ধ্বংস হইবে? অর্থাৎ 'অভাব' বা 'নাস্তি' পদার্থে গিয়া দাঁড়াইবে? যে চৈতন্য বস্তু, যে মননশক্তি যে স্মৃতি ধৃতি প্রেম ভক্তি ধ্যান জ্ঞান একটা নিরাকার রক্তপিণ্ডকে একটা বুদ্ধ, চৈতন্য, নিউটন, নেপোলিয়নে পরিণত করিতেছে তাহা দেহযন্ত্রধ্বংসে সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইবে? নিশ্চয়ই না। যাহা জীবদেহ গঠনের আগেও ছিল, সঙ্গে ও ছিল তাহা পরেও থাকিবে। আগে ছিল কেন বলি? কতকগুলি জড়-পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ, পরিণাম পরিবর্ত্তনে একটা ফুল, বা পাখী বা বানর বা মানুষের উৎপত্তি; আবার মানুষের মধ্যে একটা আদিম অসভ্য হইতে নিউটন বা র‍্যাফেলের ক্রম-

ভেদ আছে। একটা অজ্ঞাত চৈতন্যযুক্ত শক্তি নিশ্চয়ই আছে যাহা আগে হইতে ক্রিয়াশীল ও সচেষ্ট না থাকিলে এরূপ জীব ভেদ হইতে পারে না। এই সজ্ঞান চৈতন্য বিন্দু (Monads) অনাদি অজ ও অনন্ত, ইহা পরমাত্মা চৈতন্যেরই অংশ ও স্বজাতীয়। তদ্বস্তু ও তদ্ধর্ম্মী। সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষ ইহারা; মূলা প্রকৃতির ভিতর দিয়া সত্ব রজঃ তমঃ ধর্ম্মানুসারে আত্মবিকাশের চেষ্টা করিতেছে। পুরুষের এই আত্মবিকাশ ব্যাপারটা দেখা যাইতেছে যেন ক্রমবিবর্ত্তনের একমাত্র লক্ষ্য।

দার্শনিক বিচার আর একদিক দিয়া এই অপরিনামশীল শাশ্বৎ পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আমরা সেইটী এবার আলোচনা করিব।

Evolution বা বিশ্ব-বিবর্ত্তন ব্যাপার আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রকৃতি যেন মঙ্গল বা শ্রেয়ের অংশটুকু ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে যত্নপর। যুগ যুগ চেষ্টার ফলে মঙ্গল স্বরূপ যে লাভটুকু প্রকৃতি করিতেছেন তাহার একটী মূল্য আছে। সেটা তার জমার ঘরে মজুৎ হইতেছে। ভবিষ্যতে সেটীকে কাজে খাটাইতে হইবে। নিপুণা গৃহিণী যেমন ঘোল মথিয়া ননী তোলেন ও যত্ন করিয়া রাখেন উহা হইতে ঘৃত হইবে। এমন দিন ছিল যেদিন পৃথিবী একটা প্রাণহীন বস্তু পিণ্ড মাত্র ছিল; ক্রমবিকাশের ফলে এই প্রাণহীন পদার্থ (Inorganic) জৈব পদার্থে পরিণত হইল (protoplasm)। এই যে প্রাণবস্তু ইহা প্রকৃতির প্রথম নম্বরের লাভ। এই প্রাণময় বস্তু হইতে আবার চিন্ময় বস্তুর উৎপত্তি (conscousness)। ইহা দুই নম্বরের লাভ। ভবিষ্যতে প্রকৃতি এই জীব চৈতন্য হইতে আরো উচ্চতর চৈতন্য ফুটাইয়া তুলিবে। ইহাদের যে মূল্য প্রকৃতির জমার ঘরে কেবলই মজুৎ হইতে চলিবে। ইহার নাশ নাই; নাশ থাকিলে ক্রম বিবর্ত্তন মিথ্যা হইয়া যায়। কত কোটী কোটী বৎসর আগে জড় হইতে জীবসার তৈয়ারী হইয়াছে, তাহা কি ধ্বংশ হইয়াছে? তার পর এই প্রাণবস্তু হইতে চিতের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহা কি নষ্ট হইয়াছে? ইহাকেই আচার্য্য Hoffding conservation of value মঙ্গলের মূল্যের অবিনাশিত্ব বলেন। এই হিসাবে মানুষের চিৎবস্তু বা মানুষের অমরত্ব শাশ্বত বস্তু তার মূল্য আছে। তাহার ক্ষণিক জড়দেহ নষ্ট হইলে এ বস্তু নষ্ট হইবে না। কোনো না কোনো রকমে উহা প্রকৃতির ভাণ্ডারে জমা থাকিবেই। অবিরামী ধ্বংশ ও সৃজনের ভিতর দিয়া এই নিত্যবস্তু ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া জমিয়া উঠিতেছে। ইহার নাশ বা ক্ষতি সম্ভবপর কোনো মতেই নয়। এবং ইহা অনাদিকাল হইতে ছিল ও থাকিবে। অব্যক্ত ভাবে ছিল, ব্যক্তভাবে প্রকটিত হইতেছে মাত্র। মানুষের মধ্যে তার মনুষ্যত্ব (personality) বা ব্যক্তিত্ব এই চিন্ময় পদার্থ। তার জড়ময় দেহ হইতে এই তার চিন্ময়রূপ বেশী সত্য; এই জন্য জড়ময় দেহ রূপান্তর লাভ করিলে, এই চিন্ময় অংশ টিকিয়া থাকিবেই। কেন না ইহারই সাহায্যে অসীমের আত্ম-বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় ঘটিবে।

চিৎবস্তুর আভাষ আমরা মানুষের মধ্যেই প্রায় পূর্ণমাত্রাই পাই। জড়জগতে যেমন গতি (motion) চিদ্ জগতেও তেমনি চিন্তা (Thought)। দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও উহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বড় বিচিত্র ধরণের। চিন্তা গতিতে ও গতি চিন্তাতে নিত্য রূপান্তরিত হইতেছে। 'কাজ' অর্থে জড়ের গতি পরিবর্ত্তন; মানুষ যখন এই 'কাজ' করে তখন তার মূলে প্রেরণা শক্তি আসে সেই চিদ্বস্তু হইতে; আবার জড়জগতে গতি উৎপন্ন হইয়া চিদ্জগতে চিন্তা উৎপন্ন হয়। কোন যন্ত্র বলে চিন্তা গতিতে ও গতি চিন্তাতে রূপান্তরিত হইতেছে? সেই যন্ত্রটা মানুষের মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। মস্তিষ্কটী মাঝখানে থাকিয়া চিৎজগৎ ও জড়জগতের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। এ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় দেহের নাশে বা মস্তিষ্কের ধ্বংসে। কিন্তু যোগাযোগের যন্ত্র নষ্ট হইলেই যে যন্ত্র চালকের ধ্বংস হইবে তার কোনো হেতু নাই। টেলিগ্রাফের তার কাটা গেলে বা যন্ত্র বিগড়াইলেই যে সংবাদ প্রেরক বা প্রাপকের ধ্বংস হইবে ইহা ন্যায় সংগত নহে। আপাতঃ বুদ্ধিতে তাই মনে হয় বটে। জীবদেহস্থ চিৎশক্তি অক্ষম হইল মস্তিষ্কের ধ্বংসে; অক্ষম হইল মাত্র ক্ষয় হইল না। অদৃশ্য বা অতীন্দ্রিয় বলিয়া

অব্যক্ত থাকিয়া গেল কিন্তু অব্যক্ত বলিয়া কি নাস্তি নিশ্চয়ই না।

অস্তি যে তারই বা চূড়ান্ত প্রমাণ কি? এই চিদ্‌বস্তু যে তার পূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যমান তার প্রমাণ কি? তার তদিদংভাব (identity) কি করিয়া প্রমানিত হইবে?

উহার অস্তিত্ব পক্ষে এতক্ষণ ধরিয়া যে যুক্তি তর্ক করা গেল তা দর্শনের দিক দিয়া। অর্থাৎ—বস্তু মাত্রেরই ব্যবহারিক (phenomenal) সত্তা পরিণামী; কিন্তু তার তাত্ত্বিকত্ব (noumenal) সত্য এবং অপরিনামী। জীবের দেহটা ব্যবহারিক ভাবে মিথ্যা, কিন্তু তার আত্মাটা পারমার্থিক বা তাত্ত্বিক হিসাবে সত্য। আত্মাই তার স্বরূপ, দেহ তার বিরূপ বিশ্ববিবর্ত্তনে 'জীবাত্মা' পরমের একটা প্রকাশ ভঙ্গী, দেহটা প্রকাশের উপযোগী যন্ত্র মাত্র। ব্যবহারান্তে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

জীবের চিদ্‌বস্তুটী বিশ্বের ক্রমবিকাশ কারবারের Net result; খাঁটী লাভ কখনো ফ্যাল্‌না যায় না; জমার ঘরে থাকে; ক্রমসঞ্চয়ের উপযোগী হইবে বলিয়া। এই যে 'ভাণ্ডার জাত হওয়া' ইহাই জীবাত্মার অমরত্ব।

২।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র দার্শনিক বিচারে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান যুগের মনঃপুত হয় না। বিজ্ঞান তার পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে কি আত্মার অমরত্বের ইঙ্গিত পাইয়াছে? পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই অংশে সেই জাতীয় যুক্তি প্রমাণের আলোচনা হইবে।

মোটামুটী ছয় রকম অভিজ্ঞতা হইতে এই প্রমাণ ও যুক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়াছে:—

(১) টেলিপ্যাথী হইতে—Telepathy.

(২) অস্বাভাবিক চিৎ-তত্ত্ব হইতে—(Prœternatural psychology)

(৩) মিডিয়মের স্বতঃভাষন ও স্বতঃলিখন হইতে—(automatism)

(৪) সুপ্তচৈতন্ত শক্তির ক্রিয়া হইতে—(subliminal faculty)

(৫) প্রতিভা তত্ত্ব হইতে (Genius)

(৬) মানস ব্যাধি-লক্ষণ হইতে—(mental pathology)

১। ভাবচালনা বা Telepathy ঘটিত যুক্তি

অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক চিত্ত হইতে অপর চিত্তে ভাব চালনার নাম টেলিপ্যাথী। বিনা তারে বার্ত্তাবহ প্রণালীর মত ব্যাপারটা। সাধারণতঃ ভাব প্রকাশ করিতে গেলে আমরা জড়জগতে গতি উৎপাদন করি, তা ছাড়া কোনো উপায় নাই। বাহ্যজগতের বিষয়-বোধ ইন্দ্রিয়ের সাহায্য বিনা হয়না ইহাই আমরা জানিতাম, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়াও বিষয় বোধ করিতে পারি।

শুনা গিয়াছে স্বাভাবিক অবস্থায় একচিত্ত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অন্য চিত্তে ভাব জাগাইতে পারে; বৈজ্ঞানিকর চেষ্টা করিয়া পরীক্ষা যোগে এইরূপ ভাব চালাইতে পারিয়াছেন। এইরূপ ব্যাপারে প্রেরক (agent) ও গ্রাহক (recipient) উভয়ের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধানে কিছু আসিয়া যায় না। স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে ভাব চালনার বহু পরীক্ষিত দৃষ্টান্ত চিৎ-তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির (Psychical Research societyর) অন্যতম সভ্য Frank podmor এর রচিত thought transference and Apparition গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

কোনো লোক (গ্রাহক) যদি একটা নির্জ্জন স্থানে চুপ করিয়া ইন্দ্রিয়রোধ করিয়া মনকে নিশ্চেষ্ট (passive) করিয়া বসিয়া থাকেন, এবং সম্মুখে দ্বিতীয় একজন (প্রেরক-agent)—একাগ্রচিত্তে ··একটা বিষয় ভাবেন, তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে গ্রাহকের মনে আপনা হইতে সেই ভাব বা চিন্তা ফুটিয়া উঠিবে। পরীক্ষার সফলতার জন্য প্রথমে গ্রাহক ও প্রেরকের মধ্যে অঙ্গ সংযোগ দরকার হইত; পরে বিনা সংযোগে পরীক্ষা করিয়াও দেখা যায় সফলতা পাওয়া যায়। ···উভয়ের ব্যবধান নৈকট্যও যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে।

প্রেরক দূরবর্ত্তী কোনো গ্রাহকের মনে এই প্রকারে ইচ্ছা শক্তিতে ভাব চালাইতে পারেন। সময়ে সময়ে অনেক লোক অকস্মাৎ দূরদেশস্থ কোনো আসন্ন-মৃত্যু আত্মীয় বা বন্ধুর মায়াবীরূপ দেখেন। ইহাও এই টেলিপ্যাথীর ব্যাপার। এমন কি মৃতব্যক্তিরও ছায়ামূর্ত্তি অনেকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। টেলিপ্যাথী সাহায্যে এই ভাবচালনা তিন রকমে ঘটিতে পারে। (১) এক চিত্ত অতীন্দ্রিয় উপায়ে দ্বিতীয় চিত্তে ভাব জাগাইতে পারে। (২) এক চিত্ত উক্ত উপায়ে দ্বিতীয় চিত্তে তৃতীয় এক চিত্তের মধ্য দিয়া ভাব জাগাইতে পারে। তৃতীয় চিত্ত যেন দূতস্থানীয় সংবাদ বাহী। (৩) অথবা একচিত্ত দ্বিতীয় চিত্তে পরস্পর সংযোগী বিশ্ব-মনের (cosmic mind) ভিতর দিয়া ভাব চালাইতে পারে।

যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন জীব-চিত্ত যেন বিশ্ব-চিত্তের কাণ্ড বা শাখালগ্ন পাতার মত; মূলকাণ্ডের ভিতর দিয়া সমস্ত জীব চিত্তের যোগাযোগ ঘটে; আমরা এই সর্ব্বভূতস্থ বিশ্বাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিনা বটে কিন্তু এরূপ একটা সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাত্মা যে আছে তাহা খুব সম্ভব। সৌর গোলক হইতে যেমন সর্ব্বতঃ প্রসারী কিরণচ্ছটা বাহির হয়, তেমনি বিরাট বিশ্বাত্মা হইতে যাবতীয় জীবাত্মা ছটার মত বাহির হইয়াছে? যেখানে প্রেরক ও গ্রাহক উভয়েই পরস্পর সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেহ কাহারও চিত্তভাব জানে না, সেখানে এই ভাবচালনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। তৃতীয় এক সজ্ঞান জীবাত্মার ইচ্ছাক্রিয়া যদি এখানে না কাজ করে তাহা হইলে এই বিশ্বাত্মার মধ্যস্থতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির পরীক্ষায় এমন দৃষ্টান্ত ও ঘটিয়াছে।

মোট কথা Talepathy বা অতীন্দ্রিয় উপায়ে দুই চিত্তের মধ্যে ভাবের চলাচল বা দিব্যদর্শন (clairvoyance) যে পরীক্ষিত সত্য তত্ত্ব সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আর মত-দ্বৈধ নাই। জানিত সাধারণ প্রাকৃতিক উপায় (ইন্দ্রিয় সাহায্য) ছাড়া যে চিত্ত যোগাযোগ হইতে পারে ইহাতেই প্রমান পাওয়া যায় না কি যে জীবাত্মা জড়াতিরিক্ত অবস্থায় স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে? উহা সর্ব্বদা জড়দেহযন্ত্রের অধীন নহে?—কিন্তু ইহার আরো পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ আছে; যথা:—

(২) অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব ঘটিত যুক্তি।

চিন্ময় জীবাত্মা যে পঞ্চভূতময় দেহ হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিয়া কাজ করিতে পারে তার পরিপোষক প্রমাণ আছে; তবে জড়বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মত সাধারণের মধ্যে ততটা পরিচিত নয়, এবং সকলেও একমতে তাহা মানিতে চায় না। যে দুই চারিজন প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক এই অজ্ঞাত বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন তাহাদের তজ্জন্য অনেক বিদ্রূপ তিরস্কার ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে; তবে জ্ঞান সাধনার জন্য, সত্যের আবিষ্কারের আশায় তাঁহারা লোক মতের মুখাপেক্ষী নন। মনস্তত্ত্বের যে সব অলৌকিক ঘটনা হইতে জীবাত্মার স্বতন্ত্রস্তিত্ব বাদ প্রমাণীত হয় তাহা তিনটা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে যথা:—

(ক) প্রথম শ্রেণী—মনস্তত্ত্ব হইতে:—

(i) প্রতিভা—Genius, prodigy.

(ii) দিব্যদর্শন—Clairvoyance, psychometry,

(iii) ভবিষ্যদর্শন—Prevision, prognostication,

(iv) দিব্যশ্রবণ—Clairaudience.

(v) সত্যস্বপ্ন—True dreams.

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী—শরীর তত্ত্ব হইতে—(Physiological)

(i) স্নায়ু যন্ত্রের আত্যন্তিক উত্তেজনা বশতঃ অস্বাভাবিক অনুভব ক্ষমতা (Hyper-Æsthesia)

(ii) স্বতঃকথন ও স্বতঃলিখন (Automatic speech and writing)

(iii) রূপ ধারণ (materialisation)

(iv) দ্রব্যাদির স্বতঃ-সঞ্চালন, স্বতঃ আবির্ভাব, স্বতঃ তিরোভাব, অনবলম্ব স্থিতি, (movement, appearance, disappearance, of objects and levitation)

(গ) তৃতীয় শ্রেণী—রোগনিদান তত্ত্ব হইতেঃ—(pathological)

ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক জীবাত্মার (personality)

(i) বৈরূপ্য (change)

(ii) বৈকল্য (dislocation)

(iii) বিলয় (disintegration)

জীব-চৈতন্য তিনরকম বৃত্তির দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে, যথা :—জ্ঞানবৃত্তি (knowing) বোধবৃত্তি (feeling) ইচ্ছাবৃত্তি (willing)। চিত্তে এই বৃত্তি উঠিলে জীব নিজ দেহ যন্ত্র দিয়া জড় জগতে গতি উৎপাদন করে (Thought is translated into motion); আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া তাহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু এই সব বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত অনেক মনীষী বলেন যে "সময়ে সময়ে অশরীরী জীবাত্মা বিনা দেহ-যন্ত্র যোগে নিজ চিত্তবৃত্তি যে প্রকাশ করিতে পারে" তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জীবের সজ্ঞান-সক্রিয়-চিৎশক্তি যেমন জীবিত কালে দেহ গড়িয়া তার সাহায্যে আত্মবিকাশ করিত, মরণান্তে সেই চিৎ-শক্তি-ই যে নিজ দেহভাবে অন্য একটা দেহ অধিকার করিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারিবে ইহাতে অসম্ভব কি আছে? আর সত্যই এইরূপ পরিচয় কোনো কোনো অশরীরী আত্মা দিতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অন্য জীবিত দেহের অধিকার তো দূরের কথা; এই চিৎশক্তি ক্ষমতা বলে একটা ক্ষণিক দেহ তৈয়ারী করিয়াও আত্ম-পরিচয় দিতেছে। ইহা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ লব্ধ তত্ত্ব; অনুমান মাত্র নহে। অনেক গুণী ও জ্ঞানী এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন; অপর পণ্ডিতদের কথা অগ্রাহ্য হইলেও, বিবর্ত্তনবাদের অন্যতম জন্মদাতা Sir A. R. Wallace ও রসায়নাচার্য্য জগন্মান্য Sir W. Crooke এর সাক্ষ্য নগণ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে।

অবশ্য এইরূপ অঘটন ঘটনা কল্পনাতেও আনা যায় না; কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য বা সসীম কল্পনার অতীত বলিয়া ভগবানের অসীম বিশ্বভাণ্ডারের বাহিরে এ কথা জোর করিয়া বলা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া। কোটী যোজন দূরবর্ত্তী তারকার আকার, আয়তন, ঘনত্ব গুরুত্ব সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ একজন সাঁওতালের কাছে কল্পনাতীত বা তার বুদ্ধির অগম্য; বিনা তারে মুহূর্ত্তের মধ্যে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে সংবাদ পাঠানো ব্যাপারও তার বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং সে যদি এ সবের সত্তা-সত্যতা উড়াইয়া দেয় তবে আমরা কি বলি? বিশাল বিশ্ব-জগতের ব্যক্ত অংশ সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের স্থূল কয়টী ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ব; বাকী সমস্তই অব্যক্ত যদি এই অব্যক্ত মহাদেশ হইতে দু একটা আলোক রেখা কোনো কোনো অস্বাভাবিক ভাব-প্রবণ (sensitive) চিত্তে ধরা ছোঁয়া দেয় তা হইলে তাহার আবিষ্কারে বা তত্ত্বানুসন্ধানে মন দেওয়াই পণ্ডিতোচিত কাজ; হাসিয়া অবিশ্বাস করা মূর্খের ধর্ম্ম নয় কি?

৩। স্বতঃ কথন ও স্বতলিখন ঘটিত যুক্তি।

অলৌকিক মনস্তত্ত্বের এই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার যা হইতে জীবাত্মার বিদেহ অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায়। চলিত কথায় যাকে বলে 'ভর হওয়া' বা 'ভূতে পাওয়া' বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়া (Inspired) এ সেই ধরণের বা তাই-ই। ব্যাপার খানা এই। অনেক লোক এমন দেখা যায় যাহাদের স্নায়ুযন্ত্র এত অনুভূতি-প্রবণ (Sensitive) যে তাহারা সহজেই আপনা হইতে বা কৃত্রিম উপায়ে-মোহ মুগ্ধ হইয়া পড়ে; তখন তাদের নিজস্ব জাগ্রত চৈতন্য (Waking Consciousness) লোপ পায়; বাহ্য জগতের বিষয় বোধ বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু পরিবর্ত্তে আর এক অভিনব চৈতন্য জাগিয়া উঠিয়া কাজ করিতে থাকে, এবং সে চৈতন্য অতি অদ্ভুৎ অস্বাভাবিক শক্তির পরিচয় দেয়; দেখিলে মনে হয় যেন এক অদৃশ্য অথচ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্য বিশিষ্ট অশরীরী জীব তাহাকে পাইয়া বসিয়া তার দেহ-যন্ত্র যোগে মর্ত্ত্যদেহীদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করিতেছে। যেন সেই অজ্ঞাত কুলশীল জীব চৈতন্য দেহের অভাবেই এতক্ষণ তাহা পারিতেছিল না, এখন একটী খালি বা শূন্য দেহ-যন্ত্র পাইয়া কাজে লাগাইতেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই অজ্ঞাত চৈতন্য-আবিষ্টের (মিডিয়মের) বাক্‌যন্ত্র লইয়া কথা বলে —ইহাই স্বতঃ-কথন (automatic speech) আবার অন্য ক্ষেত্রে মিডিয়মের হাতটা আয়ত্বাধীন করিয়া লেখার দ্বারা মনভাব প্রকাশ করে ইহাই স্বতঃ লিখন। এই সব লিখন ও ভাষণের ভাষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়মের

অজানা ভাষা। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় মিডিয়মের নিজ আত্মা যেন দেহ-ঘর ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গিয়াছে, সেই অবসরে এক অপরিচিত অন্য আত্মা খালি ঘরে ঢুকিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই এই অজ্ঞাত চৈতন্য নিজেকে কোনো মৃত মর্ত্ত্যবাসীর মুক্তাত্মা বলিয়া পরিচয় দেয়; আপনা হইতে নিজের গরজে বা মর্ত্ত্যবাসী কোনো আত্মীয়ের নীরব আকুল আহ্বানে যেন খপরাখপর করিতে আসিয়াছে। এই সকল স্বতঃ-কথন ও স্বতঃ-লিখনের ভঙ্গী এমনি Dramatic, এমনি মৃতের ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক (Stamped with personality) এমনি আত্মত্ব প্রমাণ পূর্ণ (Suggestive of personal identity) যে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায়না যে কথিত ব্যক্তির আত্মাই বটে। অবশ্য নিশ্চয়রূপে বলা দুঃসাধ্য। জীবের জাগ্রত চৈতন্যের কতটুকু আমরা জানি? তার সমস্ত রহস্যই কি আমরা বুঝিয়াছি? মিডিয়মে আবির্ভূত এই যে অলৌকিক চৈতন্য এ কার? এর ধর্ম্ম কি?— পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত এই পরা চৈতন্যের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাতে মনে হয় যে হয়তো :—

(১) জগদান্তর বাসী অপার্থিব অন্য কোনো চিদাত্মার কাজ, বা—

(২) পৃথিবীবাসী অন্য কোনো জীবিত ব্যক্তির চৈতন্যের সচেষ্ট প্রভাব; বা—

(৩) মিডিয়মেরই নিজের সুপ্ত চৈতন্যের (Sub liminal Consciousness) অজ্ঞান ঘটিত বিকাশ; বা—

(৪) মিডিয়মের মস্তিষ্ক যন্ত্র অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়িয়া চারিপার্শ্বের চিদাকাশে মুদ্রিত (astral plane বা world) মৃতের ভাব বা চিন্তার ছাপ ধরিয়া সংবাদ দেয় [ফনোগ্রাফের রেকর্ডের ছাপ ধরিয়া কাঁটা যেমন জীবন্ত সুরের নকল তোলে সেই ধরণে, থিওসফি শাস্ত্রে এমনি একটা ইঙ্গিত আছে আমরা যা ভাবি সেই প্রত্যেক ভাব বা চিন্তার একটা ছাপ astral বা সূক্ষ্ম চিদাকাশপটে থাকিয়া যায়; তাহার নাশ নাই। ইহারাই ভাবরূপ বা Thought forms পরজন্মে জীব জন্মাইলে এই সব ভাবরূপ তাহার মস্তিষ্ক পদার্থে প্রতিঘাত তুলিয়া পূর্ব্বসংস্কার রূপে ফুটিয়া উঠিবে—এক্ষেত্রে অনুমান হইতেছে যে মিডিয়মের আবেশ অবস্থায় তার মস্তিষ্কের অনুভূতিশক্তি এত তীব্র মাত্রায় বাড়ে যে astral পদার্থে মুদ্রিত মৃত বা জীবিতের ভাবরূপগুলা তাহার সুপ্তচিত্তপটে বাজিয়া উঠে। মিডিয়মের আবেশ আর কিছু নয়, সহসা তার অনুভূতি-শক্তি অত্যন্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠে; তার তেজ এত হয় যে সহজ-মস্তিষ্ক তার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; যেমন অসহ মাত্রার আলোকের ঝাঁঝে চক্ষু অন্ধ হইয়া পড়ে; তখন উক্ত astral thought form উহাতে ধরা পড়িতে পারে, সাধারণ মস্তিষ্ক তাহা করিতে অক্ষম।]

হয়তো বা :—

(৫) মৃত কোন ব্যক্তির বিরহী জীবাত্মা আবিষ্টের মস্তিষ্ক যন্ত্রটাকে নিজ আয়ত্বাধীন করিয়া কাজে লাগায়— এবং মর্ত্ত্যবাসী আপন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করে।

এই পাঁচটা অনুমানের কোন্‌টা যুক্তিপ্রমাণে অধিক মাত্রায় সঙ্গত ও সম্ভব দাঁড়াইয়াছে তাহা বিচার করা যাউক। বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে একটা আদর্শ স্বতঃলিখন বা ভাষণের দৃষ্টান্ত পাঠ করা উচিৎ; ডাক্তার থর্ণটন্ নামক এক পাদরী পণ্ডিত তাঁহার কন্যা মিশ্ মে'কে লইয়া প্রেত বৈঠকে বসেন। মে'র স্বাভাবিক মিডিয়মি শক্তি ছিল। বৈঠক আরম্ভ হইবামাত্র প্রেত আবির্ভাবের লক্ষণ দেখা দেয়; ডাক্তার জিজ্ঞাসা করেন "পরপার হইতে কেহ উপস্থিত কি?"

উত্তর। হেনরি বেনস্

প্রশ্ন। কে আপনি?

উত্তর। ঈশ্বরের সেবক, বার্ত্তা প্রচারক (missionary) নাম ও পরিচয় পাইয়া দূরে আসীনা মিসেস্ থর্ণটন্ প্রশ্ন করেন—

আপনার সহিত শেষ সাক্ষাতের পর কোথায় চলিয়া যান?

উত্তর। আলজিরিয়া।

প্রশ্ন। সেখানে কি মারা যান?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন কেমন করিয়া।

বিষমাখানো সড়কীর আঘাতে।

প্রশ্ন। কিছু বলবার আছে?

উঃ। না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, আর কামনা করুন যেন কল্যাণ হয়—

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

বিখ্যাত মিডিয়ম মিসেস্ টম্‌সন দেহে এক আত্মার ভর হয়। পরীক্ষক লজ, সিজউইক ও মায়ার্সের মধ্যে একজন ছিলেন আত্মা নিজনাম বলিল মিসেস্ বি—। নিজজীবন সম্বন্ধে নানা প্রামাণিক গোপনীয়, অন্যের অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কথা বলিয়া নিজ আত্মত্ব (identity) প্রতিপন্ন করে। পরীক্ষক সন্তুষ্ট না হইয়া উহাকে এমন একটা সংবাদ দিতে বলেন, যাহা কোনো কালে কাহারো জ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। মিসেস্ বি মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বে পমেটমের একটা নূতন ফরমূলা নোটবুকে লিখিয়া রাখেন; কেহ তাহা জানিত না; আত্মা ঐ ফরমূলার (প্রস্তুতবিধি) উল্লেখ করেন। তাঁহার খাতা আনিয়া খোঁজা গেল; কোথাও পাওয়া গেল না; পরে বিশেষ তদন্তে দ্বিতীয় বারে দেখিতে পাওয়া যায়; তখনো সেটা Index বা সূচী পত্রে উঠে নাই (চি-অ-সমিতির কার্য্যবিবরণী—১৭।১৮) এই দুটী দৃষ্টান্ত অপক্ষপাত ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রথম নম্বরের অনুমানটী খাটে না। অর্থাৎ লোকান্তরবাসী অপার্থিব কোনো আত্মার কথা বা লেখা বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার ধর্ণটন্ অনুসন্ধানে জানেন হেনরী বেনসের আত্মা যা বলিয়াছিল সব খাঁটী সত্য। ঐ দেশে, ঐ ভাবেই তাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। ডাক্তার, বা তাঁর পত্নী বা কন্যা কেহই তাহা জানিতেন না। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে মিসেস্ বি'র— কথিত ফরমূলা লেখার কথা কেহ জানিতেন না। অন্য লোকবাসী আত্মার তাহা জানা অসম্ভব; কেননা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেহ সর্ব্বজ্ঞ নহেন; মঙ্গল বা শুক্রবাসী বা ভুবর্লোক বা স্বর্গলোকের স্থানীয় অধিবাসী local denizens আত্মারা অশরিরী জীবরা,, যে ধরা-বাসিদের গত জীবনের এত খুঁটীনাটী পরিচয় রাখিতে পারে এ ধারণা গা-জুরী।

দ্বিতীয় অনুমানও খাটে না। জীবিত কোনো মর্ত্ত্য-বাসীর সুপ্ত স্মৃতিস্তর হইতে যে মিডিয়ম এ সংবাদে যোগাড় করিয়াছে তাহা সম্ভব নহে, কেননা ডাক্তার ধর্ণটন্ বা তদীয় পত্নী বা কন্যা হেনরী বেন্‌সের শেষ বাসভূমি বা মরণ বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না, মিসেস বির—পমেটম কথাও কেহ জানিতেন না। :

তৃতীয় অনুমানও সম্ভবপর নহে। কেন না মিডিয়মের সম্পূর্ণ অপরিচিত মৃতআত্মার পার্থিব জীবন সম্পূর্ণ অপরিচিত দূরবাসী বা বিদেশীর জীবন স্মৃতি মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্যের মধ্যে স্থান লাভ কি করিয়া করিবে?

চতুর্থ অনুমান অতি উৎকট মাত্রায় অসম্ভব। চিন্তা বা ভাবগুলা যে অশরিরী অজড় immaterial তা সকলকেই জানেন। এই সব অজড় অশরীরী জিনিস, সূক্ষ্ম ইথর বা আস্ত্রাল (astral) স্তরে বা পটে কি করিয়া অঙ্কিত হইতে পারে তা মানব বুদ্ধির অগম্য। যদি বলা যায় অশরীরী চিদাকাশে মুদ্রিত থাকে তাহাই বা সম্ভবপর কি করিয়া? অজড় বস্তুতে অজড়ের ছাপ্ থাকা শূন্যতে শূন্য যোগ করিয়া সংখ্যা পাওয়ারই মত অসম্ভব নয় কি? যদি অশরীরী ভাবচিন্তার ছাপ থাকাই সম্ভব হয় তা হইলে জীবাত্মার সূক্ষ্মদেহাবলম্বনে মরণান্ত স্থিতি অসম্ভব কিসে? বরং বেশী সম্ভব ও বুদ্ধির গম্য।

কাজেই পাঁচটা কারণের চারটা না-মঞ্জুর হইলে পঞ্চম-টাতেই আশ্রয় লইতে হয়; অর্থাৎ আত্মার সজ্ঞানে পার্থিব-জড়দেহাতিরিক্ত অবস্থানেই সব চেয়ে সঙ্গত ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রেত বাদীদের মতে এই অনুমান-টাই বিজ্ঞান গ্রাহ্য হইয়াছে। তাহারা ইহাকে working Hypothesis রূপে (কাজ-চালানো মত) গণ্য করিতে চাহেন। পাঠক যদি Sir Oliver Lodge রচিত Ray-mond গ্রন্থ ও J. A. Hill রচিত New Evidences in Psychical Research এবং Psychical Investi-gation গ্রন্থদ্বয় পাঠ করেন তবে এই মতটীর অনুকূল যুক্তি প্রমাণ অসম্ভব মাত্রায় পাইবেন। John Arthur Hill নিজে বহুদিন যাবৎ সমিতির সভ্য থাকিয়াও প্রেতবাদে

সন্নিহান ছিলেন। তিনি সুপ্তচৈতন্য—বাদকে·· সঙ্গততর মত মনে করিতেন; প্রায় এগারো বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে তিনি প্রেতবাদ গ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—"The advance in psychical Research during the last 30 years enables us, as it seems to me, to go as far as that, to say that personal survival is a fact, and that some thing—not every thing—may be learnt of the surviving spirit's state and powers and interests and feelings." অর্থাৎ ৩০ বৎসর ব্যাপী প্রেততত্ত্বানুসন্ধানের ফলে স্থির চিত্তে বলা-যায় মৃত্যুর পর আত্মা সজ্ঞানে লোকান্তরে অবস্থিতি করে, এবং তার জীবন প্রণালী, কাজ কর্ম্ম, অবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যাইতে পারে।

এমতের বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের একটা মস্ত আপত্তি এই যে এরকম অদৃশ্য লোক—যেথায় জ্ঞাত প্রকৃতির নিয়মাদি কাজ করেনা বা খাটেনা—এরকম স্থান বা অবস্থা কেমন করিয়া সম্ভবপর? পণ্ডিত প্রবর হক্স্লি যিনি এদলের একজন নায়ক ছিলেন তাঁর কথা শুনুন:—Without stepping beyond the analogy of what is Known, it is easy to people the Cosmos with entities, in ascending scale, until we reach something practically indistinguishable from omnipotence, omnipresence and omniscience. (Essays on Some Controverted Questions p. 36)—সাদৃশ্য তুলনার সাহায্য ছাড়াও শুধু যুক্তি বলে তর্ক করিয়া অদৃশ্য অতি—প্রাকৃত জগতের ও তদ্বাসী ক্রমোচ্চ শ্রেণীর নানা অশরীরী জীবের ধারণা করা যায় এই ক্রমের সর্ব্বোচ্চ স্থানীয় জীবেরা কার্য্যতঃ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্ব-শক্তিমান তাহাও সম্ভবপর।

আমদের এই দৃশ্যমান স্থূল জড় জগতটারও তাহার অধিবাসীদের আকার, আয়তন, হাবভাব বিষয়ে আমাদের যে ধারণা তা সমস্তই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের ফল নয় কি? এমন যদি একটী জীবের কল্পনা করা যায় যে জন্মান্ধ, জন্ম-বধির ও স্পর্শানুভব শক্তিহীন তাহা হইলে এ জগতটা তার কাছে কেবলমাত্র কতকগুলি স্বাদ ও গন্ধের সমষ্টি মাত্র! আমাদের দেহস্থ কৃমির জগৎ, একটা পতঙ্গের জগৎ আর আমার জগৎটা কি একই চেহারার? পণ্ডিত প্রবর আচার্য্য Crookesএর এ সম্বন্ধে একটী মনোহর বর্ণনা আছে; পড়িলে আমার যুক্তিটা আরো পরিস্ফুট হইবে। দীর্ঘ-ইংরাজীটা না তুলিয়া দিয়া তাহার অনুবাদ দিতেছি:—এমন সব চিন্ময় জীবের অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব যাদের দর্শেন্দ্রিয় এমন সূক্ষ্মভাবে গঠিত যাহাতে আমাদের চক্ষুগোচর আলোক তরঙ্গ ধরা পড়ে না, কিন্তু আমাদের অননুভূত তরঙ্গ-গুলিই ধরা পড়ে। এই সব জীবের বাহ্য জগতটা আমাদের বাহ্যজগৎ হইতে একেবারে ভিন্ন রকমেই বোধ হইবে। আমাদের চক্ষুর গঠন এমনি যে তাহাতে সাধারণ আলোক তরঙ্গগুলি ধরা পড়ে; তড়িৎ বা চৌম্বক শক্তির তরঙ্গগুলি ধরা পড়ে না যদি আমাদের চক্ষু এমন হইত যে তড়িৎ বা চুম্বক তরঙ্গই ধরা পড়িত, আলোক তরঙ্গ ধরা পড়িত না, তাহা হইলে জগৎটা আমরা কেমন দেখিতাম? কাচ ও স্ফটিক তখন আমাদের চক্ষে কাঠের মত অস্বচ্ছ বোধ হইত আর ধাতুগুলি অল্পাধিক স্বচ্ছ দেখাইত। টেলিগ্রাফের তারটা মনে হইত পাথরবৎ কঠিন স্তরের ভিতর দিয়া সরু ফাঁপা একটা নল! ক্রিয়াশীল একটা Dynamo (তড়িজ্জনন যন্ত্র) একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের মত দেখাইত; আর একটা অক্ষয় চুম্বক পাথর তৈলহীন স্বয়মোজ্জ্বল অনির্ব্বানশীল প্রদীপের বা অগ্নিকুণ্ডের কাজ করিত; জ্বালানি কাঠ কয়লার জন্য মাথা ঘামাইতে হইত না।—Fortanightly Review 1892. page 716.

সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই লোক ছাড়া অদৃশ্য সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব অসম্ভব তো নয়ই, বরং বুদ্ধি-গ্রাহ্য ও বিজ্ঞানানুমোদিত অনুমান। আর জীবাত্মা এই স্থূল জড়-দেহ ছাড়িয়া, মৃত্যুর পর তদপেক্ষা একটা সূক্ষ্ম পদার্থ নির্ম্মিত দেহে সজ্ঞানে বাস করিবে ইহা খুবই সম্ভব। বরফ গলিয়া জল হইলে এবং জল তাপে উড়িয়া গিয়া অদৃশ্য বাষ্পে পরিণত হইলে তার জলত্ব কি নষ্ট হয়? আমরা, বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন জড়ের এই তিন অবস্থাই জানিতাম;

পণ্ডিতবর ক্রুক্‌সের প্রসাদে জানিয়াছি যে, জড়ের একটা চতুর্থ অবস্থা আছে, তাহা আরো সূক্ষ্মতর মানবিক অবস্থা তিনি উহার নাম দিয়াছে 'Radiant Matter'; অর্থাৎ 'দ্যুতিময়' বা 'ভাস্বর' অবস্থা।

মানুষের স্থূলদেহের ভিতর যে একটা এইরূপ দ্যুতিময় সূক্ষ্মদেহ আছে তাহা আজগুবি গল্প নহে—তাহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা লব্ধ সত্য। Mesmer ইহাকে fluidic magnetic body বলিতেন; থিওসফিষ্টরা ইহাকে Etheric Double বলেন; আচার্য্য ক্রুক্‌স্ নিজ পরীক্ষা বলে এই দেহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন; প্যারী নগরীর বিখ্যাত জীব ও প্রাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Dr. Baraduc ইহার নাম দিয়াছেন Mental-Ball মনোদেহ। ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যক Nash's Magazine এ আচার্য্য Baraduc-এর এই মনোদেহ লইয়া পরীক্ষার সবিস্তার বিবরণ আছে। ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ Camille Flammanan নিজ পরীক্ষালব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতেছেন যে— "The sub-consecions nature—the fluidic substance—the astral body may conceivably leave the physical organism and enter there again etc—" (On the Trail of the Ghost, by V. Thomson, Nash's Magazine, Sept Oct. 1908.)

যাই হোক প্রেতভাষণ ও প্রেত লিখন ব্যাপারের আলোচনা হইতেই আত্মার বিদেহাস্তিত্ব প্রমাণ চরমমাত্রায় পাওয়া যাইবে। এই অভাবনীয় তত্ত্বের আবিষ্কার এখনো সর্ব্বজন গ্রাহ্য হয় নাই, কারণ এখনো পরীক্ষা কার্য্য সম্পূর্ণ সন্তোষকর ভাবে শেষ হয় নাই। একটা কথা:—এবম্বিধ প্রেতভাষণ বা লিখন জাত যত সংবাদ আসে বা আসিতেছে তার সবই যে সত্যই কথিত কোনো আত্মার কাছ হইতে আসে এ বিশ্বাস—ঠিকনয়; আবার এও ঠিকনয় যে যে-সব সংবাদ কোনো নামধারী আত্মার নাম দিয়া আসে তা'র সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোনো এক বৈঠকে (sitting বা seance) প্রাপ্ত সমস্ত সংবাদ গুলার মধ্যে কতটা যে মিডিয়মের আত্মচৈতন্যের কারচুপি আর কতটা যে প্রেতের আত্মত্ব (identity) পরিচায়ক প্রমাণ তার হিসাব নিকাশ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার; তা সত্ত্বেও কতকগুলা স্থলে এই আত্মত্ব পরিচায়ক প্রমাণ খুব সন্তোষ জনক মাত্রায় পাওয়া গিয়াছে।

অনেকে এই সকল প্রেতালাপের (Spirit communication) মধ্যে অনেক খুঁটিনাটী ধরিয়া আপত্তি করেন; যথা:—প্রেতরা অতি তুচ্ছ কথা বার্ত্তা লইয়া কাল কাটায়; উহারা অনেকে অতি সোজা বিষয়ে ভুল করে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তুচ্ছ বিষয়ালোচনা সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যেমন Review of Reviews পত্রের ভূতপূর্ব্ব মহামতি Stead প্রণীত After Death; Stainton Moses কৃত Spirit teachings; Sweden Borg প্রণীত Heaven and Hell—পাঠ করিলে আপত্তিকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজ সমিতি যাহার উদ্দেশ্য প্রমাণ সংগ্রহে সত্য নির্ণয় করা তাহা এরূপ প্রেতকর্তৃক ধর্ম্মদর্শন বক্তৃতায় নির্ভর করিতে পারে না। ইহাদের বৈজ্ঞানিক মূল্য কতটুকু? প্রেতবর্ণিত পরকাল তত্ত্ব কে বিশ্বাস করিবে? কে তার সত্যাসত্য যাচিয়া দেখিবে? কাজেই এমন সব তুচ্ছ খুঁটিনাটী কথার আলাপ দরকার যাহা হইতে তার মর্ত্ত্যজীবনের স্মৃতিপরিচয় পাওয়া যাইবে। এই রকম তুচ্ছ কথা—কাহিনীর প্রামাণিক মূল্য বেশী। কোনো এক প্রেত পরকাল বর্ণনা করিতে গিয়া বলিল "আমরা" পরলোকে চোখ্ দিয়া পায়েস্ খাই"। সত্যতার প্রমাণ কি? একজন বলিল "পরলোক সাতটা সূক্ষ্মতর স্তরে বিভক্ত, পুণ্যবলে উপরে উঠিতে হয়, আমি তৃতীয় স্তরে আছি।" হইতে পারে মিডিয়ম্ ইহা কোনো পুস্তকে পড়িয়াছিল তার স্বপ্ন চৈতন্যে উহা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু যদি কোনো প্রেত বলে "আমি ৩রা ডিসেম্বর ১৯১৬ সনে দিল্লীতে বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে আমার বন্ধুকে এই তিরস্কার করিয়াছিলাম সে আমায় এই বলিয়া গালি দিল—আমি এই বলিয়া মাপ চাহিলাম—"। বৈঠকে কেহই তাহা জানিতনা, মিডিয়ম তো নয়ই—তার পর উক্ত বন্ধুকে দিল্লীতে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল—উত্তরে সমস্ত যথাযথ মিলিল—এ ক্ষেত্রে আপত্তিকারী কি বলিবেন?

পরলোক ও ইহলোক সর্ব্বপ্রকারে দুই ভিন্ন লোক, উভয় লোকবাসী নিজ নিজ পারিপার্শ্বিক হিসাবে দেহ ও চিত্ত প্রকৃতি হিসাবে খুবই ভিন্ন; সে ক্ষেত্রে যোগাযোগের ফল পূরা মাত্রায় আশা করা বাতুলতা। একটা মুক্তাত্মা অনভ্যস্ত পর-দেহ লইয়া কাজ করিবে; তার নিজের স্মৃতি ও চৈতন্য স্বপ্নাবিষ্টের মত তন্দ্রাবিজড়িত, সুতরাং তার কাছে জিজ্ঞাসা মাত্রে সমস্ত সঠিক উত্তর ত্বরিৎ গতিতে পাইবার আশা করা যেন ভীত ত্রস্ত ও শ্রমশীল বালককে একমিনিটের মধ্যে উত্তর না দিলে ফেল করিয়া দিবার ভয় দেখানোর মত হাস্যকর।

তা ছাড়া আমরা অধিকাংশ জনই আধ্যাত্মিক ও মানসিক ভাবে উহাদের সহিত ভাব আদান প্রদানের উপযোগীই নই। যে পরিমাণ চিত্তশুদ্ধি, মতিস্থৈর্য্য ও চিত্তধৈর্য্য এ কাজে প্রয়োজন তাহা রাখিনা; জ্ঞান-পিপাসুর প্রশ্ন ও কৌতূহলীর প্রশ্ন আর স্বার্থান্বেষীর প্রশ্ন পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন। সম্মিতি প্রেততত্ত্বানুশীলন ব্যাপারে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে জ্ঞান পিপাসু তুষ্ট হইবেন; অপর দুইজন হইতে পারিবেন না। কেননা সমস্ত সত্যের তত্ত্বই 'নিহিতং গুহায়াং' বিশেষতঃ পরলোকতত্ত্ব। Columbus জাতীয়—ধী ও হৃদয় ছাড়া এ গুহাপথে অগ্রসর হওয়া কঠিন।

(৪) সুপ্তচৈতন্য ঘটিত যুক্তি।

(Subliminal consciousness.)

> "We feel that we are
> Greater than we know—"
>
> Wordsworth.

আবিষ্ট ব্যক্তিদের (medium) কথিত বা লিখিত বিষয় এবং তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিলে একটা অজ্ঞাত তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা হইতেছে এই:— "জীবের মধ্যে আমরা যে চৈতন্য শক্তির ক্রিয়া দেখি মানুষে তাহা আংশিক পরিমাণে প্রকট, সমগ্রভাবে নহে। বাহিরে আমরা স্থূলতঃ যতটা প্রকাশমান, তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।" মনস্তত্ত্বের যেসব অলৌকিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বেশ বুঝা যায়, আমাদের সমগ্র জীবচৈতন্যের মাত্র একটা ভগ্নাংশ জাগ্রতাবস্থায় প্রকট থাকে, বাকী অংশটা সুপ্ত ও অক্রিয় ভাবেই থাকে; এখন মানব মস্তিষ্ক যে অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে তাহাতে উহার বেশী ধরিতে পারে না। সাদৃশ্য-তুলনা (analogy) দিয়া বুঝাইলে কথাটা পরিষ্কার হইবে। আলোক তত্ত্ব যার জানা আছে তিনি জানেন যে Ether বা আকাশ পদার্থের তরঙ্গ মালা আমাদের চখে পড়িয়া আলোর অনুভূতি জন্মায়। সেকেণ্ডে কতক সংখ্যক তরঙ্গ উঠিলে একরকম আলো হয়, লাল, নীল, পীত, সবুজ প্রভৃতি বর্ণের আলোর মধ্যে ভেদ কেবল এই তরঙ্গ সংখ্যার। একটা নির্দ্ধারিত সংখ্যক তরঙ্গের নীচের বা উপরের সংখ্যাকে ধরিবার মত আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি নাই। তা যদি থাকিত আমরা আরো অন্যবর্ণের আলো দেখিতাম। infrared, বা ultra-violet তরঙ্গমালা আমাদের চৈতন্যবোধের বাহির। শব্দ তরঙ্গ সম্বন্ধেও তাই। বায়ুতরঙ্গের ঘাত কাণে লাগিয়া শব্দ বোধ হয়। একটা নির্দ্ধারিত সংখ্যার উপরে বা নীচে বায়ুতরঙ্গাঘাত আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের বাহিরে আমাদের সসীম জাগ্রত-চৈতন্য প্রকৃতির যতটুকু ধরিতে পারে ততটুকুই ব্যক্ত-প্রকৃতি; তার বাহিরে অব্যক্ত প্রকৃতি অসীম। ক্রম বিকাশ গুণে কালে আমাদের বোধ যন্ত্র (মস্তিষ্ক) যত উন্নত হইবে অব্যক্ত প্রকৃতি ততই ব্যক্ত হইবে। Galileo নির্ম্মিত দূরবীক্ষণে যতটুকু দেখা যাইত এখনকার উন্নত ধরণের যন্ত্রে তদপেক্ষা হাজার গুণ বেশী দেখা যায়।— আমাদের অন্তরস্থ চিদাকাশটাও তেমনি উপরে নীচে, এ পাশে ওপাশে চতুর্দ্দিকে অসীম ভাবে বিস্তৃত; এই পাঁচটী স্থূল সসীম ইন্দ্রিয় তার খানিকটা মাত্র দেখাইতেছে। ইহাদের ক্ষমতা ও তীক্ষ্নতা যত বাড়িবে, চিদাকাশের ততই ক্রমশঃ তাদের গোচরে আসিবে। কোনো কোনো ব্যক্তিতে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম উপায়ে কোনো না কোনো—অতিমাত্রায় খরতর হইলে উক্ত চিদাকাশের অব্যক্ত অংশ হইতে জ্ঞান লাভ হয়। Mesmerism ও Hypnotism, এই অবস্থা লাভ হয়। কেহ কেহ, স্বভাবতঃ দিব্যদর্শী (clairovoyant) বা দিব্যশ্রাবী (clairaudient)। উহারা

এইশ্রেণীর। এখন যে শক্তিটা দুচার জনের মধ্যে কচিৎ দেখা দেয়, যুগ যুগ পরে মস্তিষ্ক যন্ত্রের ক্রমোন্নতি গুণে তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইবে। গুহ্য প্রক্রিয়া বলেও কোনো কোনো দেশে তান্ত্রিকধর্ম্মী বা যোগাচারী লোকেরা ঐ শক্তিলাভ করে তার প্রমাণ অছে। আবিষ্টরা (medium) মোহাবস্থায় (Trance) এই অতীন্দ্রিয় চৈতন্য শক্তির পরিচয় দিতেছে। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে অনুভূতিগুলি ধরিতে পারিতেছে না তাহারা যে চিদাকাশে ছাপ মারিতেছে না তাহা নহে; তাহারা Gramophoneএর Recordএর মত আমাদের সুবিশাল সুপ্তচৈতন্য পটে জমা হইতেছে ও অস্বাভাবিক উত্তেজনা ফলে সময়ে সময়ে উহারা আমাদের বোধ গোচর হইতেছে।

জীবের সমগ্র চৈতন্য সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান; কেবল লোকভেদে অংশ মাত্রায় প্রকট। অসীম আকাশ তার অতুল সম্পতি লইয়া চিরকালই মাথার উপর বিরাজ মান, গ্যালিলিও যতটুকু দেখিয়াছিলেন, তার চেয়ে হর্শেল বেশী দেখিয়াছিলেন; এখন লক্‌ইয়ার আরো বেশী দেখিতেছেন; কেন?—যন্ত্রের উন্নতি গুণে। সমগ্র-চৈতন্য একজন মূর্খ কৃষকে, বা আপনাতে আমাতে, বা র‍্যানাডে রামমোহন রায়ে বা বুদ্ধ চৈতন্যে কি সমভাবে প্রকট? এই তারতম্য নিশ্চয়ই মস্তিষ্কের যন্ত্রের অজানিত নিগূঢ় ক্রিয়া রহস্যেই নির্ভর করে। নানা, প্রকারে, নানা ইঙ্গিতে মানুষের মানস পটে এই কথাটা কি মাঝে মাঝে ধাক্কা দেয় না? যে—"We feel we are greater than we know"

ভাসমান তুষার শিলার iceberg যেমন ৯/১০ অংশ জলমগ্ন। মাত্র ১/১০ উপরে দৃশ্যমান, তেমনি আমাদের শাশ্বৎ সমগ্র-চৈতন্যের মাত্র ১ অংশ আমাদের জাগ্রতাবস্থায় ক্রিয়াশীল থাকে ৯ অংশ সুপ্তাবস্থায় অপ্রকট আছে। জলমগ্ন ভরা কলসীর ভিতরের জলে ও বাহিরের জলে কোনোই তফাৎ নাই; আঁধার রূপ বেড়া ভাঙ্গিলে বুঝা যায় সেই একই জল। সসীম সদেহ জীবগুলিও যেন একটা অসীম চিৎসমুদ্রে মগ্নমান কুম্ভের মত। আমরা যেমন বাহিরের জগতের সামান্যই জানি, অধিকাংশই আমাদের জ্ঞানের বাহিরে, তেমনি আমাদের অন্তর্জগতের অল্পই আমরা জানি, বেশী ভাগই আমাদের বোধাতীত। কি ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sensation) কি ভাববোধ (Emotion) কি সম্বোধি (Intellect) কি স্মৃতি (memory) কি ইচ্ছাশক্তি (will) কি কল্পনা (imagniation) সকলেরই একটা গভীর অজ্ঞাত স্তর আছে; সময়ে সময়ে সেই অজ্ঞাত স্তর হইতে এই বৃহত্তর ব্যক্তি চৈতন্যের পরিচয়-প্রমাণ আসিতেছে :—

সুপ্তানুভূতি—আমাদের জাগ্রতাবস্থার ইন্দ্রিয়যোগে বিষয় বোধ করিবার একটা সীমা আছে; উহার উপরে বা নীচে কোনো বোধই হয় না। পায়ের উপরে একটা ছোট পিপীলিকা চলাচল করিলে, আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু আরো একটু বড় গোছের কীট বা কয়টা পিপীলিকা এক সঙ্গে চলিলে তখন বোধ হয়; একটা পিপীলিকার স্পর্শবোধ যে আমাদের চৈতন্যের বাহিরে থাকিয়া যায় তাহা নয়; আমাদের জাগ্রত-চৈতন্য তাহা ধরিতে পারে না বটে, কিন্তু আমাদের সুপ্তচৈতন্যে যে তার বোধ পৌছায় না তা বলা যায় না; বরং পৌছায় যে তার প্রমাণ আছে। Mesmerise বা মোহ-মুগ্ধ করিলে, মুগ্ধ ব্যক্তিতে এই সুপ্ত চৈতন্য ক্রিয়াশীল হইতে দেখা যায়;—একজন লোককে মুগ্ধ করিয়া তাহার গায়ে ছুঁচ ফুটাইলে সে বলিতে পারিবে না, কিন্তু তার যদি মোহাবস্থায় স্বতঃলিখন শক্তি দেখা দেয় তাহা হইলে লিখিয়া জানাইবে কি ফুটিল, কবার ফুটিল ইত্যাদি। এমন সব হিষ্টিরিয়া রোগী দেখা গিয়াছে যাহাদের দৃষ্টি শক্তি অজ্ঞাতরূপে একটা অল্পপরিসর স্থানে নিবদ্ধ হয়; বাকী স্থানটা তাহাদের চখের সম্মুখে থাকিলেও উহা তাহারা দেখিতে পায় না; এমন সময় যদি উক্ত অদৃষ্ট স্থানে একটা বিছা বা সাপ ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সে ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিবে অথচ বলিতে পারিবে না কেন সে ভীত হইতেছে। এই বোধটা তার সুপ্ত চৈতন্য হইতে উঠিতেছে তার জাগ্রত-চৈতন্য তা অনুভব করিতে পারিতেছে না। যেমন অধিকাংশ আলোক-তরঙ্গ আমরা অনুভব করিতে পারি না, তেমনি অনেক অনুভূতি আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের বাহিরে থাকিয়া যায়, কিন্তু সুপ্তস্তরে জমা থাকে।

সুপ্ত-মনন-শক্তি—

Subliminal intellection :—

বিচার, বিবেচনা, সিদ্ধান্ত, হিসাব বা গণনা করা এই শক্তির কাজ। আমরা এগুলি সাধারণতঃ জ্ঞানতঃই করি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিনা বিচারে, বিনা গণনায় কঠিন কঠিন মনন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ও হয়। এরূপ শক্তির স্বাভাবিক পরিচয় পাওয়া যায়—অনেক calculating prodigyর মধ্যে। বড় বড় অসম্ভব জটীল, অঙ্ক—যাহা কসিতে শ্রম ও সময় দরকার হয়—তাহা এই অঙ্ক-ওস্তাদ্‌রা মুহূর্ত্তে করিয়া ফেলে, কাগজ পেনসিল দিয়া হিসাবের অপেক্ষা রাখেনা। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্যারী-নগরীর বিজ্ঞান মহাসভার কাছে এক ইতালী দেশবাসী নিরক্ষর মেষপালক বালককে হাজির করা হয়। সে ৩০ সেকেণ্ডে সাতটী অঙ্কযুক্ত রাশির কিউব-রুট্ বাহির করিয়া দিত। ডাক্তার ক্লারাপিড্, ফ্লুরি নামক এক মূর্খ জড়বুদ্ধি অন্ধ পাগলের কথা উল্লেখ করেন, এ লোকটা নাকি ৭৫ সেকেণ্ডে বলিতে পারিত ৩৯ বৎসর ৩ মাস ১২ দিনে কত সেকেণ্ড! লিপ্ ইয়ারও হিসাবে বাদ দিত না। বর্গমূল পদ্ধতিটা মুখে মুখে শুনাইয়া দিয়া অঙ্ক দিলে চার অঙ্কযুক্ত রাশির বর্গমূল মুহূর্ত্তে সঠিক মুখে কসিয়া দিত। অথচ হেঁরি পোঁকারের (Poincare) ন্যায় গণিৎ পণ্ডিত স্বীকার করেন তিনি একটা সামান্য তেরিজও কসিতে ভুল করিয়া বসিতেন। সুপ্ত চৈতন্যের অজ্ঞাত ক্রিয়া ছাড়া এ রহস্যের ব্যাখ্যাই হয় না। তার পর এটা অনুমান বা আন্দাজ নয়, পরীক্ষিত সত্য; সমস্ত মানুষেরই এই শক্তি আছে। মানুষকে মোহ মুগ্ধ করিয়া এই শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত Dr. Bramwell একজনকে মুগ্ধ করিয়া তাকে মনে মনে আদেশ করেন যে "তুমি জাগিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতে ২৪ ঘণ্টা ২৮৮০ মিনিট পরে একটা কাগজে ক্রুশ্ চিহ্ন লিখিবে ও সময়টা উল্লেখ করিবে। সে ঠিক সময়ে তাই করিল। শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর বেলা ৩।৪৫ মিনিটএ হুকুম হয়; লোকটী ২১শে ডিসেম্বর বেলা ৩।৪৫ মিনিটে উহা তামিল করে! অন্য পরীক্ষার সময় দেওয়া হয়;—মিনিট ৪৪১৭, ৮৬৫০, ৮৬৮০, ৮৭০০, ১১৪৭০; সমস্ত আদেশ ঠিক্ সময়েই সম্পন্ন হয়! জাগ্রতাবস্থায় মনে মনে হিসাব করিয়া এত মিনিটে কতঘণ্টা হয় নিরূপণ করা দুঃসাধ্য কিন্তু সুপ্ত চৈতন্য অজ্ঞাত উপায়ে সমস্তই অভ্রান্ত ভাবে করিল। তবেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের অপ্রকট জীব চৈতন্য শুধু যে গণনা করিতে পারে তা নয় তাহা আবার জাগ্রত চৈতন্য অপেক্ষা ভাল করিয়াই করে। অনেক ইতর জীব তাহাদের কাজকর্ম্মে এই শক্তির অদ্ভুত পরিচয় দেয়। মধুমক্ষিকা চাক নির্ম্মাণে যে জ্যামিতি বুদ্ধির পরিচয় দেয় তাহা এই সুপ্ত চৈতন্যেরই বস্তু। চাকের ঘর গুলার ছয়টা ধার (Hexagon) মাপে যে এক ইহা সে কি করিয়া মাপে? প্রবাসবাসী (migratory) যাযাবর পাখীরা কি করিয়া এক দেশ হইতে অন্য অপরিচিত অজ্ঞাত দেশ ঠিকানা করিয়া মহাসমুদ্রে পাড়ি দেয়? কুকুর কি করিয়া হাজার রকমের গন্ধ হইতে পরিচিত প্রিয় জনের গন্ধ বাছিয়া লইয়া ধরিতে পারে? এ সব কি সুপ্ত চৈতন্যেরই কাজ নয়?

সুপ্ত স্মৃতি শক্তি :—নানারূপ সত্য ও বিশ্বস্ত পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে আমাদের অপ্রকট স্মৃতি সমুদ্রের বুঝি তল বা কুল নাই। বাস্তবিকই জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত যত ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি যদি আমাদের মাথায় সজাগ থাকিত তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব দুর্ব্বহ হইত; ভ্রান্তি একটা যেন দেবতার বর। অথচ আমরা যা মনে রাখিনা তা চিত্তপট হইতে অদৃশ্য হয় না; সমস্তই মুদ্রিত থাকে; গ্রামোফোণের কাঁটাটা যখন যে যে দাগের উপর পড়ে তখনই সেটা ধ্বনিয়া উঠে; আমাদেরও মানস পটে মুদ্রিত অনুভূতিগুলা সবই বজায় আছে। চিদালোক টুকু যখন যেটাতে পড়ে তখনই সেটা ফুটিয়া উঠে; বা বায়স্কোপের আলোকোজ্জ্বল স্থানটীর মধ্যে যখন রিলের ছবি আসিয়া পড়ে তখনি সেটা দৃশ্যমান হয়।

মোহাবস্থায় (Trance) মিডিয়ম এই সুপ্তস্মৃতির অদ্ভুৎ পরিচয় দেয়। Sir J. Hamiltonএর পরাতত্ত্ব পুস্তকে একটা নিরক্ষরা দাসীর কথা লিপিবদ্ধ আছে। সে হিষ্টিরিয়াক্রান্তা হইয়া মোহাবস্থায় ল্যাটীন বা গ্রীক ভাষায়

এক প্রকাণ্ড ধর্ম্ম বক্তৃতা দেয় অনুসন্ধানে জানা যায় যে সে একসময় এক পণ্ডিত পাদরীর দাসী ছিল। পাদরী যখন পাইচারী করিতে করিতে ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতেন দাসী গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া শব্দ মাত্র শুনিতে পাইত। তাও অনিচ্ছা কৃত। সেই সব শব্দের ছাপা তার চিত্তপটে থাকিয়া যায়। সুপ্তচৈতন্য তাহা উক্তাবস্থায় জাগাইয়া তোলে।

স্বাভাবিক মোহাবস্থায় মিসেস্ পাইপার প্রভৃতি আবিষ্টেরা নিজ নিজ সুপ্ত চৈতন্য বলে অন্যান্য জীবিত ব্যক্তির সুপ্ত স্মৃতি হইতে বিস্মৃত ঘটনা জাগাইয়া তুলিয়া কোন মৃতাত্মার উক্তি রূপে হয় কথায় না হয় লেখায় ব্যক্ত করে। (চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির ১২ সংখ্যক ভলুমের ২৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

(৪) সুপ্ত সুখদুঃখাদিবোধ শক্তি

(S. Emotion):—

সাধারণতঃ একটী সুখ দুঃখের বাহ্য কারণ ঘটিলে মনের আবেগ বা চঞ্চলতা হয়; তার পর অনুরূপ দৈহিকলক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু কোনো কোনো সহজ-অভিভূতি-প্রবণ (Sensitrive) ব্যক্তির মধ্যে অকারণ আবেগ চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা দেয়। হর্ষ বা বিষাদের কোনোই সজ্ঞান হেতু নাই অথচ দৈহিক বা মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিল, বিখ্যাত মিডিয়ম মিসেস্ ভেরালকে একবার স্বতঃলিখন কালে অশ্রু-ত্যাগ করিতে দেখা যায়; মিসেস্ ভেরাল বুঝিতে পারেন নাই, অকারণে তাঁহার চখে জল কেন আসিল পরে স্বতঃ লিখনটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে তাহাতে তাঁহার দুই প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর উল্লেখ আছে। জাগ্রতাবস্থায় হঠাৎ অকারণ মানস চাঞ্চল্য ঘটিতে অনেকে দেখা গিয়াছে; তদন্তে দেখা গিয়াছে ঠিক সেই সময় অনুপস্থিত দূরবাসী কোনো প্রিয় জনের অমঙ্গল ঘটিয়াছে। মিসেস্ ভেরালের ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায়, যে তাঁহার অব্যক্ত চৈতন্যটী যে যুগপৎ মনন স্মরণ ও লিখন কাজ করিতে ছিল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখানুভবও করিতেছিল; এবং চোখের যন্ত্রটাকেও অশ্রু-ত্যাগ কাজ করইতেছিল।

(৫) সুপ্ত চেষ্টা শক্তি (will) ও কল্পনাবলে সৃজনশক্তি।

আমাদের অপ্রকট জীবচৈতন্য যে আমাদের অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া চেষ্টা করে বা কল্পনা যোগে সৃষ্টি করে তার সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষ জনক প্রমান পাওয়া যায়। স্বপ্নটা এই শ্রেণীর ব্যাপার। নিদ্রাকালে আমাদের বাহ্য চৈতন্য যখন বিশ্রাম লয়; বাহ্য জগতের জ্ঞান যখন লোপ পায় তখন সুপ্ত চৈতন্য অন্তর্জ্জগতে কারবার আরম্ভ করিয়া দেয়; পূর্ব্বানুভূত বিষয় বোধগুলাকে (percept) ভাঙ্গিয়া, গড়িয়া যোগ বিয়োগ করিয়া একটা নূতন দৃশ্য গড়িয়া তুলে; ক্ষণিকের জন্য একটা কাল্পনিক দেশ কালে ঘটনাগুলাকে সাজাইয়া একটা চিত্রাভিনয় (bioscope) চালায়; ব্যক্ত চৈতন্যটী উদাসীন সাক্ষী ভাবে তাহা ভোগ করে।

একশ্রেণীর স্বপ্ন আছে যা এই মিথ্যা স্বপ্ন হইতে ভিন্ন। এই সব স্বপ্নে জীবনের সত্য ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। ইহা সুপ্ত চৈতন্যের কাজ; আমাদের জাগ্রত চৈতন্য, বর্ত্তমান গত, সীমা বদ্ধ, জড়ের ভিতর দিয়া ভগ্নাংশে প্রকাশ মান; সুপ্ত চৈতন্য অসীম, ত্রিকালজ্ঞ এবং স্বয়ং প্রকটশীল; বাহ্য ঘটনার আরম্ভ ও শেষ আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সীমান্তে ঘটনাটী যতক্ষণ না উহার সীমানার মধ্যে পৌছায় ততক্ষণ সে অজ্ঞ; সুপ্তচৈতন্য, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন; জড় বিযুক্ত বলিয়া যুক্ত দৃষ্টি, কাজেই ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই উহার গোচর-গত। একটা বড় শোভাযাত্রা আসিতেছে; রাম রুদ্ধ ঘরের খড়খড়ির ভিতর হইতে দেখিতেছে; শ্যাম ছাদে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; স্বভাবতঃই রাম যে সময় এবং যতটুকু দেখিবে, শ্যাম তাহার অপেক্ষা বেশী অংশ দেখিবে ও অনেক আগে হইতে এবং পর পর্য্যন্ত দেখিবে। আমাদের জাগ্রত চৈতন্যটী রাম-ধর্ম্মী, আর সুপ্ত, অপ্রকট বা অব্যক্ত চৈতন্যটী শ্যামধর্ম্মী; অবশ্য এই দুই চৈতন্য স্বতন্ত্র নয়, এক মহা জীব-চৈতন্যেরই অভিব্যক্ত অংশদ্বয় মাত্র। সত্যস্বপ্ন তত্ত্বটা ঐ ধরণের। উহা পুরামাত্রায় সুপ্তচৈতন্যের কাজ এবং বস্তু-তন্ত্র (objective), আর আমাদের প্রাত্যহিক স্বপ্ন-গুলি সবই মিথ্যা ও অবস্তু-তন্ত্র (subjective)।

যে সব প্রতিভা-জাত কলাসৃষ্টি,—যথা র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, রোঁদার মর্ম্মরমূর্ত্তি, শেক্সপীরের হ্যাম্‌লেট, গেঁটের ফাউষ্ট বা বিটুহোভেনের সোনাটা বা ভিকটর হুগোর নতার-ডেম—সভ্যমানুষের গর্ব্বগৌরবের নিধি তাদের উৎপত্তি মূলে এই লোক লোচনাতীত সুপ্তচৈতন্য। অন্নদরের কলাবস্তুর জন্ম পদ্ধতি সাধারণ ধরণের। তাহারা সজ্ঞান চেষ্টার ফল মাত্র; শ্রমজাত মাথার ঘামে তাহাদের বীজ সঞ্চার হয়; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কলা নিধিগুলির দিব্য জন্ম; মহাকবি Goethe যাকে বলেন Alles ist, als wie gesh cenkt অর্থাৎ It is as if given, sent, bestowed তার মানে প্রত্যাদেশ লব্ধ। সৃষ্টিকারীরা যেন সে সময় একটা উচ্চতর অতীন্দ্রিয় রাজ্যে থাকিয়া ইহাদের মানস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও চিত্রকরের জীবনে এই সত্যটার প্রমাণ পাওয়া যায়। জর্ম্মণীর এক জীবিত বিখ্যাত চিত্রকর Jesus in the Garden of Gethsemane নামে এক চিত্র অঙ্কিত করেন। শুনা যায়, যিশুর প্রার্থনাকালীন অঙ্গভঙ্গীটার মনোমত কল্পনা না করিতে পারায় তিনি যার পর নাই মানসিক যাতনা ভোগ করেন; যত খস্‌ড়া নকসা করেন কোনটাই মানস কল্পিত ভঙ্গীর ভাবটা প্রকাশ করিতে পারে নাই; এমনি অশান্তি ভোগের মধ্যে একরাত্রিতে নিদ্রাযোগে তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন যিশু স্বশরীরে আসিয়া সেই ভঙ্গীটা উঁহাকে দেখাইতেছেন; তিনি তৎক্ষণাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া অৰ্দ্ধতন্দ্রাভিভূত অবস্থায় নকল করিয়া ফেলিলেন; জাগ্রত অবস্থায় সেই নকসা দেখিয়া, তিনি আশ্চর্য্য হন। মনমত ছবি অঙ্কিত হইল। বাস্তবিকই ছবিখানি শিল্প জগতের একখানি অমূল্য কোহিনূর।

বিখ্যাত নাট্যকার ইব্‌সেন তাহার Brand নামক নাটকখানি অলৌকিক উত্তেজনার আবেগে তিন সপ্তাহে শেষ করেন; রাত্রিকালে বিছানা হইতে ঘুমের ঘোরে নামিয়া অনেক সময় মনের ভাবগুলোকে কাগজে কলম জাত করিতে হইত। নারী ঔপন্যাসিক চার্‌লটী ব্রন্টেও নাকি ক্ষণিক উত্তেজনার বশীভূত হইলেই লিখিতে পারিতেন; অন্যসময় একেবারে কলম ধরিতেন না। এই উচ্ছাসের আবেগটা এমনই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত, যে তিনি পীড়িত হইয়া পড়িতেন। স্যার ওয়ালটার স্কট্ তাঁহার Bride of Lammermoor এই রূপ ভর অবস্থায় লেখেন। লেখা পড়িয়া শুনান হইলে তিনি তাহা অনেকস্থানে স্বরচিত কিনা বুঝিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক R. L. Stevenson এর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পের বই Treasure Island এই রূপ 'আবেশ-বিভোরতার' ফল। তাঁহার অধিকাংশ গল্পের আখ্যানভাগ নাকি এইরূপ স্বপ্ন-লব্ধ। Mozart নিজের সুরও সংগীত রচনা প্রণালী সম্বন্ধে বলিয়াছেন "All the finding and making only goes on in me as in a very vivid dream…whence and how—that I do not know and can not learn"। আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিবর নিজ রচণা সম্বন্ধে এমনি ধরণের একটী কথা বলেন—এই—অদৃশ্য অন্তর্শক্তিকে জীবন দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া তিনি নিজ রচনাগুলির গৌরব তাঁহাতে অর্পন করেন নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমানকে ছোট করিয়াছেন ফলে তাহারই এক কবিভ্রাতা (যাঁর এসত্যটা বেশী বুঝা উচিৎ ছিল) তাঁহাকে তজ্জন্য বিদ্রূপ করেন। শ্রেষ্ঠ প্রতিভার রহস্যটী যে জাগ্রতাবস্থার অধিকারীর বৃহত্তর চৈতন্যের কাজ অনেকটা যে স্বপ্ন সৃষ্টির মত স্বতঃক্রিয়া একথা অনেকেই জানেন না। চারলোটী ব্রন্টে ভগ্নী এমিলির এক গ্রন্থের ভূমিকায় যা লিখিয়া ছিলেন তাহা এই শ্রেণীর সমালোচকদের প্রনিধান যোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন :—"But this I know, the writer who posseses the creative gift owns something of which he is not always master-something that, at times, strangely wills and works for itself. * * If the result be attractive the world will praise you, who little deserves praise; if it be repulsive the same world will blame you, who almost as little deserves blame." ভাবার্থ ইহার এই :—"আমি এই মাত্র জানি যে লেখকের উচ্চদরের রচণা শক্তি আছে তিনি তার জন্য স্বতন্ত্র আর এক পরাশক্তির অধীন—এমন শক্তি যার কাছে তিনি নিজে অধীন যা নিজে কাজ করে, নিজেকে

নিজে চালায়। সৃষ্টফল যদি ভাল হয়, লোকে তাঁকে প্রশংসা করেন, মন্দ হইলে তাকেই নিন্দা করে, অথচ, যশ বা নিন্দার ভাগী তিনি নিজে আদৌ নন"।

তাহা হইলে উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে মানুষের মধ্যে তার অব্যক্ত সুপ্ত চৈতন্যটী নানা রূপে আত্ম প্রকাশ করে। তাহার জাগ্রত চৈতন্যটী তাহারই একটু মাত্র ব্যক্ত অংশ এবং ইহা জড়যন্ত্রাধীন বলিয়া সসীম, দোষযুক্ত; এবং কতক মাত্রায় আত্মপ্রকাশাক্ষম। যদি অনুভবে, মননে, স্মরণে ভাববোধে, বা কল্প সৃজনে ইহার এতদূর প্রসার হয় তাহা হইলে অধিকাংশ অলৌকিক ঘটনার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া স্বতঃই আমাদের এই রহস্যময় চিদ বস্তুর বাহিরে যাওয়া দরকার হয় না; এমন কি দেহাতিরিক্ত আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাদে সময় সময় সন্দিগ্ধ হইতে হয়; তথাপি এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা এই সুপ্তচৈতন্যের দ্বারাও ব্যাখ্যাত হয় না। বাধ্য হইয়া বিদেহাত্মার স্বাধীন ক্রিয়ায় বিশ্বাস করিতে হয়।

আচার্য্য জেম্‌স্ অনুমান করেন যে আমাদের জীব-চৈতন্য আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র ভাবে বিদ্যমান ভাবিলেও এমন মনে করা অসঙ্গত হয় না যে উহারা বিশ্বের মূলীভূত এক একাকার অবিচ্ছিন্ন মহা চিৎসমুদ্রেরই উপর তরঙ্গ স্বরূপ। এই বিরাটাত্মার সহিত জীবাত্মাগুলি সূত্রাত্মা ভাবে পরস্পর যুক্ত। এই বিরাট চিদ্‌সমুদ্রের নাম, anima nuindi দিয়াছেন। ইহাই অজ্ঞাত উপায়ে অদৃশ্য ভাবে বিশ্বস্থ সমস্ত খণ্ড চিৎকণাকে অখণ্ড ভাবে যুক্ত করিয়া রাখিয়া সকলের হইয়াও কার্য করিতেছে।

(৫) প্রতিভা ঘটিত যুক্তি—(Genius)

সভ্য মানুষের অনেক গুলা মানসিক শক্তি তাকে জীবনযুদ্ধে জয়ী করিবার পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় নহে। তথাপি সেই শক্তিগুলির বিকাশ যে মানুষে আমরা দেখি তাকেই আমরা পূজা করি ও ভক্তির চক্ষে দেখি, তাকেই আমরা মহাপুরুষ বলি; জ্ঞানবিদ্যা, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম্ম—এই সব মানসিক শক্তিরই অনুশীলন ফল। যাহাদের মধ্যে এই সব শক্তি অস্বাভাবিক মাত্রায় বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহাদিগকেই আমরা প্রতিভা বা Genius বলি। প্রতিভার চরম বিকাশ যেখানে দেখি সেখানে সে গুলিকে প্রকৃতির খাপছাড়া, উদ্ভট সৃষ্টি বলিয়া মনে করি, সাধারণের বাহিরে বলিয়া উহাদিগকে আমরা বিশ্ববিবর্ত্তণের by-prodnct বলিয়া মনে করি; বিবর্ত্তন যে ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে তাহার সহিত ইহাদের কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই এই আমাদের ধারণা; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা ঠিক অন্যরকমের বোধ হইবে। মানব জাতির ক্রমোন্নতির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারাটা বিশ্বনিয়ন্তার সমগ্র চৈতন্যে ফুটিয়া আছে, কেবল মাত্র অতীত ও বর্ত্তমানটাই আমাদের অংশচৈতন্যে ধরা পড়িয়াছে; তার ভবিষ্যৎটা আমরা জানিনা; না জানিলেও আগে হইতে তাহা (ক্রমোন্নতির অপ্রকট মূর্ত্তিটা) cosmic mind বা ঈশ্বরের মনে ঠিক তৈয়ারী আছে; এই সব প্রতিভা বা Geniusএ আমরা তাহার কিছু কিছু পূর্ব্বাভাষ পাই; সমগ্র মানুষ জাতটা ভবিষ্যতে ঐরূপ হইবে; এখনকার অতি দুর্লভ প্রতিভা শক্তি, তখনকার সাধারণ মানুষের সম্পত্তি হইবে। মানুষের চিৎশক্তিটা কতটা বেশী মাত্রায় প্রকট লাভ করিবে এবং কি পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তখন বাস করিবে বা কাজ করিবে এইসব প্রতিভার মধ্যে আমরা তাহার অকালিক ইঙ্গিত পাই। এখনকার একটী অতি সাধারণ সভ্য মানুষের ধীশক্তির সহিত পুরাতন প্রস্তর-যুগের palæeolithic যুগের, কোনো অসাধারণ মানুষের ধীশক্তির তুলনা করিলে এ কথাটা বেশ বুঝা যাইবে। সে যুগের চরম মানব-প্রতিভা এ যুগের একটা সামান্য স্কুলের ছেলের চেয়েও বোধ হয় কম ছিল। সময়ের জিনিস অসময়ে দেখা দিলে তাহাকে একটা অপ্রাকৃতিক বা অতি প্রাকৃতিক উদ্ভট জিনিস বলিয়াই মনে হয়;—মানুষের হাতে ষষ্ঠ অঙ্গুলীর মত। কাজেই গেটে, নিউটন মোজার্টকে সাধারণ হিসাবে exotic (বেতালা) accidental (আকস্মিক) by-product বলিয়া মনে হইবে। এই জাতীয় প্রতিভা যে বাস্তবিক পূর্ণমানবের আপাতঃ অপ্রকট মহাচৈতন্যেরই প্রকটরূপের পূর্ব্ব লক্ষণ, অন্ধকারের মধ্যে উদীয়মান উষা-লোকের পূর্ব্বচ্ছটা স্বরূপ, তার আর ভুল কি? ব্রাউনিং ঠিকই ধরিয়াছেন

"Of faculties, displayed in vain, but born
To prosper in some better sphere,"

জীবতত্ত্বশাস্ত্রে (Biology) একটা সত্যের উল্লেখ দেখা যায় (উহাকে Haeckel's law বলে) যে জীব মাত্রেই গর্ভবাস কালে (ভ্রূণাবস্থায় তার যুগ ব্যাপী পূর্ব্ব সমগ্র জাতীয় জীবনের ইতিহাসটা (ancestral past History) আওড়াইয়া লয়। এই নিয়মটীকে মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধেও খাটাইয়া লইলে বোধহয় অসঙ্গত হয় না।

অর্থাৎ এও বলা যাইতে পারে যে মানুষ তাহার বর্ত্তমান ক্ষণিক জীবনে কখনো কখনো ভবিষ্যতের সমগ্র পূর্ণ জীবনধারাটার একটা পূর্ব্বাভিনয় করিয়া লয়। প্রতিভা গুলি এই পূর্ব্বাভিনয়ের বিরল দৃষ্টান্ত; মানুষ যে সুখময় দূর অতীতে Angel হইবে তাহারই পূর্ব্ব সূচনা এই সব প্রতিভায় তবে এখন তাহারা অপ্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের চাপে 'are like ineffectual angels beating their wings in the void,"। জগদ্বিখ্যাত জীব তত্ত্ববিৎ De Vries এর Mutation Theoryর (হঠাৎ-রূপান্তর বাদ) যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে এইরূপ কতকগুলা উদ্ভট বা বিকট রূপের হঠাৎ আবির্ভাবের ফলে একটা নূতন (Species) জাতির উৎপত্তি হয়। এখন কার একটা বিদ্যমান Species চখে খুব স্বাভাবিক লাগিতেছে, কিন্তু উৎপত্তিকালে তখনকার লোকের চখে উদ্ভট বলিয়াই মনে হইয়াছিল। প্রতিভা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা; প্লেটো, নিউটন, বা শঙ্কর; শেলি বা মোজার্ট র‍্যাফেল এখনকার চখে প্রকৃতির উদ্ভট দৃষ্টান্ত হইলেও সুদূর ভবিষ্যযুগের সাধারণ মানুষ মাত্র। নিট্‌জের সুপারম্যান জাতীয় জীব।

(৬) মানস-রোগ নিদান তত্ত্ব ঘটিত যুক্তি (pathological)

সাঁল পেত্রিয়ারে এবং অপরাপর তজ্জাতীয় হাঁসপাতালে যে সব স্নায়ুবিকৃত রোগীর পরিচর্য্যা হয় তথায় দেখা গিয়াছে মানুষের কত রকমের মানস রোগ হইতে পারে; পূর্ণ পাগল, অর্দ্ধপাগল, বিকৃতচিত্ত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর এই সব হতভাগ্য লোকগুলা যে সাধারণ সুস্থচেতন লোকদের সমশ্রেণী জীব ইহা বিশ্বাসই হয় না। প্রতিভাযুক্ত লোক; সাধারণ দরের সুস্থচিত্ত লোক ও এই সকল বিকৃতমস্তিষ্ক লোক ইহারা জীব চৈতন্য বিকাশের তিনটী ভিন্ন ভিন্ন ক্রম (grade) নির্দ্দেশ করে; যদি জগতে প্রতিভান্বিত ব্যক্তি বা এই সব মূঢ় বিকৃতবুদ্ধি উন্মাদের অস্তিত্ব না থাকিত তাহা হইলে আমরা ধারণাই করিতে পারিতাম না, যে চিৎশক্তির বিকাশের একটা ক্রমভেদ আছে। সাধারণ মাঝারি ধরণের শক্তিকেই আমরা জীব চৈতন্যের নির্দ্দিষ্ট বিকাশ-মাত্রা মনে করিতাম; তুলনা অভাবে উহার যে উচ্চ বা নিম্নক্রম থাকিতে পারে ধারণাই করিতে পারিতাম না; কিন্তু সৌভাগ্য বলে তাহা নহে। জীবচৈতন্য যে নানা মাত্রায় প্রকটিত হইতে পারে তাহার প্রমান এই সব দিব্য প্রতিভা ও উন্মাদ বা জড়ভরতরা। প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিরই যেমন abnormal (অ-স্বাভাবিক) norml (স্বাভাবিক) বা super-normal (অতি স্বাভাবিক) মাত্রা আছে, আত্মচৈতন্যের ও তাই। প্রতিভাতে চৈতন্যের অতি স্বাভাবিক মাত্রা দেখি; জড়ে বা উন্মাদে উহার অ-স্বাভাবিক মাত্রা; আর রামে শ্যামে উহার স্বাভাবিক মাত্রা। মানুষেই যে এই জীব-চৈতন্যের বিকাশ সূত্রপাত তাহা নহে; ইভলিউশন বা অভিব্যক্তিবাদ যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা জানেন যে চৈতন্যের প্রথম সূত্রপাত আদিম জীব-পঙ্কে (protoplasm)। চক্ষুর অগোচর জীবাণু হইতে শক্তিশম্বুকে (Mollusea) তাহা হইতে জলচর মৎস্যে, তাহা হইতে সরীসৃপে (Reptilia) তাহা হইতে চতুষ্পদ এবং ক্রমশঃ দ্বিপদ স্তন্যপায়ীতে নরবৎবানরে, বানরবৎনরে ও সব শেষে সভ্য মানুষে এবং চরমে বুদ্ধ নিউটন তুল্য প্রতিভায় এই অবিচ্ছিন্ন জীব-চৈতন্য ধারা কেমন ক্রমানুসারে উঠিয়াছে; ভবিষ্যতে ইহার বিকাশ অতি মানবে গিয়া পৌছিবে না কে বলিল? ব্যক্তি-চৈতন্যের একত্ব, অসীমত্ব ও সনাতনত্ব উত্তমরূপে এই বিকাশেই জাজ্জ্বল্যমান; অমরত্বের যদি এই তিনটী লক্ষণ ন্যায়ানুমোদিত হয় তাহা হইলে উহা যে অমর তাহার সন্দেহ করা যায় না।

মানুষ তাহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা গুণে যে অবস্থার সহিত পরিচিত সেইটীকেই স্বাভাবিক বলিয়া জানে, সে অবস্থার ইতরবিশেষের দু একটা দৃষ্টান্ত ঘটিতে দেখিলে তাহাদের অ-স্বাভাবিক unnatural বলিয়া দুর্ণাম দেয়; অনেকে Genius প্রতিভাকে এক ধরণের পাগলামি বলিয়া বিদ্রূপ করেন; জড় বা উন্মাদ বা বিকলমস্তিষ্ককে 'রোগী' বলিয়া সহানুভূতি দেখান। মানব হইতে অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর উচ্চতর জীব সেই ভাবে যদি আমাদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিয়া তাহারা আমাদের চৈতন্য-শক্তিকে কি ভাবে দেখিবেন? বোধহয় আমরা এই সব 'রোগীকে' যে চক্ষে দেখি। আমরা সমস্ত মানুষ জাতটী যদি এই Hystericদের শ্রেণীর সঙ্গে এক শ্রেণী হইতাম, তাহা হইলে কেহ আমাদের মধ্যে যদি বলিতেন যে "এটা আমাদের সমগ্র বা চরম চিদাবস্থা নয়, আমরা এইরূপ থাকিব না; ইহা হইতে উর্দ্ধতরস্তরে উঠিব।" তাহা হইলে আমরা সাধারণে তাঁহার কথা অসম্ভব বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু তাই কি যুক্তিসঙ্গত? এই সব জড়-উন্মাদ রোগীদের সময়ে সময়ে এরূপ ক্ষনিক সহজ অবস্থা আসে যখন তাহাদের দৈন্য ও বিকলতা সব পরিষ্কার হইয়া যায়, অন্তঃস্থ চিদজ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখন তাহাদের পূর্ব্ব জড়াবস্থাটা তাহাদের কাছে স্বপ্নবৎ বোধ হয়, এবং তাহারা স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে থাকে 'আমাদের কোন অবস্থাটা ঠিক?'

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সেই কথার প্রয়োগ হইতে পারে। এমন কি এক সময় আসিতে পারে না যখন আমরা মানুষ আমাদের এই অতি পরিচিত স্বাভাবিক (?) চেতনা-স্তর হইতে উর্দ্ধতর এক স্তরে উঠিয়া দাঁড়াইব এবং বিস্মিত ও মুগ্ধ নেত্রে নিজেদিগকে এক পরম রমণীয় ও মহণীয় লোকের অধিবাসী বলিয়া জানিতে পারিব না? জন্মান্ধ মন্ত্রবলে দৃষ্টিলাভ করিয়া এই রূপ-রস বর্ণ-গন্ধ-গীত-ময়ী ধরণীর মহণীয় মহিমা দেখিয়া মুগ্ধ ও মুহ্য হয় যেমনি, তেমনি শত সূর্য্যদীপ্ত ওপারের আলোক সমূদ্রে ভাসিয়া উঠিয়া ঘন কুজ্ঝটিকাবৃত এ-পারের অন্ধকারকে স্মরণ করিয়া যুগপৎ ভয় বিস্ময়ে ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিব না?

নিশ্চয়ই সে দিন আসিবে। সমগ্র মানব জাতিরও সেই শুভদিন আসিবে যখন তার বর্ত্তমান জাগ্রতচৈতন্যের ক্রম উচ্চ হইতে উচ্চতর ও উচ্চতম স্তরে প্রকাশমান হইয়া তাহাকে মহনীয় অতি মানবের পরা-শ্রেণীতে তুলিয়া দিবে; সেই পূর্ণ-মানব চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান-চৈতন্যের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, হাঁসপাতালের এই সব জড়-উন্মাদের চৈতন্যে ও আমাদের চৈতন্যে যে প্রভেদ আমাদের চৈতন্যে ও সেই পরা-মানবের চৈতন্যে সেই প্রভেদ।

"Prognostics told
Man's near approach; So in man's self arise
August anticipations, symbols, types
Of a dim splendour ever on before."

আর এখনকার আমরা? আমরা কি সেই মহা চৈতন্যের স্বাদ পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব। সেই মহা-চৈতন্য যে আমাদেরই এই দেহ কারাগারে নিবদ্ধ—আমরাই যে সেই 'তৎত্বম অসি' 'সোহম্' তুমি, আমি সব সেই অনন্ত অবিনাশী চৈতন্যরূপী। যখন জীর্ণবাসের মত এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইব যখন এ পাষাণ-কারার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহির হইব তখনই দিব্য নেত্র খুলিয়া যাইবে, দেখিব আমরা সেই অমৃত ময় আনন্দ লোকে যেথায়

ন সূর্য্য ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোয়ম অগ্নি?

মরণের স্বর্ণতোরণ দিয়া অমৃতের এই লোকে যাইবার আশাতেই হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সভ্যতার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিয়া ভারতের ঋষিরা সেই মৃত্যু-মঙ্গলকে আহ্বান করিয়াই সদর্পে বলিতে পারিয়াছিলেন:—

"অসতো মা সদগময়—
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়—"

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

আলো-আঁধারী

তৃতীয় চিত্র।

[একটা শুভ্র আলোকে ঘর ভরিয়া উঠিল। সেই আলোক মণ্ডলের মধ্যে-ঘন নীল ছায়ামূর্ত্তি, শ্যামা। ছায়া-মূর্ত্তি স্ফুটতর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অশরীরী গান। ধীরে ধীরে সে শয্যার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।]

গান।

ঐ নাচে নাচে নাচেরে
মেঘ-কুন্তল উড়ে চঞ্চল জগদম্বিকা নাচেরে।
ঘন কম্পিত দশদিশা,
ছুটে সঙ্কিত সব তৃষা,
অম্বর মহা মন্তরে
আজি তাণ্ডবে নাচেরে॥

নাচে উলঙ্গী উল্লাসে,
কাঁপে ধরিত্রী নিঃশ্বাসে,
বিদ্যুতে শত ব্যর্থ বাসনা
উন্মাদ হয়ে নাচেরে॥

হৃদয়-রক্ত-রঞ্জিতা,
সর্ব্ব-ভূষণ-বঞ্চিতা,
অশন-ক্লিষ্টা, নিত্য-পীড়িতা
রিক্ত বক্ষ যাচেরে॥

জনম-মরণ-রঙ্গিনী,
দুঃখ-দৈন্য-সঙ্গিনী,
অন্তর-সরে বেদনাপদ্মে
রক্ত-চরণ রাজেরে॥

কেশ কদম্বে প্রলয়-ধ্বান্ত,
দোলে নিতম্বে যুগযুগান্ত,
উলসি বক্ষে দিবাশর্ব্বরী
ষড়ঋতুহার গাঁথেরে॥

দীর্ণ-গগন জীমূত মন্দ্রে
আবরি'ফেলেছে তারকাচন্দ্রে
চরণ-ভঙ্গে মথিত-সিন্ধু
কোটী তরঙ্গে মাতেরে॥

নাচে ব্যোম মহা প্রণবে
নাচে পৃথ্বী ফুল-পল্লবে
নাচে পরাণ রভস রঙ্গে
গন্ধে বরণে স্বাদে রে॥

মহামানবের বক্ষ মাঝে
নাচে ভরসা সমর সাজে
নিত্য নবীন বিশ্ব কাব্যে
সঙ্গীতে হাসে কাঁদেরে॥

ছায়ামূর্ত্তি—
মলিন!

মলিনা—
কে? মা, মা তুমি এসেছ?

ছায়ামূর্ত্তি—
হ্যাঁ আমি তোমার মা।

মলিনা—
মা, তোমার অমন চেহারা কেন?

ছায়ামূর্ত্তি—

আমি তোমার দুঃখ কষ্টে জ্বলে পুড়ে ঘোর কাল হয়ে গেছি।

মলিনা—

মা তোমার কাপড় কোথায় ? কাপড় পরনি কেন ?

ছায়ামূর্ত্তি—

মেয়ের লজ্জা সংসার রাখলে না, তাই মায়ের লজ্জা কিসে ঢাকবে ?

মলিনা—

তোমার এলোচুল ভিজে রয়েছে কেন মা ?

ছায়ামূর্ত্তি—

তোমার চোখের অফুরন্ত জল মোছবার জন্যে আমি চুল এলো করে রেখেছি, তাই আমার চুল কখনো শুকোয় না।

মলিনা—

তোমার হাত শুধু কেন ? তোমার গয়না কোথায় গেল ?

ছায়ামূর্ত্তি—

মেয়ে যখন আমার সকল শোভা, সকল মাধুর্য্য হ'তে বঞ্চিত হয়েছে, তখন আমার আর বেশভূষা অলঙ্কার কি আছে ?

মলিনা—

মা তোমার সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ?

তুমি আমার মেয়ে অথচ এ সংসারে তোমার স্বামী মেলে না, তাই আমি সিঁদুর মুছে ফেলেছি।

মলিনা—

তোমার জিভ অমন লক্‌লক্ করছে কেন ?

ছায়ামূর্ত্তি—

এত বড় অন্নপূর্ণা পৃথিবী তোমার একটী পেটের অন্ন জোগাতে পারে নি, তাই আমি বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মলিনা—

তোমার চোখ অমন রক্তবর্ণ কেন ?

ছায়ামূর্ত্তি—

সংসার যে নির্দ্দয় দৃষ্টিতে তোমাকে দেখেছে, তার সেই বিষদৃষ্টি আমার চোখে এসে বর্ত্তেছে।

মলিনা—

ওমা তোমার আর একটা চোখ যে, কেমন ওটা শান্ত, কেমন করুণ!

ছায়ামূর্ত্তি—

ঐ চোখে আমি সব বেদনায় কাঁদি, সব আঁধারে দেখি।

মলিনা—

তুমি কোথা হ'তে আস্‌ছ মা ? স্বর্গ হ'তে ?

ছায়ামূর্ত্তি—

না তোমার অন্তর হ'তে!

মলিনা—

আমার অন্তর—হ'তে! কই কোথায় ?

দেখতে পাচ্ছনা ঐ যে যেখানে ছেলের বাপ বিয়ের সভায় হাজার লোকের চোখের ওপর মেয়ের বাপের বুকের রক্ত চুষে খেতে লজ্জা বোধ কর্চ্ছে না—ঐ যে যেখানে নিরপরাধিনী মেয়েটী আপনার জন্মের লজ্জায় মরণকে বরণ করে আপনারই চিতাগ্নিতে কুশণ্ডিকার যজ্ঞের নিজেই আয়োজন করছে—ঐ যে যেখানে ঘরের লক্ষ্মী সারাজীবন খেটে খেটে শিশুদের খাওয়াতে আর মাতাল স্বামীর সেবাতে আপনাকে প্রতিনিয়ত চিতাগ্নির ইন্ধনে পরিণত কচ্ছে ঐ যে যেখানে জরাগ্রস্ত নির্দ্দয় সমাজ শত শত শাসনের সৃষ্টি করছে, কিন্তু এক মুঠো অশন বা এটুকুরো বসনের কোনও জোগাড় করছে না, সেইখানেই যে আমার এই স্নেহকাতর চির দুঃখিনী মেয়েটী কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। তোমার বুকভরা বেদনা এই নির্দ্দয় জগৎকে কাণায় কাণায় ভরে ফেলেছে, মা! রোগা, দুঃখী, অনাথ, অসহায়ের করুণ ক্রন্দন, সতীর আঁখিজল, বালিকার বেদনা, অনাথের আর্ত্তনাদ, রোগের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, ক্ষুধিতের প্রার্থনা, সমস্তের মধ্যে যে তুমি—সেই তোমার বহিরন্তরের চিরবেদনাময় স্বর্গ হ'তে আমি এই বেশে এসে দাঁড়িয়েছি মা।—

মলিনা—

উঃ কি কষ্ট মা! কি কষ্ট! মা, আমার কাছে এসে একটু বোস না।

ছায়ামূর্ত্তি—

আমি ত তোমার কাছেই আছি, মা—ঘুমোও তুমি।

[মূর্ত্তি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইতেছে মলিনা অনুভব করিতেছে, ছায়ামূর্ত্তি তাহার সর্ব্বাঙ্গে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতেছে।]

হাত বুলানি গান।

তুমি ঘুমিয়ে পড় অঘোর ঘুমে
আমি শিয়রে রাত রইব জাগি—,
ওরে আমার কাঙ্গাল মেয়ে
আমি যে তোর অনুরাগী।

আকাশ-ছাওয়া হাজার তারা,
অনিমেষে চাইছে যা'রা,
আঁধার ঘরের তারাই মাণিক
জাগ্‌ছে তারা তোমার লাগি!

চাঁদের কিরণ হাসির রাশি,
মলিন মুখে উঠবে ভাসি,
ফুলের শোভা মনোলোভা
তোমার তরে আন্‌ব মাগি।

অমন করে আর চেয়োনা,
গুমরে মরে আর গেয়ো না,
ঘুমিয়ে পড় জুড়িয়ে যাবে
কেন মিছে দুখের ভাগী।

মলিনা—

[অর্দ্ধ নিদ্রিত ভাবে]

কৈ কোথায় তুমি? মা, তুমি চলে যাচ্ছ?

ছায়ামূর্ত্তি—

না, যাব কেন? তোমার অন্তর ছাড়া আমার স্থান কোথায়?

মলিনা—

[কাঁদিয়া উঠিয়া] আমি তোমার সঙ্গে যাব, এখানে থাকব না, আমার ভয় কচ্ছে। [ছায়ামূর্ত্তিকে ধরিবার চেষ্টা]

[ছায়ামূর্ত্তি পুনরায় স্ফুটতর হইল]

ছায়ামূর্ত্তি—

এই গাঁটছালায় তোমায় তোমার জীবনের ঠাকুরের সঙ্গে বেঁধে দিলাম, যাকে বেঁধে দিলাম সে তার বুক দিয়ে তোমাকে সব ভয় হ'তে রক্ষা করবে। সে তোমার বেদনায় কাঁদবে, আনন্দে হাসবে, তোমার জীবন পথের সব কণ্টক দূর করে দেবে। তার হাতে হাত রেখে ঐ আলোর পথে তুমি আনন্দ লোকের যাত্রী হ'বে।

মলিনা—

[অঞ্চলের গাঁঠটী মুষ্টিমধ্যে ধরিয়া গবাক্ষ পথে একবার দূর নক্ষত্রলোকের দিকে চাহিল। তারপর বলিল]

আর ভয় নেই, মা—মা—।

ছায়ামূর্ত্তি—

আর না, এইবার ঘুমোও

[আলোক নিভিয়া গেল, আবার সব অন্ধকার, হাত বুলানি গান গুণ-গুণ শব্দে মিলাইয়া গেল। ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাবের পূর্ব্বে যেমন সব ছিল ঠিক তেমনি। করুণার প্রবেশ। করুণা এইবার প্রদীপ জ্বালিয়া ঔষধ খাওয়াইল। তাহার পর মলিনার মাথায় হাত বুলাইয়া বাতাস করিতে লাগিল।]

মলিনা—

[চক্ষু মেলিল; তাহার মুখ অলৌকিক জ্যোতিতে পরিপূর্ণ, সে উল্লসিত হইয়া বলিল]

দিদি, দিদি! কে এসেছিল জান?

করুণা—

এখনও রাত্রি আছে, ফের ঘুমাও।

মলিনা—

বল দেখি কে? কখনো বলতে পারবে না—মা—এসেছিল।

করুণা—

তুমি স্বপন দেখছ!

মলিনা—

স্বপন বল্‌ছে—এই দেখ আমার কাছে কি? দেখ, [মলিনা কাপড়ের গাঁটটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া এমন ভাবে নাড়িতেছে বোধ হইতেছে যেন কাহার সঙ্গে সে বাঁধা।]

করুণা—

কি ওটা?

মলিনা—

দেখ তুমি। [করুণা বেদনার হাসি হাসিল।] এই দেখ, মা কত শক্ত করে গাঁট-ছালা বেঁধে দিয়েছে। [করুণা চক্ষু মুছিল] দেখ, কিছুতেই আর খুলে না—মা নিজ হাতে বেঁধেছে।

করুণা—

[মলিনার হাতে অঞ্চলের গিঁটটী স্পর্শ করিয়া] সত্যি, শক্ত ত!

মলিনা—

তুমি যেন খুলো না।

করুণা—

না, না, আমি খুলব কেন!

মলিনা—

মা স্বর্গের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। ঠাকুরের সঙ্গে এই গাঁটছালা বেঁধে দিয়েছেন, খুলে গেলে আমি একলা যেতে পারব না। কতদূর যেতে হ'বে—তাকি জান?

করুণা—

সত্যি?

মলিনা—

তুমি একবার প্রদীপটা নিয়ে এস, আন,—আন শীগ্‌গির।

করুণা—

[প্রদীপ আনিয়া, তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল] কই দেখি; হ্যাঁ সত্যিত।

মলিনা-

খুব শক্ত, নয়?

করুণা—

তুমি বড্ড কথা কইছ। ডাক্তার বারবার কথা কইতে বারণ করেছে, সকালে এসে বক্‌বে।

মলিনা—

ডাক্তার আর আস্‌বেনা। আর ডাক্তারের দরকার নেই, আমি ভাল হয়ে গেছি। তুমি মিছে ব্যস্ত হও কেবল আমার জন্যে। তুমিত জাননা কি হয়েছিল! কে এসেছিল! কি সে বল্‌লে? কেন বেঁধেদিয়ে গেছে জান? বলেছে—তুমি কিছু শুন্‌ছ না

করুণা—

আজ নয়, কাল সকালে এসব বোলো অখন। ঘুমোও রাত হয়েছে। রাত্রি জাগ্‌লে অসুখ বাড়বে যে!

মলিনা—

আমার যে অসুখ নেই—সেরে গেছে এই দেখ আমি উঠিছি।

[উঠিয়া বসিল]

করুণা—

না না, উঠনা, উঠনা শোও।

[মলিনা আবার শুইয়া পড়িল ও পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল।]

করুণা—

[কিয়ৎক্ষণ পরে] ভোর হ'ল বুঝি, বাবা এলেন না! ঐ কে আসছে বুঝি—

[উৎকণ্ঠিত ভাবে বাহিরে গেল]

মলিনা—

[হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া এক দৃষ্টে আল্‌নার পাশে অন্ধকারের মধ্যে কাহার দিকে তাকাইয়া] কে তুমি? কথা কইছ না যে? তুমি কি—তুমি কি স্বর্গের দূত? তুমি কার কাছে এসেছ? আমার কাছে?—কথা কইছ না যে —বলনা, তুমি স্বর্গ হ'তে এসেছ, না নরক হ'তে? তুমি আমার বন্ধু না শত্রু?

[কালো কাপড়ে আপদ মস্তক ঢাকা এক বিরাট প্রেত-মূর্ত্তি। তাহার ভীষণ মুখ ও কোটরগত চোখ দুইটী মাত্র দেখা যাইতেছে। তাহার হাতে এক প্রকাণ্ড দণ্ড। মাথার

একটা ভারী মুকুট। সে ধীর, অচঞ্চল, পাষাণের মত। পাষাণের মূর্ত্তির মত সে অনিমেষ নেত্রে মলিনার দিকে চাহিয়া আছে। রাত্রির সমস্ত অন্ধকার জমান তাহার মূর্ত্তি; বরফের সমস্ত ঠাণ্ডা জমান তার চাহনি।]

মলিনা—

তোমার কাপড়ের ভিতর ওকি! দণ্ডটা রাখনা ঐখানে উঃ [দণ্ডটা যেন তাহার গায়ে ঠেক্‌ছে এইরূপ ভঙ্গী] তোমার দণ্ডটা বড্ড ঠাণ্ডা, বরফের মত, আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আস্‌ছে ওর স্পর্শে—উঃ—তুমি কে?

[হঠাৎ ভয় পাইয়া] দিদি, দিদি—মা—মা—

[ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব, কিন্তু এইবার নগ্ন নহে, বেশভূষায় অতি সৌম্য মূর্ত্তি, ঠিক করুণার মত দেহ ও মুখাকৃতি]

ছায়ামূর্ত্তি—

এইযে আমি

মলিনা—

দিদি! তুমি দিদি?

ছায়ামূর্ত্তি—

হ্যাঁ আমি দিদি—তুমি যা বলে ডাকবে আমি তাই

মলিনা—

দিদি! ঐখানে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখ না—ঐ যে কে?

ছায়ামূর্ত্তি—

এমন করে কাঁপ্‌ছ কেন? ভয় কি?

মলিনা—

না আমার ভয় কর্চ্ছে যে।

ছায়ামূর্ত্তি—

আমি আছি, ভয় কি?

মলিনা—

কি রকম ভয়ঙ্কর দেখ্‌তে দেখ্‌ছ না?

ছায়ামূর্ত্তি—

ভয় নেই, ইনি তোমার বন্ধু,

মলিনা—

কে উনি?

ছায়ামূর্ত্তি—

ওঁকে চেন না?

মলিনা—

না; কে উনি?

ছায়ামূর্ত্তি—

যম।

মলিনা—

যম! আমায় নিতে এসেছে? আমি কি তা হ'লে মরে যাব?

ছায়ামূর্ত্তি—

সকলকেই ত মর্‌তে হ'বে

মলিনা—

[যমকে] তুমি খুব জোরে আমায় দণ্ড দিয়ে মার্‌বে? আমার বড্ড লাগ্‌বে যে?

[ছায়ামূর্ত্তিকে] ওযে আমার কোন কথারই উত্তর দেয় না, একেবারেই কথা কয় না!

আগে তুমি ওকে চেন, ভালবাস; না ভালবাস্‌লে ও কথা কয় না, বরং রাগ করে!

মলিনা—

ওযে দেখ্‌তে বড় বিশ্রী, ওর চোখ যে ভয়ঙ্কর। ওর দণ্ড দিয়ে যে বিদ্যুৎ বেরুচ্ছে!

ওকে ভালবাস্‌লে তবে ওর আসল মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে, সে মূর্ত্তি বড় সুন্দর, বড় প্রিয়।—ও তোমার বন্ধু!

মলিনা—

আমি ওকে ভালবাস্‌ব কি করে? আমার তিনি যে আমায় নিয়েছেন!

ছায়ামূর্ত্তি—

যাকে চাও ও সেইই।

মলিনা—

[উঠিয়া বসিয়া] আমি তা হ'লে ওঁকে ভালবাস্‌ব বৈকি, উনি আমার বন্ধু। [চক্ষু বুজিয়া আপনার হস্তদ্বয় প্রসারিত

করিয়া প্রাণমন সমর্পন করার ভঙ্গীতে সে ঐ কৃষ্ণবসনাবৃত মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইল]

ছায়ামূর্ত্তি—

এইবার এস তোমার বাসর প্রস্তুত।

মলিনা—

আমার কি বিয়ে হ'ল ?

ছায়ামূর্ত্তি—

হঁ্যা, এইবার তোমার দুঃখ যন্ত্রনার শেষ হ'ল।

মলিনা—

হ'ল ?

তোমার কেমন সুন্দর দেহ ও সাজসজ্জা হ'বে

মলিনা—

[ভয় পাইয়া] আমার গাঁটছালা ?

গাঁটছালাটী মুঠো করে চেপে বুকের মধ্যে রেখো।

মলিনা—

আমি কার বুকে রয়েছি, দিদি ?

ছায়ামূর্ত্তি—

এখনও চিন্‌তে পারনি ?

মলিনা—

হাঁ এযে আমার তিনি এই গাঁটছালায় আমার সঙ্গে বাঁধা রয়েছেন! একি দিদি, আমি এত সুন্দর—এতরূপ আমার কোথায় ছিল ? ইনি এত সুন্দর যে এঁর স্পর্শে আমার একি রূপের জ্যোতি ফুটে উঠ্‌ল ? আমার সিঁথিতে কোন্ সন্ধ্যার সোনার বরণ ফুটে উঠ্‌ল ? হাতে আমার কোন্ স্বর্ণচাঁপার সোণার বালা কে পরিয়ে দিলে ? আমার পায়ে কোন তারকার হীরের নুপুর, কত সানাইয়ের সুর, কত উলুধ্বনি আমায় ঘিরেছে, আমার পথে কত আলো জ্বলে উঠ্‌ল ;—উঃ! আনন্দে আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে। আর একটু দাঁড়াও তুমি—আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। —[ঘুমাইয়া পড়ার মত শয্যার উপর ধীরে ধীরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। আলোক নিবিল।]

চতুর্থ চিত্র।

[ভোরের আভাস। জানালা দিয়া শুকতারার মৃদু আলো মলিনার মুখে পড়িয়েছে, পার্শ্বে করুণা ঘুমাইয়া রহিয়াছে, বিপিনের টলিতে টলিতে ও গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

গান।

"সুরা পান করিনে আমি
সুধা খাই জয় কালী বলে
মন মাতালে মাতাল করে
মদমাতালে মাতাল বলে।"

বিপিন—

[কর্কশস্বরে টলিতে টলিতে] এ কেরে! কারা শুয়েরে ? মলিনা! করুণা! ওরে হতচ্ছাড়ীরা—ওঠ্‌না বেটীরা ঘুমুচ্ছে দেখ্, মদ খেয়েছিস্ নাকি ? [আবার গান। সুরা পান করিনে আমি' ইত্যাদি।]

করুণা—

[চমকাইয়া উঠিয়া] একি! বাবা! চুপ্ কর, কর্‌ছ কি ? ওর যে বড্ড অসুখ।

বিপিন—

[ধমকাইয়া] অসুখ! কার ? মলিনার ? ও বেটীর ত রোজ রোজই অসুখ!

করুণা—

তুমিত মেরে বেরিয়ে গেলে, ও যে এ দিকে জলে ডুবে মর্‌তে গিয়েছিল।

বিপিন—

জলে ডুব্‌তে ? সে কি ? কে বল্‌লে ?

করুণা—

আঃ আস্তে কথা কও না, ঐ চেয়ারে চুপ্ করে বোস, গোল করনা!

বিপিন—

[বসিতে বসিতে] বসছি, বসছি, কি হয়েছিল বল্‌না।

করুণা-

কি আর বল্‌ব তোমায়! তুমি যা করেছ, কর্চ্ছ, তা ভগবান দেখ্‌ছেন। তোমার ছেলে মেয়েরা না খেতে পেয়ে মরছে, আর তুমি মাতাল হয়ে সমস্ত রাত্রির পর ঘরে ঢুকছ। প্রবোধ মাষ্টার ভাগ্যে ছিল তাই ফিরে এসে মলিনকে দেখ্‌তে পেলে, নইলে মলিনের মরণের দায় তোমার ঘাড়েই পড়্‌ত।

বিপিন—

[দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল] ঠিক বল্‌ছিস্? আমি মেরেছি বলে ও জলেডুব্‌তে গিয়েছিল?

করুণা—

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কিন্তু তাতে তোমার আর কি? এমন বাপের ছেলেমেয়েদের মরাও যা বাঁচাও তাই!

[বিপিন আবার চুপ করিল, করুণা ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহাকে খাবার দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।]

বিপিন—

[থামিয়া থামিয়া] আমারই জন্যে—কেন? আমি কি করেছি—রোজগার করে খাওয়াইনি তোদের?—এত কাল কার খাচ্ছিস্ তোরা?—কিন্তু আর ত খাওয়াতে পারি না!—নাই বা পারলাম। সবাই কি চিরদিন পাট্‌তে পারে? এখন একটু আরাম কর্‌ব না? সারাজীবন দুর্ভাবনা আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়্‌লাম্—এখন একটু জিরুবোনা! বিয়ে দিই নি,—তা—ভিটে মাটি বেচ্‌ব নাকি? কিন্তু আমার মেয়ে আমার জন্যে মরছে,—তা মরলই বা? আমার কি? আমার কি? [সজোরে চীৎকার ও উঠিতে গিয়া চেয়ার হইতে পতন।]

[ধীরে ধীরে ঘরে একটা অপূর্ব্ব জ্যোতির প্রকাশ এবং সেই সময় অতর্কিতে "অপরিচিতের" প্রবেশ।

"অপরিচিত" গৌরকান্তি ও উজ্জ্বল, সে ধীর ও স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া বিপিনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিন উঠিয়া ভীতভাবে অপরিচিতের দিকে চাইল।]

বিপিন—

কে তুমি? কোত্থেকে এলে? কি চাও?

অপরিচিত—

আমি অনেক দূরথেকে তোমারই কাছে আস্‌ছি।

বিপিন—

কি চাও তুমি?

অপরিচিত—

তোমাকেই চাই!

বিপিন—

তুমি কে?

অপরিচিত—

আমি তোমার ভিখারী—

বিপিন—

আমার ভিখারী! সে কি! আমায় নিয়ে কি কর্‌বে?

অপরিচিত—

তোমার কাছেই আমার সব আছে—

বিপিন—

আমার কাছে! আমি গরীব, আমি মাতাল, আমার জন্যে আমার মেয়ে আজ মর্‌তে বসেছে, আমার কাছে আবার কে কি চাইতে পারে?

অপরিচিত—

তোমার প্রাণ আমায় দাও, তোমার দুঃখ আমায় দাও, তোমার মধ্যে যে পাপ আছে, মলিনতা আছে তাই আমার এই অঞ্জলি ভরে দাও, তুমি যে বিষে এত দিন জ্বলে পুড়ে মরছ দাও তাই আমায়, আমি তাই আকণ্ঠ পান কর্‌ব বলে আজ তোমার কাছে এসেছি। অতিথির অপমান করো না, বন্ধু। [অপরিচিত অগ্রসর হইয়া বিপিনের হাত ধরিল]

বিপিন—

[চীৎকার করিয়া] উঃ ছাড় ছাড়! কি ভয়ানক আগুনের মত তোমার হাত খানা!

অপরিচিত—

[একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ও হাসিয়া] আগুন নয় ভাল করে একটু ক্ষণ ছুঁয়ে দেখ, নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা বোধ হ'বে!

বিপিন—

না, না, পার্ব্ব না! কে তুমি আমায় যন্ত্রনা দিতে এসেছ?

অপরিচিত—

আমি তোমারই। আমার হাতখানা একবার জোর করে ধর, বন্ধু!

বিপিন—

যাও তুমি, চাই না তোমায়, মাতালের আবার বন্ধু কে? গরীবের কেউ আছে নাকি? গরীবের ভাই নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই।

অপরিচিত—

কিন্তু আমি আছি। তোমার অন্তরের মাঝখানে আমি অটল হয়ে রয়েছি, তোমার ক্ষুধা, তোমার মোহ, তোমার ভোগ, তোমার যন্ত্রণা, তোমার দুঃখের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুভুক্ষিত তৃষিত হয়ে তোমায় বার বার বল্‌ছি 'আমার দিকে ফিরে চাও, আমার ক্ষুধা দূর কর, আমার অতৃপ্ত তৃষা নিবৃত্ত কর বন্ধু!'

বিপিন—

[দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া] তুমি যাও, ওগো যাও! আমি পার্চ্ছিনা, তোমায় সইতে পার্চ্ছিনা। ওগো সুন্দর তোমায় চিনি না, কখনো চিনি নাই, তুমি আমায় আজ কি করে চেনাবে। একাই অনেক পথ এগিয়েছি, বন্ধুই হও আর যে হও—অন্য কারু সঙ্গ আমার অসহ্য হ'চ্ছে, একি আগুনে তুমি আমায় ঘিরে ফেল্‌ছ? তোমার মুখ ফেরাও, ফেরাও, ঐ সুন্দর মুখের তেজ আমায় পুড়িয়ে দিচ্ছে!

[অপরিচিতের মুখ ক্রমশঃম্লান ও অন্ধকার হইতেছে।]

অপরিচিত—

[বজ্রগম্ভীর স্বরে] চাও, তুমি, আমার দিকে চাও!

বিপিন—

[ত্রস্তভাবে, চাহিয়া ও পুনর্ব্বার মুখ ফিরাইয়া] না! চাই না তোমায়, তুমি যাও

অপরিচিত—

তুমি আমায় অনেকবার ফিরিয়েছো, তবু আমি বার বারই এসেছি। এবার যদি ফেরাও তবে আমি তোমার এমন জিনিষ নিয়ে ফিরবো যার দৈন্য তোমায় প্রেতের মত চিরদিন অধিকার কর্ব্বে, সে যন্ত্রণা সইতে পার্‌বে?

বিপিন—

[ভীত ভাবে] কি নেবে তুমি? কি নেবে?

[অপরিচিত নিঃশব্দে মলিনার শয্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল]

অপরিচিত—

এই দেখ তোমার কীর্ত্তি!

বিপিন—

আমার কীর্ত্তি? আমি মেরেছি?

অপরিচিত—

হ্যাঁ, তুমিই, তুমিই পিতা হ'য়ে তোমার নিজের কন্যাকে হত্যা করেছ, আত্মজাকে হত্যা করে আপনাকে হত্যা কর্‌লে। আজ হ'তে অন্ধকার তোমায় অধিকার কর্‌লে। তোমার মৃত্যুকে আমি নিতে এসেছিলাম, জীবন দান কর্‌তে এসেছিলাম, জীবন তুমি নিলে না, মৃত্যুকে বরণ কর্‌লে।

[শুকতারা ডুবিয়া গেল একটা গাঢ় অন্ধকারে মলিনা ও অপরিচিত আবৃত হইয়া গেল। বিপিন উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে কিছুক্ষণ মলিনা ও অপরিচিতের দিকে চাহিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে—]

বেশ! তাই হোক্, চাইনা আমি কাউকে, তোমাকেও চাইনা, অমিত রইলাম তাই আমার ঢের!

অপরিচিত—

তোমাকেই হারালে।

[অপরিচিতের মূর্ত্তি রুদ্রভাব ধারণ করিল। সহসা তাহার মস্তকে বিদ্যুতের কিরীট, হস্তে অগ্নিময় মুদ্গর, নেত্র দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তাহার প্রচণ্ড নিঃশ্বাসে বিপিন আহত হইয়া ক্ষিপ্তের মত "আগুন, আগুন—জ্বলে মলাম, জ্বলে মলাম" চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। অপরিচিতের তিরোভাব। মলিনা বিপিনের চীৎকারে জাগিয়া উঠিল কিন্তু আবার শুইয়া নীমিলিত নেত্রে বলিল]

মলিনা—

এই যে তুমি এসেছ—দিদি, দিদি, এসো, শীগ্‌গির, আমি যে ভোরেই শ্বশুর বাড়ী চল্লাম। এসো—

[পরদেশী পথিকের মুখে যাত্রার গান।]

বাবুলা মোরায়ে নেহি হারা ছুটা যায়
চার কাহার মিলে
ডোলিয়া কাঁদাওয়ে
আপনা বেগানা ছুটা যায়।
আঙনাতো পরবত ভয়ো
ডেরী ভয়ি বিদেশ
লেও বাবুল ঘর আপনা
(অহম্) যাত পিয়াকি দেশ ॥

[পরিচিতের আবির্ভাব। ঠিক প্রবোধ মাষ্টারের মত দেহ ও মুখাকৃতি। কক্ষে অপূর্ব্ব আলোক প্রকাশ। মলিনা ক্রমশঃ উঠিয়া বসিয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।]

করুণা—

[বাহির হইতে] যাইরে যাই—উঠিস্‌নি।

মলিনা—

[পরিচিতের প্রতি] এসো না, ঐ খানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? আমার জন্যে গাড়ী এনেছ?

পরিচিত—

এই দেখ, উষার প্রথম আলোক-পথে তোমার রথ দাঁড়িয়ে আছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না, এস, ওঠ।

[মলিনা অবাক হইয়া উষার প্রথম আভায় রঞ্জিত পরিচিতের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল!

পরিচিত—

(মলিনার হাত ধরিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে) মলিন!

মলিনা—

কি বল্‌ছ, প্রিয়তম?

পরিচিত—

আমায় চিন্‌তে পেরেছ?

মলিনা—

হ্যাঁ, তুমি আমার চিরপরিচিত

পরিচিত—

আমি তোমার কে?

মলিনা—

তুমি আমার সব! আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমার পূর্ণতা, আমার ত্রুটী, আমার সমস্তেরই উপর তুমি চরণ পাত করেছ—তোমায় আমি বরণ করেছি, তুমি আমার স্বামী,—প্রিয়—

পরিচিত—

তুমি আমার চিরবৃতা (মলিনার সিন্দুর রেখাঙ্কিত কেশ গুচ্ছে হাত দিয়া), তোমাতে আমার পূর্ণরূপ প্রকাশিত হোক। (চক্ষু স্পর্শ করিয়া) কোটী সূর্য্যের আলো, কোটী চন্দ্রের জ্যোৎস্না আমি তোমার চোখে দিলাম। (কর্ণ স্পর্শ করিয়া) সপ্ত লোকের, সমস্ত দেব দেবী ঋষি মানবের নিখিল প্রাণীর স্ফুট অথবা অস্ফুট ভাষা, শব্দ তোমাতে ধ্বনিত হয়ে উঠুক! (ভ্রূদ্বয় স্পর্শ করিয়া) নির্ম্মল উষা ও নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আভার অবিরাম পর্য্যায় তোমার ভ্রূদ্বয়ে প্রকাশিত হোক্। (ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া) নিখিল লোকের নিখিল প্রাণীর অনাহত সঙ্গীত, অনাগত বাণী তোমার মুখে ফুটবে। (সমগ্র দেহ স্পর্শ করিয়া) অনন্ত নীলাকাশ, অসীম সিন্ধু, বিশাল শৈলমালা, দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমি, অথবা সুশ্যামল বনশ্রেণী, যাহা কিছু সীমাহীন অন্তহীন তাহা তোমার সান্তরূপে প্রতিভাত হ'বে। (হৃদয় স্পর্শ করিয়া) বিচিত্রা প্রকৃতির নিত্য নবলীলা, অনন্ত মানবজীবনের নিত্য নবভাব তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের উদ্বেল কম্পনে আমি সঞ্চার কর্‌লাম।

[মলিনা পুলকস্পন্দিত হৃদয়ে পরিচিতের বক্ষ আশ্রয় করিল। তাহার নয়নের আনন্দাশ্রু মুছাইতে মুছাইতে পরিচিত বলিল]

পরিচিত—

তোমার চোখের জলে সংসারের নিখিল গোপন ব্যথা ও রুদ্ধ আবেগ রক্ত কুসুম হ'য়ে আমার বক্ষে বৈজয়ন্তী হার রচনা করুক।

[পরিচিতের দেহ হইতে একটা উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া কক্ষের ভিত্তিগুলিকে অদৃশ্য করিয়া দিল। বাহির ও অন্তর মিলাইয়া গিয়া কেবল একটা আলো-আঁধারের সীমাহীন প্রান্তরের দৃশ্য। পরিচিত মলিনার হস্ত ধারণ করিয়া প্রান্তরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চল"।]

মলিনা—

কোথায় ?

পরিচিত—

ঐ যে বাহিরে, সকলের মধ্যে, সবারই মধ্যে যে আমাকে তোমায় পেতে হ'বে, তোমাকেও আমায় পেতে হ'বে। আমরা দুজনেই যে অনন্ত পথের যাত্রী। চল।

(দুইজনে শূন্য প্রান্তরের পথে অগ্রসর হইল)

মলিনা—

(শূন্য প্রান্তরে অদৃশ্য হইতে হইতে) উঃ একি শুনছি! কে কাঁদছে যেন ? হ্যাঁ, স্পষ্ট কাঁদছে ঐ শোন, আকাশে কান পেতে শোন—আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি একটা অসীম ক্রন্দন ঐ শূন্য প্রান্তর বেয়ে ভেসে আসছে—শোনো শোনো কি বিরাট ব্যথা নিয়ে একটা বিশ্বজোড়া ক্রন্দন চরাচর লোক ছেয়ে ফেলছে—এ কার কান্না? এ শূন্য প্রান্তরে গভীর অন্ধকারে একলা কে জেগে বসে গুমরে গুমরে কাঁদছে— এ বুঝি কোন বিরহী-হৃদয়ের আকুল বেদনা রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে নিবিড়তর করে তুলছে।

না, না, এ একলা কারুর কান্না ত নয়—অনেক লোক যে এক সঙ্গে কাঁদছে—সকলের কান্না জুড়ে যে একটা বিরাট ক্রন্দন আকাশ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হ'চ্ছে।

একি ? এযে আমার খুব কাছে শুনা যাচ্ছে—চুপ, চুপ, শুনি ভাল করে—এই যে একেবারে আমার ভিতর হ'তেই কান্না শুনা যাচ্ছে! একি আমার বুক যে আমারি ক্রন্দনে ভরে উঠছে—ঐ যে বুকের ভেতর কান্নার শব্দ শিরায় শিরায় রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আমার শরীরময় স্পন্দিত হ'চ্ছে।

মরুভূমির দীর্ঘ নিঃশ্বাস, আগ্নেয়-গিরির জ্বলন্তজ্বালা, উত্তাল তরঙ্গমালার নিরন্তর ক্রন্দন, উল্কাপাতের তীব্র আবেগ যে আমার হৃদয়ে অহরহ ফুটে উঠছে,—

এই যে আমার বুকের ভেতর রোগীর যাতনা, এই যে আমার বক্ষে আশাহীনের তপ্তশ্বাস—এই যে আমার উদরে ক্ষুধিতের তীব্র যাতনা, আমার হস্তপদে কুষ্ঠরোগীর বেদনা, একি আমি অন্ধ হ'লাম না কি ? আমি ত আমার চক্ষে আলোক দেখতে পাচ্ছি নে—

আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে, আমার চক্ষে দৃষ্টি নাই, শরীরে সামর্থ্য নাই, কণ্ঠে ভাষা নাই, কর্ণে শব্দ নাই, হৃদয়ে আশা নাই; নিরাশার ছায়া, নিঃসম্বলের অন্ধকার, হতভাগ্যের দীর্ঘনিঃশ্বাস দিয়ে এই যে আমার শরীর তৈরী হ'ল—সকল শূন্যতা সকল অপূর্ণতা নিয়ে আমি পূর্ণ হলাম— পূর্ণ হতে চলেছি—

কই আমি—আমার অনন্তক্রন্দন প্রান্তরের গভীর অন্ধকারে লক্ষমুখে যে ছুটছে, লক্ষ কণ্ঠে যে আমার ক্রন্দন শোনা যাচ্ছে—আর ত 'আমি একলা' নহি, জগতের প্রত্যেক পীড়িত হৃদয়ে যে আমি প্রকাশিত হ'তে হ'তে ক্রমশঃ বহু হ'তে চলেছি।

এ যে বহু অপূর্ণ আমি দুঃখময়রূপ ধারণ করে, তোমার মহিমা বুঝবার জন্য, তোমার দয়ায় আশ্রয় নেবার জন্য তোমার প্রেম পরখ করবার জন্য কাঁদছি, আমার সকল কান্না শূন্য প্রান্তর দিয়ে বেয়ে চলে আমার বুকে এসে আবার আমার অসংখ্য দুঃখময় দেহে ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশঃ বিরাট হ'তে বিরাটতর হ'তে চলছে—এ কোন্ অনাদি ক্রন্দনের মঙ্গল বাদ্যে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হয়ে কোন্ ক্রন্দনে গিয়ে থামবে

শূন্য প্রান্তর হইতে লোকচরাচরের অশ্রুপাতের গান।

'পাপিই যদি থাকে'
আমি ভয় করি নি তা'তে
(শুধু) জানিয়ে দিও, বুঝিয়ে দিও মোরে
ফিরছ তুমি আমার সাথে সাথে ॥

পাপের বোঝা ভারি জানি হবে'
তুমিই যে সব খালাস করে ল'বে
নাই যদি নাও, তাই বা কিসের ক্ষতি
তোমার বোঝা বইব আমার মাথে ॥

অপথ ধরে না যাই যদি প্রভু
পথ দেখাতে আসবে কি আর কভু
পথ ভুলানো তোমারই সেই মায়া
পথ দেখাবে গভীর আঁধার রাতে ॥

বুকের পাষাণ করছি শুধু ভারি
দেখছি কত সইতে আমি পারি
জানি তুমি আসবে দয়াল ঠাকুর
সরিয়ে দিতে সবই আপন হাতে॥

আমার ব্যথায় আমার দুঃখে স্বামী
সান্ত্বনা যে করবে তুমি জানি
স্পর্শে তোমার, চির নিরোগ হ'তে
ভুগ্‌ছি প্রভু রোগের বেদনাতে॥

লক্ষ বুকের কাঁদন এমন কেন
আমার বুকে গুমরে ওঠে হেন
আমায় নিয়ে শুধুই ভাঙ্গাগড়া
চিরটিকাল অশ্রুসলিল পাতে॥

[প্রান্তরের মধ্যে বহু নরনারীর সমাগম। সকলেই আঁধার পথে পথ-হারা, নানা বিরোধীভাবে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত—

"ওগো আর কতদূর ? আর পারি না যে !"

"ওরে আমার হাত ছাড়্‌লি কেন ?"

"আ মর' মিন্‌সে, সাম্‌নে দাঁড়াচ্ছিস্‌ কেন ? হোঁচোট খাব যে !"

"দাওনা বেটাকে ধাক্কা, বেটা খোঁড়া !"

"ও বেটাও নেঙ্‌চাতে নেঙ্‌চাতে আমাদের সঙ্গে এসেছে।"

"হট্‌ যাও, হট্‌ যাও।"

"ওরে ঠেল্‌ছিস্‌ কেন ? পড়ে যাব যে !"

"আমার ঘোমটা নাওনা একটু, ঘাড় ফেটে যাচ্ছে যে !"

"বাবারে, গেছিরে, মেরে ফেল্লে রে—আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল রে"—

"উঃ বুক গেল ! দম্‌ আট্‌কাচ্ছে, আমার বুকে একটু হাত বুলিয়ে দাও না, দাও না গো,—কেউ দেবে না ?"

কি ভয়ঙ্কর কুয়াসা কিছু দেখা যায় না রে"—]

প্রথম—

ওহে ওদিকে নয়, আমি ঠিক জানি, এই দিকে, এদিক দিয়েই রাস্তা।

দ্বিতীয়—

[উল্টা দিক দেখাইয়া] কথ্‌খনো না—ডাইনে গেলেই পথ পাওয়া যাবে।

তৃতীয়—

হাঁ তুমি অমনি দেখে রেখেছো, ডানদিকে কুয়াসা আরো বেশী জমে রয়েছে দেখ্‌ছ না—আমি বল্‌ছি বাঁয়ে যেতেই হ'বে।

চতুর্থ—

না হে ডাইনেও নয়, বাঁয়েও নয়—আমার বোধহয় পেছনে যেতে হ'বে—রাস্তা আমরা ফেলে এসেছি।

পঞ্চম—

না—না—আগে—আগে,—খবরদার পেছিও না—আগে চল।

বালক—

তোমরা সারারাত ধরে গোলই করছ। সূর্য্য উঠ্‌লে পথ পাওয়া যাবে, ব্যস্ত কেন ?

নারীগণ—

ওমা আমরা কোথায় যাব গো ! তোমরাই পথ হারিয়ে বস্‌লে, তা হ'লে আমাদের কি হ'বে !

বালিকা—

উঃ বড় ঠাণ্ডা—আমি বাড়ী যাব—আর যাব না—

বালক—

ঐ যে কে সাম্‌নে আস্‌ছে—ওকে জিজ্ঞাসা কর না কেন ?

নারীগণ—

[ক্রন্দনের সুরে] হেই ঠাকুর ! আমরা সারা রাত ধরে, ঘুরে মলাম, হিমে সর্ব্বশরীর অসাড় হয়ে গিয়েছে, পথ দেখিয়ে, দাও ঠাকুরমশায়।

পুরুষগণ—

কে তুমি ভাই ? আমরা পথ হারিয়েছি, তুমি আমাদের পথ বলে দেবে ?

পরিচিত—

আমি যে তোমাদেরই চির-পরিচিত, তোমরা যে আমার পথেরই যাত্রী !

বালক—

তাইত, তাইত, ইনি যে আমাদের চেনা !

দুই চারিজন—

কেরে ও ? কাকে বল্‌ছিস্ ?

অন্য কয়েকজন—

হ্যাঁ চেনা লোকই ত বটে !

পরিচিত—

তোমরা আমাকে চিন্‌তে পারছ না ? ভাল করে চেয়ে দেখ একবার।

[সকলে পরিচিতকে ঘিরিয়া ফেলিল]

চিনেছি, চিনেছি,—তুমি আমাদের বন্ধু।

পরিচিত—

তোমরা পথ হারিয়েছ, চল আমার সঙ্গে।

সকলে—

তোমার সঙ্গে ? তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

পরিচিত—

আমিও যে তোমাদের সঙ্গে অনন্তের যাত্রী, এ যাত্রার পথেই যে তোমাদের সঙ্গে আমার প্রতিদিন নব নব পরিচয় হ'বে। তোমাদের ফেলে যে আমার স্বতন্ত্র গতি নেই। তোমাদের প্রত্যেকের গতিতে আমার গতি, তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমার পরম গতি। তোমাদের একজনও পেছিয়ে পড়ে থাকলে আমার যাওয়া হ'বে না। অজ্ঞানে, রোগে, দারিদ্র্যে, অপবিত্রতায় কেউ অক্ষম হ'লে আমি আমার সকল জ্ঞান, সকল সৌন্দর্য্য, সব পূর্ণতা তাকে দিয়ে এগিয়ে যাব।

দুচারজন—

তুমি পারবে ?

আরও কয়েকজন—

তুমি নিশ্চয়ই পারবে, তুমি না হলে আর কে পারবে ?

পরিচিত—

হ্যাঁ আমি পারব, তোমরাই যে আমার চিরবৃত। তোমাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে যে আমি পূর্ণ হ'ব। ঐ যে আমি আলো হ'য়ে ফুটে উঠ্‌ছি, ওতে তোমাদের সকল অন্ধকার, সকল অজ্ঞান দূর হোক। এই যে আমার প্রথম প্রভাত বায়ু বইছে, ও হ'তে তোমাদের প্রাণে প্রাণে স্বাস্থ্য বল সঞ্চার হোক। এই যে চারিদিকে আমার শত শত প্রভাত পাখীর গান জেগে উঠ্‌ল তাতে তোমাদের কানে কানে শত আশার বাণী ধ্বনিত হোক। এই যে আমার নানা বিচিত্র কুসুম ফুটে উঠ্‌ল, ওতে তোমাদের মধ্যে যাহা কিছু অসুন্দর, রুগ্ন, কুৎসিত, তাই সব সুন্দর, কমনীয় হ'য়ে যাক্। এই যে আমার শিশিরে ঝলমল, দূর্ব্বায় শ্যামল ও শস্যে হরিৎ বসুন্ধরার উপর দিয়ে যাচ্ছ, এ হ'তে তোমরা ধৈর্য্যে, সামর্থ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠ, তোমাদের সকল দারিদ্র্য দুঃখ ঘুচে যাক্—এই আমার পরিপূর্ণ বিশ্ব তোমাদেরকে প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ করে তুলুক। আমি এই আমার সকল নিয়ে তোমাদেরকে পূর্ণ করি, পূর্ণ হই।

আমি যুগ যুগান্ত কাল ধরে এমনি করে আমার পূর্ণতাকে ফুটিয়ে তুল্‌ছি। প্রথমে আমি কুম্ভকার ছিলাম। সৃষ্টির অনাদিকালে আমি কত না নীহারিকা পুঞ্জ, অগ্নিগোলা ও মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে নিজের মন মত কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভেঙ্গেছি, গড়েছি। তার পর আমি হয়েছিলাম চিত্রকর। পর্ব্বতে বনভূমিতে, জীবরাজ্যে, উদ্ভিদরাজ্যে আমি কত না বিচিত্র বর্ণরূপ ফুটিয়ে তুলেছি। বৃক্ষের শ্যামলতায়, মরুভূমির ধূসরতায়, সূর্য্যের দীপ্তিতে, রামধনুর বিচিত্র ছটায় ময়ূরের পুচ্ছে, মানুষের বিচিত্র বর্ণে আমার তুলিকার স্পর্শ অঙ্কিত। এতরূপের, এত রস গন্ধ স্পর্শ শব্দের লীলাবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেও আমার তৃপ্তিলাভ হয় নি। তাই এখন হয়েছি আমি শিক্ষক। আমার জীবন পথ যে আমার আমাকে চিন্‌বার পথ। কিন্তু আমার আমাকে চিন্‌লেই ত শুধু হ'বে না। আমি এ অনন্ত জীবন পথে যে দুরন্ত বাসনায় এত সঙ্গী ও খেলার সৃষ্টি কর্‌লাম—সজীব অচেতন, শরীরি অশরীরি—তাদের জ্ঞান, তাদের মুক্তি না হ'লে যে আমার আনন্দও মুক্তি নেই। পূর্ণ জ্ঞান নেই। তাই আমি তোমাদের শিক্ষার ভার নিয়েছি। আমি তোমাদের শিক্ষক।

[পরিচিতের মূর্ত্তি ক্রমশঃ পরিপূর্ণভাবে প্রবোধ মাষ্টারের রূপ ধারণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরস্থ সকল নর-নারী বালকবালিকা মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। তাহার পর তাহারা আনন্দে গাহিতে গাহিতে আলোকে মিলাইয়া গেল]

[বালকগণের গান।]

হে মহাদুঃখ সাধক মুখ্য
　　রুক্ষ শ্মশান চারী হে।
ক্ষুব্ধ রুদ্র মহাসমুদ্র
　　মথিত গরল ধারী হে ॥

চিরনিরন্ন দুঃখী দীন
রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ ক্ষীণ
খঞ্জ পঙ্গু নেত্রহীন
তবু, ত্রিকালবিহারী হে ॥

ধরিয়াছ চির দৈন্যের বেশ
মহাব্যোম ব্যাপী তুমি ব্যোমকেশ ;
হে মহাশূন্য জীবনের শেষ
মরণ-শঙ্কা-তারী হে ॥

আলোক চাহিছ হইয়া অন্ধ
মুক্তি মাগিছ করিয়া বন্ধ,
তেয়াগি সুখ, দুঃখানন্দ
ভিক্ষু-জীবন-ধারী হে ॥

সান্ত্বনা চাহ ব্যথিতের বুকে
রোগ শোক মাঝে কাঁদিতেছ দুখে
পতিতের সাথে ধূলামাখি সুখে
তুমি দুখ-লোকচারী হে ॥

প্রতিনিমেষের অপূর্ণ কাজে
তুমি আছ মোর পূর্ণের সাজে,
সব ব্যর্থতা দীনতার লাজে
চিরদীন পূজারী হে ॥

(অত্যুজ্জ্বল আলোকমণ্ডলে যুগলের আবির্ভাব। প্রবোধ মাষ্টারও মলিনা]

মলিনা,—

মাষ্টার মশায়, তুমি আমারও, এদেরও ?

প্রবোধ মাষ্টার—

হাঁা প্রিয়তমে, আমি সকলের মধ্যে তোমার, তোমার মধ্যে সকলের।

মলিনা—

তাই বুঝি আমায় যা বলেছ, এদেরও তাই বল্লে—

প্রবোধ মাষ্টার—

হাঁা প্রিয়তমে, তুমিও সকলের মধ্যে আমার, আমার মধ্যে সকলের।

[মলিনা প্রবোধের দুই হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে প্রান্তর দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার কক্ষে পরিণত হইল।]

[মলিনার কক্ষ যেমন ছিল তেমনি আছে। মলিনা বিছানায় শুইয়া।—সূর্য্যোদয়ের আলো জানালা দিয়া মলিনার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে করুণার প্রবেশ। করুণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইয়া ভীতভাবে তাহার কপোল স্পর্শ করিল।]

করুণা—

হরে, হরে, শীগ্‌গির আয়,—যা শীগ্‌গির—ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয়, প্রবোধ মাষ্টারকে খবর দে।

[প্রবোধ মাষ্টারের প্রবেশ।]

প্রবোধ মাষ্টার—

আমি এসেছি,—কি হয়েছে ? ডাক্তারকে ডেকে এনেছি।

[করুণা মলিনার বক্ষে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে]

ওগো আমাদের কি হ'ল, ও'মলিনা, তুই কি করলি !

প্রবোধমাষ্টার—

(করুণাকে সরাইতে চেষ্টা করিতে করিতে) সর, সর, আমি দেখি।

করুণা—

(কাঁদিতে কাঁদিতে) আর কি দেখবে, সব হয়ে গেছে, তুমি যাও, যাও,— তোমার জন্যেইত—

[করুণার কণ্ঠরোধ। প্রবোধ মাষ্টার ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখে দারুণ দুঃখের ভাব ফুটিয়া উঠিল।]

প্রবোধ মাষ্টার—

আমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে না, চলে গেলে?

[দুইজন ছাত্রের সহিত হরি ও ডাক্তারের প্রবেশ।]

প্রবোধমাষ্টার—

আর—কি হ'বে—সব শেষ হয়ে গেছে !

ডাক্তার—

সর, সর, ব্যস্ত হ'য়ো না, দেখি।

[করুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।]

করুণা—

(কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবাগো, তুমি কোথায় গেলে,—ও মলিনা—মলিনা, কোথায় গেলি ভাই—' ওগো আমাদের কি হ'ল—গো—

প্রবোধ মাষ্টার—

(করুণার নিকটে গিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত) কেঁদোনা, করুণা, মলিনা মরেনি, সে মরেনি—সে তোমার আমার সবারই মধ্যে আছে।

করুণা—

(কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাথা কুটিতে কুটিতে) তাকে এনে দাও মাষ্টার মশায়—তাকে তোমার পায়ে ফেলে দেব, তুমি এনে দাও।

[ডাক্তার বাহির হইয়া গেল] ছাত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জন বলিল—

"মাষ্টার মশায়, আর কেন, আসুন নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি—"

প্রবোধ মাষ্টার—

(গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া) যা হয় তোমরা কর।

বিপিন—

কেহে তোমরা এখানে? এখানে কি করছ, বাড়ীতে এসে সব কি গোলমাল হচ্ছে—ও তোমরা বুঝি—কোথায় তোমাদের মাষ্টার মশায়? প্রবোধ! প্রবোধ! এই যে, এস বাবারা আমার, প্রবোধ রাজী হয়েছেত এবার, মিছে আমায় ভোগালে অমন ছেলে কি আজ কাল পাওয়া যায়—কত লোকের পায়ে মাথা খুঁড়লাম, কেউ শুনলে না—তা তুমি থাকতে আমার অভিষ্ট হ'ল। আগে যদি বলতে ত মলিনা কষ্ট পেত না। আর মলিনা, মলিনা,—

ওকি—তোমরা অমন করে তাকাচ্ছ কেন? গা টেপাটেপি করে বলছ, আমি পাগল। সত্যি বলছি আমি পাগল নই, আমায় পাগল মনে করছ—আমি পাগল নই,—তবে আমি কি? আমার বরাত খারাপ, মেয়েটা এত বড় হয়ে উঠল বিয়ে দিতে পারলাম না—দুটো পয়সার অভাবে কি নাকালটা না হ'ল—সে সব ছাই পাঁশ আর মনে করে কি হবে।

প্রবোধ বলেছে বিয়ে করবে, করে তা বলে নি?

ওকি! তোমরা যে অবাক হয়ে চেয়ে রইলে, তোমাদের চাহনি যে আমি সইতে পারি না।

ওগো তোমরা কেউ বল না দয়া করে, কবে আমার মলিনাকে নেবে।

কথা কইছ না যে, কথা কও, তোমরাও কথা কইবে না আমার সঙ্গে—তবে কে আমায় বলে দেবে—কবে তোর বিয়ে হবে মলিনা—মলিনা ওঠ্, চল্, এ দেশ হতে চলে যাই চল—কবে তোর বিয়ে হবে, কে তোকে বিয়ে করবে মলিনা!

করুণা—

বাবাগো, আমাদের কি হল গো, মলিনা আর নেই গো (মূর্চ্ছিতা)

বিপিন—

মলিনা, ওঠ মা আমার, চল তোমার বিয়ে দেব, চল।

[পঞ্চম চিত্র।]

[নদীতট। কয়েকজন ছাত্র চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিতেছে। কয়েকজন মাটিতে প্রবোধ মাষ্টারের সম্মুখে চিতার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছে। মাষ্টার মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

প্রবোধ মাষ্টার—

শোন তোমরা—এই যাকে আমরা পোড়ালাম মনে

করো সে আমাদের বাংলার নির্দ্দোষ নিষ্পাপ অকলঙ্ক কুমারী জীবনে সমস্ত দুঃখকে বুকে নিয়ে আজ মরেছে, তার দুঃখ আমরা সবাই ভাগ করে নিলাম—এই চিতা আজ বাংলায় সর্ব্বত্রই জ্বলছে, বাংলার অন্তরে বাহিরে চারিদিকে দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য কাতরতার মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন আজ যেন এই শ্মশান বায়ুতে ভেসে আসছে—চির-দুঃখিনী মলিনা যেন তার দুঃখ গোপন করে বাংলার প্রতিগৃহ কোণে নিভৃতে চোখের জল ফেলছে। তোমরা এই পতিতপাবনী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে বাংলার হৃদয়ের সমস্ত গোপন দুঃখ, অস্ফুট বেদনা দূর করবার ব্রত গ্রহণ কর। রোগী, দুঃখী, দারিদ্র্যের সমস্ত দুঃখ আজ হ'তে তোমাদের হোক। সেই দুঃখ মোচনই তোমাদের জীবনের সাধনা হোক।

কয়েকজন—

(নত বদনে) তাই হোক।

প্রবোধ মাষ্টার—

তোমরা এখন যাও—আমি এই খানে স্নান তর্পন করে একটু পরেই যাচ্ছি।

কয়েকজন—

না আমরা আপনার সঙ্গেই যাব—আপনি স্নান তর্পন সেরে নেন'।

প্রবোধ মাষ্টার—

না, তোমরা এগোও—আমি এখন একটু একলা থাকতে চাই—

(সকলে প্রস্থান করিলে—)

তোমাকে ক্ষণিকের দ্বিধায় হারালাম। ভুল—ভুল, এ ভুলের আর সংশোধনের অবসর পেলাম না। (ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া) হারিয়েছি! সত্যিই কি তুমি নেই? এত সৌন্দর্য্য, এত কোমলতা, এত পবিত্রতার কি পরিণাম এই এক মুঠো ছাই—এই শ্মশান বায়ুতে ঐ যা উড়ে উড়ে ভেসে যাচ্ছে তাই কি শেষ?—তবে কেন এত বুক ফাটা ক্রন্দন, তবে কেন জগতে এত ভালবাসাবাসি? (পুনর্ব্বার স্তব্ধ)—না, তা নয়—তুমি আছ প্রিয়তমে, আছ, আমার চিরদুঃখ হ'য়ে তুমি আছ—আমার জীবনের চেষ্টা হয়ে, অন্তরের সাধনা হয়ে তুমি হৃদয়ের মাঝখানটীতে চিরকাল রয়ে গেলে—আমার সমস্ত অতীতকে বর্ত্তমান করে, সমস্ত ব্যর্থতাকে সফল করে, সমস্ত কুৎসিতকে সুন্দর করে, সমস্ত শুষ্কতাকে সরস করে তুমি আমার মধ্যে রয়ে গেলে। ওগো দুঃখব্রত-ধারিণি, তোমার বেদনায় আজ এই সমস্ত আকাশ ভরে উঠেছে—তোমার জীবনের হায় হায় প্রতিধ্বনি এই শ্মশান বায়ুতে হাহাকার করে ভাসছে!

ঐ শুনতে পাচ্ছি—প্রিয়তমে তুমি আছ—তুমি আছ।

তুমি জগতের নিখিল পীড়িত হৃদয় হয়ে আমার চিরবৃতা রূপে আছ, তোমায় আমায় মিলন হ'বে যেদিন একটী দুঃখীরও দুঃখ দূর করে তার অশ্রু মুছাতে পার্ব্ব সেইদিন, যেখানে একজনও ক্ষুধিতের ক্ষুধা তৃষিতের তৃষ্ণা, দরিদ্রের ব্যথা নিঃসম্বলের নিরাশা দূর করতে পার্‌ব সেইখানে; এইরূপে প্রতিদিনের প্রেমের কার্য্যে আমাদের মিলন নিত্য নব ও পূর্ণ হ'তে থাকবে। আমরা মিলব প্রিয়তমে, দুঃখের ঘরে, সেবার ফুলশয্যায়, প্রেমের লগ্নে, আমাদের নিত্য মিলন হ'বে। তোমার আজকের বিরহের চিতাগ্নি আমাদের নিত্য বাসর-কক্ষে অনির্ব্বাণ প্রদীপের মত চিরদিন জ্বলবে।

[উৎফুল্ল হইয়া গঙ্গায় অবতরণ ও স্নান।]

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় নৌবাণিজ্য

প্রথম ভাগ—হিন্দুরাজত্বকাল

প্রথম অংশ

ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে নৌশক্তির উল্লেখ

প্রথম অধ্যায়

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সুস্পষ্ট প্রমাণাবলী।

পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, যদিও সংস্কৃত ও পালিসাহিত্যে, ব্যবসাবাণিজ্যউপলক্ষে ভারতবাসিগণের সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে ভূরি ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে, তথাপি যে অর্ণবপোত ও নৌগঠন-বিদ্যার উপর তাঁহাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিত, দুঃখের বিষয়, তাহার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ, ঐ দুইটী সাহিত্যে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, প্রাচীন ভারতের নৌগঠনশিল্প-বিষয়ক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ, (১) আমরা অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি। এই গ্রন্থে জাহাজের আকার, গঠন এবং বিবিধশ্রেণী ইত্যাদি বিষয়ক অনেক সুন্দর সুন্দর বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নৌশিল্প সম্বন্ধীয় লব্ধজ্ঞান ও প্রকৃত তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত আকারে নিবদ্ধ আছে। ঐ পুস্তক খানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য এবং গ্রন্থোক্ত উক্ত বিষয়গুলিকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিৎ বিবেচনা করি।

জাহাজ নির্ম্মাণের উপাদান সমূহের এবং অর্ণবপোত-গঠনের জন্য যে যে কাষ্ঠ প্রয়োজন হইত, তাহাদের গুণ এবং তাহার প্রকারভেদ সম্বন্ধে প্রাচীন নৌনির্ম্মাণ-কারীদিগের প্রচুর জ্ঞান ছিল। 'বৃক্ষ আয়ুর্ব্বেদের' (Vriksha-Ayurveda or the Science of plant-life—Botany) মতে, কাষ্ঠকে চারিশ্রেণী বিভক্ত করা হইয়াছে (২)।—যেগুলি হাল্কা, নরম এবং অপর কাষ্ঠের সহিত সহজে জোড়া লাগে। সেইগুলি, প্রথম "ব্রাহ্মণশ্রেণীর" কাষ্ঠ দ্বিতীয় অথবা "ক্ষত্রিয়" শ্রেণীর কাষ্ঠগুলি হাল্কা, শক্ত, কিন্তু অপর কোন কাষ্ঠের সহিত জোড় লাগে না। তৃতীয় অথবা "বৈশ্য" শ্রেণীর কাষ্ঠগুলি নরম এবং ভারী। আর আর যে কাষ্ঠগুলি শক্ত অথচ ভারী, তাহারাই "শূদ্র"-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। আর একশ্রেণীর কাষ্ঠ আছে তাহাতে দুইটী পৃথক পৃথক শ্রেণীর গুণ মিশ্রিত আছে বলিয়া, তাহারা "দ্বিজ" শ্রেণী ভুক্ত।

নৌশিল্পের প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থকার

---

(১) ইহা মুদ্রিত গ্রন্থ নহে, কিন্তু পুঁথির আকারে "কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে" রক্ষিত আছে। ইহার নাম 'যুক্তিকল্পতরু'। অধ্যাপক অফ্রেক্ট (Prof. (Aufrect) তাঁহার সংস্কৃত পুঁথির তালিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার উপর টিপ্পনী করিয়াছেন (Notice of Sanskrit Mss. Vol. I. no. CC L XX I.) যে—"যুক্তিকল্পতরু ভোজনরপতির সঙ্কলিত গ্রন্থ। ইহাতে তরবারি, অশ্ব, হাতী, অলঙ্কার, পতাকা, ছত্র, আসন, মন্ত্রী, জাহাজ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা আছে। ভোজের (বোধহয়, 'ধারা'র) 'ভোজরাজা'র পুস্তক হইতে প্রায়ই ইহাতে বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে।")

(২) লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ ॥
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে ॥

ভোজের মতে—"ক্ষত্রিয়" কাষ্ঠে নির্ম্মিত জাহাজ সুখ-সমৃদ্ধিপ্রদানকারী (৩)। বিস্তীর্ণজলরাশির উপর দিয়া যে সমস্ত স্থানে যাতায়াত অত্যন্ত দুরূহ ও বিপদাপদ্‌পূর্ণ, সেই সমস্ত স্থানে জলযাত্রা করিবার জন্য এই সকল জাহাজ ব্যবহৃত হইত (৪)। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত অর্ণবপোত সকল নিকৃষ্ট ও অশুভ বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা বেশী দিন স্থায়ী হয় না, জলে শীঘ্র পচিয়া যায় এবং সামান্য ধাক্কা লাগিলেই তাহাদের ডুবিয়া যাইবার সম্ভাবনা (৫)।

কোন প্রকার কাষ্ঠ হইতে উৎকৃষ্ট জাহাজ প্রস্তুত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াই "ভোজ"-নরপতি নিরস্ত হন নাই, নৌশিল্পী-সকলকে সতর্ক করিবার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (৬)। তিনি সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—যে, সমুদ্রগামী জাহাজ সকলের তলদেশের তক্তাগুলি জুড়িবার জন্য কেহ লৌহ ব্যবহার না করে, কারণ সমুদ্রের মধ্যে চুম্বকের পাহাড় আছে, তাহা ঐ লৌহের জন্য জাহাজগুলিকে আকর্ষণ করিবে এবং তজ্জন্য নানা বিপদাপদ্‌ আনয়ন করিবে। তজ্জন্য তলদেশের তক্তাগুলি লোহার অপেক্ষা অন্য কোন পদার্থের দ্বারা একত্র জোড়া লাগান প্রয়োজন। যে যুগে মহাসমুদ্রের উপর ভারতীয় অর্ণবপোত যাতায়াত করিত, সেই অতীত যুগে এইরূপ অদ্ভুত উপদেশ প্রদানের হয়ত প্রয়োজন ছিল।

জাহাজ ও নৌকাগঠনের জন্য যে যে কাষ্ঠব্যবহৃত হইত, সেই সেই কাষ্ঠের শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত, "ভোজে"র "যুক্তি কল্পতরু" গ্রন্থে, জাহাজের আকার ও গঠন অনুসারে জাহাজগুলিকে নানাশ্রেণীতে বিস্তৃতভাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে দুইটী শ্রেণী (৭) (ক) "সামান্য"—যে সমস্ত নৌকা বা জাহাজ, নদনদীর উপর দিয়া বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন লইয়া যাতায়াত করিত, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত। (খ) "বিশেষ"—সমুদ্রগামী অর্ণবপোত-সমূহ এই শ্রেণীভুক্ত। "সামান্য" শ্রেণীকে আবার, দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার বিভিন্নতার জন্য,—দশটী বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকায়, তাহাদের বিভিন্ন নাম ও দৈর্ঘ্যাদির পরিমাণ প্রদত্ত হইল (৮)—

(ক) "সামান্য" শ্রেণী।

	নাম…	কত হাত দীর্ঘ,…	কত হাত প্রস্থ,…	কত হাত উচ্চতা
১।	ক্ষুদ্র	১৬"	৪	৪
২।	মধ্যমা	২৪	১২	৮
৩।	ভীমা	৪০	২০	২০
৪।	চপলা	৪৮	২৪	২৪
৫।	পটলা	৬৪	৩২	৩২
৬।	ভয়া	৭২	৩৬	৩৬
৭।	দীর্ঘা	৮৮	৪৪	৪৮
৮।	পত্র পুটা	৯৬	৪৮	৪৮
৯।	গর্ভরা	১১২	৫৬	৫৬
১০।	মন্থরা	১২০	৬০	৬০

'সামান্য' শ্রেণীর উক্ত দশ প্রকার জাহাজের মধ্যে "ভীমা" "ভয়া" এবং "গর্ভরা" জাহাজ বিপদ আপদ আনয়নকারী—

---

(৩) ক্ষত্রিয় কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদং নৌকা।

(৪) অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈর্বিদধতি জলদুষ্পদে নৌকাম্।

(৫) বিভিন্ন জাতিদ্বয়কাষ্ঠজাতা ন শ্রেয়সে নাপি
সুখায় নৌকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে সরিতি
মজ্জতে চ॥

(৬) ন সিন্ধুগাহ্যার্হতি লৌহবন্ধং তল্লোহ কান্তৈহ্রিয়তে
হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌবা গুণেন বন্ধনং
নিজগাদ ভোজঃ॥

(৭) সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ নৌকয়া লক্ষণদ্বয়ম্।

(৮) রাজহস্তমিতাযামা তৎপাদপরিনাহিনী।
তাবদেবোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি গদিতা বুধৈঃ॥
অতঃ সার্দ্ধমিতাযামা তদর্দ্ধপরিনাহিনী।
ত্রিভাগেণোত্থিতানৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষতে॥
ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলা ভয়া।
দীর্ঘা পত্রপুটাচৈব গর্ভরা মন্থরা তথা॥
নৌকাদশকমিত্যুক্তাং রাজহস্তৈরনুক্রমম্।
একৈকবৃদ্ধৈঃ সার্দ্ধৈশ্চ বিজানীয়াৎ দ্বয় দ্বয়ং।
উন্নতিশ্চ প্রবীণা চ হস্তাদর্দ্ধাংশ লক্ষিতা॥
অত্র ভীমা ভয়া চৈব গর্ভরা চাশুভপ্রদা।

কারণ বোধহয়, তাহাদের আকার ও গঠনের জন্য, তাহারা জলের উপর সমভাবে ও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

যে সমস্ত জাহাজ সমুদ্রে যায়, তাহাদিগকে "বিশেষ শ্রেণীর" জাহাজ বলে (৯)। তাহারা প্রথমেই দুইটী উপবিভাগে বিভক্ত (১০)। যথা—

(১) "দীর্ঘা"—যে সমস্ত জাহাজ দৈর্ঘের জন্য বিশিষ্ট, তাহারা এই শ্রেণীস্থ। (২) "উন্নতা" যে সমস্ত জাহাজ দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের অপেক্ষা উচ্চতার সম্বন্ধে বিশিষ্ট, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত। "দীর্ঘাশ্রেণীর" আবার দশটী রকম। তাহাদের নাম ও দৈর্ঘ্যাদির বিবরণ (১১) নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(খ) বিশেষ শ্রেণী:—

১। দীর্ঘা, ৪২ (দৈর্ঘ্য) ৫ ১/৪ (বিস্তার) ৪ ১/২ (উচ্চতা)

	নাম	দৈর্ঘ্য	বিস্তার	উচ্চতা
(১)	দীর্ঘিকা	৩২	৪	৩ ১/৫
(২)	তরণী	৪৮	৬	৪ ৪/৫
(৩)	লোলা	৬৪	৮	৬ ২/৫
(৪)	গত্বরা	৮০	১০	৮
(৫)	গামিনী	৯৬	১২	৯ ৩/৫
(৬)	তরী	১১২	১৪	১১ ১/৫
(৭)	জঙ্ঘলা	১২৮	১৬	১২ ৪/৫
(৮)	প্লাবিনী	১৪৪	১৮	১৪ ২/৫
(৯)	ধারিণী	১৬০	২০	১৬
(১০)	বেগিনী	১৭৬	২২	১৭ ৩/৫

'দীর্ঘা' জাহাজ সকলের এই দশটী বিভাগের মধ্যে "লোলা" গামিনী "প্লাবিনী" এবং যে সমস্ত জাহাজ এই তিনটী শ্রেণীর বা উপশ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহারা "দুঃখদা" বলিয়া বিবেচিত হইত। (১২)

২। উন্নতা—(১৩)

	নাম	দৈর্ঘ্য	প্রস্থ	উচ্চতা
(১)	উর্দ্ধা	৩২	১৬	১৬
(২)	অনূর্দ্ধা	৪৮	২৪	২৪
(৩)	স্বর্ণমুখী	৬৪	৩২	৩২
(৪)	গর্ভিনী	৮০	৪০	৪০
(৫)	মন্থরা	৯৬	৪৮	৪৮

এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে "অনূর্দ্ধা" "গর্ভিনী" এবং "মন্থরা" অশুভ ফল প্রদান করে; এবং "উর্দ্ধা" নৃপতিবর্গকে বহু সম্পৎ প্রদান করিয়া থাকে।

যাত্রিগণকে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দতা ও সুখ দিবার জন্য জাহাজ সকল কি কি দ্রব্যের দ্বারা সজ্জিত ও ভূষিত হইবে, তাহার বিস্তৃত বর্ণনাও যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। জাহাজ সকলের শোভাবর্দ্ধন ও ভূষণের জন্য চারি প্রকারের ধাতু ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা এই — স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং এই তিন ধাতুর সংমিশ্রণে প্রস্তুত অপর একটী মিশ্রধাতু। যে জাহাজের চারিটি মাস্তুল,

(৯) মন্থরাপরতোরাস্তু তাসমেষুধোগতিঃ।
(১০) দীর্ঘা চৈবোন্নতা চেতি বিশেষে দ্বিবিধা ভিদা।
(১১) রাজহস্তদ্বয়ায়ামা অষ্টাংশপরিণাহিনী।
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাঙ্কেনোন্নতাপি চ॥
দীর্ঘিকা তরনির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘলা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা॥
রাজহস্তৈকৈর্বৃদ্ধা—নৌকানামানি বৈ দশ।
উন্নতিঃ পরিনবঞ্চ দখাষ্টাংশমিতৌক্রমাৎ॥

(১২) অত্র লোলা গামিনী চ প্লাবিনী দুঃখদা ভবেৎ।
লোলয়া মানমারভ্য যাবন্তুবর্তি গত্বরা।
লোলায়াঃ ফলমাধক্তে এবং সর্ব্বাস্থ নির্ণয়ঃ।
(১৩) রাজহস্তদ্বয়মিতা তাবৎপ্রসরণোন্নতা।
ইয়মূর্দ্ধাভিধা নৌকা ক্ষেমায় পৃথিবীভুজাম্।
উর্দ্ধানূর্দ্ধোস্বর্ণমুখী গর্ভিনী মন্থরা তথা।
রাজহস্তৈকৈকবৃদ্ধ্যা নাম পঞ্চত্রয়ং ভবেৎ॥
অত্রানূর্দ্ধো গর্ভিনী চ নিন্দিতং নামযুগ্মকম্।
মন্থরায়াঃ পরা যাস্তু তাঃ শুভায় যথোক্তবম্॥

'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থোক্ত এই শ্লোকের যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে যে সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীরমত আমি পাঠ করিয়াছি, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারাও কাহারও মতে, 'রাজা' অর্থে—চন্দ্র' = ১, এবং হাত = ২; অতএব 'রাজচন্দ্র' অর্থে ২১। কিন্তু অপরমতে 'রাজা' = ১৬; আমি এই মত গ্রহণ করিয়াছি। কারণ 'জ্যোতিষ' শাস্ত্রে 'মহীভূত অথবা 'রাজা' ঐ অর্থে প্রযুক্ত হয়। আমি দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়া, উপরে লিখিত হিসাব প্রদান করিলাম।

তাহা শ্বেতবর্ণে, যাহার তিনটী মাস্তুল তাহা লালবর্ণে, যাহার দুইটী মাস্তুল তাহা পীতবর্ণে, এবং এক মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ নীলবর্ণে চিত্রিত করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পোতাগ্রভাগ, কল্পনাপূর্ণ বিচিত্র গঠন বা মূর্ত্তির দ্বারা ভূষিত হইত। তাহাতে কখন বা সিংহের, মহিষের, সর্পের হস্তির ও ব্যাঘ্রের মস্তক,—শুকহংস ময়ূর ইত্যাদি পক্ষী, ভেক এবং মনুষ্যের মূর্ত্তি খোদিত থাকিত। তৎকালে দারুকর্ম্মের ও ভাস্কর বিদ্যার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল। ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় জাহাজ সজ্জিত ও ভূষিত করিবার অপর কতকগুলি বস্তু (যেমন মুক্তার ও স্বর্ণের হার সমূহ) সুচারু গঠন পোতাগ্রভাগে লগ্ন ও দোদুল্যমান থাকিত। (১৪)

জাহাজের কক্ষ সকলেরও সুন্দর বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কক্ষগুলির দৈর্ঘ্য ও অবস্থা অনুসারে জাহাজগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১৫) প্রথমতঃ—জাহাজের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত বড় বড় কক্ষ বিশিষ্ট পোত সকল "সর্ব্বমন্দিরা" নামে অভিহিত (১৬) এই সমস্ত জাহাজ রাজকীয় ধনরত্ন, অশ্ব, ললনাগণকে, স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। (১৭) দ্বিতীয়তঃ মধ্যভাগে কক্ষসমূহ বিশিষ্ট জাহাজকে "মধ্যমন্দিরা" (১৮) বলা হইত। রাজাদের 'সুখের ভ্রমণে'র জন্য ও বর্ষাকালের ব্যবহারের জন্য ইহা প্রস্তুত থাকিত, তৃতীয়তঃ—যে সমস্ত জাহাজের পোতাগ্রভাগে কক্ষসমূহ থাকিত, তাহাদিগকে "অগ্রমন্দিরা" নাম দেওয়া হইত (১৯)। এই সমস্ত জাহাজ বর্ষাকালের পর মেঘমুক্ত দিনে ব্যবহৃত হইত। তাহারা সুদীর্ঘ প্রবাস যাত্রায় এবং নৌযুদ্ধে (২০) অত্যন্ত সুবিধার সহিত ব্যবহৃত হইত। ভারতীয় সাহিত্যে বর্ণিত, প্রথম নৌযুদ্ধ, বোধ হয়, এই সমস্ত জাহাজের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। রাজর্ষি "তুগ্র" এই জাহাজে করিয়াই তাঁহার পুত্র "ভুজ্যু"কে, দূরবর্ত্তী দ্বীপের শত্রুগণের বিপক্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পুত্র, সমস্ত অনুচরবর্গের সহিত "যেখানে অবলম্বন ও আশ্রয় দিবার কিছুই নাই" সেই ভীষণ মহাসমুদ্রে যখন পোতভঙ্গের দ্বারা মহাবিপদে পতিত হ'ন,—তখন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় শতক্ষেপণিসজ্জিতপোতের (২১) দ্বারা, তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। মহানুভব বিদুরের সুপরামর্শে, ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চ পাণ্ডব, তাঁহাদের শত্রুপরিকল্পিত ধ্বংশের মুখ হইতে এইরূপ পোতের সাহায্যেই উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞ বিদুর সমস্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদিযুক্ত, যুদ্ধাস্ত্রসমন্বিত এবং "সর্ব্ববাতসহ একখানি পোত ঐ উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। (২২) "রামায়ণে বর্ণিত (২৩) পাঁচশত পোতও এই প্রকারেরই ছিল। কৈবর্ত্ত যুবকগণ,

(১৪) ধাত্বাদীনামতো বক্ষ্যে নির্ণয়ং তরিসংশ্রয়ম্।
কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ং বা যথাক্রমং॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পরিস্তস্ত নৌকা চিত্রণকর্ম্মনি।
চতুশৃঙ্গপ ত্রিশৃঙ্গপভা দ্বিশৃঙ্গপ চৈকশৃঙ্গিনী॥
সিতরক্তাপীতনীল বর্ণান্ দদ্যাৎ যথাক্রমম্॥
কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্রএব চ।
পক্ষী ভেকে মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকং॥
নাবাং মুখে পরিন্যস্য আদিত্যাদিদশভুবাম॥
নৌকাস্থ মণিবিন্যাসো বিজ্ঞেয়ো নবদস্তবৎ।
মুক্তাস্তবকৈর্যুক্তা নৌকা স্যাৎ সর্ব্বতো ভদ্রা॥

(১৫) সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব্বমধ্যাগ্রমন্দিরা।

(১৬) সর্ব্বতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া সর্ব্বমন্দিরা।

(১৭) রাজ্ঞাং কোশাশ্ব নারীণাং যানমত্র প্রশস্ততে।

(১৮) মধ্যতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া মধ্যমন্দিরা।
রাজ্ঞাং বিলাসযাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যতে॥

(১৯) অগ্রতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া ত্বগ্রমন্দিরা।

(২০) চির প্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে।

(২১) তুগ্রোহ ভুজ্যুনশ্বিনোদমেধে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাং অবাহাঃ।
তমুহথু নৌভিরাত্মন্বতীভিরং তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥
তিস্রঃ ক্ষপস্ত্রিরহাতিব্রজদ্ভির্ণাসত্যা ভুজ্যুমুহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নার্দ্রস্য পারে ত্রিভীরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ॥
অনারংভণে তদবীরযেথামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা উহথুর্ভুজ্যুমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসং॥

(২২) ততঃ প্রবাসিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম।
শিবে ভাগিরথীতীরে নরৈ বিশ্র স্তভিঃ কৃতাম॥
মহাভারত, আদিপর্ব্ব।

(২৩) নবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম।
সন্নদ্ধানাং তথা যুনাস্তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ॥
অযোধ্যাকাণ্ডম।

এই সমস্ত জাহাজে করিয়া, শত্রুর জন্য অপেক্ষা করিতে'ও তাহাদিগকে বাধাপ্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। আবার বঙ্গীয় বীরগণ এইরূপ জাহাজে চড়িয়াই, মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়ী সেনানীকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। রঘু নরপতি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, পূততোয়া গঙ্গার মধ্যস্থিত দ্বীপসমূহে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (২৪)

সংস্কৃত সাহিত্যের এই সমস্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে, প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত ও নৌশিল্প প্রচলিত ছিল। পালিসাহিত্য হইতে সংগৃহীত ঐরূপ সরল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ গুলিও উক্ত সিদ্ধান্তকে আরও সুদৃঢ় করিয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় পালিসাহিত্যেও সমুদ্রযাত্রার ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের ভূরি ভূরি উল্লেখ রহিয়াছে। এবং আমাদের অনুমান হয় যে এই সমস্ত উদ্দেশ্যে যে সকল জাহাজ নিযুক্ত হইত, তাহা যথেষ্ট সুবৃহৎ। যদিও পালিগ্রন্থে, সংস্কৃত গ্রন্থের মত জাহাজ সমূহের আকৃতির ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এক একটী জাহাজে কতগুলি আরোহী থাকিতে পারিত, তাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, জাহাজগুলির আকার কত বড় ছিল, আমরা তাহার সম্বন্ধে একটী নিশ্চিত ও পরিষ্কার ধারণা করিতে পারি। "রাজাবলীয়" (Rajavalliya) গ্রন্থের মতে, রাজা সিংহব (সিংহবাহু) যে জাহাজ করিয়া, রাজকুমার বিজয় ও তাহার অনুচরবর্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা এত প্রকাণ্ড ছিল যে ঠিক সাতশত আরোহীর স্থান তাহাতে সঙ্কুলান হইয়াছিল। (২৫) তাহাদের স্ত্রী পুত্র লইয়া সমস্ত আরোহীর সংখ্যা সাতশতের ও অধিক হইয়াছিল।(২৬) এবং তাঁহারা সকলেই ঐরূপ পোতসমূহে আরোহণ করিয়াছিলেন। যে জাহাজে করিয়া কুমারকেশরী "সিংহল', জম্বুদ্বীপের কোন অজ্ঞাত প্রদেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন তাহাতে (২৭) পাঁচশত বণিক ছিলেন। যে জাহাজে করিয়া বিজয়ের "পাণ্ড্য" স্ত্রী সিংহলে আনীতা হইয়াছিলেন তাহা এত সুবৃহৎ ছিল যে তাহাতে আটশতেরও অধিক আরোহীর স্থান হইয়াছিল (২৮)। 'জনকজাতকে' (Janakajataka) উক্ত আছে যে, পূর্ব্বাবতারে বুদ্ধ নিজে সাত শত আরোহীও নাবিকদল সহ যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা যাত্রিসহ সমুদ্রবক্ষে ভগ্ন হইয়াছিল.(২৯)। আবার 'সুপরক বোধিসত্ত্ব-' অবতারে; (Supparaka Bodhisat) যে জাহাজে করিয়া, বুদ্ধ স্বয়ং বরুকাছ (Broach) হইতে সপ্তরত্ন-সমুদ্রে (৩০) (the Sea of Sevengems) যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে সাত শত বণিক ছিলেন। সমুদ্রের মধ্যে ভগ্ন জাহাজ—এই বিষয় বালহস্স জাতকে (Valahassa jataka) বর্ণিত আছে—পাঁচ শত বণিক ছিলেন (৩১)। 'সমুদ্দবণিজজাতকে' (Samudda-Vanija-Jataka) বর্ণিত অর্ণবপোত এত প্রকাণ্ড ছিল যে, একখানি সমস্ত গ্রামের প্রায় সহস্র সূত্রধারের থাকিবার স্থান হইয়াছিল—এই সূত্রধারেরা অগ্রিম টাকা লইয়া গৃহাদির সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া দিতে না পারিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছিল। (৩২) যে জাহাজ করিয়া 'সুপরকের' (Supparaka) বণিক—'পুন্নভ্রাতৃগণ', (Punna brothers) চন্দনের (Red Sanders) দেশে গিয়াছিলেন, তাহা এত সুবৃহৎ ছিল যে তিন শত বণিকের স্থান হইয়াও, তাহাদের স্বদেশে লইয়া আসিবার জন্য যথেষ্ট কাষ্ঠ বোঝাই এর স্থান হইয়াছিল। (৩৩) দুই ব্রহ্মদেশীয় বণিক ভ্রাতা—তপুসা (Tapoosa) ও পলিকট (Palekat), যে জাহাজে করিয়া বঙ্গোপসাগর

(২৪) বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনাদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গা স্রোতোহন্তরেষুচ॥

(25) Upham's Sacred Books of Ceylon, ii. 28, 168. Turnour's Matrawanso, 46, 47.

(26) Twrnour's Matrawanso, 46.

(27) Si-yu-ki. ii. 241.

(28) Turnour's Matrawanso, 51.

(29) Bishop Bigandet's Life of Godama, 415.

(30) Hardy's Manual of Buddhism, 13.

(31) "Now it happened that five hundred ship-wrecked traders were cast ashore near the city of these seagoblins."

(32) There stood near Benares a great town of carpenters containing a thousand families (Cambrige translation of jatakas)

(33) Hardy, Manual of Buddhism, 57, 260.

পার হইয়াছিলেন, তাহাতে পাঁচ শত গরুর গাড়ী বোঝাই 'মাল' ছিল—তাহা ছাড়া অন্যান্য গুরুদ্রব্য তাহাতে বোঝাই হইয়াছিল। (৩৪) সাঙ্খ্যজাতকে (Sankhajataka) বর্ণিত একজন বিশ্বপ্রেমিক জলমগ্ন ব্রাহ্মণকে, যে জাহাজখানি রক্ষণ করিয়াছিল, তাহা ৮০০ হাত লম্বা, ৬০০ হাত চওড়া এবং ৮০ হাত গভীর এবং তিনটী মাস্তুল বিশিষ্ট ছিল। মহাজনক জাতকে (Mahajanaka-jataka) কথিত রাজপুত্র যে জাহাজে করিয়া, অপর সমস্ত বণিকদলের সহিত, 'চম্পা' (অধুনা ভাগলপুর) হইতে 'সুবর্ণ ভূমিতে' (বোধহয় ব্রহ্মদেশ, অথবা Golden chersorese অথবা whole Farther Indian coast) গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে পশুসহ সাতখানি সুবৃহৎ শকট ছিল। পরিশেষে দাঠাবংশ নামক গ্রন্থে দণ্ডপুর হইতে সিংহলে বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্তাবশেষ লইয়া যাইবার কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া, একখানি জাহাজের বড় সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। রাজদম্পতী (দন্তকুমার ও তাহার স্ত্রী) তাম্রলিপ্তে পৌছিয়া দেখিলেন একখানি সিংহলগামী জাহাজ ছাড়িবার মুখে রহিয়াছে। সেই জাহাজ খানির তক্তাগুলি দড়িদ্বারা বেশ শক্ত করিয়া গ্রথিত রহিয়াছে, দড়িদড়া এবং সুবৃহৎ পালবিশিষ্ট একটী সুউচ্চ মাস্তুল তাহাতে প্রোথিত রহিয়াছে এবং জাহাজ খানি একজন সুদক্ষ নাবিকের কর্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিতেছে। ঐ দুইটী বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশীয় ব্যক্তি (গুপ্তবেশী) সিংহলে গমন করিতে ব্যস্ত হইয়া, (ডোঙ্গার সাহায্যে) কৌশল সহকারে ঐ জাহাজের উপরে পলায়ন করিলেন এবং তাঁহাদের মনোভিলাষ পোতাধ্যক্ষকে বুঝাইয়া দিলেন।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত বি, এ,

"পূজারী"

প্রণয়ের একটী চুম্বন!—তারই তরে'
এই বিশ্বপরে, বিশ্বপতি সাক্ষ্য করে
দু'টী প্রাণ এক হয় পবিত্র বন্ধনে,
জ্বালাতে প্রেমের যজ্ঞ হৃদয়-ইন্ধনে।
জগতের স্বার্থদ্বন্দ্ব সুপ্ত মন হ'তে
দু'টী প্রাণ ভেসে যায় আনন্দের স্রোতে
এক হয়ে, প্রাণ-তন্ত্রী আজন্মের মত
অনন্তের পথে চলে ধ্বনিয়া নিয়ত।

নাহি হয় ছিন্ন সে বন্ধন,—সে মিলন
মানবের সর্ব্ব অর্থ সাধন কারণ।
তারা প্রভো, তব রক্ত-চরণের তলে
প্রস্ফুট সুন্দর দু'টী মানস-কমল
অসীম এ পারাবারে এই নীল জলে
তোমার চরণ মাত্র ভরসা কেবল।

শ্রীকিরণকুমার রায়

---

(34) Bishopp Bigandet's Life of Sodama. 101.

আশা

প্রস্তাবনা।

গুরু ও শিষ্য।

জগদ্ভাসক লোকচক্ষু সূর্য্যদেব লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি উদয়াচল হইতে রক্তবর্ণ মুখে উদিত হইয়া সমস্ত দিন কি দেখিয়া আবার রক্তবর্ণ মুখে অস্তাচলে শয়ন লাভ করিলেন! ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে আজ কোনভাব অবিচলিত ভাবে বিরাজ করিতেছে? শান্তি না অশান্তি? সুখ না দুঃখ? জ্ঞান না অজ্ঞান?

কে বলিবে কি? কে সতেজে সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তায় বলিতে পারে যে ইহা শান্তি নহে, অশান্তি, অথবা অশান্তি নহে, শান্তি; ইহা সুখ নহে, দুঃখ; অথবা দুঃখ নহে, সুখ? এই সূর্য্যদেব যখন প্রভাতে উদিত হন তখনও ইঁহার রক্ত বর্ণ মুখ দেখিয়াছি, যখন অস্ত গেলেন তখনও দেখিলাম সেই রক্তবর্ণ মুখ। প্রভাতের সেই রক্তাভা কি আশার উৎসাহের এবং সন্ধ্যার রক্তাভা কি নিরাশার ও লজ্জার? কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে?

সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শিষ্য তাঁহার ধ্যান মগ্ন গুরুদেবের দিকে চাহিলেন। সম্মুখে খর প্রবাহিনী গঙ্গা, পশ্চাতে অভ্রংলিহ পর্ব্বত মালা এবং তাহারি নিম্নে গঙ্গাবারি বিধৌতপদ শিব মন্দির। স্থান সুন্দর, কাল সুন্দর এবং ধ্যানস্তিমিত লোচন রজতগিরিনিভ শুভ্রোন্নত বপু গুরুদেবও সুন্দর। চতুর্দ্দিকে এত আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের আয়োজন তথাপি শিষ্য কাতর নয়নে একবার পশ্চিমাকাশের দিকে চাহিয়া সেই দৃষ্টি গুরুদেবের প্রশান্ত বদনের উপর স্থাপিত করিলেন। কিন্তু গুরুদেব নিশ্চল ভাবে ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। শিষ্যের চাঞ্চল্য তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। শিষ্য সেই জন্য গুরুদেবের ধ্যানভঙ্গের অপেক্ষায় সেই মৃদু-কলনাদিনী দেশদেশান্তর গামিনী জীবনচঞ্চলা গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেই স্থানে আর এক ব্যক্তি আসিলেন। ইনিও ঐ ধ্যানমগ্ন যোগীর একজন শিষ্য। ইনি আসিয়া প্রথমে গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন; তার পর আকাশের দিকে চাহিয়া জোড়করে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইঁহার বদনে কোনরূপ অশান্তি বা উদ্বেগের চিহ্ন নাই। ইঁহার মুখ দেখিলেই যেন মনে হয় যে ইনি যাহা পাইয়াছেন তাহাতেই সন্তুষ্ট। 'যাহা পাইতেছি তাহাই অকাতরে গ্রহণ করিব' এই ভাবে ভাবিত হইয়াই যেন তিনি জোড়করে সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ধ্যাদেবীও যেন তাঁহার সেই অঞ্জলী ভরিয়া তাঁহার অবিচলিত শান্তি সুধা ঢালিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার ঘন ছায়া ঘনতর হইয়া আসিল গুরু ও শিষ্যদ্বয় আপনাদের স্তব্ধতা পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিলেন। গুরু তখন শিষ্যদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বৎসগণ সমস্ত ভারতভূমি ভ্রমণ করিয়া কি দেখিলে?" প্রথমোক্ত শিষ্য তাঁহার সকাতর দৃষ্টি গুরুর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন "প্রভু! যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। দেখিলাম সর্ব্বত্র দুঃখ, সর্ব্বত্র অশান্তি, সর্ব্বত্র হাহাকার।"

গুরু তাঁহার কথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিয়া দ্বিতীয় শিষ্যের দিকে চাহিলেন। দ্বিতীয় শিষ্য বিনয় নম্রস্বরে বলিলেন "ঠাকুর! আমি দেখিলাম সর্ব্বত্রই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই কার্য্য করিতেছে। মানুষ সুখেও আছে দুঃখেও আছে, শান্তিতেও আছে কিন্তু সর্ব্বোপরি তাহারা ভগবানের ইচ্ছার মধ্যেই বসবাস করিতেছে। তাহাদের সুখ দুঃখ কর্ম্ম ও অকর্ম্ম কিছুই তাহাদিগকে ভগবানের ইচ্ছার বাহিরে লইয়া যায় নাই।'

গুরু তাহার দিকে চাহিয়া পুনরায় মৃদু হাস্য করিলেন।

তারপর প্রথমোক্ত শিষ্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "বৎস তুমি কি করিতে চাও?"

১ম শিষ্য। প্রভু! যখন দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি তখন তাহাকে দূর করিবার চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় এই: দুঃখ আসিয়াছে সুখের আদর্শকে হারাইয়া ফেলার জন্য। ভারতের দেহে ও মনে এই যে দুঃখাত্মক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ তাহার চির-কালের আদর্শকে পশ্চিমের মদিরোন্মত্ত আদর্শের নির্ব্বাসিত করায়। এখন আমি এমন এক-জনকে আমাদের মধ্যে পাইতে চাই যিনি আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের সেই চির-দিনের আদর্শ—সেই শান্ত সমাহিত আদর্শকে পুনর্জীবিত করিবেন। যিনি সর্ব্ব কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত নিষ্কাম কর্ম্মী রহিবেন। আমি চাই এমন একজন মহাপুরুষকে যিনি সবলে সতেজে ভারতের হৃদয়াশাকে আগ্নের অক্ষরে লিখিয়া দিয়া যাইবেন যে সেই একই পথ আছে আর অন্য পথ নাই। সেই পরম শান্তির দিকে চাহিয়া জীবনকে কর্ম্ম-কোলাহলের মধ্যে শান্ত রাখিতে হইবে। এমন একজনকে চাই যিনি সেই 'একমেবা দ্বিতীয়কে' ভারতের সেই ত্যাগী কর্ম্মী বীরের চিরন্তন আদর্শকে—স্বীয় জীবনে প্রকাশিত করিয়া ভারতের চিরন্তন সাধনকে সফল করিয়া দিবেন। যুগে যুগে যিনি জন্মিয়া সেই আদর্শকে বারম্বার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন আবার ভারতভাগ্যা-কাশে সেই আদর্শ পুরুষের জলদর্চ্চিপ্রকাশকে দেখিতে চাই। ভগীরথ যেমন এই ত্রিলোক-পাবনী মহাদেবীকে আনয়ন করিয়াছেন আমিও তেমনি সেই মহাদেবকে আনয়ণ করিতে চাই। আমার আশা আমার আকাঙ্ক্ষা আমাদের শাস্ত্রের সেই ভবিষ্যৎ অবতারকে কল্কিদেবকে আনিবার জন্যই আমায় উত্তেজিত করিতেছে।

গুরু। বৎস ব্রহ্মযশঃ! তবে তাহাই হউক, তুমি সেই সাধনায় মনোনিবেশ কর।

গুরু এই কথা বলিয়া দ্বিতীয় শিষ্যের দিকে চাহিলেন। তিনি তখন করজোড়ে বলিলেন "ঠাকুর! ব্রহ্মযশের মত অত বড় তেজ আমার নাই। অত বড় আশা করিবারও আমার ক্ষমতা নাই। আমি এইটুকু কেবল বুঝিয়াছি ভগবান্ যাহা করিতেছেন তাহা তাঁহার মঙ্গলেচ্ছাতেই হইতেছে। যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই যখন তাঁহার ইচ্ছায় তখন ইহার জন্য দুঃখিত হইব এত বড় দুঃসাহস আমার নাই। তিনি যদি ভারতে ভোগের আদর্শকে আনিয়া থাকেন তাহাই গ্রহণ করা—নির্ব্বিচারে গ্রহণ করাই ভারতের একমাত্র মঙ্গল। আর এই যে আদর্শ ভারতের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে ইহা যদি কেবল মাত্র ভোগের আদর্শ না হয় তাহা হইলে সে কথাও ধীরে ধীরে আমাদের বুঝাইয়া দিবেন। আমি তাহার জন্য ব্যস্ত হইয়া যেন তাঁহার বিরুদ্ধে না দাঁড়াই এই আমার প্রার্থনা। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ত্যাগ করিয়া ভারতের সেই চিরন্তন সর্ব্বোপ-ভোগ শক্তি, সমস্ত বস্তু হইতে ভালটুকু গ্রহণ করিয়া মন্দকে পরিত্যাগ করার ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। তাই আমার মনে হয় যে ভোগের আদর্শ আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে ইহাতে পরিশেষে আমাদের অশেষ মঙ্গল হইবে। যাহাই হউক আমি কেবল এই আশীর্ব্বাদ আপনার নিকট চাই যে, আমি যে অবস্থায় থাকি না ভগবান যাহা করিতেছেন—তাঁহার যাহা ইচ্ছা, সেই কার্য্য আর সেই ইচ্ছার সঙ্গে যেন আমার একতা কখন না চ্যুত হয়। ভোগ করানই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় শত সহস্র বন্ধনেই যদি তাঁহার বাঁধিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে যেন তাঁহার পদে প্রণাম করিয়া সেই ভোগকে সেই বন্ধনকে বরণ করিয়া লইতে পারি!

গুরু। বৎস সত্যব্রত! তাহাই হউক, তুমিও আপন আদর্শ মত সংসার পথে চলিয়া যাও। ভগবান তোমাদের উভয়ের ইচ্ছার মধ্য হইতে আপন ইচ্ছা সম্পন্ন করিয়া লইবেন। মা ভৈঃ।

শিষ্যদ্বয় তাঁহাকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে

মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গুরু স্তব্ধভাবে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। পরপারে সহস্র মন্দিরের আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি ক্রমে নীরব হইয়া আসিল। আকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিয়া মন্দিরে মন্দিরে শত শত বর্ত্তিকার আলোক জ্বলিতে লাগিল। গুরুর চতুর্দ্দিকে মৌন নীরবতা জলে স্থলে আকাশে অচল ভাবে আসন গ্রহণ করিল।

[১]

গ্রামখানির নাম সম্বলপুর। কিন্তু তাহার সম্বল অতি সামান্য; কয়েকঘর আদবাঙ্গালী পৌণে খোট্টা গোছের গৃহস্থের খোলার চাল, ধূলাকাদায় ভরা একটা মেটে রাস্তা আর ছুঁচমুখীর বেড়ায় ঘেরা টোকো আমের বাগান। মানুষের নিকট হইতে গ্রামখানি আর কোন সাজসজ্জা পায় নাই। যেস্থানের বুকের উপর অনবরত লাঙ্গল চালনা করিয়া সারা বৎসরের পরিশ্রমের পর দুই বেলার দুই মুঠা অন্ন আদায় করিয়া লইতে হয় তাহাকে সাজাইয়া কুজাইয়া ছবিটির মত করিয়া তুলিবার অবসর মানুষের নাই। তাই এই সম্বলপুর মানুষের নিকট হইতে কোন সম্বলই পায় নাই। তাই নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে চাষার মেয়ের মত সে যেন খোলা মাথায় কোমরে কাপড় জড়াইয়া ভাতের গামলা হস্তে লইয়া মাঠের ধারে চাষার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের যেখানে যে কার্য্যের অবসর নাই প্রকৃতির সেইখানে সেই কার্য্যের বিশেষ অবসর। মানুষ তাহাকে যাহা দিতে এত কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছে, প্রকৃতি তাহাই, সেই সাজ-সজ্জাই তাহার চতুঃপার্শ্বে প্রচুরপরিমাণে ঢালিয়া দিয়াছেন। গ্রামের বাহিরে প্রকৃতির শোভা বর্ণনাতীত। অদূরে গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম ঘিরিয়া গিরিশ্রেণী। সেই গিরিশ্রেণীর তল-দেশ বেড়িয়া বেড়িয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নানা ছাঁদে নানা ভঙ্গিমায় একটী ক্ষুদ্র নদী বহিয়া যাইতেছে। উপত্যকা আর অধিত্যকার উত্থান পতনের মধ্যে শ্যামল শস্যের বিস্তীর্ণ আস্তরনের উপর দর্শকের মন অতি সহজেই ছুটিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলে। দুরস্থ পর্ব্বতগাত্র ও ঘন শালবনে শ্যামল বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিকের এই শ্যামলতার মধ্যে পাটল রঙ্গের ক্ষুদ্র গ্রামখানি যেন শ্রীরাম-চন্দ্রের ললাটের উপর চন্দনের ফোটার মত শোভা পাইতেছে।

গ্রামখানির আকৃতি ও যেমন আড়ম্বরহীন ইহার জীবন যাত্রাও তেমনি সরল। সেই একই ভাবে প্রত্যহ চাষারা চাষ করে, মেয়েরা গৃহকার্য্য করে, মাথায় করিয়া নদী হইতে জল আনে এবং প্রয়োজন হইলে কলহ করে। রাখাল-বালকেরা গরু লইয়া মাঠে যায় আর সন্ধ্যাকালে ঘরে ফিরিয়া তাহাদের মাতা বা ভগ্নীর উপর আহারের তাগাদায় জুলুম করে। গ্রাম্য বৃদ্ধেরা ধান্যের হিসাব ও তাম্রকুটের ধূমের মধ্যে সারাদিন কাটাইয়া সন্ধ্যাকালে জমিদারী কাছারিতে জুটিয়া প্রেততত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারের পুত্রের অন্নপ্রাশনের মণ্ডায় ছানার অল্পতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ পর্য্যন্ত সমস্ত গভীর বিষয়ের আলোচনা করিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া যায়। মহারাজ অশোকের আমল হইতে গ্রামখানি যেন একই ভাবে রহিয়াছে। ফাহিয়ান বা হুয়েনসাং বা মেগাস্থিনিস্ যদি হঠাৎ বাঁচিয়া উঠিয়া এই গ্রামে উপস্থিত হ'ন তাহা হইলে বোধহয় তাঁহারা কেহই বুঝিতে পারেন না যে তাঁহাদের পূর্ব্ব ভ্রমণ সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে। সেই একই খোলার ঘর, সেই একই ছুঁচমুখীর বেড়া সেই একই অর্দ্ধনগ্ন চাষা আর সেই একই ধূলিমিশ্রিত তৈলার্দ্র বস্ত্রপরিহিতা স্ত্রীলোক! গ্রাম-খানিতে যেমন সময় নির্দ্দেশক কোন ঘটিকা নাই তেমনি সময় ঠাকুরও যেন এই গ্রামের ত্রিসীমা মাড়ান না।

কিন্তু চিরদিন কখনও একভাবে যায় না। বেশ এক-ভাবে দিনগুলি কাটিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে অকস্মাৎ একটা হাওয়া আসিয়া ঘরে বাহিরে, বৃক্ষলতায় আকাশে বাতাসে একটা নবীনত্বের বিকাশ করিয়া দিয়া মানুষকে নূতন উত্তেজনায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। তখন একটা নূতন সুখে নূতন বেদনায় মানুষের অন্তরের আলস্যপরায়ণ তন্দ্রাগত আত্মাটি জাগিয়া উঠিয়া আপনার সজীবত্ব অনুভব করে। জাগতিক ব্যাপারে ইহা একটী চিরন্তন নিয়ম। তাহা না হইলে জীবজগৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ আলস্যের তলে ডুবিতে ডুবিতে মৃত্যুর জড়তায় পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু ভগবানের নিয়মে তাহা কখনও হইতে পায় না, সম্বলপুরের

ভাগ্যেও তাহা ঘটিতে পাইল না। দূরদেশ হইতে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্বলপুরের একটানা জীবন-স্রোতের মধ্যে এমন একটী তরঙ্গ তুলিলেন যে তাহার জন্য সমস্ত গ্রাম খানি বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভব করিল। ব্রাহ্মণ নিরীহ ও নির্ব্বিরোধী, কিন্তু তথাপি তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে এমন একটী স্বতন্ত্রতা এমন একটী উন্নত একাধিপত্যের ভাব ছিল যাহাতে সকলেই আকৃষ্টও হইত অথচ বিপ্রকৃষ্টও হইত, তিনি সহাস্যমুখে সকলকেই আপ্যায়িত করিতেন, বিপদের সময় সাহায্য করিতেন অথচ সর্ব্বদা সময়েই একটা সূক্ষ্মদূরত্বের ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই কালিদাসের সেই শ্লোকটী সহজেই মনে পড়ে :—

ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাং।
অধৃষ্যশ্চাধিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥

নবাগত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণটীর বিষয়ে গ্রামে যে সমস্ত অদ্ভুত গুজব রটিয়াছিল নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। কথোপকথন তদ্দেশীয় ভাষাতেই হইতেছিল কিন্তু আমরা তাহা বাঙ্গালাতেই অনুবাদ করিয়া দিলাম।

গ্রামের চৌকিদার ঘনবরণ সিংহের দাওয়ায় বসিয়া গঞ্জিকায় একটা প্রচণ্ডরকম 'দম' দিয়া জমিদারের কোটাল কেশব ভকত ধীরে ধীরে গঞ্জিকাধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল "সিংজি এই বাঙ্গালীটীর ঘরে রাত্রে দেওতার আবির্ভাব হয়।" সিংজীর মস্তকে তখনও গঞ্জিকার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই, কারণ তিনি পরম গম্ভীর ভাবে মস্তক আন্দোলিত করিয়া বলিলেন "কখনও নয়, এ কখন ত হইতে পারে না।"

কেশব। কেন হইতে পারে না?

সিংজি। বাঙ্গালীরা কি দেওতা টেওতা মানে? আমি 'কল্‌কাত্তা' গিয়াছিলাম, আমি জানি উহারা সকলেই 'ভ্রষ্ট' হইয়া গিয়াছে

কেশব। ভ্রষ্ট কেন হইতে যাইবে, ইনি ত বেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ।

সিংজি। উহার ঐ সমস্তই ভণ্ডামি, আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য ঐ প্রকার বেশবিন্যাস করিয়াছে।

কেশব। তবে যে সেদিন রাত্রিতে উহার গৃহে যাইয়া আমার স্ত্রী অনেক মন্ত্রাদি পাঠ শুনিয়া আসিয়াছে, সে সব কি মিথ্যা?

সিংজি। মন্ত্র? কখনও নয় বোধ হয় "আংরেজী পঢ়না" চলিতেছিল তোমার স্ত্রী তাহাই মন্ত্র বলিয়া ভুল করিয়াছে।

কেশব। উঁহু কখনই নয়—পণ্ডিতজিরা যাহা পড়েন, ইহা তাহারই মত। আমার স্ত্রী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিয়াছে।

সিংজি। আচ্ছা বেশ মন্ত্রই যেন পড়ে, কিন্তু দেবতা আসে তাহা কিরূপে বুঝিলে?

কেশব। ঘরের মধ্য হইতে যেন আরও একজনের গলায় ঐ মন্ত্রের মত আওয়াজ পাওয়া যাইতেছিল।

সিংজি। সে উহার স্ত্রীও তো হইতে পারে।

কেশব। স্ত্রীলোকে কখনও ঐ ভাষায় কথা বলিতে পারে না।

সিংজি মহা ধাঁধায় পড়িয়া গিয়া আর একছিলিম গঞ্জিকা সাজিয়া ফেলিয়া বলিলেন "ভাইয়া একথা আর কাহাকেও বলিয়া এখন কাজ নাই। আমরা দুজনে অনুসন্ধান করিয়া তাহার পর সকলকে বলা যাইবে।"

তাহারপর উভয়ে পরামর্শ স্থির করিয়া ৪।৫ ছিলিম গঞ্জিকা সেবনপূর্ব্বক সভা ভঙ্গ করিল।

কিন্তু কথাটা কেবল চৌকিদার এবং কোটালের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তাহারা কাহাকেও না বলিলেও বাঙ্গালীবিষয়িণী কথা নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিমায় গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়াছিল। গ্রামস্থ বালক বালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহের গৃহিণী এমন কি জমিদারী কাছারীর নায়েব গোমস্তা সকলের মধ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। অথচ যিনি এই চাঞ্চল্যের কারণ তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ছিলেন। কৌতূহলী বালক যুবক বৃদ্ধ যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত সকলকেই তিনি আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিতেন। কিন্তু অবশেষে ব্যাপার এমনি দাঁড়াইল যে ব্রাহ্মণের বাঙ্গালীভৃত্য হরিদাস গ্রামের নায়েবকে বলিয়া ঐ অনাহুত অতিথিসমাগম কমাইতে বাধ্য হইয়াছিল। নায়েব

রামরতমিশির একদিন গ্রামবাসীদের ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ঐ বাঙ্গালী পণ্ডিতজিটী জমিদার ঠাকুর মহারাজদের গুরু; তাঁহারাই উঁহাকে এই গ্রামে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। খবরদার কেহ যেন উঁহাদের ব্যস্ত না করে

[২]

ব্রাহ্মণের নাম ব্রহ্মযশঃ ভট্টাচার্য্য; নাতিদীর্ঘাকৃতি সুস্থ সবল সুগৌর দেহ তদুপরি রুদ্রাক্ষমালা ও যজ্ঞোপবীত-শোভিত। প্রশস্তোন্নত ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের সহিত এমন একটা মহিমার আভাস ছিল যাহা দেখিয়া সকলেরই মনে স্বভাবতঃই একটা ভয়মিশ্রিত ভক্তির উদ্রেক হইত। সর্ব্বোপরি তাঁহার উজ্জ্বলনয়নে ও হাস্যময় অধরে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের সহিত করুণার রেখা ফুটিয়া থাকিত যে সম্বলপুরের আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই তাঁহার কথা উঠিলেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার বিষয় আলোচনা করিত। ব্রাহ্মণের গম্ভীর অথচ হাস্যময় ব্যবহারে সমস্ত গ্রামখানি মুগ্ধও হইয়াছিল অথচ ভয়মিশ্রিত ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিত।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভুবনেশ্বরী দেবীও ব্রহ্মযশের উপযুক্তা ছিলেন। অতিথি-সেবায় গো-সেবায় পূজা পাঠে এবং সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যে তিনি তাঁহার স্বামীর সম্পূর্ণ ধর্ম্মপত্নীই ছিলেন। এমন কি সর্ব্বকার্য্যে তিনি তাঁহার স্বামীর সহায়তা করিয়াও অবসরক্রমে প্রতিবেশীদের পুত্র-কন্যাদের জন্য নানাপ্রকার "লাড্ডু" নানাপ্রকার আচার, রোগের সময় সামান্য সামান্য টোটকা ঔষধ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। দেখিয়া শুনিয়া একদিন তাঁহার স্বামীই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে "সেই যখন আবার নূতন করিয়া সংসারই পাতিলে তবে এই বনবাসে আসার কি প্রয়োজন ছিল?" স্ত্রীও হাসিয়া উত্তর করিলেন ঢেঁকি স্বর্গে যাইলেও ধান ভানিবে; তুমিও কি এখানে আসিয়া ঠিক বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছ?"

স্বামী মহাশয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহারও লোকব্যবহার ঠিক সংসার ত্যাগের মত নহে।

ব্রহ্মযশের সংসার আপাততঃ পত্নি ভুবনেশ্বরী অষ্টম বর্ষীয় পুত্র বিষ্ণুযশঃ এবং পুরাতন ভৃত্য হরিদাসকে লইয়া গঠিত। তবে মধ্যে মধ্যে দূর বঙ্গদেশ হইতে দুই একজন আত্মীয় আসিয়া ব্রহ্মযশের গৃহে অধিষ্ঠিত হইতেন; এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পলায়ন করিতেন। কারণ সম্বলপুরে বাস করাও যা' জনহীন অরণ্যে বাস করাও তাহাই। এবং সেই জন্যই ব্রহ্মযশঃ একদিন তাহার ভৃত্য হরিদাসকে বলিয়াছিলেন "হরি তোমার যদি কষ্ট হয় ত তুমিও দেশে চলিয়া যাওনা কেন?" হরিদাস গম্ভীর মুখে উত্তর করিল "সবাই ত আপনার মত নয়, বাবা, যে সকলকে ত্যাগ করে চলে যাবে। আপনি সকলকে ত্যাগ করতে পারেন তাই বলে আমি কেন আপনাদের ছেড়ে দেব?"

ব্রহ্মযশঃ। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, হরি, যে তুই হয়ত আমার জন্য মিছে কষ্ট পাচ্ছিস, তাই ও কথা বলছিলাম।

হরি হরি যেদিন কষ্ট বোধ করবে সেদিন আপনাদের কারু কথা না শুনেই চলে যাবে। সেদিন আপনাদের আমাকে তাড়াবার কষ্টটাও পেতে হবে না।

ব্রহ্ম। এখানে এসে বেশী দিন ত কেউ থাকতে পারছে না দেখছি, কেবল তুমি আমাদের এখনও ত্যাগ কর নাই। দেশে স্ত্রী পুত্র পরিবার ফেলে এসে এতদিন এখানে রয়েছ তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। আমি বলি তুমি কিছু দিনের জন্য দেশে যাও।

হরি। তারপর আপনাদের কি অবস্থা হবে।

ব্রহ্ম। আমাদের জন্য ভেব না।

হরি। তবে কাদের জন্য ভাবব? বাবা আপনার কাছে আজ বিশ বৎসর আমার কেটে গেল; আজও যদি আপনি অমনি কথা বলেন তা'হলে আমার আর কোন উপায় নেই। আমি আপনাদের ছেড়ে থাক্‌তে পারব না।

রোষে ক্ষোভে অভিমানে প্রায় অবরুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া হরিদাস বাহিরে চলিয়া গেল। বালক বিষ্ণুযশঃ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। হরি তাহাকে

বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "দাদা, বাবা আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।"

বিষ্ণু। কেন হরি দা! তুমি কি করেছ?

হরি। তা' তো' জানিনে দাদা।

বিষ্ণু। তুমি যেওনা আমি তা' হলে কাঁদব।

হরিদাস হাসিয়া বলিল "আচ্ছা তা হলে যাব না।"

বিষ্ণু তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বলিল "তা হলে চল একটা গান করবে।"

হরি। এখন নয় দাদা, সন্ধ্যার পর। এখন কত কাজ বাকী আছে।

বিষ্ণু। তা থাক চল।

হরিদাস আর কোন আপত্য করিল না। বালককে লইয়া নদীর ধারে চলিয়া গেল।

স্বচ্ছতোয়া শীর্ণা ক্ষুদ্রা নদীটি ব্রহ্মযশের বাটীর প্রায় তলদেশ দিয়া প্রবাহিতা। উহার তদ্দেশীয় নাম ঝুনঝুনিয়া কিন্তু ব্রহ্মযশঃ ঐ নামীয় প্রসিদ্ধ রাগিণীর সহিত উহার কলগীতের কোন সম্বন্ধ থাকার জন্য কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক তাঁহার ঐ নামটি গ্রামস্থ ভদ্রসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকেই বলিত "পণ্ডিতজি যখন ঐ নাম দিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন গুপ্তকারণ আছে। হয়তো উহাই উহার শাস্ত্রীয় নাম।" পণ্ডিতজিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন "কেন? নামটিত মন্দ নয়। আমার ভাল লাগে তাই ঐ নাম দিয়াছি। আপনারা আপনাদের পূর্ব্ব নামই বাহাল রাখুন না কেন?" কিন্তু একথা স্বত্বেও গ্রামস্থ প্রবীণেরা আশাবরী বা আশোয়ারী নামই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিদাস বিষ্ণুযশঃকে লইয়া নদীতীরস্থ একটী আম্র-বৃক্ষের তলে যাইয়া উপবেশন করিল। বৃক্ষের তলদেশটী সযত্নে পরিষ্কৃত। কোন কার্য্য না থাকিলে হরিদাস বিষ্ণুকে লইয়া এইখানে আসিয়া বসিয়া তাহাকে গান শুনাইত কিম্বা গল্প করিত অথবা যখন কেহই না থাকিত তখন চৈতন্যচরিতামৃত বা ভাগবৎ বা অন্য কোন গ্রন্থ আনিয়া আপন মনে পাঠ করিত; এই স্থান তাহার এবং বিষ্ণুর নিতান্তই নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। ব্রহ্মযশের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব কথা হইতে যখনই তাহারা অবসর পাইত তখনই ঐ স্থানে যাইয়া তাহাদের নিতান্তই আপনার ভাষায় গৌরহরির কথা রাধাকৃষ্ণের কথা রামরাবণের কথা কিম্বা দূর স্বদেশের পল্লিকথা কহিত। এমন কি সময় সময় বিষ্ণুযশের মাতা ভুবনেশ্বরী আসিয়াও তাহাদের ঐ নিভৃত সভায় যোগদান করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ের স্নেহে উভয়কেই আপ্লুত করিতেন।

দ্বিপ্রহর কাল। মাঝে মাঝে একটা উষ্ণ হাওয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর ওপারে রাখালেরা গরু চরাইতেছে, কেহ বা অশ্বত্থের ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া একটা অতি দূরত্বের আভাস পাখীর ডাক ও বাতাসের শব্দের সহিত ভাসিয়া আসিতেছে। পশ্চিমে উচ্চগিরিশ্রেণীর গাত্রে দুই চারিটি পথের চিহ্ন সমতল হইতে উচ্চে উঠিয়া গিরিশিখরে মিলিয়া গিয়াছে,—তাহারা কোথায় গিয়াছে, গিরি পারে কোন দেশে তাহারা গিয়া শেষ হইয়াছে কে জানে? হরিদাসের ক্রোড় হইতে নামিয়া শিশু বিষ্ণু আম্রবৃক্ষের একটা শিকড়ের উপরে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল "হরিদা মা কোথায়?" চতুর্দ্দিকস্থ উদারতা বিশালতা ও শান্তির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহার মাতাকে নিকটে পাইবার প্রবলেচ্ছা দেখা দিল।

হরি। কেন? মাকে আবার কেন?

বিষ্ণু। মা তোমার গান শুনবে।

হরি। দূর খেপা, মা কি তোর মত পাগল।

বিষ্ণু। না, মাকে ডেকে আনি।

হরি। তবে আমি গাইব না। মা এখন কাজ করছেন তাঁকে বিরক্ত কর না।

বিষ্ণু। আচ্ছা হরিদা এখানকার আর সবাই যেমন কথা বলে মা বাপ তুমি আমি কই সে রকম করে কথা বলিনে কেন?

হরি। আমরা যে বাঙ্গালী আর এরা যে হিন্দুস্থানী সাঁওতাল।

বিষ্ণু। মনিয়ার মা?

হরি। ও মাগীও দেশোয়ালী।

বিষ্ণু। আমরা বাঙ্গালী তার মানে কি?

হরি। আমাদের বাড়ী বাঙ্গালাদেশে।

বিষ্ণু। সে কত দূর?

হরি। দূর বোধহয় বেশী নয় তবে হাঁটা পথ তাই আসতে এক আধ দিন দেরী হয়।

বিষ্ণু। সেখানে সবাই বাঙ্গালা বলে?

হরি। তোমার কি দেশের কথা কিছু মনে পড়ে না?

বিষ্ণু। পড়ে বৈ কি? তবে খুব ভাল মনে পড়ে না।

হরি। এই দুবছরের মধ্যে সব ভুলেগেলে? তোমার মণিদা তোমার সুকুদিদি তোমার জেঠিমা এদের কাউকে মনে পড়েনা?

বিষ্ণু। ওদের খুব মনে পড়ে। আচ্ছা হরি দা, আমরা কবে এখান থেকে যাব?

হরি। কেন এখানে কি তোমায় ভাল লাগে না?

বিষ্ণু। ভাল লাগে বইকি। তবু সুকুদিদিদের জন্যে মাঝে মাঝে বড্ড মন কেমন করে

হরি। তা হলে বাবাকে বলনা কেন কিছু দিনের জন্য আবার তোমায় সেখানে নিয়ে যাই।

বিষ্ণু। আমার ভয় করে, বাবা যদি রাগ করেন?

হরি। রাগ করবেন কেন? তুমি বলেই দেখ।

বিষ্ণু। আচ্ছা বলব। কৈ তুমি গান করলে না।

হরিদাস আর কোন কথা না বলিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিল। সে অতি সুকণ্ঠ। দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহার স্বর তরঙ্গ বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে ঐ নদীটিরই মত নানা ভঙ্গিমায় দূর হইতে নিকটে নিকট হইতে দূরে, কখনও ক্ষীণ কখনও উচ্চে উঠিয়া বালকের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। বালক বিষ্ণু কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক তাহার প্রাণ একটা অজানিত আনন্দে একটা গভীর সুখের দুঃখে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে পরম গম্ভীর ভাবে করতলের উপর চিবুক রক্ষা করিয়া দুলিতেছিল, এবং সহসা একবার যাই হরিদাস "হরি হে! এস হে!" বলিয়া গানের মাতানের অংশ উচ্চে স্বরে গাহিয়া উঠিল অমনি বালক তাহার আসন ত্যাগ করিয়া ঝাঁপাইয়া তাহার কণ্ঠ লগ্ন হইল। তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রান্ত স্বরে গাহিতে লাগিল "হরি হে! এসহে!"

হরিদাস এবং বিষ্ণুযশঃ গানে এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে বিষ্ণুর মাতা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন সে কথা তাহারা মোটেই জানিতে পারে নাই। তাহার গান থামিলে তিনি বলিলেন "হরি তোরা কি আমার কাজ কর্ম্ম করতে দিবি না, এই দুপুর বেলায় অমনি করে গান করে?"

চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িলে চোরের যে অবস্থা হয় হরিদাসের কতকটা সেই অবস্থা হইল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিষ্ণুকে বলিল "চল দাদাঠাকুর বাড়ি যাই।" বিষ্ণু ছুটিয়া গিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "আজ আমার পড়তে ভাল লাগছিল না তাই হরিদার গান শুনছিলাম। মাতা তাহাকে আদর করিয়া বলিলেন "যেমন তোমার হরিদা পাগল তেমনি তুমি! চল তোদের জন্য কেমন একটা মজার জিনিষ তৈরি করিছি দেখবি চল।"

বিষ্ণু। বাবা কি আহ্নিকের ঘর থেকে বেরিয়েছেন?

মাতা। না, কেন?

বিষ্ণু। উনি আজ হরিদাকে বকেছেন

মাতা। তাই নাকিরে! আচ্ছা চল আমি তাঁকে বকেদিচ্ছি। সকলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

[৩]

পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ি হওয়া অবধি বালক বিষ্ণু তাহার পিতার নিকট মুগ্ধবোধব্যাকরণ ও দু'একখানা কাব্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার মুগ্ধমন সর্ব্বদাই পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডি হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া নদীতীরে আম্রকাননে শস্যক্ষেত্রে এমন কি ক্রীড়াপর-গ্রাম্যবালক-বালিকাদের মধ্যে কেবলই বেড়াইয়া আসিত। সময় সময় তাহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া তাহার পিতা তাহাকে বলিতেন "বিষ্ণু যাও খেলা করে এস।" বালক তখন লজ্জিত হইয়া আবার পাঠে মনঃসংযোগ করিত, কিম্বা পুস্তক বন্ধ করিয়া বেড়াইতে যাইত।

তাহার সঙ্গী গ্রাম্য বালকগণ এই তরুণ ব্রাহ্মণকুমারকে অনেকটা ভয়-ভক্তির চক্ষে দেখিত, সেইজন্য সম্বলপুরের

মধ্যে বিষ্ণুযশের তেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু জুটে নাই। সে যাহারই সঙ্গে মিশিতে যাইত সেই তাহার গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া পিছাইয়া পড়িত, তেমন প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত মিশিতে পারিত না। একেইত ভাষার এবং দেশের পার্থক্য তাহার উপর অন্তর্বাহ্যের ভাবের পার্থক্য বিষ্ণুযশকে সম্পূর্ণ একটা পৃথক রাজ্যের জীবে পরিণত করিয়াছিল। সে যতই আপনার দূরত্বকে নষ্ট করিয়া একেবারে তাহাদের মধ্যে আপনাকে ডুবাইবার চেষ্টা করিত গ্রামস্থ অন্যান্য বালকেরা ততই দূরে সরিয়া যাইত। সেইজন্য বিষ্ণুও যেন অতি সঙ্কুচিত ভাবে দূর হইতে তাহাদের ক্রীড়াকলাপ দর্শন করিত। তাহার একান্ত ইচ্ছাস্বত্বেও পাছে সে নিকটে যাইলে তাহাদের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে এই ভয়ে সে দূর হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিত। দেখিয়া শুনিয়া নায়েব রামজয় মিশিরের পুত্র ভগবতীচরণ বিষ্ণুযশের নূতন নামকরণ করিয়াছিল "বগুলা" (বক) এবং বিষ্ণুযশের ধীর পদক্ষেপ অনুকরণ করিয়া অনেক সময় সঙ্গীদের মধ্যে একটা হাস্যতরঙ্গ তুলিয়া আনন্দোপভোগ করিত। কিন্তু তাহাদের উপেক্ষা বালক বিষ্ণুর হৃদয়ে যে কতখানি আঘাত করিত তাহা তাহারা মোটেই বুঝিত না।

এইরূপে সমবয়স্কদের মধ্যে উপেক্ষিত হইয়া বিষ্ণুযশ আপনাকে আপনি সঙ্গ দিতে শিক্ষিত হইতেছিল। একাকী, কিম্বা হরিদাসের সঙ্গে কাজে অকাজে সময় অসময়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার সঙ্গহীনতার দুঃখ দূর করিত। সুদূর প্রান্তরের মধ্যে এমন কি দূরস্থ পর্ব্বতগাত্রে সময় অসময়ে উদ্দেশ্যহীন পশুপক্ষীর মত ঘুরিয়া ক্লান্ত হইলে ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে গল্পের জন্য ব্যস্ত করিত। মাতা তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কত দেশের কত জনাকীর্ণ নগরের কত পুরাকালের পৌরাণিক যুগের রাজা-রাণী রাজপুত্রের গল্প করিয়া কত ধ্রুব প্রহ্লাদের কত কানাই বলাই সুদাম সুবলের জন্ম দিয়া তাহার সঙ্গীহীন প্রাণের মধ্যে অসংখ্য সঙ্গীর আবির্ভাব করিয়া দিতেন এবং সকাল সন্ধ্যার হরিদাসের সঙ্গীদের মধ্যে সেই সমস্ত অন্তরের সঙ্গীগণের আবির্ভাব হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে এমন একটা জনাকীর্ণ স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হইত যে সে অনেক সময় চীৎকার করিয়া হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিয়া উদ্দাম নৃত্যগীতে হরিদাসকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত।

এমন সময় একদিন ব্রহ্মযশঃ বলিয়া উঠিলেন "আর নয়, এইবার বিষ্ণুর উপনয়ন দিতে হইবে।" বালক বিষ্ণুও নবীনত্বের আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাহার হরিদাদাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "দেখো আমি খুব ভাল ব্রাহ্মণ হব।" হরিদাস কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র সঙ্গীটির বিরহাশঙ্কায় ক্লিষ্ট হইয়া বলিল "কিন্তু অনেক দিন যে তোমার ঘরে বন্ধ থাকতে হবে।" বিষ্ণু সান্ত্বনা দিয়া বলিল "তা হলই বা, কিছুদিন পরে আবার যখন ঘর হ'তে বেরব তখন—"

হরি। তখন কি?

বিষ্ণু। তখন কি করব? কি জানি কি করব? তখন কি এমন করে বেড়াতে পাব না?

হরি। কি জানি দাদা কি করবে তুমি! হয় তো আর এমন করে বেড়াতেই ইচ্ছা করবে না।

বিষ্ণু। কেন করবে না? নিশ্চয় করবে।

সে হরিদাসকে সান্ত্বনা দিল বটে কিন্তু তাহারও মনে কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল; কি জানি কি ঘটিবে!

কিন্তু ঘটিল না কিছুই। ধীরে ধীরে দিনের পর দিন চলিয়া গেল। তাহার পর একদিন প্রভাতে বিষ্ণুযশঃ দেখিল একজন জটাজুট ধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিষ্ণুযশের পিতা তাঁহার কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন বিষ্ণু কাল তোমার উপনয়ন হবে। তুমি একে প্রণাম কর ইনিই তোমার দীক্ষা দেবেন।"

বিষ্ণু ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী তাহাকে মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরদিন উপনয়ন হইয়া গেল। ব্রহ্মযশঃ গ্রামের দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করান ব্যতীত অন্য কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর করিলেন না, কিন্তু বিষ্ণুযশের পক্ষে গতদিনের সংযমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা অপূর্ব্ব আলোকে মণ্ডিত হইয়া তাহার স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ হৃদয়কে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিল। ক্ষণে ক্ষণে একটা অপূর্ব্ব পুলকে তাহার

সমস্ত শরীর হর্ষ-কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পূজা হোমাদি সমস্তই সে এমন সানন্দ-মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল যে তাহার পিতা তৎকালিক মুখের ভাব দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার পত্নীকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন "ভুবন, আমার চিরদিনের আশার বীজ বাস্তবিকই সুরোপিত হচ্চে, তুমি দেখো, বিষ্ণু আমার আশা সফল করবে।"

ভুবনেশ্বরী দেবী শুভ্র পট্টবস্ত্রে শোভিত হইয়া সমস্ত দিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যখন ব্রহ্মচারী ব্রতধারী পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন তখন কোথা হইতে একরাশ আনন্দাশ্রু আসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখশ্রীকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল। ব্রহ্মমন্ত্র-দীক্ষিত শিশুপুত্র তাঁহার নিকট যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য-দেবের ন্যায় তাঁহার মাতৃকোল উজ্জ্বল করিয়া রহিল। তাহাকে বক্ষে চাপিয়া তিনি মনে মনে নারায়ণের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন সে কথা সে দিনকার হোমধূমের সঙ্গে অন্তর্য্যামী দেবতার চরণে পৌঁছে নাই ?

(৪)

সন্ধ্যার পর সন্ন্যাসী বিষ্ণুযশের সহিত একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "বৎস বিষ্ণু আজ হ'তে তোমার বেদে অধিকার হইল। উপনয়নের দ্বারা তোমার দ্বিতীয় জন্মলাভ হয়েছে, এখন বেদপাঠ আরম্ভ করতে হবে।"

বেদ কি ?

সন্ন্যাসী বেদ অর্থে জ্ঞান। আমাদের আর্য্যজাতির চির-দিনের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি যাতে আছে সেই অনাদি পুস্তকের নাম বেদ।

বিষ্ণু। বেদ কে লিখেছে ?

সন্ন্যাসী। সে সব কথা ক্রমশঃ জানতে পারবে। এখন এইটুকু জেনে রাখো 'বেদ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কথা ঋষিদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। যাক আজ রাত্রেই আমি চলে যাব। এর পর থেকে তুমি তোমার পিতার নিকট সমস্ত বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, তার পর সময় হলে আবার আমি এসে তোমার পাঠ শেষ করে দিয়ে যাব। আমি তোমার দীক্ষা দিলাম বটে, কিন্তু তোমার পিতাই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার শিক্ষা দীক্ষা উভয়ের গুরু হলেন। উনি যা' বলবেন বিনা বিচারে তাই পালন করবে। মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা। উঁহাদের আদেশ পালনই তোমার জীবনের ব্রত হউক এই আমার ইচ্ছা আর এই আমার আদেশ। যে মন্ত্র তোমায় দিলাম সে মন্ত্রের দেবতার বাহ্য অবয়ব ঐ তোমার পিতা মাতা,—একথাটা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। তোমায় যে মন্ত্র দিলাম সে মন্ত্রের দেবতা জলে আছেন, স্থলে আছেন, তোমার অন্তরে আছেন, তোমার বাহিরে আছেন, এই কথা স্মরণ করে সব কাজ কোরো, কোন ভয় থাকবে না।

বিষ্ণু পরম ভক্তি ভাবে সেই তেজঃপুঞ্জ মহাপুরুষের বাক্যগুলি শ্রবণ করিল। তাহার পর তিনি যখন নীরব হইলেন তখন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। সে সন্ন্যাসীর সমস্ত কথা বুঝিয়াছিল কিনা জানিনা তথাপি তাঁহার কোন কথাই সে বিস্মৃত হয় নাই। তাই যখন তিনি উপদেশ দিয়া উঠিয়া গেলেন তখন তাহার মাতা ভুবনেশ্বরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। ভুবনেশ্বরী হাসিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিল "মা আমি পারব ত ?" ভুবনেশ্বরী আশ্বাস দিয়া বলিলেন "পারবে বই কি বাবা,—তুমি সব পারবে।"

সন্ন্যাসী বাহিরে যাইয়া ব্রহ্মযশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রহ্মযশ তখন জোড় হস্তে বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইতেই তিনি তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ভাই, আজ এই গৃহে যে গার্হপত্য হোমাগ্নির প্রতিষ্ঠা করিলাম, জানিনা এর শিখা কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে, কিন্তু তুমি গুরুদেবকে বলিয়ো যে আমার চেষ্টা সফল হউক আর নিষ্ফলই হউক আমার প্রাণ ঐ অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি।

তাঁর আশীর্ব্বাদে আমার যত্নের কোন ক্রটী থাকিবে না তবে ফলাফলের ভার তাঁর উপর।"

সন্ন্যাসী। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

ব্রহ্ম। তাত জানি, কিন্তু তবু এমনি মানুষের মন, যে ঐ ফলটার দিকেই কেবল ঝুঁকে পড়ে। কাজ যতটুকুই করি না কেন তার ফল নিক্তির তৌলে মেপে না পেলে মন কিছুতেই শান্ত হয় না। ওসব কথা যাক্ তুমি কি আজই যাবে?

সন্ন্যাসী। আমার কাজত সেরে দিয়েছি, ভাই, আর আমার কেন? এখন গুরুদেবের চরণে সব কথা নিবেদন করিগে।

ব্রহ্ম। সংসারে আমাকে জড়িয়ে ফেলেছি, আর কোন দিকে চাহিবার জো নাই। এমনই মহামায়ার মায়া। কতদিন তোমাদের সঙ্গে সব ভুলে কেবল গুরুচরণ আশ্রয় করেছিলাম। তারপর যাই সংসারে এসেছি অমনি মা আমায় ঠিক সেই আগেকার মতই ত আপনার করে নিয়েছেন। কোন স্থানে জোড় লাগার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাচ্ছিনা। তবু তুমি এলে, আবার চলে যাবে —তাই সম্মুখের ঐ অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে আবার আমার মন সেই উন্মুক্ততার জন্য ছট ফট্ করে উঠ্‌ছে। আবার সেই কথাটা সেই ভূমৈব সুখং—সেই অল্পকে ছেড়ে সর্ব্বকে গ্রহণ করার কথাটা ঘুরে ঘুরে মনে আস্‌ছে, কিছুতেই তাকে ভুলতে পার্‌ছিনা।

সন্ন্যাসী। ভূমাকে গ্রহণ কি আমাদেরই হয়েছে ভাই? কেবল ঘুরে ঘুরেই মরছি গুরুর আদেশ পালন করা ছাড়া আর কোন মহান সত্যের সংবাদ ত আমরা সংসার ছেড়েও পাইনি। অতএব আমাদের উভয়ের অবস্থাই এক। তবে তুমি যে দিক দিয়ে ভূমার প্রকাশকে দেখতে চাচ্ছ তাই যে ভুল তাই বা কে জোর করে বলতে পারে? হয়ত তোমার কাজই ঠিক হচ্ছে, আমরাই ভুল কচ্ছি। "বৃহত্তম" "বৃহত্তম" করলেই কি ভূমাকে পাওয়া যায়? আর অল্পকে নিয়েই কি মানুষ চিরদিন থাকতে পারে? মানুষকে ছোট হতে বাহির হয়ে বড়কে পেতেই হবে—তাকে বড় হতেই হবে। তাই বোধহয় হয়ত তুমিই ঠিক পথ অবলম্বন করেছ।

ব্রহ্ম। ঠিকই হোক আর ভুলই হোক আমাদের লক্ষ্য একই। পথের জন্য কোন ক্ষোভ রাখিও না; তবু বাল্যকাল হ'তে ত্যাগ করাটাকেই বড় করে দেখ্‌তে শিখিছি, তাই সংসারত্যাগীদের দেখ্‌লেই উন্মুক্ত আকাশ বাতাসের কথা মনে পড়ে।

সন্ন্যাসী। কিন্তু সে বাতাসতো তোমার ঐ গৃহের মধ্যে কেবলই প্রবহমান রয়েছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে তোমার গৃহের ছায়ায় এসে দাঁড়াবে সেই তা' অনুভব করবে। যাক ভাই তোমার মত গৃহীর—

ব্রহ্ম। প্রশংসা রাখ, আবার কবে তোমার দেখা পাব?

সন্ন্যাসী। সে কথা আমি জানি না, গুরুদেব জানেন। এখন তোমার পুত্রের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা কর। তাকে এই দু'দিনে যা বুঝিছি তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে এ রকম শিষ্য অতি অল্প গুরুর ভাগ্যেই ঘটে। এত অল্প বয়সে এরকম মেধা আমিত কৈ দেখিনি।

ব্রহ্ম। ঐ ত' একমাত্র ভরসা। ওকে দেখেই ত মনে হয়, যে যাঁর আশায় বসে আছি, তাঁকে পাব। যাক তবে, এস, দাঁড়াও প্রণাম করি।

সন্ন্যাসী। ঐ দেখ এক বিষয়ে তোমারই জয়; সংসারী হয়েছ বলে আমাদের শক্তির অংশে ও তোমরা প্রণাম করে ভাগ বসাতে চাও। যখন তুমিও আমাদের মত গেরুয়াধারী ছিলে, তখন তুমিই আমাদের নমস্য ছিলে, আর আজ গৃহী হয়েছ তাই আমাকেই তোমার নমস্কার গ্রহণ করতে হচ্চে।

ব্রহ্ম। ভাই আমি কারও প্রণাম নেবার অভিমান রাখ্‌তে চাই না; আমি সবারই পদতলে পড়ে থাকতে চাই। কিন্তু যাকে পেলে ধুলায় পড়ে থেকেও

সব চাইতে ধনী হব সেই সব—পাওয়ার শ্রেষ্ঠ-
পাওয়াকে পাইয়ে দাও এই আমার প্রার্থনা।

সন্ন্যাসী। তা তুমি পাবে পাবে, মা ভৈঃ।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মযশ কিছুক্ষণ কৃতাঞ্জলি পুটে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন,—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদুচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

(৫)

পূর্ণ দ্বাদশ মাসকাল গৃহে বদ্ধ থাকিয়া বিষ্ণুযশ যে দিন প্রথম বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সে দিন জলস্থল আকাশ বাতাস সমস্তই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এক বৎসর কাল ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, আচার, নিয়ম, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদির চাপে তাহার প্রাণ মৃৎগর্ভনিহিত প্রাণীর মত হইয়াছিল। তাই যখন সে প্রথম গৃহের বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইল তখন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইতে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল—সে যেন মনে মনে বলিল "বাঁচিলাম, বাঁচিলাম।" সে সেই দিন মনের আনন্দে আশাবরীর জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পূর্ণানুভূতিতে বলিল,—

দ্রুপদাদিব মুমুচান সিন্ন স্নাতোমলাদিব।
পূতং পবিত্রেনে বাজ্য মাপঃ সুন্ধন্তু মৈনসঃ॥

সে দিন যখন সে অঞ্জলি পুটে জল লইয়া সূর্য্যার্ঘ দিল তখন তাহার প্রাণের আনন্দই অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সে যেন কেবলই বলিতেছিল "বাঁচিয়া গেলাম বাঁচিয়া গেলাম" "এই জল আমার মায়ের মতনই মঙ্গল করিতেছে," "এই বায়ু আমার ভায়ের মতনই আমাকে জড়াইয়া ধরিতেছে, এই আলোকে আমার সমস্ত পাপান্ধকার দূর করিয়া দিতেছে।"

এই প্রকারের অনুভূতি যখন মনকে পাইয়া বসে তখন তাহা তাহাকে কিছুতেই বসিয়া থাকিতে দেয় না। সেই জন্য বিষ্ণুযশঃ সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া কেবলি কাজে হউক অকাজে হউক বাহিরে ছুটিয়া যাইতেছিল এবং বিনাপ্রয়োজনে সমস্ত গ্রামখানা প্রদক্ষিণ করিয়া করিয়া এবং বিনাকারণে শতবার করিয়া হরিদাসকে প্রশ্ন করিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল, "রামভজনসিংএর গোয়ালঘর খানা কি হল?" "মনিয়ার মার নালকি বাছুরটা কৈ?" "ভগবতী চরণ কোথায় পড়তে গিয়েছে?" "নদীর বাঁকে যে ডোঙ্গা খানা বাঁধা থাকত সে খানা কোথায়?" ইত্যাকার শত শত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হরিদাস পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল। তথাপি বহুদিন পরে তাহার বিষ্ণুকে ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় নিতান্তই নিকট পাইয়া হরিদাসও হেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল। তাই সেও যেন বিষ্ণুকে কাছে কাছে রাখিয়া শতপ্রকারে তাহার মনোরঞ্জন করিয়া এতদিনের বিরহের কষ্টটাকে একদিনের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দূর করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাদের রকম সকম দেখিয়া মাতা ভুবনেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন আহা! বাছাকে এতদিন ধরে এমনি করেই কি বন্ধ রাখতে হয়? শাস্ত্রে কেন যে এত কষ্ট দেবার ব্যবস্থা আছে জানি না। ছেলে যেন আমার এতদিন পরে আবার মা পেয়েছে।" ব্রহ্মযশ হাসিয়া বলিলেন "দুদিন মার কোল থেকে কেড়ে রেখেছিলাম, তাইত আজ এত আগ্রহে আবার মাকে ও জড়িয়ে ধরেছ।"

এতদিন কি পাখী ডাকে নাই? এতদিন কি গো মহিষাদি মাঠে চরিতে যায় নাই? এতদিন কি প্রান্তর মধ্যস্থ বটবৃক্ষের ডালে রাখালবালকেরা দুলেনাই? এতদিন কি সাঁওতালদের বাঁশের বাঁশী নীরব ছিল? নদীর ধারে কি এতদিন কাশফুল ফোটে নাই? না—না, ছিল, ছিল, সবই তেমনি ছিল। সেই কেবল সে সব লক্ষ্য করিবার সময় পায় নাই। শিক্ষার উৎসাহ এবং পিতার অবিচলিত গাম্ভীর্য্য এতদিন বিষ্ণুযশঃ ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান রচনা করিয়াছিল তাহাতেই সে কোন দিক লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই। তথাপি প্রভাতের আলোটি যখনই তাহার গবাক্ষের পাশে উঁকিঝুঁকি মারিত, গ্রাম বালকেরা যখনই কলরব করিয়া তাহার কক্ষের সম্মুখ দিয়া দূরে চলিয়া যাইত, নদীতে 'বোহা' (বর্ষার প্রবল স্রোত) আসিবার সংবাদটি যখনই তাহার নিভৃত কক্ষে আসিয়া পৌঁছিত, তখনই কি তাহার মন ব্যাকরণের কঠোর শব্দ

প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া, "অলঙ্কারের" শব্দালঙ্কারের শিঞ্জিতকে ভুলিয়া দূরে দূরে অতিদূরে চলিয়া যাইত না ? যাইত বৈ কি। নিত্যপূজার হোমাগ্নির উত্তাপ হইতে কখনও কখনও কি তাহার মন আশাবরীর শীতল জলের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া অবগাহন করিয়া আসিত না ? আসিত বৈকি। কিন্তু তবু সে শাস্ত্রের ও শাস্ত্রমূর্ত্তি পিতার সমস্ত আদেশই নির্ব্বিচারে পালন করিত। কারণ পিতা তাহাকে যেমনটি দেখিতে চান ঠিক তেমনটিই তাহাকে হইতে হইবে। তাহাই তাহার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য—তাহাই তাহার সাধনা।

কিন্তু তবু সে যে এখনও অতিশিশু ! মাতা প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় হইতে না হইতে এতখানি সংযমের মধ্যে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া দেওয়াতে তাহার তরুণ প্রাণ যে বিকাশের মুখেই শুকাইয়া উঠিবার মত হইয়াছে। সে মুখে বলিতেছে বটে,—"অহমন্ন মহমন্ন মহন্নম। অহমন্নাদো অহমন্নাদো অহমন্নাদো" কিন্তু তাহার শিশু আত্মা যে সুধু আমি অন্ন, আমি অন্নভক্ষক এই সব বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিয়া বাঁচিতে পারিতেছে না। তাহাকে অন্ন দাও তারপর শিক্ষা দাও যে যাহা খাইতেছ তাহাও তুমি যে খাইতেছে সেও তুমি। অনুভবের পূর্ব্বেই যদি বল "ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা" তাহা হইলে প্রথমেই যে প্রাণত্যাগ ঘটিয়া বসিতেছে। মাতা প্রকৃতির হৃদয় হইতে তাহার জন্য যে ক্ষীরধারা ক্ষরিত হইতেছে তাহার সঙ্গে প্রথমেই যদি সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া দাও তাহা হইলে সংযমের পূর্ব্বে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হইবে।

ব্রহ্মযশঃ যে একথা বুঝেন না তাহা নহে ; আর সেই জন্য মাঝে মাঝে যখন পুত্রের অবস্থা অনুভব করিয়া ভুবনেশ্বরী বিদ্রোহের লক্ষণ দেখাইতেন তখন তিনি তাঁহাকে বুঝাইতেন যে ভোগ করাত চিরদিনই আছে ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিতে শিক্ষা করাই সনাতন আদর্শ। তিনি তাহার পুত্রকে সেই আদর্শেই গড়িয়া তুলিতে চাহেন। প্রথম হইতেই যদি ত্যাগ করাটাকে বড় করিয়া দেখিতে শিখি তাহা হইলে ভোগের সময়েও সংযম আপনা হইতেই আসিবে। আর প্রথম হইতেই যদি ভোগটাকেই বড় করিয়া দেখিতে শিখি তাহা হইলে সংযম কিছুতেই আসিবে না।"

ভুবনেশ্বরী। কিন্তু তার পূর্ব্বে যে ছেলেটা মারা যায় !

ব্রহ্ম। বিষ্ণু আমার তেমন নয় ; তাহার মধ্যে কতখানি শক্তি আছে, প্রাণ আছে, তুমি তার কিছুই সংবাদ রাখ না।

ভুবন। আমি মা, আমি তার প্রাণের খবর রাখি না ?

ব্রহ্ম। মায়া স্বরূপিনী প্রকৃতি ঠিক তোমারই মত মায়াময়ী। সে তার সন্তানদের কেবলি তার ব্যগ্রবাহু দ্বারা জড়িয়ে ধরে সব ভুলিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু যে মুক্ত হ'তে চায় সে তো সেই মহামায়াজালময়ী মাতাকে ছেড়ে সেই মায়ীকে সেই জালবান নিত্য মুক্ত পিতাকেই পেতে চায়। ভুবন, আমার কতখানি আশা ঐ ছোট্ট ছেলেটার উপর রেখেছি তা যদি জানতে তা হলে আমাকে নির্ম্মায়িক মনে করতে না।

ভুবন। আমায় ক্ষমা কর, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন যেন শুকিয়ে উঠছে তাই দেখে মাঝে মাঝে তোমার কথা ভুলে যাই। আমি যে তোমার মত কিছুতেই হতে পাচ্ছি না। আমায় তোমার মত করে নাও।

ব্রহ্ম। তুমি আমার দ্বিতীয়, তুমি আমার মতই চিরদিনই আছ, তবে যে মাঝে মাঝে তোমার ভুল হয় সেটা আমার মত এত বড় একটা আশা তোমায় পেয়ে বসেনি সেই জন্য।

ভুবন। কিন্তু তোমার প্রকাণ্ড আশার চাপে ছেলেটা যদি শুকিয়ে ওঠে তাহ'লে কি আমি কিছু বল্‌তে পাব না ?

ব্রহ্ম। শুকিয়ে উঠবেনা, ভয় নেই ; যা বিষ্ণুকে দিতে চাচ্ছি তা'যে অমৃত ; তাতে কি মানুষ শুকিয়ে উঠে ? ব্রহ্মবিদ্যা পেতে হলে প্রথম হতেই আপনাকে সংযমের দ্বারা প্রস্তুত করে নিতে হয়, প্রথম হতেই প্রকৃতির ওপর উঠ্‌তে শিখতে হয়। তা' না হলে কি আর রক্ষা আছে—মহামায়ার যে কি শক্তি তা তুমি জান না। চণ্ডী বলেছেন—

"মহামায়া হ বৈশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানীনাং অপিচেতাংশি, দেবী ভগবতী হিসা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥"

জ্ঞানীদের মনও তিনি সবলে মোহের মধ্যে টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দেন। এত বড় শক্তিময়ীকে কি সহজে কেউ পারে? তাই অতি সম্বর্পনে প্রথম হ'তে আপনাকে প্রস্তুত করতে হয়। যাক তোমার ভয় নেই। একটা বৎসর বৈত নয়। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আগেকারকালে উপনয়নের পর অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ সংযত হয়ে গুরুগৃহে বাস করতে হ'ত। তাই আবার কমাতে কমাতে আজ-কাল দ্বাদশ দিনে পরিণত করা হয়েছে। আমি সেইস্থলে দ্বাদশ মাস করিছি। এতেই তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

ভুবন। আর ব্যস্ত হব না আমায় ক্ষমা কর।

[৬]

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ব্যাপারের পর আর এক বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে সমগ্র দেশব্যাপী ভীষণ মারীভয় এবং তাহার সঙ্গী দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুই রাক্ষস তাহাদের সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া গ্রাম নগর জনপদাদি আক্রমণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত করিতে লাগিল। শত শত গ্রাম একেবারে জনশূন্য, ক্ষেত্র সমূহ শস্যশূন্য হইয়া গেল। উক্ত ভীষণ শত্রুর আক্রমণে অনেক গ্রাম এমন কি গবাদি পশু শূন্য হইয়াছিল। ঐ মৃত্যুর প্রবল স্রোত ক্রমে ক্রমে সম্বলপুর গ্রামেও উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসী দরিদ্র ভদ্র সকলকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। অনেকেই গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক সহরে পলাইয়া গেল, গ্রামের চাষারা লাঙ্গল, গরু, চাষের জমী সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া নিশিদিন কম্পান্বিত কলেবরে যেন মৃত্যুর প্রতিক্ষায় গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

এই ভীষণ সময়ে চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিরাট তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়াও ব্রহ্মঘণ শান্তভাবে সম্বলপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল এমন কি তাঁহার পত্নী ভুবনেশ্বরীও সজলনয়নে সেই প্রার্থনা জানাইলেন কিন্তু তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভীরুর জীবনই মৃত্যু; সর্ব্বদা প্রাণভয়ে ভীত থাকিয়া বাঁচা না বাঁচা দুই সমান। প্রাণের ভয়ে কর্ত্তব্যকে পরিত্যাগ করিব আমি এতদূর নীচ নহি। এই গ্রামের লোকের সুখের সময় তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, আর আজ ইহাদের বিপদের সময় ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া কোন মতেই উচিৎ নয়। যদি মরিতেই হয় এইখানেই মরিব।"

ভুবন। কিন্তু মিছিমিছি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়া উচিৎ কি?

ব্রহ্ম। মিছি মিছি নয়, এই ত উপযুক্ত সময়! এই সময়েই ত মানুষের মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। যে ভীরু যে দুর্ব্বল সেতো জড়, একটু বিচার করে যদি দেখ তা হলে ভীরু কর্ত্তব্যবিমুখ মানুষই প্রাণহীন। শ্রুতি বলেছেন "নায়মাত্মা বল-হীনেন লভ্য" যে বলহীন সে আত্মাকে পাইতে পারে না; অর্থাৎ তার কাছে সে নিজেই অস্তিত্বহীন। আমি যে অজর অমর ভয় লেশ-হীন আত্মা তার পরিচয় ত এখনই নিতে হবে। এমন সুযোগ আর কখন পাব? বিষ্ণুকেও এই বিপদের মধ্যে রেখে তার পরিচয় নিতে হবে। এমন সুযোগ কি ছাড়তে আছে? আর তোমায় বলছি, আমার কথার উপর স্থির বিশ্বাস রেখো এই বিপদে আমাদের যথেষ্ট লাভ হবে, এতে আমাদের এমন একটা শিক্ষা হবে যার জন্য চিরদিনের জন্য ভগবানের পরম পাদপদ্মে আমাদের মস্তক নত হয়ে যাবে। আমার মনের এ বিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না। ভুবন, তুমি যদি ভয় পাও তাহ'লে জানব তোমার আমার মধ্যে মিলন সম্পূর্ণ হয় নাই।

ভুবনেশ্বরী তাঁহার স্বামীর তাৎকালিক উজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার ভয় দূর হইল না বটে কিন্তু অনেকটা কমিয়া গেল; কারণ তিনি তাঁহার স্বামীকে কতকটা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞান করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহার স্বামী

ভগবদিচ্ছাকে অন্তরের মধ্যে দেখিতে পাইতেন। সেই বিশ্বাসের বলে তিনিও স্বামীর সাহসে সাহসবতী হইয়া রহিলেন।

ভৃত্য হরিদাস ত ব্রহ্মযশকে একেবারে দেবতাজ্ঞান করিত; সেই জন্য সেও নির্ভয়ে প্রভুর কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছিল, একদিনও তাঁহার কথায় বা কার্য্যে ভয়ের কোন্ লক্ষণ দেখা যায় নাই। গ্রামের সাপ্তাহিক হাট উঠিয়া গিয়াছিল তাই সে সুদূর কোন এক বৃহৎ গ্রাম হইতে একেবারে সাপ্তাহিক বাজার করিয়া লইয়া আসিত। ব্রহ্মযশ ও যখন যেখানে রোগী দেখিতে যাইতেন সেও ঔষধপত্র বহন করিয়া তাঁহার অনুগমন করিত। এমন কি পথিপার্শ্বস্থ স্বজন পরিত্যক্ত মুমূর্ষু পথিককেও উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মযশকৃত সেবাগৃহে লইয়া যাইত।

ব্রহ্মযশঃ স্বীয় সন্ন্যাসাবস্থায় অনেক প্রকার রোগের শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় ও গুপ্ত ঔষধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই চিকিৎসা বিদ্যা এখন বহু শুভ ফল প্রসব করিতে লাগিল। তিনি সেই সমস্ত ঔষধাদি লইয়া অনেক রোগীকে রোগমুক্ত করিলেন অনেককে রোগাক্রমণ হইতে বাঁচাইলেন এবং সর্ব্বোপরি স্বয়ং সুস্থ থাকিয়া অনেক মুমূর্ষুর মুখে পানীয়-জল প্রদান করিয়া বহু লোকের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন। তাঁহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সাহায্য আনাইয়া গ্রামখানিকে দুর্ভিক্ষের গ্রাস হইতে মুক্ত রাখিলেন। তিনি যেন সমস্ত গ্রামখানির মধ্যে মূর্ত্তিমান অভয়স্বরূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেখানে যে অবস্থার লোক তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে সেইখানেই তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঔষধের ব্যবস্থা পথ্যের ব্যবস্থা এমন কি গৃহের অন্যান্য লোকের আহার্য্যের ব্যবস্থাও করিয়া দিতেন। দূর বঙ্গদেশ হইতে চাউলাদি হরিদাসের দ্বারা আনাইয়া নিজের গোলাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ঔষধাদি আনাইবারও ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। তিনি স্বয়ং তেমন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নহেন, তথাপি তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তির জন্য স্বয়ং ভগবানও যেন তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন; অনেক সময়ে তাঁহার পরিচিত অপরিচিত বহুব্যক্তি তাঁহার জন্য অনেক প্রকারের সাহায্য প্রেরণ করিয়া তাঁহার কার্য্যের সুবিধা করিয়া দিত। দেখিয়া শুনিয়া অনেকেরই বিশ্বাস হইয়াছিল যে তিনি ঈশ্বরানুগৃহিত ব্যক্তি।

কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে গেলে তিনি ঈশ্বরের উপরে যতখানি নির্ভর করিয়াছিলেন স্বীয় চেষ্টার উপরেও ততখানিই নির্ভর করিয়াছিলেন। রোগের প্রতিষেধক যত প্রকার উপায় তাঁহার জানা ছিল তাহার একটিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। গৃহাদি পরিষ্কার রাখিতে, সর্ব্বদা এক প্রকার আয়ুর্ব্বেদীয় তৈল দ্বারা হস্ত পদাদি মার্জ্জন করিতে, এবং রোগী দেখিতে বাহির হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার পার্ব্বতীয় সুগন্ধময় ঔষধ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে তিনি কখনও ভুলিতেন না এবং হরিদাস ও বিষ্ণুযশকেও সেইরূপে সাবধান করিতে ভুলিতেন না। তাঁহার উপদেশানু-সারে ও ঔষধাদির গুণেও অনেকে রোগমুক্ত রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে এমন কি অনেকে তাঁহার সাহায্যার্থেও অগ্রসর হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাকে একটী সেবাশ্রম নিজের গৃহের নিকটে প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এবং সেই সেবাশ্রমের অধিকাংশ কার্য্যের ভার ভুবনেশ্বরীর ও বিষ্ণুযশের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

এই সেবাশ্রমাবলম্বনে ইতিমধ্যে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহার জন্য ব্রহ্মযশ আদপেই প্রস্তুত ছিলেন না। পশ্চিমদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ পথিক পূর্ব্বাঞ্চলে সস্ত্রীক তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্বলপুরের নিকটস্থ কোন পীঠস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে সেই স্থানে মহামারীতে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার স্ত্রীটীর চিকিৎসার জন্য তিনি কোন উপায়ে সংবাদ পাইয়া ব্রহ্মযশকে লইয়া যান। কিন্তু ব্রহ্মযশ যখন উপস্থিত হন তখন সেই স্ত্রীলোকটীর অন্তিমদশা এবং সেই পথিক ব্রাহ্মণও রোগাক্রান্ত। ব্রহ্মযশ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে তাঁহার সেবাশ্রমে লইয়া আসিলেন এবং সেই সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের এক পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাকেও আনিতে বাধ্য হইলেন। সেবাশ্রমে আনয়ন করিয়া ব্রহ্মযশ সেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন বটে কিন্তু ব্রাহ্মণের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মযশ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অপরিচিত স্থানে অপরিচিত বিদেশীয় কন্যাটির কি দশা হইবে? তিনি তাহাকে লইয়া কি করিবেন? কি উপায়ে তিনি তাহাকে তাহার জন্মস্থানে পৌঁছিয়া দিবেন? সেখানকার লোকেরা ইহার ভার গ্রহণ করিবে কি না? এই সমস্ত চিন্তায় তিনি কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণ ত সংজ্ঞাশূন্য, তাহার নিকট হইতে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়াও এখন অসম্ভব। যেটুকু পরিচয় তিনি পাইয়াছেন তাহাতে তিনি বুঝিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের জন্মস্থান ৺ কাশীর নিকটবর্ত্তী ···গ্রামে। কিন্তু সেখানে তাঁহার আর কে আছে? কাহার নিকট পৌঁছিয়া দিলে বালিকা আশ্রয় পাইবে? এ সমস্ত কথা কিছুই তিনি জানিতে পারিলেন না। অনুমানে বুঝিলেন যে ব্রাহ্মণ অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছেন কারণ বালিকাও তাহার কোন বিশেষ আত্মীয়ের কথা বলিতে পারিল না; কেবল এইটুকু জানা গেল যে কেহ কেহ আছে; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বালিকার কি সম্পর্ক তাহা বুঝা গেল না।

কিন্তু ভুবনেশ্বরী বা তাঁহার পুত্র বিষ্ণুর নিকট এ প্রকারের কোন চিন্তাই স্থান পাইল না। সম্ভ মাতৃহারা এবং মুমূর্ষু পিতৃকা বালিকা তাহাদের আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে এখন আর চিন্তা করিবার কি আছে?—তাহার যদি অন্য আশ্রয় থাকে, ভালই, পরে সেখানে তাহাকে পাঠাইয়া দিলেই চলিবে; আর যদি নাই থাকে তাহা হইলে সে কি আশ্রয়হীনা থাকিবে? মাতৃহারা মা পাইবে না? পিতৃহীনা, পিতা পাইবে না? তাহার মর্ম্মভেদী অশ্রুজল কি কেহ মুছাইয়া দিবে না? অবোধ বালিকা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে তাহার কতখানি বিপদ ঘটিয়াছে তাই সে কেবলি জিজ্ঞাসা করে "মা কোথায়?" কিন্তু কি বলিয়া তাহার শিশুচিত্তকে শান্ত করা যাইবে? কি দিয়া তাহার মাতৃহারা হৃদয়ের স্নেহক্ষুধা মিটান যাইবে? এই সমস্ত চিন্তাতেই ভুবনেশ্বরীর মাতৃহৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। একেই বালিকার ভাষা ভাল বুঝা যায় না এমন কি বহু ভাষাভিজ্ঞ ব্রহ্মযশও সময় সময় তাহার ক্রন্দনের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তথাপি তাঁহাদের চেষ্টার ক্রটী ছিল না।

বালক বিষ্ণুযশও বালিকাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব সময় তাহার হিন্দি ভাষায় কুলায় না। তথাপি তাহার সস্নেহ চেষ্টায় বালিকা অনেক সময় ভুলিয়া থাকে। বিষ্ণু অনেক সময় তাহাকে ভুলাইবার জন্য বাজার হইতে নূতন নূতন খেলনা লইয়া আসে, কেয়াফুলের কণ্টকবনে ঢুকিয়া কেয়াফুল পাড়িয়া আনে পাহাড় হইতে নানাপ্রকারের নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড লইয়া আইসে কিন্তু যখন কিছুতেই কিছু হয় না তখন সজলনয়নে বালিকার ক্রন্দনে নীরবে যোগদান করে। বালিকার যখন ক্রন্দনের ঝোঁক উঠে তখন সে কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না—ভুবনেশ্বরীর মাতৃস্নেহ, বিষ্ণুযশের সহোদরের ন্যায় যত্ন, হরিদাসের গীত কিছুই তাহাকে ভুলাইতে পারে না। সে তখন মাটিতে পড়িয়া আপন ভাষায় মাতার নিকট যাইবার জন্য অতি করুণস্বরে কাঁদিতে থাকে। তাহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে ব্রহ্মযশের শান্ত হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠে।

এমন সময় একদিন বালিকার পিতার আসন্নকাল উপস্থিত হইল এবং সেই সঙ্গে তাহার লুপ্ত সংজ্ঞাও ফিরিয়া আসিল। তিনি তাঁহার কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। বালিকা নিকটে আসিলে তিনি তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া ব্রহ্মযশকে বলিলেন "মহাশয়, আমার এই কন্যাটিই শেষ সম্পত্তি। আমার আত্মীয়গণ আমায় স্থান দিলেন না। যাহা কিছু জমিজমা ছিল বেচিয়া কিনিয়া আমি এবং আমার স্ত্রী তীর্থ ভ্রমণে বাহির হই;—সে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। তাহার পর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া আপনার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। কে জানিত আজ এমন স্থানে এমন লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হইবে? সবই শ্রীরামজীর ইচ্ছা। আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না বলিয়া কোন ক্ষোভ করিবেন না; আপনাদের চেষ্টার কোন ক্রটী নাই কিন্তু ফলাফল শ্রীরামজির হস্তে। আমার এই বালিকাটি এখন আপনাদের হস্তেই রহিল ইহার এখনও দুএকজন আত্মীয় আছেন কিন্তু তাঁহারা ইহাকে স্থান দিবেন কিনা জানিনা;—খুব সম্ভব দিবেন না। তথাপি

একবার চেষ্টা করিবেন; ৺কাশী জেলার···গ্রামে আমাদের পৈতৃক বাসস্থান আছে। সেখানে আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আছেন। আমি অতি অকর্ম্মণ্য ছিলাম, সুধু পূজা-পাঠ লইয়া থাকিতাম। তাই তাঁহারা আমাকে পৃথক করিয়া দিয়া আমার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বহুল পরিমানে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাক, তাঁর জন্য কোন ক্ষোভ নাই; কি লইয়া আসিয়াছিলাম! আর কি লইয়াই বা চলিলাম। চিন্তা কেবল এই বালিকাটির জন্য।

ব্রহ্ম। সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কেহ যদি উহাকে গ্রহণ না করে আমার সংসারে উহাকে কন্যার মতই রাখিব।

ব্রহ্মযশের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমার নাম দুর্গাপ্রসাদ চৌবে! আমার ভ্রাতার নাম অযোধ্যাপ্রসাদ চৌবে। আমরা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ। আমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব ৺কাশীজিতে······ব্যাঙ্কে রাখিয়াছি, তাহার কাগজ আমার ঐ বেগের মধ্যে আছে। ইহার বিবাহের সময় ইহাকে দিবেন। আর কি বলিব আমার অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে, আপনাদের আর কি বলিব ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তিনি যেন আপনার ভালই করেন। ব্রাহ্মণের এই অন্তিম প্রার্থনা নিশ্চয় তিনি শুনিবেন।"

ব্রাহ্মণ ইহা বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব হইলেন। তাহারপর তাহার কন্যাকে বলিলেন "লছমিয়া, আমি চলিলাম।" বালিকা কাঁদিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়? মা গিয়াছেন আবার তুমি কোথায় যাইবে?"

কন্যার ক্রন্দন দেখিয়া মুমূর্ষু পিতার চক্ষে জল আসিল। তিনি ধীরে ধীরে কন্যার গাত্রে হস্ত মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন "লছমিয়া ভয় পাইওনা, ইনিই তোমার পিতা হইলেন আর উনিই তোমার মা। আমায় রামজীর কাছে যাইতে হইতেছে। তোমার মাও রামজীর নিকট গিয়াছেন সেখান হইতে রোজ তোমার সংবাদ লইব;—ভয় কি?"

বালিকা কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইল না; সে না বুঝুক তাহার অন্তরাত্মা যেন বুঝিতেছিল যে আর সে তাহার পিতা মাতাকে দেখিতে পাইবে না। তাই সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া কেবল বলিতেছিল "না না তুমি যাইও না"

বালক বিষ্ণুযশ তাহার অবস্থা দেখিয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং ছুটিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে যাইয়া ঘাসের উপর লুটাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে হরিদাস আসিয়া তাহাকে উত্তোলন করিলে সে সজলনেত্রে তাহাকে বলিল, "হরি দা, তোমার হরি ঠাকুর বড় নিষ্ঠুর! তিনি মানুষকে এত কষ্ট দিতে ভালবাসেন।"

হরি। তা না হলে কি আর রক্ষা ছিল! তিনি নিষ্ঠুর তাই তাঁকে এত ভালবাসি! তিনি যদি কেবলি দয়া করতেন তাহলে কোন্ দিন তাঁকে ভুলে বসে থাকতাম। তিনি কাঁদিয়ে মেরে ধরে আপনাকে জানিয়ে দেন!

বিষ্ণু। হরি দা তোমার সেই গানটা গাও না সেই-
"ও আমার নিঠুর হরি!"

হরিদাস আর দ্বিরুক্তি করিল না। তাহার প্রাণও কাঁদিবার জন্য ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। তাই সে মৃদুস্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল;—

ও আমার নিঠুর হরি
তুমি কাঁদিয়ে আমায় অশ্রু মুছাও
এ ভাব আমি বুঝতে নারি!
তুমি সকল কেড়ে আপনাকে দাও
(সবার) পর করিয়ে আপন করাও
আমি অবাক হয়ে বসে আছি
তোমার যুগল চরণ ধরি'।

[৭]

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়দের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া একদিন ব্রহ্মযশ ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে নিম্নলিখিত প্রকার কথোপকথন হইতেছিল। ব্রহ্মযশ বলিলেন "কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য বালিকাকে তাহার আত্মীয়ের হস্তে সমর্পণ করা।"

ভুবন। কিন্তু তারা যদি তেমন যত্ন না করে? মেয়েটী যদি শেষে অযত্নে মারা যায়?

ব্রহ্ম। তা'হলেই বা আমরা কি করতে পারি? তারা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বালিকার অভিভাবক; তারা যদি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, আমরা কোন রকমেই রাখতে পারব না।

ভুবন। কেন পারব না? ওর বাবা ত' আমাদেরই হাতে ওকে সমর্পণ করে গিয়েছেন?

ব্রহ্ম। সে কথা তুমি আমিই জানি কিন্তু সংসার ত সেকথা মানবে না। সে চাইবে যে আমরা বালিকাকে তার যথার্থ অভিভাবকদের হাতে প্রত্যর্পণ করি। তবে যদি তাঁরা গ্রহণ না করেন তখন আমরা বলতে পারব যে তাহলে আমরাই বালিকার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করলাম।

ভুবন। ভগবান করুন যেন তাই হয়।

ব্রহ্ম। এ তোমার অন্যায় স্নেহ ভুবন, যাদের জিনিষ তারাই গ্রহণ করুক এই প্রার্থনা করাই উচিৎ। স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে অপরিচিত লোকের মধ্যে বিদেশী বালিকার যে কি দুর্দ্দশা হতে পারে কে বলতে পারে। এখন না হয় ছোট আছে তারপর যখন বিবাহযোগ্যা হবে তখন কি উপায় হবে? তদ্দেশীয় কোন সদ্বংশ-জাত ব্রাহ্মণ বালক ওকে বিবাহ করবে? বাঙ্গালীর অন্ন গ্রহণ করেছে বলে হয়তো বালিকাকে কেহই গ্রহণ করতে চাইবে না।

ভুবন। এতকথা আমি চিন্তা করে দেখিনি; তবে মেয়েটিকে দেখে আমি কিছুতেই ওকে ছাড়তে পারছি না। যাক তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক।

ব্রহ্ম। ভুবন, কর্ত্তব্য কাজ যদি কঠিনই না হবে তা হলে ধার্ম্মিকের কোনই গৌরব থাকত না। তুমি যে অসহায়া মাতৃহীনা বালিকাকে এতখানি ভাল বেসেছ তাতে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে তা তোমায় কি জানাব! জগতে ভালবাসা অতিদুর্লভ বস্তু কিন্তু নারায়ণের দয়ায় সংসারে নারীজাতি মূর্ত্তিমতী ভালবাসা রূপে বিরাজ করছে, তাই সংসার দুঃখের নয় সুখের। যে যাই বলুক, মানুষ সুখ পায় তাই সংসারে থাকে, তা যদি না পেতো তা হলে কোন দিন বন্যপশুর মত বনে বনে ঘুরে মর'ত। তুমি ভালবেসেছ তাই বালিকাকে ত্যাগ করতে কষ্ট হচ্চে; কিন্তু তুমি যদি ওকে একটা উৎপাত স্বরূপ জ্ঞান করতে তা হলে বালিকাকে ত্যাগ করা অন্যায় হয়ে দাঁড়াত, নিষ্ঠুরের কার্য্য হ'ত। তখন যদি বালিকা আত্মীয় দ্বারা পরিত্যক্ত হ'ত তা হলে আমরা অনায়াসে বলে বসতাম "তা আমরা কি করব? আমরা কেন পরের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে যাব?" তখন বাস্তবিকই বালিকাকে ত্যাগ করা নিষ্ঠুরের কার্য্য হ'ত। এখন তাকে আত্মীয়দের হাতে দিলে বালিকার জন্য একটা স্থান রেখে তবে তাকে তার প্রথম স্বত্বাধিকারীদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হচ্চে; —সেখানে যদি তার স্থান না হয় তখন তোমার মাতৃ ক্রোড় ত' তার জন্য পাতাই থাকবে।

ভুবনেশ্বরী আর কোন আপত্তি করিলেন না; কিন্তু তাঁহার কোমল হৃদয়ের মধ্যে ঐ আনাহুতা স্নেহার্থীনী অতিথির জন্য যে কাতরতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার বেদনা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতেছিল "আহা পিতৃমাতৃহীনা অসাহায়া বালিকা!"

বালিকা তাহার পিতৃবিয়োগের পর কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখন কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ কাতর হৃদয়ের বেদনা সমস্ত সংসারের উপর গুরুভার হইয়া চাপিয়াছিল। সংসারের প্রত্যেক কার্য্যেই সংসারস্থ সকলেই তাহা অনুভব করিতেছিল। ব্রহ্মযশা তাহার প্রাত্যহিক প্রত্যেক কার্য্যের অবসরেই তাহার সংবাদ লইতেন; বিষ্ণু-যশাও তাহার অধ্যয়ন ও রোগী সেবার অবসরে বালিকাকে লইয়া ক্রীড়া করিত; আর ভুবনেশ্বরী ত' তাঁহার মাতৃ হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ বালিকার উপর অর্পণ করিয়া তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োজনের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন হরিদাসু তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সমস্ত গ্রাম-খানি ঘুরিয়া আসিত এবং অবসর ক্রমে আপনার স্বাভাবিক মিষ্টস্বরে মৃদু মৃদু গান করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিত। কিন্তু এত করিয়াও বালিকার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এবং গভীর দুঃখ কিছুতেই

দূর করিতে পারা যায় নাই। সে সকল সময় মুখফুটিয়া কাঁদিত না বটে তথাপি তাহার অবালোচিত গম্ভীর কাতর মুখ দেখিলেই বুঝা যাইত সে অন্তরে অন্তরে কাঁদিতেছে। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ঘুমাইতেন; কিন্তু বালিকা সময় সময় ঘুমের ঘোরেই ফুঁপাইয়া কাঁদিত। দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মযশা ক্রমশঃ বালিকার আত্মীয়দের আগমনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু বালিকার কোন আত্মীয় এযাবৎ আসিয়া পৌঁছিল না, এমন কি তাহাদের নিকট হইতে কোন সংবাদও পাওয়া গেলনা। ব্রহ্মযশা ক্রমশঃ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে হয় তাহাদের নিকট পত্র পৌঁছে নাই, না হয় এই দেশব্যাপী মহামারীতে তাহারাও কেহ বাঁচিয়া নাই, না হয় গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। এখন হয়ত বালিকাটিকে তাঁহাদেরই লালন পালন করিতে হইবে। তিনি তাহাতে অস্বীকৃত নন, কেবল সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন। বালিকার মুখে এমন একটা সৌন্দর্য্য—এমন একটা আকর্ষন ছিল, যাহা ব্রহ্মযশের ন্যায় উদাসীন ব্যক্তিকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই জন্য ঐ বিদেশিনী বালিকাকে, কিছুতেই তিনি ভার স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি স্বভাবতঃই করুণ হৃদয়, কিন্তু বালিকার জন্য তাঁহার হৃদয়ে করুণার অপেক্ষাও গভীরতর ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এমন সময় বিষ্ণু একদিন সংবাদ দিল যে গ্রামের নায়েব রামরাজ মিশির রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মযশঃ সেই সংবাদ পাইবামাত্র ঔষধ পত্রাদি সঙ্গে লইয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কাহারও অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহার কথামত নায়েব মহাশয়ের পুত্রকণ্যাগণকে ব্রহ্মযশের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কেবল শুশ্রূষার জন্য রামরাজের স্ত্রী ও অন্য কোন এক আত্মীয়া সেই গৃহে রহিলেন। রামরাজের জ্যেষ্টপুত্র ভগবতীচরণই কেবল মাঝে মাঝে তাঁহার নিকট আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিষ্ণুযশার কিন্তু কোন বিষয়ে কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সে তাহার পিতার সঙ্গে কিম্বা যে কোন সময়ে ইচ্ছা রামরাজকে দেখিতে পারিত। এবং ভগবতীচরণ যখন তাহার পিতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিত তখন তাহাকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। এমন কি শেষে তাহার সস্নেহ ব্যবহারে ভগবতী এতই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে গৃহ হইতে একপদও নড়িত না। হরিদাসের দ্বারা গান শুনাইয়া বা তাহারই নিকটে সহরের বিষয়ে গল্প শুনিয়া বিষ্ণুযশা ভগবতী চরণের বিদ্রোহী মনটিকে এমনই দখল করিয়া বসিল যে একদিন তাহার মাতা তাহাকে দূর মাতুলালয়ে তাঁহার পুত্রকন্যাদের লইয়া চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেও সে কিছুতেই গেল না। অগত্যা অন্যান্য সন্তানদিগকে পাঠাইয়া দিয়া ভগবতীর মাতাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

এদিকে ব্রহ্মযশার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও নির্দ্দোষ চিকিৎসায় রামরাজ মিশির ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মযশার উপর তাঁহার প্রথম হইতেই অগাধ বিশ্বাস ছিল তদুপরি এই ব্যাপারের জন্য তাঁহার সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এবং সেই জন্য ব্রহ্মযশা যখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন তখনই সকৃতজ্ঞ ভক্তিতে তিনি তাঁহার পদধূলি লইবার চেষ্টা করিয়া বলিতেন "ঠাকুরজি আপনি দেবতা! আপনার এই উপকারের উপযুক্ত প্রত্যুপকার আমার দ্বারা হইবে না।" ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিতেন 'এমন কথা বলিবেন না। উপকারের প্রত্যুপকার কোন না কোন প্রকারে আপনি করিবেনই। ভগবানের নিয়মের রাজ্যে কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল পাওয়া যাইবেই,—আপনার যদি কোন কাজ আমি করি আপনিও কোনও না কোন দিন আমারও কোন কার্য্য করিয়া এই আমার কার্য্যের শোধ দিবেন।"

রামরাজ। কিন্তু আপনি ত' নিষ্কাম, আপনি ত' কোন ফললাভের আশায় আমায় চিকিৎসা করিতে আইসেন নাই, সেইজন্য আমার মনে হইতেছে যে আমায় ঋণী থাকিয়াই যাইতে হইবে।

ব্রহ্ম। ওটা ভুল মিশির জি! এজন্মে না হো'ক পরজন্মেও অন্ততঃ আপনার নিকট হইতে এই কর্ম্মের ফল

আমার গ্রহণ করিতে হইবে। আর পরজন্মেই বা কেন এই জন্মেই হয়তো আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিতে পারিবেন।

রাম। বলুন কি উপকার? আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয়—

ব্রহ্ম। কি উপকার? তাহা আমি কি করিয়া বলিয়া দিব? যিনি সকল কর্ম্মের নিয়ন্তা তিনিই বলিয়া দিবেন। সংসারে উপকারের দ্বারাই যে সব সময় প্রত্যুপকার হয় এমন নয় অনেক সময় অনুপকারের দ্বারাও উপকারের ফল দেওয়া যায়। সংসার সেই ফলকে অনিষ্ট বলে জ্ঞান করতে পারে। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় যখন সমস্ত কর্ম্মেরই ফলোদয় হয় তখন সেই অনিষ্টকেই ইষ্ট বলে জ্ঞান করা সকলেরই উচিৎ। সেইজন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়েছেন যে কর্ম্মেতেই মানুষের অধিকার—কর্ম্ম ফলে নয়। কারণ কর্ম্মফল যে সব সময় দেখিতে ঠিক ইষ্টের মত হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাম। আপনি জ্ঞানী, আপনার নিকটে ইষ্টানিষ্ট উভয়ই সমান। কিন্তু আমরা সাধারণ ব্যক্তি আমরা উপকারের প্রত্যুপকারই আকাঙ্ক্ষা করি।

ব্রহ্ম। "যাদৃশী ভাবনা যস্যসিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী" আপনার যদি তাহাই ইচ্ছা হয় তবে তাহাই হইবে। এখন নিশ্চিন্ত থাকুন আমি কোন ফল লাভের আশায় আপনাকে চিকিৎসা করিতে আসি নাই। যে কর্ম্ম না করিলে পাপ এবং করিলে কোনই লাভ নাই তাহাই ধর্ম্ম কার্য্য। লাভের আশায় যে ধার্ম্মিক হইতে যায় সে বাণিজ্য করে, ধর্ম্মের কার্য্য করে না। আমি যাহা করিতেছি প্রতিবাসী মাত্রেরই তাহা কর্ত্তব্য না করিলে প্রত্যবায় আছে করিলে কর্ত্তব্য করা হয় মাত্র ইহাতে আমার কিছুমাত্র বাহাদুরী নাই; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ব্রহ্মযশঃ চলিয়া গেলে রামরাজ তাহার স্ত্রীর সহিত ব্রহ্মযশের বিষয় অনেক আলোচনা করিলেন। কিন্তু আপাততঃ উপকারের প্রত্যুপকার করিবার কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না।

[৮]

দিনের পরদিন মাসের পর মাস চলিয়া যাইলেও যখন লছমিয়ার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তখন ব্রহ্মযশ স্বয়ং তাঁহাদের খোঁজে বাহির হইলেন। তাঁহার নিকট লছমিয়ার পিতার যে সমস্ত কাগজ পত্র ছিল সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া একদিন নির্ম্মল প্রভাতে তিনি সুদূর ৺ বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হরিদাস তাঁহার সঙ্গী হইবার প্রার্থনা জানাইলেও তিনি তাহাকে গৃহস্থালীর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া এবং নায়েব মহাশয়কে তাঁহার সংসারের তত্ত্বাবধান করিতে অনুরোধ করিয়া একাকী উষার প্রভাতালোকে প্রকাণ্ড জগতের মধ্যে উধাও হইয়া গেলেন। বিষ্ণুযশা ও ভগবতীচরণ তাঁহাকে পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত অনুসরণ করিল। তাহার পর তিনি যখন পর্ব্বতের অপরদিকে নামিয়া গেলেন তখন বালকদ্বয় একটা শীলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া অপসরনশীল তাঁহার ছায়ার দিকে চাহিয়া রহিল; ইচ্ছা, যদি একবার তিনি ফিরিয়া চাহেন। কিন্তু তিনি একবারও ফিরিয়া দেখিলেন না। তাঁহার স্কন্ধস্থ প্রকাণ্ড যষ্টিটি ঠিক একই ভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল এবং তাঁহার পদতলের নাগরা জুতা জোড়া ঠিক একইভাবে সমপরিমিত ভূমী অতিক্রম করিতে লাগিল। ক্রমশঃ যখন তাঁহার দেহ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া পর্ব্বতের ক্রমনিম্নদেশ অতিক্রম করিয়া সমতল পথে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিষ্ণুযশা দুই হস্তে বদনাচ্ছাদিত করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সহসা তাহার বন্ধুর এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া ভগবতীচরণ কিয়ৎকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। শেষে বহু যত্নে তাহাকে শান্ত করিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিল।

গৃহে ফিরিয়া বিষ্ণু কাহারও সহিত কোন কথা না কহিয়া একেবারে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং বিগ্রহের পদতলে পতিত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল "হে ঠাকুর আমার পিতা যেন কুশলে ফিরে আসেন।"

ভুবনেশ্বরী দেবীর পক্ষে স্বামী বিরহ নূতন নহে তথাপি পুত্রের এবম্বিধ আচরণে তিনিও শঙ্কিতা হইয়া উঠিলেন।

কারণ তিনি মনে করিতেন যে যদি কাহারও বিদেশ গমনে তাঁহার কোন আত্মীয়ের অত্যন্ত উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই বিদেশযাত্রীর পক্ষে সেটা অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক। সেই জন্য বালক বিষ্ণুযশা যখন অশ্রুপূর্ণ লোচনে অন্যমনস্ক ভাবে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিল, তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে এরূপ করিলে তাহার পিতার অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা! তিনি যখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে বিদেশে গিয়াছেন তখন তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিৎ নয়, কারণ তাহাতে তাঁহাকে মনে মনে বাধা দেওয়া হইবে।

বিষ্ণু তাঁহার কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল ধীরে ধীরে তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল "মা, আমার এমন মন কেন?"

মাতা তাঁহার পুত্রের মস্তকে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "বাবা বিষ্ণু তুমি তোমার বাবার মত মানুষ হবার চেষ্টা করো, আমাদের মত একটুতে ভেঙ্গে পড়লে কি পুরুষ-মানুষের চলে? ছিঃ দেখ দিখি তোমায় কাঁদ্‌তে দেখে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই আজ যেন কেমন হয়ে রয়েছে। ভগবতী আজ কতবার বই নিয়ে পড়তে এসে ফিরে ফিরে গেল, হরিরও আজ কাজে মন নেই। তুমি কোথায় এদের সাহস দেবে, তা নয় তুমিই মেয়েমানুষের মত কাঁদছ। লক্ষী (লছমিয়া) তোমার বোন, তার কাজ তোমার বাবা করবেন না'ত কে করবে?"

বিষ্ণু তাহার মাতার কথা শুনিতে শুনিতে সহসা মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "মা তুমি খুব দুরদেশের গল্প জান? অনেক আগেকার।"

ভুবন। জানি।

বিষ্ণু। তাই একটা বল।

তখন মাতা পুত্রে অনেক দুরদেশের গল্প চলিতে লাগিল —যে দেশে কেবল রাজপুত্র রাজকন্যার বাস, যেখানে সোনার কাঠির রূপার কাঠিরই প্রতিপত্তি, যেখানে রাক্ষস খোক্কসেরা কেবল ভয় দেখাইয়া সরিয়া যায়, রাজপুত্রের কিছুই করিতে পারে না, যেখানকার সাগরের তলে কেবলি মানিক মুক্তা, আরো যেখানকার নগর উপনগরের পথে ঘাটে চলিতে চলিতে কেবলই মানিকমুক্তা মাড়াইয়া চলিতে হয়।

গল্প যদিও সেই চিরন্তন রাজপুত্র রাজকন্যার, তথাপি, তাহার মধ্যে যেটুকু দুঃখের সুর; যেটুকু বিরহ বেদনার সুর সেই টুকুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালক শ্রোতার কর্ণে বাজিতে লাগিল। বিষ্ণুযশা অল্প বয়সেই যদিও বহুতর পুস্তক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি মাতৃ-মুখনিঃসৃত এই সব অদ্ভুত গল্পাবলীর যেটুকু মূল কথা সেটুকু কখনও তাহার নিকট ধরা না দিয়া যাইত না। তাই পুস্তকের গাম্ভীর্য্য হইতে সর্ব্বদা মাতৃমুখ নিঃসৃত গল্পাবলীর সরলতার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিত। তাই আজিও তাহার পিতৃবিরহ কাতর হৃদয় মাতার সরল স্নেহের নিবিড়তর বেষ্টনের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া বহুল পরিমানে সান্ত্বনা লাভ করিল।

পিতা তাঁহার গভীর গম্ভীর স্নেহে তাহার জীবনের যে কতখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন বিষ্ণু তাহা জানিত না। তাই আজ যখন তিনি পরম গম্ভীর ভাবে কর্ত্তব্যানুরোধে চলিয়া গেলেন তখনই সে বুঝিতে পারিল যে তাহার পিতা তাহার পক্ষে কতখানি। শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া তিনি বিষ্ণুকে এমন ওতপ্রোত ভাবে অধিকার করিয়াছেন যে এই সামান্য কয় দিনের জন্য বিদেশ যাত্রাতেই যেন তাহার বোধ হইল যে আর তাহার কোন কার্য্য নাই। পুস্তকের উপদেশ সকল এখন তাহার পক্ষে অর্থহীন হইবে, শাস্ত্রানুশাসনগুলির কোন ভিত্তি থাকিবে না এবং এতদিন যাহা শিখিয়াছে সবই যেন একটা গুরু ভার প্রস্তরের মত তাহার মনের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিবে। তাই আজ সমস্ত দিন সে কেবলই মনে করিয়াছে "আজ কি করিব? আজ কি করিবার আছে?" তাহার শিশু-মন কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায় হইয়া আজ তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু দিন কখনও বসিয়া থাকে না, সকলের পক্ষেও যেমন সে একে একে চলিয়া যায় বিষ্ণুর পক্ষেও তাহাই হইল,—দিনের পর দিন একে একে চলিয়া গেল এবং প্রায় দুই মাস প্রবাসে অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মযশ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি 'লছমিয়ার' আত্মীয়দের বিষয়ে যে সংবাদ আনি-

লেন তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে; কারণ লছমিয়ার জ্যেঠ-তাত সেই দেশব্যাপী মহামারীতে গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় পলাইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই এবং অন্যান্য যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করায়, ব্রহ্মযশা লছমিয়াকে স্বকীয় তত্ত্বাবধানে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাটী ফিরিলেন। তিনি ৺বারানসী ধামের যে ব্যাঙ্কে লছমিয়ার পিতার যৎকিঞ্চিৎ গচ্ছিত আছে তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরী দেবী এই সমস্ত সংবাদে কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রকাশ করিলে ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন "তুমি তোমার "কুড়িয়ে পাওয়া" কন্যাটি নিয়ে দেশে যাও।"

ভুবন। কেন?

ব্রহ্ম। মেয়ে বড় হলে তার বিয়েথাওয়া দিয়ে সংসারটী একটু মনের মত করে নাও গিয়ে।

ভুবন। তা' আমি এইখানেই করে নিতে পারব। আমাদের মায়ে ঝিয়ের দু'বেলা দু'মুটো ভাত দিতে বোধহয় তুমি কৃপণতা করবে না?

ব্রহ্ম। আমি দরিদ্র, আমার নিজের দু'বেলা দু'মুটো জুটছে না তা আবার অন্যের।

ভুবন। তোমার যা জুটবে তাই কেড়ে খাব।

ব্রহ্ম। তা'হলে নাচার।

বিষ্ণুযশাও এ সংবাদে ও ব্যবস্থায় সুখী হইল কারণ সে ইতিমধ্যে লছমিয়াকে (লক্ষ্মীকে) এতদূর আপনার করিয়া লইয়াছে যে তাহার শিক্ষকতায় হিন্দুস্থানী বালিকা লছমিয়া বাঙ্গালী বালিকা "লক্ষ্মী" হইয়া উঠিয়াছে। সে এখন কতক বাংলা কতক হিন্দি মিশ্রিত করিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মযশের সংসারের অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাহার তাড়নায় হরিদাস ব্যতিব্যস্ত, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে বিষ্ণুযশার বিদ্যাভাসে ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি গ্রামের নায়েব হইতে চৌকিদার পর্য্যন্ত সকলেই ইতিমধ্যে মহারাণী 'লক্ষ্মীর' তাঁবেদার। নায়েব মহাশয়ও তাঁহার স্ত্রী যে লক্ষ্মীকে স্নেহ করিতেন তাহার বিশেষ কারণ এই যে সেই অসহায়া বালিকা তাঁহাদেরই স্বজাতীয়া এবং গ্রহবৈগুণ্যে পরান্ন-পালিতা। গ্রামের অন্যান্য লোকেও যে লক্ষ্মীর বশীভূত হইয়াছিল তাহার অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে একটী বিশেষ কারণ এই ছিল যে লক্ষ্মী 'লক্ষ্মীর' মতই সুন্দরী। ঘন কুঞ্চিত কুন্তল বেষ্টিত গৌরবর্ণ নিটোল মুখখানির মধ্যে এমন একটা গভীর সৌন্দর্য্য ছিল যাহা সকলকেই আকর্ষণ করিত। সর্ব্বোপরি লক্ষ্মীর সঙ্কোচশূন্য সরলতায় গ্রামের বালক-বালিকদের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছিল।

লক্ষ্মীও যেন আপনার ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই যখনই তাহার কোন বস্তুর প্রয়োজন হইত তখনই অসঙ্কোচে যাহাকে সম্মুখে দেখিত তাহাকেই আপনার রাজ আজ্ঞা প্রদান করিয়া বাধিত করিত। সেই আজ্ঞা প্রদানের মধ্যে এমন একটী সৌন্দর্য্য এমন একটী ভঙ্গী থাকিত যাহাতে কেহই তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিত না। তাহার সুগৌর সুন্দর মুখ খানিতে বালসুলভ চপলতা অপেক্ষা পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্যই অধিক ছিল, অথচ, সুকুমার সৌন্দর্য্যের এবং সরলতার অভাব ছিল না। সেই অনাথিনী পরান্ন পালিতা ক্ষুদ্র বালিকার ব্যবহারের মধ্যে কোথা হইতে যে এতখানি সরলতা ও তেজস্বীতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না অথচ সেই তেজস্বীতা কাহারও চক্ষে অশোভন বলিয়া প্রতিভাত হইত না। ভীষণ মহামারী ও বিপ্লবের মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়া যেন একটী প্রবল শক্তি ক্ষুদ্র বালিকারূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মযশের ক্ষুদ্র সংসারের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আর ব্রহ্মযশের ক্ষুদ্র পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া সেই শক্তি আপনার অচ্ছেদ্য মায়াজালে সমস্ত গ্রাম খানির হৃদয়কে জড়াইতেছিল।

গ্রামে এমন কোন বালক বা বালিকা, বৃদ্ধ, যুবক বা স্ত্রী ছিল না যাহার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না। নায়েবের পুত্র ভবানীচরণকে অনেক দিন তাহার জন্য সাঁতার কাটিয়া নদী পার হইতে হইয়াছে। গ্রামের চৌকিদার ধনবরণ সিংকে অনেক দিন তাহার জন্য অন্ধকার রাত্রে তাহাকে স্কন্ধে লইয়া সারাগ্রাম ঘুরিয়া বেড়াইতে

হইয়াছে। গ্রামের কোটাল কেশব ভকতকে বহুদিন তাহার পুত্তলিকার বস্ত্রের জন্য সুদূর গণ্ড গ্রামে কাজে অকাজে ছুটিতে হইয়াছে। এমন কি সেই গ্রামের এমন কেহই ছিল না যে তাহার পুত্র কন্যাদির জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় লক্ষ্মীর জন্য কিছু না কিছু ক্রয় করিয়া আনিত। অথচ ইহার জন্য তেমন অনুরোধ বা উপরোধ ছিল না। বালিকা যেন অতি সহজেই সকলের মনের মাঝ খানটিতে আপন আসন স্থাপিত করিয়াছিল। তাহার আত্মপর জ্ঞান ছিল না, যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত সেই তাহার পরমাত্মীয় হইয়া যাইত। তাহার গৃহের দাসী-কন্যা মণিয়াও যেমন তাহার আপনার নায়েবের কন্যা জানকিও তেমনি। আজ দ্বিপ্রহরে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অনুসন্ধানে জানা গেল সে রঘুয়া কাহারের বাটীতে বসিয়া সে রঘুয়ার ক্ষুদ্র শিশুকে লইয়া মহাব্যস্ত আছে এবং রঘুয়াকে তাহার জন্য মৎস্য ধরিতে যাইতে হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় হরিদাস আসিয়া সংবাদ দিল যে মনু পাঁড়ের গো-শকটে চড়িয়া সে দূরগ্রামে তামাসা দেখিতে গিয়াছে, ভবানীচরণ ও বিষ্ণু বাধ্য হইয়া তাহার সহিত গিয়াছে; কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারা যায় নাই। অথচ এই ক্ষুদ্র বিদ্রোহিনী যখন গৃহে ফিরিল তখন ব্রহ্মযশা ব্যতীত আর কাহারও তাহাকে কোনরূপ ভৎসনা করিবার ক্ষমতা ছিল না।

কেবল এক জনের নিকটে লক্ষ্মীর সমস্ত তেজস্বীতা সমস্ত প্রবলতা দুর্ব্বল হইয়া নত হইয়া পড়িত। তিনি ব্রহ্মযশা। ব্রহ্মযশের গম্ভীর দৃষ্টি ও নীরব ভৎসনার নিকট বালিকার সমস্ত প্রবলতা নিমেষে, কাতর দৃষ্টি ও সকরুণ অশ্রুধারায় পর্য্যবসিত হইত। এমন কি লক্ষ্মীর অতিশয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময়েও ব্রহ্মযশের শান্ত নয়নের একটী মাত্র দৃষ্টিপাতে লক্ষ্মীর চঞ্চলতা পলায়ন করিত।

ভুবনেশ্বরী দেবী মাতৃ কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া সর্ব্বদাই কর্ত্তব্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন এবং তাহার জন্য ব্রহ্মযশের নিকট মাঝে মাঝে মৃদু অনুযোগও পাইতেন, তথাপি ঐ মায়াবিনী বালিকার উপর আপনার অকারণ স্নেহকে কিছুতেই সংযত করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ বালিকা যখন তাহার মৃত পিতামাতার জন্য কারণে অকারণে কাঁদিয়া উঠিত, তখন ভুবনেশ্বরীর মাতৃ হৃদয় ভেদ করিয়া স্নেহ করুণা ও আদরের উৎস প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে বহু দূরে লইয়া যাইত। সেই কারণে বালিকার সর্ব্বপ্রকার আব্দার হাস্য মুখে সহ্য করিতেন, এবং তিনি করিতেন বলিয়াই বাটীস্থ অন্যান্য সকলেও সহ্য করিত।

এইরূপ অবস্থায় একদিন ব্রহ্মযশা ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন "তোমরা অত্যধিক আদর দিয়া লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মী করিয়া তুলিতেছ ক্রমশঃ দেখিতেছি উহার ভার আমাকেই লইতে হইবে।" ভুবনেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন "তোমার ভাগে একটীকে দিয়াছি এটী আমার ভাগে।"

ব্রহ্ম। ভাগাভাগীর কথা নয় ভুবন! উহার ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে, উহাকেও সেই মহৎ ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এখন হইতে প্রস্তুত না হইলে—

ভুবন। এরও ভবিষৎ? এর বিষয়েও যদি একটা খুব বড় ধারণা তোমার হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহার ভাগ্যেও অনেক দুঃখ আছে দেখিতেছি। দোহাই তোমার! ইহার ঘাড়ে কোন বড় আশার চাপ দিও না। একে বালিকা, তাহাতে আবার পিতৃমাতৃ হীনা! এ আর তোমার কোন্ কার্য্যে লাগিবে? কুড়িয়ে পাওয়া—

ব্রহ্ম। সেই জন্য নারায়ণের দান বলিয়া উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তুমি কি মনে কর, ভুবন, যে এইরূপ অপূর্ব্ব অবস্থায় যাহাকে পাওয়া গিয়াছে সে কি বিধাতার কোন এক গূঢ় উদ্দেশ্যে এখানে আইসে নাই?

ভুবন। বিধাতার যে কি উদ্দেশ্য তাহা তুমিই জান, আর তোমার বিধাতাই জানেন। আমি কেবল এইটুকু জানি যে আমার হৃদয়ের একটা কোণ অপূর্ণ ছিল তাহাই পূর্ণ করিতে আমার লক্ষ্মী এসেছে।

ব্রহ্মযশা আসিয়া প্রীতিপূর্ণ নেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "সে কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সর্ব্ববিষয়ের উপরে

উহার নিজের ভবিষ্যৎ। সেই দিকে চাহিয়া উহাকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে। সেই জন্য আজ হইতে উহার শিক্ষার ভার আমি গ্রহণ করিব। কিন্তু ভয় নাই তাহাতে তোমার হৃদয়ের সেই কোণটী খালি হইবে না।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

"সমাজ-সয়তান"

কলাবাগান পেরিয়ে গেলে পর
নোনাগাছের বনে ভরা উঠান, তারই একটী পাশে 'কেষ্ট' মালোর ঘর ;
মুখুয্যেদের অনেক দিনের প্রজা,
একটী ছেলে নাম ছিল তা'র 'ভজা',
বউটী তাহার তিনটী দিনের জ্বরে
গেল বছর ভাদ্রে গেছে মরে'
ওষুধ পথ্য কেই বা বল দিল
কাঙাল তা'রা বড্ড কাঙাল ছিল,
গাঁয়ের এমনি মজা :
নাড়ী দেখার লোক পেলেনা সকল পাড়া বেড়িয়ে এল 'ভজা' !

গাঁয়ের ত্রিসীমানায়
ডাক্তার কিম্বা বৈদ্য খুঁজে বাহির করা মহা একটা দায়।
'ভিজিট' দিয়ে ভিনগা থেকে বটে
ডাক্তার আনা ধনীর ভাগ্যে ঘটে,
কিন্তু যাদের উদরে নাই অন্ন
নাছোড়-বান্দা হাড় হাবাতে দৈন্য
তা'দের শুধু কান্নাকাটিই সার
প্রাণটা নিয়ে বেঁচে থাকাও ভার !
একটী মাত্র কাঁসার ঘটী ছিল
সাবুর পয়সা জুটল না তাই 'কেষ্ট' সেটা বাঁধা দিয়ে দিল।

ভরা ভাদ্র মাস
কালো মেঘে জমাট আকাশ মাঝে মাঝে ফেল্‌ছে দীর্ঘশ্বাস,
দু'টী প্রাণের ব্যথায় ঘন হয়ে
বাদল ধারা ঝরছে রয়ে রয়ে,
'কেষ্ট' কাঁদে অক্ষমতার লাজে
বিপুল ব্যথা 'ভজার' বুকে বাজে
তিনটী দিন আজ খায়নি তা'রা কিছু
অসাড় বসে মাথা করে নীচু
'ভজা' ডাকে—ওমা ওগো মা -
ভজার দিকে দেখ চেয়ে, ডাক্‌ছি এত কানেও শুন্‌ছো না ?

গভীর হ'ল রাত্রি
মিথ্যা ভজার মারে ডাকা আজকে সে যে পরপারের যাত্রী !
রোগের জ্বালা পেটের জ্বালা হ'তে
হাত এড়িয়ে চল্‌ল কোন মতে
তিনটী দিনই বুকের উপর তা'র
চাপা ছিল একটা ভীষণ ভার,
আজকে সে ভার সরিয়ে দিল কে ?
মুখের কালি মুছিয়ে নিল যে !
ঘুটঘুটে সে অন্ধকারে তখন
মুখের 'ছিরি' উঠ্‌ল জ্বলে নিভার আগে প্রদীপ জ্বলার মতন।

*　　*　　*　　*　　*

একটী বছর গেল
ভাদ্র গিয়ে আশ্বিন মাসে ঢাকের বাজ্‌না আবার ফিরে এল ;
'ভজা' ভাবে এইবা কেমন হ'ল
মরা মানুষ মরা হয়েই র'ল ?
'কেষ্ট' ভেবে পায় না কোন কূল
চোখের জলে পথ হয়ে যায় ভুল,
দিন যামিনী বুকের উপর হায়
বিদের কাঠি আঁচড় দিয়ে যায়
দেহের রক্ত মাথায় উঠে পড়ে
কে কা'রে দেয় সান্ত্বনা গো পিঁড়েয় পড়ে, লুটোপুটি করে'।

সেই ছিল যে লক্ষ্মী—
ঘরকন্না তারই ছিল প্রাণ দিয়ে সে সইত সকল ঝক্কি
চাল বাড়ন্ত জানতে দিত না
রোগ হ'লে সে গায়েই নিত না
কাঙ্গাল আমি জানতে পারিনি
একটী কড়িও কারো ধারিনি
হাজার দুখেও হাসিটুকু মুখে
এত মায়াও ছিল তাহার বুকে !
ঘরে আমার দায় হ'ল যে টেঁকা
নেহাতে আমি লক্ষ্মীছাড়া আটকপালের এতও ছিল লেখা !

সারা বছর ধরে,
ঘরের ধূলা উঠ্‌ছে জমে উঠান গেল আবর্জ্জনায় ভরে
পায়রা দু'টো কোথায় গেল উড়ে
তুলসী তলায় প্রদীপ শুধু, পুড়ে !
নেপা পোঁছা পিঁড়েয় ধরে' নোনা
মাঝ উঠানে পড়ছে ভেঙ্গে কোনা
হাঁস কটা আজ খাচ্চে যেন খাবি
কনকাটে রুঁই মরছে পড়া চাবি,
চালের বাতায় ঘুন ধরেছে—ঘুন
ছেঁড়া বালিশ মাদুর কেটে ইঁদুরগুলো করলে চতুর্গুণ।

কাঙ্গাল আমি কাঙ্গাল
ভজার মা যে ভেঙ্গে গেছে আমার মনের চারিদিকের জাঙ্গাল
সারা বছর বেকার বসে আছি
না খেয়ে আর কেমন করে বাঁচি,
আমি পাষাণ অনেক স'বে প্রাণে
দুখের ছেলে দুখের কি সে জানে ?
দু'মুটো ভাত তারও জোটেনা
আনব মেগে ?—মুখযে ফোটেনা !
মরা গাঙ্গে জাল ফেলা মোর সার
উঠ্‌ল কেবল মরার মাথা, হাড়ের গাদায় ঠেক্‌ল শুধু ভার।

জমিদারের বিলে
জাল ফেলা সে কায়দা অনেক হুকুম মেলে খাজ্‌না নগদ দিলে,
নায়েব ম'শার পা দু'খানি ধরে,
কান্না কাটি সারা সকাল-করে
ফলে পেলাম পেয়দা বেটার ঘুঁসি
বেরিয়ে এলাম তাতেই হয়ে খুসি,
পেটের জ্বালায় ক্ষেপে ভজার সাথে
বাহির হ'লাম সেদিন আঁধার রাতে,
—পেত্নিতলার ঘাটে
লুকিয়ে যে মাছ ধরব সবই বিকিয়ে যাবে রামনগরের হাটে!
বড় 'খালুই' দুটো
সবার আগে পূরে নে মাছ তোল দেখিরে আরো দু'চার মুঠো?'
'ভজা' বল্‌লে, 'এই দেখনা আমি
মোড়ের মাথায় একটুখানি নামি
দু'চার বারে জমা হ'বে অনেক
দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও তুমি খনেক',
—এই না বলে পাউড়ি ধরে' গিয়ে
খেপ্‌লা নিয়ে একটু ঘুরণ দিয়ে
যেমন এল ধারে
হুড়মুড়িয়ে পাউড়ি ভেঙ্গে অমনি 'ভজা' অগাধ জলে পড়ল একেবারে।
অন্ধকারে খালি
ডুব্‌ দিয়ে আর সাঁত্‌রে কেবল হাত্‌ড়ে পেলাম দু'চার মুঠো বালি,
অথৈজলে বিফল খোঁজা মোর
আঁধার কেটে আস্‌ল হয়ে ভোর
অনেক ডেকে পাইনি 'ভজার' সাড়া
সারা সকাল ঘুরনু সকল পাড়া
পেটের জ্বালায় গেছে মায়ের কাছে?
সেথায় বুঝি দুখের দানা আছে,
কুঁড়ে খানা আমার
সেদিন থেকেই শূন্যপড়ে—এখন সেথা বাস করে এক চামার।

* * * *

পাঁজর ভেঙ্গে মোর

ছ'টা ছ'টা ভাদ্র মাসের কাল রজনী হয়ে গেল ভোর।

বুকের মাঝে পাঁচটা পোড়া ফাগুন

জ্বালিয়ে গেছে কুলের কাঠের আগুন।

এখন আমি 'দানোর' মত ফিরি

বেড়া আগুণ আমার আছে ঘিরি'

রাত্রে আমি পাকা সিঁধেল চোর

দিনে আমি বেজায় নেশা-খোর

অত্যাচারের ঘানির মধ্যে এখন

মলে ফেল্‌ছি পিষে ফেল্‌ছি আমারই এই লক্ষ্মীছাড়া জীবন!

আমার ভাঙ্গা বুকে

অত্যাচারের ছুরি হান, একটী কথাও ফুটবে নাক' মুখে,

"চোর" বল'ত সেলাম করে যাব

'মাতাল' বল, খুবই আমোদ পাব

'খুনের মেয়াদ' নয়ক আমার সাজা

বুকের মাঝে জ্বল্‌ছে ইটের পাঁজা

"কেষ্ট মালো বড্ড ভাল ছিল?"

কে তাহারে এমন করে দিল?

তোমরা আবার মানুষ?

নায়েব ম'শায় পা ধরে' যে ধাক্কা খেলাম তখন ছিল হুঁস?

সাজ্‌ছ এখন ন্যাকা

হাতের বাঁধন দেখে তোমরা অনেক কথা কইছ এঁকা বেঁকা!

তখন মুখে কেওকি চেয়েছিলে?

দু'মুটো ভাত কেও কি দিয়েছিলে?

পিঁড়েয় পড়ে আমরা দু'টী প্রাণী

থাক্‌না,—আমি সবায়েইত জানি!

নাড়ী দেখার লোক ছিল না গাঁয়ে

চুকিয়ে দিলাম হেলায়, ভজার মায়ে

পেটের জ্বালায় ভজা—

"না, না, সেসব মিথ্যা কথা,—সয়তানীতে অনেক আছে মজা!

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আষাঢ়-দুর্য্যোগ

কে জানিত কবে আষাঢ়ের এই ঘনায়মান পুঞ্জীভূত মেঘ মালার গুরুগম্ভীর গর্জ্জন আমার কর্ণে বজ্রনির্ঘোষে আসন্ন ভবিষ্যতের দুর্য্যোগ সন্ধ্যার সূচনা করিয়া গিয়াছে!

আজিকার এই সমস্ত আকাশের সমগ্র বাতাসের দুর্য্যোগ যে এমনি করিয়া শত বাহু বেষ্টনে আমাকে আক্রমণ করিবে তাহার কোনও সংবাদই ভিতরে বাহিরে কোনদিন প্রকাশ হইতে দেখি নাই।

"আষাঢ়স্য-প্রথম দিবসে"র বিরহী-যক্ষের মত, সমস্ত হৃদয় দিয়া আকাশময় বর্ষার মেঘকে ধীরে ধীরে নিবিড় হইতে দেখিয়াছি, আর্দ্রবায়ুর উন্মত্ত চাঞ্চল্যকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়া শুধু একজনের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছি! সারাদিনমানের অবিরাম বর্ষণের সুর মল্লাররাগিণীতে হৃদয়-বীণার প্রত্যেক তন্ত্রীটী চঞ্চল করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে।—দূরে—অতিদূরে পঙ্কিল জলাশয়ে ভেককুল বর্ষার অবিরল সলিলস্পর্শে পুলকোন্মত্ত হইয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সারা হইয়াছে—আমার প্রাণকে জাগ্রত করিয়া একটা অভাব—কাতরতা রহিয়া রহিয়া আমাকে পাগল করিয়াছে। বাহিরের শীত-শিহরিত একটা কম্পন দেহময় ছড়াইয়া পড়িয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। মেঘের সৌন্দর্য্য সম্ভার দেখিয়া শুধু ভাবিয়াছি, সম্ভোস্ফীত নদীবক্ষের আকস্মিক আলোড়নের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া গিয়াছে—ওই নদীরই দু'কূলব্যাপী প্লাবনের মত কিসের একটা আকুল বন্যা দেহমন জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া দিয়া গিয়াছে—কিন্তু তবু আষাঢ়ের এই ভারাক্রান্ত বিরহ-ব্যথার মধ্যে একটা আসন্ন আনন্দের প্রতীক্ষায় ছিলাম—কিন্তু আমার এই অনুভূতির রাজত্বের বাহিরে যে একটা হিসাব নিকাশের ধর্ম্মাধিকরণ আছে তাহার পারোয়ানা এক দিনের জন্যও আমার নিজের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হয় নাই!

দিনের অন্ধকার ক্রমে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে গাঢ় হইয়া উঠিত! সেই বর্ষণ, সেই কম্পন সেই দুর্য্যোগ! কোনও দিন পথ-ভ্রষ্ট হইয়া মনের বেদনাকে আরো তীব্র ভাবে অনুভব করিয়াছি, রাশি রাশি অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুতের আলোক—আরো সমস্যা আরো প্রশ্ন, আরো বিপন্ন করিয়া দিয়াছে—নিজের দীনতা নিজের লজ্জা তখন যে নিজের মনের ছিল—

"হায় পথবাসী, হায় গতিহীন,
হায় গৃহ-হারা
ঝর ঝর ঝরে বারি ধারা—"

কোনও দিন বা নিশাসমাগমে উপাধানে মুখ লুকাইয়া বর্ষার প্রভাবকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে গিয়া ব্যর্থতায় হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে—একটা অবসাদ একটা আলস্যের আতিশয্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি—কখন কি দেখিয়া, কাহার আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি জানিনা—বাহিরে তাল-সমন্বিত বর্ষণের শব্দে, কান পাতিয়া শুনিয়াছি কে যেন আহ্বান করিতেছে।—অতি মৃদু অতি মধুর সে আহ্বান!—

"আয়, ছুটে চলে আয়, বর্ষা-রাণীর এই আনন্দ-বিলাসের রূপ-সম্ভার রাত্রির অন্ধকারে কি বিফল হইয়া যাইবে" একটা অধীর কণ্ঠে সেই নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া বুক চিরিয়া ডাকিয়াছি—

"আমারে যদি জাগালে তুমি নাথ
ফিরো না তবে ফিরো না কর করুণ আঁখিপাত!
শায়ন ঘন গহন পরে'
আষাঢ় মেঘে বৃষ্টি ঝরে'
"বাদল ভরা আলস ভরে ঘুমায়ে আছে রাত।"

এমন সময় যদি তুমি আসিয়াছ তবে ফিরিয়া যাইও না আমি ব্যথিত আমি ক্লিষ্ট—এস গো তোমার সর্ব্বশান্তি-সংবিধায়িনী শায়ন-সঙ্গীত আমায় শোনাইয়া যাও!

"বিরাম-হীন বিজলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
আজি, বরষা-জল-ধারার সাথে গাহিতে চাহে গান"

তুমি যাইও না—আমার গানকে সার্থক হইতে দাও—আমার

সুর আজ তোমার স্পর্শে সুন্দর করে তোল! আজ আমার গানের ছন্দে ছন্দে তোমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব গড়িয়া উঠুক, তোমার গতির মনোহারিত্ব আজ আমার গানের তালে তালে নৃত্য করিতে থাকুক!

না—না, তুমি ত এলে না—তুমি যে ফিরিয়া গেলে! আমার স্বপ্নের তৃপ্তি সুখকে কেন হরণ করিলে প্রভু, আমার মনের অন্ধকার আজ বাহিরের আলোক খুঁজিয়া পায় না সেখানেও যে ভীষণ দুর্যোগের সূচিভেদ্য অন্ধকার—

"হৃদয় মোর নয়ন জলে
ডুবায়ে দিলে তিমির তলে
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দু'টি হাত!"

আমাকে আজ কি শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলে তুমি? আমার ভাগ্যবিপর্য্যয়কে মানিয়া লইতে, জীবনের দুর্যোগকে বরণ করিতে? চেষ্টার সফল মূর্ত্তিকে বিদ্রূপ করিয়া অদৃষ্টকে হাস্তমুখে পরিহাস করিতে?—জীবনের আসন্ন সুযোগ উপেক্ষা করিতে ও অনাগত ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে? কি শিক্ষা দিতে তুমি আসিয়াছিলে গুরু?—তোমার আদেশ আমি পালন করিব কিন্তু নিজের বিফল কর্ম্ম চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সাধনার মধ্যে নিজের অক্ষমতার দৈন্য যে মনের উপর দারুণ কষাঘাত করিয়া লজ্জা দিতেছে, জানি আমি—There is life in despair কিন্তু নিজের যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের জন্য সহস্র বজ্রাঘাতকেও কুসুম-স্পর্শ বলিয়া সহিষ্ণুতার আনন্দ পাইতাম তাহা যে আমার হারাইয়া যায়?—করি কি? নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে তুলনায় সমালোচনা যে সহ্য করিতে পারিব না। কামনাকে তোমার অভ্রভেদী মন্দিরে উৎসর্গ করিতে পারি, বাসনাকে তোমারই অসীম ইচ্ছার মধ্যে জলাঞ্জলি দিতে পারি আকাঙ্ক্ষাকে তোমার কল্যাণ-মন্ত্রবলে দূরীভূত করিতে পারি—কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে আঘাত করিলে সহ্য করিতে পারি না।

আজ আমি জীবনের সহস্র দুর্যোগকে মাথায় করিয়া তোমারি প্রকাণ্ড রাজপথে তোমার রাজদণ্ড বহন করিয়া তোমার রক্তপতাকার নিম্নে অদম্য কর্ম্মশক্তি লইয়া উপস্থিত হইতে চাই—সাফল্যের সারথী তুমি, তুমি তোমার পাঞ্চজন্য বাজাও, ভেরীর ভৈরব নিনাদে জাগ্রত কর—তোমার রথের শতাশ্ব তাহাদের যুগপৎ হ্রেষাধ্বনিতে পথের কঙ্করময় সঙ্কীর্ণতাকে সরাইয়া দিক—তুমি তোমার অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দাও কোথায় কোন মহান্ অভ্রিশিখরে, তোমার অক্ষয় রক্ত-পতাকা বিজয়-মাল্য বিভূষিত হইয়া যুগে যুগে, বিশ্বমানবের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

আমি আজ ক্ষুব্ধ, দুর্ব্বল অভিশাপগ্রস্ত অক্ষম প্রেমকামী—তুমি আমাকে তোমার সম্মোহন-শক্তিতে জাগ্রত কর—কর্ম্ম-শক্তির অনন্ত প্রেরণা দিয়া তোমার দিকে আহ্বান করিয়া নাও।

বিফলতার মধ্যে আমি মরিতে চাহি না বাঁচিতে চাই—নৈরাশ্যের মধ্যে ব্যক্তিত্ব হারাইতে চাই না—ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে গঠন করিতে চাই! আমি দেখিতে চাই বিপর্য্যয়ের সংঘাতে, দুর্যোগের অভিঘাতে আমি সহ্যাদ্রির সহিষ্ণুতা লাভ করিয়াছি—আমি কর্ম্ম চাই, কামনা চাইনা, কল্যাণ চাই, স্বার্থ চাহি না, প্রেম চাই প্রতিদান চাই না, তুমি এস বন্ধু, এস গুরু, এস দয়িত, এস আদর্শদেবতা আমায় আশা দাও, আনন্দ দাও, উৎসাহ দাও, উদ্দীপনা দাও—তোমার অক্ষুণ্ণ প্রেরণায় অমৃতের পুত্র আমি, আমাকেও অমরত্ব দাও! —কৈ তুমি ফিরিয়া আসিলে?—এখনও কি পরীক্ষা করিতেছ? দেখিতেছ এই বুকে কত আঘাত সহ্য হয়? না, না, আর ছলনা করিওনা—আমি যে তোমার! মোহ? —সেত ক্ষণিকের? নৈরাশ্য?—সেত মুহূর্ত্তের? কর্ম্ম শৈথিল্য?—সেত উদ্বোধনের সঙ্গে সংযোগ বিধানের নিমিত্ত! নিষ্কর্ম্ম-আলস্য?—সেওত অবসাদের পর জাগরণকে সতেজ করিবার জন্য! তবে তুমি এস হে আমার জাগরণের বন্ধু তোমার সঙ্গে আমাকেও নাও! না আস তবু আমি তোমারই প্রতীক্ষায় থাকিব কোনও দিন তুমি নিশ্চয়ই আসিবে—সখারূপে, বন্ধুরূপে, প্রেমময় দাতা কল্পতরু হয়ে, আমারি জন্য তুমি অভিসারে আসিবে—তেমনি একটা দুর্যোগের প্রতীক্ষায়, দুর্দিনের আশায় আমি পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব! সেই দিন হইবে—

"ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!"

তুমি এতক্ষণ দূরে, বহুদূরে, এতক্ষণ কত দূর দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছ, তবু আমি নিরন্তর তোমারই ধ্যানে তোমাকেই দেখিব, আর একটা প্রতীক্ষার আকুল-বিহ্বলতায় চিরদিন ভাবিব—

আমারি অভিসারে
"সুদূর কোন্ নদীর পারে
গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার"।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"সাধারণতঃ তিন প্রকারে আমরা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। প্রথমতঃ যুক্তি, বিচার ও সৎচিন্তা সহায়ে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা মহত্তম। দ্বিতীয়তঃ অনুকরণ দ্বারা শিক্ষা লাভ করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। তৃতীয়তঃ বহুদর্শিতা অর্থাৎ ঠেকিয়া যে শিক্ষা লাভ হয় তাহা তিক্ততম ও অপ্রীতিকর।" —কুগবার্থ।

"যে শিক্ষা আমাদিগকে প্রকৃত পক্ষে উন্নত করিয়া থাকে, তাহা বস্তু বা তদ্বিশ্লেষণ মূলক গবেষণা নহে পরন্তু চরিত্রবান মানুষ এবং তাঁহাদিগের উচ্চতম চিন্তা সমূহই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন করে। আমি শিক্ষালাভ করিবার জন্য মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী পুনঃ পুনঃ পাঠ করা অপেক্ষা, এক ঘণ্টা কাল কোন পবিত্র হৃদয় ব্যক্তির সঙ্গলাভ করা অধিক আকাঙ্ক্ষনীয় বলিয়া মনে করি।"

—জে, মার্টিন।

"মাথায় কতকগুলি ভাব ঢুকাইয়া সারাজীবন হজম হইল না—অসম্বদ্ধ ভাবে মাথায় ঘুরিতে লাগিল—ইহাকে শিক্ষা বলে না। আমাদিগকে বিভিন্ন ভাবসমূহকে এমন ভাবে আপনার করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে আমাদের জীবন গঠিত হয়, যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, চরিত্র গঠিত হয়। যদি তোমরা পাঁচটী হজম ভাব করিয়া জীবন ও চরিত্র ঐ ভাবে গঠিত করিতে পার, তবে যে ব্যক্তি একখানা সারা লাইব্রেরী মুখস্থ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষা তোমার অধিক শিক্ষালাভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।" —বিবেকানন্দ।

নিঃস্বার্থ প্রেম

[সংসার চিত্র]

স্থান—জনৈক ভদ্রলোকের বাসভবন।

কাল—শীতের মাঝামাঝি—ওলাউঠার প্রবল প্রকোপ।

সময়—গভীরা অমানিশা।

১ম দৃশ্য।

বহির্ব্বাটীর শয়ন কক্ষ।

গৃহ-কর্ত্তার উপযুক্ত পুত্র রমেশ বাবু বৈষয়িক কার্য্যের তত্ত্বাবধানে—দলিল পত্র ইত্যাদি দর্শনে অধিক রাত্রি হওয়ায় বহির্ব্বাটীতেই শয়ন করিয়াছেন। পার্শ্বের শয্যায় ভৃত্য নিদ্রামগ্ন। নিশীথে তিনি ভৃত্যকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া বলিলেন,—আমি পায়খানায় যাইব রে!—শীঘ্র আলো জ্বাল্! লেপ, কাঁথা ছাড়িয়া উঠিতে ভৃত্য বড় বিরক্তি অনুভব করিল। মনে মনে বলিল,—যা হোক্ মুনিব পেয়েছি গো! নিশুতি রেতেও মুনিবের জ্বালায় ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই! ঘরে দিয়াশালাই ছিল না। সুতরাং দিয়াশালাই আনিতে ভৃত্য অন্দরাভিমুখে চলিল।

২য় দৃশ্য।

অন্দরের একটি শয়ন কক্ষ।

এ কক্ষে রমেশ বাবুর আত্মীয়বর্গ শয়ন করিয়াছেন। ভৃত্য আসিয়া তাহাদের ঘরের দরজায় সজোরে ঘা দিল এবং প্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি দিয়াশালাই যাচ্ঞা করিল। গৃহে আবদ্ধ নৈশ অন্ধকারটুকুকে আত্মীয় বর্গের বদনের অভিমান-কালিমা মুহূর্ত্তে আরও জমাট—আরও গাঢ় করিয়া তুলিল। তাঁহারা গুঞ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—এই জন্যই আপনার লোকের দ্বারস্থ জীবনেও হ'তে নাই। এ বাবা 'বে' উপলক্ষে নিয়ে এসে দু'পাঁচ দিন খেতে ধুতে দেওয়া নয়—তা'র কড়ায় গণ্ডায় সুদ শুদ্ধ আদায় করা। কোথায় রাত্রে ঘুম না হ'লে, ঘুম হ'চ্ছে না কেন তল্লাস নেওয়া উচিত, তা' নয়, এ আবার উল্‌টো বিপত্তি!—শীতের রেতে ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দেওয়া! এমন মস্‌গুল্ ঘুমের নেশায় ভরপুর হ'লে বাড়ীতে সহধর্ম্মিণীরা পর্য্যন্ত এ নেশা ভাঙ্গাতে সাহস করে না!

৩য় দৃশ্য।

রমেশ বাবুর পুত্র-কন্যার শয়ন গৃহ।

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখিয়া ভৃত্য সেথা হইতে হেথায় আসিয়া উদয় হইল। সে এখানেও বিশ্বস্ত ভৃত্যের পরিচয় দিল তাহার দুইটি কার্য্য সম্পাদনে—(১) প্রভুর অবস্থা বর্ণনে এবং (২) দিয়াশালাই যাচ্ঞায়। রমেশ বাবুর পুত্র হারুর পাশের 'তাকিয়া'টী তাহার শ্রীচরণদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়া কথঞ্চিৎ দূরে পলায়ন করিয়াছিল। সহসা ভৃত্যের এই মুখ নিঃসৃত বিজয়-ডঙ্কারূপ নির্ঘোষ-বাণী শ্রবণে জাগরিত হইয়া সে অচিরাৎ তাকিয়াকে চরণ বিমর্দ্দিত করিল। ভাল'য় ভাল'য় বশ্যতা স্বীকার করিলে পরে তাকিয়াটি তাহার অঙ্কশায়িনী হইল। তাকিয়া-বিজয়ে সাহায্যকারী ভৃত্যকে হারু যৎপরোনাস্তি অন্তরে অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আবার নিদ্রাদেবীর প্রিয় শিষ্য হইলেন। কন্যা শান্তি শ্যামের মোহন বেণুর সুর গলায় সাধিয়া তাহার মাতার গৃহে দিয়াশালাই খোঁজ করিবার সুব্যবস্থা ভৃত্যকে দিয়া আকণ্ঠ লেপ খানি আরও একটু টানিয়া কর্ণ ও মস্তকাবৃত করিয়া বেশ আরাম লাভ করিল।

৪র্থ দৃশ্য।

রমেশ বাবুর অন্দরস্থ শয়ন কক্ষ।

কিন্তু হায়! আজ রমেশ বাবু এ কক্ষে শয়ন করেন নাই! কেবল সুন্দরী অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁহার—

"বলি গো স্বজনি যেওনা যেওনা,
তা'র কাছে আর যেওনা যেওনা,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক্‌,
মোর কথা তা'রে বোল না বোল না।
আমারে যখন ভাল সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি স্বজনি,
মোর তরে তা'রে দিওনা বেদনা।"

গানটি একবার, দুইবার, শতবার গাহিয়া গাহিয়া কক্ষে একাকিনী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। ভৃত্য আসিয়া দ্বারে করাঘাত করতঃ প্রভুর অবস্থা আনুপূর্ব্বিক প্রভুপত্নীর সমীপে উপযুক্ত সম্মান ও দীনতার সহিত নিবেদন করিল। ভৃত্যের কথা শুনিয়াই রমেশ বাবুর স্ত্রী এক নিঃশ্বাসে নাক সিট্‌কাইয়া বলিয়া গেলেন,—মিন্সের মুখে আগুন! সুখ ব'লতে একরত্তি এ সংসারে নেই! উপরন্তু স্বামীর সেবা কর্‌তে কর্‌তেই জীবনটা গেল! আজ জ্বর রে! কাল পেটের অসুখ রে! পরশু জ্বর রে! তরশু হেন রে! লেগেই আছে নিত্তি নতুন একটা। ভালমন্দ গহনা, কাপড় চেলী জীবনে ত' পর্‌লামই না—রাতের একটু স্বচ্ছন্দ ঘুম, তা'ও স্বামীর চোখে বিষ-বাতি জ্বালা! সুন্দরীর এক নিঃশ্বাসের দম অনেক খানি। 'চু'-খেলার বালক বৃন্দের নিকট তাঁহার দম প্রশংসার্হ!

পঞ্চম দৃশ্য

উপরোক্ত কক্ষ সংলগ্ন অঙ্গন।

ভৃত্য এ'বার ক্রোধভরে অঙ্গন দিয়া চলিয়াছে। রাগান্বিত ভৃত্য ঠিক বাড়ীর 'পুসী' বিড়ালের ক্রোধাধূত স্ফীত লেজের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। সমালোচকবর্গ এইবার আমার মত মেষশাবককে খুব্‌ এক চোট লইবেন বুঝিতেছি। কারণ 'পুসী'র রঙ্‌ শাদা—তাহার লেজও শাদা অর্থাৎ গৌরবর্ণ। আর এ হতভাগ্য ভৃত্য বেচারী ঘোর কৃষ্ণকায়। সুতরাং দু'টি বিরোধী বস্তুর ভিতর সামঞ্জস্য প্রদর্শন সাহিত্য-আইনানুযায়ী দণ্ডনীয়। শুনিয়াছি ভৃত্য বেচারী তাহার দেশের বাড়ীতে বিমাতার সহিত ঝগড়া করিতে করিতে বলিয়াছিল,—তোমার গুণের ত্রিসীমানাতেও যেন আমি পা' না দিই। তাহার বিমাতা খুব সুন্দরী—গৌরাঙ্গী। তাই নাকি ভৃত্য বেচারী বিমাতার গুণের অধিকারী হইবে না বলিয়া ইচ্ছা করিয়াই কৃষ্ণাঙ্গ সাজিয়াছে। যাক্‌, ভৃত্য যে রাগিয়াছে ইহার কারণ প্রভুকে সে যে আলো যোগাইতে ও পাইখানায় লইয়া যাইতে পারিতেছে না তাহা নহে। ভৃত্য বলিতেছিল,—ওই বুঝি মোরগ ডাকে রে! ওই সকাল হ'য়ে আসে বুঝি! আমার ঘুম হ'ল না! শেষ রাত্তিরে লোকে এমনি ভাবেও সারা বাড়ী ঘুরে অযথা না ঘুমিয়ে কাটায়—ছিঃ! এই অসুখ বিসুখের সময়ে এমনি ভাবে রাত্রি জাগরণ! এ রেতের কথা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে—এ রাত্রি আমার প্রাতস্মরণীয়! অবশেষে বিবেচ্য এই যে সারা নিশা জাগরণই ভৃত্যের ক্রোধের অন্যতম প্রধান কারণ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রমেশ বাবুর জনক জননীর শয়ন কক্ষ।

কর্ত্তা মহাশয় ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী—রমেশ বাবুর পিতা ও মাতা উভয়েই নিদ্রিত। ভৃত্য একবার ভাবিল,—যাই দেখি, একবার রমেশ বাবুর ভা'য়ের কাছে। যদি চ তিনি বাবুর সহিত ঝগড়া বিবাদ করিয়া অল্পদিন হইতে পার্শ্বের বাড়ীতে পৃথক হইয়া বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি আমাকে খুব ভাল বাসেন। তাঁ'র নিকট যাইয়া দিয়াশালাই চাহিলে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। অতঃপর ভৃত্য গালে হাত দিয়া ক্ষণিক ভাবিল,—তবে কথা হ'চ্ছে, রমেশ বাবুর নাম করিলে দিয়াশালাই পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং সে আর কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্গন দ্রুত অতিক্রম করিয়া রমেশ বাবুর জনক-জননীর শয়ন কক্ষের জানালার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং জানালায় করাঘাত করিয়া বিরক্তির সহিত বলিল,—কর্ত্তা মশাই, কর্ত্রী ঠাকুরুণ্‌! আলো জ্বালিতে একটি দিয়াশালাই এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট পাইতেছি না—বাবুর বড়ই—। ভৃত্যের কথা সমাপ্তির পূর্ব্বেই রমেশ বাবুর পিতা বৃদ্ধ দেবেশ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কথার কোন উত্তর না দিয়াই যুবকের বল ধারণ করিয়া

নিমেষে খাট হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝম্প দিয়া ঘরের মেঝেয় নামিয়া কম্পিত হস্তে আলোটি জ্বালিয়া ফেলিলেন। রমেশ বাবুর বৃদ্ধা জননী শুষ্ক জড়িত কণ্ঠে ভয়ে জড়সড় হইয়া হতাশ ভাবে বলিলেন,—কি হবে গো! মা কালি মা! তুমিই আমাদের একমাত্র বল ও ভরসা! মা রক্ষা-কালি! তুই রক্ষা কর্ মা! দেবেশ বাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ছোট বাক্সটি লইয়া ও রমেশ বাবুর মাতা আলোটি লইয়া ব্যস্ত হইয়া চলিয়াছেন। তাড়াতাড়িতে সম্মুখের দালান ঘরের দরজায় দেবেশ বাবুর মস্তক সজোরে ধাক্কা লাগিল। দালান ঘরে দেবেশ বাবুর মাতা অর্থাৎ রমেশ বাবুর নবতিবর্ষ বয়স্কা ঠাকুরমাতা ঘুমাইতেছিলেন। দরজার শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া তিনি তাঁহাদের দেখিয়া বলিলেন,—বলি, ও-ও-ও-বৌ-মা! বুঝি কোন ক-থা-বার্ত্তায়-দে-বেশের সঙ্গে ঝ-গ-ড়া হয়েছে। তা-ঘরে যাও এ-খুন। দে-বেশ আমার ভা-ল ছেলে। ওকে অমন ক-রে ডাক্‌কে আস্‌তে হ-'বেনা। ও-অমনিই ঘরে যাবে। বলি, তো-মাদেরই বা ব-'ল্‌ব কি! ওই আ-র বছর ওঁর-তোমার শ্ব-শুর ঠাকুরের মৃ-ত্যুর দু,দিন আ-গে পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হ'ত। তা-অমন হ'-য়েই থাকে—তা-অমন হ'-য়েই থাকে। রমেশ বাবুর পিতা মাতা তাঁহাকে ব্যাপার কিছুই বলিলেন না। তাহার কারণ তিনি ত' বৃদ্ধ দেবেশ বাবুরই মাতা—মরণের নৌকায় পা' দিয়াছেন! তিনি এখন কাণে ব্রেক্ শুনিতে না পাইলেই বা দোষ কি! অবশ্য তিনি আমার কথা শুনিতে পাইবেন না বলিয়াই আমি কারণ দর্শাইতে সাহসী হইলাম নতুবা এরূপ কারণ প্রদর্শন করিবার আমার ইখ্‌তিয়ার কি! তিনি আমার থান না পয়েন যে আমি তাঁহাকে একদম মরণের মুখে নিয়ে যেতে সাহসী হ'য়েছি—না, তাঁ'র বয়সের লোক তিনিই একা! আমাদের ন্যায় তাঁদেরও বাঁচিবার সাধ থাকিতে পারে! শুনিয়াছি নাকি তিনি যৌবনেও কানে স্বভাবতঃ একটু কম শুনিতেন। যাক্, তিনি এখন নাতি, নাতিনী, ছেলে, ছেলের বউ লইয়া সংসার পাতাইয়া বসিয়া আছেন! তাঁহার যৌবনের কথা টানিয়া তাঁহার খুঁত কাটিতে যাইলে আমাদের অতিমাত্র মূর্খতা, ধৃষ্টতা, বাচালতা এবং প্রগল্‌ভতার প্রকাশ পাইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই!

সপ্তম দৃশ্য।

বহির্ব্বাটী যাইবার অঙ্গন।

অতি ত্রস্তভাবে অথচ অতি দ্রুতপদ বিক্ষেপে দেবেশ বাবু ঔষধের বাক্স লইয়া এবং রমেশ বাবুর মাতা আলোটি লইয়া বহির্ব্বাটী অভিমুখে চলিয়াছেন। রমেশ বাবুর পিতা ব্যাকুল ভাবে ভাবিতেছেন,—জগদ্-রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ্বর না করুন, রমেশের যদি কিছু বাড়াবাড়ি দেখি, আমি এদেশের সমস্ত বিশিষ্ট ডাক্তার কবিরাজকে ডাকিব। যাঁহারা কলেরা রোগী সারাইতে অদ্বিতীয় তাঁহাদের আমি আনাইব। আমার আজন্ম সঞ্চিত অর্থ আমি সমস্ত রমেশকে ভাল করিতে খরচ করিব। তৎপরে তিনি আকুল আগ্রহে ভগবানের উদ্দেশে শির নত করিয়া বলিলেন,—কিন্তু ভগবন্! তুমি দেখো, সম্পদের বিপদে সহায় হে আমার ভগবন্! তুমি মুখ তুলে' তাকাইও। তুমি আমার রমেশকে রক্ষা করিও! এদিকে আবার রমেশ বাবুর জননী অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্র অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া মনে মনে বলিতেছেন,—হে ঈশ্বর! রমেশের আমার কিছু ভালমন্দ হইলে আমি আত্মহত্যা করিব! দোহাই প্রভু! আত্মঘাতী হতভাগিনীর কিছু দোষ নিও না! তার পর তিনি তাঁহার সমস্ত চিন্তা শক্তিটুকু মা কালীর ধ্যানে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন,—হে ভূধাত্রি! রক্ষাকালি জননি! হে মঙ্গলময়ি! আমার রমেশকে তুমি রক্ষা কর! ওগো, আমার ইষ্টদেবি!—ওগো, আমাদের আশা ও ভরসা! তুমি না রক্ষা করলে রক্ষা করতে পৃথিবীতে আর কা'র হাত আছে! গত মঙ্গলবারে ও' পাড়ায় ওলাউঠা নিবারণার্থে তোমার যে পূজা হ'য়েছে, সেদিন আমি বাড়ীর সকলের কল্যাণে তোমার পূজা দিয়া আসিয়াছি! মা রক্ষাকালি মা! তুমি আমার রমেশকে রক্ষা কর! আগামী মঙ্গলবারে আমার রমেশের কল্যাণে ধূপ, ধুনা পোড়াইয়া তোমার ষোল আনার পূজা দিব।

নিঃস্বার্থ প্রেম! অসীম, অনন্ত প্রগাঢ় ভালবাসা! যিনি এই স্বার্থপূর্ণ জগতে জনক জননীর বক্ষে নিঃস্বার্থ প্রেমের

প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করযোড়ে প্রণাম করিতেছি এবং সেই সঙ্গে পরমারাধ্য পিতৃদেবকে প্রণাম করিতেছি—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ।

আর চিরারাধ্যা প্রত্যক্ষা দেবী জননীকে প্রণাম করিতেছি—

—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ।

(যবনিকা পতন)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝুলনোৎসব

আজি স্বর্গের প্রেম-নির্ঝর গলে ঝর্ঝর ধারে বৃষ্টির,
আজি বংশীর গানে চঞ্চল প্রাণ টলমল্ করে সৃষ্টির ।
কোন্ শিল্পীর নব রঙ্গীন্ তুলি দশ্‌দিক্ করে রঞ্জন,
আজি লোক্ লোক্'পরে প্রেম শ্লোক্ ঝরে মৃত্যুর ভয়ভঞ্জন ।
ওরে মন্দ্রিত মেঘ-মন্দির,
করে ছন্দিত বন্ মন্-তীর,
আজি বল্লভ-করপল্লবকোল হিন্দোল্ হৃদ্-বন্দীর ।
ব্রজ বন্ধুর পায় আয় দিবি অভিনন্দন,
ওরে আয় যাবি কে কে কুঞ্জের মাঝে মন্‌চোরে দিতে বন্ধন ।

আজি বিশ্বের তরুপুঞ্জের কোলে ফুল্‌দল্ করে দুল্ দুল্,
আজি সুন্দর শিব সত্যের আঁখি মর্ত্ত্যের পরে ঢুল্ ঢুল্ ।
চির অশ্রুর ঝারি অর্ঘ্যের নীরে ঢাল্ তোরা ওরে স্নান্‌ধার,
দেরে আত্মার রাঙা বৃন্তের ফোটা ভক্তির পুতঃ মন্দার ।
কর মন্‌প্রাণ তনু অর্পণ,
এযে তৃষ্ণার পরিতর্পণ,
করে ঝল্‌মল শ্যামমূর্ত্তির তীরে চিত্তের নবদর্পণ ।
আজি হর্ষের মহাসিন্ধুর যেরে কূল্ নাই,
হৃদ্ কুঞ্জের প্রাণকান্তের তনু দোল্ দিই মন-ঝুল্‌নায় ।

ওরে সব ব্রাণ আজি ক্রন্দন করে বক্ষের ফুল্ সজ্জায়,
তোরা আয় আয় শত উন্মুখ্ ছুটি' বাঁধ ভাঙ্ লোক লজ্জায় ।

সব সম্ভ্রম্ মান্ ভোগ্ সুখ্ প্রেম্-বহ্নিতে কর ধূপ্ দান,
সারা সংসার ভরা কল্লোল-শিরে তোল্ তোল তাঁরি রূপ্ গান।
আজি ত্রিলোকের ভাব-সিন্ধুর,
আজি নন্দনদী বারি বিন্দুর,
তার বক্ষের মহাউৎসবে রস উচ্ছ্বসি ওঠে ইন্দুর।
আজি দুঃখের চির অমৃত মাগে কোন্‌জন ?
হবে কান্তের চির হিন্দোল্ তলে বিশ্বের প্রাণ রঞ্জন।

খুলি' পদ্মের অবগুণ্ঠন ফিরে ভৃঙ্গের লাখ্ চুম্বন,
নব যৌবন্ রস সঙ্গীতসুরে উদ্বেল্ ফলফুল্ বন।
মেঘ মন্দিরে গুরুগম্ভীর বাজে নিখিলোৎসব মঙ্গল,
ওরে শান্তির মহাহিল্লোলে নাচে পন্থের চির সম্বল।
ওরে রব বাজে ওই বংশীর,
ওই ডাক আসে শুভাশংসীর,
আজি অমৃত-বাগে অমৃতক্ষণ বয়ে যায় প্রেম্-অংশীর।
ওরে বৃন্দাবনের খোলা আজ কুঞ্জের দ্বার,
আজ নিয়ে আয় সখী যমুনার তীরে জীবনের পুষ্পের ভার।

ওরে ঘরে ঘরে আয় খুলে দিই মোরা নন্দের নন্দনপুর,
তোল্ নিখিলের হৃদ্‌যন্ত্রের সাথে অভিষেক-বন্দন-সুর।
আজি চিন্ময় চিদানন্দের রসে তন্ময় সৃষ্টির প্রাণ,
ওরে কৃষ্ণের ঝুল্‌নার দোল্ তলে যুগ্‌যুগ্ বিশ্বের ত্রাণ।
আজ বয় তাঁর প্রেম-নির্ঝর,
সারা বিশ্বের বুকে ঝর্ ঝর্,
ওরে বঙ্কিম চারু বিহ্বল্ দিঠি করে দেছে প্রাণ জর্‌জর্।
প্রাণ কান্তের পায় আয় দিবি কেরে মান দান,
ওরে চিত্তের ব্রজকুঞ্জের বঁধু গায় চিদানন্দের গান।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

নারায়ণ

(১)

প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ পাইয়াও নারায়ণ সুখী হইল না। ম্লানমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মাতার নিকট বলিল, "মা আমি পাশ করিয়াছি।" অন্তরের চিন্তাক্লিষ্ট অপ্রসন্নতা ম্লানহাস্যে ঢাকিতে গিয়া নারায়ণ অজ্ঞাতসারে তাহা অধিকতর প্রকট করিয়া ফেলিল। সে বিষাদ করুণ মুখখানির প্রতি চাহিয়া জননী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নারায়ণ মুখ ফিরাইয়া মাতার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

আজ ছয় বৎসরের কথা—কাত্যায়নী দেবী একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র [illegible]ারায়ণকে বক্ষে করিয়া বিধবা হইয়াছিলেন। সেইদিন হইতে কতকষ্টে যে তাহাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন তাহা একমাত্র ভগবানই জানেন আর অনুভব করিতে পারিবেন বঙ্গের দরিদ্রা বিধবা জননীগণ। পুত্র-কন্যা-পতি-শোকে ভগ্নহৃদয়া মাতা আশায় বুক বাঁধিয়া নারায়ণকে ইস্কুলে দিয়াছিলেন। অবশেষে অবশিষ্ট সামান্য স্বর্ণালঙ্কার খানি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া পুত্রের পরীক্ষার ফিসের টাকা ও কেন্দ্রে যাতায়াতের ব্যয় দিয়াছিলেন। নারায়ণ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী ফিরিবার পর কতরাত্রি আশা ও উদ্বেগের আতিশয্যে জননীর রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই। আজতো নারায়ণের পাশ করিবার সংবাদ আসিয়াছে; তবু তাঁহার চক্ষে জল আসে কেন? কৈ নারায়ণ তো সুখী হয় নাই।

বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া নারায়ণ আমগাছ তলায় বসিয়া পড়িল। না, তাহার কোন উপায় নাই! কলেজে পড়িতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কপর্দ্দকহীন দরিদ্র সে—কে তাহাকে সাহায্য করিবে? কাহার দ্বারে গিয়া ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইবে? সহজ প্রাপ্য মৌখিক সহানুভূতিতে হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তো প্রকৃত অভাব মেটে না! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—অবশেষে মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া সে গ্রামের জমীদার কৃষ্ণবল্লভ চৌধুরীর শরণাপন্ন হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিল।

প্রভাতে যখন কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতা হইতে সদ্য আনিত দৃশ্য পটাদি নবনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চে সাজাইবার জন্য ব্যস্ত, তখন নারায়ণ আসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি একবার বক্র কটাক্ষে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র, ব্যস্ততা নিবন্ধন কুশল প্রশ্ন করিবারও অবসর পাইলেন না। নারায়ণ ও সাহস করিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—

মোসাহেব শ্রেণীর কয়েকজন "বাবু"র অনুগ্রহভাজন ভদ্রসন্তান নানাপ্রকার সমালোচনা করিয়া কৃষ্ণবল্লভ বাবুর সুরুচির ও বদান্যতার প্রশংসা করিতেছেন, তিনিও চাটুবাক্যে উৎফুল্ল হইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য তাম্বুল রাগরঞ্জিত দীর্ঘদন্ত বাহির করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতেছেন। আবার কখনো বা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঐ সমস্ত মূল্যবান বস্তু কত সন্তর্পণে ও যত্নের সহিত ব্যবহার করিতে হয় তৎসম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দিতেছেন। এই ব্যাপার মিটিতে প্রায় বেলা এগারটা হইল। কৃষ্ণবল্লভবাবু উঠিবেন এমন সময় নারায়ণের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ওহো তুমি সেই থেকে দাঁড়িয়ে আছ দেখ্‌ছি; আমার কাছে তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি?" নারায়ণ গলা ঝাড়িয়া, ঢোক্ গিলিয়া অতিকষ্টে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমার একটী ক্ষুদ্র নিবেদন আছে।"

"আচ্ছা তুমি এখনকার মত যাও বিকেল বেলায় এসো—তখন সব কথা ধীরে সুস্থে শুনব'খন।—" বলিতে বলিতে বাবু অগ্রসর হইলেন, মোসাহেবগণ পশ্চাবর্ত্তী হইল। দুইজন যুবক অগ্রসর হইয়া বলিল, "চল নারায়ণ—বাড়ী যাবে না?"

অপ্রতিভ নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, "আজ্ঞে যাব বৈ কি, চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে একজন যুবক বলিলেন, "নারায়ণ, তুমি তো পাশ কর্‌লে এখন কোন কলেজে পড়বে মনে করেছ।"

সে বিনীত ভাবে উত্তর দিল, "এখনও কিছু ঠিক করে উঠ্‌তে পারি নাই।"

"তোমাদের মাষ্টার জ্ঞানবাবু কি বলেন?"

"তাঁর সঙ্গে এখনও দেখা করিনি; তাঁর মতামত জানিনে।"

এমন সময় দ্বিতীয় যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নারায়ণ, তোমরা কলিকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেরবার মুখে দু'এক রাত থিয়েটার দেখেছ নিশ্চয়; কি কি প্লে দেখ্‌লে?" নারায়ণ ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিল যে সে থিয়েটার দেখে নাই। যুবকদ্বয় বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—কলিকাতায় গিয়া যে অন্ততঃ একদিনও থিয়েটার দেখে না—সে বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কেন? নারায়ণের টাকা পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতা যাওয়াটাই যে একেবারে বিফল হইয়াছে ইহা নানাপ্রকার যুক্তিপ্রয়োগে প্রমাণ করিয়া তাঁহারা কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীগণের অভিনয় চাতুর্য্য, রূপ গুণ, ভঙ্গিমা ইত্যাদির সূক্ষ্ম সমালোচনায় একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। নারায়ণ অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্যপথ ধরিল।

(২)

অপরাহ্নে নারায়ণ যখন সঙ্কুচিত ভাবে কৃষ্ণবল্লভের বৈঠকখানার একপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তিনি তাহাকে এত সস্নেহ আগ্রহে অভ্যর্থনা করিলেন যে, সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তখন "নাট্যসমিতির" রিহরর্শেল হইতেছিল। কৃষ্ণবল্লভের ইঙ্গিতে সকলেই স্তব্ধ হইয়া নারায়ণের প্রতি চাহিল। কৃষ্ণবল্লভ সকলকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে নারায়ণের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন; সে লজ্জায় আরক্তিম হইয়া বিস্তৃত ফরাসের এক প্রান্তে ত ভাবে বসিয়া রহিল। কৃষ্ণবল্লভ সহাস্য বদনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাপু, তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না, আমি সব কথাই শুনেছি। তোমার মত সচ্চরিত্র, সুশীল বালককে সাহায্য কর্‌তে ইচ্ছা কার না হয়? কিন্তু তুমি কলিকাতায় গিয়া কলেজে পড়লে তোমার বুড়োমাকে কে দেখ্‌বে, আর বাড়ীর ঠাকুর সেবাই বা কি করে চল্‌বে, তার কোন বন্দোবস্ত করেছ কি?"

এ গুরুতর অন্তরায় দুটী নারায়ণ ভাবিবার অবসর পায় নাই। যে ক্ষীণ আশার আলোটুকু মিটু মিটু করিয়া জ্বলিতেছিল—একটী সামান্য ফুৎকারে তাহা নিভিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অন্ধকার হইয়া গেল। কৃষ্ণবল্লভ নারায়ণের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তোমার মত একজন ভাল ছেলের যদি লেখাপড়া না হয় তা হলে সেটা বড়ই দুঃখের কারণ হবে। আমি যদি তোমাকে না দেখি তা'হলে গ্রামের পক্ষেও বড়ই অগৌরবের কথা! হাজার হোক্, তুমি আমাদের ঘরের ছেলের মত; অবাধ্য হবে না তাও জানি। সেই জন্যই আমরা ভেবে চিন্তে স্থির কর্‌লাম তোমার পক্ষে প্রাইভেট্ পড়ে পরীক্ষা দেওয়াই সুবিধার হবে। শুন্‌লেম গবরমেণ্টের নূতন আইন হয়েছে—ইস্কুলমাষ্টারী না কর্‌লে নাকি প্রাইভেট্ পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তার জন্য বিশেষ চিন্তা নেই, তুমি কাল থেকেই স্কুলে যেও; আমি হেড্‌মাষ্টার মশাইকে বলে ঠিক করে রেখেছি। অন্য কেউ হলে অবিশ্যি পনর টাকার বেশী মাইনে দিতাম না। তা তুমি ঘরের ছেলে তোমার কথা আলাদা! যে দিন কাল পড়েছে তাতে ঐ কয় বিঘা জমির ফসলে কি আর দুটো পেট চলে? এই ধর দু'এক বছর পরে যদি ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে বৌমা আসেন—কি বল রমেশ?"

"আজ্ঞে তা বৈকি, তা বৈকি"—বলিয়া সে নারায়ণের প্রতি কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিল।

"কি বল? এতে আর তোমার বোধহয় আপত্তি হবে না?—কৃষ্ণবল্লভ প্রশ্ন করিতেই নারায়ণ অতিকষ্টে কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস দমন করিয়া কহিল, "আপনার আমার উপর যথেষ্ট দয়া!" "তোমার মাষ্টার মশাইকে একবার জিজ্ঞাসা করবে

না ?”—রমেশের মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া হরেন্দ্র বলিল, “ওরে বাবা! তাঁর হুকুম ছাড়া বোধ হয় এরা স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখে না ?”

কৃষ্ণবল্লভ কৃত্রিম রুক্ষস্বরে বলিলেন “ছিঃ হরেন্! জ্ঞান বাবুকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করো না—তিনি একটা মানুষের মত মানুষ! কি নারায়ণ! তোমার নাইট্ স্কুল কেমন চল্‌ছে ?”

“আজ্ঞে একরকম ভালই চল্‌ছে—চাষাদের উৎসাহ দেখে মনে হয় শিক্ষার প্রয়োজনটা তারা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে!”

“তবে আর কি ? তোমাদের জ্ঞানবাবু করছেন কামারের কারখানা; তুমিও একটা ছুতরের ব্যবসা খুলে দাও! ধর্ম্ম ও দোকানদারী দুইই চুটিয়ে চল্‌বে! তোমাদের মাষ্টার মশাই—”হরেন্দ্র আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বাধা দিয়া রমেশ বলিল “নিজে তো গোল্লায় গেছিস্! তবু তো দেশের মধ্যে জ্ঞানবাবুর দেখা দেখি দুচার জন ছেলের সৎকর্ম্ম কর্‌বার প্রবৃত্তি আস্‌ছে ? নারায়ণ! তুমি ভাই কিছু মনে করো না—ওটা একটা আস্তো জানোয়ার!”

নারায়ণ মৃদুহাস্তে দৃষ্টি নত করিল! যেখানে মস্তিষ্ক ও হৃদয় দুয়েরই অভাব সেখানে কোন কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র ইহা বুঝিয়া সে কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। একথা সে কথার পর, পুনরায় থিয়েটারের কথা উঠিল দেখিয়া নারায়ণ কৃষ্ণবল্লভকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

“কি বলুন, তা'হলে “পিয়ারার” পার্টই নারায়ণকে দেওয়া যাক'—রমেশ ধমক দিয়া বলিল, “থাম্‌না ছোঁড়া, আগে দেখাই যাক্!”

হরেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিল, “এর আবার দেখাদেখি কি ? ওর গান, টান গুলো ভাল হয় না—ও বরং সাদিয়া হবে! পিয়ারার পার্ট নারায়ণকে দিয়েই ভাল ওত্‌রাবে।”

ধূমপান করিতে করিতে কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন “ও যে লাজুক ছেলে; ওসব ছ্যাবলামো গুলো কর্‌তে পারবে তো ?” অবজ্ঞাহাস্তে হরেন্দ্র বলিল, “দলে মিশ্‌লে দু'দিনেই যাদু ঠিক হয়ে যাবেন।”

“নাও, নাও—কাজ চলুক; ওসব রমেশ দেখ্‌বে এখন—” বলিয়া কৃষ্ণবল্লভ সোজা হইয়া বসিলেন।

২

“এই যে নারায়ণ ? এসো এসো ?”

“আমায় ডেকেছিলেন আপনি ?”

“একবার কি এদিকে আস্‌তেও নেই! কাল বিকেল বেলা তোমাদের ওদিকটায় একবার নিজেই যাব মনে করেছিলুম! যাক্ কেমন আছ ? মাষ্টারী কেমন লাগ্‌ছে ?”

লাজরক্তিম নারায়ণ মৃদুহাস্তে বলিল, “আজ্ঞে, কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে ?”

“সে কি কথা, তোমরাই তো কাজ কর্‌ছো হে! সেদিন গয়লাপাড়া থেকে বাজারে আসবার রাস্তাটা দেখে বড়ই খুসী হয়েছি। শুন্‌লাম তোমার চেলারা নাকি সেটা বেঁধে দিয়েছে!”

“প্রত্যেকবার বর্ষার সময় জল জমে রাস্তার ঐ জায়গাটায় এক হাঁটু কাদা হয়। বাজারে আসা যাওয়ার সময় লোক জনের দুর্গতির একশেষ হয়! তাই সকলে মিলে ওটা বাঁধিয়ে নেওয়া গেল।”

“বেশ করেছ—বেশ করেছ! এমনি করেই তো গ্রামের উন্নতি কর্‌তে হয়! তবে ভদ্রলোকের ছেলেদের না খাটিয়ে ঐ চাষা ভূষো দিয়েই ওসব কাজ করিয়ে নিও! বুঝ্‌লে না ? কথাটা কি, চাষার ছেলেরা ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে মিশে কাজ কর্ম্ম কর্‌লে আস্পর্দ্ধা পেয়ে মাথায় উঠ্‌বে—বুঝ্‌লে না ?”

নারায়ণ দৃষ্টিনত করিয়া মৃদুহাস্য করিল—উত্তর দিল না। কৃষ্ণবল্লভ ছোটলোকগুলা আস্পর্দ্ধা পাইলে যে স্কন্ধে উঠিয়া বসে, এইরূপ কতকগুলি ঘটনা সবিস্তারে বর্ণন করিতে লাগিলেন, এমন সময় রমেশ আসিবা মাত্র কৃষ্ণবল্লভ তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এই যে রমেশও এসেছো ? হ্যাঁ সেই কথাটা শোনো নারায়ণ! আজ কিন্তু তোমায় আমরা একটা অনুরোধ কোরব—যদি রাখো তা হলে বলি!”

নারায়ণ তাঁহার অযথা বিনয়ে লজ্জিত হইয়া সসম্ভ্রমে

বলিল "আজ্ঞে, আপনার নিকট আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আমায় ওরূপ ভাবে কথা বলে লজ্জা দেবেন না।"

অট্টহাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন "দেখ্‌লে রমেশ! নারায়ণ সে ছেলেই নয়! গুরুজন বলে কত শ্রদ্ধা—শেখো, শেখো!—হ্যাঁ বলছিলাম কি, তুমি নাকি বেশ বল্‌তে কইতে পার; তোমার গান তো শোনাই আছে! সে দিনও আমরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছিলাম, বেশ গায় নারায়ণ কিন্তু, কি বল রমেশ? তা' দেখ, তোমরা দশজন আমোদ আহ্লাদ করবে বলেই তো এ থিয়েটারের হাঙ্গামায় মাথা দিয়েছি! বুঝ্‌লে নারায়ণ, সকলের ইচ্ছে তুমিও এতে যোগদান কর। এতে আর তোমার—"

তাঁহার প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি নারায়ণের মুখের উপর পড়িবা মাত্র, সে বিনীত ভাবে বলিল, "আমি সংসারে একা, আমার সময় অতি কম! থিয়েটার করা আমার ভালবোধ হয় না; আমাকে আর ওর ভিতরে জড়াবেন না।"—কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনরায় বলিল, "আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না; আমি অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি যে আপনার এই সামান্য আদেশটা প্রতিপালন করতে পার্‌লাম না!"

কৃষ্ণবল্লভ রমেশের সহিত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করিয়া নারায়ণের প্রতি চাহিলেন—ঐ উজ্জ্বল তরুণ সুন্দর মুখখানির প্রতি চাহিয়া কোন রূঢ় কথা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সংযম ও পবিত্রতার নিকট, ক্ষমতা-গর্ব্বিত ঔদ্ধত্য উত্তেজিত হইতে লজ্জিত হইল। তিনি ম্লানহাস্যে বলিলেন, "না না, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে বলছিলাম কি একবার ভালকরে বিবেচনা করে দেখ; আমি খুব অন্যায় অনুরোধ করছি না।"

নারায়ণ যথাসম্ভব নম্রভাবে স্বীয় অপারগতা ও অসম্মতি জানাইয়া বিদায় লইল। এতদিন পরে সে বুঝিতে পারিল কেন কৃষ্ণবল্লভ সহসা তাহার প্রতি অতটা অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। একটা জটিল প্রহেলিকার সহজবোধ্য মীমাংসা অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল; সে বেশ বুঝিতে পারিল—এ ব্যাপারের এই খানেই শেষ নয়; আগত প্রায় বাধা বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক!

নারায়ণের এই ঔদ্ধত্যের কাহিনী থিয়েটারী যুবকবৃন্দের প্রসাদাৎ অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইতে অধিক বিলম্ব হইল না! কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কেহ বলিলেন, ছোঁড়াটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; কেহ বলিলেন, গ্রামের ছোটলোক গুলো "দাদাঠাকুর" "দাদাঠাকুর" করে ওর মাথাটা গরম করে দিয়েছে!

গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোক নামধেয় একপ্রকার নিষ্কর্ম্মা জীব আছেন, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চাই যাহাদের সময় কাটাইবার একমাত্র অবলম্বন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিকৃষ্টতম, তাঁহারা স্থানীয় বড়লোক বা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির প্রিয়পাত্র হইবার আশায় সত্য মিথ্যায় রচনা করিয়া তাঁহাদের নিকট নানাপ্রকার সংবাদ বহন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগের আর একটী বিশেষত্ব যে পরের ভাল দেখিতে পারেন না। এই রকম কয়েকজন ভদ্রলোক জটলা করিয়া ব্যাপারটীকে যথাশক্তি জটিল করিয়া তুলিলেন! কৃষ্ণবল্লভ শুনিতে পাইলেন যে নারায়ণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে উপহাস করিয়াছে, এবং স্বরূপগঞ্জে গিয়া জ্ঞান মাষ্টার ও আরও কয়েকটী প্রকাশ্যস্থলে তাঁহার নিন্দা করিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্যদিকে নারায়ণ তাহার ব্যথার ব্যথী হিতৈষীদিগের নিকট শুনিতে পাইল যে কৃষ্ণবল্লভ তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছেন—অতএব সাবধান। নারায়ণ ভাল মন্দ না বলিয়া ভগবান্ ভরসা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

প্রত্যাখ্যিত হইলে জেদ বাড়িয়া যায়, ইহা মানব প্রকৃতির মর্ম্মগত ধর্ম্ম! নারায়ণের ব্যবহারে কৃষ্ণবল্লভের আত্মাভিমানে যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছিল সত্য—মনে মনে তাহার প্রতি যথেষ্ট অসন্তুষ্টও হইয়াছিলেন; তথাপি নারায়ণ তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে অকাট্য প্রমাণ সহ তাহা বহুবার শুনিয়াও তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! কাজেই তাহাকে জব্দ করিবার চেষ্টা না করিয়া বশে আনিবারই সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণের কিছুই টলন না দেখিয়া তথাকথিত উদ্যোক্তাগণ ক্ষুন্নমনে শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

(৪)

কামিনী ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন যজমানবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী ব্রাহ্মণী কোন গোপনীয় কারণে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে! কর্ম্মফল খণ্ডাইবার নহে—অগত্যা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের স্মরণাপন্ন হইলেন। তিনি সময়োচিত সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শবটা নদীতে নিক্ষিপ করিবার ব্যবস্থা দিলেন—কারণ অপঘাতে মৃতদেহ নাকি অগ্নিসৎকার করা শাস্ত্র বিগর্হিত। যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আজীবন শাস্ত্র মানিয়া চলিতেছেন, এমন কি "সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ"—এই শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই পঞ্চষষ্টি বৎসর বয়েসে একটী ত্রয়োদশ বর্ষিয়া বালিকার পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন—আজ তাঁহার মন এ উৎকট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল! আমি কামিনী ভট্টাচার্য্য—শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ; দেশবিশ্রুত দশকর্ম্মান্বিত পুরোহিত—আটশত উনিষ ঘর আমার যজমান —আর আমার সহধর্ম্মিণীকে কিনা গলায় কলসী বাঁধিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে হইবে? দশজনে শুনিলে বলিবে কি? তারপর যে নদী—মড়া তো ভাসিয়া যাইবে না। পচিয়া ফুলিয়া উঠিবে। কচ্ছপ; শকুন, কাকে খাইবে—আর গ্রামের লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিবে—"বিয়ে প্যাগ্‌লা বুড়া"—বলিয়া টিট্‌কারী দিবে—অসহ্য! উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর দ্বারস্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার শত কাতর অনুনয়েও কেহ শাস্ত্র মর্য্যাদা ও স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। একজনকে রাজী করাইতে পারিলেও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলনা। অগত্যা সন্ধ্যার প্রাকালে তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন এমন সময়ে পথে নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ। নারায়ণ তাঁহার শুষ্ক বিষাদ মলিন মুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি ভগ্নকণ্ঠে সমস্ত কথা বলিয়া অবশেষে বলিলেন "কি করি বাপু? যেমন অদৃষ্ট করে এসেছিলাম তার ফলভোগ করতেই হবে।"

নারায়ণ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা জেঠামহাশয়! আমি যদি অগ্নি সৎকারের ব্যবস্থা করি; আপনার কোন আপত্তি আছে কি?"

"আপত্তি? হই হব একঘরে; আমার আর তিনকুলে আছে কে? দেখ বাবা! যদি কোন রকমকরে এ যাত্রা মানরক্ষে করতে পার! পরোপকার করাই তো তোমাদের ধর্ম্ম, বেশী কি আর বল্‌বো।"—অবশ্য নারায়ণেরও যে এক ঘরে হইবার প্রচুর সম্ভবনা আছে, একথাটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে পড়িল বটে; কিন্তু প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। "আচ্ছা আপনি বাড়ীযান—আমি এখনি আস্‌ছি।"—স্বল্পকাল মধ্যেই নারায়ণ দুইজন বলিষ্ঠকায় নমঃশূদ্র যুবক সমভিব্যাহারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগের সাহায্যে কাষ্ঠাদির বন্দোবস্ত করিয়া শ্মশানে লইয়া শব দাহ করিল! ভট্টাচার্য্য মহাশয় নারায়ণকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, সে শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পদধূলি লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। * * *

কৃষ্ণবল্লভের আহ্বানে নারায়ণ তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—গ্রামের সমাজপতিগণ প্রায় সকলেই গম্ভীর মুখে কৃষ্ণবল্লভকে ঘিরিয়া উপবিষ্ট।

আজিকার এই সভার উদ্দেশ্য তাহার অবিদিত ছিল না —সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। গ্রাম্যপ্রথানুযায়ী সে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই তিনি ব্যস্ততার সহিত পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "থাক্ থাক্ আর অত ভক্তি দেখাতে হবে না।" পশ্চাৎ হইতে একজন হাসিয়া বলিলেন, "একেই বলে গরু মেরে জুতো দান।"

অপ্রতিভ নারায়ণ লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি নত করিল। কিয়ৎকালপরে কৃষ্ণবল্লভ শুষ্কস্বরে বলিলেন, "বসো বাপু— কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকবে।"

সে পার্শ্বস্থ একখানি টুলের উপর বসিবামাত্র বাগচি মহাশয় মুখবিকৃত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা নারায়ণ! সেদিন তুমি ফাঁসীর মড়াটা কেমন করে অগ্নি সৎকার করে এলে হে? স্মৃতিরত্ন মশাই শবটা নদীতে ফেলে দেবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন; তুমি সেকথা শুনেও গ্রাহের মধ্যে আনলে না! এত আস্পর্দ্ধা তোমার কোথা থেকে হ'ল।"

নারায়ণ ধীর ভাবে বলিল, "জেঠামহাশয়ের অনুরো

উপেক্ষা কর্‌তে না পেরেই শবদাহ করেছি! এটা যে এত গর্হিত কাজ হবে তা তখন ভেবে উঠ্‌তে পারিনি। স্মৃতিরত্ন মহাশয়”—

সহসা কামিনী ভট্টাচার্য্য বাধা দিয়া বলিলেন—“আমি তোমায় অনুরোধ করেছিলুম—আমার সম্মুখে জলের মতো বলে ফেল্‌লে! আমি ত বল্‌লাম যে অদৃষ্টে যা আছে, ঘট্‌তে দাও, তুমিই তো বাপু জেদ্ ধরে বস্‌লে যে পোড়াতেই হবে। শোকে, দুঃখে তখন কি আর আমার মাথার ঠিক ছিল? নৈলে এমন অধর্ম্ম কি আমা দ্বারা হয়? দুর্গা—শ্রীহরি—দেখ দেখি, তখন আমি একশবার না করলাম—আর এখন কি ফ্যাসাদ উপস্থিত!”

বিস্মিত নারায়ণ ক্ষণকালের জন্য যেন পৃথিবীর অস্তিত্ব বিস্মৃত হইল। মানুষ এই কামিনী ভট্টাচার্য্য? হাঁ মানুষই তো বটে, ব্রাহ্মণ, হিন্দু সমাজের একজন স্তম্ভ—হাঁ ভগবান্! এমন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া আর এই পতিত জাতিকে কত ব্যঙ্গ করিবে?—স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের কঠোর হাস্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল; সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, “হাঁ, বোধ হয় জেঠা মহাশয় আপত্তিই করেছিলেন, কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লাম যে দেহটা নদীতে ফেলে দিল ওটা পচে জলখারাপ হবে। এখন তো নদীতে আর স্রোত নেই। গ্রামের গরীব লোকেরা তো ঐ জলই খায়, তাদের ভয়ানক অসুবিধা হত! কি করি বলুন—নানানদিক ভেবে পোড়ানা ছাড়া আর কোন বুদ্ধি মাথায় এলো না?

“নাও, শুন্‌লে বাগ্‌চীর পো! ওরে বাপ্, যার গ্রাম সেই খোদ মালিক এখানে উপস্থিত। ভাল, মন্দ তিনিই দেখ্‌বেন তোমার গায়ে পড়ে মোড়ল সাজবার দরকার কি বাপু।”

তর্ক করা নিরর্থক বিবেচনা করিয়া নারায়ণ উত্তর করিল না। স্মৃতিরত্ন সুরটা কিঞ্চিৎ কোমল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, “সমাজে থাক্‌তে গেলে এসব বিধিব্যবস্থা মেনে চল্‌তে হয় যদি সমাজ ছাড়তে চাও সে আলাদা কথা।”

নারায়ণ গভীর ক্ষোভের সহিত বলিল, “একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনারা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন? এর-মধ্যে আবার সমাজ ছাড়বার কথাই বা কেন ওঠে? আমি খুব একটা গুরুতর অপরাধ করেছি বলে তো মনে হয় না।”

স্মৃতিরত্ন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন “না তা কর্‌বে কেন? কামিনী ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণীর সৎকার করে আমাদের যথেষ্ট সম্মানিত করেছ। বাপু! এসব বাড়াবাড়ি শিখ্‌লে কোত্থেকে? সমাজে থাক্‌তে গেলে এসব অনাচার চল্‌বে না।”

“কৈ কোন অনাচার করি বলে তো মনে হয় না?”

উচিতবক্তা চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “সেদিন জেলে পাড়ায় হরিলুটের বাতাসা এক মাদুরের ওপরে বসে বারজাতের সঙ্গে কেমন করে খেলে বাপু? ভাব যে কেউ বুঝি কিছু দেখ্‌তে পায় না। সব রকম কথাই আমাদের কানে আসে, তবে পরের অন্যায় হয় তাই অনেক কথা চেপে যাই।”

বাগ্‌চী মহাশয় মোটা রুদ্রাক্ষের মালাখানি জপিতে জপিতে কৃষ্ণবল্লভের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “পরের কথায় থাকিনে তাই। নইলে আমি নারায়ণকে ছোট জাতের হাতে জল পর্য্যন্ত খেতে দেখেছি। দশজনের সামনে সে সব কথা বলা আমার স্বভাব নয় তাই বল্‌লাম না”—নারায়ণের প্রতি কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি দ্রুত হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন।

অনেকেই ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নারায়ণকে নানাপ্রকারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া সে উত্তর করিল, “জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে যথাসাধ্য শাস্ত্র মেনেই চলি; এখন যদি আপনারা অন্যরকম বলেন—তা'হলে আর কি কর্‌বো? আমার মনে হয়”—বাধা দিয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন, “শুনছেন তো সকলে? এক রত্তি ছেলে সেও কিনা শাস্ত্র নিয়ে তর্ক কর্‌তে চায়। বাপু মোটে তো একটা পাশ দিয়েছো—তাতেই এতদূর হয়েছে। গুরুজন, শাস্ত্র, কিছু মান্‌তে চাও না। তোমার পক্ষে আমাদের কথাই তো শাস্ত্র,—আবার কি। আমরা বল্‌ছি কাজটা অন্যায় হয়েছে; তবু তুমি বুঝ্‌তে পারছ না। কামিনী দা ঠিক বলেছেন—ভারী জেদী ছেলে তো তুমি।”

কামিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “দেখ্‌ছো তো ভায়া। এই রকম জেদ করেই তো এ অনর্থ টা ঘটালে।

কথা নেই, বার্ত্তা নেই, কোথা থেকে ছুটো চাঁড়াল নিয়ে এসে হাজীর। আমার মানা কি আর শোনে ?"

বৃদ্ধ সান্ন্যাল মহাশয় এতক্ষণ তামাক খাইতে খাইতে নিবিষ্ট মনে সব শুনিতেছিলেন, এইবার হুঁকাটী চক্রবর্ত্তীর হাতে দিয়া বলিলেন, "কালে কালে আরও কত কি দেখ্‌বো ভায়া ? ওরে, বাপু, আমরা তো এখনও মরিনি ; আমরা গেলে তারপর বাগ্‌দী জেলে, চাঁড়াল, মোছলমান নিয়ে একাকার করিস্‌।"

এ নাটকের প্রণেতা এতক্ষণ দুই একটী মন্তব্য প্রকাশ ও স্থানে স্থানে অর্থপূর্ণ হাস্য ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই। এইবার তিনি তাকিয়া হইতে উত্থিত হইয়া সোজা হইয়া বসিলেন। মৃদুহাস্যে নারায়ণের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনারা আসুন ; ছেলে মানুষ না বুঝে যা করেছ, তার জন্য আর গঞ্জনা দিয়ে কি হবে। আজকাল লেখাপড়া শিখ্‌লেই এই রকম সব দুর্ব্বুদ্ধি হয়। যাক্‌, এ যখন আপনা আপনির মধ্যে তখন একটা মীমাংসা করে ফেলাই ভাল।" নারায়ণ তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ নামাইল—কিছু বলিল না। মনে মনে ভাবিল "অনুগ্রহোপিভয়ঙ্করঃ।"

এইবার স্মৃতিরত্ন মহাশয় একটু সংযতস্বরে বলিলেন "বাবু! কি আর বল্‌বো। অমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে এই সব ম্লেচ্ছাচার করছো। যাক্‌গে, বাবু যে কালে বলছেন তখন আর এ নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাটি করতে চাইনে। যা করেছ—করেছ ; এখন একটা প্রায়শ্চিত্ত কর ; ব্যবস্থা আমি নিজে দিচ্ছি। আর এই দশজনের সামনে স্বীকার কর ও সব কাজ আর করবে না।"

"এই সমস্ত মিথ্যা অপবাদ কৃতকর্ম্ম বলে মেনে নিয়ে আমি কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবো না। আমার মনে হয় যাঁরা এই সমস্ত মিথ্যাকথা রচনা করেন তাদেরই আগে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এমন কি শবদাহ করার জন্যও আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবো না ; কারণ তাতে সমাজের কোন অমঙ্গল হয় নাই। আপনাদের শাস্ত্রমতে যদি আমি অপরাধী হয়ে থাকি তা'হলে যা ইচ্ছে করতে পারেন।"

নারায়ণের তেজব্যঞ্জক মুখভঙ্গী ও স্পষ্ট উত্তরে ক্ষণকালের জন্য সকলেই বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কারণ লাজকুণ্ঠিত, নম্র, বিনয়ী নারায়ণের যে এতখানি দৃঢ়তা আছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও ধারণায় আইসে নাই। স্মৃতিরত্ন মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "একেবারে গোল্লায় গেছ, উপদেশ ভাল লাগ্‌বে কেন ?

নির্ল্লজ্জ কামিনী ভট্টাচার্য্য বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌ছেন তো! একরত্তি ছেলের কি জেদ্‌! এমনি করেই তো সেদিন কাণ্ডটা করে ফেল্লে! বাপু! একটু নরম হয়ে ভেবে দেখ—সমাজে একঘরে হয়ে থাকাটা বড় সুখের হবে না।"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন "একঘরে হবে কেন? চাঁড়াল পাড়ায় না হয় গিয়ে ঘর বাঁধ্‌বে। না হয়, ছমির মণ্ডলের সঙ্গে যে পীরিত, চাই কি তার ঘর জামাইও হ'তে পারে।"

নারায়ণ সহসা উঠিয়া কৃষ্ণবল্লভকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি ডেকেছিলেন তাই এসেছিলাম। যাক্‌ অন্য সময় আপনার কাছে আস্‌বো আজকার মত আমি যাই।"—সে আর কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কামিনী ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণবল্লভের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লেন বাবু ;—ব্যাটার কত অহঙ্কার। বুক ফুলিয়ে উঠে চলে গেল। এতো এক রকম আপনাকেই অপমান করা। আমি না গোড়াতেই বলেছিলাম ; ঐ যে ভেজা বেড়ালের মত চুপ করে বসে থাকে ; ওটা শয়তানের হাঁড়ি, পাকা মৎলববাজ। আমি সাতগাঁর লোক চরিয়ে খাই ; আর ছোঁড়াটা সেদিন এমন ভেল্কী লাগিয়ে দিলে যে বুড়ো বয়েসে যা কোন দিন করিনি সেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে? মাগী নিজেতো গেছেই, আমাকে শুদ্ধ অপমান করে গেল? দুর্গা-শ্রীহরি।"

চক্রবর্ত্তী, কামিনী ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমারও দাদা দোষ আছে! কি বল্‌বো বাবুর খাতিরে কিছু বল্‌লাম না ; নৈলে কে না জানে যে তুমি সেদিন সকলের দোরে দোরে গিয়ে"—"আর তুমি বড় সাধু না? দেখিনি আর একদিন, নবাঙেলীর বাড়ীতে দশার চিঁড়ে খেতে? আমি যদি প্রায়শ্চিত্ত করি তো তোমাকেও করিয়ে ছাড়বো?"

চক্রবর্ত্তীর সহিত ভট্টাচার্য্যের যজমান লইয়া বিরোধ ছিল; কাজেই দুই এক কথায় ঝগড়া বেশ পাকিয়া উঠিল। পরনিন্দায় কাহারও অরুচি ছিল না কাজেই কেহ বাধা দিলেন না বরং আঁতে ঘা লাগায় দুই একজন যোগ দিতে বাধ্য হইলেন। কৃষ্ণবল্লভ গড়গড়ার নলটী মুখ হইতে সরাইয়া বলিলেন, "ছিঃ আপনারা কি আরম্ভ কর্‌লেন! থামুন না লাহিড়ী মহাশয়! আপনিও কি পাগল হ'লেন।

কোমরের কাপড় সামলাইতে সামলাইতে চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "দেখুন তো, আপনিই বিচার করুন। সৌদামিনী তো এখনও মরে নাই, জিজ্ঞেসা কর্‌লেই হয়। তার ঘরে বসে চিঁড়ের ফলার মারা আর * * *।" লাহিড়ীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় বাহুবিস্তার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

* * * * * *

(৬)

"নারায়ণ ভালকরে ভেবে দেখ, আমি যদি মত না দেই তা'হলে কারও সাধ্যানেই তোমায় একঘরে করে? এই সামনের ঝুলনদোলে তুমি থিয়েটারটা কোর্‌বে স্বীকার কর, তা'হলেই সব গোল চুকে যায়।"

"একঘরে হওয়ার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত বা দুঃখিত নই; তবে আপনার মত একজন পরম হিতৈষীর কথা রাখ্‌তে পাচ্ছি না—এই দুঃখই আমার সব চেয়ে বেশী। আপনার অনুগ্রহ আমি জীবনে ভুলবো না—কিন্তু আমি বিবেককে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিনা। আমোদ করে নষ্ট কোরবো—এমন সময় আমার নেই; আপনি আমায় অব্যাহতি দিন।"

কৃষ্ণবল্লভ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তা তুমি যদি থিয়েটার করা অনর্থক সময় নষ্ট করাই মনে কর, তা'হলে সেজন্য আমি তোমায় কিছু কিছু পারিশ্রমিক দিতে রাজী আছি; মনে রেখো এ শুদ্ধ তোমার খাতিরে। তোমার যেমন চেহারা তার ওপর অমন গাইতে পার; তুমি যদি রাজকন্যা ও রাণীর পাঠগুলো নাও তো চমৎকার হয়; তোমারও তাতে সুযশ। সেই জন্যই আমার এত আগ্রহ। নারায়ণ, আমার কথাটা রাখো, এতে তোমার ভাল বৈ মন্দ হবে না।"

সে কিয়ৎকাল নতনেত্রে চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, "না মশায়? তা'হলে আমার নাইট স্কুলটী চল্‌বে না। বিশেষ আমি স্কুলমাষ্টার, ছাত্রদের সামনে মেয়ে মানুষ সেজে অঙ্গভঙ্গী কর্‌লে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে, এটা আপনি বিবেচনা করে দেখুন।"

আর বিবেচনা!—জেদের' নিকট কৃষ্ণবল্লভ বহুদিন বিচারশক্তি বলি দিয়াছেন। যেমন করিয়া হউক নারায়ণকে দিয়া থিয়েটার করাইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু নারায়ণ বিনীতভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ স্বীয় একান্ত অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। কৃষ্ণবল্লভ তাহাকে নানা প্রকারে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভয় প্রদর্শন করিয়াও তাহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা যাও, তোমার এ আস্পর্দ্ধা আমি যেমন করে পারি চূর্ণ করবো। দেখি তুমি কত সচ্চরিত্র ও পরোপকারী। একরত্তি ছেলের মুখে লম্বা লম্বা কথা?"

নারায়ণ ধৈর্য্যশান্ত কণ্ঠে উত্তর করিল, "আপনি জমীদার—প্রবলপ্রতাপ; আমি নগণ্য দরিদ্র। আপনি সব কর্‌তে পারেন। কিন্তু বিবেচনা করে দেখ্‌বেন আমার কোন অপরাধ নেই।"

কৃষ্ণবল্লভ রক্তনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "আর সাধুতা ফলাতে হবে না; তোমার মত সাধু ঢের দেখেছি। আচ্ছা থাকো—দেখা যাবে। তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গবোই।" নারায়ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "আপনি, উত্তেজিত হয়েছেন; প্রকৃতিস্থ হয়ে আর একবার ভাল করে ভেবে দেখ্‌বেন; সামান্য কারণে আমার উপর অবিচার করবেন না।"

কৃষ্ণবল্লভ ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন, "বটে, এতক্ষণ দেখ্‌ছিলাম যে তোমার স্পর্দ্ধা কতদূর ওঠে—আমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছ? তুমি নিজেকে কি মনে কর বল দেখি? আমাকেও কি জেলে চাঁড়াল মছোলমান পেয়েছ নাকি?"

লজ্জায় আরক্তিম হইয়া নারায়ণ সে স্থান হইতে অপসৃত হইল। যতদূর দেখা যায় ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত

কলুষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণবল্লভ নিস্পলকে চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নারায়ণ স্কুলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, কৃষ্ণবল্লভ অপর কয়েকটী ভদ্রলোকসহ লাইব্রেরী গৃহে উদ্গ্রীব হইয়া যেন তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ও পার্শ্বে হেড্‌মাষ্টার বাবু গালে হাত দিয়া গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট। ব্যাপার কতক্ অনুমানে ঠিক করিয়া লইয়া সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। কৃষ্ণবল্লভ রুক্ষকঠোর স্বরে বলিলেন, "নারায়ণ! আমার বরাবর তোমাকে একজন সচ্চরিত্র যুবক বলেই ধারণা ছিল; গ্রামের উন্নতির জন্য তোমার চেষ্টা ও আগ্রহ দেখেই দয়াকরে তোমায় স্কুলে কাজ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ তাতে তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর্‌লে কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটী হবে।" নারায়ণ তাঁহার কথা ভাল বুঝিল না; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল, "কালতো আপনাকে"—টেবিলের উপর সজোরে করাঘাত করিয়া কৃষ্ণবল্লভ বলিলেন, "সে সব কথা নয়। বাইরে পরোপকার, রোগীর সেবা ইত্যাদি করে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তলে তলে জঘন্য গুপ্ত বদমাইসী—ভেবেছো যে তা'হলে কেউ সন্দেহ কর্‌বে না, কেমন? বলুন না হেড্‌মাষ্টার মহাশয়?"

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় হাঁ না করিয়া কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ ছাড়িবার পাত্র নহেন, অবশেষে হেডমাষ্টার বাবু আমতা আমতা করিয়া যাহা বলিলেন; তাহা শুনিয়া লজ্জা ক্ষোভ ও ঘৃণায় নারায়ণের ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল! নিষ্ঠুর আনন্দে কৃষ্ণবল্লভের বদনমণ্ডল প্রজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে শুন্‌লেন তো? এসব ছেলে পেলেরাই বলেছে, ঘটনা সত্য না হলে কি আর এত কথা হয়?"

উপস্থিত ভদ্রলোক বা স্কুলকমিটির মেম্বরগণের মধ্যে দুইএক জন, ঘোর কলিকালে যে এইরূপ হইবেই তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নারায়ণের প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণায় দৃষ্টিপাত করিলেন। কৃষ্ণবল্লভ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কিহে তোমার এর উপর বল্‌বার কিছু আছে কি?"

নারায়ণের পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল সহসা আবেগে রক্তিম হইল, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ নিবারণ করিয়া সে কৃষ্ণবল্লভের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "কিছুনা, আপনাদের যা অভিরুচি কর্‌তে পারেন।"

সে মর্ম্মভেদী চকিত-দৃষ্টি-স্পর্শে তাঁহার ঈর্ষ্যাকলুষিত চিত্ত শিহরিয়া উঠিল; তিনি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "স্বর্গীয় বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পুত্র তুমি, তাই ক্ষমা কর্‌লাম—নৈলে কঠিন শাস্তি দিতাম। যাক্, আজ থেকে স্কুলের কাজথেকে তোমায় অবসর দেওয়া গেল। আর একটা উপদেশ দেই ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ো—নিজের চরিত্রটা সংশোধন কর্‌তে চেষ্টা করো! এ গ্রামে বাস করে অত ভণ্ডামী চল্‌বে না।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হেড্‌মাষ্টার বাবু ছাড়া আর সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বিচারের অভিনয় শেষ হইল—সকলে মিলিয়া অম্লান বদনে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দন্তে অধর চাপিয়া নারায়ণ ধীরে ধীরে স্কুল হইতে বাহির হইয়া গেল, পশ্চাতে অসহিষ্ণু ছাত্রবৃন্দের কলকোলাহল সে শুনিতে পাইল না। কৃষ্ণবল্লভ, হেড্‌মাষ্টার ও অন্যান্য শিক্ষকগণের সাহায্যে অতিকষ্টে সরলহৃদয় বালকগণকে ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত করিলেন।

(৭)

নারায়ণ স্কুল হইতে বাহির হইয়া বরাবর স্বরূপগঞ্জে জ্ঞানবাবুর বাসায় গেল। তিনি তখন স্কুলে গিয়াছেন, নারায়ণ শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ছুটির পর জ্ঞানবাবু বাসায় ফিরিয়া নারায়ণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সে সদা হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানি সন্ধ্যার স্থলপদ্মের মতই ম্লান হইয়া গিয়াছে, উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "কিরে, কি হয়েছে, অমনতর হয়ে বসে আছিস্ যে?"

এতক্ষণ নারায়ণ তাহার লাঞ্ছনাহত প্রাণের বেদনাপ্লুত কাতরতা সংযমের বেষ্টনী দিয়া হৃদয় মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু জ্ঞানবাবুর প্রশ্নে তাহার সে মর্ম্মান্তিক যাতনা ক্ষতসেতু-বন্ধন-জল-সংঘাতের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল!

জ্ঞানবাবু সমাজচ্যুতির কথা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; কিন্তু আজকার জঘন্য কাহিনী শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। নির্ব্বাক বিস্ময়ে ললাটে হস্তার্পণ করিয়া অনেকক্ষণ পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিলেন। তারপর সস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে গাঢ়স্বরে ডাকিলেন:—নারায়ণ!—সে আহ্বানে স্নেহ ও সমবেদনা সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। নারায়ণ মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। সে স্তিমিত-ম্লানদৃষ্টি, শুষ্ক বিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তার্পন করিয়া জ্ঞানবাবু স্নেহ-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন "খুব কষ্ট পেয়েছিস্—না? অজ্ঞাতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল; তিনি তাড়াতাড়ি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। নারায়ণের যন্ত্রণা-নিষ্পীড়িত, বিক্ষোভালোড়িত চিত্তের পুঞ্জীভূত বেদনা সে স্নেহশীতল স্পর্শে গলিয়া নয়ন পথে নির্গত হইল। জ্ঞানবাবুর মনে পড়িল স্বামিজীর সেই আশ্বাস-বাণী—"ক্ষীর ননী খেয়ে, তুলোর গদীর উপর শুয়ে; এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে; কার ব্রহ্ম কবে বিকশিত হয়েছেন? কাঁদতে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ, জন্তু, গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় ব্রহ্মদর্শন হয়"—তাই তিনি নিবারণ করিলেন না। নারায়ণ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আর আমি বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌বো না, এ মুখ কেমন করে গ্রামের সকলকে দেখাবো—এর চেয়ে মৃত্যুও যে ভাল।" সহসা জ্ঞানবাবুর প্রশান্ত-গম্ভীর মুখখানি সংযম-নিষ্ঠার পুণ্যময় মহত্ত্ব-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তা হতে পারে না; কাপুরুষের মত পলায়ন করে আত্মরক্ষা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নেই। যাও বীর, এতদিন পরে তোমার সম্মুখে পরীক্ষামন্দিরের গৌরবময় দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভগবানে বিশ্বাস রূপ দৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত হয়ে বিজয়ী সৈনিকের মত দৃঢ় পদক্ষেপে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। সংসারের রক্তনেত্রের ভ্রূকুটী দেখে কাপুরুষের মত ভীরু কাতরতায় এলিয়ে পড়া তোমার শোভা পায় না;—এতদিনে তবে কি শিক্ষা লাভ কর্‌লে?"

সত্যই তো? নির্ব্বিচারে সমস্ত গ্লানি, অপমান, অপবাদের বোঝা মস্তকে লইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৃদ্ধের ন্যায় এই পঙ্গু সমাজের কল্যাণকল্পে কার্য্য করিতে হইবে—এ সত্যটী আত্মহারা দৌর্ব্বল্যে অন্ধ হইয়া সে কেন দেখিতে পায় নাই? তবে কি সত্যের সাধনায় সে এখনও পরিপূর্ণ বিশ্বাসে আত্মদান করিতে পারে নাই। একটা দুঃসহ ক্ষোভের কশাঘাতে সে যেন অকস্মাৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইল; অনুতপ্ত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল,—দেবচরিত্র জ্ঞানবাবুর পদতলে কেন এ অপবাদ বেদনার কলঙ্কমলিন দীর্ঘশ্বাস বহন করিয়া আনিলাম? ভাবিতে ভাবিতে সে সহসা উত্তেজনা-ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই সমস্ত অন্যায় লাঞ্ছনাকে আনন্দে বরণ করে নেবার মত দৃঢ়হৃদয় আমার নেই—অন্ততঃ সহ্য কর্‌তে পারি সে শক্তি যাতে আমার হয় আমায় সেই আশীর্ব্বাদ করুন। আপনার কৃপা থাক্‌লে আমার জীবনের সাধনা কখনই ব্যর্থ হবে না, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"—বলিতে বলিতে নারায়ণ গভীর শ্রদ্ধায় জ্ঞানবাবুর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। জ্ঞানবাবু বাহুবিস্তার করিয়া তাহাকে ভূমি হইতে তুলিলেন। উল্লাসে ও গর্ব্বে তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবানন্দ জাগিয়া উঠিল; তিনি উৎসাহোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি কি আশীর্ব্বাদ কর্‌বো বৎস! শ্রীভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন। মনে রেখো, আমাদের জীবনের আদর্শ সেই মহাপুরুষ "এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চির-বুভুক্ষিত; কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীর উদ্ধারের ব্রত" গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও, তাঁর বিচলিত হৃদয় শিষ্যবৃন্দকে আশ্বাস দিয়ে লিখেছিলেন "কোমর বাঁধ, বৎস, প্রভু আমাকে এই কার্য্যের জন্য ডেকেছেন। সমস্তজীবন আমি নানা কষ্ট ভুগেছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরতে দেখেছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করেছে, জুয়োচোর ও বদমাইস বলেছে। আমি এসমস্তই সহ্য করেছি, তাদের জন্য—যারা আমায় উপহাস ও ঘৃণা করেছে। বৎস! এই জগত দুঃখের আগার বটে কিন্তু মহাপুরুষগণের শিক্ষালয় স্বরূপ।"

নারায়ণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তাহার বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে একদল স্কুলের ছাত্র উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা নীরবে সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া তাহার অঙ্গ হইতে যেন সমস্ত লাঞ্ছনা মুছিয়া লইল। তাহার ব্যথিত-দৃষ্টি-ম্লান সৌম্য বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে স্নেহ সকরুণ স্বরে বলিল, "কিরে তোরা এখানে কেন? কেউ দেখ্‌তে পেলে আবার নানা কথা হবে?"

"কেন আপনার কি ভয় হচ্ছে নারায়ণ দা?"

প্রশ্নকর্ত্তার দিকে শান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণ বলিল, "ভয়? কিসের ভয়রে ধীরেন? সংসারে সুখ কি এতই দুষ্প্রাপ্য যে বিবেক মূল্যে তা ক্রয় কর্‌তে হবে? তবে আমার জন্য লোকে তোদের অপমান করবে—বিদ্রূপ কর্‌বে এ সহ্য কর্‌তে পারবো না।"

আর একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "আপনাকে যারা বিনাদোষে এমনিতর অপমান করে আমরা তাদের কথা গ্রাহ্য করিনে। আমরা সব্বাই মিলে প্রতিজ্ঞা করেছি, কাল থেকে আর ইস্কুলে যাব না; দেখি কি করে ইস্কুল হয়।"

"পাগল সব! ইস্কুলের দোষ কি? নেতোরে সুরেন, আমার চাদরখানা বাড়ীর ভেতরে রেখে আয়! বস্ সব ঠাণ্ডা হয়ে! মন কর যেন কিছুই হয় নি! ছেড়ে দে ওসব বাজে কথা—আয় দিকি, আমরা সকলে মিলে একবার সেই গানটা গাই।

"তাই বেশ হবে; সকলে শুন্‌বে এখন যে আমরা নারায়ণদার এখানে বসে মনের আনন্দে গান গাচ্ছি, ভারী মজা হবে কিন্তু"—বলিতে বলিতে বালকগণ নারায়ণকে ঘেরিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। সমস্বরে গাহিতে লাগিল,—

জাগ্রত হও, জাগ্রত হও, জাগ্রত হও করমবীর;
তুচ্ছ করিয়া কালের ভ্রূকুটী, দর্পে উচ্চ করিয়া শির।

মহা আহ্বান জলদ মন্দ্রে মথিয়া অলস-তন্দ্রা-ঘোর,
উঠিছে ধ্বনিয়া বিবেক-কণ্ঠে পশে নাকি তাহা শ্রবণে তোর!
হের দিকে দিকে নবীন আশায় উঠিছে জাগিয়া অযুত প্রাণ,
নব জাগরণ পুণ্য-বারতা বিশ্ববাসীরে করিতে দান।
ওরে ধূলিলীন ভ্রান্ত অবোধ নিরাশায় কেন নয়নে নীর,
জাগ্রত হও জড়িমা সরায়ে জাগ্রত হও করম বীর।

(ঐ) উদিল পূরবে তরুণাদিত্য বিমল-সত্য-কিরণ-জাল,
সব সন্দেহ দ্বন্দ্ব ছেদিয়া ধ্বংশ করিল তিমির মাল।
রুদ্ধ আজিকে কার বাতায়ন, কে যাপিছ গৃহে রুধিয়া দ্বার-
সংশয়াতুর কে ভীরু কাতর হেরিছ নয়নে অন্ধকার,
ছুটে আয় ত্বরা টুটি' গৃহ বাধা অমৃতের শিশু মুক্ত ধীর
জগতের কাজে জাগ্রত হও, জাগ্রত হও করম বীর।

দুঃখ দৈন্যে দগ্ধ ধরণী কতকাল রবে ঘুমায়ে আর,
জাগো মহাপ্রাণ কে আছে কোথায় স্বার্থ-বিহীন হৃদয় যার।
এসো বিবেকরবির পুণ্য কিরণে সুস্নানপূত শুভ্রকায়,
এসো জাগ্রত করি শ্রদ্ধা নিষ্ঠা পরাণ সঁপিতে প্রভুর পায়,—
পতিত কাঙ্গাল যাতনা-ক্লিষ্টে ইষ্ট বলিয়া স্থির,
ত্যাগ ও সেবায় লভিতে মুক্তি জাগ্রত হও করমবীর॥

(৮)

জ্ঞানবাবু চেষ্টা করিয়া নারায়ণকে স্বরূপগঞ্জের বিখ্যাত আড়তদার কুণ্ডুবাবুদের মোকামে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। সে প্রত্যহ বাড়ী হইতে আসিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল। গ্রামের তথাকথিত ভদ্রলোকগণ তাহাকে নানা প্রকার ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন—নারায়ণ নীরবে সহ্য করিতে লাগিল। কৃষ্ণবল্লভের আশা ছিল যে নারায়ণ নিশ্চয়ই আশ্রয় ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য একদিন তাঁহার দরজায় দাঁড়াইবেই, কিন্তু সত্বর তাহার কোন সম্ভবনা নাই দেখিয়া তাঁহার মনে নূতনতর মৎলব জাগিয়া উঠিল। বলাবাহুল্য সনাতনধর্ম্ম রক্ষাকল্পে ও কর্ত্তব্য বিবেচনায় পূর্ব্বকথিত সমাজপতিগণ কৃষ্ণবল্লভের প্রজ্জ্বলিত ঈর্ষ্যায় ইন্ধন যোগাইবার কার্য্যে কোনদিন শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই।

দুইমাস কাটিয়া গিয়াছে। একদিন মোকামের দেওয়ানজী নারায়ণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখুন, এখন কাজের অত্যন্ত ভীড় পড়িয়াছে। কিছুদিন আপনাকে মোকামে থাকিয়াই কাজকর্ম্ম করিতে হইবে। কাল সেই ভাবেই প্রস্তুত হইয়া আসিবেন। ইহাতে আপনার লাভ বৈ লোক-

সান নাই, কারণ বেতন ব্যতীত খোরাকীও আপনি সরকার হইতে পাইবেন।"

নারায়ণ নম্রভাবে উত্তর করিল, "মশাই! আমার এখানে থেকে কাজ করবার উপায় নেই, বাড়ীতে এক রোগদুর্ব্বলা বিধবা মা—তার উপর নিত্য ঠাকুর সেবা আছে—এ সব কে করবে?"

"অন্য লোকের বন্দোবস্ত করিয়া দিলে হয় না?"

"অন্য লোক দিয়ে দু'এক দিন চলে, রোজ রোজ তো চল্‌বে না। বিশেষ আমাদের বাড়ীতে গ্রামের কেউ তো আসেন না, জানেন তো সব!"

"যাক্, ঠাকুর সেবার বন্দোবস্তের বিষয় ভাবিবার আমার অবসর নাই; তাহা হইলে আপনি এখানে থাকিয়া কাজ করিতে পারিবেন না বলুন?" নারায়ণ মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে—কেমন করে সম্ভব হবে বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে, আমার অনেক কাজের"—বাধা দিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে দেওয়ানজী বলিলেন, "কেবল ঠাকুর সেবা, পরের উপকার ইত্যাদি করিয়া তো দিন চলে না; মনিবের হিতও দেখা উচিত। আর যদি সেটা কর্ত্তব্য বলে বিবেচনা না করেন, তবে আপনার চাকরী কর্‌তে আসা উচিত ছিল না।"

নারায়ণ মস্তক অবনত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করতঃ গাঢ়স্বরে উত্তর করিল, "উত্তম তবে আজ হতে আমায় জবাব দিন।" দেওয়ানজী কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "জবাব আমি দিতেছি না, আপনি লইতেছেন।"

নারায়ণ কাগজ পত্র বুঝাইয়া দিয়া বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল। সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না সহসা এরকম হইল কেন? দেওয়ানজীর এই "কাজের ভীড়" যে কৃষ্ণবল্লভ বাবুর রচিত তাহা সংসারের কূটনীতিজ্ঞানহীন নারায়ণ কেমন করিয়া বুঝিবে? আর বুঝিলেই বা করিবে কি? সবলের তৃপ্তির জন্য দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার জগতে তো এই প্রথম নহে—ইহার নাম সংসারচক্র। কঠোর নির্ম্মমতার লৌহবলয় মণ্ডিত এই সংসারচক্র ভ্রূক্ষেপহীন আবর্ত্তনে সমভাবে দরিদ্র, পতিত, কাঙ্গাল, ব্যথিতের উর্দ্ধমুখ আশা নিষ্পেষিত করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে—অভিযোগ, আবেদন, আর্ত্তনাদ, মিনতি নিস্ফল। দরিদ্রা বিধবার অবলম্বন অন্ধের যষ্টির মত একমাত্র পুত্র বলিয়া কেহ করুণার্দ্র নয়নে চাহিয়া দেখিবে না। বিশেষ এই সমাজের বক্ষে বসিয়া তুমি উচ্চতত্ত্ব সাধন করিবে? সাধারণের মত গতানুগতিক ভাবে জীবন যাপন না করিয়া একটা অপ্রীতিকর (?) আদর্শ খাড়া করিয়া দশ-জনকে ছাড়াইয়া উঠিবে এত ধৃষ্টতা তোমার? অতএব তোমাকেই তো সর্ব্বাগ্রে ঐ নিষ্ঠুর পেষণে দুষ্ট হইতে হইবে—ইহার নাম সংসার চক্র। সংসারের—সমাজের এই শোচনীয় অধঃপতন নিরীক্ষণ করিয়াই তো বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ মর্ম্ম বেদনায় বলিয়া উঠিয়াছিলেন:—

হৃদিবান নিঃস্বার্থ-প্রেমিক! এ জগতে নাহিতব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর মূরতি তাকি সয়?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ—তবে পাবে এ সংসারে স্থান!

নারায়ণ! তুমি কি "জড়প্রায় অতি নীচ" হইতে পারিবে? পারিবে কি লৌহপিণ্ডের মত অনুভূতিহীন হইতে? তা যদি না পার তবে ইহা সহ্য করিতে হইবে—এই নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যে দিয়াই জীবনকে সত্যের সাধনার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এক হস্তে অশ্রুজল মোচন করিতে হইবে; অপর হস্ত পর কল্যাণে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। ইহার নাম সংসার চক্র—কৃষ্ণবল্লভ বাবুর অপরাধ কি?

* * * * * * *

"দাদা ঠাকুর! কুণ্ডুবাবুরা তোমায় নাকি জবাব দিয়েছে?"

"জবাব দেয়নি মণ্ডলজী, আমি পোষালো না বলে নিজেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি।"

"হুঁ,—তাতো শুনেছি, ঐ দেওয়ানজী বেটা যে কয়েক-দিন থেকে মুনিব বাড়ী ঘোরাঘুরি করছিল, তার খোঁজ রাখো কিছু?"

"তা হোক্, চাকরী গিয়েছে ভালই হয়েছে; ও সব আর কোর্‌বো না মনে করেছি; একরকম করে দিন চলে যাবে?"

"তাতো যাবে—কিন্তু খোদাতাল্লার মুলুকে কি এই সব জুলুমের একটা ইন্‌সাফ্ নেই?"

"জুলুম কোথায় দেখলে মণ্ডলজী! কৃষ্ণবল্লভ বাবুতো

আমার তেমন কিছুই অনিষ্ট করেন নি, কর্‌লে তো তিনি আরও অনেক কর্‌তে পার্‌তেন।"

ছমির মণ্ডল অবজ্ঞাভরে বলিল, "ইস্ ভারী তো মর্‌দানী! তোমার মতো নাচার এতিমের উপর জুলুম কর্‌তে যার সরম লাগে না—সে আবার মানুষ! এতদিন তুমি ঠেকিয়ে রেখেছো তাই, তা না হলে দেখিয়ে দিতুম—ও কতবড় তালুকদার। এবার যদি আর কিছু করে, তবে আমি এক হাত দেখে নেবো; তোমার বাধা আর মান্‌বো না—এ আমার সাফ জবান।"

ছমির মণ্ডলের বাড়ীতে নারায়ণ আসিয়াছে সংবাদ পাইয়া একে একে মাতব্বর কৃষকগণ সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে তাহাকে আর চাক্‌রীর অন্বেষণে অন্যত্র যাইতে দিবে না। নাইটস্কুলে যাহারা অবৈতনিক শিক্ষালাভ করে তাহারা মাসিক কিছু কিছু দিলেই তাহার ক্ষুদ্র সংসার একরূপে চলিয়া যাইবে। কিন্তু নারায়ণকে সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়াও এ প্রস্তাবে রাজী করাইতে পারিল না। কেমন করিয়া সে সম্মত হইবে? "নরনারায়ণ" সেবায় পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য সে যে সেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে। সে এবার একবার নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

দামোদর নদের বন্যায় বর্দ্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে সংবাদ পাইয়াই জ্ঞানবাবু তথায় চলিয়া গিয়াছেন। রুগ্না মাতাকে একাকী ফেলিয়া নারায়ণ তাঁহার সঙ্গী হইতে পারে নাই। জ্ঞানবাবু ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত সে এই ভাবেই থাকিবে সঙ্কল্প করিয়াছে। জ্ঞানবাবুর পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্যে অগ্রসর হইবে না জানিতে পারিয়া ছমির মণ্ডল আর তাঁহাকে কোন অনুরোধ করিল না। সকলেই মাষ্টার মহাশয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় রহিল। এদিকে নারায়ণের সাংসারিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে লাগিল। কৃষ্ণবল্লভ আশায় দিন গণিতেছেন, একদিন না একদিন নারায়ণ ত্রুটী স্বীকার করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইবে—কিন্তু সে আসিল না। চাটুকারগণ নানাপ্রকারে তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়া বশে আনিবার পরামর্শ দিল বটে, কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ বেশ বুঝিতে পারিলেন যে ইহার উপর কিছু করিতে গেলেই গ্রামের মুসলমান, নমঃশূদ্র জেলে প্রভৃতি প্রজাবৃন্দকে সংযত রাখা সুকঠিন হইবে। দরিদ্র, সমাজচ্যুত বালক এখনও সকলের চক্ষুর সম্মুখে বুক ফুলাইয়া কৃষকপল্লীতে যাতায়াত করে, এযে "আমারি নাগর, যায় পরঘর, আমারি আঙ্গিনা দিয়া"—ব্রহ্মাণ্ডের এ অনিয়মের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল।

একদিন বাগ্‌চী মহাশয় চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু নারায়ণ কিছুতেই অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অথবা কৃষ্ণবল্লভবাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে রাজী হইল না। অবশেষে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উত্তেজিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "বাপু নিজের ভাল যদি না বোঝ, তা'হলে আমরা আর কি করবো। ও সব ছোট লোকের সঙ্গে না মিশে ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা মেশা কর্‌তে কি দোষ? ভদ্রলোক, ব্রাহ্মণের ছেলের এ নীচপ্রবৃত্তি কেন? যাদের ছুঁলে স্নান কর্‌তে হয়, তাদের রোগী চব্বিশ ঘণ্টা ঘাঁটা, তাদের বিছানায় গিয়ে বসা এসব কোন শাস্ত্রে আছে বাপু? কৈ বুড়ো হতে চল্লুম, কত সাধু দেখলাম—সেকালেরও কত সাধু ভালমানুষের কথা শুনেছি, কিন্তু এমনতর বিদ্‌ঘুটে ব্যাপারের কথা তো শুনিনি, দেখিওনি। আর গ্রামের ভাল মন্দ যাঁরা মাতব্বর মুরুব্বি আছেন, তাঁরাই দেখ্‌বেন—তোমার এত মাথাব্যথা কেন?" নারায়ণকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্ত্তী আশান্বিত হইয়া ভাবিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। নারায়ণকে যদি বশে আনিতে পারি তাহা হইলে কৃষ্ণবল্লভ খুব সন্তুষ্ট হইবেন; সেই সন্তুষ্টির একটা ভাবীচিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "সেদিনও বাবু তোমার কথা কত বল্লেন; তিনি এখনও দুঃখু করে বলেন, নারায়ণ আমার কথাটা রাখ্‌লে না। এখনো যদি কথা শোনে তাহলে আমি ওর জন্য কিনা কর্‌তে পারি; ওকি আমাদের পর? তোমার উপর বাবুর বেশ স্নেনজর আছে এই সময় কিছু জমি জিরেত বাগিয়ে নাও। ভালকথা বল্‌ছি বাবা,

ওসব পাগ্‌লামো ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে যাতে সংসারের উন্নতি হয়, দশজনে ভালবলে তাই কর। খামাখা গাঁয়ের মনিবের সঙ্গে এমনতর খোঁচাখুচি করাটা ভাল নয়।" সম্মুখের রাস্তা দিয়া কয়েকজন স্নান করিতে যাইতেছিলেন, "মনিবের সঙ্গে খোঁচাখুচি" ইত্যাদি শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাদের চরণ অজ্ঞাতসারে স্তম্ভিত হইল। নূতন আবার কি হইল সেটা না শুনিয়া চলিয়া যাওয়াটা একান্ত দুষ্কর বিবেচনায় তাঁহারাও নারায়ণের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনে শুভ পদার্পণ করিলেন। কামিনী ভট্টাচার্য্য একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "আহা বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সোণার সংসারের আজ দুরবস্থা দেখ।"

দাঁতনকাঠিটী চিবাইতে চিবাইতে বেণীভাদুড়ী বলিলেন, "কিহে, চক্রবর্ত্তী ভায়া ব্যাপার কি ?"

চক্রবর্ত্তী তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য সবিস্তারে বর্ণন করিয়া কহিলেন, "বুঝ্‌লে নারায়ণ, তুমি যদি প্রায়শ্চিত্ত কর তা'হলে পর সমস্ত খরচ কৃষ্ণবল্লভবাবু দেবেন—তবে অবিশ্যি থিয়েটার কর্‌তে রাজী হতে হবে।"

কামিনী ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বাপু অত জেদ্‌ দেখাতে গেলে শেষে নিজেকেই ঠক্‌তে হয়। বাড়ীর ভাতখেয়ে মাষ্টারী করা পঁচিশ টাকা মাইনে—সুখে থাকৃতে ভূতে কিলোয় কিনা ? হাঃ হাঃ আরে চক্রবর্ত্তী ও গোঁয়াড় গোবিন্দ কি আর হিতোপদেশ কানে তুলবে ?"

চক্রবর্ত্তী সে কথায় কান না দিয়া নারায়ণকে বুঝাইতে লাগিলেন, বাগচী মহাশয়ও দু'চার কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু নারায়ণ কিছুতেই কৃষ্ণবল্লভের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থিয়েটারে যোগদান করিতে রাজী হইল না। ক্রমে উপদেশের সুর নরম হইতে গরমে উঠিল। নারায়ণ বিনীত-ভাবে বলিল, "আপনারা অনর্থক আমার উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন; আর আমার চাকরী কর্‌বার ইচ্ছা নেই—আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন যেন জীবনটা এই ভাবেই কাটিয়ে দিতে পারি।"

চক্রবর্ত্তী উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "বাপু এত বেলাহাজ তুমি ? আর কেউ হলে গ্রামে মুখ দেখাতে পার্‌তো না। যেরাপিত্তের নাড়ীপর্য্যন্ত ধুয়ে খেয়েছো ? বাবুর দয়ার শরীর তাই—নইলে এতদিন ভিটের ঘুঘু চর্‌তো।"

কামিনী ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তীর হাত ধরিয়া ব্যঙ্গহাস্তে বলিলেন, "এসোহে ভায়া, কলিকালে কারও ভাল কর্‌তে নাই। এই সব নব্য ছোক্‌রা—এরা কি আর গুরুজনের মর্য্যাদা বোঝে না রেখে চল্‌তে পারে ? বাপু এক ফ্যাসাদে ফেলে বুড়ো বামুনের পঞ্চাস টাকা লোক্‌সান করেছো—ধর্ম্ম আছেন হে—হে—টের পাচ্ছোতো ?"

চলিয়া যাইবার প্রাকালে মর্ম্মান্তিক ভাষায় দুটী কথা শুনাইতে কেহ ত্রুটী করিলেন না। নারায়ণ নীরবে নতনেত্রে সমস্ত শুনিল; কোন উত্তর করিল না। তাহার মনে পড়িল জ্ঞানবাবুর সরল স্নেহময় আদেশ—সেই তেজগর্ভ আশ্বাসবাণী। যত কঠিন হউক, সে অসীম ধৈর্য্য বুক বাঁধিয়া এবার প্রকৃত মানুষের মত শক্তি, সাহস ও সঙ্কল্প লইয়া ভগবানের স্নেহচিহ্নিত কর্ম্মীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইবে। গ্লানির বেদনায় বিপর্য্যস্ত বুদ্ধি হইয়া সে আত্মহারা দৌর্ব্বল্যে জীবনের সাধনা বিফল হইতে দিবে না। সে কেন অক্ষম হইবে ? সেও মহাশক্তির সন্তান—ভগবানের দাস; কেন সে অক্ষম হইবে ?

(৯)

উপর্য্যুপরি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে কাত্যায়নী দেবীর স্বাস্থ্য পূর্ব্ব হইতেই ভগ্ন হইয়াছিল; বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জররোগে আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। নারায়ণ ভগবানের মুখ চাহিয়া জননীর সেবায় নিযুক্ত হইল। রোগিনীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতে লাগিল, নারায়ণ বুঝিতে পারিল এবার জননীকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে ফিরাইয়া আনা অসাধ্য—তবুও কর্ত্তব্য বিবেচনায় নিত্যব্যবহার্য্য ধাতুপাত্রসমূহ বিক্রয় করিয়া ঔষধ পথ্যাদির বন্দোবস্ত করিল। এ বিপদেও অবশ্য কেহ সনাতনধর্ম্মনীতি (?) লঙ্ঘন করিয়া জাতিভ্রষ্ট নারায়ণকে সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন না। আসিল দরিদ্র কৃষকগণ। তাহারা নারায়ণের বাজার করিয়া দিত; স্বরূপগঞ্জ হইতে ঔষধ আনিয়া দিত। রাত্রে চার পাঁচজন মিলিয়া তাহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া পাহারা দিত। দাদাঠাকুরের বিপদে কি তাহারা স্থির থাকিতে পারে ? তাহারা বিচলিত হৃদয় নারায়ণকে সান্ত্বনা দিত, আশার কথা শুনাইত।

শয্যাপরি জননীর সংজ্ঞাহীন দেহ—পার্শ্বে নারায়ণ বিনিদ্রনয়নে বসিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার শীর্ণ পাংশুবর্ণ মুখখানার প্রতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে চাহিয়া দেখিতেছে। জননী যে একাধারে তাহার পিতা, মাতা দুইই ছিলেন! কোনদিন পুত্রের কোন সঙ্কল্পে বাধা দেন নাই। এই অসীম স্নেহরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। মাকে হারাইয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিব? একটা স্নেহহীন, মমতাহীন নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের ধূসর মরুময় চিত্র কল্পনা করিতে গিয়া নারায়ণের দৃঢ়হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি হইবে, কি করিব—ভাবিয়া নারায়ণ সীমা পাইল না। সে চেষ্টা করিয়া সমস্ত দুশ্চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে পুঃন পুঃন আত্মনিবেদন করিতে লাগিল। এমন সময় বাহির হইতে একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করিল "দাদাঠাকুর, মা ঠাকুরুণের অবস্থা কেমন বোধ কোর্‌ছো?"

নারায়ণ ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আর অবস্থা। রামদা তুমি একটু ঘুমোও, এই ক'রাত সমানে জাগ্‌ছো, অসুখ করতে পারে।" সে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি কি একাই জাগ্‌ছি, তুমি জাগ্‌ছো না দাদাঠাকুর। চাষালোকের অত কথায় কথায় অসুখ করে না। ভেবে, ভেবে আর রাতজেগে তোমার শরীরটা যে আধখানা হয়ে গেছে।"

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, নারায়ণ বুঝিল জননীর জীবন-দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। একাই মাতার রোগজীর্ণ দেহখানি ক্রোড়ে করিয়া তুলসীমঞ্চের তলে লইয়া গেল। প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়া, শোকাহত হৃদয়াবেগ কথঞ্চিত সম্বরণ করিয়া প্লুতস্বরে মাতার কর্ণমূলে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কাত্যায়নী দেবী মরণের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরনিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। নারায়ণ হাহাকার করিয়া প্রাঙ্গনোপরি লুটাইয়া পড়িল।

গলিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে রামদাস স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। তিনি তখন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া তামাক ধ্বংস করিতে করিতে চক্রবর্ত্তী ও কামিনী ভট্টাচার্য্যের সহিত শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছিলেন। রামদাস সকলের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নারায়ণের বিপদ্বার্ত্তা নিবেদন করিল। স্মৃতিরত্ন মহাশয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কেনরে, তোরাই তো তাদের কুটুম্ব স্বজন; আমাদের কাছে আবার আসা কেন?"

কামিনী ভট্টাচার্য্য কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বলিলেন, "দেখ্‌লেন স্মৃতিরত্ন মশায়, নবাব নিজে আস্‌তে পারেন না—একটা চাঁড়ালকে পাঠিয়ে ডাকা হচ্ছে; যেন আমরা ওঁর খাস-তালুকের প্রজা।"

"চাঁড়াল" শব্দটী বহুকষ্টে হজম করিয়া রামদাস বলিল, "আজ্ঞে, তিনি পাঠান নি; আমরাই সকলে মিলে পরামিশ করে আপনাদের কাছে এলাম। তেনার তো আর কেউ নেই; বুড়ীর একটা গতি করতে হবে তো?"

চক্রবর্ত্তী নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ছমির মণ্ডল আসেনি? তার বাড়ীতে রাত্রে নাইটইস্কুল আর মুরগীর ঠ্যাং খাওয়া; এখন তারা এসে গোর দিক্ না—সব চেয়ে ভাল হবে।"

"হাঁরে রামদাস! নারায়ণের মাকে নাকি, ওষুদের সঙ্গে ডাক্তার মুরগীর সুরুয়া খাইয়েছে?"—স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অপর দুইজন উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। রামদাস বুঝিতে পারিল না যে সে জাগিয়া আছে কি স্বপ্ন দেখিতেছে! অশিক্ষিত নীচজাতি (?) রামদাস সুরুচিসঙ্গত সভ্য ভাষায় কথা কহিতে শিখে নাই; উৎকট ব্যঙ্গে ব্যথিত হইয়া সেও স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের স্বর্গগতা জননী সম্বন্ধে গ্রাম প্রচলিত একটা তিক্ত জনশ্রুতির বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিল। স্মৃতিরত্ন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "হারামজাদা ব্যাটা, তোর এত আস্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণের প্রতি কটূক্তি!! মনিববাড়ী নিয়ে তোর ঐ মুখ জুতিয়ে দুরস্ত করছি; দাঁড়া বাপ্পোৎ"—রামদাস দাঁড়াইল না! ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালনের চেয়ে একটা গুরুতর কর্ত্তব্যকেই সে বড় বলিয়া দেখিল। একে একে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অনেক অনুনয় করিল, কেহ কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিল বটে, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। সমাজ আছে কি করা যায়!

স্মৃতিরত্ন মহাশয় দ্রুতপদে আসিয়া কৃষ্ণবল্লভকে এ সংবাদ

প্রদান করিলেন। তিনি ভালমন্দ কোন উত্তর করিলেন না; কেবল তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ে একটু ম্লানহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। রামদাসকে ধরিয়া আনিবার জন্য দুইজন পাইক তখনি ছুটিল না দেখিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় খুন্নমনে কৃষ্ণবল্লভ ও রামদাসকে অভিশাপ দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রামদাসকে দেখিয়া নারায়ণ কাতর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে রামদা?" রামদাস রুদ্ধকণ্ঠে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া অন্তরের তীব্র শোকাগ্নি যেন ঠিকরিয়া নয়ন পথে নির্গত হইল; নারায়ণ অভিমান দৃপ্তস্বরে বলিল, "কেন ঐ সব লোককে অনুরোধ কর্‌তে গিয়ে অপমান হতে গেলে রামদা? আমার দুইবাহুতে তো যথেষ্ট শক্তি আছে; তোমরা আছ, কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই।"

এমন সময় ম্লানমুখে কয়েকটী কিশোরবয়স্ক বালক তথায় উপস্থিত হইল; নারায়ণ তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া করুণস্বরে বলিল, "তোমরা কেন এসেছো ভাই? তোমাদের অভিভাবকেরা জান্‌তে পার্‌লে যারপরনাই লাঞ্ছিত হবে; আমার জন্য অনর্থক কেন অপমানিত হবে?" কিন্তু তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না দেখিয়া নারায়ণ আর বাধা দিল না। কৃষকগণ কাষ্ঠাদি বহন করিয়া পূর্ব্বেই শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল; নারায়ণ বালকগণের সাহায্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিল।

তখন কৃষ্ণবল্লভ সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সহসা নারায়ণকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় যেন একটা অসীম লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। অনেকদিন নারায়ণকে তিনি দেখেন নাই; শুভ্রবস্ত্রপরিহিত মূর্ত্তিমান বৈরাগ্য—ঐ না সেই নারায়ণ? তাহার জাগরণম্লান, উপবাস-ক্লিষ্টমুখখানি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণোজ্জ্বল রশ্মিধারায় অভিষিক্ত হইয়া কত করুণ দেখাইতেছে;—কৃষ্ণবল্লভের গতি স্তম্ভিত; দৃষ্টি নিষ্পলক হইল। তাঁহার ক্ষমতামদগর্ব্বিত দৃঢ়হৃদয় একটা অব্যক্ত বেদনায় টন টন করিয়া উঠিল—ইচ্ছা হইল মাতৃহারা নারায়ণকে বুকে করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করেন; কিন্তু বিহ্বলহৃদয় সংযত করিয়া চাহিয়া দেখেন, নারায়ণ বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। অশ্রুপূর্ণ লোচনে হতবুদ্ধির মত কৃষ্ণবল্লভ পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া পাগলের মত ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নারায়ণ দেখিল চারিদিকেই স্নেহময়ী জননীর স্মৃতিচিহ্ন! একটা অসীম ক্রন্দন তাহার হৃদয়ের সমস্ত শূন্যতা পূর্ণ করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় মর্ম্মবেদনায় মাতৃহারা নারায়ণ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার তো আর কেহ নাই। ক্ষণকালপরে আত্মসম্বরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে নারায়ণ চাহিয়া দেখিল, তাহার অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তিখানি—অধরপুটে কি উজ্জ্বল স্নেহসকরুণ হাস্য—চক্ষু দুটী যেন সমবেদনার গভীরতম অনুভূতিতে অশ্রুভারাক্রান্ত। দুঃখ, দৈন্য, বিপদ, নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে হঠাৎ যেন এক দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ-শুভ্রালোকের কল্যাণস্পর্শে নবীন প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া সে যুক্তকরে প্রার্থনা করিল, "এস হে প্রভু, এস হে আচার্য্য চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ; সৈনিককে কেবল আজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই।" তবে তাহাই হউক, আমার এ ক্ষুদ্র কর্ম্মময় জীবনের সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, বিপত্তি, ব্যর্থতার মধ্যে যেন তোমার মহতী মঙ্গলেচ্ছাকেই অনুসরণ করিতে পারি। "বহুরূপে" তোমার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য যেন এই সংসারের মধ্যেই কর্ম্মক্ষেত্রের অনুসন্ধান করি। "যেন প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও নির্ভয়ের সহিত বলিতে পারি,—

ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

পঞ্চামৃত

স্ত্রীলোক শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

যুদ্ধের সময়ে শিল্প সম্বন্ধে প্রধান চিন্তনীয় বিষয়গুলির মধ্যে পুরুষ শ্রমজীবীর স্থানে স্ত্রীলোক শ্রমজীবীদিগের প্রতিষ্ঠান হইতেছে একটী। স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যপ্রসারে এই একটি সুফল লক্ষিত হইতেছে যে কুসংস্কার মূলক বাধা বিপত্তি ও নিয়মকানুন গুলি ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোকদিগকে করিতে দেওয়া হয় নাই, সেই সব কার্য্যে তাহারা স্বতঃই নিযুক্ত হইয়া নিজেদের সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছে। জগতের সমস্ত স্থানে স্ত্রীলোকেরা শিল্পকার্য্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিতেছে। ইংলণ্ডে ১,২৫,০০০ স্ত্রীলোক পুরুষদিগের কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে জার্ম্মাণীতে কেবলমাত্র খনিজদ্রব্য ব্যবসায়ে নিযুক্তা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৬,০০০,০০০০ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইটালি এবং ফরাসী দেশে পুরুষদিগের স্থানে স্ত্রীলোকদিগকে নিযুক্ত করার চেষ্টা সমান ভাবেই চলিতেছে। আমেরিকাতেও স্ত্রীলোকদিগের জন্য অনেক উন্নতিশীল কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইতেছে। সেই সঙ্গে তাহাদের বেতনও বৃদ্ধি করা হইতেছে। তবুও অবস্থার এই পরিবর্ত্তন হইতে অনেক দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অত্যধিক ভার উত্তোলন ইত্যাদি অনেক কার্য্যে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যহানি করিতে পারে। রাত্রিতে কার্য্য ও অত্যধিক পরিশ্রম ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অনিষ্টকর; পুরুষোচিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইলে স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের জন্য এই তিনটি প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য :—সমান বেতন, উপরোক্ত অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগের স্বপক্ষে কতকগুলি আইন কানুন, এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা। সুপ্রশস্ত স্বাস্থ্যকর ভোজনগৃহ, স্বাস্থ্যোন্নতিমূলক ব্যবস্থা, শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত জনিত কতকগুলি রোগের আশু আবিষ্কার ও দূরীকরণ কল্পে অবৈতনিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও তাহাদিগের জন্য আবশ্যক।

শ্রীসুশীলকুমার বাগচী

বাবলা

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই, প্রধানতঃ পল্লীগ্রামে ময়দানের ধারে ধারে ও পোড়ো জমীতে এবং নদীর চরে বাবলাগাছ প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। শুষ্ক বালুময় জমীতেই ইহা বেশ সহজেই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারবর্ষের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বম্বে ও সিন্ধুদেশে ইহা প্রচুর জন্মে; পঞ্জাবে, অযোধ্যায়, বাঙ্গালায় ও মান্দ্রাজে ইহা অনেক জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

যদিও পোড়ো জমীতে বিনা যত্নে ও বিনা আবাদে বাবলা গাছ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু যদ্যপি এই গাছ হইতে উপকারী সামগ্রী পাইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে ইহাকে একটু যত্ন করিতে হইবে। বেলে-জমীতেই এইগাছ সহজেই ভাল হয়। পাথরবিশিষ্ট জমী, জলা জমীতে বা নামাল জমীতে ইহার আবাদ ভাল হয় না। বীজ পুতিয়া বাবলাগাছের চাষ করা হয়। বর্ষার পূর্ব্বেই ১০।১২ হাত অন্তর ইহার বীজ বপন করিতে হয়। বীজ হইতে ধীরে ধীরে অঙ্কুরোদ্গম হয়, কারণ বীজের ত্বক্ বড় কঠিন। সেই কারণে চৈত্রমাসে ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে গোময় মাখাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়; কেহ কেহ বীজ জলে ভিজাইয়া রাখে। কেহ কেহ বলেন যে, গরুতে ছাগলে বাবলার বীজ খাইয়া রোমন্থনকালে মুখ হইতে ফেলিয়া দিলে, সেই সকল বীজ তাহাদের খাদ্যকোষে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করে বলিয়া বীজের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হইতে দেখা যায়।

তিনবৎসর পরে গাছগুলিতে পুষ্পোদ্গম হয় ও ফল ধরে। কানপুরের একজন চর্ম্মকর্ম্মজ্ঞ বলেন যে, ৪।৬ বৎসরের গাছের ছাল হইতে চামড়া ট্যান্ করিবার উপযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। অতএব যদ্যপি চামড়া ট্যান্ করিবার উপযুক্ত পদার্থ পাইবার জন্য বাবলার আবাদ

করা হয়, তাহা হইলে ৪।৩ বৎসরেই গাছকে নষ্ট করা উচিত। কারণ গাছ বৃদ্ধ হইলেই এই পদার্থ কমিয়া আইসে।

এক বিঘা জমীতে বাবলার চাষ করিতে হইলে ১০ বৎসরের জমীর খাজনা ও চাষের ব্যয় ধরিলে ৮৫৲ টাকা পড়ে; কিন্তু এই সময়ের পর কেবল কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা ৮৫৭৲ টাকা লাভ হয়। কাষ্ঠ হিসাবে একটী পূর্ণ বর্দ্ধিত গাছের (২০ বৎসরের) বাঙ্গালায় দাম ৪৲ টাকা হইতে পারে। কিন্তু কানপুরের নিকট স্থানে একটী বাবলাগাছ ৬ বৎসর পরে ৩৲ টাকায় বিক্রয় হয়। রাজপুতনায় এক একটী গাছ ১৫৲ টাকায় বিক্রয় হয়। যাহা হউক, ভাল জমিতে এই গাছ জন্মাইতে পারিলে ইহা বেশ বড় হইবে এবং ইন্ধনকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কড়ির কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া, যদি অল্প খাজনায় পোড়ো ও বালিযুক্ত উচ্চজমি পাওয়া যায়, যদি ছাল বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করা হয়, এবং তাহার উপর যদি জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব থাকে, তবে বাবলাগাছের আবাদ করিয়া গরীব চাষারা দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া বাবলাগাছ হইতে আরও কয়েকটী প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ পাওয়া যায়, আমরা একে একে তাহার বিবরণ দিতেছি।—"কৃষিসম্পদ"

পুস্তক সমালোচনা

দেবজন্ম।

সাধক বলেন মানুষ প্রবৃত্তির দাস। জীব ও মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষ প্রবৃত্তির সমষ্টি। সাধকবলেন, প্রবৃত্তির আবেগময় স্রোত মানুষের জীবনকে পরসত্যের গোমুখী ধারা হইতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই স্রোত বন্ধ কর; এই স্রোতের মুখে উজান বহিয়া যাও, শঙ্করের জটামুক্তা ভাগীরথী জীবনকে শিবময়, রুদ্রের উত্তাল উচ্ছাসময়, ভৈরবের ভীষণমধুর আনন্দে মুখর করিয়া তুলিবে। জীববিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বলেন, মানুষের জীবনে প্রবৃত্তি-মালার সম্মিলন, বাসনার মিলন সংঘর্ষ ভিন্ন কিছুই নাই। প্রবৃত্তির নিরোধে জীবনেরই নিরোধ। কাজেই, প্রাণের স্রোতের উজান বহিয়া মানুষ কিরূপে অমৃতে পৌছিবে কিরূপে আনন্দ লাভকরিবে? দুইটী চিন্তার মধ্যে এই অনৈক্য ও বিরোধ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

দেখা যাউক প্রবৃত্তি বলিতে আমরা কি বুঝি। প্রকৃতিদেবী চারিপাশের ঘটনা নিচয় দ্বারা নিরন্তরই জীবের জীবনস্রোতে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। জীবও সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রাণের প্রবাহকে গতিময় রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। কাজেই, বলা চলে যে জীবের সঙ্গে পৃথিবীতে জড় প্রকৃতির একটা খেলা চলিতেছে। প্রকৃতি একভাবে ঘুঁটী চালিতেছেন, জীব আবার আর একভাবে তাহার উত্তর দিতেছে। এখেলা দুজনের কাছেই পুরানো; দুজনেই অনন্ত কাল যেন একই খেলায় আনন্দ পাইতেছেন দুজনেরই চাল ও তাহার পাল্টা জবাব এক ধাঁচে বাঁধা হইয়া গিয়াছে। এখন, জীবের বিশেষতঃ উচ্চস্তরের জীবের, এই ধরাবাধা পাল্টা চালগুলিই প্রবৃত্তি।

উপমা ও রূপক ছাড়িয়া বলিতে হইলে বিষয়টী এইরূপ দাঁড়ায়। পরিপার্শ্ব (Environment) জীবের উপর নিরন্তরই আঘাত করিতেছে। জীব ও নিজের সত্তা বজায় রাখিবার নিমিত্ত প্রতিক্রিয়া করিতে বাধ্য—না করিলে তাহাকে জগৎ হইতে অপসৃত হইতে হইবে। জীব এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কাজেই কতকগুলি ধরা বাঁধা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। পরিপার্শ্বের আক্রমণের প্রত্যুত্তর সচরাচর এই পথ দিয়াই প্রেরিত হয়।

একটা উদাহরণ দেখা যাউক। সকল জীবই আহারান্বেষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর আহারান্বেষণ প্রণালী স্বতন্ত্র। একই প্রবৃত্তি জীবের দৈহিক ও মানসিক গঠন অনুসারে পৃথক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আহার অন্বেষণ রূপ যে একটা প্রতিক্রিয়া সেটা সকল জীবেই বর্ত্তমান আছে।

আজ কালকার মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষের মন এই প্রবৃত্তি নিচয়ের ঘাত প্রতিঘাতের ফল। যতক্ষণ প্রবৃত্তি বিশেষ নির্ব্বিবাদে চরিতার্থতা লাভ করে, ততক্ষণ তাহার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা আসে না। কিন্তু যখনই প্রতিদ্বন্দী বা বাধা সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই উভয়ের সংঘর্ষ মিটাইবার নিমিত্ত বিচার ও বিবেচনার আবশ্যক হয়। এই প্রকারের সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই মনের বিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথে আলোক বিস্তার করিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। প্রবৃত্তির আশ্রয়েই মনের নিবাস। কাজেই মনোবিজ্ঞানের মতে প্রবৃত্তির নিরোধে মনেরও নিরোধ, প্রাণেরও নিরোধ। সাধক যে পথে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা বাসনার শ্মশান ভূমির পথ। সেখানে চিতা-ভস্মে যদি জীবন কখনও নূতন করিয়া ফুলে ফলে সাজিয়া ওঠে তবে তাহা আমাদের অগোচরই থাকিবে। সে ফলের রস, সে ফুলের গন্ধ কখনও এজগতে তৃপ্তিদান করিবেনা।

আমরা যে পুস্তকখানির সমালোচনা করিব বলিয়া এই সকল অবান্তর কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার উদ্দেশ্য—একটী অভিনব সাধনার পথ নির্দ্দেশ করা। এই সাধনায় প্রবৃত্তির নিরোধ নাই অথচ প্রাণের তৃপ্তিহয়, স্বরাট্ লাভহয় এপথ দিয়া চলিলে জীবনগতির বেগ মন্দীভূত হয় না; প্রাণে নূতন শক্তি বহিয়া আসে। এদিকে চক্ষু ফিরাইলে এক ফুৎকারে সংসারের ভোগের আলো নিবিয়া যায় না; কেবল নূতন রাগে, নূতন যৌবনে পূত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কাজেই এ পথের পথিক এ সংসারে থাকিয়াই নূতন করিয়া জন্ম লাভ করিল; জৈববিবর্ত্তনের মধ্যেই তাঁহার দেহে অলৌকিক প্রাণের প্রতিষ্ঠা হয়। এই নূতন দেবজন্ম।

সাধনার পথ ধরিয়া না চলিলে তাহার রহস্য, তাহার মর্ম্ম বোধগম্য হয় না। সাধক কর্ম্মী; কর্ম্মের মর্ম্মের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করেন। কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—এ নূতন পথে কিরূপে চলিতে হয়? কি করিলে দেবত্বের আলো নরজীবনে ফুটিয়া ওঠে? শেষের সন্ধান না পাইলে পথ সংশয়বহুল হইয়া পড়ে। কাজেই যে শক্তিদ্বারা সাধক শক্তিময় হইবেন, যে আনন্দে মর্ত্ত্যভূমিকে পুষ্পিত করিবে তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস, গভীর ভরসা স্থাপন করিতে হইবে। এই হইতেছে প্রথম কথা স্বর্গের গান যাহাতে জীবনের মধ্যে সুরেলয়ে বাজিয়া ওঠে তাহার জন্য মনের রূপ তন্ত্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। তাহার উপায় চিন্তায় শমতা; ভাবে শমতা। মনের বিক্ষিপ্ত ও আত্ম-বিরোধী চিন্তাস্রোতের উদ্দাম ভাবের মধ্যে শান্তি আনাই শমতা। সুরে সুরে বাঁধা তারের মধ্যে একটী বাজিলেই আর একটীও বাজিয়া ওঠে। আমাদের মনের তারকে তাই দেবতার বীণার তারের সঙ্গে মিলাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের ভাবরাশি ও স্থির গম্ভীর অথচ উচ্ছ্বাস-উদ্বেল হইয়া উঠিবে। প্রাণ শক্তিময় হইবে।

এইরূপে সুদূরের অলৌকিক তেজ আমাদের জীবনে আসিয়া মিশিবে। দেবলোকের পূত অগ্নির হবি-গন্ধে আমাদের প্রবৃত্তি নিচয় সুরভিত হইয়া উঠিবে। মানুষ সংসারের একস্তর ঊর্দ্ধে থাকিয়া বিরাটজগতের বিরাট লীলামোদে মত্ত হইবে। এই হইতেছে সাধনা; এই হইতেছে দেবজন্ম।

এ পথ আমাদের দেশে নূতন নহে। বৈষ্ণব ভক্ত, তান্ত্রিক সাধক সকলেই এই ভাবের ভাবুক। অথচ এই পুরাতন কথাও লেখকের অনুপ্রাণনাবশে বেগময়ী, বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ লেখক নিজের অনুভূতির কথা কহিয়াছেন; নিজের দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে আমাদের সামনে মূর্ত্ত করিয়া দিয়াছেন। তাই তিনি বলিতে পারিতেছেন "ইহলোকে এই স্থূল জগতেই আমরা রহিব। যাহা কিছু উপলব্ধি করিবার, যাহা কিছু প্রতিষ্ঠিত করিবার, জীবনের মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিব, জীবনের অতীত হইয়া নহে। বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা প্রয়াস উৎসর্গ করিয়াছিলেন—দেবায় জন্মনে। এই দেবজন্ম লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য; দেবতার সত্তা দিয়া আমাদের সত্তার প্রতি স্তর সম্পূর্ণ করিয়া গড়িব,

দেবতার জীবন দিয়া জীবনের প্রতি অঙ্গ অমৃতময় করিয়া তুলিব।"

"সাধকের নিজের শক্তি নিজের অধ্যবসায় দ্বারা নিজের অতীত একশক্তি, নিজের নিগূঢ় এক প্রেরণাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃতি উপরে রহিয়াছেন যে পুরুষোত্তম তাঁহার যন্ত্রভূত হইবে, সাধক সাধকের শক্তির মধ্যে তাহারই ইচ্ছাশক্তি খেলিতে থাকিবে। ইহাতে সাধকের বাহ্য চেষ্টার যে হ্রাস হইবে তাহা নহে, পাহাড় গহ্বর সমতল হইয়া আমাদের জন্য যে কণ্টক বিহীন পুষ্পবিকীর্ণ সুরম্য রাজমার্গ উন্মুক্ত করিয়া দিবে তাহাও নয়। সংগ্রাম করিতেই হইবে, ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিবে, পদতলে রক্তবিন্দু ক্ষরিবে কিন্তু ক্লেশ রহিবে না। কারণ তখন আমরা জানিব আমাদের শ্রম বিফল নহে—ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? তখন স্থির নিশ্চিত, গন্তব্যস্থান আমাদের আয়ত্তাধীন, অমৃতের পুত্র আমরা, দিব্যধাম আমাদের সম্মুখভাগে।"

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দীপালি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত প্রণীত একখানি গল্প পুস্তক মূল্য ॥০ আনা মাত্র। প্রসন্ন লাইব্রেরী পাটুয়াটুলী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।

শ্রদ্ধেয় প্রিয়কান্ত বাবুর অনেক গল্প আমরা বাঙ্গলা মাসিকে পড়িয়াছি। সেইগুলি একত্র করিয়া এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করা হইয়াছে।

আমরা শ্রীযুক্ত জলধর বাবুর কথাতেই বলি—"বইখানির নামকরণ ঠিক হয় নাই"..........করুণ কাহিনী পূর্ণ গল্প পুস্তকের নাম আর যাই হউক 'দীপালি' হওয়া ভাল দেখায় না—

একই ধরণের অনেকগুলি গল্প একসঙ্গে থাকায় একটা একঘেয়ে (Monotony) ভাব গল্পের আর্টকে সুন্দর হইয়া ফুটিতে দেয় নাই। 'অঞ্জলি' 'বিধবার' ছেলে প্রভৃতি কয়েকটী গল্প আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার রচনা প্রণালী বেশ মধুর—বর্ত্তমান জীবন-সমস্যার দিক দিয়া তাঁহার গল্পকে সার্থক হইতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

বইখানির আর একটী বিশেষ ত্রুটী আমাদিগকে হতাশ করিয়াছে পুস্তকে এত মুদ্রাকর প্রমাদ হওয়া কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্রাহ্মণ-বংশ-বৃত্তান্ত।

কবিরাজ ৺শরচ্চন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) রায় প্রণীত সুবর্ণপুর নদীয়া—মৃত্যুঞ্জয় ঔষধালয় হইতে শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকের নামই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করিতেছে। বহু অনুসন্ধান অধ্যবসায় ও পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থকার এইরূপ একখানি মূল্যবান পুস্তকে ব্রাহ্মণ জাতির অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা ও যথায় মিমাংসা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ পুস্তক প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পরিবারে এবং প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পাঠাগারে থাক উচিৎ।

পদ্মপা

স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়,
উপাসনা সমিতিকর্ত্তক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সূচীপত্র

ভাদ্র—১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ—ছাত্রগণের জন্য স্বল্পমূল্যে উপাসনা বিতরণ করা হইবে। সত্বর নাম রেজেষ্টারী করুন—অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিব। পুরাতন উপাসনা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gauranga Press,

71/1 Mirzapur St. Calcutta.

Published by Pulin Behary Dass,

11, College Square, Calcutta.

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষশয়নের সাগর-সৈকত।

১৫শ বর্ষ } ভাদ্র—১৩২৬ ৫ম সংখ্যা।

আলোচনী

হিন্দু এবং দ্রাবিড়ী লৌকিক ধর্ম্ম

দেব দেবতার কল্পনা সৃষ্টি ও সংমিশ্রণ ভারতবর্ষ জুড়িয়া সেই বহু অতীত কাল হইতে চলিয়াছে ও চলিতেছে। দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতের কিয়দংশ যেমন ভূবিদ্যা অনুসারে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মৃত্তিকা-ভিত্তি বলিয়া খ্যাত, কিন্তু তাহার উপর পলি পড়িয়া পড়িয়া যেমন স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে এবং গাছগাছড়া, বনজঙ্গল, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত-মালা গ্রাম সহর ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে সেরূপ মানুষের স্বাভাবিক-ভীতি কৌতূহল ও আশ্চর্য্যবোধের সেই বিরাট ভিত্তির উপর নানা ভাব, কল্পনা, দর্শনের স্তর পর পর উঠিয়া এক সর্ব্বভুক্ সর্ব্বতোমুখী, সর্ব্বাধার হিন্দুত্বের সৃষ্টি করিয়াছে। বেদের সেই ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষৎ বেদান্তের সেই পরম এক ব্রহ্ম, মহাযান বুদ্ধতন্ত্রের তারা পুরাণের বিষ্ণু ও শিব ও অসংখ্য দেবদেবী, মুসলমানদের একেশ্বরবাদ ও পীর ফকির পূজা অথবা সুফীগণের প্রেম ও ভক্তিতত্ত্ব, লিঙ্গ ও শালগ্রাম পূজা, গাছগাছড়া, পুতুল পাথর, জীব নদ নদী এত এই সজীব হিন্দুত্বে মিলিয়াছে ও মিশিয়াছে! যে ভারতীয় সভ্যতার ধারার মত কোন একটীর বিকাশ ও পরিণতি নির্ণয় করা অসাধ্য। আর এই মিশ্রণের সর্ব্বাপেক্ষা মূলতত্ত্ব এই যে দ্রাবিড়ী বন-জঙ্গল, নদী, পর্ব্বত, ঘাট, মাঠে, গোষ্ঠী ও গ্রামের দেবতা ও বৈদিক, দেবতা যে কখন পরস্পরের হাত ধরিয়া শেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে বা স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে দেখা গিয়াছে তাহা অনধিগম্য।

তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞানের অতি সুন্দর ক্ষেত্র এই ভারতভূমি, কারণ সভ্যতার নানা স্তরের সহিত এমন জীবন্ত পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।

তুলনা-মূলক ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনারও এমন ক্ষেত্র আর নাই। পাথর-পূজা হইতে ষট্চক্র ভেদ, পশু-পূজা হইতে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান পর্য্যন্ত এমন বিচিত্র স্তরের বিচিত্র জাতি ও সভ্যতার ধর্ম্মানুষ্ঠান যে হিন্দুর লৌকিক

ধর্ম্ম ও লোকাচারে মিশিয়া রহিয়াছে তাহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। একটী বিশিষ্ট সূত্রকে এই জটিল ও রঙীন আচ্ছাদন-বস্ত্র হইতে টানিয়া বাহির করা ও তাহার বিশ্লেষণ করা তুলনা-মূলক ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কাজ। ধর্ম্মের এই আচ্ছাদন বস্ত্রেরও দুইটী মূল সূত্র টানা ও পরেন—প্রকৃতির সহিত বিরোধের পরিবর্ত্তে একটা জীবন্ত ঐক্যানুভূতি ও মানুষের বিচিত্র সম্বন্ধ হইতে অনন্তবোধের রসানুভূতি। ভারতবর্ষের বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঐক্য এইখানে, তুরীয় বোধ ও সেই পরম একমেবাদ্বিতীয়ের জ্ঞান এই দুইটিকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছে। আমাদের এই 'নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণতল' ও 'অম্বরচুম্বিত ভাল, হিমাচল দেশে,—বহুত্বাম এই জ্ঞানটাও কেমন এই বিচিত্র মানুষ জাতি ও সভ্যতা বাহুল্যের সহিত সুন্দর খাপ খাইয়াছে। কারণ এই বহুত্বাম-জ্ঞান বিরোধের পরিবর্ত্তে সামঞ্জস্য, বর্জ্জনের পরিবর্ত্তে গ্রহণ অনাদরের পরিবর্ত্তে মিশ্রণের উৎসাহ দিয়াছে।

দ্রাবিড়ী স্ত্রী-প্রধান সমাজে কুমারী ও মাতার যে বিশেষ সম্ভ্রম এবং তাহাদের যে বিশেষ পদ ও অধিকার তাহাই এই কন্যকা পূজায় প্রতিফলিত হইয়াছে। গোষ্ঠী বা কুলের প্রধান যেখানে নারী, এবং যেখানে বিবাহবন্ধনের অস্বীকার ও ব্যতিক্রমে নারীর মর্য্যাদাহানি হয় নাই,সেখানে উত্তর ভারতের জগদ্ধাত্রী, জগদম্বা বা গণেশজননী অপেক্ষা চিরকুমারী কন্যকা, গৌরী বা পার্ব্বতী পূজাই স্বাভাবিক। পুরুষ-প্রধান কুলে, সমাজে ও ধর্ম্মে মাতৃত্ব ও স্ত্রী-প্রধান সমাজে ও শাস্ত্রে নারীত্বের গৌরব। কুল, গোষ্ঠী ও সমাজের. বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করিয়া যে কুমারিকা পূজা বিশিষ্ট পরিবার জীবন ও যৌবন সম্বন্ধ ও আদর্শের আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহা দাক্ষিণাত্যের কৃষক-গণের—যেমন আন্ধ্রা শিল্পী, ব্যবসায়ী ও বৈশ্যগণের সেরূপ কন্যকা। সমগ্র দক্ষিণ প্রদেশে যাহা কিছু তাহাদের শুভ কর্ম্ম বা দান অনুষ্ঠিত হয়, ধর্ম্মশালা ও মন্দির-নির্ম্মাণ ও সংস্কার, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, স্নানমণ্ডপ বা পাণ্ডল (জলছত্র) বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং অন্যান্য প্রায় যাবতীয় দানানুষ্ঠানেরই যে গুরুভার এই বৈশ্যসমাজ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছে —তাহা সবই কন্যকা কামাক্ষীর নামে উৎসর্গীকৃত। গ্রামে গ্রামে এই বিরাট বৈশ্যসমাজ নানা শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া স্বগোষ্ঠী জাতি ও সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য কন্যকা পরমেশ্বরীর নামে কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছে এবং আজও চালাইতেছে তাহা আমি ভারতীয় গ্রাম্যসমাজ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার সময় কিছু বলিব। কন্যাকার উদ্ভব সম্বন্ধে দ্রাবিড়ী প্রবাদ আছে যে বহুকাল পূর্ব্বে একবার কোমাতি, (ইহারা হইতেছেন দাক্ষিণাত্যের বৈশ্যসম্প্রদায়) ও ম্লেচ্ছদিগের সহিত একবার ঘোরতর সংগ্রাম বাধে। কোমাতিগণ পার্ব্বতীকে আবাহন করিলে তিনি কোমাতি কন্যারূপে জন্মগ্রহন করেন। ম্লেচ্ছরা ঐ কোমাতি কন্যাকে বিবাহার্থে দাবী করায় যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তাহারা একবারে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু শত্রু বিজয়ের পর কন্যার সতীত্ব সম্বন্ধে কোমাতিগণ সন্দেহ করাতে তিনি অগ্নি প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হন। সেই হইতে কোমাতিগণ কন্যাকে পূজা করিতেছেন।

স্বর্গের দেবতাগণ সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। যক্ষ কিন্নরগণের প্রসাদ বিতরণের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু অসময়ে গভীর নিশীথে হঠাৎ সূর্য্যোদয় হইল। হাতের মালা হাতেই রহিল, বিবাহ হইল না, কারণ মানুষের দৃষ্টিনিক্ষেপ দেবতাগণ সহ্য করিবেন না, দেবসভা ভঙ্গ হইল। লজ্জায়, ক্ষোভে মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। হৃদয়বল্লভের সহিত অনন্তকালের মিলনের পূর্ব্বেই চিরবিচ্ছেদ ঘটিল। বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে যিনি পরিত্যক্ত তাঁহার নিদারুণ অবস্থা দর্শনে অমরবৃন্দের মুখে বিদ্রূপের কুটিল হাসি। তাই কুমারী ঘৃণায় ও ক্রোধে কঠিন ব্রত গ্রহণ করিলেন।

তাই পঞ্জাব হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত রাজধানী অথবা পল্লীপথে—বৃক্ষান্তরালে অথবা জলাশয় পার্শ্বে—শস্য ক্ষেত্রে অথবা গ্রামাভ্যন্তরে, যে স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি তন্তুবায় ও কর্ম্মকার ব্যস্ত—সেই সেই স্থানে, দেব দেবীর মূর্ত্তি স্থান বিশেষে সেই অদ্বিতীয়ের বিভিন্ন প্রকাশে বিভিন্ন রকমে আমাদের ধর্ম্মের বহু শাখা প্রশাখার মূল যে এক, তাহাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতেছে। উত্তরাংশের লোক যখন দক্ষিণে যাইয়া দেখে মহীশূর, তানযোর,

তিনেভেলীর গ্রামে গ্রামে তাহারই চির-পরিচিতা ভদ্রকালী, ভগবতী, চামুণ্ডা কালী ও সপ্তমাতৃকামূর্ত্তি, তখন তাহার কি বিস্ময়! পার্থক্য এই যে উত্তরে—আত্মা-শক্তির পূজা, উপনিষদ্ আর বেদান্তের বিশুদ্ধভাবানুযায়ী পরিশুদ্ধ ও সংমার্জ্জিত, আর দক্ষিণে শক্তি পূজার দার্শনিক ভিত্তি তত সুদৃঢ় নহে এবং যন্ত্র তন্ত্রমন্ত্রের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যে শক্তিপূজা ব্রাহ্মণেতর জাতির ভাব ও আদর্শে অধিকতর নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং নিম্নস্তবের যাদুগিরি ও ইন্দ্রজালের সংস্পর্শে দুষ্ট। কিন্তু, কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর কোনও আচার্য্য বা গুরু শক্তিপূজার বিশুদ্ধি ও বিকাশের আয়োজন করিবেন; এই ধর্ম্মবিপ্লব, কেবল আধ্যাত্মিক জগতে এক শুষ্ক আনুষ্ঠানিক ও স্মৃতিমূলক একেশ্বরবাদ হইতে প্রকৃতি ও জীবনের বহুমুখীনতার সম্যক জ্ঞানের পরিনতিতেই শেষ না হইয়া, কেবল দেবতার শোভাযাত্রার রথের, কৃত্রিম অনুষ্ঠানাদির ও তুচ্ছবাদানুবাদের পঙ্ক হইতে উদ্ধারেই সীমাবদ্ধ না হইয়া—ইহা সমাজবিপ্লবে পরিণত হইতে পারে। তাহাতে নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি, সমাজের আধ্যাত্মিক স্রোত প্রবলতর করিতে সাহায্য করিবে। ভারতের যাবতীয় জীবনে আচারের বৈচিত্র্যের মধ্যে ধর্ম্মের মূল যে এক, ইহাতে তাহাই সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে। মানুষের সহিত প্রকৃতির ঐক্যানুভূতি ও মানুষের সম্বন্ধ হইতে অনন্তবোধের রস সঞ্চারে যে কত উচ্চস্তরে পৌঁছাইতে পারে তাহাই কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়।

কুমারিকা অন্তরীপের দক্ষিণতম প্রদেশে, শিলাময় এক ক্ষুদ্রদ্বীপ—ঠিক যেন কুমারীর চরণযুগল এখনও মহাসাগর সঙ্গমের দ্বারা প্রক্ষালিত। জনশ্রুতি এই যে, সাগরের বিস্তার হেতু, দেবীর শিলাময় দ্বীপে আদিনিবাস দুর্গম হওয়াতে তিনি অধুনা তীরস্থ মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন।

এই স্থানে নীল-সিন্ধু-জলধৌত দেবীচরণে উপবিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃই উত্তরস্থ তুষারাবৃত হিমাচলের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধা পার্ব্বতীর কল্পনাচিত্র পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। ভারতীয় মহাসমুদ্রের সতত-চূর্ণ-তরঙ্গমালা যে অনন্তের সুর অবিরত জাগাইয়া রাখিতেছে—কুটিল প্রবাহিণী—সরযূ যমুনা, গোদাবরী ও কাবেরীর কলধ্বনিতে যে সুর সদাই জাগরূক তাহাই আমাদের প্রকৃতির আহ্বান। চক্ষেও তাঁহার অনন্তের আলোক দীপ্তি। দুর্গম পর্ব্বতকন্দরে, তালিরাজি পরিবৃত সরোবরে, সাগর বেলায় কিংবা মরু-প্রান্তরে, যে যে স্থানে তাঁহার কমনীয়তা বা কঠোরতা কোন বিশেষরূপে প্রতিভাত—সেই সেই স্থানই আমাদের পবিত্র তীর্থভূমি। সীমার মধ্যে অসীমের যে অভিব্যক্তি, তাহারই বাণী নানাভাবে, নানারূপে প্রকৃতি আমাদিগকে শুনাইতেছেন! তীর, সমুদ্র, উপত্যকার বিভিন্ন সৌন্দর্য্যে, স্থানীয় বহুবিধ মূর্ত্তিপূজার প্রকৃতির এই বাণী ঘোষিত হইতেছে।

কুমারিকা অন্তরীপে গৌরীচরণচুম্বী-তীর-সংক্ষুব্ধ বীচিমালা, অনন্ত-প্রসারিত মহাসাগর, তিনেভেলী ও ত্রিবাংকুরের শ্যামল বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র ও দিগন্তবিলীন অনুধাট পর্ব্বতমালা দর্শনে দ্রাবিড়ীগণের মানসপটে কি এক অভিনব চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছিল। এই প্রকৃতি উর্ব্বর গঙ্গা-যমুনাতটের অন্নদাত্রী মাতা অন্নপূর্ণা নহেন—তিনি পঞ্জাবের গিরিকান্তারে জ্বালামুখীর সংহারিণী নহেন—তাঁহার লেলিহান রসনা সংসারকে দাহন করে না—এই স্থানে তিনি কুমারী গৌরী-কঠোর-তপশ্চারিণী—মহা সন্ন্যাসী মহাদেবের তুষ্টি সাধন-নিরতা।

প্রাচীন ভারতের উপনিবেশস্থাপনকারী দ্রাবিড়ীগণের কল্পনাশক্তি যেমন মনোহর তাঁহাদের সত্যের উপলব্ধি তত গভীর। পরিজ্ঞাত ভারতখণ্ডের এই দক্ষিণতম অংশে বসিয়া—নূতন নূতন দেশাবিষ্কারের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে তাহারা এই স্বীয় লীলায়িতভঙ্গী বিভোরা—প্রবাল মুক্তাসার লইয়া খেলায় আত্মহারা এই চিরকুমারীর মূর্ত্তি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইস্থানে বিহার অপেক্ষা তপস্যার ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে, কারণ দ্রাবিড়ী লোকপরম্পরায় কথিত আছে যে, গৌরীর এই পবিত্রক্ষেত্রে মহাদেবের সহিত শুভ-বিবাহের আয়োজন সব হইয়াছিল।

তাই বিবাহমন্দিরের 'গোপুরম' এখনও সমাপ্ত হয় নাই—তাহার চারিটী স্তম্ভ অসমাপ্ত—কারুকার্য্যহীন—নির্জ্জনে অদূরে প্রেতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া অমুদযাপিত ব্রতের করুণ সাক্ষ্য দিতেছে। কুমারীর অভিশাপে পিষ্টক ও

পরমায় পাত্র পাষাণে পরিণত হইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। আজও ভারতের শিল্পের প্রাসাদ অসম্পূর্ণ—আর বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে যে পাত্রে আমাদের মানস নৈবেদ্যের পরিপাক হইত—তাহা পাষাণে পরিণত। অন্ন আজ বালুকাতে পরিণত—তাই সমুদ্রযাত্রীগণ, এখনও সাগরবারিতে বালুকার অঞ্জলি প্রদান করে—ইহাই বর্ত্তমান ভারতের বিশ্বমানব-সাগর অর্চ্চনায়—অর্ঘ্য ও নৈবেদ্যের পরিবর্ত্তে দীন বিনিময়। প্রতি প্রাতে ও অপরাহ্নে কুমারী যাত্রীদের এই দৃশ্য দেখিতেছেন—তাঁহার এই অন্তর যাতনা পর্ব্বত-প্রতিঘাত হইয়া দিকচক্রবালে ও সাগরকল্লোলে মিশিয়া গিয়াছে। আর্য্য, শক, হুন, মঙ্গল, মোগল কত নূতন জাতি, ধর্ম্ম ও সভ্যতা আসিল, আবার বিলীন হইয়া গেল, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য তিনি কি অভ্যুদয়াপিত ব্রতের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন?

কত দীর্ঘ দিবস ও ক্লান্তিসুপ্তরজনী তিনি তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট শিবসুন্দরের নিমিত্ত রোদনে অতিবাহিত করিয়াছেন। কত বর্ষ—ব্রতসিদ্ধির আশায় করগণনা করিয়াছেন—তিনি নিশ্চিতই আসিবেন—আর কতদিন প্রিয়তমাকে ভীষণবাত্যা ও তুফানসংকুল এই পর্ব্বত সমাকীর্ণ সাগরবেলায় দুর্ভেদ্যবনরাজির অভ্যন্তরে নির্জ্জন নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করাইবেন? তিনি নিশ্চিতই আসিবেন।

নিশি সমাগমে যখন অতীত বিবাহনিশির সুখস্মরণে কুমারীর তরুণ হৃদয় উদ্বেল উদ্দাম হইয়া উঠে, তখন সমুদ্র সর্ব্বগ্রাসী হয়, প্রচণ্ড গর্জ্জন করিতে থাকে—তালি বনরাজি তখন বেদনায় শিহরিয়া মর্ম্মরিয়া উঠে। মানুষ তখন ভাবে, কুমারীদেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছেন। শেষে যদি দেবী নিজকে সংযতা করিতে না পারিয়া সাগর-বারিতে প্রাণ দেন—এই ভয়ে ভীত পুরোহিতবৃন্দ মন্দিরের সাগরমুখী পূর্ব্বদ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

বহুকাল তিনি অপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়াছেন। আশা আর উন্মাদনা, হর্ষ আর সংযমের আবেশে—'তিনি নিশ্চিতই আসিবেন' এই চিন্তায় তবুও তিনি আপনাকে শান্ত করেন। তাই উদাস প্রভাতের ঈষৎ গৈরিক আলোকে লোহিত বেলাভূমির কষায়বস্ত্র-পরিহিতা, ধূসরপর্ব্বতশ্রেণীর কেশরাজিযুক্তা, শান্ত সাগরবারির সাশ্রুনয়না, তপস্বিনী মূর্ত্তি। রাত্রির দুর্য্যোগের পর প্রভাতের শান্তি আসে, প্রভাতে দ্রাবিড়ীগণ তাঁহাকে পূজা করে তপস্বিনী মূর্ত্তিতে, মধ্যাহ্নে পূজা করে প্রকৃতির দীপ্ত ক্রমপরিস্ফুটতার মধ্যে ঐশ্বর্য্যব্যসনে লিপ্ত ভোগ মূর্ত্তিতে, সন্ধ্যার মোহন সমাগমে প্রকৃতির অলস আবেশের মধ্যে চম্পক চন্দনের আকুল মিশ্রিত সৌরভে অভিসারিকা মূর্ত্তিতে। আবার বিষাদময় গভীর নিশীথে যখন সমুদ্রের ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ গর্জ্জন তালিবনশ্রেণীর নিঃসহায় হাহাকার ও ঘুর্ণীবায়ুর নিষ্ফল আস্ফালনের সহিত সুর মিলাইয়া একটা গভীর হতাশাব্যঞ্জক ঐক্যতান সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত থাকে তখন চারিদিকের সেই প্রহেলিকার পর্ব্বতের মধ্যে ভক্ত পূজারীগণ কুমারীর উদ্ভ্রান্ত ও ব্যথানিপীড়িত মূর্ত্তির দিকে বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকে। দিনের পর দিন প্রকৃতির এই পর্য্যায়রূপে ভাববিবর্ত্তনে মানব প্রেমের প্রতীক্ষা, মিলন ও বিরহের সেই চিরন্তন ছবি মানব জীবনের সেই চিরন্তন tragedy প্রতিভাত। বিদ্রোহের পর যেমন সংযম আসে, নিশিবিচ্ছেদ যাতনার পর তাঁহার সংযম ও সাধনা।, এ সাধনা কি চিরকালের? তাহা জানেন কেবল তাঁহার নির্দ্দয় প্রেমাস্পদ, যিনি কুমারীর সৌন্দর্য্যগর্ব্ব কালেরও ইতিবৃত্তের প্রবল ঘাতপ্রতিঘাতে নষ্ট করিয়াছেন—তিনিই ইহা জানেন।

ধনুস্কোটী কন্যাকুমারিকা অপেক্ষা অধিকতর মনোরম পুলকস্মৃতিময় সমরজয়গাথাপূর্ণ ধনুস্কোটী আর এক রমণীর দীর্ঘ যাতনা ও শোকগাথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতের মূর্ত্তিমান শান্তি ও সদাচারব্রত নৃপতি এইস্থানে বাণাঘাতে সাগরকে পরাজিত করেন—তাই এখানে সাগর সরোবরসম শান্ত এবং স্থির।

কিন্তু কন্যাকুমারী অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও উন্মাদন। এই অপূর্ণ-বাসনা আর হৃতধন দেশের পর্ব্বতশোভিত ঝটিকাক্ষুব্ধ সাগরবেলায়—তপ্ত বালুকারাশিবিদ্ধ ভগ্নমন্দিরাভ্যন্তরে এবং অসংখ্য তালিরাজিশাখাকৃত কর্কশধ্বনির মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত। আশা যাহার বিঘ্ন, বিফলতা যাহার সম্বল—যাহার সান্ত্বনা কেবল নিরাশা—সে এইস্থানে আসুক, এই পরিত্যক্তা নিরাশাবিষপায়িনী—

চিরকুমারীর—ফেনিলোচ্ছাসধৌত চরণতলে ক্ষণিকের নিমিত্ত বিশ্রামনিদ্রা লাভ করুক,—তাহার ক্ষুদ্রোদ্দামবক্ষে আশ্রয় মাগিলে চিরশান্তি ও স্বকাম লাভ হইবে। কারণ যে ব্যক্তি—উত্তালতরঙ্গময় সাগরকল্লোল এবং উন্মত্তঝটিকা-মধ্যে আলুলায়িতকুন্তলা বিরহবিধুরা মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, আবার পরদিবস প্রাতে গৈরিকবসনাবৃতা কুমারীকে আর এক দিবসের তপস্যার নিমিত্ত—আর এক আশাধূসর সন্ধ্যা যাপনের নিমিত্ত—আর এক বিচ্ছেদবেদনাময় নিশিজাগরণের নিমিত্ত তপস্বিণীর বেশে দেখিবে তাহার সকল নিরাশা দূরীভূত হইবে—এক অভিনব বিশ্বাসের এবং অভিনব সংযমের উদ্দীপনার উদ্বেল আনন্দে।

যিনি সত্য শিবসুন্দর তাঁহার সহিত আমার প্রকৃতির চিরমিলন যতদিন না হয় ততদিন তাহারি মতন আমাদেরও কত অমাবস্যার বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইবে, হৃদয়ে ত্রিসমুদ্রতরঙ্গমালার ভাববিভঙ্গ ধারণ করিতে হইবে,—শুধু শিবসুন্দরের আশাপথ চাহিয়া। দেখিনা কি প্রকৃতিকে আমার প্রত্যেক সন্ধ্যায় কমনীয় নববধূর বেশে, প্রত্যেক গভীর রাত্রের অশান্তিতে অনুভব করি না কি তাঁহার অন্তঃকরণের মহাবিচ্ছেদ বেদনাময় ত্রিসমুদ্রের মহাঝটিকা বিক্ষুব্ধ ভাবতরঙ্গ, আবার প্রত্যূষে তাঁহার কি শান্ত শ্রী, বালার্ককিরণোজ্জ্বলা হইয়া তিনি গায়ত্রী তীর্থে যখন স্নান করিতে বসিয়াছেন, দিগন্ত বিস্তৃত রক্তবর্ণ বেলাভূমি তাঁহার কৌষেয় বস্ত্র হইয়াছে। তখন কি সংযম, কি কঠোরতা, কি পবিত্রতার দীপ্তি তাঁহার মুখে ফুটিয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের অমাবস্যা রজনীতে ভারতীয় সভ্যতার চির-বিচ্ছেদ-বেদনায়, চাই আমাদের কুমারীর মত দিনে দিনে সংযম, দিনে দিনে কঠোরতা। কবে আমাদের সেই মহাব্রত উদ্‌যাপন হইবে তাহা আমাদের চিরকুমারী আর সেই চির-কঠোর শিবসুন্দরই জানেন।

সম্পাদক।

ভাদরে

ভাদ্র মাসে নদী নালা জলে ভরপূর,
মাঝ দরিয়ায় উছ্‌লে ওঠে ভাটিয়ালের সুর।
কূলে কূলে ঠিক্‌রে পড়ে স্রোতের কলকল,
ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্ দাঁড়ের ব'ঠে আঁক্‌ড়ে ধরে জল।
লাও চলে গো পালের ভরে যেথা সেথা দিয়া,
আমি ভাবি এ মাস বাদে তোমায় পাব প্রিয়া।

ভাদ্রমাসে বর্ষা বধূর স্রস্ত কেশ-পাশ,
বেণীর মাঝে বদ্ধ হ'য়ে গুম্‌রে ফেলে শ্বাস।
সঙ্গীহারা মেষের মত শুভ্র মেঘ দল,
মুক্ত নভে হেথা হোথা গর্জ্জে অবিরল।
সজল আঁখি শরৎ শিশু শ্যামল হ'য়ে রাজে,
আমি ভাবি এ মাস বাদে তোমায় পাব কাছে।

ভাদ্র মাসে ডগমগ কল্মিলতা গুলি,
লক্ষ ফুলে চেয়ে থাকে ছোট্ট মাথা তুলি।
সোণার ধানে ঢেউ লেগেছে, মন যে কেমন করে'
আজ রাখালের গানে গানে গগন ওঠে ভরে—
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসে অধর ভরা মধু,
আমি ভাবি এ মাস বাদে তোমায় পাব বধূ।

ভাদ্র মাসে উজল তারা আকাশ ছেয়ে হাসে,
জ্যোৎস্না তরুণ ভরসা সম বক্ষে নেমে আসে।
দিনের পর, ছুটির দিন ঘনিয়ে আসে যত,
প্রবাসের এই দণ্ডগুলো পিছিয়ে পড়ে তত।
আশায় এবং নিরাশায়, সুখে এবং দুঃখে,
আমি ভাবি এ মাস বাদে তোমায় পাব বুকে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

চিত্রকর।

একবার, দুইবার, তিনবার, অনেকবার চিত্রকর আঁকিল, পট ছিঁড়িয়া ফেলিল, কৈ সে মুখখানি ত' হইল না, সে সৌন্দর্য্যটুকু ত আসিল না, সে মধুরতা ত' ফুটিল না। সেই মুখখানি, যে মুখ তাহার সমস্ত হৃদয়ের গোপন প্রেম-টুকু দিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, যে মুখখানি তাহার নয়নে এক শান্তি, স্নিগ্ধ স্বপনের হাত বুলাইয়া দিয়াছে, যে মুখখানির নিকট অবগুণ্ঠিতা উষাও লাজে ম্রিয়মান হয়, যাহার নিকট নীল গগণের চাঁদের কান্তিও পরাভূত হয়, যে মুখের নিকট ঋতু সমাগমে প্রথম পুষ্পও মধুর বলিয়া মনে হয় না,—কৈ চিত্রকর এতবার আঁকিল, সে মুখখানা ত' ফলিল না; চিত্রকর যে মূর্ত্তিখানি হৃদয়ের এক নিভৃত কক্ষে ধরিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেছে, যে মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য তাহার প্রাণ মাতোয়ারা করিয়াছে—কৈ এতদিনের সে মুখখানি, সেই মূর্ত্তিখানি, সেই সৌন্দর্য্যটুকু ত' এতবারের এত চেষ্টাতেও পটে ফুটিয়া উঠিল না, চিত্রকর ধরিতে পারিল না!

চিত্রকর কতদিন, কতবার চেষ্টা করিয়াছে, আবার করিল—পারিল না, আবার করিল—মনের মূর্ত্তিকে পটে স্থাপনা করিবে—পারিল না। আবার চেষ্টা করিল—এইবার শেষ চেষ্টা—পারিল না—হইল না।

চিত্রকর এত ছবি আঁকিয়াছে, তাহার তুলি কত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, কত বর্ণনার অতীত, আশার অতীত ছবি হইয়াছে, কৈ, তাহার তুলি তাহাকে এত বিমুখ ত' কখন করে নাই।

আর চেষ্টা করিল না। তাহার মনের প্রতিমা মনেই রহিয়াছে, সেই মন্দিরেই সে উপাসনা করিতেছে, কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই, এ উপাসনার শান্তি নাই, এ যে এক মহা উপাসনা, ইহার তৃষ্ণায় যে তৃষিত, তাহার অনন্ত যাতনা, তাহার বেদনা অশেষ।

চিত্রকর গৃহত্যাগ করিল, আর ফিরিল না, আর ফিরিবে না।

বৎসরের পর বৎসর আসিয়াছে, গিয়াছে, চিত্রকর তাহার আদরের, কত যত্নের, স্নেহের, প্রেমের, ভালবাসার প্রতিমাখানি হৃদয়ে ধরিয়া কত দেশে দেশে, কত পাহাড় পর্ব্বত, নদী, মাঠ ঘাট, বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। তাহার মানস পটের প্রতিমা, প্রেমের সৃষ্টি, কল্পনার দান, জীবনের স্বপন খানি দিন দিন মধুর হইতে মধুরতর, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর, পবিত্র হইতে পবিত্রতর হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রকর এখন সরযূ নদীর তীরে উপনীত হইয়া লোকালয় হইতে দূরে, এক নিভৃত স্থানে বাস করিতেছে। সমস্ত দিন, কখনো বা দিনরাত্রি পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া শ্রান্ত চরণ যখন আর দেহকে বহন করিতে চাহে না, চিত্রকর তখন সরযূতীরে তাহার কুটীরে ফিরিয়া আসে।

একদিন সমস্ত রাত্রি পূর্ণচন্দ্র-উদ্ভাসিত গগনের নীচে, জ্যোৎস্না প্লাবিত ধরণীবক্ষে পুণ্য সরযূনদীতটে পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়া, পরিশ্রান্ত দেহে উষার অনতিপূর্ব্বে একটি নিভৃত স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে চিত্রকর ধীরে ধীরে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

নিদ্রা ভাঙ্গিল—কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, তাহা সে জানে না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মন শূন্য।

একটু শব্দ পাইয়া পশ্চাতে তাকাইল, পশ্চাতদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল, চক্ষু মুছিল, আবার তাকাইল। কিন্তু এ কি! কল্পনার অতীত, স্বপনের অতীত, এ যে তাহার সেই প্রতিমা, সেই ব্যর্থ সাধনার পরিপূর্ণ ফল, সেই প্রেমের সৃষ্টি, সেই ভালবাসার দান, সেই সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি—কে তাহার মন হইতে বাহির করিয়া তাহার চক্ষের সমক্ষে ধরিল? ইহা কি বাস্তব, না স্বপন, এতদিনের নিষ্ফল প্রয়াস কি আজ তবে সফল হইবে, না ইহা কেবল তাহার চিরন্

প্রতারণা মাত্র ? চিত্রকর আবার দেখিল,—না, ইহা প্রকৃত, ইহাতে ভুল নাই, ভ্রান্তি নাই, প্রতারণা নাই।

শিশিরস্নাত সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের মত, পূর্ণযৌবনা অপরূপ সুন্দরী—তাহার জাগ্রত প্রতিমা ঋষিকুমারীর দিকে চিত্রকর উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। প্রভাত স্নানান্তে, কলসী কক্ষে, কুমারী মৃগশিশুর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে সরযূতট হইতে ফিরিতেছিল। চিত্রকর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, কুমারী স্থিরনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টি চিত্রকরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলিকে যেন বলিয়া উঠিল, "জাগো, জাগো।" এই উজ্জ্বল, অনিন্দ্যপ্রতিমা খানির সমক্ষে যেন চিত্রকর মুহূর্ত্তের জন্য বিহ্বল, বিভোর হইয়া পড়িয়াছিল। নিজেকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "সেই, সেই, তুমিই আমার সেই—আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে চাই।"

কুমারী তাহার সেই স্বপনমাখা চোখে চিত্রকরের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এসো"। হায়, কত ভালবাসা, কত সৌন্দর্য্য, কত প্রেম, কত মধুরতা মুহূর্ত্তের জন্য কুমারীর সেই মুখখানায় খেলা করিয়া গেল।

স্বপনের মোহে লোক যেমন ভ্রমণ করে, চিত্রকর সেইরূপ লক্ষ্যহীন গতিতে কুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে কথাগুলি সে আর বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—সে যেন বলিয়া উঠিল, "কে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিল—তুমি কি পৃথিবীর ?"

গৃহে আসিলে কুমারী চিত্রকরকে একখানা আসন দিয়া অপেক্ষা করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া চিত্রকরের সমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি কি চাও ?"

চিত্রকরের সমক্ষে তাহার যেন সেই জাগ্রত স্বপন ভাসিতেছিল, সে বলিল, "আমি তোমাকে চাই, তুমিই সেই, আমি তোমাকে চাই।"

কুমারী আবার বলিল, "কি চাও, বল, যাহা চাও তাহাই পাইবে।"

চিত্রকরের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে এক ভয়ানক হাসি হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে চাই।"

পশ্চাৎ হইতে কুমারীকে কে ডাকিল, কুমারী বলিয়া গেল "এখন যাও, আবার আসিও।"

পরদিন আবার চিত্রকর আসিল। বলিল, "আমি তোমাকে চাই।"

কুমারী উত্তর করিল, "কি চাও, বল, যাহা চাও তাহাই পাইবে।"

"তোমাকে চাই।"

"কি চাও ?"

"তোমাকে।"

"আমাকে ? আমার কি চাও ?"

"তোমাকে।"

"আমার কি চাও, বল। আমার রূপে কি তুমি মুগ্ধ হইয়াছ ? আমার এই রূপটুকু চাও ?—এই রূপ, রং, চর্ম্ম ? যদি লইতে পার লও, কেবল সেইটুকু পাইবে, আর কিছুই নয়।"

"না, তা' নয়, তোমাকে চাই।"

"কি চাও, বল। শরীরটুকু ? তবে তাই লও, আমার এ শরীর তোমার আজ্ঞাবহ হইবে, তোমার দাস হইবে, কিন্তু তোমার আর কোন অধিকার থাকিবে না।"

"না, তোমাকে চাই।"

"কি চাও, বল। আমার মনটুকু ? তবে তাহাই লও, আমার মন তোমাকে অর্পণ করিলাম, তোমার ধ্যানেই মগ্ন হউক, কিন্তু জানিও, তোমার আর কোন অধিকার থাকিবে না। আমার সৌন্দর্য্যের দিকে তুমি দৃষ্টিপাত করিতে পারিবে না, আমার শরীর আমারই দাস হইয়া কেবল আমারই আজ্ঞাবহ থাকিবে, তোমার নহে।"

"না, আমি তোমাকে চাই।"

"কি চাও, বল। আমার আত্মাটুকু ? প্রাণটুকু ? যদি তাহাতে পরিতৃপ্ত হও, তবে লও, এক্ষণই।"

"না, আমি তোমাকে চাই।"

"আমার কি চাও, বল। গুণটুকু ? যদি কিছু থাকে, লও, যদি পার। কিন্তু আর কিছু পাইবে না।"

"না, তোমাকে চাই।"

"আমার কি চাও, বল।"

"তোমাকে চাই, তোমাকে চাই, তুমিই আমার সেই, তোমাকে চাই।" চিত্রকরের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, সে আনন্দে নৃত্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "পাব না? আমি তোমাকে চাই, তোমাকে চাই?"

"যদি না বল কি চাও, তবে কেমন করিয়া তোমায় কি দিব?"

"তবে—" এই বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া চিত্রকর নিজ বক্ষে আঘাত করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার।

শিক্ষা-প্রণালী।

শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকদ্বয়ে অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেছেন। তিনি প্রথমে বলেন দ্রব্যার্পণরূপ যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর। কেননা দ্রব্য সহিত সমস্ত-যজ্ঞ কর্ম্ম জ্ঞানযোগেই পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে তিনি এই উপদেশ দেন 'তুমি গুরুর চরণে প্রণত থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবে এবং প্রশ্ন করিয়া তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী গুরু বা আচার্য্য তোমাকে উপদেশ প্রদান করিবেন আর সেই উপদেশ প্রাপ্ত হইলে তুমি জ্ঞানলাভ করিবে।' এই দুইটী শ্লোক হইতে আমরা পুরাকালের ভারতবর্ষীয় শিক্ষাপ্রণালী, গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ আর শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। তৎকালে ছাত্রগণ গুরুর আবাসে বাস করিত। ছাত্রগণের এই অবস্থাকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম বলা হইত। ছাত্রেরা গুরুর আদেশ পালন করিত ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া শিক্ষা লাভ করিত। আর সে সময়ে তত্ত্বজ্ঞানই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। ছাত্রেরা গুরুকে প্রশ্ন করিয়া সন্দেহ দূর করিত। এরূপ শিক্ষা টোলে দেওয়া হইত আর টোলে বালকেরা ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, বেদ, বেদাঙ্গ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিত। ইহা বলা বাহুল্য এরূপ শিক্ষা ব্রাহ্মণ সন্তানদিগকে দেওয়া হইত। সাধারণ লোকের জন্য পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা প্রদান করা হইত। আর পাঠশালায় অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ আর জমিদারী হিসাব শিখিলেই যথেষ্ট হইত। কথক মহাশয়েরা পুরাণ ও মহাভারতের কথা বলিয়া উপদেশ দিতেন আর সেই সকল কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে জ্ঞানলাভ করিত। মুসলমানদিগের সময়ে এ শিক্ষাপ্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে ধনী ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা পার্শী ও উর্দ্দু শিক্ষা করিতেন। আকবর সার রাজত্বকালে মন্ত্রীবর তোড়রমল্ল ধর্ম্মাধিকরণে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত করেন আর সেই সময় হইতে হিন্দুগণ পার্সী ও উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন ও সেবয়া এই তিন উপায়ে হিন্দু ও মুসলমানদিগের সময়ে শিষ্যেরা অধ্যাপক ও মুন্সীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিত। এক্ষণে সেরূপ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এরূপ সম্বন্ধ থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বিদ্যালয়ে ও কলেজে বালকেরা প্রশ্ন করিয়া তাহাদের সন্দেহ দূর করিতে পারে না। ছাত্রগণকে এরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার মধ্যে মধ্যে দেওয়া আবশ্যক আর শিক্ষকগণেরও সক্রেটিসের ন্যায় মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া ছাত্রগণের মনে অনুসন্ধিৎসা উৎপাদন করিবার

চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান ছিল, এক্ষণে উহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী বুঝিতে গেলে ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী ও তাহা কিরূপে প্রবর্ত্তিত ও ক্রমবিকশিত হইয়াছে তাহা জানা আবশ্যক।

ইংলণ্ড ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রণালী রোম দেশের শিক্ষাপ্রণালী হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে আর কোন দেশের শিক্ষা প্রণালী প্রাচীন গ্রীস দেশের শিক্ষাপ্রণালী হইতে অনুকৃত।

এক্ষণে বালকগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়কে ইংরাজী ভাষায় School বলে। এই স্কুল শব্দটী Latine লাটিন Schola (স্কোলা) হইতে গৃহীত, আর গ্রীক ভাষায় স্কুলকে স্কোলে বলিত, আর স্কোলে শব্দের ধাতুগত অর্থ ছিল অবকাশ। দেখুন অবকাশ হইতে পরিশ্রমশীলতার ও অনুশীলনের স্থান হইয়াছে। এরূপ শব্দার্থের পরিবর্ত্তন অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। Silly শব্দ ইংরাজীতে প্রথমে সুখী বুঝাইত, এক্ষণে উহার অর্থ নির্ব্বোধ হইয়াছে। Fond শব্দের পূর্ব্ব অর্থ নির্ব্বোধ ছিল এক্ষণে উহার অর্থ প্রিয়। School শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই গ্রীকদেশে পূর্ব্বে ক্রীতদাসের সংখ্যা অধিক ছিল, আর ঐ সকল ক্রীতদাসেরা শ্রমজীবির কার্য্য করিত আর স্বাধীন অধিবাসীদিগের বহুল পরিমাণে অবকাশ ছিল। সেই অবকাশ থাকাতেই তাঁহারা বিদ্যানুশীলন করিতে পারিতেন, তজ্জন্য বিদ্যানুশীলন স্থানের নাম স্কুল (School) হইয়াছে।

গ্রীকদেশে তিন প্রকার শিক্ষক ছিল। (১) গ্রামাটিষ্টিস (২) শিথাটিষ্টিস ও (৩) পিডোট্রিব। গ্রামাটিষ্টিসেরা বালকগণকে লিখন, পঠন ও অঙ্কশাস্ত্রে উপদেশ দিত, শিথিষ্টিসেরা সঙ্গীত শিক্ষা ও পিডোট্রিবেরা ব্যায়াম শিক্ষা প্রদান করিতেন। গ্রীসদেশে বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভাগ ছিল না। সেখানে বালকেরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা করিত। এক একজন শিক্ষকের নিকট অল্প সংখ্যক বালকেরা শিক্ষালাভ করিত। এই সকল শিক্ষকের নিকট ক্রীতদাসেরা বালকগণকে লইয়া যাইত। এই সকল ক্রীতদাসকে পিডাগোগ (Pedagogue) বলিত। এক্ষণে পিডাগোগের অর্থ শিক্ষক কিন্তু গ্রীসদেশে উহার অর্থ বালকগণের পরিচালক ক্রীতদাস ছিল। এইরূপ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে বালকগণ সোফিষ্ট (Sophist) বা রেটরের (Rhetore) নিকট শিক্ষালাভ করিত। সোফিষ্টেরা বালকগণকে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা দিত আর রেটরেরা অলঙ্কারশাস্ত্র আর বক্তৃতাকরণে উপদেশ দিতেন। সক্রেটিস (Socrates ' একজন বিখ্যাত সোফিষ্ট (Sophist) ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল। সক্রেটিস আমাদের দেশের রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বালকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন। কোন লোক তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট উত্তর গ্রহণ করিতেন আর তাহাকে এইরূপে উপদেশ দিতেন। কথিত আছে একদা এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই ব্যক্তি একজন শাসনকর্ত্তা (administrator) হইবার প্রয়াসী ছিল, কিন্তু তাহার ধারণা ছিল শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। সক্রেটিস তাহা জানিতেন। তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি শুনিতে পাই তুমি শাসনকর্ত্তা হইবার প্রয়াসী। সেই ব্যক্তি উত্তর করিল 'হাঁ'। তৎপরে সক্রেটিস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পদ পাইবার জন্য অবশ্য তুমি উপদেশ বা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। সে ব্যক্তি বলিল "ইহার জন্য কোন শিক্ষার আবশ্যক নাই"। সক্রেটিস বলিলেন "ভাল ভাল। আচ্ছা তুমি শাসনকর্ত্তা হইলে, তোমার দেশের ধন-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।" সে ব্যক্তি বলিল "অবশ্যই' করিব"। তখন সক্রেটিস জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কিরূপে তুমি আয় বৃদ্ধি করিবে"। সে ব্যক্তি বলিল, "রাজস্ব বাড়াইয়া আর শত্রুদেশ জয় করিয়া"। সক্রেটিস পুনরায় তাহাকে বলিলেন "রাজস্ব বাড়াইবে সেত ভালকথা, বল দেখি এ দেশের কোন্ কোন্ বিভাগ হইতে কত কর গ্রহণ করা হয় আর কোন্ কোন্ কর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। আবার বিদেশ জয় করিতে হইলে ঐ বিদেশে কত বা সেনা আছে আর তোমার নিজ দেশেই বা কত সেনা আছে

তাহা জানা চাই। তুমি সে সকল বিদিত আছ কি না।" এইরূপে সে ব্যক্তি বুঝিতে পারিল শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে শাসনকর্ত্তা হওয়া দূরে থাকুক সামান্য সূত্রধার বা নাবিকের কার্য্য করা যায় না। এই প্রণালীকে সক্রেটিসের প্রণালী (Socretic method) বলে। কখন কখন এইরূপ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

গ্রীসদেশে বালকগণকে পৌরাণিক আখ্যান বলা হইত, আর এইরূপ আখ্যান দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইত। এই সকল পৌরাণিক উপাখ্যান বীররসে পরিপূর্ণ ছিল। একিলিসের (Achellis) বীরত্ব, ইউলিসিস (Ullysis) বা ওডেসিয়াসের (Odyssias) কূট-বুদ্ধির প্রশংসা এই সকল আখ্যানে বিবৃত থাকিত। আমাদের দেশে উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারতে যেরূপ নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা ঐ সকল উপাখ্যান হইতে বালকেরা শিক্ষা করিতে পারিত না। রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পারি রামচন্দ্র রাজ্যত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করেন। এরূপ স্বার্থত্যাগ ও সত্যনিষ্ঠা গ্রীকদিগের পুরাণ বা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গ্রীক-দিগের একটী উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করিলে ইহা প্রতীয়-মান হইবে। ইউলিসিস বা ওডেসিয়াস ইথাকা নামক দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। গ্রীক ও ট্রয়বাসীদিগের মধ্যে দশ বৎসরব্যাপী এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইউলিসিস কৌশল দেখাইয়া ট্রয়নগর ধ্বংস করেন। পরে যখন তিনি নিজ-দেশে প্রত্যাগমন করেন তখন পথিমধ্যে ইয়ায় নামক দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ দ্বীপে সার্স (Cercé) নাম্নী এক কুহকিনী বাস করিত। ঐ কুহকিনী যে কোন পথিক তাহার আশ্রয় লইত তাহাকে এক পানীয় দ্রব্য পান করিতে দিত আর ঐ পথিক সেই পানীয় দ্রব্য পান করিয়া শূকরা-কৃতি ধারণ করিত। ইউলিসিসের সঙ্গীগণ তথায় যাইলে তাহারা সকলেই শূকরাকৃতি ধারণ করিয়া কারাবদ্ধ হয়। পরে ইউলিসিস প্যাল্লাস এথিনি (Pallas Athene) বা সরস্বতী দেবীর সাহায্যে ঐ সকল লোককে উদ্ধার করেন। ইউলিসিস অনেক সময় অনেক মিথ্যাকথা বলিয়াছেন, কিন্তু কবি তাঁহাকে তজ্জন্য কোনরূপ অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। বরঞ্চ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের সহিত আমাদের দেশের পৌরাণিক উপা-খ্যান বা উপনিষদের উপদেশের সহিত তুলনা করিলে দুই দেশের শিক্ষাপ্রণালীর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বৃহদারণ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে এক ঋষি দৈববাণী শুনি-লেন—দ দ দ। তিনি ধ্যানে জানিতে পারিলেন—

প্রথম দ মানে দাম্যত ইন্দ্রিয় সংযম কর।

দ্বিতীয় দ মানে দত্ত দান কর।

তৃতীয় দ মানে দয়ধ্বথত দয়ালু হও।

তিনি পরে এইরূপ শিক্ষা শিষ্যগণকে প্রদান করেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে গ্রীসদেশে নীতি ও সত্যের প্রতি লোকের তত লক্ষ্য ছিল না, কেবল সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব প্রকাশ করা হইত ইহাই তাঁহারা মনে করিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবেচারাম নন্দী।

বর্ণ-বিভাগ ও জাতিভেদ।

-:◆◇◆-

ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদ বিদ্যমান থাকায় হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান যুগের নব অভ্যুদিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট অতি হেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভারতীয় জাতিসমূহ, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত চক্ষে দৃষ্টিকরতঃ হিন্দু-সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির অন্তর্ভূত জনসাধারণ স্ব স্ব বর্ণ ও জাতির উন্নতি ও মিলনকল্পে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, নমশূদ্র, নায়র প্রভৃতি জাতির বহু সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একেই ত' ভারতভূমি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ভীল, সাঁওতাল, কুকী প্রভৃতি বহুধর্ম্মাবলম্বী ও মানবীয় সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের বহু জনসমূহের লীলা-নিকেতন। তাহার উপর একমাত্র হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে যদি শত আন্তর্জাতিক বিভাগ পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবাসীগণকে এক জাতি বা "নেশন" রূপে অভিহিত করা একরূপ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত রাজন্য বা রাজশক্তি-পরিচালকগণের এক মহা সম্মিলন মন্দিরে ভারতবাসীর স্থান নাই বা থাকা সম্ভব নহে বলিয়া বহু রাজনৈতিক মনীষিগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে হিন্দুর বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন জাতীয় নরনারীগণকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিয়া একজাতি গঠন করিয়া হিন্দুসমাজকে উচ্চ রাজনৈতিক অধিকারে অধিকারী করিবার জন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় চিন্তাশীল ব্যবস্থাপক ও জননেতৃগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। এইসময়ে একবার হিন্দুর বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদ সম্পর্কিত তথ্য আলোচনা করিয়া ইহার শুভাশুভ নির্ণয় চেষ্টা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

হিন্দুর বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবানের মুখে উক্ত হইয়াছে, যথা :—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ, তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।" ইহাতে দেখা যাইতেছে শ্রীভগবান কূট রাজনৈতিকগণের ন্যায় এই বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বীকার করিয়াই, সেই মুখেই আবার নিজের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিতেছেন। তিনিও বোধ হয় কোন পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেসের স্কন্ধে কর্ত্তৃত্ব আরোপ করিয়া, এই ভেদ-নীতিটা অবলম্বন করা জনিত দোষভাগ হইতে নিজের দায়ীত্ব সঙ্কুচিত করিয়াছেন। কিন্তু চতুর চূড়ামণির এই ব্যবহারজীবির ন্যায় চাতুরী এককালে যে ধরা পড়ে না তাহা নহে। তাঁহার বিশাল বিশ্বরাজ্যের নীতি যে যথেচ্ছাচারী এক অদ্বিতীয় বিরাট সম্রাট, তাহা তাঁহার প্রজাবর্গ যে আদৌ বুঝিতে পারে না, তাহা নহে। যদিও কেহ কখনও তাঁহার ব্যক্তিগত শক্তির আসন গ্রহণ করিতে চায় বা তাঁহার আসনে জড়বিজ্ঞান বা পার্থিব অর্থকে বসাইতে চায় কিন্তু সে সুবুদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তিনি যে এক অদ্বিতীয় নিয়ামক এবং এই অনন্ত সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা, তিনি অনন্ত বৃহৎ এবং তাঁহার সৃষ্টিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া অনন্তকোটী বিভাগের সৃষ্টি করিয়া অনন্ত বিশ্বকে অনন্ত বিভাগে বিভক্ত করিয়া মানবীয় রাষ্ট্র নায়কগণের "বিভাগ করিয়া শাসন কর" ('Divide and rule) এই কূটনীতি তাঁহার সৃষ্ট জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং যথেচ্ছাচারে অনন্তকোটী বিশ্ববাসী জড় চেতনকে শাসন করিয়া সকলের বড়, সকলের অপেক্ষা মহান্ হইয়া অপ্রতিহত শক্তি পরিচালনের সুখের আবিলতায় নিজ বিরাট বুক ঢালিয়া দিয়া রাখিয়াছেন ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধে বুঝিতে পারে। তাঁহার যদি সদভিপ্রায় থাকিত বা তিনি যদি সদভিপ্রায় প্রণোদিত হইয়া তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে

অগ্রসর হইতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট পদার্থকে তাঁহার ন্যায় তুল্য শক্তি ও সামর্থ্যবিশিষ্ট, তাঁহার স্বীয় মনোহরের মনোহর রূপরাশির তুল্য অসংখ্য তনুর সৃষ্টি করিয়া সাম্যনীতির পরিচয় প্রদান করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু হায়! কর্তৃত্ব থাকিলেই বা পাইলেই তাহা কেহ ছাড়িতে চাহে না। আত্ম অতিরিক্ত সকলের উপর প্রভাব বিস্তার না করিলে কর্তার কর্তৃত্ব থাকে না এবং কর্তৃত্ব না থাকিলে আত্মতৃপ্তিই বা কোথায়? সুতরাং সাম্যনীতি দুর্ব্বলেই অবলম্বন করিতে চায়। বলবানগণ চিরদিনই সাম্যনীতির বাহিরে থাকিয়া স্বীয় বল প্রকাশ করেন। যিনি অনন্ত আকাশবিহারী ভুবন সমূহকে ক্ষুদ্র, বৃহৎ ও বিভিন্ন শক্তিশালী করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক ভুবনে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা ধর্ম্মবিশিষ্ট বিভিন্ন বস্তুর জনক, যিনি ভুবনসমূহে জড় চেতনাদি সৃষ্টি করিতে বসিয়া তাহাদের মধ্যে বহুধা বিভাগ স্থাপনের কর্তা, তিনি যে মানব সৃষ্টিকালেও সেই কূটনীতি অনুসরণ করিয়াছেন ইহা ত' তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, অথবা তাঁহার স্বীয় অপটুতাপ্রসূত। একটা কথা শুনা যায় যে তাঁহার সম আর একটা কিছু সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সুতরাং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হউক অথবা বাধ্য হইয়া হউক সৃষ্টিকালে তিনি বহুতর ভেদযুক্ত, বহু বৈচিত্র্য সমন্বিত, জড় চেতন সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি একটু কূট রাজনৈতিক চাল দিয়া নিজের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি যাহাই করুন না কেন আমাদের তাহাই শুনিতে হইবে কারণ আমরা তদধীন। এখন প্রথমে বিবেচ্য এই যে তিনি এই বর্ণভেদটা সৃষ্টি করিয়া বসিলেন কেন? সব সমান করিয়া সৃষ্টি করিলেই ত' হইত। কিন্তু দুইটী বস্তু সমান করিলে, সেই দুইটীর মধ্যে যদি কোন ভেদ বা কোন পার্থক্য না থাকে তবে সেই দুইটী বস্তুর দ্বৈতভাব থাকে কি করিয়া? সর্ব্বাংশে যদি সমান হয় তবে দুটী বস্তু ত' এক হইয়া যায়। কোন না কোন ভেদ বা পার্থক্য না থাকিলে দুইটী বস্তুকে ত' দুইটী বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় থাকে না। সমস্ত জগতের জড় চেতন সমূহকে যদি পরস্পরের সহিত সমান করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সর্ব্বশক্তিমান্ থাকিতেন কি? এক হইতে আর এককে পৃথক করিয়া দেখাইতে বা বুঝাইতে হইলেই সমতার বা তথাকথিত সাম্যের অভাব হইতেই হইবে। সুতরাং এই বিপদে পড়িয়া সৃষ্টিকর্তাকে প্রথম হইতেই ভেদনীতিটাকে প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে। নচেৎ যেটা সৃষ্টি করিতে যাইতেন তাহাই তাঁহার সহিত এক হইয়া গিয়া এক বর্ণ বা এক জাতি হইত। কেন তিনি তাহাই করেন নাই? তাহা হইলে ত' তাঁহার ঈশ্বরত্বের উপর আজ আর কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না।

এইরূপে গরজে পড়িয়া, সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর কর্তৃত্ব-সুখ অনুভব করায় যখন সৃষ্টিকর্তার সাধ হইল, তখন বাধ্য হইয়া অপরিমেয় ও অপরিচ্ছিন্ন স্বীয় বিরাট দেশটাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জড় চেতন জগত প্রসব করিতে হইয়াছে। নচেৎ মনের সাধ পূর্ণ করিবার আর উপায়ান্তর থাকে না। তবে যে তিনি গীতোক্ত শ্লোকে স্বীয় কর্তৃত্ব কিয়দংশ অস্বীকার করিয়াছেন, তাহারও একটা বিশেষ কারণ আছে। একটা রহস্যজনক উপাখ্যান এই সংস্রবে স্মরণ হইল। তখন আমরা তরুণ যুবক। এক বিবাহ-বাসরে বাজী পোড়ান দেখিতে গিয়াছি। বর-কর্তা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শক্তিমান ও বর্ষীয়ান জমিদার। বৃদ্ধ বাজীওয়ালা কমলাকান্ত তাঁহার প্রজা। প্রথমতই বম্ ফুটিতেছে; কয়েকটী পোড়ান হইল কিন্তু তেমন বজ্র-গম্ভীর নাদ শুনা গেল না। ভাঙ্গাগলার ভাঙ্গা আওয়াজে বরকর্তা বিরক্ত হইয়া বাজীওয়ালাকে নিকটে ডাকিয়া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা! এরূপ হইল কেন? বুড়া হইয়াছিস্ তবু জুয়াচুরী? আবার আমারই সহিত?" বৃদ্ধ কমলাকান্ত দুই হস্ত জোড় করিয়া একটু চাপা হাসি হাসিয়া বলিল "কর্তা, এ গুলি খারাপ হ'য়েছে সত্য কিন্তু তা'র একটা কারণ আছে।" অধিকতর বিরক্তির সহিত কর্তাটী জিজ্ঞাসা করিলেন "কারণটা কি শুনি?" বাজীকর পূর্ব্ববৎ উত্তর করিল, "আজ্ঞে এ গুলা বউ গ'ড়েছিল।" জমিদার মহাশয়ের গম্ভীর বদনেও একটু হাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল। কমলাকান্ত আরও ব'লল যে অনেক বাজী অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিতে তাহাকে বাধ্য হইয়া তাহার সহ-

ধর্ম্মিণীকে সহযোগিনী করিতে হইয়াছিল; ইহাতে তাহার অপরাধ হইতে পারে না, হইলেও তাহা মার্জ্জনীয়। এই কথা বলিতে বলিতে অন্য আর একটা বম্ ফুটিয়া উঠিল। তাহার বিকট গর্জ্জনে কর্ত্তাটী পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন; কমলাকান্তও সেই সময় উল্লাস ও গর্ব্বস্ফীত বক্ষে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন কর্ত্তা এটা আমি গ'ড়েছিলাম।" এইরূপে যেটী ভাল হয় সেইটীকে নিজহস্ত গঠিত ও যেটী মন্দ হয় সেটীকে তাহার বধূহস্ত প্রস্তুত বলিয়া কমলাকান্ত উৎসবময় বিবাহবাসরকে হাস্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই জগতের এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর কমলাকান্তও বোধ হয় সৃষ্টিকার্য্যে সমস্তটা না হউক অনেকটা অন্ততঃ এই দৃশ্যমান জড় চেতনের লীলাভূমি ভুবন সমূহ সৃষ্টিকালে ঐরূপ বধূর সাহায্য লইয়াছিলেন। সেইজন্য সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি বিশেষরূপা বধূটী এই যে অপূর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমাদের গুণপুরুষটিও "বউ গ'ড়েছিল" বলিয়া স্বীয় কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার বিরাট বধূ প্রসূত এই বিশাল বিশ্বে ভেদনীতিটা বড়ই প্রবলা। একটী তৃণদল অন্য তৃণদলটির সহিত সমান নহে। বহুজাতীয় গুল্মগুল্ম, তরুলতারাজি দ্বারা ধরণী অঙ্গ বিভূষিত। অনন্তকোটি বিভিন্ন দেহধারী বিভিন্ন শক্তি-সামর্থ্য সমন্বিত জীবসঙ্ঘের চির কোলাহলে বিশ্ব-ভুবন মুখরিত। অনন্ত বৃহৎ অনন্তকোটী জড়পিণ্ডগুলি হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র রেণুগুলি পর্য্যন্ত নিরন্তর ভ্রাম্যমান। এইরূপ সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে মানব আমরাও সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য লইয়া বিচরণ করিতেছি। জড় চেতন সকলের মধ্যেই বর্ণ ও জাতিভেদ দেদীপ্যমান। ইহাদের অন্তর্গত যে কোন বর্ণের মধ্যে বহু অবান্তর জাতির সমাবেশ। বৃক্ষজাতির মধ্যে আম্র, কাঁঠাল, দেবদারু প্রভৃতির জাতিগত ভেদ ত' আছেই; এক আম্র বৃক্ষের মধ্যেই ফজ্‌লি, বোম্বাই, নেংড়া প্রভৃতি বহুভেদের নিত্য অধিষ্ঠান। সকল ফজ্‌লি বৃক্ষ বা ফলও একরূপ নহে। একটী বৃক্ষের সকল অঙ্গ সমান কার্য্য করে না। তাহার মূলকাণ্ড, শাখা, পল্লব সকলেই বিভিন্নভাবে কর্ম্মে রত। গো-মহিষাদি পশুগণের মধ্যেও নানাজাতীয় ভেদ বিদ্যমান। কেবল মানবই কি প্রত্যেকে সমধর্ম্মী ও সমশক্তি সমন্বিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে? দেশভেদে আকৃতি প্রকৃতিগত অসংখ্য ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রত্যেক মানব অন্য যে কোন মানব হইতে বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতি লইয়া গঠিত। সর্ব্বোপরি স্ত্রী ও পুরুষদেহের ভেদ সর্ব্বত্র নিত্য দেদীপ্যমান। এই বিভিন্নতার মধ্যে অনন্ত কৌশলীর এক অচিন্ত্য কৌশল এই অনন্ত বিভিন্ন জড় চেতন দেহধারীগণকে কি এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণে আবদ্ধ ও মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। স্রষ্টার নিপুণতায় এই বিশাল বিশ্বে কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া একাকী চলিবার উপায় নাই। পরমুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। বিশ্ব-ভুবনের সুদূর প্রান্তবর্ত্তী নয়নেত্রে বিভাষিত একটী ক্ষীণরশ্মি জ্যোতিষ্ক হইতে শয্যালগ্ন ধূলিকণা পর্য্যন্ত সকলেই নরদেহের বা নরচিত্তের উপর অল্প-বিস্তর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অন্য নিরপেক্ষ কেহ নাই। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অলক্ষ্যে একটী অহেতুক আকর্ষণ পরস্পরকে একই সূত্রে গাঁথিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে বা সেবায় রত রাখিয়াছে। মহীয়সী শক্তির কি বিচিত্র লীলা! এই অনন্ত ভেদসঙ্কুল লীলামন্দিরে, কি মহীয়সী অভেদনীতি ক্রীড়াশীলা? ক্ষুদ্র মানব আমরা, অনন্ত কালসাগরে নিমেষ স্থায়ী জীবনের সনন্দ লইয়া, বিশ্বব্যাপিনী অঘটন ঘটনাপটিয়সী প্রবলপ্রতাপান্বিতা শক্তি সম্রাজ্ঞীর একটী অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্রের প্রসাদলব্ধ কুহকে ভুলিয়া, আমরা প্রত্যেকে আত্মশক্তির প্রাবল্যের অভিমানে আত্মাতিরিক্ত জড় চেতন নির্ব্বিশেষে সকলকেই নিয়মিত করিয়া আত্মতৃপ্তিলাভের জন্য আত্মহারা। কৃষ্ণবর্ণ একটী গোলাকার মৃণ্ময় জলপাত্রের উপরিভাগে ভ্রাম্যমান পিপীলিকাশ্রেণীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায় আমরা মাতা বসুমতীর বক্ষোপরি নৃত্য কুন্দন করিতেছি। আমাদের প্রতাপ, আমাদের যশ, আমাদের সুখদুঃখ, স্বাধীনতা, অধীনতা সমস্তই আমাদের এই পিপীলিকাপালের মধ্যেই অবরুদ্ধ। মানব ব্যতীত মানবের কার্য্যকলাপে অন্য কেহ জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গৌরবান্বিত মনে করিবে না। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে মানবের নাম, মানবের বংশ বা মানবের বাসভূমি ধরণীর একদিন অস্তিত্ব থাকিবে না।

তথাপি আমরা অহমিকার তাড়নে নর-চিন্তার অতীত এই বিশ্ব-বিধাত্রীশক্তি যে সনাতন পুরুষের শ্রীচরণ-সেবিকা, সেই দুর্জ্ঞেয় পুরুষের অবলম্বিত এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ-নীতির দোষগুণ বিচার করিয়া তৎপ্রকাশিত নর-সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চাই।

তথা কথিত সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য অপক্ক নব অভ্যুদয়ের মরিচীকার পদাঙ্কানুসারী আত্মগরিমাস্ফীত তথা কথিত স্বদেশী জননায়কগণ এই ধরণীপৃষ্ঠে এমন কোন দেশ বা কোন জাতি বা নেশন দেখিয়াছেন কি, যেখানে স্ত্রী পুরুষে, ধনী দরিদ্রে, প্রভু ভৃত্যে, রাজায় প্রজায়, চর্ম্মকারে চাটুকারে, স্বর্ণকারে কর্ম্মকারে, ব্যবহারজীবে ব্যবসায়জীবে, চিকিৎসকে শববাহকে, তৈলিকে শৌণ্ডিকে, ভাস্করে তস্করে, অথবা মানবে মানবে ভেদ নাই? বিদেশীয় বিলাস-বিভ্রান্ত রঙ্গভূমির নটনটীগণের আত্মগরিমার অভিনয় দর্শনে তাহাদের দৃষ্টিবিভ্রমজনিত তাহারা এই সকল তথা-কথিত সভ্যজাতির মধ্যে বহুধা জাতি ও অন্তর্জাতি বিভেদ দেখিতে পাইতেছেন না। এই সকল দাম্ভিক নরসমাজের মধ্যে একমাত্র অর্থ ই নানাবিধ জাতিভেদের নিয়ামক। সমশ্রেণীস্থ ধনীগণকে লইয়া এই সকল বিদেশীয় সভ্যজাতির মধ্যে বহুসংখ্যক অবান্তর জাতি গঠিত; তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী বর্ণবিভাগ বিদ্যমান। প্রথমবর্ণ শ্রমজীবি, দ্বিতীয় বণিক ও তৃতীয় অভিজাতবর্গ লইয়া গঠিত। এই তিন বর্ণের মধ্যে বহু অবান্তর জাতিভেদ বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেক জাতীয় ব্যক্তিগণ এমন এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, প্রত্যেক জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য ইহারা জনধ্বংশকারী রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে সমর্থ। সর্ব্বনীচ বর্ণের শ্রমজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোন ব্যক্তি যে কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে পারিলে সঞ্চিত অর্থের তারতম্য অনুসারে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতর বর্ণে উন্নীত হইয়া অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অবশ্যই তাঁহার সহকারীতা করে। কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা কেহ এইরূপ বর্ণগত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই এই বাণীসেবকবৃন্দ লক্ষ্মীকৃপায় বঞ্চিত ও সংখ্যায় হীনতর হইলেও তাঁহারা অন্য আর একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হয়েন এবং কেবলমাত্র বিদ্যা বা ধর্ম্মানুশীলনে ক্ষণস্থায়ী জীবনগুলিকে সার্থক করেন। অপর তিন শ্রেণীস্থ বহুধা বিভক্ত ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ শ্রমজীবি ব্যবসায়ী বা অভিজাতবর্গ এই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সমন্বিত নারী নরকে সম্মানের উচ্চ আসন না দিয় থাকিতে পারেন না। এখানেও সেই "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময় সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ" নীতি দেদীপ্যমান। লীলাময়ের কি অপূর্ব্ব লীলা। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী উল্লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য? অসভ্য হিন্দুর ছায়া স্পর্শে যে সভ্য নর-বৃন্দের ধবল অঙ্গ কালিমা কলুষিত হয়, সেই অসভ্য হিন্দুর, সেই পৌত্তলিক হিন্দুর, সেই কাল কূটে লম্পট পুরুষটার, সেই কুরুযুদ্ধনায়ক কূটনীতিজ্ঞ কাল পুরুষটার সেই কোন-কালে কথিত বিধানটা ধরণীপৃষ্ঠস্থ সমস্ত নরসমাজের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণ করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই নরসমাজ উক্ত চতুবর্ণ বিভাগ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও প্রত্যেক বর্ণের বক্ষে অগণ্য অবান্তর বিভাগ পুষ্ট হইতেছে। হিন্দুর বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদ অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন বর্ণের বা জাতির নামে পরিচিত কিন্তু পাশ্চাত্য নবীন সভ্যতা এখনও স্বীয় শিশুগণের অন্নপ্রাশন বা নামকরণ করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত আর একটী বিশেষ পার্থক্য উভয় সভ্যতার বর্ণবিভাগ মধ্যে বিদ্যমান আছে। হিন্দুর বর্ণবিভাগ বংশপরম্পরাক্রমে নিয়মিত। পাশ্চাত্য বর্ণবিভাগে এক বর্ণের সন্তান গুণ-কর্ম্মভেদে ভিন্নবর্ণে উন্নীত বা অবনত হইতে পারেন। পাশ্চাত্য বর্ণভেদের অনুকরণে অস্মদ্দেশে যে নব বর্ণভেদ অলক্ষ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতেও ব্যবহারজীবির পুত্র ব্যবহারজীবি, বণিকের পুত্র বণিক, শিক্ষকের পুত্র শিক্ষক প্রভৃতি পৈত্রিক বৃত্তি অধিকাংশ স্থলে অবলম্বন করিতেছেন ও তাঁহারাই স্ব স্ব পিতৃপুরুষগণের অবলম্বিত কর্ম্মে সহজে নিপুণ হইয়া প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ করিতেছেন। মানবসৃষ্টির আদি হইতে হিন্দু সমাজবন্ধন লাভ করিয়াছে। তাহাদের প্রাচীন বিধানে সমাজের বিভিন্ন

বর্ণের ব্যক্তি গুণকর্ম্মানুসারে উচ্চতর বা নিম্নতর সমাজে উন্নত বা অবনত হইত। বেদব্যাসের মহর্ষিত্ব, বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব, কর্ণের ক্ষত্রিয়ত্ব, সুদাসের রাক্ষসত্ব প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। কিন্তু বিশেষরূপে কৃতীত্ব না দেখাইতে পারিলে কেহ শ্রেষ্ঠ বর্ণে উন্নীত বা বিশেষরূপে পতিত না হইলে কেন নিম্ন বর্ণে অবনমিত হইতেন না। এইরূপ উন্নয়ন বা অবনয়ন অলক্ষ্যে ঘটিত না। সমাজের নিয়ামক কোন অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ ব্যতীত এই বর্ণপরিবর্ত্তনের নন্দ দিতে অন্য কেহ সক্ষম হইতেন না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজে যে কোন নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তি আত্মচেষ্টার ও অর্থব্যয়ের তারতম্যানুসারে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমশঃ কোন উচ্চতর বা নিম্নতর বর্ণে মিশিয়া যান। তাঁহারা শ্রেষ্ঠতর সমাজে মিশিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ক্রমশঃ মিশিতে হয়। এমন কি একজন অভিজাত বংশজাত লর্ড অপেক্ষা নবনির্ম্মিত লর্ডকে বহুদিন তৈলকটাহ নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় সঙ্কুচিতভাবে সঞ্চরণ করিতে হয়। এই বর্ণপরিবর্ত্তন ক্ষেত্রেও উভয় সভ্যতা একই নীতির পশ্চাদবর্ত্তিনী। সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী বহু বিপ্লবের কষাঘাতে জীর্ণ হিন্দুসমাজে অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষের আবির্ভাব বিরল হইলেও নদীয়াবিহারী গৌরহরি প্রভু নিম্নজাতীয় মহাজনগণকে আচার্য্যের আসন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে ত' বেশী দিনের কথা নয়। সবে চারিটাশত বৎসর মাত্র। সাধারণ নরসমাজ ব্যক্তিগত স্বার্থের বশীভূত হইয়া বা প্রবৃত্তির তাড়নায় উশৃঙ্খল হইয়া এই সনাতন নীতিকে বিপর্য্যস্ত করিতে গেলে বহুতর শঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। চতুর্বর্ণবিভাগের পরে যতদিন সমাজের নিয়ামক মহাপুরুষগণ আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন ততদিন এক এক বর্ণের মধ্যে গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে বহুসংখ্যক অবান্তর বর্ণ বা জাতি বিভাগ করিয়া দিয়া অথচ জাতিপরম্পরাকে পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া হিন্দুসমাজকে সজীব ও সংযত রাখিয়াছিলেন ও তাঁহারই প্রসাদে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম, হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর বিজ্ঞান, হিন্দুর গণিত, হিন্দুর চিকিৎসা আজিও পর্য্যন্ত কালের কোলে মুখ লুকায় নাই। কেবলমাত্র বাচিক বিদ্যার বহর লইয়া রজতকাঞ্চনের চাকচিক্য লইয়া ব্রাহ্মণকন্যার রূপমুগ্ধ শূদ্রসন্তান হঠাৎ ব্রাহ্মণ হইবে, হিন্দুর বর্ণবিভাগ লয়প্রাপ্ত হইবে না। সমস্ত বর্ণভেদ উঠাইয়া একাকার করিতে গেলে নূতন কতকগুলি অবান্তর বর্ণের সৃষ্টি হইয়া সহস্রাকারে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুর বর্ণভেদ ঘুচাইতে গিয়া একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়া নিজেই আদি, সাধারণ ও নববিধান প্রভৃতি বহু জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। চারি জাতীয় কায়স্থগণকে মিলাইয়া এক কায়স্থ জাতি গড়িতে গিয়া পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানী দাম্ভিক কায়স্থগণ একটী পঞ্চম জাতি গঠন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের শিল্পোদয়-পরায়ণ স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনগণের আত্মাভিমান প্রসূত আন্তর্জাতিক বিবাহবিধি প্রচলিত হইলে পুনরায় কতকগুলি নূতন শঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইবে। অথচ মনুষ্যত্বে, চরিত্রে, বিদ্যাবুদ্ধিতে বা নৈতিক বলে হিন্দুসমাজ বিন্দুমাত্র উন্নত হইবে না। কেবলমাত্র চরিত্রহীনা ও চরিত্রহীন নারীপুরুষ সমূহের উশৃঙ্খলতা ও ইন্দ্রিয়লালসা অবাধে চরিতার্থ করার পথ রাজবিধি অনুসারে সুগম হইলে তাঁহারা সমাজবক্ষে পদাঘাতে তথাকথিত বহুধা বিভক্ত হিন্দুসমাজকে অধিকতর বিভক্ত ও শক্তিহীন করিবে। সত্য বটে হিন্দুর বিভিন্ন বর্ণের ও জাতির মধ্যে একটী বিদ্বেষবুদ্ধি বর্ত্তমানে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকেও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন দেশে আর বিভিন্ন রসের বিভিন্ন আম্রফল থাকিবে না, সর্ব্বজাতীয় আম্রফলের সমাহারে এক নূতন অনাস্বাদিতপূর্ব্ব উৎকট রসরসিক আম্রফল উৎপন্ন হইবে, অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসটিমাত্র বিদ্যমান থাকিবে, ইতর রসগুলি সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে অর্থাৎ সকলেই শ্রেষ্ঠ হইবে, ইতর কেহ থাকিবে না এরূপ কখন সম্ভব নহে। যে দিন এই আদর্শ স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইবে সেই সুখের দিনে এইসকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্ব কাহার নিকট বিজ্ঞাপন করিবেন? নিম্নস্তরের মনুষ্যত্ব রহিল না। তাহা হইলে শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠত্ব কে বুঝিবে ও কিপ্রকারে বুঝিবে? একবার দেখ দেখি। সেই নানাবর্ণ সম্মিলিত বিরাট রূপ

দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হৃদয়ে একবার চরণে পতিত হইয়া বলি, "নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব্বত্র এত সর্ব্ব।" জয় হউক, জয় হউক। বিরাট একাকারের জয় হউক। সমস্ত পার্থক্য সমস্ত বিভাগ, সমস্ত ভেদ ঘুচিয়া যাক্। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি হইতে মানব চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করুক। কেবল বড় দুঃখ রহিয়া গেল যে এই নীচ ভাষায় রচিত নীচহস্তপ্রসূত কদাকার বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত জয়ধ্বনি যাঁহাদের বিজয় ঘোষণা করিতেছে তাহা তাঁহাদের কর্ণনেত্রের বিষয়ীভূত হইবে না, অথবা কোন দুষ্কৃতি বশতঃ, তাহা হইলেও ধিক্কার কুঞ্চিত নাসারন্ধ্র ভেদ করিয়া ইহা তাহাদের বিশাল মস্তিষ্ক কোটরে বিরাজ করিবার কোন পার্থিব সম্ভাবনা নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি যে ভেদ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। সৃষ্ট বস্তুর অণু বৃহৎ সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদ নিত্য বর্ত্তমান। ভেদ লইয়া সৃষ্টির আবির্ভাব। ভেদ মুক্ত হইলেই সৃষ্টির তিরোভাব। সুতরাং মানবের মধ্যে বর্ণ বা জাতিভেদ ঘুচিবার নহে, এখন দেখিতে হইবে এই বহুধা ভেদ সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত সৃষ্ট পদার্থনিকর কোন্ গুপ্তমন্ত্রের কুহকে পরস্পরকে চূর্ণবিচূর্ণ না করিয়া সৃষ্টির সামঞ্জস্য ও নিত্যত্ব রক্ষা করিতেছে। অপার করুণাময় বিশ্বেশ্বর কি একটী অযথা ভেদজ্ঞান সম্বলিত জড় চেতনকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে ধ্বংস করিবার জন্যই এ জগত প্রকাশ করিয়াছিলেন? এইজন্যই কি তাঁহার করুণাসাগর উছলিয়া উঠিয়াছিল? তিনি সর্ব্ব-নিয়ামক ও ভীষণ শাস্তা এই ভয়েই কি জীব শ্রেষ্ঠ মানব কেবল বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াই এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারী অদ্বিতীয় পুরুষকে করুণাময়, প্রেমময় প্রভৃতি অভিধান দ্বারা অভিহিত করতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া স্ব স্ব সুখ স্বার্থ লাভ করিয়া আসিতেছে! হায়! বলবান অত্যাচারীগণের চরণতলে চির তোষামোদ বাধি সেটন করাই কি মানবের নিয়তি? এ চিন্তা মনে আসিলেও কেমন একটা জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়; মানব মানবত্বে পতিত হয়। সুতরাং কেবলমাত্র অনাদি ভেদনীতি দ্বারা জগৎপাতার এই চির বিচিত্র নয়ন মনোরঞ্জন চির সুন্দর, চির সুখকর জগৎ পালিত হওয়া অসম্ভব।

তথা কথিত বহুধা বিভিন্নতার মধ্যে একটা একত্ব বা অভেদত্ব ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। শিশ্নোদর তৃপ্তিজাত ভোগ বিলাসরত আত্মবৎসল মানবের স্থূলদৃষ্টি তাহা দেখিতে পায় না। পরকে সন্তপ্ত করিয়া পরের বুকের উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া চালাইয়া, স্বীয় বেশভূষার চটকে পরের নেত্র ঝলসিত করিয়া আত্মেতর সকলের উপর নায়কত্বের অভিমান লইয়া, আত্মবিদ্যা বুদ্ধিকে অভ্রান্ত ভাবিয়া যাঁহারা আত্মসুখানুভূতির অযথা পুষ্টির নিমিত্ত কোন এক উৎকট বাসনা চালিত হইয়া নর-নায়ক বা জগ-নায়ক হইতে প্রয়াসী, তাঁহাদের অবিদ্যা অঞ্জনচ্ছুরিত বদ্ধ দৃষ্টিতে জড় চেতনের মধ্যে একটী মিলনের মধুর সংবাদ প্রীতির একটী প্রাণস্পর্শী মাধুর্য্য তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। জীবে জড়ে, অণুতে বৃহতে, অম্লে মধুরে, স্ত্রী ও পুরুষে তাঁহারা কেবল মাত্র একটী দৈহিক সুখানুভূতি সম্পাদক সম্বন্ধমাত্র বুঝিতে সমর্থ হয়েন। বিশ্ব-স্রষ্টার বিচিত্র বিধানে জড় চেতন সকলেই পরস্পরের সেবা রত। স্বীয় দেহ ও মন দিয়া পর সেবাই সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত। প্রত্যেকে স্বীয় বিভিন্ন অঙ্গসমূহ দ্বারা, আত্ম-ফল-ফুল, কাণ্ডমূল, পল্লবাদি দ্বারা পরকে সেবা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন ও সর্ব্বশেষ পরের জন্য বা পরসেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া আত্মোৎকর্ষের চরমসীমা স্বরূপ বিশ্ব ও বিশ্বান্তরালে স্থিত বিশ্বেশ্বরের সেবা পাইবার অধিকারী।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত।

তমাল ঘন বন
সন সন
সমীরণে,
বিজলি কাল মেঘে
উঠে জেগে
ক্ষণে ক্ষণে।

হেরিয়া অলিকুল
ফোটে ফুল
অনুরাগে,
কি জানি বিনি বিনি
চিনি চিনি
ধ্বনি জাগে।

আসি উড়ে কেন
পড়ে হেন
আঁখি মাঝে,
রূপসী ঢাকে মুখ
চাঁদ মুখ
নত লাজে।

তুমি অপরিচিত
ছিল এত
চেনা শোনা,
ব্রজের বনে বনে
মনে মনে
আনাগোনা।

ভাষায় আশা দিতে
বনশ্রীতে
এসেছিলে,
ঝুলনা ভাল করে
ফুল ডোরে
বেঁধে গেলে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আশা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয় খণ্ড।

(১)

প্রসারশীলতাই জীবনের লক্ষণ; যাহা চিরদিন একই থাকিয়া যায় তাহাই জড়, তাহাই মৃত। জৈবিক কোষাবস্থা হইতে পরিস্ফুট ও উন্নত মানবজীবন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই জীবন সেই একই লক্ষণাক্রান্ত,—সেই এক হইতে বহুধা বিকশিত হওয়াই জীবের জীবনের লক্ষণ। এই নিয়ম যে কেবল জীবের দৈহিক ব্যাপারের উপর খাটিবে তাহা নহে, জীবের মানসিক ব্যাপারের উপরও উহার সম্পূর্ণ অধিকার। এককোষী জীব (Unicellulor Protozoa) যেমন আপনা হইতে বহু কোষী হইয়া উঠে, তেমনি তাহারই মধ্যে আপনার সুখ দুঃখটুকুও অন্যান্য কোষের সহিত অংশ করিয়া লয়। এই ব্যাপক ক্রমবিকাশের নিয়ম উন্নত জীবেও সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। কোন জীবই অন্তরে বাহিরে একটী মাত্র থাকিতে পারে না—সে তাহার বাহির ও অন্তরের চাপে ক্রমশঃই এক হইতে বহু হইয়া উঠে। জীব যতই উন্নত হয় ততই বাহিরে সমাজ-বন্ধ ও অন্তরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধে, স্বীয় সুখ দুঃখের সঙ্গে পরের সুখ দুঃখের একত্ব অনুভব প্রভৃতি মানসিক প্রসারেও সে এক হইতে বহু হইয়া উঠে।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার আমিত্বের, একত্বেরও বিকাশ হয়, "ক্ষুদ্র অহং" হইতে সে ক্রমশঃ "বৃহৎ অহং" হইয়া উঠে। তাহার অহং অপ্রজ্ঞাত "ছায়া ছায়া ভাব" ত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। উন্নতজীব. মানবের অহং যেরূপ পরিস্ফুট ভাবে এক সেইরূপই পরিস্ফুট ভাবে বহু—তাহার স্বার্থ যেরূপ বৃহৎ তাহার পরার্থও সেইরূপ সুদূর প্রসারী। এইরূপে দেখিতে গেলে দেখা যায় যে এক ও বহু সসীম ও অসীম একসঙ্গেই আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়া যুগপৎ, দ্বৈতহীন একমেবাদ্বিতীয়ং ও ভূমাস্বরূপ বিরাট হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর ইতিমধ্যে প্রায় ১২।১৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সম্বলপুরের সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক জীবনের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মযশঃ ক্রমশঃ যতই আপনাকে সন্ন্যাসীর একত্ব হইতে সংসারীর বহুত্বে পরিণত করিতেছিলেন, বিষ্ণুযশঃ ততই যেন আপনাকে দূরে দূরে সরাইয়া লইয়া আপনার মধ্যে আপনি সীমাবদ্ধ হইতেছিল। তাহার পিতা এখন সেই গ্রামের বহু সদনুষ্ঠানের নিয়ন্তা—গ্রামের পশুরক্ষিণী সভা, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, স্বাস্থ্যরক্ষিণী প্রভৃতি জনোন্নতি বিধায়িনী প্রতিষ্ঠান সমূহের তিনিই জনক; এবং সেই সঙ্গে একটি দেবালয় স্থাপিত করিয়া তাহারই প্রাঙ্গনে একটী ধর্ম্মরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বহু দেশ হইতে বহু সন্ন্যাসী ও আচার্য্য আসিয়া মাঝে মাঝে সেই মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। এতদ্ব্যতীত শিল্পবিদ্যা ও কলাবিদ্যার শিক্ষার জন্যও তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি আপন চেষ্টায় ও উপদেশে অনেকগুলি নিঃস্বার্থপর যুবকের সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন এবং নিকটস্থ বহু গ্রামের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার অর্থশালী বন্ধু ও শিষ্যের অভাব ছিল না। এই সমস্ত কারণে এই ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে এমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল যাহাতে সে তাহার আপন ক্ষমতা বহু দূর বিস্তৃত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্মযশঃ মূলতঃ যাহার শিক্ষার জন্য আপনাকে একভাগে বিভক্ত করিয়া তুলিতেছিলেন সেই বিষ্ণুযশঃ ক্রমশঃ আর একপ্রকারের জীব হইয়া উঠিতেছিল। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হইয়া উঠিতেছিল। সে যে তাহার পিতার বৃহদানুষ্ঠান সমূহ হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিত.তাহা নহে বরঞ্চ অধিকাংশ সময় তাহার পিতাকে সাহায্য করিতে অতিবাহিত হইত। তথাপি তাহার অন্তরের মধ্যে যেন আর একটী অপূর্ব্ব মনুষ্য ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া তাহাকে বৃহৎ না করিয়া নিতান্তই একাকী করিয়া তুলিতেছিল। তাহার পিতা যেমন সময় পাইলেই সকলের মধ্যে আপনাকে ডুবাইতেন সেও সেইরূপ শিক্ষা, সাধনা ও কর্ম্মের অবসরে নিতান্তই একাকী হইত। এমন কি সময় সময় কর্ম্মের ও শিক্ষার অত্যধিক ভাবের সময়েও সে মাঝে মাঝে এতই অন্যমনস্ক হইয়া উঠিত যে ব্রহ্মযশঃকে মাঝে মাঝে তাহার জন্য অনুযোগ করিতে হইত।

ব্রহ্মযশঃ পুত্রকে সুখ দুঃখ সহনাক্ষম অক্লিষ্টকর্ম্মা করিয়া তুলিয়াছেন, ধ্যান ধারণাদির দ্বারা তাহার আভ্যন্তরিক জীবনের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, সর্ব্বোপরি আপনার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শের দ্বারা তাহাকে কর্ম্মযোগী করিয়া তুলিয়াছেন—তথাপি কোথায় যেন কি একটা অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। বিষ্ণু যেন সর্ব্ববিষয়ে লিপ্ত অথচ তাহার অন্তরে ঠিক মাঝখানটিতে সে সম্পূর্ণ একাকী ও লক্ষ্যহীন।

তাহার এই আভ্যন্তরিক ঔদাসীন্য আর কেহ লক্ষ্য করুক আর নাই করুক ভুবনেশ্বরী দেবী ইহা সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং আর একজনও সম্পূর্ণ লক্ষ্য করিয়াছিল। সে লক্ষ্মী। ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁহার স্বামীর কোন কার্য্যেই বাধা দিতেন না এবং সর্ব্বদাই তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তথাপি তাঁহার মাতৃচক্ষের সম্মুখে পুত্রের এই আভ্যন্তরিক সম্পূর্ণ ঔদাস্য ও সঙ্গহীনতা ধরা না দিয়া থাকিতে পারে নাই। সেইজন্য স্বামী যখন স্বীয় মহান্ আদর্শ ও আশার আকর্ষণে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া পুত্রের অন্তরের সংবাদ রাখিতেন না, তখন ভুবনেশ্বরী স্বীয় মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষীরধারায় পুত্রের

আভ্যন্তরিক বিকাশমান মনুষ্যত্বটীর পুষ্টিসাধন করিতেন। সে যখন নিতান্তই একাকী তখন সহসা সচকিত হইয়া অনুভব করিত তাহার মাতা তাহার অত্যন্ত নিকটে। বিষ্ণু যখন তাহার শাস্ত্রপুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিত "কি চাই ? কি পাইলে তাহার অন্তরের ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়", তখনই দেখিত তাহার মাতা আসিয়া তাহার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া গভীর স্নেহে পরম সহানুভূতিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন ; বড় বড় জ্ঞানের কথা, বড় বড় তর্কশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীর কূটতত্ত্বগুলি যাহা দিতে পারিতেছে না, তাহার মাতার একটীমাত্র স্নেহদৃষ্টি তাহাকে তাহা প্রচুর পরিমাণে দিয়া তাহার হৃদয়-ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে। সে তাহার পিতার গভীর স্নেহের বিষয়ে অজ্ঞ নহে, সে তাহার দেবোপম পিতার নিঃস্বার্থ কর্ম্মের মর্য্যাদা গ্রহণে অপারগ নহে। তথাপি কি যে চাই, কোন অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি গভীর বেদনা তাহাকে দূরে দূরে অতি দূরে লইয়া যাইতে চায়, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। তাহার পিতা তাহার অন্তরকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা যতখানি বলে বৃহৎ করিয়া তুলিতেছেন সেও যেন ততখানি বলে অন্তরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। সেই ক্ষুদ্র অন্তরের কোন্‌টীর মধ্যে কাহার আকর্ষণ নীরবে কার্য্য করিতেছে ? কাহার বাঁশী তাহাকে সমস্ত কর্ম্ম ভুলাইয়া এমন প্রবল আকর্ষণে টানিয়া লইতে চায় ? কে সে, যাহার অস্তিত্ব কোন তত্ত্বশাস্ত্রের বা দর্শনের সাহায্যে জানিবার যো নাই, অথচ সে আছে—আছে—আছে, অতি প্রবল, অতি নিষ্ঠুর অথচ অতি শান্ত, অতি কোমল হইয়া অন্তরের কেন্দ্রস্থলে পদ্মাসনে বসিয়া আছে। যখন চতুর্দ্দিকে কর্ত্তব্যকর্ম্মের ঠেলাঠেলি, যখন চতুর্দ্দিকে মতামতের মহাযুদ্ধ, যখন বহিরন্তরের সর্ব্বস্থানে কেবল স্পষ্টতা, কেবল কাঠিন্য সমস্তই যখন তীব্র আলোকে আলোকিত তখন কোন এক অজ্ঞাত অস্পষ্টতা ও ছায়া-বহুলতার মধ্যে একটী করুণ স্বর তাহার কর্ণে আসিয়া বাজিতে থাকে। তখন সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া যায়, তখন সমস্ত আলোকই একটী অপূর্ব্ব ছায়ায় মণ্ডিত হইয়া উঠে, আর তখনই সমস্ত বহিরন্তরের শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, প্রণব থামিয়া গিয়া মনের মধ্যে নীরবতার প্রবল সরবতা জাগিয়া উঠে।

ব্রহ্মযশঃ ইহা লক্ষ্য করিতেন না অথবা লক্ষ্য করিলেও ইহার দিকে ততটা মন দিতেন না। তিনি পুত্রকে তাঁহার আদর্শানুযায়ী জিমনাষ্টিক (Gymnastic) করাইয়াই যেন সন্তুষ্ট। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহার মধ্যে সরসতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার যেখানে প্রাণ ছিল বিষ্ণুর প্রাণ সেখানে ছিল না ; সেইজন্য তাঁহার প্রাণের প্রচণ্ড কম্পন বিষ্ণুর প্রাণে কোনরূপ সজীবতাকে জাগাইত না। যদিও বিষ্ণুর সে বিষয়ে চেষ্টা ও যত্নের অভাব ছিল না তথাপি তাহার প্রাণ তাহার পিতার ডাকে সম্পূর্ণ সাড়া দিত না।

ভুবনেশ্বরী যেমন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তেমনি আর একটী রমণীও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। লক্ষ্মী এই ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে অনেকখানি পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে তাহার দেহও যেমন পরিপূর্ণতা ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে,তাহার মনেরও সেইরূপই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রহ্মযশের ও ভুবনেশ্বরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এই পশ্চিমদেশীয়া বালিকা মনে ও দেহে তাঁহাদের অনুরূপই হইয়াছে। অথচ তাহার সেই আজন্মের তেজস্বিতা ও রমণীয়তা বাড়িয়াছে ভিন্ন কমে নাই। সর্ব্বোপরি ব্রহ্মযশের প্রাণপণ চেষ্টায় সে তাহার জীবনকে তাঁহারই আদর্শের জন্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। সে এখন মনে প্রাণে ব্রহ্মযশেরই হইয়াছে। তাহার চিন্তা, তাহার নিষ্ঠা, তাহার সংযম, তাহার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই এখন ব্রহ্মযশের। সেইজন্য ব্রহ্মযশঃ যেমন তাঁহার পুত্রের উপর একটা মহান্ আশা স্থাপিত করিয়াছিলেন, এই বিকাশোন্মুখী নারীহৃদয়ও তেমনি একটী মহান্ আশা তাহার উপর স্থাপিত করিয়াছিল। ব্রহ্মযশঃ যে কোন দিন তাঁহার অপূর্ব্ব আশার কথা লক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অন্তরের গূঢ় কথাটি অন্তরে অন্তরেই বালিকা শিষ্যার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বিষ্ণুর প্রতিকার্য্য অতিশয় মনোযোগের সহিত দেখিত। এবং সেইজন্য বিষ্ণুর মনের অবস্থাও যেন সে কতকটা অনুভব করিতে পারিয়াছিল এবং মনে মনে সেই কারণে যথেষ্ট বেদনা অনুভব করিত। বিষ্ণুর উপর তাহার ভক্তি শ্রদ্ধার

অভাব ছিল না কিন্তু পিতা তাহার নিকট সাক্ষাৎ দেবতা। সেইজন্য পিতাপুত্রের আভ্যন্তরিক ব্যবধান যদিও অতি সূক্ষ্ম ছিল তথাপি মেধাবিনী লক্ষ্মীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে উহা অতিক্রম করিতে পারে নাই।

(২)

শরৎ প্রভাত। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই কিন্তু সমস্ত পূর্ব্বগগন গভীর রক্তবর্ণে রঞ্জিত, এবং সেই রক্তাভা ভেদ করিয়া উদয়োন্মুখ সূর্য্যের রশ্মিরেখা দূরে দূরে প্রসারিত হইতেছে। প্রভাত বায়ু ধান্যের গন্ধের ভারে অলস মন্থর গতিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বহমান। সমস্ত জগতের প্রাণের সহিত আজ এই ধান্যগন্ধবাহী বায়ু সেই ক্ষুদ্র সবলপুর গ্রামের প্রাণের যোগসাধন করিয়া দূর দূরান্তে বহিয়া যাইতেছে।

বর্ষার পরে গ্রাম্য নদীটী কূলে কূলে পরিপূর্ণা না হইলেও নিতান্ত শীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু তাহার জল অনেক স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। প্রাতঃস্নান সারিয়া বিষ্ণুযশা ও ভগবতীচরণ জলে দাঁড়াইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনা করিতেছিল। তীরে দাঁড়াইয়া হরিদাস দেহের জল গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা মুছিতে মুছিতে তাহার স্বাভাবিক মধুর স্বরে হরিনাম গান করিতেছিল।

ভগবতীচরণ আহ্নিক সমাপনান্তে তীরে উঠিয়া ফিরিয়া দেখিল বিষ্ণু অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার মুখে মন্ত্রোচ্চারণের কোন ভঙ্গি বা শব্দ নাই; সে যে জপ করিতেছে তাহাও বোধ হইল না। তথাপি সে সেই একইভাবে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে চাহিয়াই আছে। কি দেখিতেছে, কি ভাবিতেছে, কি করিতেছে সেই জানে, কেবল তাহার মুখে চক্ষে একটা কাতরতা, একটা আকাঙ্ক্ষার বেদনা ফুটিয়া রহিয়াছে। ভবানীচরণ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চাহিয়া শেষে ডাকিল "বিষ্ণু"। বিষ্ণুযশাও চকিতে চেতনা লাভ করিয়া হাসিয়া তাহাকে ইঙ্গিতে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া লইল।

তাহার পর তীরে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রের জল নিংড়াইতে নিংড়াইতে বলিল,—"ভগবতি! এমন সুন্দর প্রভাতে তোমার কি ইচ্ছা করে বল দেখি।

ভবানীচরণ হাসিয়া বলিল,—"কেন? কি আবার ইচ্ছা করে। কিছুই না।"

বিষ্ণু। আমার ইচ্ছা করে খুব অনেক দূরে চলিয়া যাই। সূর্য্যের ঐ ছটাগুলা দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন দূরদেশের দিকে মনটাকে অঙ্গুলি দ্বারা পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছে। এমন প্রভাতে আমার মন কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে না।

ভগবতীচরণ বিষ্ণুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত থাকিয়া থাকিয়া বিষ্ণুকে অনেকটা বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই সে বিষ্ণুযশের কথার কোনরূপ উত্তর না দিয়া বলিল,—"চল বাড়ী চল।"

ভগবতীর দিক হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া, বিষ্ণু হরিদাসের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা হরি দা, তোমার কি ইচ্ছা করে?"

হরিদাস। আমার কথা যদি জিজ্ঞাসা করলে দাদাঠাকুর তা'হলে বলি আমার মনটা ঠিক ঘুঘরোপোকার মত। সেটা কেবলি অন্ধকারের মধ্যে মাটির তলাতে থাকতেই ভালবাসে। যদি কোন কারণে বাইরে গিয়ে পড়ে তাহ'লে যতক্ষণ না এই বাড়ীটাতে ফিরে আসতে পারে ততক্ষণ সে স্বস্তিতে থাকে না।

বিষ্ণু কাহারও নিকট হইতে মনের মতন উত্তর না পাইয়া একবার নদীর পানে চাহিল। তাহার পর পরপারের শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিয়া চলিয়া তাহার দৃষ্টি দূরস্থিত ধূমাবৃত পর্ব্বত শীর্ষে স্থাপিত হইল এবং শেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল "চল।"

পথে চলিতে চলিতে ভবানীচরণ হঠাৎ বলিল "আচ্ছা বিষ্ণু তোমার যদি এত বেড়াইতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঠাকুরজীকে সে কথা বল না কেন?"

বিষ্ণু। মাঝে মাঝে আমিও মনে করি বলিব, কিন্তু ভয় হয় যদি তিনি অনুমতি না দেন।

ভবানী। না দিবার ত' কোন কারণ দেখি না। যাহাই হউক একবার বলিয়া দেখিও।

বিষ্ণু আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু প্রভাতের সেই উদ্বেগ, সেই কাতরতা তাহার সেইদিনকার সমস্ত কর্ম্মের উপর একটা অবসাদের ভারের মত চাপিয়া রহিল।

সেইজন্ত সন্ধ্যার সময় পিতাপুত্রে মুখামুখী হইয়া বসিবামাত্র ব্রহ্মবশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? বিষ্ণু তোমাকে আজ সমস্ত দিন এত অন্যমনস্ক দেখিলাম কেন?"

বিষ্ণু। বাবা, কিছুদিন বেড়াইতে গেলে হয় না? আমার দূরদেশ দেখিবার ইচ্ছা করে।

ব্রহ্ম। দূর দেশ? কতদূর যাইতে ইচ্ছা কর?

বিষ্ণু। যত দূর পারি। কেবলই এই এক স্থানে থাকিয়া থাকিয়া আমার মনে হইতেছে আমি যেন কূপ-মণ্ডুক হইয়া যাইতেছি।

ব্রহ্ম। বেশ তা' হলে আয়োজন কর। কিন্তু তোমার মা এবং লক্ষ্মীর কি ব্যবস্থা করিব।

বিষ্ণু। উঁহারাও সঙ্গে চলুন।

ব্রহ্ম। তাহাতে অনেক বাধা;—প্রথমতঃ আমাদের স্বাধীন ভাব অনেক খানি হ্রাস হইবে দ্বিতীয়তঃ তাহাতে অনেক অধিক ব্যয়ও ঘটিবে তাহার অপেক্ষা কোন আত্মীয়ের নিকটে উহাদের রাখিয়া পরে দেশ ভ্রমণে বাহির হইতে পারিলেই ভাল হয়।

বিষ্ণু। তাহা হইলে মা'কে একবার বলিয়া দেখি তিনি কি বলেন। খুড়ো মহাশয়কে পত্র লিখিয়া উহার ব্যবস্থা হইতে পারে না কি?

ব্রহ্ম। আমিও তাহাই ভাবিতেছি। যাহা হউক শীঘ্রই ব্যবস্থা করিতেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

ব্যবস্থা হইল যে, ভুবনেশ্বরী ও লক্ষ্মীকে কলিকাতায় কোন এক আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তাঁহারা দেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন। সম্বলপুরের সমস্ত ভার রামরজ মিত্রের উপর পতিত হইল।

(৩)

কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী বৃহৎ অট্টালিকায় সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বহুপ্রকার ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থশালী হইয়া কলিকাতায় পুত্রকন্যার শিক্ষাদির জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যদিও ব্যবসাদার লোক, তথাপি সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার জন্ত সকলেরই প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন, এবং সেই কারণেই তাঁহার ব্যবসাও দিন দিন উন্নতিলাভ করিতেছিল। সৎকার্য্যে দান, বন্ধু ও আত্মীয়গণের সাহায্যার্থে তাঁহার ভাণ্ডার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। সর্ব্বোপরি তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার এবং ধর্ম্মমতের উদারতার জন্য তিনি বন্ধুবান্ধব সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দুই পুত্র ও একটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ব্যবসা সম্বন্ধেও শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতের উপায় বিধান করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রটী ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। অবশ্য এই বিষয়ে তাঁহার নিজ ইচ্ছার অপেক্ষা পুত্রদের মতিগতির উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং সেই কারণেই তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু হইলেও কন্যাটীকে বেথুন (Bethune) কলেজে পড়াইয়া শিক্ষিত করিতেছিলেন এবং কনিষ্ঠ পুত্রটী বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাতেও তিনি অমত করেন নাই।

তিনি বহুদিন হইতেই বিপত্নীক; সেই কারণেই তিনি পুত্রকন্যাগণের পিতা ও মাতা উভয়ের স্থানই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সেইসঙ্গে আপনার সাধু চরিত্রের ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মের উচ্চাদর্শে পুত্রকন্যাগণকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন কি তাঁহার শিক্ষিত বন্ধুগণের মধ্যে তিনি জনক ঋষি নামে অভিহিত হইতেন।

তাঁহার গৃহে হিন্দু-পরিবারোচিত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অভাব ছিল না; এতদ্ব্যতীত স্বীয় গ্রামে অতিথিশালা, দাতব্য চিকিৎসালয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং দরিদ্র আত্মীয়গণকে স্থানদান ও জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন।

কিন্তু অনাবিল সুখ কাহারও ভাগ্যে থাকে না। তাঁহার উদার মতের জন্ত এবং স্বীয় আদর্শানুযায়ী জীবনযাপনের জন্ত তিনি অনেক গোঁড়া হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং অনেক আত্মীয় তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াও গোপনে তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা করিত। কিন্তু তিনি কখনও সেজন্ত কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিরক্তিপ্রকাশ করিতেন না। এমন কি তাঁহার গম্ভীর উদার সদ্ব্যবহারের

জন্যই অনেকে তাঁহার শত্রুতা করিত। কিন্তু তিনি এই সব ক্ষুদ্রচেতাদিগের ব্যবহার গম্ভীরভাবে উপেক্ষা করিয়া বলিতেন যে, "সৎকার্য্য যদি অতি সহজই হয়, তাহা হইলে জগতে সাধুতার কোনই গৌরব থাকে না। যাঁর গৌরবে ধর্ম্মের গৌরব তিনি আমার মাথায় থাকুন আমি আর কিছুই চাই না।"

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিয়ব্রত যদিও পিতার বৈষয়িক কার্য্যের প্রধান সহায় তথাপি তাঁহার মধ্যে একটা মানসিক ঘূর্ণিবায়ু ছিল। সেই বায়ুর তাড়নে সে সর্ব্বদাই কাজে অকাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। একটা কিছু হাতের কাছে না হইলে তাহার চলিত না। এই কারণে সে পিতার ব্যবসায়ের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ছাড়াও আরও বহুপ্রকার (Self-imposed duties) স্বরচিত কর্ত্তব্যের বোঝা আপনার স্কন্ধে চাপাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। উদাহরণ স্বরূপে দু'একটার উল্লেখ করি; কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সমস্ত পাটের ও অন্যান্য বস্তুর কলকারখানা আছে তাহাতে বহু দরিদ্র ব্যক্তি কুলির কার্য্য করে। তাহাদের দৈনিক জীবনযাপনের প্রণালী ও কারখানার ভিতরকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ প্রিয়ব্রতের একটী ব্রত। নিজ কলিকাতা সহরের কুলি মজুরের অবস্থার খবর রাখাও তাহার একটী কার্য্য। এবং সর্ব্বোপরি দরিদ্র অথচ বহু ভদ্র গৃহস্থের পারিবারিক সংবাদ রাখিয়া তাহাদের জীবনোপায় বিধান করিবার চেষ্টা করাও তাহার জীবনের ব্রত।

এই সমস্ত কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অনেকগুলি অনুচর বন্ধুও জুটিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে সে বহু অগম্য স্থানের ভিতরকার সংবাদ পাইত এবং ইহাদের দ্বারাই সে আপনার অর্থ ও সামর্থ্যের সাহায্য দিকে দিকে ছড়াইয়া দিত। অর্থ সাহায্যে মানুষের প্রকৃত অভাব দূর হয় না বলিয়া সে অনেক ভদ্র পরিবারের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র শিল্পের শিক্ষা ও উপায়বিধান করিয়াছিল। এবং এতদর্থে অনেকগুলি যুবক বন্ধুর সাহায্যে দূর পল্লীগ্রাম বা অন্যান্য স্থান হইতে হস্ত-শিল্প-কৌশল শিক্ষা করিয়া ইহাদের মধ্যে প্রচারিত করিত। পরে এইমত শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে বাজারে বিক্রীত হইতে পারে তাহার জন্য একটা বিক্রয়-মণ্ডলী স্থাপিত করিয়াছিল। ইহাতে যাঁহারা শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতেন তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে উৎপাদন করিয়াই চলিতেন, বিক্রয়ের ভাবনা তাঁহাদের ভাবিতে হইত না, অথচ যাহারা বিক্রয় করিত তাহারাও বেশ দু' পয়সা লাভ পাইত।

পৈতৃক ব্যবসায়-বুদ্ধিকে এইরূপে পরোপকারার্থে নিয়োজিত করিয়া প্রিয়ব্রত নিজের ও ভবিষ্যতের উন্নতির পথও উন্মুক্ত করিতেছিল। তাহার পিতাও এবিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। এবং কোন আত্মীয় বা বন্ধু যদি এবিষয়ে কোন কথা বলিতেন বা বাধা দিতেন তাহাতে সত্যব্রত হাসিয়া বলিতেন "বালকের অন্তর্নিহিত শক্তি ও চেষ্টাকে জাগাইয়া তোলা ও তাহাকে উপযুক্ত পথে নিয়োজিত করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আমি আমার আপন আপন আদর্শ বা ইচ্ছাকে যদি উহাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিই তাহা হইলে উহাদের উন্নতি স্বভাবানুযায়ী হইবে না এবং হয়তো বিফল হইবে। ভগবান উহাদিগকে যেদিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন আমি কেন বাধা দিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব?"

সত্যব্রত এই আদর্শানুসারেই তাঁহার পুত্রকন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সেইজন্যই তাঁহার সন্তানগণের চিত্ত আপনাদের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি ও চেষ্টানুসারেই ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইতেছিল।

কনিষ্ঠ পুত্র শিবব্রত কতকটা ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সে কবিতা লিখিত, সভাসমিতিতে যোগ দিত, বক্তৃতা করিত এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ ২।৪ দিনের জন্য একেবারে উধাও হইয়া কোথায় চলিয়া যাইত কেহ তাহার খোঁজ পাইত না।

তাঁহার কন্যা মহামায়া আবার এই অল্প বয়সেই তাহার ভ্রাতাদিগকেও এক এক বিষয়ে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মধ্যে প্রায় সকল বিষয়েই তাহার নিজের এক একটী মত ছিল। এবং সেই সমস্ত মত লইয়া সে যখন তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটী একদিকে হেলাইয়া তাহার ভ্রাতা বা তাহার পিতা বা অন্য কাহারও সহিত তর্ক করিত তখন তাহার পিতা সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিতেন "মা আমার লীলাবতী হইবে।"

(৪)

সন্ধ্যা হইয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের গাছগুলা উদাসীনের ন্যায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। রাস্তায় লোকচলাচল একপ্রকার বন্ধ, তথাপি বরফওয়ালার বিক্রয়াশাহীন হাঁকাহাঁকির বিরাম নাই—এমন দিনে কেহ বরফ কিনিবে না তথাপি তাহাকে পেটের দায়ে এই কর্ম্মভোগ ভুগিতে হইবে। মিউনিসিপাল লাইটারটী মাত্র তাহার এই কর্ম্মভোগের সঙ্গী—কারণ রাস্তায় আলোর প্রয়োজন হউক আর না হউক তাহাকে একটীর পর একটী করিয়া আলো জ্বালিতে হইবে। ল্যাম্পগুলিও বৃষ্টির অন্ধকারে আবৃত হইয়া দূর হইতে তাহাদের অস্তিত্ব মাত্র জ্ঞাপন করিতে পারিতেছে—কে যেন তাহাদের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে তাই তাহারা অতি ক্ষীণস্বরে পথিকদের দূর হইতে বলিতেছে—"ভয় নেই আমরা আছি, আছি—আছি!"

প্রিয়ব্রত তাহার কক্ষে একখানা চৌকির উপর বসিয়া তাহার বন্ধু শ্যামাচরণের সঙ্গে একটা বাড়ীর প্ল্যানের খসড়া লইয়া মৃদুস্বরে আলোচনা করিতেছিল। শ্যামাচরণ সেই প্ল্যানটার মধ্যে দু' একটা স্থান বদলাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু প্রিয়ব্রত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "না তাহ'লে এই ঘরটায় বাতাস যাবে না।

শ্যামা। কিন্তু তাহ'লে দেখ্‌তে যে কি রকম বেখাপ্পা হচ্চে। আর্টের খাতিরে—

প্রিয়। আর্টের খাতিরে স্বাস্থ্যের নিয়ম ভাঙ্গা ঠিক নয়।

শ্যামা। অথচ সংসারে সর্ব্বদাই তা হ'চ্চে।

প্রিয়। তা' হোক এখন তোমার যদি অন্য কিছু বলবার থাকে ত' বল।

শ্যামা। তুমি এই প্ল্যানের মধ্যে কেবল যখন জিওমেট্রী আর ট্রিগনোমেট্রীর আর Mechanicsএর স্থান করেছ তখন আমার মত আর্টক্রিটিকের মতের স্থান এতে নেই।

প্রিয়। এই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে তোমার কাজ করতে হবে। তুমি এটা যাতে এরই মধ্যে বেশ একটু দেখ্‌তে ভাল হয় তাই করে দাও। আর্টই কাজের প্রাণ নয়, সুখস্বচ্ছন্দ ও সুবিধাকে ভিত্তি ক'রে আর্টকে জাহির কর।

তাহারা যখন এইরূপ কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত সেই সময় মহামায়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাদের তর্ক শুনিতেছিল। প্রিয়ব্রত ও শ্যামাচরণ বাহিরের বৃষ্টির শব্দে তাহার আগমন জানিতে পারে নাই। কিন্তু প্রিয়-ব্রতের শেষ কথা কয়টী শুনিয়া মহামায়া যখন হাসিয়া উঠিল তখন উভয়েই চমকিত হইয়া দেখিল মহামায়া। উজ্জ্বল দীপালোকে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি এবং তদুপরি তাহার হঠাৎ আবির্ভাব এবং অপ্রত্যাশিত হাস্যধ্বনি উভয়কেই চমকিত করিল। প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করিল "তুই কখন এলি?"

মহামায়া। আমি তোমাদের গুজুরগুজুর শব্দ শু'নে দেখ্‌তে এলাম কি কর্‌ছ, এসে দেখি ওমা একটা প্ল্যান! আমি ভেবেছিলাম শ্যামাদাদা যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই এ কথাটা গুরুতর কথা হ'চ্চে, তা নয় একটা প্ল্যান।

শ্যামা। তা' হাস্‌লে কেন?

মহামায়া। আপনার রকম দেখে। আমাদের সঙ্গে এত তর্ক করেন আর বড় দাদার পাল্লায় পড়্‌লে অমনি কাঁচপোকার কাছে তেলাপোকার মত যা বলেন তাতেই হুঁ।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা বল ত মায়া, এই প্ল্যানটা কেমন হয়েছে, আমি বলছি যে, যাতে দেখতেও সৌষ্ঠব হয় অথচ কাজ চলে এমন একটা কিছু করার দরকার। প্রিয় বল্‌ছে—

মহামায়া। উনি বলবেন যা তা জানি কিন্তু আমার মতে ও আর্টও কিছু নয়, জিওমেট্রীও কিছু নয়। প্ল্যান হতে ও দুটোকেই বাদ দেওয়া উচিত, নইলে মৌলিক কিছু হবে না।

প্রিয়। কেন শুনি?

মায়া। জ্যামিতির মূল ভিত্তি হ'চ্চে "বিন্দুর" আইডিয়া হ'তে, বিন্দু হ'চ্চে—যার অস্তিত্ব আছে অথচ পরিমাণ নাই। অথচ এই পরিমাণ হীন অস্তিত্ব হইতেই রেখা, রেখা হ'তে তল আর তল হ'তেই ঘনত্ব। যার পরিমাণ নেই তা হ'তে কখনও পরিমাণ হ'তে পারে? অতএব জ্যামিতির সমস্ত ব্যাপারই ভুয়ো এবং কাজেকাজেই ট্রিগনোমেট্রীও নেই। আর আর্ট? সেটা ত একটা মানসিক ব্যাপার, ওর জন্যই

বা এত মারামারি কেন। এটা ওর মত করতে হ'বে, এটা ওর সঙ্গে মিল্‌বে রোমান গথিক, ইণ্ডো-ইয়োরোপিয়ান ইণ্ডিয়ান,—মাথা মুণ্ডু—এ সবই যখন convention তখন ও সব বাদ দিয়ে ফেলাই ভাল তা'তে জগতের অনেক উপকার হ'বে।

প্রিয়ব্রত উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। শ্যামাচরণ মনে মনে বিরক্ত হইল কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া মহামায়াও হাসিয়া ফেলিল। শ্যামাচরণ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল "তা তোমরা হাস আর যাই কর, সংসারে আর্টকে ডিঙ্গিয়ে যা কিছু আছে সবই বর্ব্বরতা।"

প্রিয়। সরলতা বর্ব্বরতা হ'তে আর্টের বর্ব্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়াও একটা কুসংস্কার। যাক্, ও নিয়ে তর্ক কর্‌তে হয়, তোমরা ক'র, আমার তর্কের সময় নেই। এখন এটার যা হয় একটা কিছু করে দাও।

ইতিমধ্যে জলে ভিজিতে ভিজিতে আর এক ব্যক্তি আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই প্রিয়ব্রত ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি গিরীন, কি হ'ল?"

আগন্তুক তাহার ভিজা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল "না ভাই, আমি কিছুতেই পারলাম না।"

প্রিয়। পার্‌লে না কিহে? তা হ'লে কি আজ তারা এই বৃষ্টিতে সারা রাত ভিজবে না কি?"

গিরীন্দ্র। উপায় কি?

প্রিয়। উপায় কি? কি সর্ব্বনাশ! তা' হ'লে তুমি কাপড় ছাড় আমি নিজেই একবার দেখি।

প্রিয়ব্রত বাহির হইবার উপক্রম করিবামাত্র শ্যামাচরণ বলিল "ওয়াটার প্রুফটা নিও হে।" প্রিয় কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। মহামায়া হাসিয়া বলিল "গিরীন বাবুর যেমন কাণ্ড! এই বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে খবর দিতে এলেন কি ক'রতে? দাঁড়ান একখানা কাপড় আনিয়ে দিই।" মহামায়া বাহির হইয়া গেলে শ্যামাচরণ গিরীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি?" গিরীন্দ্র তোয়ালের দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিতে করিতে বলিল "......টুলির ২।৩ ঘর মজুরের ঘর পড়ে গিয়েছে, আমি তা'দের জন্য ত্রিপল আর চাটাইয়ের জোগাড়ে গিয়েছিলাম।"

শ্যামা। তারপর কি হ'ল?

গিরীন। কুড়িয়ে বাড়িয়ে খান তিনেক ত্রিপল জোগাড় করে দিয়ে এসেছি চাটাই খান কতক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু একটী লোকও পাওয়া যাচ্ছে না যাদের দিয়ে ওগুলো টাঙাই, আর ঐ অল্প চাটাই ত্রিপলে অতগুলা লোকের সঙ্কুলান হ'বে কেন?

ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য শুষ্ক বস্ত্র লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তৎপশ্চাৎ আর একজন একটা থালে জল-খাবার লইয়া আসিল।

দুই বন্ধুতে মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিতেছে এমন সময় গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে শিবব্রত সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "এই যে শ্যামা দাদা, বড় দা কৈ?"

শ্যামা। সে একটা কাজে এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

শিব। আঃ এত বৃষ্টিতেও কাজ—কাজ—কাজ। কাজের কি আর সময় অসময় নেই।

শ্যামা। কর্ত্তব্যের সময় অসময় নেই—সে যখন ডাকে—

শিব। থাম, তোমাদের দর্শন আর কর্ত্তব্যের জালায় ঝালাপালা হওয়া গিয়েছে। এখন একটু গানবাজনা করবে এস, দাদা এ'লে তখন কাজ নি'য়ে পড়বে অখন।

গিরীন। শিবু, তোমার দাদা এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে গেলেন আর আমরা মজা ক'রে গানবাজনা কর্‌ব?

শিব। তা' যার যা ভাল লাগে। দাদার ভাল লাগে কাজ, মামার ভাল লাগে তর্ক, আমার ভাল লাগে গান-বাজনা আনন্দ করা। কিন্তু এমন দিনে সব কাজ সব তর্ক উড়িয়ে দিয়ে কেবল আপনাকে নিয়ে নিরালা থাকতে যে কত আনন্দ তা' তোমরা কি জানবে।"

গিরীন্দ্র। ভাই শিবু আর যাই কর ওরকম জানিয়ে জানিয়ে কথা বলাটা একটু কমাও। তুমি যখনই কথা বল তখনই মনে হয় বই থেকে কথা বেছে বেছে বলছ। দু'দিন পরে সংসারে ঢুক্‌তে হ'বে তখনও কি ঐ বানান কথার ঝুড়ি মাথায় ক'রে ঘুরে বেড়াবে?

শিব। জীবনটাকে ত' চিরদিনই তৈরি করেই তুলতে হয়, আপনা হ'তে তাকে গড়ে উঠতে দিলে সে একটা

কিম্ভুৎ কিমাকার হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সেই ভয়ে সর্ব্বদা বইএর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আপনাকে গড়ে তুলছি ; যা'ক ও সব কথা, এখন একটু গানবাজনা করবে এস।

শ্যামা। আমার ওপর এই প্ল্যানটা সুধরানর ভার হয়েছে আমি এখন যেতে পারব না. তোমার দাদা রাগ করবেন।

শিব। প্ল্যান! ওরে বাস্‌রে, তুমি কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদি ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে উঠ্‌লে কবে? একেবারে স্বর্গ হ'তে মর্ত্তে! দাদা না পারেন এমন কাজ নেই। গিরীনদা তুমি এস।

গিরীন্দ্র হাসিয়া বলিল "চল হে শ্যামা, ওর হাত হ'তে নিস্তার নেই।"

তিন জনে অপর এক কক্ষে চলিয়া গেল।

(৫)

তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগরের একটী প্রকাণ্ড পাটের কলের গেটের সম্মুখে একজন সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ তাঁহার যুবক পুত্রের সহিত দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া অগণ্য জনস্রোত দ্রুতবেগে সেই গেটের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলপ্রকার বয়সের লোকই সেই কলের দিকে প্রাণপণ বেগে ছুটিতেছিল, কারণ ছ'টা বাজিতে আর মোটে ৫ মিনিট বাকী, এখনি দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সমস্ত লোকই যে বরাহনগরবাসী তাহা নয়, কেহ কেহ হয় তো অনেক দূর হইতে আসিতেছে। কেহ পান চিবাইতে চিবাইতে, কেহ সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছে, কেহ নগ্নপদে কেহ বা জুতা পায় দিয়া ছুটিয়াছে, কাহারও আবৃত দেহ, কাহারও অনাবৃত, কিন্তু সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন; বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে ছুটিয়াছে, যেন কি একটা মহাবিপদ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, দৌড়িয়া না গেলে উপায় নাই।

চাহিয়া চাহিয়া যুবক তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এরা ছুটে চলেছে কেন?"

পিতা। ভয়ে।

পুত্র। কিসের ভয়ে?

পিতা। এখনি ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।

পুত্র। তাতে কি?

পিতা। তাতে এই হবে যে ওরা আর তা' হ'লে এ বেলার মত কাজ পাবে না, আর কাজ না পেলে ওদের দৈনিক মজুরিও পাবে না।

পুত্র। ফটকের কাছে এসেও ওরা ছুটেই ঢুকছে।

পিতা। সেটা অভ্যাসের জন্য।

পুত্র। এরা যে এত সকালেই কাজ করতে ছুটে আসে খাওয়া দাওয়া করে কখন?

পিতা। খাওয়া দাওয়া ওদের প্রায় নাই, রাত্রিতে উঠে ওদের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি যা রেঁধে দেয় তাই নাকে মুখে গুঁজে চ'লে আসে। আর চিরদিনই এদের অভ্যাস তাই ওতে তত ওদের কষ্ট হয় না।

পুত্র। ওদের তা' হ'লে আর কোন কাজ নেই, কেবল চাট্টি খাওয়া আর ছুটে কলের মধ্যে প্রবেশ করা।

পিতা। তা' বৈকি।

পুত্র। কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! এর চাইতে পশু পক্ষীদের অবস্থাও যে ঢের ভাল। আমায় দেখ্‌তে হ'বে।

পিতা। ওরা এখন হ'তে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত কলের মধ্যে আপনাদের পিশ্‌বে, তারপর ঘণ্টা খানেকের জন্য ওদের ছুটী।

পুত্র। তখন বোধ হয় একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে খাওয়া দাওয়া ভাল ক'রে ক'রবে।

পিতা। মোটেই নয়। যার যা জুটবে সে তাই খাবে।

পুত্র। এদের সমস্ত অবস্থা জান্‌তে আমার বড় ইচ্ছা করছে, দুপুর বেলায় যখন ওদের ছুটি হবে একবার আস্‌ব। একবার এই কলের মধ্যে যাওয়া যায় না?

তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে কলের দরজা বন্ধ হইয়া গেল এবং প্রকাণ্ড পাগড়িওয়ালা একজন দ্বারবান ফটকের সম্মুখে আসিয়া একটা টুলে উপবেশন করিল। যাহারা ফটক বন্ধ হওয়ার পর উপস্থিত হইল তাহারা কেহবা বসিয়া পড়িল, কেহবা সেই হিন্দুস্থানীটীর নিকটে গিয়া কাতরোক্তি করিতে লাগিল। দ্বারবান পুঙ্গব

তখন নানাপ্রকার সুমধুর সম্বোধনে তাহাদের আপ্যায়িত করিয়া এবং ঊর্দ্ধতন বহু পুরুষের বহুপ্রকার সুখাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া কাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র, কাহাকেও তাহার কোমল হস্তের আপ্যায়ন প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে দু'একজন ভদ্রবেশধারীও ছিলেন তাঁহারাও বাদ গেলেন না। ইতিমধ্যে কতকগুলি কুলি-রমণী আসিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল এবং দ্বারবান মহাশয়কেও তাঁহার প্রতি কথার যথাযথ উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া শেষে হস্তপদাদি আস্ফালন ও আস্ফোটনপূর্ব্বক ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় সহসা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং একজন ইংরাজ বাহিরে আসিবামাত্র উক্ত কুলি-রমণীগণ তাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইংরাজ তাহাদের সঙ্গে বহুক্ষণ বাগবিতণ্ডা করিয়া তাহাদের প্রবেশ করিতে দিলেন এবং সেই সঙ্গে যে কয়জন পুরুষ-কুলি ছিল তাহারাও প্রবেশ করিল কিন্তু সেই ভদ্রবেশী কেরাণীগণ প্রবেশাধিকার পাইল না।

পিতাপুত্র এবার এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া, সেই কেরাণীগণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া এক ব্যক্তি অতি করুণ স্বরে বলিল, "মশায় আপনি একটু সাহেবকে ব'লে দেন না। এমাসে দু'দিন এই রকম দেরী হ'য়ে গিয়েছে আজ তিন দিন।" ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কথা ও শুনবে কেন?" সেই ব্যক্তি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা'হলে কি হবে? আজ বড় সাহেব যদি আমার না দেখে তাহ'লে চাকরিটী যাবে।' কি করি মশায়, একটা উপায় করতে পারেন না?"

ব্রাহ্মণের পুত্রটী আর থাকিতে পারিল না, সে দ্রুতগতিতে সাহেবের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল "সাহেব এদের ঢুকতে দাও।"

ইংরাজপুরুষ তাহাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?' যুবক বিনতি স্বরে বলিল, "আমি যেই হই, এদের প্রবেশ করতে দিতে দোষ কি?" সাহেব গম্ভীর স্বরে বলিল, "নিয়ম নাই।" সাহেব আর দাঁড়াইল না, সশব্দে দ্বাররুদ্ধ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সাহেবকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কেরাণীটী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ-যুবক ধীরে ধীরে তাহার নিকটে যাইয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ভাই এমন চাকরি নাই বা করলে!" কেরাণীটা কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ যুবক তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ ভাই তুমি না পুরুষ মানুষ!" কেরাণীটা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আর এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "পুরুষ মানুষ নয়, কুকুর। মানুষ হ'লে কি আর এই অপমানে এতক্ষণ চুপ ক'রে থাকত" ব্রাহ্মণ যুবক ফিরিয়া দেখিল আর এক যুবক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহাদের উভয়ের ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছে। তাহাকে ফিরিয়া চাহিতে দেখিয়া শেষোক্ত যুবক নিকটে আসিয়া বলিল, "মশায়, ওদের ওপর সহানুভূতি দেখান বৃথা, আপনি আপন কাজে চলে যান। ওদের মুখদর্শন ক'রলেও পাপ হয়। ব্রাহ্মণ যুবক নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল "ভাই এদের কি কোন উপকার করতে পারেন না।" নবাগত যুবক বিরক্ত হইয়া বলিল, "উপকার ক'রলেও ওরা নেবে না। দাসত্বে ওদের জন্ম, দাসত্বে ওদের বৃদ্ধি, দাসত্বেই ওদের জীবনের শেষ হবে। ওদের সমস্ত দিনের ব্যাপারটা যদি একবার লক্ষ্য করেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন যে ওরা কি হ'য়ে গিয়েছে। রাত থাকতে চাটি খেয়ে ছুটে এসেছে, কি না মাসিক ১৫টী টাকা পাবে এই আশায়। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটবে। তারপর দুপুর বেলায় এক বাটী জলো চা খাবে, তা'তে একটুও পুষ্টির আশা নেই, অথচ এই পেটের জন্যই সব। এদের যদি বলেন যে এর চাইতে বাড়ী গিয়ে দু'বিঘে জমি চষে খাও গিয়ে, না হয় মাথায় ক'রে মোট ব'য়ে খাও গে, তাও এরা পারবে না। কেন জানেন? ঐ সাদা জামাটা আর ঐ চটিজোড়া আর আধ্‌লার একটা সিগারেটের জন্য। লাথি খেয়ে খেয়ে এমন হ'য়ে গিয়েছে যে, লাথি না খেলে ওদের ভাত হজম হয় না। আপনি ওদের উপকার করতে চান? ধন্য আপনার সাহসকে! আমি আজ ৪।৫ বছর থেকে দেখছি যে, ওদের চাইতে যাদের কাপড়-চোপড় ময়লা, ওদের চাইতে যারা নিম্নশ্রেণীর লোক, যারা এই সব কলের মুটে মজুর তাদের উপকার

করা সহজ এবং তারাই উপকারের পাত্র ;—যারা উপকারও নিতে জানে না, তাদের কি উপকার ক'রবেন ?

পূর্ব্বোক্ত বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উহার কথা শুনিতেছিলেন। যুবক নিবৃত্ত হইলে তিনি অগ্রসর হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "তোমার নাম কি বাবা ?"

ব্রাহ্মণকে দেখিবামাত্র নবাগত যুবক তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে আমার নাম শ্রীপ্রিয়ব্রত দেবশর্ম্মা উপাধি চক্রবর্ত্তী।

"নিবাস ?"

প্রিয়। 'আপাততঃ কলিকাতাতেই।

ব্রা। তোমার ঠাকুরের নাম ?

প্রিয়। শ্রীযুক্ত সত্যব্রত দেবশর্ম্মা।

ব্রা। তোমাদের পূর্ব্ব নিবাস কি—গ্রামে ?

প্রিয়। হাঁ, আপনি কি ক'রে জান্‌লেন ? আপনি কি বাবাকে চেনেন নাকি ?

ব্রা। চিনি বৈ কি বাবা। আমার নাম শ্রীব্রহ্মযশঃ ভট্টাচার্য্য। এটী আমারই ছেলে বিষ্ণুযশঃ।

প্রিয়। তাই'ত আমিত আপনাদের চিন্‌তে পারিলাম না। তা যাই হোক্ আপনারা এখানে কোথায় আছেন ?

ব্রা। এই খানেই...... রাস্তার ধারে আমার একজন আত্মীয়ের বাড়ীতে আছি। তুমি সত্যব্রতের ছেলে, তোমায় আমি এখন ছাড়্‌ছিনে। তুমি না চেন, তোমার ঠাকুর আমায় বেশ চেনেন। চল আমাদের ওখানে চল।

প্রিয়। আমার এখানে একটু কাজ আছে, সেটা সেরেই যাচ্ছি।

ব্রা। কি কাজ ?

প্রিয়। আমি এখানকার কলের যে সব কুলি খাটে তা'দের দৈনিক জীবনযাত্রার বিষয় একটু অনুসন্ধান ক'র্‌ছি। দেখি যদি তা'দের কোন উপকার ক'র্‌তে পারি।

ব্রা। তুমি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। আচ্ছা তা'হ'লে কাজ সেরে এস। ১৪নং বাড়ী বুঝ্‌লে।

প্রিয়ব্রতকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া বিষ্ণুযশঃ তাহার হাত ধরিয়া বলিল "ভাই দেখবেন ভুলবেন না।"

প্রিয়ব্রত একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "আপনি যখন প্রথম পরিচয়েই আমায় ভাই বলেছেন, তখনই বুঝেছি যে আপনার সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্বন্ধ আছে। ভয় নেই আমি আপনাকে ছাড়তে পারব না।"

প্রিয়ব্রত চলিয়া গেল। ব্রহ্মযশঃও সপুত্র গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

---

(৬)

মহামায়ার পাঠ-কক্ষে বসিয়া Bethune কলেজের কয়েকটী ছাত্রী নারী-সমিতির আগামী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা করিতেছিল। মহামায়া এই সমিতির একজন নেত্রী, সেইজন্য তাহার মত লইয়া এই সকল বালিকাদের মধ্যে কয়েকদিন হইতে বিশেষ আলোচনা চলিতেছিল। এই সকল বালিকার মধ্যে সকলেই প্রায় ব্রাহ্ম মতাবলম্বীর সন্তান, মহামায়াই কেবল খাঁটী হিন্দুর কন্যা ; অথচ মহামায়াই ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপ্লব-বাদিনী। নরওয়ের নাট্যকার ইবসেনের নাটকগুলি ও ইংরাজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক নিবন্ধই তাহার বেদ, বাইবেল, কোরাণ। তদুপরি গৃহে সম্পূর্ণরূপে আপন ইচ্ছানুসারেই আপনাকে গড়িয়া তুলিবার অবসর পাওয়াতে সে সর্ব্ব বিষয়ে এক নূতনতর জীব হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহার সমস্ত শক্তি দ্বারা স্বীয় মতের সহিত স্বীয় জীবনকে একীভূত করিয়া ফেলিয়াছে ; তাহার চিন্তা ও কার্য্যের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। এই কারণে তাহার কার্য্য ও মতের মধ্যে এত শক্তি ও এত প্রবলতা ছিল যে কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িত সেই তাহার প্রবল শক্তিতে অভিভূত হইত। সত্যব্রত তাহার সর্ব্বপ্রকার খেয়ালের পোষকতা করিতেন এমন কি সময় সময় তাহাদের বালিকা-সভায় যোগদান করিয়া তাহাদের চেষ্টাকে শক্তিপূর্ণ করিয়া দিতেন। কেবল এক বিষয়ে তিনি তাঁহার কন্যাকে সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেন—তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবাধ মিলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই বিষয়ে মহামায়া ও তাহার পিতার মতানুবর্ত্তিনী ছিল। তাহার পিতা বা তাহার ভ্রাতাদ্বয় উপস্থিত না থাকিলে কিম্বা নিতান্তই পরিচিত ব্যক্তি না হইলে মহামায়া কোন

পুরুষের সঙ্গেই মিশিত না। তাহার মতে স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ রূপে আপন নিয়মে আপনাকে গঠিত করিয়া তুলিবে। ইহাতে পুরুষের মতের মিল বা সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু সহচর্য্যের প্রয়োজন অতি কম। পুরুষে মত দিতে পারিবে, দূর হইতে সাহায্য দিতে পারিবে; কিন্তু অত্যন্ত নিকটে আসিলেই প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা আপনাদের পরস্পরকে লইয়া এতই ব্যস্ত হইবে যে তখন আর বাহিরের কার্য্য তাহাদের দ্বারা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সংসারে যাহারা বড় বড় কার্য্য বা বড় বড় মতের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন তাহারা সকলেই একক—বৃহত্তর জীবনে নর বা নারী উভয়েই সঙ্গহীন, আত্মনির্ভরশীল ও আপনাতে আপনিই সম্পূর্ণ।

অদ্যকার ক্ষুদ্র আলোচনা সভায় তাহার এই মতের বিরুদ্ধে মহামায়ার একটী বালিকা বন্ধু প্রতিবাদের ক্ষীণ স্বর তুলিয়াছে তাই এত গভীরভাবে আলোচনা চলিতেছে। যে বালিকা প্রতিবাদ করিতেছে তাহার নাম সরোজিনী; সে বিবাহিতা এবং তাঁহার স্বামী বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রবাসী। সরোজিনী বলিল "তা যাই বল ভাই, তোমার ঐ যথেচ্ছাচারী মত আমি ত' কিছুতে হজম ক'র্‌তে পার্‌ছি না। তুমি কি সংসার থেকে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়ে দিতে চাও নাকি।

মহামায়া। স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ভগবানের সৃষ্টি, আমার কি সাধ্য তা উঠিয়ে দিই তবে পুরুষদের স্বামীভাবের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করতে চাই। তাঁরা আমাদের স্বামী হবেন কোন্ সত্ত্বে? আমরা কি ঘটী, বাটী, থাল, গেলাস, গাড়ু, গামছার সমান নাকি। স্বামী দয়া ক'রে একটু ভাল বাসবেন, সোনার শিকল গলায় পরিয়ে দিয়ে সংসারের কুকুর ক'রে বেঁধে রাখ্‌বেন আর তাঁরা সারাদিন স্ফূর্ত্তি ক'রে যখন ঘরে ফির্‌বেন তখন আমরা তাঁদের পায়ের তলায় পাপোষের ওপর প'ড়ে লেজ নাড়ব এ আমার কিছুতেই বরদাস্ত হবে না।

উপস্থিত অন্যান্য বালিকারা হাসিয়া উঠিল, সরোজিনী কিন্তু ছল ছল চক্ষে বলিল, "ভাই মায়া আমি তোমার সঙ্গে তর্কে পার্‌ব না, কিন্তু তোমার এই মতও গ্রহণ করতে পার্‌ব না। ভালবাস্‌তে আমাদের জন্ম, ভালবেসে জীবন কাটিয়ে দেব। তিনি বিলেতে গিয়েছেন আমাদের সকলেরই জন্য, তুমি ব'ল্‌বে তাঁর নিজের সুখের জন্য, নামের জন্য, টাকার জন্য; কিন্তু আমি ব'ল্‌বো আমাদের ভালবাসার জন্য। এই এত দূরে রয়েছি, অথচ এক মুহূর্ত্ত তাঁকে ভুলতে পারছিনে, এই আকর্ষণ কি একেবারে মিথ্যে মোহ-কল্পনা; আর তোমাদের দু'টো বইপড়া বাঁধি গৎই সত্য। না ভাই তোমাদের সভার নিয়ম হ'তে ওটা কেটে দাও, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধকে সত্য বলে স্বীকার কর। পুরুষেরা যদি আমাদের মত ভালবাস্‌তে না পারে নাই পারুক তবু আমরা তাঁদের ভালবাসবো—

মহামায়া। এবং তাঁদের যখন দয়া হবে তখন তাঁদের পায়ের জুতা ঘুরিয়ে দেবার অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি ক'র্‌ব। তাঁরা ব'ললে খাব তাঁদের এঁটোপাতে, ঘুমুতে ব'ল্‌লে ঘুমুব তাঁদের পায়ের তলায় এবং তাঁরা যখন মদ খেয়ে পিলে ফেটে মর্‌বেন তখন আমরা সতীরা অমনি তাঁদের সঙ্গে সহমরণে যাব। ছিঃ সরোজ তুমি অল্প বয়সে বিয়ে ক'রে কিম্ভূত কিমাকার হ'য়ে গিয়েছে। তোমার বি এ পাশ করা বৃথা হ'য়েছে এবং তত্তদিনকার শিক্ষা তোমার দাসীত্ব মোচন ক'র্‌তে পারে নি। এইখানেই পুরুষ মানুষের জিত্—

মহামায়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সত্যব্রত সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"পুরুষের জিত্ নয় মা, ভগবানের অমোঘ নিয়মেরই জয়, মা সরোজ, বাইরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ হ'তে তোমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিলাম। তোমার কথা শুনে তোমায় বুকে ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে। তোমরা চিরদিন এমনি ক'রে আমাদের ভালবেসো, তাই তোমাদের নিজস্ব, তাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, তাই আমাদের এই সংসারের একমাত্র মুক্তির আনন্দ। তোমাদের স্নেহের বাঁধনই আমাদের স্বার্থের বাঁধন হ'তে টেনে এনে প্রেমের স্বাধিনতার মধ্যে উত্তীর্ণ ক'রে দেবে। মা মহামায়া তোমার আজ পরাজয়।"

মহামায়া। বাবা, আপনি এ কথা ব'ল্‌লেন। তাহ'লে আর আমি কি ব'ল্‌ব?

সত্যব্রত। তুমি চিরদিন যা ব'লে আসছো তাই বল মা, তারপর যেদিন সময় আস্‌বে সেদিন ভগবান আপনিই তোমায় বুঝিয়ে দেবেন। যাক্ সে কথা, আজ সমস্ত দিন প্রিয়কে দেখ্‌ছি না কেন? গিরীন দু'বার এসে ঘুরে গেল, তার বিশেষ কি একটা দরকার আছে, আজ আফিসেও সে একবারও দেখা দিলে না; মালপত্রগুলা চালান দেওয়া হ'ল না।

মায়া। দাদা কোথায় তা'ত আমি জানিনে বাবা।

সত্যব্রত। বাড়ীর কোন খোঁজ রাখ্‌বিনে অথচ বাহিরে কোথায় কি হ'চ্চে তাই নিয়ে তোর ঐ ছোট্ট মাথাটা ঘামাচ্ছিস্ কেন মা? আমরা কি তোর কেউ নই আর বাহিরের লোকরাই তোর সব?

মায়া। বাবা আজ আপনার মুখে এ সব কি কথা?

সত্য। মা, আজ সরোজের মুখের দু'টো কথা শুনে আমার যেন আবার চোক ফুটেছে, স্নেহে অন্ধ হ'য়ে আমি তোকে কি তৈরি করলাম মা।

মায়া। বাবা আপনিই বলেন যে ভগবানই মানুষের ভেতরকার মানুষটাকে ফুটিয়ে তোলেন। আমি যা হ'য়েছি তাতে ত' আর কারও হাত নেই, এতে কেবল নারায়ণেরই হাত আছে।

সত্য। সে কথা সত্য, তবু আজ মনে হ'চ্চে যেন আমি যা করেছি তা বোধ হয় ঠিক নয়। পুত্র কন্যার গ'ড়ে তুল্‌বার ভার ভগবান্ পিতাদের হাতে দিয়েছেন কিন্তু আমি কেবল তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি।

সরোজ। তা হ'লে জেঠামশায় আপনার দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই। ভগবান যা ক'র্‌ছেন তাই হোক্।

সত্য। তাই হোক্ যে সব সময় জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারিনে মা, ঐ খানেই ত আমাদের পরাজয়। যাক্ মায়া দুঃখিত হ'স্‌নে, তুই যা কর্‌ছিস ক'রে চল। আমার দুর্ব্বলতা দেখলে মনে করিস্ বুড়োবয়সের দুর্ব্বলতা।

মায়া। বাবা আপনাকে যে দিন দুর্ব্বল মনে ক'র্‌বো আপনার ওপর যে দিন বিশ্বাস হারাব সে দিন আমার সমস্ত বল সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে ব'লে মনে ক'র্‌বো।

সত্য। মা তোমরা কথাবার্ত্তা কও, আমি চল্‌লাম। কিন্তু যাই কর মা তোমরা এই কথাটা মনে রেখো যে, সকল কর্ম্মের ওপর নারায়ণ আছেন। যে কাজ কেবল নিজের ব'লে মনে হবে সে কাজ ভাল নয় তাতে অমঙ্গলকেই ডেকে আন্‌বে।

সত্যব্রত ধীরপদবিক্ষেপে বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর আলোচনার তেজ অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়া গেল এবং অবশেষে একজন দাসী আসিয়া কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলে পর বন্ধুগণের মুখে আবার হাস্য পরিহাসের উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়া উঠিল

(৭)

প্রভাতে প্রিয়ব্রত তাহার বসিবার ঘরে পদচারণ করিতেছিল। তাহার বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ চৌকির উপর বসিয়া তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়াছিল এবং কক্ষের অপর প্রান্তে একটা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করিয়া মহামায়া একমনে প্রিয়ব্রতের কথা শুনিতেছিল। প্রিয়ব্রত উত্তেজিত স্বরে বলিল "ভাই গিরীন, সে কি দেখিলাম! কোনও মানুষের বুকে যে এতখানি ভালবাসা থাক্‌তে পারে, মানুষকে যে মানুষ এত ভালবাস্‌তে পারে তা জানতাম না। কালকে দুপুর বেলায় কি করেছি জান? বরানগরের একটা কলে দিনমজুরি খেটে এসেছি। আমায় সে বল্লে ভাই একবার আমায় ঐ কলের মধ্যে নিয়ে যেতে পার। আমি বল্লাম পারি। আগে জানিনে সে কি মনে ক'রে একথা ব'ল্‌ছে। তারপর সে কলের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সাহেবকে ব'ল্‌লে, আমি মজুর আমায় কি করতে হবে বল? সাহেব ত, অবাক্ কারণ সে চেহারা দেখ্‌লে অবাক্ না হ'য়ে যায় এমনত' কেউ দেখিনে। আমি তা'র হাত ধরে বল্লাম সে কি ভাই, এ তুমি কি ক'র্‌ছ? সে হেসে বল্লে আমার এতগুলি ভাই যা ক'র্‌ছে আমি তা ক'র্‌ব না। ক'র্‌লেও তাই, সমস্ত দিন সেই কুলিগুলোর সঙ্গে খাটলে, যাকে সাহেব ব'ক্‌ছে, যাকে চাবুক নিয়ে তাড়া মার্‌ছে, যাকে মেটেরা মার্‌ছে তাদের কাছেই ছুটে গিয়ে সে তা'র কাজ নিজের ঘাড়ে নিচ্ছে। সমস্ত দিন আমায় ছুটিয়ে মেরেছে—আমায় পাগল ক'রে তুলেছিল। কি অদ্ভুত তার মায়া—আমি কি রাতে

আসতে পারি। নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে এসেছি, আবার এখনি যেতে ইচ্ছা করছি, যেতেই হবে। নইলে তাঁকে সামলাবে কে ?"

মহামায়া। দাদা তুমি এতক্ষণ ধরে পাগলের মত ব'কে-যাচ্ছ কিন্তু তা'র পরিচয় ত' একটুও দিলে না।

প্রিয়। কি বলব তোকে মায়া, তা'র আবার পরিচয় কি ! সে একটা প্রহেলিকা।

মায়া। দাদা তোমার মুখে এসব পাগলামি ত' কখনও শুনিনি, ছোড়দা হ'লে এসব কথা শোভা পেত। তুমি ক্ষেপার মত কি ব'কে যাচ্ছ। কাল সারারাত্রি না ঘুমিয়ে তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। আজ আর তোমায় বেরুতে দেব না। তুমি বাবাকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলেছ, তিনিও সকাল হ'তে না হ'তে কোথায় চলে গেলেন।

প্রিয়। যারা তাদের জানে তারা আর স্থির থাকতে পারে না, তুই যদি দেখিস্ তাহ'লে তোর তর্কফর্ক কোথায় তলিয়ে যাবে। এতদিন কেবল কতকগুলা মতের সমষ্টির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে মাত্র কিন্তু কাল একটা সত্যিকার মানুষ দেখিছি। মায়া একবার যাবি ?

মায়া। আমি ত' আর ক্ষেপিনি আমার কলেজের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। তুমি স্নান ক'রবে চল।

প্রিয়। স্নান আহ্নিক মাথায় উঠেছে।

গিরীন্দ্রনাথ এতক্ষণ নীরবে ভ্রাতাভগ্নির কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, এইবার কথা কহিল। বলিল, "মায়া তুমি যাও আমার সময় হ'লেই যাচ্ছি।" মহামায়া হাসিয়া বলিল, "দোহাই গিরীন বাবু আপনিও যোগ দিবেন না। দাদাকেই সামলাতে পাচ্ছি না, তার ওপর আবার বন্ধুরা লাগ্‌লে আমরা দাঁড়াই কোথায় ?"

গিরীন। ভয় নাই, প্রিয় ঠিকই আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকগে।

প্রিয় তাহার ভগ্নির কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "মায়া আমাকে সামলাতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তুমি আর গিরু যখন আমায় ক্ষেপাতে পার নি, তখন আর কেউ ক্ষেপাতে পারবে না। কিন্তু এই যাঁর কথা বলছি, এর মধ্যে সবটুকুই মানুষ, তর্ক নেই, মত নেই, পুথি নেই, কিছু নেই শুধু মানুষ ! দুর্ভাগ্য যে তা'কে আনতে পারলাম না ; সে একলা, আজও আবার সেই কালে ঢুকতে চায়। তার বাপ তাকে না বারণ করেন যদি তা হ'লে সে নিশ্চয় যাবে। কিন্তু যেমন ছেলে তা'র তেমনি বাপ ! অদ্ভুত !

মায়া। ভূতই হ'ক, আর অদ্ভুতই হ'ক তোমার মত লোককে যখন সে এমন ক'রে ফেলেছে, তখন সে একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে। তা'র নাম কি ?

প্রিয়। বিষ্ণুযশা—

মায়া। তার সবই অদ্ভুৎ, নামটা পর্য্যন্ত কিম্ভূৎকিমা-কার। বাঙ্গালী না হিন্দুস্থানী ?

প্রিয়। বাঙ্গালী।

গিরীন্দ্র। নামটা শুনে মনে হচ্ছে—

মায়া। কিছুই মনে হচ্চে না, সবই হ'তে পারেন তিনি। যাক্ এখন স্নানাহার ক'রবে চল, তারপর বৈকালে তাঁদের ওখানে যাওয়া যাবে। তাঁদের বাড়ীতে কে আছে ?

প্রিয়। তাঁরা অনেক দূর থেকে এসে তাঁদেরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠেছেন। সঙ্গে বিষ্ণুর মা আছেন আর এক ভগ্নি আছেন শুন্‌লাম। কিন্তু এদের সঙ্গে তেমন দেখা ক'র্‌বার সময় পাই নি, সমস্তদিনই বিষ্ণুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হ'য়ে ছিল। আহারের সময় বিষ্ণুর মা একবার আমার সম্মুখে এসেছিলেন, আমি কেবল তাঁকে প্রণাম মাত্র করিছি, মুখের দিকে চাইতে পারি নি, কারণ বিষ্ণুকে নিয়েই আমার সব সময়টা কেটে গিয়েছে।

মায়া। বিষ্ণুর ভগ্নী ! তিনি কি রকম ?

প্রিয়। জানি নে, কারণ তাঁকে দেখিনি।

মায়া। তা ভাই বোনও বোধ হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা কি অন্য কিছু একটা হবেন বোধ হয়।

প্রিয়। তাঁর নাম শুনিছি লক্ষ্মী।

মায়া। তা' আগেই জানি।

গিরীন। মায়া, তোমার বিভালাভ কল্পটা কেবল অভিনয় আর উপাখ্যকেই জন্ম দিয়েছে।

মায়া। তা' ওগুলো কি কেবল আপনাদেরই একচেটে হবে ? বি, এ, এম্, এ, পাশ ক'রে যদি আপনারা আপ-নাদের বাপ দাদাদের ওল্ড ফুল, বাড়ীর স্ত্রীলোকদের

চাকরাণী ক'রে রাখ্তে পারেন, আমরাও আপনাদের কাছ থেকে শিখে আপনাদের শেখান বিদ্যা আপনাদের কড়ায় গণ্ডায় ফিরিয়ে দেবো।

মায়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। প্রিয়ব্রত গিরীন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "রাগ করিও না গিরীন, অল্প বয়সে যা তা কতকগুলা প'ড়ে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু ওর ভিতরের ভাবটা ভারি মিষ্টি, আমি খুব জানি।"

গিরীন। এক এক সময় মনে হয়, একি তোমার বোন্? কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে "আকরে পদ্ম রাগানাং জন্মঃ কাচ মনেঃ কুতঃ"

প্রিয়। মানি বটে, কিন্তু কতকগুলা বাজে মতের কাদামাটী ওর ওপর পড়েছে। সেইগুলা ধুয়ে ফেল্তে হবে। এই থাকে দেখিছি একে যদি একবার এখানে আন্তে পারি, তাহ'লে বুঝিয়ে দিতে পারব যে, মানুষ মতে হয় না, যুক্তিতর্কে হয় না, পুঁথিপড়া বিদ্যাতেও হয় না। ভেতর হ'তে জলন্ত চেতনা, যে মানুষের কার্য্য হ'তে না বেরোয়, সে পুরা মানুষ হ'য়ে ওঠে না। পুরা মানুষ হ'তে অনেক জন্মের তপস্যার দরকার। কাল বিষ্ণুকে দেখে আমার সেই কথাটা কেবলই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে যেন এতদিন পরে বুঝি একটা জীবন্ত মানুষ দেখ্তে পেলাম। কি জলন্ত ভক্তি, কি গভীর স্নেহ, কি আপনাভোলা সুন্দর মানুষ! এতদিন কেবল বাজে কথায় তোমাদের ভুলিয়ে রাখ্তাম। বড় বড় আদর্শের কথা শুনিয়ে তোমাদের মনকে আমার বশে আন্তাম। কিন্তু হঠাৎ যেই এর সংস্পর্শে এলাম, অমনি বুঝ্তে পারলাম যে, আমরা কেবল বল, আমরা কেবল চেষ্টা, আমরা কেবল শক্তি কিন্তু এ একেবারে শক্তির পারে, তর্ক, যুক্তির পারে, বিশ্বাসের আর চেষ্টার উর্দ্ধে যেখান হতে সব চেষ্টা, সব বুদ্ধি, সব জ্ঞান, সব কর্ম্ম ওঠে, সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে এঁর বাস।

গিরীন। তাই, এঁকে দেখবার জন্য আমার মনও ছট্‌ফট্ ক'র্ছে।

প্রিয়। বাবা ফিরে আসুন কাল্‌কে আমি না থাকার দরুণ কতকগুলা কাজের ক্ষতি হ'য়ে গিয়েছে, তার একটা ব্যবস্থা ক'রে আমি দু' দিনের জন্য তোমাদের কাছ থেকে ছুটি নেবো। আমি যা করতাম তুমি সমস্তই ঠিক মত চালিয়ে যেও, তা হ'লেই আমার উপকার করা হবে।

গিরীন। আমিও যে তোমার সঙ্গে যাব মনে ক'র্ছি।

প্রিয়। তার দরকার হবে না। তিনি যখন এমন ক'রে আমাদের অধিকার ক'র্ছেন, তখন স্বয়ং আমাদের মধ্যে এসে আমাদের সমস্ত চেষ্টা সার্থক ক'রে দেবেন।

গিরীন গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় শিবব্রত সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদা তুমি নাকি একজন দেবতা দেখে এসেছ?"

প্রিয়। তোমায় সে কথা কে বল্লে?

শিব। এই মাত্র পিশিমা মায়ার কাছে শুনেছেন। তিনি বল্লেন তুমি নাকি তাঁর কাছে কাল সারাদিন ছিলে, তিনি নাকি তোমার মাথা খারাপ ক'রে দিয়েছেন। সাবধান আর দেবতা টেবতার কাছেও যেসো না, ওরা কাঁচাখেকো দেবতা। দেবদেবীর বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, পদ্য লেখা সহজ কিন্তু তাঁদেরকে প্রতিদিনকার ডাল ভাতের মধ্যে এনে ফেল্লেই মুস্কিল।

গিরীন। নিশ্চয়ই, কারণ তাঁরা'ত আর পেনাল-কোডের ধারা মেনেও চল্বেন না, সিভিল প্রোসিডিয়োরের অনুসারেও তাঁরা প্রোসিড ক'র্বেন না। যারা নিজেদের চতুর্দ্দিকে এই সব সিভিল ক্রিমিনালের আইনের জাল ছড়িয়ে হাত পা বাঁধা প'ড়ে আছে তাদের এ সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'র্তে যাওয়া অনধিকার চর্চ্চা।

শিব। আহা গিরিন্‌দা রাগ ক'র্লেন। আমি অত কিছু মনে ক'রে বলিনি। দাদা নাকি শুন্‌লাম রাতে খান নি, সকালেও পূজাহ্নিক করেন্ নি কেবল বক্‌ছেন। তাই পিসিমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন, ওঁকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসিছি।

প্রিয়। ছিঃ শিবু তোরা সব মনে ক'র্ছিস্ কি আমি পাগল হ'য়ে গিয়িছি নাকি?

শিব। জগতে কিছুই আশ্চর্য্য নয় সবই ঘট্‌তে পারে।

গিরিন। ও সব কথা থাক্ আমার কাজটা শেষ ক'রে রেখো। শ্যামা সেই প্ল্যানটা শেষ ক'রে ঐ টেবিলে রেখে দিয়েছে। আমি মজুর লাগিয়ে এসেছি তুমি একবার দেখ্‌তে যেও।

শিব। এই ত' বেশ কথা, তা নয় কি যা তা বেতালা বেসুরো কথা কইছিলে তোমরা, যে বাড়ীশুদ্ধ সব ক্ষেপে যাবার মত হ'য়েছে।

প্রিয়। দু'দিন ভাই আমায় ছুটি দাও। কিন্তু সাবধান আমার জন্য যেন ভাল কাজে অবহেলা করিও না। দীনাশ্রম ১ বছরের মধ্যেই শেষ ক'র্‌তে হবে।

গিরীন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। প্রিয়ব্রতও শিবব্রতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

(৮)

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মযশঃ তাহার পুত্র-কলত্র সমভিব্যাহারে দক্ষিণেশ্বরের ৬কালিমন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখিতে আসিয়াছেন। লক্ষ্মীও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। কিন্তু সে বিষ্ণুযশার সঙ্গে মন্দিরের নানাস্থান দেখিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে বিষ্ণুর সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সে সহসা ছুটিয়া গিয়া "পঞ্চবটীর তলে" পতিত হইল এবং গভীর আর্ত্তস্বরে ডাকিল মা মাগো! লক্ষ্মী প্রথমতঃ চমকিত হইয়া উঠিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুস্থির হইয়া ধীরে ধীরে বিষ্ণুযশার নিকটে গিয়া বলিল ছিঃ ওঠ।" বিষ্ণু উত্তর দিল না, কেবল ধীরে বদন উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার অশ্রুপ্লাবিত নয়নদ্বয় লক্ষ্মীর নয়নের উপর স্থাপিত করিল। সন্ধ্যার শেষ রক্তিমচ্ছটা সেই বদনের উপর পতিত হইয়া যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অথচ গভীর দুঃখের কথা লক্ষ্মীকে নিবেদন করিল তাহার সম্মুখে বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিষ্ণুর পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বিষ্ণু তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "চল লক্ষ্মী পালিয়ে যাই।" এখানে আর একটু দাঁড়ালে আমি পাগল হ'য়ে যাব।

লক্ষ্মী আর কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল। কিন্তু বিষ্ণু দু'একপদ অগ্রসর হইয়াই বলিল "লক্ষ্মী আমার যেন মনে হচ্ছিল যে সমস্ত জগতের গভীর কাতরোক্তি জমাট বেঁধে ঐখানে গুমরে গুমরে কাঁদছে। আমি স্পষ্ট যেন শুন্‌তে পাচ্ছিলাম কোথা হ'তে যেন কতলোক ছুটে এসে ঐখানে মাথা লুটুচ্ছে আর ব'ল্‌ছে মা মা মাগো।" বিষ্ণু সহসা লক্ষ্মীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "তুমি শুন্‌তে পাওনি লক্ষ্মী।" লক্ষ্মী নীরবে মস্তক সঞ্চালিত করিয়া জানাইল যে সে শুনিতে পাই নাই। বিষ্ণু কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তুমিই সুখী।"

লক্ষ্মী। "তুমিই বা এত অসুখী কেন?"

বিষ্ণুযশা। তা ঠিক জানি না। আমাদের সম্বলপুরে বেশ ছিলাম, এখানে এসে আমার কি হ'ল। আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে যে এই সমস্ত সংসার একটা মস্ত কল কারখানা; আর সমস্ত লোক এই কারখানার মধ্যে ঢুকে আপনাদের পিশ্‌ছে মেরে ফেল্‌ছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লক্ষ্মী, যে আমার সমস্ত অস্তিত্বটাকে ভেঙ্গেচুরে এক লক্ষ আমি হ'য়ে এদের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়ে এদের দুঃখ লাঘব করি। কিন্তু তা যে হয় না।

লক্ষ্মী। ঐ দেখ কারা এদিকে আস্‌ছে, চল বাবার কাছে যাই। তোমার এ সব কথা কে শুন্‌তে পাবে আর কি ভাব্‌বে! চল।

বিষ্ণু আর কোন কথা বলিল না, নীরবে লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। ব্রহ্মযশাও তাহাদের অনুসন্ধানেই আসিতেছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'য়েছে বিষ্ণু?"

বিষ্ণু। বাবা বাড়ী চলুন।

ব্রহ্ম। কেন?

বিষ্ণু। বাড়ি চলুন সেখানে গিয়ে ব'ল্‌ব।

ব্রহ্মযশা আর কোন কথা বলিলেন না, সকলকে সঙ্গে করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

গৃহে ফিরিয়া ব্রহ্মযশা তাঁহার পুত্রকে লইয়া একটী কক্ষে যাইয়া উপবেশন করিলেন। বিষ্ণু কিছুক্ষণ চিন্তা

করিয়া বলিল "বাবা আমাকে এই আগুণের মধ্যে কেন এনেছেন ?"

ব্রহ্ম। তোমার শিক্ষার জন্য। মানুষের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত ক'র্‌বার জন্য। পল্লীগ্রামে তুমি মানুষের এক অবস্থা দেখেছ আর এখানে দেখ্‌ছ আর এক অবস্থা। এ দেখে তোমার কি মনে হ'চ্চে ?

বিষ্ণু। মনে যে কি হ'চ্চে তা আর আপনাকে কি বুঝাব। আপনি আমার দেবতা, আমার গুরু, জন্মদাতা, আমার যা মনে হ'চ্চে তার চাইতে কতগুণ বেশী কষ্ট আপনার মনে হ'চ্চে তা আমি আমার মনের ভাব অনুভব ক'রেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি। এখন বলুন আমায় কি ক'র্‌তে হবে ?

ব্রহ্ম। এখন তোমার ছাত্রাবস্থা, এখন প্রশ্ন করো না যেখানে যেতে ব'ল্‌বো, যা ক'র্‌তে ব'ল্‌বো, তাই ক'রে চল তারপর সময় হ'লে সমস্তই বুঝিয়ে দেবো। এতদিন ধ'রে কি শিখ্‌লে তাই এখন আমায় বল।

বিষ্ণু। এখানে এসে পর্য্যন্ত কেবল একটী ভাব আমার শিক্ষা হ'য়েছে সেটি এই যে মানুষ এখানে বড় কষ্টে কাল কাটাচ্ছে।

ব্রহ্ম। ঠিক শিক্ষাই হ'য়েছে। তবে কি ক'র্‌তে হবে সে কথা পরে ব'লে দেবো। এখন কেবল এইটুকু স্মরণ রেখো যে কোন একটা মহৎকার্য্যের জন্যই তোমায় ভগবান্ এই দুঃখের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন। সেই মহৎ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমার জীবনকে তুমি পবিত্র রাখ্‌তে উন্মত এবং সদা সজাগ থাক্‌বে। কখন যে তাঁর আহ্বান তোমার মধ্যে এসে পড়্‌বে তার স্থান কাল কিছুই ঠিক নেই। আমিও সেই মহান্ ভবিষ্যতের আশায় তোমার শিক্ষার ভার গ্রহণ ক'রেছি। তুমি দেবতার দাস, নারায়ণের সেবক এই কথা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রেখো। আর একটা কথা বলে দিই, এতদিন তোমায় সে কথা বলি নি কিন্তু এখন বলার প্রয়োজন হ'য়েছে। আগে একটা কথার উত্তর দাও, লক্ষ্মীর প্রতি তোমার মনের ভাব কি রকম ?

বিষ্ণু। লক্ষ্মীর প্রতি ? কেন তার সঙ্গে কি ?

ব্রহ্ম। তাকে তোমার কি রকম মনে হয়।

বিষ্ণু। আমি আপনার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, তাকে আবার কি রকম মনে হবে ? সে স্থিরা ধীরা বুদ্ধিমতী—

ব্রহ্ম। না সে কথা নয়, তাকে যদি তোমার জীবনের সঙ্গে চিরদিনের জন্য গেঁথে দিই—অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যদি তার বিবাহ দিই ?

বিষ্ণু। সে কি বাবা ? তাকে যে চিরদিন বোন্ ব'লেই মনে ক'রে এসেছি তাকে কেমন ক'রে বিয়ে ক'র্‌বো ? বিয়ে ক'র্‌বো ? কেন বাবা আমার আবার বিয়ে কি ?

ব্রহ্ম। তোমায় গৃহী হ'তে হবে, সন্ন্যাসী কর্‌বার জন্য তোমায় এত যত্নে শিক্ষিত ক'রে তুল্‌ছি না। জগতে আদর্শ গৃহস্থ হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, তোমায় তাই হ'তে হবে। তারপর যিনি আস্‌বেন যাঁর আবির্ভাবের আশায় এই সমস্ত সংসার উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে তাকেই তোমরা আন্‌বে। আমি সেই আশাতেই চিরদিন আছি। বৎস তুমি আমার সেই আশা সফল ক'র্‌বে। তোমার উপর আমার সমস্ত জীবনের সাধনার ফল নির্ভর ক'র্‌ছে।

বিষ্ণুযশা সহসা গভীর কাতরোক্তি করিয়া উঠিল এবং তাহার পিতার হস্ত ধরিয়া বলিল,—"বাবা আপনি যে স্বর্গে আছেন সেখানে আমায় টেনে নিন্, আমি এ কোথায় পড়ে র'য়েছি। এখানে কেবল দুঃখ, কেবল বেদনা, কেবল নিরাশা। আমার দ্বারা কি এই গভীর দুঃখের কিছুও লাঘব হবে ? বাবা আপনি যা বলছেন তা যে আমি ধারণাতেই আন্‌তে পাচ্ছি না। আমায় আপনি কোথায় নিয়ে যেতে চান্ ?

ব্রহ্ম। কোথায় নিয়ে যেতে চাই তা' যে আমিই সঠিক জানি তা'নয়। আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর নারায়ণের ইচ্ছাই কার্য্য ক'র্‌ছে। আমরা কেবল তাঁ'র সেই ইচ্ছাকে নিজেদের মধ্যে অনুভব ক'রে তাকেই কাজের মধ্যে প্রকাশ ক'র্‌ব। যাক্ এখন লক্ষ্মীকে আজ হ'তে তুমি অন্য চক্ষে দেখ্‌তে আরম্ভ কর, মনে রেখো যে এই সংসারে সেই তোমার প্রধান সহায় এবং আমার সাধনার সফলতার জননী হ'বে। শীঘ্রই তা'র সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবো।

বিষ্ণু। বাবা আপনার আদেশ আমি মাথায় ক'রে নিলাম, কিন্তু লক্ষ্মীকে যে কেমন ক'রে অন্য চক্ষে দেখ্‌তে হ'বে তা'ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

ব্রহ্ম। ক্রমশঃ বুঝ্‌তে পার্‌বে, এখন আমার কাজ জানিয়ে দেওয়া—তোমার কাজ চেষ্টা করা, চেষ্টা কর্‌বে ত'?

বিষ্ণু। ক'র্‌ব, কিন্তু যদি সফল না হই? চিরদিন যে আমার ভগ্নী ছিল সে কি ক'রে আমার পত্নী হ'বে? স্ত্রীলোককে কি ক'রে ওভাবে দেখ্‌তে হয় তা' যে জানিনে। যদি ভুল হয়, যদি না পারি বাবা আমায় আপনি ক্ষমা কর্‌বেন ত'?

ব্রহ্মযশা ধীরে ধীরে পুত্রকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন "বাবা স্ত্রী-পুরুষ ভাব ভগবানের দত্ত, ও কাউকে শেখাতে হয় না। কিন্তু তোমার এই বাল্যভাব দেখে আমার মনে হ'চ্চে আমি ধন্য। যাক্, চল একবার নারায়ণের পায়ে আমাদের সমস্ত কথা নিবেদন করিগে। তিনি শক্তি দেবেন, তিনি সমস্ত ভুল শুধ্‌রে দেবেন। তারপর জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ হ'লে তিনিই আমাদের টেনে নেবেন। আর এক কথা কাল্‌কে আমরা কল্‌কাতার সহরের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌ব। সেখানে সত্যব্রত আমাদের জন্য একটা বাড়ি ঠিক করেছেন, সেখানে কিছুদিন থেকে তারপর তোমার মাকে আর লক্ষ্মীকে তোমার কাকার কাছে রেখে আমরা তীর্থযাত্রায় বেরুবো।

বিষ্ণু। আপনার যা' ইচ্ছা তা'ই হ'ক।

ব্রহ্ম। কেন বিষ্ণু তুমি এমন স্বরে কথা ব'লছ কেন!

বিষ্ণু। বিবাহের কথা ব'লে আজ যেন আমার অর্দ্ধেক শক্তি নষ্ট ক'রে দিলেন। বিবাহ! সেই ঘর-কন্না!, এই যা' চারিদিকে দেখ্‌ছি। এই সব বৃথা দুঃখ-ভারকে সাগ্রহে বহন ক'রে নিতে হ'বে! হায় এতদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রে শেষে আমার জীবনের এই পরিণতি হ'বে! যাক্ যা' আপনার ইচ্ছা তা'ই হ'ক।

ব্রহ্ম। বাবা বিষ্ণু! বিবাহিত জীবনকে কোনমতেই তুচ্ছ জ্ঞান কোরো না। যা'দের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদছে ত'াদের মত তোমায় হ'তে হ'বে নইলে তাদের দুঃখ তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না। এই সংসার নারায়ণের একটী প্রকাণ্ড পরিবার, এই পরিবার হ'তে অসময়ে যে বেরিয়ে পালাতে চায়, যে নারায়ণকে ত্যাগ করে সে মরীচিকার পেছনে ছোটে। অবশ্য জন্মান্তরীণ সংস্কার কোনও কোনও লোকের মনে এত প্রবল থাকে যে তাহারা বিবাহ না করিয়াও —সেই পুরাতন ঘরকন্নার আভাষমাত্রে—সংসারের সবটুকুই পাকা সংসারীর ন্যায়ই বুঝিয়া লয়।

আমার এত চেষ্টায় যদি তুমি এটুকু না শিখে থাক তাহ'লে আমার সমস্ত চেষ্টাই বৃথা হ'য়েছে।

বিষ্ণু। বাবা ক্ষমা করুন, আর আমি কোন কথা বলবো না। আপনার আদর্শকে অপমান ক'রে অপরাধ ক'রেছি। আপনি আমায় শাস্তি দেন!"

ব্রহ্মযশঃ তাঁহার পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর তাহাকে লইয়া তাঁহার পূজার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(৯)

কলিকাতায় প্রিয়ব্রতদের বাটীর সন্নিকটে বাসা ভাড়া লওয়ার পর হইতে বিষ্ণুযশাকে কলিকাতার নানাস্থান দেখাইবার ভার প্রিয়ব্রতই গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিদিনই একটা না একটা নূতন স্থানে, একটা না একটা নূতন অবস্থার মানুষকে দেখিতে দেখিতে বিষ্ণুযশা অন্তরে অন্তরে একটা তীব্র উত্তেজনা অনুভব করিতেছিল। এই মহা-নগরীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যে একটা উন্মাদক শক্তি আছে তাহা আজীবন পল্লীবাসী বিষ্ণুর শিরায় শিরায় প্রবেশ করিতেছিল—অথচ সে সংবাদ আর কেহই জানিতে পারিল না। দেশের দুই মূর্ত্তি—পল্লীগ্রামে এক মূর্ত্তি সহরে আর এক মূর্ত্তি। পল্লীগ্রামে সে শান্ত ও সংযত, সহরে উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। দেশের মূর্ত্তি এই হিসাবে মানুষের নিজমূর্ত্তির ঠিক উল্টা। মানুষ বাহিরে সদা চঞ্চল সদা কর্ম্ম-নিরত, কিন্তু অন্তরে তাহার অন্তরতম মানুষটী স্থির, ধীর, গতিহীন। দেশ তাহার কেন্দ্রস্থলে চঞ্চল অথচ বাহিরে সে স্থির, ধীর, মন্দগতিসম্পন্ন। অথচ এই দেশই বল আর সংসারই বল, সহরই বল আর গ্রামই বল সবই মানুষের নিজের সৃষ্টি। মানব চেষ্টা করিয়া স্বয়ং যাহা, তাহার ঠিক উল্টাটী সৃজন করিয়া বসিয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাবড়ার পুলের নিকটে দাঁড়াইয়া বিষ্ণুযশা, প্রিয়ব্রত ও গিরীন সেই বিশাল জনস্রোতের ভাব ও গতি লক্ষ্য করিতেছিল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া গিরীন্দ্র প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞাসা করিল "প্রিয় এই এত লোক চল্‌ছে কিন্তু একটার মুখেও কি একটু শান্ত মধুর ভাব দেখ্‌তে পাচ্ছ? কেবল স্বার্থ-স্বার্থ-স্বার্থ!"

প্রিয়। এই জিনিষপত্তরের হাটে বেচাকেনা ক'র্‌তেই যা'রা আস্‌ছে তা'রা ত' কেবল আপনাদের কেন্‌বার জিনিষের কথাই ভাব্‌বে; এখানে ত' কেউ দিতে আ'সে না, নিতেই আ'সে, তা' সে জিনিষপত্তরই হ'ক্ আর ভাবই হ'ক্, সেইজন্য সবাই আপনার ঝুলির কথাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে যাচ্ছে। যা'র ঝুলি পরিপূর্ণ হ'য়েছে সে অহঙ্কারে ফুলে' সবাইকে অবজ্ঞা ক'র্‌তে ক'র্‌তে যাচ্ছে, যার ঝুলি শূন্য সে গা'ল পাড়্‌তে পাড়্‌তে যাচ্ছে। যেখানে কেবল দেনাপাওনারই কথা, দেনাপাওনারই সম্বন্ধ—যেখানকার সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কর্ম্ম ঐ সম্বন্ধটা নিয়েই নাড়াচাড়া ক'র্‌ছে সেখানে শান্তভাব মধুরভাব কোথায় পাবে?

প্রিয়ব্রত নীরব হইল। তাহার পর বিষ্ণুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল! বিষ্ণু নির্ব্বাক্ নিশ্চলভাবে পুলের দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ সে অনুচ্চস্বরে বলিল "কি সুন্দর!"

প্রিয়ব্রত তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল "সুন্দর? কি সুন্দর? কা'র কথা বল্‌ছেন?"

বিষ্ণু চমকিত ও লজ্জিত হইয়া বলিল "এত লোক এক সঙ্গে চল্‌তে আমি কখনও দেখিনি। আজ কি মেলা টেলা আছে?"

প্রিয়। কল্‌কাতায় রোজই এমনি মেলা বসে, কিন্তু এর মধ্যে কি আপনার সুন্দর লাগ্‌ল?

বিষ্ণু। আমি ভাবিতেছিলাম যে তলা দিয়ে মা গঙ্গার স্রোত ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে, আর উপর দিয়ে মানুষের স্রোত ছুটেছে—কোন্ দিকে? নিশ্চয়ই সমুদ্রের দিকে। এমনটি ত' কোন দিন দেখিনি, এমন স্পষ্টভাবে কোনদিনই মনে হয়নি যে এই সমস্ত লোকই সমুদ্রের দিকে ছুটছে। তাই, সে সমুদ্রের আভাষ, তা'র গর্জ্জন স্পষ্ট আমার কাণে এসে পৌছাচ্ছে, এই এত লোক, সকলেই এক একটা আলাদা লোক, সকলেরই নিজের নিজস্ব ভাব একটা আছে; অথচ ছুটেছে একটা সমুদ্রের দিকে। কি মহান সেই সমুদ্র—

বলিতে বলিতে বিষ্ণুযশা রাস্তার একটা আলোকস্তম্ভের গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল। প্রিয় ও গিরীন্দ্র দেখিল বিষ্ণুর নয়নদ্বয় নিমীলিত, তাহার করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ এবং তাহার মুখ হইতে অস্ফুটস্বরে কি একটা কথা বাহির হইতেছে। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণু নয়ন উন্মীলিত করিয়া প্রিয়ব্রতের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল "আমায় ক্ষমা করুন, আমি এখানে এসে যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানিনে তা'ই বোধ হয় এ সব দেখে শুনে আমার মাথা ঠিক থাক্‌ছে না। সময় সময় মনে হচ্ছে একটা কে যেন এই সমস্ত জিনিষপত্তর লোকজনের আড়ালে দাঁড়িয়ে খুব খেলা ক'র্‌ছে। চতুর্দ্দিকে এত যে ঠেলাঠেলি চাপাচাপি তবু সে ঠিক তা'র মধ্যে আপনার কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। যারা দৌড়ুচ্ছে তা'রাও তা'রই জন্য ছুট্‌ছে যারা' ব'সে আছে তা'রাও তা'রই কাছে বসে আছে। যতদিন সম্বলপুরে ছিলাম ততদিন কেবলই মনে হ'ত কে যেন আমার ডাক্‌ছে। এখানে এসে ডাকাডাকি ভাবটা এতই প্রবল হ'য়েছে যে কি ব'ল্‌ব ভাই আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে ছুটে বেরিয়ে যাই, ঐ ওদের মধ্যে ঝাপিয়ে প'ড়ে এক হ'য়ে যাই। কিন্তু তার পরেই মনে হয় বাবা কি মনে ক'র্‌বেন।"

বিষ্ণু নীরব হইল কিন্তু তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইতেছিল। প্রিয় তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল "চলুন ঐ ঘাটে গিয়ে বসি।" গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "চল বাড়ি যাই।" বিষ্ণু বলিল "আমার সঙ্গে সারাদিন আপনারা বেড়াচ্ছেন, আপনাদের খুব কষ্ট হ'চ্চে নিশ্চয়! চলুন বাড়ী যাই।"

তিনজনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিষ্ণুকে তাহার বাসায় পৌছাইয়া দিয়া প্রিয় ও গিরীন যখন তাহাদের গৃহে পৌছিল তখন দেখিল মহামায়া তাহার প্রতীক্ষায় গবাক্ষে দাঁড়াইয়া আছে! প্রিয় প্রবেশ করিবামাত্র সে জিজ্ঞাসা করিল "বিষ্ণু কৈ? তাঁকে যে বাবা ডাক্‌ছেন।"

প্রিয়। আমরা তাঁ'কে বাড়ী রেখে এলাম, আজ তা'র শরীরও তেমন ভাল নেই।

মায়া। শরীর ভাল নেই? কি হ'য়েছে?

প্রিয় কোন উত্তর দিল না, নীরবে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। গিরীন জিজ্ঞাসা করিল "খুব বিশেষ প্রয়োজন থাকে ত' তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।"

মায়া। আপনারা দু'জনেই খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেছেন, এখন থাক্ আর একটু পরে ছোটদাকে পাঠিয়ে দেব। এই সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে শরীর খারাপ না হওয়াই আশ্চর্য্য! আপনিও দাদার সঙ্গে জুটে যেতে উঠ্‌লেন দেখ্‌ছি।

গিরীন। তোমার দাদার সঙ্গে ত' আজ নূতন জুটিনি। তুমিও আমায় আজ নূতন দেখ্‌ছ না, তবে ও কথা বল্‌ছ কেন?

প্রিয়। মায়া, বড় ক্ষিদে পেয়েছে একটু জল খাবারের যোগাড় দেখ আমি তাড়াতাড়ি আহ্নিকটা সেরে নিই।

মায়া। ঐ দেখ জলখাবার তৈরিই আছে। বিষ্ণু বাবুর জন্যও সাজিয়েছিলাম—

গিরীন। তা হ'লে তাঁ'কে আস্‌তেই হ'বে, ভয় নেই তুমিও যখন তা'র বিষয় একটু আধটু ভাব্‌তে আরম্ভ ক'রেছ তখন তা'র শুধ্‌রা'বার আশা আছে। ভালকথা প্রিয়, শ্যামাচরণ কৈ? তাঁকে যে এই সময় আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলাম।

"তা'র সব সময় কথার ঠিক থাকে না" বলিয়া প্রিয় চলিয়া গেল। তখন মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা গিরীন বাবু-সত্য বলুন ত' মানুষটাকে কি রকম মনে হয়?"

গিরীন। কা'র কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ? বিষ্ণুদার কথা?

মায়া। হ্যাঁ।

গিরীন। মন্দ কি? মানুষটা নূতন ধরণের বটে, এক এক সময় মনে হয় ওর সবই বুঝি ভাল; কিন্তু তার-পরেই বুঝ্‌তে পারা যায় না, ওর মধ্যে ভাল একটুও নেই—একেবারে বালকের মত ভাব। তোমার কি মনে হয়?

মায়া। আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। ওঁর, আমাদের ধরণের শিক্ষা হয় নি, আমরা যে সব ভাবের মধ্যে লালিত হ'য়েছি সে সব ভাব, সে সব কথা ওঁকে যেন স্পর্শই করেনি। অথচ জ্ঞানের গভীরতাও কম নয়—কিছু না শিখেও অনেক জিনিষ শেখা যায় তা ওঁকে দেখ্‌লেই বুঝা যায়। কিন্তু সব চাইতে দুর্ব্বোধ্য ওঁর নিজের ভাবটা।

গিরীন। ওঁর ভাবটা যে কি রকম অদ্ভুত তা'র একটা উদাহরণ দিই। কাল্‌কে ওঁকে নিয়ে Zoo (জু) দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। জীবজন্তুগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ কি ব'লে উঠ্‌লে জান? ব'লে উঠ্‌লে এখানে মানুষ কি ক'রে রোজ আসে? আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম 'কেন'? সে বল্লে "এত নিষ্ঠুরতা এমন ক'রে জীবজন্তুদের আবদ্ধ দেখা যারা রোজ সইতে পারে তারা নিশ্চয়ই এই বাঘ ভাল্লুকের চাইতেও হিংস্র।" এই ব'লে এত দ্রুত সে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে যে আমাদের প্রায় ছুটে গিয়ে তা'কে ধর্‌তে হয়। তারপর বাইরে এসে তবে সে স্থির হয়। তারপর সে অকারণে দুই হাতে তা'র চোখ ঢাকিয়াছিল। তাকে সাম্‌লে নিয়ে আস্‌তে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। রাস্তায় লোক অনেক সময় অবাক্ হ'য়ে আমাদের ভাব-গতিক লক্ষ্য কর্‌ছিল।

মায়া। ওঁকে না দেখ্‌লে আমি হয়ত' আপনার কথা হেসে উড়িয়ে দিতাম; কিন্তু ওঁকে দেখার পর হ'তে আর ওর বিষয়ে কোন কথা অবজ্ঞা ক'রে উড়িয়ে দেবার যো নেই।

মায়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ ও শিবব্রত কক্ষে প্রবেশ করিল। শিবব্রত বলিল "কা'র কথা হ'চ্চে?"

গিরীন। বিষ্ণুর কথা। আচ্ছা শিবু, তোমার কি মনে হয়? বিষ্ণুকে দেখে তোমার কি ধারণা হ'য়েছে?

শিব। আমার এই ধারণা হ'য়েছে লোকটা চেষ্টা ক'র্‌লে একজন উঁচু ধরণের কবি হ'তে পার্‌তো! কিন্তু ইংরিজী-টিংরিজী কিছুই জানে না, পড়া শুনা কিছুই নেই ব'লেই বোধ হয়।

শ্যামাচরণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। গিরীনও হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "পড়াশুনা নেই কি ক'রে জান্‌লে?"

শিব। আমি আজ সকালে ওঁকে পাকড়াও ক'রে National education সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম। কিন্তু তা'র একটারও উত্তর দিলেন না ব'ল্লেন 'আমি ত' কিছুই জানিনে। আমায় কেন জিজ্ঞাসা করছেন, বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি ব'লতে পারবেন।

গিরীন। নিজেকে জাহির করা বিদ্যেটা ওঁর নেই এটা নিশ্চয়, কিন্তু বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে ওঁর ভেতরে এমন একটা বিদ্যে আছে তা'র কাছে আমাদের ইংরিজী-বই-পড়া বিদ্যে সূর্য্যের কাছে প্রদীপের আলো। যাক ওঁকে ডেকে আনবার কি হ'ল? যাব নাকি?

শিবু। চল আমিও যাই। শ্যামাদাও এস না। লোকটাকে খুব interesting বলেই মনে হয় বটে।

তিনজনে বাহির হইয়া গেল।

(১০)

বৈকালে লক্ষ্মী ও মহামায়া লক্ষ্মীদের বাসার একটা কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছিল। লক্ষ্মী তাহার জীবনের সমস্ত রহস্য আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছিল। মহামায়া এক মনে শুনিতে শুনিতে বলিয়া উঠিল "আপনি তা হ'লে বাঙ্গালী নন, এদেরও কেউ নন?" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল "জন্মাবা-মাত্র কি কেউ কারুর থাকে,—আপনার হ'তে হয়। আমি আশৈশব পিতৃমাতৃহীন অথচ কখনও বাপ মা' হারাই নি। আমি যে কি ছিলাম তা জানিনে জ্ঞান হওয়া অবধি দেখ্‌ছি আমি এঁদেরই,—অথচ এঁরা বলেন আমি এ দেশের নই। আমি আমার মধ্যে এমন কিছুই খুঁজে পাইনে, যা'তে আমায় বুঝিয়ে দেবে যে আমি এঁদের নই। অথচ লোকে বলে আমি বিদেশী!"

মায়া। আপনাকে দেখে ত' কিছুতেই বুঝতে পারি না যে আপনি এঁদের আপনার লোক নন্। আচ্ছা এখন কি আপনার আর আপনার নিজের দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না? যাঁরা বাস্তবিকই আপনার নিজের লোক, যাঁদের সঙ্গে আপনার রক্তের সম্বন্ধ তাঁ'দের কাছে যেতে ইচ্ছা করে না?

লক্ষ্মী। এঁরা ছাড়া আমার আপনার যে আর কেউ আছে, তাই আমি ধারণার মধ্যে আনতে পারি না।

মায়া। তা' হ'লে আপনার যখন বিয়ে হ'বে তখন কি করবেন?

লক্ষ্মী। তা কি জানি?

মায়া। আচ্ছা আপনারা ত' হিন্দুস্থানী পশ্চিমে ব্রাহ্মণ, আপনাদের মধ্যে ত' বাল্যকালেই বিয়ে হয়। আপনার এখনও বিয়ে হয় নি কেন?

লক্ষ্মী। বাবা দেন নি তা'ই হয় নি।

মায়া। এখন যদি কোন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের ছেলে আপনাকে বিয়ে ক'রতে রাজী না হয়?

লক্ষ্মী। আমি ও বিষয়ে কোন চিন্তাই কখনও করি নি। বাবা যা' ক'রবেন তাই হ'বে।

মায়া। আপনার বিয়ের ওপর ত' ওঁর কোন হাত নেই। বিয়ে কতকটা সমাজ কতকটা নিজের ওপর নির্ভর করে। উনি যদি এখন একজন বাঙ্গালীর ছেলের সঙ্গে আপনার বিয়ে দিতে চান্, আপনি কি তা'ই ক'রবেন?

লক্ষ্মী। উনি যার সঙ্গে দেবেন তার সঙ্গেই বিয়ে হবে। তা' নিয়ে মিছে কেন মাথা ঘামাতে যাব। আর এ সব কথাই বা আপনি এত ক'রে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনাকেও ত' আপনার বাবার মতেই বিয়ে করতে হবে।

মায়া। আমার মতে এবিষয়ে আমার নিজের ইচ্ছেই সব চেয়ে আগে দেখা উচিত। বাবা কখনই আমার অমতে বিয়ে দেবেন না।

লক্ষ্মী। এতে আবার আপনার মতামত কি? বিয়ে ত' বাপ মায়েই দিয়ে থাকে। তাঁদের চেয়ে কি আমরা বেশী বুঝি?

মায়া। আমার নিজের ভালমন্দ কিসে হবে, তা' আমি বুঝি বৈকি। আর বুঝি আর নাই বুঝি এ বিষয়ে আমার মতামতটা সব চাইতে বড়, কারণ বিবাহ আমাকেই করতে হবে আর কাউকে নয়। আমার যদি ইচ্ছা না হয় তাহ'লে আমার মতের বিরুদ্ধে বিবাহ দেবার কা'রও অধিকার নেই।

মহামায়ার শেষ কথাগুলি শুনিয়া লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল "সে কি ভাই! বাপমায়ের চেয়ে কি আমি বড়? তাঁর চাইতে আমাদের আপনার আর কে আছে—ছেলে

মেয়ে যে সব তাঁ'দেরই। সংসারই বলুন, সমাজই বলুন সবই যে তাঁ'দেরই নিয়ে। আমরা স্ত্রীলোক, আমরা ত' জন্মাবধি কা'রও না কারুর হ'য়ে জন্মেছি। আমরা এমন-ভাবে আপনাদের তৈরি করব যা'তে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন একেবারেই যেন সেই অবস্থার সঙ্গে এক হ'য়ে যেতে পারি। আমাদের অন্তরকম অস্তিত্বই নেই।"

মায়া। আপনার অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হ'চ্ছে। হায়! এমনি করেই পুরুষরা আমাদের খেলার পুতুল ক'রে রেখেছে। আমাদের যে একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে আমরাও যে এক একটা মানুষ, আমাদের প্রাণ আছে, বুদ্ধি আছে, অস্তিত্ব আছে এটা পর্য্যন্ত তাঁ'রা আমাদের জানতে দেন না—ছিঃ—

মহামায়ার কথা শুনিয়া লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, "এ সব নূতন কথা, একথা কেউ আমায় কখনও বলে নি। আপনিও আর ওবিষয় নিয়ে বৃথা তর্ক করছেন কেন? আমি যেমন জানি যেমন বুঝি সেই অনুসারেই আপনাকে বল্লাম। আমার আর নূতন ক'রে কিছু বুঝ্‌বার ইচ্ছা নেই। আমার মনে হ'চ্ছে, আপনার ঐ সব কথা শোনাও ঠিক নয়—

মায়া। "কেন?

লক্ষ্মী। ওতে দুঃখ বাড়বে বৈ ক'মবে না। সংসারে সুখী হ'তে হ'লে সন্তুষ্ট হ'তে হবে।

মায়া। নিজের মনুষ্যত্ব হারিয়ে সুখী হ'তে যাওয়া নীচতা।

লক্ষ্মী। থামুন, অন্য কথা পাড়ুন।

এই সময়ে ভুবনেশ্বরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি কথা মা?"

মহামায়ার তর্ক-প্রবৃত্তিটা চড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সে লক্ষ্মীর শেষ কথাটায় এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে, ভুবনেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিয়া ঐ বিষয়ে ভুবনেশ্বরীর মত জিজ্ঞাসা করিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন "মা আমরা মূর্খ স্ত্রীলোক, আমাদের কি তোমাদের মত বোঝবার ক্ষমতা আছে? তবে এটুকু আমরা বুঝি যে আমরা যখন মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি তখন আমাদের ভালবাসতেই হবে। আর সেই ভালবাসার চারদিকেই সংসার সৃষ্ট হবে। সংসারের ঠিক মাঝখানটিতে যখন আমাদের থাকতেই হবে তখন আমাদের নিজেদের অস্তিত্বটাকে খুব বেশী ক'রে যদি মনে করি তাহ'লে সংসার ভেঙ্গে চুরে যা'বে, কিছুতেই গড়ে উঠবে না। তাই আমাদের সর্ব্বদাই মনে ক'রতে হবে যে আমরা আমাদের নই, পরের।"

মায়া। আপনার এই কথাগুলাতে কেবল পুরুষের স্বার্থপরতা প্রকাশ হ'চ্ছে। আমরা ভালবাসব, আমরা তাঁদের জন্য সংসার সৃষ্টি ক'রব, অষ্টপ্রহর তাঁদের সুখের জন্য সজাগ থাকব, আর তাঁরা বেশ স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়াবেন, এ কোন্ দেশী বিচার?

ভুবন। যাঁর হাতে জগতের সমস্ত ভার আছে, তাঁর কাছেই এ বিষয়ের বিচারের ভার আছে। পুরুষে অন্যায় ক'রছে সেটা আমাদের দেখ্‌বার দরকার কি মা? আমরা যদি আমাদের স্বভাব অনুসারে নিজেকে নিজে গ'ড়ে তুলতে পারি, তাহ'লেই আমাদের জন্ম সার্থক হবে। এ বিষয়ে তোমায় আর কি বুঝাব মা, তুমি এরই মধ্যে কত প'ড়েছ কত দেখেছ; তার ওপর তোমার ঠাকুর একজন পরম জ্ঞানী। তাঁর কাছ থেকে তোমার সন্দেহ ভেঙ্গো।

এ কথার পরে আর তর্ক করা চলে না, কিন্তু বাটী ফিরিয়াও মহামায়ার চিত্ত শান্ত হইল না। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যে তাহার পরাজয় হইয়াছে, সে উত্তর দিতে পারিত কিন্তু দিতে পারে নাই। কেন যে কিছুতেই সে ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারে নাই তাহার সন্তোষজনক কারণ যতক্ষণ সে নিজেকে না দিতে পারিতেছে ততক্ষণ সে কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছে না। সেই জন্য সে সন্ধ্যার পরই তার পিতার নিকট উপস্থিত হইল। সত্যব্রত তাহার কন্যার ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কি মা, কি হ'য়েছে?"

মহামায়া তাঁহার নিকটে আসিয়া বসিল এবং বিষণ্নমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা সত্যি বলুন এতদিন যা আমি শিখ্‌ছি সবই কি ভুল?"

সত্য। কেন মায়া সে কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ?

মহামায়া তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "তাঁরাই বা এ রকম হ'লেন কেন ? আর আমারই বা অন্য কথা মনে হয় কেন ?"

সত্যব্রত। মানুষ যে অবস্থায় পড়ে সেই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, তা' না নিলে সে সংসারে থাকতে পারে না। ওঁরা ওঁদের যে রকম শিক্ষা দীক্ষা সেই অনুসারে নিজেদের গড়েছেন, তুমিও আপন শিক্ষানুসারেই আপনাকে গ'ড়ে তুলেছ, এতে আশ্চর্য্য হ'বার বা প্রশ্ন করবার কিছুই নেই।

মায়া। তবে কেন আজ আমি কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে তাদের মতটা পুরুষদের শিক্ষানুসারেই হ'য়েছে—আমাদের দেশের পুরুষরা যা চান ওঁরা নির্ব্বিচারে তাই হ'য়েছেন।

সত্য। মা সেই জন্যই ত ওঁরা সুখী, নির্ভরতা আর সন্তুষ্টিই মানুষকে সুখী করে। তাঁরা যাদের নির্ভর ক'রে সন্তুষ্ট আছেন তাঁরা নিস্বার্থপর। ব্রহ্মকৃপাকে ত' দেখেছো আর তাঁর ছেলেটি। এঁদের উপরও যারা নির্ভর ক'রতে না পারে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ ব'লতে হবে।

মায়া। যে অন্যায়টা দেশব্যাপী তা' দু'একজনের কাজের দ্বারা শুধ্রোতে বা সমর্থিত হ'তে পারে না। ওঁরা হয় ত' ভাল লোক কিন্তু তাই ব'লে আমরা যে সকলেই আমাদের জন্মগত সত্ত্ব ত্যাগ ক'রব এ কেমন ক'রে হ'তে পারে।

সত্য। মা, যাই ক'র এই কথাটা স্মরণ রেখো, যে সংসারে যারা কাজ করে তারা মত নিয়ে মারামারি করে না। মতের সঙ্গে মত দিয়ে যুদ্ধ চলে; কিন্তু যাঁরা কাজ করেন তাঁদের কাজের সঙ্গে কাজ দিয়ে যুদ্ধ ক'রতে হয়। তুমি যখন কেবল মত নিয়েই যুদ্ধ ক'রছ তখন ওঁদের কাছে ওসব প্রশ্ন নিয়ে যাও কেন ? তুমি যা ক'রবে বা ক'রছ তারই ফল দেখিয়ে তারই বলে ওঁদের কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াও। স্ত্রীলোকের সত্ত্ব বিষয়ে যে সব মত আছে তার ফল কি দাঁড়াচ্ছে একবার চারদিকে চেয়ে দেখো তারপর সেই সবকথা ওঁদেকে গিয়ে ব'ল। জগতে তোমার মতটা নূতন নয়—রোম সম্রাজ্যের পতনের সময় রোমের স্ত্রীলোকদেরও ঐরকম মত হ'য়েছিল কিন্তু তার ফল ভাল হয়নি, বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ঐ মত প্রচলিত হ'য়েছে ; তবে তার ফল যে কি দাঁড়াবে কেউ এখনও ব'লতে পারে না ; কারণ ঐতিহাসিকভাবে দেখ্‌তে গেলে তোমার ইবসেন, মিল প্রভৃতি নূতন ঋষিগণের মত এখনও শৈশবাবস্থাতেই আছে। যখন সমস্ত জাতি বলিষ্ঠ তখন এত মত নিয়ে মারামারি হয় না, কাজ নিয়েই হয়। তারপর যখন মতের আর কাজের চুলচেরা ভাগ হ'তে থাকে আমার মতে তখনই জাতীয় অধঃপতনের মূল। এবং সেই জন্যই ভারত অধঃপতিত হ'য়েছিল। তুমি হয়তো জিজ্ঞাসা ক'রবে যে,ভারতে ত' কখনও স্ত্রীলোকেরা আপনার সত্ত্ব নিয়ে মারামারি করেনি তবে কেন ভারতের স্ত্রীলোকদের এত অধঃপতন ? আমি ব'লব আমাদের স্ত্রীলোক, ইউরোপের স্ত্রীলোকদের মত অতদূর অধঃপাতে কখনই যায়নি তাই এখনও আমরা বেঁচে আছি। বাইরে আমরা সব হারিয়েছি কিন্তু অন্দরে আমরা কিছুই হারাইনি তাই এখনও আমরা বেঁচে আছি। স্ত্রীলোকেরা নিঃস্বার্থভাবে এখনও আপনাদের কাজ ক'রে যাচ্ছেন তাই এখনও এ জাতিটা মরেনি। এরপরে যদি নূতন ভাবের কথা তুলে অপরীক্ষিত মতবাদ উঠিয়ে তোমরা আমাদের সেই অন্তঃপুরের মধ্যেই একটা বিপ্লব আন তাহ'লেই তার ফল যে কি হ'বে কে ব'লতে পারে ?

মায়া। আমাদের দেশে ত' এখনও ঐ মতটা পরীক্ষিত হয়নি তা হ'লে তার ফল যে মন্দই হবে তা' কে ব'লতে পারে ?

সত্য। না, তা' কেউ জোর ক'রে ব'লতে পারে না। সেই জন্য আমিও তোমায় কোন কাজে বাধা দিইনি। যিনি সব কাজের মূল তিনিই তোমার ভুল হ'লে সংশোধন ক'রে নেবেন এই বিশ্বাসের জোরেই আমি নিশ্চিন্ত আছি। একটা কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিই যে নিঃস্বার্থপরতাই সকল মহৎ কাজের মূল ; আমার মতটা সংসারে চল্‌বে. আমার নাম খুব ছুটবে এভাবটা যেখানে আছে সেই খানেই দেখ্‌বে যে, সেকাজে সংসারের উপকার হয় না। এই কারণেই পূর্ব্বেকার মহাজনেরা নিজের মত ব'লে কিছুই চালায় না ; সব মতের মূলেই ঈশ্বরজানিত কোন ব্যক্তির

দোহাই দিতেন, এমন কি নিজের নাম পর্য্যন্ত গোপন করিতেন। তারপর সেই মতের দ্বারা যদি সংসারের উপকার হ'ত তা' হ'লে তা' চ'ল্‌ত, নাহলে তা' ঐ পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ থাকৃত।

মায়া। আমার বোধ হয় ওটা একটা বড় রকমের জুয়াচ্চুরি, এবং তারই ফলে সাধারণ লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'র্‌বার শক্তি হারিয়েছে। তারই জন্ত আমাদের চারদিকে এত অজ্ঞতা, এত কুসংস্কার, এত বাধা। সব চিন্তার ভার যদি আমাদের পূর্ব্বকালের মহাজনদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে চ'লে থাকি তা' হ'লে যা হয় তাই আজ চার্‌দিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের সেই জাতীয় অন্যায় এখন স্তূপাকার হ'য়ে আমাদের রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমার মনে হয় যে আর আমাদের ঘুমিয়ে থাকা চলেনা। পুরুষেরা যদি আপনাদের দোষ সংশোধন না করেন আমরা স্ত্রীলোকেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকৃতে পারৃব না। আমরা যখন সংসারের ঠিক কেন্দ্রেই আছি তখন আমাদেরই আরম্ভ করতে হবে এবং তা হ'লেই শীঘ্র সবই শুধ্‌রে উঠবে।

সত্য। তুমি এখনও বালিকা, তোমার মুখে এত বড় দুঃসাহসের কথা শুনে আমার ভয় হ'চ্চে। কি জানি ভগবান্ এ কি ক'রছেন। এতদিনকার একটা বিশাল প্রতিষ্ঠানের মূলে যদি এমনি ক'রে তোমরাই আঘাত সুরু কর তাহ'লে কি যে ভয়াবহ ব্যাপার ঘট্‌বে কে বলতে পারে? তবে এটা স্থির যে তোমরা যতই নাড়া দাও, যতই আঘাত কর এই সনাতন সমাজবৃক্ষ এতই দৃঢ়, মূলও এতই মহান্ যে এর তোমরা কিছুই ক'র্‌তে পারৃবে না। হয়তো তোমাদের নাড়াচাড়াতে কতকগুলো শুক্‌নো পাতা ঝরেগিয়ে নূতন পাতা গজাবার সুবিধে হ'বে। যাক্ এখন তর্ক ছেড়ে কাজে মন দাও গিয়ে। মনে কোন ক্ষোভ রেখোনা। তোমার অন্তরাত্মা যে কাজ ক'র্‌তে বল্‌ছেন তাই ক'রে চল, ফলাফল তোমার হাতে যখন নেই তখন আমার ভয়ও নেই।

মায়া তাহার পিতার নিকট হইতে উঠিয়া গেল কিন্তু তাহার চিত্ত শান্ত হইল না। রাত্রে সে শয্যায় শয়ন করিয়াও ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে "আমরাই কেবল নিঃস্বার্থপর হইব, আমরাই কেবল ভালবাসিতে বাধ্য, সমস্ত কর্ত্তব্যই আমাদের স্কন্ধে আর পুরুষদের কোন কর্ত্তব্যই নাই। আমরা চিন্তা করিব না,কারণ তা'তে সমাজের ক্ষতি অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষতি আমরা আমাদের ছোট ঘরের কোন্‌টীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব আর পুরুষেরা বাহিরের সমস্ত সুখ সমস্ত আনন্দ উপভোগ করিবেন। এ কোন ন্যায়পরায়ণ ভগবানের বিধান ?"

মহামায়া এইরূপে তাহার চিত্তের সমস্ত শক্তি লইয়া পুরুষজাতিকে আক্রমণ করিতে মনে মনে চেষ্টা করিল, কিন্তু যখনই তাহার পিতা বা ভ্রাতার নিস্বার্থপরতার কথা মনে পড়িল তখনি তাহার মনের তীব্রতা সমস্ত বিরুদ্ধভাবগুলি একনিমেষেই শান্ত হইয়া যাইতে লাগিল। যখনই সে মনে আঘাত করিতে উদ্যত হইল অমনি তাহার পিতার শান্ত করুণাপূর্ণ মুখ মনে পড়ায় তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল! অবশেষে বিরক্ত হইয়া একখানা পুস্তক লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার সে চেষ্টাও সফল হইল না, তখন ব্যথিত অন্তঃকরণে আবার শয্যা গ্রহণ করিল!

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

বিধবা।

প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য চলিছে সংসারে,
হেথা তোর, বিষাদিনি! কে চাহিবে মুখ?
পেতেছিস্ হাত তুই পিশাচের দ্বারে—
অবহেলা, অবজ্ঞায় ভেঙ্গে যাবে বুক।
তোর ও বুকের মাঝে যে চিতাটী জ্বলে,
জোগা'বে ইহারা তা'তে কেবল ইন্ধন,
বাড়াবে দ্বিগুণ জ্বালা শুধু হলাহলে,
গুপ্ত নিয়তির ইহা দারুণ বন্ধন।

ক্ষণিকের শান্তি নাই, জ্বালা আর জ্বালা,
তবুও হাসির রেখা হইবে টানিতে,
নইলে শুনিবে কেন? এরা সব কালা—
এরা শুধু পেতে চায় কেহ নাই দিতে।
হতভাগি, খাটো শুধু ভোর থেকে সাঁঝ,
বিধাতা চাহেনি মুখ, চা'বে কি পিশাচ!

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

কবির মুক্তি।

কোশলরাজ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, এক তরুণ কবি দ্বারে উপস্থিত, তাহার গানে নাকি বনের পশুপক্ষী ঘুমাইয়া পড়ে, বাতাস স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, পাষাণের চক্ষে অশ্রু ঝরে।

রাজা সঙ্গীত-সভা আহ্বান করিয়াছেন, রাজ্যের যত সমজদার সমাগত। পর্দ্দার আড়াল হইতে কঙ্কণের কিনি কিনি ধ্বনি আসিতেছে।

কবি আসিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময়ে সকলে দেখিল—তরুণ-যুবক, হাতে বীণা, বেশ অতি সাধারণ। রাজা কহিলেন "কবি, গান ধর।"

বীণা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল—কবির করাঙ্গুলি স্পর্শে তাহা গ্রামের পর গ্রামে উঠিতে নামিতে লাগিল। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ভোরের আকাশ ভরিয়া উঠিল, বাহিরের বীণায় তাহা আপনাকে বিলাইয়া দিল। সভাতল নীরব, নিস্তব্ধ; শুধু এক সঙ্গীত লহরীর নৃত্য।

অকস্মাৎ সঙ্গীত থামিয়া গেল। সকলের চমক ভাঙিল, দেখিল কবির বক্ষ অশ্রুতে ভিজিয়া গিয়াছে, কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ।

রাজা সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন "কবি, তোমার সাধনা সার্থক।" সভাসদগণ আলিঙ্গন করিয়া বলিল "কবি তুমি ধন্য।" পর্দ্দার আড়াল হইতে হীরার মালা আসিয়া কবির পদতলে পড়িয়া জানাইল—সেখানকার আনন্দ, সেখানকার কৃতজ্ঞতা।

মুগ্ধরাজা কহিলেন "কবি, তুমি যে সঙ্গীতের জাল এদেশে বুন্‌লে, তাহাতেই তুমি বন্দী"। কবি বিনীত হইয়া বলিল "মহারাজ, আমি আশ্রয়হীন, আশ্রয় পেয়ে ধন্য হলেম।

সভা ভঙ্গ হইল। কবি বীণাটী বক্ষে করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল। বীণাটী ঝাড়িয়া পুছিয়া এক কোণে রাখিয়া দিল। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস মর্ম্মের গভীরতম প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কবির ব্যথা যে কোথায়, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; তবু কোথায় যেন একটা আঘাত, কোথায় যেন একটা বেদনা গুমরিয়া মারিতেছে। গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে যখন গাছের পাতাটীও ঘুমাইয়া পড়িত, কবি তখন শিহরিয়া উঠিয়া বসিত। একটা অজানা দুঃখে তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিত। কি যেন তার ছিল—কোথায় যেন সে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অসহ্য বেদনায়

বীণাটীকে বুকে চাপিয়া ধরিত ; তারপর ধীরে ধীরে বীণার অরুণ মূর্চ্ছনায় নিজের কণ্ঠ মিলাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। হৃদয়ের এ গুরুভার একটু সরিয়া গেলে সে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিত—কেন—কিসের আঁখিজল ? কোন উত্তর পাইত না। প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যাইত এ প্রশ্নের সমাধান হইত না।

(২)

রাজকুমারী সুলতা বলিল, "বাবা আমি বীণা শিখ্‌ব'।"

রাজা খুসী হইয়া বলিলেন "বেশ'ত, আমি আজই কবিকে ব'লে দেব'।".

কবি শুনিয়া বিস্মিত হইল। এই'ত বেশ ছিল। প্রভাতে রাজার সভায় গান গাওয়া, আর তারপর সারাদিবারাত্রি ছুটি; তাহার আত্মহারা চিত্ত আপনার মনে থাকিত। আবার এসব কেন ? কবি ক্ষুণ্ণ হইল, তবু তাহাকে এ কাজ গ্রহণ করিতে হইল।

কবি যেন ছিল ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি, তাহার ভিতরটা যতই সুন্দর ছিল বাহিরটা ছিল ততই বিশ্রী।

রাজকুমারী দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল। এই কি সেই—যাহার গানে এতখানি পরিপূর্ণতা, এতখানি মাদকতা! রাজকুমারীর মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল, মৌন কবি মাথা নত করিয়া বীণায় আঘাত করিল। আবার বীণার আকুল ধ্বনি নিখিল ভুবন ছাইয়া ফেলিল, কোন কল্পপুরের সুর-মাধুরী মূর্ত্তিমতী হইয়া বীণার বুকে যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। বিশ্বের যত ব্যথার পুঞ্জীভূত ক্রন্দন সুরস্পর্শে, জাগিয়া উঠিল। কোন্ অভাগীর আপনহারা আর্ত্তনাদ, কোন্ সন্তপ্তের হিয়ার স্পন্দন !

সুলতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "কবি, থাম, থাম, আর যে প্যারিনে—উঃ অসহ্য! বল, বল কবি, কি দুঃখ, কি হাহাকার তোমার বুকে—" আকুল আগ্রহে রাজকুমারী কবির মুখের দিকে চাহিল। কি উত্তর দিবে সে ? সেই অশ্রুভরা হাসিটী হাসিয়া কবি মাথা নত করিল

সুলতা ভাবিল 'কে এ কিন্নর! কিন্তু রূপ কই ? নাইবা থাক্ রূপ, রূপে আমার কি ? তারপর পরিপূর্ণ গর্ব্বে শিহরিয়া ভাবিল, 'আমি রাজকুমারী।'

(৩)

সন্ধ্যার রক্তিম আলো নিবিড় মেঘের কোলে মিশিয়া গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, বাতাস নিস্তব্ধ, আকাশ নিস্তব্ধ, কবির চিত্ত নিস্তব্ধ। কবি ভাবিতেছিল কোথায় সে আসিল। কবি ভাবিতেছিল কোথা হইতে সে কোথায় আসিল—কেন এমন করিয়া ধরা পড়িয়া গেল। তাহার হস্তপদ কেন এমন করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, এ যে বড় কঠিন—বড় মধুর, এ যে অতি দুঃসহ সুখ, এ যে বাসনা জাগান' তৃপ্তি। ইহার শেষ কোথায়—কে জানে!

রাজপুরী হইতে সংবাদ আসিল,—সময় হইয়াছে, রাজকুমারী প্রস্তুত। কবি বীণা লইয়া রাজকুমারীর কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন রাজকুমারী সুলতার জন্মতিথি। রাজপুরী আলোর বসন পরিয়া ঝল্‌মল্ করিতেছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল, সকলের অন্তরে বাহিরে উচ্ছল আনন্দপ্রবাহ।

বনদেবীর মত সুলতা কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল ; অঙ্গে তার পুষ্পাভরণ, কক্ষের যত দীপ যত আলো উজ্জল হইয়া উঠিল। মুগ্ধ বিস্মিত কবি অনিমেষে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারী বলিলেন "কবি, আজ উৎসবের দিন—তোমার বীণ-রবে তাহা পরিপূর্ণ কর

কবি বীণায় আঘাত করিল, বীণার তারগুলি ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। এ কেমন হইল! বীণা যে, আজ অবাধ্য! আজ যে সে বাজিতে চায় না—কেন এমন হইল, সে যে মূক হইতে চায়, কি যেন সে বলিতে চায় কিন্তু পারে না যে!

কবির অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। অঙ্গুলি শিথিল হইয়া পড়িল। সে বীণাটী নামাইয়া রাখিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল।

সুলতা সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কবি আজ তোমার মন ভাল নেই—আজ নাইবা গাইলে। আজ তোমার ছুটি।"

কবি চঞ্চল হইয়া উঠিল—কিছু ভাবিল না। বলিয়া ফেলিল "রাজকুমারি, আমার ছুটি ত' আর নাই, আমার ছুটি যে শেষ হ'য়ে গেছে।" সে উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সুলতার হাত চাপিয়া ধরিল। সুলতার সারা অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল।

একি মদিরার নেশা! একি মাদকতা! সুলতা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে কবির বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। একি!

অকস্মাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। তাহার অন্তরের মধ্যে রাজকুমারী শিহরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল! সে সজোরে হাত ছিনাইয়া লইয়া শয়নকক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। কবি দেখিল তাহার চক্ষুর সম্মুখে ত্রিভুবনের সকল জমাট অন্ধকার পাখা মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৪)

রাজকুমারী কুসুম-ভূষণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল। আজ তাহার বুকে একি আগুন জ্বলিল! এ আগুণ যে সাত সমুদ্রের সমস্ত জলেও নির্ব্বাপিত হইবে না। তাহার অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিল "তোর এ জ্বালা জুড়োবে না লো—তুই যে রাজকুমারী।" সত্যিইত সে রাজকুমারী; তবে—তবে কি!

সুলতার অশ্রুবন্যায় ভূমিতল ভাসিয়া গেল!

রাজা আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হ'য়েছে মা?"

সুলতা পিতার কোলে মাথা লুকাইয়া আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার কি হইয়াছে সে কি বলিবে! এ যে বলা যায় না। এ যে সাগরের বুকফাটা ব্যথার কলকল্লোলের মত বুকের মাঝেই গুমরিয়া উঠে, আবার সেখানেই মিলাইয়া যায়।

রাজা আবার সস্নেহে বলিলেন "কে তোমার কি ক'রেছে মা? আমায় বল মা আমি এখনই তার প্রতিকার কর্চ্ছি।"

সুলতা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "তা'র স্পর্দ্ধা বাবা, যে তোমার কন্যার অপমান করে।—"

রাজা চমকিয়া উঠিলেন—রুষ্টস্বরে বলিলেন "তোমার অপমান! কে—কে করেছে?" সুলতা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "তোমার—তোমার কবি—"

রাজা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর কন্যার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "তা'কে ক্ষমা কর মা, সে বনের পক্ষী, তা'র কথায় কি রাগ কর্ত্তে আছে?"

রাজা কবে, কোন মুহূর্ত্তে জানিনা এই তরুণ যুবকটীকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সুলতা ক্ষুব্ধস্বরে ডাকিল—"বাবা"। রাজা স্নেহবিগলিত হইয়া বলিলেন "তবে তা'ই হউক মা; তুই যাতে সুখী হোস্ আমি তাই ক'রব, তা'কে শাস্তি দিব। তা'কে এরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত ক'রব।" রাজা ক্ষুণ্ণ মনে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

* * * *

ছিটকিরি ছিটকিরি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কবি বীণাটী বুকে করিয়া কুটীরে বসিয়াছিল। ভিজা মাটীর গন্ধে তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, সে বীণার ঝঙ্কার তুলিল—তারপর কণ্ঠ খুলিয়া গান ধরিল। তাহার কণ্ঠস্বর মেঘের পরতে পরতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আজ যে তা'র মহাসঙ্গীতের দিন! সে গাহিল—

"ওরে বন্ধনহারা মন, ওরে আমার উদাসী চিত্ত,
আজ তোর মুক্তি—আজ তোর জীবনের চিরমুক্তি।
আজ একবার হেসে নে—একবার কেঁদে নে রে।"

আজ তাহার নির্ব্বাসন। এ নির্ব্বাসন না সর্ব্বস্বপ্রাপ্তি! আজ ত' সে পরিপূর্ণ; যার জন্য তা'র ক্ষুধিত তাপিত তৃষিত চিত্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল, তাহা ত' সে পাইয়াছে। তবে আর কি? তাই আজ তার মুক্তি।

কবি বীণাখানি বক্ষে করিয়া গৃহের বাহির হইল। সন্ধ্যার আঁধারে তাহাকে কেহ লক্ষ্য করিল না। ধীরে ধীরে সে আসিয়া রাজকুমারীর কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইল। সুলতা উপাধানে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। কবি ধীরে ধীরে বলিল "রাজকুমারি! আজ আমার ছুটী; যার জন্য এসেছিলাম তাহা আমি পেয়েছি। আজই আমায় যেতে হবে। তোমার জন্য—আমার সুখদুঃখের চিরসঙ্গী এই বীণাখানি—তোমার জন্য এনেছি।" কবি বীণাটী শয্যার উপর রাখিয়া ধীরে অতি ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহার এ পূজা এ অর্ঘ্য গৃহীত হইল কিনা জানিবার জন্য প্রতীক্ষাও করিল না।

সুলতা আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, বীণাটীকে জড়াইয়া তাহার সর্ব্ব শরীরে চুম্বনের বৃষ্টি করিল। তারপর কম্পিত হস্তে বীণাখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া বীণার সব তার ছিঁড়িয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেনগুপ্ত।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সমাজ-সংস্কার।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-সংস্কারকগণ ও তাঁহাদের সংস্কার-প্রস্তাব, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, উদ্দেশ্য, উপায়গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া সমাজসংস্কার সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকি, স্বামী বিবেকানন্দ তাহার তীব্র প্রতিবাদরূপেই বাঙ্গালী সমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর ধ্বংসমূলক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সংস্কার চেষ্টাগুলির আত্মঘাতী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিয়াই গভীর ক্ষোভের সহিত বিবেকানন্দকে বলিতে হইয়াছে, "আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি।" আধুনিক সংস্কারকগণ, যাঁহারা এখনও উনবিংশ শতাব্দীর ভ্রান্ত আদর্শের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা অনেক সময় বিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসেন, "তবে কি সমাজসংস্কারের প্রয়োজন নাই?" নিতান্ত মূঢ় বা একান্ত শম্বুকধর্ম্মী গোঁড়া ব্যতীত আর কেহই এই প্রয়োজন অস্বীকার করিবেন না।

সমাজের কতকগুলি কুরীতি, অর্থহীন প্রথার দৌরাত্ম্যে, জমাট কুসংস্কারের দুর্ব্বহভার পীড়িত জাতির অগ্রসর বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং ইহার আশু পরিবর্ত্তন যে একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহা বিবেকানন্দ কোনদিনই অস্বীকার করেন নাই। আবর্জ্জনাকে পরিহারের চেষ্টা পূর্ব্বগ সংস্কারকগণ অপেক্ষা স্বামিজীর মধ্যেও একান্ত কম ছিল না। তাঁহার তীব্র আপত্তি কেবল তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত কার্য্যপ্রণালীর উপর! বিগত শতাব্দী, সংস্কারকার্য্যকে যে উপায়ে যে পথে চালিত করিয়াছিলেন বা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা—কেবল বৈদেশিক বলিয়া নহে, অন্ধ অনুকরণ বলিয়া নহে—কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করে নাই, করিতে পারে নাই, বা করিবে না বলিয়াই তিনি ভবিষ্যযুগকে ঐ প্রণালী সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সংস্কারের প্রয়োজন সুস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াও তিনি কেন শতাব্দী-ব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

মানবের সমাজধর্ম্মের সেই আদিম শৈশবকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত উহার বিকাশ ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাস বর্ত্তমান কালে আমরা যে আকারে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে অধিক বিলম্ব হয় না যে, যেখানেই বলপূর্ব্বক কোন নূতন বিধান চালাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, অথবা কোন পুরাতন রীতি পরিহারের জন্য জাতিকে বাধ্য করা হইয়াছে, সেই খানেই তথাকথিত সংস্কারকগণ স্ব স্ব ব্যর্থতাকেই প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। ব্যক্তিবিশেষের অথবা কয়েকজন লোকের কোন প্রথা অন্যায় বলিয়া বোধ হইলেই যে সমগ্রজাতি নির্ব্বিবাদে তাহা স্বীকার করিয়া লইবে, একমাত্র বাতুল ব্যতীত অপর কেহ সেরূপ আশা করিবেন না। বিগত শতাব্দীর সংস্কারকগণ যে এই সত্যটীকে অস্বীকার করিয়া দেশব্যাপী একটা সমাজ-বিপ্লব জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ সন্দেহ করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণ আছে। আর এই কারণেই তাঁহারা বিকল মনোরথ হইয়াছেন। যিনি জাতির কল্যানকল্পে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইবেন তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে। কথিত সংস্কারকগণ অধীর উত্তেজনায় অভিশাপ উচ্চারণ করিয়া সংস্কারে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়াই স্বামিজী সামাজিক ব্যাধির প্রতীকারোপায় নির্দেশ করিতে গিয়া পূর্ব্বানুষ্ঠিত প্রণালীর প্রতিবাদের সঙ্গে বলিয়াছেন, "আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজ সকল (?) আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

বিগত সংস্কারযুগের সমালোচনা করিতে গিয়া স্বামিজী পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—"আমি সংস্কারে বিশ্বাসী নহি, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।"

সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে কতকগুলি কুপ্রথা বর্জ্জন করিয়া উন্নততর সামাজিক জীবনযাপন প্রণালী একদিনেই সমষ্টিগতরূপে জাতীয় জীবনে ফুটিয়া উঠে না—উঠিতে পারে না। ব্যষ্টির জীবনেই উহার বিকাশ—জাতীয় চরিত্রে উহার ক্রমসঙ্করণও অতি ধীরভাবে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, যদি একদিনেই বিশকোটী হিন্দু সমস্ত প্রকার সম্প্রদায়গত বৈষম্য, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের কথা বিস্মৃত হইয়া নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে এক অখণ্ড জাতি গঠনের দিক দিয়া খুবই সুবিধা হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সুবিধাকেই বড় করিয়া দেখিয়া কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া বেঞ্চের উপর বসাইয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত করাইতে পারিলেই সমাজ উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয় না—ইহা পরীক্ষিত সত্য।

ঐরূপ সংস্কার চেষ্টাকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া স্বাভাবিক উন্নতির পথে সমাজকে চালিত করিবার যে সুমহান প্রয়াসে বিবেকানন্দ জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে এক অতি অনুপম অভিনব আদর্শ, বিদেশীর পদা-ঘাতপ্রসূত-অসহিষ্ণু-অধীরতায়-উন্মুখ সংস্কারকগণের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি ছাপাইয়া, ডুবাইয়া আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে মহিমাময় বৈশিষ্ট্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিবেকানন্দ যে বলিয়াছেন, "সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক"—এইখানেই এ উক্তির সত্যতা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকি। আমরা বেশ বুঝিতে পারি বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলন করা উচিত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেন বলিয়াছেন, "আমি কি বিধবা যে আমাকে উহা জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

অর্থাৎ সমস্ত সমাজসংস্কার সমস্যাটী তাঁহার নিকট একটী প্রশ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—"সংস্কার যাহারা চায় তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কারপ্রার্থী লোক কৈ?"

এই সংস্কার-প্রার্থীগণকে গঠন করিয়া তোলাই স্বামিজীর মতে বর্ত্তমান যুগের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। এবং এই লোকশিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষাই করিতে হইবে। সেইজন্যই তিনি ইহাকে জাতিগঠন বা সমাজ-গঠনের যুগ বলিয়া স্বীকার করেন নাই—সমাজ বা সম্প্রদায় গঠনেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না; মানুষগঠন করিবার জন্যই তিনি সমধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং ভাবাবেগে দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, "I want to preach a man-making religion." অর্থাৎ আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার ক'রতে চাই, যা'তে মানুষ তৈরী হয়। ত্রিশ কোটী নরনারীর মধ্য হইতে তিনি সহস্র মানুষ চাহিয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শ্রদ্ধাবান, মেধাবী, পর কল্যাণ কামনায় সর্ব্বত্যাগী কতকগুলি মানুষ পাইলে তিনি ভারতের, কেবল ভারতের কেন, সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দিতে পারেন।

যতদিন মানবসমাজ থাকিবে, উহার অপূর্ণতা, ত্রুটী, অন্যায় কদাচারও থাকিবে—পুরাতন বাতব্যাধির ন্যায় সমাজের দুর্নীতিকে একেবারে দূর করা অসম্ভব—এক স্থান হইতে তাড়িত হইলে উহা অন্য স্থানে গিয়া বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিবেই। অতএব যাঁহারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামাইয়া আনিবার দিবাস্বপ্নে বিভোর হইয়া সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের পক্ষে অনর্থক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকাই ভাল।

* * * *

পাটেল বিল উপলক্ষে আজকাল অসবর্ণ বিবাহ লইয়া দেশব্যাপী একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। নানাবিধ বাদ প্রতিবাদে বাঙ্গালাদেশের মাসিক পত্রিকাগুলির পক্ষ ও বক্ষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই অসবর্ণ বিবাহ সমস্যাও আমাদের নিকট নিতান্ত আকস্মিক ভাবে উপস্থিত হয় নাই; বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণোত্তম বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ প্রস্তাব রাজদ্বারে আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইবার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মসমাজ অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া

তাঁহারাও রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন; এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন তাঁহাদের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়াছিল। কিন্তু এই সাফল্য ক্রয় করিতে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকগণ যে মূল্য দিয়াছিলেন;—যে হীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, সাতচল্লিশ বৎসর গত না হইতেই কি বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়া গিয়াছে? নতুবা কোন্ লজ্জায় সে আবার লালায়িত হস্ত প্রসারণ করিয়া পুনরায় রাজদ্বারে দাঁড়াইতে চায়?

আমাদের যতদূর বিশ্বাস সমাজ-সংস্কার-কল্পে বিদেশী বিধর্ম্মী রাজার সাহায্যে আইন করা বিবেকানন্দের একান্ত অনভিপ্রেত ছিল। অথচ তিনি অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন এবং কি উপায়ে উহা সামাজিক জীবনে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতও করিয়াছেন। * সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া অনিষ্টের কারণ জন্মিতে পারে এই আশঙ্কায় স্বামিজী বিভিন্ন জাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের সমর্থন করেন নাই। একই জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রথমতঃ বিবাহপ্রচলনে তাঁহার পূর্ণ সম্মতি ছিল।

এইরূপে জাতিভেদ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ, পতিত ও নিম্নজাতি সমূহের উন্নয়ন ও সমাজে যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ, বাঙ্গালা দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে যথাযথ অধিকার প্রদান ইত্যাদি সংস্কারের আভাষ পৃথক পৃথক ভাবে তাঁহার উপদেশ ও কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে পাইয়া থাকি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমরা বৈদিশিক শিক্ষা ও আদর্শের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি;—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপের সহিত ঠিক ঠিক পরিচিত না হইতে পারিতেছি, ততদিন বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত সংস্কারের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, ইহা ধ্রুব সত্য! বিগত শতাব্দীর সমস্ত প্রকার ধ্বংস ও অন্ধ পরানুকরণের চেষ্টা বাঙ্গালার প্রাণ-শক্তিকে নির্জ্জীব করিতে পারে নাই—তাই শতাব্দীর বিপ্লব ঝটিকাবসানে উহা আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার বিশিষ্ট সাধনাগুলিকে এক অখণ্ড সমন্বয় সূত্রে গাঁথিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ভাবে শিক্ষাদান প্রণালীর যে আদর্শ উদীয়মান জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, কে বলিতে পারে বাঙ্গালী কতদিনে তাহা প্রাণে প্রাণে [illegible] করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে? এখনও কি সময় হয় নাই?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

জন্মাষ্টমী

ব্যাপ্ত অসীম অম্বরতল ঘন ঘোর কালোমেঘে
অধীর পবন গর্জ্জন করি' ফুঁসিছে মত্ত বেগে
জলদপুঞ্জ ঢালে নিশিদিন বারি-ধারা অবিরল
পাগল যমুনা উদ্দাম স্রোতে ছুটিয়াছে উচ্ছ্বল
কৃষ্ণা-রজনী মসীঢালা গায়
তমসায় নাহি পথ দেখা যায়
বিশ্বপ্রকৃতি করে হায় হায়—কোথা আলো, কোথা আলো?
দয়াময়! আর নাহি সয় তব কৌমুদী-দীপ জ্বালো।
মানব কাঁদিল—ভগবান ভগবান!
জীবনের ঘোর তমসা হইতে কর গো পরিত্রাণ।

* Vide Complete works 1155 p.

সহসা ওকিরে অম্বর ব্যাপি' অমৃত সুর ঝরে,
আনন্দ-রেণু পড়িল ঝরিয়া ব্যথিত মর্ত্ত্য'পরে,
সপ্তভুবন ছন্দিত করি' উঠিয়াছে বন্দন
আর্ত্তত্রারিতে বিশ্বত্রাতার আজি ওরে আগমন
ধরণীর দুঃখ-দুর্দ্দিন রাতি
জীবনমরণে রণ-মাতামাতি
হেন সঙ্কটে না আসিলে তিনি বাঁচে কি করিয়া প্রাণ ?
সৃষ্টি রাখিতে মর্ত্ত্যের ঘরে আসে নামি' ভগবান।
শ্রবণ-রন্ধ্রে বংশী যে বেজে যায়
ধ্বংসহরণ জন্মবারতা গাবি তোরা আয় আয়।

ত্রিতাপ তাপিত লৌহকারায় কাঁদে কোন্ অভাগা রে ?
মুক্ত করিতে শৃঙ্খল আজি হরি যে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
অন্ধ কারা যে ধুয়ে যাবে আজি আলোকের ঝরণায়
মুক্তির গান আসিয়াছে নামি' মর্ত্ত্যের আঙ্গিনায়।
ভরে' থাকে মেঘে যদি অম্বর
বজ্র গরজে যদি কড়্কড়্
নাহি আর খেদ নাহি ওরে ডর শৌরী যে আজি ঘরে
গৃহে গৃহে গাঁথি পুষ্পের মালা সাজায়ে দে থরে থরে।
মথুরার পথে ছুটে আয় নরনারী
আঁধারের তলে আজি আনন্দ গলে যায় দেবতারি।

গর্জ্জন করি, নাচ ওরে বায়ু উন্মাদ বাহু তুলি'
রুদ্র মধুরে তালে তালে নেচে ওঠ্‌রে যমুনা ফুলি'।
পাপতাপ গ্লানি শঙ্কার পুরী হ'য়ে রোক্ অচেতন
প্রাণধনে মোরা রেখে আসি চল্ ডেকেছে বৃন্দাবন।
হেঁটে পার হব' সিন্ধুর গায়
তুচ্ছ তরীর মাগি না সহায়
নিখিল বন্ধু কোলে আজি যার তাহার কিসেরে ভয় ?
শ্রীমধুসূদন আত্মীয় যার সমংতার বরাভয়।
ব'লে দে বার্ত্তা বিশ্বের দ্বারে দ্বারে
আর্ত্তের হরি জন্মেছে আজি কংসের কারাগারে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কাঞ্চীরাণী।

ঝুম্, ঝুম্, ঝুম্ অবিশ্রান্ত জলের ধারা পড়িতেই আছে। পাহাড়গুলি যেন একখানা সাদা আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া পড়িয়া আছে। মেঘের পর্দ্দার ভিতর দিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া সূর্য্যদেব আজ একেবারে ক্ষান্ত দিয়াছেন। আকাশ, পাহাড়, পৃথিবী সব যেন আজ এক হইয়া গিয়াছে—আছে শুধু বারিপতনের অবিশ্রান্ত "ঝুম্ ঝুম্" রব। টিনের ছাদের উপর জল পড়িয়া আরও দ্বিগুণ শব্দ হইতেছে, শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন একটা গানের তান বহিয়া চলিয়াছে। সকাল বেলা উঠিয়া গরম গরম চা পান করিয়াই বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আয়নার দেয়ালগুলির মধ্য দিয়া আকাশের অবস্থাটা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া নিলাম, যদি বর্ষাতিটা পরিয়া একবার "ম্যল্"টা ঘুরিয়া আসিতে পারি। মনে হইল বৃথা চেষ্টা, দু'তিন ঘণ্টার পূর্ব্বে এ জল ধরিবার নয়। সময়টা এখন কাটে কি করে? টিপয়ের উপর থেকে "হারমোনিয়ম"টা টানিয়া লইয়া গাহিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাও ভাল লাগিল না। বৃষ্টির বেগ এদিকে বাড়িয়াই চলিয়াছে, মনে হইতে লাগিল সমস্ত বিশ্ব-সংসার বুঝি বিরহী যক্ষের ব্যথা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, তাই আজ অশ্রুবর্ষণের বিরাম নাই। এমন সময় হঠাৎ বোধ হইল দরজায় কে আস্তে আস্তে ঘা মারিতেছে, উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া দেখি, সেই পাহাড়ী মেয়েটী,—কাঞ্চী,—দাঁড়াইয়া; গায়ের সমস্ত কাপড় সিক্ত হইয়া গিয়াছে। জলেভেজা মুখখানি পদ্মফুলের মত টল টল করিতেছে; এই বৃষ্টিকাদায় আসার দরুণ পরিশ্রমে, রাঙ্গামুখখানি, আরো রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সঙ্কুচিত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, হাতে সেই অন্য দিনের মত এক গুচ্ছ পাহাড়ী ফুল, চোখে মুখে কি একটা করুণ আবেদনের ভাব। এখন কাঞ্চীর একটু পরিচয় দিব আমি প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, আমাদের আফিসের কোন কাজ লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছি, নহিলে এ ভরা শ্রাবণে মেঘের জটাজুটধারী পাহাড়ের কাছে কে এখন আসে? "ম্যলে"র চৌরাস্তার নীচেই একটা ছোট বাড়ীতে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বাড়ীখানি যেন একটী ছবির মত। দেওয়াল বাহিয়া লতাইয়া লতাইয়া "পোটেটো ক্রিপারের" কয়েকটা গাছ উঠিয়াছে, তাহাতে থরে থরে শুভ্র ফুলের গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে। সাম্‌নে একটু খালি ঢালু জমি, সেখানে'ত জরদা আর লাল ডালিয়ায় রাশিতে যেন মনে হয় আগুনের ফুল্কির ঢেউ। আমার সঙ্গে শুধু পুরাণো চাকর নিধুরাম আসিয়াছে; আমার অবিবাহিত জীবনের সেই আমার একমাত্র সম্বল। বাড়ীর পিছন্ দিকে পাহাড় ঘেসিয়া একখানি ছোট ঘর, তাতেই বাড়ীর চৌকীদার নরসিং, তাহার স্ত্রী ও কন্যা কাঞ্চীকে লইয়া থাকে। নরসিং বাড়ীর চৌকীদারী করিয়া যা কিছু পাইত, সবই সে সুরাদেবীর পদে অর্ঘ্যদান করিত। কাঞ্চী ও তাহার মা কুলিগিরি করিয়া, রাস্তার পাথর ভাঙ্গিয়া যাহা রোজগার করে, তাহা দিয়া কষ্টে সৃষ্টে তাহাদের ছোট সংসারখানি চলিয়া যাইত। একদিন পার্ব্বতীর মার মুখেই, তাহাদের ঘর সংসারের সব সুখ দুঃখের কাহিনীগুলি শুনি, অনেকগুলি সন্তান মারা যাইবার পর কাঞ্চীই তাহাদের শেষ বয়সের সম্বল; বড়লক্ষ্মী মেয়ে সে, এই অল্পবয়সেই বাপের অত্যাচার ও অযত্ন হইতে, মাকে প্রাণপণে আগলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। রোজ দেখিতাম, সে তাহার ছোট "ডোকা"খানি পিঠে করিয়া মা'র সঙ্গে কাজে বাহির হইয়া যায়, সারাটী দিন মা'র সঙ্গে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বাপ মা'র সেবায় লাগিয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিন তা'র একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ ছিল; রোজ সকালে বাহির হইয়া যাইবার পূর্ব্বে, এক গুচ্ছ ফুল আনিয়া সে আমার বসিবার ঘরে জানালার পাশে রাখিয়া দিয়া যাইত। প্রথম প্রথম আমি অত খেয়াল করি নাই। তারপর

যখন দেখিতাম এটী তাহার প্রতিদিনের একটী নৈমিত্তিক কর্ম্ম—তখনও এর কারণ জানিবার জন্য কোন রকম কৌতূহল হয়নি। কিন্তু এই ভরা বাদলের মাঝখানেও ভিজে কাপড়ে, তেমনি ভাবে তাহাকে ফুলের গুচ্ছ হাতে লইয়া আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

কাঞ্চী ক্ষণিকক্ষণ কুণ্ঠিতভাবে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "বাবুজি! এই বৃষ্টির মধ্যে দরজা খুলেছি ব'লে রাগ কর্ব্বেন না, আমি এই ফুল ক'টী রেখে এখনই চলে যাব।"

"না, কাঞ্চি, আমি রাগ করিনি। তুমি দরজা ভেজিয়ে বরঞ্চ এদিকে এসে একটু ব'সো, একটু গল্প করা যাক্। আচ্ছা, "নানী" তুমি রোজ রোজ এখানে ফুলগুলি সাজিয়ে রেখে যাও কেন? ফুল কি তুমি বড় ভালবাস?"

"বাবুজি! আপনি জানেন না, আমার বাবুজী যে ফুল বড় ভালবাস্তেন, ঐখানে ঐ যেখানে জানালার পাশে আপনি ব'সে আছেন, ঐখানে খাটের ওপর তিনি শুয়ে থাক্তেন। জানালার ভেতর দিয়ে মেঘের খেলা দেখতে তিনি বড় ভালবাসতেন, আর ভালোবাসতেন ঐ লাল লাল "ডালিয়া" ফুলগুলি। রোজ সকালে আমি টিপয়ের ওপর ফুলদানে রাশি রাশি ফুল তাঁ'র জন্যে সাজিয়ে রাখ্তাম—বলিতে বলিতে তাহার কালো কালো চোখ দুটী জলে ভরিয়া আসিল, অনিমেষ দৃষ্টিতে সে জানালার দিকে তাকাইয়া রহিল, মনে হইতে লাগিল যেন সে তাহার সেই মানস চক্ষে তাহার "বাবুজী"কে দেখিতে পাইতেছে। এই সরলা গিরিনন্দিনীর এই অদ্ভুত কথাগুলিতে আমার কৌতূহল খুব বৃদ্ধি পাইল। আমি আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম "কে তোমার বাবুজী কাঞ্চি? আমি'ত কিছুই জানি না।" সে যেন নিদ্রোত্থিতার মত চমকিয়া উঠিল ও তাহার পর তাহার সেই করুণ চক্ষু দু'টী আমার মুখের উপর রাখিয়া বলিতে লাগিল "ওঃ! আপনি বুঝি জানেন না—সে আজ প্রায় দু'বছরের কথা। বাবুজী আপনাদের সেই বাংলা দেশেরই লোক। শুনেছিলাম তিনি নাকি কোন্ দেশের জমিদারের ছেলে, নিজের মা ছিলেন না, ঝি চাকর দিয়ে তাঁরা তাঁকে এই বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নাকি বুকের ব্যামো ছিল; এখানে যখন প্রথম আসেন তখন মাঝে মাঝে আরাম কেদারা ক'রে বাগানের মধ্যে গিয়ে বসতেন ও আমাকে তাঁর সেই বাংলা দেশের গল্প বল্তেন। তারপর যখন ক্রমে ক্রমে তাঁর শরীর এতো দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়লো যে, বাইরে যাবার শক্তিটুকুও রইল না, তখন শোবার ঘর থেকে তা'র খাটখানি এই জানালার পাশে আনিয়ে রাখালেন। ভাল ক'রে ভোরের আলো ফুট্তে না ফুট্তে, পর্দ্দাখানি সরিয়ে দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাক্তেন, এই জানালাটুকুর ভেতর দিয়েই বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁ'র সম্পর্ক ছিল। চাকর ক'টী ছাড়া আর জন মনুষ্যের সঙ্গে তা'র এখানে পরিচয় ছিল না, আমি গিয়ে তা' প্রায় তাঁ'র সঙ্গে গল্প কর্তাম, আমাকে দেখ্লে, তাঁ'র নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবনে বোধ হয় একটু সুখী হ'তেন, আর আমি ফুলে ফুলে রোজ তাঁ'র ঘরখানিকে দেবমন্দিরের মত সাজিয়ে দিতাম। বাবুজী আমার ফুল যে বড়ই ভালবাস্তেন। তিনি বল্তেন "কাঞ্চি! আমি যখন চলে যাব তখনও কি আমার ঘরখানিকে, আমাকে মনে ক'রে ফুল দিয়ে সাজাবি ত'? কারণ তখন আমাকে মনে ক'রে রাখবার লোক এ পৃথিবীতে খুব কম থাক্বে।"

"শুনেছিলাম বাবুজীর নাকি বিয়েও হ'য়েছিল। বাবু, আপনাদের বাংলা দেশ ত' শুনি, এমন নরম শস্য শ্যামলা, আর আপনাদের মেয়েদের মন কি পাথর দিয়ে গড়া। আমরা পাহাড় দেশের মেয়ে, আমাদের মনও ত' তা'র চেয়ে নরম। বাবুজীর স্ত্রী নাকি কোন বড় মানুষের মেয়ে, স্বামীর এই ছোঁয়াচে রোগ হওয়ার পর ভয়ে তিনি নাকি বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিলেন—পাছে চিঠি লিখ্লে, বাবুজী উত্তর দেন, সেই ভয়ে চিঠিও লিখ্তেন না। আর আমি জানি, এক একদিন ডাক এলে, তিনি কি উৎসুক ভাবে একখানি চিঠির প্রত্যাশায় ব'সে থাক্তেন। তা'র বালিশের নীচে সর্ব্বদা তাঁ'র স্ত্রীর একখানি ছবি থাকৃত, মাঝে মাঝে কি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতেই সেখানা না দেখ্তেন। বল্তে কি তাহার স্ত্রী আর আত্মীয় স্বজনের, বিশেষতঃ তাঁ'র স্ত্রীর অযত্ন ও অনাদরেই বাবুজী আমার এতো শীগ্গীর শুকিয়ে

গেলেন। তারপরও ছ'মাস প্রায় এখানে তিনি ছিলেন; যখন কোনই উপকার আর হ'ল না—তখন দেশে ফিরে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হ'লেন। তা'র কিছুদিন পরে একটী কর্ম্মচারী এসে তাঁ'কে নিয়ে গেল। সে আজ এক বছরের কথা, সেই থেকে রোজ সকালে আমি এই ফুলগুলি, তাঁ'র স্মৃতিকে স্মরণ ক'রে রেখে যাই। ঝড়, বৃষ্টি, বাদল কিছুতেই বাদ যায় না। এতদিনে বাবুজী আমার হয় ত' তা'র এতো প্রিয় নীল আকাশে"—বলিয়া কাঞ্চী তাহার হাতখানি তুলিয়া মেঘের ফাঁকের মধ্য দিয়া যে একটুখানি নীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেইখানে দেখাইয়া দিল। আমি তাহার গল্পে এতই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কখন যে বৃষ্টি থামিয়া গিয়া, আকাশে ও মেঘে, কে জয়ী হইবে বলিয়া দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে লক্ষ্যই করি নাই। কাঞ্চী ফের আরম্ভ করিল, "যখনই ঐ জানালার দিকে তাকাই, মনে হয় বাবুজী সেই রকমই প্রশান্ত হাসিটুকু নিয়ে শুয়ে আছেন, এত রোগ ভোগের মধ্যেও তখন তাঁ'র মুখের ম্লান হাসিটুকু মিলায় নি। এখন আসি বাবুজি, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, মার সঙ্গে কাজে বা'র হ'তে হবে।"

আমিও বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, একটুখানি মেঘের ফাঁক দিয়া সূর্য্যদেব এক গাল হাসি লইয়া মুখ বাহির করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি ছাতি ও লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এরকম সুযোগটুকু অবহেলা করা, দার্জ্জিলিঙ্গে—নির্ব্বোধের কর্ম্ম; কারণ কখন যে প্রকৃতি দেবী, তাহার অভিমান অশ্রু পুনরায় বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। পথে যাইতে যাইতে যতই ছোট পাহাড়ী মেয়েটীর অদ্ভুত প্রেমের কথা মনে পড়িতে লাগিল, ততই অবাক্ হইয়া গেলাম।

তারপর যতদিন কাটিয়া গিয়াছে, কাজের তাড়ায় কাঞ্চীর সঙ্গে আমার দু'একবার দেখা হইলেও বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু রোজই যখন বসিবার ঘরে আসিতাম, দেখিতাম, তাজা ফুলের গুচ্ছ তেমনি ভাবেই জানালার পাশে সাজান রহিয়াছে।

একদিন রাত্রে খুব ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, সকালে আমার সেদিন উঠিতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে। উঠিয়া আসিতে আসিতেই নিধু আমাকে বলিল চৌকীদারের স্ত্রী সেই ভোর থেকে দাঁড়িয়ে আছে, আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। হঠাৎ এত সকালে কি দরকার, আমার সঙ্গে, ভাবিয়া পাইলাম না; মনে হইল হয়'ত চৌকীদার মদ খাইয়া তাহাকে মারিয়াছে, তাহারি নালিশ করিতে আসিয়াছে। বাহিরে বাহির হইয়া আসিতেই সে আমার পায়ের কাছে আসিয়া, উপুড় হইয়া কাঁদিতে লাগিল "বাবুজি! কাঞ্চীকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কিরে—কি পাগলের মত বক্‌ছিস্—পাওয়া যাচ্ছে না কি—বাজার টাজার কোথাও গিয়েছে বোধ হয়।"

"না বাবুজী কাঞ্চী আমার ত' সে রকম মেয়ে নয়—সে'ত না ব'লে কোথাও যায় না—তা'ছাড়া বাবুজী, সেখানেও আমি তা'র খোঁজে গিয়েছিলাম সে কোথাও সেই বাবুজী—" বলিয়া সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল। আমি তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া, চারিদিকে লোক পাঠাইয়া খোঁজ করিতে লাগিলাম, সত্যই যখন কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আমারও মনে নানা রকম আশঙ্কা হইতে লাগিল। কাঞ্চীর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, জানিলাম যে পূর্ব্বদিন রাত্রে সে অভ্যাসমত তাহার মাতার নিকটেই শুইয়া ছিল, ভোরে উঠিয়া দেখা গেল সে বিছানায় নাই। তাহার মাতা ভাবিল, আগেই উঠিয়া সে হয়'ত নিকটে কোথাও গিয়াছে, কিন্তু বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার প্রত্যাগমনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, তখন সে তাহার সন্ধানে বাজারে যায়—সেখানেও তাহাকে না পাইয়া, তাহার মনের ভিতর কেমন করিতে থাকে, তাহাতেই সে বাবুজীর কাছে আসে। কাঞ্চীর পিতা'ত নেশার ঘোরে তখনও সম্পূর্ণ অচৈতন্য—কাজেই সে বাবুজীর স্মরণ লইয়াছে। কাঞ্চীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, কিছুদিন হইতে তাহার বিবাহের কথা হইতেছিল—প্রথম হইতেই কি জানি কেন সে তাহাতে বড়ই নারাজ ছিল, তারপর দিন দুই আগে সেই সংক্রান্ত একটী সামান্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই সে কি রকম সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ থাকিত—কিন্তু ইহার বেশী মাতার কাছে সে বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই আর আপত্তি দেখায় না।

বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া গেল, আমার প্রেরিত লোকগুলি একে একে ফিরিয়া আসিল, কাহারও সেই কোনই তত্ত্ব পাওয়া গেল না। আমি আর কিছুতেই তখন স্থির থাকিতে পারিলাম না, একটী ভুটীয়া ঘোড়া ভাড়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এধার ওধার চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে "ভুটীয়া বস্তীর" অনেক নীচে একটী ঝরণার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম ঘোড়াটী বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়া হইতে নামিয়া, একটী গাছের ডালে তাহাকে বাঁধিয়া, মুখ-হাত ধুইবার জন্য ঝরণার প্রান্তে অগ্রসর হইতেছি এমন সময় হঠাৎ শুনিলাম ঘোড়ারা ভয় পাইলে যে রকম শব্দ করে আমার ঘোড়াটী সেই রকম অওয়াজ করিতেছে ও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—আমি প্রথমতঃ কোনই কারণ অনুমান করিতে পারিলাম না। শেষে দেখি, ঝরণার অপর প্রান্তে কি একটা কালো মতন পদার্থ রহিয়াছে। আমি শিলাখণ্ডের উপর পা দিয়া অপর পার্শ্বে গেলাম—গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। যাহার সন্ধানে সারাদিন চারিদিকে এত লোক পাঠাইলাম—নিজেও যাহার জন্য বৃথা চেষ্টা, কয়েক ঘণ্টা অনবরত ঘুরিতেছি—সম্মুখে সেই বালিকা—অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, সে নিদ্রা হইতে যে তাহাকে আর জাগাইয়া তুলিতে হইবে না, তাহা দেখিয়াই বুঝিলাম। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলাম, গুচ্ছ গুচ্ছ সিক্ত চুল মুখখানি বেষ্টন করিয়া আছে—একটী প্রশান্ত স্নিগ্ধ হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে তখনও খেলিতেছে—পরণে তাহার সেই নীল মখমলের সাড়ী—ওড়নার মত লাল শালখানি গায়ে জড়ান—আর হাতে, হাতে তাহার সেই এক গুচ্ছ ডালিয়া ফুল। এমন সময় গাছের পাতার আড়াল দিয়া ডুবন্ত রবির একটা রশ্মি আসিয়া তাহার কপোলে পড়িল, মনে হইতে লাগিল—যেন সতীর সিঁথিতে সিন্দুরের রেখা। সতীর সিন্দুরের রেখাই বটে! বুঝিলাম এ সতীর সহমরণ, অজানা পথে, অজানা দেশে সে তাহার প্রেমের দেবতার অনুসরণ করিতে গিয়াছে, হাতে তাহার সেই ভক্তির নিদর্শন ফুলের গুচ্ছ। একজনকে মনে মনে হইলে বরণ করিয়া অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া গ্রহণ করার নামও তাহার কাছে অসহ্য, তাই সে বিবাহের অনুষ্ঠানের পর হইতে এত ম্রিয়মাণ ছিল। ব্যাকুল হইয়া তাই সে তাহার দেবতার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে, ঝড় বৃষ্টি কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারে নাই। এতো আত্মহত্যা নয়! এ যে প্রেমের আত্মত্যাগ। সেই সতীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বার বার নমস্কার করিলাম, তারপর তাহার উপযুক্ত সৎকার করিবার জন্য লোকজন সংগ্রহ করিতে সহরে ফিরিলাম।

আজ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখনও যখন ডালিয়া ফুল দেখি তখনই আমার সেই পাহাড়িয়া বালিকার অদ্ভুত প্রেমের কথা মনে পড়িয়া যায়।

শ্রীমতী রমলা বসু।

গুরুভক্তির জয়।

তখন সন্ধ্যা বেলা
শিশুরা কখন ঘরে ফিরে গেছে
ভেঙ্গে দিয়ে ধুলা খেলা।

রাখাল বালকগণ
গাভীগুলি ল'য়ে আপন আলয়ে
ফিরে গেছে বহুক্ষণ।

দূর দেবালয় তলে
আরতি বাজনা বাজিছে মধুর
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে।
তখন সকল ঘরে
তুলসী তলায় জ্বলেছে প্রদীপ
অঙ্গন আলো ক'রে।
সুদূর বনানী হ'তে
কভু শিবাকুল ডাকিয়া, সন্ধ্যা
জানায় পথিকে পথে।
শেষ ঝারি ল'য়ে ভরি'
পল্লী-রমণী গেছে ফিরে ঘরে
ঘাট নির্জ্জন করি।
পবিত্র কাশীধাম—
দক্ষিণে তার গঙ্গা বাহিনী
পুণ্য তাহার নাম।
ভরা ভাদরের ঢল
ভয় লাগে মনে উদ্দাম নদী
কূলে কূলে ভরা জল।
ভরা গঙ্গার তীরে
প্রভু শঙ্করে বসেছে তখন
অযুত ভক্ত ঘিরে।
শিষ্য সনন্দন
কি কাজে না জানি, নদীপারে
দাঁড়াইয়া কতক্ষণ।
এপার হইতে তারে
শঙ্কর কহে,— 'ওহে সনন্দন
ত্বরা করি এস পারে।'
শিষ্য ভাবে—'কি করি ?
শেষ খেয়া দিয়ে গিয়েছে পাটুনী
ঘাটে বাঁধা নাই তরী।

আমার গুরুর বাণী
রাখিনু মাথায়, উদ্দাম স্রোতে
গোষ্পদ বারি মানি।
সংসার পারাবার
অগাধ অপার যে করিছে পার
তাঁর কাছে এ'ত ছার।
সেইজন মোর গুরু
নির্দ্দেশ করে ' যেতে পরপারে
জাহ্নবী হবে মরু !'
অটল ভক্তি নিয়ে
স্রোতের উপর নির্ভীক মন
দাঁড়াল চরণ দিয়ে।
ভক্ত-চরণ-তলে
অমল ধবল কমল ফুটিল
অসীম ভক্তি বলে।
চলিছে সনন্দন
চরণে তাহার ফুটিছে পদ্ম
অদ্ভুত অঘটন।
পদ্মে রাখিয়া পদ
এপারে শিষ্য বন্দিলা আসি
গুরুপদ কোকনদ!
কহে শঙ্কর হাসি
আচার্য্য তব হইল ধন্য
ধন্য হইল কাশী।
অসীম ভক্তি তব
গুরুরে তোমার করিয়াছে জয়
অধিক কি আমি কব ?
আজ হ'তে এই ভবে
"পদ্মপাদ" এ আখ্যা তোমার
চিরদিন তরে রবে।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ জ্ঞান-প্রচার সমিতি।

কার্য্য-বিবরণী

উপক্রমণিকা।

গত ১৩১২ সালে আমাদের দেশবাসীর প্রাণে যখন নানাদিকে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তখন ঘটনাক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং তাহার প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগরিত হয়। তাহার ফলে কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তির অর্থানুকূল্যের ও আত্মনিয়োগের অবকাশ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্' প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান ইহা নহে।

ঐ সালের ফাল্গুন মাসের শেষে খৃষ্টীয় ১৯০৬ অব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে শিক্ষাপরিষৎ যথাবিধানে রেজেষ্টীকৃত হয় ও ইহার কার্য্যারম্ভ হয়।' কয়েক মাস পরে পরবর্ষে ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসের শেষে ১৫ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। উহার পূর্ব্বদিন টাউনহলে বিরাট সভায় এই সংবাদ বিঘোষিত হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'জাতীয় শিক্ষা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা দেশের শিক্ষার উন্নতিপ্রয়াসী প্রত্যেক ব্যক্তির ধীরভাবে পাঠ করা উচিত। সেই জাতীয় বিদ্যালয়ের আরম্ভ সময়ে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গগত স্যার গুরুদাস 'বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কুমার-স্বামী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মিঃ আর, সি, ব্যোনার্জ্জি, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টো' পাধ্যায়, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর প্রমুখ মনীষিগণ নানাবিষয়ে প্রবন্ধ, পাঠ বক্তৃতা করিতেন। গুরুদাস বাবুর 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' এবং তাঁহার বাঙ্গালা পাটিগণিত, বীজগণিত প্রভৃতি তাঁহার এখানে প্রদত্ত দুইটি পৃথক্ ধারাবাহিক বক্তৃতার ফল।

পরে ১৩১৭ সালের প্রথম ভাগে খৃঃ ১৯১০ অব্দের মে মাসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সহিত বঙ্গীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতি মিশিয়া যায়। এবং জাতীয় বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় এক বাটীতে স্থাপিত হয়। সেই শিল্পবিদ্যালয় এখন মানিকতলায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেখানে ছাত্রগণ উৎসাহ-সহকারে নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতেছে ও এখানকার কারখানায় শিক্ষালাভ করিয়া বেশ সম্ভ্রমের সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

নানা কারণে মফঃস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়গুলি ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল ও কলিকাতার জাতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া গেল, তাহাতে আমাদের জাতীয় কর্ম্মশক্তির গৌরববৃদ্ধি পায় নাই। যে সমস্ত কারণে এ অনুষ্ঠান অসফল হইয়াছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মীগণ সে গুলি আলোচনা করিয়া দেখিবেন। সে সমুদয় বর্ণনার স্থানও ইহা নহে।

বর্ত্তমানে নানা বিষয় নানা দিক্ দিয়া আলোচনার পর শিক্ষা-পরিষদের পরিচালক-সমিতি গত বৈশাখ মাসের শেষভাগে ১৩ই মে ১৯১৯ তারিখের অধিবেশনে এই 'জ্ঞান-প্রচার-সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কয়েক জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও অধ্যাপক নানা বিষয়ে ধারাবাহিক-ভাবে প্রবন্ধ পাঠ করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন মাননীয় বিচারপতি সার্ জন্ উড্রফ্ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া-ছেন। আমরা বঙ্গীয় জনসাধারণকে 'জ্ঞান-প্রচার-

সমিতি'র অনুষ্ঠিত সভা ও বক্তৃতাগুলিতে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে পাঠ করিতে বিনীত-ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

প্রথমে আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে আমাদের এই জ্ঞান-প্রচার-সমিতির প্রথম সভাপতি অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অকাল তিরোধানের কথা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি তিনি জীবনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং ইহার কার্য্যে যেরূপ তৎপর ছিলেন তাহার প্রভাব জাগ্রতভাবে ইহার উপর কার্য্যকার হইবে।

আশা করি যে সমুদয় অধ্যাপকগণের সহানুভূতি ও সহকারীতার উপর নির্ভর করিয়া এই জ্ঞান-প্রচার-সমিতির কার্য্যারম্ভ হইল; তাঁহাদের তৎপরতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। দেশের জিনিষ দেশের সেবায় নিয়োজিত হইল, এখন দেশবাসী ইহার প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধন করুন এবং ইহা যে তাঁহাদেরই ইহা বুঝিয়া ইহার প্রতি মমতাসম্পন্ন হউন।

ভগবানের কৃপায় এই অনুষ্ঠান জয়যুক্ত হউক।

শিক্ষার একটী কথা।

-◆○◆-

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ—জ্ঞান-প্রচার-সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত।

—:*:

শিক্ষা নামে যে জিনিষটা আমাদের দেশে চলিতেছে, সেটাকে যাঁহারা একটা বিরাট প্রহসন মাত্র বলিয়া মনে করেন তাঁহারা কতকটা বাড়াবাড়ি করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে এ শিক্ষার গোড়ায় গলদ রহিয়াছে এবং ইহা নিজের মূল শিকড়গুলি সত্যের গভীর স্তর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়া নিজেকে সর্ব্বতো-ভাবে বাস্তব ও যথার্থরূপে সফল করিয়া তুলিতে পারে নাই। এ দেশের উপর দিয়া পশ্চিমের সভ্যতার যে বেণোজল কিছুকাল ধরিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহারই নরম পলিমাটিতে প্রধানতঃ এ শিক্ষার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়; এবং তাহারই রসে ইহার বিকাশ ও পরিপুষ্টি হইতেছে দেখা যায়; কিন্তু এই পলিমাটির নীচে দেশের বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনার ও সভ্যতার যে জমাট ও সার-মাটির স্তরগুলি প্রচ্ছন্নভাবে সাজান রহিয়াছে, সে গুলির সঙ্গে বর্ত্তমান শিক্ষার বিশেষ কোনও সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিতেছে না যে সেই স্তরগুলিকে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে না পারিলে আমাদের দেশে মাটিতে বেশীর ভাগ আগাছা-পরগাছারই ফসল ফলিবে, কিন্তু কোনও ফলবান্ তরু পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ঝড় বাতাসের সঙ্গে যুঝিয়া শীতগ্রীষ্ম শুখো ডুবো প্রভৃতি প্রকৃতির অবস্থাবিপর্য্যয়গুলিতে নিজের সেবায় ও সার্থকতার পরিপূর্ণতা সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবে না। শুধু শিক্ষার ক্ষেত্র বলিয়া নহে, রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি অপরাপর ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে একথা খাটে।

মোটামুটি-ভাবে এ কথা সকলেই মানিয়া লন। আমাদের শিক্ষার ত্রুটী যথেষ্ট এবং ইহার অনেকটাই মিথ্যা একথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের যে প্রথিতযশা মনীষী বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত সর্ব্বোচ্চ সনন্দখানিকে 'চোতা কাগজ' বলিয়া একদিন উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের কৃত্রিম ময়ূরপুচ্ছের ভরন্টা সভায় মাঝে ভাঙ্গিয়া দিয়া আমাদিগকে কতকটা লজ্জা

দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু যে ভাবের ঘরে চুরি চলে না, সেই ভাবের ঘরে বসিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সত্যের বাজারে যাচাই করিতে যাইলে আমাদের সর্বোচ্চ সনন্দগুলিরও জাল দলিল বলিয়া ধরা পড়ার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। পৃথিবীর ধূলামাটির সংস্পর্শ ছাড়িয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর যেন সন্ধ্যার একটি শুভ্র নির্ম্মল আলোকরেখার মত স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনিও আজ সশরীরে যদি আমাদের মাঝখানে বিদ্যমান থাকিতেন, তবে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তিনি হীরেন্দ্রনাথের কথার প্রতিবাদ করিতেন না। কিছুদিন তাঁহার অন্তেবাসী হইয়া আমরা জানিয়াছিলাম যে শেষ জীবনে তাঁহার বেদ-সমুজ্জ্বলা বুদ্ধি ও সদাচার-মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্য-প্রকৃতি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অজ্ঞেয়বাদের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছিল ; এবং শিক্ষায়-দীক্ষায়, চিন্তায়-অনুষ্ঠানে, আচারে ব্যবহারে, আমাদের দেশের শিক্ষিতদের যে পশ্চিমাভিমুখীনতার মোহ, যে অন্ধ অনুচিকীর্ষার ব্যাধি এবং পরকীয় গৌরবের আওতায় থাকিবার মিথ্যা অভিমান তাহাই তাঁহার ঋষি-দেবতা-বরেণ্য জীবন-যজ্ঞে শেষ আহুতি হইয়াছিল। অমন জ্ঞান-গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে যে, সরস, কোমল, ভাবপূর্ণ হৃদয়খানি তিনি ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ও নানাবিধ জাতীয় অনুষ্ঠানের কৃত্রিমতা, অসারতা ও অশোভনতা গভীর বেদনার চাঞ্চল্য উৎপাদিত করিত, ইহা আমরা জানি।

শিক্ষার গলদ স্বীকার করিতে আমরা গররাজী নই। তবে সে সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি তেমন স্পষ্ট, তীব্র ও চিরন্তন নহে। এই জন্য এ ক্ষেত্রেও আমাদের কথা, অনুভূতি ও কাজের মধ্যে পরস্পর মিল নাই। যেটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মুখে সায় দিই, সেটাকে অন্তরাত্মায় তেমন নিবিড়ভাবে হয়ত অনুভব করি না ; এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ অস্পষ্ট ও সাহসশূন্য, প্রতিপালন-শিথিল, বাধা-প্রাপ্ত, অশোভন ও অসফল হইয়া থাকে।

গাহিতে বসিলে যে ব্যক্তির সুরগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসঙ্গত হইল না, এবং তাল, মান, লয়ের সংবাদ রাখিল না, তাহার কণ্ঠ-স্বরের মাধুর্য্য আমাদের প্রশংসা অর্জ্জন করিলেও, আমরা তাহার শিক্ষাকে অস্বীকার না করিয়া পারি না। স্বভাব যাহা পাইয়াছে ও রাখিয়াছে, শিক্ষা তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া অবসর দিবে ; স্বভাবে যাহা কেবল সুন্দর, শিক্ষায় তাহা শিব ও সত্য হইয়া উঠিবে ; স্বভাবে যেটি আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষায় সেটি সঙ্গতি ; স্বভাবে যাহা প্রেরণা, শিক্ষায় তাহা চরিতার্থতা ; স্বভাবে যাহা অল্প, শিক্ষায় তাহা ভূমা। এই জন্য যেখানে দেখি সুন্দর জিনিষ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শাশ্বত এবং কল্যাণে সফল হইয়া ধন্য না হইল, তাহাকে পাইয়া আমরা আদর করিলেও তাহাকে লইয়া নিশ্চিন্ত ও কৃতার্থ হইয়া বাস করিতে পারি না। ঝরণার জলে পিপাসা মিটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা নীচে গড়াইয়া না আসিল, ততক্ষণ তাহার জলে অবগাহন করিয়া এবং আমাদের মাটি সরস ও উর্ব্বরা করিয়া লইয়া তৃপ্ত ও ফলবান্ হইতে পারি না। অতএব শুধু প্রেরণা যথেষ্ট নয়, চরিতার্থতা চাই ; আরম্ভ হইলেই হইল না, উপসংহার চাই। পাখীর ডাকে, পাতার মর্ম্মরে, বাতাসের আকুল অভিসারে যে সুরলহরীগুলি এ বিশ্বে জাগিতেছে, মাধুর্য্য সম্পদে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে কি সেগুলির ন্যূনতা আছে ? সে মহাসঙ্গীতে মানুষ নিজের ষোল আনা সব সময়ে ধরা দিয়া থাকিতে পারে না কেন ? কেন মানুষের সভ্যতার আদিম উষা সামগানে আবার মুখর হইতে যাইল ? কেন তবে মানুষের মন্দিরে ও কুঞ্জে, মিলনে বিচ্ছেদে, সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জীবনে মরণে সঙ্গীতের আয়োজন চিরদিন এত সাগ্রহ হইয়া রহিয়াছে ? বিশ্ব সঙ্গীতের মাঝে কি খুঁজিয়া পায় না যাহা যোগাইতে মানুষের কণ্ঠ ও যন্ত্র এত রাগরাগিণীর সৃষ্টিতে অক্লান্ত, এত তালমানলয়ের বন্ধনে স্বেচ্ছায় বদ্ধ ও তাহাদের পরিচর্য্যায় সতর্ক ? সেটি স্বরের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য নহে ; কারণ বিশ্বে তাহার স্বাভাবিক আয়োজন অপ্রচুর নয়। তবে স্বভাবে সে স্বরগুলি পরস্পরের সঙ্গে অপেক্ষা ও মিল রাখিয়া এবং পরস্পরের পরিচর্য্যা করিয়া এমন একটা কিছু পূর্ণাবয়ব স্বরসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে না যাহাকে আমরা আমাদের ভাবসমূহের বাণী-মূর্ত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতিতে সুরগুলি যেন

পরস্পরের খোঁজ রাখিতেছে না ; পরস্পরের অন্বেষণ করিতেছে না। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণীতে, তালমানলয়ে সুরগুলির পরস্পরের অন্বেষণ, অপেক্ষা, সঙ্গতি ও সহায়তা রহিয়াছে। আবার, আমাদের সঙ্গীতে সুরগুলির উদয়, স্থিতি, পরিপুষ্টি ও লয় আমাদের স্বায়ত্ত ; আমরা যেটিকে যখন যেরূপভাবে চাই, সেটিকে তখন সেইরূপভাবে পাইয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতির মহোৎসবে আমরা চাই বলিয়া কিছু পাইতেছি ন', যাহা আপনা হইতে আসিতেছে তাহারই আস্বাদ করিয়া সুখী হইতেছি, যাহা আপনা হইতে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা আমাদের নিষ্ফল। বর্ষার পূর্ণিমা-রাত্রিতে বর্ষণ-পরিতৃপ্ত যূথভ্রষ্ট একখানা মেঘ স্নিগ্ধকৌমুদী অঙ্গে মাখিয়া কোন অজানা স্বপ্নলোকের একটা ইঙ্গিতের মত আমাদিগকে মুগ্ধ, আত্মহারা করিয়া দেয় ; কিন্তু বাতাস যখন তাহাদিগকে সরাইয়া দিবে তখন আমাদের অপরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস'ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। প্রকৃতিতে শুধু চিত্র সম্বন্ধে নয়, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ সম্বন্ধেও দেখি যে সেগুলি আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসে না এবং যাইবার সময় আমাদের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া যায়। প্রকৃতিতে আমাদের বাঞ্ছিত ও উপভোগ্য জিনিষ প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলি আমাদের স্বায়ত্ত নয় বলিয়া, আমরা উপভোগ্য সামগ্রীর একটা আলাহিদা আয়োজনও করিয়া লইয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে সেইটি আমাদের নিজস্ব-সঙ্গীত এবং তাহার রাগ-রাগিণী, তাল-মান-লয়। অতএব দেখিতেছি যে প্রধানতঃ দুইটি কারণে আমাদের এই আলাহিদা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক স্বরগুলির মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা, মিলন ও সহায়তা পাইতেছি না বলিয়া। দ্বিতীয়তঃ সেগুলির আসা যাওয়া, বিকাশ ও পরিণতি আমাদের আয়ত্ত নয় বলিয়া। ইহাই হইল প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতা, এবং এই অসম্পূর্ণতার যথাসম্ভব পূরণের জন্যই আমরা যে উপায় আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি, সেইটার নাম শিক্ষা। শুধু সঙ্গীতকলার দিক্ হইতে নয়, মানুষের সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষার এই লক্ষণ গ্রহণ করা চলিতে পারে।

মানুষের নানান্ দিক্—শরীর, ইন্দ্রিয়, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা। এ সকলের নানান্ বৃত্তি রহিয়াছে ; কতদিকে আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা রহিয়াছে ; কতরকম আরম্ভের চেষ্টা রহিয়াছে। কিন্তু সকল সময়ে ও সর্ব্বতোভাবে তাহাদের বৃত্তিগুলির মধ্যে পরস্পর মিল ও সহকারিতা থাকে না ; সকল সময়ে তাহাদের আকাঙ্ক্ষার আবেগ চরিতার্থতার মধ্যে বিশ্রান্তি লাভ করিতেছে না ; এবং সকল সময়ে তাহাদের আরম্ভ উপসংহার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার শক্তি যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। আমাদের ভিতরে প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার এই একটা দিক্। আবার আমাদের সংস্কারগুলি, আবেগগুলি ও বৃত্তিগুলি সর্ব্বতোভাবে'ত আমাদের বশে নয়। যাহা চাই, যেটি চাওয়াতেই আমার কল্যাণ বলিয়া আমি মনে করি, যেটি আমার প্রেয়ঃ বা শ্রেয়ঃ অথবা উভয়ই, সেইটিরই পরিচর্য্যায় ও উপকারিতায় আমার সকল দেওয়াকে'ত ঢালিয়া দিতে পারি না। আমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে মিল নাই ; আমার উদ্দেশ্য ও আয়োজন, লক্ষ্য এবং যাত্রা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার মধ্যে এমন কোনও একটা অসন্দিগ্ধ ও চিরন্তন যুক্তবেণী আমি খুঁজিয়া পাই না যেখানকার পুণ্যতীর্থোদকে অবগাহন করিতে পাইয়া আমার এই বহুজন্মব্যাপী মহাতীর্থযাত্রা চতুর্ব্বর্গের সফলতালাভে ধন্য হইয়া উঠিবে। আমার প্রকৃতি যে আমার আদর্শের অনুবর্ত্তন করে না, আমার শক্তির সাহস যে আমার লক্ষ্যের বিপুলতার সামনে অভিভূত হইয়া পড়ে ; এবং আমার লক্ষ্যও যে অব্যভিচরিতরূপে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল নহে ;—ইহাই হইল আমার স্বাতন্ত্র্যের স্বভাব এবং এইটা আমার ভিতরের প্রাকৃতিক অসম্পূর্ণতার অপরদিক্। অতএব সামঞ্জস্য ও স্বাতন্ত্র্য, প্রধানতঃ এই দুই দিকে আমাদের প্রকৃতির সুরগুলিকে নিযুক্ত করিয়া লইয়া জীবনরাগিণীর সৃষ্টি করিতে হইবে ; নহিলে সে সুর গুলিতে কতকটা খণ্ডিত মাধুর্য্যের সম্ভাবনা থাকিলেও, সে গুলি আমাদের 'জীবনকুঞ্জে' একটা অখণ্ডৈকরস, পূর্ণ মধুর রাগিণী রচিয়া দিবে না ; এবং সে রাগিণী আমাদেরই আয়ত্ত থাকিয়া, আমাদেরই আকাঙ্খা, আশা ও ভরসার বাণী-মূর্ত্তি হইয়া, হে আমাদের চিরবাঞ্ছিত, তোমারই আবাহনে ও আপ্যায়নে সর্ব্বদা ও

সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত ও কৃতার্থ হইবে না। এই জন্য শিক্ষা চাই, এবং সে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ও পরিচয় ঐ দুইটাতে—আমাদের সকল দিকের মধ্যে এবং ভিতরে ও বাহিরের মধ্যে সামঞ্জস্য ; এবং আমাদের ভিতরের সবটা ও বাহিরের অন্ততঃ যতটার সঙ্গে আমরা সম্পর্কিত ততটা উপরে আমাদের অবিসংবাদিত স্বাধিকার। এই দুইটি নহিলে শিক্ষা হয় না। এবং দুইটির সদ্ভাব ও অভাব এবং তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের শিক্ষার হিসাব-নিকাশ লইতে হইবে। অতএব বর্ত্তমানে যে আমরা আমাদের কথা, চিন্তা ও কাজের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাইতেছি না, এবং যেটাকে বুঝিতেছি সেটাকে কর্ম্মের মধ্যে আকার পাইয়া মূর্ত্তি করিয়া তুলিলে যে সাহস ও শক্তি পাইতেছি না, ইহাতে সামঞ্জস্য ও স্বাধিকার এই দুইটিকেই আমরা হারাইতেছি ; এবং এই দুইটি যদি না থাকিল তবে আমাদের শিক্ষা যে বাস্তব হইতেছে না সে পক্ষে আর সন্দেহ রাখিব কি ?

এক কথায় যদি শিক্ষার লক্ষণ দিতে হয় তবে বলিব, স্বারাজ্য। সামঞ্জস্য ইহার ভিতরকারই কথা। বহুকে লইয়া যেখানে এক স্বরাট্ হইবে, সেখানে বহুর পরিচালন-সূত্রগুলি একই স্থানে ন্যস্ত হওয়া চাই। মাকড়সা যে উদ্দেশ্যেই জাল পাতুক, জাল পাতাটা বেশই হয়, এবং, তা'র ফলে সে জালে তা'র নিশ্চিন্ত স্বাধিকার। তাই স্বারাজ্য বলিলেই সামঞ্জস্য আপনা হইতেই আসিল। প্রাচীন ঋষিরা এই স্বারাজ্য-সিদ্ধির মধ্যেই অমৃতে সন্ধান পাইয়া ইহার জয়গানে তাঁহাদের বেদবাণী উদাত্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। "তমসঃ পরস্তাৎ" যে 'আদিত্যবর্ণ' পুরুষ রহিয়াছেন, স্বারাজ্যসিদ্ধির ফলে 'অমৃতের পুত্র' মানুষ তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুর পারে গমন করিয়া থাকে। এই অমৃতত্বের পর আর কিছু পাওয়া মানুষের পক্ষে হইতে পারে না ; সুতরাং স্বারাজ্য-সিদ্ধির চেয়ে বড় আর কোন সিদ্ধি মানুষের নাই। ইহা পাইলে আর কিছুরই অভাব বা অপেক্ষা থাকে না ; এবং ইহা যতক্ষণ না পাইল ততক্ষণ মানুষ আর কিছুরই মধ্যে নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ধরা দিয়া সুস্থ থাকিতে পারে না। সমুদ্রে সকল 'আপঃ' প্রবেশ করিতেছে, অথচ সমুদ্র যেমন নিজের পরিপূর্ণতায় 'অচল-প্রতিষ্ঠ", মহাকাশে এই সমগ্র বিশ্বটা নাচিয়া ছুটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ আকাশ যেমন নিজের সমাহিত গৌরবে নিত্যতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছে ; সেইরূপ স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে মানবের সকল প্রেরণা ও সকল কামনা, সম্মিলিত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে, অথচ ইঁহার নিজের গভীরতায় কোনও ক্ষোভের চাঞ্চল্য নাই, এবং ইহার নিজের প্রতিষ্ঠা শাশ্বত ভূমিতেই সুস্থির রহিয়াছে।

মানুষের ব্যষ্টিরূপ ও সমষ্টিরূপ—সে নিজে এবং তাহার সমাজ। এ দুটির কোনটাকে উপেক্ষা করিয়াই স্বারাজ্য হয় না। গাছ বাড়িয়া ফলপুষ্পে সার্থক হইবার পক্ষে শুধু বীজের নিজস্ব শক্তিটাই যথেষ্ট নহে ; শূন্যের মাঝখানে, অসম্ভব, প্রতিকূল বা অসম্পূর্ণ অবস্থার মাঝখানে ফেলিয়া রাখিলে সে বীজের নিজস্ব প্রকৃতি রিক্ত এবং ব্যর্থই রহিয়া যায়। মাটির রসে, বাহিরের তাপ, আলোক, বাতাস ও শিশিরে সে নিজেকে বাস্তবের মধ্যে হাজির করিবার অবসর পাইবে ; যতক্ষণ না মধুমক্ষিকা বা বসন্তবাতাস প্রতিবেশী পাদপের পুষ্পপরাগরেণু বহিয়া আনিয়া তাহার নিজের পুষ্পসজ্জার মাঝে ছড়াইয়া দিবে, ততক্ষণ তাহার পুষ্পসম্ভার একটা নিষ্ফল রূপের হাট পাতিয়া রাখিবে মাত্র, সে হাটে কোন কিছুরও বিনিময় হইয়া কাহাকেও সফলতা আনিয়া দিবে না। মানুষও যদি সত্যকার জীবন পাইতে চায় তবে তাহার সমষ্টিরূপ বা সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সমাজ যেখানে পরতন্ত্র, অবসন্ন, অসংস্কৃত ও অসুন্দর সেখানে, ব্যক্তির সেই সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্য দিয়া, এবং তাহাকে তদবস্থ ফেলিয়া স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে পৌঁছিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি ? স্বারাজ্য পাইতে হইলে হয় তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত পাইতে হয়, নয় তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি মাত্রও জীব রহিল, মুক্তি পাইল পাইল না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই মুক্তি পাইবে না ; মুক্তি এমন একটা মন্দির যাহার দ্বারে প্রবেশ করিতে হইলে সকল জীবকে হাঁতধরাধরি করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, অগ্র-পশ্চাদ্ ভাবে প্রবেশ করা চলিবে না ; এ কথা যাঁহারা

বলিয়াছেন তাহারা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা বলেন নাই। এ প্রকার মুক্তি-কল্পনার উদারতা একদিকে আমাদের হৃদয়টাকে নিখিল-জীবের সঙ্গে মমতা-বন্ধনে বাঁধিয়া দেয় এবং আমাদের সকল প্রকার লোক-সেবার প্রচেষ্টাকে মহাগৌরবে মণ্ডিত করিয়া দেয়; কারণ এবংবিধ মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের যে আর সকলকে সঙ্গে লইয়া চলিতে হইবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার একটি সহযাত্রীও পথে পিছাইয়া থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারের কাছে আমার তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে যে। অপর দিকে কিন্তু এ প্রকার মুক্তি-কল্পনা আমাদের তীর্থযাত্রার অসীমতা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়া অন্তরে ভয় আনিয়া দেয়। বিশ্বজীবের মুক্তিতে তবে আমার মুক্তি! সে মুক্তিতে কোন দিনও তবে আমি পৌঁছিতে পারিব না। সমষ্টি মুক্তি? তাহার জন্য কালের ত' কোনও সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া যায় না যাহার মধ্যে সে পরিসমাপ্ত হইয়া যাইবে! ব্যাস, বশিষ্ঠ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য—কেহই ত' তবে এখনও পারে যাইতে পারেন নাই; সকলেই খেয়ার ঘাটে বসিয়া আছেন ও পথের পানে চাহিয়া আমাদের জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা করিতেছেন; যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীটও 'পথের ধূলায় অন্ধ' ও মলিন হইয়া আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত পারের মাঝি তাহার নৌকা ভাসাইবে না বলিয়া কবুল জবাব করিয়াছে যে। তবে উপায়—আমার মত অসহিষ্ণু ব্যস্ত-বাগীশ, আগুসারা জীবের উপায়? উপায় খুঁজিয়া লই-বার জন্য আমাকে একটা রফা করিয়া লইতে হইয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এমন ধারা রফা শেষ পর্য্যন্ত চলুক আর নাই চলুক, আমি একরকম করিয়া লইয়াছি। নিজেকে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে কতকদূর পর্য্যন্ত আমাকে সমাজের সঙ্গে ও সমাজকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইবার আবশ্যকতা থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত নাই। খানিকদূর পর্য্যন্ত সমাজের আশ্রয়ে এবং সমাজের সর্ব্ববিধ শুভ ব্যবস্থার সহায়তা লইয়া থাকিতেই হইবে; অন্যদিকে আমি যখন শ্রেয়োলাভের পথে চলিতে আরম্ভ করি, তখন অনেক দূর পর্য্যন্ত সমাজকেও সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আমাকে সর্ব্ববিধ সেবা ও পরিচর্য্যার দ্বারা সমাজকেও আমাদের কল্যাণের অংশভাগী করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই হইল অপরের আমার উপর দাবী। এ দাবী অগ্রাহ্য করিয়া যে চলিতে গেল, সে কল্যাণের দিকে পিছন ফিরিয়াই চলিল। কিন্তু এ দাবীরও একটা সীমা আছে; খানিকদূর পর্য্যন্ত আত্মোন্নতি ও লোকসেবা এ দুয়ের মধ্যে পরস্পরের অপেক্ষা থাকিলেও, মানবাত্মা পরিণামে এমন একটা ভূমিতে গিয়া পৌঁছায় যেখানে সে আত্মারাম ও আত্মতৃপ্ত হইয়াই নিঃশ্রেয়সের চরম পদবীতে আরোহণ করে, সেখানে আর তাহার সঙ্গ নাই এবং কাহারও জন্য বা কিছুরও জন্য অপেক্ষা নাই। এ ভূমিতে পৌঁছিয়া লোকসেবা না করিলেও ক্ষতি নাই; এবং যে এ ভূমিতে পৌঁছিয়াছে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক লোক সেবা করুক আর নাই করুক, তাহার মহনীয় ও বরণীয় পুণ্য জ্যোতিঃ এ ভবাটবীর অভ্যন্তর ভাগে তাহার স্নিগ্ধ সংস্পর্শে তমোমালিন্য কতকটা দূর করিয়া দিবেই। আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি এমন ভাবেই যে কেবল জনসেবা করা হয় এমন নয়; আমাদের ধীবৃত্তিগুলিকে সকল প্রকার শুভ বাসনায় নিয়োগ করিতেছেন যে সবিতা তিনি কি আমাদের ধরিবার, ছুঁইবার, মাপিবার, তুলিবার জিনিষ? অতএব কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ:—মানবাত্মার স্বারাজ্য লাভের যে শেষভূমি সেখানে 'স্ব' মানে আত্মেতর আর কিছুই নহে; তখন স্বারাজ্যের জন্য কিছুরও অপেক্ষা নাই; সমাজ বা বিশ্বমানব সে ভূমির কাছাকাছি পৌঁছাক, আত্মা তখন 'সুস্থিরঃ স্বে মহিম্নি।' আসল কথা, সে ভূমিতে আপন ও পরের মাঝে যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে তাহার বিলয় হইয়া যায়। এখন 'আমি'ও একটা যেমন, 'তুমি'ও একটা তেমন, এবং 'সে'ও একটা তেমন; কিন্তু স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে 'তুমি' ও 'সে', 'আমি'র পাশে স্বতন্ত্র আর একটা কিছু নহে—'আমি'র ভিতরেই তাহাদের স্থান; একটা বিরাট 'আমি' বিশ্বকে কুক্ষিগত করিয়া, বিশ্বের সুখ-দুখ, জীবন-মরণ, উত্থান-পতন নিজেরই ভাবনার মধ্যে সমাপ্ত করিয়া টানিয়া লয়, বাহিরে পড়িয়া থাকিতে দেয় না; তখন যে স্বরাট্ সেই বিশ্বরাট্; তখন কে আমার বাহিরে

পর হইয়া, উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া থাকিল যে তাহাকে আদরে যজ্ঞশালায় আহ্বান করিয়া না লইলে আমার অসমাপ্তি রহিয়া যাইবে? যখন আত্মাই হোতা, আত্মাই হবিঃ, আত্মাই হবন, আত্মাই হবির্ভুক অগ্নি, এবং আত্মাই যজ্ঞ শেষ অমৃত; তখন কে কাহারে বরণ করিয়া লইবে, কে কাহারে যজ্ঞান্তে মোচন করিবে? এক ঊর্দ্ধমূল অধঃ-শাখ মহাপাদপের শাখায় শাখায় স্বাদু পিপ্পলের ফল যতক্ষণ আমি খাইয়া বেড়াইতেছি, ততক্ষণই আর একটী সুপর্ণ পক্ষী কিছু না খাইয়া কেবল দেখিতেছে; কিন্তু আত্মাই যখন মহাপাদপের মূলে, শাখায়, ছন্দোরূপে পত্ররাজিতে, ফলে, ভোক্তায় ও ভোগ্যে, দ্রষ্টায় ও দৃশ্যে নিজেকে ওতপ্রোত দেখিল, তখন কে তাহার বাহিরে পড়িয়া রহিল যে তাহার পরীক্ষায় নিজের সত্তাকে সে যাচাই করিয়া লইবে?

শিক্ষার প্রসঙ্গে এত বড় কথা না পাড়িলেও বোধ হয় চলিত; কিন্তু এটাও আবার ভুলিলে চলিবে না, যে শুধু ছোট কথায় এবং মাঝারি কথায় মানবাত্মার সাজ পোষা-কেরই পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার স্বরূপের সার সত্যের পরিচয় দেওয়া চলে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদিগকে স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান ও শক্তি আনিয়া দেওয়া—শুধু এ কথা বলিয়া শেষ করিলে জিনিষের খোসাতেই শেষ করা হইল, সার পর্য্যন্ত পৌছান হইল না। শিক্ষা আমাদের শরীরটাকে সুস্থ করিবে, অন্নমুষ্টি যোগাইবে, লেখাপড়া শিখাইবে, চরিত্রবান্ করিবে—এ গুলি বেশ কথা এবং মোটামুটি ভাবে দেখিতে যাইলে সোজা কথা। কিন্তু এ কথা গুলি বলিলেই আসল কথা বলা হইল না; এমন একটা কথা বাকি রহিয়া গেল যেটা না বলিলে একথাগুলির মধ্যে কোনও নিয়ত বন্ধন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোনরূপ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা যায় না, কোনওরূপ পরিণতি ও সম্পূর্ণতার একটা দিগ্‌দর্শন অবিষ্কার করা চলে না। শরীরটাকেই সব চেয়ে বড় না করিব কেন? অন্নমুষ্টি যোগানটাকেই শিক্ষা বলিতে আপত্তি কি? মস্তিষ্ক ও হৃদয় এ দু'টার মধ্যে একটাকে খাটো করিয়া অপরটার অনুশীলন করিলে হানি কি? সবই আসিল কিন্তু জীবনে পবিত্রতার সৌন্দর্য্য থাকিল না, তাহাতেই বা আসিল যাইল কি? এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলিবে না যতক্ষণ না একটা কথা আমরা বলিতে পারিতেছি সেই কথাটি স্বারাজ্য। অতএব বড় কথা গোলমেলে কথা বলিয়া ভয় পাইলে আমাদের চলিতেছে কৈ? অনাবৃষ্টিতে মৃত্তিকা যখন নীরস, তখন বাগানের মালিকে ডাকিয়া ফুল ফলের গাছ পালার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়, প্রত্যেকটিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হইয়াছে কি না; কিন্তু আষাঢ়ের মধ্যাহ্নে বিশ্বাত্মার সঞ্চরণশীল স্নেহের মত একখানা মেঘ উঠিয়া যে দিন নিজেকে রিক্ত করিয়া 'তৃষিতধরা মাঝে' ঢালিয়া দিয়া গেল, সে দিন আর গাছ পালার তথ্য লইবার প্রয়োজন থাকে না। 'স্বারাজ্য' এমন একটা কিছু পাইলাম যাহা আমাদের প্রকৃতি-উদ্যানের সর্ব্বাংশে অকাতরে পক্ষপাতহীন বর্ষিয়া গেল; তাহাকে আর ঝাঁঝরি হাতে করিয়া প্রত্যেক তরুগুল্মটির মূলে কুণ্ঠিত বারিধারা আলাহিদা যোগাইয়া বেড়াইতে হয় না।

লক্ষ্য দূরে থাকিলে অস্পষ্ট আবছায়ার মত দেখাইবেই। কিন্তু সেখানে না পৌছিলে যদি আমাদের চরিতার্থতা না থাকে তবে পথের ধারে চোখের সামনে উপস্থিত যাহা পাইলাম—তাহাতেই আমাদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম বিলাইয়া দিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিলে চলে কি? দীর্ঘ তীর্থযাত্রায় যখন আমার অভীপ্সিত দেব মন্দিরের চূড়া অস্পষ্ট দেখা গিয়াছে, তখন পথিমধ্যে এক পান্থশালায় নিজেকে নিশ্চিন্তভাবে ফেলিয়া রাখিব কি? দিনের বেলায় হাটে বেচাকেনা করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঝি পদ্মার জলে ডিঙি ভাসাইয়া, যখন দূরে গগন-সীমান্তে অস্পষ্ট মসীরেখার মত আপন 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' পল্লীবাসটি দেখিতে পায়, তখন সে পরপারের নিকটে একটা বালির চরে ডিঙি বাঁধিয়া, আকাশ পানে চাহিয়া, জল-কল্লোলে ক্ষুধপিপাসা মিটাইয়া পড়িয়া থাকিবে কি? গন্তব্য স্থানে না পৌছিলে যদি আমাদের চলিত তবে না হয় এখানে সেখানে এটা সেটা লইয়া থাকিয়া যাইতাম; যেটি ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, কাজেই অল্প লইয়া নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের চলে না। শুধু শরীরের স্বাস্থ্য আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়; শুধু খাইতে পরিতে পাইলেই হইল না; শুধু লেখাপড়া শিখিলেই রেহাই নাই; যশ, সম্পদ, এমন কি চরিত্র,

এগুলিতেও বিরামস্থান নাই। পথ চলিতে চলিতে যথাসম্ভব এ সমস্ত আমাকে পাইতে হইবে, কিন্তু সে পাওয়াকে আরও একটা বড় পাওয়ার আরম্ভ বা ভূমিকা করিয়া না লইতে পারিলে, আমায় যে অল্পেই পড়িয়া থাকিতে হইল, এবং অল্প কিছুতেই ত' সুখ নাই, স্বস্তি নাই। আবার আদর্শ অস্পষ্ট বলিয়া—তাহার প্রভাব যে আমাদের উপর কম হইবে, এ কথাও সব সময়ে ঠিক কথা নহে। 'পাখীগণ' যখন 'করে রব' তখন শিশুগণ নিজ নিজ পাঠে মন দেয় বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে প্রেরণা রহিয়াছে সেটা গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড এবং সেটা শিশুদের ত্বগিন্দ্রিয়ের কাছে বেজায় স্পষ্ট; 'রাখাল' ও যখন 'গরুর পাল ল'য়ে যায় মাঠে', তখনও প্রেরণাটি ঠিক ইহাই। কিন্তু কবি বা শিল্পী যখন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে বসিল, তখন সে ধ্যানে যে আদর্শটিকে অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছে তাহাকেই বাস্তবের মাঝখানে ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইল; কবির প্রত্যেক ভাব, ভাষা ও ছন্দের এবং শিল্পীর প্রত্যেক তুলিকা-সম্পাত ও বর্ণ-বিন্যাসের পশ্চাতে সেই ধ্যানলব্ধ অস্পষ্ট আদর্শটিরই প্রেরণা ও প্রভাব রহিয়াছে; কিন্তু সে প্রভাবের মূল অস্পষ্ট বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ কি অব্যবস্থিত, তাহার দাবী কি একটুও শিথিল? যেমন আদর্শটিকে ধরিয়া বাঁধিয়া একটা লক্ষণ বা বিবৃতি দিয়া হাজির করা যায় না, সেইরূপ কবির বা শিল্পীর সাধনা যে পুরস্কারের আশায় রহিয়াছে, অথবা যে ব্যর্থতার আশঙ্কা করিতেছে, তাহাকেও স্পষ্ট একটা কোনও বিবরণ দিয়া প্রকাশ করা চলে না; তাহা সৃষ্টির আনন্দ বা ব্যর্থতার নৈরাশ্য এইরকম একটা অস্পষ্ট কথায় আমাদের বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু সাধনার মূল উৎস এবং শেষ পরিণতি এদু'টাই অস্পষ্ট হইলে কি হইবে—কবি তা'র প্রতিপাদক্ষেপে এমন একটা কিছুর প্রেরণা ও নির্দ্দেশ অনুভব করে, যেটার প্রভাব ও শাসন, উদ্যত বেত্রদণ্ডের চেয়ে ঢের বেশী সতর্ক ও মর্ম্মান্তিক। অতএব স্বারাজ্য বুঝি না বলিলে রেহাই নাই।

অনেক বড় কথা আমরা বুঝিতে চাহি না বলিয়াই বুঝি না। ছোটর কাছে যে আপনাকে একেবারে ক্রীতদাস করিয়া ধরা দিয়াছে, তাহার বড়র ত' আশাও নাই এবং বড়তে তাহার প্রয়োজনও নাই। যে জীব গর্ত্তের অন্ধকারেই নিজের স্বাভাবিক বাসস্থান করিয়া লইয়াছে, তাহার গর্ত্তের দ্বারে যদি উদার বিশ্বের ভূমালোক গিয়া কোন দিন উপনীত হয়—তবে সে যে ভয়ে গর্ত্তের ভিতর তাহার অসহিষ্ণু দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিবে। আমরা শরীরের ভোগ সুখ, খাওয়া পরার সুখ প্রভৃতি তুচ্ছতার মধ্যে নিজেদিগকে এমনভাবে সমাপ্ত ও অভ্যস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি যে, অনেক বড় সত্য কথা আমাদের কাছে বাজে কথারই সামিলই হইয়া আছে; সে সব কথা শুনিলে আমরা বুঝি না এবং বুঝিবার সম্ভাবনা হইলেও অস্বস্তি বোধ করি। বড় কথা গোলমেলে কথা বলিয়া আমরা নিজ নিজ গর্ত্তের মধ্যে বেশ বিজ্ঞের মতই জীবনটা কাটাইয়া দিই; কিন্তু যে সকল মহাজন বড়র জন্য, সত্যের জন্য, সুন্দরের জন্যই তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বড় লইয়াই যাঁহাদের দরকার এবং বড় নহিলে যাঁহাদের কোনমতেই চলিবে না, তাঁহাদের মুখে 'বড় কথা গোলমেলে কথা' এ আপত্তি ত' কেহ কোনও দিন শুনিল না। পক্ষান্তরে সংসারের ঐহিকসর্ব্বস্বেরা যে কথাগুলিকে সাদাসিধা কথা বলিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আছে, সে কথাগুলির অনেকটাই আপাততঃ সাদাসিধা, বস্তুতঃ নহে। যে দেখে যে পৃথিবী সমতল এবং পৃথিবীরই চারিধারে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রজগৎ ঘুরিয়া পাহারা দিয়া বেড়াইতেছে, তা'র দেখা আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষের সহজ ধারণার খুবই অনুকূল সন্দেহ নাই; কিন্তু একটুখানি তলাইয়া দেখিতে যাইলেই সে দেখার ভুল ধরা পড়ে, আমাদের সহজ ধারণাগুলির মধ্যে গোল বাহির হইয়া পড়ে। এ সহজ ধারণাকে উল্টাইয়া দিয়া বিজ্ঞান কিছুকাল ধরিয়া যে কথাটা আমাদিগকে শুনাইতেছে, সেটা শুনিতে ও বুঝিতে খুব শক্ত কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের যে কৈফিয়ৎ পাই তাহা সত্যের সরলতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বজনীন সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য্য-সম্পাতে চিত্তাকর্ষক। আমাদের অনেক সহজ জ্ঞানের মধ্যে যে গোল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা বিজ্ঞানে গিয়া ধরা পড়ে; আর দূর হইতে আনাড়ীর দৃষ্টিতে বিজ্ঞানে যে সত্যগুলি দুর্দ্ধর্ষ ও জটিলতায় সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হয়,

পরীক্ষার এবং উপলব্ধিতে সে সত্যগুলির সরল সৌন্দর্য্য ও নির্ম্মল ঔদার্য্য মানবাত্মাকে বিস্মিত, মুগ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত না করিয়া যায় না। স্বারাজ্য সিদ্ধির চরম ভূমিতে 'আমি'র মধ্যেই 'তুমি' না 'আমি'র পাশে 'তুমি' এ বিচার আগে করিয়া লইয়া তবে স্বারাজ্যের কথায় ঘাড় পাতিয়া দিব, এ কথা যাঁহারা ভাবিতেছেন, তাঁহারা কথাবার্ত্তার অধিক আর কিছুই করিবেন না; তাঁহারা তাঁহাদের নিরালাপুরীর অর্গলগুলি খুলিয়া পথে বাহির হইয়া তীর্থযাত্রা করিবার প্রয়োজন সত্যসত্যই প্রাণে এখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহারা আগে বুঝিতে চান যে মানবাত্মার এই মহাব্রত প্রতিষ্ঠার অবসানে দেবতার প্রসাদ লইয়া সোজাসুজি মুখে দিতে হয়, না মস্তক বেষ্টন করিয়া মুখে দিতে হয়। যেন এই মহাসত্যটা বুঝিবার অপেক্ষাতেই তাঁহাদের সকল উদ্যম, সকল অধ্যবসায় পড়িয়া আছে।

মানুষ হাটবাজারে বেচাকেনা করে, বাস করে না। কারবার করিতে গিয়া তাহাকে একটা না একটা মুখোস পরিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পরের মাল কত সস্তায় কিনিবে এবং নিজের মাল কত বেশী দরে বিকাইবে ইহাই তাহার চিন্তা। এখানে সত্যের আসল ছবিটি তা'র কাছে অন্তর্হিত।' কিন্তু বাস করিবার জন্য একটা মন্দিরও আছে। সেইটার নাম অন্তরাত্মা। 'এখানে 'শান্তশীতল রাগে' যে ঠাকুরটি বিরাজ করিতেছেন তাঁহার স্নেহজ্ঞাগ্রত নয়নের নিম্নে মানুষের প্রাণকে নিরাভরণ হইয়া হাজির হইতে হয়। হাটে মিথ্যা কারবার করিয়া, একরাশি অভিমানের পশরা বহিয়া মানুষ যখন অবসন্ন পদে তা'র মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সে মন্দিরাভ্যন্তরের 'মঙ্গল-ভৈরব-শঙ্খ-নিনাদ' তাহার কম্পিত মস্তক হইতে সকল অভিমানের ও প্রবঞ্চনার ঝুড়ি ধূলির উপর লুটাইয়া দেয়। সে পশরা মাথায় বহিয়া অন্তরাত্মার মন্দিরে যে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সে 'চিন্তামণির নাচদুয়ারে' আমার যে মুখোস খুলিয়া ফেলিতেই হইবে। এখানে আসিয়া ঝুটাকে সাচ্চা হইতেই হইবে যে। এখানে মানুষের ছোট বড় দুইটা দিকই বেশ করিয়া মিলাইয়া, হিসাব নিকাশ করিয়া পাকা খাতায় তুলিতে হইবেই যে। বাজারে কাণাকড়ি লইয়া খেলিয়াছি, কাণাকড়িই কুড়াইয়াছি, কিন্তু আমার নিভৃত গৃহকোণে 'নিবাত-নিষ্কম্প-মিব প্রদীপম্' যে অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছেন সেখানে আমার পুঁজিপাটার কড়াক্রান্তির একটা হিসাব আমায় করিয়া লইতেই হইবে যে। নিজের ধনরত্নের সিন্ধুকটি কেহ ঘাড়ে করিয়া হাটে যায় না; সেখানে কারবারের ফল কুড়াইয়া আনিবার জন্য একটা ছোট থলেই যথেষ্ট; কিন্তু ঘরে ফিরিয়া সে থ'লেটিকে লইয়া সিন্ধুকের কাছেই ত' হাজির করিতে হয়; ছোটকে আর ছোট করিয়া ফেলিয়া রাখা চলে না, বড়র সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হয়। সকল কাজের মধ্যে ছুটি করিয়া লইয়া আমার অন্তরাত্মার মাঝে, যে বড়টির কাছে আমার এক আধবার হাজির হইতেই হয়, সেই বড়ই ত' স্বারাজ্য। হাটের পথে কেহ আমাকে ইহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কবুল করি না; বলি স্বারাজ্য আমি জানি না, বুঝি না। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আর আত্মবঞ্চনা চলে কি? মানুষ যতক্ষণ বলিতেছে আমি শরীরের সুখ চাই, যশ চাই, প্রতিপত্তি চাই, বাহ্য সম্পদ চাই, ততক্ষণ সে ফুলের বাহিরে ভন্ ভন্ করিয়া ঘুরিতেছে মাত্র; ফুলে যেই সে বসিতে পাইল সেই সে সুস্থির হইল; কারণ তখন যে তা'র নিশ্চিন্ত ও সম্পূর্ণভাবে পাওয়া হইয়াছে, এটা চাই, ওটা চাই করিয়া আর ব্যর্থ প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। সেই ফুলটাই তা'র অন্তরাত্মা এবং তাহাতেই যে সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠার আনন্দ তাহাই ত' স্বারাজ্য সিদ্ধি।

ভাঁটার সময় সাগর যখন আপনাকে একটুখানি সরাইয়া লইয়াছিল তখন তাহারই রসে সিক্ত বেলাভূমিতে বসিয়া তাহার পানে পেছন ফিরিয়া নিজের ভিতরে যে দীনতার মণ্ডুকটি বাস করে তাহার জন্য একটা গর্ত্ত কাটিতেছিলাম। পশ্চাতে বিপুল উচ্ছ্বাসে সাগরের তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; কিন্তু আমি তার শাশ্বত ভৈরব বাণীকে একটা অজানা রহস্য ভাবিয়া গ্রাহ্য করি নাই; মনকে বুঝাইয়াছিলাম যে ও বিরাট রহস্যের সঙ্গে আমার নিজস্ব ছোট গর্ত্তটির কোনও সম্পর্ক নাই। আমার মণ্ডুক জীবনের ক্ষুদ্রতা নিজেতেই পর্য্যাপ্ত এবং সেইটুকুখানিই আমার কায়েমি স্বারাজ্য। থাওয়া

পরার কথা ভাবিব, সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা ভাবিব এবং সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে নিজেকে খুব চালাক ও লায়েক করিয়া তোলাই আমার শিক্ষা। ভেক গর্তের জলটুকুতে লাফাইতে শিখিবে, বেশ চালাকি করিয়া পোকা মাকড় ধরিয়া খাইতে শিখিবে, বংশ বৃদ্ধি করিয়া যাইতে আলস্য থাকিবে না, এবং আমার মত গর্তের পারে বসিয়া সাগরের বিপুলতা ও নদনদীর স্বাধীনতাকে বেশ বিজ্ঞের মত উপহাস করিবে—ইহাই হইল তাহার শিক্ষা এবং ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু হে মানবাত্মা! সাগরের জলের বিপুলতা ও গভীরতার মাঝখানেই যে তোমার স্বাভাবিক মন্দির একথা কতক্ষণ নিজেকে তুমি ভুলাইয়া রাখিয়া কূপ-মাণ্ডুক্যের তুচ্ছতাকে বরণ করিয়া রহিবে? বিরাট তুমি, তোমার এ তুচ্ছের সাজ কতক্ষণের জন্য? ভূমা তুমি, তোমার এ অল্পের ভাণ কতক্ষণ টিঁকিবে? কতক্ষণ তুমি বলিবে যে, সাগরসৈকতে যে একরত্তি জল চোঁয়াইয়া গর্তের ভিতর আসিতেছে তাহাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত; কেবলমাত্র খাওয়া পরা, লম্ফঝম্পের যে কৃপণ, কুণ্ঠিত সুখ তাহাই আমার বাঞ্ছনীয়? যে শাশ্বত আনন্দে এ নিখিল বিশ্ব সৃষ্টির সম্প্রসারণ অনুভব করিয়াছে, যে বাধাহীন, সঙ্কোচহীন আনন্দে এ জগৎটা প্রতিষ্ঠিত, এবং সাগরের জলে বরফের মত যে অপরিমেয় আনন্দে, সৃষ্টি নিজের বিশিষ্টরূপ আবার হারাইয়া ফেলিবে, সে আনন্দ যে তোমারই আনন্দ, সে যে তোমার নিজেকে নিজের ভালবাসার চরিতার্থতা; কতক্ষণ সে আনন্দের পূর্ণাভিষেক হইতে নিজেকে ভয়ে তুমি সরাইয়া রাখিতে পারিবে? ঐ দেখ সাগরের জলে আবার জোয়ার আসিতেছে; যে সঙ্কীর্ণ বেলাভূমিতে সাগর এ সংসারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, সেটাকে মাঝে মাঝে সাগর নিজের বিপুল আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া না লইলে, বুঝি বা গর্তের জলে মানবাত্মার মণ্ডুক-লীলাভিনয় চিরন্তন হইত। কিন্তু জোয়ারের সময় সিন্ধু যখন তোমার বালির খেলা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যাইবে, তখন, হে মণ্ডূক! তুমি তোমার দীনতার ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া সেই প্রাচীন সুপর্ণ পক্ষীটির মত হিরণ্ময় পক্ষপুট বিস্তার করিয়া সাগরের বিশালতার পানেই অভিযান করিবে না কি? যেখানে সাগরের অশান্ত গাঢ় নীলিমা আকাশের সুস্থির নীলিমার কাছে ধরা দিয়াছে, যেখানে সমগ্র সৃষ্টিটা চিদাকাশের সমাধিবেদীপ্রান্তে সম্ভ্রমে প্রণত, সেই দিকে, হে মানবাত্মা! খেলা ভাঙ্গিবার পর তোমার পুণ্য-অভিযান। ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুর্দ্দিক্‌ যথায় অনন্তের পূর্ণ মহিমায় দীপ্ত সুনির্ম্মল, যে ভূমিতে পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে পূর্ণই অবশেষে থাকে, যে পদবী "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং"—তথায় হে সুরি! তোমার হিরণ্ময় পক্ষবিস্তার করিয়া, তোমার অপগতমোহ 'আতত চক্ষু' মেলিয়া, দেশ-কালের সীমারেখার বাহিরে যে আত্মার সর্ব্বাত্মতা তুমি অনুভব করিবে, তাহাই তোমার স্বারাজ্য। এখানে 'স্ব এর মধ্যেই সব, 'আমি'র ভিতরেই 'তুমি'।

আর একদিন দেখি পট পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কাহার কাছে, কি যেন কি একটা চাই; কি যেন কি একটা না পাইলে আমার প্রাণের ক্ষুধা ভরে না, পিপাসা মিটে না; সেই চাওটার নাম দিয়াছি আমার ভিক্ষার ঝুলি। সেই ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া এই মহাব্রজের কুঞ্জদ্বারে দ্বারে আমি 'জয় রাধে' বলিয়া মাধুকরী করিয়া বেড়াইতেছি। ভিক্ষা মুষ্টি হাতে করিয়া সে যখন কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া আমি বলিতেছি—হে আমার চিরবাঞ্ছিত! তোমারই পায়ে আমায় বিকাইতে না পারিলে আমার চরিতার্থতা নাই। তোমারই গৃহাঙ্গন আমার প্রাণের অঞ্চল দিয়া নিত্য মুছাইতে না পারিলে যে আমার স্বস্তি নাই; তোমারই ডাকে আমার চরণ চঞ্চল, তোমারি সেবায় আমার কর দুটি অনলস করিতে না পারিলে আমার জনমটাই যে বৃথায় যাইবে। অতএব হে আমার 'তুমি'! তোমারি আবাহনে, আপ্যায়নে ও পরিচর্য্যায় আমার 'আমি' কে স্বীকার করিয়া লও। ইহাই তোমার দ্বারে আমার এ ভিক্ষা। আমার এ ভিক্ষার মর্ম্ম সে বুঝিল না, ফিরিয়া গেল। বাউলও অন্য দ্বারে গিয়া তাহার ঝুলি পাতিয়াছে। এ জগতের প্রত্যেক হৃদয়টার কাছে সে আপনাকে বিনা কড়িতে লুটাইয়া বিলাইয়া দিতে চায়; কিন্তু জগতের প্রাণী যে কড়ি দিয়া কিনিতে ও বেচিতেই অভ্যস্ত; যেখানে কড়ির নাম-গন্ধ ও নাই, আদান-প্রদানের একটা কষাকষি মাজামাজি নাই, সেখানে যে পা

বাড়াইয়া দিয়াছিল সে ত সত্যসত্যই বাউল, সে বুদ্ধিমান, হুঁসিয়ার জীবের কারবারের বাহিরে। শকুন্তলা যে দিন নব মল্লিকার মূলে বারি সেচন করিতে গিয়া দর্ভাঙ্কুর বিদ্ধচরণা কাহার পানে সলজ্জ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াছিল, শ্রীরাধা যেদিন 'কনক-কলসে' যমুনার জল ভরিতে আসিয়া কাহার বেণুরবে স্রোতের মুখে বেতসীর মত কাঁপিয়া উঠিতেছিল, জুলিয়েট যেদিন রোমিওর বক্ষোলগ্ন হইয়া বিহগকণ্ঠে ঊষার জাগরণ শব্দটাকে নিশীথের সুখ-স্বপ্নেরই সামিল করিয়া লইতেছিল, দেস্‌দেমিনা যেদিন স্বামীর আততায়ী হস্তের নিষ্পেষণে শেষ নিশ্বাসে বলিতেছিল—"প্রভু—" সেদিন কিন্তু সে সকলের মধ্যে সেই প্রাচীন বাউলটাই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বুদ্ধ যেদিন নির্ব্বাণের জন্য, জীবের জন্ম-জরা-মরণ-দুঃখ দূর করিবার জন্য বোধি বৃক্ষতলে সমাধি করিলেন, খৃষ্ট যেদিন জগতের কলুষ-কলঙ্ক নিজের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া দিবার জন্য যূপকাষ্ঠে উঠিলেন, চৈতন্য যেদিন জীবের দ্বারে দ্বারে প্রেম বিলাইবার জন্য জাহ্নবী তীরে সন্ন্যাস লইলেন, কবীর যেদিন কুষ্ঠী কুৎসিৎ জীবের মুখের কাছে "এহি মেরা রাম" বলিয়া প্রেমের আরতি করিলেন, সেদিন সেই পরিচিত বাউলটারই আমরা সাড়া পাইয়াছি। সে যে আমার বড়ই দরদী, সাঁচ্চা ফেলিয়া ঝুটা লইয়া থাকিতে আমায় কোন মতেই দিবে না। তাই আমাদের "ক্ষুধিত পাষাণের" চারি ধারে সেই বাউলটাই আবার আপন মনে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে—"তফাৎ যাও,—সব ঝুটা হ্যায়"। বাউল আমাদিগকে যে স্বারাজ্য দিবে সে যে সেবার স্বারাজ্য, প্রেমের স্বারাজ্য; সেখানে 'তুমির' পাশে 'আমি'—'তুমির দুয়ারে নিত্য বিকাইয়া 'আমি', বলির দুয়ারে যেমন ভগবান।

প্রেমের স্বারাজ্য বড়, কি নির্ব্বাণের স্বারাজ্য বড়—ইহা লইয়া গোলমাল করিয়া কোনও ফল নাই। প্রেমের স্বারাজ্যে জগৎ-সংসারটা 'আমার', জ্ঞানের স্বারাজ্যে জগৎ-সংসারটা "আমি"। প্রথমটিতে তোমার সঙ্গে আমার সেবার সম্বন্ধ, সুতরাং তুমি আমার অন্তরে থাকিয়াও বাহিরে; দ্বিতীয়টীতে তোমার সঙ্গে আমার ভাবনার সম্বন্ধ, আমি ভাবিতেছি বলিয়াই তুমি রহিয়াছ; সুতরাং তুমি আমার বাহিরে থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরে। প্রথমটিতে, আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া আমার প্রেমকে অকাতরে সকলের কাছে বিলাইয়া দিয়াছি, সুতরাং কেহ আমার পর নাই, কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, কোন খানে আমার ব্যাঘাত নাই, নিজেকে ঢালিয়া দিতে কোন কিছুরও অপেক্ষা নাই, ইহাই হইল আমার স্বারাজ্য। জগতে এমন কেহ দীন অকিঞ্চন নাই, যাহাকে আমার ভাণ্ডারের বাহিরে এক পাশে শূন্য রহিয়া যাইতে হইবে, জগতে এতবড় কাহারও ঐশ্বর্য্যের স্পর্দ্ধা নাই যেখানে আমার সাধের বাউলটি হাজির হইতে সঙ্কোচ বোধ করিবে। এ স্বারাজ্য কি কম স্বারাজ্য? ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাহারও সাধ্য আছে কি, যে একটা সীমারেখা টানিয়া দিয়া বলিতে পারে—ওহে বাউল! তোমার সেবার অধিকার এই পর্য্যন্তই। কোন্ পাপী তাহাকে বলিতে পারে—ওগো, আমার কাছে তুমি এসো না, আমাকে তুমি ছুঁয়ো না। কোন পুণ্যশ্লোক তাহাকে বলিবে—ওগো, আমার পুণ্য মহিমাই আমার কাছে পর্য্যাপ্ত, তোমার সেবায় আমার প্রয়োজন নাই? কে আছে এমন রাজা যে, মিথ্যা স্তুতি-গানের কোলাহল উপেক্ষা করিয়া একটিবার প্রাসাদ বাতায়ন-পথে পথের ঐ বাউলটির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিবে না? পথিক আজ তার সিংহদ্বারে যে দান লইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে দান বরিয়া লইতে রাজ-বেশের মণি-মুক্তার বন্ধনের ভিতর হইতেও মানবাত্মা যে সাগ্রহ হইয়া উঠে; সে দানের স্থির, স্নিগ্ধ আভার সম্মুখে রাজ-চক্রবর্ত্তীর গৌরব-সমুজ্জ্বল বিজয়শ্রী এবং অসামান্য সাম্রাজ্য-লক্ষ্মীও যে লজ্জায় ম্লান হইয়া পড়ে! আবার কে আছে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কারাগারে এমন উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত চিরবন্দী, যাহার কারাকক্ষের লৌহ অর্গল ঐ বাউলের ডাকে নিঃশব্দে খুলিয়া যাইবে না! যাহার ক্লিষ্ট পীড়িত অঙ্গ হইতে বন্ধনশৃঙ্খল সে ডাকের সম্ভ্রমে খুলিয়া পড়িবে না। আয়েষা যে দিন ক্ষত্রিয় রাজকুমারের কারাকক্ষে সঞ্চারিণী শুশ্রূষার মত আসিয়া 'হাতীশালে হাতী ও ঘোড়া শালে ঘোড়ার,' কথা বলিয়াছিল, সেদিনও আমরা আমাদের ঐ বাউলটিকে চিনিতে পারিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়টি'তেও আমি সকল গণ্ডী কাটিয়া দিয়া সৃষ্টির

নিখিল সামগ্রী নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছি। কোথাও আমার কুণ্ঠা নাই, বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই; কারণ সবই যে আমি। আমার ভাবনার ভিতরেই বিশ্বটা বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে মিলাইতেছে। সকল সুখ দুঃখকে বুকে করিয়া আমি আনন্দ, সকল আলো আঁধার অন্তরে বহিয়া আমি "ধ্রুবজ্যোতি"; সকল শুভ-অশুভকে জড়াইয়া লইয়া আমি শিব; সকল সুধা ও গরল সম্মিলন করিয়া আমি অমৃত; এবং সকল সুন্দর অসুন্দরের সমন্বয় করিয়া লইয়া আমি মধুর। ইহাই আমার স্বারাজ্য। তবেই প্রশ্ন উঠিতেছে, জ্ঞান বড় না প্রেম বড়? শিক্ষায় সেবক করিয়া তুলিবে না বৈরাগী করিয়া তুলিবে? শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বারাজ্য একথা বলিলেই ত পরিষ্কার হইল না—স্বারাজ্য যে দুইরকম হইতেছে। সেবায় ও প্রেমে কি মানবাত্মার চরিতার্থতা, অথবা নিজের ব্রহ্মত্বের উপলব্ধিতে? প্রশ্নের উত্তর যাহাই হউক, তাহার অপেক্ষায় আমাদের শিক্ষার ও সাধনার সকল আয়োজন অনুষ্ঠান স্থগিত করিয়া রাখার কোনও কারণ নাই। শিক্ষার বা সাধনার একটা মূল অবিচ্ছিন্ন কাণ্ড রহিয়াছে, যাহা হইতে এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া, সেবার ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের ধর্ম্মশাখার ন্যায় বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দিকে গিয়াছে। গোড়ায় অনেক দূর পর্য্যন্ত জ্ঞান ও প্রেমের মধ্যে, সেবা ও বৈরাগ্যের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ, এমন কি আত্মীয়তা রহিয়াছে। পরে হয় ত আলাহিদা ব্যবস্থা, এবং চরমে হয়ত আবার একাত্মতা। যার তুচ্ছ ভোগসুখে অনাসক্তি নাই, সে কি প্রাণ ঢালিয়া পরের সেবা করিতে জানে? আবার পরের জন্য যার প্রাণ টানিতেছে না, ভাই বন্ধুর জন্য, স্ত্রী পুত্রের জন্য, দীন-দুঃখীর জন্য, দেশের জন্য যাহার প্রাণে দরদ হইতেছে না, সে কি নিজের ভোগ-সুখে অনাসক্ত, বৈরাগী সহজে হইতে পারে? যে নিজের দিকে তাকাইল না, তার এমন একটা কিছু জুটিয়াছে যার দিকে তার পিছন ফিরিতে তার সাধ্য বা অবকাশ নাই। লোক সেবা না করিলে, সর্ব্বভূত-হিতে রত না হইলে, বাসনা ত্যাগ হয় না, সুতরাং বৈরাগীর ও নিঃসঙ্গ হওয়া সম্ভবে না। এই জন্য জ্ঞানীর পক্ষে, ব্রহ্ম-মন্দিরে যাত্রীর পক্ষে, ফলাভিসন্ধানশূন্য হইয়া লোক-সেবা করা সাধনার প্রথম অপরিত্যাজ্য অঙ্গ। যে ইহা দ্বারা চিত্তের সম্প্রসারণ ও বাসনার সংশোধন করিয়া না লইলে ব্রহ্মাত্মতা রূপ স্বারাজ্য-সিদ্ধিতে তাহার অধিকার ও যোগ্যতা সাব্যস্ত হইল না। অতএব যে বলিতেছে যে স্বারাজ্যের জন্য গোড়া হইতেই লোকসঙ্গত্যাগ করিতে হইবে, দেশ ও সমাজকে উপেক্ষা করিতে হইবে, সে অন্ধ-তমিস্রার সঙ্কীর্ণ গুহারই অন্বেষণ করিতেছে, জ্ঞানের বিপুল ভাস্কর-মন্দির তাহার আপনার সীমারেখার বাহিরে। পক্ষান্তরে যে বলিতেছে—আমি ভাল বাসিব, সেবা করিব, —জানিয়া শুনিয়া আমার লাভ কি? সেও বড় কাঁচা কথা বলিতেছে। ইচ্ছা, শক্তি ও জ্ঞান—এই তিনের ত্রিবেণী-সঙ্গমে ডুব দিতে না পারিলে সেবা কখনও নিশ্চিন্ত ও চিরস্থায়ী কল্যাণে ধন্য হয় না। মায়ের মত সন্তানের ভাল করিবার ইচ্ছা কার, কিন্তু ভাল করিবার শক্তি এবং ঠিক ভালর জ্ঞান না থাকিলে মা যে অনর্থ ঘটাইয়া বসেন তাহার জন্য ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনের কাছেও বোধ হয় ক্ষমা নাই। সেবাকে বাস্তব ও সুন্দর করিবার জন্য যেমন পশ্চাতে প্রেম চাই, তেমন তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার জন্য জ্ঞান চাই। চলিবার ইচ্ছা থাকিলেই শুধু চলা হয় না, দেখিয়া শুনিয়া চলিতে পারা চাই, নহিলে চলিতে ইচ্ছা থাকিল মন্দিরে, গিয়া পড়িব কোন পাথারে? যে জগৎ ভালবাসিবে, তার খাঁটী করিয়া আপনাকে ভাল-বাসা চাই, যে যজ্ঞে তোমাকে 'আমি' চিনিয়া বরণ করিয়া লইব, সে যজ্ঞে যজমান 'আমি' নিজেকে আগে চিনিয়া লইব, অথবা একই চেনার দুইটা দিক্—তুমি ও আমি, যজমান ও পুরোহিত, হোতা ও দেবতা, পরস্পর পরস্পরকে চেতাইয়া লইতেছে। ইহাই অরণি সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি,—ইহাই সাকার পূজায় দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা; একটা প্রদীপ-শিখা হইতে অন্য প্রদীপ-শিখা প্রবর্ত্তিত হইল এবং উভয়ের রশ্মি সংহত হইয়া আলোকের সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া দিল, প্রকাশকে সাহস ও অভয় দিল। ইহাই উপসংহারে সেই মহাবাক্য 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। যে পুরাণ বৃক্ষের শাখায় আত্মা বিচরণ করিতেছে, তাহারই মূলে ও শিরায় শিরায় যেমন রস চাই, তাহার পাতায় পাতায় তেমনই আলোকের

অঞ্জনা চাই ; নহিলে শুখাইয়া মরিয়া স্থানু হইয়া রহিবে। রস—প্রেম বা আনন্দ, আলোক—অনুভূতি বা জ্ঞান। যে হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ অপিহিত রহিয়াছে তাহার উন্মোচন করিলে দেখিব পক্ষিশাবকের মত মানবাত্মা একটা অমৃতের মাঝে ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহার দুইটি পক্ষপুট—একটি জানা, অপরটি চাওয়া ; একটি পাওয়া, অপরটি দেওয়া ; একটী 'আমি', অপরটি 'তুমি'। শিক্ষা, সাধনা আত্মাকে স্বারাজ্য ভূমিতে তুলিতে গিয়া এ দুয়ের ছাটিয়া ফেলিয়া কাহাকে বজায় রাখিবে ? অতএব জ্ঞানের স্বারাজ্য ও প্রেমের স্বারাজ্য এ দুয়ের মধ্যে গোড়া পত্তনের সময় হইতেই একটা খাত কাটিয়া রাখা চলে না। জড় লইয়া যদি গড়িয়া তুলিতে হইত তবে পত্তনের সময়েই আমাকে শেষ ভাবিয়া লইতে হইত ; কিন্তু একটা সজীব পদার্থ যেখানে বাড়িয়া উঠিতেছে সেখানে মূল কাণ্ডটা অবিভক্ত থাকিল বলিয়া শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পের ভবিষ্যতের জন্য আমার আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া চিন্তিত হওয়ার কোনই কারণ নাই। পরিণামে যেখানে বিভক্ত হওয়া স্বাভাবিক, গোড়ায় সেখানে অবিভক্ত, সম্মিলিত ও সাপেক্ষ থাকাটাও স্বাভাবিক হইতে পারে। যে সেবা চায় সে জ্ঞানের, এবং যে জ্ঞান চায় সে সেবার মুখ দর্শন করিবে না এরূপ প্রতিজ্ঞা গোড়াতে অসঙ্গত ও মারাত্মক। "এহ বাহ্য আগে কহ আর" শুধু এই কথাই প্রভু কহেন নাই ; "এহ হয় আগে কহ আর" একথাও প্রভু কহিয়াছেন।

বৈরাগীর ধর্ম্ম শিখাইতে গিয়া ভারতবর্ষ ঠকিয়া গেল—একথা আংশিক ভাবেই সত্য। প্রথমতঃ কালের মাপকাটিটা একটু বড় করিয়া লইলে, কার হার কার জিত, অনেক সময় বলা শক্ত ; দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষ যদি শেষ পর্য্যন্ত ঠকিয়াই গিয়া থাকে, বৈরাগীর ধর্ম্ম-যে তার জন্য কতটা দায়ী, তাহা দেখাইয়া দেওয়াও সহজ নহে। যদি কতক পরিমাণেও দায়ী হয়, তবে তাহা প্রাচীন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য ভাঙিয়া দিয়া সমাজাত্মার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে বলিয়াই। আগে চতুরাশ্রমের ভিতরে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের, ও ব্যষ্টির যে সমন্বয়, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বারাজ্যের পত্তনভূমি ; সে ব্যবস্থায়, সেবা ও বৈরাগ্যের যে মূলকাণ্ডের কথা বলিতেছিলাম, তাহা বেশই দৃঢ়, দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট। এ সমন্বয়ের পরবর্ত্তী বেদ হইতেছে গীতা। নানা ভাব-বিপ্লব ও কর্ম্ম-বিপ্লবের মধ্য হইতে যজ্ঞ বরাহ-রূপে এই বেদের সমুদ্ধার ভগবান করিয়া আসিতেছেন বার বার। প্রেম এই বেদের মন্ত্র, জ্ঞান এই বেদের ব্রাহ্মণ ; 'তুমি' এই বেদের দেবতা, 'আমি' এই বেদের ঋষি, সেবা এই বেদের ছন্দঃ, ত্যাগ এই বেদের ঋক্, প্রেম এই বেদের সাম এবং জীবন এই বেদের যজুঃ। হে ত্রয়ি সনাতনি ! তোমার বরেণ্য ভর্গঃ আমাদের পৃথিবীর অশান্ত ধীবৃত্তিগুলিকে আবার শুভ বাসনায় বিনিয়োগ করুন, সে তোমার প্রসাদ পাইবার আশাতেই সম্প্রতি যে রক্তগঙ্গায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে। তাহার আশা কি সফল হইবে ? ভারতের মহাকাল মন্দিরের পূজারি ভারতের অন্তরাত্মা ; তাহার নিদ্রালস নেত্রে আবার তোমার জ্ঞানাঞ্জন বিলেপিত হউক ; সে উঠিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দেখুক, আজ নিখিল বিশ্বের অন্তস্তলে তাহারই মন্দিরাভিমুখে তীর্থযাত্রায় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; বিশ্বমানব যে দিন শ্রদ্ধার নৈবেদ্য মাথায় বহিয়া আনিয়া তাহার মন্দিরের চারি ধারে ঘেরিয়া দাঁড়াইবে, সে দিন, হে প্রাচীন পূজারি ! তুমি যেন সজাগ থাকিও, তোমার সেই সিন্ধু-সরস্বতী-স্তন্য-পীযূষাভিষিক্ত সামগানে অভ্যস্ত কণ্ঠস্বর সম্পদে ও ছন্দোবৈভবে যেন অকুণ্ঠিত থাকে ; তোমার দেবতার প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে বিশ্বমানবের নৈবেদ্য যেন সার্থক হয় ; তোমার ধীরোদত্ত আশীর্ব্বাণী যেন বিশ্বমানবের প্রাণে অভয় ও আশ্বাস আনিয়া দেয়। তোমার মন্দিরাভ্যন্তরের এক কোণে যে বর্ত্তিকাটি তুমি এতকাল ধরিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছ, তাহাই তোমার আশার বর্ত্তিকা, তাহাই তোমার প্রাচীন স্বারাজ্যের অবশেষ এবং ভাবী স্বারাজ্যের ভরসা। সাগ্নিকের অগ্নির মত তাহা তোমায় নিরলস ও অকুণ্ঠিত ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। তোমার ঐ মন্দিরের আলো যদি নিবিয়াই যায়, তবে হে মন্দভাগ্য পুরোহিত ! রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্যের মিথ্যা গৌরব ও বাহ্য সম্পদের তুচ্ছ চাকচিক্য তোমার অন্ধকারকে স্বচ্ছ করিয়া দিবে না। তোমার প্রকৃত স্বারাজ্যের বিনিময়ে যদি তুমি শুধু রাষ্ট্রীয় স্বারাজ্য ও বাহ্য সম্পদ পাও, তবে তাহাতে

স্বারাজ্য ও সম্পদকে উপহাস করা হইবে মাত্র। কারণ যে স্বারাজ্যে সাম্বতা নাই এবং সে সম্পদ শ্রেয়ঃ পদবীকে আশ্রয় করে না।

শিক্ষার লক্ষণ এক কথায় যেমন স্বারাজ্য, স্বারাজ্যের লক্ষণ এক কথায় তেমনই শক্তি। অশক্তের স্বারাজ্য হয় না। বলহীনের দ্বারা আত্মা লভ্য হয়েন না। প্রেমের স্বারাজ্য ও জ্ঞানের স্বারাজ্য, এ দুইটারই গোড়ার কথা শক্তি। বালকের রোদনই বল, কিন্তু বল ত বটে। যে কাঁদিয়া জিতিয়া যাইতেছে, সে জিতিয়াই যাইতেছে, হারিয়া যাইতেছে না। প্রেমের জয়ও জয়। শুধু ইহাই নহে, প্রেমের জয়ই জয়। যে ভালবাসিল কিন্তু জিতিতে পারিল না, তার এখনও ভালবাসা হয় নাই। সে নিজের তুচ্ছ অভিমান ও স্বার্থের কাছে এখনও বিজিত হইয়াই আছে। অহেতুক প্রেমের, রাগাত্মিকা ভক্তির কোথাও কোন অবস্থাতেই পরাভব নাই। কোনও একজন ধনুর্দ্ধরের ভুবনবিজয়ী ও দুর্নিবার বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু চালাকি করিতে গিয়া হর কোপানলে তাহাকে ভস্মত্ব পাইতে হইয়াছিল; এইখানে তাহার পরাভব। কিন্তু যে প্রেমের কথা আমরা ভাবিতেছি, তাহার পূজায় মহাদেবের মহাসমাধি ত ভাঙ্গিয়াছিলই, অধিকন্তু যেদিন সেই প্রেমের শব-প্রতিমা খানিকে স্কন্ধে করিয়া 'পাগল শিবপ্রমথেশ' এই মহা বিশ্বের পরতে পরতে কাঁদিয়া ফুকরাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সেদিন স্বয়ং চক্রীর সুদর্শনচক্র সতীকলেবর জগতের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া সতীনাথের শোকভার কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু জগৎটাকে এমন একটা মহাপীঠ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে আমাদের মত অপ্রেমিক অভাজনকে এই পুণ্যক্ষেত্রে অতি সঙ্কোচে পা বাড়াইয়া চলিতে হয়—পাছে কোনও ভক্তের জবাপুষ্পাঞ্জলি আমাদের অসতর্ক পদস্পর্শে অপমানিত হইয়া পড়ে। অতএব মৃত্যুতে প্রেমের পরাভব নাই। আলেকজান্দারের, সিজারের অথবা নেপোলিয়নের বিজয়-অক্ষৌহিণী যাহা গড়িতে পারিয়াছিল তাহা ত ভাঙ্গিয়াই ছিল; কিন্তু বুদ্ধের, খৃষ্টের, অথবা গৌরাঙ্গের প্রেম যাহা গড়িয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার ভিত্তি মানবাত্মার ভিতর সুস্থির রহিয়াছে, তাহার সাম্রাজ্য আস্তীর্ণ করিয়া রাখিতে পৃথ্বী বিপুলতরা হইলেও চলিত এবং তাহার বিজয়নিশান বহন করিয়া লইতে কালবক্ষ আরও নিরবধি হইলেও মন্দ হইত না। দন্তে তৃণ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ হইয়া, প্রেমিক রাজরাজেশ্বরের দুয়ারে শিক্ষার জন্য আসিয়া দাঁড়াইল, রাজরাজেশ্বর তাহাকে তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারটা ঢালিয়া দিয়া ত পার পাইবেন না; তাঁর নিজেকে তার কাছে বাঁধা দিতে হইবে যে। যে ঐশ্বর্য্য চায় তাকে ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিলেই সে ফিরিয়া যায়; কিন্তু যে মাধুর্য্য চায়, আমাকে চায়, তার কাছে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, আমাকেই তার কাছে ধরা দিতে হইবে এবং সে আমার কাছ হইতে ফিরিবার নামটি করিবে না। যে ঐশ্বর্য্যের ভিখারী সে ঐশ্বর্য্য পাইয়া আমার গোলাম হইল, আর যে মাধুর্য্যের ভিখারী, তার কাছে ভিক্ষা দিতে গিয়া, আমিই তার গোলাম হইয়া বসিলাম। যে আসিয়া ধন-দৌলত চাহিয়াছে, তাহাকে আমার খাজাঞ্চিখানায় পাঠাইয়া দিয়া আমি খালাস, কিন্তু যে আমাকেই দেখিতে আসিয়াছিল, তার জন্য যে এই বর্ষার নিরালা বাসরে প্রাণের ফাঁকাটার ভিতর হইতে থাকিয়া থাকিয়া একটা করুণ-সুর উঠে—"মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর।" অতএব প্রেমের স্বারাজ্যের দাপট বড় কম নয়। জ্ঞানের স্বারাজ্যের কথা আর না হয় নাই বলিলাম। কথাটা দাঁড়াইল শক্তি। যে সুপর্ণ-পক্ষীটার খবর আমরা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি, তার জ্ঞান ও প্রেম, এই দুইটা পক্ষপুট; এবং সেই পক্ষপুটের—বিস্তার ও সঞ্চালন যেটাকে পাইয়া হয়, তাহাই হইল শক্তি। শক্তি নহিলে পক্ষপুটের ব্যবহারও নাই, প্রয়োজনও নাই।

শক্তির প্রয়োগ কোথায় বা কাহার উপরে? মানুষের একটা ভিতর একটা বাহির। বাহিরের যেমন নানান্ থাক্, নানান্ বৈচিত্র্য, ভিতরেও তেমন। ভিতরে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, হৃদয়, আত্মা; ইহাদের নানা সংস্কার, নানা বৃত্তি, নানা চেষ্টা। বাহিরে শরীর, সমাজ, প্রাণীজগৎ ও জড় প্রকৃতি। এই সমস্তগুলিকে জড়াইয়া লইয়া, এবং এইগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া, যেটা রহিয়াছে সেইটাই পূরা মানুষ। প্রেমেই হউক, আর জ্ঞানেই হউক, মানুষকে

নিজের এই ষোল আনা বুঝিয়া লইয়া দখল করিতে হইবে। এই দখল সাব্যস্ত করিতে শক্তি চাই; এবং দখল সাব্যস্ত হইবার নামই স্বারাজ্য। কেহ জগতের দ্বারে দ্বারে নিজেকে ধরা দিয়া জগৎকে স্বীকার করিয়া যাইতেছে; কেহ বা জগৎটা নিজের ধ্যানের মধ্যেই টানিয়া লইয়া তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার ভিতরে বা বাহিরে কিছু বা কেহ, অস্বীকৃত হইয়া, পর হইয়া থাকিল, ততক্ষণ আমি একটা চৌহদ্দীর ভিতর বাঁধা পড়িয়া থাকিলাম—অন্ন, কৃপণ ও কুণ্ঠিতই রহিয়া গেলাম, এ অবস্থায় আমার ছুটি নাই।

নিজের ভিতর শক্তি জাগাইব কি উপায়ে? ক্ষুদ্র আমিত্বের বোঝাটুকু বহিতেই আমার শক্তিটুকু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আমি, জ্ঞানের সম্পর্কেই হউক, আর প্রেমের সম্পর্কেই হউক, এতবড় জগৎটাকে আবাহন করিয়া আনিয়া আমার অন্তরাত্মার সিংহাসনে বসাইব কোন্ সাহসে? এত অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে বরণ করিয়া লইয়া যেদিন পাদ্যার্ঘ্য যোগাইতে হইবে সেদিন কি আমার ভৃঙ্গার নিত্য পূর্ণ করিয়া রাখিবার জন্য একটি একটি করিয়া বাহিরের শিশির কুড়াইয়া আনিব? অথবা আমারই ভিতরে এমন কোন রুদ্ধ উৎস উপেক্ষিত অনাবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়া আছে, যেটিকে কোন উপায়ে একবার বহাইয়া লইতে পারিলে, আমার ভৃঙ্গার ত ভরিবেই, অধিকন্তু তার স্নিগ্ধ অনাবিল প্রবাহ আমার বিশ্বনারায়ণের পাদমূলে স্বচ্ছন্দে গড়াইয়া আসিয়া ধন্য হইবে? আমি ছুটিব তবে কোন্ দিকে? কোথায় আমার পাদ্যার্ঘ্য, কোথায় আমার নৈবেদ্য, কোথায় আচমনীয়, কোথায় দক্ষিণা? বাহির হইতে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে অথবা নিজেরই অন্দরের ঠাকুরঘরে আমার কোন আপন জন পূজার সব আয়োজন প্রস্তুত রাখিয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, কখন আমি স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিয়া তার দুয়ারে করাঘাত করিব? ছুটিয়া বেড়ান পশ্চিমের হাল ব্যবস্থা, আর হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দেওয়া আমাদের সাবেক ঘরওয়া ব্যবস্থা। ভাল কোন্টা, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কি? মহাদেব যেদিন কৈলাসপর্ব্বতে মহাধ্যানে বসিয়াছেন, আর নন্দীর শাসনে মুখরা চঞ্চলা প্রকৃতি যেন চিত্রার্পিতবৎ হইয়া রহিয়াছে, সেদিন আমরা দেখিতেছি জ্ঞানের স্বারাজ্য। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্। এ ক্ষেত্রের বাহিরে ত ছুটাছুটি নাই-ই, বরং সমস্ত বাহিরটা ভিতরের শাসনে আত্মসমর্পণ করিয়া সুস্থির রহিয়াছে। আর যে দিন গৌরাঙ্গ 'শান্তিপুর ডুবু, ডুবু' রাখিয়া—'ন'দে ভাসাইয়া' অযাচকে প্রেম বিলাইয়া ফিরিতেছিলেন, সে দিন তাঁর বাহিরে ছুটাছুটি ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শিশির কুড়াইয়া ভাণ্ড ভরিবার ছুটাছুটি নহে, সে যে জলভারাবনত আষাঢ়ের নব মেঘের পৃথিবীর সন্তপ্ত ধূলিরাশির মাঝে নিজেকে ঢালিয়া দিবার পুণ্যাভিসার। সে যে আসলে আহরণ নয় বিতরণ, বিতরণের জন্যই আহরণের ভঙ্গী।

স্বারাজ্যের কথা শক্তির কথা বলিয়া সকল প্রকার ক্লৈব্যকে আমাদের পরিহার করিতে হইবে—ভাবনায় ক্লৈব্য বিশেষতঃ। যাঁহারা শিক্ষায়, দীক্ষায়, অনুষ্ঠানে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার কথা বলেন, দেশের ও জগতের হাওয়া বুঝিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করার পরামর্শ দেন, আমি যেটি চাহিতেছি বিনা ওজড়ে আমার মুখের কাছে তাহাই যোগাইয়া দিতে চাহেন, তাঁদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাসিতে চাহিলে ভাসিয়া যাওয়াই হইবে, রহিয়া বসিয়া যাওয়া হইবে না; যাহারা ভাসিয়া চলিল, প্রকৃতির বিচার তাদের জন্য এমন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সেখানকার নীরব, বিপুল অন্ধকারে গণনাতীত দুর্ব্বল, ভরসাহীন, বিশ্বাসহীন, আদর্শহীন জাতি নিজেদের সকল চিহ্ন ও সকল কাহিনী হারাইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দর জিনিষটাই চাহিতে শেখান; সকল সাধনার লক্ষ্য হইবে সেই বাঞ্ছিত পদার্থটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে মানুষকে মিলাইয়া দেওয়া। যেটী চাহিতেছি সেটাকে পাইবার শক্তি দেওয়াই দেওয়া নহে; চাহিবার মত জিনিষকে চাহিবার শক্তি দেওয়াও দেওয়া।

কাজ করিবার জন্য একপ্রকার বড় কথা আছে, আবার কাজে ওজড় করিবার জন্য আর এক রকমও আছে। যে বড় কথা পাড়িয়া কাজে ঢিল দিল বা কাজ হইতে সরিয়া

পড়িল তার দুর্ব্বলতার বরং ক্ষমা আছে; কিন্তু ভণ্ডামির ত ক্ষমা নাই। স্বারাজ্যের শেষ ভূমিতে আমরা সকলে হাত ধরাধরি করিয়া প্রবেশ করি, আর আগু পিছু হইয়াই প্রবেশ করি, দীর্ঘ যাত্রার পথে যে আমরা সকলে সমান তালে হাঁটিতেছি না সে পক্ষে সন্দেহ আছে কি! বিশ্বমানবের পাঠশালায় কাহারও হাতে শিশুশিক্ষা কাহারও হাতে ব্যাপ্তিপঞ্চক দেখিলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কেহই স্বারাজ্য পায় নাই, সুতরাং সকলেই সমবস্থ; কেহই নিজের বর্ত্তমান ব্যাপারে তুষ্ট নয়, অতএব সকলের বর্ত্তমান অবস্থা তুল্য; এইরূপ বড় কথায় যে ছোট বড় সকলকে টানিয়া সমান গোত্র করিয়া দিবে তার ঠিকে ভুল হয়ত হইতে পারে, কিন্তু একথা পাড়িয়া যদি সে কেবল ছোটকেই একটা মিথ্যাভিমানেই মগ্ন করিয়া রাখিতে চায়, সত্যসত্যই বড়র কাছে আসিবার চেষ্টা হইতে ফিরাইয়া দিতে চায়, তবে তার সে কপটাচারের ত ক্ষমা নাই।

তপস্তা দ্বারা অমৃতের ভজনা করা হয়, মৃত্যুর নহে। স্বারাজ্য সিদ্ধিই ধ্যানের ফল, নৈষ্কর্ম্ম্য ও দীনতা নহে। সকল অসামঞ্জস্তকে সামঞ্জস্ত দিবার জন্য, সকল খণ্ডিতকে সমগ্র ও পূর্ণ করিয়া লইবার জন্য, সকল পরবশকে আত্মবশ হওয়াইবার জন্তই তপস্তা ও ধ্যান। বাহিরের সকল উদ্যম ও অনুষ্ঠান আমাদিগকে সচল করিয়া রাখিতেছে, কিন্তু এ সচলতা কল্যাণের অভিমুখে হইবে না, অমৃতের অভিমুখে হইবে না, অমৃতের অন্বেষণে হইবে না, প্রতিষ্ঠার জন্যই হইবে না, যদি ইহার প্রেরণা ও উপদেশ আমাদের ভিতরকার অচলায়তনের বাস্তুদেবতাটির কাছ হইতে না আসে। আমি চলিতেছি কিন্তু আমার দৃষ্টি যদি লক্ষ্যে স্থির না রহিল, আমার পদবিক্ষেপের নিম্নে পথ যদি ব্যবস্থিত ও সুস্থির হইয়া না থাকিল, তবে আমার চলার পরিণাম কোথায়, সার্থকতা কিসে? সমরক্ষেত্রে একটা বিপুল বাহিনী অভিযান করিয়াছে, কিন্তু তাহার বিপুলতা, সাহস ও শৌর্য্য তাহাকে ধ্বংস হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে না, জয়শ্রী আনিয়া দিবে না, যদি তার সকল কোলাহল ও চাঞ্চল্য হইতে দূরে, সেনাপতি তার পরিচালনার সব সূত্রগুলি, নিজের ধ্যানের মধ্যে একত্র ও সম্বদ্ধ করিয়া না লন। আমাদের পৃথিবীর ও গ্রহউপগ্রহগুলির মহাশূন্যে যে অভিযান তাহাতে শৃঙ্খলা ও অভয় থাকিত না, যদি সবিতার কেন্দ্রাকর্ষণ তাহাদের জন্য একটা পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিত। সকল সফলতায় সিদ্ধি ও অভয় দিবার জন্য এমন কিছুর উপদেশ ও পরিচালনা আবশ্যক, যেটি নিজে ধীর ও নির্ভয়। সেই অচল ও অভয়ের ভূমিতে দাঁড়াইবার জন্য যেটি চাই—তাহাই তপস্তা—তাহাই ধ্যান। অমৃতের পুত্রই অমৃতলাভ করিবে। সচল ও অচলের মধ্যে, কর্ম্ম ও ভাবনার মধ্যে, যোগ ও ক্ষেমের ভিতরে, মৃত্যু ও অমৃতত্বের মাঝখানে যেখানে মিল হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইয়া গেল সেইটাই স্বারাজ্য ভূমি, তাহাই শিক্ষার সাফল্য। তপস্তার বাড়াবাড়ি করিয়া কেহ কখনও ঠকে নাই—আমাদের ভারতবর্ষও নহে। আমরা ইতিহাস ভুল শিখিয়াছি।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

মাসিক কাব্য সমালোচনা।

মালঞ্চ—চৈত্র। প্রেমাশ্রু—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার ।। কবিতার বিষয় শোকোদ্দীপক তাহা নামেই বুঝা তেছে। ৪০ পংক্তি কবিতাটীর মধ্যে মাত্র দুইটী পংক্তি উল্লেখযোগ্য, অবশ্য তাহারও ভাব পুরাতন।

সৌদামিনী খেলে গেল, র'ল শুধু অন্ধকার
বুকফাটা আর্ত্তনাদ দীর্ঘশ্বাস ঝটিকার।

বিদ্যাপতির—

"ভাল ক'রে পেখন না ভেল
মেঘমালা সঙে তড়িৎ-লতাজনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

এ কটি কথা তড়িতের ন্যায় মনে আসে।

আর দুটী পংক্তি—

"জন্মান্তরে তুমি আগে প্রেমের আলোক জ্বালি
মোর তরে রহিবে কি সাজায়ে বরণডালি"

রবীন্দ্রনাথের—

"হে কল্যাণি, গেলে যদি, গেলে মোর আগে
মোর লাগি কোথাও কি দু'টী স্নিগ্ধ করে
রাখিবে পাতিয়া শয্যা চির-সন্ধ্যা তরে"

ও

"মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
ব'সে আছ বাতায়ন প'রে
জ্বালায়ে রেখেছ দীপখানি
চিরন্তন আশায় উজ্জল।"

এই সকল পংক্তিগুলি মনে পড়ায়।

"এ জনমে আগে আমি প্রেমদীপ জ্বেলেছিনু
সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করি তোমা ভালবেসেছিনু"

ইত্যাদি পংক্তি বড়ই নিস্তেজ ও নীরস। "ভবিতব্যতা" ও "সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য" দুইটী চতুষ্পদী কবিতা। ১মটী—শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণ তীর্থের। ২য়টী—শ্রীনরেন গাঙ্গুলী। কবিতা দুইটীর নাম শুনিয়া পাঠক মনে করিবেন কি গভীর তত্ত্বই না শ্লোক দু'টীতে নিবদ্ধ আছে। যেমন নামের শ্রী তেমনি রচনার সৌষ্ঠব।

ভবিতব্যতা যথা—

যাহা হইবার ভবে সদা তাহা হ'বে
কাননে কুসুমকলি প্রস্ফুটিত রবে
হয় না কখনো তাহা যা' হবার নহে
আকাশে কুসুম গুচ্ছ ফুটিয়া না রবে।"

(সৃষ্টি ও সৌন্দর্য্য) যথা—

"ভ্রমে নর বনে ও কান্তারে
দেখে বিশ্বে কি শোভা অপার
পর্ব্বত-কন্দরে রুদ্ধ বসে মৌনী ধ্যানী
নয়ন সম্মুখে দেখে সৌন্দর্য্য স্রষ্টার

১ম ২ পংক্তিতে ১০+১০ অক্ষর, ২য় পংক্তিদ্বয়ে ১৪+১৪ অক্ষর। জিজ্ঞাসা করি এ বিড়ম্বনা কেন? তীব্র সমালোচনার সম্মার্জ্জনী ব্যতীত এ সকল জঞ্জাল বঙ্গ সরস্বতীর মন্দির হইতে পরিষ্কৃত হইবার অন্য উপায় নাই। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বৈদ্যনাথ বাবু আপনার পৈতৃক উপাধি ত্যাগ করিয়া পরীক্ষার দ্বারা উপার্জ্জিত উপাধি ব্যবহার করেন কেন? হীরেন বাবু কি তাঁহার নিজের নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত না লিখিয়া হীরেন্দ্রনাথ এম, এ, বি, এল লিখিবেন। আর কবি (?) শ্রীনরেন গাঙ্গুলী নিশ্চয়ই শ্রীনরেন্দ্রনাথ (বা কৃষ্ণ বা কুমার) গঙ্গোপাধ্যায়—তিনি আপনাকে নরেন গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন কেন? লোকে তাঁহাকে যাহা বলিয়া ডাকে তাহাই কি নিজের রচনায় নীরব ব্যবহার করিতে হইবে?

শ্রীঅভিলাষচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহোদয় 'প্রাপ্তি সাফল্য'

কবিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই, ছন্দটিকে শ্রোত্র-রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ছন্দঃশাস্ত্রে পারদর্শিতার অভাবে অলয় ও প্রতিপদ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

"পুষ্পিত শাখীকুঞ্জে
অবিরল অলিগুঞ্জে"

ইহাতে ছন্দের যেটুকু মর্য্যাদা আছে—

"যৌবন মধুর গন্ধ
জবারে করেছে অন্ধ" অথবা
"বিপুল বিভব তুচ্ছ
এ যে প্রাপ্তি মহা উচ্চ"

এ চারি লাইনে তাহা নাই। তারপর

"নৃত্য পুলকে হেসে যায় হাসি ব্যাকুল রোদন মাঝে
বন্দে জনম মধুর ছন্দে মৃত্যু নয়নাসারে"

ইত্যাদি পংক্তি ভাল করিয়া বুঝাও যায় না।

'বাসনা শান্ত আসন প্রান্তে দান্ত পরাণহীনা' অণুপ্রাস বাহুল্য সত্ত্বেও শ্রুতিকটু।

নন্দিনী—বৈশাখ। "নিবেদন"—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

"৺নবীনচন্দ্র"—সম্পাদক রচিত। রঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে কবিবরের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রচিত ও পঠিত। কবিবরের প্রচারিত মন্ত্র সম্বন্ধে সম্পাদক বলিয়াছেন—

"ভারত জগৎ নহে, নহে ঐ পারাবার
এ জগৎ সীমা, আছে অন্য পারে তার
অনন্ত বিস্তৃত রাজ্য মোদের কর্মভূমি
তব নবধর্ম্ম তথা করিব প্রচার।"

"প্রতীক্ষায়"—শ্রীমতী নির্ম্মলহাসিনী দেবী রচিত। কবিতার—"সুতীব্র মন্দির" "বিফলিয়া" ইত্যাদি ২।১টী শব্দ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ্যের বস্তু নাই।

অর্চ্চনা—বৈশাখ। 'দয়াল'—শ্রীসতীশচন্দ্র বর্ম্মণ রচিত। কবিতার বিশেষত্ব বিন্দুমাত্রও নাই। এমন দুর্ব্বল মিল কোথাও আজকাল দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

"সহসা এসে বালক এক তাহার লাঠি ধরিল
আমার সাথে এসগো চলি মধুরস্বরে কহিল।
অন্তরবাণী ভিখারী শুনি বলিল "ডাক শুনেছ?
কে তুমি বাছা এমন ঝড়ে পথের মাঝে এসেছ!"
বালক বলে "অভয় আমি দুঃখীর ঘরে রহিয়া
বেড়াই ঘুরি সারাটী গ্রাম ছুটিয়া কভু খেলিয়া
কাঁদিয়া দুখী বলিলে ধরি' আবেগে গলে' যাইল
ভকতিভরে দয়াল বলি লুটিয়া ভূমে পড়িল।"

এই ত কবিতার নমুনা। ইহা গদ্য না পদ্য? অর্চ্চনার অন্যান্য রচনাগুলি মন্দ নয়। কিন্তু কবিতায় দানসত্রের দিনে অর্চ্চনায় ভাল কবিতার এত দুর্ভিক্ষ কেন?

পর্ণকুটীর—শ্রীসুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

"হেথা—কাণের কাছে লেগেই আছে
শ্রান্ত পথিক সুর"

আদৌ সুন্দর নহে।

"হেথা—চমক ভাঙ্গে বৃক্ষে যদি
একটী পাতা ঝরে।"

এ পংক্তিটী মন্দ নহে। বাকী সবই দুর্ব্বল।

সন্দেশ—বৈশাখ। "নিরুপায়।" মন্দ নহে তবে "ছিঁচকাঁদুনে" কবিতাটাই সব চেয়ে সুন্দর হইয়াছে এমন সুন্দর মিল আজকালকার ও কোনো কবির কবিতা দেখা যায় না। কবিতার বিষয়োপযোগী এমন সুন্দর বাক্য চয়ন খুব কমই দেখা যায়। কবিতাটির কতকাংশ তুলিয়া দিতেছি—

ছিঁচকাঁদুনে মিচ্‌কে যারা শস্তা কেঁদে নাম কেনে
ঘ্যাঙায় শুধু ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানঘেনে আর প্যানপেনে
ফুঁপিয়ে কাঁদে ক্ষিদের সময় ফুঁপিয়ে কাঁদে ধমকালে
কিংবা হঠাৎ লাগলে ব্যথা কিম্বা ভয়ে চমকালে
ইত্যাদি

কাঁদবে না সে যখন তখন রাগ্‌বে কেবল রাগ পুষে
কাঁদবে যখন খেয়াল হবে খুন কাঁদুনে রাক্ষুসে

* * * * *

বাপরে, সেকি লোহারবালা? এক মিনিটও শান্তি নাই
কাঁদন ঝরে শ্রাবণ ধারে ক্ষান্ত দেবার নামটি নাই।

ঝুমঝুমি দাও পুতুল নাচাও মিষ্টি খাওয়াও একশোবার
বাতাস্ কর চাপড়ে ধর ফুটবেনাক হাস্ত তার।
কান্নাভয়ে উল্টে পড়ে কান্না ঝরে নাক দিয়ে
গিলতে চাহে দালান বাড়ী হাঁখানি তার হাঁক দিয়ে।

ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ—আষাঢ়। রথযাত্রা—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—কবিতার ছন্দোবন্ধে কোন দোষ নাই—মাঝে মাঝে কবিত্বও আছে—তবে কবির নিকট এই প্রসঙ্গে যে সকল কথা শুনিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম—সে সকল কথা শুনিতে পাইলাম না। শৌরীন বাবু কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে ক্রমেই সাফল্য লাভ করিতেছেন—ভরসা করি কালে তিনি জয়যুক্ত হইবেন।

'মিলন গীতি'—শ্রীমহম্মদ মোজাম্মেল হক্। কবিতাটিতে কবিত্ব কিছুই নাই—কবিতাটিতে বহুবার ছন্দঃপতন হইয়াছে। কবি "সুযশঃ" লিখিয়া ভাষার বিশুদ্ধি সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু ছন্দের বিশুদ্ধির বিনিময়ে আমরা এরূপ ভাষা-বিশুদ্ধি চাহি না।

"মস্‌জিদে আজ ভায়ের মিলন
মন্দিরেও প্রেমালিঙ্গন"

হিন্দু-মুসলমানের এই মিলনের কথা বড়ই সুখের বটে কিন্তু গদ্যাত্মক ও শ্রুতিকটু। কবি এই ভাবটী মধুর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে সোনায় সোহাগা হইত।

"তোমার রাম সীতা
ভীম যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্য
মহাভারত গীতা
ও ভাই মহাভারত গীতা
তোমায় শুধু জানব ব'লে
পড়্‌ছি মোরা কুতূহলে
বল্‌তে পারি কে কার স্বামী
কে কাহার বা পিতা
ও ভাই কে কাহার বা পিতা"।

ইহা কবিতায় একেবারে অচল। হিন্দুকে চিনিবার জন্য কবি "ভীম যুধিষ্ঠির মহাভারত গীতা" পড়িতেছেন এবং বলিতে পারেন "কে কার স্বামী এবং কে কার পিতা" ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহা কবিতায় বড়ই বিশ্রী শুনাইতেছে সমগ্র কবিতার মধ্যে এই শ্লোকটী বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছে।

কবিতাটী কবিতা হিসাবে একটুও প্রশংসনীয় হয় নাই তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে কবিতাটির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। হিন্দু মুসলমানের মিলন সঙ্গীতে বঙ্গ সাহিত্য-মন্দির যত মুখরিত হয় ততই ভাল কবির বক্তব্য বিষয় সবই সত্য—

একই মায়ের স্তন্য পিয়ে
আমরা দোঁহে আছি জিয়ে

ইহা পরম সত্য। বঙ্গ সাহিত্যের যে সকল লেখক হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য লেখনী ধারণ করিতেছেন কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেই। মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক মহোদয় সেজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ইনি একজন সুকবি বলিয়া আমরা জানি—সেজন্য তাঁহার কবিতায় অপ্রত্যাশিত দোষগুলি দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি।

"সাহিত্যসংস্কার" নামক প্রবন্ধে শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ, মাইকেল হেমচন্দ্র ভারতচন্দ্র ইত্যাদি কবির রচনায় অনুকরণ করিয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছেন। কবিবরের হেমচন্দ্রের ও মধুসূদনের অনুকরণ বেশ সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু লেখক এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র ভক্ত কবিগণকে যে ব্যঙ্গ করিয়াছেন তাহা সুরচিত হয় নাই বলিয়া উপভোগ করিতে পারিলাম না। মোটের উপর প্রবন্ধটিতে বেশ রস জমিয়াছে। হেমচন্দ্রের মুখ দিয়া লেখক বলাইয়াছেন—

এখন সেদিন নাহিক রে আর
শিষ্ট মিষ্ট বোলে সাহিত্য সংস্কার
হবেনা হবেনা খোল তলোয়ার।
এ সব কবিরা নহে তেমন

এ তলোয়ারের ব্যবস্থা "ভারতবর্ষে"র কবিদেরই আগে হওয়া বাঞ্ছনীয়। পঞ্চভূত।

"নিবেদিতা"।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী প্রণীত। ১নং মুখার্জ্জীর লেন বাগবাজার উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। এই পুস্তিকাখানি যে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে যথেষ্ট আদরণীয় হইয়াছে তাহা অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তিকাখানির চারিটী সংস্করণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা পুস্তিকাখানি আদ্যোপান্ত আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, এবারও লেখিকা স্থানে স্থানে আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিতে ত্রুটী করেন নাই।

ভূমিকায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজী লিখিয়াছেন, "সিষ্টার নিবেদিতার পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের সহিত বর্ত্তমান গ্রন্থকর্ত্রীর এককালে এমন বিশেষ সম্বন্ধ ছিল যে, তাঁহাকে নিবেদিতার ছাত্রীদিগের অন্যতমা বলা যাইতে পারে। সেজন্য নিবেদিতার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা আজি লিখিলেও তাঁহার দৈনন্দিন অন্তর্জ্জীবনের মহত্বের চিত্র ইনি যে ভাবে অঙ্কিত করিতে সমর্থা হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে ঐরূপ করিতে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।" সত্যই অসীম শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ প্রাণ-ঢালিয়া লেখিকা তাঁহার নিপুণ তুলিকা সহায়ে নিবেদিতার জীবনের আলেখ্যখানি অতি মনোরমভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। যদিও এই পুস্তিকাখানিতে নিবেদিতার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলীর সমাবেশ নাই তথাপি লেখিকা নিবেদিতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা হইয়া যাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন তাহা সরল, সংযত অথচ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বাগবাজারের ক্ষুদ্র বালিকা-বিদ্যালয়টীকে বুকে করিয়া নিবেদিতার লোকলোচনের অন্তরালে ভাবী জননীগণকে ভারতীয় আদর্শে গড়িয়া তুলিবার সুমহান্ প্রয়াস,—সেবাব্রতধারিণী সাধিকার অসীম উদ্যম ও অগাধ বিশ্বাস, অনুপম গুরুভক্তি,—দুঃখ, দৈন্য, ব্যর্থতার আঘাতেও অবিচলিত থাকিয়া নিঃশব্দে কর্ত্তব্যপালন, দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সম্পূর্ণ ভ্রূক্ষেপহীন,—স্নেহবিগলিতা জননীর মত স্নিগ্ধ ক্ষমা লইয়া প্রত্যেক ছাত্রীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ইতিহাসবিশ্রুত চিতোর নগরে প্রস্তরোপরি জানু পাতিয়া পদ্মিনী দেবীর ধ্যান,—ইত্যাদি চিত্রগুলি লেখিকার সুযোগ্য লেখনীমুখে এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিতে গিয়া আমি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই।

"বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যের জন্যই পুস্তক লিখিবার অধিক প্রয়োজন হইত। ঐরূপ পরিশ্রম করিয়াও মাঝে মাঝে যখন খরচের টানাটানি পড়িত তখন নিজের সম্বন্ধে কোন খরচটা কমাইতে পারা যায়, সেইদিকেই অগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত এবং নিজ শরীর পোষণে যে যৎসামান্য ব্যয় তাহাও যেন তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিত।

ফলে শারীরিক অনিয়মে তাঁহার শরীর দিন দিন রক্তহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনে যাইতে হইত।" * * * পড়িতে পড়িতে লেখিকার সহিত সমস্বরেই বলিতে ইচ্ছা হয়—"নিবেদিতা আর নাই! কিন্তু অর্দ্ধাশনে, অনশনে থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে যে একমাত্র জাতীয়-রমণী-বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, এখনও কি দেশবাসীর তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার অবসর ঘটিবে না?"

মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিস্ নোবল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভারতের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরম আত্মনিবেদন নিবেদিতা নাম স্বার্থক করিয়া যে মহনীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, সেই আদর্শের জীবন্ত প্রতিমাখানির সম্মুখে মস্তক নত করিয়া লেখিকা ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও যাহাতে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন এই প্রশংসনীয় দায়ীত্ববোধ হইতেই যে লেখিকা পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি লেখিকার চোখের জল দিয়া লেখা—বাস্তব জীবনের মহিমা-সমুজ্জ্বল করুণ-কাহিনী। ইহার ভাষা সরল, সতেজ, আড়ম্বরহীন; মহত্বকে বুঝিবার ও বুঝাইবার মত তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও হৃদয়ের দ্বারা অনুপ্রাণীত, আধুনিক যুগের নাটক নভেলের দুর্ব্বহ ভার ঠেলিয়া যে পুস্তকখানি চতুর্থ সংস্করণে পদার্পণ করিতে পারিয়াছে—ইহাই তাহার কারণ। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং সাগ্রহের সহিত আশা করিতেছি, লেখিকা সত্বরই ভগ্নী নিবেদিতার একখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে [illegible] অধিক যশস্বিনী হইবেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সূচীপত্র

আশ্বিন—১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ—ছাত্রগণের জন্য স্বল্পমূল্যে উপাসনা বিতরণ করা হইবে। সত্বর নাম রেজেষ্টারী করুন—অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিব। পুরাতন উপাসনা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gouranga Press,

[illegible] Mirzapur St. Calcutta

Published by Pulin Behary Dass,

11 College Square Calcutta

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষশয়নের সাগর-সৈকত।

১৫শ বর্ষ } আশ্বিন—১৩২৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আলোচনী।*

লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান।

ভারতবর্ষের যে অধ্যাত্মবোধ একের মধ্যে এক ও একের মধ্যে বহুকে চিনিয়াছে তাহা নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আমাদের জনসাধারণের ধর্ম্ম ও অধ্যাত্ম-জীবনকে একটা বিশিষ্ট ছাঁচ দিয়াছে। বাহিরের পূজা অনুষ্ঠান যে ভাবের হউক না কেন, গ্রামের লোক, কৃষক বা শিল্পী রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, শিব, ভগবতী যাঁকে পূজা করুন না কেন সে জানে যে ভগবান্ এক, তাঁর যে নামই দেওয়া হউক না কেন।

উত্তর ভারতে আমরা গ্রাম্য দেউলের মধ্যে সাধারণতঃ রাম লক্ষ্মণাদি, বিষ্ণুর অবতার, মহাদেব এবং বিভিন্ন শক্তি-মূর্ত্তির পরিচয় পাই। তাহা ছাড়া আরও অনেক দেবতা আছেন যাঁদেরকে গ্রামবাসীরা পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। প্রত্যূষে যখন কৃষক তাহার শয়নকক্ষের চৌকাটটি পার হইয়া দাঁড়ায়, বালার্কের প্রথম কিরণ যখন তাহার নিদ্রাজড়িত চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, তখন সে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া প্রার্থনা করে,—হে সূর্য্যদেব, তুমি আমায় সৎপথে রাখিও। যখন সে নদী অথবা পুষ্করিণীতে অবগাহন করে তখন তাঁহারই উদ্দেশে আবার সে অঞ্জলি দেয়। নদীও তাহার নিকট পূজার পাত্র। গঙ্গামাঈ, যমুনাজী তাহার কত পাপ গ্লানি ধুইয়া দিয়াছে। যখন সে শয্যা ত্যাগ করে তখন ভূমি স্পর্শ করিয়া সে ধরিত্রীমাতার নিকট প্রার্থনা করে, আমায় তুমি সন্তোষ দাও। যখন গাভী দুগ্ধবতী হইল, প্রথম দুগ্ধ সে বসুন্ধরাকেই অর্ঘ্য প্রদান করে, ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে কিছু সে ভূমি-দেবতাকে না দিয়া পারে না। লাঙ্গল দেওয়া ও বীজ বুনার পূর্ব্বে সে ভূমিকে এক হইলেও, প্রকৃতির সেই ধারিণী ও জননীশক্তি, ভূমির সেই উর্ব্বরতা ও উৎপাদিকতা এবং ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব ও তিরোভাব তাহাদের রস সঞ্চার করিলেও, ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা ও কল্পনার শাখা-প্রশাখা বিশ্বাকাশে অনন্তের দিকে বিচিত্রভাবে বিস্তার করিয়াছে এবং তাহাদের ফুল ফল মানবকল্পনার ও ভাবুকতার বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন এবং সৌন্দর্য্যে ও সুস্বাদুতায় মণ্ডিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য নৃবিজ্ঞানের এইখানেই দোষ ও ত্রুটি—যে সে অনুষ্ঠানের মাপকাটি শুধু ইউরোপ ও জগতের অসভ্যজাতি সমুদায় হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। হইতে পারে আমাদের শক্তিপূজার ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতির সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বিভীষিকা ও আশ্চর্য্যবোধ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেক ইন্দ্রজাল ও যাদুগিরির সহিত সংযোগ ত্যাগ করিতে পারে

* জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জ্ঞানবিস্তার সমিতির পক্ষ হইতে ভারতীয় সমাজদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনার এক অংশ! উঃ সঃ

নাই—কিন্তু ধর্ম্মের ইতিহাসে যেমন আমরা এক স্তর হইতে অপর ঊর্দ্ধস্তরে উঠিতে উঠিতে চলিয়াছি, অন্য দেশের শক্তি-পূজার ইতিহাসে এই অব্যাহত গতি দেখা যায় না; এবং অন্য দেশের শক্তি-পূজার ব্যভিচার অথবা আমাদের দেশের সম্প্রদায়বিশেষের কদাচারকে লক্ষ্য করিয়া যদি আমরা লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিচার করিতে বসি তাহা হইলে বিচারটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক হইবে। মানুষের কোন অনুষ্ঠানকে বিচার করিতে হইলে তাহার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির দিকেই মন দিতে হইবে, বিকারের অন্বেষণ করিতে যাইয়া বিকাশের পথটি অনেক সময়েই হারাইয়া যায়। তখন সমাজ ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উদ্ভট কল্পনা ও বিচার সৃষ্টি হয়। সংস্কারকগণ এই ভুল অনেকবার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এটা ঠিক প্রকৃতি-পূজার নিম্নস্তরের ইন্দ্রজালের দিকটা ক্রমশঃ ছাড়িয়া, একটা উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও দেবতার কল্পনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বেশ উচ্চস্তরে পৌছিয়া সত্য ও সরলভাবে ধর্ম্মপিপাসা তৃপ্ত করিতে পারে।

এই গোড়াকার কথাটি মনে রাখিয়া যদি আমরা নিম্নস্তরের শক্তিপূজা আলোচনা করি তাহা হইলে আমাদের বিচারের ভুল না হইবার সম্ভাবনা। মুণ্ডা, ওরাঁয়ো, সাঁওতালদিগের মধ্যে দেবী হইতেছেন, খের-মাতা, দেশাহাই দেবী, ভূমিদেবী, অথবা ভূ-দেবী। প্রকৃতির সেই নিগূঢ় রহস্যাময়ী উৎপাদিকাশক্তিকে মহীশূরের পর্ব্বতাঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ নবীন সবুজ ঘাসে কটিমাত্র আচ্ছাদিত হইয়া নৃত্যোৎসবে বৎসর বৎসর আবাহন করে। এই উৎপাদিকা শক্তির পূজা চিরন্তন, সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সেই অবিরাম জন্ম ও মৃত্যুর পর্য্যায়, সেই আপনার প্রহেলিকাময় শক্তি হইতে আপনার পুনর্জ্জন্ম ও পুনরুত্থান নারীর জননীশক্তির সহিত জড়িত হইয়া কত যে লিঙ্গ ও মাতৃযোনির প্রতীক কল্পনা এবং মহনীয় সত্যানুভূতির আধার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই,—গ্রীসের ডায়নোসিয়াস ও ডেমেটার আর্টেমিস বা ডায়না, আফ্রডাইটী, তেমাস বা গ্রথেনা, পারস্যদেশের অনাহিতা, ফিনিসিয়ার আষ্টার্টী এবং আসিরিয়া-ব্যাবিলনিয়ার ইষ্টারের রহস্যাবৃত পূজানুষ্ঠানের শক্তি ও উন্মাদনা এইখানে এবং ইহারাই শেষে যে স্থান ও যুগবিশেষে সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম ও নৈতিক সাধনার অঙ্গ হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভূ-দেবী একটি ছোট গ্রাম অথবা ক্ষুদ্র জাতি-বংশের অধিষ্ঠাত্রী। দাক্ষিণাত্যে কালী বা মারী-আম্মাও এই ধরণের, কিন্তু তাহাদের এমন কতকগুলি সার্ব্বজনীন গুণ আরোপ করা হইয়াছে যাহাতে তাহাদেরকে আর গ্রাম বা ক্ষুদ্র জাতি-বংশের গণ্ডীর মধ্যে বলা যায় না। তবুও সেই গ্রামের বা অঞ্চলের বিশিষ্ট উদ্ভিদ বা পুষ্প, নদীর বক্র অথবা আবর্ত্তগতি, উত্তরবাহিনী অথবা দক্ষিণবাহিনী স্রোত, কোন কুণ্ড অথবা ঝরণার সহিত ঐ গ্রাম্যদেবতা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া তাহাদেরই বিশেষণে উহারা পরিচিত হয়। লোকনায়িকা, কান্নমা, ঈষাকাই-আম্মা, দুর্গাম্মা, গঙ্গাম্মা, উরাম্মা, মামিল্লাম্মা (আমগাছের দেবী), পুন্নাহাতুরাং নাই (নদীর ধারে পুন্নাই বনের দেবী), তিরুভাল-উদাহয়াল (বটবৃক্ষের দেবী) এদের প্রত্যেকের নাম ধাম প্রকৃতির কোন বিশিষ্টরূপ, নদী, বৃক্ষ অথবা গ্রামবিশেষ বা কোন বস্তুর সহিত বিশেষভাবে জড়িত এবং এইটাই,Naturalismর দিকটাই আমার দক্ষিণ ভ্রমণের সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ দিয়াছে। প্রকৃতির সহিত এমন সতেজ ও জীবন্ত সম্বন্ধ ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে এমন ভাবে দেবতার কল্পনা ও পূজাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই।

বিন্ধ্যগিরির অধিষ্ঠাত্রী বিন্ধ্যবাসিনী, কোলাবার পর্ব্বত গুহাবাসিনী সপ্তশ্রী কিংবা লেলিহানজিহ্বাসম্বলিত কাংগ্রার আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখীর মত দাক্ষিণাত্যের দেবদেবী সমুদয়ই প্রকৃতিপূজার এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। কাঞ্জভরম ও মায়াভরমের আমগাছ, পাপনাশমের কালালতা এবং স্থানবিশেষের বিবিধ বনৌষধি ও ফুলফলের সহিত দেবদেবী পূজার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রকৃতির পূজার এই দিকটা চিরন্তন কারণ মানুষ প্রকৃতিকে খণ্ডভাবে পাইতে অধিক ভালবাসে, প্রকৃতির সমগ্ররূপ অথবা অরূপ অপেক্ষা তাহার কোন একটি বিশিষ্টরূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত অতীন্দ্রিয়বোধকে সে সহজেই মিলাইয়া দিতে পারে।

এই দিকটা যেমন সত্য ও স্বাভাবিক ইন্দ্রজাল, যাদু-গিরি অথবা অনুকরণ-স্পৃহা হইতে উদ্ভূত প্রথা বা প্রক্রিয়া-গুলি সেরূপ সত্য ও চিরন্তন নহে। হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতার ইহা অপেক্ষা আর এখন গৌরবের বিষয় খুব কমই আছে যে লৌকিকধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশে আমরা দেখিতে পাই এই ঝুটা ভাব ও ক্রিয়াকাণ্ডগুলা আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে এবং পূজা-পদ্ধতি ক্রমশঃ সত্য ও সবল দৃষ্টিতে সেই অসীমের পানে অসঙ্কোচে তাকাইতে চলিয়াছে।

আয়ানার হইতে হরিহর পুত্রতামিল ও তেলুগুদিগের ভূত-প্রেতনিবারক ভূতোত্তান হইতে ভূতনাথ, উত্তর ভারতের ভৈরোঁ হইতে কালভৈরব অথবা গোষ্ঠীর বা জাতিবংশের দেবতা সেনাপতি অথবা বিষ্ণুস্কন্ধ হইতে সুব্রহ্মণ্য অথবা বোম্বাই অঞ্চলের বুনোদিগের খাণ্ডোবা হইতে জাতীয় খাণ্ডেবদেব শুধু দেবতার আরোহণ বুঝায় না, অনুষ্ঠান ক্রিয়াকাণ্ডগুলারও অনুরূপ পরিবর্ত্তনও সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। হনুমান ও কালভৈরব মন্দিরের দ্বার-পাল ভাবে নিযুক্ত রহিয়াছেন, ইঁহারা বনজঙ্গল ছাড়িয়া দেবালয়ের মুক্তপ্রাঙ্গণে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন মাত্র। শীতলামাতা অথবা লক্ষ্মীমাতা ঠিক এই ভাবেই আসিয়া আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। স্থানীয় বীর অথবা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নাম ভাঁড়াইয়া টিকিয়া যাইতেছেন, ভূতদেব ভূতনাথে মিশিয়া যাইতেছেন, আবার ভূমি-দেবী, গ্রাম্য-দেবতা, শীতলা, মারীমাতা অথবা রোগ ও মারীভয়ের দেবতা পার্ব্বতী ও দুর্গার অঞ্চলে আশ্রয় পাইয়া হিন্দুর দেব-সংসারে রক্ষা পাইতেছেন। গণেশ যিনি দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ ত্রিবাঙ্কুরে পরমাত্মাভাবে শিব ও হরি অপেক্ষা অধিক বরেণ্য তিনি পূর্ব্বে অনার্য্যদিগের সূর্য্যদেব ছিলেন,—ত্রিবাঙ্কুরে মহাগণপতি হোমাগ্নি তাঁহার উদ্দেশ্যে এখনও প্রজ্বলিত হয়; গণাধিপ বা গণপতি হইতে বিনায়ক সহজ আরোহণ এবং মূষিক ও হস্তী অনার্য্যদিগের বংশ-নিদর্শনরূপে এখনও তাঁহার দেব-অঙ্গে জড়াইয়া রহিয়াছে।

ইঁহাদিগকে তাহারা গড় হইয়া নমস্কার করে। যখন শস্য সংগৃহীত হইল তখন গোবর অথবা তণ্ডুলের বিঘ্নেশ্বর মূর্ত্তি তাহার মাথায় ধানের ডাঁটা দিয়া দক্ষিণ ভারতে মাঠের মধ্যে শস্যের উপর রাখা হয়। ভূমিয়া হইতেছেন ভূমি-দেবতা, গ্রাম্য-দেবতা। গাভীর দুগ্ধ, বাগানের সে বৎসরের প্রথম ফল কৃষকপত্নী তাঁহাকেই অর্পণ করে। প্রাঙ্গণটী ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পাঁচটি দূর্ব্বার শিকড় তুলিয়া গোবরে প্রত্যহ সজ্জিত করিয়া আসে। তাঁহারি দেউলে সে প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইয়া আসে। ক্ষেত্রপাল হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি কীটপতঙ্গ হইতে শস্য ও ব্যাধি হইতে গোধন রক্ষা করেন, এবং রাখালরাজ হইয়া রাখালগণের পূজা পান। কৃষকের সুখ দুঃখ, কৃষির উন্নতি অপরের সঙ্গে তিনি বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট, তাই পূজাপার্ব্বণে আমোদ-প্রমোদে তিনি গোষ্ঠবিহার ও কালী-উৎসবের প্রধান সহচর। দেবতা এখানে সখা হইয়া কৃষকের অন্তরে আসিয়াছেন, সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধনে তিনি আবদ্ধ, তিনি এখানে প্রভু অথবা বিধাতারূপ সঙ্কুচিত করিয়াছেন।

দাক্ষিণাত্যের পল্লীগ্রামে শিব ও পার্ব্বতী, এবং তাঁহাদের পুত্র বিঘ্নেশ্বর ও সুব্রহ্মণ্য খুব মহাসমারোহে সব স্থানেই পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত দেবতা সেখানকার হইতেছেন আয়ানার বা শাস্তা। দ্রাবিড়ী জন্ম হইলেও তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দ্বারা হিন্দু হইয়াছেন। হিন্দুর দেবতাগণের পার্শ্বে তাঁহার স্থানলাভ হইয়াছে দেবগণের বংশে আসিয়া, তাঁহাকে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে হরিহরপুত্র। তাঁহার পিতা হইলেন শিব ও মাতা বিষ্ণু—যখন তিনি মোহিনীমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুসময়ে বৃষ্টি আনেন এবং এটা খুব স্বাভাবিক ও উপযোগী যে তাঁহার মন্দির প্রায় সর্ব্বদাই ঠিক একটা নদী, বিল বা খালের ধারে রহিয়াছে। তিনি গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন এবং গভীর রাত্রে কুকুর, ঘোড়া বা হাতীতে চড়িয়া মাঠে মাঠে বা গ্রামপথে ঘুরিয়া পাহারা দেন। শস্যক্ষেত্র হইতে সমস্ত আধিব্যাধি বহিষ্কৃত করেন, লোকালয় চোর ডাকাত হইতে রক্ষা করেন। তানজোর, ট্রিচিনপলি, মদুরা, টিনেভেলি প্রভৃতি জেলার গ্রামে গ্রামে যাইয়া আমি গ্রাম্য-মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাটির ঘোড়া ও হাতী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। গ্রামের কুমোর আয়ানারের এই সকল বাহন গড়ে এবং গ্রামবাসীরা কোন

বিপদ উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই সকল মানসিক করে। টিনেভেলি ও তানজোর জেলায় ও মালাবারে শাস্তা-পূজা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। কোচিনরাজ্যের ট্রিচুর সহরে আমি একটী ব্রাহ্মণসমূহ-মঠমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত শাল-গ্রামের পরিবর্ত্তে স্বর্ণবিগ্রহ শাস্তার পূজাসমারোহ দেখিয়া-ছিলাম। কুমারিকা যাইবার পথে দেখিয়াছি, আর এক গ্রামে টিনেভেলি হইতে প্রায় দশক্রোশ দূরে ব্রাহ্মণেরা চাঁদা তুলিয়া নিজেরাই রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া শাস্তার মন্দির তৈয়ার করিয়াছে। সেই স্থানটার নাম পেরুমালিনগ্‌গি। এই শাস্তাপূজা ব্রাহ্মণ-সভ্যতার দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে একটা সতেজ জীবনী ও যোগ্যতাশক্তির পরিচায়ক। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা উত্তর ভারতের মত বিজয়ের গর্ব্বে ও আস্ফা-লনে যায় নাই, দ্রাবিড়ী-সভ্যতা পরাজিত বা বিপর্য্যস্ত হয় নাই, ব্রাহ্মণ সভ্যতার চাটুবাদে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল মাত্র। ব্রাহ্মণ-সভ্যতাও নানা দিক হইতে দ্রাবিড়ী জনসাধারণের ধর্ম্মভাব ও বিশ্বাস হইতে পরিজ্ঞাত পূজা ও অনুষ্ঠানের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই, এমন কি শিব ও বিষ্ণুকে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রপল্লীগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী আম্মাভরু বা আঁঙ্কাম্মাকে তাঁহাদের গর্ভধারিণী জননী বলিয়া বরণ করিতে হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও দ্রাবিড়ী পূজা ও অনুষ্ঠানের সংমিশ্রণ আরও দেখা যায় আম্মা পূজায়। আম্মা অথবা মাতৃকার অসংখ্য মূর্ত্তি দাক্ষিণাত্যের পল্লগ্রামে পাওয়া যায়। আম্মা-পূজা এবং উত্তর ভারতের দুর্গা ও কালীপূজার তফাৎ এই যে দাক্ষিণাত্যে শক্তি-পূজা ধর্ম্মের ক্রমবিকাশে খুব নিম্নস্তরেরই পরিচয় দেয়, তাহাতে সূক্ষ্ম অসীমের ভাব ও অধ্যাত্ম-সাধনা অপেক্ষা ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও গ্রাম্যতাই বেশী। অথচ নাম অনেক সময় একই, ভদ্রকালী, মহিষমর্দ্দিনী, দ্রৌপদী, চামুণ্ডা, কালী-আম্মা ভগবতীর সহিত পরিচয় আমরা দাক্ষিণাত্যেও পাই।

মারী-আম্মা ইহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতা। তিনি বিসূচিকা এবং অন্যান্য মারীভয় হইতে গ্রামকে রক্ষা করেন, তাহা ছাড়া এমন রোগই নাই যাহা তিনি উপশম না করিতে পারেন, এমন কোন দান নাই যাহা তিনি না দিতে পারেন। ইহারাই হইলেন গ্রাম্য-দেবতা, ইহাদিগের মন্দির গ্রামের একপ্রান্তে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে, উত্তর দিকে ইহাদিগের মুখ কারণ সাধারণ বিশ্বাস হইতেছে যত কিছু ব্যাধি উপদ্রব উত্তর দিক হইতেই আসে। হইতে পারে, ইহার কারণ উত্তর হইতে আর্য্যগণের উপনিবেশকে দ্রাবিড়ী সভ্যতা প্রথমে অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিল। পূজা পার্ব্বনে, আমোদ-প্রমোদে, রোগে দুর্দ্দিনে আম্মারাই গ্রাম্য-সমাজে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভয় আকর্ষণ করে।

মারী-আম্মার পূজারীরা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শূদ্র কিন্তু পূজা-পার্ব্বণে ব্রাহ্মণরাও সমবেত হন। অনাচারী কুম্ভ-কার ও ধোপারাই পূজার ভার লয়, মালা ও সাদিগারা বলিদান করে। দেবতাকে বাহনে অথবা রথে চড়াইয়া গ্রামের চতুর্দ্দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ-পাড়ায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র-পাড়ায় শূদ্র নারিকেল ভাঙ্গিয়া অর্ঘ্য দেয় ও কর্পূরের আরতি করে। মারী-আম্মার পূজায় বলিদান, দেবতার সেবায় মদভোগ প্রভৃতি কদাচারের প্রভাব ব্রহ্মণ্য আদর্শ ও অনুষ্ঠানের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ কমিতেছে, কিন্তু সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মণ্য-সভ্যতা অনার্য্যভাব সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসমান বলিয়া এখনও তাহার প্রভাব, ততদূর বিস্তৃত হয় নাই। অনার্য্যদিগের বিবাহ অথবা শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য অনেক স্থলে প্রয়োজনীয় বলিয়া গ্রাহ্য হয় না এবং এই হেতু ব্রাহ্মণদিগের দেব-দেবীগণের রাজন্যবর্গ প্রতিষ্ঠিত দু'চারিটা বড় বড় মন্দির থাকিলেও জন-সমাজে গ্রাম্যদেবতা, স্থানীয় আম্মা, বংশদেবতার পূজা লইয়া থাকে। হনুমান ও শিব অনার্য্য ও আর্য্যগণের ধর্ম্মসমুদ্রের সেতুবন্ধভাবে বিরাজ করিতেছেন।

দাক্ষিণাত্যে তানজোর জেলার অভ্যন্তরে যাইয়া আমি ব্রহ্মণ্যসভ্যতার আর এক চিত্র দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক গ্রামেই সেখানে শিব ও পেরুমলের (বিষ্ণু) মন্দির, নদীর ধারে ধারে স্নান-মণ্ডপম, বালকগণ তালপাতায় লিখিত রঘু-বংশ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছে, প্রত্যূষে স্নানের সময় বেদগানে সমস্ত গ্রামটি মুখর হইয়া উঠিতেছে, পূজা-পার্ব্বণে মন্দিরে ভজন হইতেছে, রোগ ও দুঃখের সময় সহস্রনাম জপন অনুষ্ঠিত অথবা অথর্ব্ববেদ হইতে গান হইতেছে, তাহা ছাড়া

হরিকথা, ভজনওয়ালা ও শাস্ত্রীগণ কথকতা শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেছেন, গ্রামবাসিগণ সীত্যাকল্যাণম্, দময়ন্তীকল্যাণম প্রভৃতি কালক্ষেপন বা যাত্রা শুনিতেছে অথবা গ্রামপথের কাম-পাতিতে মদন-ভস্ম করিতেছে এবং সমস্ত গ্রামের পঢ় অথবা গ্রামপর্ণম হইতে তাহাদের ব্যয় সঙ্কুলান হইতেছে। ব্রহ্মণ্যসভ্যতার এই প্রতিপত্তির কারণ সম্ভবতঃ চোল-রাজগণের প্রভাবে এ ক্ষেত্রে স্পর্শ করিয়াছে কিন্তু রূপান্তরিত করিতে পারে নাই।

দাক্ষিণাত্যের আম্মার এখনও মানুষ দ্রোহিতা, পাশবিকতা ও বীভৎসতা যায় নাই। ইলাম্মা ও মারী-আম্মার পূজায় মেষবলি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎভাবে করা হয়। আমি ট্রিচিনিপলি জেলার এক গ্রামে গিয়া শুনিলাম, যখন গ্রামে মড়ক উপস্থিত হয় তখন পিড়ারীর (সংস্কৃত বিষহরির তামিল রূপান্তর) পূজা শেষ করিয়া গ্রামে তোটি (আমাদের এখানকার চামরের অনুযায়ী) উলঙ্গ হইয়া নাড়ীভুড়ীর মালা পরিয়া মদ, চাল ও রক্তের ছিটা দিতে দিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং অবশেষে গ্রামের একপ্রান্তে আসিয়া ভূত-প্রেতের উদ্দেশ্যে ছুড়িয়া দেয়। ব্রহ্মণ্যসভ্যতার প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রজাল ও যাদুগিরি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া শক্তির কল্যাণ ও করুণা মূর্ত্তিটা সমধিক পরিস্ফুট হইতে থাকে। গ্রাম্যদেবতাদিগের স্নান ও পশুবলির প্রতি বিতৃষ্ণা ব্রহ্মণ্যসভ্যতার প্রতিপত্তির উদাহরণ। বলিদানাদি অনুষ্ঠানেও দেবতাকে তুষ্টিকরণের পরিবর্ত্তে যজ্ঞোৎসবের দিকটা অধিক ফুটিতে থাকে। তবুও গ্রামের শিব ও বিষ্ণুপূজা হইতে এই সকল গ্রাম্যদেবতার পূজা অনুষ্ঠানের প্রভেদ লক্ষিত হয়। শিব ও বিষ্ণু নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম শক্তির দ্যোতন করে। ক্ষুদ্র গ্রামের গণ্ডীতে তাঁহারা গ্রাম্যদেবতাদিগের বেদ উপনিষদের মত আবদ্ধ নহে। দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বতী, মীনাক্ষী, কামাক্ষী, কন্যা কুমারিকার সহিত আম্মাগণেরও এই রকম প্রভেদ। সেই সাংখ্য ও বেদান্তের এই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর অনাদি অনন্ত লীলা সেই স্রষ্টার ঐশীশক্তির কল্পনা মিশ্রিত হইয়া যে দুর্গা ও কালীর পূজা ও অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহার ক্রমবিকাশ আরও অনেক উচ্চস্তরের। শক্তি-পূজার এই ক্রমবিকাশ বিশ্বমানবের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে বিভিন্ন পথে গিয়াছে। কিন্তু হিংসার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা, উৎপাত ও ভয়ের পরিবর্ত্তে বরাভয়, পাশবিকতার পরিবর্ত্তে দেবত্বের, অসুন্দর, অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে সৌন্দর্য্যশ্রীর, বিরোধের পরিবর্ত্তে শান্তির রূপান্তরের ইতিহাস সকল দেশেই এক—সুতরাং কালী বা আম্মা, ইষ্টার, আষ্টার্টী, আফ্রোডাইটী, সিবিলী কিংবা ডায়েনার পূজাপদ্ধতি ও ক্রিয়াকাণ্ডের মূল শিকড়গুলা ঠিক এই ভাবেই গ্রীসের আদিমবাসীদিগের নদী, জঙ্গল, পর্ব্বত, ঝড়বৃষ্টির দেবতা আগন্তুকদিগের দেবতাদিগের অঞ্চলে আশ্রয় পাইয়া ঠিকিয়া গিয়াছিল। জেডনার জঙ্গলের শক্তি জিউস নাম লইল, আপলো ক্ষেত্রপাল মেষপালের সহিত একটু মিশিয়া গেল, আফ্রোডাইটি, হীরাত, এথেনী প্রত্যেকের পূজা অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোক-সাহিত্যের প্রেমের গন্ধে বিচিত্র হইয়া উঠিল। স্থানবিশেষ বা লোক-সাহিত্যের প্রভাব অনুসারে দেবতাদিগের প্রভাব স্থির হইয়াছিল।

সম্পাদক।

শূন্যের পূর্ণতা।

বিশ্ব আমারে নিস্ব করিবে
শক্তি কি হেন আছে
অনেক পুণ্যে তাইতে শূন্য
হ'য়েছি ধরার মাঝে ;

নিরবলম্ব সম্বল মোর
দৈন্য দুঃখ নয়নের লোর
বেদনা ক্লিষ্ট স্বপনের মাঝে,
কেটে যায় মোর নিশি

প্রভাতে উঠিয়া করি হাহাকার
রাজ্য আমার সব একাকার
বিরাট বিপুল শূন্যতা সনে
এক হ'য়ে থাকি মিশি।

বর্ম্মের মত অভাব আমায়
চিরদিন আছে ঘিরি,
বাহিরের যত জাল জঞ্জাল
নিতি চলে যায় ফিরি

আমার সদর দউড়ী পাহারা
চিরদিন ধ'রে দিতেছে যাহারা
প্রলোভনে তারা ভুলিবার নয়
বিশ্বাসী তারা খুব

মাঝে মাঝে তাই এই কাণাকাণি
আমারে লইয়া বৃথা টানাটানি
শেষে যরে দেখ নহি আমি দীন
বিস্ময়ে রহ মূক।

দুঃখ আমায় দীক্ষা দিয়েছে
শিখেছি মন্ত্র কত
তাই তার কাছে হ'য়ে আছি আমি
শিষ্যের মত নত,

নিশিদিন তাই আরাধনা তা'র
প্রাণে পাই কত শান্তি অপার
প্রতি নিমিষের অসীম শক্তি
সেও ত তাহারি দান ;

কিছু নাই মোর তাও সব আছে
রাজা আমি তবু শূন্যতা মাঝে
মন্ত্রণা দেয় সেই সেথা মোরে
সেই ত বাড়ায় মান।

দৈন্যের মাঝে অনেক হারায়ে
সকলি ফিরায়ে নিয়েছি
ক্ষণিকের সুখ প্রতিদানে তার
নিত্যের দান পেয়েছি।

এই নিয়ে মোর দিন কেটে যাবে
কাজে ও অকাজে অলাভে ও লাভে
চিরদিন ধ'রে এই দেবে সুখ
এই দেবে মোর প্রাণ ;

ক্ষণিকের তরে এলে অবসাদ
ভুলে যদি ঘটে কখন প্রমাদ
সব দূরে যাবে পশিলে শ্রবণে
মহাসাগরের গান।

বিপদ আমারে সাথে ক'রে নিয়ে
চলেছে অজানা দেশে
না জানি কেমনে সন্ধ্যা বেলায়
এই পথ কোথা মেশে

জীমূত মন্দ্রে গরজে আকাশ
সৃষ্টি যেন সে করিবেরে গ্রাস
বিশ্ব আলোড়ি, উঠিতেছে ঝড়
হৃদয় নাচিছে হরষে।

এরই মাঝে মোর মিলেছে যে ধন
চির নিরাপদ পূত সনাতন
বজ্র কঠোর সাহস মিলেছে
তাহারি পুণ্য পরশে।

দুঃখ দৈন্য বিপদের মাঝে
অনেক পেয়েছি আমি
ভাণ্ডার তব কাঙ্গাল করিয়া
দিয়েছ দয়াল স্বামী,

কত দিবসের বিপুল সাধনা
প্রাণ মন সঁপি, কত আরাধনা
জনমান্তরে করেছিনু তাই
তারি তরে এই লাভ,

আমি ত বিশ্বে রাজ অধিরাজ
দৈন্যের সনে মম রাজকাজ
অনেক হারায়ে সকল পেয়েছি
নাহি ত কোন অভাব।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আশা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

১১

সত্যব্রতের বহু সৎকর্ম্মের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগরে একটী ঠাকুরবাড়ী ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা অন্যতম। প্রতি সপ্তাহের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে হয় তিনি, না হয় তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত বা অন্য কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ ও শাস্ত্রাদিপাঠ শ্রবণ করিতেন। অদ্য সপরিবারে তিনি এবং ব্রহ্মযশা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন; এবং সেই দিন শাস্ত্রপাঠের ভার ব্রহ্মযশের উপর পড়িয়াছে।

বিগ্রহের সন্ধ্যারতির পর নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সত্যব্রত, ব্রহ্মযশা, বিষ্ণু, প্রিয়ব্রত প্রভৃতি সকলেই বসিয়া কীর্ত্তন শুনিতে ছিলেন। কীর্ত্তনীয়াগণ সকলেই শ্রোতা সমাগম দেখিয়া সাগ্রহে আপনাদের কার্য্য করিতে লাগিল। তাহাদের মস্তক আন্দোলন ও নৃত্যগীতের ভাবভঙ্গী দেখিতে দেখিতে মহামায়া মৃদুস্বরে তাহার পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীকে বলিল "ভাই এমন গোলমালের মধ্যে ভক্তি আস্‌বে কেন? আমার ত' কেবলি হাসি পাচ্চে।" লক্ষ্মী একবার সকাতর দৃষ্টিতে বিগ্রহের দিকে চাহিয়া তাহার পর তাহার বিশাল চক্ষু দুইটী মহামায়ার নয়নের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল "একবার ওঁর দিকে চেয়ে দেখুন।" লক্ষ্মীর নির্দ্দেশক্রমে বিষ্ণুযশার দিকে চাহিয়া মহামায়া অবাক হইয়া গেল, দেখিল বিষ্ণুযশা নিমীলিত নেত্রে স্থির হইয়া বসিয়া আছে এবং মুখে এমন একটী ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহাকে অমান্য করিবার শক্তি তাহার নাই। তাহার মুখে এমন একটী আনন্দের রেখাপাত হইয়াছে, এমন একটী শান্ত কোমল ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা হাসিও নহে অথচ হাস্য, যাহা সুখেরও নহে অথচ দুঃখেরও নহে। সর্ব্বোপরি বিষ্ণুযশার দেহের অনাবৃত সৌন্দর্য্যের উপর দিয়া মাঝে মাঝে এমন এক একটা তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে যাহা দেখিয়া মহামায়ার সমস্ত বিরুদ্ধভাব এক নিমিষেই মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় মস্তক অবনত করিল। প্রিয়ব্রতও বিষ্ণুর দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিল। সহসা তাহার মনে হইল যেন বিষ্ণু কি বলিতেছে, কীর্ত্তনীয়াদের গীতশব্দে তাহা শুনা যাইতেছে না অথচ বেশ অনুভব হইতেছে যে বিষ্ণু যেন কি বলিতেছে। প্রিয়ব্রত তখন তাহার নিকটে ঘেঁসিয়া বসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সব কথা শুনিতে পাইল না কেবল এই দুইটী কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, "আমায় নাও—আমায় নাও—।"

কীর্ত্তনীয়াগণ গীত শেষ করিয়া যখন বিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং সেই সঙ্গে সকলেই প্রণাম করিলেন তখন বিষ্ণু সহসা মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া "আর ছেড়ে থেকো না," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ব্রহ্মযশা ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন "বিষ্ণু ওঠ"। বিষ্ণু তীরবৎ উঠিয়া বলিল "ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও।" ব্রহ্মযশা গভীর স্নেহে তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। বিষ্ণু তাঁহার বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিল "বাবা বাহিরে চলুন।" ব্রহ্মযশা তাহাকে লইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে নামিয়া গেলেন। অন্য সকলেও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রাঙ্গণে অবতরণ করিয়া, মহামায়া তাহার ভ্রাতা প্রিয়ব্রতকে আকর্ষণ করিয়া একপার্শ্বে লইয়া গেল। প্রিয়ব্রত হাসিয়া বলিল "তোর আবার কি হ'ল?" মহামায়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "দাদা একি?"

প্রিয়ব্রত। এ যা তাই! এর নাম নেই, এ যে না অনুভব করেছে সে বল্‌তে পারে না, একি! একেই শাস্ত্রে বলেছে

প্রেম বা ভক্তি! একেই বলে আত্মনিবেদন, আপনাকে একেবারে ভুলে না যেতে পার্‌লে এ ভাব অনুভব কর্‌তে পারা যায় না।

মহামায়া। এই ভক্তি! এই পাগলামির নাম ভক্তি?

প্রিয়। পাগলামিই বটে তবে টাকা কড়ি ধন দৌলত নাম ধাম সব স্বার্থ এর জন্য পাগল হওয়ার চাইতে এই পাগলামি যে কতদূর বাঞ্ছনীয় তা তুমি বলতে পারবে না মায়া।"

মায়া। কেন পারব না? আমায় বুঝিয়ে দাও।

প্রিয়। এর কিছুই বুঝ্‌বার জো নেই মায়া, যদি সব ভুলে গিয়ে আমাকে আমার সমস্ত নিজত্বকে ভুলে যেতে পারি তাহ'লে বোধ হয় বুঝ্‌তে পারব; কিন্তু কখনও যে অন্য কাউকে বুঝ্‌তে পারব তা' বলতে পারি না। কিন্তু তুমি যাই কর এই ভাবকে মিথ্যা বলে উচ্ছৃঙ্খলতা মনে করে এর অপমান করো না।

মায়া। আমি ত' কিছুতে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, দাদা; প্রস্তরের একটী বিগ্রহমূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কতকগুলি উদ্দাম নৃত্যের মধ্যে এত বড় সত্য এত খানি শক্তি- কোথায় লুকিয়ে ছিল? আর তোমরা সকলেই তা' অনুভব কর্‌লে, আমিই কেবল বঞ্চিত রইলাম এ আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না,আমায় বুঝিয়ে দাও; তোমরা না দাও ত' কে দেবে?

মহামায়ার কণ্ঠস্বরে একটা মিনতি, একটা কাতরতার আভাস পাইয়া প্রিয়ব্রত বলিল "মায়া আমি তোমায় সত্যই বল্‌ছি যে এ আমার বুঝ্‌বার শক্তির অতীত। বাবাকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনি হয়তো বুঝাতে পার্‌বেন।" না হয় একবার বিষ্ণুর মাতাকে ভগ্নিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

মায়া। ওঁদের সঙ্গে আমার কিছুই মেলে না; ওঁদের কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

প্রিয়। তবে বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। এখন চল, ঐ দেখ ওরা নাটমন্দিরে গিয়ে বসছেন।

সকলে নাটমন্দিরে সমবেত হইলে সত্যব্রতের অনুরোধে ব্রহ্মযশা বেদীতে উপবেশন করিলেন। এবং আচমনাদি করিয়া ভাগবৎপাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন। পাঠ আরম্ভ হইল 'বলি-নিগ্রহ'!

নারায়ণ দৈত্যশ্রেষ্ঠ বলির অহঙ্কার চুর্ণ করিবার জন্য একপদে স্বর্গ অন্য পদে ভূলোক অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা তাঁহার পরমপদ তাহা দিয়াছিলেন বলির মস্তকে; সে দিনের সেই অদ্ভূৎ ব্যাপার জগতে এক পরম সত্য জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছে। সেদিন হইতে আমরা জানিয়াছি যে ধর্ম্মের কার্য্য, পুণ্যের কার্য্যও যদি অহঙ্কার-দুষ্ট হয় তাহা হইলে সর্ব্বগর্ব্বহর হরির দ্বারা সেই কার্য্যের দর্প বিনষ্ট হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও জানিয়াছি যে, যে ত্যাগ ভগবতো-দ্দেশেই হইয়াছে তাহার ফলে পরম মঙ্গল লাভই হইবে।

বলির ত্যাগের তুলনা নাই; তিনি জানিয়া শুনিয়া এমন কি গুরু শুক্রাচার্য্যের দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াও বামনদেবকে প্রকারান্তরে তাহার অর্জ্জিত সমস্ত রাজ্যই দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং যখন স্বর্গ ও মর্ত্ত উভয় স্থানেই উক্ত বামনদেবের শরীর দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং প্রতিশ্রুত অন্য পদের জন্য স্থান না পাইয়া আপনাকে সেই পরমপদে উৎসর্গ করিলেন তখন তাঁহার সবই গেল অর্থাৎ সবই লাভ হইল। সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে যে এত বড় পরম সম্পদ লুকাইয়া ছিল কে তাহা জানিত? সর্ব্বস্ব এমন কি আমার আমিত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফল যে নারায়ণের পূর্ণ সান্নিধ্য লাভ এই পরম সত্য বলির সেই মহান্ ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি।

শ্রুতি বলিয়াছেন "নায়মাত্মাবলহীনেন লভ্যঃ। যে বলহীন সে এই আত্মাকে পাইতে পারে না। বলির ত্যাগ মহাবলীর ন্যায়ই হইয়াছিল তাই তিনি সবলে স্বর্গ ও মর্ত্তের সুখকে ত্যাগ করিয়া এমন কি আপনার আমিত্বানুভবের সুখ হইতেও আপনাকে বঞ্চিত করিয়া নারায়ণের সান্নিধ্য-কেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বলি আপনাকে নারায়ণের চরণে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া তাঁহার "বলি" নাম সার্থক করিয়াছিলেন।

যাহাকে পাইলে অন্য সমস্ত লাভই অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় সেই লাভই পরম লাভ। কিন্তু সেই পরম লাভ সর্ব্বস্ব ত্যাগ না হইলে হয় না; সর্ব্বস্ব ত্যাগ অর্থে কেবল যে ধন সম্পাদিত ত্যাগ তাহা নহে, সব চাইতে বড় ত্যাগ আমিত্বের অভিমান ত্যাগ। ভগবান্ যেন বলির সাধনার ফলে সন্তুষ্ট হইয়া এমনরূপে আসিয়া তাহার সর্ব্বশেষ ধন "আমিত্ব"

তাহাও ভিক্ষা করিয়া লইলেন। এই আমিত্ব এবং তৎসঙ্গে মমত্ব গ্রহণ করিয়া ভগবান্ বলির যে কত বড় উপকার করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই, তাই পরম জ্ঞানী বলি পুলকিত হইয়া বলিয়াছিলেন—

"পুংসাং শ্লাঘ্যতমং মন্যে দণ্ডমর্হবর্ত্তমার্পিতং।
যং ন মাতা পিতা ভ্রাতা সুহৃদশ্চাদি সন্তিহি॥

"প্রভু, আপনি আমার এই যে দণ্ড করিলেন ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে আর শ্লাঘ্যতম কিছুই নাই; আমি ইহাকেই বহুমান বলিয়া মানিয়াছি; আমার এত বড় যশস্কর উপকার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু কেহই করিতে পারিতেন না।"

ভগবান্ যে দণ্ড দেন তাহা যদি নারায়ণের হাতের দান বলিয়া জানিতে পারি তাহা হইলে নারায়ণকেই পাওয়া হইল তাঁহারই স্পর্শলাভ হইল; ইহার অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? কিন্তু এই যে সর্ব্বস্বহরণ ইহার ন্যায় ভীষণ অথচ সর্ব্বোত্তম উপকার যাহাদের সহিত লৌকিক সম্বন্ধ তাহারা করিতে পারে না। মাতা কিম্বা পিতা কি আমার মহদুপকার হইবে জানিয়াও আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পথের ভিখারী করিয়া আমার উপকার করিতে পারেন? এ কেবল নারায়ণই পারেন। যে যে বিষয়ে আমার মমত্বজ্ঞান আছে তাহাই আমার বন্ধনের কারণ, এই বন্ধন কেবল তাঁহারই স্পর্শে ছিঁড়িতে পারে, যাঁহার জ্ঞানে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়া।"

আবার কেবল মাত্র "মমত্ব" গ্রহণ করিলে চলিবে না আমিত্বকেও গ্রহণ করিতে হইবে। ভক্তের নিকট হইতে তাহার "আমিত্ব" গ্রহণের জন্যই বামন অবতার। সব যায় কিন্তু আমিত্ব যায় না—এই পরম নিবেদন, আত্মনিবেদনের জন্য ভগবানকে স্বয়ং আসিতে হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়াও বোধ হয় না।

কি অপূর্ব্ব এই বামনদেবের আত্মপ্রকাশ! ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ-শিশু যজ্ঞাগারে ভিক্ষুকের বেশে প্রবেশ করিয়া ত্রিলোকাধিপকে পথের ভিখারী করিলেন! কিন্তু সেই সঙ্গে বলির সমস্তই পাওয়া হইয়া গেল—সেই ক্ষুদ্র বিপ্রশিশুর দেহে "জগৎ কৃৎস্নং" প্রকাশিত হইল এবং সেই সমগ্র জগতেই দেহী তাঁহারই দুয়ারের দ্বারী হইয়া রহিল। শ্রুতিতে ভগবানকে "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র; পুরুষোঅন্তরাত্মা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই পুরুষের যখন পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় তখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার স্থান সঙ্কুলান হয় না। তখন তিনি—

সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥

ব্রহ্মযশা বলি-নিগ্রহকে অবলম্বন করিয়া বলিলেন যে, এই ত্যাগের আদর্শই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের একমাত্র আদর্শ। আমাদের সমাজে সাধুতার ও ধার্ম্মিকতার পরিমাণ ত্যাগের গুরুত্ব;—সংসারে আসিয়া নারায়ণের মহান্ পরিবারভুক্ত হইয়া কে তাঁহার প্রীত্যর্থে কতখানি আপনাকে দান করিয়াছে তাহাই আমাদের মাপকাটী। এই মাপকাটীতে যাহার যতটুকু ধরা পড়ে তাহার ততটুকু পুঁজি। যাহার যতখানি বল আছে সে ততখানি ত্যাগী না হইলে নারায়ণের নিকট সে ততখানি ঋণী থাকিয়া যাইবে; এবং সেই ঋণের বোঝা সে যতদিন না নামাইতে পারিবে ততদিন বা ততজন্ম তাহার নিস্কৃতি নাই।

ব্রহ্মযশা যখন বেদী হইতে নামিলেন তখন রাত্রি গভীর হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কথার ভিতর এমন একটা শক্তি ছিল যে সকলেই একাগ্রচিত্তে তাঁহার কথা শুনিতেছিল, এমন কি মহামায়াও তাহার সমস্ত বিদ্রোহভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্তসমাহিতচিত্তে তাঁহার সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল। আহারাদির পরে সে যখন গিয়া শয়ন করিল তখন পর্য্যন্ত তাহার কর্ণে কেবলি বাজিতেছিল "ঋণের বোঝা যতদিন না নামিবে ততদিন নিস্কৃতি নাই—নিস্কৃতি নাই—নিস্কৃতি নাই।"

১২

শীত ও বসন্তের সন্ধি-সময়ে প্রকৃতির যেমন একটা স্থির ভাব আইসে বিষ্ণুর সমস্ত দেহ ও মন সেইরূপ একটা "ন যযৌ ন তস্থৌ" রকমের অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল। ভিতরে ভিতরে কিসের একটা যেন আয়োজন চলিয়াছে অথচ বাহ্যতঃ তাহার প্রকাশকে সবলে অবরুদ্ধ রাখিয়া সে চলিতেছে। সেই গূঢ় আয়োজনের মৃদু অথচ গম্ভীর গুঞ্জন শব্দ মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে, যেন একটা ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাসে সে মাঝে

মাঝে কাঁপিয়া উঠিতেছে। শীত গিয়াছে কিন্তু বসন্তও আইসে নাই অথচ অন্তরের গূঢ়দেশ হইতে একটা মৃদু শীতল বায়ু মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইয়া তাহার ওষ্ঠ তাহার নয়ন এমন কি তাহার বাক্যও কম্পিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাহার হৃদয়ের মধ্যে এ কি জাগিতেছে? তাহার সমস্ত বহিরন্তর ব্যাপ্ত করিয়া এ কোন্ ভাব তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিতেছে? এ কার কথা, কার গভীর আহ্বানে তাহার অন্তরাত্মা ছুটিয়া দেশে, কালে, লোকে লোকে ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে চায়। রজনীর গভীর অন্ধকার কোথা হইতে আজ এক গুরুভার হইয়া সমস্ত তারা নক্ষত্র লইয়া তাহার অন্তরের উপর চাপিয়া বসিতেছে? দূর দূর অতি দূরত্বও কেন আজ ছুটিয়া আসিয়া তাহারই অতি অন্তিকতম হইতে চায়? তাহার অন্তর হইতেও যেন কে বাহির হইয়া সেই দূরতম দূরত্বের হস্ত ধরিয়া ঐ সম্মুখের প্রাসারিত গড়ানের মাঝখানটাতে গিয়া দাঁড়াইল। স্থির ধীর নক্ষত্রলোকের দিকে চাহিয়া বিষ্ণুযশা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমি যাব?"

কিন্তু কোথায়? উপরে অনন্ত চক্ষু মেলিয়া সহস্রলোচন ইন্দ্রদেব চাহিয়া আছেন। কিন্তু কৈ তাঁহার স্পষ্ট আহ্বান? কোথায় তাঁহার সেই বৈদিক যুগের বজ্রভাষা! হে ইন্দ্র তুমিই একদিন সন্দেহীর সন্দেহ দূর করিয়া বলিয়াছিলে "হে স্তোতা! এই আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি আমাকে দর্শন কর; সমস্ত ভুবনকে আমি মহিমা দ্বারা অভিভূত করি।" এখন একবার সেইভাবে বল "অয়মস্মি জরিতঃ পশ্যমেহ বিশ্বা-জাতান্যভ্যস্মি মহ্না।" তুমিই একদিন বলিয়াছিলে "মম স্বনাৎ কৃধু কর্ণো ভয়াৎ" "আমার কথা এই যে বধীর সেও সভয়ে শুনিতে পায়," কিন্তু কৈ আজ ত তোমার সে শব্দ নাই? ঐ যে মহানগরী নিদ্রিত দুরন্ত শিশুর ন্যায় নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া তোমারই সহস্র চক্ষুর তলে রহিয়াছে ইহার কর্ণে কৈ তোমার সেই শব্দ যাহা পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করে? এই যে চুপে চুপে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে শব্দ উঠিতেছে এই শব্দের সহিত তোমার গভীর স্বননের যোগ করিতে দাও—তোমার সহস্র কিরণাঙ্গুলি দ্বারা আমার পথ নির্দ্দেশ কর। কোথায় তুমি আমায় লইয়া যাইতে চাও বুঝাও।

গভীর নিস্তব্ধ নিশায় বিষ্ণুযশা তাহার শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া ছাদে দাঁড়াইয়া দূর নক্ষত্রলোকের দিকে চাহিয়া ছিল। উপরে তারকাখচিত রজনীর গভীর অতলতা। নিম্নে আলোকিতা নগরীর আলোক সেই অন্ধকার রজনীর গভীরতা ভেদ করিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। আলোকাধারগুলি দেখা যাইতেছে না, অথচ সকলে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড গহ্বরস্থ আলোকের উজ্জ্বলাভাসের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। রাত্রে যে স্থান এত নিস্তব্ধ, দিনে সেই স্থান সুখ দুঃখের কোলাহলে এত মুখরিত হইয়া উঠে কেন? জগৎ যখন আপনার মুখ অন্ধকারের আবরণে আবৃত করে তখনই মানবের নয়ন বচন সমস্তই স্তব্ধ হইয়া যায়, আর যখন জগৎ আপনার মুখ উন্মুক্ত করে তখই মানুষ আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হয় কেন? দিবসে সমগ্র জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মানুষ আপনাকেই কেবল দেখে; যখন সকলেই তাহাকে টানিতেছে তখন সে কেবলই আপনার ক্ষুদ্রত্ব লইয়াই ব্যস্ত, একি প্রহেলিকা।

চাহিয়া চাহিয়া বিষ্ণুযশার মনে হইল সেও কি এই রজনীর মত আপনাকে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়া তাহার শান্ত মধুরতায় মানুষের অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে পারে না? এই যে মহান্ শান্তি অনন্ত আকাশ হইতে, দূর নক্ষত্রলোক হইতে, নারায়ণের পরমপদ হইতে মানুষের অশান্ত সংসারের উপর নামিয়া আসিতেছে, ইহাকেই কি সে মানুষের প্রতিদিনকার কার্য্যের উপর স্পষ্টভাবে চিরদিনের মত ধরিয়া রাখিতে পারে না? যদিও সে অক্ষম, যদিও সে অতি ক্ষুদ্র তথাপি কি তাহারই ক্ষুদ্রত্ব হইতে সেই বিশ্বব্যাপী পরম শান্তি জাগিয়া উঠিতে পারে না? এই যে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে কে বলিতেছে "আমায় আর আবদ্ধ রাখিও না, আমায় আর ক্ষুদ্র করিয়া রাখিও না। আমায় ছড়াইয়া দাও, ঐ আকাশের শান্ত অন্ধকারের মত ছড়াইয়া দাও" এই গূঢ়তম শব্দ কি একদিন বজ্রনির্ঘোষে দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না? এই যে বাহির হইতে প্রতিদিনই একটা আহ্বান "এস এস বাহিরে এস" এই শব্দ তাহার মনের মধ্যে কেবলি প্রবেশ করিতেছে, এই আহ্বান কি তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে পারিবে না?

সহসা বিষ্ণুর মনে হইল যে সে পারিবে। সে অক্ষম নয়, সে দুর্ব্বল নয়, সে ক্ষুদ্র নয়! তাহার নয়ন হইতে যেন এক মুহূর্ত্তে একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা উঠিয়া গেল। সে স্পষ্ট অনুভব করিল যে সে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; জগতের সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে সর্ব্বচিন্তার মধ্যে তাহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে। দেশ হইতে দেশে, যুগ হইতে যুগে সে আপনার অখণ্ড অস্তিত্ব অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। এক মুহূর্ত্তেই সে এক ছিল বহু হইয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে অনুভব করিল যে আবার সে সেই পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় সে কাঁদিয়া বলিল "এ কোথায় এলাম? আমি এখানে থাক্‌ব না। আমি যাব আমি যাব।"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "এস।" বিষ্ণু চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল লক্ষ্মী।

বিষ্ণু। একি লক্ষ্মী তুমি এখানে? এত রাত্রে?

লক্ষ্মী। আমি তোমায় ডাক্‌তে এসেছি। বাবা ডাক্‌ছেন?

বিষ্ণু। বাবা ডাকছেন! কেন?

লক্ষ্মী। আজ তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ।

বিষ্ণু। বিবাহ! কৈ একথা ত' আগে জান্‌তে পারিনি!

লক্ষ্মী। আমি জান্‌তাম, আমি সমস্ত দিন উপবাস ক'রে আছি।

বিষ্ণু। তাত' আমিও আছি। সেইজন্যই কি বাবা আমায় আজ উপবাস কর্‌তে বলেছিলেন? তাই বুঝি আজ সকালে শ্রাদ্ধাদিও সমাধা করেছেন?

লক্ষ্মী। নান্দীমুখও করেছেন।

বিষ্ণু। তাও করেছেন। কিন্তু বাবার কাজ আমি সব সময় বুঝ্‌তে পারিনি তাই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি।

লক্ষ্মী। তা'হলে এস।

বিষ্ণু। বিবাহ! লক্ষ্মী তুমি আমায় বিয়ে কর্‌বে? আমি কি তোমার ভাই নই?

লক্ষ্মী। না।

বিষ্ণু। তবে এতদিন আমি তোমার কে ছিলাম?

লক্ষ্মী। ভাই ছিলে।

বিষ্ণু। ভাই ভগ্নীতে বিবাহ হয়?

লক্ষ্মী। বাবার আজ্ঞা। এস আর দেরী ক'রনা।

বিষ্ণু। বাবার আজ্ঞায় কি এত বড় অন্যায়ও ন্যায়ানুমোদিত হবে।

লক্ষ্মী। আমি আর কিছু জানি না তবে এইটুকু জানি যে চিরদিনই আমি বাবার, তিনি আমায় যাঁর জন্য এতদিন ধরে তৈরি করেছেন আজ নির্ব্বিচারে তাঁরই হব। তুমি ও তর্ক ক'রনা এস।

বিষ্ণু। তুমি যে এতদিন ধরে আমারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলে তা তুমি কেমন করে জান্‌লে?

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ নীরবে রহিল, পরে তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দু'টী অন্ধকারের মধ্যে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া বিষ্ণুর নয়নের উপর স্থাপিত করিল। বিষ্ণুর আরও নিকটে আসিয়া বলিল "একথা আজ নয়, আর একদিন বলিব। আজ তুমি আমায় বিশ্বাস কর যে একথা আমি আমার জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই জানি। তুমিত আমারই মত ইচ্ছা কর্‌লেই জান্‌তে পারবে, কিন্তু তোমার মন অন্য দিকে ছিল তাই জান্‌তে পারনি। এখন এসব কথা থাক। বাবা ডাক্‌ছেন; তিনি এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, চল উভয়ে আজ এক সঙ্গে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ক'রে নিয়ে সংসারে যে কাজের জন্য এসেছি তার জন্য প্রস্তুত হই-গিয়ে।"

বিষ্ণু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "লক্ষ্মী! তুমি পার্‌বে। এতখানি যে নির্ভর কর্‌তে পারে, এমন ক'রে যে আপনাকে ভুল্‌তে পারে সেইত' সব পারে" আমিও এমনি ক'রে আপনাকে ভুল্‌ব। 'চল।"

উভয়ে ব্রহ্মযশের নিকট চলিয়া গেল। এবং সেই গভীর নিশায় অন্য সকলের অজ্ঞাতে বিষ্ণুযশা ও লক্ষ্মী চিরদিনের জন্য দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ হইয়া গেল। এই বিবাহে কন্যা আপনাকে আপনিই দান করিল। এ বিবাহে কেবল ব্রহ্মযশা ও ভুবনেশ্বরী ব্যতীত বাহিরের আর কেহই জানিল না। জানিলেন কেবল সর্ব্বান্তর্য্যামী নারায়ণ। ভুবনেশ্বরী একবার মাত্র শুভ শঙ্খধ্বনি করিয়া নৈশ আকাশকেও সেই কথা জানাইয়া দিলেন।

১৩

শিবব্রত গাহিতেছিল

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে,
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।"

মহামায়া নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল এবং মাঝে মাঝে বক্রদৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের ভাব দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইতেছিল। শেষ শিবব্রত যখন অতি করুণ মুখভঙ্গী করিয়া গাহিল।

"দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া
তোমার লাগিয়া একলা জাগে,"

তখন সে হাসিয়া বলিল "ছোট দা! এত মিথ্যা কথাও তোমরা বানিয়ে বল্‌তে পার!"

শিবব্রত গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

মহা। তোমার ঐ হিয়াটীর খবর আমি বেশ জানি, ও কারুর জন্যই একলা জাগে না। ও কেবল নিজের জন্যই একলা জাগে।

শিব। যে কখনও এ ভাব অনুভব করেনি তার পক্ষে এমন কবিতাও বিফল। কাল যখন লীলা এই গানটী গাহিলেন—

মহা। তখন তিনি একেত মস্ত ভণ্ডামী কর্‌লেন, তার ওপর আমাদের সমস্ত নারীজাতির উপর এমনি ক'রে এমন একটা অপমানের বোঝা চাপিয়ে দিলেন যে যার জন্য চিরদিনই আমরা তোমাদের কাছে সুলভ হ'য়ে গেলাম। এমনি ক'রে তিলে তিলে আমরা তোমাদের খেলার জিনিষ হয়েছি। ভগবৎ সম্বন্ধে যে গান রচিত সে গান নিজের সম্বন্ধে লাগান যে কতদূর নীচতা তা' তোমরা কি বুঝ্‌বে?

শিব। নরনারীর চিরন্তন সম্বন্ধও ভগবানের তৈরী, একথা যে অস্বীকার করে সে মানুষ নয়, তার নাম যে কি, অভিধান খুঁজে তা' বার করা যাবে না।

মহা। নরনারীর চিরন্তন সম্বন্ধ এই যে নারীকে চিরদিন পুরুষের দাসত্ব কর্‌তে হবে। পুরুষের মন ভুলাবার জন্যই তার জন্ম, পুরুষের সুখের জন্যই তার সমস্ত

শিব। ভালবাসা পরস্পরকে পরস্পরের কাছে ছোটই ক'রে দেয়। আপনাকে ছোট ক'রে পরের কাছে দান কর্‌লে তবেই তার জন্ম সার্থক হয়। যে তা' না পারে সে মানুষ ত' নয়ই জীবও নয়। কারণ জীবমাত্রই বন্ধনের জন্য লালায়িত।

মহা। থাম আর জীবতত্ত্ব বুঝ্‌তে হবে না। এখন কথা হচ্চে তুমি রোজ রোজ লীলাদের ওখানে যেতে আরম্ভ করেছ কেন? ওরা ব্রাহ্ম ওঁদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ অসম্ভব, অথচ ঐ জ্ঞানহীন বালিকার মনটী অধিকার কর্‌বার জন্য তোমার এত ষড়যন্ত্র কেন? তুমি কি তবে বিবাহ করবে?

শিব। যদি করি।

মহা। যদি নয়, নিশ্চয়ই কর্‌তে হবে।

শিব। কেন? তোমার মতে ত' বিবাহ কর্‌লেই স্ত্রীলোক দাসী হ'য়ে যাবে। তার চাইতে বন্ধুভাবে এই মিলনে কি উভয়ের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে উভয়কে সুখের বন্ধনে বেঁধে রাখ্‌লে সেটা কি ভাল হবেনা?

মহা। তা যদি তোমাদের মত স্বার্থপর পুরুষরা পারত তা'হলে যে কি আনন্দের কথা হ'ত তা আর কি বল্‌ব! কিন্তু তোমরা কখনই নীতির বন্ধনের মধ্যে আপনাদের আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারবে না, উচ্ছৃঙ্খল পুরুষরা একবার যদি সুবিধা পায় তা'হলে কিছুতেই তাদের ঠেকিয়ে রাখবার যো নেই।

শিব। কি ক'রে জান্‌লে? তুমি'ত কখনও এমন ক'রে পুরুষদের পরীক্ষা ক'রে দেখনি। এই যে গিরীনদা এতদিন ধরে তোমার মনটী পাবার জন্য যাওয়া আসা কর্‌ছে, যাকে বাবা ব'লে রেখেছেন যে তোমার ইচ্ছা হ'লেই তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন, কৈ তাকে ত' একদিনও তোমার কঠোর পরীক্ষার মধ্যে ফেলে পরীক্ষা ক'রে দেখনি?

মহা। ছিঃ তুমি কি বল তার ঠিক নেই, নিজের ভগ্নীর সম্বন্ধে ঐ কথা বল্‌তে তোমার লজ্জা ক'র্‌ল না?

শিব। তোমারও আবার লজ্জা টজ্জা আছে নাকি? তুমি সাধারণ মেয়েদের মত ঐ সব কুসংস্কার হতে আজও

আপনাকে মুক্ত করতে পারনি? আমি ত' তোমায় কেবল মতের সমষ্টি ব'লেই মনে করি। আকারে তুমি মেয়েমানুষ কিন্তু কার্য্যে তুমি যে কি তা' তোমার সৃষ্টি-কর্ত্তাও বোধ হয় জানেন না।

শিবব্রত এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে চাদর লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। মহামায়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "কোথায় যাচ্চ? ব'সনা?"

শিব। ভয় নেই লীলাদের ওখানে যাচ্চি না।

মায়া। ঐ গানটা আর একবার গাওনা।

শিব। কোনটা?

মায়া। যেটা গাচ্ছিলে।

শিব। আমার চাইতে ঢের ভাল ক'রে যে গাইতে পারে তার কাছে একদিন শুন।

মায়া। লীলার কাছে?

শিব। হ্যাঁ তার কাছেও শুনতে পার, কিন্তু আমি তার কথা বল্‌ছি না।

মায়া। তবে কার কাছে শুনব?

শিব। গিরীনদার কাছে।

মায়া। তিনি এ গান জানেন?

শিব। না জান্‌লেও একবার শুনেই শিখে নেবেন।

মায়া। তা' তাঁর কাছে শুনব এখন তুমি আর একবার গাও না।

শিব। আমার কাজ আছে যে?

মায়া। থাক্‌গে কাজ, গাও।

শিবব্রত অগত্যা আবার গাহিতে আরম্ভ করিল। মহামায়া একমনে শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া ভয়ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিল "ওকি ওকি।" শিবব্রত চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল মহামায়া ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। সেও দ্রুত তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল প্রিয়ব্রত ও গিরীন্দ্র বিষ্ণুযশাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছে, বিষ্ণুর সমস্ত শরীর রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার দক্ষিণ স্কন্ধদেশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

প্রিয়ব্রত বিষ্ণুকে তাহার বসিবার কক্ষে লইয়া গিয়া চৌকির উপর শয়ন করাইয়া দিয়া গিরীন্দ্রকে বলিল "যাও হরেন ডাক্তারকে নিয়ে এসগে।" গিরীন্দ্র চলিয়া গেল। মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল "বাবাকে ডাকি।" প্রিয়ব্রত তাহাকে বারণ করিয়া বলিল "এখন কাউকে ব্যস্ত ক'র না। আগে এঁকে একটু সুস্থ করি তুমি জল আর নেকড়া নিয়ে এস।"

ভ্রাতা ভগ্নিতে মিলিয়া বিষ্ণুযশার রক্তাদি প্রক্ষালিত করিয়া দিয়া পুনর্ব্বার বাঁধা ছাঁদা করিতে করিতে ডাক্তার আসিয়া যোগদান করিল। ডাক্তার ঔষধাদি সমস্তই লইয়া আসিয়াছিল, সেইজন্য তাহার হস্তে রোগীকে সমর্পণ করিয়া প্রিয়ব্রত তাহার ভ্রাতাভগিনীর নিকট সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করিল।

প্রিয়ব্রত ও গিরীন্দ্র বিষ্ণুকে লইয়া কালীঘাটে গিয়াছিল। সমস্তদিন নানাস্থান দেখিয়া বেলা ৩টা আন্দাজ সময় তাহারা ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় দেখা গেল একটা ছাগশিশুকে বলি দিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত করা হইয়াছে। বিষ্ণু সেই দৃশ্য দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া বধকারীর হস্ত চাপিয়া ধরিল। সকলে তখন মহা গোলমাল বাধাইয়া দিল "মায়ের বলিতে বাধা"। "কোথাকার নাস্তিক এটা" "মার এটাকে" ইত্যাদি নানাপ্রকার শব্দ উত্থিত হইতে দেখিয়া প্রিয়ব্রত ও গিরীন্দ্র বিষ্ণুকে নানারূপে বুঝাইয়া অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিষ্ণুর দৃষ্টি অন্য কোন দিকে ছিল না, সে একদৃষ্টে সেই ভীত ছাগশিশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়ব্রত বলিল "আমরা বল্‌লাম আসুন, আপনি ও দৃশ্য দেখ্‌তে পারবেন না। কিন্তু উনি শুন্‌লেন না। শেষে আবার সেই কামার খাঁড়া তুলে যে মুহূর্ত্তে সেই পাঁঠাটাকে কাটতে যাবে সেই মুহূর্ত্তেই ছুটে গিয়ে উনি সেই খাঁড়াটাকে ডানহাত দিয়ে আট্‌কাতে গেলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওঁর পৌঁছিবার পূর্ব্বেই খাঁড়াটা নেমেছিল তাই হাতে আর বুকের মাংসের উপর আঘাত লেগেছে মাত্র নইলে"—

শুনিতে শুনিতে মহামায়ার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে একদৃষ্টে মূর্চ্ছিত বিষ্ণুর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তা এখানে আন্‌লে কেন"?

প্রিয়। এই অবস্থায় হঠাৎ ওখানে নিয়ে গেলে যদি ওঁরা ভয় পান তাই এখানে এনেছি

শিব। হাঁসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল হ'তনাকি?

প্রিয়। তা হ'লে একটা পুলিশকেসে পড়ে যেতে হবে। ওখানকার লোকেদের কোন রকমে থামিয়ে, ঐ খানেই একজন ডাক্তারের ওখানে নিয়ে গিয়ে এঁকে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে নিই তারপর একটা গাড়োয়ানকে ১০টী টাকা কবুলে ওঁকে এখানে নিয়ে এসে ফেলেছি। এখনও যে পুলিশকেসের সম্ভাবনা গিয়েছে তা নয় তবে আপাততঃ ভালয় ভালয় আমরা এখানে এসে পৌচেছি।

ডাক্তার বন্ধনাদি কার্য্য শেষ করিয়া নাড়ী দেখিয়া বলিল "আপাততঃ ভয়ের কেনে কারণ নাই.বেশী রক্ত পড়ায় ইনি অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন। Heart actionও বেশ ভালই আছে, এখন কেবল rest আর এই Stimulantটা মাঝে মাঝে খাওয়ানা চাই।"

শিবব্রত বলিল, "আপনি এখন যাবেন না ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার। তা বলেন বস্‌ছি কিন্তু আর আমার বস্‌বার দরকার নেই! একটু একটু হাওয়া করুন আর বেশ যখন জ্ঞান হবে দুধের সঙ্গে এই Stimulant mixture দিলেই চল্‌বে। আপনারা ওঁকে কালীঘাট হ'তে এত-দূরে এনে ভাল করেননি, ঐখানে দুদিন রেখে একটু সুস্থ ক'রে আন্‌লে হ'ত। আঘাত খুব deep নয়.তাই.—তবে হাতের ঐ আঘাতটা একটু ভোগাবে।

গিরীন্দ্র বাতাস করিতে করিতে দেখিল বিষ্ণুযশা নয়ন উন্মীলিত করিয়া তাহার দিকে চাহিতেছে। তাহাকে সাহস দিবার জন্য গিরীন্দ্র মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "ভয় কি?" বিষ্ণুযশাও হাসিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণুযশা বলিল "বাবা কৈ?"

গিরীন্দ্র। তাঁকে খবর দিইনি।

বিষ্ণু। তাঁকে ব'লে পাঠান আমি ভালই আছি। কিন্তু গিরীন বাবু আমার এইটুকু লাগাতে এত কষ্ট পাচ্ছি আর সে উঃ—

আর কথা বলিতে পারিল না কিন্তু তাহার নিমী-লিত নয়ন হইতে অবিরলধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার তখন ব্যস্ত হইয়া বলিল "আপনি একটু ঘুমাবার চেষ্টা করুন নইলে কষ্ট আরও বাড়বে।" বিষ্ণুযশা তাহার বিশাল চক্ষু ডাক্তারের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল "আমার এই সামান্য আঘাতের জন্য আপনারা ব্যস্ত আর সেই কাতরদৃষ্টিপ্রাণের জন্য মূক-নিবেদন কেউ দেখ্‌লেন না কেন? কেন সেই খাঁড়াটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিলেন না? আমার লেগেছে আর তার লাগেনি? মায়ের সাম্‌নে ছেলেকে কাট্‌লে, আর কেউ তাতে বাধা দিলে না?"

বিষ্ণুযশার উঠিয়া বসিবার চেষ্টা দেখিয়া ডাক্তার ও গিরীন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া শয়ন করাইল। তারপর ডাক্তার প্রিয়ব্রতকে ডাকিয়া বলিল "ইহার কোন আত্মীয়কে নিকটে থাকিতে ব'লে দিন। Diliriumএর মত বোধ হচ্ছে।"

শিবব্রত আর কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। মহামায়া ধীরে ধীরে বিষ্ণুর নিকটে গিয়া তাহার বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল "আপনি একটু স্থির হ'ন, নইলে সকলেই ব্যস্ত হ'য়ে পড়ছেন। বিষ্ণু তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "এমন অন্যায়ের অবিচারের স্থানে তোমরা আছ কি ক'রে?" মহামায়া কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল যেন বিষ্ণুর হৃদয় হইতে একটা প্রচণ্ড দুঃখ-তরঙ্গ তীক্ষ্ণধার ছুরির ন্যায় তাহার হস্তের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সে ব্যস্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইল।

তারপর ব্রহ্মযশা আসিলেন, সত্যব্রত আসিলেন আরও অনেকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং বহুক্ষণ চেষ্টার পর বিষ্ণু একটু সুস্থ হইল; কিন্তু সেই তীব্র দুখের বৈদ্যুতিক প্রথম আঘাত মহামায়া কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। সেই তীব্র করুণার বিশাল সহানুভূতির স্পর্শে তাহার নারীহৃদয়ের অন্তরস্থ মানুষটী এমন সজোরে কম্পিত হইয়া গেল যে আর সে শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে থামাইতে পারিল না। সে এতকাল ধরিয়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও তর্ক-শাস্ত্রাদির দ্বারা তাহার নারীহৃদয়ের যতখানি কোমলতা, যত-খানি সরসতা নষ্ট করিয়াছিল এক মুহূর্ত্তেই তাহার শতগুণ সরসতায় শতগুণ কোমলতায় তাহার সমস্ত অস্তিত্ব ভরিয়া উঠিল। বহুদিনের অনাবৃষ্টির পর সহসাগত প্রচণ্ড বর্ষণকে যেমন ধরাপৃষ্ঠ তাহার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়া

শুষিয়া লইতে থাকে, এই নবোদ্বোধিত নারীহৃদয় তেমনি করিয়া তাহার এই নবানুভূতিকে অতি লোল্যে আপনার মধ্যে টানিয়া লইতেছিল। তাই রাত্রে নিদ্রিত হইয়াও স্বপ্নে জগৎব্যাপী একটা বারিবর্ষণের শব্দের মধ্যে স্পষ্ট শুনিতেছিল কোথায় একটী অতি করুণ বীণাধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে। স্বপ্নে তাহার বোধ হইল সেই ধ্বনিকে যেন সমস্ত জগৎ তাহার বিপুল ভারে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু তবু তাহার করুণ নিবেদন দেশে দেশে কালে কালে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে;—সেই ধ্বনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে, গলা টিপিয়া ধরিলেও সে থামিতে চায় না। তাহার দিকে মন দাও আর নাই দাও সে আপনাকে জানাইবেই, সে আপনার কথা শুনাইবেই।

১৪

বিষ্ণুযশা অতি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। তাহার স্বভাবতঃ নীরোগ শরীরে আঘাতের ক্ষত বেশী দিন রহিল না, সামান্য একটু সুশ্রুষায় সে সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল।

দ্বিপ্রহরে কাজকর্ম্ম সারিয়া লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইতেই বিষ্ণু বলিল "লক্ষ্মী, আমি যদি আরও দু'একদিন পড়ে থাক্‌তাম তা'হলেই তোমাদের ভাল হ'ত।" লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল "কেন?"

বিষ্ণু। তা হ'লে বেশ মনের সুখে একটা ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে তোমরা নিশ্চিন্তমনে কাজকর্ম্ম কর্‌তে পেতে।

লক্ষ্মী। ছিঃ তা কেন? তুমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে উঠে আবার কাজকর্ম্মে মন দাও এই ত আমাদের ইচ্ছা।

বিষ্ণু। কিন্তু আমার ইচ্ছা করে মানুষকে এমনি ক'রে খুব কাছে পাই, একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার সমস্ত দুঃখ কষ্ট কেড়ে নিই।

লক্ষ্মী। অত বড় অহঙ্কার মনে পোষণ ক'র না, কতটুকুই বা তোমার শক্তি, এত বড় একটা ইচ্ছা পোষণ কর্‌লে পরের দুঃখ ত দূর হবেই না, লাভের মধ্যে নিজের দুঃখটাই বাড়বে।

বিষ্ণু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল "লক্ষ্মী! তুমি আমাকে বিয়ে করলে, তোমার সঙ্গে'ত আমার কিছুই মেলে না। তুমি এক রকম ক'রে দেখ, আমি আর এক রকম ক'রে সব জিনিষ দেখি; তোমাতে আমাতে কোন স্থানেই যোগ দেখ্‌তে পাইনে তবু তুমি আমার সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করেছ। ভগবানের একি লীলা!

লক্ষ্মী। এ যদি ভগবানেরই লীলা হয় তাহ'লে এতে দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই। যে যোগ আমাদের চ'খে ঠেক্‌চে না, সে যোগ তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি তাই আমরা মিলিছি

বিষ্ণু। আর যদি এ মিলন আমরাই জোর ক'রে তৈরি ক'রে থাকি? যদি এটাতে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হ'য়ে থাকে?

লক্ষ্মী। তা' হলে সে ভুল তিনি সুধরে দেবেন। না, এতে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই হয়নি। তুমি বিশ্বাস হারাচ্ছ কেন? কোথায় কোন দেশে আমি জন্মেছি তার ঠিক নেই; তারপর অদ্ভুত রকমে আমি তোমাদের কাছে এসে পড়ি। অমনি তোমরা আমায় এমনি ক'রে আপনার ক'রে নিয়েছ যে,আমি আর কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না যে আমি তোমাদের নই। এ হ'তে কি তুমি বুঝ্‌তে পাচ্চনা যে আমি আমাদের দুজনার জীবন একটা কোন গূঢ় উদ্দেশ্যেই এমনি ক'রে মিলিত হয়েছে। আমি বেশ বুঝেছি যে আমাদের বিবাহ না হইলেই ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা হ'ত। পরম জ্ঞানী বাবা এর মধ্যে সেই পরম ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছিলেন তাই আমাদের বিবাহ হয়েছে। এতে সমাজের বাধাকে তিনি গণনার মধ্যে আনেন নি। পাছে এতে সমাজে কোন বাধা উঠে তাই তিনি গোপনে একাজ সেরেছেন। আমরা একাজের জন্য জন্মেছি তার কাছে লোকের বাধা সমাজের এমন কি আমাদের পরস্পরের ব্যক্তিগত আমিত্বের বাধাকেও তিনি গ্রাহ্য করেন নি। তুমি বাবাকে বিশ্বাস কর, সম্পূর্ণরূপে তাঁর ওপর নির্ভর কর, তা'হলে আর কোন সন্দেহ তোমায় বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

লক্ষ্মী নত নয়নে এই কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিল, আর বিষ্ণুযশা নির্নিমেষ লোচনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া

তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল! লক্ষ্মী নিবৃত্ত হইয়া বিষ্ণুর সহিত নয়নে নয়নে সঙ্গত হইবামাত্র লজ্জিত হইয়া বলিল "তুমি বাবাকে না হয় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিও।" বিষ্ণু বলিল "আর আমার কোন্ সন্দেহ নাই। কিন্তু লক্ষ্মী, তোমরা আমায় যেমনটী দেখ্‌তে চাও, আমি চেষ্টা ক'রেও যে তা হ'তে পার্‌ব তা'ত আমার কিছুতেই মনে হচ্চে না। তোমায় কোন দিন বলিনি কিন্তু আজ আর না বলে থাক্‌তে পাচ্চি না, তুমি শুনবে?" লক্ষ্মী সেই শয্যার এক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

বিষ্ণু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "লক্ষ্মী! আমি কিছুতেই আমার মনকে ধরে রাখ্‌তে পারি না। আমার কেবলই ইচ্ছা হয় যে একছুটে বেরিয়ে চলে যাই। আমার চারিদিকে যতই বাঁধন দৃঢ়তর হচ্চে ততই মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ছে। কে যেন কেবলি আমাকে টান্‌ছে আর বল্‌ছে "ওরে একি কচ্ছিস্?" আমার কানের কাছে সারাদিনই একটা কান্নার শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। কেন এই ক্রন্দন? কে কাঁদ্‌ছে? তা কি কেউ ব'লে দিতে পারে? আমায় তোমরা যতই বাঁধ যতই ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখ আমি একদিন যাবই।

লক্ষ্মী। কোথায়?

বিষ্ণু। কোথায় বল্‌তে পার্‌ব না, কিন্তু যেমন ক'রেই হ'ক যেখানে গিয়েই হ'ক আমায় জান্‌তে হবে কে কাঁদ্‌ছে? যে দিন সম্বলপুরে প্রথম এই ক্রন্দন এই আয় আয় শব্দ শুন্‌তে পেয়েছিলাম সেই দিনই আমি ছুটে বেরিয়ে পড়্‌তাম, কিন্তু তা' পারিনি। কেন জান? এই তোমাদেরই জন্য। এখন বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে ভেতর হ'তে যতই মানুষ উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠে বা'র হ'তে ও তেমনি জোরে তাকে চেপে বসিয়ে রাখে। যিনি আমায় বাইরে যাবার জন্য ডান হাত দিয়ে টান্‌ছেন তিনিই বোধ হয় আবার বাঁ হাত দিয়ে আমায় বেঁধে রাখছেন। এখানে এসে পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে সেই ভীষণ বহিরাকর্ষণ ভীষণতর হ'য়ে উঠেছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমায় একেবারে তোমরা আট্‌কে ফেলেছ।

। আমাদের যদি কেবলমাত্র বন্ধন ব'লেই তোমার মনে হ'য়ে থাকে তাহ'লে এবন্ধন বেশী দিন টিক্‌বে না। যিনি বাঁধ্‌ছেন তিনিই যদি টানেন তাহ'লে কার সাধ্য নেই যে চুপ ক'রে থাকে।

বিষ্ণু সহসা লক্ষ্মীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "লক্ষ্মী, একবার আমার বুকের মধ্যে ঢুকে তুমি সেই আকর্ষণটাকে অনুভব করতে পার? তা যদি পার্‌তে তা হ'লে দেখ্‌তে সমস্ত সংসার আর এক মূর্ত্তিতে তোমার কাছে ফুটে উঠেছে। যেদিন প্রথম আমি এই রকম অনুভব করি সেদিন আমার মনে হ'য়েছিল যেন সমস্ত সংসার লক্ষ লক্ষ হাত বার ক'রে আমায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে। শুধু আমায় নয়, আমার মনে হ'য়েছিল যেন সমস্ত চরাচর আপনাকে টানাটানি ক'রে ভেঙ্গে ফেলে ছড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বেশ মনে হ'ল যে যেন কোন একটা অতি করুণাময় অথচ অতি অমোঘ্য হস্ত এই ভীষণ চাঞ্চল্যকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালিয়ে চালিয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় জগৎ সৃষ্টি কর্‌ছে। এই সংসার যতই ভীষণ ততই সুন্দর, এবং প্রত্যেক অণুতে অণুতে এত চাঞ্চল্য এত সংঘর্ষ অথচ ইহা এত সুন্দর এত আকর্ষণকারী। এই জগতের ঠিক মাঝখানটীতে হাসি আর অশ্রু এক সঙ্গেই ব'সে আছে। সেই অশ্রুটী কেবলি আমায় বল্‌ছে আপনাকে ছড়িয়ে দে, আবার সেই সঙ্গে সে সব ভুলান হাসিটী আমায় টেনে ধ'রে রেখে বল্‌ছে কোথায় যাবি, যাস্‌নে। কিন্তু আমার মধ্যে কেমন ক'রে জানিনে ঐ ক্রন্দনটী বেশী জেগে উঠেছে। এই কল্‌কাতায় এসে আমি চারদিকে কেবল ঐ কান্নাই শুন্‌তে পাচ্ছি। লক্ষ্মী তোমরা কেন পাও না?

লক্ষ্মী এতক্ষণ নীরবে ছিল, বিষ্ণুর এই আকস্মিক প্রশ্নে চমকিত হইয়া বলিল "আমি—আমি তোমায় বুঝ্‌তে পার্‌ছি না আমায় বুঝাও।"

বিষ্ণু কাতরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "দয়া ক'রে বোঝ লক্ষ্মী! আমি বোঝাতে পার্‌ব না, তুমি নিজে চেষ্টা করে আমায় বোঝ। বাবা আমায় কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চান আর এ আমি কোন্ দিকে যেতে চাচ্ছি এ আমায় কে বোঝাবে?"

নিশ্বাস ফেলিয়া লক্ষ্মী বলিল "যিনি বোঝালে আর কোন

সন্দেহ থাকে না তিনিই তোমাকে বোঝাবেন, আমি সামান্য নারী আমায় তুমি বুঝাবে, তোমায় আমায় এই সম্বন্ধ।"

বিষ্ণু। না লক্ষ্মী, এখানে তোমার চাইতেও আমি নিরুপায়। তুমি বাবার উপর নির্ভর ক'রে যেমন স্থির হ'য়ে আছ, আমি তেমনি নিজের উপর নির্ভর করতে না পেরে কাউকে সম্পূর্ণ অবলম্বন করতে না পেয়ে ঝড়ের মুখে খড়ের মত উড়ে বেড়াচ্ছি।

লক্ষ্মী আর কোন কথা কহিল না, কিন্তু তাহার অবনমিত বদনে একটা গভীর সহানুভূতির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপর রমণী হৃদয়ের কোমলতার ছায়াপাতে এমনি একটা কোমল মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল যাহা দেখিয়া বিষ্ণুযশা আর স্থির থাকিতে পারিল না; লক্ষ্মীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সে তাহার দক্ষিণ হস্তটী লক্ষ্মীর মস্তকের উপর রাখিয়া বলিল "লক্ষ্মী জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তিল তিল ক'রে একত্রিত ক'রে নারায়ণ স্ত্রীলোকের রূপ সৃষ্টি করেছেন; আর সমস্ত কোমলতা, করুণা, স্নেহ, ভালবাসা এক জায়গায় ক'রে তোমাদের হৃদয় তৈরি করেছেন। আমার ইচ্ছা করে, তোমাদের মত নির্ভরশীল হই, তোমাদের মত আপনাকে ভুলে পরের হ'য়ে যাই। তুমি জাননা লক্ষ্মী, তুমি আমার এক বিষয়ের গুরু।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দাঁড়াইল, তারপর একবার বিষ্ণুর উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া পরমুহূর্ত্তেই তাহার পায়ের তলায় মস্তক লুটাইয়া প্রণাম করিল। বিষ্ণু বাধা দিল না কিন্তু তাহার কম্পিতাধর, সজল চক্ষু, কণ্টকিত দেহ যে কথা লক্ষ্মীর নিকট নিবেদন করিল তাহা লক্ষ্মীর বাহ্য প্রণামের অপেক্ষা কোন অংশে কম ভক্তিজ্ঞাপক হয় নাই।

১৫

শ্যামাচরণ গিরীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভয়ানক তর্ক জুড়িয়া দিয়াছে। তর্কটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ লইয়াই প্রথম আরম্ভ হয়, কিন্তু সকল তর্কেরই যেমন দস্তুর তেমনি এই তর্ক ক্রমশঃ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। শ্যামাচরণ পুরুষের কর্ত্তব্যবিষয়ে জলন্ত বক্তৃতা করিতে করিতে এমন প্রচণ্ডভাবে স্বজাতীয় জীবদের গালাগালি সুরু করিল যে, গিরীন্দ্রের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতির লোকও বিচলিত হইয়া গেল। শ্যামাচরণ উত্তেজিতভাবে বলিল "এইত আমাদের চিরদিনের ব্যবহার। যত নিয়ম, যত বিধি, যত কঠোরতা সব স্ত্রীলোকদের জন্য, আর পুরুষদের পক্ষে ঐ এক নিয়ম "মাকড় মারলে ধোকড় হয়।"

গিরীন। তুমি যদি কখনও মনু বা যাজ্ঞবল্কের একখানা পাতাও উল্‌টাতে তাহ'লে একথা বল্‌তে না। পুরুষের জন্য যে সমস্ত বিধি নিষেধ আছে তার তুলনায় স্ত্রীলোকের বিধি নিষেধাদির সংখ্যা ঢের কম। কিন্তু পুরুষেরা যদি তা না মানেন তার জন্য কি শাস্ত্রকারদের দোষ দেওয়া যাবে? আর আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি সেইগুলা এখন পর্য্যন্ত মেনে চলে থাকেন তাই ব'লে কি বল্‌ব যে তাঁরা অন্যায় করেছেন?

শ্যামা। তাঁরা যে এতদিন মেনে চলেছেন সেটা কি শুদ্ধ আমাদের জোরের ভয়ে নয়? আমরা যদি with impunity আমাদের শাস্ত্রকারদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে যা ইচ্ছা তাই কর্‌তে পারি তা' হ'লে আমাদের ঘরের মা বোন এঁরা কি দোষ করলেন?

গিরীন। যদি শুদ্ধ গায়ের জোরের জন্যই তাঁরা ঐ সব নিয়ম মেনে থাকেন তা হ'লে বল্‌ব যে তাঁদের একটুও মনুষ্যত্ব নেই। কিন্তু যদি তাঁরা তাঁদের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধি হ'তেই ঐ সব নিয়মের যথাসাধ্য পালন ক'রে এসে থাকেন তা হ'লে থাক্‌লই বা পুরুষদের অন্যায়; তা'তে তাঁদের কি এসে যাবে?

শ্যামা। নিজের বেলায় সব জিনিষই বেশী ক'রে নিচ্ছ। ওদের বেলায় শুভবুদ্ধি, আস্তিক্য, করুণা, দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাল ভাল কথা লাগিয়ে নিজেদের চিরদিনের অন্যায়টার দিকে চোক ফিরুচ্ছ না। আমরা সারা সংসার ঘুর্‌ব, জগতের যত রকম সুখের উপকরণ আছে সব আমরাই ভোগ কর্‌ব আর মেয়েদের বেলায় যত সম, যম, দম নিয়ম। তাঁরা ঘরে বন্ধ থাক্‌বেন কেননা বাইরে বেরুলে তাঁদের রক্ষা করে কে? বাড়ীতে যত ভাল ভাল জিনিষ হবে আমরাই তা খাব আর তাঁরা খাবেন আমাদের

পাতা কুড়ান; আমরা বদমাইসি কর্‌ব আর তাঁরা আমাদের ভক্তি কর্‌তে বাধ্য, কারণ সতীধর্ম্ম একমাত্র তাঁদের, আমাদের পক্ষে সে নিয়ম খাটে না। তারপর আমরা ঘরের বাড়ী গেলেও তাঁদের রক্ষা নেই; হয় আমাদের সঙ্গে চল, না হয় জীবন্মৃত হ'য়ে থাক। সংসারের কোন কাজে তাঁরা বুদ্ধি খাটাতে পারেন না কারণ "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" ঋষিবাক্য! হায় রে ঋষি আর হায় রে তাঁদের হাজার হাজার বছরের দিস্তে পড়া বাক্য! শান্তিশতকের যত শান্তির কথা সব কটাতেই সেই এক কথা।

স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম্। "মোহমুদ্গর" সমস্ত স্ত্রীলোকের নাকের ওপর ঘুরিয়ে শঙ্করাচার্য্য তাঁদের ঘরের কোণে কোণঠাসা করেছেন। তবু আমরা গর্ব্ব ক'রে বল্‌ব আমরা স্ত্রীলোকদের দেবী ক'রে রেখেছি। ধিক্।

গিরীন। এক সঙ্গে সব্যসাচীর মত সবদিক আক্রমণ কর্‌লে তর্ক চল্‌তে পারে না। প্রথমে বল্‌লে সংসারের যত সুখ সবই আমাদের আর স্ত্রীলোকদের কেবলি দুঃখ, আবার সেই সঙ্গেই শান্তিশতক মোহমুদ্গর হইতে স্ত্রীলোকের অপমানজনক কথা তুলে আমায় একবারে দু'দিক হ'তে আক্রমণ ক'রেছ। প্রথমতঃ যারা কেবলমাত্র নিজেদের সুখই দেখে তারা হয় সংসারের মধ্যে অতি অধম লোক না হয় একবারে সংসারত্যাগী। যাঁরা সংসারকে ত্যাগ ক'রে বাইরে যেতে চাচ্ছেন তাঁদের পক্ষে সব চাইতে দুস্ত্যজ্য যে দু'টো তাদের গালাগালি কর্‌তেই হবে অন্ততঃ নিজের মনকে স্তোকবাক্যে বোঝাতেই হবে নইলে সর্ব্বস্ব ত্যাগ হয় নাই। তাঁদের কাছে সংসারও যেমন মন্দ বস্তু সংসারের মাঝখানে যাঁরা আছেন সেই স্ত্রীলোকেরাও তাই। আর এটা কেন ভুলে যাচ্ছ যে স্ত্রীলোকদের যারা কেবল দেহটা নিয়েই ব্যস্ত, যাদের কাছে স্ত্রীলোকদের দেহই কেবল আকর্ষণের বস্তু তারাই ত' স্ত্রীলোকের যথার্থ অপমান করে। শঙ্করাচার্য্য, কলহরন মিশ্র, বুদ্ধদেব প্রভৃতি ত্যাগী মহাত্মারা স্ত্রীলোকদের দেহটাই পরিত্যজ্য বলেছেন, আত্মার ত' কেউই পৃথক নয়। স্ত্রীলোকেও ত্যাগী যোগিনী হ'লে তাঁদের নাম ত পরমহংসই হ'য়ে থাকে তখন আর Sexual কোন রকম পার্থক্য থাকে না। তারপর প্রথম কথা অর্থাৎ পুরুষেরা সংসারের যত রকম সুখ আছে তা'র Lion's share নিজেদের জন্য রেখেছেন। কথাটা মিথ্যা নয় আমাদের দেশে এখন যে ভোগের আদর্শ এসেছে তাতে প্রথমে আমরাই আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, স্ত্রীলোকেরা এখনও তাতে তেমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। এটা আমাদের স্বার্থপরতা বল্‌তে পার বটে কিন্তু তাতে কি খুব খারাপই হ'য়েছে। আমরা নিজেরা দু'দিন লাফালাফি ক'রে এখন উল্টা সুর গাইতে ধরিছি। এই যে ইউরোপের ভোগের আদর্শ দেশে এসেছে তাকে এখন আমরাই গাল পাড়্‌ছি। কেন তা' আর বিচার করার দরকার নেই তবে কর্‌ছি এটা ঠিক আমাদের ধাতে এটা সইল না তাই গাল দিচ্ছি। মেয়েমানুষ যে বাহিরে এসে এখনকার Struggle for existenceএর মারামারির মধ্যে আপনাদের প্রবেশ করাননি এটা আমার মতে আমাদের বহু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। নব্য ইউরোপ স্ত্রীলোকদের জন্য আর খাট্‌তে রাজী নয়। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা, তাদের বাঁচিয়ে চলা ইউরোপের পুরুষদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। নব্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকরা এখন সে অধিকার হ'তে বঞ্চিত। এখন তাঁদের মৃণালভুজলতাকে ভুজদণ্ডে পরিণত ক'রে জীবনসংগ্রামে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পুরুষদের মত সমান খাট্‌তে হচ্চে। এস্থলে পুরুষরা যদি তাহাদের civic সমানাধিকার না দেয় তাহ'লে মস্ত বড় অন্যায় হবে। আমাদের স্ত্রীলোকদের এখনো সংসারের বাইরের যুদ্ধে টেনে আনি নি; তাঁদের—তোমার কথাতেই বলি—তাঁদের ঘরের কোণে খাইয়ে দাইয়ে সাজিয়েই রেখে দিচ্ছি। তাঁদেরও মস্ত কাজ কর্‌তে হচ্চে সংসারকে গড়ে তুল্‌তে হচ্চে, যেখানে অভাব আছে অপূর্ণতা আছে সেখানেই নিজেদের স্নেহ ভালবাসার হস্ত দিয়ে পূর্ণতা আন্‌তে হচ্চে। তবে যে সব পুরুষরা কেবল নিজের সুখটুকুই দেখে তাদের কথা ছেড়ে দাও। কারণ তেমন ভাবে দেখ্‌তে গেলে স্বার্থপর স্ত্রীলোকও সংসারে অনেক আছেন। আর পূর্ব্বকালে যে সব অন্যায় অবিচার করেছি, তার জন্য

যদি এখন মারামারি সুরু কর তাহ'লে তোমার বিচারটা ঠিক সেই বাঘ আর ভেড়ার বাচ্ছার মতই হবে। "তুই করিস নি তোর বাবা করেছে সে একই কথা" এ ভাবে বিচার ক'রে যদি আজ পুরুষদের মারতে সুরু কর তাহ'লে আমি নাচার।

শ্যামা। বক্তৃতাটা মন্দ দেওনি, রিপোর্ট করার উপযুক্ত বটে। সত্যটাকে ঢাকতে হ'লে এমনি ক'রেই নিজের আর পরের চোখে ধুলা দিতে হয়। মানুষ হ'ব, ভালর মন্দর আমরাই, আমরাই সংসারের আঠার আনা অধিকার ক'রে বসে থাকবো আর স্ত্রীলোকরা হবেন দেবী। আমরা করবো ভোগ আর তাঁরা করবেন ত্যাগ, মানুষ চারদিক দিয়ে সংসারের সঙ্গে লড়াই ক'রে আপনার মনুষ্যত্বটাকেই ফুটিয়ে তুলছে, স্বাধীনভাবে নিজেদের ভবিষ্যতকে গড়ে তুলছে। আর মেয়েদের বেলায় অমনি অন্য নিয়ম গড়া হ'ল। ছোট ছেলেকে যেমন ক্রমাগত কাপড় চোপড় জড়িয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ রাখলে সে কিছুতে বলিষ্ঠ, দুঃখকষ্টসহনক্ষম মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে না—আমরা আমাদের মেয়েদের তুলোয় করে আলমারিতেই যদি তুলে রাখি তাহ'লে তাঁরা পুঁতুলই হ'য়ে যাবেন মানুষ হবেন না।

গিরীন। ভায়া হে, আমাদের দুঃখকষ্টের হিন্দুসংসারে মেয়েমানুষ মোমের পুঁতুল তৈরি হ'য়ে ওঠে না। সংসারের কাজকর্ম্ম না করতে দিয়ে কেবল সাজিয়ে কুজিয়ে বাহিরে হাওয়া খেতে আর পুরুষদের সঙ্গে ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াতে দিলেই তাই হবার সম্ভাবনা। আমাদের সংসারে যদি ওঁরা কেবল দাসীই হন—নব্য বঙ্গসংসারে তাঁরা যে কি তৈরি হচ্চেন তা ভগবানই জানেন। তবে এইটুকু স্মরণ রেখো যে, যে দাসী সে কোন না কোনও কালে আপনার সম্পূর্ণ স্বত্বের কথা জানতে পেরে মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে কিন্তু যাঁরা পুঁতুল তাঁরা ক্রমশঃ জড়ত্বপ্রাপ্ত হবেন। আমাদের সংসারে কাজ ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে, স্ত্রীলোকের এক কাজ পুরুষদের এক কাজ। কিন্তু যে কারণে গুণকর্ম্ম বিভাগ হ'তে যে জাতিভেদটার জন্ম তাহাই crystalized হ'য়ে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যখন আমাদের সমস্ত হিন্দুজাতটা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে সুরু করেছে, ঠিক সেই সময়েই পুরুষরা অবিনয়ী স্বার্থপর হ'য়ে উঠে স্ত্রীলোকদের আলোক বাতাস হ'তে বঞ্চিত করেছে। এক সময়ে যেমন জাতিভেদের বন্ধনে বেঁধে দিয়ে আমাদের হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষা হ'য়েছিল তেমনি স্ত্রীলোকদের ঘরের মধ্যে পুরে তাদের রক্ষা করার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। এখন সে সব অবস্থা ক্রমশঃ সুধ্‌রে আসছে, স্ত্রীলোকেরা ক্রমশঃ আবার পূর্ব্বেকার স্বাধীনতার মধ্যে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিন্তু স্বাধীনতা মানে যদি উচ্ছৃঙ্খলতা হয় তাহ'লে সে পরাধীনতার চাইতেও ভয়ানক। প্রবৃত্তিময়ী নারীই সংসার গড়ে তুলতে পারেন, আবার তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহ'লে একদিনেই একটা সংসার উচ্ছন্ন দিতে পারেন।

শ্যামা। সংসার অর্থে পুরুষদের সংসার ছাড়া যদি আর কিছু বুঝতে তাহ'লে তোমার কথার মানে পাওয়া যেত। তুমি যে সব কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছ তার পেছনে ঐ একই কথা রয়েছে পুরুষদের জন্য মেয়েদের মরতে হ'বে, বাঁচতে হ'বে, কাঁদতে কাটতে হ'বে। এখানে সেবা ক'রে নিষ্কৃতি নেই আবার পরজন্মে মিলিত হ'য়ে তাঁর সেবা করতে হ'বে ব'লে হয় এখানে মর, না হয় সারাজীবন জীবন্মৃত থেকে মৃত পুরুষটীর উদ্দেশে নিজেকে সব জিনিস হ'তে বঞ্চিত রাখ। কেন এমন স্বার্থপরতা আমাদের? আমাদের সেই কেবল ওঁরা ভালবাসবেন, সেবা করবেন আর আমরা গায়ে হাওয়া দিয়ে সমস্ত দায়ীত্ব হ'তে মুক্ত থেকে ঘুরে বেড়াব? এ নিয়ম যারা ক'রেছে তাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে সমস্ত স্ত্রীলোকেরই উচিৎ একেবারে পুরুষদের boycot করা। আমার কেবলি মনে হয় যে এমন যারা স্বার্থপর তাদের জুয়াচুরী এতদিন ধ'রে ধরা পড়েনি কেন তাই আশ্চর্য্য! এমন আমাদের দেশ যেখানে স্বয়ং ভগবান্ এসে নিয়ম বেঁধে দিয়ে যান, ধর্ম্মসংস্থাপন ক'রে যান সেই দেশে জন্মে তিনি ত যা কিছু করেছিলেন সবই পুরুষদের জন্য, এই হতভাগিনীদের দিকে তিনিও ফিরে তাকান্ নি। এই ধর্ম্মের এই সব মতের আবার আমরা গরব করি—আমাদের গলায় দড়ি জোটে না কেন?

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া উত্তর দিতে যাইতেছে এমন সময়

মহামায়া ধীরি পদবিক্ষেপে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "কেবল মুখে Sympathy দেখালে কি হবে শ্যামাদা, কাজে কিছু করতে পারেন? আমাদের শিখিয়ে পড়িয়েও যে দাসীত্ব, মূর্খ রেখে চোক বেঁধে ঘরে পুরে রেখেও তাই। যেমন ক'রেই রাখুন ঐ ডান হাত ডান দিকে আর বাঁ হাত বাঁদিকেই আপনারা রাখ্‌বেন। পুরুষদের সমানাধিকার ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মাণী, আমেরিকা এ সব দেশেও মেয়েরা পাচ্ছে না এখানে ত নয়ই। উপরন্তু এখানে অজ্ঞানতার দরুণ আমাদের অবস্থা আমরা টের পাইনে, ইংলণ্ডে সব বুঝে সুঝেও মেয়েদের কোন উপায় নেই! ইবসেন মিল প্রভৃতিরা মুখে যতই Sympathy দেখান কাজের বেলায় মেয়েদের সেই কোণ-ঠাসাই ক'রে রেখেছেন। এমন যদি কোন মহাপুরুষ জন্মান যিনি প্রাণ দিয়ে এবং জীবন্ত ভালবাসা দিয়ে এই হতভাগিনীদের অবস্থা ভাল করার জন্য চেষ্টা করেন তাহ'লে বুঝ্‌বো যে আমাদের একটা উপায় হবে। বিদ্যাসাগরের মত আরও যদি দু'একজন আমরা আমাদের মধ্যে পাই তাহ'লেই আমাদের উপায় হবে। গায়ের জোরে যখন আমরা পার্‌ব না, তখন চুপ ক'রে থাকা আর না হয় কান্নাকাটী করা ছাড়া আর আমাদের কি উপায় আছে?

শ্যামাচরণ জয়গর্ব্বে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল আর গিরীন্দ্র গম্ভীরমুখে কি উত্তর দিবে তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করিল। মহামায়া তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল "গিরীনবাবু আপনি হারেন নি, আর যদি হেরে থাকেন তাহ'লেও মেয়েমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ আপনাদের সাজে না। অতএব উত্তরটা মনের মধ্যেই রাখুন। আর যদি পারেন ত' এমন কাজ করুন যাতে আর তর্ক কর্‌বার কিছুই না থাকে একেবারে সমস্তই মীমাংসা হ'য়ে যায়। আমার মত সামান্য স্ত্রীলোকের ওপর রাগ না করে-

গিরীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল "রাগ নয় মায়া—আমি ভাব্‌ছি এই যে দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্যের সূচনা দেখা দিয়েছে এর সঙ্গে আবার নূতন রকমের যুদ্ধ আরম্ভ হ'লে তার ফল যে কি দাঁড়াবে কে জানে। ইউরোপে যে ঢেউ উঠেছে তাই এসে আমাদের শান্তির কুটীরগুলিকেও যদি অশান্ত ক'রে তোলে তা'হলে তার ফল যে কত ভয়ানক হবে বলতে পারি না। ইউরোপ হ'তে সব সভ্যতার ঢেউ এসে প্রথম প্রথম আক্রমণ ক'রে তার ফলে আমাদের মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতা জেগে ছিল। কিন্তু সেটাতে আমাদের স্ত্রীলোকদের তত কিছু করতে পারেনি, দু'একদিন সেমিজ, জামা, ঘাঘরা, জুতা, সভাসমিতিতে একটু আধটু যেতে আবার তাঁরা আপনাদের স্বাভাবিক শুদ্ধবুদ্ধি দরুণ শান্ত হচ্ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডের Suffregettes movementএর নূতন ঢেউ উঠে এখানে তার তরঙ্গকে পাঠিয়েছে তার ফলে যদি কয়েকজন Pankhurstএর জন্ম হ'তে থাকে তাহ'লে গরীব বাঙ্গালিদের কি উপায় হবে তাই ভাব্‌ছি একেই তারা দারিদ্র্য পীড়িত কন্যাদায়গ্রস্ত তার ওপর—

শ্যামা। তাঁরা দারিদ্র্যপীড়িত, তাই ত স্ত্রীলোকদের স্বাধীনভাবে আপনাদের উন্নতি ক'রে পুরুষদের সংসারের ভার লাঘব করার দরকার। কন্যাগুলিকে যদি দায় ব'লে না মনে করতে পারি তা হ'লে একদিকে যেমন নারীর উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হবে আর একদিকে তেমনি নিজেদের ভার লাঘব হবে।

গিরীন। আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করতে পার্‌ছি না। এই যুদ্ধের মধ্যে মেয়েদেরও যারা টেনে আন্‌তে চান্ তাঁরা যে কতখানি পরার্থপর তা বুঝ্‌তে পারছি না। চাকরির বাজার কত সস্তা তাও জান, তা ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, জালজুয়াচুরি, হানাহানি দাঙ্গা এর মধ্যে নারীর নারীত্ব বস্তুটুকু বজায় থাক্‌বে?

শ্যামা। না থাকুক, কাঁচের পুতুল না হ'য়ে তাঁরাও যদি মানুষ হ'য়ে উঠেন তা হ'লে ভালই হবে।

গিরীন। আমার মনে হয় তা কিছুতেই হবে না। পুরুষের সঙ্গে নারীর যে সম্বন্ধ প্রথমে তার মূলেই এতে কুঠারাঘাত হবে। আমাদের পুরুষদের বাইরের সমস্ত সম্বন্ধই প্রায় contractual. মেয়েপুরুষের সম্বন্ধও যদি ঐ contractএর ওপর দাঁড় করাতে চাও তাহ'লে সংসার ব'লে কিছুই থাক্‌বে না। মেয়ে পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে contractএর যা ওপরে তাই আছে—স্নেহ, ভালবাসা,

নির্ভরতা এসব না হ'লে একজন আর একজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল্‌তে পারে না। সেখানে যদি কেবলি স্বার্থ এসে বাধা দেয় তাহ'লে সেখানে কেবল সন্দেহ আর সংঘর্ষ এসে দেখা দেবে। পুরুষদের স্বার্থপরতা যতটা পুরুষদের নিজেদের মধ্যে মেয়েপুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে তত নয়।

মহামায়া। পুরুষে পুরুষে স্বার্থপরতা থাকলেও মিল্‌ছে, স্বাধীনতার যেখানে মিলন সেইখানেই বন্ধুত্ব। মেয়ে-পুরুষের বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধন হ'তে পারে এটা অস্বীকার কর্‌ছেন কেন?

গিরীন। আমার ত' মনে হয় ও বন্ধনটা বন্ধনই নয়। আর কেবলমাত্র ঐ বন্ধন নিয়ে সংসার সৃষ্টি হ'তে পারে না। পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে আর একটা এমন জিনিষ আছে যার কাছে সব স্বার্থ সব দ্বন্দ্ব এক মুহূর্ত্তেই গ'লে গিয়ে তাদের এমন ক'রে মিলুবে যাতে তাঁরা উভয়ে মিলে এক হ'য়ে যাবেন।

মহামায়া। আমি যা বল্লাম তার জন্য আদর্শের প্রয়োজন। আমি কেবল্ তর্ক ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ব না। সেইজন্য আমি এমন একজনকে চাই, যিনি স্ত্রীপুরুষের চিরন্তন বন্ধনের উপরেও যে আর একটা বন্ধন আছে তাই উজ্জ্বল ক'রে চোখের সামনে ধর্‌বেন। সে ভালবাসা বা স্নেহ লৌকিক নরনারীর ভালবাসার চাইতেও অনেক বড়, অনেক উর্দ্ধের হবে। এমন একজনকে চাই—

মহামায়ার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে শিবব্রত ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়া বলিল "তোমরা এখানে তর্ক ক'রে মতামত নিয়ে সময় কাটাচ্ছ ওদিকে বিষ্ণুদাদাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল।"

শ্যামা। কেন কেন? সেকি?

শিব। সেই সেদিনকার কালীঘাটের ব্যাপারের জন্য। বিষ্ণুযশার নামে আত্মহত্যার চেষ্টার charge দিয়ে আরও কি কি charge দিয়ে তাঁকে warrant ক'রে ধরে নিয়ে গেল। বড়দাদা bail এর চেষ্টায় গিয়েছেন। আমিও যাচ্ছিলাম, আমায় বাবার কাছে খবর দিতে পাঠালেন।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই নির্ব্বাক হইয়া রহিল। তারপর মহামায়া রক্তবদনে শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া বলিল "এই দেখুন সংসারের ব্যবহার! সে সত্য বস্তুকে কিছুতেই সইতে পারে না। এতখানি স্নেহ, ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও যে সত্যিকার ভালবাসা—তাও সে সইতে পারে না। সে বড় বড় কথা ব'লে বড় বড় বই লেখে কিন্তু কাজের সময় তার ভেতরকার আসল জিনিষটা বেরিয়ে পড়ে।"

গিরীন্দ্র ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। শিবব্রত পিতাকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল। শ্যামাচরণও তাহাদের অনুসরণ করিল। কেবল মহামায়া গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার অবরুদ্ধ অশ্রুকে বৃথা থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

১৬

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বিষ্ণুযশার আত্মহত্যার চেষ্টার অপরাধের বিচার হইয়া গেল। ব্রহ্মযশা কোনও উকিল নিযুক্ত করিলেন না কিন্তু প্রিয়ব্রতের কয়েকটী উকিল বন্ধু স্বেচ্ছায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে প্রিয়ব্রতের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাহাতে বাধা দিলেন না। কিন্তু বিষ্ণুযশা এই নব্য উকিলগণের ঘোরতর কলরবে ও সাক্ষীগণের জবান-বন্দী জেরা ইত্যাদিতে বিরক্ত হইয়া বলিল "কেন আপনারা এত গোলযোগ কর্‌ছেন? সাহেব, আমি আমার প্রাণ দিয়েও যদি সেদিন সেই ক্ষুদ্র জীবটাকে বাঁচাতে পার্‌তাম তাও কর্‌তাম। কিন্তু তা পারিনি ব'লে আজ আমার লাঞ্ছনা ভগবান্ কর্‌ছেন আপনাদের দোষ কি?"

সরকারী উকিল তাড়াতাড়ি উঠিয়া আদালতকে বিষ্ণুর কথা নোট করিয়া লইতে বলিল। আদালত প্রশ্ন করিল "তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

বিষ্ণু। আমি ছাগশিশুটীকে বাঁচাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম।

সরকারী উকিল। বাঁচাবার জন্য তুমি উঠান খাঁড়ার তলায় গিয়েছিলে!

বিষ্ণু। সেই জন্যই ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু পৌঁছুতে পারিনি। প্রথমে ঐ লোকটীর হাত হ'তে খাঁড়া কেড়ে নিতে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধুরা বাধা দিলেন কিন্তু ঐ নিরীহ পশুটীর পরিত্রাহী চীৎকার শুনে আমি আর স্থির থাক্‌তে

পারিনি, ছুটে গিয়ে তার ওপরে পড়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তা হ'ল না।

সরকারী উকিল মহাশয়—সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া আদালতকে ইংরাজীতে বলিলেন "আমার আর কোন বক্তব্য নাই, ইহার চাইতে আর কি প্রমাণ করিবার দরকার আছে। ইহাতে সম্পূর্ণ (confession) দোষস্বীকার করা হইল। ইহার উপর আর কোন argumentএরও দরকার নাই।

সরকারী উকীল বসিলেন, বটে কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব অবাক হইয়া সেই সৌম্য নির্ভীক ব্রাহ্মণযুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটী ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য যে মহাপ্রাণ মানব আপনাকে উৎসর্গ করিতে উদ্যত হয় তাহাকে শাস্তি দিতে কাহার না হস্ত কম্পিত হয়?

আসামীর পক্ষের উকিল উঠিয়া ইংরাজিতে বলিলেন যে ঐ কার্য্য Temporary madness হইতে হওয়াই বিশেষ সম্ভব। ইহার যেরূপ ভাবভঙ্গী তাহাতে ইহাকে একটী ধর্ম্মোন্মত্ত মানুষ (religious fanatic) বলিয়াই বোধ হইতেছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটও বিষ্ণুযশাকে ছাড়িয়া দিবার একটী অছিলা খুঁজিতেছিলেন। তিনি আসামীর পক্ষের উকিলের মতে মত দিয়া উঁহাকে খালাস দিলেন। বিষ্ণু গম্ভীর পদবিক্ষেপে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াতেই গিরীন তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "উঃ কি ভয়ানক লোক আপনি! আমাদের এত চেষ্টা এক নিমিষে নষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন!" বিষ্ণুযশা হাসিয়া বলিলেন "চলুন বাড়ী যাই!" বাবা কেমন আছেন?

প্রিয়। তিনি ভালই আছেন। চলুন।

সকলে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ব্রহ্মযশা তাঁহার পাঠকক্ষে বসিয়া প্রিয়ব্রতের লিখিত কি একটা প্রবন্ধের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে এই নিঃস্বার্থ কর্ম্মীযুবকের কার্য্যকলাপে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতা দ্বারা তাহার কর্ম্মের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে বহু পুঁথি-পত্র ছড়ান, তাঁহার আসনের নিকটে কয়েকটা পুস্তকপূর্ণ "হোয়াট নট", ঘরের দেয়ালে কতকগুলি অদ্ভুত চিত্র এবং পুস্তকাদি পরিপূর্ণ র‍্যাক। এই সকল সরঞ্জামের ভিতরে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া তিনি নিবিষ্টভাবে পুস্তকাদির পাতা উল্টাইতেছিলেন এবং মাঝে একখানা খাতায় কি লিখিতেছিলেন। এমন সময় মহামায়া ধীরে ধীরে বিষণ্ণমুখে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অদ্য বিষ্ণুর মোকদ্দমার দিন তাই সে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে।

মহামায়া প্রবেশ করিতেই ব্রহ্মযশা পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি মা? তুমি আজ—এখানে যে? বস।" মহামায়া লজ্জিতমুখে একখানি স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। সে আজ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিল; কিন্তু আসিয়া দেখিল যে আজিকার সেই ব্যাপারের জন্য এবাটীর কেহই উদ্বিগ্ন নয়; অন্ততঃ এবাটীর কাহারও কোন কার্য্যে কোনপ্রকার উদ্বেগ বা চিন্তা প্রকাশ পাইতেছে না। মহামায়া তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া একেবারে ব্রহ্মযশের কাছে উপস্থিত হইয়াছে। সে জানিতে চায় যে এই শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন পরিবারটীর শান্তির উৎস কোথায়?

মহামায়া কোন উত্তর দিল না; কিন্তু তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখভঙ্গী দেখিয়া ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন "কি মা আজকের সেই মোকদ্দমার ব্যাপারের জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছ?" মহামায়া নীরবে মস্তক নত করিয়া কাপড়ের পাড় খুঁজিতে লাগিল। ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন "তা এতে আর সান্ত্বনা দেবে কি মা! ভগবান্ তার নূতন রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এতে অসন্তুষ্ট হ'লে চল্‌বে কেন? সুখের শিক্ষা অনেক হয়েছে এখন দু'দিন দুঃখের শিক্ষা হ'ক। যারা জেলে যায় তারাও ত' মানুষ; তাদের দুঃখ কষ্টও ত আমাদের বুঝ্‌তে হ'বে?

মহামায়া কাতরভাবে বলিল "তা কি এমনি ক'রে বুঝ্‌তে হ'বে?"

ব্রহ্মযশা। হ্যাঁ এমনি ক'রে দুঃখের সঙ্গে পূর্ণভাবে মুখোমুখী না হ'লে বই পড়ে, কথা শুনে তার শত ভাগের এক ভাগও বোঝা যায় না। আমরা শেখাই বক্তৃতা দিয়ে, আর নারায়ণ শেখান একেবারে দুঃখের মধ্যে ডুবিয়ে। আমাদের শিক্ষা এক কান দিয়ে শোনার পর আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু ভগবানের শিক্ষা হাড়ে হাড়ে বিঁধে থাকে।

মহামায়া। জেলে আর কি শেখাবেন তিনি?

ব্রহ্ম। তা ভগবান্ জানেন, তবে এইটুকু আমি বল্‌তে পারি যে নিজের প্রাণের সঙ্গে যেখানে যোগ সেইখানেই সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ হয় না। প্রাণ দিয়ে অনুভব করা চাই তবে ত' প্রাণ দিয়ে তাদের জন্য খাট্‌তে ইচ্ছা হ'বে।

মহামায়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল "এই এত বড় একটা অন্যায় ঘট্‌তে যাচ্ছে আর তার জন্য আপনি একটু দুঃখিত নন ?"

ব্রহ্ম। অন্যায়! কি অন্যায় ?

মহামায়া। উনি একটা জীবের প্রাণরক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন এমন কি নিজের জীবনকেও ত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন; কিন্তু তারই ফলে আজ তাঁর এই লাঞ্ছনা! সংসারের কাছ হ'তে যদি এরকমই ব্যবহার পাই তা হ'লে উপকার কর্‌তে যাওয়ায় লাভ ?

ব্রহ্ম। লাভ লোকসানটা কেবল নিজের দিক হ'তে যদি দেখি তা হ'লে সংসারে কোন বড় কাজই কেউ কর্‌তে পার্‌ব না। সংসার চিরদিনই মহৎকার্য্যকে প্রথমে এমনি ক'রেই অসম্মান করে। কিন্তু তারপর সেই কার্য্যের যখন ফল আরম্ভ হয় তখন বুঝ্‌তে পারে যে সে কি করেছিল। সে একটু বুঝ্‌তে দেরী করে ব'লেই কি তাকে দোষ দিতে হবে। ভাবুকের ভাব একেবারেই কিছু পরের হয় না। যখন সকলেই সে ভাবের উপযুক্ত হয় তখনই সেই ভাবটা সকলের হয়। আর তুমি এটাকে বিষ্ণুর লাঞ্ছনা বল্‌ছ কেন ? আর যদি লাঞ্ছনাই হয় তাতে তার দুঃখ হ'তে পারে কিন্তু সকলের এতে লাভই হচ্ছে। বিষ্ণুর দুঃখটা আজ তোমরা পাঁচজনে ভাগ ক'রে নিয়েছ অথচ তার নিজের ব্যক্তিগত লাঞ্ছনাকে অবলম্বন ক'রে তার ভাবটা ছড়িয়ে পড়্‌ছে, এটা কি লাভ নয় ?

মহামায়া বুঝিল যে এই ক্ষুদ্র পরিবারটার শান্তির মূল সূত্রটী কোথায়। তাহার মস্তক ভক্তিতে নত হইয়া গেল। সে ভাবিল 'এমনি করিয়াই ত' অনুভব করা চাই, এমনি করিয়াই ত সব জিনিষ বুঝা চাই। নইলে সে বুঝা বুঝাই নয়।'

মহামায়া ব্রহ্মযশাকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী পূজার কক্ষ হইতে এই মাত্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উন্মুক্ত কেশদাম ছড়াইয়া তাহার বক্ষ গণ্ড ও পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া বাতাসে ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। মহামায়া দেখিল ললাটের উপর চন্দনের টিপ এবং তদুপরি উজ্জ্বল সিঁন্দুর-রেখা সিঁথির উপর ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। লক্ষ্মীর বিবাহের পর মহামায়ার সহিত এই তাহার প্রথম সাক্ষাৎ। মহামায়া প্রথমটা চমকিত হইল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল "ভাই এ কবে হ'ল ?" লক্ষ্মী বুঝিয়া হাসিয়া বলিল "আজ ১০দিন হ'ল ?" মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল "তা আমরা জান্‌তে পারিনি কেন ?"

লক্ষ্মী। আমাদের বিয়ে গোপনেই হ'য়েছে। আমি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের মেয়ে, যদি কেউ এ বিবাহে বাধা দেয় সেইজন্য বাবা গোপনেই এ কাজ সেরেছেন।

মায়া। তাই বুঝি এতদিন আমাদের ওখানে যাওনি।

লক্ষ্মী। তুমিও ত কৈ একদিনও খোঁজ নিতে আসনি।

মায়া। আমি আসিনি কিন্তু আর সবাই ত' আস্‌তেন, পিসিমা আস্‌তেন, ক্ষাত, দুখু এরাও ত আস্‌ত ? কৈ এ কথা ত' কেউ কোনদিন আমায় বলেনি।

। বোধ হয় কেউ লক্ষ করেন নি। আমি বিবাহের চিহ্ন কিছুদিন গোপন ক'রে রাখ্‌তে আদিষ্ট হ'য়েছি।

মায়া। তবে আজ ?

লক্ষ্মী। আজ আমার কেমন প্রবল ইচ্ছা হ'ল যে সম্পূর্ণভাবে বিবাহিত স্ত্রীর বেশ ধারণ করি। তাঁর আর আমার মধ্যে যেন আজ আর কিছুই গোপন রাখ্‌বার দরকার নেই বোধ হ'ল। তাই তোমার কাছে এই বেশে এসে দাঁড়িয়েছি। মহামায়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "হ্যাঁ তাঁর বিষয়ে সমস্ত লজ্জা সমস্ত দ্বিধা আজই দূর ক'রে ফেলে দেওয়া উচিৎ! কি ভাগ্যবতী তুমি!"

লক্ষ্মী বিস্মিত হইয়া বলিল "তুমি আজ একথা বল্‌ছ ? তুমিত' বল বিবাহ কর্‌লে মেয়েদের সৌভাগ্যের কথা নয়।"

মায়া। সে কথা সব সময় ঠিক নয় ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

লক্ষ্মী বুঝিল যে এই কথা দ্বারা মায়া তাহার স্বামীর কতখানি সম্মান করিল। সেও পুলকিত হইয়া মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "চল বাবাকে প্রণাম ক'রে আসি।"

এমন সময় নিম্নতলে কাহার পদশব্দ শুনা গেল! লক্ষ্মী উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল "তিনি আসছেন।" মহামায়া বলিল "কে?" "স্বামী!"

উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিষ্ণু ধীর পদক্ষেপে উপরে আসিতেই লক্ষ্মী তাহাকে প্রণাম করিল। বিষ্ণু দক্ষিণ হস্তে লক্ষ্মীর মস্তক স্পর্শ করিয়া মহামায়ার দিকে চাহিয়া বলিল "এই যে আপনি!" মহামায়া উত্তর দিল না, কেবল নীরবে তাহাকে প্রণাম করিল। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে জ্ঞাসা করিল "মা কৈ?" ভুবনেশ্বরী পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিষ্ণু হাসিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া পিতার কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিল।

(১৭)

প্রিয়ব্রতের দুইটী লেফ্‌টেনাণ্ট গিরীন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণ। কিন্তু দুইজনের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। গিরীন্দ্রনাথ কর্ম্মীলোক, সারাদিন একটা না একটা কাজ লইয়াই আছে। আর শ্যামাচরণ ভাবুক, সে কেবল সারাদিন নানাপ্রকার মত ও ভাব লইয়াই আছে। প্রিয়ব্রত এই উভয়ের ঠিক মাঝখানে থাকিয়া উভয়কেই চালাইয়া লইয়া বেড়ায়। ইহারা উভয়েই তাহার সহচর অথচ কাজের সময় গিরীন্দ্রের ডাক পড়ে, আর তর্কের সময় আলোচনার সময় শ্যামাচরণের।

মাঝখানে এই বিষ্ণুঘশা আসিয়া পড়াতে প্রিয়ব্রত ও গিরীন্দ্র তাহাকে লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে শ্যামাচরণ কতকটা উপেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই সামান্য উপেক্ষায় অলক্ষ্যে তাহার ভাবপ্রবণ-হৃদয়ে একটা গূঢ় অভিমান ও হিংসার কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল। সে তাহার প্রতিপত্তি হারাইয়া আপনাকেও যেমন গৃহকোণগত করিতেছিল তেমনি মনে মনে এই নবাগত অদ্ভুত জীব বিষ্ণুকে আঘাত করিবার উপায় চিন্তা করিতেছিল।

এমন সময় প্রিয়ব্রত একদিন শ্যামাচরণকে ডাকিয়া বলিল—"ওহে শ্যামাচরণ, বিক্রয়সমিতির রিপোর্টটা দেখ্‌ছি গুরুচরণ দিয়ে গিয়েছে। তুমি দেখে শুনে যে সব নিয়মের পরিবর্ত্তন করার দরকার মনে কর সেইগুলো নোট ক'রে তোমার suggestionগুলো পাশে লিখে দাও।

শ্যামাচরণ কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হইয়া বলিল "কি হ'য়েছে শ্যামা?"

শ্যামাচরণ গম্ভীরভাবে বলিল "আমার suggestionটা কি খুব দরকার? এ বিষয়ে আমি আবার তোমার কি সাহায্য ক'রব?"

প্রিয়। তুমি ক'রবে না ত' কে ক'রবে?

শ্যামা। আমাকে আর যে তোমাদের বেশী প্রয়োজন আছে তাত' ব'লে বোধ হয় না।

প্রিয়ব্রত বুঝিল-ব্যাপার কি। হাসিয়া বলিল "এঁ্যা। Philosopher মানুষেরও রাগ অভিমান এ সব আছে দেখ্‌ছি! তা ভাই তুমি যতই রাগ কর তোমায় ত' আমরা ছাড়্‌তে পার্‌ব না। দরকার হ'লেই তোমার ডাক পড়্‌বে।"

শ্যামা। যার অস্তিত্ব কেবল দরকারের সময় মনে পড়ে, অন্য সময় যে তোমাদের কাছে অস্তিত্বহীন সে আর তোমাদের মধ্যে একটু স্থানের জন্য কামড়াকামড়ি ক'রবে না। আমায় রেহাই দাও ভাই। বিশেষতঃ তোমাদের এখন সন্ন্যাসী যোগী নিয়ে কারবার, আমাদের মত সংসারী জীবের সঙ্গ যতই ত্যাগ কর ততই ভাল।

প্রিয়ব্রত উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিয়া বলিল "বিষ্ণুর হিংসা ক'র্‌ছ! ওকেও মানুষে হিংসা করে? ও ত' কিছুই চায় না, তোমার পথে ও কখনো দাঁড়াবে না, তবু ওর ওপর তোমার এত রাগ হ'ল কেন?

শ্যামা। ওকে হিংসা ক'র্‌ছি এ কথাটার চাইতে এই কথাটাই ঠিক যে, ও তোমাদের দু'জনাকে কর্ত্তব্যের পথ হ'তে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যই আমার কষ্ট হ'চ্ছে। তোমার দীনাশ্রম অর্দ্ধেক তৈরী হ'য়ে পড়ে আছে তুমি যে Factory-পরিদর্শন-সমিতি করেছ তাও ভা[illegible]

ক'রে কাজ করছে না তোমার বিক্রয়-মণ্ডলী ত' দেখ্‌ছি কিছুই করে নি। তা ছাড়া যে সব বিষয়ে আমাদের statistics collect করার দরকার ছিল তার এ পর্য্যন্ত কিছুই হ'ল না। যারা খাটচে তারা তোমার এই রকম নেচে বেড়ান দেখে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছে। কোথায় গেল দরিদ্রের দুঃখ দূর করার চেষ্টা? কোথায় গেল তোমার নিঃস্বার্থ পরোপকার? নিজের দিকে একবার চেয়ে পরের মনের ভাবের বিচার কর।

শ্যামাচরণ বিরক্তভাবে মুখ নত করিয়া একখানা পুস্তকের পাতা উল্‌টাইতে লাগিল। আর প্রিয়ব্রত সহাস্যমুখে তাহার বক্তৃতাটী হজম করিয়া ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "ভাই, গিরীন আর তুমি, তোমাদের দু'জনকে নিয়েই ত' আমার সব। আমার যা ত্রুটি হবে তোমরা দু'জনে তা সুধ্‌রে নেবে। এইভাবেই ত' চিরদিন কাজ চলে আস্‌ছে। আমি ত' কেবলই ভুল করি, কিন্তু তার জন্য ত' তোমায় এতখানি বিচলিত হ'তে কখনও দেখিনি। আর যাঁর ওপর তোমার বিশেষ রাগ তিনি কখনও আমায় কর্ত্তব্য হ'তে দূরে নিয়ে যেতে চান না। কিন্তু তার অদ্ভুত চরিত্র আমাদের এতই অভিভূত ক'রে ফেলেছে যে, দু'দিন একটু কাজকর্ম্মের গোল হচ্ছে বটে। কিন্তু ঠিক জেনো, শ্যামা, যে এই মহৎ চরিত্র হ'তে আমাদের এমন একটা লাভ হ'চ্ছে যা'তে আমরা চিরদিনের জন্য ধন্য হ'য়ে যাচ্ছি। এমন জীবন্তভাবে ভালবাস্‌তে যদি একটুও শিখ্‌তে পারি তাহ'লে আমাদের কর্ত্তব্য আরও সহজ আরও প্রীতিপ্রদ হবে।

শ্যামা। তোমার একটা মস্ত গুণ ছিল যে তুমি মানুষকে পরীক্ষা না ক'রে বিশ্বাস কর্‌তে না। কিন্তু আজ তোমার সে ক্ষমতাটুকুও চলে গিয়েছে। তুমি এখন অন্ধ হ'য়ে গিয়েছ যে মানুষটার বাহির ভেতর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে না। দুটো ভাল কথা শুনে দুটো ভাব কালি দেখে ভুলে গেলে! ছিঃ!

প্রিয়। পরীক্ষা! বিষ্ণুযশাকে পরীক্ষা কর্‌তে হ'বে? যার সমস্তই স্বচ্ছ, যার কোন জায়গাতে একটুও অন্ধকার নেই, তার পরীক্ষা! তোমার এ হ'ল কি শ্যামা?

শ্যামা। কিছুই হয় নি, প্রিয়, আমি যা ছিলাম তাই আছি। তোমরাই আত্মহারা হ'য়েছ। তোমাদের এখন যে অবস্থা তাতে যে কোন প্রতারক এসে দু'টো ভাল কথায় ভুলিয়ে দিতে পারে, কিন্তু আমায় তা পারে না। আমি যদি ওকে দু'দিন হাতে পাই তা হ'লে সামান্য চেষ্টাতেই প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে ওর ভেতর বাহির এক নয়।

প্রিয়ব্রত অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল তারপর গম্ভীরভাবে বলিল "পরীক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা ক'রে থাক কর কিন্তু আমি তোমায় কোন সাহায্য ক'র্‌ব না। আমি যে তাকে বিশ্বাস কর্‌তে পেরেছি এতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। পরীক্ষা! কি ভীষণ অন্যায় কথা!

শ্যামাচরণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, সজোরে বলিল "অন্যায় নয়, কখনই অন্যায় নয়! তোমরা যে এই অপরিচিত অপরীক্ষিত জীবটিকে এমনভাবে নিঃসঙ্কোচে আপনার কাজে নিচ্ছ এইটেই অন্যায়!"

এমন সময় গিরীন্দ্রনাথ ও শিবব্রত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। শিবব্রত, শ্যামাচরণ ও প্রিয়ব্রতের ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি অন্যায় শ্যামা দাদা! তুমি বড়দার ওপর এত চ'টলে কেন?

প্রিয়ব্রত গিরীন্দ্রের দিকে বিষণ্ণনয়নে চাহিয়া বলিল "গিরীন, এখন শ্যামাকে সাম্‌লাও! ও বলে যে বিষ্ণুযশাকে পরীক্ষা না ক'রে ওর সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা করাটা ভাল হয় নি।"

শিব। সে কথাটা ত' ঠিক। শ্যামাদা আমি আপনার দিকে। এস একটা উপায় ঠিক ক'রে ফেলা যাক।

গিরীন্দ্র তাড়াতাড়ি শ্যামাচরণের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "ভাই যাই কর, ওকাজটি ক'রনা। পরীক্ষায় পাশ ফেল নিয়ে মানুষ বড় হয় না। এই দেখ তোমার আর শিবুর চেয়ে ইউনিভার্সিটীতে উচ্চস্থান কেউই পায় নি অথচ তোমাদের দুজনের চাইতেই প্রিয় সব কাজেই বড়!"

প্রিয়। এখন Self-admiration Societyর কার্য্য বন্ধ কর। শ্যামা, ও রাগারাগি মান অভিমান নিয়ে কাজ চল্‌বে না। নিজের বিষয় যদি ক্রমাগত ভাব্‌তে সুরু কর তাহ'লে নিজেকে এতই টেনে নামাবে যে তখন তোমায় টেনে

তুলতে অনেক বেগ পেতে হবে। আমার দোষ হয়েছে আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আজ হ'তে তুমি আবার আমার সকল কাজেই পাবে। তুমি যে আমার দোষ দেখিয়ে দিয়েছ তার জন্য তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি। আর কেউ হ'লে হয়তো আমার রাগ হ'ত, কিন্তু তুমি আমার নিতান্তই আপন জন, তোমার ওপর রাগ করা যায় না।

প্রিয়ব্রত স্বয়ং কাগজপত্র দেখিতে বসিয়া গেল। গিরীন্দ্রও তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। প্রিয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "তুমি এখনি যাও, তোমার মার জ্বর বেড়েছে। কেমন আছেন জেনে একেবারে দীনাশ্রমে চলে যেও! সন্ধ্যাবেলায় এস।"

গিরীন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল শিবব্রত শ্যামাচরণকে টানিয়া লইয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

শ্যামাচরণ। আমার ত' ভাই আর সহ্য হ'চ্ছে না।

শিব। আমারও না। দেশশুদ্ধ লোক ঐ একটা লোককে নিয়ে কেন যে এত বিব্রত আমি ত' বুঝ্‌তে পারিনে। এমনকি মায়াও ঐ দলে যোগ দিয়েছে। সেদিন লীলাও আমায় ঠাট্টা ক'রে বল্লে যে আমরা সবাই সন্ন্যাসী হ'য়ে যাচ্চি আর তাদের সঙ্গে কেন মিশ্‌তে যাই।

শ্যামা। শিবু, ভাই একটা কাজ করতে পার তাহ'লে এই অবতার মশায়ের ভাবের ঘরে হানা পড়ে।

শিব। কি কাজ?

শ্যামা। কিন্তু তোমায় ব'ল্‌তে ভয় ক'র্‌ছে, পাছে রাগ কর।

শিব। রাগ ক'র্‌ব না, তুমি বল।

শ্যামা। এ সংসারে সব চাইতে বড় পরীক্ষা যা তাই আমাদের করতে হবে। এই সাধুটি কেবল বাইরে বাইরে ঘুরে সাধুতা দেখিয়ে বেড়ান, এঁকে একবার তোমার লীলাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পার?

শিব। তা কেমন ক'রে হবে? আর সেই বা তা স্বীকার ক'র্‌বে কেন? না না সেটায় কাজ নেই।

শ্যামা। তা হ'লে উপায় নেই। কিন্তু ক'র্‌লে দেখ্‌তে পেতে যে দু'দিনের মধ্যে এই সাধুটি আমাদেরই মত সংসারের পাঁকে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

শিব। আর কোন উপায় যদি না থাকে তা হ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লে হয়। লীলাও আমায় সেদিন ব'ল্‌ছিল যে একবার ওঁকে দেখ্‌বে।

শ্যামা। তা হ'লে এই সুযোগ। কিন্তু তোমার নিজের যদি কোন—

শিব। না না সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। লীলাকে আমি বেশ জানি।

শ্যামা। অর্থাৎ তাঁর মনটি তোমারই সম্পূর্ণ দখলে আছে। সে আরও ভাল; এবং তুমিও এ ফাঁকে তাঁর বিশুদ্ধি একবার পরীক্ষা ক'রে নিও।

শিব। আরে না না, সে পরীক্ষা আর ক'র্‌তে হবে না। শ্যামাদা তোমার planটা খুব novel বটে---কিন্তু ভয় হ'চ্ছে যদি আমাদের gunpowder-plotটি ফেঁসে যায় তা হ'লে দাদার কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

শ্যামা। তোমার দাদার মত এক রকম নিয়েছি। সে সাহায্য ক'র্‌বে না ব'লেছে। আর সে আপন ধরণেই চলে, পরের খোঁজ রাখা তার অভ্যাস নেই।

শিব। কিন্তু বিকুর খোঁজ সে নিশ্চয় নেবে।

শ্যামা। তা উনি যদি মাকড়শার জালে আট্‌কে পড়েন তাহ'লে তোমার দাদা সঠিক বুঝ্‌তে পারবেন যে, উনিও আমাদের মত একটী মাছি মাত্র। এখন কথা হ'চ্ছে who is to bell the cat, মাছিকে কি ক'রে এই জালের কাছাকাছি করা যায়।

শিব। সে ভার আমার। ওকে দুটো কথায় ভুলিয়ে নিয়ে যেতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আর তার চাইতে এইখানে প্রথম সাক্ষাৎটা ঘটিয়ে দেওয়া যাবে।

দুইজনে পরামর্শ শেষ করিয়া প্রিয়ব্রতের কক্ষে আসিয়া দেখিল সে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কতকগুলা অঙ্ক লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। শিবব্রত হাসিয়া বলিল "বড়দা, আমরা ত' তোমার মহাপুরুষের পরীক্ষার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি।"

প্রিয় তাহার কার্য্য হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল "বেশ।"

শিব। কিন্তু এর পর তুমি আমাদের দোষ দিতে পাবে না।

শ্যামা। শিবু, কি বল্‌লে শুনতে পেয়েছ ?

প্রিয়। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই কর, কিন্তু কোনরকম অন্যায় বিপদে ওঁকে ফেল না বা নিজেরাও কোন অন্যায় কাজ ক'র না।

(ক্রমশঃ)।

মোহভঙ্গ।

(গাথা)

বিজয় নগরের তটিনীতীরে তাপস উদয়ের গেহ,
যুবক বিরাগীর আয়ত আঁখি, কনকনিন্দিত দেহ ;
উজ্জল রেখাহীন ললাট চুমি' ভ্রমর কেশ পড়ে লুটি',
অধরে হাসিমাখা, কোমলভাষা, করুণাভরা আঁখি দুটি ।
নদীর কূলে কূলে অশথ-ছায়, বিজন কুটীরের মাঝে,
বরষ মাস তা'র কাটিয়া যায় ভজন সাধনের কাজে ।
স্বজন কোথা তা'র ভবন কোথা যে, সে কথা কেহ নাহি জানে,
শুধু সে একতারা হৃদয়ে চাপি' বিভোর হরিনাম-গানে ;—
নদীর কলকলে যে কথা জাগে, যে ভাষা মর্ম্মরে বনে,
উতলা বায়ু বহে যে গান গাহি, কুসুম কলিকার কাণে,
তরুণ তাপসের মধুর স্বরে যেন সে গানখানি বাজে,
বাতাস হিল্লোলে কাঁপিয়া যায় নদীর কল্লোল মাঝে ;
পূরব নভোদ্বারে উষার হাসি যখন সবে যায় দেখা,
নগর রাজপথ ধ্বনিয়া গানে উদয় ফিরে পথে একা,
হরষে ওঠে জাগি' নগরবাসী, শিশুরা হাসি' ওঠে ঘুমে।
প্রবীণ প্রবীণারা বাহিরে আসি, নীরবে লুটি পড়ে ভূমে।
এমনি নিশিদিন নবীন যোগী বিভোর নাম-সুধাপানে,
আবেগে আঁখিনীর বহিয়া যায় মধুর হরিণাম-গানে।

একদা ভিক্ষায় বাহিরি' পথে উদয় একতারা করে
নগরদ্বারে' দ্বারে গাহিয়া ফিরে নয়নে বারিধারা ঝরে,—

দেখা কি হবেনাগো জনমে আর ? রব কি আশাপথ চাহি ?
তরণী ভিড়িবেনা ওকূলে কভু ? অকূলে যাব শুধু বাহি' ?
তোমারি মুখ চাহি' আসিনু ছুটি তেয়াগি' প্রীতিভরা গেহ,
বিসরি' ধূলাখেলা, হরষ-হাসি, বিসরি' জননীর স্নেহ।
কি বাঁশী বাজালে গো হিয়ার মাঝে, চরণে বাঁধ গেল টুটি,'।
সকল তেয়াগিয়া আপনহারা কাঙ্গাল এল পথে ছুটি'।
হে মোর হরি আজো নিবেনা তুলে ? মুছায়ে দিবেনা এ আঁখি ?
আমার পথচলা বিফল করি' সকল পথ রবে বাকী ?'—
নয়নে ঝর ঝর বহিল ধারা, উছসি' গান গেল থামি,'
আঁচলে আঁখি মুছি' ডাকিল ধীরে—'কোথা গো কোথা গৃহস্বামী !'
সহসা দ্বারপাশে হেরিল যুবা কনকপ্রতিমার পারা
ভুবনবিমোহিনী রূপসী বালা নীরব সম্বিতহারা ;
সজল অপলক আঁখির নীলে পরাণ বিগলিয়া আসে,
বুঝি ও নয়নের নীলিম হ্রদে নিখিল-বিশ্বিত ভাসে !
উদয় সম্ভ্রমে রহিল চাহি' অচল অবশিত কায়া,—
'মরিলো রূপময়ী ! আঁখিতে তোর আকাশ রচিল কি মায়া ?
সফল হল তবে আমার যত আশায় থাকা দিনযামী ?
আমার সাধনার অমরা হ'তে মানসী আসিলে কি নামি ?'
এ কোন্ অলকার কিরণ-লেখা ও আঁখি-অঞ্জনে রাজে !
নিখিল চেতনার দ্যোতনা বুঝি বিলসে তনিমার মাঝে !
একি এ ঝঙ্কার ! একি এছায়া ! হে মোর অন্তরময়ি !
মানস-প্রতিমার একি এ কায়া ! স্বপন-বাঞ্ছিতা অয়ি !
একিগো মদিরার আবেশ মরি অবশ হিয়া মাঝে পশে !
অতুল তনুবিভা বাহুর পাশে চিত্ত জড়াইয়া বসে !
ফুরালো পথ-চাওয়া—কে যাবে চলি' নূপুর গুঞ্জরি' পায়ে,
আগল খুলে থাকা নিশীথ-যামে বিজন আঁধারের ছায়ে।
ফুটিল হিয়া তব নয়নপাতে ফুটিল শতদলসম
লুটায়ে দিনু ওই চরণতলে পরাণ-অঞ্জলি মম।'
চমকি' জাগে বালা রাঙিয়া উঠি', সলাজ সঙ্কোচভরে
কহিল মৃদুভাষে আনত আঁখি,—'অতিথি ! এস মোর ঘরে।'

'মোহিনি! একি তোর মায়ার ফাঁসি? লহ গো লহমোরে টানি,'
নিখিল বন্ধনে হারায়ে দিয়া তেয়াগ সার্থক মানি।'
রমণী চাহে দুটী নয়ন তুলি, কহিল,—পিঞ্জর মাঝে
বিহগী চেয়ে থাকি নীলিমা পানে, পরাণে ক্রন্দন বাজে;
আপন করে রচা কারার কোণে আপনি মরি শুধু কাঁদি',
কেমনে জানিনাগো আপন পায়ে আপনি শৃঙ্খল বাঁধি!
এসগো মুকতির বারতা-বাহি! এসগো অমরার আলো!
বিজন কারাগেহে আঁধার কোণে জ্বালো গো দীপশিখা জ্বালো।
এসগো সুতরুণ জরার মাঝে, এসগো ঝঙ্কার গানে,
এসগো সুন্দর বিথারি' আভা, চেতনা সঞ্চারি প্রাণে,—
উদয় বিস্ময়ে হেরিল যেন নিখিল নাহি আর নাহি,
সকল জুড়ি' দু'টি নয়ন জাগে মরমতলে তার চাহি'!
ভুলিল অশথের পুরাণো ছায়া, নদীর কল্লোল-হাসি,
নীরবে প্রবেশিল রমণী-গেহে স্বপন-হিল্লোলে ভাসি।

* * * *

কোথায় গেল মিশে স্বপন-ছায়া নিবিড় তামসীর তলে,
নিখিল তমোময়ী ছায়ার মাঝে কামনা রূপ ধরি' জ্বলে!
দেহের মোহপাশে চেতন-হারা পরাণ অবশিয়া লুটে,
লালসা-চঞ্চল হৃদয়তলে গভীর তৃষা জাগি' ওঠে!

* * * *

নগরে গৃহে গৃহে পথের মাঝে ফেণায়ে ওঠে কথারাশি;—
তাপস উদয়ের একিগো রীতি, গোপনে নারী-সহবাসী'।
কেহবা বলে—'ওরে টানিয়া আনি' মাথায় ঘোল ঢালি' দেহ,'
'প্রহারে দেশছাড়া করিব ওরে'—কোমর বাঁধি' বলে কেহ।
উদয় কহে ধীরে প্রিয়ার কাণে—উধাও আয় ছুটে যাই,
বিপুলা ধরণীর স্নেহের কোলে মোদের হবে নাকি ঠাঁই?
শ্যামল কাননের শয়ন'পরে উদার আকাশের তলে
দুজনে মুখোমুখি রহিব চাহি,' বরষ যাবে চলি' পলে;
চরণে কলকল নিঝর-বারি গাহিবে প্রণয়ের গাথা,
কোকিল কুহু কুহু উঠিবে গাহি' বিরহী-মর্ম্মের ব্যথা,

আকাশ বিস্ময়ে রহিবে চাহি' ধরার স্বর্গের পানে,
বাতাস শিহরিয়া যাইবে বহি' কানন মর্ম্মরি' গানে।

গোপন নীড়-হারা বিহগসম অসীম নীলিমার তলে
তরুণ তরুণী সে আপনহারা উধাও কোথা ছুটে চলে ;—
কোথায় মিথিলা সে, কাঞ্চী কোথা, কোথায় গুর্জ্জর-ভূমি,
কোথা সে বঙ্গের শ্যামল শোভা সুদূর দিক্-রেখা চুমি',
কোথায় সাগরের সিকতা-ভূমে তমালতালীবন রেখা,
কোথা সে হেমগিরি-তুষারশিরে উষার সিন্দুর-লেখা,—
মাতাল বায়ু সম বেড়াল ছুটি পরশ মদিরার মোহে,
নিখিল হারাইয়া অতল তলে দোঁহায় ডুবি' র'ল দোঁহে ;
একটি নিশীথের স্বপনসম বরষ গেল চলি' কবে,
বাহুর নীড়মাঝে বিহগদুটি জড়ায়ে রল সুনীরবে।

সকল দেশ ভ্রমি' প্রিয়ার সহ, বিজন গিরিসানুদেশে
উদয় বিরচিল কুটীর নব বিরল লোকালয়ে শেষে ;
সমুখে উচ্ছ্বলে নিঝরধারা কানন-অঞ্চল চুমি' ;
উপল-প্রতিঘাতী সলিল-স্রোতে মুখর নির্জ্জন ভূমি ;
ধূসর গিরিরাজি বিপুল স্নেহে ঘিরিয়া আছে চারিপাশে,
মোহিনী বনরাণী আবরি' তনু শ্যামল অঞ্চল-বাসে।
অনিদ মধুরাতে পাগল বায়ে বনের মর্ম্মর-কথা ;
কঠিন পাষাণের মরম-গলা করুণ কল্লোল-গাথা,
উদয় রমণীর হৃদয়-তারে মধুর ঝঙ্কারি' ওঠে।
অধীর বাহুপাশে প্রাণের ভাষা নিবিড়তর হ'য়ে ফোটে।
দিবসে ভিক্ষার লাগিয়া যবে প্রবেশে পল্লীর মাঝে
চলিতে রূপ যেন ঝলকি' ওঠে, কণ্ঠে হরিনাম বাজে,
নিরখি' গ্রামবাসী চমকি' কহে—দেবতা এল বুঝি ভূমে !
বুঝি ও চরণের পরশ মাগি' ধরণী পদতল চুমে।
গভীর সম্ভ্রমে লুটিয়া পায়ে জীবন সার্থক মানি'
নিবেদে দেবতার পূজার তরে কুড়ায়ে ফলমূল আনি'।
সেদিন মধু-রাতে আকাশ ছাপি' উছলে রজতের ধারা,
ফাগুন হাহা শ্বসে উদাসীসম বিভল বন্ধনহারা,

শিলার গায়ে গায়ে নিঝর-জলে মাণিক ঠিকরিয়া উঠে,
আঁধার বনতলে পাতার ফাঁকে অলস চন্দ্রিকা লুটে ;
তরুর মরমর, সলিল-হাসি, বায়ুর গুঞ্জন-বাণী,
নিঝুম যামিনীর মরমকথা বিরলে করে কাণাকাণি।

উদয়শিলা'পরে বসিয়া একা, রমণী কাছে তা'র নাহি,
উজল আকাশের নীলিমা মাঝে নীরবে ছিল কোথা চাহি' ;
জোছনা-আলো-পাতে মুকুতাসম ঝলকি' ওঠে আঁখিধারা,
নিতল নভতলে নীলিম সরে উদয় ছিল হ'য়ে হারা।
সহসা কহি ওঠে,—'হে মোর হরি ! কোথা এ নিয়ে এলে টানি' ?
আলেয়া-আলো লাগি' আপন আলো ভুলালে কেন নাহি জানি।

টুটেছে মোহ ঘোর উঠেছে জাগি' আবেশ-অবশিত হিয়া'
ফুটেছে গগনে গো প্রভাতী-রেখা আঁধার চঞ্চলি' দিয়া !
কোথা সে আবেশের লহরী লীলা, কোথা সে উন্মাদ তৃষা ?
কোথা সে মদিরার মাধুরীপানে চপল নিদহীন নিশা ?
চমকি' দেখি চেয়ে নয়নজলে বাহুর বন্ধন-পাশে
পরশ-থরথর কোমল কায়া ছায়ায় মিলাইয়া আসে।
ঘুচিয়া গেল আজি স্বপন-মোহ, গেলগো গেল খুলে আঁখি !
ছলনাময় ! ছল পড়িল ধরা, আর ত লভিবনা ফাঁকি।

আকাশ বাজালগো বাজাল বাঁশি—হিয়া যে বাধা নাহি মানে,
কে যেন ডাকিছে সে পুরাণো সুরে নিঝর-কল্লোল-গানে !
পড়িছে মনে সেই তটিনীবারি, পুরাণো অশথের ছায়া,
পড়ে গো পড়ে মনে উষার আলো, বিজন কুটীরের মায়া !
পড়িল খসি' মোর চরণ-ফাঁসি, রূপসি ! থাকো রূপ লয়ে,
ও রূপ-সুধা-রসে ডুবিতে গিয়া ফিরিনু বিষ-জ্বালা সয়ে।'
—চলিল ছুটী একা পাগলপারা কোথা সে রাজধানী রাজে'
রমণী রল পড়ি' কুটীরতলে মগন স্বপনের মাঝে ;

ভ্রমিয়া দেশ দেশ দিবস কত উদয় উতরিল গেহে,
আবার একতারা তুলিয়া নিল আবেগ আকুলিত স্নেহে,—
প্রভাতে ঘুমঘোরে শুনিল সবে নগর-রাজপথ বাহি'
কে চলে পরিচিত মধুর স্বরে আবার হরিনাম গাহি'।

বরষ গেল ; সারা নগর জুড়ি' উঠিল হাহাকার-ধ্বনি,
করাল মহামারী হেরিয়া সবে ব্যাকুল পরমাদ গণি'।
জাগিল চারিধারে মরণ-ভেরী করুণ ক্রন্দন-রবে,
নেহারি' নরকের তামসী ছায়া পলাল গৃহ ছাড়ি' সবে।
কুটীরে পথে পথে শবের মেলা, বাতাসে পূতিবাস ভাসে,
গলিত শব লয়ে শৃগালদলে বিকট রব চারিপাশে।
কোথা' বা 'জল জল' ডাকিছে কেহ কাতর সকরুণ স্বরে,
কোথা বা সন্তানে চাপিয়া বুকে জননী বৃথা কাঁদি মরে।
উদয় আপনারে ভুলিয়া গেল, কাঁদিয়া ওঠে তা'র হিয়া,—
মুছিয়া দিব আজি সবার আঁখি করুণা-অঞ্চল দিয়া।

ভুলিল গান-গাওয়া আপন মনে বাজায়ে একতারা খানি,
ছুটিল গৃহে গৃহে স্বজনহারা পীড়িতে বুকে নিতে টানি'।
—সহসা বিস্ময়ে হেরিল পথে—ও কে ও ভীতিহীনা নারী
ভ্রমিছে ক্ষুধিতেরে আহার দিয়া, তৃষিতে যোগাইয়া বারি!
চমকি' কাছে আসি' থামিল যুবা, চাহিয়া রল মুখপানে,—
একি সে জ্বলজ্বল নয়নবিভা আজিও জাগিছে যা' প্রাণে?

একি সে নিখিলের লাবণি-ঢালা কোমল পুষ্পিত লতা?
একি সে লীলাময়ী মোহিনী বালা প্রথম-যৌবন-লতা?
কোথা সে রূপবিভা? উজল ভালে নিঠুর অঙ্কিত রেখা!
নাহি সে চঞ্চল নয়ন, জাগে গভীর কালিমার লেখা!
একি গো ঝলমল আলোকছটা রাজে ও ক্ষীণ তনু ঘেরি'
হিয়া কি আঁখিজলে গলিয়া ঝরে নিখিল দুখজ্বালা হেরি

মরিলো নারি! তোর এ কোন্ ছবি, এ কোন্ লীলা আজি অয়ি!
এ কোন্ সুষমায় ভরিয়া তনু আসিলে কল্যাণময়ি!
অভাগা যাচে ক্ষমা চরণে তোর, হে দেবী করেছি কি হেলা!
এ যে গো দেবতার প্রতিমা ল'য়ে অবোধ বালকের খেলা।'

রমণী মৃদু হাসি' কহিল ধীরে,—'তাপস! বুঝেছ কি ফাঁকি?
আপনি আপনারে ছলিয়া মোহে এবার ফুটেছে কি আঁখি?
দেহের শোভা ল'য়ে রচিয়া ডালি প্রেমের পূজা কভু নহে,
প্রেম যে ফল্গুর বালুকাতলে গোপন ধারাসম বহে।

মিলন—নহে সে তো পরশ মোহ, প্রাণের যোগ সে যে মাগে,
দেহের ব্যবধান খুলিলে শুধু পরাণ চঞ্চলি'-জাগে।'
উদয় কহে,—আজি টুটেছে মোহ, এসলো এস তবে নারি!
ঘুচাব নিখিলের বেদনা জ্বালা, মুছাব নয়নের বারি।
যে পথ খুঁজে খুঁজে হারানু দিশা, যে আলো হারাইল আঁখি,
লহ গো হাতধরি' হারানো পথে অশোক-পদরেখা আঁকি'।
সফল সার্থক মিলন আজি সেবায় অন্তরদানে,
পরাণ লভেছে গো তৃষার বারি করুণা-বিকশিত প্রাণে।'

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

'খুনে আসামী'

"ফাঁসি খুব ভোরবেলায় হয়,—না? সে একরকম মন্দ নয়; একটু আঁধার থাকতে থাকতে হ'লে আরও ভাল, বেশী লোক হবে না; কিন্তু মান্না আর সোণী নিশ্চয় আস্‌বে;—যা'হোক এ নিয়ে ভাব্‌বো না, বড় খারাপ লাগে।

বাবু, তুমি আমার সব কথা শুনতে চাও, সে বেশ, গল্প বল্‌তে আমার ভাল লাগে, খুব ছেলেবেলাকার কথাও আমার মনে আছে—এই তো সেদিনকার কথা; গলির মোড়ে আমার মায়ের ছোট পানের দোকান ছিল, তারই নীচে একটা অন্ধকার ফোকর, সেইখানে ব'সে ব'সে আমি রাস্তার লোক দেখ্‌তাম, কতরকমের লোক আস্‌ত যেত, কেউ আবার পান কিন্‌তো, দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরিয়ে নিত, এই রকম।

গলির ভিতর আমাদের ছোট ঘরখানি—একটা কুটরী আর সাম্‌নে একটু রোয়াক, পাশের দুটো ঘরে সোণীরা থাক্‌তো, রোয়াকের একধারেই রাঁধাবাড়া চ'ল্‌ত, বাড়ীর সাম্‌নে একটা বড় নর্দ্দমা ছিল, আমি কতবার তার মধ্যে প'ড়ে গেছি; আমার আগে যে 'বহিন' হ'য়েছিল সে তাতেই ডুবে ম'রেছে।

একটু বড় হ'লে আমি আর বাড়ী থাক্‌তাম না, সব সঙ্গীরা মিলে সারাদিন ঘুরে বেড়াতাম, সে সময়টা বেশ মজায় কাটত; বড় বড় দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নানা রকমের জিনিষ দেখ্‌তাম, আর তাই নিয়ে কত তর্ক হ'ত, পুলিশে মাঝে মাঝে তাড়া ক'র্‌লে আমরা একছুটে গলি ঘুঁজিতে ঢুকে যেতাম আর দূর থেকে তাদের কলা দেখাতাম, ভারি স্ফূর্ত্তি হ'ত; মাঝে মাঝে আমরা ময়দানের দিকে চলে যেতাম, সেখানে কত সাহেব, মেম, গাড়ী ঘোড়া, মটর, সে এক তাজ্জব ব্যাপার ব'লে মনে হতো, একটু ভয়ও লাগ্‌ত; ময়দানের বড় বড় গাছের তলায় আমরা শুয়ে থাক্‌তাম, সেখানে ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিতে কি আরাম! খালের ধারেও অনেক সময় কাটিয়ে দিয়েছি, কত জিনিষ ভেসে আসে, একদিন একটা প্রকাণ্ড টিনের ভাঙ্গা বাক্স ভেসে এসেছিল আমরা সেটাকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসি।

এম্‌নি ক'রে সময় কাটছিল এমন সময় একদিন টহল্‌ থেকে ফিরে শুনি আমার মা নাকি পালিয়ে গেছে, এক মুসলমান ফিরিওলার সঙ্গে সে চ'লে গেছে; বাবা খুব

রাগারাগি কচ্ছিল, তার চীৎকারের চোটে বস্তির সব লোক এসে তখন জমে গেছে, বাঁশের মোটা লাঠিটা হাতে নিয়ে আমার বাবা চেঁচিয়ে মা'কে শাসাচ্ছিল আর সৌখীর 'ফুফু' তাকে নানারকমে শান্ত করবার চেষ্টা কচ্ছিল—আমার খুব ভয় হ'তে লাগ্‌ল যেন আমারই দোষ আমি ভয়ে ঘরে ঢুক্‌তে পার্‌লাম না, সেদিন আর খাওয়া হয় নাই তবে মায়ের উপর আমার কোন রাগ ছিল না।

বাবা মস্ত জোয়ান লোক ছিল, তার হাতের একটা চড়ে ঘণ্টাদুই মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ ক'র্‌ত, সমস্ত দিন কলে খেটে এসে সে সন্ধ্যাবেলায় খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ত; তবে এক একদিন, যদি ছুটি থাক্‌ল তা'হলে ইয়ার দোস্ত নিয়ে নেশা ক'রে খুব হাল্লা ক'র্‌ত, আমি চোখ বুজে এককোণে প'ড়ে থাক্‌তাম যেন কতই ঘুমুচ্ছি।

মা যাওয়ার পর থেকে খাওয়াটা সৌখীর বাড়ীতেই হ'ত; আমরা তাদের মাসে এগার টাকা ক'রে দিতাম, তাদের বাড়ী কাচ্চাবাচ্চা অনেক, একটা ম'র্‌তে না ম'র্‌তে আর একটা হাজির হ'ত, বেশী থাক্‌লেই বেশী মরে; সৌখীর বাপের শ্বশুর কুষ্ঠরোগে সাদা হ'য়ে গিয়েছিল, তার ওপর লাল্ ফুট্‌কী ফুট্‌কী, চোখের পাতা, ভ্রূ, মাথা, কোথাও একটু চুল ছিল না, সে কথাও কইতে পার্‌ত না, কেবল সমস্ত দিন রোয়াকের এক পাশে ব'সে থাক্‌ত, রোদে বসে ভন্‌ভনে মাছিগুলোকে গা থেকে তাড়ানই তার এক কাজ ছিল—খাবার সময় আমার দিকে তাকালে আমি আর খেতে পার্‌তাম না—ভয়ানক রাগ হ'ত; মনে হ'ত এক লাথিতে ওর মুখ ভেঙ্গে দিই; সৌখীও আমার মতন বুড়াকে দুষ্‌মনের চোখে দেখ্‌ত

বাড়ীতে কেউ না থাক্‌লে আমরা দুজনে ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে তার গায়ে মার্‌তাম, বড় ঢিলে জখম হবে ব'লে ছোট ছোট নরম ঢিল বাছাই ক'রে নিতাম, বুড়া উঠ্‌তেও পার্‌ত না কিছু ব'ল্‌তেও পার্‌ত না, কেবল চাকা ঘোরার মতন একরকম 'ঘরর্ ঘরর্' শব্দ তার গলা দিয়ে বেরুত্‌—আমরা খুব হাস্‌তাম।

গলির মোড়ে ডানদিকে মটরগাড়ীর 'ড্রাইভার্‌রা' থাক্‌ত, আমায় তারা মাঝে মাঝে বক্‌সীস দিয়ে ফরমাস্ খাটিয়ে নিত; তারা কত মজার মজার গল্প করত আমি খুব পছন্দ ক'র্‌তাম—বড়রাস্তায় বাবুর বাড়ীর দরোয়ান পুরো খোট্টা, সেও আমায় মাঝে মাঝে আধ্‌লা পয়সা দিত, আমি দোকান থেকে তার বিড়ি, মিছরী কখন কখন আদাও কিনে আন্‌তাম—বাবুদের ছেলেরা বাগানে কেমন খেলা করে, আমার দেখ্‌তে ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু একদিন বড় ছেলে এসে আমার মুখে চাবুক মেরে রক্ত বার ক'রে দিয়েছিল সেইথেকে আমার সেখানে দাঁড়াতে ভয় হ'ত।

এই সময় মান্নারা আমাদের গলিতে ডেরা নিল, তারাও আমাদের মতন কাহার, বাপ্ আর 'নানা' এক মাড়োয়ারীর বাড়ী কাজ ক'র্‌ত। মান্না, কাল সে ভোরে নিশ্চয়ই আস্‌বে, খুব ওস্তাদ্ লোক, আমার চেয়ে দু'আঙ্গুল লম্বা ছিল আর তার একটা চোখে রোগ হ'য়ে সাদা হ'য়ে গিয়েছিল। মান্না বড় চৌমাথায় ট্রামগাড়ীতে ভিক্ষে ক'র্‌ত; কখনও আমাকে কখন সৌখীকে সঙ্গে থাক্‌তে হ'ত; এক একজন বাবুকে এমন বিরক্ত করা হ'ত যে, শেষে সে বেচারী পয়সা দিয়ে তবে বাঁচ্‌ত; আমরা স'রে এসে খুব হাঁসতাম। হাতে দু'এক পয়সা ক'রে পড়্‌তে আমরা একদিন সাহস ক'রে পুল্ পার হ'য়ে গেলাম; মান্না আমাদের ভাল ক'রে ইষ্টিশন্, রেলগাড়ী, টিকিট ঘর বুঝিয়ে দিলে।

প্রায় সমস্ত দিন তিনজনে ঘুরে বেড়াতাম। খিদে পেলে মটর ভাজা, চাল ভাজা—আর এক একদিন রাত্রেও বাড়ী ফেরা হ'ত না, ফুটপাথে, দোকানের রোয়াকে ঘুমিয়ে থাক্‌তাম।

একদিন সৌখীর মা আমার বাপ্‌কে বল্লে—ছেলে দামাল হ'চ্ছে কামে লাগাও নয়ত একদম্ বিগ্‌ড়ে যাবে, গাঁজা খেতে শিখ্‌বে—বেটী নিজে এদিকে একটা মরদের মত দারু খেত, রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজ ক'রে যা পে'ত প্রায় এই রকমেই যেত। সেইদিন থেকে সব মজা স্ফূর্ত্তি দুর হ'য়ে গেল। ছেলেবেলাটার জন্যে বড় কষ্ট হয়, বাবু; যদি বড় না হতাম; ছোটই থেকে যেতাম। আর কি, কালই সব শেষ হ'য়ে যাবে, ফাঁসি দিলে খুব লাগে বোধ হয়, আর ম'রে গেলে নিশ্চয় ভূত হ'তে পার্ব্বো, ফাঁসিতে মল্লে খুব বদমাস্ ভূত হয়। দম বন্ধ ক'রে রাখ্‌লে বেশীক্ষণ ঝুল্‌তে হবে না, ঝট্ খতম হ'য়ে যাবে।

সৌথীর মা সেদিন ভাঙ্গা গলায় বাবাকে কত বুঝালে, ফের সাদী বিয়া করার কথাও হ'ল ; আমি সব শুনলাম।

ছদিন পরেই আমি কাজে বাহাল হ'য়ে গেলাম, এক ইস্কুল ঘরে দশ বাজে থেকে চার বাজে তক্ পাংখা টানা ; আমি গায়ে কুর্ত্তা লাগিয়ে মাথায় এক পাগড়ী বেঁধে রোজ নোকরীতে হাজির হ'তে সুরু করলাম।

দরজার চৌকাঠে পা লাগিয়ে প্রথম জোরে জোরে টানতাম, তারপর হাত দুখানা, ব্যথা হ'ত আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে যেত ; এক এক সময়ে মালুম হ'ত যে সব ঘুরছে, দুলছে একবার ওপর আর একবার নীচ, পাংখাটা একবার আসছে আর যাচ্ছে,তখন মাথার মধ্যে সব গোলমাল লাগ্‌ত ; রাস্তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁদ্‌তাম ; সা'য়েই 'বাহাদুর' কোচমান্ তার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত, সে আমায় দেখ্‌লেই দাড়ির মাঝ থেকে বড় বড় পিলারংয়ের দাঁতগুলো বার ক'রে হেঁসে ফেল্‌ত।

একদিন ভারী গরম, হাওয়া একদম্ ছিল না, আমি পাখা টানতে টানতে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম, খুব ঘুমাচ্ছি এমন সময়ে দারোয়ানজী পিঠের ওপর এক লাথি, ঘুম ছুটে গেল ; ছোক্‌রা বাবুরা বেদম হেঁসেছিল।

দিন কয়েক পরে ছোক্‌রা বাবুদের সাথে বেশ ভাব হ'ল, আমি তাদের জন্য পানের দোকান থেকে সিগ্‌রেট্ কিনে এনে দিতাম, তারা নিজেরা কিন্‌লে মাষ্টার দেখ্‌তে পাবে। এই সময়েই আমি বিড়ি খেতে আরম্ভ করলাম।

একদিন ইস্কুল-ফাটক থেকে বার হ'য়ে বিড়ি ধরাতে যাচ্ছি এমন সময়ে দেখ্‌লাম এক বাবু মান্নাকে ধ'রে মারছে, তাই নিয়ে একটা ছোট খাট ভিড়ও হ'য়ে গেছে ; আমি হাতের বিড়ি আমার কাণে গুজে ভিড়ে ঢুকে পড়্‌লাম ; অল্প সময় পরে বাবুর পকেট থেকে একটা রুমাল আর এক বাক্স সিগ্‌রেট্ বার ক'রে নিয়ে স'রে গেলাম। রুমালে দুটো টাকা বাঁধা ছিল, মান্না সেই পেয়ে মায়ের কথা ভুলে ভারী খুসী হলো ; সিগ্‌রেট্ আমি আর মান্না দু'জনে খেলাম ; সৌথী তখন এক হোটেলে চা বানাত, সে সেইখানে থাক্‌ত ব'লে ভেট হ'ত না।

এই সময় এক নূতন মুস্কিল এসে জুটলো ; চার পাঁচজন কলেজ বাবু আমাদের গলিতে এক নাইট স্কুল খুললে, পড়্‌তে পয়সা লাগ্‌ত না ; প্রথম বাবা বলেছিল যে আসামের চা-বাগানে কুলী চালান করার জন্য জুয়াচোর লোক এই ফন্দী আঁটে ; তারপর সবাই বুঝল। যেদিন আমার বাপ কলের সাহেবের কাছে খুব মার খায় সেই দিন সে আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নাইট স্কুলে ভর্ত্তি কল্লে ; প্রথম ভারী বেজার লাগ্‌ত, পরে বাবুদের সাথে ভারী দোস্তী হ'য়ে গিয়েছিল ; তারা আমাকে বলত 'ফুকন্ তুমি খুব ভাল হবে, তোমার বুদ্ধি আছে ;' আমি ভুগোল, আর মতিহাস, না কি বলে, সেই খুব পড়্‌লাম, বাংলা লেখাপড়া, ইংরাজী আর হিসাবও থোড়া শিখেছিলাম—সবশুদ্ধ তিন বৎসর ; তারপর বাবুদের, মাইনে না নিয়ে ইস্কুল করার জন্য, হাজতে দিল, ইস্কুল উঠে গেল। এর মধ্যে আমি বহুত জায়গায় নোকরী কল্লাম—সব সময় কর্ত্তামও না।

আমার বাপ আবার সাদী কর্ল্ল, কল্‌কাতায় সাদী আবার কি ? কোথা থেকে একটা মাগীকে নিয়ে এল, সে রাঁধাবাড়া ক'রে দিত ; আমিও দুস্‌রা জায়গায় ডেরা করলাম, সেখানে মুসলমানই বেশী। হাসান ব'লে একটা মোটর-ড্রাইভার আগে আমাদের গলিতে ছিল, জেল হবার পর সে এইখানে ভাইয়ের কাছে থাকে, মান্নার সঙ্গে তার ভারী দোস্তী, তাদেরই খাতিরে আমি এই নূতন জায়গায় এলাম, তখন আমি এক দোকানে বেয়ারা ছিলাম, তলব ছিল বার টাকা।

মান্না কোনও কাম ক'রত কি না, কেউ তার ঠিকানা জানত না, চার পাঁচ রোজ সে কোথায় কোথায় টহল দিত ; তারপর একদিন এসে খুব গল্প করত আর গাঁজা টানত, এক একদিন দারু এনে ভাল মছলী, শীকার এই সব খাওয়া হ'ত ; মান্নার কাছে মাগ্‌লে দু'চার আনা পয়সা মিল্‌তই তবে তাকে কিছু হাওলাৎ দিলে আর ফেরত পাওয়া যাবে না এ সকলের জানা ছিল। হাসান রোজ সকালে কতকগুলো পুরাণো আধ ছেঁড়া কাগজ নিয়ে বাহার যেত ; সারাদিন কামের তল্লাসে ঘুরে বেচারা যখন রাত্রে বাড়ী ফিরে আসত তখন তার ভাই আর ভাইয়ের বউ তাকে ভারী গালাগালি করত—ছোটাকাম সে করবে না, কোনও নোকরীর খোঁজ

তাকে বললে সে চুপ ক'রে থাকবে, যে মোটর-ড্রাইভার করেছে সে কি ছোটা কাম করতে পারে—বেচারা দিন দিন আধাপেটা খেয়ে খেয়ে রোগে পড়ল; তার ভাই কাল্লু বলত, 'আধা খিলাই পুরা দলাই।' কাল্লুর দলাই আর মাগীর গালাগালের চোটে সে বেচারা একদিন ম'রে গেল তবু ছোটাকাম কভি কর্লে না—আসল মরদ আদমী ছিল, মুটিয়াগিরি ক'রে মাহিনা পনর টাকা হ'লেও সে তা ক'র্বে না।

মান্নাকে সবাই ভারী ডর করত, সে ভারী বদ্‌রাগী, তার আঁখি বরাবর রক্তের মতন লাল ছিল আর সবাই বলত তার কাছে হাতীয়ার থাকে। একদিন শুনলাম যে বাবার চাক্‌রী গেছে আর তারা বড় কষ্ট পাচ্ছে, আমি তাদের দেখ্‌তে গেলাম, একটা ছেলে হয়েছিল, চার বরষের, চুহান তার নাম, সেটাকে আমার কাছে নিয়ে এলাম আর দুটো টাকা দিয়ে এলাম; শুনেছি আমার বাপ্ তার স্ত্রীকে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে রোজ মারত, মেরে শুইয়ে দিত তারপর ঘরে খাবার থাকলে সব খেয়ে শুয়ে পড়ত; সে মাগী একদিন আমার কাছে রাত্তিরে এসে বললে 'তোমার বাপের ভারী অসুখ, তুমি যাও' আমি সেই ঘড়ি গিয়ে দেখ্‌লাম, ঘর খালি, বাবা সব বিচে দিয়ে কোথায় চলে গেছে; ডেরায় ফিরে এসে দেখি আমার ঘরেও সব ফাঁক, বর্ত্তন টর্ত্তন কাপড় কিছু নেই, মাগী সব নিয়ে পালিয়েছে, তবে তার ছেলে চুহানকে রেখে গেছে; চুহান আমায় সব ব'লে কাঁদতে লাগ্‌ল, আমার বেশী রাগ হয়েছিল, আমি তাকে দুই চড়ে থামিয়ে দিলাম।

এই সময়ে এর দিন দুই পরে একদিন মান্না গিয়ে আমি যে দোকানে কাজ করি সেখানে হাজির। আমি তখন বাইরে চিঠি নিয়ে গিয়েছি; মান্না আমার জন্যে ভেট করতে দারোয়ানজীর কাছে বসেছিল; দারোয়ানজীর সাথে পানের রস বারাণ্ডায় ফেলা নিয়ে তার গালাগালি আর মারামারি হ'ল; দোকানের কর্ত্তাবাবু এসে পায়ের জুতা খুলে মান্নার গালে মেরেছিল, মান্না সেই রাগে তাকে বেদম মার দেয়, গালের মাংস কামড়ে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। কর্ত্তাবাবু ও আমার লোক শুনে আমাকে তখনি বরখাস্ত ক'রে দিল; আমি বাবুর পায়ে ধ'রে কত ব'ল্লাম 'বাবু, আমার কি কসুর আছে'; বাবু শুনলে না, আমার আড়াই মাসের তলবও আটকে রেখে দিলে;- আমার তখন চারদিকে ধার, দেনার তাগিদ, ঘরে সব চুরি হ'য়ে গেছে, আমি কত কাঁদলাম, চারদিন দোকান থেকে বাবুর বাড়ী আর বাড়ী থেকে দোকান করতাম, সমস্ত দিন না খেয়ে বাবুর বাড়ীর বারাণ্ডায় শুয়ে থাকতাম; না খেয়ে খেয়ে মাথা ঘুরত, উপরদিকে তাকালে মালুম হ'ত যে সমুচা আকাশটা একদিকে সরে যাবে, আমার ডর লাগ্‌ত কখন মরে যাব, মান্নার দেখা পাওয়া যেত না, সৌখী আর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বেমারে পড়েছিল আর সব লোকের সাথে আমার ঝগড়া, কোথাও ভিখ্‌ও মিলবে না; ঘরে ফিরে দেখ্‌লাম চুহান এককোণে কুত্তার বাচ্চা যেমন ক'রে প'ড়ে থাকে তেমনি পড়ে ঘুমাচ্ছে, তার কি ভুখ্‌ও লাগে না কেবল আমার পেটে যত ভুক, আমি তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে বল্লাম—যাও ভিখ মেঙ্গে লিয়ে এস—ছোক্‌রা আস্তে আস্তে চলে গেল, অনেকক্ষণ পরে এসে আমার হাতে দুটো পয়সা দিয়ে আবার শুয়ে পড়্‌ল, আমি কিন্তু বেটার মুখে ফুলুরী ভাজার তেলের গন্ধ পেয়েছি, বেটা ভিখ্ ক'রে যা পেয়েছে তাই থেকে চুরি ক'রে আবার ফুলুরী খেয়েছে, সেদিন কিছু বল্লাম না; দু'পয়সাতে প্রাণ বেঁচে গেল।

তারপর দিন আবার তলব চাইতে বাবুর বাড়ীতে গেলাম; বাবুদের একটা ভারী বদ্‌মাস বিলাতী কুত্তা ছিল, সেটা রোজ বাঁধা থাকে, আজ সেটাকে খুলে রেখেছে; আমার ওপর এমন তাড়া কর্ল' যে আমি ভয়ে পালিয়ে এলাম, রাস্তায় এসে শুনলাম যে বাবু খুব হাঁসছে আর বলছে 'শালা নালিশ ক'রে মাইনে আদায় কর, গুণ্ডা বদ্‌মাস্ কোথাকার' আমি চলে এলাম।

ভুখ্ কাকে বলে সেই বেশ ভাল ক'রে জানতে পারলাম—যেন একটা জানোয়ার মানুষের পেটের মধ্যে বাঁধা আছে; কিছু বুঝবে সুঝ্‌বে না, খাবার কিছু থাকুক্ না থাকুক্ তবুও সে হাল্লা করবে; আমি জানি যে সারাদিন কিছু মিলবে না, আর ভেবে কি হবে, চুপ ক'রে মরে শুয়ে থাকি সে

জানোয়ার কিন্তু মান্‌বে না এমন হাল্লা লাগাবে যে আদমির দিল্ একদম্ বিগ্‌ড়ে যায়। সকালে একবার ছুটাছুটি ক'রে কিছু ধারটার ক'রে কোনমতে জীবন রাখতাম; চুহান বেটা কি খেত জানি না, একদিন আমার কাছে মার খেয়ে সে আর দর্শনভি দিতো না। পড়শীরা সব আমায় হেসে হেসে জিজ্ঞাসা করত 'খবর কি,' আমি তাদের খালি গালাগালি দিতাম একদিন ছোট রকমের একটা দাঙ্গাও হ'য়ে গেল। সেইদিন রাতে আমি উঠে এক বোতল কেরাসিন তেল আর কাঠ খড় দিয়ে একটা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলাম—সে এক ভারী মজা, হৈ চৈ গোলমাল, রাতদুপুরে বড় বড় বাবু লোকেরা পর্য্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে বিরক্ত মুখে রাস্তায় ছুটাছুটি কর্ল্লে। তাদের ভয় দেখে আমার ভারী খুসী হচ্ছিল, একটা মোটা বাবু, সে বেটা রোজ পোলায় কালিয়া ছাড়া কিছু খেতো না, ভয়ে ঘেমে সাদা মেরে গিয়েছিল, ছুট্‌তে ছুট্‌তে আর চেঁচানির চোটে একবারে বেহুঁস হ'য়ে গেল: আর পড়্‌শীরা সব নেড়ের দল, তাদের কান্না আর শির চাপড়ানি দেখে আমার খিদে কোথায় চলে গেল। পুলিশ ইঞ্জিনকল সব হাজির, আর আগুনটা হুহু ক'রে জ্বল্‌ছে নিভ্‌তে চায় না, লাল আগুন আর কালো ধুঁয়া আমার পেটের যে জানোয়ার আছে তারই মতন ঠিক—কেন তা সমঝাতে পারব না, সারা রাত গোলমাল; পরদিন আমি আর উঠ্‌তে পার্ল্লাম না, গায়ে এতটুকু তাকৎ ছিল না।

* * * * *

মরিয়মের স্বামী ছিল ছোক্‌রা, তার একটা পুরাণো বইয়েরদোকান ছিল, অবস্থা ভাল তবে পুরো বেকুফ, বাপ্ দাদা যা রেখে গিয়েছে নিজের বোকামীতে ঠ'কে ঠ'কে সব যাচ্ছিল; আমায় তার দোকানে চাকর কর্ল্লে, ইংরাজী অল্প জান্‌তাম বাংলাও পড়্‌তে পার্‌তাম, বইয়ের দাম নিয়ে কেউ আর ঠকাতে পার্ব্বে না। দোকান মানে কোনও দস্তুর মতন ঘর ছিল না; বিকেল বেলা হ'লে এক বড় দোকানের রোয়াকে বইয়ের গাদি নিয়ে বস্‌তাম, সকালেও কিছুক্ষণ বসা হ'ত তবে সে সামান্য, বিকালেই কাম চল্‌তো; সমস্ত দিন ছেঁড়া বই জোড়া লাগাতাম আর পুরাণো বইয়ের সন্ধানে নানা জায়গায় ঘুর্‌তাম্, সব পুরাণো, বাংলা নভেল আর ইংরাজী নভেল; শেষে 'সেল' থেকে অন্য বইভি কিন্‌তে সুরু করেছিলাম; কাজটা হঠাৎ আমার সহজ হ'য়ে গেল; যত বড় ভারী আদমিদের নোকরের সাথে সল্লা ক'রে দোকানে বই আন্‌তে লাগ্‌লাম; দোকান জ'মে উঠ্‌ল আমার তলবও বেড়ে গেল। মরিয়ম তার বেকুফ্ স্বামীকে পুছ্‌ত না, সব সময় সল্লা পরামর্শ যা হয় আমার সাথেই কর্‌ত; ছোক্‌রা মনে মনে চটলেও কিছু বল্‌তে সাহস ছিল না, তার দোকান, তার দানাপানি যে আমার হাতে; সে আর দোকানে হাজির হতো না, অল্প কিছু হাতখরচ পেলেই সে চুপ ক'রে থাক্‌ত, আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে চাইত না। শেষে দিন রাত বাইরেই থাক্‌তে সুরু কর্ল্লে, সবাই বল্‌ত একটা দুস্‌রা মাগী রেখেছে; যাই হোক একদিন বেটা বেজায় আফিং খেয়ে ম'রে গেল; কত লোক কত কথা বলে।

একটা ভাল দেখে বাড়ী ক'রে মরিয়মকে সেখানে উঠিয়ে নিয়ে গেলাম; সবাই আমাকে দুষ্‌তে লাগ্‌ল যে আমার জাত গেছে, মুসলমানীর রান্না খেয়েছি তা কি হোলো, আমরা ছোটলোক আমাদের জাত নিয়ে কি হবে; আর সৌখীর কাছে শুনেছি কত ভারী ভারী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণও হোটেলে মুসলমানের পাকান মুর্গী খায় দারু খায়, আমি কিছু খেয়াল ক'ল্লাম না; খালি একদিন দু'দিন একটা যাত্রা শুনে মনটা ভারী খারাপ হয়েছিল, ভগবানের আমার ওপর খুব রাগ হয়েছে ব'লে মনে হ'ল তবে আমরা পাপী, হাজার হোক ছোটলোক কি করব। আগের জনমে বহুত পাপ করেছিলাম তবে এর পরের জন্মে দেখ্‌ব ছোট লোকই বেশী হবে, ভাল আদমী দুনিয়ায় আজকাল বহুত কম; সব বদ্‌মাস, সব ম'রে ছোটলোক হ'য়ে জনম নেবে। খুব বাংলা নভেল পড়্‌তাম, সব সমঝ্‌মে আস্‌ত না; মগজ, লেড়কা বেলা থেকে খাটুনির কাম ক'রে ক'রে মোটা হ'য়ে গিয়েছে তবে ভারী ভাল লাগত আর আমার মনে হ'ত আর সব আমাদের নিজের লোকের চেয়ে আমি ঢের চালাক আর ভদ্র বাবুর মতন; তাদের কথাবার্ত্তা আর পুরাণো আমলের গল্প শুনে আমার রাগও হ'ত আর হাঁস্‌তাম; তাদের সঙ্গ ভাল লাগত না তাই মরিয়মকে সব প'ড়ে

সমঝিয়ে দিতাম সেও খুব পসন্দ ক'রত; গোয়েন্দার গল্প আমার বেশী ভাল লাগত আর ছদ্মবেশ কর্ত্তে খুব ইচ্ছে হ'ত; রাস্তার অনেক লোককে দেখে কেন আমার এমনি মনে হয় যে বেটা ছদ্মবেশ করেছে তার চেহারা এক রকম আর পোষাক দুস্‌রা রকমের, দুষমনের মতন সুরৎ এদিকে বাবুর মতন বেশ। আমার দোকান মস্ত বড় হ'য়ে উঠেছে, আর যারা পুরাণো বই বিচ্‌তো তাদের চেয়ে আমার বেশী বিক্রী; আমি সাহেব লোকদের ক্লাবে খানসামাদের সাথে জান্‌পয়ছান ক'রে তাদের কাছে সস্তায় মোটা বই নিয়ে আস্‌তাম; 'এভ্‌রিম্যান' 'নেলসন্‌' সিক্‌সপেনি' সব দাম আমি ঝট্‌পট্‌ ব'লে দিতাম, কোনাডইলের বই খুব বেশী বিক্রী; জার্ভিস্‌, গুইবুথি, অপিনহাম্‌ কার কেমন কদর আমার বেশ জানা ছিল।

এই সময় প্রথম থিয়েটার দেখ্‌তে যাই; ভারী মজা লেগে গেল, বহুতবার গেছি কত গান শিখলাম; 'আমি এসেছি এসেছি' ব'লে একটা গান আছে, আমি শিখে মরিয়মকে শুনালাম, সে খুসী হ'ল।

মরিয়ম আমার কোনও কথায় ওজর কর্ত্ত না, সব মেনে চল্‌ত আমিও তাকে কখন মারপিট কর্ত্তাম না, রাগ হ'লে গাল দিতাম, না হয় খাওয়া বন্ধ ক'রে দিতাম; একদিন কেবল দারু খেয়ে হোঁস ছিল না, তার মাথার খানিকটা চুল টেনে ছিঁড়ে দিয়ে একটা চড়ে তার নাক দিয়ে রক্ত বাহির ক'রে দিয়েছিলাম; সে গালাগালি কর্ল্লে, আমাকে তাড়িয়ে দেবে ব'লে ভয় দেখালে কিন্তু তাড়াবে কি, আমার হাতেই সব দোকান টাকা কড়ি, সে তো আমারই খায় পরে; বাক্সর চাবী আমার কাছে, একদিন সে টাকার জন্যে বাক্স ভাঙ্গতে চেষ্টা করেছিল, বল্‌লে তারই টাকা, সেটা সত্য কিন্তু আমি যে এতদিন ধ'রে সেই টাকা রেখেছি তাকে খোরাক পোষাক দিয়েছি আপনার বুদ্ধিতে দোকানে কত আয় করেছি, মাগীকে এমন ভয় দেখালাম, বাস্‌ সেদিন থেকে সে আর কিছু বল্‌ত না। তার পেটে তখন লেড়কা ছিল, যত দিন যেতে লাগল ও কেমন বোক্কা মেরে যেতে লাগল আর এমন শুখিয়ে গেল যে রোজ বাড়ী ঢুক্‌বার সময় আমি খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তাম ম'রে প'ড়ে আছে কি না; আমার দোস্তদের মধ্যে মান্না আর সৌখী; মাঝে মাঝে তিন চারজন জমে আমরা খাওয়া পিনা আর গান কর্ত্তুম; মাগী মনে মনে রাগ্‌লেও কিছু মুখ ফুটে বল্‌ত না; তার অবস্থা দেখে আমার ভারী হাসি পেত। সৌখীকে আমি কিছু কিছু টাকা ধার দিতাম, বেচারা বেমারে বেমারে ভারী মুস্কিলে ছিল; তার আঁখিতে সব সময় কান্না; দারু পিলে সে এমন আওরৎএর মতন চেঁচিয়ে কাঁদ্‌ত, সে এক মজা; আজ তাকে কে মেরেছে, গাল দিয়েছে, কাল সব বালবাচ্চা খেতে পায় নি, পরশু তার নোকরী গেছে এই সব খালি ব'লে ব'লে সে কাঁদত, এক এক সময় ভারী দিক্‌ লাগ্‌লেও আমি তাকে ধার দিতাম; মান্না অনেক সময় আমার ডেরাতে থাকৃত, দোকানেও আমার সঙ্গে বস্‌ত; মরিয়ম মান্নাকে দেখ্‌লে ভয়ে কাঠের মতন হ'য়ে যায় ব'লে আমি মান্নাকে আরও বেশী বেশী বাড়ীতে নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা কর্‌তাম; আমার মেজাজটা ভারী দিল্‌দরিয়া ছিল, স্ফূর্ত্তি কর্ত্তে আমি ভালবাসি।

সেই বৎসর ভারী বেমারী হয়—বহুত আদমী মরে গেল; কত ঘর খালি হ'য়ে প'ড়ে রৈল। মরিয়ম সেই বেমারীতে মরে গেল, নসীবে যা আছে তাই হবে, মিছামিছি পয়সা খরচ ক'রে ডাক্তার এনে কি হবে; মর্‌বার সময় আমি ছিলাম না, শুন্‌লাম মাগী খালি একটা কথা ব'লে গেছে যে আমি নাকি ওর আদ্‌মিকে ডাইনী ওষুধ ক'রে মেরেছি; সব মিছে কথা, ডাইনী ওষুধ আবার থাকে? মূর্খ লোক ওই সব মনে করে। মরিয়ম মরে গেল আমি বস্তি ছেড়ে একটা গলিতে বাড়ী কর্ল্লাম, আমার কাছে তখন নগদ প্রায় হাজার রুপেয়া ছিল, কেননা মরিয়মের সব গহনাপত্র অনেক আগেই বিক্রী ক'রে নগদ টাকা আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম; কিতাবের দাম সব ধ'রে আমি তখন কিছু কম হাজার রুপেয়ার মালিক।

* * * * *

থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়ে আমার চার পাঁচজন ছোক্‌রা বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমি তাদের বরাবর পাণ সিগারেট, লেমনেড, সরবৎ পয়সা খরচ ক'রে খাওয়াতাম, তারা যখন আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আমায় ভারী মেজাজী

আদমী ব'লে তারিফ ক'র্ত্ত তখন আমার ভারী স্ফূর্ত্তি হতো, পহিলা পহিলা একটু ভয়ে মিশ্‌তাম, তারপর দেখ্‌লাম বাবুরা বেশ দারু খায় আর সব আমাদেরই মতন তখন একেবারে পাকা দোস্তী হ'য়ে গেল; কতদিন আমার বাড়ীতে এনে খাইয়েছি—শালারা সব নিমক্‌হারাম। মান্না তখন আমার বাড়ীতেই থাকৃত, অনেকটা চাকরের মতন; সে আমায় বেশী বেশী খাতির ক'র্‌ত। এই ভাবে দিন কাটতে লাগ্‌ল তবে দোকানে যেতে ইচ্ছে ছিল না; মান্না রোজ বেচাকেনা ক'র্ত্তে যায়। বাবুদের সাথে আমিও বেশ বাবু ব'নে গেলাম কেউ বুঝ্‌তে পার্ত্তো না; মুখে সিগারেট ধরিয়ে যখন ট্রামে চড়ে যেতাম তখন সবাই আমার দিকে তাকিয়ে স'রে ব'স্‌ত, প্রথম প্রথম লাজ লাগ্‌ত তবে সে থোড়া কয়েকদিন; এক একজন দু'একটা খারাব বাত ব'ল্‌ত আমি তাদের মুখে ধুয়ো ছেড়ে এমন ভাবে তাকিয়ে থাক্‌তাম যে বেটারা ভয় পেয়ে যেত।

হীরুবাবুর সঙ্গে আমার বেশী দোস্তী, সে রোজ এসে কত গল্প ক'র্ত্ত, বড় বড় বাবুলোকদের সঙ্গে তার জানা আছে ব'লে তাদের গল্প ক'র্ত্ত, আমার ভারী তাজ্জব লাগ্‌ত; হীরুবাবু আমাকে বরাবর বাবুজী ব'লে ডাকে, আমি তার উপর খুব শ্রদ্ধা করতাম। সে দশ পঁচিশ কখন পঞ্চাশ এম্নি ক'রে আমার কাছে তিন চারশো টাকা হাওলাৎ নিয়েছিল; এক পয়সা ফেরৎ পাইনি; বেটা আমায় বড়লোক বড়লোক ব'লে এমন তোষামোদ ক'রত যে আমি লজ্জায় চাইতে পার্ত্তাম না, তাকে ধার দিয়েছি ব'লে আর আর বাবুরা আমায় বড় খাতির ক'র্ত্ত—দুনিয়ায় ভাল-মানুষী কর্ল্লেই ঠক্‌তে হয়; হীরুবাবুর পাল্লায় প'ড়ে আমি এক একদিন দশবারো টাকা স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়েছি আর সেই হীরুবাবু একদিন কোথায় স'রে প'ড়ল; তখন যে বাবুরা টাকা ধার দেওয়ার জন্যে আমায় খাতির ক'র্ত্ত তারাই আমাকে কেমন ঠকেছ এই ব'লে ঠাট্টা তামাসা ক'র্ত্তে লাগ্‌ল; আমি তাদের ব'ল্‌তাম 'ও আর কি অমন বহুত যায় আসে, তিন চারশো টাকাতে আর কি'। তারা আমার কথা বিশ্বাস কর্ত্ত না, খালি ব'ল্‌ত 'বাবুজী বড় ঘাল হ'য়েছে, অনেক টাকা মারা গেল।' আমার রোক চেপে গেল আমি বেশী বেশী টাকা খরচ ক'র্ত্তে লাগ্‌লাম; দোকানের কিতাব আর কেনা হতো না, সব বিক্রী হ'য়ে গেল। মরিয়ম মারা যাবার আড়াই বৎসরের মধ্যে প্রায় হাতখালি হ'য়ে গেল। আবার দোকানে বস্‌বার ইচ্ছা ছিল না; বাবুরা যদি দেখে আমি রাস্তার ধারে পুরাণো বই বিক্রী করি—তাদের কাছে ছোট হ'তে পার্ব্বো না।

কাছে পয়সা না থাক্‌লে আমার ঠিক পাগলের মত মনে হ'ত, দুষমন যেন আমার ঘাড়ে চাপ্‌ত। পেটে ভাত না পড়লেও আমি পকেটে গোটাকয়েক পয়সা থাক্‌লে আরাম পেতাম; ভুক্‌ লাগ্‌লেই পকেটের পয়সা বাজাতাম্‌ তার আওয়াজে দিল্‌খুসী থাক্‌ত। চটী পায়ে ফুটপাথে ঘুরে বেড়ানই আমার এক কাজ; আর মাঝে মাঝে পেটে খিদে রেখে এক পয়সার পাণ কিনে খেলে পুরাণো স্ফূর্ত্তির কথা সব মনে পড়ে যেতো তখন আর বেশী কষ্ট হতো না, মালুম হতো যেমন ছিলাম তেমনই আছি। মাঠে কিংবা ইডেনগার্ডেনে গিয়ে এক জায়গায় ব'সে ব'সে কেবল সেই পুরাণো কথা ভাবতাম—এক একবার ক্ষেপে যেতাম। মেজাজ ভারী বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল, সবার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তাম; চেহারা এমন খারাপ হ'য়ে গেল। তার ওপর আবার দেনা ছিল আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, এক মান্নার সঙ্গে দেখা হ'ত; সে বেটার কাছে কখনও একপয়সা থাকে না; যা কিছু সামান্য রোজগার করে গাঁজাতেই ফুঁকে দেয়।

একদিন সব পয়সা ফুরিয়ে গেল; তখন দুটো পয়সা ছিল, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি কোনদিকে খেয়াল নাই কত লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগ্‌ছে আমি কেবল একটা গাল দিয়ে দিয়ে চ'লে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা মোড়ের কাছে এসে মনে হ'ল অনেকক্ষণ পকেটে হাত দিয়ে দেখিনি, তাড়াতাড়ি দেখলাম—পয়সা নেই, একটাও পয়সা নেই,—তার পর আর একদিনও পয়সার মুখ দেখিনি। আজকেই ম'রে যাব; অনেকে কিন্তু বেঁচে যায়, প্রথমে না ম'রলে বোধ হয় ছেড়ে দেয়।—আর বেঁচে কি হবে মরাই ভাল; এখন ত একটা পয়সা বা একটা কাণাকড়িও নেই যে আমাকে পিছনে টানবে; আমি ম'র্ত্তে রাজী আছি। এখনও দু'এক ঘণ্টা আছে বোধ হয়—যখন লট্‌কে ঝুলিয়ে দেবে তখন

আস্‌মানে খালি ঝুলব, পায়ের তলায় কিছু থাক্‌বে না—উঃ আমার শির ভারি দুখাচ্ছে, সব বন্ বন্ ঘুরছে। খুনের কথা খপরের কাগজে যা লিখেছিল আমি জানি, সব ঠিক কথা—শালারা ভারী চালাক—কিসের ঘণ্টা বাজলো—এখুনি আস্‌বে বোধ হয়—ওঃ নাঃ এটা পাহারা বদল হচ্ছে—এখনও এক ঘণ্টা আছে। বাবু ব'স, উঠ্‌ছ কেন সব বলি শোন; চলে যাবে; আচ্ছা তবে যাও শালা জাহান্নামে যাও তোমার মতন বহুত বাবু ভাইয়া দেখেছি—যাও—”

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধনা।

থেমে গেছে অগ্রসর, ফেরা অসম্ভব;
তমোলুপ্ত পথচিহ্ন—নিশীথ নীরব।
দুরু দুরু হিয়া,
না জানি কিসের লাগি' উঠিল কাঁপিয়া
বিপুল আবেগ ভরে,
মুহূর্ত্তের তরে—
ব্যর্থতার গ্লানিভরা ক্ষুব্ধ চিত্ততল,
নিস্পন্দ নিরাশা আসি করিল বিকল।

তোমারে কি সাজে—
আত্মহারা দৌর্ব্বল্যের পরিতাপ মাঝে
এই আত্ম-সমর্পণ?
জীবন মরণ
নহে ভ্রান্তি, নহে খেলা, দাঁড়াও পথিক;
বিরাট আকাশতলে নির্ম্মম নির্ভীক।

স্থির দাঁড়াইয়া,
ব্যগ্র বাহু মেলি তুমি ধর আঁকড়িয়া
বিশ্বের সন্দেহগুলি;
যাইও না ভুলি—
পদতলে পৃথ্বী, মৃত্যু, অসহায় নর,
কাতরে কাঁদিয়া চাহে প্রভাত সুন্দর।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কাব্যের উপাদান। *

-:*:-

(প্রথম প্রস্তাব)

কাব্য কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া সমালোচনা-সাহিত্যে এই সম্বন্ধে যে কত মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আলোচনা করিবার শক্তি আছে এই কথা বলিয়া নিজকে সমাজের কাছে হাস্যাস্পদ করিতে চাহি না। তবু কিন্তু কথাটা ঠিক যে, বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্তি হইবার পূর্ব্বেই আমরা এই সম্বন্ধে কতকগুলি মতের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হই। কাব্য সম্বন্ধে এই সমস্ত মতগুলি গুছাইয়া নিজের ভাবে বলিতে চেষ্টা করিব।

"কাব্য কি?"—এই প্রশ্নের উত্তর ইউরোপ একভাবে দিয়াছে; পুরাতন ভারতবর্ষও ইহার একটা উত্তর একদিন দিয়াছিল। বিস্ময়ের কথা হইলেও, আজকাল আমরা ইউরোপের উত্তরটাই বিশেষভাবে আলোচনা করি, পুরাতন ভারতবর্ষের পুরাতন কথাগুলি দৃঢ় প্রাচীরে ঘেরা প্রাচীন "অচলায়তনের" প্রাণহীন ও গৎবাঁধা নিয়মের মধ্যে যাইয়া একেবারে রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই তমসাচ্ছন্ন "অচলায়তনের" পুরাতন প্রাচীরগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং উহার স্থানে একদিন নব মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাহাতে বাহিরের আলো ও বাতাস খুব স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে পারিবে। ইতিমধ্যেই এই অচলায়তনের সংস্কার হইতেছে,—ইতিমধ্যেই গোঁড়ামির কঠিন প্রাচীর ভেদ করিয়া পুরাতন ও নূতনের মধ্যে চলা ফেরা করিবার জন্য অনেকগুলি গুপ্ত পথ আবিষ্কার হইয়াছে। তাহা নবাবিষ্কৃত পথে চলা ফেরা করিয়া পণ্ডিতবর্গ আজকাল বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পুরাতন বলিয়া পুরাতনকে অবহেলা করা উচিত নয়—পরন্তু পুরাতন অভিজাত-বংশ-মর্য্যাদার মত তাহাকে গর্ব্বের সহিত আঁকড়িয়া ধরাই উচ্চতর জীবনের কর্ত্তব্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় কাব্যের উপাদান; এই বিষয়ে নব্য ইউরোপের ও পুরাতন ভারতবর্ষের মতগুলি পাশাপাশি করিয়া দেখিতে বোধ হয় কোন দোষ নাই। আমরা এখানে পূর্ব্বে কয়েকজন ইংরেজ সমালোচকের মত আলোচনা করিয়া শেষে ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতটা আলোচনা করিব।

Johnson বলেন—"ছন্দবিশিষ্ট রচনাই কবিতা। কল্পনার সহযোগে বুদ্ধি যখন সত্য ও আনন্দকে এই ছন্দোবন্ধ রচনার ভিতর ফুটাইয়া তোলে তখনই উহা উৎকৃষ্ট কাব্য হয়।" তাঁহার মতে উৎকৃষ্ট কাব্যের আর একটী উপাদান এই যে,উহা ভাবরাজ্যে নূতন তথ্য আবিষ্কার করে। Mill বলেন—"হৃদয়ের গভীর ভাবগুলি যখন ভাষার ভিতর দিয়া একটী বিশিষ্ট আকারে ফুটিয়া ওঠে, আমরা তখন উহাকে কাব্য বলি।"Carlyle বলেন—"চিন্তা যেখানে সঙ্গীতের মত মধুর ও কমনীয় হইয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়—সেইখানেই কাব্যের বিকাশ (Musical thoughts)। Shelley বলেন কল্পনার বিকাশই কবিতা। Leigh Hunt এর মতটী বেশ একটু বড় রকমের; তিনি বলেন সত্য, সৌন্দর্য্য এবং শক্তির জন্য আমাদের ভিতরে যে কতকগুলি প্রবল বাসনা আছে তাঁহা যখন কল্পনার সাহায্যে বিভিন্নাবস্থায় বিভিন্ন ভাব লইয়া ফুটিয়া উঠে—সেই ছন্দোময়ী ভাষাই কবিতা। Coleridge বলেন—আনন্দই যে রচনার সহজাত ফল, সত্য যাহার গৌণ উদ্দেশ্য, এবং যাহা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ভাব ও কল্পনার সংযোগে প্রাণের ভিতর এক বিচিত্র আনন্দ অনুভূত হয়—তাহাই কাব্য। Wordsworth এর মতে অন্তরের জ্ঞানরাশি যখন ভাবের আবেগে ফুটিয়া বাহির হয়, তখনি উহাকে কবিতা বলা হয়। Mathew

* পূর্ব্ববঙ্গে সাহিত্যসমাজের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

Arnold কাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা লইয়া সমালোচনা-ক্ষেত্রে যথেষ্ট বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও উহার ভিতর যে যথেষ্ট সত্যতা আছে একথা তখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইতেছেন। তিনি বলেন—বিশেষ একটী সত্য ও সৌন্দর্য্যের আদর্শের মধ্যে যাইয়া কোন ব্যক্তি যখন ভাবের আবেগে অতি মিষ্ট সুরে জীবনের উপর সমালোচনা করিয়া যায়—তখনই এই সমালোচনাটা কাব্য নামে অভিহিত হয়।

এইতো গেল কয়েকজন ইংরেজী সাহিত্যিকের মতের সারাংশ। ইচ্ছা করিলে আরও অনেকগুলি মত সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্য দেখান যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য তাহার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে কয়টী মত এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত অসদৃশ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে কাব্য সম্বন্ধে মূলতঃ প্রায় সকলেই এক কথা বলিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় এই মতগুলি ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া কাহারো মতের মধ্যেই কাব্যের সমস্তগুলি লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। ইহাদের মধ্যে Colerdige, Leigh Hunt, এবং Mathew Arnold কাব্য সম্বন্ধে অনেকটা দার্শনিকের মত আলোচনা করিয়াছিল। Coleridge তাহার মতটীকে একটু গর্ব্বের সহিত Philosoplic definition নামে অভিহিত করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, এই সমস্ত মতগুলি একথানে একত্র করিয়া আলোচনা করিলে কাব্যের উপাদানগুলি বুঝিতে আমাদের কষ্ট হইবে না। এই সমস্ত সংগৃহীত মত হইতে আমরা কাব্যের নিম্নলিখিত উপাদানগুলি পাইতে পারি :—১। ছন্দ ২। সত্যের উপর কল্পনার রেখাপাত ৩। ভাবের গভীরতা ৪। সাধারণ লোকে সাধারণ বস্তুকে যে ভাবে দেখে কবিতার ভিতর কবি তাহার মধ্যেই একটু নূতনত্ব দেখাইয়া দেন। ৫। কাব্যের দু'টী উদ্দেশ্য আছে—(ক) মুখ্য উদ্দেশ্য—আনন্দ দান—(খ) গৌণ উদ্দেশ্য—জীবন সমালোচনা। এই দু'টী উদ্দেশ্য আছে বলিয়াই সত্য, মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য একাধারে পরিস্ফুট হয়। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যাহাকে 'রস' বলিয়াছেন এই উদ্দেশ্যের ভিতরেই সেই রসের বিকাশ। কাব্যের এই উপাদানগুলি এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কাব্যে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা :—

সাহিত্যের ভিতর গদ্য ও পদ্য বলিয়া দু'টা জিনিষ অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ছোট কালে কোন লেখাকে পদ্য কিম্বা গদ্য বলিয়া ঠিক করিতে হইলে আমরা 'চৌদ্দ' অক্ষরের মাপকাঠী দিয়া মাপিয়া লইতাম। তার পরে একটু বড় হইলে বুঝিতাম যে পয়ার ভিন্ন আরও কতকগুলি ছন্দ আছে যাহা দ্বারা পদ্য ও গদ্যের পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। কিন্তু তখনো আমরা এই ছন্দের সাহায্যেই গদ্য পদ্য ঠিক করিতাম।

"মণের দামের বামে ভিখারিটী দিলে
আধ পোয়ার দাম যায় নিমেষেতে মিলে।"

শুভঙ্করের এই ছন্দোবদ্ধ আর্য্যাটী এক কালে আমাদের কাছে নিতান্তই কবিতা বলিয়া মনে হইত। প্রথম যখন উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করি তখন "কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে" প্রভৃতি কয়েকটী ছন্দবিশিষ্ট সঙ্গীত ভিন্ন আর সমস্ত লেখাগুলিকেই গদ্য বলিয়া মনে হইত এবং তাই "কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে" প্রভৃতি গীতগুলিকে কবিতা বলিয়া মনে করিবার একমাত্র কারণ ছিল এই যে উহা ছন্দে লিখিত। কিন্তু ছন্দের সঙ্গে আমরা কবিতার যে সম্বন্ধই স্থাপন করি না কেন—জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কবিতার ভিতর কি ছন্দটা নিতান্তই প্রয়োজনীয়? অনেকে বলেন, কল্পনা এবং হৃদয়াবেগ থাকিলেই কবিতা হইল, তাহার ভিতর ছন্দের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। Carlyle এই মতাবলম্বী হইলেও তিনি কাব্যের ভিতর ছন্দের মাধুরী দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি বলেন, কবিতার ভিতর ছন্দের কোন আভ্যন্তরিক প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও, উহাকে সঙ্গীতের মত মধুর করিতে হইলে ছন্দের প্রয়োজন আছে।

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল।"

ইহাতে ভাব ও কল্পনার প্রাচুর্য্য না থাকিলেও, ছন্দের অস্তিত্ব হেতু, ইহা বেশ শ্রুতি-মধুর। Carlyle এর মতে কবিতার ভিতর এই শ্রুতি-মাধুর্য্য দেওয়ার জন্য ছন্দের প্রয়োজন।

Sir, Phillip Sidney বলেন, ছন্দটা কবিতার অলঙ্কার। Coleridge দৃষ্টান্তস্বরূপ Plato ও Jeremey Taylor এর নামোল্লেখ করিয়া বলেন, যে ছন্দ না থাকিলেও উঁহাদের লেখায় যথেষ্ট কবিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এইখানে একথা বলা যাইতে পারে যে, সুন্দর জিনিষকে অলঙ্কার পরাইলে উহা আরও সুন্দর দেখায়।

অন্তবিহীন লীলা অন্তরে নিশিদিন
সুন্দর দেহ-হৃদি মন্দির চিরলীন
মঞ্জু মরম বনে মঞ্জীর জাগরণে
মন্দার মনোহর গন্ধ
জয় নন্দ নয়ন চিরানন্দ

নবীন কবি পরিমলের এই কবিতাটার ভিতরে কবিত্ব যে যথেষ্ট আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন; কিন্তু বিচিত্র ছন্দযোগে ইহার ভিতর যে বিচিত্র ভাব, বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, গদ্যে ঠিক এই কথাগুলি লিখিলে তাহা হইত কি? Bogehot বলেন, উৎকৃষ্ট কবিতা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের মধ্যে উহা একেবারে গাঁথা হইয়া যায়। ছন্দ যে স্মৃতির সহায়, একথাতো কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু এসমস্ত কথা সত্ত্বেও ছন্দ বিরোধিগণ বলিতে পারেন যে ছন্দটা কবিতার বাহিরের প্রয়োজন; ভিতরের দিক হইতে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই। সেইরূপ আপত্তিকারীদের কথায় দু'টী উত্তর দেওয়া যাইতে পারে।

Leigh Hunt ইহার একটী উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি বলেন; গদ্যরচনা হইতে কবিতার পার্থক্য এইটুকু যে, গদ্যের বিষয়গুলি এমনি ধরণের যে উহাকে কিছুতেই সঙ্গীতে পরিণত করা যায় না। পরন্তু কবিতার বিষয়গুলির ভিতর সঙ্গীতের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যাইবে। ছন্দ না হইলে সঙ্গীত হয় না। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" উচ্ছ্বাসগুলিও কেহ সুর করিয়া গাহিয়া যাইতে পারিল না। কাজেই ছন্দটা কবিতার শুধু বাহিরের অলঙ্কার নয়—উহার একটা আভ্যন্তরিক প্রয়োজনীয়তাও আছে। গদ্যকে কবিতা করিবার জন্যই উহার আবশ্যকতা। অবশ্য Leigh Huntএর এই মতের মধ্যে ছন্দের খুব বেশী প্রাধান্য দেখান হইয়াছে। তাহা হইলেও তাহার কথাটা একেবারে মূল্যহীন বলা যায় না। একটী বিষয় গদ্যে বলিতে হইলে তাহার মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বের বিকাশ করা যাইতে পারে; কিন্তু সেই বিষয়টা তখনই নির্দ্দোষ কবিতা হয়, যখন উহাতে ছন্দ সংযোজিত হয়। প্রকৃতিভেদেও কবিতা যেমন বিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র জিনিষ, আকৃতিভেদেও উহা অন্যান্য গদ্যরচনা হইতে পৃথক। কিন্তু একথাটা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে, যে শুধু ছন্দ থাকিলেই কোন রচনা কবিতা হয় না; উহাকে কবিতা বলিতে হইলে কাব্যের অন্যান্য উপাদানগুলিও থাকা প্রয়োজন। যিনি শুভঙ্করের আর্য্যা বা "পাখী সব করে রব" ইত্যাদি পদ্যগুলিকে কবিতা বলেন, কবিত্ব সম্বন্ধে তাহার খুব যথেষ্ট জ্ঞান আছে একথা বলা যায় না। ছন্দের ভিতর ভাবকে ফুটাইয়া তোলা কাব্য রচনার একটী কৌশল—একটী Art. Wordsworth বলেন, কবিতা কবি-হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক উৎস—„Sponteneous over-flow. Mill বলেন, মানুষের অন্তরস্থিত গভীর ভাবগুলি যখন ভাষায় ফুটিয়া উঠে, তখন উহার ভিতর ছন্দের আভাস পাওয়া যাইবেই। ক্রৌঞ্চ-মিথুনকে ব্যাধ-হস্তে শর-বিদ্ধ দেখিয়া আদি কবি বাল্মীকির করুণ হৃদয় হইতে যে ছন্দোময় পদাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে Millএর এই মতটী সমর্থিত হইতে পারে। আরও একটী কথার এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন গ্রীক দার্শনিকের মতে সঙ্গীত হইতেই নাকি এই দৃশ্য-জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে; আবার এই সঙ্গীতেই নাকি উহা মিশিয়া যাইবে। শব্দময় ব্রহ্ম বলিয়া একটা কথা এদেশেও চলিত আছে। সুর-তাল লয়ের সহিত ওঁকার ধ্বনিও নাকি একদিন সমস্ত আকাশকে কাঁপাইয়া তুলিত। রাধা রাধা বলিয়া যখন শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিত তখন নাকি যমুনায় উজান বহিত। সঙ্গীত হইতেই জগতের উৎপত্তি, একথাটা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, Drydenএর সেই—

"From harmony, from heavenly harmony
This Universal frame began"—

এই বাণীই যদি সত্য হইয়া থাকে তবে গভীর ভাবাত্মক

কবিতার সঙ্গে যে ছন্দের একটা সংযোগ থাকিবে, ইহাতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কাজেই দেখা যাইতেছে যে কবিতার ছন্দটাকে শুধু একটা বাহিরের আভরণ বলা চলে না—উহার একটা আভ্যন্তরিক প্রয়োজনীয়তা একটা "Inward necessity" আছে।

আর একদিক দিয়াও আমরা কাব্যের ভিতর ছন্দের প্রয়োজনীয়তাটী উপলব্ধি করিতে পারি। কোনও একটী গদ্য-রচনাকে যখন পদ্যে পরিণত করা হয়, কিম্বা কোন পদ্যকে গদ্যে পরিবর্ত্তিত করা হয়—তখনি আমরা কবিতার ভিতর ছন্দের আবশ্যকতাটী ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। পদ্যকে যখন গদ্য করা হয় তখন দেখা যায়, সেই গদ্যের ভিতর তেমন আনন্দ-দান-শক্তি, তেমন ভাব আর থাকে না। রবীন্দ্রনাথ তাহার অসাধারণ প্রতিভা লইয়া গীতাঞ্জলি ও চিত্রা প্রভৃতি কাব্যগুলি ইংরাজী গদ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত ও ভাবান্তরিত কাব্যগুলি পড়িয়া তেমন আনন্দ, তেমন রসানুভূতি—যাহা তাহার মৌলিক কাব্যগুলিতে পাইয়াছি—পাওয়া যায় কি?

Schiller একখানি গদ্য-গ্রন্থকে পদ্যে পরিণত করিতে যাইয়া Goetheকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় বলা হইয়াছে যে কবিতার আকৃতি এবং প্রকৃতি, ছন্দ এবং ভাব খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। গদ্যকে পদ্যে পরিণত করিতে গেলে দেখা যায়, অনেক সাধারণ ভাব—যাহা গদ্যে বেশ চলিতে পারে—ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উঠিয়া যায়। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" একখানি গদ্য-কাব্য? কিন্তু ইহাকে যদি পদ্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হয় তবেই Schillerএর মতটী সত্য কিনা তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই জানি পাঠকের মনে ভাবোদ্রেক করিতে পারাই কাব্যের একটী বিশেষ সার্থকতা। ছন্দটা এইরূপ ভাবোদ্রেকের নিতান্ত সহায়। Dryden এর Alexendar's Feast কবিতাটী যাহারা পাঠ করিয়াছেন—তাহারা জানেন সঙ্গীতের সুর মানব-হৃদয়ের উপর কি অসীম ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে। সন্ধ্যার নিস্তব্ধ বিশ্রাম-গৃহে পূরবী-সুপ্তি-মগ্ন গভীর নিশীথে বেহাগ বা বাগেশ্রী রাগিণীগুলি প্রাণের ভিতর যে কি ব্যাকুল ভাব জাগাইয়া তোলে, তাহা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা আমার মনে পড়িতেছে—

ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মূরতি
বিষাদ শান্ত শোভাতে
ওই ভৈরবী আর গেয়ো নাকো এই
প্রভাতে—

এই শান্ত প্রভাতে এই ভৈরবী রাগিণীর ব্যাকুল-করা, মন-মাতান সুরটী প্রাণে যে বড় বাজে।—

ওই মন উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল-পরশে সকল জীবন
বিকলি',
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহু ঘেরা
অশ্রু-কোমল শিকলি
হায় মিছে মনে হয় জীবনের ব্রত
মিছে মনে হয় সকলি।

স্বর্ণ-কুমারীর সেই—"এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী, সে যদিগো শুধু আসিত"—এই গীতটী যাহারা জ্যোৎস্না-বিহসিত বাসন্তী-পূর্ণিমায় খোলা ছাদে বসিয়া শুনিয়াছেন তাহারা জানেন প্রাণের ভিতর সুরের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। কিন্তু এই রাগরাগিণী, এই সুর;—এগুলি কি? ইহা কি কতকগুলি ছন্দেরই উচ্চারণ মাত্র নয়? ছন্দ না হইলে কি সঙ্গীতের ভিতর সুর সংযোজন করা যায়? ভারতবর্ষের সমস্ত কার্য্যই যে একদিন সুর-সংযোগে গীত হইত—বেদ পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি যে এককালে গীত হইত—ইহার মধ্যে তো একটা গভীর অর্থ আছে বলিয়াই মনে হয়। সুর এবং ছন্দের মাত্রানুযায়ী উচ্চারণ, বোধ হয় তাহাদের কাছে একই জিনিষ ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সাধারণভাবে পড়িয়া গেলে যে আনন্দ, যে রসানুভূতি হয়, ছন্দের মাত্রানুযায়ী উচ্চারণ বা সুরসংযোগে তাহা গাইতে শুনিলে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী রসানুভূতি হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে ভাবোদ্রেকের জন্যও ছন্দের প্রয়োজন।

এই ভাবোদ্রেকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা আরও পরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বরগুলি ছন্দের হ্রস্ব দীর্ঘ মাত্রার উচ্চারণ মাত্র। এইজন্য ভিন্ন ভিন্ন স্বর ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদ্রেক করে। ইহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদ্রেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের প্রয়োজন। স্বর আর ছন্দকে একার্থক বলিয়া অস্বীকার করিলেও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ যে, হৃদয়ের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ভাবোদ্রেক করে. একথাতো অস্বীকার করা যায় না। বিরহ-বর্ণনায় মন্দাক্রান্তা ছন্দের অপ্রতিহত প্রভাব। পয়ার-ছন্দে রৌদ্র রস ভাল ফোটে না। লঘু ভাবের জন্য লঘু ত্রিপদী। দিন দিন মানব হৃদয়ে যতই নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে কাব্যেও ততই নূতন নূতন ছন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। মাইকেল যে কেবল একটা নূতনত্ব ও বিদ্যামত্তা দেখাইবার জন্য বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাতো মনে হয় না। "মেঘনাদ বধের" গুরু গম্ভীর সুর জানাইবার জন্য হৃদয়ের ভিতর অদ্ভুত রস (Sublime feelings) ফুটাইবার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া পয়ার-ছন্দের মায়া কাটাইয়া অমিত্রাক্ষরের আমদানী করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ও বর্ত্তমান কালের কবিদিগের কাব্যে যে আজকাল আমরা এত ছন্দবাহুল্য দেখিতেছি আমার তো মনে হয় উহা সখের খেলা নয়—বিভিন্ন প্রকার ভাবোদ্রেকের জন্য ঐগুলির একটা আভ্যন্তরিক আবশ্যকতাও আছে।

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

"একটা অসম্ভব গল্প।"

আমার বয়স পনর বছর পার হ'য়ে গেছে অথচ বিবাহের কোন চেষ্টাই হ'ল না। বাবার এই উদাসীনতা মা মোটেই পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে কন্যার বয়সের ও শরীরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বাবা হেসে বলতেন ওতো এখনো খুকী—বালিকা মাত্র। যাই হোক, আমার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত যৌবন সাড়া দিয়ে উঠলো—স্বভাবধর্ম্মে একটা অজানা অভাবও যে আমার প্রাণের অভিনব শূন্যতার মধ্যে নিবিড় হ'য়ে উঠছিল না—এমনও নয়। আমার সমস্ত নারীত্ব রামধনুর মত রঙ্গীন হ'য়ে জগতের লালায়িত মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য লুব্ধ ব্যাকুলতায় অধীর হ'য়ে উঠতো,—হায় সে এক বিচিত্র অনুভূতি।

দাদার পড়বার ঘরে সকালে বিকেলে তাঁর বন্ধুগণ প্রায়ই এসে জমতেন। 'চা, চুরুটের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রকম আলোচনা হ'ত। মাঝে মাঝে আমিও সেখানে গিয়ে বসতাম। আমাদের দেশে সকলেই কথা বলতে চায়। কেউ শুনতে চায় না—কাজেই আমার মতো সহিষ্ণু ও মৌন শ্রোত্রী যে তর্ক-সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এ আর বিচিত্র কি? তবে আমি খুব কমদিনই সেখানে যেতুম - হয়তো আমার অনুপস্থিতির দিন তর্ক-সভাটা খুব ঘোরালো হ'য়ে উঠতো না। তবে দাদার দু'চারজন বন্ধু তর্ক করবার বা আলোচনা করবার প্রবল আকর্ষণে নিয়মিতরূপে তথায় হাজির হতেন। এ ছাড়াও যে তাঁদের আর একটা গোপনীয় কার্য্য ছিল সেটার কথা না হয় খুলে নাই বললাম। যাই হোক সবারই চেয়ে আমার ভাল লাগতো হিরণ বাবুকে। স্পষ্ট সতেজ গলায় তিনি যখন তীব্রভাবে রমেশ বাবুকে আক্রমণ করতেন—তখন বেচারা কথার জবাব দিতে না পেরে আমার দিকে লজ্জাজড়িত কুণ্ঠায় ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করতো। একে তো তর্কে পরাজিত হওয়াটাই লজ্জার কথা—তার ওপর আবার স্ত্রীলোকের সামনে !!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা একখানি বইএর খোঁজে দাদার পড়ার ঘরে ঢুকেই দেখি, হিরণবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে একখানি কি বই পড়ছেন—আমার পায়ের শব্দ পেয়ে তিনি মুখ তুলে আমার দিকে চাইতেই আমি একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ চলে যাওয়াটা যে একান্তই অভদ্রতা হবে সেটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঠিক ক'রে নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বলে উঠলাম "দাদা কোথায় গেলেন!"

"কি জানি আমায় বসিয়ে রেখে কোথায় যে বেরিয়ে গেল ঠিক জানিনে—এভাবে একা একা বসে থাকাটাও কষ্টকর।"

আমি আস্তে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। কিন্তু এঁর সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ করবো? উনিও যে একটু সঙ্কোচ একটু দ্বিধা অনুভব করতে না লাগলেন তাও নয়। যাক্,—কয়েকমিনিটের মধ্যেই উনি বেশ সচেতন হ'য়ে উঠলেন; মৃদুহাস্যে আমায় প্রশ্ন ক'রে বললেন যে তিনি দাদার কাছে শুনেছেন যে আমি বাঙ্গালা-সাহিত্য খুব বেশী রকম চর্চ্চা ক'রে থাকি সে কথাটা সত্য কিনা। আমি হাঁ, নার মাঝামাঝি একটা কৈফয়ৎ—একটা উত্তর দিলাম। তিনি রবিবাবুর কথা তুললেন। আমি নৌকাডুবি পড়েছি কিনা তাও জিজ্ঞাসা করলেন। রমেশ ও হেমনলিনীর চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ হ'ল। আমি অধিকাংশ স্থানে শুনতেই লাগলাম—নিজের মতামত প্রকাশ করলাম না। এমন সময়ে দাদা এসে প'ড়ে আমায় একটা নিগূঢ় লজ্জার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিলেন। আমি ছুটে আমার ঘরে চলে এলাম—জ্যাকেট্টা খুলতে গিয়ে দেখি, আমি পুরো দস্তর ঘেমে গেছি!

এই রকমে নূতনতর আশা ও আকাঙ্খা, উত্তেজনা ও উল্লাসের ভেতর দিয়ে আমার জীবন একটা পরিণতির দিকে অজ্ঞাতসারেই অগ্রসর হচ্ছিল—এমন সময় একদিন শুনলাম যে পাঁচ দিন পরেই আমার বিয়ে! এই আকস্মিক সংবাদটা ঘূর্ণী-হাওয়ার মত আমার মনে একটা বিপ্লব সৃষ্টি ক'রে আবর্ত্তিত হ'তে লাগলো বটে—কিন্তু সে কিসের জন্য? এ বিয়েতে আমার সম্মতি আছে কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করা কেউ আবশ্যক বোধ করলেন না। মাতো আনন্দে আত্মহারা! অমন জমিদার জামাই—দোজবর হ'লে কি হয়; কাঁচা উমের—আমার চঞ্চলার বরাত ভাল! দুরন্ত অভিমান আমার সমস্ত হৃদয়ে একটা বেদনাময় বিক্ষোভে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো! কিন্তু তবুও এই বিয়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মত একটা জোরের "না" আমার অন্তরে ছিল না ব'লেই আমি কথায় তো কোন আপত্তি প্রকাশ করতে পারলামই না—এমন কি ভাবভঙ্গীতেও নয়। চঞ্চলা নামটার সঙ্গে আমার চালচলনের এমন অসম্ভব রকমের মিল ছিল যে আমায় চিন্তিত ও গম্ভীর দেখে সকলেই ধারণা করলেন যে বিয়ের সংবাদে আমি একটু লজ্জাশীলা হ'য়ে পড়েছি—এবং সেটা নাকি ভালই!

ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া একটা স্পষ্টতম বাস্তব—আমার একান্ত নিজস্ব-পরিণত হবার উপক্রম হ'য়েছিল—সেটা অকস্মাৎ হাউইএর মত চকিতে তার ক্ষণিক দীপ্তিতে তীব্র বেগে ছুটে কল্পনার অতীত প্রদেশে গিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে —আমার সমস্ত হৃদয়ের উপর একটা অন্ধকারকে জমাট ক'রে দিয়ে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। হিরণবাবু যদি শোনেন যে আমি এই মিথ্যার দৌরাত্ম্য থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার জন্য কোন চেষ্টাই করি নাই তা'হলে তিনি মনে করবেন কি? চেষ্টাটা তিনিই করবেন কি আমারই করা উচিত—এর মীমাংসা ক'রে উঠতে পারলাম না। হিরণবাবু গরমের বন্ধে বাড়ী গেছেন, কাজেই সময় আর উপায় দুএরই অভাব! আপনারা হয়তো বলবেন মেয়ে মানুষের পক্ষে এতটা খোলাখুলিভাবে মনের কথা প্রকাশ করা লজ্জাজনক। কিন্তু মনে রাখবেন আমি আপনাদের উপন্যাস বলতে বসিনি—যা সত্যই ঘটেছে তাই বলছি।

সে যা হোক, সত্যই পাঁচ দিন পরেই বিভূতি বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। আমার নারীর প্রাণ পুরুষের জন্য অবশ্য তেমন সজাগ ছিল না ব'লেই আমার স্বামী আমার হৃদয়ে একটা বড় রকম কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারলেন না। আপনারা সকলেই জানেন অপরের ব্যবহার করা পুরোণো শাল দামী হলেও—আনকোরা নতুন একখানা কমদামী রাপ্যারের ওপরই মানুষের স্বভাবতঃ লোভটা বেশী হয়। সেইরকম আমার দোজবর স্বামীর সঙ্গে হিরণবাবুর তুলনা করতে

গেলেই আমার মনের স্বাভাবিক গতিই হতো হিরণবাবুর দিকে! কিন্তু তাই ব'লে ঐ যে একটা জীব, যার সঙ্গে আমার চিরজীবনের সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে আমার কোন কৌতুহলই ছিল না, এটা যদি আপনারা মনে করেন তবে আপনাদের পক্ষে নারীর চিরন্তন প্রকৃতিটাকেই অস্বীকার করা হবে! তাই সেদিন যখন আমার ননদ স্বর্ণ রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে আমাকে একখানা গোলাপী রঙের শাড়ী পরাবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো তখন আমি মোটেই আপত্তি কর্‌লাম না। আমার স্বামীর সঙ্গে এই প্রথম নিরালা মিলন যে কোন নূতন উন্মাদনা সৃষ্টি কর্‌তে পার্‌বে না তা আমি বেশ জান্‌তাম, কারণ মানুষের জীবনে একই বিষয়ের অনুভব দ্বিতীয়বার তেমন তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয় না। জ্যাকেটের বোতাম আঁট্‌তে আঁট্‌তে মনে পড়ে গেল সেই আর একদিনের সন্ধ্যাবেলার কথা! ভেবে আর কি হবে? তা' হচ্ছে অতীতকে নিয়ে একটা সেন্‌টিমেন্টালিজম্‌।

আমার স্বামীর শোবার ঘরের দরজার সাম্‌নে আস্‌বা-মাত্র আমার পায়ে যেন কে হাতীবাঁধা মোটা মোটা লোহার শিকল জড়িয়ে দিলে। একটা আসন্ন অপমানের আশঙ্কায় কুণ্ঠিত হ'য়ে স্বর্ণর কাঁধের উপর হাতখানা রেখে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বল্‌লাম যে "চল ভাই, আজকার মত আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকিগে—আমার বড় লজ্জা কর্‌ছে!" সে নানারকম আমায় শাসিয়ে একরকম জোর ক'রে টেনে হিঁচড়ে ঘরের মধ্যে ঠেলে দিলে। ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে, কোনমতে অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে একপাশে সঙ্কুচিত হ'য়ে দাঁড়ালাম। স্বর্ণ দুষ্টামির হাসি হেসে বল্‌লে "দাদা, এই তোমার বউ বুঝে পড়ে নাও, যে লজ্জা না গো মা!"

আমাকে দেখবামাত্র তিনি অর্থাৎ আমার স্বামী এমন অস্বাভাবিকভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লেন যে বাড়ীতে হ'লে এদৃশ্য দেখে আমি নিশ্চয়ই হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌তাম! তত জোরের প্রাণখোলা হাসি না হ'লেও, মাঝারি গোছের একটা চলনসই হাসি পেট থেকে উথ্‌লে গলা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেছে ঠিক এমনি সময় তিনি এসে আমার আলিঙ্গন কর্‌লেন। যদিও এই আলিঙ্গন খুব নিবিড়; শরীরের ওপর একটা উৎকট অত্যাচার; তবু এ থেকে মুক্ত হবার জন্য কোন চেষ্টাই আমি কর্‌লাম না। কেবল মনে হ'তে লাগ্‌লো আমার সমস্ত শরীরের ওপর যেন একশো ব্যাঙ তাদের থিতথিতে স্পর্শ নিয়ে একটা নিশ্চিন্ত অধিকারের দাবীতে সারি সারি বসে গেছে। তিনি টক্‌ ক'রে আমার ঘোম্‌টা সরিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত মুখের দিকে চাইলেন—সে দৃষ্টিতে ছিল একটা নির্ম্মম অনুসন্ধানের তীব্রতা-মাখান রূপের মাদকতা! সহসা একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় আমি ছিট্‌কে গিয়ে টেবিলের উপর পড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে আলোকটা উল্টে পড়ে দপ্‌ ক'রে নিভে গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবল শুন্‌লাম তাঁর পলায়মান পায়ের শব্দ—তারপর সব নীরব। আমার প্রবুদ্ধ চৈতন্যের উপর কি এ অকারণ লাঞ্ছনা! আমার প্রাণের পরে হাজার চাঞ্চল্যের গোলমাল আমার পায়ে দ'লে আমার মগ্ন চৈতন্যের সত্য মন থেকে বেরিয়ে এসে যখন মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়ালো—তখন আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম হিরণবাবুর ওপর আমি অন্তরের দিক থেকে যে অধিকার করেছি—সেই নৈতিক দৌর্ব্বল্যের বিষম পরিণামটী এমনি ব'য়েই আমাকে চিরজীবন ঘুঁটের আগুনে পোড়াবে। হায় এরকম ঘটনা ঘটবে তার একটু আভাসও যদি আগে পেতাম তা' হলে কেউ আমার বিভূতিবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিতে পার্‌তেন না—এটা ঠিক অনুভব কর্‌লাম।

সকাল বেলায় বসে বসে যখন রাত্রের ঘটনাটা ভাবছিলুম, এমন সময় মুখখানা কালো ক'রে স্বর্ণ এসে পাশে দাঁড়ালো। সে দরজার আড়াল থেকে সবই দেখেছিল; তার কাছে লুকোবার চেষ্টা করা বৃথা হ'লেও এত বড় একটা লাঞ্ছনাকে সহজে স্বীকার ক'রে নেওয়াই আমার পক্ষে খুব কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো। তবে এইটুকু রক্ষা যে স্বর্ণ মেয়েটা অনেকটা বোকা চালাক্‌ গোছের—তাই তাকে আমার ব্যথার ব্যথী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা দরকার বোধ কর্‌লুম না। সে আমার স্বামী তাঁর ভূতপূর্ব্ব স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার কর্‌তেন তার অনেক কথাই জেনে নিলুম। স্বর্ণ যখন অসংযত ভাষায় অনর্গল সেই সব কথা ব'কে যাচ্ছিল তখন আমার নারী-হৃদয়ের সমস্ত রূপ যৌবন সবই জোয়ারের জলের মত উথ্‌লে উঠে একটা বিপ্লব সৃষ্টি কর্‌বার পথ খুঁজ্‌ছিল। কেবল সে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না, একটা

দুর্ব্বল স্ত্রৈণ পুরুষ কেমন ক'রে প্রবল অবজ্ঞাভরে—এইখানে এসে চিন্তাই খেই হারিয়ে ফেলে, টেনে বুনে আর কি বল্‌বো!

রাত্তিরে স্বর্ণ একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল আমাকে দেখে—কারণ আমি সেজেগুজে আমার অপরূপ বাসরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম; তবু আমি নতুন বউ কিনা, তাই স্বর্ণও আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো। আমার স্বামী বসে বসে কাব্য পাঠ কর্‌ছিলেন। আমি ঘরের মধ্যে পূর্ব্বদিনের মতই দাঁড়ালুম স্বর্ণ এগিয়ে গিয়ে তার দাদার দিকে চেয়ে বল্‌লে, "দাদা, তুমি আর যাকেই ফাঁকি দাও না কেন আমার নূতন কান, নূতন চোখ নূতন মনকে ফাঁকি দিতে পার্‌বে না। তোমার বাগানের দিক্‌কার দরজায় আজ বাহির থেকে শিকল এঁটে দিয়েছি—আর এ দরজারও তাই কর্‌বো। যদ্দিন তুমি শিষ্ট না হ'য়ে ওঠো, তদ্দিন তুমি এমনি বন্দীর অবস্থাতেই রাত কাটাবে।"—স্বর্ণ কপাট টেনে দিয়ে বাইরের শিকলটা কড়ায় লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল, আমি দাঁড়িয়েই রইলুম। ঘোমটার আড়াল থেকে দেখ্‌তে পেলুম—তিনি আমার দিকে, বেড়াল যেমন মাছের দিকে চেয়ে থাকে, তেমনি ক'রে চেয়ে দেখ্‌ছেন। আজকে আমি নিজেকে ঠিক ক'রেই রেখেছিলাম—গত রাত্রের মত বিশ্রী ব্যাপার ঘটতে দেবো না। এমনি ক'রে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর তিনি নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে বলে উঠ্‌লেন—"চঞ্চলা এসো।"

সঙ্কোচ ও দৃঢ়তায় মিশে আমার চল্‌বার ভঙ্গীটে বোধ হয় খুব সুন্দরই হয়েছিল—নৈলে আমার স্বামীর চোখে এমন ক্ষুধিত দৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠ্‌তো না নিশ্চয়! কিন্তু তিনি একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাননি'—যেহেতু আমি নিতান্ত ঝি-চাক্‌রাণীর মতো হুকুম তামিল ক'রে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াবামাত্র ঘোমটাটি ফেলে দিতে তার একটুও দেরী হল না। তবুও আমার লোকটার উপর অভিমান হল না। আমার হাতখানি নিয়ে তিনি নানাভাবে নেড়েচেড়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন; কিছুক্ষন পর এই লোলুপতা সহ্য কর্‌তে না পেরে আমি একরকম অজ্ঞাতসারেই বলে উঠ্‌লুম "কি দেখ্‌ছো?" তিনি থিয়েটারী কেতায় মুখ বাঁকিয়ে বল্‌লেন, "আমার স্বভাব এমনি যে, আমার মানুষের হাতের সঙ্গেই ভালবাসা আগে হয়। তোমার হাত দু'খানি অতি সুন্দর।" আমার হাত দু'খানি যে সুন্দর সে পক্ষে সন্দেহ কর্‌বার কোন কারণ ছিল না, তবুও একটা পরিণত বয়েসের পুরুষের মুখে এই জোর ক'রে আনা নিছক ন্যাকা কথা শুনে একটু হাসি পেল। এই সব কবিকে খেয়ালের খোরাক জোগাবার প্রবৃত্তি আমার মোটেই ছিল না; কাজেই কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্য আমি স্পষ্টভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন কর্‌লাম "শুনেছি, তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খুব ভাব ছিল; অথচ তিনি মারা যাওয়ার পর বছর না ঘুর্‌তেই আবার বিবাহ কর্‌লে কেন?"

আমার দৃষ্টিটা বোধ হয় মনের দাবিয়ে রাখা অসহিষ্ণু অভিমানে একটু তীক্ষ্ণ হয়েছিল, তাই তার ভাব দেখে মনে হ'ল আমার দৃষ্টি যেন তাঁর পাঁজর ভেদ ক'রে বুকের ভেতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত ক'রে তুল্‌ছে! তিনি ভ্যাবা-চ্যাকার মত ব'লে ফেল্‌লেন, "কি করি মা ছাড়লেন না তাই বাধ্য হ'য়ে বিয়ে কর্‌তে হ'ল।"

এমন মাতৃভক্ত পুরুষ যে এককালে নামজাদা স্ত্রীভক্ত ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও হবার আশা রাখেন—সে সম্বন্ধে সন্দেহ-প্রকাশ কর্‌বার কোন কারণ নেই। তবু একবার মুখের উপর বল্‌তে ইচ্ছা হয় যে "তোমার খেয়ালের খোরাক জোগাবার জন্য বিধাতা আমায় সৃষ্টি করেন নি; নারীত্বের মর্য্যাদাকে প্রাণপণে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার অধিকার সকল নারীরই আছে—অন্ততঃ থাকা উচিত।"—সে যাই হোক্, ফলে আমার কোন কথাই বলা হ'ল না; কেবল মনে মনে মতলব আঁট্‌লাম, পূর্ব্বরাত্রের ঘটনার প্রতিশোধ আমি যেমন ক'রে পারি নেবো! একটা দুর্ব্বল-হৃদয় পুরুষকে পায়ের তলায় নাই আন্‌তে পার্‌লাম যদি—তা হ'লে এ দেহে আবার রূপ যৌবন এসেছিল কেন?

স্বর্ণ তার শ্বশুরবাড়ী চলে গেল, আমরা স্বামী স্ত্রীতে যেমন সবাই দিন কাটায় তেমনি দিন কাটাতে লাগ্‌লুম। তবুও এই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারটার মধ্যেও এমন একটা প্রহেলিকাময় কিন্তু ছিল—যার একটা কঠিন অস্তিত্ব আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে জানিয়ে দিত যে আমার সমস্ত জীবনটা বিরাট মিথ্যা সম্বন্ধের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

সেই অতীতের একটা স্মৃতি—যা আমার মনের কোণে আট্‌কা পড়ে ছিল, যদিও সেটা দিন দিন অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হ'য়ে আস্‌ছিল—তবুও তার একটা সূক্ষ্ম প্রভাব অন্তরকে একটা নেশায় বিভোর ক'রে রাখ্‌তো। ঐ প্রভাবের মধ্যেই আমার প্রাণ নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌তো, বর্ত্তমানের স্পষ্টতার চেয়েও অতীতের অস্পষ্টতাটাই বেশী দামী।

যতই দিন যেতে লাগ্‌লো আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌লুম—প্রথমপক্ষের স্ত্রীর বিরহটাকে তিনি একটা রোম্যাণ্টিক ব্যাপার ক'রে তুল্‌বার জন্য পূরোদস্তর ভণ্ড সেজেছেন; কিন্তু সে ভণ্ডামীর আবরণ ভেদ ক'রে মাঝে মাঝে তাঁর অন্তরের লালসা উঁকি মেরে বাইরে থেকে কিছু পাবার আশায় উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তো—কিন্তু বেচারার পক্ষে সহজ মানুষ হওয়া কত কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!! তিনি নিজেকে আমার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য কি চেষ্টাটাই না করতে লাগ্‌লেন—কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটী সুযোগকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়াটাই হ'ল আমার নারী-জীবনের সার্থকতা? এই রকমে ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি একটা রুদ্র অবজ্ঞা আমার চিত্তকে বিষময় ক'রে তুল্‌লো; আমি তাঁর সাম্‌নে নববধূর মতই ঘোমটা টেনে থাক্‌তাম। এ রূপের উপর তাঁর কোন্ অধিকারের দাবী? আর এই কথা ভাব্‌তে গেলেই আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়ে একটা প্রশ্ন হৃদয়ের পরদায় পরদায় ফুটে উঠ্‌তো—আমার স্বামী বিভূতিবাবু না হিরণবাবু?

আপনাদের মনে কখনও বিদ্রোহের ভাব জেগেছে? বিদ্রোহ—সংসারের উপরে সমাজের উপরে। কেন আমাকে জোর ক'রে এই ন্যাকা পুরুষটীর হাতে সমাজ নিশ্চিন্তে সঁপে দিলে? আমার হৃদয় যাকে প্রতিনিয়তই অস্বীকার ক'রে আপনার সরল পথে চল্‌তে চায়—তাকে স্বামী বলে মেনে নিতে হবে—এ অত্যাচার কেন? এই নিষ্ঠুর অত্যাচারটা আমার হৃদয়ের উপর দিয়ে সমস্ত সজীবতা ও স্বাতন্ত্র্য চূর্ণ ক'রে মিউনিসিপ্যালিটীর রোলারের মত ভ্রূক্ষেপহীনভাবে দিবানিশি গড়িয়ে যাচ্ছে—অথচ এর বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই, কর্‌তে গেলেই হৃদয়হীন নির্ম্মম জগত আমায় ধিক্কার দেবে! কিন্তু কেন? কাকে প্রশ্ন কোর্‌বো—এখানে হৃদয় নেই, দয়া নেই, করুণা নেই—সবাই কেবল একটা বিরাট মিথ্যা!

না এমন ক'রে জীবন তো কাটে না। আমার স্বামীর রাক্ষসী লালসার তৃপ্তির জন্য আমাকে প্রতিনিয়ত দরকারের পেছনে পেছনে ছুট্‌তে হবে—অথচ তার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে পাব না? তাঁর রুচির হোমে দেহকে আহুতি দেবো—ভুলে যাব যে আমার জীবনের একটা সুখ দুঃখ আছে, আশা আকাঙ্ক্ষা আছে? হায়, এর হাত থেকে আমার কবে মুক্তি হবে? কিসে হবে?

এমনি করেই দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। একদিন রাত্রে হিরণবাবুকে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম যে, হিরণবাবু এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সেই পারার মত চঞ্চল চক্‌চকে চোক দুটী ছল ছল—পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপ্‌ছে—যেন তাঁর মনের কোণে আট্‌কা পড়া কথাগুলি আমায় বল্‌বার জন্য নির্জের অভিমানের সঙ্গে লড়াই কর্‌ছেন। আমার ঘুম তখনই ভেঙ্গে গেল। শয্যার উপর উঠে বস্‌বামাত্র নিষ্ঠুর বাস্তব একটা বরফের চাপের মত আমার বুকের উপর সজোরে পতিত হ'য়ে সমস্ত কল্পনা চুরমার ক'রে দিলে! একি বিদ্রূপ বিধাতার! কেগো তুমি আমার জীবন নিয়ে এমন ক'রে দয়াহীন খেলা কর্‌ছো? বুক ফেটে কান্না এলো—তা থামাতে পার্‌লাম না। যেন একখানা বরফের হাত আমার হৃৎপিণ্ডটাকে অনবরত পেষণ কর্‌তে লাগ্‌লো! ওগো আর না, আর না, আমি এ মিথ্যার অভিনয় ভেঙ্গে দিয়ে তোমার সন্ধানে ছুটবো সমস্ত কাঁটা পায়ে দ'লে—আর এমনি ক'রে কেবল একটা জেদের খাতিরে নিজেকে সঙ্গে সঙ্গে এই স্বামীকে প্রতারিত কোর্‌বো না—গণ্ডীর বাঁধন ছিঁড়ে নিজের অধিকারে দাঁড়াতেই হবে। এমন সময় আমার স্বামী উঠে বস্‌লেন। আমার কাঁদতে দেখে তিনি বোধ হয় গর্ব্বের সঙ্গেই ভাব্‌লেন যে তাঁর ব্যবহারেই আমি কাঁদছি। হায় তিনি যদি জান্‌তেন প্রকৃত কথা? যদি বুঝ্‌বেন যে আমার অন্তরাত্মা তাঁকে মোটেই বরণ ক'রে নিতে পারেনি। ফাঁকা কথায় আমার

সান্ত্বনা দেবার তার নির্লজ্জ চেষ্টা দেখে অতি দুঃখেও হাসি এলো !!

এমন সময় মা এসে কপাটে আঘাত ক'রে আমার স্বামীকে বল্লেন, 'দেখত কার মোটর এসে আমাদের বাড়ীর গেটের কাছে এসে লাগ্‌লো।"

শুনলাম আমার বাবার শক্ত ব্যারাম—আমায় নিতে মোটর এসেছে। আমার স্বামী আমায় নিয়ে মোটরে উঠ্‌লেন।

তখন ভোর হয় হয়, বাবার ঘরে ঢুকে দেখি তিনি যেন এই অভাগীকে দেখ্‌বার জন্যই বেঁচে ছিলেন। আমার শুষ্ক শীর্ণ মূর্ত্তি দেখে তিনি চম্‌কে উঠ্‌লেন। বল্লেন "মা বড় ঘরে তোর বিয়ে দিয়েছিলুম—সুখ হবে ব'লে—এমন হ'য়ে গেলি কেন মা ?"

বাবাকে মিথ্যা কথা কি ক'রে বলি, মাথা নাবালুম। তিনি মুখ বিকৃত ক'রে বল্লেন, "বুঝেছি একজনকে অমনি ক'রে মেরে ফেলেছে—আর একজনকেও—অমূল্য,ডাক্‌তো ?

দাদা তাঁকে ডাক্‌তে গেল। আমার প্রাণটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো! সত্যিতো ? বোধ হয় এমনি ক'রেই জ্বালাতন হ'য়ে আমার সতীন মারা গেছে। আমিও মর্‌বো ? না, না, আমি বাঁচ্‌বো! আমার জীবন একটা ন্যাকামোর খাতিরে বলি দেবো না !!

তিনি ঘরে ঢুক্‌তেই বাবা ব'লে উঠ্‌লেন "এ কাকে নিয়ে এলে বাবা, এত আমার চঞ্চলা নয়"—বাবা আরও কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন। বোধ হয় আমি অত্যাচারে ও অযত্নে এমনি রোগা হ'য়ে গেছি, সেই কথাটা ব'লে জামাইর নিকট একটা শেষ অনুরোধ রেখে যেতেন। কিন্তু হায়রে ভণ্ডামী! তিনি ক্ষুধিত শার্দ্দূলের মতো আমার উপরে লাফিয়ে পড়ে আমার বুক চেপে ধর্‌লেন। তারপর সেই অবস্থাতেই আমার বাবার দিকে হাতের "তর্জ্জনী উঁচিয়ে চ্যালেঞ্জের স্বরে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন" "না এ আপনার মেয়ে চঞ্চলা নয়—আমার স্ত্রী রেবামিনি।" তারপর—বল্‌তে লজ্জা হয়! আমার বড় ভাই দাঁড়িয়ে—সম্মুখে বাবা মারা যাচ্ছেন, এমন সময়ে পাগলের মত তিনি আমায় চুম্বন কর্‌লেন। এ বীভৎস দৃশ্য দেখে বাবা চীৎকার ক'রে, জ্ঞান হারালেন। দাদা হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন—বাবার এই অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে বল্লেন, "করেন কি বিভূতিবাবু—বাবা যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত বিদায় নিলেন।"

আর বিভূতিবাবু! তিনি তখন আমায় চুম্বন কর্‌ছেন !! এতদিন ধরে তিনি যে কাব্য, সাহিত্য আলোচনা করেছেন, তার আবেগে একটা নূতন কিছু করা চাইতো! আমার বাবা ম'লে তাঁর তো কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই,! কারণ মৃত্যুর অসীম শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে চুম্বন ও আলিঙ্গন করার মধ্যে যে একটা বিজয় গর্ব্ব আছে তাকে উৎকট ভাবে প্রকট ক'রে তুল্‌বার এমন সুবর্ণ সুযোগ তো আর মিল্‌বে না! আপনারাই বলুন দেখি—এমন রোমাণ্টিক স্বামী কজনের ভাগ্যে মেলে ?

শ্রীপ্রতাপাদিত্য রায়।

চাষার বিরহ।

আজিকে প্রথম ফুটেছে ঝিঙের ফুল,
বৃষ্টির জলে বেঁধেছে ডাঁটার ঝাড়,
আঁব গাছে বাসা বাঁধিয়াছে বুলবুল্,
বেগুণ গাছের ধরিয়াছে খাসা ঝাড়,—
প্রিয়ে! তোর তরে আজ প্রাণ করে হাহাকার!

বেড়ার গায়েতে ধরেছে উচ্ছে-জালি,
মাচার উপরে ঝাঁপিয়ে উঠিছে পুঁই,
শসা গাছ গুলো লতিয়ে উঠিছে খালি,
সবুজ বরণে হাসিছে এবার ভূঁই,—
প্রিয়ে! আমি হেথা, আর কোথা তুই—কোথা তুই!

মত্তমানের পড়েছে মস্ত কাঁদি,
কাণায় কাণায় ছাপিয়ে উঠেছে কূয়ো,
ডোবায় এবার লেগেছে মাছের গাঁদি,
গাছে এ বছর ফলেছে অনেক গুয়ে,—
প্রিয়ে! তুই বিনে মোর সকলি লাগিছে ভুয়ো!

নূতন খড়ে যে ছেয়েছি ঘরের চাল,
গরুর গাড়ীর বেঁধেছি নূতন ছই,
নূতন বছরে কিনেছি নূতন হাল,
আলের জলেতে পেয়েছি পাঁচটা কই,—
প্রিয়ে! তোর তরে আজ কেঁদে কেঁদে সারা হই!

লেবুর ফুলের গন্ধ করিছে ম'ম',
উঠানে ফুটেছে দোপাটী, কৃষ্ণকলি,
কলাবতী ফুল টুকটুকে তোর সম,
আলো ক'রে আছে ডোবার ধারের গলি,—
প্রিয়ে! আমি খুন হই, কোথা আজি তুই র'লি!

ধবলি গায়ের হ'য়েছে বাছুর খাসা,
মঙ্গলা আজো দুধ দেয় কেঁড়ে কেঁড়ে,
কষুরি পেয়ারা হইয়াছে ডাঁশা ডাঁশা,
সারাদিন পুষি তোর পথ চেয়ে ফেরে,—
প্রিয়ে! সব আছে তবু বাঁচি নাক' তোমা ছেড়ে'

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"গোরা"

রবীন্দ্রনাথের "গোরার" সমালোচনা কর্‌বার মত অবস্থা আমার আজও আসেনি, শুধু সুগন্ধ ও ঝাঁজের কথাই যা অনুভব ক'রেছি, তাই একটু প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা ক'রব। "গোরাতে" প্রধানতঃ কি কি মীমাংসা হয়েছে?---(১) "First love is not real love: প্রকৃত ভালবাসা প্রথম দর্শনেই হয় না। "প্রেমের মর্য্যাদা" সজীব চরিত্রগুলির ভিতর থেকে উজ্জ্বল আলোর মত প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। (২) "মানুষের মর্য্যাদা" ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার, অনুষ্ঠান ও সাম্প্রদায়িকতার বড় বড় প্রধান বাঁধ ছাপিয়ে উঠেছে। সমাজ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের দ্বন্দ্বের সমাধানের সত্যপথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে (৩) "গোরার স্বদেশ-প্রেম, বিনয়ের রমণী-প্রেম,—মানুষের হৃদয়ের দু'টী প্রবল আকাঙ্ক্ষার, শক্তি ও প্রেমের উপাসনার মন্ত্রদু'টীর এই যে "মিলন" তা সুচারুরূপে অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে। ভারতে নারীশক্তির যথার্থ আসন-সিংহাসন—নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, যার অভাবে বা অবহেলায় দেশের শক্তি আধখানা রয়ে যাচ্ছে, যার সার্থকতার উপর ভারতের ভাবী পূর্ণশক্তি নির্ভর ক'রছে! ভারতের নারীশক্তি অন্ধ অনুকরণে জাগ্‌বে না, ভারতের বিশিষ্ট পথে তার যে বিকাশ হয়েছে, সেই পথেই তার শুভ চরম পরিণতি হবে। (৪) "ভারতবাসীকে" প্রকিতিস্থ হ'তে হবে: নির্ব্বিচারে বিদেশী হাবভাব, শিক্ষাদীক্ষা, গ্রহণ কর্‌লে চল্‌বে না;—দেশবাসীর স্বাধীন চিন্তা ও সমবেত চেষ্টায় আত্মহিত চিন্তার স্রোত যথার্থ ফিরে আসা চাই, নইলে কোন দেশ-গুরুর শিক্ষায় দেশ প্রাণময় হ'য়ে মাত্‌বে না।

* * * * *

"গোরা" নিখুঁত নয়; সুগন্ধের মধ্যে ঝাঁজও আছে। (১) প্রথম, কারাগারে গোরাকে আমরা দেখ্‌তে পাই না। গোরাকে আমরা পরিপূর্ণরূপে দেখি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে, মহাত্মা গান্ধীকে আমরা গোরার মধ্যে দেখি না; গোরার জীবনের ছায়াময় এই অংশ মহাত্মা গান্ধীর জীবনে সহস্র রশ্মিতে আলোকময় হয়েছে।

(২) 'মাসীমা' হরিমোহিনীর আবির্ভাব অস্বাভাবিক কষ্টকল্পনার মত; বরদাসুন্দরীর গৃহে তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য ও স্বতন্ত্র অবস্থায় আশ্চর্য্যহীনতা কেবল "উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা" রক্ষা ক'রেছে—এতটা অসাদৃশ্য সুসঙ্গতও হয়নি। ("উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা" আর কিছু নয়, সুচরিতাকে ভিন্ন অবস্থায় ফেল্‌লে তার চরিত্রের কতটা পরিবর্ত্তন সম্ভব তারই "দার্শনিক বিচার" কপালকুণ্ডলাকে গৃহে আনার মত দার্শনিক কল্পনা।) এই উপন্যাসের

প্রয়োজনীয়তা রক্ষার জন্যই সুধীর, লীলা ও লাবণ্যর চরিত্র সৃষ্টি; সমস্ত উপন্যাসখানিকে একটী ফুলন্ত গাছের সঙ্গে তুলনা করলে এরা সব অর্দ্ধস্ফুট ও অপরিস্ফুট কুঁড়ি। এদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর সতীশ, সতীশের পার্শ্বে লীলা ও সুধীর অর্দ্ধস্ফুট এবং লাবণ্য অপরিস্ফুট রয়ে গেছে।

(৩) গোরা যখন বল্ল "আমার কোন বন্ধন নেই," তখন সে শক্তিহীন নিষ্প্রভ নয়; তখন তার শক্তি যথার্থ ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হ'ল। তার স্বদেশ প্রেম স্বার্থকতা লাভ করল, প্রসারতা লাভ করল: কিন্তু সেই Transmission বড় আকস্মিক; নিমেষমাত্রে সে এত বড় বিপর্য্যয় "অবাক্" হ'য়ে মেনে নিলে! ভারতবর্ষের আকর্ষণে ক্ষুদ্র জলন্ত উল্কার মত অকস্মাৎ মাটীর সঙ্গে মিশে গেল!

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে নিখিলেশ-চরিত্রে আমরা দেখি বিনয়ের প্রেম কতটা প্রসারতা লাভ করেছে। গোরার মানবত্ব দানবত্বের দিকে ছুটে চল্‌তে গিয়ে সন্দীপ চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সন্দীপের চরিত্রের শেষ পরিণতি গোরার মত উজ্জ্বল নয়, দানবত্বের অবসানে একেবারে নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে। নিখিলেশ-চরিত্র বিনয়-চরিত্র অপেক্ষা উজ্জ্বল হয়েছে। প্রেম নিষ্কাম প্রেমে পরিণত হয়েছে। সুচরিতার পার্শ্বে ললিতা ও বিনয়ের পার্শ্বে গোরা সমান্তরালে থেকে সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পেরেছে। এই সামঞ্জস্য আমরা যেমন উদার-হৃদয় পরেশ বাবুর চরিত্রে ও আনন্দময়ী মা'র চরিত্রে লক্ষ্য করি, তেমনই সহজে আমরা দেখ্‌তে পাই যে ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজের প্রভাব মনুষ্যত্বকে ছোট ক'রে রাখ্‌তে পারে না, বাধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের প্রকৃতি নূতন শক্তিসঞ্চয় করতে থাকে, যে শক্তির কাছে সকল সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়, সমাজই মানুষের সৃষ্টি, মানুষ সমাজের সৃষ্ট নয়।

"মানুষমাত্রেরই নিত্য নূতন শক্তিসঞ্চয়ের অসংখ্য সুযোগ ঘটে; ঘটনাস্রোতের ভিতর দিয়ে জীবনের শক্তি ছুটে চলেছে, উপরের ঢেউগুলো তার আকার মাত্র। ঘাত প্রতিঘাতেই শক্তির উদ্বোধন হয়। বিনয়ের আধখানা শক্তি গোরার প্রভাবে পাওয়া, বাকীটা মা আনন্দময়ী ও ললিতার দেওয়া, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। গোরার কাছে যা চির-অজ্ঞাত ছিল, সেই ভারতের নারী-শক্তির পরিচয় তার বিনয়ের কাছেই প্রথম পাওয়া; আনন্দময়ীর প্রভাব গোরার উপর পরিপূর্ণই ছিল। তার স্বপ্নের ভারত সে নারীশক্তির বিনা সাহায্যে সম্পূর্ণ গ'ড়ে তুল্‌তে পারে না, তা'কে স্বীকার করতে হ'ল"।

"মা আনন্দময়ী তাঁর উদার মাতৃহৃদয় দিয়ে বিশ্বকে আশ্রয় দিতে পারলেন তাঁর গোরার জন্য; বিশ্বকে আঁকড়ে ধরেও তাঁর ভয় পাছে গোরা চলে যায়! গোরার ভয়েও তিনি বিনয়-ললিতাকে আশ্রয় দিতে দ্বিধা করলেন না। ললিতাকে যিনি আশ্রয় দিলেন না, তিনি ললিতার মা বরদাসুন্দরী।

"বরদাসুন্দরীর মাতৃহৃদয় আনন্দময়ী মা'র পার্শ্বে সমাজ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে খর্ব্ব হ'য়ে গেছে। সমাজের মঙ্গলকামনাই তাঁর চরম লক্ষ্য; ব্রাহ্মধর্ম্মের রক্ষক পানুবাবুর মত তিনি সমর্থন করেন, পরেশ বাবুর ঔদাসীন্য সহ্য করতে পারেন না!

"পরেশ বাবুর উদারতা পানুবাবু বোঝেন ঔদাসীন্য। কৃষ্ণদয়াল চরিত্রের পার্শ্বে পরেশ বাবুর চরিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে চিত্রিত হয়েছে।

ললিতা ও সুচরিতার শিক্ষা পরেশ বাবুরই আদর্শে হয়েছে; ললিতা তার প্রায় সব শক্তিই পিতার আদর্শে সঞ্চয় করেছি। সুচরিতা তাহার পালিত পিতার শিক্ষার প্রভাবে আত্মশক্তি সঞ্চয় করলেও, তার অনেকটা সে তার অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর থেকে গ্রহণ করেছে; গোরার প্রভাবও সামান্য নয়।

ললিতার ও সুচরিতার চরিত্রে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের হীনতা অধিক আক্রমণ করেছে। ললিতার ষ্টীমারে বিনয়ের সহিত পলায়ন ও সেই রাত্রি বিশেষ স্মরণযোগ্য; সুচরিতারও আত্মরক্ষার চেষ্টা, বিভিন্ন অবস্থায় তাহার অপরিসীম আত্মসংযম ললিতার তীব্র তেজস্বীতার সহিত তুলনীয়।

* * * * *

"গোরা" শক্তি-মন্ত্রের উৎস-প্রস্রবণ। ভারতবাসী ভারতের কবিগুরুর কাছে এই বড় শিক্ষালাভ করছে যে, আঘাত

করাই দুঃখ, আঘাত পাওয়া দুঃখ নয়। আঘাত যারা পায়, সবল হয় তারাই, যারা কেবল আঘাত করে—যত বড় শক্তিশালীই হ'ক না কেন—তারাই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। আঘাত পাওয়া, দুঃখকে বরণ করা ঈশ্বরের দান. শক্তির উৎসকে গৃহে স্থাপন; দুঃখের, আঘাতের তীব্র বেদনার ভিতর থেকে মানুষ যে শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, যে শক্তিকে প্রতিহত কর্‌বার মত দুর্দ্ধর্ষ শক্তি জগতে আজও সৃষ্ট হয় নেই। সে নবশক্তির নাম প্রেম; সে প্রেম বিদ্বেষ জয় করে; যে প্রেমে গোরা স্বপ্নের ভারতবর্ষ রচনা ক'রেছিল আজ মহাত্মা গান্ধীর সেই মন্ত্রবলে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ সঞ্জীবিত হ'য়েছে।

শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার।

পরীক্ষা।

নীরোদের পিতা কলিকাতার একজন বড় আটর্নী ছিলেন। তাঁহার অবস্থা বেশ ভাল ছিল, আর নীরোদই তাঁহার একমাত্র পুত্র; সুতরাং সে কখন টাকার অভাব জানে নাই। চাকরীর চেষ্টায় উমেদারী করিয়া বেড়াইবার তাহার কোনই আবশ্যক হয় নাই, হাতে সময়ও যথেষ্ট ছিল, তাই এম, এ পাশ করিয়াই তাহার চিরদিনের সাধ বই লেখায় সে সমস্ত মনোযোগ দিল। তাহার রচনাশক্তিও বেশ ভাল ছিল, এদিকে অন্নচিন্তাও নাই, কাজেই অল্প দিনের মধ্যেই, একাগ্র সাধনার ফলে সে লেখক-সমাজে বেশ নাম করিয়া ফেলিল। এতদিন ছোট গল্প ও কবিতার দিকে তাহার বেশী মন ছিল, কিন্তু কিছুদিন হইল সাহিত্য-সমিতি হইতে একটা বেশ বড় রকম সামাজিক উপন্যাস লিখিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠান হইয়াছে।

নীরোদের অনেক দিনের সাধে একটী বড় রকম বই লিখিয়া সাহিত্য-জগতে উপন্যাসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। তাহার ভিতর যে চিন্তাশক্তি ও গভীরতা ছিল না তাহা নহে, বরঞ্চ সে যখন লিখিতে আরম্ভ করিত তখন সে তাহাতে এমনই তন্ময় হইয়া পড়িত যে বাহ্য জগতের কোন জ্ঞান তখন তাহার থাকিত না। তাহার প্রত্যেক নায়ক-নায়িকার স্থলে আপনাকে সে অভিষিক্ত করিয়া বসিত, তাহাদের সুখ দুঃখ, রাগ অভিমান ঘটনাচক্রের নানাভাববিপর্য্যয়, সবই যেন সে অনুভব করিত। তাই তাহার প্রত্যেক গল্পের মধ্যে এতটা সজীবতা ও প্রাণ থাকিত, আর সেইজন্যই সে লেখকসমাজে এত শীঘ্র নাম করিয়া বসিয়াছিল। তাহার এই রচনা-উন্মত্ততার ফল পাইতেছিল তাহার স্ত্রী লীলা। এক বৎসর হইল প্রায় নীরোদের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার পিতা সম্বলপুরের একজন বড় উকীল। হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও তাঁহার চালচলন সমস্তই অত্যন্ত আধুনিক ধরণের; কন্যাদিগকে তিনি কলিকাতার বেথুন বোর্ডিংএ রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, বিবাহও খুব বয়স্থা অবস্থায় দিয়াছিলেন।

একবার পূজার ছুটীতে তাঁহারা বংশী বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময় নীরোদও সেইখানে যায়। অল্পদিনের মধ্যে ভবতোষ বাবুর পুত্র অনুপমের সঙ্গে তাহার আলাপ পরিচয় হয় ও সেই সূত্রে তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া-আসা আরম্ভ করে। সেইখানেই তন্বঙ্গী সুন্দরী লীলার সলজ্জ মুখশ্রী ও মার্জ্জিত সুশিক্ষিত আচার ব্যবহার দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

তাহাদের বিবাহের এখনও বছর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে লীলার সুন্দর মুখখানিতে মাঝে মাঝেই বিষাদের কালো রেখা পড়ে। কই স্বামীতো তাহাকে আর তেমন আদর যত্ন করেন না। বিবাহ করিয়াই যেন লীলার উপর তাহার সব কর্ত্তব্যের শেষ হইয়াছে। এক

একদিন এমন হইত যে দু-একটী বিশেষ আবশ্যকীয় কথা ছাড়া সমস্ত দিনরাত্রে দুইজনের মধ্যে কোন রকম আলাপ-পরিচয় হইত না। সারাদিন নীরোদ তাহার লাইব্রেরীর মধ্যে তাহার পুস্তকরাশি ও সাহিত্যচর্চ্চার মধ্যে নিমগ্ন থাকিত; এদিকে বেচারী লীলা একটী মিষ্টি কথা, একটু আদরের জন্য লালায়িত হইয়া ঘুরিত। কিন্তু নীরোদের সেইদিকে দৃকপাতও ছিল না, সে ভাবিত—লীলাকে সে ভালবাসে ও লীলা তাহাকে ভালবাসে, এই যথেষ্ট; এর চাইতে যে আর কিছু বেশী দরকার, বাহিরে কোন রকম ভাব প্রকাশ বা আদান-প্রদানের প্রয়োজন, তাহা তাহার মাথাতেই আসিত না। সে ইহাতেই যথেষ্ট তৃপ্ত ছিল, সে ভাবিত লীলাও বুঝি তাহাই হইবে। সে তাহার নায়ক-নায়িকার চরিত্র-গঠনে এমন নিপুণ ও তাহাদের ভাব বুঝিতে এত দক্ষ হইলেও তাহার নিজের স্ত্রীর মনোভাব বুঝিতে অক্ষম ছিল। তাহার ভালবাসা ছিল, একেবারে অন্তর্মুখীন আর বরাবরই সে স্বল্পভাষী, নিজের মনোভাব কখন সে কাহারও নিকট ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না, লজ্জা আসিয়া বাধা দিত। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ার কারণেই বোধ হয় এই রকম হইয়াছিল, তাহার চিত্তের কোমল বৃত্তিগুলি কখন প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায় নাই। সেই আবদ্ধ মনোভাবগুলি এখন তাই রচনার মধ্য দিয়া এমন সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইতেছিল।

এই সময় নীরোদের বইএর তাগিদ আসিল। সে ভাবিল কলিকাতার নানা আকর্ষণ ছাড়িয়া কোন নির্জ্জন জায়গায় যাইতে পারিলে, সে প্রাণ ভরিয়া বইয়ের ভিতর নিজের আদর্শটী গড়িয়া তুলিতে পারে। সেইবার পূজার সময় বংশী বেড়াইতে গিয়া স্থানটী তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল; দুধারে সবুজ খোলা মাঠ, দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত উদার আকাশখানি দূরে দু'একটী কালো পাহাড় প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া, আর চিক্‌চিকে বালীর নদীর জ্যোৎস্নার আলোকে অপূর্ব্ব শোভা, আহা, কি সুন্দর লাগিয়াছিল। সেই সব স্থানে যাইলেই কেমন একটা প্রাণখোলা আনন্দের ভাব হৃদয়ে আসে, তাহাতে কোন আবিলতা নাই কোন কৃত্রিমতা নাই। কি একটা অপূর্ব্ব শান্তির আবেশে মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আর তাহার গল্পের কিয়দংশ ওই রকম পাহাড়ে জায়গা লইয়াই; সেইখানে একটা বাড়ী ভাড়া পাওয়া গেলে কয়েক মাসের জন্য, বেশ হয়। লীলাকেও সঙ্গে লইতে পারা যায়, সেইখানেই না তাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়?

নীরোদ চেষ্টা করিতেই বেশ একটী ছোট বাংলা ধরণের বাড়ী জোগাড় করিল, তারপর লীলার নিকট গিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিল। অনেক দিন পরে লীলার ম্লান মুখখানি আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে তো কখন বংশীর কথা ভোলে নাই; কি আনন্দ, কি উচ্ছ্বাসের দিন সেইগুলি ছিল। তাহার একটী ক্ষুদ্র ইচ্ছা পালন করিবার জন্য নীরোদের কি অদম্য আগ্রহ। আহা! এখানে বেচারা শত কাজে ব্যস্ত থাকে, তা বুঝি লীলার সঙ্গে আলাপ করিবার সময় পায় না। বংশীতে নির্জ্জনে গিয়া দু'জনে আবার সুখের নীড় বাঁধিবে কি সুখের ঘরকন্না হইবে সে কল্পনার নানা সুখময় স্রোতে সে নিজেকে একেবারে ঢালিয়া দিল ও পরম উৎসাহে যাত্রার আয়োজনে মন দিল

আদরে, সোহাগে, সেবার যত্নে এবার স্বামীকে সে এমনই জয় করিয়া ফেলিবে যে অতীতের সব স্মৃতিগুলি আবার তাহার মনে জাগিয়া উঠিবেই, তখন দেখা যাইবে কত সে লীলাকে ভুলিয়া তাহার রচনায় মগ্ন থাকে।

(২)

"কিগো! এখন যে লেখা নিয়েই ব্যস্ত, বেলা যে অনেক হয়। তুমি না ব'লেছিলে, আজ আমায় চাঁদন নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে।"

নীরোদ তখন তাহার নায়ক-নায়িকা লইয়া মহাব্যস্ত। লীলার কথা তাহার কল্পনার স্রোতে বাধা পড়াতে একটু বিরক্তের চিহ্ন তাহার কপালে দেখা গেল, সে লেখা থেকে মুখ না তুলিয়াই অসন্তোষের স্বরে বলিল "আজ কি না গেলেই নয়? আজ আমি ভারী ব্যস্ত।"

লীলার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল। হায়রে রাক্ষসী বই। সে যেন ঠিক সতীনের মত তাহাকে তাহার স্বামীর সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। কত আশা করিয়া সে বংশীতে আসিয়াছিল। এই তো একমাস

কাটিয়া গেল, ইহার মধ্যে স্বামী যেন তাহার থেকে আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে। আর, এদিকে বেচারী তাহার ক্ষোভে দুঃখে আর নিঃসঙ্গী-নির্জ্জন জায়গার দিন আর কাটে না যেন। মাঝে মাঝে নীরোদ তাহাকে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে লইয়া যাবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়; কিন্তু লেখার মধ্যে তন্ময় হইয়া বসিলে আর তাহার সে কথা মনে পড়ে না। এতে কিন্তু লীলার প্রাণে বড় আঘাত লাগে।

সেদিন তাহাদের বিবাহের বৎসর পূর্ণ হইল। লীলা মনে মনে বড় আশা করিয়াছিল, স্বামীর একথা নিশ্চয় মনে হইবে; একটু আদর, একটু স্নেহভাব, একটু আগ্রহ এই বিশেষ স্মরণীয় দিনটী মনে করিয়া দেখাইবেন; কিন্তু সারাদিন কাটিয়া গেল একবারও তিনি এই কথার উল্লেখ করিলেন না, তখন মনের দুঃখে না খাইয়া সে মাথা-ধরার অছিলায় সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করিল।

নীরোদের কিন্তু এখানে দিনগুলি বেশ মনের আনন্দে ও শান্তিতে কাটিতেছে। এ স্থানটী পূর্ব্ব হইতেই তাহার খুব পছন্দ। জায়গাটীও বেশ স্বাস্থ্যকর, আর সে তো চিরদিন নির্জ্জনপ্রিয়, তাহার রচনার খাতা ও প্রিয় পুস্তকগুলি হইলে আর সে কিছু চায় না।

এখানেতো বাড়ী সব সময় পাওয়া যায় না, যদি একটা ছোট বাংলা সে করাইয়া লইতে পারে তবে বছরের অধিকাংশ সময় এখানে আসিয়া বেশ সুখে কাটাইয়া দিতে পারে; লীলার দিক্‌টা কিন্তু তাহার একবারও খেয়ালে আসিল না।

এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছিল, আর লীলার কথাতে তাহার মনের কল্পনার স্রোতও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সে তাই আস্তে আস্তে তাহার খাতাপত্র গুটাইয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাড়াইল। এমন সময় দেখিল ডাকপিয়ন আসিয়া লীলার হাতে একটা চিঠি দিয়া গেল।

নীরোদ লীলাকে ডাকিয়া বলিল "কি গো! বেড়াতে যাবে নাকি, তবে তৈয়ার হ'য়ে এসো।"

লীলার হৃদয় তখন অভিমানে পূর্ণ; সে বলিল "না থাক্, আজ আর যাব না। ঝিকে বলি আলো জেলে দিতে, তুমি তোমার লেখা শেষ কর। আমার সঙ্গে চাঁদন বেড়ানর চেয়ে তাতে ঢের বেশী আমোদ পাবে। ভাল কথা, এই মা এ মাস চিঠি পেলাম; তোমার, আমাদের সেই সম্বলপুরের অমর দাদাকে কি মনে পড়ে?"

"কোন অমর? সেই পাটনা কলেজের অমর রায়, সেই যার সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা ঠিক হচ্ছিল?"

"হাঁ! যাক্ আমার মত একটা তুচ্ছ নগণ্য জীবের সম্বন্ধে তোমার এতো কথা মনে থাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'লাম। জান বোধ হয়, অমর দাদার খানিকটা জমিদারী এখানে আছে; এখান থেকে মাইল দুই দূরে পাঁচজড়ার কাছে। মা লিখেছেন, অমর দাদা আমাদের জন্য সর্ব্বদা এতো করেন, তিনি এলে আমরাও যেন খোঁজ খবর নি। তাই তোমাকে ব'লে রাখ্‌লাম, তুমি যে লেখায় মগ্ন থাক, বাইরের তো কোন খেয়াল থাকে না; তিনি এলে কিন্তু একটু ভাল ক'রে আলাপ সালাপ ক'র।"

তা আর কর্ব্ব না, নিশ্চয়। শোন লীলা, আমি একটা কথা ভাব্‌ছিলাম, সেটা তোমায় বলি; এ জায়গাটা তো বেশ; এখানে এ ভাড়াবাড়ীতে মাঝে মাঝে না এসে যদি আমরা নিজেরা একটা বাড়ী তৈয়ার ক'রে নি তো, বছরের বেশীর ভাগ এখানে থাক্‌তে পারি কি বল তুমি? এমন নির্জ্জন শান্তিপূর্ণ স্থানটী!"

লীলা এ প্রস্তাবে শিহরিয়া উঠিল, বলিল "বছরের বেশীর ভাগ এখানে থাকা। এই জন-মানবশূন্য নির্জ্জন পুরীতে, এর চেয়ে তো জেলখানাও ভাল। এখানে তো কেউ নেই। আমাদের সব আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তো কল্‌কাতায়। এখানে তো দু'এক মাস পোষায়, তা ব'লে কি বরাবর। তোমার তো বই আছে—আর আমি কি ক'র্ব্ব?"

"কেন, তুমি না একদিন বল্‌ছিলে আমায়, অমরকে জমিদারীসংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে, বছরের মধ্যে অন্ততঃ ছ'মাস এখানে থাক্‌তে হয়? তাহ'লে তুমি আর অত একলা পড়্‌বে না, আর আমার তো লেখা হ'লেই হল।"

লীলা আশ্চর্য্য হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল ও বলিল "অমর দাদার কথা কি তোমার মনে নাই?"

নীরোদ প্রশান্ত মৃদু হাসিয়া বলিল "মনে থাক্‌বে না কেন? অমরের ভারী সাধ ছিল তোমায় বিয়ে করে, যদি না মাঝ থেকে আমি এসে তোমাকে নিয়ে পালাতাম।

এখনও হয়তো মনে মনে তোমার উপর তার টান আছে. কিন্তু তাতে কি আসে যায় ?"

লীলার মুখ থেকে হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল "তোমার তাহ'লে হিংসা হবে না—?" বলিয়াই সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

ভগবান্ নীরোদের মনে মান, অভিমান, হিংসা এসব বৃত্তিগুলি একেবারেই দেন নাই, সুতরাং এ গুলির মর্ম্ম সে কোন দিন বুঝিত না। সে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল "না গো না, আমার বিন্দুমাত্র হিংসে হবে না। আমার স্ত্রী তো আমারি থাকবে, সে অধিকারে যে সে হাত দিতে পার্ব্বে না। সে এখানে অবাধে যাওয়া-আসা করতে পারে।"

লীলার কিন্তু স্বামীর এতখানি নিশ্চিন্ত ভাব ভাল লাগিল না, তাহার মনে বড় বাজিল, আজকাল সবই তার মনে বড় বাজে। সে ভাবিল তাচ্ছিল্য ও উদাসীনতাই এই অবহেলার কারণ।

(৩)

নীরোদ আজকাল আরও ব্যস্ত; তাগিদের উপর তাগিদ আসিতেছে আর মাসখানেকের ভিতর বইখানা শেষ করিয়া পাঠাইতে হইবে। বসিবার ঘরের জানালার একপাশে ডেস্কের উপর তাহার হস্তের পরিষ্কার অক্ষরপূর্ণ রচনার স্তূপ, দিন দিন উঁচু হইয়া উঠিতেছে। লীলা সে-গুলিকে রোজ ঝাড়িয়া পুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে, কিন্তু এক এক সময় তাহার হাত দু'টা ছটফট করিতে থাকে, সেগুলিকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়িয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে। অতি কষ্টে মনের ইচ্ছাকে দমন করিয়া রাখে। নীরোদের এখন আরও সময় কম, কাজেই সকালে বিকালে লীলা একলাই বেড়াইয়া বেড়ায়। কখন কখন ছোট নদীর ধারটীতে গিয়া বসিয়া থাকে।

একদিন নীরোদ সবে সকালের কাজ শেষ করিয়া স্নান করিতে উঠিয়াছে, এমন সময় দেখিল লীলা বেড়িয়ে ফিরিয়া আসিতেছে। আজ অনেক দিনের পরে লীলার মুখে এমন একটা ঔৎসুক্যের চিহ্ন ছিল যে—নীরোদের অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাহা ঢাকা পড়িল না, সে জিজ্ঞাসা করিল "কি লীলা খবর কি ?"

"জান কার সঙ্গে আজ বেড়াতে গিয়ে দেখা হয়েছে ? অমর দাদা, তিনি কাল এসেছেন। আজ বিকালেই বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন; কাজ টাজ সেরে রেখো" ব'লেই সে খাবারের বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা অমর আসিয়া উপস্থিত হইল। ভদ্রতার খাতিরে নীরোদকেও ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিতে হইল। চা-পানান্তে তিনজনে মিলিয়া চেয়ার টানিয়া বারান্দায় আসিয়া বসিল। দু' এক কথার পর নীরোদ চুপ করিয়া অমর ও লীলার কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল। অনেক দিনের পরে কথা বলিবার লোক পাইয়া লীলার ছোট মুখখানি উৎসাহে ও ঔৎসুক্যে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। নীরোদ যেন সেদিন লীলাকে এক নূতন আলোকে দেখিতে পাইল।

কতখানি চিন্তায় কতখানি কবিত্বে তাহার প্রাণটা ভরা, সেদিকের খবর সে কোন দিন রাখে নাই, রাখিবার চেষ্টা করে নাই। আর অমরের মুখে লীলার প্রতি কি একটা সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তিভাব সে দেখিল যে, তাহার ভবভোলা অন্তরে গিয়াও তাহা আঘাত করিল।

কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে, অমর উঠিয়া বিদায় লইল। লীলা খানিকদূর পর্য্যন্ত গিয়া তাহাকে পৌছাইয়া দিল, আর নীরোদ উঠিয়া ঘরের ভিতর গিয়া বাতিটা উস্কাইয়া বসিয়া লিখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু আজ যেন সব কেমন তাহার প্রাণের মধ্যে বেসুরায় বাজিতে লাগিল, হাজার চেষ্টা করিয়াও এক লাইন লিখিতে পারিল না।

দিনেরবেলা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলেও, রাত্রিটা বেশ ভাল করিয়া বিশ্রাম করিত, নহিলে মস্তিষ্কটা ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার না থাকিলে ভাল করিয়া লিখিতে পারিবে না। তাই সে খুব সকাল সকাল শুইতে যাইত। কয়েকদিন থেকে লীলা বলে তাহার অত শীঘ্র শুইতে গেলে রাত্রে ভাল ঘুম হয় না;—তাই নীরোদ শুইতে যাইবার পরেও সে বাতি জ্বালাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি সব মাথামুণ্ডু লেখাপড়া করিত।

(৪)

এই রকম করিয়া কয়েক সপ্তাহ কাটিল। অমর মাঝে মাঝেই আসিয়া নীরোদ ও লীলাকে তাহাদের বাড়ী লইয়

যাইবার জন্ত তাগিদ করে। নীরোদ কাজের দোহাই দিয়া এতদিন যায় নি, লীলারও যাওয়া হইয়া উঠে নাই। তাহারা শীতের রাত বলিয়াও নীরোদ সকাল সকাল শয়ন করে, বলিয়া, সাতটার মধ্যেই রাত্রের খাওয়া শেষ করিত। বড় শীত, তাই বসিবার ঘরে একটা লোহার কড়ায়ে গুলের আগুন থাকিত, দু'জনে গিয়া সেখানে বসিয়া একটু আগুন পোহাইত; তারপর নীরোদ উঠিয়া শুইতে যাইত ও লীলা তাহার লেখা পড়ায় মন দিত। সেদিন সে অভ্যাস মত একেলাই বিকালে বেড়াইতে বেরিয়েছে, কিন্তু এখনও আসে নাই। ক্রমে সাতটা, সাড়েসাতটা, নয়টা বাজিল, তখনও লীলার দেখা নাই। এত দেরী তো সে কোনদিন করে না। যদিও ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত, তবু অজানা লোক-জনহীন স্থান তো। নীরোদ কোন রকমে আহারাদি শেষ করিয়া ঘড়ির দিকে বারেবার তাকাইতে লাগিল, সেদিন আর তাহার আহারান্তেই শুইতে যাওয়া হইল না। ক্রমে তাহার মনে ভয় হইতে ভয়ানক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কি করিবে কিছুই যেন স্থির করিতে পারিল না, মনের উত্তেজনায় শুধু ঘর আর বাহির করিতে লাগিল, এমন সময় দূরে একটা সাম্পানী গাড়ীর আওয়াজ পাইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ীটা তাহাদের বাড়ীর ফটকের কাছে আসিয়া থামিল ও তাহার ভিতর হইতে লীলা ও অমরদের বাড়ীর ঝি নামিল। লীলা গাড়ীখানা ও ঝিকে বিদায় দিয়া আস্তে আস্তে ঘরে আসিয়া ঢুকিল ও যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাব দেখাইয়া বাড়ীর প্রান্ত থেকে ব্রোচটা খুলিতে লাগিল। লীলাকে নিরাপদ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মুহূর্ত্তে নীরোদের মনে সব ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া গিয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রচণ্ড রাগ ও সর্ব্বপ্রথম ঈর্ষা আসিয়া অধিকার করিল। সে কঠোরস্বরে বলিল "লীলা তোমার একি ব্যবহার? এত রাত পর্য্যন্ত অমরদের ওখানে তুমি কি করছিলে? কোথায় যাচ্ছ আমাকে কি একটু জানান উচিৎ ছিল না!? আর এদিকে আমি ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হচ্ছি।" লীলা একটা হাই তুলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল "সত্যি নাকি? আমার জন্যে তোমার ভাবনাও হয়? আমি ভাবছিলাম তুমি এতক্ষণ বই নিয়েই মগ্ন আছ, আমার অস্তিত্বও মনে নেই। আর আমি তো অমর দাদার ওখানে যাব ব'লে বার হয়নি যে তোমায় ব'লে যাব। বেড়াতে বেড়াতে দেখি অনেকদূর এসে পড়েছি, তারপর অমরদাদা ও পিসীমাও বেড়াতে বেরিয়েছেন দেখ্‌লাম। পথে তাঁদের সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন তাঁরা কিছুতে ছাড়্‌লেন না, পিসীমা পৌষ-পার্ব্বণের পিঠে আজ তৈয়ার করেছেন, আমাকে না খাইয়ে আস্‌তে দেবেন না ব'ল্লেন। তাঁদের পিড়াপিড়ীতে আমিও গেলাম, কারণ জান্‌তাম আমার অনুপস্থিতি তুমি কিছুই গ্রাহ্য কর্ব্বে না, আর বামুন দিদিই তো ছিল তোমার খাবার ঠিক ক'রে দেবার, একদিনে কিছু এসে যাবে না। তা' ছাড়া মানুষের মুখের দুটো কথা শুনে, দু'দণ্ড একটু গল্প ক'রেও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লাম। এখানে তো নিজের স্বরও ক্রমশঃ ভুলে যাচ্ছি। এখন চল, বড় ঘুম পেয়েছে।"

"এ তাদের ভারী অন্যায়! এমনি ক'রে তোমাকে নিয়ে যাওয়া; বিশেষতঃ আমি যখন সঙ্গে নেই। আর তোমারও কি এটা উচিত হয়েছে?"

"কিসের জন্যে অন্যায় হয়েছে? আমি তো একটা আস্‌বাব নই, রক্তমাংসেরই মানুষ, আমারও মনের ভাবের আদানপ্রদানের দরকার হয়। সেখানে গিয়ে যদি একটু সহানুভূতি পাই, একটু কথা ব'লে বাঁচি তবে তোমার তাতে কি এসে যায়?"

"বটে সহানুভূতি! পরের কাছে তুমি সহানুভূতি খুঁজ্‌তে যাও, আর স্বামী হ'ল তোমার পর?"

"পর না তো কি? স্বামী কিসের স্বামী। শুধু মুখের স্বামী। বিয়ের পর আমারও মন ব'লে একটা জিনিষ আছে, তার খবর কোন্ দিন নিয়েছ? না অন্য সব আস্‌বাব-পত্রের মত আমিও তোমার একটা আস্‌বাব মাত্র। তোমার সহানুভূতি, তোমার আদর, তোমার যত্ন, তোমার সব বইএর নায়িকাদের জন্যে, স্ত্রীর জন্যে নয়। দেখাব, দেখাব—কে আমার সর্ব্বনাশের মূল"—হিংসায় তাহার চোখ দু'টা অস্বাভাবিকভাবে জ্বলিতেছিল—এই বলিয়া সে নীরোদকে টানিয়া বসিবার ঘরের মধ্যে আনিল। তারপর ছুটিয়া গিয়া, বাধা পাইবার আগেই স্তূপাকার

কাগজের বাণ্ডিলটা সেই জলন্ত কড়ায়ের মধ্যে ফেলিয়া দিল। নীরোদ ত এই অভাবনীয় ঘটনায় খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হায়! হায়! সব গেল, সব গেল, রাক্ষসী পিশাচী কি করিল? তাহার এতদিনের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়া গড়া, সঞ্চিত আশাগুলি একেবারে ভস্মসাৎ হইল—"ছাড়, ছাড়, যদি একপাতাও বাঁচাতে পারি—" কিন্তু লীলার মুখে তখন কি বিজাতীয় আনন্দ! সবলে সে নীরোদকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল,—"না, না, একলাইনও তুমি বাঁচাতে পার্বে না। পুড়ুক, পুড়ুক, আমার সব সুখের অন্তরায়। ওরি জন্যে তুমি আমার এই দশা ক'রেছ, ওরি জন্যে আমি আমার প্রাপ্য ভালবাসা, আদর, যত্ন, সব হারিয়েছি। সব পুড়ে গিয়েছে; যাও, এখন তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, যাও—দেখ গিয়ে তোমার সাধের রচনার ভস্মাবশেষ ছাড়া আর কিছু আছে কি না"। বলিয়া—নীরোদকে ছাড়িয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। মনের উত্তেজনায় তখন তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে।

নীরোদের মনের অবস্থা তখনকার বর্ণনা করা যায় না। তাহার ছয়মাসের কত কষ্টসহ পরিশ্রম, ছয়মাস কেন—সমস্ত জীবনের আশা ভরসা যেন ঐ আগুনে ভস্ম হইয়া গেল। রাগে দুঃখে কতক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না; তারপর সে বলিল "স্ত্রী—এই'কে স্ত্রী বলে? এরি হাতে আমি আমার জীবনমরণের ভার ছেড়ে দিয়েছি? এ যে আমার গলায় ছুরীও দিতে পারে। লীলা, তুমি কি পাগল হয়েছ? এমন কাজ তুমি কর্‌লে কেন? তুমি বুঝ্‌তে পারছ না—তুমি আমার জীবনের কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ।"

"ওগো, আমি কি আর তা বুঝ্‌তে পারছি না। একি আমি একদিনের উত্তেজনায় ক'রেছি। ভেবে দেখ, এর মূলে কি? এই লেখার বাতিকের জন্যে তুমি আমায় কি রকম অবহেলা ক'রেছ। আমার প্রাণ একবিন্দু ভালবাসার জন্যে ছট্‌ফট্‌ ক'রেছে। আমি নানারকমে তোমার আদর যত্ন পাবার চেষ্টা ক'রেছি, সব নিষ্ফল হ'য়েছে। তখন, সত্যি আমি জান্‌তে চেয়েছিলাম তুমি আমাকে, না ঐ রচনার বাতিককে, কা'কে বেশী ভালবাস। তাই পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বার জন্যে আজ এই কাণ্ড কর্‌লাম। যদি আমায় সত্যি ভালবাস, তবে এই অপরাধের জন্যে আমায় ক্ষমা কর্‌বে। নইলে আমার চ'লে যাওয়াই ভাল।"

"ক্ষমা! তোমার ক্ষমা চাইতে লজ্জাও করে না? এর চেয়ে আমার বুকে ছুরী মার্‌লেও আমার বেশী ক্ষতি হ'ত না। এর পরে তোমাকে আমি আমার জীবনে কি রকম ক'রে বিশ্বাস কর্ব্ব? এর চেয়ে দূরে দূরে থাকাই দু'জনের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যাক্ এখন ত আমি আর এ ঘরের মধ্যে একদণ্ড তিষ্ঠতে পারি না। আজকে রাত্তিরের মত আমি চল্লাম, কোথায় যাব জানি না। দেখি বাইরের উদারতা থেকে কিছু শান্তি পেতে পারি কি না। এখানে আর একদণ্ডও থাক্‌লে পাগল হ'য়ে যাব, কি ক'রে বস্‌বো জানি না।"

(৫)

অনেকক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে যখন শ্রান্ত হইয়া নীরোদ বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অমাবস্যার চতুর্থীর চাঁদ এক-খণ্ড কালো মেঘের তলায় অদৃশ্য হইয়াছে, চাকরেরা যে যাহার ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে আর শূন্য পাতালপুরীর মত খালি বাড়ীখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। শয়নকক্ষের আলোটা কখন দম্‌কা বাতাসের জোরে নিভিয়া গিয়াছে। নীরোদ হাতড়াইতে হাতড়াইতে একটা দেশালাই তাকের উপর হইতে সংগ্রহ করিয়া বাতিটা জ্বালিল, অন্ধকারও এই নীরব নিস্তব্ধতা যেন তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। তারপর আলো জ্বালিয়া এঘর, ওঘর, বারাণ্ডা, বাগান সমস্ত খুঁজিয়াও যখন কোথাও লীলার সন্ধান পাইল না, তখন তাহার মনে দারুণ আতঙ্কের উদয় হইল, এতো রাত্রে কোথায় গেল সে?

না জানি মনের উত্তেজনায় কত কঠোর কথাই তাহাকে শুনাইয়াছে; কিন্তু শারীরিক ও মানসিক গ্লানিতে তাহাকে বড়ই অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, খুঁজিবার আর শক্তিটুকুও রহিল না। অতি কষ্টে জানালার পাশে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিল, মেঘমুক্ত হইয়া চাঁদখানা আবার তাহার আলোতে চারিদিক হাসাইয়া তুলিল। জ্যোৎস্নার ঘরের চারিদিকে একটা বিহ্বল ও ক্লান্ত দৃষ্টিতে ঘুরিয়া

ফেলা হইবে, আমি ততই শব্দ কম শুনিতে থাকিব। পাত্র প্রায় বায়ুশূন্য হইয়া আসিলে আর আমি শব্দ শুনিতে পাইব না। অথচ ঘণ্টা তখনও পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। আবার ধীরে ধীরে বাতাস ভিতরে পূরিয়া দেওয়া হউক; আমিও আবার ক্রমশঃ বেশী বেশী শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অতএব বাতাস শব্দের বাহন ইহাই সাব্যস্ত হইল। অন্বয় ব্যতিরেকে আমরা দেখিলাম যে, ঘণ্টা-সঞ্চালন-সঞ্জাত স্পন্দনগুলি বাতাস বহিয়া আনিয়া আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারে পৌছাইয়া না দিলে আমরা ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাই না। শুধু দ্বারে পৌছাইয়া দিলেই তার খালাস নাই। শ্রবণযন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্রসমূহ এবং মস্তিষ্কের অনুভূতিকেন্দ্র-গুচ্ছ-বিশেষে রীতিমতভাবে ধাক্কা দিতে না পারিলে আমার শব্দজ্ঞান হয় না। ইহাও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার, এ সকল উপাদান ও নিমিত্ত ছাড়া আরও একটা জিনিষের অপেক্ষা রহিয়াছে—সেটা অল্প বিস্তর মনঃসংযোগ। একটার তোপে যেদিন আমার ঘড়ি মিলাইতে হইবে সেদিন আমায় উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতে হয়। ইহা হইল ইচ্ছাকৃত মনঃসংযোগ। অন্ধকারে কুটীরের গবাক্ষে বসিয়া শ্রাবণের বর্ষার সুরের মূর্চ্ছনা ও লয়গুলি শুনিতেছি এবং প্রথামত 'বাতায়নিকের কথাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে চপলা ঘনীভূত অন্ধকাররাশি 'শকলান' করিয়া দিয়া চমকিল, এবং একটু পরেই গুরুগম্ভীর মেঘমল্লারের একটা ছন্দঃ বিপুল উচ্ছ্বাসে নামিয়া আসিয়া বর্ষার সকল কোমল সুরগুলিকে মগ্ন করিয়া দিল। সকল ভাবনার মধ্য হইতে জাগিয়া আমায় এ শব্দ শুনিতেই হইয়াছে। ইহা হইল অনিচ্ছাকৃত মনঃসংযোগ। এস্থলে ধাক্কা এতই প্রবল যে আমায় শুনিতেই হয়। কিন্তু চাহিয়া দেখি, এই অমাবস্যার 'ঘোর বাদলে' আমার কুটীরে যিনি আজ অতিথি, তাঁহার নাসাগর্জ্জন পূর্ব্ববৎই চলিতেছে: ধাক্কা তাঁহাকে জাগাইতে পারে নাই। তাঁহার মনঃসংযোগ হয় নাই। অতএব শুধু বাহিরে বাতাসের স্পন্দনই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক উপাদান ও নিমিত্তের অপেক্ষা রহিয়াছে।

একটা ধাতুপাত্রে বাড়ি দিলাম। ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। ক্রমশঃ কিন্তু শব্দটা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া চলিয়াছে। শেষকালে আর কিছুই আমি শুনিতে পাইতেছি না। ধাতুপাত্রের কণিকাগুলি কিন্তু তখনও প্রহারের বেদনা ভুলিতে পারে নাই; তাহারা তখনও কাঁপিতেছে। কিন্তু কাঁপিলে কি হয়, সে কম্পন এত মৃদু যে তজ্জনিত বাতাসের কম্পন আমার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। কম্পন বেগের একটা নিম্নসংখ্যা আছে যার নীচে নামিয়া গেলে সাধারণতঃ আর আমরা শুনিতে পাই না। কিন্তু শুনিতে পাই না বলিয়া কম্পন ও স্পন্দনও যে থামিয়া গিয়াছে এমন নহে। কোনও একটা স্পন্দনের বেগ পূর্ব্বোক্ত অধঃসীমা (lower limit) ছাড়াইয়া উঠিলে তবে সাধারণতঃ আমাদের শোনার সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এ ছাড়া কাণের ও মস্তিষ্কের রীতিমত উত্তেজনা চাই এবং অল্প বিস্তর মনঃসংযোগ চাই। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সোজা কথায়, এক ক্ষণের মধ্যে অন্ততঃ বারকতক বায়ুকণিকাগুলির স্পন্দন না হইলে আমরা শুনি না। যেমন একটা অধঃসীমা আছে, তেমনি একটা উর্দ্ধসীমাও (upper limit) আছে; এক ক্ষণের মধ্যে স্পন্দন কয়েক সহস্রের চেয়ে বেশী দ্রুত হইলে হয়ত আমরা শুনিতে পাইব না। এই দুইটা সীমার মধ্যে অবশ্য নানান্ থাক্, সুতরাং শব্দের নানান্ পরদা নানান্ বৈচিত্র্য। ঐ দুই সীমার মধ্যে কোন একটা বিশিষ্ট বায়ুস্পন্দনের ফল একটা বিশিষ্ট শব্দজ্ঞান। কোকিলের ডাক বাহিরে একপ্রকার বায়ুস্পন্দন; কাকের ডাক আর এক প্রকার।

আমাদের শব্দজ্ঞানের মোটামুটি বিবৃতি এইরূপ। আপাততঃ আর বেশী তলাইয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই। শব্দের এই বিবরণ হইতে একটা কথা পরিষ্কার হইল যে, এইরূপ শব্দ সৃষ্টির মূল বা জগতের আদি বলিয়া মনে করা চলিতে পারে না। এইরূপ শব্দের জন্য বায়ুস্পন্দন দরকার, কিন্তু গোড়ায় বায়ু কোথায়? ইহার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ও মস্তিষ্ক চাই, কিন্তু গোড়ায় সেগুলি আছে কি? মনঃসংযোগ, শব্দসংস্কার প্রভৃতি অপরাপর নিমিত্তের ও অপেক্ষা রহিয়াছে, কিন্তু জগতের যখন সবে আরম্ভ, তখন এগুলিই বা পাইতেছি কোথায়? আমরা যেটাকে শব্দ বলিয়া অনুভব করিতেছি সেটা সৃষ্টিপ্রবাহের মূলে ছিল না, পরে দেখা গিয়াছে; বিভিন্ন কারণের সহকারিতায় এবং বিভিন্ন অবস্থার

যোগাযোগে পরে বিকাশ পাইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম উপক্রম যাহা হইতে তাহাকে যদি 'প্রাথমিক স্পন্দ' primordial causal movement) এই নাম আমরা দিই, তবে আমরা যেটাকে শব্দ বলিতেছি সেটা প্রাথমিক স্পন্দ নহে। সেই প্রাথমিক স্পন্দের মূল উৎস হইতে নানা দিকে নানা ভাবে অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতেছে—নানা ধারায় সৃষ্টির প্রবাহ হইতেছে। এই ধারাগুলিকে 'কার্য্যাভিব্যক্তি ধারা' (lines or streams of effectual manifestation) বলা চলিতে পারে। আমরা যে সকল রূপ দেখিতেছি, শব্দ শুনিতেছি, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনুভব করিতেছি, সুখ দুঃখের বেদনা পাইতেছি—সে-সকল এইরূপ একটা একটা অভিব্যক্তির ধারা। মূল উৎসে যাহা রহিয়াছে তাহা রূপ, শব্দ, রস প্রভৃতি নহে, তাহাদের করণ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতিও নহে, তাহাদের গ্রহীতা মন বা বুদ্ধিও নহে; তাহা প্রাথমিক স্পন্দন মাত্র।

সৃষ্টির গোড়ার কথা অথবা শেষের কথা এখন আমরা আলোচনা করিব না। সৃষ্টির কি কোনও আদি আছে ও অন্ত আছে, অথবা তাহা অনাদি ও অনন্ত—এ সমস্যারও সমাধানের প্রয়াস আমরা আপাততঃ করিব না। বোধ হয় এ সমস্যার সন্তোষজনক কোন সমাধান নাই-ও। সৃষ্টি ও লয়ের কথা বাদ দিলে 'প্রাথমিক স্পন্দন'কে শুধুই 'স্পন্দ' বলিতে হয়। আপাততঃ ইহা বলিয়া কাজ নাই যে, কোন একপ্রকার জাগতিক সুষুপ্তির পর এই জাগতিক জাগরণ, কোন একটা মহামৌনের পর এই বিশ্বকলরব, কোন একরূপ সাম্যাবস্থার পর এই বিচিত্র বৈষম্যের উন্মেষ। সোজাসুজি ভাবে বুঝিতে গেলেও আমাদের সকল প্রকার জানার (experience) মূলে যে ব্যাপারটা রহিয়াছে, সেটা স্পন্দ বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। আমাদের রূপজ্ঞান, শব্দজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি সকল জানা ব্যাপারের গোড়ার কথা স্পন্দ —চাঞ্চল্য (stressing)। ঈথরের কোন স্থানে একটা চাঞ্চল্য জন্মিল; সেটা তরঙ্গের মত চারিদিকে ছড়াইয়া আসিয়া আমার চক্ষু ও মস্তিষ্ককে চঞ্চল করিয়া দিল; এই চাঞ্চল্যের (stress) আমার চেতনায় যে প্রকাশ বা অভিব্যক্তি (resultant manifestation), তাহাই ত আমার বস্তুর রূপজ্ঞান। আলোক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি সকল রকম অভিব্যক্তি সম্বন্ধেই এই বিবরণ খাটে। কোন একটা দ্রব্যের অণুগুলি অস্থির হইয়া কাঁপিতেছে; ঈথার বা তজ্জাতীয় কোন একটা অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম বাহন (medium) সে কম্পন বহন করিয়া আনিয়া আমার স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দিল এই উত্তেজনার যে চেতনায় সাড়া (response) তাহাই ত আমার তাপের অনুভব। বাগবাজারের রসগোল্লা মুখে ফেলিয়া দিলাম; রসের সঙ্গে মুখামৃতের রাসায়নিক সংযোগ হইল; সেই রাসয়নিক ক্রিয়া দেখিতে গেলে শক্তির আদান-প্রদান; তলাইয়া দেখিলে তাহা স্পন্দনেরই ব্যাপার। রসনার স্নায়ুগুলি সেই শক্তির খেলায় চঞ্চল হইল। চেতনায় ইহারই যে ছাপ তাহাই আমার রসগোল্লার রসাস্বাদ। বাহন ঈথারই হউক, তাহা লইয়া মারামারি করিয়া লাভ নাই। সকল প্রকার অনুভূতির উৎপত্তি যে চাঞ্চল্যে (stir, agitationএ) সে পক্ষে আমরা সন্দেহ না রাখিলেও পারি।

অনুভূতি বা প্রত্যয়ের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে, অর্থ বা বিষয়ের দিক্ হইতেও সেই সিদ্ধান্তই আমরা পাই। কেমন করিয়া জানিতেছি শুনিতেছি, সে কথা না হয় ছাড়িয়া দেওয়া যাক্; জিনিষটা বস্তুতঃ কি? দৃষ্টান্তের জন্য অপর আর একটা বাগবাজারের রসগোল্লা অদৃষ্টে যদি নিতান্ত নাই-ই জুটে, তবে না হয় এই নীরস খড়ির টুক্‌রাটি লইয়াই অগত্যা নাড়া চাড়া করা যাক্। দেখিতে এই খড়িটা বেশ জমাট বাঁধা একটা জিনিষ; কিন্তু এখনি আমি ইহাকে চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারি; এই চূর্ণগুলি আবার আরও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইতে পারে; রাসায়নিক গিয়া যাহাকে পরমাণু বলে সেইখানে গিয়া এইরূপ বিভাগের আপাততঃ বিরাম। কিন্তু আপাততঃ বিরাম, বস্তুতঃ নহে। কারণ, রাসায়নিক অণু পরমাণুগুলিও যৌগিক দ্রব্য, তাহাদের গঠন প্রণালী জটিল। যে সূক্ষ্মতর উপাদানে সেগুলি গঠিত, সেগুলিকে বিজ্ঞান ইলেকট্রন (electron) বলিতেছে; এগুলি তাড়িতের অণু; ইহাদেরও মাপ পরিমাণ আছে; কিন্তু তাহা রাসায়নিক অণু (atoms) গুলির মাপের তুলনায় ঢের কম। একটা অণুর গঠন [illegible] অদ্ভুত। এক

এক একটা অণুকে এক একটা বালখিল্য সৌরজগৎ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সৌরজগতে যেমন গ্রহ-উপগ্রহগুলি নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে একটা কেন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আণবিক জগতে (atomic world) ও অনেকটা সেইরূপ। অণুতে পৌঁছিয়া আমরা আশা করিয়াছিলাম এইখানে বুঝি গতির বিশ্রাম, ছুটাছুটির শেষ; বাহিরে অণু যতই চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াক না কেন, তার ভিতরটা সুস্থির। এই খড়িটার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশগুলি নিয়ত দুলিতেছে, কাঁপিতেছে, স্পন্দিত হইতেছে—আমরা চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইলেও হইতেছে। অণুগুলিতে পৌঁছিয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম যে এগুলি পরস্পরের সম্পর্কে যতই চঞ্চল হউক না কেন, নিজের নিজের ভিতরে সুস্থির। কিন্তু ইলেকট্রন দেখা দিয়া আমাদের সে আশা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। যেগুলিকে অণু বলিতেছি সেগুলিও যে এক একটা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ড, এক একটা জগৎ। স্থূল জগতে যেরূপ সঞ্চালন আবর্ত্তন, কম্পন স্পন্দন চলিতেছে, অণুর ভিতরকার জগতেও সেইরূপ। এ চলা ফেরার বিশ্রান্তি কোথায়? সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে ক্রমশঃ নামিয়া গিয়া কোথায় আবিষ্কার করিব একটা ধ্রুবলোক, একটা অচলায়তন? ইলেক্ট্রনে কি? ইলেক্ট্রনগুলি বাহিরে, অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্কে, বড়ই অশান্ত চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে; সময়ে সময়ে তাদের গতি এতই ভীষণ হয় যে তাহা আলোক-তরঙ্গের গতির কাছাকাছি আসিয়া থাকে—অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে প্রায় দুই লক্ষ মাইল। ইহাই হইল বাহিরের ব্যাপার। ইলেক্ট্রনের ভিতরটা কিরূপ? ইলেক্ট্রনের ভিতরের কথা ভাবিতে এখনও বিজ্ঞান সাহস পায় নাই; তাড়িত-অণুতে ব্রহ্মের 'অণো রণীয়ান্' মূর্ত্তির যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহাতেই আমাদের কল্পনাশক্তি মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে; আরও সূক্ষ্ম, আরও ছোট ভাবিবার মত অবস্থা এখনও আমাদের হয় নাই। কিন্তু সত্যসত্যই ইলেক্ট্রনকে অণুত্বের পরাকাষ্ঠা (absolute limit) মনে করা চলিতে পারে কি? ইলেক্ট্রনও ত সাবয়ব দ্রব্য এবং তাহার একটা [illegible]; সুতরাং তার চেয়েও ছোট অংশ থাকারই [illegible]; তাহারও কোনও একরকম [illegible] থাকারই কথা। যদি থাকে তবে কি অস্থির, চঞ্চল নহে? এক একটা ইলেক্ট্রনকে এক একটা ঈথারের আবর্ত্ত ভাবিব কি? যদি তাহাই হয়, তবে ঈথারের সেই সূক্ষ্মতম অবয়বগুলি (ether-elements) ত' চঞ্চল হইয়া পাক দিতেছে। পুনশ্চ,ঈথারই বা কি এবং তাহার সূক্ষ্ম অবয়বগুলিই বা কি; এ সমস্যায় গণিত পরাভব স্বীকার না করিলেও আমাদের কল্পনা ভয়ে ভয়ে নিরস্ত হইয়া আসে।

গণিতের কল্পনা বস্তুতন্ত্রতার নাগপাশে বদ্ধ নয়; গণিত ঈথারকে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া যে সকল সূক্ষ্মতম অবয়ব (elements) তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, এবং যেগুলির সাহায্যে জগতের চলাফেরা ব্যাপারের একটা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়াস পাইতেছে, সে গুলিকে গণিতের পরিভাষা (mathematical concepts)র ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিব, অথবা বাস্তব বলিয়া মনে করিব—এ সম্বন্ধে আপাততঃ বিতণ্ডা করিয়া লাভ নাই। সোজা কথায়, সূক্ষ্মের মধ্যে খুঁজিতে গিয়া আমরা শেষ পর্য্যন্ত সেই ঘোরা ফেরা, দোলা কাঁপাই পাইলাম। সূক্ষ্মের দিক্ দিয়া দেখিতে গিয়া পাইলাম স্পন্দ চাঞ্চল্য। জগতে এমন কিছু ছোট নাই যার ভিতরে ও বাহিরে ছুটাছুটি নাই। যে চলিতেছে সেই জগৎ; অণুও চলিতেছে সুতরাং সেও জগৎ; ইলেক্ট্রনও চলিতেছে, সুতরাং সেও জগৎ। ব্যোমাংশ (ether elements) গুলিও চলিতেছে সুতরাং সেও জগৎ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের গোড়ার কথা ও মর্ম্মের কথা এই চলাফেরা ব্যাপার। এই চলাফেরার নাম দিয়াছি স্পন্দ—ইহাকে সঞ্চলন (translation)ই বল, আর আবর্ত্তন (rotation)ই বল, অথবা ইহাদের বিবিধ সংমিশ্রণই বল। ছোটর দিক্ হইতে যে কথাটা পাইলাম, বড়র দিক্ হইতেও সেই কথাটাই পাই। আমাদের বসুন্ধরা চঞ্চলা; আমাদের সবিতা চঞ্চল; আমাদের ধ্রুবলোকও চঞ্চল। কেহ বা বেশী, কেহ বা কম। যাহাকে স্থির ভাবিতেছি সে কেবল মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলেই স্থির, বস্তুতঃ নহে। কোন স্থানেই বিশ্রান্তি ঐকান্তিক নহে কোথাও নিরতিশয় ভাবে সুস্থিরতা (absolute rest) নাই। ব্রহ্মের যে 'মহতো মহীয়ান্' মূর্ত্তি সেও যে মহানটরাজের মূর্ত্তি, শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি

করিতে আমাদের সাধ্য নাই। অভ্যুদয় বাদ (Evolution theory) এর কল্যাণে আমাদের কর্ণের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গেলে বড় সুবিধা হইবে না, তবে শ্রবণশক্তির বিস্তার যদি বাড়িয়া যায়, তবে না হয় একদিন আচার্য্য মহাশয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা সবান্ধবে যাইব। ম্যাক্সওয়েলের ভূত তাপবিজ্ঞানের সমীকরণের একটা ভয়ানক শক্ত আঁক কষিয়া ফেলিয়াছে; এবং চঞ্চল জগতের অণুগুলিকে লইয়া দুইটা কামরায় আপন হিসাব মত বিলি করিয়া যাইতেছে; আমাদের সতর্কদৃষ্টি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে সেই বৈজ্ঞানিক ভূতটার সঙ্গে আমাদের মোলাকাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। ভরসা করি, যেদিন বৈজয়ন্তধাম হইতে রথ নামিয়া আসিয়া আমাদের রামেন্দ্রসুন্দরকে বিশ্বোত্তীর্ণ পদবীতে, সত্যলোকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেদিন তাঁহার আত্মা অব্যাহত, অনাবিল দৃষ্টিতে সেই ভূতটার হিসাবের খাতাখানাই যে বেশ করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন এমন নহে, তার এলাকাভুক্ত চঞ্চল জগৎটাকে বাঙ্ময়জগৎ, শব্দময় জগৎ রূপেও চিনিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে অণুর জগৎ এখন পর্য্যন্তই শুধুই চঞ্চল জগৎ তাহার ভাষা নাই।

আর দৃষ্টান্ত লইয়া কাজ নাই, কথাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ। মনেই হউক আর জড়েই হউক, ইলেক্‌ট্রনেই হউক আর গ্রহ উপগ্রহেই হউক, চেতনাতেই হউক আর জীবকোষেই হউক, যে কোন প্রকার স্পন্দ বা চাঞ্চল্যকে আমরা পরশব্দ বলিব। সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই আর নাই-ই পাই। যদি পাই তবে তাহাকে অপরশব্দ বা ধ্বনি (Sound) বলিব। যে চাঞ্চল্যে হরির শব্দজ্ঞান হয় না, তাহাতে হয়ত যদুর শব্দজ্ঞান হয়। হরির চেয়ে যদুর কাণ তীক্ষ্ন। কুকুর হয়ত মানুষের চেয়ে বেশী শুনিতে পায়; যে সব ক্ষেত্রে আমাদের শব্দানুভূতি নাই সেখানে হয়ত তার আছে; কুকুরের চেয়ে বেশী শুনিতে পায় এমন জীবও থাকিতে পারে। যন্ত্র সাহায্যে (megaphone, microphone প্রভৃতি) পিপীলিকার পদসঞ্চারও হয়ত আমরা শুনিতে পারি। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'—সুতরাং যিনি যন্ত্র সাহায্যে সূক্ষ্মশব্দ শুনিতেছেন তিনি যোগী। যোগী অন্যপ্রকারও হইতে পারেন। হিন্দুদের অধ্যাত্মবিজ্ঞান যদি সত্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি সংযম প্রক্রিয়া (অর্থাৎ ধারণা ধ্যান সমাধি) দ্বারা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম শব্দও শুনিতে পারেন। চাই কি অণু-পরমাণু, ইলেক্‌ট্রনদের চঞ্চলচরণে ছুটাছুটি তাঁর কাছে ভাষাহীন, নীরব না হইতে পারে। তবেই শ্রবণ সামর্থ্য (capacity af hearing) আপেক্ষিক (relative), তারতম্য বিশিষ্ট (variable) এবং অবস্থাধীন (conditional) হইতেছে। এ যোগ্যতা দেশ-কাল-পাত্রের অপেক্ষা করে। তুমি আমি সচরাচর যে শব্দ শুনি তাহাকে স্থূলশব্দ বলা যাক্। যন্ত্র সাহায্যে যে শব্দ শুনা যায় বা যোগী যে শব্দ শুনিতে পান তাহাকে সূক্ষ্ম (subtle) শব্দ বলা যাক্। কিন্তু সব যন্ত্র এক রকম নয়, সকল যোগীর অনুভব সামর্থ্য তুল্য মূল্য নহে; সুতরাং সূক্ষ্মশব্দেরও নানা থাক্ (gradations) অবশ্যই হইবে। বৈজ্ঞানিক বা যোগীও শব্দকে ঠিকভাবে বা পুরাপুরি (perfectly ও unconditionally) শুনিতে পান না; কারণ তাঁরও শ্রবণসামর্থ্য যে আপেক্ষিক ও অবস্থাধীন। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে—কোনও অবস্থায় শব্দের ঠিকভাবে, নিরতিশয় রূপে শোনা আছে কি? এমন কোনও শ্রবণসামর্থ্য আছে কি যাহা সম্পূর্ণ ও নিরতিশয় (perfect ও absolute)? তা সত্যই আছে কিনা জানিনা, তবে গণিতশাস্ত্রের নজিরে ধরিয়া লওয়া হউক যে সেরূপ একটা অনুভব সামর্থ্য আছে—এমন একটা জ্ঞানভূমি আছে যেখানে অন্য কোন উপাদান বা নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই আত্মা স্পন্দনমাত্রকে শব্দরূপে যথাযথ ধরিতে পারে। বাতাস বা ঈথার থাকুক আর নাই থাকুক বস্তুর চাঞ্চল্য বা স্পন্দ যদি কোন চৈতন্যে যথাযথ বা নিরতিশয়ভাবে শব্দরূপে অভিব্যক্ত হয়, তবে শ্রবণশক্তির যে পরাকাষ্ঠা আমরা খুঁজিতেছিলাম তাহাই সেখানে পাইলাম। এই প্রকার যে শ্রবণসামর্থ্য তাহাকে সার্ জন উডরফ্ Absolute Ear বা নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য বলিতেছেন। এই পারিভাষিক শব্দটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করিতে যাই, তবে হয়ত হাস্যাস্পদ হইব। নিরপেক্ষ কর্ণ বা নিরতিশয় কর্ণ, এইরূপ একটা অদ্ভুত কথা শুনিলে আমরা কেহই সহিষ্ণু থাকিতে পারিব না। কিন্তু

পরিভাষা যাহাই হউক, জিনিষটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নয়। আমরা 'কর্ণ' বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝি ইহা সেরূপ কর্ণ না হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে শব্দানুভবসামর্থ্য কম বেশী হইয়া থাকে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে এ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা কোথায়? কোনও ব্যক্তিবিশেষে এ সামর্থ্য নিরতিশয়ভাবে পরিসমাপ্ত হউক আর নাই হউক, 'পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' এমন ধারা কোনও একজন প্রজাপতি সত্যসত্যই থাকুন আর নাই থাকুন, আমরা গণিতশাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে যদি একটা অনুভব সামর্থ্যের বিরামস্থান, পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লই, তবে তাহাতে আমাদের অজ্ঞেয়বাদী অথবা নাস্তিক বন্ধুর শিরঃসঞ্চালন করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বৃত্তের ভিতরে একটা বহুভুজ ক্ষেত্র আঁকিয়াছি; যদি ক্ষেত্রের ভুজসংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে থাকি তবে ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃত্তের পরিমাণের ক্রমেই কাছাকাছি হইতে থাকে। এ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, বহুভুজ ক্ষেত্রটির ভুজসংখ্যা যদি অনন্ত করিয়া লওয়া যায়, তবে তাহার চৌহুদ্দী বৃত্তের সঙ্গে শেষকালে মিলিয়া যাইবে না কি? সত্যসত্যই হাতে কলমে কিন্তু কখনই দুইটাকে একান্তভাবে মিলাইয়া দেওয়া যায় না; তবে পরীক্ষার জের কল্পনা সারিয়া লইতেছে তুমি বৈজ্ঞানিক, অণুর কথা বলিতেছ; তাহা কি তোমার সূক্ষ্মতা-ভাবনার একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) নহে? ইলেক্‌ট্রনের কথা বলিতেছ, তাহাও যে তোমার সংস্কার (unit charge of electricity) ঠিক লক্ষ্যার্থ, এ কথা কি তুমি হলফ করিয়া বলিতে পারিবে? যে জিনিষের একটা বেশি কমি আছে ক্রমিকধারা (series) আছে, তাহারই একটা পরাকাষ্ঠা কল্পনা করিয়া লইবার আমাদের অধিকার আছে, এবং সেরূপ কল্পনা করিয়া লওয়ায় অনেক সময় আমাদের বোঝাপড়ায় বিশেষ সুবিধা হয়; এরূপ কল্পনা করার অধিকার না দিলে ক্যালকুলাস্ নামক গণিতশাস্ত্রটাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়া থাকিত। যাহা হউক, অনুভব সামর্থ্যের নানান্ থাক্ দেখিয়া তাহার একটা পরাকাষ্ঠা আমরা কল্পনা করিতেছি এবং সেইটারই নাম দিতেছি Absolute Ear. আমাদের শোনা অল্প, এ প্রকার শোনা ভূমা; আমাদের শোনা প্রাসিক, এ প্রকার শোনা যথার্থ; আমাদের শোনা সাপেক্ষ, এ প্রকার শোনা নিরপেক্ষ; শুধু শোনা কেন; দেখা প্রভৃতি অনুভূতির অপরাপর ধারাগুলি সম্বন্ধে আমরা এক একটা পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া লইতে পারি; তাহা হইলে Absolute Eye, Absolute Tongue প্রভৃতিও আসিতেছে। তবে মনে রাখিতে হইবে, এগুলি এক একটা শক্তি বা সামর্থের পরাকাষ্ঠা মাত্র; চোক, কাণ, জিব ইত্যাদির মত স্থূল কোন দ্রব্য না হইতেও পারে।

এরূপ কর্ণকে (Absolute Earকে) পারমার্থিক কর্ণ বলিব কি? নাম যাহাই দেওয়া হউক, স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা নিরতিশয় শ্রবণ সামর্থ্য। শুনিবার জন্য এই কর্ণের কেবল একটা হেতুর অপেক্ষা করিতে হয়—সেটি স্পন্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকিলেই এই কর্ণ শুনিতে পাইবে এবং এমন ভাবে শুনিতে পাইবে যে, সে শোনার চেয়ে খাঁটি ও বেশী শোনা আর কিছু হইতে পারে না। এই পারমার্থিক কর্ণ দ্বারা যে শব্দের অনুভব হয় তাহাকে সার্ জন উড্রফ শব্দতন্মাত্র বলিতেছেন। দর্শনশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা এ ব্যাখ্যার যাথার্থ্য বিচার করিবেন; সাহেবের মতে পারমার্থিক কর্ণ দ্বারা আমরা শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় মূর্ত্তিটি (sound as it is) গ্রহণ করিতে পারি। ইহা যেন শব্দের প্রকৃতি; আর তুমি আমি এমন কি বৈজ্ঞানিক ও যোগীও যে শব্দ শুনিতেছেন, সেটা অল্পবিস্তর শব্দের বিকৃতি—এ শব্দের বেশিকমি আছে, ভুলভ্রান্তি আছে আছে; কেহ বেশী শুনিল; কেহ কম শুনিল; আমি যেভাবে শুনিলাম, তুমি সেভাবে শুনিলে না; আমি ভুল শুনিলাম, তুমি কতকটা ঠিক শুনিয়াছ; আমি যেখানে আদৌ শুনিতে পাইলাম না, তুমি সেখানে কিছু শুনিলে; এইজন্য ইহা শব্দের বিকৃতি। তবেই আমাদের লক্ষণানুসারে শব্দতন্মাত্র শব্দের প্রকৃতি হইল—শব্দের প্রকৃতি, শব্দের প্রসূতি নহে। অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র এবং পরশব্দ এক জিনিষ নহে। পরশব্দ কারণীভূত (causal) চাঞ্চল্য (stress) মাত্র—যে চাঞ্চল্যের জন্য শব্দজ্ঞান হয় সেইটা মাত্র, সে

নিজে শ্রুতশব্দ (sound) নহে। ইহা শব্দের প্রকৃতি। কিন্তু শব্দতন্মাত্র শ্রুতশব্দ, তবে তাহা তোমার আমার কাণে শোনা শব্দ নয়, পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত নিরবচ্ছিন্ন শব্দ। কাজেই শব্দতন্মাত্রও অপরশব্দের ভাগেই পড়িতেছে। তবে অবশ্য অপরশব্দগুলির সর্ব্বোচ্চ থাক্ বা পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্র। তার নীচে নানান্ থাকের শব্দ রহিয়াছে; সেগুলিকে মোটা-মুটি দুইরূপ মনে করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকযন্ত্রসাহায্যে অথবা ধ্যান-ধারণা দ্বারা যে শব্দগুলি আমরা শুনিতে পারি, কিন্তু যেগুলিকে সচরাচর আমরা শুনিতেছি না, সেইগুলি সূক্ষ্মশব্দ; তাহাদের পরাকাষ্ঠা শব্দতন্মাত্রে। আর সচরাচর কাণে আমরা যে শব্দগুলি শুনিয়া থাকি (যথা বাঁশীর শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি), সেগুলি স্থূলশব্দ। অতএব অপরশব্দের বা শ্রুতপদের (sound এর) মোটামুটী তিনটা বিভাগ পাইলাম—প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু থাক্ (gradations) গণনাতীত; যত রকমের কাণ তত রকমের শোনা; দেশ-কাল-পাত্র বদলাইলেই শোনাও বদলাইয়া যায়। বিভাগ তিনটি এই :—শব্দতন্মাত্র (বা শব্দের প্রকৃতি); সূক্ষ্মশব্দ (অতীন্দ্রিয় বলিব কি?); এবং আমাদের আটপৌরে স্থূলশব্দ (normal sound)। এ তিনটি ছাড়া এবং এ তিনেরই মূলে যে চাঞ্চল্যের বীজ রহিয়াছে, যেটা না থাকিলে কেহই শুনিতে পান না, এমন কি স্বয়ং প্রজাপতিও শুনিতে পান না, সেইটাকে আমরা আগাগোড়া পরশব্দ বলিয়া আসিতেছি। তিন রকম শ্রুতপদের জন্য তিন থাকের কর্ণ বা শ্রবণ সামর্থ্য আবশ্যক। শব্দতন্মাত্রের জন্য পারমার্থিক কর্ণ (Absolute Ear); সূক্ষ্মশব্দের জন্য দিব্যকর্ণ (yogik ear); এবং স্থূলশব্দের জন্য ভৌতিককর্ণ (normal ear)। ফলকথা, শব্দের দিক্ হইতে হিসাব লইলে আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের পাঁচটা অবস্থা। অনুভবের যদি কোনও তুরীয় ভাব থাকে, যেখানে আদৌ ক্ষোভ বা চাঞ্চল্য নাই তবে সেটা অশব্দের অবস্থা; কারণ চঞ্চল্য না থাকিলে শব্দ থাকেনা। তারপর চাঞ্চল্য রহিয়াছে কিন্তু শুনিবার কোনরূপ কাণ নাই, ইহাই পরশব্দ। তারপর, চাঞ্চল্য রহিয়াছে এবং তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে শোনা হইতেছে; ইহাই শব্দতন্মাত্র। তারপর, চাঞ্চল্যটাকে আমাদের ভৌতিককর্ণ ধরিতে পারিতেছে না কিন্তু দিব্যকর্ণ ধরিয়া ফেলিতেছে, ইহাই সূক্ষ্মশব্দ। সর্ব্বশেষে চাঞ্চল্য ভৌতিককর্ণটাকেও উত্তেজিতকরিয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে। ইহাই স্থূলশব্দ।

একটা কথা সকলপ্রকার শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্য (stress) রহিয়াছে তাহাকে আদৌ 'শব্দ' বলিতেছি কেন? যখন সেটাকে শুনিলাম তখনই সেটা শব্দ, যখন শুনিতেছি না, তখন সেটা শব্দের সম্ভাবনা (Possibility) মাত্র, শব্দ নহে। ঠিক কথা; কিন্তু পরশব্দকে শব্দ বলিবার কৈফিয়ৎ আমাদের একটা আছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—আমাদের অনুভূতির এই পাঁচটা ধারা। এই পাঁচটাই আবার যে উৎস হইতে নির্গত হইতেছে তাহা পরশব্দ বা চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য যে গোড়ায় তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু সেটাকে রূপ, রস, প্রভৃতি আখ্যা না দিয়া শব্দ আখ্যা দিতেছি কেন? শব্দের এমন বিশেষত্ব কি আছে যাহাতে তাহাকেই সকলের মোড়ল করিয়া বসাইতে হইবে? পরশব্দ যে প্রকৃত প্রস্তাবে শব্দ (sound) নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কাজেই তাহাকে শব্দ বলিতে গেলে আমাদের অধ্যাস (impose) করিতে হয়। এক কারণের যদি অনেকগুলি কার্য্য থাকে তবে তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট কার্য্যটিকে আমরা কারণের সঙ্কেত (symbol sign) ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই। হ্রদের সুস্থির জলরাশির কাছে দাঁড়াইয়া নীরবতা অনুভব করিয়াছি; জলে যে চাঞ্চল্য নাই, শব্দ হইবে কেন? আবার, পুরীর সমুদ্রতটে দাঁড়াইয়া বিপুল সিন্ধুগর্জ্জন শুনিয়াছি; শুনিব না কেন, লবণাম্বুরাশির ধারানিবদ্ধ তরঙ্গমালা যে মরুভূমিতে নিশ্চয়ই আছড়াইয়া পড়িতেছে। নীরবতা সুস্থিরতার সঙ্কেত, মুখরতা চাঞ্চল্যের সঙ্কেত। যেখানে শান্তি সেখানে মৌন, যেখানে ক্ষোভ, ছুটাছুটি সেইখানে কোলাহল। সাম্যাবস্থা, শান্তি বুঝাইতে মৌনের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কোথায় পাইব? বৈষম্য, অশান্তি, চাঞ্চল্য বুঝাইতে শব্দের মত এমন স্পষ্ট সঙ্কেত কি আছে? যেখানে রূপ দেখিতেছি, রসাস্বাদ করিতেছি, গন্ধ পাইতেছি, সেখানেও মূলে এক প্রকার না এক প্রকার চাঞ্চল্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চাঞ্চল্য স্পষ্ট নহে—পরীক্ষায় ধরা পড়ে।

হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড়ে বসিয়া হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গোটা কয়েক চূড়া দেখিতেছি; অথবা মুশৌরির সেনা-নিবাস পর্ব্বতে বসিয়া সম্মুখে চিরতুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণীর কর্পূরকুন্দেন্দুধবল বিরাট বপুঃ নিষণ্ণ রহিয়াছে দেখিতেছি। এই যে রূপজ্ঞান, ইহার মূলেও ঈথারতরঙ্গগুলির বা ঐ রকম একটার কিছুর চঞ্চল অভিসার রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাকাইয়া দেখি যেন একটা বিপুল, ভাস্বর নিসর্গগৌরব ত্রিত্রার্পিত হইয়াই রহিয়াছে—কোথাও একটু স্পন্দন নাই, চাঞ্চল্য নাই; সব শান্ত, সমাহিত। এটা কিন্তু আমার দৃষ্টির স্বাভাবিক কৃপণতা, আমার বোঝার ভুল। অত সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য আমার কাছে চাঞ্চল্য বলিয়া ধরা পড়ে না। মন্দিরে পূজায় বসিয়া দেবতার পায়ে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম নিবেদন করিয়া দিয়াছি; তার স্নিগ্ধ সৌরভ আমার ভাব আরও গাঢ় করিয়া দিতেছে। অবশ্য, গন্ধবহ পদ্মপরাগরেণু বহিয়া আনিয়া আমার নাসিকার ত্বকে ছিটাইয়া না দিলে আমি গন্ধ পাই না; কিন্তু গন্ধ পাইয়া. এত আহরণ, বিকিরণ ও বিতরণের কথা ত কৈ আমার মনে হয় না; আমি মনে ভাবি পদ্ম পরিমল যেন একটা স্নিগ্ধ শান্তি প্রলেপের মত আমার প্রাণের উপর লাগিয়া রহিয়াছে। এখানেও চাঞ্চল্য অনুভব ধরা পড়ে না, পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই জন্য রূপ, রস প্রভৃতি চাঞ্চল্যহেতুক হইলেও চাঞ্চল্যের সব সময়ে স্পষ্ট প্রতীক নহে। কিন্তু শব্দ ও চাঞ্চল্য যেন এপিঠ ওপিঠ; দেখিলে সন্দেহ বা ভ্রম থাকিতেও পারে, যেটা দেখিতেছি সেটা অস্থির কি সুস্থির; কিন্তু ডাক শুনিলে আর সন্দেহই থাকে না, যে ডাকিতেছে সে অস্থির। তাই শব্দ চাঞ্চল্যের খুব স্পষ্ট ও অব্যভিচারী সঙ্কেত। কাণে বায়ুতরঙ্গের ধাক্কা অনেকটা ধাক্কার মতই বোধ হয়, কিন্তু চোখে (retiana) ঈথারতরঙ্গের ধাক্কা আমরা প্রায়ই ধাক্কা বলিয়া জানিতে পারি না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায়

মাসিক কাব্য সমালোচনা।

প্রবাসী। বৈশাখ—"রহস্য"—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্তের রচনা। কবিতায় বিশেষত্ব কিছুই নাই। রক্তিম চিতায় দিবসগুলি ডুবিয়া না মরিয়া পুড়িয়া মরিলেই ভাল হইত। মণিমাল্যের এক একটী রত্নকে নিমজ্জন করিবার জন্য কবি মৌন সিন্ধু মাঝে "অতলের কূপে"র আবিষ্কার করিয়াছেন।

"ঘুমের গান"—শ্রীদরবেশ রচিত। কবিতাটীর স্থলে স্থলে বেশ সুন্দর হইয়াছে—

আয় ঘুম আয়
বুঝিনা কেন যে কেউ জাগিবারে চায়
আমি আছি 'ওগো' আছে
ছেলে মেয়ে হাসে নাচে
আর কেউ মরে বাঁচে সে খোঁজে কিদায়
কি স্বাধীন খাই দাই—
এবাড়ী ওবাড়ী যাই
এই ঢের এর বেশী পাগলেরা যায়।

শান্তি শান্তি সব
মিছে কেন কলরব ?
ঘুমায়ে স্বপন দেখ আঁখির পাতায়
আয় ঘুম আয়।

দেশ নায়কদের প্রতি ও বেশ একটু তীব্র কটাক্ষ আছে।

কর্ত্তা সাজিয়া যত
চেঁচাও ষাড়ের মত
মগজ ঘামাও খালি কাগজ রেখায়।

যখন পাইবে বাঁকা
থেমে যাবে হাঁকা ডাকা
চুপ চুপ জামায়ের হাকিমতী যায়।
এর চেয়ে ঢের সোজা
বিছানায় চোক বোজা
মরারা যেমন করে' শ্মশানে ঘুমায়
আয় ঘুম আয়।

রচনায় বেশ পারিপাট্য আছে—পাকা হাতের রচনার অনেক নিদর্শনও বর্ত্তমান।

এমাসের প্রবাসীতে প্রবন্ধ গৌরবের তুলনা নাই। প্রবন্ধ গৌরবের ভার লইয়াছেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রবীণ মণীষীরা—এ সংখ্যায় কাব্য গৌরবেরও দীনতা নাই। এ সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সম্পৎ 'রেণু'—শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু রচিত। এই নবীন কবির ২।১টী ছোটখাট কবিতা দুই একখানি পত্রিকাতে দেখিয়াছিলাম এবং তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল কিন্তু ভাবি নাই এত শীঘ্র এই তরুণ কবি শিশুগরুড়ের ন্যায় সুতঙ্গ সুনীল গগণে উধাও উড্ডীন হইয়া উঠিবে। রেণু কবিতার রচনা পারিপাট্যে মুগ্ধ হইতে হয়। যেমন ভাষা বিন্যাস তেমনি নিখুঁত ছন্দোমাধুর্য্য যেমন অপ্রতিহত অনারত প্রবাহ তেমনি কবিত্বে কৌমুদী উজ্জ্বল চঞ্চল তরঙ্গমালা। ছন্দোবদ্ধ মিল অলঙ্কার ভাষা চয়ণের ষোল আনা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রচনাকে এমন অনায়াস গতি দান করিতে পারা বহুকালের সাধনা ব্যতীত সম্ভবনহে। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত নূতন অসমছন্দে কবিতাটী রচিত। পরিচয়ের জন্য কয়েক পংক্তি উপহার দিতেছি—

অন্তরে মোর কে জানালো নীরব নিমন্ত্রণ
এই জীবনের বসন্তে আজ ঐ এলরে ঐ এল যৌবন
কতই ছন্দ কতই গন্ধ কি আনন্দ জাগলো জলে স্থলে
নিখিল বিশ্ব অবাক হয়ে থাকে চেয়ে পরম কৌতূহলে
গাঁয়ের যতলোকে
মোদের পানে চেয়ে চেয়ে পলকহারা চোখে
শুধু এই কথাটিই জনে জনে জানায়
"এই দুটীতে দিব্যি কিন্তু মানায়"

বাল্যকালের সোহাগের কথা—

"সহজ ছিল সকল দাবী দাওয়া
নাচাইতেই পাওয়া আবার নাচাইতেই যাওয়া"

বাল্য সুলভ লীলার কথা—

"সেই যে রেণুর দুই হাতে দুই চক্ষু টিপে ধরা
নাম বল্‌তে গিয়ে আমার ছল করে ভুল করা"

বসন্ত সমাগম—

"সফলকরে আকুল সে পথ চাওয়া
বকুলবনে বইল আবার দক্ষিণ হাওয়া
মুকুল ভরা গাছে গাছে ফুটিয়ে দিয়ে ফুল অফুরন্ত
এলো বসন্ত" —ইত্যাদি

নবীন কবির আরো ১টী উপমার নমুনা দিয়া এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব—

মায়ের আঁধার বুকের কোণে জ্বলছিল সে অবিরত
সকল তারা হারিয়ে যাওয়া নিশাশেষের শুকতারাটির মত"
"সকল কথাই মনে পড়ে থেকে থেকে একে একে
যেমন করে' থরে থরে তারার কুসুম ভেসে আসে
অন্ধকারের বন্যাতে ঐ সন্ধ্যার আকাশে।"
"সারাটী দিন রইত সে তার কোলে পিঠে
ধোঁয়ায় মলিন পূজার ফুলে
গন্ধ মধুর চন্দন একছিটে।"

কবিতাটীর স্থলে স্থলে একটু একটু অস্বাভাবিকতা আছে আখ্যান বস্তুর শেষাংশটুকু প্রথমাংশের সহিত একটু অসমঞ্জন হইয়াছে—যে pastoral air কবিতাটীতে স্বপ্নমোহন করিয়া তুলিয়াছিল যে বকুল ফুলের আকুল করা গন্ধ নারিকেল পাড়ার ঝিরঝিরানি শামুক নুড়ির ঠুনঠুনি, পদ্মভরা কালোদীঘির কাল জলের কলকলে শ্রবণ মন মস্‌গুল হইয়া পড়িয়াছিল ইংলণ্ড ও বম্বের নামে তাহা রাজপথের ধূম মলিন-ধূলায় ও ট্রেণট্র্যামের গর্জ্জনে কোথায় যেন মিলাইয়া গেল।

"এই দণ্ডেই ইংলণ্ডেই করব পলায়ন"

শুনিতে মিষ্ট হইলেও এ সংকল্পত্যাগ করাই উচিত ছিল। নবীন কবির ভবিষ্যৎ খুবই আশাপ্রদ বলিয়া

"পঞ্চভূত"

স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়
উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ—ছাত্রগণের জন্য স্বল্পমূল্যে উপাসনা বিতরণ করা হইবে। সত্বর নাম রেজেষ্টারী করুন—অগ্রহায়ণ মাস হইতে আমরা এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিব। পুরাতন উপাসনা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gouranga Press,

71/1 Mirzapur St., Calcutta.

Published by Pulin Behary Dass,

11, College Square, Calcutta

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা; তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ। | কার্ত্তিক—১৩২৬ | ৭ম সংখ্যা।

প্রকৃতির প্রতিদান।

ভারতের দেবদেবীর কল্পনা ও পূজার সহিত প্রকৃতির অবিরাম ভাববিপর্য্যয়ের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে আমি তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার নিগূঢ় রহস্যাত্মিকা উর্ব্বরা শক্তি, আপনার ভিতর হইতে আপনার পুনর্জন্ম ও পুনরুত্থানের ক্ষমতা শীতঋতুর অবসাদ ও মৃত্যুর পর নব বসন্তে প্রকৃতির এই মৃত্যোত্থান শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া কত ভূমিমাতৃকার পূজা আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষে যে মানব কল্পনা ও ভাবুকতার প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মা দ্যোতনা ও মানব জীবনের অনন্ত লীলাকে প্রকাশ করিয়াছে তাহা শক্তিপূজার বিচিত্র ইতিহাস সকল দেশ ও কালে একবাক্যে সাক্ষ্য দেয়। আমি এখানে শক্তি পূজা অর্থে কোন বিশিষ্ট সগুণ দেবতার শক্তি বলিতেছি না, ব্যাপক ভাবে সেই ব্রহ্মাণ্ডের লীলাময়ী আত্মা প্রকৃতির প্রতিদানকেই উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক দিবসের প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পর্য্যায়ও আহ্নিকের বিচিত্র মাতৃকল্পনা সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ পূজা অনুষ্ঠানে প্রকৃতি পূজার সাক্ষ্য দিতেছে।

দ্রাবিড় দেশে, গ্রামের বড় রাস্তাটি সাধারণতঃ পূর্ব্ব-দিক হইতে পশ্চিমে গিয়াছে, সূর্য্যের রাস্তাকেই অনুসরণ করিয়াছে এবং দিবসের কালবিশেষে আকাশমার্গে সূর্য্যদেবের স্থান অনুসারেই গ্রামের পূর্ব্ব দরজায় ব্রহ্মার মন্দির, দক্ষিণ দরজায় বিষ্ণুর মন্দির এবং পশ্চিম দরজায় শিবের মন্দির। ইহাও খুব স্বাভাবিক যে যে-দিকে সন্ধ্যার চিতা দিনের পর দিন জ্বলিয়া নদীর জলে তাহার করুণ প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে এবং দিকবধূ তাহার দিকে ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে চাহিয়া থাকে সেইখানে সেই শ্মশানচারী শিবের মন্দিরের সম্মুখে গ্রামের শ্মশানটি পড়িয়া রহিয়াছে।

গ্রামের কোথায়ও ঠিক মধ্যখানে দৈনিক স্নানের জন্য পুষ্করিণীটি রহিয়াছে, চারিদিকে পবিত্র দেবদারু, আম্র, চম্পক, নিম্ব অথবা নারিকেল শ্রেণী। দিনের পর দিন, প্রত্যূষে, মধ্যাহ্নে, বসন্তে, হেমন্তে ঐ শান্ত অচঞ্চল জলের উপর নীল আকাশের লীলা-খেলা, গাছের মুকুল নবপত্রের স্নিগ্ধ অরুনিমা অথবা শুষ্ক পর্ণের ধূসর আভা প্রতিভাত হয়, কিংবা শিশু, বালক, জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ, যুবতী বা মাতা, মানুষের সকল বয়স ও অবস্থার

ভাববিপর্য্যয়ের ছায়া পড়ে! তখন শান্ত উদাস প্রীতাতে অবগাহন স্নানে দেহ জুড়ায় এবং এই সব ছায়াদর্শনে মুগ্ধ হইয়া মন তাহার স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন দর্পণে আদ্যা প্রকৃতির অনাদ্যনন্ত চঞ্চল লীলাখেলা ও মানব জীবনের অনন্ত ভাববিপর্য্যয়ের কাল্পনিক ও বস্তুতন্ত্র প্রতীক ও মূর্ত্তি ফুটিতে থাকে। মানবীয় ও তুরীয় ভাবের আনন্দ বিনিময়ে সেইখানে সে মানুষের ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতে রসানুভূতি পাইয়া যে মূর্ত্তির সহিত পরিচিত হয় তাহারাই ঘাটের উপর মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ও অভ্যন্তরে তাহারি জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। চপলা প্রকৃতির ক্ষণিক খেলা কিম্বা মানুষের জীবন ও অদৃষ্টের সেই চিরন্তন বিবর্ত্তনশীল প্রতিরূপগুলাকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনার জাল বুনা হইতে থাকে। কোথায়ও প্রকৃতির সেই আদি উপকরণগুলা, ব্যোম, বায়ু, অগ্নি, পৃথ্বী প্রভৃতি বিগ্রহের রূপ ধরিয়াছেন। কারণ ইহারাও সেই পরম পুরুষের প্রাকৃতিক মূর্ত্তি। কোথায়ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সগুণ হইয়া প্রকৃতি-কোটি হইতে ঈশ্বর-কোটিতে উপনীত হইয়াছেন। কোথাও মানুষের জীবনের অবস্থা ও পরিণতিকে মানুষের ও সমাজের জীবনের সম্বন্ধকে বিগ্রহ মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে। এই নিমিত্তই কোথায় ও বা চির কিশোর, বা চির কুমারী, কোথায় ও বা সপ্তমাতৃকা, ব্রাহ্মী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মাহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, খোদিত মন্দির গাত্রে ও মন্দির দ্বারে জীবন ও মরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে। শান্ত ও অনন্ত, মহাকাল বা মহাকালী হয়ত বা কোথাও এই লীলাময় দেব দেবীগণকে আপনার বিরাট ক্রোড়ে লইয়া আপনারই লীলায় বিভোর, একবার সকলকে তাহার শূন্যের কবলে গ্রাস করিতেছেন আর একবার শূন্য হইতে উৎসৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছেন। অন্তরাত্মা শেষে অনুভব করিবার সুযোগ পান। লীলাময় পরিবর্ত্তনশীল অনন্ত জীবনের ও ভাবের অদ্বিতীয় কেন্দ্র হইয়া আপনিই প্রকৃতি ও সংসারের মায়া জাল ফেলিতেছেন এবং আপনিই আবার সেই জালকে উর্ণনাভের মত আপনার হিরণ্যগর্ভে সঙ্কুচিতও করিতেছেন।

কারণ, এইটাই ভারতের দেবদেবীর কল্পনা মন্দির নির্ম্মাণ ও সজ্জা বিধানের অপরূপ কৌশল যে মানুষের মনকে এক স্তর হইতে অপর উর্দ্ধস্তরে ক্রমশঃ যাইবার একটা সুন্দর উপায় সে করিয়াছে। স্থানীয় লোক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্পের চিত্র মন্দির প্রবেশ করিতেই প্রথমে বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সজাগ করিতে থাকে। তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দিরের বাহিরের দালানে সেখানকার চলিত তামিল প্রবাদের অদ্ভুত মাছ, ঘোড়া, সিংহ, মানুষের গল্পের এমন আজগুবি ছবি আছে যে আমরা আশ্চর্য্য হইলেও সেখানকার লোকের পক্ষে তাহা অতি শিক্ষাপ্রদ ও ভাবউন্মেষক। রামেশ্বরের সেই বিরাট দরদালানের ছাদে সমস্ত রামায়ণ মহাভারতটা ছবির আকারে এমন ফুটিয়াছে যে যাত্রীর পক্ষে তাহা বাস্তবিকই অতি আনন্দের। কন্যাকুমারিকা হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে শুচিন্দ্র মন্দিরের গোপুরমে রামায়ণ মহাভারত এবং প্রায় সমস্ত পুরাণের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি খোদিত রহিয়াছে! সেখানে সমুদ্র মন্থনের যে বিরাট ছবি কারুকার্য্যে মহনীয় ও মনোরম হইয়া রহিয়াছে তাহার তুলনা হয় এক বরবদুরের মন্দিরের অনুরূপ ছবির সঙ্গে। ভারতবর্ষের সকল মন্দিরে এমন কি গ্রাম্য দেউলে পর্য্যন্ত কম বেশী এইরূপ পুরাণের ছবি ও গল্প দেখা যায়।

মানুষের মন এইভাবে তৈয়ারী হইয়া যখন অগ্রসর হইতে থাকে তখন তাহার চক্ষের সম্মুখে অনার্য্য পুজিত দেবতা হনুমান, কালভৈরব প্রভৃতি দ্বারপালগণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চস্তরের দেব দেবী উপস্থিত হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতির সেই তিনটি রূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এবং তাহাদের সগুণ প্রকাশ বিষ্ণুর অবতার সমুদয়, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কিশোর লীলা, শিবের পঞ্চবিংশ লীলা-মূর্ত্তি। বিষ্ণুর অষ্টশক্তি, এইরূপে অন্তর্জগতে ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, বাস্তব হইতে তুরীয়তে ক্রমারোহণের মধ্যে যখন বিশ্বপ্রকৃতির যাবতীয় লীলা, মানব জীবনের ভাগ্য ও যাবতীয় বিকাশ ও পরিণতির সহিত পরিচয় লাভ হইতেছে, তখন পূজার্থী মহামণ্ডপ, মুখমণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ

ক্রমশঃ ছাড়িয়া, গর্ভ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। মন্দিরের চারিদিকের সমস্ত পবিত্রতা ঐ গর্ভগৃহকে কেন্দ্র করিয়াছে, যেমন গর্ভগৃহের যিনি অধিষ্ঠান করিতেছেন তিনিই সমস্ত দেব দেবী কল্পনার কেন্দ্রস্থল। দর-দালানগুলার উচ্চতা ও প্রশস্ততা একদিকে যেমন অন্তঃকরণের প্রসার সাহায্য করে, অপর দিকে সব পথ-গুলি যে একটা কেন্দ্রের দিকে ধাপের পর ধাপ, উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ যে অল্পপরিসর হইয়া আসিতেছে তাহাও অন্তঃকরণের সেই উর্দ্ধগতির সহায়ক, শেষে যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভগৃহে আসিয়া পৌঁছিল তখন মন এমন একটা কম্প-মান প্রতীক্ষার বিগলিত অবস্থায় আসিয়াছে যে সেখানে তাহার উপর যাহার ছাপ লাগিবে তাহা একেবারে স্থায়ী হইয়া যাইবে। বাহির হইতেও মন্দিরের সেই গোপুরমের পর হইতে অট্টালিকাগুলার ক্রমারোহণের দ্বারাও মন ধাপে ধাপে উঠিতে উঠিতে ক্রমশঃ সেই ব্যোমের দিকে অগ্রসর হয়। আর ইহাও খুব আশ্চর্য্য নয় যে সেই মন্দিরের গুহাহিত মণিকোঠে নিঃসঙ্গভাবে পৌঁছাইয়া যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তিনি একবারে অরূপ। অসংখ্য মূর্ত্তি দেখিয়া ও পূজা করিয়া আসিয়া যাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, যিনি তাহাদের প্রত্যেকের এবং সকলের মাঝখানে, তিনি বিশ্বরূপ এবং অরূপ, চিদাম্বরমের মত একটা মহাশূন্য না হয় তানজোরের লিঙ্গের মত প্রকাণ্ড ও সীমাহীন কিম্বা শ্রীরঙ্গম, কুম্ভকোণ-মের, ত্রিভেনদ্রামের মত এমন বিরাট মূর্ত্তি যে সত্যই মনে হয় সে বিশ্বাধার, যে অরূপে বা বিশ্বরূপে সকলরূপ ও প্রকাশের জন্ম তাহার অতি সুন্দর দুর্জ্ঞেয় প্রতীক। তাহার মধ্যে যিনি এক এবং একের মধ্যে যিনি বহু গ্রীক কল্পনার সেই উদ্ভিন্ন যৌবনের মহিমা ও কমনীয়তা যে বস্তুবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পরিচয় দিবার জন্য হিন্দু বা দ্রাবিড়ী শিল্প ব্যগ্র নহে; মানব জীবন ও প্রকৃতির অতীত সেই বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য-লীলাকে উন্মোচন করাই ভারতীয় শিল্পের উদ্দেশ্য। এবং এই আদর্শে প্রাকৃতিক জীবন ও মানবের জীবন মরণ খেলার মধ্যে যে সকল দৃশ্য-বস্তু বা ঘটনাবলীতে সেই তুরীর রহস্য লীলাকে প্রকটিত দেখিতে পাই সে গুলিই স্থপতি বিদ্যা ও দেব কল্পনার আশ্রয় ও আধার। এই নিমিত্ত কখনও রুদ্র, কখনও বিভৎস, কিন্তু সর্ব্বদাই বিশ্বাত্মক বিগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। এটা ঠিক প্রকৃতির কিম্বা মানব জীবনের সুষমা ও সৌসামাঞ্জস্য জীবনের সবটা ঘিরিয়া বসে নাই। ভাঙ্গা গড়া অনিয়ম এমন কি বিশৃঙ্খলা জীবনের অনেক সত্য ও সৃষ্টি প্রকাশিত করে। দ্রাবিড়ী বা হিন্দু শিল্পের বিচার তাই গ্রীস হইতে আমদানী স্থপতি বিদ্যার মাপ কাটিতে হইবে না। জীবনের সমগ্রতা ও বাস্তব সত্যের মাপ কাটির দ্বারা ইহার যাচাই হইবে।

এই দিক দিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি, গ্রীক শিল্প যেমন জীবনের এক দিকটাকে মূর্ত্তি দিয়াছে, সেরূপ মিসর, চীন, জাপান ও ভারত ইহারাও যিনি অরূপ এবং যিনি বিরাট, তিনি মন্দিরের অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তির কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া রূপ-অরূপের লীলায় মগ্ন, তাঁহার চিরন্তন খেলা এমনই নিবিড় ভাবে দাক্ষিণাত্যের বিপুলকায় মন্দিরে ও মন্দিরের বিস্তৃত প্রাঙ্গনে ফুটিয়াছে যে বলিতে হয় আর্য্যকল্পনা ও দ্রাবিড়ী বস্তুবিদ্যা পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে জগতের এমন মহৎ ও সুবৃহৎ সৃষ্টি বোধ হয় হইত না।

প্রকৃতির বিচিত্র ভাব, মানব জীবনের বিচিত্র পরিণতি, প্রেমের অফুরন্ত লীলার মধ্যে যিনি বিকারহীন, দ্বন্দ্বাতীত, শান্ত, অচঞ্চল তাঁহাকে ভারতবর্ষে অনুভব করিয়াছে আর একদিক হইতে প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের লীলার মধ্যে তাহাকে বার মাসের তের পার্ব্বণে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে বরণ করিয়া এবং জাতীয় জীবনের অতীত গৌরব কাহিনী গুলাকে, মহাপুরুষ সমুদায়ের সার্থক জীবনের ঘটনাবলীকে প্রকৃতির পুনরুত্থান ও ষড়ঋতুর পুনরাগমনের সহিত মিলাইয়া দিয়া। শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন ও রাম-নবমী, বলিরাজার রাখীবন্ধন, চাঁদ সওদাগরের পরিবারে মনসাপূজা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ও বৃন্দাবনলীলা প্রত্যেকে কোন হর্ষ দুঃখময় অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, সে অতীতটা আমাদের কাছে

নিতান্ত নির্ব্বিকার, অস্পষ্ট কিন্তু তাহায় অনুভূতি ও নিজ নিজ সাধন অনুসারে মানব জীবন ও সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন দিক উন্মোচন করিয়াছে। তাহারা কোনওটি সত্য হইতে ভ্রষ্ট নহে, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ বিশিষ্ট ও বস্তুতন্ত্র সাধনা ও কল্পনায় চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইজিপ্টে বার্দ্ধক্যের সেই প্রশান্ত রহস্যে সকল শিল্প সৃষ্টি আবৃত ও স্তিমিত, চীনে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের ভিতর মানুষের জীবন যেন একটা দৃশ্যাভিনয়, জাপানে মানুষ প্রকৃতির খণ্ড-জীবন আপনার ব্যক্তিগত জীবনের চাঞ্চল্য হইতে রসাস্বাদন পাইয়াছে। কিন্তু গ্রীসের মত বিলাস, ভোগ বা যৌবনের মহিমা বা মানুষের বীরত্বকে অবলম্বন না করিয়া মানব ভাগ্যের মধ্যে যাহা কঠোর অথবা নিষ্ঠুর তাহাকে ছন্দে আবদ্ধ করিয়া ঘর সংসারেও আনিয়া আয়ত্ব করিয়াছে। ভারতবর্ষে একদিকে একটা তুরীয়-বোধ সীমার মধ্যে অসীমের সন্ধানে প্রকৃতি ও মানুষ উভয়কেই আবেষ্টনে ঘিরিয়াছে। আবার অন্য দিকে অরূপের রূপবাসনাকে অবলম্বন করিয়া অরূপকে বহুরূপী সাজাইয়া প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও মানবেতিহাসের গতির মধ্যে তাহার নিত্য নব অভিনয় দেখিতেছে।

এই আদর্শই ভারতবর্ষের আত্মা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য ও পর্য্যাপ্তি এই আদর্শকে একটা বিশিষ্ট ছাঁদ দিয়াছে। সকল কল্পনা ও সকল সৃষ্টিকেই বিচিত্র ও অসংখ্য করিয়াছে, কালের ধারণায় সেই মন্বন্তর যুগ যুগান্তর কল্পনা, জগতের ধারণায় সেই চতুর্দ্দশ ভুবন সৃষ্টি দেব দেবীর ধারণায় তেত্রিশ (কোটি ?) দেবতা কল্পনা মন্দির নির্ম্মাণে সীমাহীন বিস্তৃতি ও বিশ্রাম মণ্ডপে বনানীর ন্যায় সহস্রাধিক কারু স্তম্ভ নির্ম্মাণ স্থপতিবিদ্যা, কারু-কার্য্যেও পুলক বর্ত্তমানকালে সজাগ হইয়া নানা পূজা অনুষ্ঠানের আনন্দ সৃষ্টি করিতে থাকে। আমরা যেন পুনর্ব্বার সেই অতীতের হর্ষ ও দুঃখ বর্ত্তমানে ফিরিয়া পাইয়া আবহমান কালের অব্যাহগতি মানব জীবন ধারার ঐক্য সূত্রটিকে খুঁজিয়া পাই। ভারতবর্ষের কল্পনায় ইতিহাসের ঘটনা ঋতুর সঙ্গে বিবর্ত্তনশীল, এবং বিবর্ত্তনটাও পৌনঃপুনিকভাবে চলিয়াছে। তাই আমরা নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তি গড়িয়া বা ছবি আঁকিয়া স্মৃতিরক্ষা করি না; প্রকৃতির বিচিত্রবর্ণের লেখা পঞ্জিকায় এক একটি মহা-পুরুষের জীবন অমর হইয়া রহিয়াছে, তাই মেলায়, শোভাযাত্রায়, আমরা যে শুধু তাঁহাকে বা তাঁহার কোন লীলাকে স্মরণ করি তাহা নহে, অনেক সময়ে সেই সব লীলা আমরা অভিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনে পুনর্জ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাই। উত্তর ভারতের রামলীলা, রাবণ লীলা, ভরত মেলা প্রভৃতি অভিনয় যে রামায়ণ অপেক্ষা রাম লক্ষ্মণাদিকে জন সমাজের অন্তরের আরও নিকটে নিবিড় ভাবে পরিচয় করাইয়া দিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। অভিনয় ও প্রতিরূপের সাহায্য এবং ঋতু পরিবর্ত্তনের চিত্রণে সমগ্র মানব জীবন ও অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্কন, ইতিহাসের কল্পনায় মানবের যুগের পর যুগের বিবর্ত্তন—এই সকলের ভিতরই একটা tropical temperamentএর (গ্রীষ্ম প্রধান দেশীয় চিত্তের অপর্য্যাপ্তি) প্রভাব দেখিতে পাই।

দাক্ষিণাত্যের দেবদেবীগণের যে লীলা বৎসর বৎসর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় তাহাও এই ধরণের। মন্দিরের ভৃত্যদিগকে জমি দেওয়া আছে, তাহারা প্রতি বৎসর অভিনয় করিয়া থাকে। এবং মদুরার মন্দিরের একটি সুন্দর নিয়ম যে মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বরের উৎসব মূর্ত্তি প্রত্যেক মাসে নগরের এক একটি স্বতন্ত্র পথ দিয়া শোভা-যাত্রায় বাহির হয় ভক্ত পূজারী গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাই মদুরার পথ সকল মাসিক শোভাযাত্রা হইতে এক একটি মাসের নামে অভিহিত হইয়াছে। শোভাযাত্রা অথবা লীলা এইরূপে এক একটি অধ্যাত্ম ও অলৌকিক ভাবকে আশ্রয় করিয়া পথে ও প্রাঙ্গনে ব্যক্তির অনুভূতির রস প্রাচুর্য্য ও জনতার জাগ্রৎ চৈতন্য হইতে নবজীবন লাভ করে, এবং অফুরন্ত যুগ পরম্পরাগত মানব জীবন ও বিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে যিনি লীলাময় তাঁহাকে নিবিড়ভাবে পরিচিত করাইয়া দেয়।

আবার ইহাই প্রকৃতিকে নিত্য নব মূর্ত্তি দিয়া অতীতকে বহু ও বিচিত্রভাবে ধারণ করিয়া আমাদের বা

মাসের তের পার্ব্বণ পূজার অসংখ্য ক্রিয়া কলাপে অভি-ব্যক্ত হইয়াছে; অথচ এই বহু ও বিচিত্রের মধ্যে যিনি এক তাঁহাকে ভারতবর্ষ হারায় নাই। এইরূপে এক একটি ভাবও ঘটনা বস্তুতন্ত্র হইয়া জাতির ব্যক্তির চির স্মরণীয় হইয়া গিয়াছে।

বৎসরের পর বৎসর ঋতু পরিবর্ত্তনের সহিত, চন্দ্রের গতির অনুযায়ী এবং গ্রহযোগ বিশেষে আমাদের নানারূপ পূজা পার্ব্বণ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নিদাঘের উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন যখন সূর্য্যদেব মাথার উপর হইতে প্রখর রৌদ্র বর্ষণ করিতে থাকেন, তখন পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্লান্ত পান্থদিগের জন্য জলছত্র মণ্ডপ এবং সরাই প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই ধর্ম্মবোধ যে মানবের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে যাবতীয় পশু পক্ষী ও বৃক্ষ গুল্মাদি জলসিঞ্চিত হইয়া এই করুণার অংশ পাইয়া থাকে। এবং স্থানীয় দেবদেবীগণও তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ দাবী করেন। বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতুতেই বিষ্ণুর স্নানাদি অনুষ্ঠান অতীব স্বাভাবিক। বট অশ্বত্থ ও তুলসী বৃক্ষের উপর এবং শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলার উপরেও ছিদ্রযুক্ত পূর্ণ জল কলস স্থাপিত হয় এবং বিন্দু বিন্দু জল কণা প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও তাহাদের শীতল করিয়া রাখে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে পূর্ব্বপুরুষদিগের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে সুস্বাদু ফল সম্ভার সজ্জিত পূর্ণ জল কলস দ্বারা তর্পন করা হয়। বিহারে এই সময় কৃষিজীবিগণের দেবতার তুষ্টি সাধক নানারূপ মন্ত্র তন্ত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে, রমণীগণের বহুপ্রকার গীত ও ছড়ার আবৃত্তিতে এবং মৌলবীগণের প্রার্থনায়, বর্ষার প্রতীক্ষায় ব্যাকুলতার একটা সহজ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ষার সূচনায় যখন নদ নদীর কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ভরাসৌন্দর্য্য ও আকুল প্লাবন তাহাদিগের পূর্ণ যৌবনের পরিচয় দেয়, তখন গঙ্গাপূজা, মকরবাহিনী হইয়া গঙ্গামাতা ঘাটে ঘাটে ফুল ফল অর্ঘ্য পাইয়া সমুদ্রের দিকে কুলু কুলু হাস্যে অগ্রসর হ'ন। ঠিক অনুরূপ অনুষ্ঠান দাক্ষিণাত্যের কাবেরী স্নান। আদি মাসের অষ্টাদশ দিবসে যখন কাবেরীর জলরাশি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠিয়াছে তখনই কাবেরী স্নান, যেখানে নদী আবর্ত্তগতি অথবা কোন শাখানদী আসিয়া মিশিয়াছে সেখানে কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া স্নানোৎসবে যোগ দেয়। যখন ভরা আকাশের গুরু গুরু গর্জ্জন কৃষকের আনন্দ কোলাহলের সহিত মিশিয়া যায় আর অবিশ্রান্ত জলধারার মধ্য দিয়া ধরণী গগণের মধ্যে এক অব্যক্ত বিরাট সহানুভূতি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে তখন মানব হৃদয়েও প্রিয়তমের সহিত একটা মিলনেচ্ছা স্বভাবতঃই জাগরূক হয় প্রতীক্ষা ও বিরহ রঙ্গীন হইয়া উঠে; আর এই সমস্ত অভিনব ভাবই যেন তৎকালীন ঝুলন যাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; নব শোভায় হাস্যময় কদম্বের শাখায় দোদুল্যমান ঝুলনের উপর, প্রাণ আকুল করা সৌরভের মধ্যে, প্রিয়ার সহিত প্রিয়তমের মিলন, দীর্ঘবিচ্ছেদের পর রাধিকার সহিত রাখাল বালকের মোহন লীলা, মানবাত্মার সহিত ব্যথিত ভগবানের যোগ। শ্রাবণের মনসা পূজা সেই সময়ে সর্পভীতির অধিকতম সম্ভাবনাকেই নির্দ্দেশ করে। তাহার পরেই নন্দোৎসব; নয়নাভিরাম শ্যামল তৃণে যখন সমস্ত ভূমিই মণ্ডিত হইয়া যায় তখন নববস্ত্র পরিহিত উৎফুল্ল রাখালবৃন্দ গাভীগণকে উন্মুক্ত প্রান্তরে স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া দেয় এবং বংশীধারী রাখাল নন্দের দুলালকে আহ্বান করিয়া হর্ষে নৃত্য ও ক্রীড়া করে। এই সময়ে অম্বুবাচীও বর্ষার সূচনা করে। বারিপাতে যখন পৃথিবী রসযুক্তা হইয়া বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার উপযোগী হন, তখন তিনি হন রজস্বলা, অশুদ্ধা, তখন ভূমি কর্ষণও নিষিদ্ধ।

পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলে বৃষ্টির বিরামে যখন সমুদ্র আর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নয়, তখন আগামী বৎসরের শুভ সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যকল্পে সমুদ্রকে নারিকেল অর্ঘ্য দান এবং নৌকা সমুদ্রতরী প্রভৃতিকে পূজা করা হয়। ভাদ্রের শেষ সময়ে চাষীগণ 'ভাদোই' ফসলের জন্য কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এবং ভবিষ্যতেও এবংবিধ অনুগ্রহের আশায় অনন্তব্রতের উপবাসে আত্মসংযম করিয়া থাকে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে বর্ষণের উপর 'অঘ্রানী' ফসল এবং রবিশস্যের উপযোগী অবস্থা সম্যক নির্ভর করে বলিয়াই

এই সময়ে কৃষকেরা নানারূপ ব্রত ও তর্পণ দ্বারা দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের তুষ্টি সাধনে তৎপর হয়। অতঃপর নবরাত্র বা নয়দিবস ধরিয়া সংযম অভ্যাস এবং বিষুব সংক্রান্তির অব্যবহিত পূর্ব্বেই শুক্লপক্ষে সপ্তমী অষ্টমী এবং নবমী তিথিতে আমাদের অতসী পুষ্পবরণীর পূজা; হেমন্তের ধান্ত ও প্রকৃতির হরিদ্রাভা তাঁহার সোণার অঙ্গে উথলিয়া পড়িয়াছে। কৃষকের নিকটও এটি একটী মহৎ উৎসব, কারণ এই পূজা উর্ব্বরতার অবিনশ্বরত্ব ও ধরণীর প্রচুর দানের পুনঃসম্ভাবনার জ্ঞাপক। উৎপন্ন নবীন ফসলের অনুযায়ী ও মহা সমারোহে প্রতিমার পূজা সাধিত হয়। দক্ষিণে দশহরার দশম দিবসে খুব আনন্দ ও উৎসব। সেই সময় সেখানে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং আয়ুধ পূজার লাঙ্গল, খুরপী হইতে সমস্ত শিল্পের যন্ত্রাদি চন্দনে চর্চ্চিত হয়। হেমন্তে মালাবারের ওর্ণম উৎসব সর্ব্বপ্রধান—শস্য সঞ্চয়ের সহিত বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিবাঙ্কুরে আলিপনার দ্বারা ভদ্রকালীর মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা হয়, বালিকা ও যুবতীগণ মধ্যে প্রদীপ রাখিয়া গান রচনা করে, গাহে ও পথে পথে যাইয়া নৃত্য করে। কার্ত্তিক মাসে ধানের শীষ গজাইবার সময় বহু প্রকার পূজা অনুষ্ঠান হয়, বিশেষতঃ রমণীগণ ও কুমারী বালিকারা নানারূপ ব্রতের উদযাপন করে। মাসের শেষ অংশে ধান্য ফসলের আশু সম্ভাবনায় যখন মনে চাঞ্চল্যের আতিশয্য হয় তখন সকলেই বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা সংযম অভ্যাস করে, এই সময়েই বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুদিনব্যাপী উপবাস ব্রত; দীপালি উৎসবে অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং নদীর স্রোতেও প্রদীপ ভাসান হয়; বঙ্গদেশে আবার শ্রী ও সমৃদ্ধির দেবতা লক্ষ্মীর পূজা কোজাগর পূর্ণিমা তিথিতে সাধিত হয়। তাহার পর শরতের অতুলনীয় পূর্ণিমা রজনীতে রাসযাত্রায় গোপীগণের সহিত রাধাকৃষ্ণের নৃত্যলীলা প্রকৃতি জগতের পর্য্যায়রূপে স্ফুরণ ও বিকাশের অব্যাহত শক্তির সহিত প্রাণী জগতের যে বাস্তবিকই একটা সাম্য আছে তাহাই ঘোষণা করে। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে, প্রলয় নৃত্য-ভঙ্গীতেও ভয়ঙ্কর গূঢ় রহস্যে আবৃত শ্যামামূর্ত্তির পূজা।

৩০শে কার্ত্তিক কৃষক তাহার ক্ষেত্র হইতে একটী পক্ক ধান্যপূর্ণ শীষ আহরণ করিয়া পুরোহিতকে দিয়া থাকে এবং যে পর্য্যন্ত না তাহার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয় ততক্ষণ ফসল কাটা একেবারে নিষিদ্ধ। ফসল ঘরে তোলার পর অগ্রহায়ণে নবান্নের উৎসব চাষীদিগকে মাতাইয়া তোলে; হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাসে যে তাহারা অন্ন দ্বারা প্রথমে মূক পশুপক্ষী এবং তৎপর আত্মীয় কুটুম্বের এবং সকলের শেষে আপনাদের পরিতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য রাখে এইটাই তাহাদের ঔদার্য্য ও সরলতার পরিচায়ক, তাহাদের প্রতি উৎসবে তাহাদের মানসিক সৌন্দর্য্য এইরূপেই আত্মসংযমের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। সেই দিনই গ্রামে গ্রামে নবীন কার্ত্তিকের পূজা, কার্ত্তিক মূলে যুদ্ধ দেবতা হইলেও কালের স্রোতে তাঁহার সহিত অগণ্য নূতনত্ব ও সৌন্দর্য্যের স্মৃতি ও প্রসঙ্গ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণে পিঠা সংক্রান্তি কর্ম্মক্লান্ত কৃষকের সারা বৎসরের গ্লানি স্নেহের হস্তে মুছাইয়া দেয়, স্নেহময়ী মাতা কর্ম্মাবসানে পুরস্কার প্রত্যাশী সন্তানগণকে সুমিষ্ট পিষ্টক দ্বারা আপ্যায়িত করেন—এইটাই কৃষকদিগের অবিমিশ্রিত আমোদের সময়।

বাংলার মকর সংক্রান্তির উৎসবের দিনে দক্ষিণে পঙ্গল উৎসব। পঙ্গল নামে ফোটা, এবং দিনের অনুষ্ঠানটি হইতেছে দুগ্ধে গুড়ের সহিত নূতন চাউল রান্না করিয়া বিশ্বেশ্বরকে উৎসর্গ করা। পঙ্গলের দ্বিতীয় দিনে গোমহিষাদি স্নাত, ও পূজিত হয় এবং অনেক গ্রামের ষণ্ড লইয়া ক্রীড়া আমোদ হয়। তামিল বৎসর আরম্ভ এই পঙ্গল উৎসবে। কৃষির গৌরবকে আশ্রয় করিয়া এই আনন্দ-দিন হইতে কৃষকের বৎসর-সূচনা। তামিল পূজা অনুষ্ঠানে সেরূপ পারম্পর্য্য লক্ষিত হয় না, শুধু শস্য সঞ্চয়ের সময় যাবী আম্মার বিপুল সমারোহে পূজা গ্রামে গ্রামে হইয়া থাকে।

বসন্তের প্রথম সংস্পর্শে যখন দক্ষিণ বায়ু নব আম্র মুকুল গন্ধভার বাহী, যখন যবশস্য নবীন সবুজ, বনে বনে নবঘন শ্যামলতার ঢেউ খেলিয়া বেড়াইতেছে তখন সরস্বতী বোধন প্রকৃতির পুনরুত্থানের হর্ষগীতি ও

সৌন্দর্য্য চারু শিল্পকলা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী ভারতীর পূজা। পঞ্জাবে লোকেরা তখন হরিদ্রা ও সবুজ রঙের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং বন্ধু বান্ধবের সহিত ভোজন আলাপে সন্ধ্যা কাটায়—গোড়ী উৎসবের আমোদ প্রমোদ বাস্তবিকই প্রকৃতির নূতন জীবনের সুরে আত্মহারা। পূর্ণ বসন্তের পূর্ণিমা রজনীতে যখন ধরণী ভাববিহ্বল, যখন অশোক কর্ণিকার বনে বনে রক্তরাগের ঢেউ তুলিয়াছে পশুপক্ষীর অন্তরে আবেগের বিলাসাতিশয্য তখন কৃষির বিরামের পর হোলি উৎসবে উৎসবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চত্য জগতের Saturnalia মত হোলি উৎসব প্রকৃতির সেই আদ্যা পুনরুত্থান শক্তির উদ্বোধন। মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরের বাসনা তখন রক্তিম হইয়া ফাগুণের দোল খেলার ফাগ বৃষ্টিতে ঘাটে বাটে ঘরে প্রাঙ্গনে আপনার পরিচয় দিতেছে।

ষড়ঋতুর শোভাযাত্রা, গ্রহতারকা রবিচন্দ্রের আকাশ পথে পৌনঃপুনিক বিবর্ত্তনের সহিত হিন্দুর আমোদ উৎসব একটা নিবিড় সংযোগ রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের বিচিত্র ভাব ও কল্পনায় অনুপ্রাণিত, এই সব বাৎসরিক পূজা পার্ব্বণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবতাকে আরাধনা করা হয়, এবং একই স্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট পূজা বা অনুষ্ঠানের একটা লৌকিক আর একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এটা ঠিক মানুষ এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সেই বারুণী অর্দ্ধোদয়, চূড়ামণিযোগ, চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ বা পূর্ণিমা গঙ্গাস্নানে, অমাবস্যার মাসিক বাৎসরিক ব্রত অনুষ্ঠানে এবং পূজা উৎসবে বার মাসের তের পর্ব্বণে এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির ঘূর্ণায়মান ব্রহ্মাণ্ড-স্রোত ও ষড়ঋতুর চিরন্তনী লীলার সহিত একটা নিবিড় সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে।

আর এই বিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির মধ্যে যিনি লীলাময় তাঁহাকে ভারতবর্ষ অ-মানুষ অপ্রাকৃত ভাবে দেখিয়াছে।

গ্রীক কল্পনা দেব দেবীগণকে মানুষের ছাঁদে গড়িয়াছিল; মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্ম-জীবনের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার প্রতীক, ঋতু পরিবর্ত্তনের বিচিত্র ছবি হইতেই গ্রীক শিল্প তাহার পূর্ণ বিকাশের সময় রঙ্ বা সৌন্দর্য্যের মাল মসলা গ্রহণ করে নাই। গ্রীক শিল্প ও পুরাণ মানুষের মধ্যেই অসীমের সন্ধান করিয়াছে। গ্রীসে ঝরণা, বা নদী, মাঠ অথবা কুঞ্জের nymph অথবা বধূগণ গোড়া হইতেই একেবারে মানবীয় এবং ঘর ও পরিবার জীবনের সহিত তাহাদিগের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রকৃতিকে গ্রীক কল্পনা সজীব ও জীবন্ত ভাবে অনুভব করিয়াছে এটা ঠিক। কিন্তু তাহা মানবীয় কল্পনা হিন্দুর কল্পনার মত অপ্রাকৃত নহে। গ্রীকের কল্পনা ও ভাবপ্রবণতা আছে কিন্তু তাহার কেন্দ্র মানুষ ও মানুষের ভাব ও আদর্শ, হিন্দুর কল্পনা মানুষকে প্রকৃতি ও অপ্রাকৃতের ক্রোড়ে রাখিয়াছে। গ্রীসের Horai অথবা ঋতুর দেবতা প্রকৃতির বিবর্ত্তনের সঙ্গে নব নব রূপ ধারণ করে না, তাহারা স্বাধীন তাহারা কাল্পনিক নৃত্যগীতশীল সদাই Gracesদিগের সহচর। এই ঋতুর দেবতা সমূহের সহিত আমাদের ষড় ঋতু পরিবর্ত্তন অনুসারে বিচিত্র নিত্যনব প্রকৃতি পূজার আকাশ পাতাল প্রভেদ। প্রকৃতির ঋতুরূপ ফুল ফল গাছ পালার সঙ্গে নিবিড় সংযোগ আমরা লোকালয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের আমোদোৎসবের মধ্যে সঞ্জীবিত রাখিয়াছি। আমাদের মাঙ্গলিক সমুদায়ই একটা আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বোধ ও প্রকৃতির অনুভূতির সাক্ষ্য দিতেছে। চন্দন ও সিন্দুরে চর্চ্চিত মঙ্গল কলসটির উপর মুকুল সম্বলিত আম্র-শাখা ও ক্ষীণকটি কদলী বৃক্ষটি রাখা হয় এবং বেল ও নারিকেল কত না শুভ ফলের দ্যোতনা করে, স্ফুটনোন্মুখ নারীত্বের যৌবন গরিমার নিদর্শন সিন্দুর সধবার চিহ্ন এবং প্রসাধন বিলাস উপকরণ চন্দন কুঙ্কুম অলক্ত কস্তুরি পান সুপারি সবই আমাদের মাঙ্গলিক। শুভ শঙ্খ বলয় সিন্দুর ও স্বর্ণ সম্বলিত সিন্দুর চুপ্‌ড়িটী গৃহলক্ষ্মীর পূজার মাঙ্গলিক এবং পূজার ঘরের সম্মুখে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ তণ্ডুল হরিদ্রা চূণে কত না লতাপাতা, পদ্ম, মাছ, আলপনা দেয়। দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই প্রদেশে, মালাবারে এবং তামিল প্রদেশে গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথটি

বাঙ্গালীকে অত্যন্ত দ্বিধাভরে অতিক্রম করিতে হয়, কারণ নারীর এমন নিপুণ হস্তে রাস্তার উপর শাদা, লাল ও হলুদে রঙের সরল ও চক্র রেখার সমাবেশ, পদ্ম, লতা-পাতার বৃত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে যে তাহাদেরকে অবমাননা করিতে ইচ্ছা যায় না। মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালোরের অথবা গ্রামের প্যারিচারী পঞ্চমদিগের বাসস্থানেও আমি প্রায়ই এইরূপ গোময় প্রলেপ ও সুন্দর কারুকলা কৌশলে আলিপনা দেওয়া দেখিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্যের অতি অপরিচ্ছিন্ন ঘরের বাহিরে একটা সৌন্দর্য্য বোধের উদ্দীপনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

কেবল দৈনিক উৎসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত নহে, মানুষের জীবন ও তাহার পরিণতির সুন্দর প্রতীক এইরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্যামায়মান সমতল ভূমির বট কিম্বা অশ্বত্থ ত একটা গাছ মাত্র নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আবার কত নবীন বংশধর জড়াইয়া রহিয়াছে অতীতের সাক্ষ্য তাহারা কয়েক পুরুষের গাছবংশ, তাহাদের সুশীতল ক্রোড়ে মাস মাস বৎসর বৎসর, পঞ্চায়েৎ গ্রামের সুখ দুঃখের আলোচনা এবং বালকগণ ক্রীড়া কৌতুক করিয়া আসিয়াছে, মানুষের ভাগ্যের উপর তাহাদের কি স্নেহ করুণ ছায়াস্পর্শ; পর্ব্বতের বাত্যাহত চির নবীনদেবদারুগুলা পর্ব্বতের মতনই কষ্ট সহিষ্ণু, সাগরবেলায় তমালতালী যাহারা প্রতিনিয়ত নির্ম্মল ঊষার প্রথম সূর্য্যরশ্মির ও প্রতি সন্ধ্যার করুণ সূর্য্যাস্তের সহিত পরিচয় পায় ইহারা সবই আমাদের চিত্রকলা আমাদের গৃহ-সজ্জা, আমাদের লোক সাহিত্যে আদরের স্থান পাইয়া লোক চৈতন্যের উপর প্রকৃতির প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। আবার শুধু এই জগতের মানুষের সুখ দুঃখের সংকীর্ণ গণ্ডী অথবা প্রকৃতির বিচিত্র রূপের মধ্যে আবদ্ধ নহে। হিন্দুর কল্পনা এই বাহিরের সাধারণ জিনিষ, দৈনিক সচরাচর যাহা দেখি বা শুনি তাহাদেরকে আশ্রয় করিয়া একটা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের রহস্যরাজ্য ও তুরীয় রসানুভূতির নিগূঢ় মাধুরী অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছে।

তাহা ছাড়া শঙ্খের আবর্ত্ত চিহ্নটি (spiral) ক্রমারোহণের প্রতীক হইয়া খুব আদরের হইয়াছে—। বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই spiral গতিকে জৈবিক ও মানবীয় বিবর্ত্তনের ধারা বলিয়া স্বীকার করিতেছে। হিন্দুর যোগমার্গে জীবের ঊর্দ্ধ গতির ব্যাখ্যা শঙ্খের আবর্ত্তকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছিল।

সাগরবেলায় নিক্ষিপ্ত শশিশুভ্রশঙ্খ যুদ্ধে রথী মহারথীর হস্তে ভীষণ নিনাদে পূর্ব্বে ধরাতল প্রকম্পিত করিত, কিন্তু এখন রমণীর ওষ্ঠস্পর্শে তাহার কোমল মধুর ধ্বনি যতদুর শুনা যায় ততদুর লক্ষ্মীদেবী অচলা হইয়া অবস্থান করেন। শঙ্খচূড় বিনাশের আখ্যায়িকার সহিত জড়িত হইয়া এই শঙ্খ দেবতাদির পূজায় অতি পবিত্র পদার্থ বলিয়া বিজ্ঞাত, এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সমুদায়ে শোভন শঙ্খের মধুর ধ্বনি গৃহলক্ষ্মীর যাহা কিছু পবিত্র, শুভ ও আনন্দদায়ক, তাহাই প্রকাশ করে। শুধু তাই নহে, রূপকের মধ্য দিয়া এই সমুদ্র জীবের জীর্ণ কঙ্কালের শব্দস্ফুরণে সঞ্জীবন সেই শব্দময় ব্রহ্মোরস্ফুরণে প্রতীক গড়িয়া থাকে। জড় প্রকৃতির জাগরণে শ্যামলা ধরণীর গাত্রে চিরশ্যামল ও চিরজীবী দূর্ব্বা ধরণীর আশীর্ব্বাদ দানরূপে সকল শুভকর্ম্মের মাঙ্গলিক নিদর্শন এবং প্রাণরক্ষক ধান্য খই আলোচাল এবং শাদা শরিষা শাকম্ভরীর উৎপাদিকা শক্তিরূপে বিবাহানুষ্ঠানের আশু ফল সম্ভাবনায় সকল অবয়বেই ব্যবহৃত হয় ভূমিমাতা বা সাগর লক্ষ্মীর যাহা দান তাহাই মানবের ভাব, আদর্শ বা ভাগ্যের সহিত একটা মিলন স্থাপন করিয়া আমাদের জীবনের সহিত একটা নিবিড়তর পরিচয় স্থাপন করে। লতাপাতা গাছপালার সহিত নিবিড় সংস্পর্শ আমরা আমাদের গৃহকর্ম্মে, পূজা পদ্ধতিতে রাখিয়াছি। শারদীয়া দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা স্থাপন ও পূজা সর্ব্বপ্রারম্ভেই হয়।

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ
বিল্বাশকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা।

প্রত্যেক বৃক্ষ বা লতা দেবীর কোন লীলার সঙ্গে জড়িত বা মহাদেবের অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রতীক হইয়া

তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নবপত্রিকাবাসিনী দুর্গা নামে পূজা হইয়া থাকে। যেমন—

ওঁ কদলী তরু সংস্থাসি বিষ্ণো বক্ষঃস্থলাশ্রিয়ে
নমস্তে নবপত্রি ত্বং নমস্তে চণ্ডনায়িকা ॥
ওঁ হরিদ্রে রুদ্ররূপাসি শঙ্করস্য সদা প্রিয়ে
রুদ্ররূপেন দেবি ত্বং সর্ব্বশান্তিঃ প্রযচ্ছমে ॥

নবরাত্রের ব্রত উৎসব ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রচলিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এটা শারদীয়া প্রকৃতির উৎসব। প্রাচীনকাল হইতেই শরৎকালের প্রারম্ভে একটা সর্ব্বপ্রদেশব্যাপী উৎসব হইত। ব্রাহ্মণগণের পাঠ অধ্যাপনা বর্ষার সময় স্থগিত থাকিত। বৌদ্ধেরা আপনাদিগের বিহারের বাহিরে যাইতেন না। রাজন্যবর্গ দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইতেন না। এমন কি নারায়ণ পর্য্যন্ত এই সময়ে শুইয়া থাকেন। কাজেই শারদাগমের উৎসবের বিপুল সমারোহ। সে আনন্দ সে সমারোহ বাল্মীকির রামায়ণে পর্য্যন্ত প্রতিফলিত রহিয়াছে। তাই এখনও দক্ষিণে ঘটের উপর ধান্যশীর্ষ রাখিয়া নবরাত্রের উৎসবে লোক ভগবতীকে অর্চ্চনা করে, উত্তরে যব ও গোধূমের শীর্ষসহ মহালক্ষ্মীর পূজা করা হয়। রাজপুতানায় নবরাত্রের সময় গৌরীর নিকট উৎসর্গীকৃত যবের শির্ষ স্ত্রীলোকেরা সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব স্বামী পুত্রকে দান করে এবং তাহারা তাহা পাগড়ীতে গুঁজিয়া রাখে। পশ্চিম ভারতে এই সময় কোকণী ভাড়বল রমণীরা দম্পতীকে দাঁড় করাইয়া তাহাদের করঙ্গাকে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করে। কায়স্থেরা অঙ্গবরণ করে। আত্মীয়জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরস্পরে শাঁইপাতা দেয় ও কোলাকুলি করে এবং যাবতীয় অস্ত্র শস্ত্র লেখনী পুস্তককে পূজা করে। রমণীগণ পরে ফুলের মালা করিয়া গীত সুরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে গৌরী ও ঈশ্বর প্রতিমার উভয় পার্শ্বে চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে শোভাযাত্রায় বাহির হয়। বাঙ্গালা দেশে নবপত্রিকা পূজা সেই শারদীয় উৎসবের প্রধান অঙ্গ ও পরিচয়। এই কলাবৌ পূজা খুব প্রাচীন, দশভূজা মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা নিতান্ত আধুনিক। শরৎকালে কলাপাতা, দাড়িম গাছের পাতা, ধান্য, হলুদ গাছের পাতা, মানপাতা, বেলগাছের পাতা, জয়ন্তী গাছের পাতা, সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি হয়, বসন্তে এদের কোন বাহারই নাই। প্রত্যেক বৃক্ষ বা লতার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তাহার কোন না কোন সংযোগ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন আমাদের ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে বৃক্ষাভিমানিনী দেবতা, পর্ব্বতমানিনী দেবতার উল্লেখ আছে। দেবতা গাছ বা পর্ব্বত বলিয়া আপনাকে মনে করেন। তাহার পর, দেবতা হইলেন গাছের অধিষ্ঠাত্রী, যেমন এই সকল নব পত্রিকার দেবতা। নব পত্রিকার প্রথম গাছ কলা গাছ, ঠিক যেন তম্বঙ্গী, আবার অনেক কলাগাছ গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত লালে লাল,—তাই তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী।

দাড়িম গাছের ফুল দেখিলেই তাহার অধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা কেন হইল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। হলুদ গাছের অধিষ্ঠাত্রী উমা,—যাঁর রং ঠিক কাঁচা হলুদের মত। মানকচুর পাতার সহিত তাহার অধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা দেবীর লেলিহান জিহ্বার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। বেলগাছ শিবের অতি প্রিয়, তাই বেলগাছের অধিষ্ঠাত্রী হইলেন শিবাণী। অশোকের অধিষ্ঠাত্রী শোক রহিতা। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী কার্ত্তিকী, কারণ কার্ত্তিক হইতেই জয় বিজয়। এই নয়টি গাছকে কলার খোলায় মুড়িয়া বাঙালীর কল্পনা ও ভাবুকতা এই নব পত্রিকার সঙ্গে আর একটি লতা আদরে বরণ করিয়াছে,—ইহার নাম অপরাজিতা; অপরাজিতার ফুল সেই নীল নব ঘন বরণী কালিকার মত, এবং অপরাজিতা নামটাও দুর্গার একটি বিভূতিকে প্রকাশ করে। তাই নব পত্রিকায় সন্তুষ্ট না হইয়া বাঙালী কলাবৌকে সাধ করিয়া অপরাজিতার ভূষণ পরাইয়া দেয়।

(ক্রমশঃ)

সম্পাদক।

ভালবাসার দান।

সাত পাঁচ কথা কহিয়া গান গাহিয়া বৈষ্ণবী চলিয়া যায়, আর খোকা 'আয়, আয়, গান আয়' বলিয়া একটা ছোট প্রাণের একটু ছোট নিঃশ্বাস ছাড়ে।

মা খোকার পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া খোকাকে লইয়া চুপ করিয়া শুইবার ঘরের গদিতে বসিয়া পড়ে।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন বৈষ্ণবী খোকাদের বাড়ী আসিল। খোকার আর খোকার মা'র হৃদয়টুকু একেবারে অধিকার করিয়া লইয়া গেল।

খোকার মা সন্ধ্যার প্রদীপ দেখাইতে অন্ধ বুড়ী শাশুরি ঘরে গেল। বলিল,—হ্যাঁগা মা, উনি ত কল্‌কাতা থেকে লিখ্‌ছেনই, খোকাকে নিয়ে বেড়াবার একটা মানুষ রাখিবার জন্ত; তুমি ও ব'লে থাক, তা' মা বলি, একটি ভাল মেয়ে পাইলে রাখিবনা কেন?

বউ শাশুড়ির কাছে বড় আশা লইয়া কথাটি পাড়িল। শাশুড়ি বৌ'য়ের আশা পূর্ণ করিতে বলিলেন।

অন্যদিনের মত আজ ও দুপুরে বৈষ্ণবী শোয়ার ঘরের দাওয়ার আসিয়া বসিল। অন্যদিনের ন্যায় আজ ও গান গাহিতে লাগিল। খোকার মা বৈষ্ণবীর ডানদিকে আর খোকা বৈষ্ণবীর কোলটিতে বসিয়া গান শুনিতে লাগিল।

একখানি করিয়া গান ভাঙে, আর তাহাদের একটু থামিয়া গল্প হয়। আজ প্রথম গানখানি শেষ হইলে খোকার মা বলিল,—সত্যি বল্‌তে কি দিদি, তুমি আমার পূর্বজন্মের মা'র পেটের বোন্‌। কই এতদিন ত' এখানে আছি, পাড়াঘরের লোকে ত' খোকাকে, আমাকে লইয়া এত আদর করে না!

বৈষ্ণবী দুই পা ছড়াইয়া দিয়া খোকাকে তাহার উপর দাঁড় করাইয়া, খোকার হাত দুইখানি ধরিয়া দোলাইয়া খোকাকে হাসাইয়া ও আপনি হাসিয়া বলিল,—হ্যাঁরে খোকা, তোর মা বলে কি রে? আমি নাকি তাকে, তোর মাকে খুব আদর করি। এটা সেটা পানটা মশলাটার খুব শ্রাদ্ধ ক'রে তোদের খুব আদর করি, নয় রে।

খোকা তাহার ঘুঙুর দেওয়া মল খুব খানিক বাজাইয়া ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিল,—ডিডি, গান—গান—

বৈষ্ণবী তখনই পা গুটাইয়া খোকাকে কোলে টানিয়া গান ধরিল।

এবার গান ভাঙিলে খোকার মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—দিদি, তোমাকে একটা কথা বলিব, যদি তুমি শোন।

বৈষ্ণবী খোকাকে বুকের উপর রাখিয়া খোকার মার দিকে তাকাইয়া চাপা হাসিটুকু আর রাখিতে পারিল না।

খোকার মা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—না, দিদি, যদি তুমি কিছু মনে কর, তাই বলি বলি করিয়া বলিতে পারিতেছি না। বল্‌ছিলাম,—তুমি ত' বলেছ, তুমি সম্প্রতি ভিখ্‌ লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াও। তোমার স্বামী তীর্থ করিতে গিয়াছেন, তুমি এখানে গঙ্গাতীর করতে এসেছ, পরের বাড়ীতেই থাক বলেছ—তা হ্যাঁগা, তোমার এখানে খোকার বাড়ীতে কিছুদিন থাক না কেন!

খোকার বুকে মাথা রাখিয়া বৈষ্ণবী বলিল,—খোকা, তোর মা ত' আমাকে তোমার বাড়ী নেমন্তন করলে, তুমি ত আমাকে তাড়াইয়া দেবে না, খোকা?

বৈষ্ণবী যখন মাথা তুলিল, তাহার মুখের হাসিটুকু, যদি কেহ তখন বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিত, একটু গম্ভীর বলিয়া বোধ হইত।

বৈষ্ণবী তখনই তাহার সরলভাব পা ঢালিয়া বলিল,—আচ্ছা দিদি, এখানে এখন মাস খানেক থাকিব, খোকার বাড়ীতেই থাকিব।

* * * * *

আজ এই দিন দশেকের মধ্যেই খোকা তা'র মা'র সঙ্গে 'দিদি সম্পর্ক পাতাইয়াছে। বৈষ্ণবী এখন খোকার 'মা' হইয়া বসিয়াছে। খোকার মত আব্দার এখন বৈষ্ণবীরই উপর। খোকার মা'র চুল-বাঁধা আগেকার মত একদিনেরটা এখন দুই চারদিন চলে না। একদিনের সিঁথির সিন্দুর এখন দুই দিন যায় না।

বৈকালে খোকার মা হাসিতে হাসিতে বৈষ্ণবীর কাছে আসিয়া বলিল,—দিদি আজ, আজ চিঠি এল, খোকার বাবা চারদিনের বন্ধে বাড়ী আস্‌ছেন। ভালই হ'ল, তোমার মত মানুষ দেখে তিনি খুব আহ্লাদ করবেন।

বৈষ্ণবী ধীরভাবে বলিল,—কখন্ খোকার বাবা বাড়ী এসে পৌঁছাবেন।

খোকার মা বলিল,—আজ এই ৫টার সময় তিনি বাড়ী এসে পৌঁছাবেন। এখন ৩টা। দু' ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন এখন।

বৈষ্ণবী চকিতে আকাশের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল,—দিদি, তোমার কাছে যে বাজুখানি রেখেছি তাহা খোকাকে আজ পরাইয়া দাও। আমি ওখানি খোকাকে দিলাম।

খোকার মা হাসিতে হাসিতে বলিল,—নাও, দিদি হয়েছে। উনি তোমার ব্যবহার দেখে তোমাকে অমনিতেই খুব ভাল বল্‌বেন। তোমার সোণাটুকু তোমারই থাক্।

বৈষ্ণবী নিজে যাইয়া বাক্স হইতে বাজু আনিয়া খোকার হাতে পরাইয়া দিল। বলিল, আমার সোণা আমার সোনামনিরই থাকিল।

খোকা মিনিটের মধ্যে বাজুখানিকে বেশ করিয়া মুখের লালে স্নান করাইয়া দিল।

বৈষ্ণবী বাঁ হাতে খোকাকে কোলে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া, ডান হাত দিয়া খোকার মা'র হাত ধরিয়া বলিল,— দিদি, ও পাড়ার দত্তদের এক ঝি, আমাদের দেশেই বাড়ী, এই একটু আগে আমাকে খবর দিয়ে গেল— দেশে আমার মা বড় কাহিল। আমি এখনই রওনা হই, আমাকে যাইতে অনুমতি দাও। মা ভাল যদি হ'ন, তবেই এখানে এসে আবার থাক্‌ব। খোকাকে, খোকার বাবাকে, তোমাকে আবার দেখ্‌ব। নতুবা আমার দর্শন আর পৃথিবীতে পা'বে না!

* * *

৫টার সময় খোকার বাবা বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, খোকার, খোকার মা'র চোখ মুখ ভারি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া উঠার মত।

খোকার মা ভাঙা ভাঙা গলায় বৈষ্ণবীর কথা আগা গোড়া স্বামীর কাছে বলিল। তাহার অকৃত্রিম ভালবাসার দান খোকার হাতের বাজুখানি পরে কাঁদিতে কাঁদিতে দেখাইল।

দেখিয়াই খোকার বাবা যেন কেমনতর হইয়া গেলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ দৃষ্টিতে খোকার মা'র মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—হ্যাঁ গা, শুনছ গা। যা'বার সময় বৈষ্ণবী কিছু বলে গেল না? এখানে আসার কথা আর কিছু বল্‌লে না?

খোকার মা বলিল,—ওগো, আসার কথা বলে গেল— যদি তা'র মা ভাল হয় তবেই—আস্‌বে। নতুবা তা'র দর্শন আর পৃথিবীতে পাওয়া যা'বে না।

খোকার বাবা আর থাকিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ওগো, শেষের কথাই ঠিক। তা'র শেষের কথাই ঠিক।—তা'র দর্শন আর এ পৃথিবীতে পাওয়া যা'বে না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আর তা'র সংবাদ দিতে পার্‌বে না। রাণি! আমি জীবনের অতীত ইতিহাস একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ ভাব্‌ব। আজ জীবনের অতীত কাহিনী সমস্ত এক মুহূর্ত্তে ভাব্‌ব।—

রাণি! আমি যখন এই সাধের কল্যাণপুর গ্রাম থেকে কল্‌কাতায় চাকরী করতে গেলাম, তখন আমার বয়স ২২ কি ২৩। কল্‌কাতায় আমার মেসের সঙ্গী জুটিল—এক জোচ্চর, এক বদ্‌মায়েস, এক মাতাল, এক জালিয়াৎ। রাণি! অদৃষ্টের পরিহাস! আমি তাহাদের স্রোতে ভাসিয়া গেলাম। আমি জোচ্চোর হ'লেম, আমি বদ্‌মায়েস হ'লেম, আমি মাতাল হ'লেম, আমি জালিয়াৎ

হ'লেম। বাড়ীতে আমার মা,—আশ্চার্য্য হ'য়ো না, আর তোমার ওই বৈষ্ণবী—আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—আমার প্রথম স্ত্রী। আর তা'র কোলে আমার বড় আদরের খোকা, সোনামনি। রাণি। কাঁদ্‌ব না—হৃদয় কঠিন ক'রে বজ্রের স্বরে ব'লে যা'ব। কাঁদ্‌তে গেলে ইতিহাস এক মুহূর্ত্তে কেন—জীবনের সমস্ত দিনেও বল্‌তে পার্‌ব না। রাণি, বাড়ীতে চাকরীর টাকা পাঠান দূরে থাক্—বাড়ীতে এসে মাঝে মাঝে স্ত্রীর কাছ হ'তে জোর জবরদস্তি ক'রে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যেতাম। স্ত্রীর কাছ হ'তে টাকা—অর্থাৎ তা'র কাপড়, গহনা বিক্রীর টাকা। আর বাড়ীর বাক্স বাসন বিক্রীর টাকা। রাণি। ওই বৈষ্ণবী এই মাতালের হাত ধ'রে কতদিন কত কাকুতি মিনতি ক'রে সুপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। আমি তখন পূর্ণমাত্রায় মাতাল—দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-হারা। কোমলা অবলা বালিকা ত কোন্ ছার। এ গাঁয়ে তখন আমাকে সুপথে ফেরাবার মত কোন দুর্দ্দান্ত লোকই ছিলেন না। স্ত্রীর হাত ছিনাইয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে ফেলিয়া টাকা কড়ি গুছাইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতাম। আমার কঠোর তাড়নায় যাবতীয় গহনা, যাবতীয় বাড়ীর আস্‌বাব বিক্রয় করিয়া স্ত্রী আমাকে সমস্ত টাকা দিত। খোকা সুপথ্যের অভাবে মারা গেল। স্ত্রী আমার সব সয়েছিল। কিন্তু যেদিন স্বর্গগত খোকার সেই 'সোণামণি' নাম লেখা বাক্সর উপর আমার নজর পড়িল, সেদিন সে বাক্সখানি বুকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল ;—ওগো, আমি এ বাক্স কিছুতেই দেবো না। যতদিন তুমি লক্ষ্মীছাড়া থাকিবে, ততদিন এ বাক্স কিছুতেই পা'বে না। আমি নেশার ঝোঁকে তাহাকে লাথি মারিয়া চির জন্মের মত তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলাম। পরদিনই আবার কল্‌কাতা চলে গেলাম। দেখিলাম, আফিসে আর আমার চাকরী নেই। এ মাতাল বদ্‌মায়েসকে কোমল প্রাণা স্ত্রী ছাড়া অন্য কেহ জায়গা দেবে কেন, রাণি। আমার আফিসের টাকা গেল। বাড়ীর টাকার দফাও ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমার বন্ধুরা—কোথায় তখন তা'রা। আমার চক্ষু ফুটিল। আমার সর্ব্বনাশ আমি তখন বুঝিলাম। সম্পত্তি নাশে আমি টলিলাম না। স্ত্রী, পুত্র হারা হইয়া আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা, রাণি। এখন।—এখন দেখ, আমি ধীর, শিষ্ট যুবক। কলিকাতায় উচ্চ রাজকার্য্য করিতেছি। লক্ষ্মীছাড়া ঘরে তিন বৎসর হইল তোমাকে নব লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এখন নূতন 'সোনামনি' পাইয়াছি। তাই রাণি। বৈষ্ণবী এতদিন গোপনে যে জিনিষ বুকে ধরিয়া রক্ষা করিয়াছে তাহা আজ লক্ষ্মীর ঘরে দিয়া চলিয়া গেল।

অমন যে ঘন দুধটুকু খোকাকে কখন খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, খোকা তাহা না খাইয়া তাহা চ'খের জলে একেবারে জল করিয়া বিজয়ার করুণ সানাই বাঁশীর সুরে ধোঁকাইতে ধোঁকাইতে চমকিয়া বলিয়া উঠিল,—আয় মা আয়। আয়, আয়, গান, মা, আয়।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভাই-ফোঁটা।"

ভাই-বোনের এই মিলন দিনে, বুক ভেঙে আজ কান্না আসে

তুমি কেন রইলে দিদি ভুলে

তোমার সাধের সোণার তরী কোন সাধনার পুণ্যে ভরি'

ভিড়ালে আজ কোন্ সাগরের কূলে ?

ভুলের দেশে রইলে ভুলে, দেখ স্মৃতির পর্দ্দা খুলে

আজ যে তোমার আশীর্ব্বাদের দিন

ভুল ভেঙে দাও ভুল ভেঙে দাও' সজাগ হয়ে ওঠো বেঁচে

রইলে তুমি কোন সাধনায় লীন ?

যাবার বেলা মাকে ডেকে, পথের দিকে তাকিয়ে থেকে

বুক ভাসালে রক্ত আঁখির জলে

অভিমানে তাই কি শেষে, রইলে দিদি নিরুদ্দেশে

এমনি করে সকল ভুলে র'লে ?

বুক চিরে মা ডাক্‌ছে তোমায়, সাধ্য কি তাঁর কান্না থামায়

সে ডাক শুনে পাষাণ গলে যায়,

দশটী দিনও যায়নি দিদি, কেমন করে এমন হলে

ভুলে গেলে কাঙালিনী মায় ?

আজ যে শুধু মনের উপর আঘাত করে তোমার হাসি

মোদের দুখে তোমার চোখে জল

মনে প্রাণে কেবল কাঁদি, তোমার কথাই দিন যামিনী

বসে বসে বক্‌ছি অনর্গল

তোমার অতি ছোট্ট কাজে দেখ্‌ছি, তোমার, ছোট্ট কথাও

অবিরত শুনছি যেন কানে

তোমায় কবে কি বলেছি, সেই কথাটি সজাগ হয়ে

কাঁটার মত বিঁধ্‌ছে আমার প্রাণে

বুক দিয়ে যে আড়াল করে' দু'হাত দিয়ে আগ্‌লে ছিলে
যোদের সকল দুঃখ বিপদ হ'তে
পথের কাঁটা সরিয়ে নিতে, চরণ-চিহ্ন রেখে গেছ
ধূলায় ভরা মোদের জীবন-পথে
মোদের শুষ্ক আনন দেখে, সংগোপনে খুঁজতে তুমি
কিসের দুঃখ কিসেরি বা ব্যথা
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নিতে ব্যথায় ভরা নয়নের জল
ঘুচিয়ে দিতে প্রাণের কাতরতা।
মায়ের দুঃখ নয়নের জল, বুকে তোমার রইল জমা
কাঁদলে মনে সারাজীবন ধরে'
শতেক সুখে সুখী ছিলে আমরা মোদের বিষের জ্বালায়
হৃদয় তোমার রেখেছিনু ভরে!

মনের আগুণ চিরদিনই মনের মাঝে কালি করে'
বাইরে তুমি চির উজল ছিলে
অকথিত অনেক কথাই আজকে যেন প্রাণে প্রাণে
অভাব মাঝে প্রকাশ করে দিলে
যে দিকে চাই সেই দিকে যে, তোমার স্মৃতি সজাগ হয়ে
দিচ্ছে বুকে হানা
একটী কথা চাপ্‌তে গিয়ে জোয়ার আসে হাজার কথার
কর্ব্বে কে তার মানা?—
কুলুঙ্গিতে তোমার গীতা, উপনিষদ্ বাঁধাই আছে
ক'দিনেতেই আবর্জ্জনা তা'তে
মহাভারত বন্ধ ছিল খুলেই দেখি পূজার ফুলে
চিহ্ন দেওয়া তোমার আপন হাতে
মেজের গড়ায় পঞ্চপাত্র শূণ্য পড়ে ফুলের সাজি
ঠাকুরঘরের বারান্দাটার কাছে
সন্ধ্যা করার সাড়ীখানি আলনাতে আজ তেমনি তোলা
জপের মালা ওই টাঙান আছে।

গুরুগীতার পাতায় পাতায়, তোমার হাতের দাগ পড়েছে
খুলতে গিয়ে চক্ষে আসে জল
তুমিই শুধু গেছ দিদি রইল পড়ে তোমার সবই
স্মৃতির মাঝে ব্যথায় ছবল।

হ্যাগো,—আলতা পায়ে সবাই পবে, এমন রাঙা দেখিনি ত
তোমার পায়ে এতই সুশোভন
সিঁথির সিঁদুর জলত যেন, যজ্ঞহোমেব অনল শিখা
সতীর তেজে দীপ্ত চিরন্তন।
কেমন করে ভুলব দিদি, তুমি যে গো ছড়িয়ে আছ
ভিতর বাহিব সমান করে যেন
তুমি ছাড়া নাহিক কিছু, তবু এমন কঠিন হ'লে
এমন দিনেও বইলে ভুলে কেন?

ভা'র কপালে দেবে ফোটা, ভাই হবে যে সোণাব ভাঁটা
যমেব দ্বারে তুমিই কাঁটা দেবে।
জীবন ভবে' ভাবলে যাদেব, তাদেব মনে পড়ছে নাকি
ভাই ফোঁটা' আজ সেই কথাটী ভেবে?

সকাল বেলা তোমার মুখে স্তোত্র শুনে মনে হতে
আদিম কালেব আশ্রমেতে আছি
তীর্থস্নানের মন্দাকিনী কল্‌কলিয়ে উছলে পড়ে
এখনও যে প্রাণেব কাছাকাছি।
তোমার সুরে সুর মিলায়ে, সবাই যখন চল্‌ত গেয়ে
অসাড় দেহ শিউরে যেত কিসে
আজকে গানের স্মৃতি শুধু প্রাণের মাঝে বেতাল নেচে
চোখের জলে হারায সকল দিশে।

বুকের শোণিত ঢেলে ঢেলে যে ফল তোমার ফল্‌ল গাছে
ঝড় বাদলে সমান পহর দিয়ে
হারিয়ে যাওয়ার ভয়ের মাঝে বিপর্য্যয়ের অন্ধকারে
রক্ষী বিহীন করলে কোথায় গিয়ে!

নখের আঁচড় দাওনি যেতে আজকে তারা বৃন্ত বিহীন
ধুলায় পড়ে যাচ্ছে গড়াগড়ি
তোমার হাতে গুছিয়ে রাখা, ভাল মন্দ ঘরের জিনিস
অযতনে হচ্ছে ছড়াছড়ি।

দেশ জুড়ে যে সকল বোনের মুখভরা আজ হাসির রাশি
ভাই বলে আজ কতই আয়োজন
ভাই বোনের আজ মিলন দিনে অভাগ্য তাই আজকে আমার
জেগে ওঠার নাইক প্রয়োজন।

চোখ দু'টো আজ উদাস হয়ে আকাশ পানে চেয়েই আছে
কাঁপিয়ে দেহ বাতাস বয়ে যায়,
প্রাণের কাঁদন বুকের মাঝে পাথর হয়ে বাচ্চে জমে
মনটারে আজ প্রবোধ দেওয়া দায়।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

ভাববার কথা

আমরা কি খুব সাত্ত্বিক?

Herbert Spencer এর একটী বড় মূল্যবান উক্তি হচ্ছে 'To be a good animal is the first requisite to success in life and to be a nation of good animals is the first condition of national prosperity অর্থাৎ সংসারে জীবন ব্যাপারে কৃতকার্য্য হতে গেলে মানুষকে সুস্থকায় জন্তু হতে হবে আর সমগ্র জাতীর উন্নতি করতে হলে ভাল সুস্থকায় জন্তুর সঙ্ঘ হতে হবে। কিন্তু এর তাৎপর্য্যটা এই মানুষ ১২আনা পশুধর্ম্মী, ৪আনা দেবধর্ম্মী, বলো আর যা বলো। মানুষের দেহ ব্যাপারে তাকে পশুর মত চলতে হয় এবং থাকতে গেলে তাকে পশুরই মত জীবনযুদ্ধে লড়াই করে অস্তিত্বের অনুকূল সুবিধা সুযোগ গড়ে তুলতে হয়। মানুষের মধ্যে একটা অশরীরী আত্মা স্বতন্ত্র ভাবে আছে কিনা জানিনি, আর নিজের উন্নতির জন্য এই দুর্জ্ঞেয় বস্তুটির সাধ্য সাধনা কতদূর দরকার তাও জানিনি, তবে এটা অবিসংবাদী সত্য যে মানুষের মস্তিষ্ক আর পশী ও মেরুদণ্ডটা তার সব রকমের উন্নতির সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র। চাই কি আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও এই মস্তিষ্কটীকে সযত্নে পোষণ করতে হয়। পুষ্টিকর খাবার, ভাল বাতাস, খাঁটি জল আবহাওয়ার উপযোগী বস্ত্র ও বাসস্থান এগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিমান সন্দেহ করেন না। সন্ন্যাসী বা মুনিঋষি না খেয়ে বা বাতাস খেয়ে ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিরোধ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারেন কিন্তু সাধারণ [illegible] পনেরো আনা তিন পাই জীবধর্ম্মী, তার পক্ষে উক্ত বস্তু গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তার পর এগুলি সংসারে বড় সহজ সাধ্য সুলভ বস্তু নয়, এ গুলির জন্য মানুষকে রীতিমত লক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। দেবতা (প্রাকৃতিক শক্তি গুলি) মানুষ ইতর জন্তু এই তিন শ্রেণীর শত্রু মানুষের; এদের সঙ্গে লড়াই করে কৃতকার্য্য হতে গেলে, স্বাস্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধি বিলক্ষণ মাত্রায় চাই।

এই তিন বস্তু বিনা মানুষের জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার উপায় নাই। সমস্ত ইতর জীব, যারা জীবন যুদ্ধে টীকে আছে এই তিনটী জিনিসেরই বলে। পৃথিবীর অতীত যুগে যত অসংখ্য অসংখ্য জীববংশ অদৃশ্য হয়েছে—তা শুধু এই তিন শক্তির অভাবে জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়ার জন্য। মানুষেরও তাই। মান সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি যশ যা কিছু জীবনের সার ও সেরা তা জীবন যুদ্ধে জয়ের পুরস্কার বই আর কি?

সংসারে যে ব্যক্তি হীন ও দীন হয়েছে তার কারণ সে good animal হতে পারেনি। অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধি এই তিনটী শাণিত অস্ত্রের অভাবে সে জীবন যুদ্ধে হেরে ঐ রকম অবস্থায় পরিণত হয়েছে।

জন্তুজগতেও যেমন মানুষ জগতেও তেমনি। ব্যক্তি সম্বন্ধে এটা যেমন সত্য জাতি সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। কোন জাত যদি দেখি হীন ও দীন হয়ে আছে তাহলে বুঝতে হবে স্বাস্থ্য, শক্তি ও বুদ্ধির অভাবে জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এমনি হয়েছে। সোজা কথায় জাতটাও good animal হতে পারিনি। ইতিহাসে যদি দেখি কোনো জাত অনেক কাল ধরে প্রাধান্য ভোগ করে তার পরে অন্য কারো অধীন হয়ে পড়েছে তাহলে বুঝতে হবে জাতটী good animal ছিল, কি রূপে bad worthless animal হয়ে পড়েছিল।

... রকম আত্মশিক্ষা দরকার। ... যে সর্ব্বনেশে জড়ত্ব যা আমাদের ... চেপে গেছে সেই জড়ত্বকে নষ্ট করতে হবে। ...না না হলে তা হবে না। 'নান্য পন্থা ...তে অয়নায়' কারো কারো মতে এই জড়ত্বের ... সাত্ত্বিকতা! কেননা আমরা এ অবস্থাতেও ...কালের জন্য বেশী ভাবি, জপ তপ পূজা আহ্নিক তীর্থ ... করে থাকি; আমরা বিষয়-মত্ত নই, আমাদের ...সারের মিথ্যা সুখে মন বসেনা! এ যে দৌর্ব্বল্যের মোহভাব, এ যে অক্ষমতাজনিত অস্পৃহা; ... যে মিথ্যা ধর্ম্মের সেবা। এ যে অসাড়তা, ...ত্ত্বিকতা—একে বলে না। অন্তরের সমস্ত শক্তি ...র্ণমাত্রায় জাগরিত হয়ে সমস্ত মনোবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় ...রিত হয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মকে অবলম্বন করে ...ব যখন সাম্যে স্থিতি করে তখন তার অবস্থার নাম ...ত্ত্বিকতা। যখন শক্তি সত্ত্বেও শক্তির অপব্যয় বা ...ব্যবহার হয় না; বৃত্তি বহির্মুখী হয়েও কেন্দ্রচ্যুত ...না, তখন সেই অবস্থার নাম সাত্ত্বিকতা। আমরা যখন ...লি সংসারে আমাদের আসক্তি নাই তখন বুঝতে ...বে আমাদের আসক্তি বসাবার মত শক্তি নাই, যখন ...মরা বলি, আমরা পরকালটাকে বড় করে দেখি ...ন বুঝতে হবে ইহকাল আমাদের পক্ষে দুর্লভ বলে। ...ন আমরা বলি আমরা হিংসা করি না, তার মানে ...সা করতে যতটুকু তেজ বা শক্তির দরকার ততটুকুও ... নাই। আঙ্গুর দুষ্প্রাপ্য বলে যেমন শিয়ালের ...ছে টক বোধ হয়েছিল, তেমনি দুষ্প্রাপ্য বলেই ...কালের ভোগ সম্পদ আমাদের কাছে হেয় হয়ে ...গ্রশীল শক্তিকে ঠেলে দিলে তা ক্ষণিকের ...টে কিন্তু যখন সে আবার এগিয়ে ...সে ... জোরে আঘাত করে।

এই ... আমাদের ... সঙ্গে ... বলে, ... প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক বলে ঠেলে ... কিন্তু ... প্রবাহে আবার সে গড়াতে গড়াতে এসে আমাদের এমন ভাবে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে যে এ নির্ম্মম নিষ্পেষণ থেকে সেরে উঠতে একটা গোটা যুগ লাগবে।

আমরা কোনো এক অতীত যুগে সত্যই মানুষ হয়েছিলুম, মানুষের মত মানুষ—তারপর কোন এক সময় থেমে গিয়েছিলুম শুধু থেমে যাওয়া নয় পিছু হটতে আরম্ভ করলুম! ফলে এখন গোড়া থেকে আবার আমাদের আরম্ভ করতে হবে অর্থাৎ আবার আমাদের animality ফুটিয়ে তুলতে হবে অর্থাৎ good animal হতে হবে সুস্থ দৃঢ়কায় নীরোগ বলবান দেহ গড়তে হবে—জীবনের সুখ সাধ জাগিয়ে তুলতে হবে, পুরা দমে ঐহিকের ভোগক্ষম হতে হবে, সুপ্ত কুণ্ডলিনীকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে, সে জেগে উঠে সহস্র শিখা তুলিয়ে নেচে উঠবে—পশু না জাগলে দেবতা জাগবে না—পশু যে দেবতার বাহন!

পরিশেষে আমার একটা বক্তব্য আছে। অনেকেই আমার উপর খুব বেশী রকমই চটেছেন এই বলে—"একেই তো লোক জন কলিতে ধর্ম্ম হারিয়ে পশু হয়ে বসেছে এর ওপর আবার জন্তু হবার জন্য ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন!"

এ রকম দোষারোপ যখন হবেই তখন আমার উক্তির যুক্তিটা যাতে এঁদের বোধগম্য হয় তার জন্য দু কথা খুলে বলা দরকার বোধ করি। আমি যখন বলছি আমাদের animal (জন্তু) হতে হবে তখন এ কথা বলছিনি যে আমাদের মানুষ না হয়ে চারপেয়ে জন্তু হতে হবে—ঘাস্ খেতে হবে বা শিং, ল্যাজ নেড়ে কামড়া কামড়ি করতে হবে। আমি বলতে চাই আমাদের সুস্থকায়, বলবান, ... জীব হতে হবে। আর ... অবস্থাটাকে ... হবে। ... করতে ... হবে; সংসারের ভোগ সুখের দিকে বারআনা নজর দিতে হবে। জীবন

[illegible]
[illegible] তোমার [illegible] হৃদয়ে গভীর প্রেমের সিন্ধু
কোন্ বিদর্ভ কোন্ গান্ধার, কোন্ বিদেহের রত্নগন্ধ
প্রথম তোমারে বক্ষে ধরিল মেলাইল তব নেত্র পদ্ম।
অয়ি অনিন্দ্য বধূ বন্দিত বরি তোমা আজ এ গৃহালিন্দে
এস মন্দিরে নন্দিত করি স্নিগ্ধ গন্ধ নীলারবিন্দে॥

গৃহ তরুতল বেদী মন্দির অন্নের থালা পূর্ণকুম্ভ,
যাচে তব কর-পরশ গরিমা, কুট্টিম যাচে চরণ চুম্ব
দেব দ্বিজগুরু অতিথি গোধন তব সেবা লভি হইবে ধন্য
স্বাহা স্বধা গাহে স্বস্তি বচন তোমার দীর্ঘ আয়ুর জন্য।
অয়ি অনিন্দ্যা বধূ বন্দিতা বরি তোমা আজ এ গৃহালিন্দে,
এস মন্দিরে নন্দিত করি শোভন গন্ধ নীলারবিন্দে॥

শ্রীকালিদাস রায়।

কাব্যের উপাদান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কাব্যে সত্য ও কল্পনার রেখা।

Coleridge যখন বলেন, কাব্য বিজ্ঞান হইতে একটী স্বতন্ত্র জিনিষ, তখন তাঁহার কথাটা আমরা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারি। কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ দান; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সত্যাবিষ্কার। কাব্যের ভিতর কবির প্রাণের গভীর ভাব ও চিন্তাগুলি কল্পনার [illegible] বিচিত্র বর্ণে ফুটিয়া উঠে; বিজ্ঞানের [illegible] স্থান, মোটেই নাই কল্পনার যে স্থান [illegible] নিতান্ত সীমাবদ্ধ—যুক্তি এবং দর্শনের [illegible] যাইতে [illegible] কল্পনার আবার বেশী বাহিরে [illegible] শুধু বলিতে পারেন—

"সঙ্গিনী কল্পনে [illegible]
লয়ে যায় করে ধরি নন্দন কাননে।"

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নন্দন কানন docks, factories Arsenals ইহার বেশী যদি কিছু হয় তো ইডেন গার্ডেন বা সিমলার পাহাড় [illegible] কবি কল্পনার বলে একই স্থানে বসিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল দর্শন করিতে পারেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কল্পনা দেশ কাল ও পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। বৈজ্ঞানিকের কল্পনা যুক্তি ও তর্কের ভিতর "[illegible] বলদের মত" ঘুরিয়া [illegible] কল্পনা যুক্তি ও তর্কের বাহিরে থাকিয়া [illegible] মত, আকাশ বাতাসে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। কাজেই দেখা যাইতেছে

বিজ্ঞানের [illegible] তাহা সীমাবদ্ধ। [illegible] মধ্যে তাহাকে পদে পদে যুক্তি [illegible] হইয়া চলিতে হয়—এই অল্প পরিসর [illegible] মধ্যে বৈজ্ঞানিকের কল্পনা সত্যকে শুধু [illegible] খুঁজিয়া মরে। কিন্তু কবির কল্পনা সম্পূর্ণ [illegible] এবং উন্মুক্ত—সে অতি বৃদ্ধ, অতি সতর্ক [illegible] বেশী ধার ধারে না। সে নব যৌবনের [illegible] অঙ্কুরিত আশা লইয়া কোন এক মুকুলিত [illegible] প্রভাতে বা সোনালী বরণ হেমন্ত সন্ধ্যায় [illegible] আত্ম নির্ভরে দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া [illegible] "কাঞ্চী আর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ" হইলেও কল্পনার অশ্বে চড়িয়া কবির মন একমুহূর্ত্তে যাইয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইতে পারে। সেখানে যাইয়া সে হয়তো দেখিতে পায় "ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজ বালা" তাহার অধরে মৃদু হাসি—আঁখিতে আননে একটা বিলাস স্বপ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে, কল্পনার এই দ্রুত গতি দেখিয়া কাহারো কোন সন্দেহ হয় না; কেহ তাহাকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করে না। কবির কাছে আমরা সীমাবদ্ধ সত্য চাহি না। আমরা চাই আনন্দ, অনন্ত যৌবন "নন্দন বনের মধু রতির [illegible]

এখানে [illegible] প্রশ্ন হইতে পারে কাব্যের ভিতর কল্পনাকে এমন স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কিনা যাহাতে সে কেবল [illegible] অসম্ভব কথা রচনা করিতে পারে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়াই সমালোচকগণ কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্যের ভিতর যাহা সৃজিত হয় তাহা উত্তম কি [illegible] তাহার মাপকাটি (Standard) আমাদের [illegible]। বৈজ্ঞানিকের সত্যাসত্য বিচার করে [illegible] তাহার যুক্তি ও তর্কানুসারী চিন্তা [illegible] খুবই কম, [illegible] ভোজনে [illegible] মিষ্টান্নের [illegible] এই যে আনন্দ বিকাশ, ইহার ভিতর কোন যুক্তি কোন তর্ক [illegible] কণ্ঠের সেই ছুটে-ছুটে-খোঁজো [illegible] আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, [illegible] তাহা আমাদের জন্য প্রচুর আনন্দ সঙ্গে করিয়াই [illegible] আসে। সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যের মাপকাটীও আমাদের এই আনন্দ। সুন্দর জিনিষ কোন উচ্চ শৈল শিখর হইতে আমাদের তৃষিত উত্তপ্ত অন্তর মাঝে এই উচ্ছল আনন্দ প্রবাহ লইয়া আসে, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এখানে শুধু একথা বলিলেই চলিতে পারে যে, কবি কল্পনা আমাদিগকে যে পরিমাণে আনন্দ দান করিবে আমরা উহাকে সেই পরিমাণ আদর করিব। এমন একদিন ছিল যে অতিকায় জীব সমূহের অসম্ভ কল্পনাগুলিও মানুষকে আনন্দ দান করিত। কিন্তু এইরূপ আনন্দ দান সম্ভব হইত না, যদি Levy Pliny প্রভৃতি উদ্ভট প্রাণীবিদদিগকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া লোকে বিশ্বাস না করিত। যে কোন কারণেই হউক, এক কালে মানুষ দশ মুণ্ড সহস্র আঁখি কিম্বা তিন পদ বিশিষ্ট দেবতা বা রাক্ষসের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত এবং ঐরূপ কল্পনা হইতে আনন্দও পাইত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নতির জন্যই হউক বা অবনতির জন্যই হউক, এই ঘোর কলিকালে লোকে আর সে সব কথা বিশ্বাস করে না—এবং উহার কল্পনা হইতে আনন্দও পায় না। কাজেই কবি কল্পনাকে এতটুকু সংযত রাখিতে হইবে যেন উহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—এবং এই বিশ্বাস হইতে আনন্দ পাইতে পারি। কবি যে বলেন—"Truth is beauty and beauty is truth"—আমার তো মনে হয় তাহার কারণও এই ই। সত্য না হইলে সৌন্দর্য্যের বিকাশ অসম্ভব; যেখানে সৌন্দর্য্য নাই বুঝিতে হইবে সেখানে সত্যও নাই। এই সত্য ও সৌন্দর্য্যের মিলিত [illegible] আমাদিগকে আনন্দ দান করিতে পারে। যে [illegible] কল্পনা আমাদিগকে এইরূপ [illegible] পারে, তাহাকেই আমরা উচ্চশ্রেণীর [illegible] করি।

আমার এ-কথা হইতে কেহ যেন [illegible] না করেন.

আমি কবিদিগকে বিজ্ঞান পড়িয়া পড়িয়া কাব্য লিখিতে বলিতেছি। সেইরূপ বিবেচনা করিলে, লেখকের উপর অবিবেচনার কাজ করা হইবে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অর্থ এই যে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই কবির প্রধান কাজ। আমি এই সৌন্দর্য্য কথাটার উপরই কবির লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতে চাই। সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া সৌন্দর্য্য বিকসিত হয় না এবং সৌন্দর্য্য না হইলে আনন্দ বা রসানুভূতি হয় না, বলিয়াই আমি সত্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে কবির সত্য আর বৈজ্ঞানিকের সত্য তো এক নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ (analysis) করিতে করিতে বস্তু-জগৎ হইতে তিল তিল করিয়া যে সত্যের আবিষ্কার করেন, কবি সংযোজন প্রণালী (synthesis) দ্বারা ভাব রাজ্যে তাহা লইয়াই কতকগুলি নূতন জিনিষের কল্পনা করেন। Leigh Hunt বলেন, বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান যেখানে শেষ হইয়া যায়, কবির কাজ সেইখানেই আরম্ভ হয়। Wordsworth বলেন, সত্য সাধারণ লোকেও উপলব্ধি করে, কবিও উপলব্ধি করেন। কিন্তু কবি উহা এমনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে তিনি তখন আর তাহার এই উপলব্ধিটাকে চাপিয়া রাখিতে পারেন না। এই উপলব্ধি হইতে তাঁহার অন্তরের ভাবরাশি একেবারে উথলিয়া উঠে। অগ্নিসংযোগে ফেনায়িত দুগ্ধের মত এই ভাবগুলি তখন প্রাণের মধ্যে কেবলি ফুলিয়া উঠিতে চায়। তখন তিনি আর এই উদ্বেলিত ভাবগুলিকে অন্তরে চাপিয়া রাখিতে পারেন না—এমনাবস্থায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কবিতার আশ্রয় লইতে হয়। এই রকম অবস্থায় পড়িয়াই কবি গাহিয়াছেন—

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের'পর
কেমনে পশিল হৃদয় মাঝারে
প্রভাত পাখীর গান ?
না জানি কেন রে হৃদয় মাঝারে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
ওরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ
ওরে উথলি, উঠেছে বারি
বুকের ভিতর হৃদয় আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।

কবি হৃদয়ের মাঝে সত্যের সাড়া পাইয়া এমনিভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। তাহার ভাবগুলি হৃদয়কন্দর হইতে তখন এমনিভাবে ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। কবির সত্য হ্রদের ভিতর প্রস্ফুটিত পদ্মটীর মত—দেখিয়া মনে হইতে পারে উহা যেন জল হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু উহা যে মৃণাল এবং মূল দ্বারা শক্ত মৃত্তিকার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাহা আমরা কয়জন ভাবিয়া দেখি? আমরা চাই ওই বিকশিত সৌরভিত পদ্মটী,—মৃণাল বা মূল দিয়া আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রয়োজন নাই বলিয়াই তো আর আমরা বলিতে পারি না যে উহা একটা স্রোতে ভাসা ফুল। উহার কোন স্থিতি নাই—কোন অবলম্বন নাই। বিজ্ঞানের সত্য উহার মৃণাল এবং মূল; কবির সত্য শুধু প্রস্ফুটিত কুসুমটী। সত্যের সঙ্গে কবি-কল্পনার এইটুকু সম্বন্ধ।

বিজ্ঞানের সত্য কাব্যের কল্পনায় কিরূপভাবে ফুটিয়া উঠে, কয়েকজন কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা আলোচনা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। কবি দুর্গামোহন কুশারী অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত নামা হইলেও তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটীতে সত্য, কল্পনা এবং ভাবের আবেগ বেশ মিলিয়াছে।

কি এক নীরব মহা আনন্দে
সৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া
প্রকৃতির বুকে অতীব গোপন
কি জানি সত্য স্বরগ-স্বপন
গূঢ় রহস্য নারিনু ভেদিতে
শ্রান্ত হয়েছি সাধিতে কাঁদিতে
যুগ যুগান্ত ছুটিয়া;
শুধু এই বুঝিয়াছি মহা আনন্দে
সৃষ্টি উঠেছে ফুটিয়া।

আনন্দ হইতেই যে জগতের সৃষ্টি—এই আনন্দের জন্যই যে—

ফুল ফোটে ফল দোলে গাছে গাছে শাখে শাখে
মুগধ বিহগগুলি কত গায় কত ডাকে

এযে "কি মায়া কি আনন্দ কি ছায়া আবেশময়"—তাহা বিজ্ঞানি জানেন।—বৈজ্ঞানিক জানেন এই আনন্দেরই স্পর্শ পাইয়া একদিন—

"আকাশ তলে উঠলো ফুটে
আলোর শতদল ;
পাপড়িগুলি থরে থরে ছড়াল দিক দিগন্তরে
ঢেকে গেল অন্ধকারের নিবিড় কালো জল।

কবি সেই দিন গাহিয়াছিলেন,—

মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি ব'সে
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।

একটী গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যকে অবলম্বন করিয়া কবির কল্পনা কি এক সৃষ্টি রহস্য বর্ণনা করিয়াছিল। পড়িতে পড়িতে প্রাণ আনন্দে ভরিয়া আসেনা কি? এখানে কবি বৈজ্ঞানিকের মত কোন তর্ক, কোন যুক্তির অবতারণা করেন নাই। শুধু সৃষ্টি রহস্যের উপর কবির কল্পনা একেবারে সোজাসুজিভাবে আঘাত করিয়াছে। কবির সত্য, ভাবের অভিব্যক্তি ; তাহার কবিতাগুলি উন্মত্ত প্রাণের বাধাহীন উচ্ছ্বাস। এই সত্য তাহার নিকট কোন পুলকক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা সে নিজেও জানিতে পারে না। হয়তো একদিন গভীর নিশীথে, সেই উচ্চ পাহাড়ের উপর ফকির Mosesএর নিকট দৈববাণীর মত—

বিশ্ব যখন নিদ্রা মগন
গগন অন্ধকার—

কবি সত্যের আভাস পাইয়া আপনার মনে বলিতে থাকেন—

কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝঙ্কার?

এই যে গুঞ্জরিত বিপুল বাণী—ইহাই কবির শ্রেষ্ঠতম সত্য। ইহা যখন প্রাণের ভিতর ব্যাকুল সুরে বাজিতে থাকে, তখন তিনি সত্যময়, রসময় ও আনন্দময়ের কাছে অশ্রু গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে থাকেন—

ফুলের মত আপনি ফুটাও গান
হে আমার নাথ এইতো তোমার দান।

এই যে গান ফুটান' ইহাই কাব্যের সত্য।

কাব্যের সত্য হইতে বিজ্ঞানের সত্যের পার্থক্যটী আমরা একভাবে বুঝিয়াছি। কিন্তু এই পার্থক্যেরও আবার কতকগুলি স্তর আছে। কবিতার আলোচ্য বিষয় যখন প্রকৃতি, তখন বৈজ্ঞানিকের সত্য হইতে কাব্যের সত্য অনেক দূরে। এই আলোচ্য বিষয় যখন জীব জন্তু মানুষের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সকল সত্যের মূল, সকল সৌন্দর্য্যের আধার এবং সকল রসের খনি সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সত্যময়ের দিকে উঠিতে থাকে, তখন এই পার্থক্য ক্রমেই কমিতে থাকে। উদার উন্মুক্ত আকাশে বাতাসে কবির স্বেচ্ছাচারী কল্পনা যেমন স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে, জীব জগতে তাহার সে অবাধ গতি, সেই স্বেচ্ছাচারিতা চালাইতে পারে না। তারপর এই কল্পনা যখন ভগবানের চরণ তলে আশ্রয় লয়, তখন তার সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত ঔদ্ধত্য একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, তখন কল্পনাময় কবি সেই ভুবনেশ্বরের কাছে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতে থাকেন—

আমার মাথা নত ক'রে দেও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

কল্পনার এই যে সংকর্ষণ ও প্রসারণ, ইহারও একটী কারণ আছে। বিজ্ঞান বলে—(অবশ্যই জড়বাদীরা) জড় জগৎ কতকগুলি প্রাণহীন বস্তুর সমষ্টি ; এই প্রাণহীন জড়জগতের সহিত প্রাণীদের সহিত কোন সম্বন্ধের কথা ইহারা বিশেষ কিছু বলিল না। বিবর্ত্তন বাদীরা যে দুই চারিটী কথা বলিতে চান, তাহাও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ প্রয়োগ

করিয়া বলিতে পারেন না। জড় জগৎ হইতে প্রাণময় জগতের উদ্ভব সম্ভব কিনা, ইহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সমাজের একটী গুরুতর সমস্যা। বিজ্ঞানের উপর যে উচ্চ দর্শন আছে, (Metaphysics) তাহা এই সমস্ত জটিল প্রশ্নের একভাবে উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু এই Metaphysicsএর যুক্তিতর্কগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই সমস্ত নিছক সত্যগুলি (abstract truths) আজকাল অনেক কাব্যের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এই উচ্চ দার্শনিক সত্যগুলি বাদ দিলে, উচ্চাঙ্গের কাব্য মোটেই টিকে না। Coleridge বিজ্ঞানের সত্য বলিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা এই দার্শনিক সত্য নয়, উহা প্রমাণ সাপেক্ষ বিজ্ঞানের সত্য (Exprimental truths) কাজেই প্রাণহীন জড় জগতের সহিত, প্রাণময় জীব জগতের কোন সম্বন্ধ নাই, এ কথাটাকে আমরা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কবি কিন্তু বিজ্ঞানের এই কথাটা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। ওই সুরভি মলয় হিল্লোল, ওই তরঙ্গ-চঞ্চলা আবেগময়ী স্রোতস্বিনী, ওই ঘন নীল আকাশের তলে কত না বিচিত্র বর্ণের ভাসমান মেঘমালা, উহার সহিত, আমি মানুষ,—আমার প্রাণের কোন সম্বন্ধ নাই, এমন একটা ভয়ানক কথা কবি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। প্রকৃতি মানুষ হইতে একটা স্বতন্ত্র নিৰ্জ্জীব পদার্থ, এ কথাটা স্বীকার করিতে কবির প্রাণে যে বড় বাজে! 'খেয়ার' উৎসর্গ পত্রে কবি রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জগদীশ চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া এই বেদনার কথাটাই বলিয়াছেন—

বন্ধু,

তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।

এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবন মৃত্যু রৌদ্র ছায়া
পাঠায় বারতা
আমার লজ্জাবতী লতা।

তুমি বৈজ্ঞানিক, ওই লজ্জাবতীলতার ফুলটার ভিতর কতকগুলি পাপড়ি, কতকগুলি রেণু, কতকগুলি পরাগ দেখিতে পাইতেছ; তুমি পরীক্ষা করিয়া হয়তো এই সমুদয়ের একটা কারণও (Secondary cause) বাহির করিতে পার; কিন্তু কবির প্রাণ যে তাহাতে সন্তুষ্ট হয় না। সে যে উহাদেরই সঙ্গে হৃদয়ের একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লইতে চায়। বৈজ্ঞানিকদের এইরূপ নির্জ্জীব জড় জগতের সহিত কবির এইরূপ কোন একটা সম্বন্ধ পাতাইবার একটা অদম্য বাসনা আছে বলিয়াই, আমরা বলি জড় জগৎ বর্ণনায় কবি বড় বেশী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে কথাটাকে তো একেবারে মিথ্যা বলা যায় না। কালিদাস আষাঢ়ের প্রথম দিবসে সঞ্চরমান একখণ্ড মেঘের পানে চাহিয়া যে এক অপূর্ব্ব বিরহের কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এইরূপ কল্পনারই উপর প্রতিষ্ঠিত। জড় জগতের সহিত মানব হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া মানুষের বক্ষ-পাহাড় ভেদ করিয়া যে কত কবিতার উৎস ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নদ নদী, কানন পর্ব্বত, আকাশ বাতাস, আমাদের চারিদিকের সহস্র জড় পদার্থের সঙ্গে যে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নাবস্থায় কত বিচিত্র রকমের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে! সেদিন কবি ভুজঙ্গধরের "গোধূলি" কাব্যখানা পড়িতে পড়িতে, এই কল্পনাময় সম্বন্ধের এক অপূর্ব্ব সংঘটন দেখিলাম। কবি বলিতেছেন—

নিদাঘের শেষে,
পরিণত যৌবনের বরষা যখন
পশিল মন্থরগতি মানসের দেশে—

তখন বিরহী কবি প্রকৃতিকে আপনার প্রেমময়ী মানসী প্রতিমা মনে করিয়া বলিতেছেন—

"অয়ি আদরিণি,
এ সুখ বরষা দিনে এস সোহাগিনি !
কদম্বে কবরী ভরি', দুলাইয়া কানে
পরাগী শিরীশ ফুল, নিতম্ব বিতানে
ইন্দ্রধনু কাঞ্চী পরি', পীন পয়োধরে
জড়ায়ে বকুল মালা, বক্ষের উপরে
যুথিকার কণ্ঠহার করিয়া ধারণ,
সুরভি চন্দন অঙ্গে করি বিলেপন,
মেঘ বাসে অঙ্গতনে আবরিয়া কায়,
চপলা কটাক্ষ হানি' এ মোর হিয়ায়,
শুচিস্মিতে, নেমে এস ধীরে।"

কিন্তু এই স্থানেই তার সম্বন্ধ স্থাপন শেষ হয় নাই। কবিতার পর কল্পনায় দেখিলেন,—

ঘন আলিঙ্গনে
খসিছে কবরী বন্ধ, শিথিল বসনে
নগ্নরূপ, সুলোচনে, নার ঢাকিবারে,—
বিকসিত পুষ্প যথা পল্লব-প্রাকারে।

যে কোন কবির কবিতা হইতে এইরূপ শত সহস্র লাইন উদ্ধৃত করিয়া কল্পনাবলে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-হৃদয়ের এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কবিকুলচন্দ্রের "বসন্তলীলা"র বর্ণনা হইতে কয়েকটী চরণ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। বসন্ত আসিয়াছে কবি বলিতেছেন—

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্থ।
* * * *
শিখিকুল নাচত, অলি কুল চন্দ্র,
আনন্দিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র।
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ।
কুন্দ বিল্বতরু ধবল নিশান
পাটল তূণ অশোক দলবান।
কিংশুক লবঙ্গ লতা একসঙ্গ
হেরি শিশির ঋতু আগে দেল ভঙ্গ।
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল
শিশিরক সবহু করল নিরমূল।
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান।

প্রকৃতির ভিতর এই যে জীবনের সাক্ষাৎ, এই যে নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস, ইহাকে বিজ্ঞান মিথ্যা বলিতে পারে; কিন্তু কবির কাছে ও ভাবুকের কাছে ইহা যে নিতান্তই সত্য—নিতান্তই উপলব্ধির বিষয়। বাসন্তী পূর্ণিমার সৌরভিত চাঁদনি আলোকে বসিয়া মলয় স্পর্শে প্রিয়ার আঁচলের পরশ অনুভব করেন নাই, এমন যুবক কয়জন আছে? শ্রাবণের 'ঘন ঘোর বরিষায়' প্রিয়ার কাজল দেওয়া চোখের চঞ্চল আঁখি দুটী মনে করে নাই এমন বিরহী প্রবাসী কয়জন আছে? তুমি আমি যাহা অন্ততঃ একদিনও অনুভব করিয়াছি কবি তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয় লইয়া যে তাহা খুব গভীরভাবে অনুভব করিবেন, এবং সেই অনুভূতি হইতে আকাশে বাতাসে একটা চঞ্চল জীবনের প্রবাহ দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কবির এই কল্পনার ভিতর হইতে গভীর Metaphysical সত্যের কথা বাদ দিলেও, কাব্যের সত্য ইহার ভিতর যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত বর্ণনায় দেখিতে হইবে, যে বস্তুতে যাহা কল্পনা করা সম্ভব নয়, তাহাতে যেন তাহা না হয়। দুগ্ধকে যেন লোহা বলিয়া কল্পনা না করা হয়। সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করাতে মিল্‌টনের দুই একটী কবিতার এইরূপ অসঙ্গত কল্পনা স্থান পাইয়াছে! বিজ্ঞানের চিন্তাপ্রণালীতে যেমন একটা নিয়মের ধারা (Logic) আছে, কাব্যের কল্পনা প্রণালীতেও সেইরূপ একটা নিয়মের ধারা মানিয়া চলা উচিত। কোন বস্তুকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কল্পনার বলে তাহার উপর কতকগুলি শ্রুতিমধুর বিশেষণ চাপাইলে তাহাতে ভাবের বিকাশ হয় না। আবার একই সময়ে একই বস্তুকে দুটি বা তিনটি পরস্পরবিরোধী

বিশেষণ দিয়া সাজাইলে, তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য্য হানি হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। ইংরেজী অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে oxymoron বলে, তাহা খুব সাবধানে প্রয়োগ করা উচিত।

প্রকৃতি বর্ণনায় কল্পনার প্রাচুর্য্য থাকিবেই। যাঁহারা খুবই Realistic—কোনরূপ অলঙ্কার না দিয়া প্রকৃতিকে একেবারে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চান, তাঁহাদেরও বর্ণনাভঙ্গিতে তাঁহাদের হৃদয়ের সুখ দুঃখের সাড়া পাওয়া যায়। যে সমস্ত বর্ণনায় হৃদয়ের এই সাড়াটুকু না পাওয়া যায়, তাহা কবিতা হইতে পারে না। ভূগোল বৃত্তান্তে বা বন-বিভাগের পরিদর্শন বিবরণীতে যে সমস্ত স্থান ও উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হয় তাহা সত্য হইলেও কবিতা হইতে পারে না—এই বর্ণনায় বক্তার বা লেখকের হৃদয়ের কোন স্পন্দন অনুভূত হয় না—এই জন্য উহা আমাদের প্রাণেও বিশেষ ভাবোদ্রেক করিতে সমর্থ হয় না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কাব্যের ভিতর প্রকৃতি বর্ণনায় কল্পনার প্রাচুর্য্য থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কবি যেই মুহূর্ত্তে জীবজগতে প্রবেশ করেন, তাঁহার কল্পনাও ক্রমে ক্রমে সংযত হইতে আরম্ভ করে। যখন তিনি মানুষের সুখ দুঃখ হাসি কান্না লইয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া কঠোর বস্তুতন্ত্রতার (Realism) অধীনে আসিতে হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সকল চিরন্তন সম্বন্ধ যুগ যুগান্তর ধরিয়া স্থাপিত রহিয়াছে, কবির কল্পনা তাহারই ভিতর সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। কবি যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের কথা বলিতে চান, তখনই কাব্যের ভিতর রসটাকে আমরা সহজে বুঝিতে পারি। প্রকৃতিকে আমরা যে ভাবেই দর্শন করি না কেন, উহার একটা সত্য পরিচয় আমরা বড় সহজে পাই না এবং বস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সত্যের (the highest truth) পরিচয় না পাইলে রস অনুভূত হয় না। রসটা নিতান্তই বস্তু অনুগত। ভাবের আদান প্রদানের পথ আছে বলিয়াই মানুষের সঙ্গে মানুষের : আংশিকরূপে সত্য এমন সম্বন্ধগুলি সহজে বুঝিতে পারা যায়—বুঝিতে পারা যায় বলিয়াই মানব হৃদয় বর্ণনায় আমরা একটু বেশী আনন্দ পাই। প্রকৃতি বর্ণনাগুলি আমাদের কাছে তখনই খুব ভাল লাগে যখন উহার ভিতর আমরা মানব হৃদয়ের সহজ ও বলবান্ ভাবগুলি আরোপিত দেখিতে পাই, কাজেই রসটাকে আমরা বস্তু অনুগত বলিয়াই মনে করি। মায়ের বুক তখনি শুধু স্নেহে ভরিয়া উঠে, যখন তিনি সন্তানের মুখটী দেখিতে পান। আমাদের যৌবনসুলভ উন্মাদ বাসনাগুলি শুধু তখনি জাগ্রত হইয়া উঠে, যখন আমাদের বাসনার বস্তুগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়।

> বসন্তের যে আভাস যৌবনের স্বপ্ন হ'য়ে
> শুধু জেগে ছিল,
> ও তোমার নেত্র পাতে পূর্ণ হয়ে চূর্ণ হ'য়ে
> ছড়ায়ে পড়িল।

"আঁখিতে আঁখিতে এই যে মদির মিলন"—ইহা হইতেই যে বাসনার সৃষ্টি—এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের এইরূপ সম্বন্ধ হইতেই রসানুভূতি হইতে থাকে কিন্তু বস্তুতন্ত্রতা কাব্যের রসোৎপাদক হইলেও কল্পনার খেলা যে এখানে নাই, এমন কথা বলা যায় না। কল্পনা এখানে সত্যের অলঙ্কার; মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধগুলি যদি অনাবৃত ভাবে দেখান হয়, তবে এমন অনেকগুলি সম্বন্ধ দেখা যাইবে, যাহা মোটেই সুন্দর নয়। সেগুলিকে আভরণ শূন্য করিয়া দেখাইতে গেলে নিতান্তই কুৎসিৎ দেখাইবে। কিন্তু কাব্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান; ভিতরে বাহিরে যে জিনিষগুলি সুন্দর, তাহা হইতেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ পাই। কিন্তু যেখানে ভিতরের জিনিষটী মোটেই সুন্দর নয়, তাহাকে যদি ঠিক যথাযথ ভাবে বর্ণনা করা হয়, তবে আমরা তাহা হইতে ব্যক্তি বিশেষ আনন্দ পাইতে পারি। কিন্তু মানুষের সামাজিক বা জাতীয় জীবন তাহা হইতে আনন্দ পাইতে পারে না। প্রত্যেক মানুষেরই দুটা জীবন আছে—একটা তাহার ব্যক্তিত্বের জীবন; এখানে সে তাহার সুখ দুঃখ হাসি কান্না লইয়া একা—বিশ্বের সহস্রপ্রকার প্রতিযোগীতার মধ্যে সে

এখানে নিতান্তই একা; তাহার আর একটী জীবন আছে,—তাহা তাহার মানবত্বের জীবন; এখানে সে আর একা নয়; এখানে সে দশের একজন,—এই জীবনে কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়- সকলেই মিত্র, ইহাই তাহার বৃহত্তর জীবন। এই সামাজিক ও জাতীয় জীবন দিয়াই মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদের পরিমাপ হওয়া উচিত। উচিত যাহাই হউক, কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিক ও রাজনৈতিক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন, মানুষ সামাজিক জীবনের বন্ধন শিথিল করিয়া ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিত্বের জীবনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিত্ব-বাদ ইউরোপে আজকাল বেশ মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যক্তিত্ববাদের প্রেরণায় সাহিত্যের ভিতর সত্যকে অনাবৃত ভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য বেশ একটা প্রয়াস চলিয়া আসিতেছে। এই প্রয়াসের ফলে আজকাল সাহিত্যের ভিতর আমরা অনেকগুলি অস্পষ্ট সত্য দেখিতে পাইতেছি—যাহা দেখিলে নিতান্তই কুৎসিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই কুৎসিৎ জিনিষগুলি আদৌ সত্য কিনা—একটু তলাইয়া চিন্তা করিতে গেলে সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। সে যাহাই হউক, কুৎসিৎ জিনিষের বর্ণনা হইতে আমরা খুব কম আনন্দ পাই বলিয়াই কাব্যে উহাকে কল্পনার তুলিতে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করা হয়। কুৎসিৎকে সুন্দর করিতে গিয়াই কাব্য জগতে ornate artএর সৃষ্টি হইয়াছে। বেজ্‌হটের (Bagehot) মতে টেনিসনের Enoch Arden এই ornate artএর একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যখানিকেও আমরা এই শ্রেণীর কাব্য বলিয়াই মনে করি। কেবল 'চিত্রায়' নয়, রবীন্দ্র নাথের যৌবনের অনেক কবিতায়ই এই অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর "শিশু" কাব্যের একটী কবিতায়, সত্যের সঙ্গে কল্পনা এমনি সুন্দর ভাবে মিশিয়াছে যে আমরা ভিতরের কুৎসিত ভাবটাকে একেবারেই দেখিতে পাই না। কবিতাটী এই—

খোকা মাকে সুধায় ডেকে—
এলাম আমি কোথা থেকে
কোন খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে"
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে,—
"খোকারে তার বুকে বেঁধে
ইচ্ছা হয়ে জন্মে ছিলি মনের মাঝারে;
"যৌবনেতে যখন হিয়া
উঠে ছিল প্রস্ফুটিয়া,
তুই ছিলি সৌরভের মত মিলায়ে;
আমার তরুণ অঙ্গে-অঙ্গে,
জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে,
তোর লাবণ্য কোমলতা বিলায়ে।"

কাব্যে বস্তুতন্ত্রতার কথা বলিতে গেলে আরও অনেক কথাই বলিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিবার শক্তিও আমার নাই। কিন্তু এ কথাটা বেশই বুঝিতে পারা যায়, যে নরনারীর চরিত্র বর্ণনায় এবং তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ সংস্থাপনে বস্তুতান্ত্রিক না হইলে কবি তাঁহার কাব্যে রস সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। ফলে রসের অভাব হেতু তাঁহার গ্রন্থখানি হয়তো কাব্য নামেরই উপযুক্ত হইবে না। যে সমস্ত কাব্য, মহাকাব্য এবং নাট্য কাব্য জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, সেইরূপ সমস্ত কাব্যই বস্তু তন্ত্রটা-মূলক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ চিত্র অঙ্কণে কবির কল্পনা যতই সংযত হউক, ভগবানের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতার ভিতর অনেকেই কল্পনার সেইরূপ সংযম দেখিতে পান না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবিতা জড় জগতের আলোচনা ছাড়াইয়া ক্রমশঃ উঠিতে থাকে, কাব্যের ভিতর কল্পনার প্রভাবও ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে। এই সূত্র (theory) অনুসারে, ভগবানের সম্বন্ধে কবিতার কল্পনা খুবই কম থাকা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভাগবৎ বিষয়ক কবিতার ভিতর কল্পনার প্রভাব কম, একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন না। "In Memorium", "Excursion", "গীতাঞ্জলি", বা "অন্তর্য্যামী" প্রভৃতি কাব্যগুলি চোখের সামনে রাখিয়া কেহ একথা বলিতে পারেন না যে, ইহাদের মধ্যে

কল্পনার প্রভাব খুব কম। যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, যিনি মন এবং বাক্যের অতীত বলিয়া কথিত, তাঁহার সম্বন্ধে কবিতা লিখিতে গেলে যে তাঁহার একটা স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমেই কল্পনা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু গভীরভাবে কথাটা একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে এই কল্পনার সঙ্গে প্রকৃতি বর্ণনায় কল্পনার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রকৃতিতে আমরা কখন রুদ্র রূপে, কখন শান্ত রূপে, কখন মাতৃ রূপে, কখন বঁধূ রূপে কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রতিক্ষণে বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃতি নির্জ্জীব; উহার সঙ্গে যত রকম সম্বন্ধ সৃষ্টিই করনা কেন, উহা সব মিথ্যা—সব Pathetic fallacy or transferred Epithet. কিন্তু ভগবানকে আমরা যে ভাবেই কল্পনা করিনা কেন,—বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারে না। বলিলেও তাহা কবি শুনিতে বাধ্য নন। মন, বাক্য এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখা যায় ও পরীক্ষা করা যায়, বিজ্ঞানের সীমা ততদূর পর্য্যন্ত; উহার বাহিরে তার আর গতি নাই, কাজেই প্রমাণবাদী বিজ্ঞান (Experimental Science) ভগবানের বিষয় বড় একটা কিছু বলিতে পারে না। সে সম্বন্ধে তাহাকে যদি কিছু বলিতেই হয়, তবে তাহাকেও কল্পনার উপরই নির্ভর করিতে হয়—তাহাকেও তখন ভগবানের একটা স্বরূপ অনুমান (theory) করিয়া লইতে হয়। বৈজ্ঞানিক যেখানে অনুমান করিতে যান, সেখানে কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের সমান অধিকার। কাজেই কবির অনুমানকে বৈজ্ঞানিক তখন আর কল্পনা (Poetic fancy) বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। পুরাতন পুতুল পূজার যুগে (Pagan Age) কবি-কল্পনায় এই কথাটা না খাটিলেও বর্ত্তমান যুগের ভগবৎ বিষয়ক কবিতায় এ কথাটা বোধ হয় সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজিত হইতে পারে। এ যুগের কবিরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—Jupiter, Uranus বা Odinকে এখন আর ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করেন না। ঐ সমস্ত অতি শক্তিশালী দেবতাগণ কতকগুলি উপলব্ধ সত্যের রূপক (allegory) বলিয়াই এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট গণ্য হন। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, ভগবৎ বিষয়ক কবিতার কল্পনার প্রভাব খুব কম—(অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে কল্পনা বলেন, আমি সেই কল্পনার কথাই বলিতেছি।)

কিন্তু ভগবদ্ বিষয়ক কবিতায় কল্পনার প্রভাব কম হইলেও, ঐ সমস্ত কবিতার সকলগুলি কথাই কিছু আর বেদ বাক্য বলিয়া মনে করি না। ঐ সমস্ত কবিতায় এমন অনেক কথা বলা হয়, যাহাকে আমরা কাব্যের সত্য (Poetic truth) বলিয়াই মনে করি। দার্শনিকের কঠোর মাপ কাঠী দিয়া মাপিলে হয়তো সেই সত্যটা একেবারেই টিকিবে না। এই যে একটা গান,—

> সে যে পাশে এসে বসেছিল
> তবু জাগিনি
> কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
> হতভাগিনি।
> এসেছিল নীরব রাতে,
> বীণাখানি ছিল হাতে,
> স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
> গভীর রাগিণী।

ইহাতে ভগবানের যে খুব কবিত্বপূর্ণ সুন্দর একটী রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? শুনিয়া অবধি গানটী আমার কাছে খুবই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহার ভিতর কল্পনার ছায়াই একটু বেশী পড়িয়াছে; তবু কিন্তু ইহাকে কল্পনা বলা যায় না। কে এমন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি বলিতে পারেন যে, ভক্তের কাছে ভগবান এইভাবে আসিয়া দেখা দেন না? এই সমস্ত কবিতা পড়িয়া আমরা শুধু বলিতে পারি—

> ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
> আত্ম সমর্পণ
> ওরে 'ওরে মন যোড় কর করি'
> কর তাহা দরশন।

এই সমস্ত কবিতায় কবি ভক্তের মত, সাধকের মত ভগবানকে নানা রূপ দিয়া সাধনা করেন। ভক্তের এই সাধনাতে অবিশ্বাস করিবার কোন অধিকার আমাদের নাই। অধিকার নাই বলিয়াই, ইহাকে আমরা কল্পনা বলিতে পারি না। কবি যখন ভক্তি নম্র কণ্ঠে বলিতে থাকেন—

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই,
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই;
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে চোখে আসে জল
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।
পথের তুলিব ফুল কাঁটা ফেলি দিব,
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব;
গুন গুন গাহি গান পথ চলি' যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব।
দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক,
যদি ভয় পাই বঁধু মাঝে মাঝে ডেক।

তখন আমরা তাহাকে বলিতে পারি না,—"ওগো কবি, ওগো স্বপ্নময় সাধক, এ পথে যাইয়ো না এ পথে কণ্টক আছে। আমরা বলিলেও সে হয়তো শুনিবে না। আমাদের সন্দেহপূর্ণ নিষেধ বাক্য শুনিয়া সে হয়তো প্রাণে ব্যথা পাইবে,—তবু কিন্তু সে চলিয়া যাইবে—যাওয়ার বেলা হয়তো করুন কণ্ঠে আমাদিগকে বলিয়া যাইবে—

"কেন হাসিতেছ তুমি নির্ম্মম নিষ্ঠুর
অজানিত পথ কি গো এতই বন্ধুর?
যেতে হবে যেতে হবে যেতে হবে মোর—
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোর;
পথ খানি যেথা থা'ক পাব আমি পাব
যেমন করেই হউক, যাব আমি যাব।"

কবির এরূপ ভাবাবেশে বাধা দেওয়ায় আমাদের কোন অধিকার নাই। কিন্তু এ সব স্থানে আমাদের কিছু বলিবার না থাকিলেও, এক স্থানে আমরা দুই একটী কথা বলিতে পারি। কবি যখন সাধকের সীমা ছাড়াইয়া শিক্ষকের আসন গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে চারিদিকের সমস্তগুলি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দার্শনিক ভাবের কবিতা লিখিতে হয়। টেনিসনের In Memorium শোক শিক্ষার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। অবিশ্বাসী সমাজের ভিতর বিশ্বাস-স্থাপন, ধর্ম্মদ্বেষী খৃষ্টান হৃদয়ে খৃষ্টের মহান আদর্শ জাগাইয়া তোলা প্রভৃতি কয়েকটী কাজ কবিতার জন্য In Memorium লিখিত হইয়াছিল। অবশ্যই বন্ধুর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করাও যে কবির একটা উদ্দেশ্যে ছিলনা, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু "In Memorium" কাব্যখানা পড়িয়া গেলে ইহাই মনে হয় যে, কবি লোক-শিক্ষার জন্যই যেন কাব্যখানা লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যের অনেক স্থলেই প্রচলিত ধর্ম্ম মতের উপর কবি কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহার ফলে উনবিংশ শতাব্দির সমস্যা-জটীল সমাজ-বিজ্ঞানের অনেক অন্ধকার দূর হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের "নৈবেদ্য" ও অনেকটা এই ধরণেরই কাব্য। কিন্তু Keble বা William Blacke যে সমস্ত ভগবৎ বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষভাবে বোধ হয় লোক শিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল না। সে সমস্ত কবিতায় আমরা কবি হৃদয়ের কতকগুলি ব্যাকুলভাবেরই উচ্ছ্বাস যেন দেখিতে পাই। রবীন্দ্র নাথের "গীতাঞ্জলিতে" চিত্তরঞ্জনের "অন্তর্য্যামী" কাব্যে বা দেবকুমারের "ধারায়" কোনও দার্শনিক মত বিশেষের উপর কটাক্ষ বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কাব্যে কবি শুধু নিজের ভিতরে ভগবানের যে বিচিত্র লীলা, যে বিচিত্র বর্ণসম্পাত দেখিতে পাইয়াছেন, তাহার কথাই, প্রাণের আবেগে সরল ও সহজ ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু "নৈবেদ্যের" কবি অনেক স্থলেই লোক শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সেখানে তিনি আপনার উপলব্ধ জ্ঞান ও আবেগ লইয়া অনেক প্রকার মতবাদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে নহে আমার" "আমার এ শরীরের হিয়ায় হিয়ায়" প্রভৃতি অনেকগুলি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত কবিতায় কবি কতকগুলি দার্শনিক মতের উপর হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দিয়া

জন সাধারণকে সত্য মিথ্যা বুঝাইতে চাহিয়াছেন; কাজেই এই সমস্ত কবিতায় চিন্তা ও বুদ্ধির বিকাশই বেশী হইয়াছে; পক্ষান্তরে "গীতাঞ্জলি" বা "গীতালিতে" আমরা কবির অনুভূতির কথাই বেশী দেখিতে পাই। দার্শনিক হিসাবে কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা সে সম্বন্ধে "গীতাঞ্জলি"তে রবীন্দ্রনাথ এবং "অন্তর্য্যামীতে" চিত্তরঞ্জন প্রায় নীরব। সম্ভবতঃ কাব্যের ভিতর লোক শিক্ষা দেওয়ার স্পর্দ্ধা হইয়াছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ "গীতাঞ্জলির" প্রথমেই গাহিয়াছেন—

আমার মাথা নত করে দেও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

ইহার পরে তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন—

আমারে না যেন করি হে প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ—
আমার জীবন মাঝে।

তিনি তখন বুঝিয়াছেন—

হেথা যে গান গাইতে আসা
হয়নি সে গান গাওয়া

তাহা হইলেও তিনি যে না গাহিয়া পারেন না—প্রতিদিনের উপলব্ধিগুলি কেমন করিয়া তিনি চাপিয়া রাখিবেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি যখন গাইতে বল
গর্ব্বে আমার ভ'রে উঠে বুকে
দুই আঁখি মোর করে ছল ছল
নিমেষ হারা চেয়ে তোমার মুখে"।

তার পর—

"কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে
সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখীর মত সুখে।"

কিন্তু এই গানগুলি তো তাঁর লোক শিক্ষা দেওয়ার বাসনার গান নয়। কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবানের সম্বন্ধে কোন মতামত এখন আর তিনি প্রকাশ করিতে চান না। আজ তিনি বুঝিয়াছেন—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।"

এখন অনুভূতির গান, বিরহ-মিলনের গান। যখন তিনি দূরে থাকেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা চলে। কিন্তু আজ যে তিনি আসিয়াছেন!—তিনি সুন্দর কি কুৎসিৎ, তিনি প্রেমিক কি অপ্রেমিক, এসব কথা লইয়া তো আজ আর তর্ক চলে না। আজ যে তিনি প্রত্যক্ষ—

শরতে আজ কোন অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গারে হৃদয়
আনন্দ গান গারে।

তোমরা কি বিশ্ববাসী, আজিও তার পায়ের ধ্বনি শুনিতে পাও নাই? সে যে কেবলি আসে—

কত কালের ফাল্গুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে আসে আসে।—
কত শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘের রথে
সে যে আসে আসে আসে!

কবি চিত্তরঞ্জনের কবিতাগুলিও এইরূপ অনুভূতি ও উপলব্ধির কথায় পূর্ণ। সত্য মিথ্যা নিয়া সেখানে বিচার নাই। কতকগুলি ভাবের সঙ্গীত হৃদয়াবেগের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটী কবিতা এই—

"এস আমার প্রাণের বধূ এস করুণ আঁখি,
আমার প্রাণ যে কাঁটায় ভরা কোথায় তোমারে রাখি!
প্রাণের এত কাছাকাছি আছ তুমি চেয়ে,
তোমার ঐ চোখের ছায়া আছে পরাণ ছেয়ে
একটুখানি দাঁড়াও তবে কাঁটা তুলে দিব
তোমার তরে কোমল করে প্রাণ বিছাইব
এস আমার কোমল প্রাণ এস করুণ আঁখি
কাঁটা তোলা প্রাণের মাঝে আজ তোমারে রাখি।"

এই সমস্ত কবিতার ভিতরে সত্য অপেক্ষা কল্পনা বেশী আছে বলিয়া কেহ কি বলিতে পারেন ? সাধারণ লোকে পারিলেও, বৈজ্ঞানিক এসমস্ত কবিতাগুলিকে কল্পনাপূর্ণ কবিতা বলিয়া কখনও উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভগবান যে তাঁহার প্রমাণ তর্কের বাহিরে। শুধু প্রাণ দিয়াই যে তাঁহাকে অনুভব করিতে হয়।

(৪) কাব্যে ভাবের গভীরতা।

উৎকৃষ্ট কবিতার একটী লক্ষণ এই যে উহার ভাবগুলি খুব গভীর। ছন্দ থাকিলেও, যেখানে ভাবের গভীরতা নাই, কার্লাইলের (Carlyle) মতে, সেগুলি কবিতা নয় ; তাহা শুধু কতকগুলি শব্দের ছটা। সাধারণ লোকে প্রায় সকল জিনিষকেই খুব হাল্কা ভাবে দেখেন এবং সেই সমস্ত বস্তু সম্বন্ধে যে সব কথা বলেন, তাহা নিতান্তই গদ্যময়—নিতান্তই অগভীর। সাধারণ লোক হইতে কবির পার্থক্যও এইখানেই। তিনি সমস্ত জিনিষকেই খুব গভীর ভাবে ভাবিয়া দেখেন এবং গভীরভাবে ভাবেন বলিয়াই তাঁর অনুভূতি গুলিও খুব গভীর হয়। ওই সুনীল আকাশ মাঝে বিচিত্র বর্ণের ভাসমান মেঘমালা, ওই আলোকোজ্জ্বল গ্রহ মণ্ডলী, ওই উচ্ছল সমীর প্রবাহ, ইহা কবিও দেখেন, আমরাও দেখি। কিন্তু আমরা যখন দেখিয়াই চক্ষু ফিরাইয়া চলিয়া যাই, কবি কিন্তু তখনো স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। চাহিয়া চাহিয়া তাঁর মনে যে কত শত ভাব উপস্থিত হয়, তাহা তিনিই জানেন ; তার পর আমরা দেখিতে পাই, তিনি উহাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই কাজ দেখিয়া, কেহ পাগল বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই—কেহ বন্ধু বলিয়া ভালবাসি। কবি ওই যে ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবের আবেগে বাহিরের সঙ্গে তাঁর মনোরাজ্যের একটী সম্বন্ধ স্থাপন করেন, ইহার জন্যই আমরা তাঁহাকে মধ্যবক্তা বা Interpreter বলি। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি-জগতের সত্যের আবিষ্কার করেন ; কবি বাহিরের সঙ্গে ভিতরের ভাব বিনিময় করেন। কিন্তু কোন বিষয়ে নিজে গভীর ভাবে অনুভব না করিলে ত সে বিষয়ে তাহার কিছু বলা সম্ভব হয় না। 'Wordsworth' এক 'Daisy' পুষ্পের ভিতরে কত সৌন্দর্য্য কত ভাব দেখিতে পাইয়াছেন ; এক হিমালয়ের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমস্ত বর্ণনাই গভীর অনুভূতির ফল। এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য যে, যে বস্তু সম্বন্ধে আমি যত গভীর ভাবে অনুভব করিব, সে সম্বন্ধে আমার কথাগুলি তত গভীর হইবে। ভয়ানক একটা অত্যাচার—কতকগুলি প্রবল দুর্নীতি—কতকগুলি ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া যিনি জীবন ও মরণের মধ্যে কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এই বিষয় চিন্তা করিয়াছেন তিনি শুধু বলিতে পারেন—"To be or not to be, that's the question." একমাত্র পুত্রের জন্য মায়ের স্নেহটা যে কি গভীর, যিনি সে বিষয়ে গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন শুধু তিনিই বুঝিবেন, Shakespeare কি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া 'Lady Macbeth' দ্বারা বলাইয়াছেন—

> "I have given suck and know
> How tender, 'tis to love the babe that
> milks me :
> I would, while it was smiling in my face,
> Have plucked my nipple from his
> boneless gums,
> And dashed the brains out, had I so
> sworn, as you
> Have done to this."

জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি এরূপ গভীর অনুভূতি হইতে সঞ্জাত। আবেগবান হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস (overflow) বা ভাবের অভিব্যক্তিই কবিতা। কোন বিষয়ের অনুভূতি যখন এমন প্রবল হয় যে, উহাকে আর হৃদয়ে ধরিয়া রাখা যায় না,—বক্ষের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করিয়া, হৃদয়ের দুই কূল ছাপাইয়া তখন উহা কবিতা হইয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবগুলি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত। হৃদয়ে উঠিয়া হৃদয়েই মিলাইয়া যায়। আমাদের হৃদয়ে অনেক সময় এমন অনেক ভাব জাগরিত হয় যে, আমরা উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারি-না। সেই সমস্ত ভাব লইয়া কোন কালেও কবিতা রচিত হয় না—হইতে পারে না। কাব্যামৃত সুধা ভাবের ক্ষিরোদ সমুদ্রের মধ্যে আছে; উহাকে আবেগ পর্ব্বতে মন্থন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কেবল যেমন তেমন মন্থন করিলে চলিবে না—হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া, প্রাণের রক্ত জল করিয়া উহাকে বহুবার মন্থন করিতে হইবে॥ প্রথমবার হয় ত অশ্ব, তারপর হয় ত ঐরাবত, তারপর হয়ত উর্ব্বশী বা চন্দ্র উঠিতে পারে,—কিন্তু সুধা পাত্রের জন্য তখনও মন্থন করিতে হইবে—অন্তরের দেবপ্রকৃতি ও অসুরপ্রকৃতি সমস্ত একত্রিত করিয়া বার বার মন্থন করিলে তারপর হয় ত কাব্যলক্ষ্মী এই আরাধ্য বাঞ্ছিত সুধাপাত্র হস্তে লইয়া কবিকে দেখা দিতে পারেন। কবিতার আরাধনাত অনেকেই করেন; কিন্তু কয়জন কাব্যলক্ষ্মীর দেখা পান?—কয়জন কাব্যের ভিতর সুধারস সঞ্চার করিতে পারেন?—কয়জন কাব্যের ভিতর সে রস স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, চৈতন্যময়ের আভাস ফুটাইয়া তুলিতে পারেন? এই রস সৃষ্টি করিতে যে সাধনা, যে গভীর অনুভূতির প্রয়োজন, তাহা কয়জনের আছে?

এখানে সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকগণ একটা কথা বলিতে পারেন যে, কাব্যের ভিতর রস সঞ্চার করিতে যদি অনেকেই অক্ষম, তবে সাহিত্যের ইতিহাসে এত সহস্র সহস্র কবির নাম আমরা পাই কেমন করিয়া? বর্ষে বর্ষে তো জগতে কম কবি জন্মিতেছে না, ইহাদের সকলের কবিতাই কি রসহীন? আমার কথার উদ্দেশ্য কিন্তু সেই রকম নয়। যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাসে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে কবি নন এমন কথা ত আমি বলিই না, পরন্তু এমন অনেক কবি ছিলেন, যাঁহাদের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে থাকা উচিত ছিল কিন্তু রহে নাই। তাঁহারা সকলেই কবি, একথা স্বীকার্য্য। কিন্তু সকলেই প্রথম শ্রেণীর কবি নন। কবিদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগটা নূতন নয়, রস বিকাশ ও আনন্দ প্রদান শক্তির তারতম্যানুসারে এই শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কবিতার ভাব যেখানে গভীর, সেখানে সত্য, সেখানে রস ও আনন্দ। গভীরতা যেখানে কম, আনন্দও সেখানে তদনুযায়ী কম হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্যই এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, একই কবিতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আনন্দ লাভ করে। একই কবিতা একজনের কাছে হয় ত খুব ভাল লাগে, আর একজনের কাছে নিতান্ত অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা লইয়া যে আজকাল মতনৈক্য দেখা যাইতেছে, উহাই এ বিষয়ে একটী জ্বলন্ত সাক্ষ্য। বিদ্যাপতি বা জ্ঞানদাসের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সময়ের যুবকদল যে আনন্দ পান, শুনিয়াছি বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে সে রস ও সে আনন্দ অনেক উচ্চতর ভাবাপন্ন। এমত অবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে কাব্যের গভীরতা বুঝিবার উপায় কি? কোন পাঠকেই হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি চাপিয়া রাখিয়া কাব্য পাঠ করেন না। কাজেই কবির ভাবের সঙ্গে পাঠকের ভাবের মিলন হইয়া রসসৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবু বোধ হয় এ কথাটা সত্য যে কাব্যের ভিতরে কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বিশেষ ভাবে নিহিত আছে। বিশেষ কোন একজন পাঠকের ভাল লাগা না লাগা দিয়া কাব্যের বিচার করিতে গেলে সে বিচারে ভুল হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছোট শিশু, হয় ত মায়ের মুখে "তাই তাই তাই মামা বাড়ী যাই" প্রভৃতি সুরযুক্ত ছড়াগুলি শুনিয়া খুব আনন্দ পাইতে পারে; এই শিশুটীর কাছেই যদি কবিতাবৃত্তির রীতিনীতিগুলি পালন করিয়া, কেহ জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে থাকেন,—

"বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে।
সবাই স্বাধীন এই বিপুল ভবে॥"

কিম্বা কেহ যদি বলিতে থাকেন,—

"সাধিতে প্রতিজ্ঞা যদি হয় প্রয়োজন
উপাড়িব একা নভ নক্ষত্র মণ্ডল
সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন
লইব ইন্দ্রের বজ্র পাতি বক্ষঃস্থল ॥"

তবে শিশুটী আনন্দ না পাইয়া হয়ত তাহার মায়ের বুকে ছোট মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে থাকিবে। এইরূপ অবোধ শিশুহৃদয় প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের ভিতরও যে নাই এ কথা বলা যায় না। কাজেই কাব্যের গভীরতা বুঝিতে হইলে পাঠকের ভাব গ্রহণের শক্তি দিয়া তাহার পরিমাপ করা চলে না। Browning বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনেকে বুঝেন না বলিয়া উহাকে অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া উপেক্ষা করা খুব সদ্বিবেচনার কাজ নহে। Wordsworth বলেন, যিনি নিজে কবি, তিনি যদি দার্শনিকের মত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে কাব্য সমালোচনা করেন, তবে সেই মতের দ্বারা কাব্যের বিচার হইতে পারে, আমাদেরও মনে হয়, যিনি কাব্য প্রিয় এবং বুদ্ধিমান, একটী কবিতা দেখিলেই তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন, উহা কোন্ শ্রেণীর কবিতা।

কিন্তু অনেক এমন কবি আছেন, তাঁহাদের অনুভূতিগুলি খুবই প্রবল এবং খুবই গভীর; অথচ তাঁহার কাব্যের সকল স্থানে সেই অনুভূতি ও রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। "To be or not to be, that's the question" এইরূপ গভীর ভাবাপন্ন কবিতা Shakespeare এর মধ্যেও খুব বেশী বোধ হয় পাওয়া যাইবে না। Hamlet, Lear বা Othelloর কথাগুলির সঙ্গে Polonius, Goneril এবং Iagoর কথাগুলি তুলনা করিয়া পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, পুর্ব্বোক্ত চরিত্র কয়টীর কথাগুলি কত গভীর,—যেন অতলস্পর্শ, যেন হৃদয়ের রক্ত দিয়া লেখা; আর শেষোক্ত চরিত্র কয়টীর কথাগুলি কত হাল্‌কা,—যেন সাধারণ ঘরের কথাবার্ত্তা। কিন্তু ইহাদের কথা শুনিয়া আমরা উহাদের কবিকে অগভীর বলিতে পারি না। Hamlet এবং Lear গভীর রহস্যের ভিতর হইতে আসিয়া একটা গভীর রহস্যের মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহাদের পশ্চাতে সমুদ্র, সম্মুখে সমুদ্র, উপরে বিশ্বধ্বংসী ভীষণ ঝটিকা; তাঁহারা একটা উত্তাল জলোচ্ছ্বাসের মত এই সমুদ্রের ভিতর হইতে উঠিয়া সমুদ্রে মিলাইয়া গিয়াছিলেন, Polonius প্রভৃতি নিতান্তই এই সংসারের লোক; তাহারা কোন বিষয়েই গভীর ভাবে চিন্তা করিতে পারে না। তাহারা ক্ষুদ্র নদীর ভিতর ক্ষুদ্র জলবুদ্বুদ। কাজেই দেখা যাইতেছে, কাব্যের গভীরতাটী আলোচ্য বিষয়ের গভীরতা বা অগভীরতার উপর নির্ভর করে, আলোচ্য বিষয় যদি গভীর হয়, এবং কবি যদি সেই গভীর বিষয়গুলি ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তবেই তাঁহার কবিতাগুলিও গভীর ভাবাপন্ন হয়। আলোচ্য বিষয় গভীর হইলেও, কবির অক্ষমতা হেতু অনেক সময়ে তাঁর কবিতাগুলি নিতান্ত হাস্যস্পদ বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Kyd এর "Spanish Tragedy" বা Shakespeareএর "Titus Adronious" এর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, উহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি যে অগভীর এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু কবি চরিত্রগুলি এমনি ভাবে হত্যা করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে ভয় হয়, পাছে কবির উলঙ্গ কৃপাণি তাঁহার চরিত্রগুলি ত্যাগ করিয়া পাঠকদিগকেই বা এক ঘা মারিয়া বসে। তবু কিন্তু এ কথাটা ঠিক যে বিষয়ের গুরুত্ব হেতু এই দুই খানি নাটকেও গভীর ভাবের দুই একটী কবিতা বেশ ফুটিয়াছে।

আলোচ্য বিষয় গভীর হইলে কাব্যে যে গভীরতা হয়, উহা তাহার প্রকৃতিগত গভীরতা। কিন্তু বিষয় ভেদে, এই গভীরতার মধ্যেও তারতম্য দৃষ্ট হয়। সকল বস্তুরই দুটী দিক আছে,—বাহিরের দিক এবং ভিতরের দিক। বাহিরের দিকটা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য,—চক্ষু কর্ণ নাসিকা দ্বারা আমরা তাহার বিচার করি; ভিতরের দিকটা মন বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়—চক্ষু কর্ণ দ্বারা তাহা মোটেই বুঝা যায় না। বস্তুর বাহিরটাকে আমরা বাহিরের ইন্দ্রিয় দ্বারাই বুঝিতে পারি; কিন্তু ভিতরটাকে বুঝিতে হইলে, আমাদের

ভিতরের শক্তি দিয়াই বুঝিতে হয়। একটী কমলার বর্ণ, রস, গন্ধ ও আকার আমরা যথাক্রমে চক্ষু, জিহ্বা নাসিকা ও হস্ত দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য, ইহার রস, ইহার স্পর্শ সুখ অনুভব করে কে? আমার চক্ষু কর্ণ? নিশ্চয়ই নয়, উহারা আমার উপভোগের সহায় হইতে পারে; কিন্তু ভোগ করি আমি। মালী বাগান হইতে ফুল আনে আমার ভোগের জন্য; মালী আমার ভোগের সহায়—কিন্তু ভোগে তাহার কোন অধিকার নাই। ইন্দ্রিয় আমার ভৃত্য, আমার সুখের সহায়; কিন্তু সুখ শুধু আমারি—আমার মন বুদ্ধি হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া যিনি রহিয়াছেন—তাঁহারই। দার্শনিক হয়তো এ বিষয়ে আরও অনেক কূট তর্ক তুলিবেন; তিনি হয়তো আমাদিগকে আরও গভীরতার মধ্যে যাইতে বলিবেন—তারপর হয়তো আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন—বাহিরের ওই কমলাটী আর আমার শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রহিয়াছে, উহারা সব এক—সেই এক, একদিন 'এক' ছিল—তারপর সকলের অজ্ঞাত সারে কখন বহু হইয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিকের কাছে অন্তর বাহির, জড় চৈতন্য সব এক—এক মহা প্রাণেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ মালা, কাব্যের কথা বলিতে গিয়া আমরা এত গভীর দূরে যাইতে চাই না; তবু এ কথাটা ঠিক যে, এই গভীরতার দিকে যিনি যত বেশী অগ্রসর হইবেন, তাঁহার কাব্যের ভাবগুলিও তত গভীর হইবে; তিনি যত বাহির লইয়া থাকিবেন, কাব্য তাঁহার তত হাল্‌কা হইবে। সমালোচক Stopord Brooke তাঁহার "Theology in English Poets" গ্রন্থে এ কথাটা বুঝাইয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে বস্তুর ভিতরই বা কি এবং বাহিরই বা কি? বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক এ সম্বন্ধে কি বলেন তাহা আমাদের জানিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকেরও একটা ধারণা আছে। জিনিষগুলি আমাদের কাছে যে ভাবে উপস্থিত হয়—আমাদের বাহিরের ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ঐ জিনিষগুলিকে যে ভাবে গ্রহণ করি বস্তুর সেইটাই সাধারণ অবস্থা বা বাহিরের ভাব। যেমন আছে, ঠিক তেমনটীর কথা যখন বলা হয়, যখন পর্য্যন্ত উহার সঙ্গে আমার হৃদয়ের সম্বন্ধের কথা বলা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে আমরা শুধু বস্তুর বাহিরের কথাই বলিতেছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কমলাটির সঙ্গে আমার হৃদয়ের একটা সম্বন্ধ হইয়া গেল, যখন তাহার বাহিরের আকৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া, দর্শন বা স্বাদ গ্রহণের আনন্দের কথা বলিতে আরম্ভ করি, তখনই বুঝিতে হইবে আমরা ভিতরের কথাই বলিতেছি। তখনই কাব্যের ভিতর ক্রমে ক্রমে গভীরতা আসিতে থাকে। চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে আমরা কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যটা পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। কৃষ্ণ সদ্যঃস্নাতা রাধাকে দেখিয়া আসিয়াছেন এবং বন্ধুদের কাছে আসিয়া বলিতেছেন,—

"শোন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনি মাজিছে গা
যমুনার তীরে, বসি তার নীড়ে,
পায়ের উপরে পা।
অঙ্গের বসন কৈরাছে আসন
আলায়ে দিয়াছে বেণী
উচ কুচ মূলে হেমহার দোলে
সুমেরু শিখর জনি
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্কী চাঁদার
স্মরণ লইল আসি।"

এই ত গেল বাহিরের রূপ বর্ণনা। এই বর্ণনায় আমরা রাধার বাহিরের একটা সৌন্দর্য্যের কথা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই বাহিরের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার হৃদয়ের একটা যোগ একটা সম্বন্ধ আছে। তা না থাকিলে রাধিকার ঐ রূপ, ঐ যৌবন, ঐ এলায়িত কেশপাশ আমাদের নিকট মূল্যহীন হইয়া যাইত। বাহিরের ঐ রূপ,

ঐ যৌবন, তখনই পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে, যখন আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লয়। পুষ্পের সৌন্দর্য্য তখনই সার্থক হয়, যখন উহা ফলের ভিতর পরিণতি লাভ করে। এখানেও তাহাই হইয়াছে। বাহিরের সৌন্দর্য্য ভিতরে আঘাত করিয়াছে, সেই আঘাতের ফল,—

চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর
সেই হতে মোর হিয়া নহে থির
মনমথ জরে ভোর।

ইহার পর কৃষ্ণ আবার সখিদের কাছে বলিতেছেন,—

"সেই মরম কহিনু তোরে,
আর নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
আকুল করিল মোরে।"

এইস্থানে দেখা যাইতেছে হৃদয়ের ভাবগুলি নিতান্তই ইন্দ্রিয় সঞ্জাত। যৌবনের প্রথম অবস্থায় এমনই হয় বটে, কিন্তু বিরহের অনলে বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের সৌন্দর্য্যটা যখন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, তখন রাধা বা কৃষ্ণের আর এইরূপ প্রবল ইন্দ্রিয় তাড়না নাই। তখন তাহাদের মিলন ভিতরে ভিতরে—হৃদয়ে হৃদয়ে। তখন রাধিকা বলেন,—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
যে মোর ভরম ধরম করম
যে তোর করুণা, না জানি আপনা
আনন্দে ভাসি নিতি
তোমার আদরে সবে স্নেহ করে
বুঝিতে না পারি রীতি।"

উপরের দুটী কবিতা মিলাইয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন বাহিরের কথা ছাড়িয়া কবি যতই ভিতরের দিকে যাইতে থাকেন, কাব্যের ভিতর ভাবের গভীরতা আপনা আপনই ততই কেমন ফুটিয়া উঠে। ভগবান নিতান্তই ভিতরের জিনিষ। তিনি ইন্দ্রিয়ের ত অতীতই; দর্শনের সূত্রানুসারে তিনি বাক্য ও মনেরও অতীত। কাব্য কিন্তু বাক্য ও মনের অতীত কিছু কল্পনা করিতে পারে না। কাজেই কাব্যের ভিতর আমরা তাহার যে আভাসটী পাই তাহা আমরা হৃদয় দিয়াই অনুভব করিতে পারি। তিনি "নিতুই নব নব রূপে' আমাদের ভিতর বিকশিত হইতেছেন। আমরা বুঝিতে পারি,—

"নয়ন তাহারে পায়না দেখিতে
রয়েছে নয়নে নয়নে।"

আমরা তাঁহাকে পাইতে চাই হৃদয় দিয়া; আমাদের বাসনা কামনা সর্ব্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া আমরা তাঁহার পায়ের নীচে লুটিয়া মরিতে চাই। তাহার কাছে আমরা শুধু এই বলিতে চাই,—

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব।"

যিনি আমাদের এ 'বুকচেরা ধন পরাণ রতন,' তাহার কথা কি আমরা হাল্কা ভাবে বলিতে পারি? এই অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক যুগেও কবি-হৃদয় তাঁহার সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সম্বন্ধটা অটুট রাখিয়াছে। কবি এ সম্বন্ধের কথা যে ভাবে গাহেন, বৈজ্ঞানিক সে ভাবগুলি বুঝিতে পারেন না, এই জন্যই বোধ হয় ভগবান্ সম্বন্ধীয় কবিতা গুলি এ যুগে Mystic আখ্যা পাইয়াছে।

ভগবানের পরেই মানব হৃদয়ের গভীর ভাবগুলি কাব্যে গভীরতা সৃষ্টি করে। মানব হৃদয়ের গভীরতাটা বুঝিতে পারিলেই কাব্যের গভীরতাটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। বস্তুর যে অন্তর বাহির দুটী দিক আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহার প্রত্যেকের ভিতরেই আবার অনেক গুলি স্তর আছে। যে কোন কারণেই হোক, আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে স্বাদেন্দ্রিয়কে, স্বাদেন্দ্রিয় হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে শ্রবণ বা দর্শনেন্দ্রিয়কে উচ্চ স্থান দেই। আমাদের অন্তরের ভাবগুলির মধ্যে ও আবার এইরূপ স্তর বিন্যাস আছে। স্পর্শ সুখ হইতে দর্শন সুখকে আমরা উচ্চতর বলিয়া মনে করি। ইন্দ্রিয়ের এবং সুখের এই যে স্তর বিন্যাস,—ইহার কি কোন

কারণ নাই? আমার ত মনে হয় দর্শন হইতে যে অনুভূতি তাহা স্পর্শানুভূতি অপেক্ষা গভীর বলিয়াই আমরা এইরূপ করি। স্পর্শানুভূতিটা নিতান্তই রক্তমাংসের সহিত জড়িত; কতকগুলি বলবান ভোগ বাসনা ইহার প্রতিরোমকূপে দিবানিশি জলিয়া মরিতেছে। এই দুর্দ্দমনীয় বাসনা লইয়া কেবলই মনে হয়,—

বরিখ বরিখ করি সময় গোয়ানু
খোয়ানু এতনু আশে
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে?
অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে
ইহ নব যৌবন বিরহে গোয়ায়ব
কি করব সোই পিহা লেহে

এখানে কেবলই ভোগবাসনার কথা বলা হইতেছে কিন্তু এই স্পর্শ কাতরতা একদিন চলিয়া যায়; তখন আমাদের সুখ পিপাসা হৃদয়টী বুঝিতে পারে

কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলী
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি

এই যে হিয়া দগদগি পরাণ পোড়ান ভাবটা স্পর্শের সঙ্গে যতটা লাগিয়া থাকে দর্শনের সঙ্গে তত নয়। 'পরশন নাই দিলে দরশন দিও,' এই কথাটা অন্তঃপুর হইতে অনেকেই অনেকবার শুনিয়াছেন এবং কথাটার মধ্যে যে কতকটা গভীরতা আছে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

এইত গেল বাহির এবং অন্তরের তুলনায় অন্তরের গভীরতার কথা। এই বার বাহিরের কথা বাদ দিয়া শুধু অন্তরের ভাবগুলি আলোচনা করা যাক্। আমাদের অন্তরের ভাবগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে একটা সুখের বা আনন্দের দিক, আর একটা দুঃখ বা বেদনার দিক। ইংরেজী মনোবিজ্ঞানে এই ভাবগুলিকে Pleasure এবং Pain এর মধ্যে ভাগ করা হইয়াছে। এই আনন্দ ও বেদনা দুটা জিনিষই অন্তরের ভাব। কিন্তু ইহার মধ্যেও গভীরতার তারতম্য করা যায়। এইরূপ তারতম্য করিতে গেলে দেখা যাইবে সুখ হইতে দুঃখ গভীর; আনন্দ অপেক্ষা বেদনাটা আমাদের হৃদয়কে বেশী অভিভূত করে; হাসি অপেক্ষা বিষাদের ভাবটা আমাদিগকে বেশী গম্ভীর করিয়া তোলে। সুখ দুঃখ মানসিক ভাবগুলি বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান' খুবই কঠিন; তবু এটুকু আমরা বেশই বুঝিতে পারি যে আনন্দ অপেক্ষা বেদনাটা অনেক গভীর, কবি যখন মানবহৃদয়ের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিতে বসেন তখন দুঃখের গান বেদনার গান ও বিষাদের গান গুলিই স্বভাবতঃ গভীর হইয়া উঠে। আনন্দের গানে যে গভীরতা নাই এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু বিষাদ সঙ্গীতের মধ্যে যে করুণ সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, আনন্দের গানে, হর্ষের গানে সে সে গভীরতা সে করুণ সুর ফোটে না। মেয়েরা কথায় বলে 'হাসিতে মুকুতা ঝরে অশ্রুতে মাণিক'। অবশ্য উপকথার ভিতর এই কথাটার অর্থ ভিন্নরূপ কিন্তু কাব্যের সুখ দুঃখের কথার এই ছড়াটীর উল্লেখ করিতে গেলে ইহার মধ্যে বেশ একটী সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায়। মানুষের মুখের হাসিটি বেশ চক্ চক্কে ঝক্ ঝকে মুকুতার মত; কিন্তু জহুরী জানে মুকুতার চেয়ে মাণিক্যের মূল্য অনেক বেশী। লোকে যে কথায় বলে 'সাত রাজার ধন একটী মাণিক' কবি বলেন,—

"Rose is more beautiful when dipt in water
Love is lovelier when washed with tears."

মানুষের হাসিটি শরৎ প্রভাতের শুভ্র শেফালির মত,—একটুখানি নাড়া দিলেই উহা ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে থাকে; অশ্রুটী গোলাপফুলের মত,—হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া লাল হইয়া কণ্টকিত বৃন্তের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইয়া রহে। সে একটুখানি নাড়া দিলে লুটিয়া পড়ে না, কিন্তু তার কাছে গেলে সে হৃদয়ের

সৌরভ দিয়া মানুষকে তুষ্ট করে। কতখানি উষ্ণ রক্ত জল করিয়া দিয়া যে এই এক ফোটা অশ্রু নয়নকোণে ফুটীয়া উঠে, তাহা কি বুঝাইবার কথা? এইজন্যই কাব্যের ভিতর দুঃখ বেদনার কাহিনীগুলি আপনা হইতেই গভীর হয় এবং গভীর হয় বলিয়াই কবি বলিয়াছেন—"Our Sweetest songs are those that tell the sadest thoughts." বেন জন্সনের কাব্যে বিস্তর humour আছে, কিন্তু তাহার সমস্ত নাটকের ভিতর একটী Lear একটী Hamlet বা একটী Coriolanus পাওয়া যায় কি? সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে Hamlet বা Learএর কবি বলিয়াই বেশী শ্রদ্ধা করে। বিদ্যাপতি সুখের কবি—ভোগের কবি; কিন্তু চণ্ডীদাস দুঃখ বেদনার কথা বলিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে যে আসন পাইয়াছেন, বিদ্যাপতি তাহা পাইয়াছেন কি?

দীর্ঘ বিরহের পর, রাধিকা যখন কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তখন বিদ্যাপতির রাধা গাহিলেন,—

আজু রজনী হাম্ ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরনন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহ সন্দেহা॥
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বান অব লাখ বান হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা এই মিলনে আজ কেবলি অশ্রু ফেলিতেছেন, তার রাধা কৃষ্ণ আজ শুধু—

দুঁহু মুখ হেরই দুঁহু আনন্দে
হরষ মলিন ভাবে
হেরয়ি না পারই
অনিমেখ রহল ধন্দে॥"

রাধিকা আজ কৃষ্ণকে বলিতেছেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হ'য়ো তুমি।

রাধার যে আর কেহ নাই; সে জানেনা—

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কারে?

সে আজ কেবলি ভাবিতেছে—

"কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি,
যে ধন তোমায় দিব সেই ধন তুমি।"

তারপর তাহার ভয় হইল, পাছে এই মিলনের মাঝে আবার বিরহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই রাধিকা ভয়ে ভয়ে কহিল –

শোন সুনাগর করি যোড় কর
এক নিবেদিয়ে বাণী।
এই কর যেনে ভেঙ্গে নাহি জানে
নবীন পিরীতিখানি॥

চণ্ডীদাসের রাধা সুখের ভিতর কেবলি দুঃখ দেখিতেছেন; কেবলি তার ভয়, "পাছে হারাইয়া ফেলে চকিতে।" এই সুখ দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে এই হর্ষ আতঙ্কের সংমিশ্রণে চণ্ডীদাসের এই শেষ মিলন বর্ণনাটী অতি সুন্দর হইয়াছে। এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাধিকার আনন্দ ও বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের ভাবগুলি বেশ স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। বৈষ্ণব সাহিত্যের দুঃখের গানগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় জিনিষ। বলিতে দোষ নাই বিদ্যাপতির ভোগ সুখের গানগুলি বোধহয় অনেকেরই চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটায়, পড়িতে পড়িতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর একটা উদ্দাম কামনা বিদ্যুতের মত জলিয়া উঠে। কিন্তু এই বিদ্যাপতিই যেখানে দুঃখের কথা, বিরহের কথা বলিয়াছেন, সেইখানে আমরা

অপরিসীম আনন্দ পাইয়াছি। চণ্ডীদাস যেখানে অবিমিশ্র দুঃখের গান গাহিয়াছেন, সেই সমস্ত স্থানের কবিতাগুলি ভাবে, প্রাচুর্য্যে, অতি মধুর, অতিশয় গভীর হইয়াছে। তার বিপ্রলব্ধা রাধা যখন "বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইয়া" "বঁধু পথ পানে চাহিয়া" দুকান পাতিয়া কুঞ্জদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, তখন—

পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই।

কিন্তু মধু যামিনীর বাসর শয্যা আজ তার নিষ্ফল হইয়াছে, রাধা কহিলেন—

ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
শেষ বিছাইনু ফুলে।
সব হৈল বাসি, আর কেন সই
ভাসাগে যমুনা জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুবক চন্দন
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুল বিরস ফুলহার ফণী
দংশিছে হৃদয় যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার
আর তো না যায় দেখা।
ললাট সিঁদুর মুছি কর দুর
নয়নের কাজর রেখা॥

এই সমস্ত উদ্ধৃত পদাবলী হইতে এখন বোধ হয়, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে কাব্যে, সুখের কথা বলা হয়, তাহার চেয়ে হৃদয়ের শোক দুঃখ বেদনা যে কাব্যের আলোচ্য বিষয়, তাহার ভিতর গভীরতা অনেক বেশী। এই সূত্র ধরিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, মিলনান্ত কাব্য অপেক্ষা বিয়োগান্ত কাব্যের ভাবের গভীরতা অনেক বেশী। এই সূত্র ধরিয়াই এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃতির ভিতর যখন আমাদের হাস্য ও আনন্দের ছবি ফুটিয়া উঠে, তখন উহা আমাদের চিত্তকে যে ভাবে আকর্ষণ করে, তদপেক্ষা, যখন উহার মধ্যে দুঃখ বেদনার কথা ফুটিয়া ওঠে, তখনকার ভাবটী আমাদের প্রাণে বেশী আঘাত করে। এই দুঃখ বেদনার ছাপ লইয়া প্রকৃতি আমাদের কাছে অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়; উহার ভিতরে তখনি আমরা ভাবের গভীরতা দেখিতে পাই। আমাদের মাথার উপরে যখন কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন 'অমা অন্ধকারে' একটা প্রবল,

"Sulpherous and thought-executing fire,
Vaunt couriers to oak-cleaving thunderbolts"

ভীষণ আক্রোশে গর্জ্জন করিতে থাকে, যখন একটা ভয়ানক

"Contentious storm invades us to the skin"

তখন আমরাও Learএর মত গভীর দুঃখে বলিয়া উঠি—

"Oh thou, all shaking thunder,
Strike smite flat the thick rotundity
o' the world."

"বজ্র বজ্র, কোথা তুমি এ সময়?
কালানল ছড়াও চৌদিকে,
সে অনলে ভস্ম হোক পাপ বসুন্ধরা।"

এই সময়ে প্রকৃতির এই তাণ্ডব নৃত্যের সময়ে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম ভাবগুলি প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির আনন্দ মূর্ত্তিতে এত গভীরতা এমন মর্ম্মভেদী করুণ রোদন শুনা যায় না। বসন্তকালটাকে আমরা ৺রামসুন্দর বসাক মহাশয়ের অনুগ্রহে বাল্যকাল হইতেই 'সুখের সময়' বলিয়া জানি। কিন্তু ভৈরবী রাগিণীতে যখন কাহাকেও করুণ সুরে গাহিতে শুনি—

"আর কেন? আর কেন?—
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ?"

তখন আমাদের প্রাণের ভিতর যেন কেমন একটা গভীর বেদনার সুর বাজিতে থাকে; ঐ শুষ্ক পত্র দলিত কুসুমটীর জন্য আমাদের প্রাণে যেন কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়া উঠে। তখন যদি কেহ আসিয়া সাহানার সুরে গাহিতে থাকে—

"মধুর বসন্ত এসেছে
মধুর মিলন ঘটাতে
মধুর মলয় সমীরে
মধুর মিলন রটাতে"

তখন এই বসন্তের সহস্র সুখ স্মৃতি, অলির গুঞ্জন,

ঝরা বকুলের মালা, মলয়ের মৃদু গন্ধ—আমাদের মানস হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন আবেগ কম্পিত হৃদয়ের প্রীতিদান—ঝরা ফুলের মালা গাছি আমাদের কাছে নিতান্তই নগন্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তখন সেই করুণ ভৈরবী রাগিনীতে আমাদেরো বলিতে ইচ্ছা হয়

"এই লও, এই ধর এ মালা তোমরা পর
এ খেলা তোমরা গেল সুখে থাক অনুক্ষণ।"

স্মৃতি মূলক কবিতাগুলি আমাদের কাছে খুবই মধুর লাগে। এই স্মৃতি গুলি যখন দুঃখের সময়ে সুখ স্মৃতির মত আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে, তখন উহা আরও মধুর হয়। সুখের সময় দুঃখের স্মৃতির চেয়ে দুঃখের সময় সুখের স্মৃতিতে গভীরতা বেশী আছে বলিয়া মনে হয়। সুখের স্মৃতিতে দুঃখটী গভীর হয় বলিয়াই সেই কবিতা গুলি এত মধুর। বাসন্তী পূর্ণিমার উৎফুল্ল চন্দ্রকরলেখা খুবই ভাল লাগে; কিন্তু বুকে একটা গভীর নিরাশার বেদনা লইয়া যখন আমরা ওই চন্দ্রের পানে দৃষ্টিপাত করি, তখন এককালে হয়তো সহস্র সুখ স্মৃতি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে; আমরা গভীর দুঃখে তীব্র হতাশায় চন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিতে থাকি—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে?
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে
গগন মাঝারে শশী আসি' দেখা দেয় রে!
তারে তো পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল কেমনে নিবাই রে
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!

এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতে পারে যে, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের গভীর দুঃখ—গভীর বেদনা গুলি যখন আমরা মিশাইয়া লই, তখনই কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনার ভিতর গভীরতা ফুটিয়া উঠে।

কাব্যের গভীরতার সঙ্গে যে কেবল ভাবের গভীরতাই সংশ্লিষ্ট, তাহা নহে। ভাব সংযোগে কাব্য যখন গভীর ভাবাত্মক হয়, তখন ইহাকে আমরা প্রকৃতিগত গভীরতা বলি কিন্তু কাব্যের বাহ্য আকার হইতেও উহার গভীরতার একটা সীমানা পাওয়া যায়। গীতি কবিতায় ভাবের গভীরতা সকল প্রকার কাব্য হইতে বেশী, কারণ ইহার ভিতরে কবি আপন হৃদয়ের গভীর ভাবগুলি প্রকাশ করিতে যেমন সুবিধা পান, অন্যান্য কাব্যে তেমন সুবিধা পান না। অন্যান্য কাব্যের ভিতরও কবি যেখানে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া নিজ হৃদয়ের কথাই বলেন, সেখানে ভাবের এই গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায়। গীতি কাব্যের পর নাটকে, খণ্ডকাব্যে এবং মহাকাব্যে ভাবের গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে। প্রহসনে বা বিদ্রূপাত্মক কাব্যে ভাব গাম্ভীর্য্য খুবই কম। উহাতে মানুষের শুধু বাহিরের দিক দেখান হয়। এখানে অবশ্য এমন কথা বলা হইতেছে না যে, এই সমস্ত কাব্যে ভাব গাম্ভীর্য্য একেবারেই নাই; উহাদের ভিতরও গভীরতা থাকিতে পারে এবং আছে; কিন্তু এই সমস্ত কাব্যে কবিকে একটু বিশেষ ভাবে সংযত হইয়াই চলিতে হয়—এখানে তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রের আদেশ গুলি একটু মানিয়া চলিতে হয়। কাজেই ইহার মধ্যে কবি ইচ্ছামত ভাবের বিন্যাস করিতে পারেন না। এই জন্যই গীতি কবিতার ভিতর কবি যে গভীরতা ফুটাইতে পারেন, এই সমস্ত স্থানে নিজেকে অন্ততঃ আংশিক ভাবে ধরা না দিয়া সে গভীরত ফুটাইতে পারেন না। এই সমস্ত কাব্যে যেখানে ভাব খুব গভীর, বুঝিতে হইবে সেখানে কবি আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। বুঝিতে হইবে নিজেকে তাঁহার বর্ণনীয় চরিত্রের সঙ্গে মিশাইয়া কাব্য লিখিয়াছেন।

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়।

আশা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মহামায়াদের নারী সমিতির অন্য একটী বিশেষ অধিবেশন। এই অধিবেশনে মহামায়া একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিল। প্রবন্ধে বিষয় ছিল "নারী সমিতির ভবিষ্যৎ"! এই প্রবন্ধে ভারতীয় রমণীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা এবং বর্ত্তমানে সেই শিক্ষার প্রথম ভিত্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। তাহার প্রবন্ধের সার কথা এই যে, ভারতীয় নারীর গৌরবকে ভিত্তি করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে নব যুগের পত্তন করিতে হইবে। যাহা হইয়া গিয়াছে সেই অতীত কে সোপান করিয়া আমাদিগকে ভবিষ্যতের উচ্চ গৌরবের দিকে উঠিতে হইবে। ক্রমাগত পশ্চাতের দিকে চাহিলেও চলিবে না অথচ অতীতকেও একেবারে অতীত করিলে চলিবে না। আমাদের জাতীয় নারী জীবনের অভ্যন্তরে যে অতীত মহিমা সুপ্ত হইয়া আছে, সীতার ধৈর্য্য, ক্ষমা ও স্নেহ—সাবিত্রীর পবিত্রতা ও একনিষ্ঠা গান্ধারীর তেজস্বিতা ও ত্যাগ এই সকলের যে একীভূত শক্তি ভারতীয় নারীজীবনকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া যাইতেছে, সেই স্রোতকে আবার সজাগ করিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগের নূতন অবস্থার সঙ্গে একীভূত করিয়া ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপ যুক্ত করিয়া আমাদের সেই পুরাতন পবিত্র এবং সতেজ নারীত্বকে জাগাইতে হইবে।

ইহার জন্য কেবল এই সমিতিতে একত্রিত বক্তৃতা করিলে চলিবে না। এই আদর্শ বুকে লইয়া আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে এই নারীশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নারীশিক্ষাবিস্তারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মহামায়া আজ তাঁহার ভগ্নিদের আহ্বান করিতেছেন। এই কার্য্যে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিতে পারিবেন তাঁহাদিগকেই তিনি আহ্বান করিতেছেন। যিনি বর্ত্তমান সময়ের নারীর দুর্দ্দশার প্রাণে প্রাণে জীবন্ত ভাবে অনুভব করেন নাই তিনি একার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহাদের প্রাণ বাস্তবিকই কাঁদিতেছে, যাঁহারা ভারতের অতীত নারীত্বকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে রাজী তাঁহারাই আসুন। এই আহ্বানে যদি একজন আইসেন তাহাও যথেষ্ট বলিয়া মহামায়া মনে করিবেন।

মহামায়া উপবেশন করিলে তাহার পার্শ্ববর্ত্তীনী লীলাবতী মৃদুস্বরে বলিল "কি ভাই, এসব নূতন গুরু করণের পর থেকে নাকি"। মহামায়া লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিল। সে স্বভাবতই যা কিছু করিত তাহারই মধ্যে আপনার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি দিয়াই করিত আজিকার এই বক্তৃতাটার সময়ে সে যেন তাহার স্বাভাবিক শক্তি অপেক্ষা আরও একটু বেশী শক্তি, বেশী তেজ প্রকাশ করিয়াছিল। সেই জন্য সকল শ্রোতাই কথঞ্চিত অভিভূত হইয়াছিলেন। সেই জন্য লীলার কথায় সে একটু বেশী লজ্জিত হইয়া পড়িল। কারণ এধরণের বক্তৃতা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। সে স্ত্রীলোকের স্বত্ব লইয়াই এতদিন ব্যস্ত ছিল, কিন্তু আজ সহসা সে এক নূতন কথায় এবং অন্ততঃ তাহার পক্ষে এক নূতন ভাবের স্রোতে সকলকে ভাসাইয়া স্বয়ংই কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে।

মহামায়ার বক্তৃতার পর লীলাবতী উঠিয়া, মহামায়ার প্রবন্ধের সমালোচনা করিলেন। লীলাবতী সমালোচনার মধ্যে যথেষ্ট বিদ্রূপ ও নানা বিষয়ে নানারূপ কটাক্ষ করিয়া মহামায়াকে যথেষ্ট বিব্রত করিয়া তুলিলেন।

পরিশেষে একথাও বলিলেন যে আভ্যন্তরিক পৌত্তলিকতার সংস্কার সহস্র শিক্ষাতেও দূর হয় না, তাই এই অদ্ভুত প্রস্তাব লেখিকা করিতে সাহস করিয়াছেন।

লীলাবতীর পরে আরও দু একজন দু এককথা বলিলেন কিন্তু মহামায়া সে সব কিছু শুনিল না। সে কেবল ভাবিতে লাগিল লীলার কথা। লীলার বিদ্রূপ বিদ্ধ হৃদয়ে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, যেমন করিয়াই হউক লীলাকে বুঝাইয়া দিবে যে, যাঁহার নিকট হইতে এই নব ভাব সে পাইয়াছে তিনি এমন করিয়া তুচ্ছ করিবার যোগ্য নন্! যিনি মহামায়ার এ ভাবস্রোতের উৎস কিছুই বলেন না, কিছুই করেন না অথচ তাঁহার কাছে একবার বলিলে আপনা হইতেই এই সকল ভাব হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হয়। তাই সভাভঙ্গের পর যখন লীলা আসিয়া, তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল "মা৷ ভাই রাগ করনা" মায়া তখন কম্পিত কণ্ঠে বলিল "না জেনে না শুনে মিছি মিছি তুমি ওঁর প্রতি কটাক্ষ করলে কেন?

লীলা তাহার বিশাল নয়নে একটা কৌতুকের কটাক্ষ ফুটাইয়া তুলিয়া মহামায়ার পানে চাহিয়া বলিল "চলনা তোমার নূতন গুরুটীর সঙ্গে আলাপ করে আসি; তিনি যদি তোমার মত লোককেও এমন করে ফেলে থাকেন তাহ'লে নিশ্চয় তিনি একটা দেখবার মত লোক।" মহামায়া গর্ব্বিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তোমার সমস্ত রূপ সমস্ত গুণ ছলা চাতুরি আর গর্ব্ব নিয়েও যদি তাঁর কাছে যাও তবু তুমি তাঁর কিছুই করতে পারবেনা।" লীলা তাহার দেহের রূপসাগরের মধ্যে একটা তরঙ্গ তুলিবার জন্যই উন্মুক্ত কেশদামকে দুই হস্তের দ্বারা সলীল ভঙ্গীতে ছড়াইয়া দিল; এবং শেষে মহামায়ার হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহামায়ার গাড়ীতে চড়িল। মহামায়া হাসিয়া বলিল "কি For fresh fields and pastures new নাকি? তাহ'লে আমার ছোটদাটীর কি অবস্থা হবে?"

লীলা। পুরুষ মানুষদের গর্ব্ব নষ্ট করায় কতটা সুখ তা তুমি জান না। তুমি এতদিন মেয়েমানুষের সত্ব আর অধিকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলে বটে, কিন্তু ভগবান যে কাজের জন্য আসলে আমাদের পাঠিয়েছেন অর্থাৎ এই সব দুর্দ্ধর্ষ গর্ব্বিত ও পশুর মত বলবান মানুষ গুলোকে পোষা জন্তুর মত পেছনে পেছনে টেনে নিয়ে বেড়াতে তা'তে তোমার মোটেই চেষ্টা নেই। এই খানেই তোমার সঙ্গে আমার অমিল। তোমার আজকের বক্তৃতাটা শুনে সেই অদ্ভুত জীবটীকে দেখতে ইচ্ছা করছে যে, তোমার মত পুরুষের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন লোকটিকেও শেষে এই রকম করেছে।

মায়া। তুমি কি এই রকম মন নিয়ে ছোটদাকে এমন করে তুলেছ তা'হলে ত তাঁকে সাবধান করে দিতে হচ্চে।

লীলা। এ বিষয়ে তাঁর মতটা ঠিক আমারই মত দেখতে পাবে। তিনিও বলবেন যে মেয়ে মানুষের পায়ে পায়ে ঘুরবার জন্যই পুরুষমানুষের জন্ম।

মায়া। এবং তারপর যখন পা হতে মাথায় উঠবেন তখন তাঁকে কে সামলাবে? ছিঃ ছিঃ লীলা আমিত পুরুষদেরও ঘৃণা করি না, কিন্তু তুমি, তাই কর। আমি চাই আমাদের সম্মান, তুমি চাও তাঁদের অপমান। তুমি ওঁদের নিয়ে খেলা করতে চাও আমি চাই ওঁদের সমকক্ষ হতে। কিন্তু সাবধান ভাই, কখন যে কি হ'তে কি হয় কে বলতে পারে?

লীলা। কোন ভয় নেই ভাই আমি ঠিক আইন নিয়মেই চলব। এখন তোমার বর্ত্তমান মহাপুরুষটীর একটু পরিচয় দাও। তোমার দাদার কাছ থেকে কতক জানতে পেরেছি বটে, কিন্তু আসল মানুষটা তিনি ধরতে পারেন না, বা পারলেও বলতে পারেন না। হাতের কাছে যা পান তাই নিয়েই তিনি এত ব্যস্ত থাকেন যে, পরের খবর তাঁর কাছ থেকে সঠিক পাওয়া যায় না।

মায়া। এমন লোকটীকে ছেড়ে তুমিই বা পরের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? আর তাঁর পরিচয়ই বা

কি দেব? আমি কতটুকুই বা তাঁর জানি?

লীলা। তুমি এতটা মুগ্ধ হ'লে কি করে?

মায়া। মুগ্ধ! মুগ্ধ করবার মত তাতে কিছুই পাবেনা। আমার সঙ্গে তেমন করে কথাই বলেন না। সর্ব্বদা আপন ভাবে বিভোর হয়ে আছেন।

লীলা। আচ্ছা আজ দেখ আমি এমনি করে তাঁকে বশ করে নেব, যে তাঁর সমস্ত ঝুলি এক নিমিষেই শূন্য হয়ে যাবে।

দুই বন্ধুতে গল্প করিতে করিতে তাহারা মহামায়াদের বাটীতে উপস্থিত হইল। মায়া তাহাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিল "ভাই তুমি ত এলে কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কি করে?

লীলা। বা সে কি কথা আমায় এতদূর এসে ফিরিয়ে দেবে নাকি? তোমার ছোটদাটিকে ডাক, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছেন, আমি আগে হ'তে বলে রেখেছি।

মায়া। এ আগে হইতেই ষড়যন্ত্র চলছে দেখছি! তুমি মাসীমার সঙ্গে দেখা করগে আমি ছোটদাকে ডাকি।

লীলা ভিতরে চলিয়া গেল। লীলার পিতা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র কন্যাদের নানারূপে শিক্ষিত করিয়া সংসারে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবার পূর্ব্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। লীলার দাদা শশীশেখর একজন উদীয়মান ব্যারিষ্টার। তিনি লীলার শিক্ষাদি সম্পূর্ণ করিয়া এখন উপযুক্ত পতির হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিতে সচেষ্ট। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে ও মাতার অত্যধিক আদরে এবং পিতৃ সম্পত্তিতে তাহার ভ্রাতার তুল্যাধিকারিণী হওয়াতে সে অনেকখানি কতককটা স্বাধিনতা পাইয়াছিল। সেইজন্য এখনও তাহার বিবাহ কেহ দেওয়াইতে পারে নাই। যদিও অনেক উপযুক্ত পাত্রই তাহার করপ্রার্থী হইয়া ঘুরিতেছিল তথাপি সে কাহাকেও এতাবৎ মনোনীত করে নাই। উপরন্তু শিবব্রতের দিকে তাহার একটু বেশী ঝোঁক থাকায় এ বিষয়ের শেষ ফলের জন্য তাহার মাতা ও ভ্রাতা অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবব্রতও বলিয়াছিল যে, সে যদিও হিন্দু সন্তান তথাপি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া লীলাকে বিবাহ করিবে, আর যদি লীলার মত হয় তাহা হইলে বিবাহ করিয়াই বিলাত চলিয়া যাইবে। শিবব্রতের পিতা এবিষয়ে কোন বাধা দেন নাই, এবং শিবব্রতও এবিষয়ে তাহার ভ্রাতা বা ভগ্নীকে কোন কথা তেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া বলে নাই। এই জন্য তাহার এই ব্যাপারে প্রিয়ব্রত ও মহামায়া অনেকটা অজ্ঞই ছিল।

মহামায়া অনুসন্ধান করিয়া যখন শিবব্রতের কোনই সংবাদ পাইল না তখন লীলাকে গিয়া সেই সংবাদ দিল। লীলা বলিল "সে হচ্চে না অন্ততঃ চল ওঁদের বাড়িতে গিয়ে আলাপ করে আসি।" মহামায়া হাসিয়া বলিল "চল।" উভয়ে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় শিবব্রত বিষ্ণুকে লইয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতে বিষ্ণুকে দেখিয়া লীলা মায়াকে জিজ্ঞাসা করিল উনিই কি তিনি?" মহামায়া বলিল "হাঁ"।

শিবব্রত অগ্রসর হইয়া বলিল "লীলা, ইনিই আমাদের বিষ্ণু দাদা!" বিষ্ণু লীলাকে নমস্কার করিয়া বলিল "দিদি! আজ আপনার কথা শুনাতে শুনাতে আপনার প্রশংসা করিতে করিতে ইনি প্রায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। আপনাকে দেখে বুঝতে পেরেছি যে, এ প্রশংসা অযোগ্য হয়নি। এমন দেবীর মত যাঁর রূপ না জানি তাঁর মনটী আরও কত সুন্দর!"

লীলা প্রথমটা একেবারে অবাক হইয়া গেল! বিষ্ণু যে ভাবে কথা বলিল তাহার মধ্যে লজ্জা বা দ্বিধা বা কুণ্ঠার লেশ মাত্র ছিল না। প্রথম পরিচয়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকে বিষ্ণু যেন তাহার কিছুই অনুভব করে না। ইহার সরল প্রশান্ত হাস্যোজ্জল তরুণ মুখশ্রীর মধ্যে যে বলিষ্ঠ পুরুষত্ব ছিল তাহা এক নিমেষের মধ্যে লীলার নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিল। বিষ্ণুর এই অপ্রত্যাশিত আত্মপ্রকাশে সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "বাহির দেখেই কি মানুষের ভেতরের কথা বুঝিতে পারা যায়?"

বিষ্ণু। যায় না? আমার ত মনে হয় খুব যায়। যে

যেমন লোক ভগবান তার চারদিকে তেমনি একটা ভাব দিয়ে তাকে ঘিরে রাখেন।

মায়া। আপনি হয়তো আপনার নিজের ভাবটী দিয়ে পরকে দেখেন তাই আপনার ঐ রকম মনে হয়।

শিব। তা' এখানে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তার দরকার কি? চলুন বিষ্ণুদা আমার ঘরে গিয়ে বসিগে।

সকলে শিবব্রতের কক্ষে গিয়া আসন গ্রহণ করিলে বিষ্ণু বলিল "আজ শিবব্রত আপনার গানের খুব প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন যে আপনি গানের মধ্যে এমন একটা ভাব প্রকাশ করতে পারেন যা হয়তো কবির মনের মধ্যেও ছিল না। আপনি একটা গান করুন।"

লীলা। আমার গান উনি যেমন প্রশংসা করেছেন তেমন যদি না হয় তা হ'লে আপনার ভ্রম কেটে যাবে তার চাইতে আপনার পক্ষে ওটা অশ্রুতই থাক।

শিব। কেন? কেন? গাওনা লীলা?

লীলা। যদি ঐ একটি মাত্র লোভেও উনি আমাদের সঙ্গে বেশী করে পরিচয় করেন তারই জন্য আজ আমি গাইব না। আর এক দিন যদি দয়া করে আমাদের ওখানে যান তাহ'লে আপনার যত ইচ্ছে তত শুনিয়ে দেব, আজ থাক।

বিষ্ণু। আপনার পরিচয় আমি যথেষ্ট পেয়েছি। প্রিয়ব্রত গিরীন বাবু আজ ক'দিন হতে এঁরই হাতে আমায় সঁপে দিয়ে নিজেদের কাজে ব্যস্ত আছেন। আমার মত বেকার লোকটীকে নিয়ে ইনি কি করবেন স্থির না করতে পেরে ক্রমাগত আপনার পরিচয় আমার কাছে দিয়েছেন। আপনি যখন শিবব্রতের এত পরিচিত তখন আমারও আপনি নিকট আত্মীয়। আপনার পরিচয়ে আর প্রয়োজন নেই, আপনি নিঃসঙ্কোচে গান করুন। আজ আপনার গান শুনব তারপর অন্য সময়ে আপনার অন্যান্য গুণপণার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেব।

মহামায়া নীরবে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল এবং লীলার ভাবগতিক লক্ষ্য করিতেছিল। লীলা তাহার দিকে চাহিতেই সে গম্ভীর ভাবে বলিল "তা গাও না।"

লীলা উঠিয়া অর্গানের নিকটে গিয়া বসিল। শিবব্রত আরও দুইখানি চেয়ার টানিয়া তাহার নিকটে স্থাপন করিয়া বলিল "আসুন এইখানে বসি।"

বিষ্ণু বলিল "কোন প্রয়োজন নাই, আমি এইখান থেকেই বেশ শুনতে পাব।"

লীলা গাহিল—

"জীবনে আমার যত আনন্দ
পেয়েছি দিবস রাত,
সবার মাঝারে তোমারে আজিকে
স্মরিব জীবন নাথ!

লীলা স্বভাবতই সুকণ্ঠ, তাহার উপর আজ যেন সে জগৎ জয় করিবার জন্য তাহার শিক্ষার ও ইচ্ছার সমস্ত শক্তি তাহার স্বর তরঙ্গের মধ্যে ঢালিয়া দিয়াছে। বিষ্ণু নীরবে নিমীলিত নেত্রে শুনিতেছিল। গানটী শুনিতে তাহার সমস্ত দেহ মন হর্ষে কণ্টকিত এবং তাহার গৌর দেহ আরও যেন দীপ্তিশালী হইয়া উঠিল। গান থামাইলে শিবু ও লীলা উঠিয়া আসিতেই সাশ্রুলোচনে বিষ্ণু বলিল "আজ আপনারা আমায় যে আনন্দ দিলেন তার বিনিময়ে দেবার মত কিছুই আমার নাই। মায়া—আপনি কেন এমন গাইতে শেখেন নি?"

মায়া লজ্জিত হইয়া বলিল "সকলের চেষ্টা ত' এক দিকে যায় না।"

বিষ্ণু। কিন্তু এই রকমে আনন্দ দিতেই আপনাদের জন্ম সংসারের বাইরে যখন এত হানাহানি কাটাকাটি তখন আপনারাই ত সেই হানাহানির বিষকে সুধায় পরিণত করবেন; সেইত আপনাদের চরম সার্থকতা। কে কোথায় কি কচ্ছে, কোথায় কি উত্থান পতন হচ্ছে, এ জেনে মানুষের কতটুকু লাভ? কিন্তু এই আনন্দময়ীর জগৎ পরিবারের মধ্যে যে যতটুকু আনন্দের সুধা সঞ্চিত করে রেখে যেতে পেরেছে সে ততটুকুই কাজ করেছে। দিদি আপনি যদি শ্রান্ত না হয়ে থাকেন তাহ'লে আর একটী গান করুন। আহা

গিরীনবাবু থাকলে বেশ হ'ত, তিনিও খুব চমৎকার গাইতে পারেন।

লীলা। না আজ আর নয়, আমি নারী সমিতি হতে এখনও বাড়ি ফিরিনি, মা হয়তো ভাবছেন।

শিব। আর একটু বস না। মায়া লীলার জন্য জলখাবার জোগাড় কর্ত্তে বলে দাও।

লীলা। সে কাজ আগেই সেরে নিয়েছি। এখন আমি চল্লাম। কাল্‌কে আমার ওখানে যাবেন ভুলবেন না।

মহামায়া লীলার সঙ্গে বাহিরে গিয়া, তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল "লীলা, এমন মানুষের ওপরে তুমি অত্যাচার করবে?"

লীলা। এ বিষয়ে আমার দয়ামায়া নেই। আজ এই লোকটী আমার যে অপমান করেছে, তা এজন্মে ভুলব না।

মায়া। অপমান? কি অপমান করলেন?

লীলা। আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তুমি আমায় বাধা দিও না মায়া, আমি এই দাম্ভিক পুরুষটীকে বুঝিয়ে দেব যে, আমরা উপেক্ষার জিনিষ নই।

মায়া। কি ভয়ঙ্কর! অপমান করেছেন, না তুমি যে মান্যের অনুপযুক্তা তাই দিয়েছেন! মেয়ে মানুষকে কেবল নায়কের চক্ষে প্রেমিকের চক্ষে না দেখলে কি তাকে অপমান করা হয়? আমরা কি মানুষ নই? আমরা কি কেবল পুরুষ মানুষের মন কুড়িয়ে লালসা কুড়িয়ে বেড়াব? ধিক্ তোমায় যে তুমি ওঁর এত বড় সম্মানকেও অসম্মান বলে গ্রহণ করেছ! তোমার এই কথায় আমি বুঝতে পেরেছি কেন আমরা শেষে পুরুষের দাসী হয়ে যাই। যারা এ রকমের মন নিয়ে পুরুষের কাছে যায় তাদের শেষে দাসী হওয়াই উচিৎ, নইলে সংসার টিকতে পারত না, উচ্ছৃঙ্খলতায় আর দুর্নীতিতে সে এতদিন রসাতলে যেত।

লীলা। Hear hear. বক্তৃতাটী মন্দ করনি। এখন তবে আসি ভাই। কিন্তু যাই কর তোমার গুরুটীকে আমার হাত থেকে আর রক্ষা করতে পারবে না।

মায়া। সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত আছি। ওঁকে এই কয় দিনে যদি চিনতে না পেরে থাকি তাহ'লে বুঝব যে, সংসারে সবই মায়া ভোজবাজী।

লীলা হাসিতে হাসিতে গাড়িতে গিয়া চড়িল।

গিরীন্দ্রনাথ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু সে উদ্যোগী পুরুষ। সেই জন্য সে ধীরে ধীরে প্রিয়ব্রতের সাহায্যে এবং আপন অদম্য কর্ম্মতৎপরতায় কৃতী হইয়া উঠিতেছিল। সে কতকগুলি দরিদ্র ভদ্রসন্তানকে নানা কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, তাহাদের এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনারও আর্থিক উন্নতি করিয়া লইতেছিল। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থকে মিলিত করিয়া সে এমন দু একটী প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়াছিল যাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যৌথ-ক্রয়-বিক্রয় মণ্ডলী এবং কৃষিশিল্প শিক্ষক ও পরিদর্শক মণ্ডলী এই দুইটীই প্রধান। গিরীন্দ্রের সহকারীগণের মধ্যে একদল গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া সেই স্থান হইতে গ্রামজাত সমস্ত দ্রব্য সম্ভার একত্রিত করিয়া কলিকাতা বা অন্যস্থানে পাঠাইয়া বিক্রয়ের সুবিধা করিয়া দিত। এই বিক্রয় মণ্ডলীতে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহারা সকলেই এই মণ্ডলীর অংশীদার। ইহাতে দ্রব্য প্রস্তুতকারকগণের মধ্যেও অনেকে অংশীদার হইয়াছিল। ইহাতে ফল হইল এই যে দ্রব্য প্রস্তুতকারকগণ তাহাদের দ্রব্যের লাভ ত পাইতই উপরন্তু মণ্ডলীর অংশীদারের লভ্যাংশ পাইত। এই কারণে তাহারাও একদিকে যেমন লাভের জন্য এই মণ্ডলীতে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য তেমনি একটী প্রতিষ্ঠানের অধীন থাকাতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত থাকিত।

কৃষিশিল্প শিক্ষক পরিদর্শক মণ্ডলীর কার্য্য ছিল ঠিক এর উল্টা। এই মণ্ডলীর প্রধান কার্য্য ছিল শিল্পও ও কৃষিকার্য্য পরীক্ষা করা এবং শিল্পী ও কৃষকগণকে দ্রব্য জোগান, নানা স্থান হইতে দ্রব্যাদি ও বীজাদি যোগাড় করিয়া এই মণ্ডলীর কর্ম্মীগণকে একদরে জোগাইয়া দিতে এবং বাজা' কি

দেশের দ্রব্যের কাটতি হইবে তাহারা সংবাদ জানাইয়া দিতে। এতদ্ব্যতিত কৃষকগণকে তাহাদের জমির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কি কি সারাদি লাগিবে ইহাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা ও সেই দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বা যোগাড় করিয়া দিতে হইত। এই কারণে গিরীন্দ্রনাথ কয়েকটী উৎসাহী গ্রাম্য যুবকদের দ্বারা তাহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রামে এক একটী গোশালা ও সামান্য সামান্য পরীক্ষাগার স্থাপিত করিয়া তাহারই সংলগ্ন জমীতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র ও গোষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাতে উহাদেরও অন্ন সংস্থানের উপায় হইয়াছিল উপরন্তু ঐ সকল গ্রাম্য যুবকগণ ও মণ্ডলীর অংশীদার হওয়ায় তাহাদের কর্ম্মের ও স্বার্থের ঐক্য সংঘটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এই কারণেই আবার সে কতকগুলি স্বার্থপর জমিদার ও ঋণদাতা মহাজনের বিষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিল। তাহার চেষ্টায় দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবীগণের অনেক দুঃখের লাঘব এবং জমিদারদিগের অত্যাচারের অসুবিধা হওয়ায় তাহারা গিরীন্দ্রনাথ ও প্রিয়ব্রতের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল দরিদ্র শ্রমজীবী এই মণ্ডলীর আশ্রয়ে আসিয়াছে তাহারা নিয়মিত খাজনা দেওয়ায় ও ঋণ গ্রহণ না করায় যদিও জমিদারের অনেক সুবিধা হইয়াছে তথাপি মানুষের স্বভাবই এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার না করিতে পারিলে তাহারা থাকিতে পারে না। এই কারণে প্রিয়ব্রত একদিন গিরীন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল "দেখ কতকগুলি জমিদারকে আমাদের দলে টানতে হবে। এমন করে বিরোধ জাগিয়ে রাখলে শেষে আমাদের কাজ সবই পণ্ড হবে।"

গিরীন্দ্র। বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে? তাদের স্বার্থের হানি হচ্চে, তারা ত চটবেই।

প্রিয়। শ্যামাচরণকে লাগিয়ে দেওয়া যাক।

গিরীন্দ্র। ও গিয়ে তর্ক জুড়ে দেবে কাজ হবে না।

প্রিয়। তবে তুমিও ওর সঙ্গে যোগ দাও।

গিরীন্দ্র। তার চাইতে গুরুচরণ, ক্ষেমঙ্কর, সতীশ এদের তিন জনকে লাগিয়ে দাও। এরা নিজেরাও জমিদার অথচ এ সব কাজে খুব উৎসাহও আছে। কণ্টকে নৈব কণ্টকং; ওদের নিজের জাত ভাইরা আরম্ভ করলে কাজ সোজা হয়ে আসবে।

প্রিয়ব্রত তাহাই করিল। এবং তাহাতে ফলও একটু আদটু দেখা গেল।

তাহারা এইরূপে ব্যস্ত আছে এমন সময় মহামায়া একদিন গিরীন্দ্রনাথকে পাকড়াও করিয়া বলিল "আপনারা আমাদের অন্ন সংস্থান নিয়েই ব্যস্ত কিন্তু গরীব স্ত্রীলোকদের জন্য কি করছেন? সংসারে অর্থই সব নয়, আরও কিছু দরকার।"

গিরীন্দ্র। সব কাজই যে একদলে করবে এর কিছু মানে নেই। আমরা যা নিয়ে রয়েছি তাই করব, অন্য কিছু করতে গেলে দু নৌকায় পা দেওয়া হবে। স্ত্রী-লোকের সম্বন্ধে কিছু করতে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়।

মায়া। কেন? আপনারা না করবেন ত' কে করবে? আপনারা কেবল নিজেদের দিকটাই দেখবেন? তা হ'লে আমাদের উপায় কি হবে?

গিরীন্দ্র। এতদিন আমরাই পেছিয়ে ছিলাম। আমাদের সংসারের মধ্যে পুরুষত্বহীন পুরুষই বেশী—আফিসে চাকরী আর বাড়ীতে দাবা তাস পাশা এই নিয়েই আমাদের পুরুষদের সময় কাটে। সেইজন্য পুরাপুরী মানুষ খুব কমই জন্মায়। এতদিন পরে আমরা একটু আদটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করিছি এরই মধ্যে শক্তির অপচয় করলে চলবে না। যে কাজে লেগে পড়েছি সেই কাজেই লেগে থাকতে হবে।

মায়া। এটা আপনার বাড়াবাড়ি। এতদিন পুরুষদের মধ্যে পুরুষ জন্মায় নি? তবে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিবেকানন্দ এঁরা কি?

গিরীন্দ্র। এঁরা দিকপালের অংশ! এঁরা লোক শিক্ষার জন্য ভগবানের নিকট হতে চিঠি নিয়ে আসেন। এঁদের দেখে সাধারণ বাঙ্গালীদের বিচার করলে বলতে হয় যে এক শতাব্দির মধ্যে যে বাঙ্গালী এতগুলি মহাপুরুষ জন্ম দিতে পেরেছে, সে বাঙ্গালী একটা মস্ত জাত কিন্তু যারা বাঙ্গালীর ঘরের খবর রাখে তারাই জানে

যে আমাদের ভেতরকার অবস্থা ঠিক তেমন নয়। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ এইটুকু বললেই চলবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে সব চেয়ে উজ্জল চরিত্রগুলি সমস্তই স্ত্রীলোক। বলিষ্ঠ চরিত্র অতি কমই তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। এর দ্বারাই বুঝতে পার যে আমাদের সংসারে পুরুষের পুরুষত্ব বিকাশের স্থান কতটুকু।

মায়া। সামাজিক আদর্শটা civic individualistic নয়। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম Family Idealএর উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এই রকম ব্যাপার ঘটেছে। Familyর বাহিরে আমাদের স্ত্রী পুরুষের অস্তিত্বই নেই। Familyর মধ্যে স্ত্রীলোকের আধিপত্য বেশী তাই বোধ হয় এ রকমটা ঘটেছে।

গিরীন্দ্রনাথ প্রথমটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, কারণ মায়ার নিকট হইতে এ রকম কথা সে মোটেই আশা করে নাই। তাই সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "তাই যদি হয় তা' হলে এতদিন তুমি আমাদের উপর এত খড়্গ হস্ত হয়েছিলে কেন?"

মায়া। খড়্গহস্ত কাজে কাজেই হতে হয়। আপনারা যদি আপন সত্ব অনুসারে কাজ নাও করেন তবুও আপনাদের উপায় আছে—আপনারা ইচ্ছা করলেই সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনাদের যোগ সাধন করে নিজেদের উন্নতির পথ করে নিতে পারেন। কিন্তু আমরা আমাদের সেই পুরাতন Family Idealএর জন্য চিরকালই ঘরের কোণে বদ্ধ থাকব এ হতেই পারে না। আমরাও মানুষ—আমরা কেবল মাত্র সামাজিক কারখানার কলমাত্র নাই। আপনাদের যেমন ভেতর বাহির দুই আছে আমাদেরও কেন তা থাকবে না?

গিরীন্দ্র। সমাজের দু'টো দিক, ভেতর আর বাহির। বাহিরটা যদি আমাদের ভাগে পড়ে থাকে ভেতরটা তোমাদের ভাগে পড়ুক। এই ভাবে উভয়ে উভয়ের কাজ করে চল্লে কারুর সঙ্গে কারুর সংঘর্ষ লাগবে না। কাজও চলে যাবে। আর এটা ঠিক মনে রেখো যে আমরা আমাদের চিরদিনকার আদর্শকে যদি সম্পূর্ণ উল্টে দিই তাহ'লে আমাদের জাতীয়ত্ব বজায় থাকবে না। আমাদের মূলটাকে বজায় রেখে বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুসারে তাকে একটু আদটু কেটে ছেঁটে নিতে হবে। সমাজ তত্ব সম্বন্ধে ইউরোপ চিরদিন এক উত্তর দেয় নি, গ্রীস এক রকম দিয়েছিল রোম আর এক রকম দিয়েছিল!

মায়া। বিশেষ যখন আপনাদের তাতে সুবিধা আছে। না গিরীনবাবু তা হ'চ্ছে না। এখন আর আমরা চুপ করে থাকব না। আমরাও আপনাদের সঙ্গে এক সঙ্গেই চলব। আপনারা যদি আমাদের পেছনে ফেলে বড় হ'য়ে ওঠেন, তাহ'লে দেখবেন আমাদের দুর্গতিতে আপনারাও একসঙ্গে মরবেন। আমার আপনাদের সাহায্য করতে হবে।

গিরীন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "কি করতে হবে বল, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

মায়া। আপনার ও ফাঁকা কথায় আর ভুলছি না। "চেষ্টা করব", "আচ্ছা দেখা যাবে", "তোমরা আরম্ভ কর, আমরাও আছি" এসব ছেলে ভুলান কথা। আপনাদের আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, সম্পূর্ণ এক হয়ে এক ইচ্ছায় এক চেষ্টায় এক প্রাণে এক মনে কাজ করতে হবে, নইলে কিছুতেই শুনব না। আপনাকে বলে রাখছি গিরীন বাবু যে যদি এখনও সাবধান না হন, তাহ'লে শীঘ্রই এমন একটা national crisisএর মধ্যে এসে পড়বেন; ইংলণ্ডের suffragets movementএর চাইতেও ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে।

গিরীন্দ্র। তোমাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াব? কোন্ অধিকারে?

গিরীন্দ্রের এই আকস্মিক প্রশ্নে মায়া দুই হাত পিছাইয়া দাঁড়াইল। তাহার বিশাল নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ গিরীন্দ্রের অবনমিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে গম্ভীরভাবে বলিল "আপনার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। এর মধ্যে অধিকার অনধিকারের কথা তুলছেন কেন?"

গিরীন্দ্র। তোমার মতে পুরুষে চিরদিন স্ত্রীলোকের ওপর অন্যায় এবং জবরদস্তিই করে এসেছে, এখন হঠাৎ যদি আমাদের তোমরা সাহায্য করতে ডাক তাহলে প্রথমে আমাদের স্থির করে নিতে হবে যে আমরা উভয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের উদ্দেশ্যের ঐক্য হ'লেও কার্য্যের ঐক্য চাই। তোমরা এক দিক দিয়ে টান তাতে সুফল হবে না। দেহের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্যের মত আমাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সর্ব্ববিধ ঐক্য চাই। এই ঐক্যটার নামই বলছি অধিকার। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যেটা মিলন স্থান সেইটাকে আগে পরিষ্কার করে নেওয়া চাই।

মায়া। অর্থাৎ আমরা যদি আপনাদের মতে না চলি, আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে আপনাদের না হ'য়ে যাই, তাহ'লে আমাদের আপনারা সাহায্য করবেন না। স্বার্থপরতা যে এর চাইতে উদ্ধত হ'তে পারে তা আমার জ্ঞানে ত' আসে না।

গিরীন্দ্র। তা হবে, আমি যে এ বিষয়ে বেশী বুঝি তা ব'লতে পারব না, তবে আমার মনে হয় যে যদি কেউ কারও উপকার করতে চায় তাহ'লে সম্পূর্ণ তাকে আপনার না ক'রে নিলে তার উপকার কিছুতেই সে করতে পারে না। পুরুষের জন্য যদি পুরুষকে খাটতে হয় তখনও এই নিয়ম, মেয়েদের জন্যও বোধ হয় এই নিয়ম।

মায়া চটিয়া বলিল "পেঁচাল কথা ছেড়ে দিয়ে সোজা বলুন যে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে বিবাহিত না হ'বে, পুরুষের দ্বারা সে স্ত্রীলোকের কোনই উপকার হতে পারবে না।"

গিরীন্দ্র। তা না হ'লে করে এমন দুঃসাহস যে তোমাদের নিয়ে খেলা করতে যাবে? যে যার সম্পূর্ণ আপন সেই তাকে প্রাণ দিয়ে সাহায্য করবে। যে কাজটা পরের জন্য করতে যাব সেটা যদি নিজের ঘর হতে আরম্ভ না হয় ও সেরকম সামাজিক কাজ কিছুতেই সমাজ গ্রহণ করবে না। যে ব্যাপারটা সাধারণের হবে সেটা সমাজের ঠিক অন্তর হ'তে ওঠা চাই।

মায়া। কেন বাহির হ'তে কি সমাজের অন্তরের কাজ করা যায় না? যারা সাধারণকে টেনে তুলবে তারা ত সাধারণের বাহিরেই থাকবে, তা'না হ'লে কাজ করবে কেমন করে? যাঁরা সংসারের মধ্যে নব ভাব প্রবেশ করান তাঁরা ত বাহিরেই থাকেন।

গিরীন্দ্র। তাঁদের কাজ idea দেওয়া—ভাব দেওয়া, কিন্তু ভাব অনুসারে যাঁদের কাজ করতে হবে তাঁরা থাকবেন ভেতরে।

মায়া। আপনার আমার সঙ্গে মতের মিল হল না। তা নাই হক আপনি আমায় সাহায্য করুন। আমি আপনাকে চাই।

গিরীন্দ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার মায়ার দিকে চাহিল তাহার পর বলিল "সত্য বলছ! আচ্ছা বেশ আমি সাহায্য করব, কিন্তু ফলাফলের জন্য আমি দায়ী নই।" মায়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাকালে একটী উজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া লীলা গান করিতেছিল। তাহার ভ্রাতা শশিশেখর কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে ছিলেন। তাহার মাতা একখানি চেয়ারে বসিয়া কি একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে কন্যার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন। লীলার নিকটে আর একখানা চেয়ারে বসিয়া বসিয়া এককাপ চা হস্তে লইয়া শিবব্রত গান শুনিতেছিল। প্রায়ই তাহারা এইভাবেই সন্ধ্যা অতিবাহিত করিত, কিন্তু সেইদিন আর এক ব্যক্তি ঐ কক্ষে উপস্থিত ছিল এবং তাহারই জন্য অন্যকার আয়োজনের মধ্যেও অনেকখানি আড়ম্বরও ছিল। লীলা বামদিকস্থ বিষ্ণুর মুখের দিকে একটা অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে নেত্রপাত করিয়া গাহিল—

ঘাটে বসে আছি আনমনা
যেতেছে বহিয়া সুসময়;
এ বাতাসে তরি বাহিব না
তোমা পানে যদি নাহি বয়।

বিষ্ণু আসিয়া পর্য্যন্ত অধিক কথা বলে নাই, তার বিশেষ কারণ এই মহাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে তাহার প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু লীলা যখন অতি করুণ কণ্ঠে পুরবীর উদাস করা সুরে সেই কক্ষ ভরিয়া ফেলিল, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নেত্র মুদ্রিত করিল। যেন সেই সঙ্গীতধারার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া সে সুস্থির হইল।

কিন্তু যখন লীলা গাহিল—

তীর সাথে হের শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান
রশি খুলে দেবে কবে মোরে
ভাসিতে পাইলে বাঁচে প্রাণ!

তখন তাহার কণ্ঠ হইতে একটা কাতরোক্তির মত শব্দ বাহির হইল; লীলার মাতা নিকটেই ছিলেন, তিনি বলিলেন "কি হ'ল বাবা?" বিষ্ণু লজ্জিত হইয়া বলিল "কিছুনা মা, গানটা আমার খুব ভাল লাগছে।"

লীলা গানটী শেষ করিয়া বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া দেখিল বিষ্ণু স্থির হইয়া বসিয়া আছে। গানটী যে শেষ হইয়া গিয়াছে সে কথা যেন সে জানিতে পারে নাই। তাহার অন্তরের মধ্যে যেন তখনও ধ্বনিত হইতেছিল—

"শোনা যাবে কবে ঘন ঘোর রবে
মহা সাগরের কলগান।"

শিবব্রত তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিষ্ণুদা কেমন লাগল?" বিষ্ণু উত্তর দিল না নিমিলিত নেত্রেই বসিয়া রহিল। শিবব্রত তখন চেয়ার ছাড়িয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে মৃদুভাবে নাড়া দিয়া বলিল "ঘুমুচ্ছেন নাকি?

বিষ্ণু তীরবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "শিবব্রত সাগরের গান কখনও শুনেছেন?"

শিব। গান শুনিনি তবে গর্জ্জন শুনিছি।

বিষ্ণু। আমায় তাই শুনতে হবে। চলুন বাড়ি যাই সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।

লীলা। এরই মধ্যে যাবেন। তা হ'চ্চে না আপনিও একটা গান করুন।

বিষ্ণু। আমি গাইতে জানিনে ত।

শিব। তবে শুনুন।

বিষ্ণু। না আমি আর বসতে পারছি না, এঘরটার সঙ্গে এ গান যেন মোটেই খাপ খাচ্চে না, সমস্তই গোলমাল করে দিচ্চে। আর এক সময় এসে দেখব যদি ভাল লাগে।

লীলার মাতা। এই যে বল্লে বাবা তোমার খুব ভাল লাগছে।

বিষ্ণু। যতক্ষণ গান হচ্ছিল ততক্ষণ আমি সব ভুলে গিয়াছিলাম। গানটাকে উনি এমনি ক'রে গাইছিলেন যে তাতে আমার স্পষ্ট অনুভব হচ্ছিল যে—

বিষ্ণু আর বলিতে পারিলনা; তাহার চক্ষু বাহিরের দিকে কি এক অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর উপর স্থাপিত হইল এবং সে সহসা বলিল "না আর বসতে পারছি না আমি চল্লাম।" বিষ্ণু দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। লীলা ও তাহার মাতা অবাক্ হইয়া গমনশীল বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে লীলার মাতা বলিলেন "এ কাকে এনেছিলে শিবু? এ যে একটা বদ্ধ পাগল।"

শিবু। আর বড়দা বলেন ইনি একজন মহাপুরুষ!

লীলার মাতা। ছেলেটীকে দেখে আমার মায়া করছে। কি সুন্দর ছোটছেলের মত মুখ খানি, আর কি সুন্দর কার্ত্তিকের মত চেহারা! এমন ছেলেটি পাগল হতে চল্ল?

লীলা। মা কি পাগল, পাগল বকছ, পাগল তোমায় কে বল্লে? সব লোকই বুঝি এক রকমের হয়? ঐ এক রকমের মানুষ।

লীলার মাতা। আমার ইচ্ছে করে দু'দিন ওকে কাছে রেখে পর মন ভাল করে দিই। আচ্ছা শিবু ওর লেখা পড়া কতদূর হয়েছে?

শিবু। ওঁর বিদ্যে সাধ্যির বিষয় টের পাবার কিছুই জো নেই। universityর ডিগ্রি কিছু নেই

অথচ সময় সময় এমন এমন কথা বলেন যা আমাদের বৈ পড়া বিদ্যে হ'তে অনেক উচু ধরণের। কিন্তু অধিকাংশ সময় উনি আপন ভাবেই মত্ত থাকেন তখন ওঁর ধরণ ধারণ ক্ষেপার মতই বোধ হয়। ওকথা থাক লীলা আর একটা কিছু গাও।

লীলা অর্গান ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল "না আজ আর নয় আপনি কা'ল আসবেন আর পারেন ত ওঁকেও ধরে নিয়ে আসবেন; লোকটা ক্রমশঃ interesting হয়ে উঠছে।"

শিবু ছুঃখিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই লীলা বলিল "আপনি রাগ করবেন না।"

শিবু। না না রাগ করব কেন? যাক্ কাল্ পারি ত ওঁকেও নিয়ে আসব। তবে ওঁর গতিবিধি আমার আয়ত্তে নয় তা বলে রাখছি।

শিবু চলিয়া গেলে লীলা গবাক্ষে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। লীলার মাতা নিকটে আসিয়া বলিলেন "লীলা আর কত দেরি করবি, আমরা সকলেই যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম।"

লীলা অন্যমনস্কের মত তাহার মাতার দিকে চাহিল।

লীলা তাহার মাতার কোন কথাতেই কান দিল না দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "এ তোমার কি রকম বুদ্ধি লীলা, কাজের কথা কিছুতেই মন দেওনা কেন?"

লীলা হাসিয়া বলিল "এসব বিষয় নিয়ে আমি তাঁকে কিছুই বলতে পারব না। তোমার যদি ইচ্ছা হয় ত' নিজেই একদিন কথা পেড়ো না কেন?

মাতা। কালই একথা পাড়ব।

লীলা। কিন্তু দোহাই কারও সামনে একথা যেন পেড়ো না; তোমার সব সময় কাণ্ড জ্ঞান থাকে না

মাতা। কাণ্ড জ্ঞান আমায় তোমাদের কাছে শিখতে হবে না। যেমন তোমার দাদা তেমনি তুমি। সে রোজকারও করছে ঢের, বুদ্ধি শুদ্ধিও যথেষ্ট হয়েছে, তবু বলে এখন বিয়ে করব না; তুমিও এই রকম হয়ে রইলে। আমি একা এই এত বড় সংসার ঠেলি কি করে?

লীলা। কেন তোমার চাকর বাকরের ত অভাব নেই।

মাতা। শোন একবার মেয়ের কথা; ঝি চাকরের জন্যই কি মানুষ বিয়ে করে নাকি? এত শিখলি এত পড়লি কিন্তু তোদের একি রকম ধরণ যে হ'ল তা বুঝতে পারলাম না। এখন কার সবই যেন উল্টে যাচ্ছে। আমার কথা যদি না শোন তোমরা, তা' হ'লে এ বুড়ো বয়সে শেষে মাথা খুঁড়ে মরব নাকি?

লীলা। এখন একটু ধর্ম্ম কর্ম্মে মন দাও, আর সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে মাথা ঘামান কেন?

লীলার মাতা অত্যন্ত রাগিয়া বলিলেন, "আমার মরণ হয় ত' বাঁচি।" লীলা হাসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না মা এখন মরবে কেন? বালাই আমরা মরতে দেব কেন?"

মাতা। যা তোকে আর আদর জানাতে হবেনা। তিনি রাগিয়া চলিয়া গেলেন। লীলা একাই কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিল।

ব্রহ্মযশা ও সত্যব্রত নিভৃতে বসিয়া গল্প করিতে-ছিলেন। সত্যব্রত বলিলেন "তোমার বিষ্ণুকে দেখে মনে হচ্চে যে, তুমি যা আশা করছ তা হবে না। ওকে যে দেখবে সেই বলবে যে ওর দ্বারা তোমার জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় অসম্ভব। ওর চরিত্রে সবটুকু কোমলতা, ওর মনটাতে কেবলি ভক্তি। ওর কর্ম্মই বল আর জ্ঞানই বল সবই ভক্তির প্রকার ভেদ। কিন্তু এতে ত' তুমি যা চাচ্ছ তা হবে না।"

ব্রহ্ম। আমি কতকটা তোমার প্রিয়র মতই লোক চাই। কিন্তু ও আবার আর এক দিয়ে বেড়ে উঠছে। কেবলি কাজ নিয়েই আছে।

সত্য। তবেই দেখ ঠিক যেমনটি চাওয়া যায় তেমনটী হয়ে ওঠে না; - সব কাজের ওপর ভগবানের ইচ্ছাই প্রবল ভাবে কাজ করে। আমার চাই যে রকম

সে রকমটী হয় না, ওদের ভেতরকার মানুষটীই সব কাজে ফুটে ওঠে। সেই জন্য আমার মতে সেই শিক্ষাই শিক্ষা, যাতে মানুষের অন্তর্নিহিত আদত মানুষটীই বিকশিত হয়ে ওঠে।

ব্রহ্ম। মানুষ যদি ঠিক প্রকৃতি অনুসারে আপনাকে গড়ে তোলে তাহলে যে পশুই হয়ে উঠবে। কিন্তু তার প্রকৃতির ওপরও যা আছে তাকেই জাগিয়ে তুলতে হবে। তার আত্মাকে প্রকৃতঃ পরংপষৎ তাকেই জাগাতে হবে। এখন এই আত্মা আপনাকে প্রকাশিত করেন প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সেই জন্য প্রথম হতেই ব্যবস্থা করা হয়েছে সম যম দম নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবান; তাকে যুদ্ধ করে না জয় করলে কি আর রক্ষা আছে?

সত্য। প্রবৃত্তিটা কেবল দেহাদিতেই নিবদ্ধ একথা বোধ হয় সত্য নয়, আত্মারও প্রবৃত্তি আছে। আত্মাও কিছু চান, আত্মারও কিছু হবার চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টার জন্য মনের ও দেহের প্রবৃত্তিগুলিকে তিনি নিজের ইচ্ছানুসারেই চালনা করেন।

ব্রহ্ম। প্রবৃত্তি সমস্তই মনের, আত্মার আভাষে, আত্মার চৈতন্য সংযোগে সেগুলাকে সচেতন ও বলবান বলে মনে হয়। যেখানে মনের সঙ্গে আত্মার যোগ কেটে যায় সাধারণতঃ সেই সময়ই লোক পাগল হয়। এই পাগলামি নানা রকমের, এক রকম যারা পাগলা গারদে আছে, আর এক রকম যারা কেবলই টাকা আনা পাই নিয়েই আছে, আর এক রকমের যাঁরা আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে মনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করে স্বস্থ হয়ে আছেন। তাঁদেরও বাহ্যিক সমস্ত কাজই পাগলা গারদের মত।

সত্য। তা কেমন করে হবে? যাঁদের বুদ্ধি স্থির হয়েছে, প্রবৃত্তি দমিত হয়েছে, চাঞ্চল্য চলে গিয়েছে তাঁদের সমস্ত কার্য্যইত স্থির ধীরের মতই হবে?

ব্রহ্ম। তাঁরা আপন নিয়মে চলবেন, তাই লোকে তাদের পাগলই বলবে। নিজের মত যা নয় সে রকম কার্য্য করলেই সাধারণ লোকে পাগল বলে।

সত্য। কিন্তু তুমি ত চাও এমন লোক যে সমস্ত প্রাকৃত লোকদের আদর্শ হবে? পরমহংস ত' তুমি চাও না।

ব্রহ্ম। না তা চাইনে। আমি চাই জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই সমন্বয়। যাঁরা মনের ওপরে চিরদিনের মত উঠে যাবেন তাঁদের দিয়ে সংসারের লোকের কোন উপকারই হবে না। সেইজন্য আমি চাই এমন একজনকে যিনি আমাদেরই মত সংসারের সমস্ত কাজই করবেন অথচ তাঁর ভক্তি থাকবে ভগবানের চরণে, জ্ঞান থাকবে সদা মুক্ত সদা নির্ম্মল আর তাঁর সমস্ত কর্ম্মই জানিয়ে দেবে যে এইখানেই শেষ নয় আরও অস্তিত্ব আছে।

সত্য। এ কাজ তোমার বিষ্ণুকে দিয়ে হবে না, তা তোমায় বলে দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। কর্ম্মের ফলাফল যখন সম্পূর্ণ আমার হাতে নয়, তখন শেষ ফল কি হবে তা ভেবে এখন থেকে ভয় পেলে চলবে কেন? এখন কাজ করে যাই পরে যা নারায়ণ করবেন তাই হবে।

সত্য। তোমারও শেষ কথা যা আমারও তাই। আমিও তাই ভেবে সংসারে কাজ করে যাচ্ছি।

ব্রহ্ম। তা ত' দেখছি ভাই; কিন্তু কেবল নারায়ণের ওপর নির্ভর করে থাকবার জন্য তিনি আমাদের পাঠান নি। সংসারে যুদ্ধ করতেই তিনি পাঠিয়েছেন। তুমিও সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করে বসে নেই আমিও না। আমরা কেবল মুখেই ও কথা বলি। কাজের সময় তা হতেই পারে না।

সত্য। পুত্র কন্যাদের শিক্ষার বিষয় অন্ততঃ আমি তাই করেছি।

ব্রহ্ম। সেইটাই বোধ হয় ভুল করেছ। সেই কারণেই তোমার শিবব্রত কেবল খেয়াল নিয়েই আছে, তোমার মায়াও তাই। প্রিয়ব্রতের অভ্যন্তরে খুব ভাব বস্তুই আছে তাই সেই অনেকটা মানুষ হয়ে উঠছে। কিন্তু এখনও সাবধান, এখনও ওদের

নিয়মের মধ্যে এনে ওদের কাজকর্ম্ম সংযত করে দাও তা না হ'লে বিপদ ঘটতে পারে।

সত্য। তোমার মতে কি করা উচিত?

ব্রহ্ম। ওদের বিবাহ দিয়ে সংসারে ঠিকমত প্রবেশ করিয়ে দাও। তারপর তুমি যে আদর্শে কাজ করে এসেছ সেইটী বেশ করে ওদের বুঝিয়ে দাও। নিজেরদের নিয়ে ওরা কেবলি খেলা করছে। জীবনটা ত খেলার নয়।

সত্য। তা আর হয় না ভাই; এই এতদিন পরে আর ওদের ওপর জোর জবরদস্তি চলবে না। এখন কেবল বসে দেখতে হবে আমার এত দিনকার কাজ কি ফল প্রসব করছে। আমরা দু'জনে যখন গুরুদেবের কাছ থেকে চলে আসি তখনকার কথা মনে পড়ছে। সেই দিনকার তোমার আশার কথা আকাঙ্ক্ষার কথাও মনে পড়ছে। তারপর এতদিন চলে গিয়েছে। কিন্তু আমরা ঠিক নিজ নিজ পথেই এতদিন রয়েছি। হঠাৎ এই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া আমার এত দিনকার কাজকে একেবারে আগাগোড়া বদলে ফেলতে পারব না। গুরুও সে আদেশ দিয়ে যান নি।

ব্রহ্ম। তবে নীরবে অপেক্ষা কর। কোন দুঃখ করো না, যা হয় হোক। তুমি ত' যা কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছিলে তাই করেছ, এইটেই তোমার সান্ত্বনা হোক।

সত্য। তাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রবেশ করিয়া উভয়কে প্রণাম করিল। সত্যব্রত তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "তোমার সর্ব্ব প্রকারেই সুবিধা হয়েছে, এই এক অপূর্ব্ব রত্ন তুমি পেয়েছ।" লক্ষ্মীর দিকে সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া ব্রহ্মযশা বলিলেন "এতখানি সুবিধা না হ'লে কি আমি এত বড় আশা নিয়ে এতদিন বেঁচে থাকতাম? এইটীই আমার ভবিষ্যতের সফলতার পূর্ব্বাভাষ!"

লক্ষ্মী একখানি পত্র ব্রহ্মযশের হস্তে দিল। তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এই পত্র তোমার জেটতুত ভাই লিখেছেন! আশ্চর্য্য! এতদিন পরে তোমাকে তাঁদের মনে পড়েছে!" লক্ষ্মী নতনেত্রে বলিল "এখন উপায়?"

সত্যব্রত। কি হয়েছে?

ব্রহ্ম। এঁর বাবা এঁকে আমাকেই দিয়ে যান। আমি প্রথম প্রথম এঁর আত্মীয়দের খোঁজ নিয়ে এঁকে তাঁদেরই হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু ভগবদিচ্ছায় তাঁরা কেউই এতকাল এর সংবাদ নেননি। আজ হঠাৎ এঁর জেঠতুত ভাই পত্র লিখেছেন যে, তাঁর পিতা এতদিন যে অন্যায় করেছেন আজ তিনি সেই অন্যায়ের প্রতিকার করতে উদ্যত। তাঁরা শীঘ্রই এসে এঁকে নিয়ে যাবেন।

সত্য। কেমন করে? এখন আর তাঁদের এঁর ওপর কি অধিকার।

ব্রহ্ম। সংসারে অধিকার অনধিকার ত' কেবল আপন স্বার্থ অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়। এখন লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্ব বিষয়েই এ আমাদের হয়ে গেছে। তবু স্বার্থ এঁর আত্মীয়দের আবার এঁর ওপরে জোর জুলুম করতে নিয়োজিত করেছে। ইতিপূর্ব্বে আমাকেও এঁর জেঠামহাশয় এঁর নামে গচ্ছিত টাকাকটির জন্য তলব তাগাদা করেছিলেন। আমি তাতে বিচলিত হইনি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র এই পত্র লিখছেন।

লক্ষ্মী। আমি এখন কি উত্তর দেব?

সত্যব্রত। উত্তর আর কি দেবে মা? উত্তরের আর উপায় নেই। এখন একমাত্র উত্তর যা তাই দাওগে।

ব্রহ্ম। না এখন অন্য কোন উত্তর দিয়ে প্রয়োজন নেই। তিনি আসুন, সব কথা তাঁকে খুলে বলে তারপর কি হয় দেখা যাক।

লক্ষ্মী আপন কক্ষে গিয়া দেখে বিষ্ণু একখানা পত্র হস্তে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। লক্ষ্মী নিকটে গিয়া বলিল "কি ভাবছ?" বিষ্ণু চমকিত হইয়া ফিরিয়া বলিল "লক্ষ্মী এই পত্রখানা লীলাবতী কেন লিখিলেন বলতে পার?"

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই তাঁর কোন প্রয়োজন আছে, তাই লিখেছেন।

বিষ্ণু। কিন্তু কি প্রয়োজন তাত' কিছুই লেখেন নি।

লক্ষ্মী। কি লিখেছেন?

বিষ্ণু। পড়ে দেখ।

লক্ষ্মী পড়িয়া দেখিল, লীলা লিখিয়াছে—"সেদিন হঠাৎ চলিয়া গেলেন, তারপর আর একদিনও দেখা নাই। এর কারণ কি? আপনি কি আমাদের উপর কোন কারণে রাগ করেছেন? সকলেই আপনার সঙ্গ পায়, আমরা কি এমন অপরাধ করিয়াছি যে তাহ'তে বঞ্চিত থাকিব? যদি কোন বিঘ্ন না থাকে তাহ'লে অদ্য আসিবেন।" পত্র পাঠ সমাপ্ত করিয়া লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি কে?"

বিষ্ণু। ইনি মায়ার একজন বন্ধু; এবং বোধ হয় শিবব্রতের সঙ্গে এঁর বিবাহ হবে।"

লক্ষ্মী। তাহ'লে এঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হ'ল কি ক'রে?

বিষ্ণু। শিবব্রতই করে দিয়েছেন। এখানে ত' দেখছি স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন চলে। এঁরা বোধ হয় ব্রাহ্ম।

লক্ষ্মী। তা বেশ তুমি যাও না কেন?

বিষ্ণু। কিন্তু ওখানে গেলে আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। অত সাজসরঞ্জাম অত আড়ম্বর আমার সয়না।

লক্ষ্মী। কিন্তু এত মিনতি করে যখন লিখেছেন, তখন যাওয়া উচিৎ। নাই বা মিলল, ওঁদের সঙ্গে আমাদের চালচলন তবু মানুষত সকল অবস্থাতেই এক। ইনি যখন এত আগ্রহ করে ডাকছেন তখন তোমার যাওয়া উচিৎ।

বিষ্ণু। ওঁদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিশেষ অমিল আছে, তাই যতবারই মনে করছি যাওয়া উচিৎ ততবারই বোধ হচ্ছে গিয়ে কাজ নেই। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল যে, এই লীলাবতী যা কিছু করছেন সবই যেন চেষ্টা করে; যে ভাবটাই উনি প্রকাশ করছিলেন, সেইটিই মনে হচ্ছিল ভাল। তাই আজ কিছুতেই যেতে মন সরছে না। একবার বাবাকে জিজ্ঞাসা করব?

লক্ষ্মী। এই সামান্য বিষয় নিয়ে তাঁকে কেন ব্যস্ত করবে, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। কিন্তু আমার মতে সংসারে সকলের সঙ্গেই কিছু সম্পূর্ণ মিল হয় না, তাই ব'লে কি যাদের সঙ্গে অমিল তাদের ত্যাগ করতে হবে? ঘৃণা করতে হবে?

বিষ্ণু। না না আমি ঘৃণা করতে যাব কেন? তবে আমার দ্বারা তাঁদের কোন কাজই হবে না। কেবল দুদণ্ড বসে গল্প করা। তা যদি আমার ভালই না লাগে, ত' এরকম মিছে কাজ করতে যাব কেমন ক'রে।

লক্ষ্মী। তোমার সুখ না হয় তাঁদের হ'তে পারে। তুমি হয়তো ধরতে পারছ না, কিন্তু তাঁরা হয়তো তোমার মধ্যে এমন জিনিস পেয়েছেন যেটাতে তাঁদের খুবই আনন্দ দিয়েছে। তা' নাহ'লে এমন করে পত্র দেবেন কেন? আর এই সামান্য বিষয়ে যদি তোমায় এত মাথা ঘামাতে হয়, তাহ'লে সংসারে চলবে কেমন করে?

বিষ্ণু আর কোন কথা বলিল না। সন্ধ্যার সময় শিবব্রত ডাকিয়া লইয়া লীলাদের ওখানে চলিয়া গেল। পথে যাইতে বিষ্ণু শিবব্রতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি ওখানে গেলে ওঁরা কি সত্য সত্যই সুখী হন।" শিবব্রত এই আকস্মিক প্রশ্নে হাসিয়া উঠিয়া বলিল "কেন? এ সন্দেহ আপনার মনে উদয় হ'ল কেন?"

প্রিয়। আমি ওখানে গিয়ে তেমন আনন্দ পাই না। কিন্তু আজ লীলা আমায় একখানা পত্র দিয়েছেন। তাতে উনি যা লিখেছেন তা প'ড়ে মনে হ'ল, ওঁরা যেন আমি গেলে সুখী হন। কিন্তু আমার সঙ্গে ওঁদের কিছুই মেলে না।

শিব। মেলে না! কি ক'রে জানলেন?

প্রিয়। ওরা ব্রাহ্ম; আমি তা নই। তাছাড়া ওঁরা ইংরাজী ধরণের লোক, আমি তা নই। ওঁদের

শিক্ষা আমার চাইতে অনেক বেশী, আমি ওঁদের মত করে কথা বলতেই জানিনে। আমায় ওঁদের ভাল লাগবে কি ক'রে ?

শিব। তা কি করে বলব ? নিশ্চয় এমন একটা কোন কারণ ঘটেছে যার দরুণ ওঁরা আপনাকে বলে।

বিষ্ণু কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া হঠাৎ বলিল "আচ্ছা আপনি লীলাবতীকে বিবাহ করবেন কি করে ? আপনি হিন্দু, ওঁরা ব্রাহ্ম।"

শিব। ভগবান যে মিলন ঘটাচ্ছেন তাতে বাধা দেওয়াই অন্যায়। হিন্দু ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান এসব আমাদেরই সৃষ্টি। যেখানে সব মানুষেরই মিল আছে আমরা উভয়ে সেই খানেই মিলেছি।

বিষ্ণু। কি করে বুঝলেন যে এ মিলন ভগবানই ঘটাচ্ছেন ? এওত' হতে পারে যে আমার যা যা মনে মনে চাই বলে অনুভব হয়েছে, যেটাকে আমার প্রবৃত্তি গ্রহণ করতে বলছে সেইটাকেই' হয়তো মনে করছি, ভগবান নিতে আদেশ করছেন।

শিব। ভগবানই প্রবৃত্তিকে মানুষের মনের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন। সেই ভগবদ্দত্ত প্রবৃত্তিই মানুষকে চালায়। একথা যদি সত্য হয় তাহ'লে আমার মধ্যে এই যে ভালবাসা জন্মেছে এটা ভগবানের সৃষ্টি বলতেই হবে।

বিষ্ণু। প্রবৃত্তিকে দমন করে প্রবৃত্তির ওপরে যা আছে তাকেই যদি প্রকাশ করতে না পারি তা হ'লে আমি মানুষই নই। আমি প্রবৃত্তির ওপরে আমি অজর অমর অচঞ্চল আত্মা। আমি নারায়ণেরই—আর কারও নই।

বিষ্ণু শেষ কথাগুলি এমন জোরের সহিত বলিল যে শিবব্রতের সমস্ত উৎসাহ এক নিমেষে নিবিয়া গেল। সে ভালবাসার কথা বলিবার জন্য যতখানি উৎসাহ অনুভব করিয়াছিল, বিষ্ণুর স্ফুরিতাধর উন্নত মস্তক তেজোময় চক্ষু দেখিয়া সে ততখানি নিরুৎসাহ হইল। তাই আর সে একটীও কথা বলিতে পারিল না।

লীলাবতীদের গৃহের গাড়ি—বারান্দায় তাহার ভ্রাতা শশিশেখর বিষ্ণু ও শিবব্রতকে অভ্যর্থনা করিলেন। শশিশেখর হস্তপ্রসারিত করিয়া শিবব্রতের করমর্দ্দন করিলেন। বিষ্ণু তাহাকে নমস্কার করিল তিনিও তাহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন।

শশিশেখর তাহাদের লইয়া হল ঘরে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে শ্যামাচরণ ও শশিশেখর আরও দুচারিজন বন্ধু বসিয়াছিলেন। বিষ্ণুকে ইহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া শশিশেখর একজন খানসামাকে ডাকিয়া সান্ধ্য ভোজের জোগাড় করিতে আদেশ করিলেন।

সমস্ত কক্ষটী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। কৌচ চেয়ার টেবিল ছবি ইত্যাদিতে ঘরখানি সজ্জিত। তদুপরি নানা প্রকার পুষ্পাদি সম্ভারে ও মনোহর গন্ধে সেই উজ্জ্বল কক্ষ সম্পূর্ণরূপেই মনোরম হইয়াছিল। বিষ্ণু দেখিয়া শুনিয়া নিস্পন্দভাবে এককোণে বসিয়া রহিল। শ্যামাচরণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল "অমন করে কোণে বসলেন কেন ? এগিয়ে আসুন।"

বিষ্ণু কাতরভাবে বলিল "না আমি এইখানেই বসব।"

শ্যামাচরণ। সে কি কথা ! আজ আপনি হচ্ছেন প্রধান অতিথি। ইতিমধ্যে দু একজন সঙ্গিনী সঙ্গে উজ্জ্বল বেশধারিণী লীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই বিষ্ণু ব্যতিত উপস্থিত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। লীলা সকলকেই হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিয়া শিবব্রতকে বলিল "আপনিও দেখছি ক্রমশঃ ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলেন।

শিবব্রত লজ্জিত মুখে বলিল "এতদিন আমি এখানে ছিলাম না, বড়দা আমায় মফঃস্বল পাঠিয়েছিলেন।"

লীলাবতীর চক্ষু বিষ্ণুকেই খুঁজিতেছিল। তাহাকে এক কোণে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে তাহার পার্শ্বস্থ একজন সঙ্গিনীকে বলিল "ঐ দেখ apart from the rabble rout উনি বসে আছেন।" শ্যামাচরণ কথাটা বুঝিতে পারিয়া বিষ্ণুকে বলিল "ঐ দেখুন আপনি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঠাট্টা বিদ্রূপইতে যদি বাঁচতে চান ত এগিয়ে চলুন।"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল "কোন প্রয়োজন নেই আমি এই-

খানেই বেশ আছি।" লীলা অগ্রসর হইয়া বিষ্ণুকে বলিল "বিষ্ণু বাবু, সংসারে দুরকম লোক আছে; এক রকমের লোকেরা সব কাজে এগিয়ে গিয়ে দেঁচিয়ে মেচিয়ে আপনাদের জাহির করে; আর এক রকমের মানুষ আছে তারা সব কাজ থেকে দূরে থেকে গম্ভীরভাবে কেবল মাথা নেড়ে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করেন। কিন্তু যেমন কেচর মেচর করে ছাতার পাখী ও বড় হয়ে উঠতে পারে না তেমনি অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে পেঁচা মশায়ও তাঁর অন্ধকার গাম্ভীর্য্য নিয়েও বড় বলে গণ্য হতে পারে না।"

বিষ্ণু প্রশান্তভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "আপনারা আনন্দ করুন আমি দেখি।"

লীলার একজন বন্ধু অমলা বলিলেন "আপনার জন্য আজকার সমস্ত আয়োজন, আপনি কোণে লুকিয়ে থাকলে আমাদের চলে যেতে হয়।"

বিষ্ণু। কোন ভয় নেই দিদি, আমি চেষ্টা করব যাতে আনন্দিতই হই। আপনাদের এত আয়োজন পণ্ড করব না। তবে সবাই এক রকমে সুখ পায় না। আপনারা আনন্দের নানারকম আয়োজন করে তারপর তাতে ডুবে সুখ পান, আমি তাই দেখে সুখ পাই। কারও সুখ আপনি আসে না জোগাড় করে আনতে হয় আর কারও সুখ আপনি আসে।

ইতিমধ্যে নানা প্রকারের খাদ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ বৃহৎ কক্ষের দুই পার্শ্বে আরও দুইটী কক্ষ ছিল। তাহারই একটিতে ঐ সব খাদ্যাদি সজ্জিত হইলে শশিশেখর সকলকেই আহ্বান করিলেন। বিষ্ণু ও রমণীগণ ব্যতীত সকলেই সেই কক্ষে চলিয়া গেল। লীলা জিজ্ঞাসা করিল "ফলটল ও কি কিছু খাবেন না?" বিষ্ণু বলিল "আমার সন্ধ্যাহ্নিক হয়নি, বিশেষতঃ এরকম করে খাওয়া আমার উচিত নয়।"

অমলা প্রভৃতি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। লীলা বলিল "কি করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন?"

বিষ্ণু। আমাকে ছেড়ে দিলে।

লীলা। কেন?

বিষ্ণু। এ রকম উৎসব আমোদে আমার আনন্দ হয় না। আপনারা মিছামিছি এই যে এত অপব্যয় করেছেন এ দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্চে। দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এমন অপচয় করবার কারও অধিকার নেই। আমাদের চার দিকে হাজার হাজার লোক দু'বেলা দুমুটো অন্নের জন্য প্রাণপাত করছে, আপনারা এমনি করে সেই অন্ন নষ্ট করছেন। শাস্ত্রে বলেছে অন্ন নারায়ণের একটী রূপ, সেই জন্য অন্নং ন নিন্দ্যাৎ, অন্নের অপমান করলে ভগবানেরই অপমান হয়।

লীলা। অন্নের অপমান কোথায় করলাম।

বিষ্ণু। অপব্যবহারের চাইতে বড় অপমান নেই।

উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। স্ত্রীলোকের মুখের উপর এমন করিয়া কেহ যে কিছু বলিতে পারে তাহা তাহাদের ধারণাতেই ছিল না। কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া সরিয়া গেল। লীলা রক্তবর্ণ মুখে বলিল "অন্নের যারা কাঙ্গাল তারাই আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সেই অন্ন ভাগ করে খেতে কুণ্ঠিত। যাদের অন্নের যথেষ্ঠ সংস্থান আছে তারা পাঁচজনকে দিয়েই খায়, তাতেই তাদের সুখ।"

বিষ্ণু। আপনি রাগ করবেন না। সব জিনিস কি সবাই এক রকম করে বোঝে। আমার যে রকম বুদ্ধি সেই রকমই বল্লাম। জেনে শুনেই ত' আপনারা আমায় ডেকে এনেছেন।

অপমানিতা লীলা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল "অন্ততঃ স্ত্রীলোকের মান্য রাখাটা ভদ্রতার অঙ্গ হওয়া উচিত।" অমলা লীলাকে বলিল "ওঁর ওপর রাগ করে কি হবে ভাই, যার যে রকম শিক্ষা দীক্ষা সে সেই রকমই কথা বলবে।"

লীলা, বিষ্ণুর এইরূপ ব্যবহারে যথেষ্ঠ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং সেদিন সন্ধ্যায় তাহার বিদ্রূপ ও বাক্যের সমস্ত শক্তি হতভাগ্য বিষ্ণুর উপরেই ব্যয়িত হইতে লাগিল। পুরুষগণ যখন আহারাদি সারিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল তখনও সে শান্ত হইল না। তাই আজ তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বাক্যের ও রূপের তীব্রতা চতুর্দ্দিকে

বিকীর্ণ হইতে লাগিল। শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া বলিল "ব্যাপার কি? বিষ্ণু বাবু আপনি ওঁর বিরাগভাজন হ'লেন কেন?"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল, "বুদ্ধির দোষ, শিক্ষার দোষ!" শশিশেখরের একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু পরম গম্ভীরভাবে লীলাবতীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া economics সম্বন্ধে বিষ্ণুর উপর একটী দীর্ঘ বক্তৃতা প্রয়োগ করিলেন কিন্তু বিষ্ণু অটল। সে সহাস্য মুখে সেটীকে হজম করিয়া বলিল "আপনাদের ও সব কথা বুঝি এত শক্তি কোথায়? প্রয়োজন ও ব্যয়ের অনুসারে দেশে বস্ত্র প্রস্তুত হ'তে পারে, কিন্তু আপনাদের এই সব আড়ম্বরের জন্য তুচ্ছ খেলার জন্য কেন যে দরিদ্র লোকে জলে আগুণে রোদে প্রাণপাত করবে তা বুঝতে পারছি না। তাদের কষ্ট যদি একবার দেখতেন তা'হলে আপনাদের ওসব বড় বড় কথা কোথায় থাকত জানি না।"

ব্যারিষ্টার। কেবল ফকিরী গ্রহণ করবার জন্য আমাদের জন্ম হয়নি? আপনার এই সব socialistic view তুলে রেখে দেন। চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে তারপর কথা বলবেন। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশটার অবস্থা কি হয়েছে একবার ভেবে দেখেছেন? ধর্ম্ম কি কেবল মুখ বুজে মাটী কামড়ে পড়ে থাকলেই হয়? না পরের দুয়ারে ভিক্ষে করে, পরের উপার্জ্জনের ওপর নির্ভর করে থাকলে হয়? আজ যদি দেশ শুদ্ধ লোক একসঙ্গে বিলাস দ্রব্য অপ্রয়োজনের জিনিস ত্যাগ করে ফকীর হয়ে ওঠে তাহ'লে কি হয়? ভগবান কেবল যদি ঐজন্য আমাদের তৈরি করতেন তাহ'লে এত আয়োজন আমাদের সম্মুখে ধরতেন না। সংসারে এখন ধর্ম্মের ফকীরির দিন গিয়েছে। ধর্ম্ম এখন অর্থ আর অন্ন সংস্থানে, সুখ এখন সব জিনিস ভোগে।

বিষ্ণু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তাহ'লে আমি এখানে কেন? আমি আপনাদের সুখোপভোগের সঙ্গে ত কিছুতেই যোগ দিতে পারব না।"

লীলা হাসিয়া বলিল "তা যার যে রকম শক্তি, সে সেই রকমই সহ্য করতে পারবে।" বিষ্ণু গমনোদ্যত হইলে শ্যামাচরণ তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া বলিল "বসুন বসুন, সারা সন্ধ্যাটা বাজে কথায় না কাটিয়ে একটু আদটু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করুন। লীলাদেবী আপনি একটা গান করুন।"

লীলা। "উঁহার হয়তো তা সহ্যই হবেনা। সর্ব্ব বিষয়েই ওঁর নূতন নূতন ধারণা; আমাদের গান ওঁদের ভাল লাগবে কেন? ভাব ভক্তি সবই ওঁর আলাদা, এমন কি ওঁর জন্য ভগবানকেও নূতন ধরণে হ'য়ে আসতে হবে।

বিষ্ণু বিস্মিত নয়নে একবার তাহার দিকে চাহিল, তারপর গম্ভীরভাবে বলিল "আপনার গান আমার খুবই ভাল লাগতে পারে।"

লীলা। তাই নাকি? কি করলে ভাল লাগতে পারে তাই না হয় বলুন, আমি চেষ্টা ক'রে দেখি।

বিষ্ণু। যদি কিছু চেষ্টা না ক'রে অমনি গান করেন।

এই কথায় লীলার আত্মাভিমানে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিল যে, সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া সেইস্থান হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া শিবব্রতের আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল এবং শশিশেখরের সেই ব্যারিষ্টার বন্ধুটীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিষ্ণুর শিক্ষাদির সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক শিবব্রতকে বলিল "চলুন ও ঘরে বিলিয়ার্ড খেলা যাকগে। এ রকম সহবাসে থাকলে মানুষও জন্তু হয়ে যায়।"

ব্যারিষ্টারটীর শেষ কথায় সমস্ত লোকই স্তম্ভিত হইয়া গেল। শশিশেখর ব্যাপার দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এ তোমরা কি করছ? আজকের সন্ধ্যাটাই মাটী করলে? লীলা তোমারই অন্যায়, কোথায় তুমি সকলকে খুসী করবার চেষ্টা করবে, তা না এই সব গোলমাল পাকাচ্ছ। সকলে মিলে ওঁর বিরুদ্ধে লাগবার তোমাদের কোন অধিকার নেই। মত নিয়ে তর্ক করবার স্থান এ নয়, এখানে আনন্দ করতে এসে নিরানন্দ জাগিয়ে তোলা মেয়েমানুষের উচিৎ নয়।"

লীলারও তাহা মনে হইতেছিল। তাহার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ইচ্ছা আপন দোষেই নিষ্ফল হইয়া গেল। আজ সে মনে করিয়াছিল বিষ্ণুকে চমকিত করিয়া দিবে। কথার ছটায়, গানের তরঙ্গে, সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় বিষ্ণুকে দিশেহারা করিবে, কিন্তু তাহার একটাও হইল না; উপরন্তু সে বিষ্ণুর চক্ষে অতি হেয়, অতি অপদার্থ করিয়াই আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছে। তারই এই চিন্তায় তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল বটে তথাপি সে যে বিষ্ণুকে তাহার অপমান ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট এবং সেইজন্যই সে অতি শীঘ্র শান্ত হইল এবং ঐ ব্যারিষ্টারটী যখন সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় শেষ করিয়া দিলেন, তখন সে কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আমায় ক্ষমা করুন।"

বিষ্ণু। ক্ষমা! কেন? আপনারা ত' কোন দোষ করেন নি। আপনাদের যা ধারণা তাই বলেছেন, এতে আপনার দোষ কি? আমারই ভেতরে অনেক দোষ আছে, নইলে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছিনা কেন?

শ্যামাচরণ যখন দেখিল মেঘ কাটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন অগ্রসর হইয়া বলিল "তাহ'লে একটা গান শুনে বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক।"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিল "বেশ ত তাই হ'ক।"

কিন্তু লীলা সেদিন কিছুতেই ভাল করিয়া গাহিতে পারিল না; এমন কি দু'একস্থলে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইবার মত হইতেছিল। গানটী শেষ হইবামাত্র বিষ্ণু নিকটে আসিয়া বলিল "আজ আপনি যেমন গেয়েছেন, এমন কোন দিনই গাইতে পারেন নি। সার্থক আপনার গান শিক্ষা।"

বিষ্ণু কিছুক্ষণ পরে শিবব্রতের সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া গেল। আর লীলা সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিল।

প্রিয়ব্রত কয়েক দিন হইতে অত্যন্ত ব্যস্ত। তাহাদের কয়েকটী ব্যবসায়ে অত্যন্ত লোকসানের সম্ভাবনা হইয়াছে। এই বৎসর পাটের ব্যবসায়ে প্রায় আদ্ধা আধি লোকসান হইবার সম্ভাবনা। একেত বেশী দরে মাল খরিদ হইয়াছে তদুপরি যে কর্ম্মচারীর উপর মাল খরিদের ভার ছিল সেও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। প্রিয়ব্রত ভাবিয়াছিল যে কাপড়ের লাভে সেই লোকসান পুষাইয়া লইবে, কিন্তু এবারকার স্বদেশী কাপড়ের টানও যেমন কম মিলওয়ালারাও তেমনি অত্যন্ত জখমি মাল চালান দিয়াছে। একমাত্র ভুসি মালেও তেমন সুবিধা হইল না। সত্যব্রতে বিরাট কারবারের মধ্যে অত্যন্ত গোলযোগের সূচনা হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া প্রিয়ব্রত বলিল "বাবা সমস্ত অকর্ম্মণ্য ও জুয়াচ্চোর কর্ম্মচারীদের ছাড়িয়ে দিয়ে আমার বন্ধুদের মধ্য হ'তে উপযুক্ত লোকদের লাগান যাক।" সত্যব্রত হাসিয়া বলিলেন "ব্যবসা মাত্রেরই যখন উঠতি পড়তি আছে তখন ব্যস্ত হ'লে চলবে না। ধীর ভাবে আর সব কাজ ছেড়ে এই কাজে মনোনিবেশ কর এবং দরকার হয়তো গিরীন্দ্রকে সঙ্গে নাও।"

প্রিয়। গিরীনকে এখন পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

সত্য। কেন?

প্রিয়। একে ত সে নিজের কাজেই ব্যস্ত তার ওপর আমাদের সমবায় সমিতির কাজ সমস্তই তার ওপর নির্ভর করছে। আমাদের জন্য আরও অনেক লোকের ক্ষতি করতে পারব না।

সত্য। তা হ'লে শিবব্রতকে সঙ্গে নাও।

প্রিয়। তার বিষয় ত' সবই জানেন; ব্যবসার কথা বলতে গেলে সে হয়তো হেসেই উঠবে। জোর করে তাকে এ কাজে লাগালে সবই নষ্ট হবে। তা ছাড়া সেও ত একটা বিষয়ের জন্য প্রস্তুতই হচ্ছে।

সত্য। আজ কালকার ওকালতি ব্যারিষ্টারির ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া ঐ হীন ব্যবসাটায় মানুষ কিছুতেই পুরা মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। আমার ইচ্ছাও ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়েও সঙ্গে যোগ দেক।

প্রিয়। এই এতদিন পরে ও কথা বললে চলবে কেন?

কোন ব্যবসাই হীন নয় যদি স্বয়ং হীন না হয়ে যাই।

সত্য। সে কথা ঠিক, কিন্তু কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জনই যে কাজের উদ্দেশ্য সে কাজে কখনই মানুষ উন্নত থাকতে পারে না। কাঁচা পয়সার এমন একটা দোষ আছে যাতে কোন দিকে মানুষকে তাকাতে দেয় না। আদালতে নানা রকমে চোকে ধূলা দিয়ে ঠকিয়ে না চলতে পারলে অর্থ প্রাপ্তি কিছুতেই হবে না। প্রথম প্রথম দু দিন মনে হবে দরিদ্রকে সাহায্য করব, বিপন্নকে উদ্ধার করব কিন্তু কিছুদিন পরেই সে ভাব চলে যায়। তখন অর্থ, অর্থ, অর্থ ছাড়া আর কোন দিকে লক্ষ্য থাকে না।

প্রিয়। অন্য ব্যবসাতেও ত' তা হ'তে পারে।

সত্য। তা পারে; কিন্তু অন্য ব্যবসায় প্রবেশ করলে নানা দিকে চক্ষু পড়ে, নানা প্রকার অভিজ্ঞতা হ'তে থাকে। অন্য ব্যবসায় উন্নতির মূলমন্ত্রই হচ্ছে সততা। মানুষ দু'দিন ঠকবে তিন দিনের দিন আর সে ঠকতে চাইবে না। কিন্তু সাধুতা থাকলে তার ব্যবসায় উন্নতি হবেই, সেই জন্য আগেকার লোকে ব্যবসাদারকে বলত সাধু। এখনও কোন কোন জাতির উপাধি সাধু বা সাধু খাঁ। সাধুতাই যখন লক্ষ্য পদার্থ তখন ব্যবসাদার লোকেরা যে অসাধুই হবে এর কিছু মানে নাই।

প্রিয় যাক এখন কথা হচ্ছে যাদের যাদের চুরী ধরা পড়েছে তাদের কি করা যায়?

সত্য। তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যা লোকসান করেছে তার প্রতিবিধান করতে বল। ক্ষমার চাইতে ভাল ওষুধ নাই। মানুষ স্বভাবতই খারাপ নয় অভাবে আর লোভে তাকে খারাপ করে। এই কথাটার প্রতি দৃষ্টি করে কাজ করে যাও নিশ্চয়ই ভাল ফল ফলবে। তবে যে ক্ষতি আর সুধরাবার কোন উপায় নেই। সেটাকে অকুণ্ঠিত মনে স্বীকার কর।

প্রিয়ব্রত পিতার নিকট হইতে আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল শ্যামাচরণ তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া আছে। আজ প্রায় ২।৩দিন তাহাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

প্রিয়। শ্যামাচরণ যে! ব্যাপার কি? আজ ক'দিন তোমায় দেখিনি কেন?

শ্যামা। ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব?

প্রিয়। নির্ভয়ে বল।

শ্যামা। বাঘ নিয়ে খেলা করতে গিয়া তার এক থাবায় উলটে পড়েছিলাম।

প্রিয়। অর্থাৎ!

শ্যামা। অর্থাৎ তোমার বিষ্ণুষণকে নিয়ে দু'দিন খেলা করেছিলাম কিন্তু এমন ঠাণ্ডা মানুষের মধ্যে যে এত বড় tartar ছিল তা কে জানত?

প্রিয়। ছেণালী ছেড়ে দিয়ে বল কি হয়েছে?

তখন শ্যামাচরণ সেদিনকার লীলাদের সান্ধ্যভোজের সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল "কে জানত ভাই ইঁহার মধ্যে এত খানি শক্তি আছে? আমি তারপর কালকে লীলাবতীর নিকটে গিয়া উহার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু তিনিও দেখলাম আমার চাইতেও বেশী আঘাত পেয়েছেন এমন কি আমার অনুমান যদি সত্য হয় তা'হলে বলতে হয় যে, তিনি আর এক রকমে অভিভূত হয়েছেন। তিনি একপ্রকার মিনতি করেই আমায় অনুরোধ করলেন আর একদিন বিষ্ণুকে বুঝিয়ে ওঁদের ওখানে নিয়ে যেতে কিন্তু আমার আর সাহস নেই।"

প্রিয় গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া বলিল "তোমাদের উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। কিন্তু এ তোমরা আবার কি বিপদ ঘটালে! শিবু শুনছি এই লীলাতীর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্টতা করেছে, তাকে সামলানই এক দায়; তার উপর সেই বুদ্ধিহীনা বালিকার যদি অন্য কোন রকম ক্ষতি হয় তাহলে সে অন্যায়ের জন্য তোমাদের কি শাস্তি বিধান করা উচিত তাত' বুঝতে পারছি না

শ্যামাচরণ কাতর হইয়া বলিল "প্রিয় ভাই রাগ

কর না। তুমি একটু চেষ্টা করলেই সব পরিষ্কার হবে।"

প্রিয়। কি করতে হবে?

শ্যাম। শিবুর সঙ্গে যাতে এই লীলাবতীর বিবাহ শীঘ্র হয়ে যায়। সেইটে করে দাও।

প্রিয়। শিবুর সঙ্গে এর বিয়ে? তা কেমন করে হবে? আমরা হিন্দু আর এঁরা ব্রাহ্ম।

শ্যামা। তোমার মুখে একথা শুনব এ আশা আমার ছিল না। যাক তাহ'লে এর উপায় আমাকেই করতে হবে।

প্রিয়। না তোমায় আর কিছুই করতে হবে না, সমস্ত ভগবানের উপর ফেলে দাও। নিজের হাতে একটা কাজ করতে গিয়ে বিপ্লব ঘটাবার যোগাড় করছ। কিন্তু শিবুর সঙ্গে বিবাহ হলে সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে তা কেমন করে জানলে? লীলাবতীর বিষয়ে যা তুমি বর্ণনা করলে তা যদি সত্য হয় তাহ'লে শিবুই বা এ বিবাহে স্বীকৃত হবে কেন? আর তিনিই বা কোন মুখে শিবুকে বিবাহ করবেন?

শ্যাম। আমার আশা আছে তাঁর ক্ষণিকের মোহ দুদিনেই কেটে যাবে। শিবু বহুদিন হতেই তাঁকে অধিকার করেছে। বিষ্ণুর চরিত্রের উজ্জ্বলতার প্রভাব ইনি একটু শান্ত হলেই কেটে যাবে। সেই আশাতেই আমি একথা বলছি।

প্রিয়। বিষ্ণুর প্রভাব ক্ষণিকের নয় এটা তুমি ঠিক জেন। তবে এটাও স্থির যে তাঁর চরিত্রের আসল কাজ হচ্চে মানুষের যেটা অন্তরতম মানুষ তাকেই জাগিয়ে দেওয়া। তিনি মানুষের প্রবৃত্তিকে কখনই উত্তেজিত কর্বেন না। মানুষ যাতে উচ্চতর জীব হতে পারে তাই তাঁর কাছে থেকে পাওয়া যায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক শ্যামা আমায় বিশ্বাস কর আমি দৃঢ় ভাবে বলছি যে বিষ্ণুর প্রভাবে এই রমণীকে মহৎই করবে। তোমার কেবল এইটুকু অনুরোধ তুমি আর নিজে হতে কিছু করতে যেও না এখন তোমায় যা বলি তাই কর আমি একটু বিপদে পড়েছি আমায় সাহায্য কর।

প্রিয়ব্রত শ্যামাচরণকে তাঁর বৈষয়িক ব্যাপারের কথা বুঝাইতে লাগিল।

মহামায়া পাড়ার কতকগুলি অল্পবয়স্কা বালিকাদের একত্রিত করিয়া তাহাদের বাটীতে একটী নৈশপাঠশালা খুলিয়াছিল। বালিকারা দিনে স্কুলে যাইত এবং সন্ধ্যায় মহামায়াদের নিকট গল্প শুনিতে আসিত। মহামায়া তাহাদিগকে গল্পচ্ছলে বহুবিষয়ে উপদেশ দিত, পাঠ বলিয়া দিত এবং সর্ব্বোপরি এই বালিকাদের হৃদয়ে গৃহস্থালী ছাড়াও যে আর একটা জীবন আছে তাহারই অনুভূতি জাগাইবার চেষ্টা করিত।

অদ্য রবিবার, তাই বালিকারা মহাব্যস্ত। অদ্য মহামায়ার সহিত তাহারা মহামায়াদের ঠাকুরবাড়ী দেখিতে যাইবে এবং সেইখানে নিজেরাই রন্ধনাদি করিয়া খাইবে। মহামায়াও এই কারণে একটু ব্যস্ত; এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একখানি পত্র তাহার হস্তে দিয়া গেল। পত্রে লীলাবতী লিখিয়াছে যে অদ্য মায়া যেন কোথাও বাহির না হয়, দ্বিপ্রহরে লীলা আসিবে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মায়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল যে, অদ্য সে বাটীতে থাকিতে পারিবে না; অদ্য তাহার ছাত্রীদের লইয়া সে তাহাদের ঠাকুরবাড়ীতে বনভোজনে যাইবে।

কিছুক্ষণ পরে ঠিক বাহির হইবার সময়ে স্বয়ং লীলা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল "চল আজ আমিও তোমার ছাত্রী এবং অতিথি।" মায়া পুলকিত হইয়া বলিল "এদের সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগবে? দাঁড়াও ছোটদাকেও ডেকে নি।" লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "না না আজ তুমি আর আমি মাঝে এই সব আনন্দের পুঁতুল থাকবে, আজ আর কাউকে চাইনে। চল আর দেরী করা নয়।"

সকলে শকটারোহণে প্রস্থান করিল। পথে যাইতে যাইতে মায়া প্রশ্ন করিল "ব্যাপার কি বলত? ক'দিন থেকে ছোটদারও মুখ গম্ভীর, জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন

না; আজ আবার তোমার এক নূতন ভাব! এ হ'ল কি? তোমাদের ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?" লীলা হাসিয়া বলিল "ঝগড়া করবার মত লোক কি তোমার ছোট দা? আর তা' আমার সঙ্গে?"

মায়া। তাইত আশ্চর্য্য হচ্ছি! ছোটদাকে গম্ভীর হ'তে দেখলে ভয় হয়, সংসারে নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক উপপ্লব উপস্থিত, নইলে তিনি সহজে ত' চিন্তিত হবেন না। কি হয়েছে বলত? এই ক'দিনে চেহারাটাও ত' বেশ বদলে ফেলেছে, যেন Dispepsia হয়েছে। যদি এলেই ত' অমন দুঃখ দুঃখ মুখে কেন এলে? তোমায় হাসতে না দেখলে আমার ভয় করে।

মায়া অত্যন্ত স্নেহে লীলাকে জড়াইয়া ধরিয়া যখন এই প্রশ্ন করিল তখন সহসা লীলার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখ নত করিয়া বলিল "এখন থাক, ওখানে গিয়ে সব কথা বলব।"

মায়া তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিল না, কারণ তাহার গাড়ীতে আরও দুইটী বালিকা ছিল। দেবালয়ের সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই সে কিন্তু লীলাকে এক পার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া একটা বেদীর উপর বসাইয়া বলিল "কি হয়েছে বল?"

লীলা যে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। চারিদিকে রৌদ্র ও ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশ। পাখীর গান, বালিকাদের আনন্দ কলরব, শান্ত প্রভাত বায়ু,—কলিকাতার কর্ম্মকোলাহল হইতে এই "ছায়া সুনিবিড় শান্তি"র আবাসস্থলে আসিয়া তাহার জাগরণ-শ্রান্ত চিন্তাক্লান্ত মনটি তাহার দুঃখের ভারে কিছুতেই অপরকে পীড়িত করিতে চাহিল না। একবার চারিদিকে চক্ষু বুলাইয়া লইয়া লীলা লজ্জিত মুখে বলিল "এখন পারছিনা ভাই, আগে আজকের খেলাধুলা শেষ করি তারপর বলব।" মায়া কিছুতে ছাড়িল না, বলিল "আমাদের কিছুই করতে হবে না। আজ সমস্ত কাজের ভার আমার ছাত্রীদের ওপর, ওরাই সব করবে কারণ এটাও ওদের শিক্ষারই অঙ্গীভূত। তুমি তোমার মনের ঝুলি ঝেড়ে ফেল।"

লীলা তখন ধীরে ধীরে অনেক কথা বলিল। কিন্তু তাহার সমস্ত কথার মধ্যে একটা আন্তরিক কাতরতা বিবিধ ছন্দে প্রকাশিত হইয়া সেই দীপ্ত প্রভাতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের উপর একটা অতি কোমলভাব ছড়াইয়া দিল। সব কথা শেষ করিয়া লীলা বলিল "তিনি আমায় আঘাত করেছেন, তা আমি ভুলতে পারছিনা কেন? আবার আমার জন্যই সকলে তাঁকে আঘাত করেছে, কিন্তু আমি কেন বাধা দিতে পারিনি? কাপুরুষের মত সেই একক মানুষটাকে আমি এবং আমার বন্ধুরা যখন তীব্র বিদ্রূপ আর অপমান দিয়ে বিঁধছিলাম, কেন তখন তাকে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ঢেকে রাখতে পারলাম না। আমার মনে এই দুই রকমের ভাব এমন একটা বিপ্লব বাধিয়েছে যে, আজ ক'দিন হ'তে আমি কিছুতেই সুস্থির হ'তে পারছি না। তিনি কেন রাগ করলেন না? তিনি কেন হাসিমুখে চলে গেলেন? যদি গেলেন ত' তাঁর সমস্ত অস্তিত্বটা আমার মন হ'তে মুছে নিয়ে গেলেন না কেন? —ভাই মায়া তুমি আমার এমন শত্রুতা করলে কেন?"

লীলা তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত নয়ন দুটী যখন মায়ার গম্ভীর প্রশান্ত বদনের উপর স্থাপিত করিল, তখন মায়ার নয়নেও অশ্রু দেখা দিল। কিন্তু সে অশ্রু দুঃখের নয় আনন্দের—বিষ্ণুর জয়ে যেন সে অন্তরে অন্তরে অতিশয় পুলকিত। তাহার চক্ষের সম্মুখে বিষ্ণুর হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে কোমল অথচ স্থির ধীর পৌরুষপূর্ণ মূর্ত্তিখানি জাগিয়া উঠিতেই তাহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে লীলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ভাই এমন মানুষকে ভক্তি ছাড়া, প্রণাম ছাড়া, আর যে কিছু করতে পারি এত শক্তি আমার নেই। তোমার সাহসকে ধন্যবাদ যে, তুমি একে ভালবাসতে সাহস করেছ। নরনারীর ঐ অতি সাধারণ ভাব নিয়ে ওঁর কাছে যেতে যে সাহস ক'রে তাকে আমিও ধন্যবাদ দিই। কিন্তু এরকম মানুষকে প্রতিদিনের ভাত ডালের মধ্যে ধ'রে এনে দিই এত শক্তি আমার নেই। আমি তোমায় এইটুকু উপদেশ দিই যে, যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করছ ও ভাব নিয়ে ওর কাছে যেওনা।"

লীলার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; সে সতেজে বলিল "তাকে পেতে চাইব এত বড় লোভী আমি নই। আমি কেবল একবার তাঁর পায়ে জানাতে চাই যে আমি পরাজিত। তুমি আমার সেই সুবিধাটুকু করে দাও। তুমিই আমায় এই আগুণের মধ্যে ফেলেছ, তোমাকে আমায় এই আগুণ হ'তে শুদ্ধ হ'য়ে বেরিয়ে আসবার সুবিধা করে দিতে হবে। আমি তাঁকে একখানা পত্র দিয়েছি। তার যা উত্তর পেয়েছি এই দেখ তা আমার কাছে রয়েছে।"

লীলা একখানা পত্র বাহির করিয়া দিল। মায়া পড়িয়া দেখিল, বিষ্ণু লিখিয়াছে—

"ক্ষমা চাহিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই ভগ্নি! ভগবান যেদিন আমায় যেরূপ রাখেন আমি সে দিন সেইরূপই থাকি, তাতে একটুও দুঃখ করি না। দুঃখ? সংসারে এত লোক এত কষ্ট পাচ্ছে, আর কোথায় কে দুটো কথা বলেছে বলে দুঃখ করব? ছিঃ! আপনি আমায় এত নীচ মনে করেন? কোন ক্ষোভ রাখবেন না, আমি আপনাদের কাছে সে দিন খুব আনন্দই পেয়েছিলাম। মানুষ সবাই এক রকমের নয়, তাই এক রকমে তাদের জীবন কাটে না। সেইজন্য আমি ক্ষণেকের জন্য ভুলে গিয়ে আপনাদের রূঢ় কথা বলেছিলাম। কিন্তু তাও এখন বুঝছি যে সে কথা আমি বলিনি, সে কথাও আমার মুখ দিয়ে আর একজন বলেছে। হয়তো ও কথারও প্রয়োজন ছিল। তাই তখন আমার নিজের অপরাধের জন্য যে দুঃখ হ'য়েছিল; তা ঝেড়ে ফেলেছি। আমার জন্য আপনি যে এতটা চিন্তিত, আপনি যে আমায় এতখানি স্নেহের চক্ষে দেখেছেন তাতেই নারায়ণের পায়ে কোটী কোটী প্রণাম জানাচ্ছি। দিদি, স্নেহ তাঁরই দান, তাই যখন আপনি আমায় দিতে পেরেছেন তখন তাঁরই অনুভব আপনার হয়েছে। জগতের সমস্ত স্নেহ প্রেম ভালবাসা সেই জগদেকনাথের প্রেমের ছায়া! আপনারা নারীজাতি সেই ধনে ধনী, আপনাদের পায়ে কোটী কোটী প্রণাম! আপনারা সেই প্রেমের অনুভব আমাদের হৃদয়ের কাছে এনে দিয়ে জগদ্‌গুরু হয়েছেন—হে গুরু আপনাকে প্রণাম।"

পত্র পড়িয়া মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "ফের ফের লীলা, এ আগুণের কাছে যেও না। এতে ঝাঁপ দিও না! এই স্বর্গের বস্তুর কাছে এ কি ভাব নিয়ে তুমি বহ্নিবিবিক্ষু পতঙ্গের মত ছুটে যাচ্ছ! ফের—"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিল "ফিরব না, কিছুতেই নয়।" পরক্ষণেই কাতরস্বরে মায়ার হস্ত ধরিয়া বলিল "একটীবার তাঁর পায়ের কাছে আমায় বসতে দাও, আমি আমাকে পবিত্র করে নিই, তারপর সংসারে যে কাজে আমায় নিয়োজিত করবেন আমি তাতেই নির্ব্বিচারে আপনাকে নিয়োজিত করব। কোন দ্বিধা করব না, কোন বিচার করব না। জীবনে একবার পূজা করে নির্ম্মাল্যের ফুল সংসারে আশীর্ব্বাদেই লাগবে, মায়া তোমার ভয় নেই।"

মায়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "বেশ তাই হবে। কিন্তু সাবধান তিনি বিবাহিত। এঁর স্ত্রী এঁরই মত দেবতা। সাবধান, এঁদের যেন অমর্য্যাদা কর না। তুমি প্রবৃত্তিময়ী তোমার ন্যায্যান্যায্য বিচারের ক্ষমতা চলে গিয়েছে, তাই সাবধান ক'রে দিচ্ছি।"

লীলা পরাজিতা, অনুতপ্তা দীনভাবাপন্না লীলা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেদীর উপর বসিয়া পড়িল—আর শাখান্তরালচ্যুত প্রভাত সূর্য্যের শ্রী দীপ্তভাবে তাহার মস্তকে পতিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব আলোকে মণ্ডিত করিল।

ব্রহ্মযশার গৃহে অন্য একজন নূতন অতিথি আসিয়াছেন। ইনি একজন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ এবং সম্বন্ধে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। কপালে দীর্ঘ ফোঁটা পরিধানে মলিন বস্ত্র এবং মস্তকের উপর প্রকাণ্ড পাগড়ি। ব্রহ্মযশা ইঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। ইনি আসিয়াই "লছমিয়ার" সঙ্গে দেখা করিতে চাহিলেন। ব্রহ্মযশা তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর পদাদি প্রক্ষালিত করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়া তাঁহার পূজা পাঠ ও আহারাদির জোগাড় করিবার অনুমতি পাইলেন।

কিন্তু 'তবি ভুলিবার নয়,' আহারাদি শেষ করিয়াই তিনি বলিলেন "আমার বেশী সময় নাই, অদ্যই ফিরিয়া যাইতে হইবে, অতএব লছমিয়ার সঙ্গে "মুলাকাত" হওয়ার এখনি প্রয়োজন। আমার পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত সংসারের ভার আমারই উপর পড়িয়াছে, সেইজন্য আমি অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন বাবু রামপ্রসাদ, আপনি আসিয়াছেন বটে কিন্তু আপনাদের লছমিয়া যদি যাইতে না চান?" রামপ্রসাদ তাঁহার গোল গোল দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন "এ কিরূপ কথা, আমার ভগ্নী আমার সহিত যাইবেন না?"

ব্রহ্ম। তিনি ত' জন্মাবধি আপনাকে কখনও দেখেন নাই; হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যাইবেন কিরূপে? চৌবেজী আপনি আপনার সঙ্গে কোন নিদর্শন আনিয়াছেন কি?

চৌবেজী আকাশ হইতে পড়িলেন। শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "এ সব আপনার চালাকি! বাঙ্গালি লোক সকলেই বখেড়া লাগাইতে পটু কিন্তু আমি কোন কথাই শুনিব না; আমার নিকট কোন চালাকিই খাটিবে না। আমি উহাকে লইয়া যাইবই।

ব্রহ্ম। আপনি রাগ করিবেন না, ব্যস্ত হওয়ারও কোন প্রয়োজন নাই। আপনার পিতা মৃত অযোধ্যা প্রসাদ তাঁহার ভ্রাতাকে এক প্রকার গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তারপর তিনি আমাদের আশ্রয়ে আসিয়া সস্ত্রীক প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহার পর ঐ কন্যাটীকে আমারই হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। তিনি এমন কি আপনাদের হস্তে উহাকে সমর্পণ করিতে বারণই করিয়া যান। তথাপি কর্ত্তব্যানুরোধে আমি আপনাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়া আপনাদের হস্তে প্রত্যার্পণের চেষ্টা করি। কিন্তু তখন আপনারা উহাকে গ্রহণ করিলেন না। এখন উঁহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থের সংবাদ পাইয়া গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। এ অবস্থায় উনি যাইবেন কেন? বাল্যকালে লইয়া গেলে উঁহার কোনই কষ্ট হইত না। এখন উনি আমাদের সংসারের একজন হইয়া গিয়াছেন, এ সময় আপনাদের অধিকার উনি স্বীকার করিবেন কেন? আপনি এই সব কথা বিবেচনা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। একটী বালিকার সমস্ত জীবন এই ব্যাপারের উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনাকে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

চৌবেজী কিছুক্ষণ নিমিলিত নেত্রে চিন্তা করিলেন, পরে খানিকটা "খৈনি" মুখে পুরিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাকে একবার ডাকুন।"

ব্রহ্মযশা লক্ষ্মীকে ডাকিলেন। লক্ষ্মী আসিয়া চৌবেজীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। চৌবেজী তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। পরে দু একবার ঢোক গিলিয়া চক্ষু পিট পিট করিতে করিতে বলিলেন "এই কি লছমিয়া? এ যে বাঙ্গালীর মেয়ে। আপনারা চালাকি করিয়েছেন না ত?"

ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন, পরীক্ষা করিয়া লউন।" চৌবেজী আর একবার লক্ষ্মীর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "না আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। আমি পরীক্ষা করিয়া তবে স্বীকার করিব। আপনারা যে যাহাকে তাহাকে আমার স্কন্ধে চাপাইবেন তাহা হইবে না।"

ব্রহ্ম। মহাশয়! আপনার স্কন্ধে চাপাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা নাই। আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি অদ্যই প্রতিগমন করিতে পারেন।

চৌবে। কিন্তু আপনারা যে মিছামিছি একটী বাঙ্গালী বালিকার জন্য আমার খুল্লতাতের অর্থ করায়ত্ব করিয়া রাখিবেন তাহা হইবে না।

ব্রহ্ম। সেইটাই আসল কথা, এ কথা খুলিয়া বলিলেই ত' চুকিয়া যাইত। কিন্তু আমরা বিশেষ রূপেই যখন জানি যে ইনি মৃত দুর্গাপ্রসাদ চৌবের কন্যা তখন ইঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে ইঁহাকে কিছুতেই বঞ্চিত হইতে দিব না।"

লক্ষ্মী এইবার কথা কহিল। পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় সে তাহার ভ্রাতাকে বলিল "কেন ব্যস্ত হইতেছেন, আপনার ঐ সামান্য অর্থের উপরই যদি এত লোভ হইয়া থাকে তাহা হইলে লিখিলেন না কেন, আমি অনায়াসেই উহা আপনাকে ছাড়িয়া দিতাম। আপনাদের কখনও দেখি নাই তাই আসিতে লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি যখন আমাকে চান না আমার অর্থ চান তখন এতদুর কেন আসিতে গেলেন।"

চৌবেজী একগাল হাসিয়া বলিলেন "না না তা' নয়, তোমাকেই আমার দেখিতে আসা। এখন কখন আমার সঙ্গে যাইতেছে বল।"

লক্ষ্মী গম্ভীরভাবে বলিল "আপনার সঙ্গে যাওয়া না যাওয়া এখন আর আমার উপর নির্ভর করে না। উনিই আমার এখন পিতা, উঁহার অনুমতি হইলে আমি যাইতে পারি।"

ব্রহ্মযশা বলিলেন "তাহা হইলে আপনি এখন দু'দিন এইস্থানে অবস্থান করুন। যদি আপনি ইঁহাকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত ইহা প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে কিছুদিনের জন্য আপনার সঙ্গে ইঁহাকে প্রেরণ করিতে পারি।"

চৌবেজী আবার চটিয়া উঠিলেন, রাগে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল; কেবল তাঁহার দীর্ঘ আর্ক ফলাটী প্রচণ্ড ভাবে আন্দোলিত হইয়া তাঁহার আন্তরিক ঝটিকার সংবাদ জগতে প্রকটিত করিতে লাগিল। তিনি তাঁহার প্রচণ্ড মুষ্টি আসনের উপর পাতিত করিয়া অনেক কষ্টে বলিলেন যে তাঁহার ভগ্নীকে আবদ্ধ রাখিবার অধিকার কাহারও নাই।

ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন যে তাঁহার আছে কারণ লক্ষ্মী এখন তাঁহার পুত্রবধূ!

এই সংবাদে চৌবেজী একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন এবং বহুপ্রকার আইন ঘটিত ভয়াদি প্রদর্শন পূর্ব্বক, শেষে প্রায় কাঁদ কাঁদ সুরে বলিলেন যে এ সংবাদ যেন তাঁহাদের দেশে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিজ পুত্র কন্যার বিবাহাদিতে ভয়ানক অসুবিধা ঘটিবে।

ব্রহ্ম। ভয় নাই এ সংবাদ কোথাও প্রকাশ করিব না।

চৌবে। কিন্তু আপনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে হিন্দুস্থানী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন?

ব্রহ্ম। সে কথা বুঝাইতে দু'দিন লাগিবে, আপনি এখন দু'দিন শ্রান্তি দূর করুন।

চৌবে। আপনার জলগ্রহণ করাও পাপ—আপনি আমার জাতি খাইয়াছেন।

ব্রহ্ম। জগতে যিনি স্বয়ং জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই এই বিবাহ দিয়াছেন। আপনাকে সেই কথা বুঝান প্রয়োজন। সেইজন্য বলিতেছি আপনি দু'দিন অপেক্ষা করুন।

লক্ষ্মী এতক্ষণ নীরবে সমস্তই শুনিতেছিল, ভ্রাতার অদ্ভুৎ ভাব ভঙ্গী দেখিয়া সে প্রথমটা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন চৌবেজী ব্রহ্মযশার বিষয়ে ঐ অপমান জনক বাক্য উচ্চারণ করিল তখন সেও বিচলিত হইয়া বলিল "বাবা, যিনি আপনাকেও অপমান করিতে পারেন তাঁকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিতে আমি ইচ্ছুক নই উনি অদ্যই চলিয়া যান।"

ব্রহ্ম। না মা, উনি আমার কি জানেন তাই মান্য রাখিয়া কথা বলিবেন। উঁহার যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা সেই অনুসারেই উনি ঐ কথা বলিয়াছেন; ও কথায় রাগ করা উচিত নয়। চৌবেজী রাগ করে কোন ফল নেই, ভয় দেখিয়েও কোন ফল হবে না, কারণ ইনি এখন সাবালিকা এঁকে ও ভয় দেখান মিছে। আর তাতে আপনারও বিশেষ লাভ নেই। এখন যাতে সর্ব্ববিষয়ে সুব্যবস্থা হয় তাই করুন।

চৌবেজী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে লক্ষ্মীকে বলিলেন "লছমিয়া তুমি আমার যে ক্ষতি করিলে এমন কেহই করে না। তুমি আমার উচ্চ মাথা হেঁট করিলে। তোমাদের কিরূপে জব্দ করা যায় তাহাই এখন বিবেচ্য।"

ব্রহ্ম। আচ্ছা বেশ সেই কথাই ভাল, দু'দিন এইস্থানে থাকিয়া উকিলাদির নিকটে গিয়া তাহাই করুন।

চৌবে। আপনি আর আমায় রাগাইবেন না, আপনার

নিকটে থাকিয়া আপনার সর্ব্বনাশ চিন্তা করিব এতদূর নীচ আমি নই। এক দিনের জন্য যখন আপনার অন্ন গ্রহণ করিয়াছি তখন আপনার অনিষ্ট করা আমার দ্বারা হইবে না। আমি অদ্যই চলিলাম, আপনাদের সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই—আমি দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার অনিষ্ট করিয়া যদি আপনার মঙ্গল হয় ভগবান তাহাই করুন।

চৌবেজী ছল ছল চক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্মী অগ্রসর হইয়া করজোড়ে বলিল "অন্ততঃ আর একটী দিন থাকুন।" লক্ষ্মীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ও ব্রহ্মযশার অমায়িকতায় আপ্যায়িত হইয়া বাবু রামপ্রসাদ চৌবে অগত্যা সেই রাতটা ঐখানেই কাটাইতে স্বীকৃত হইলেন।

চৌবেজী একরাত্র থাকিতে গিয়া অনেক রাত্রিই রহিয়া গেলেন এবং এই অবসরে বিষ্ণুযশা প্রিয়ব্রত এবং বিশেষ করিয়া শিবব্রতের সঙ্গে আলাপ করিলেন।

—•—

মহামায়ার কক্ষে বসিয়া লক্ষ্মী তাহার সহিত লীলা-ঘটিত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতেছিল। লক্ষ্মী অতি কাতরভাবে বলিল "জেনে শুনে, তুমি এমন ব্যাপার ঘটতে দিলে কেন? ছিছি একথা তাঁকে বলিব কি করে? তুমি জান না ভাই, বাবা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে অচল অটল, কিছুই যেমন তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, ইনি তেমনি সামান্য ব্যাপারেই বিচলিত হন। এমন কোমল এমন পরদুঃখকাতর হৃদয় তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না। এই জন্যই সময় সময় আমার কষ্ট হয় ইনি কেন বাবার মত হ'লেন না? বাবা এত চেষ্টা করে শেষে একি ফল লাভ করলেন? তিনি যেমনটী চান ইনি ত' সে রকম হতে পারলেন না। এই জন্য আমার ভয় হচ্চে যে যখন শুনবেন তাঁরই জন্য লীলাবতী এই রকম হয়েছেন তখন তিনি যে কি করবেন তা ধারনাতেই আনতে পারছি না।"

মায়া। তাঁকে এসব কথা খুলে বলার দরকার কি? সুধু এই টুকু বললেই চলতে পারে যে লীলা তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবার জন্য একবার তাঁর দর্শন প্রার্থিনী।

লক্ষ্মী। তা হ'লে তিনি দেখাই করবেন না; অথচ তাঁর সঙ্গে লীলার দেখা হওয়ার নিতান্তই প্রয়োজন দেখছি।

মায়া। কেন?

লক্ষ্মী। তুমিইত' বললে যে লীলা এই দেখা করবার জন্য অত্যন্ত কাতর হয়েছেন।

মায়া। আমার বিশ্বাস যে তাঁর নিকট হ'তে উপদেশ পেলে লীলা শান্ত হবে। তাঁর কাছে যে একবার নত হয়ে যথার্থ শান্তির কামনা নিয়ে যাবে সে নিশ্চয়ই শান্তি পাবে।

লক্ষ্মী। তুমি ওঁকে এতখানি চিন্তে পেরেছ এর জন্য তোমায় শত ধন্যবাদ।

মায়া। কিন্তু তোমার ত' এতে পাপত্তি থাকতে পারে?

লক্ষ্মী। আমার আপত্তি? কিসের আপত্তি?

মায়া লক্ষ্মীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "তোমার পায়ের ধূলা একটু দিতে পার, তা হ'লে আমাদের মত অনেকেরই নারীজন্ম উদ্ধার হয়ে যাবে।"

লক্ষ্মী। ছিঃ কি বল তার ঠিক নেই। তুমিই আমার নমস্যা, দাঁড়াও প্রণাম করি। কিন্তু আমার কি আপত্তি থাকতে পারে সেটা বুঝিয়ে দাও।

মায়া। নিজের স্বামীর কাছে এই রকম মন নিয়ে যেতে দিতে সকলে হয় তো স্বীকার করবে না তাই ওকথা বলছিলাম।

লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল "না হয় কেউ ওঁকে পত্নীভাবে ভাল বাসলেই, না হয় কাউকে উনি আমার চাইতে বেশী ভালবাসলেনই তাতে কি গেল এল। এটা যখন স্থির যে মানুষ কর্ত্তব্য করতেই সংসারে জন্মেছে, তখন তার মন নিয়ে সে যা ইচ্ছে করুক না তাতে তার কিছুই যাবে আসবে না। ধর্ম্ম এমনি সত্য বস্তু যে তিনি অবশেষে মানুষকে ঠিক পথেই আনবেন। প্রবৃত্তি নিয়েত' মানুষ সর্ব্বদাই যুদ্ধ করছে, তাইত তার সাধনা। মনকে দমন করে আনতে পারলে তখনই ত সে জয়ী হ'ল, তখনই ত'

তার সিদ্ধি লাভ হ'ল। মানুষ ত' আর কাঁচের বা মাটির ঘট নয় যে ভাঙলেই তার ঘটত্ব চলে গেল। মানুষ একটা প্রাণপূর্ণ জীবন্ত আত্মা, তাকে নষ্ট করে কার সাধ্য! ধর্ম্মাচরণের জন্য নারায়ণ মানুষকে সংসারে পাঠিয়েছেন—সেই ধর্ম্মও যেমন নিত্য মানুষও তেমনি নিত্য।

নারায়ণ বলেছেন—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ॥

ধর্ম্ম এতদিনের এবং এত দৃঢ় যে ব্যক্তিগত অতিক্রমনে তার কিছুই হয় না অথচ এমনি সে মহান যে তার একটু পেলেই মানুষ চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হয়ে যায় জগতে আর তার কোন ভয় থাকে না। তুমি ত' জান ভাই যে আমরা উভয়েই সব ছেড়ে ঐ ধর্ম্মকেই আশ্রয় করেছি। এতে যদি মাঝে মাঝে স্খলন পতন হয় তার জন্য ভয় করতে যাব কেন? আর এত কথাই বা কেন বলি? তাঁকে ত' তুমি জান তাঁর বিষয়ে কি এ ভয় করাও হ'তে পারে? আমার ত' কিছুতেই হয় না। ওঁর ভালবাসা কেবল একটী মাত্র আমাতে বা তোমাতে বা আর কারুর ওপরে আবদ্ধ করে রাখতে গেলে ওঁর ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা হবে। তা আমি পারি না যে।

মায়া লক্ষ্মীর এই কথাগুলি শুনিয়া বলিল "কিছুদিন আগে আমি তোমায় অশিক্ষিতা মূঢ়া বালিকা মাত্র মনে করিতাম; তারপর ক্রমশঃ তোমার পরিচয় পেয়ে আমার মনে হচ্চে, কি করেছি এত দিন? আমার বাবাও পরম জ্ঞানী কিন্তু তাঁর নিকট হ'তে কখনও এমন করে কোন জ্ঞান পাবার আশায় বলি নি। কেবল নিজের পাঁচখানা বই নিয়ে নাড়াচাড়াই করেছি। এখন আমার স্পষ্ট বোধ হচ্চে জ্ঞান অর্জ্জনের চেষ্টায় জ্ঞান হয় না, জ্ঞানকে জীবনের মধ্যে সত্য করে তুলতে পারলে তবে জ্ঞান আসে এবং তার সঙ্গী শান্তি আর সুখও দেখা দেয়। যাক তোমার যখন কোন আপত্তি নেই তখন লীলাকে ডেকে পাঠাই।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বামীর কাছে কি করে একথা বলব।

মায়া। আর কোন কথা বলে দরকার নেই কেবল এইটুকু বলে রাখ গে যে, লীলা একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

লক্ষ্মী। বেশ সেই কথাই ভাল। তুমি ওঁকে নিয়ে এস আমি চল্লাম।

লক্ষ্মী চলিয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে লীলা লজ্জিত মুখে মায়ার নিকট উপস্থিত হইল। মায়া বলিল "তুমি যদি এতে লজ্জা বোধ কর তা হ'লে কি সাহসে তাঁর কাছে যেতে চাচ্ছ?"

লীলা বলিল "ভাই আমায় ক্ষমা কর এই ক'দিন হতে আমার যে অবস্থা যাচ্চে তাতে আমার সমস্ত শক্তি চলে গিয়েছে। এখন তোমার সংবাদ বল। তুমি সব কথাই লক্ষ্মীকে বলেছ?

মায়া। নিশ্চয়ই। কিছুই গোপন করিনি। তিনি তোমায় এখনি যেতে বলে গিয়েছেন, যাবে?

লীলা। সব কথা শুনে তিনি কি বল্লেন।

মায়া। তাঁর কথা শুনবার যে তুমি উপযুক্ত তা আগে প্রমাণ কর তারপর তিনি কি বলেছেন তা বলব। এখন আর অন্য কথার সময় নেই, চল।

মায়ার উজ্জ্বল গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া লীলা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আর কোন কথা না বলিয়া সে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া ব্রহ্মযশের গৃহে উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতেই লক্ষ্মী দাঁড়াইয়াছিল। মায়া ও লীলাকে দেখিবামাত্র সে নামিয়া আসিয়া বলিল "আপনাকে দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'চ্চে। আমার কাছে লজ্জা বা কুণ্ঠাবোধ করবার দরকার কিছুমাত্র নেই। আসুন উনি ওপরেই আছেন। এখনি বেরুচ্ছিলেন আপনার জন্য ওঁকে ধরে রেখেছি।"

লীলা কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া না পাইয়া মহামায়ার দিকে চাহিল। মহামায়া হাসিয়া বলিল "চল ওপরে যাওয়া যাক।"

তাহাদের শব্দ পাইয়া বিষ্ণু তাড়াতাড়ি তাহার কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল "আসুন আসুন আমি আপনাদের জন্যই আজ বেরুতে পাই নি।"

লক্ষ্মী বলিল "আমরা থাকলে হয়তো এঁর কথা বলতে অসুবিধা হ'বে, অতএব এস অতিথি ভাগ করে নেওয়া যাক, মায়া দিদি তুমি আমার ভাগে, কারণ—

মায়া। কারণ সেইটেই প্রয়োজন।

মায়া ও লক্ষ্মী চলিয়া গেল। বিষ্ণু বলিল "তাহ'লে এখানে দাঁড়িয়ে ফল কি? চলুন দেখি আজ অতিথি সৎকার করতে পারি কি না? আমি ত' কিছুই জানিনে ক্রটী হলে মার্জ্জনা করে নেবেন।"

লীলা কাটের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিষ্ণু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল "কি হয়েছে? আপনি অমন করে দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? আপনি যদি অমন করে দাঁড়িয়ে থাকেন তা' হ'লে এ বাড়ির কেউ আমায় ক্ষমা করবে না"।

লীলা যন্ত্র চালিতবৎ বিষ্ণুর কক্ষে প্রবেশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই বিষ্ণুর পায়ে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিয়া, বলিল "আমায় ক্ষমা করুন। আমি এ ঘরে প্রবেশ করিবার উপযুক্তা নই।

বিষ্ণু ব্যস্ত হইয়া বলিল "ছিছি আপনি অতিথি, আপনি আমার নারায়ণ আপনি ওকথা কি করে বল্লেন? আপনাকেই আমার পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় দিতে হবে। এই আসনখানায় বসুন। আমি অতিথি সৎকারের উদ্যোগ করি। লক্ষ্মী বলেছে আজ সমস্তই আমায় করতে হবে, সে একটুও সাহায্য করবে না, তাই নিরুপায় হয়ে মার কাছে যেতে হচ্চে দেখি তিনি যদি কিছু যোগাড় করে দেন।"

লীলা কাতর হইয়া বলিল, "আপনি আমার গুরু, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন তা হ'লেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হ'বে।"

বিষ্ণু অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; পরে হাসিয়া বলিল "আপনার কি হয়েছে? অমন করে রয়েছেন কেন? আর বারে বারে ক্ষমা করুন ক্ষমা করুন বলে আমায় অপরাধী করছেন কেন? কি অপরাধের জন্য আপনি ক্ষমা চাচ্চেন?"

লীলা উত্তর দিল না। বিষ্ণু তাহাকে নীরব দেখিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "সব কথা খুলে বলুন, আমার যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। আপনাকে দেখে বুঝতে পার্চ্ছি একটা গভীর দুঃখ আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সংসারে যদি কোন কারণে দুঃখ পেয়ে থাকেন তাহ'লে সেটাকে মনে করে রাখলে দুঃখ কিছুতেই কমে না। আমার বোধ হচ্চে, সেই দিনকার ব্যাপারটা আপনি ভুলতে পারেন নি। আমি সত্য বলছি যে সেদিনের জন্য কোন ক্ষোভ নেই, আপনি সেই দিনকার ব্যাপারের জন্য কোন ক্ষোভ মনে করে রাখবেন না। আমার কাছে আপনি কোন অপরাধ করেন নি উপরন্তু আমার প্রতি এতটা স্নেহ আর করুণা দেখিয়ে আপনি আমায় চিরদিনের জন্য কিনে নিয়েছেন। আপনাকে সত্যই বলছি যে সংসারে যদি কেউ কারও কাছে কোন অপরাধ করে সেটা মনে করে রাখা শুধু অন্যায় নয় নিজের ওপরও অত্যাচার করা হয়। আমি কেন মিছি মিছি নিজেকে কষ্ট দেব। আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই আপনি স্বচ্ছন্দে ঐ আসন গ্রহণ করুন। একটা সামান্য কারণে যাঁর হৃদয় হতে আমার জন্য এতখানি করুণা জাগতে পারে তাঁকে কি করে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দেখাব তাই ভাববার বিষয়।

লীলা তবুও নড়িল না। বিষ্ণু তখন নিরুপায় হইয়া বলিল "তাহ'লে আমি নিরুপায়। আপনি যদি এরকম করে আমার পূজা প্রত্যাখ্যান করেন—

লীলা কাঁদিয়া ফেলিয়া করজোড়ে বলিল "দয়া করুন, এক মিনিটের জন্য আমায় এইখানে এইভাবে বসে থাকতে দেন। তারপর সংসারে আপনি আমায় যে কাজে নিয়োগ করবেন যেখানে যেতে বলবেন, যেখানে আমায় রাখবেন আমি সেইখানে থাকব। একবার কেবল আমার মাথায় হাত দিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আর আমি কিছু চাইনে। আমার সমস্ত গর্ব্ব নষ্ট করে দিয়েছেন এখন আছে কেবল আপনাকে প্রণাম করবার অধিকার। আপনি সকলকেই দয়া করেন, পশুপক্ষীও আপনার দয়া

হ'তে বঞ্চিত নয়। আমায় আর বঞ্চিত রাখবেন না। আপনার হৃদয়ের অগাধ শান্তির এককণা আপনার ঐ একটু স্পর্শ দিয়ে আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে দেন। দেবতা, ভক্তকে ফেরাবেন না।

লক্ষ্মী মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। বিষ্ণু ক্ষণকাল উজ্জ্বল চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—"দেবি! ঈশ্বরের স্পর্শ তোমার হৃদয়ে হয়েছে, তুমি অতি পবিত্রা! তোমায় স্পর্শ করে আমি পবিত্র হলাম।"

বিষ্ণু একবার জোর করে লীলাকে প্রণাম করিয়া বলিল—"নমো নারায়ণায়।" তারপর বলিল "ওঠ নারী! তুমি নারায়ণের প্রেরিতা, নারায়ণের সম্পত্তি, নারায়ণ তোমার হৃদয়ে। দেখতে পাচ্ছনা? কার স্পর্শ চাচ্ছ? আমার? আমি কে? আমি তোমায় এই স্পর্শ করে পবিত্র হলাম। গৃহে যাও আর মনে রেখো তুমি আজ হতে আর কারও নও কেবল তাঁর—তাঁর—তার।"

বিষ্ণু করজোড়ে নিমীলিত নেত্রে অশ্রু প্লাবিত বদনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। লীলা একবার সেই ভক্তের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বিষ্ণু পদ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এখন আসুন কি অতিথি সৎকার করবেন করুন আমি প্রস্তুত।"

———•———

রামপ্রসাদ চোবেকে গৃহে স্থান দিয়া ব্রহ্মযশা স্বয়ংই আমন্ত্রন করিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিলেন। চৌবেজী অত্যন্ত অস্থির মতির লোক। তাঁহাকে হস্তগত করিয়া শিবব্রত ব্রহ্মযশা ও বিষ্ণুযশার সর্ব্বনাশের চেষ্টা আরম্ভ করিল।

কিছুদিন হইতে শিবব্রত বিষ্ণুর উপর লীলার জন্য একটা ভয়ানক হিংসা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মায়া সমস্ত কথাই তাহাকে বলিয়াছিল এবং লীলার ব্যবহার ও তাহার হিংসা বহ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়াছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, যেমন করিয়াই হউক এই ভণ্ড লোকটার সমস্ত জুয়াচুরী সাধুগিরি নষ্ট করিয়া দিবে। ইতিমধ্যে রামপ্রসাদ চৌবেকে পাইয়া তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সে তাহাকে নানা প্রকারে কুবুদ্ধি দিয়া প্রলোভিত করিয়া এমন কি নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিয়া হস্তগত করিল। একদিন প্রভাতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চৌবেজী শিবব্রতের কোন এক বন্ধুর গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইলেন, ইচ্ছা এইখান হইতে ব্রহ্মযশার নামে প্রেসিডেনসী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে ব্রহ্মযশার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা জুড়িয়া দিবে।

কার্য্যেও তাহাই হইল; একদিন প্রভাতে দুইখানি গ্রেপতারি পরোয়ানায় ব্রহ্মযশা ও বিষ্ণুযশাকে পিনাল কোডের ৩৬৬ ধারা অপরাধে ধরিয়া লইয়া গেল।

এই সংবাদ পাইয়া সত্যব্রত মহামায়াকে লক্ষ্মীও ভুবনেশ্বরীর নিকট পাঠাইয়া স্বয়ং জেলে গিয়া ব্রহ্মযশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন "এতবড় মিথ্যা কতক্ষণ চলবে, কোন ভয় নেই ভাই। আমি যখন নির্দ্দোষী তখন আমাদের কোন ভয় নেই।

সত্য। কিন্তু সংসারে চিরদিন সত্যেরই জয় হয় না। সেইজন্য সত্যকেও প্রমাণ করার দরকার। আমি ভাল উকিল লাগাতে চাই এবং আপাততঃ জামিনের জন্য চেষ্টা করব।

ব্রহ্ম। ও সব কিছু করবার প্রয়োজন নেই। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাই হ'ক।

সত্য। ভগবানের যে কি ইচ্ছা তা কেমন করে বুঝব? হয়তো তিনি এমনি করে, তোমার শত্রুদেরই শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন।

ব্রহ্ম। আমার কেউ শত্রু নয়, সকলেই মিত্র। তুমি ব্যস্ত হয়ো না ভাই; এতে আমার কিছুই হবে না।

সত্য। না ভাই অন্যায়কে এমন করে প্রশয় দেওয়া চলে না। তুমি আমায় বাধা দিওনা। যে পাষণ্ডেরা তোমায় মিছামিছি এমন বিপদে ফেলেছে তাদের আমি কোনমতেই ক্ষমা করব না।

ব্রহ্ম। যদি তারা তোমার পরমাত্মীয় হয়।

সত্য। তা হ'লেও তাদের রক্ষা নাই। আমি যেমন করে পারি তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করব। তুমি আমায় বাধা দিও না।

ব্রহ্ম। তুমি ভুল করছ, এতে তাদের কোন অপরাধ নাই ভগবদিচ্ছাতেই সব ঘটছে। নিশ্চয়ই আমাদের কোন ত্রুটী হয়েছিল; তিনি তারই শাস্তি বিধান করেছেন।

সত্য। সে কথা সম্পূর্ণ সত্য, তবু আমাদেরও কর্ত্তব্য আছে। আমরা যদি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই তা হ'লে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করা হবে। তিনি যেমন অন্যায়কে সৃষ্টি করেছেন তেমনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্যও আদেশ দিয়েছেন। আমি চিরদিন তাঁর ওপর নির্ভর করে যা ইচ্ছা তাই ঘটতে দিচ্ছিলাম। আমার পুত্র কন্যারা তাই আপন ইচ্ছা-মত গড়ে উঠেছে। তার ফল যে খুব ভালই হয়েছে একথা কিছুতেই বলতে পারি না। তুমি চিরদিন আপনার উপরই নির্ভরশীল। আজ কেন বলছ যে যা ভগবান করবেন তাই ঘটুক। ভগবানের ইচ্ছা আমাদের কার্য্যের দ্বারাই প্রকাশিত হবে। আমি যখন ক্রমশঃ তোমার মতকেই গ্রহণ করছি তুমি কেন আবার আমারই মত ষষ্ঠবিয়্যশেতি হয়ে উঠছ? ব্রহ্ম-ব্রথা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "ভাই বাধ্য হয়েই কতকটা তোমার মত একান্ত নির্ভরশীল হতে বাধ্য হচ্ছি। আমি চেষ্টা করে সারা জীবন একটীমাত্র আশার উপর প্রাণ সমর্পণ করে বসে আছি। অথচ আমার সেই এত আশার স্থল একি হয়ে উঠল? বিষ্ণুযশাকে ক্রমশঃ আমি একি গড়ে তুললাম? তাকে আমি আমার প্রাণপণ চেষ্টার ফলে, কি হতে দেখব মনে করেছিলাম, আর সে একি হ'ল? কোথায় নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মসন্ন্যাসী আদর্শ গৃহস্থ হয়ে সে আমার সেই মহান আশাকে সফলতার পথে অগ্রসর করে দেবে, তা না হয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবভোগী উন্মাদ হয়ে উঠতে চল্ল! মনে করে ছিলাম কলকাতার কর্ম্ম তরঙ্গের মধ্যে এনে ফেলে তাকে শিক্ষা দেব। কলকাতার কর্ম্মের উগ্রহতার মধ্যে দাঁড় করিয়ে তার প্রাণে প্রকৃত কর্ম্মী হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেব। আশা ছিল যে, সে এই উন্মত্ত জগৎকে বুঝিয়ে দেবে যে প্রকৃত কর্ম্মীর আদর্শ এরকম পাগলামি নয়। কিন্তু হায়! ক্রমশঃ দেখছি যে সংসারের এই অবস্থা দেখে সে প্রকৃত সংসারী হবার চেষ্টা না করে তীব্র বৈরাগ্যকে লাভ করছে। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে সে উদাসীন হ'তে চল্ল। ভাই, তুমি আমার এ দুঃখ বুঝতে পারবে কি? তাই মনে করছি যে, দেখি ভগবান এই রকমে আমাকে আর তাকে দুঃখ দিয়ে সুধ্‌রাতে পারেন কি না? আর আমি চেষ্টা করব না, সব চেষ্টা তাঁরই ওপর ফেলে দিলাম।"

সত্যব্রত হাসিয়া বলিলেন "তোমার চেষ্টায় বিষ্ণু যা হয়েছে তা হয়তো তোমার ইচ্ছানুরূপ না হ'তে পারে, তবু এ কথা বলতে আমি বাধ্য যে, যে কোন পিতা বিষ্ণুর মত পুত্রের গৌরবে গৌরব অনুভব করতে পারে। বিষ্ণুর মত পুত্র জন্মালে বংশের বহু পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যায়। যাক কিন্তু এ বিষয়ে আমি তোমার মতানুসারে কোন কার্য্য করতে পারব না। অন্ততঃ আমার অনুরোধে আমার কথামত কাজ তোমায় করতেই হবে।" আমার এই চেষ্টা নারায়ণেরই চেষ্টা মনে করে নিশ্চিন্ত থাক, নইলে—

ব্রহ্ম। তোমার যা ইচ্ছা কর গে আমি আর তর্ক করব না, বাধা দেব না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতি ভূষণ ভট্ট।

মহম্মদ

উষর মরুর কোলে শান্তির নির্ঝর

সুশীতল বারি যথা সুধীরে সঞ্চারি,

পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম জগতে প্রচারি,

তুমি মহম্মদ আজ জগতে অমর।

ধূসর আরব বুকে নাস্তিকের মাঝে

কোরেসের অত্যাচার করি অবহেলা,

একেশ্বর মহামন্ত্র প্রচারিল পুনঃ,

পুণ্য সেই বীরমন্ত্র জগতে বিরাজে।

খোদার প্রেরিত তুমি শেষ পেগম্বর

ইব্রাহিম বংশধর, আল্লার রসুল,

খদিজা রমণ তুমি সত্যের মূরতি,

কাবার মন্দির কোলে তুমি নিরন্তর,

পাইতেছ সার্ব্বভৌম প্রীতির বন্দন,

অতুল বিভূতি তব, তোমায় প্রণতি।

শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার।

স্বর্ণ ও গুঞ্জা।

(অনুবাদ)

আগুনে পুড়িতে নাহি মোর দুখ

লোহারো তাড়নে নীরব থাকি

কুঁচের সঙ্গে তুলনা আমার

এই দুখ আমি কোথায় রাখি?

শ্রীকালীদাস রায়

অসবর্ণা।

পুরুষগণ।

হরিনাথ দাস	প্রবীণ ব্যারিষ্টর।
কৃষ্ণনাথ দাস	ঐ পুত্র ব্যারিষ্টর।
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	উদীয়মান ব্যারিষ্টর
রাধারমণ বিশ্বাস	জমিদার।
উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ...	ডাক্তার।
খোদাবক্স	কিরণের বাবুর্চি।

স্ত্রীগণ।

হিরণ্ময়ী	হরিনাথের স্ত্রী।
রাসরাণী	কৃষ্ণনাথের স্ত্রী।
সুরুচি } সুনীতি }	হরিনাথের কন্যা।
শশিপ্রভা	কিরণের ভগিনী ও উপেন্দ্রনাথের স্ত্রী।

অসবর্ণা।

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা হরিনাথ দাসের বাটী।

সুরুচি—টেবিলে কনির ঠেস দিয়া চেয়ারে,
কলম হস্তে আসীনা।

সুরুচি। কেন ম'স্তে তাকে বিলেত যেতে ব'ল্লাম? আর ত মাথার ঘাম পায়ে ফে'লে টাকা রোজগার করবার দরকার নেই। ওটা কেবল আমার অহঙ্কার। আমি বি, এ, পাশ ক'ল্লাম সে ক'বার উপরি উপরি ফেল হয়ে পড়া ছাড়লে। লোকে আমাকে মূর্খের স্ত্রী ব'ল্বে সেটা প্রাণে সইল না। তা ছাড়া আমরা কত্‌ণি আলোক প্রাপ্ত, তার তখনও গায়ে পাড়াগাঁয়ের গন্ধ ছিল। কি ভুল! এ কথাটা একবার মনে হ'ল না যে বিলেতে গিয়ে মেমের সঙ্গে মিশে সে কি আর আমার কথা মনে করবে। এই ত আমি এম্, এ পাশ করিচি। বিদ্যায় কি এমন তাকেবর হইচি তাও ত দেখ্‌তে পাচ্চি নে। ছুটো ইংরিজি কথা ব'ল্‌তে গেলে সাতবার বাধে। সে তখন যেমন ইংরিজি ব'লত, আমি ত এখনও তা পারি নে। প্রথম প্রথম গিয়ে প্রতি মেলে চিঠি লিখ্‌ত। এক একখানা চিঠি যেন এক একখানা খাতা। ত্রিশ পৃষ্ঠার কম হ'ত না। চার চারটে মেল এল গেল, একখানাও চিঠি নেই। দূর হ'ক গে আমিও আর চিঠি লিখ্‌বো না

(কাগজ ও চিঠি সকল দেরাজে তুলিয়া রাখা)

রাসরাণীর প্রবেশ।

রাসরাণী। চিঠি লেখা হ'ল ঠাকুঝি?

সুরুচি। না।

রাস। কখন লিখ্‌বি আর? ডাক যাবার যে সময় হল।

সুরুচি। আমি চিঠি লিখ্‌বো না।

রাস। চিঠি আসেনি ব'লে রাগ হয়েচে বুঝি?

সুরুচি। তোকে ত কখনও ভুগ্‌তে হয় নি। তুই এর কি বুঝ্‌বি?

রাস। সুখে থাক্‌তে ভূতে পায়। বিয়ের বয়েসে বিয়ে কল্লিনে, রাধা বেচারাকে দেশান্তরী ক'ল্লি। এখন থাক থুব্‌ড়ো হয়ে।

সুরু। কেন আমার কি বিয়ের বয়েস চলে' গিয়েছে ?

রাস। তা যায় নি ? পনের বছরে যা ছিল একুশে কি তা থাকে ? বল না কেন তুই সত্যি করে।

সুরু। বড় মিছে কথা বলিস নি। তখন প্রাণটা যেমন টাট্‌কা ছিল, এখন তার কিছুই নেই।

রাস। শুধু কি প্রাণটা ? আমাদের দেশে কুড়ী ছাড়ালেই বুড়ী।

সুরু। আচ্ছা, আমরাই বা কুড়ীতে বুড়ী হই কেন, আর মেমেরা কুড়ীতে ছুঁড়ী থাকে কেন ?

রাস। আমরা ফুটে উঠি যেমন শীগ্‌গির, ঝরেও যাই তেম্‌নি শীগ্‌গির।

সুরু। তা ঠিক নয়। ওরা না হয় আমাদের চেয়ে বছর দেড়েক পরে ফোটে। ওদের মত আমাদের রঙের জোর নেই।

রাস। তা আর বলতে। ওদের ছেলেগুলো দেখ্‌তে কেমন গোলগাল, যেন রক্ত ফুটে বেরুচ্ছে আমাদের ছেলেগুলো, খোস পাচড়ায় ভরা, যেন হল্‌দে পোকা, একটু দুধ তাও হজম কত্তে পারে না।

সুনীতির প্রবেশ।

সুনীতি। কে দুধ হজম কর্ত্তে পারে না ?

রাস। আমাদের দেশের ছোট ছেলেরা !

সুনীতি। বুড়োরাই বা কই পারে ? ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নেই এমন লোকই নেই।

রাস। ঐ ডিস্‌পেপ্‌সিয়াই আমাদের তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাবার প্রধান কারণ।

সুনীতি। সেই কথা হচ্চে বুঝি ?

রাস। ও কথাটা মাঝ থেকে এসে পড়েচে। আমি ব'ল্‌ছিলাম, মেয়েদের বিয়ে অল্প বয়সে হওয়া ভাল। আমাদের বয়সে আর কিছু বাকি থাকে না।

সুনীতি। সত্যি থাকে না নাকি ? কই আমি ত কিছু বুঝতে পারি নে।

রাস। তুই না পারিস আমি পারি।

সুনীতি। সে তোর দোষ, তুই না পরবি কর্সেট, না পরবি কাঁচুলি।

রাস। দূর দূর কি কথা থেকে কি কথা এনে ফেল্লি।

সুরুচি। ও সব বাজে কথা। আমাদের জীবন ওদের মত নয়। ওরা যেমন সকল সময় ফুর্ত্তিতে থাকে, আমরা তা থাকি নে। ওদের দেশে চোদ্দ পনের বছরের মেয়েরা দৌড়োদৌড়ি ক'রে খেলিয়ে বেড়ায়, তারা তখন শিশু। আমাদের দেশে পনের বছরের মেয়ের দু তিনটে ছেলে মেয়ে হয় সে তখন গিন্নি বান্নী। মন বুড়িয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও বুড়িয়ে যায়।

সুনীতি। ও কথাটা পুরুষদের ওপর বেশী খাটে। ইংরিজীতে বলে না,—পুরুষের তত বয়েস তার মন যে রকম, মেয়ে মানুষের তত বয়েস তার চেহারা যে রকম। আমাদের চেহারা যাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে আমাদের খুব দৃষ্টি রাখা দরকার। অথচ আমরা সে কথা ভাবিও না।

সুরুচি। শুধু কর্সেট কাঁচুলিতে চেহারা ভাল থাকে না। ম্যালেরিয়া আর অম্বলের ব্যামোতে পুরুষানুক্রমে ভুগে ভুগে আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে, আমাদের হাড় সরু সরু, পেশী নেই বল্লেই হয়, মাংসে আঁট নেই, হাড় থেকে ঝুলে পড়চে।

রাস। সে কথা ঠিক, আমাদের মেয়েরা ত শুধু কুড়ীতে বুড়ী হয় না, পুরুষেরাও হয়। কুড়ী পেরুতে না পেরুতে ওদের চুল পাকে, মুখের চাম্‌ড়া কোঁকড়াতে থাকে, চোখ আর রগ বসে যায়। আরও বছর দশেক পরে দাঁত পড়তে আরম্ভ হয়।

সুনিতি। এর প্রতিকার হওয়া চাই। নইলে আর দুশো তিন শো বছরের পর বাঙ্গালীরা সত্যি সত্যি বেগুন গাছে আঁক্‌শি দেবে।

সুরুচি। আমাদের বিয়ের যে রকম বাঁধাবাঁধি তাতেই আরও অধঃপতন হচ্চে। একই বংশের লোকের সঙ্গে ক্রমাগত বিয়ে হয়ে আমাদের আরও দুর্ব্বল কচ্চে।

রাস। তুই কি চা'স বাঙ্গালীদের সঙ্গে পাঠানদের বিয়ে হয় ?

সুরুচি। হলে ভাল হয় না?

সুনীতি। আমার বোধ হয় তা হয় না। এই ত ইংরেজদের সঙ্গে এ দেশীদের বিয়ে হয়ে ফিরিঙ্গীদের উৎপত্তি হয়েচে। তারা আমাদের চেয়ে ভাল ত নয়ই, বরং শরীরে, চরিত্রে, বিদ্যায়—সকল বিষয়েই মন্দ। বিবাহ এমন লোকের সঙ্গে হওয়া উচিত নয় যাহাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে কিন্তু তা বলে ভিন্ন জাতের সঙ্গেও বিয়ে হওয়া উচিত নয়।

সুরুচি। তুই হার্বার্ট স্পেন্সারের কথা বল্‌ছিস্ সে হিসাবে কিন্তু বাঙ্গালী বামুন, কায়েত, বদ্দি, নবশাখ, সোণার বেনে কি সে রকম ভিন্ন জাত?

সুনীতি। পরীক্ষা করে না দেখ্‌লে ত বলা যায় না। ভিন্ন দেশের একজাতের মধ্যে বিয়ে দিয়েও ত ফল ভাল পাওয়া যায় নি। এই ত আমাদের জান্‌তি ক'জন বাঙ্গালী বামুনের মেয়ের সহিত পশ্চিমের বামুনের সঙ্গে বিয়ে হয়েচে। তাদের হয় ছেলেপিলে হয় নি, নয় ত মোটে এক আধটি হয়েচে। তাদের কাউকে আমাদের চেয়ে উন্নত অবস্থার জীব বলে বোধ হয় না। বরং অবনতই বোধ হয়। কায়স্থদের বঙ্গজ, উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বামুনদের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, খড়দা, ফুলে, সর্ব্বানন্দী, এই সব যে ভাগ হয়েচে, আমার বোধ হয় যে বেশী দূরের লোকের সঙ্গে বিয়ে যাতে না হয়, এই তার উদ্দেশ্য।

রাস। সে কালের লোক কি অত বুঝতো?

সুনীতি। বুঝতো নিশ্চয়, নইলে এক গোত্রে বিয়ে; যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আছে তাদের মধ্যে বিয়ে, শাস্ত্রে বারণ কেন করা হয়েচে? ভারতবর্ষের লোক একথা যেমন বুঝতো, এমন বোধ হয় কোনও দেশের লোক বুঝে নি। এখন ইউরোপের লোক কতক কতক বুঝচে।

সুরুচি। আমার বোধ হয় যত দূরে দূরে, যত ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে বিয়ে হয় ততই সন্তান ভাল হয়।

সুনীতি। তা হ'লে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, গাধা এদের বিয়ে হতো।

সুরুচি। ঘোড়া গাধার বিয়ে হয়ে ত খচ্চর হচ্চে। খচ্চরগুলো খুব পরিশ্রমী আর কষ্টসহিষ্ণু হয়।

সুনীতি। কিন্তু খচ্চরের বাচ্চা হয় না। স্বভাবের উদ্দেশ্য নয় ওরকম সঙ্কর জীবের বংশ বৃদ্ধি হয়।

সুরুচি। আমাদের দেশের জাতিভেদটা ত একটা কৃত্রিম জিনিস। বামুন, বদ্দি, কায়েত, নবশাখ, সোণার বেনের বিয়ে হলে সঙ্কর জীবের উৎপত্তি হয় না।

সুনীতি। তবে তুই বেচে বেচে স্বজাতকে বিয়ে করবি ঠিক করিচিস কেন? তোর উচিত ছিল কোনও বামুনকে বিয়ে করা।

রাস। অমন করে দীর্ঘ নিশ্বেস ফেল্লি যে ঠাকুর্ঝি?

সুরুচি। যাঃ বকিস নে।

সুনীতি। রাধাবাবুর চিঠি আসে নি বলে বুঝি। দিদি তুই ওকে ডাইভোর্স করে একটা বামুন বিয়ে কর।

রাস। বিয়ে না হ'তেই ডাইভোর্স?

সুনীতি। ভুল বলেচি; জিল্ট্ করে বলা উচিত ছিল।

রাস। তোর বুঝি রাধার উপর লোভ পড়েচে?

সুনীতি। দূর দূর, আমি অমন পেসাদি জিনিস নিই নে।

রাস। পাতে না পড়তেই পেসাদি হ'ল?

সুনীতি। তা নয় ত কি। দিদি যখন চোদ্দ বছরের তখন থেকেই যে ওর সঙ্গে রাধা বাবুর ভারি ভাব। তিন বচ্ছর ভাব করে তারপর সে বিলেতে গেছে। সেখান থেকেও চিঠিতে চার বছর ধরে ভাব চল্‌চে।

সুরুচি। চুপ্ করবি তুই, না আমি উঠে যাব?

সুনীতি। তুই কেন উঠ্‌বি? আমিই উঠে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

রাস। সুনী বেলায় মুখফোঁড় হচ্চে। এই বেলা থেকে ওর মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা কর।

সুরুচি। ও আমার কথা শোনে বুঝি?

রাস। ওর বিয়ের কিছু ঠিক হ'ল?

সুরুচি। কোথায় বিয়ে? আমরা যে একরকম অদ্ভুত

প্রাণী, না হিঁদু, না মুসলমান, না খৃষ্টান, না ব্রাহ্ম। আমাদের বিয়ে কি সহজে হয় ?

রাস। কেন আমরা ত হিন্দু।

সুরুচি। হিঁদুর মতন আমাদের কিছু আছে কি, যে আমরা হিন্দু। মুসলমান বাবুর্চীতে রাঁধে, টেবিলে খাই, পূজোও নেই, বাপমার শ্রাদ্ধও নেই। হিন্দুরা আমাদের হিঁদু বলে মানবে কেন ?

রাস। তা হ'লে তোরা ব্রাহ্ম।

সুরুচি। আমরা ত ব্রহ্মসমাজে যাই নে।

রাস। সমাজে না গেলে কি ব্রাহ্ম হয় না ? এমন অনেক খ্রিষ্টান আছে যারা গির্জ্জেয় যায় না ; এমন অনেক মুসলমান আছে যারা মসজিদে যায় না ; তেমনি অনেক ব্রাহ্ম আছে যারা সমাজে যায় না। আচ্ছা বল্‌তে পারিস ব্রাহ্মতে আর হিঁদুতে তফাৎ কি ?

সুরুচি। হিঁদুরা সংস্কৃত মন্ত্র প'ড়ে পূজো করে, ব্রাহ্মরা বাঙ্গলা কথা বলে পূজো করে।

রাস। দূর তা কেন হবে ? হিঁদুরাও বাঙ্গলা কথা বলে ; ব্রাহ্মরাও সংস্কৃত মন্ত্র বলে।

সুরুচি। আমরা পূজো করি ওরা উপাসনা করে।

রাস। (হাসিয়া) এইবার ঠিক হয়েচে। আর কিছু ?

সুরুচি। হিঁদুরা জাত মানে, ব্রাহ্মরা মানে না।

রাস। জাত ত অনেক হিঁদুতে মানে না ; অনেক ব্রাহ্ম আবার জাত মানে।

সুরুচি। যে সব হিঁদু জাত মানে না, তারা হিঁদু নয়।

রাস। কি তারা ?

সুরুচি। আমার মতন, কিছুই নয়।

রাস। যে সব ব্রাহ্ম জাত মানে ?

সুরুচি। তারা ব্রাহ্ম নয়।

রাস। তা হ'লে রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ছিলেন না, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম ছিলেন না, এক কেশববাবু ব্রাহ্ম ছিলেন। তাও মেয়ের বিয়ে দেবার পর হয়ে ছিলেন।

সুরুচি। ঐ তিন জন ছাড়া কি আর ব্রাহ্ম নেই ?

রাস। ঐ তিন জনই ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদি, মধ্য আর অন্ত, চুনো পুঁটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

সুরুচি। আদি, মধ্য, অন্ত কি রকম ?

রাস। রামমোহন রায় আদি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্য, কেশবচন্দ্র সেন অন্ত।

সুরুচি। কেশববাবু অন্ত কেন ?

রাস। তিনি জাতিভেদ ওঠাতে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলচ্ছেদ কল্লেন। তাঁর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম উন্নতি তাঁর পরেই নির্ব্বাণ।

সুরুচি। সত্য কি ব্রাহ্মধর্ম্ম নিবে গেছে।

রাস। প্রথম দিনকতক যে রকম হয়ে উঠেছিল, অনেকে মনে করেছিল, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্ম হয়ে যাবে। এখন সে আগুন কি আর আছে ? খানকতক কয়লা এখানে ওখানে ছিট্‌কে গিয়ে ধোঁয়াচ্চে মাত্র।

সুরুচি। কেন ব্রাহ্মধর্ম্মটি ত বেশ।

রাস। ধর্ম্ম কোন্‌টা মন্দ ? কিন্তু নতুন ধর্ম্ম কি যে সে বা'র কত্তে পারে ? ঈশ্বরের অবতার নইলে নতুন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় না।

সুরুচি। রামমোহন রায়কে কি অবতার বলা যায় না ?

রাস। তিনি ত আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ত্তা নন্। তাঁর ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম সমস্ত জগতের লোক এখন উপনিষদ পড়ছে। তাঁর মিশন সার্থক হয়েচে। বাস্তবিক রামমোহন রায় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ছিলেন না তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজী যুগের প্রবর্ত্তক।

সুরুচি। সে কথা ঠিক। এখন আমাদের ধর্ম্মের যা কিছু উন্নতি বা অবনতি হবে তা ইউরোপের বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সঙ্গে রগড়ারগড়ি ক'রে হবে।

(নেপথ্যে দিদি ! বউদি ! মা ডাক্‌চেন)

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিনাথ দাসের অফিস গৃহ হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথ।

হরি। ও বিষয়ে কোনও ইংরাজী নজীর আছে কিনা দেখ।

কৃষ্ণ। ইংরাজীর নজীর নেই। একটা আমেরিকান নজীর আছে।

হরি। এ মোকদ্দমা ত আগুর কোর্টে নয়, আমেরিকান নজীরে কাজ নেই।

কৃষ্ণ। নজীরটা কিন্তু ঠিক মেলে। আর ভারি সুন্দর লেখা।

হরি। মিললে কি হবে, যাদের কাছে মোকদ্দমা তারা আমেরিকান নজীরের নাম শুনলে জ্বলে যায়।

(আর্দালীর প্রবেশ ও কার্ড দান) অন্দর লে আও।

(আর্দালীর প্রস্থান ও কিরণ চন্দ্রের প্রবেশ।)

কিরণ। গুড্‌মর্ণিং।

হরি ও কৃষ্ণ। গুড্‌মর্ণিং।

কিরণ। পরন্ত একটা কেস্ আছে, আমার মক্কেল আপনাকে এন্‌গেজ কত্তে চায়।

হরি। ভারি পেঁচোয়া ব্যাপার নাকি।

কিণে। এমন কিছু নয়। হিন্দুলয়ের একটা পয়ণ্ট আছে। আপনি হচ্চেন হিন্দুলয়ে এখনকার প্রধান অথরিটী, তাই আপনাকে দরকার।

হরি। তোমার মক্কেলের ভারি চাড় দেখচি। আমাকে মোকদ্দমা বোঝবার জন্যে তোমাকে আলদা ফি দিয়েছে।

কিরণ। তা অবিশ্যি দিয়েচে।

হরি। বেশ পরন্ত আমার ফুর্সৎ আছে আমার ফী তুমি জান?

কিরণ। তা জান্নি।

হরি। বল তাহ'লে কেসটা কি।

কিরণ একজন ব্রাহ্মণ এক শূদ্রের মেয়েকে হিঁদু মতে বিয়ে করেছিল। তার এক ছেলে হয় সেই বিয়েতে। এখন ব্রাহ্মণ মরে গেছে। সেই ছেলের সঙ্গে তার কাকার মোকদ্দমা। কাকা বলচে ও বিয়ে সিদ্ধ নয় সে সমস্ত বিষয় থেকে তাকে বেদখল করে ফেলেছে সবজজ কাকার পক্ষে রায় দিয়েচেন ছেলে হাই-কোর্টে আপীল করেচে।

হরি। সবজজের রায় ত ঠিক। আমরা আপীলে হেরে যাব।

কিরণ। যে সব নজীর এ বিষয়ে আছে, সব ভুল। সে সব বাতিল করে নতুন নজীর করাতে হবে। শ্রুতি স্মৃতি সদাচার থেকে গোড়া পত্তন কত্তে হবে।

হরি। তা কি কত্তে দেবে?

কিরণ। অন্যকে দেবে না, আপনাকে দেবে।

হরি। তুমি অবিশ্যি কেশটা পড়েছ। এক এক করে বলে যাও, নজীর কিসে ভুল। তুমি বুঝতেই পাচ্চ, আমি শূদ্র, আমি শাস্ত্রকে খুব বেশী ভালবাসার চক্ষে দেখিনে। কিন্তু এখানে নিজের ভালবাসার কথা হচ্চে না। তুমি শূদ্রাপুত্রের পক্ষে শাস্ত্র দেখাও আমি বামুন কাকার পক্ষে শাস্ত্র দেখাই।

কিরণ। বেশ তাই হ'ক। এ অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম নয়। শাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ। আমার এ রকম নোট্ করা আছে। আপনি স্মৃতির বইগুলো বার করুন।

হরি বলে যাও।

কিরণ। গোভিলগৃহসূত্রে "দারান কুর্বীত অসগোত্রান মাতু অসপিণ্ডান্" বলা হয়েছে, সবর্ণা বলা হয়নি।

হরি। সবর্ণা বুঝে নিতে হবে। আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে "কুলমগ্রে পরীক্ষিত" বলা হয়েছে।

কিরণ। কুল বল্লে সবর্ণ বোঝায় না।

হরি। গর্গনারায়ণ ওর টীকা কচ্চেন, যার মাতৃকুলে আর পিতৃকুলে দশপুরুষধরে বিদ্যা তপস্যা ও সৎ কার্য্যদ্বারা ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষা করা হয়েচে।

কিরণ। পারস্কর গৃহসূত্রে বলেচে কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহ্নীয়াৎ। তিস্রো ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুপূর্ব্বেণ দ্বে রাজন্যস্য। একা বৈশ্যস্য। সর্ব্বেষাং শূদ্রামপি একে

হরি। ঐ মন্ত্রবর্জ্জং কথাটাতেই যে মাথা খেয়েচে অর্থাৎ শূদ্রার সঙ্গে বিবাহ ঠিক হ'ল না।

কিরণ। পাণিগ্রহণ যখন কল্লে বিবাহ কেন নয়?

হরি। কর্ক উপাধ্যায় ঐ সূত্রের মানে কচ্চেন:—
সর্ব্বেষাং বর্ণানাং। এব একে শূদ্রাং ইচ্ছন্তি। একে ন ইচ্ছন্তি। ন হি অস্যাঃ ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারঃ। ...রামা রমণায় উপযতে ন ধর্ম্মায়। মানব গৃহসূত্রে স্পষ্ট বলেচে; বন্ধুমতীং কন্যাং অস্পৃষ্ট মৈথুনাং উপযচ্ছেত সমানবর্ণাং অসমান প্রবরাং। যবীয়সীং নগ্নিকাং শ্রেষ্ঠাং।

কিরণ। শ্রেষ্ঠাং কথা থেকেই বোঝা যাচ্চে, ওটা বিধি অর্থাৎ আদেশ নয় উপদেশ বা অর্থবাদ মাত্র।

হরি। হিরণ্যকেশি গৃহসূত্রে ও বল্‌চে সজাতং সবর্ণাং অসগোত্রাং।

কিরণ। মন্ত্র না পড়লে বিবাহ হয় না, তার কোনও প্রমাণ আছে?

হরি। আছে বই কি। নারদ বলেছেন, পাণিগ্রহণ মন্ত্রশ্চ—নিয়তং দারলক্ষণং। মন্ত্র না হ'লে বিবাহার্থ পাণিগ্রহণ হয় না, কেবল রমণায় গ্রহণ হয়। বৃহস্পতি বল্‌চেন—

পাণি গ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ॥
চতুর্থী হোমমান্ত্রেণ ত্বক্মাংসহৃদয়েন্দ্রিয়ৈঃ।
ভর্ত্রা সংযুজ্যতে পত্নীতদ্‌গোত্রাৎ এন সা ভবেৎ॥

কিরণ। সে কি! মনু বল্‌চেন—অষ্টৌ ইমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্ নিবোধতঃ। কুল্লুক স্ত্রীবিবাহ শব্দের অর্থ করেছেন ভার্য্যাপ্রাপ্তি হেতু বিবাহান্। মন্ত্র না পড়লে যদি বিয়ে না হয় এ সব বিয়ে কি করে হবে?

হরি। এখানে বিবাহ মানে স্ত্রীপুরুষের সংযোগ। এই জন্যেই গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আর পৈশাচ বিবাহকেও বিবাহ বলে, মনু বল্‌চেন পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যো কদাচন। তারপর ৪৩ শ্লোকে—

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যত
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥ বলে

৪৪ শ্লোকে বল্‌চেন, ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণের হাত না ধরে ব্রাহ্মণের হাতের তীর ধরবে। বৈশ্যা গরুতাড়ান লাঠি ধ'রবে। শূদ্রা ব্রাহ্মণের বস্ত্রের দশা গ্রহণ করবে।

কিরণ। তা' হ'লেই শূদ্রার সঙ্গে ব্রাহ্মণের উদ্বাহ হ'তে পারে বলা হ'ল।

হরি। আসল কথাটা কি জান। বহুপূর্ব্বকাল থেকে শূদ্রাকে রক্ষিকারূপে বাড়ীতে রাখবার প্রথা ছিল। মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি যে সময় লেখা হয়, সে সময় সে প্রথাটা অচল হ'য়ে উঠেছিল। সেই জন্য সে কথাটার উল্লেখ করে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় ১৪ শ্লোক থেকে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত দেখ না।

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োঃ আপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥ ১৪
হীন জাতিস্ত্রিয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥ ১৫
শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
সৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥ ১৬
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥ ১৭
দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎ প্রধানানি যস্যতু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তাং নচ স্বর্গং স গচ্ছতি॥ ১৮
বৃষলীফেন পীতস্য নিশ্বাসোপহতস্যচ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥ ১৯

আপস্তম্ব বলচেন:—পূর্ব্ববত্যাং অসংস্কৃতায়াং বর্ণান্তরে চ মৈথুনে দোষঃ॥ তত্রাপি দোষবান্ পুত্রএব। অর্থাৎ যার পূর্ব্বে অন্যত্র বিবাহ হয়েচে কিংবা যার সঙ্গে বিবাহ হয় নি এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কিংবা অসবর্ণার সহিত মৈথুনে দোষ হয়। পুত্রও দোষযুক্ত হয়।

তারপর আপস্তম্ব বল্‌চেন

দৃষ্টো ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ সাহসঞ্চ পূর্ব্বেষাং।
তদন্বীক্ষ্য প্রযুঞ্জানঃ সীদত্যবরঃ॥

পূর্ব্বে কেউ কেউ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করেছেন বা হঠকারিতা

করেচেন জানি কিন্তু তাই দেখে যদি এখনকার লোক তাদের অনুসরণ করে সে পতিত হয়।

শঙ্খ বল্‌চেন—"দারান্ আহরেৎ সদৃশান্।"

উশন বল্‌চেন—"অন্য জাতি বিবাহে চ স মহাপাতকী ভবেৎ।"

কিরণ। বিবাহ ভাল হ'ক, মন্দ হক সে কথায় আমাদের দরকার নেই। ছেলে পিতার সম্পত্তি পায় কিনা সেইটেই আমদের দেখ্‌তে হবে। যদি আমাদের মক্কেলের বাপের সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র থাকৃত তা হলে সে বেশী ভাগ পেত, কিন্তু তা যখন নেই এরই সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া উচিত।

হরি। এখনকার নজীর অনুসারে এ বিবাহই নয়, ছেলে ছেলেই নয়।

কিরণ। এখনকার নজীরের কথা ছেড়ে দিন। শাস্ত্র কি বলে দেখুন।

হরি। তুমি মনুসংহিতা দশম অধ্যায়ের ১৫১ থেকে ১৫৩ শোলকের কথা বল্‌চো। কিন্তু মনু ১৫৪ শোলকে বল্‌চেন—অবর্ণা বা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে পুত্র যার না থাকে শূদ্রাপুত্র দশম ভাগের অধিক পাবে না।

কিরণ। ঐ মানে কুল্লুক করেচেন জানি। কিন্তু ও মানে যে ভুল তাতেও সন্দেহ নেই, শ্লোকটা হচ্চে।

যদ্যপি স্যাৎ তু সৎপুত্রো হ্যসৎপুত্রো' পি বা ভবেৎ।
নাধিকং দশমাৎ দদ্যাৎ শূদ্রাপুত্রায় ধর্ম্মতঃ॥

এর মানে ভাল ছেলে থাক বা মন্দ ছেলে থাক্‌ শূদ্র পুত্রকে দশম উহার অধিক দেবেনা।

হরি। তোমার মানে ঠিক নয় কুল্লুকের মানেই ঠিক সে ব্যক্তি সৎপুত্র বা অসৎপুত্র হ'ক অর্থাৎ তার পুত্র থাক্ না থাক্ সংহিতাকার পূর্ব্বের রেওয়াজ কি ছিল বলে ক্রমে এগিয়ে যাচ্চেন। পূর্ব্বে শূদ্রপুত্র সিকি পেত, তারপরে দশভাগের একভাগ, তারপর সেটেই না। ১৫৫ শ্লোকে বলেচেন "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং" শূদ্রাপুত্রো ন রিক্‌থভাক"। স্বয়ং দত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়্ অদায়াদ বান্ধবাঃ অর্থাৎ এরা বন্ধু হলেও সম্পত্তি পাবে না।

কিরণ। মনু ছাড়া অন্য কেউ ওকথা বলেছেন কি?

হরি। বৃদ্ধ হারীত বলচেন:—বিভক্তেষ্বনুজো জাতঃ সবর্ণো যদি ভাগভাক্ অর্থাৎ ভাগ হয়ে যাবার পর যদি সবর্ণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা জন্মায় সে এক ভাগ পাবে। অর্থাৎ অসবর্ণ পাবে না।

গৌতম বলেন ঔরসক্ষেত্রজদত্ত কৃত্রিম গূঢ়োৎপন্নপবিদ্ধ ঋগৃথভাজঃ। কানীন সাহংঢ়পৌনর্ভব পুত্রিকাপুত্র স্বয়ং দত্তক্রীড়া গোত্রভাজঃ চতুর্থাংশভাগিনিশ্চ ঔরসাস্তভাবে।

ইনি শৌদ্রের নাম কল্লেন না। অর্থাৎ শৌদ্রের দায় ভাগী নয়।

কিরণ। বশিষ্ঠ বলচেন:—প্রথম ছয় প্রকার পুত্র না থাকৃলে, দ্বিতীয় ছয় প্রকার পুত্র (যার মধ্যে শূদ্রাপুত্র আছে) দায় ভাগী হবে।

হরি। বশিষ্ঠ স্মৃতি বোধ হয় মনুসংহিতা থেকে পুরাণ স্মৃতি। আমরা যে মনুসংহিতা পেয়েছি এ আধুনিক গ্রন্থ। এতে অনেক স্মৃতিকারের উল্লেখ আছে বৌধায়ন শূদ্রাপুত্রকে নিষাদ বলেছেন, তাকে দায় ভাগী করেন নাই।

আপস্তম্বের কথা আগেই বলেছি তাঁর মতে কেবল সবর্ণা অপূর্ব্বা স্ত্রীর সন্তান দায় ভাগী, আর পিতৃকর্ম্মের অধিকারী অন্যে নয়। অন্য পুত্র সেকালে হ'ত বলে এখন হবে না।

কিরণ। যাজ্ঞবল্ক্য বার রকম পুত্রকেই পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে অংশহর অর্থাৎ দায়ভাগী বলেছেন।

হরি। বলেছেন বটে কিন্তু তাঁর শূদ্রাপুত্রের নাম নেই।

কিরণ। বিষ্ণু ত শূদ্রাপুত্রের অংশ পাবার কথা বলেছেন।

হরি। হাঁ বলেছেন, বিষ্ণু নিশ্চয় মনুসংহিতার পূর্ব্বের লোক। নারদ দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে শূদ্রাপুত্রের উল্লেখ করেন নি।

কিরণ। বৃহস্পতি শূদ্রাপুত্রকে অংশ দিয়েছেন না?

হরি। কই না। বৃহস্পতি বলচেন—

এক এবৌর সঃ পিত্রে স্বামী প্রকীর্ত্তিতঃ।
তত্তুল্যা পুত্রিকা প্রোক্তা ভর্তব্যাস্তপরে সুতাঃ॥

বৌধায়ন বল্‌চেনঃ সবর্ণায়াং সংস্কৃতায়াং স্বয়ং—
উৎপাদিতং ঔরসং বিদ্যাৎ।

বৃহস্পতি বেশ বলেছেন—
উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাৎ অশক্যো যং কর্ত্তুং মর্ত্ত্যৈ র্বিধানতঃ।
অনেকধাঃ কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যৈঃ পুরাতনৈঃ।
তচ্ছক্যং নাধুনা কর্ত্তু শক্তিহীনৈরিদন্তন॥

কিরণ। হাঁ। আপনি যে বলেছিলেন মনু পূর্ব্বকালের প্রথার উল্লেখ করে এখন তা হবে না বলেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আর কে কে বলেছেন—

হরি। হারীত প্রথম ছয় পুত্রকেই দায়াদ বলেছেন। তাঁর তালিকায় ও শূদ্রাপুত্রের নাম নেই। শঙ্খ লিখিত ও প্রথম ছয় পুত্রকেই দায়াদ বলেছেন। দেবল দ্বাদশ পুত্রের উল্লেখ করে বল্‌চেন প্রথম ছয় পুত্র বন্ধু দায়ভাগী, অবশিষ্টেরা কেবল বন্ধু। ঔরস পুত্র থাক্‌লে এরা কেউ পূর্ণ দায়ভাগ পায় না। যারা সবর্ণ তারা ঔরসপুত্রের তৃতীয়াংশ পাবে। অন্যে কেবল গ্রাসাচ্ছদন পাবে।

যমও তাই বলেছেন, প্রথম ছয় পুত্র দায়ভাগী, পরের ছয় পুত্র শঙ্কর এবং দায়ভাগের অনধিকারী। যমের তালিকায় শূদ্রাপুত্রের নাম নেই।

শূদ্রাপুত্রকে মনু পারশব আখ্যা দিয়ে বল্‌চেন—
যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাৎ উৎপাদয়েৎ সুতং।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥

বৌধায়ন শূদ্রাপুত্রকে নিষাদ বলেচেন। ব্রহ্মপুরাণেও বলা হয়েচে ব্রাহ্মণদের পারশবপুত্র কদাচ জন্মায়। কেবল শাপগ্রস্ত ক্ষত্রিয় দেরই পারশব জন্মায়। বল আর কিছু চাই?

কিরণ। ঢের হ'য়েছে আর শাস্ত্র চাইনে। কিন্তু সদাচারের মধ্যে ওটাকে আনা যায় না?

হরি। শাস্ত্র ওকে অসদাচার বলেচেন যখন তখন হিন্দু-ধর্ম্ম থেকে ওকে সদাচার বলা যায় না।

কিরণ। স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ এর মধ্যে আনা যেতে পারে না কি? ও কথাটার মানে হচ্চে ইউটিলিটি। আমরা দেখচি জাতিভেদে দেশের সর্ব্বনাশ হচ্চে। শঙ্কর বিবাহ হলে জাতিভেদ উঠে যাবে অতএব শঙ্কর বিবাহ স্ব স্ব চ প্রিয়মাত্মনঃ এর মধ্যে আস্‌তে পারে।

হরি। আসে আসুক তার ত পথ খোলা রয়েচে। সিভিল ম্যারেজ কল্লেই, ত লেঠা চুকে যায়। শঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি যখন হিন্দু শাস্ত্রকারদের চোখে বড়ই ঘৃণ্য তখন ওটাকে শাস্ত্রসঙ্গত বলতে কোনও আদালত রাজি হবে না। আর দেখ কিরণ আপীলটাতে তুমিই বক্তৃতা করো। তোমার মত বল্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার কেসে তোমার বিশ্বাস আছে। আমার নেই। বুঝলে?

কিরণ। তাই করবো। আপনি বসে থাক্‌বেন।

হরি। বাঁচালে ভাই। শনিবারে তোমার সন্ধ্যার সময় এখানে নিমন্ত্রণ রইল।

কিরণ। যে আজ্ঞে।

(সকলের প্রস্থান)।

ক্রমশঃ।

শ্রী—

মঞ্জীর।

নর্ত্তকী নেচে গেছে রজনীতে,
কি জানি কেমন করে'
লঘু চরণের মঞ্জীর তার
আঁধারে রয়েছে পড়ে।
উন্মাদ তা'রে তুলে নিয়ে কহে—
"মোর ঘায়ে বাজিবি না
ওরে নটিনীর নিপুণ পায়ের
কোমল-কণ্ঠা বীণা ?"

"মোরে তুলে নিবে না কি ?"
লোভী পাগলের মুখপানে চাহি
মঞ্জীর কহে ডাকি'।

ঘন ঘন ঘন কঠিন আঘাতে
মঞ্জীর উঠে বাজি,'—
প্রতি শিঞ্জিতে পাগলের চিতে
উল্লাস এ কি আজি !
বাহির জগতে কত উপহাস
গুমরিছে কত ঠাঁই,
ফিরে দেখিবারও অবসর তার
নাই আজ নাই নাই।

মনে তার শুধু আশা—
মঞ্জীরে কবে ধ্বনিয়া উঠিবে
জগতের যত ভাষা।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

সূচীপত্র

অগ্রহায়ণ—১৩২৬

দ্রষ্টব্য ঃ—ছাত্রগণের জন্য অল্পমূল্যে উপাসনা বিতরণ করা হইবে। সত্বর নাম রেজেষ্টারী করুন—এই মাস [illegible] আমরা এই বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিতেছি। পুরাতন উপাসনা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Printed by Pulin Behary Dass at the Sree Gouranga Press.

[illegible] Mirzapur St., Calcutta.

Published by Pulin Behary Dass.

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল ধ্যানের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ প্রস্তরের চাপ বিচূর্ণিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ—১৩২৬ | ৮ম সংখ্যা।

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা।

(বোলপুর উৎসব উপলক্ষে লিখিত।)

তুমি সখা তুমি গুরু, নহ শুধু কল-কণ্ঠ কবি
ওহে রবি—জগতের রবি।
রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে ভরা সমগ্র সংসার
তবু হিয়া আকুলিয়া ফিরে খুঁজি সৌন্দর্য্য সম্ভার
তুমি সেই আঁখিপাতে আঁকি দাও সোণালী অঞ্জন
স্বপন-সুন্দর-বিশ্ব করে দেয় মানস রঞ্জন
"শিশুর হাসিটী" ভরি "প্রেয়সীর নয়নে অধরে"
তোমার মোহন মন্ত্রে যে সুষমা উছলিয়া ঝরে
হিয়ায় না ধরে।
মেঘে ঢাকা চিত্তাকাশে তব স্বর্ণ তুলি
ফুটায় বিজুলি।

নন্দন মন্দার শাখে ফুটেছিলে বুঝি কোনও দিন
সুধা গন্ধ, সরস, নবীন
উজ্জ্বল দিনের আলো অঙ্গে তব পড়িত ঠিকরি'
তোমা ঘিরি দেবকন্যা খেলিত বাসন্তী-বাস পরি'
কোমল মৃণাল ভুজে কেলি ছলে ধরি' শাখাটীরে
হাসিয়া মধুর হাসি দোলাইত যবে ধীরে ধীরে
মৃদুল সমীরে
লুটিতে তাদের অঙ্গে নয়নে অধরে কত লীলা ভরে',—

তার পর কোনও দিন আলোকিয়া দেবর্ষির বীণা
মনে কি গো আছে ছিলে কিনা ?
দেবের সঙ্গীত স্বরে সারা বিশ্ব যেত যবে ভরি'
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তব মর্ম্মতন্ত্রী উঠিত শিহরি,
তাই গাঁথা আছে প্রাণে তারি বুঝি কয়েকটি সুর
তাই কি পুলক জাগে স্মরি' কোনও পরশ মধুর
অপ্সর বধুর
তাই অফুরান জাগে সৌন্দর্য্য কল্পনা
ভাব উন্মাদনা।

পরিয়া বিজয় মাল্য গৌরবের টীকা আসিয়াছ ফিরে
মায়ের স্নেহের কোলে ফিরে।
আজ শুধু বঙ্গ নয়, সারা ধরা করে তোমা নতি
জননী জনমভূমি সগৌরবে চাহে তোমা প্রতি
তোমার ভকতবৃন্দ অর্ঘ করে আছে দাঁড়াইয়া
ও জগবন্দিত পদে লুটাইতে চাহে সারা হিয়া
হাসিয়া কাঁদিয়া,
ভকতি চন্দনে মাখা লহ এই পূজা উপহার
দীন ফুলহার।

শ্রীশরদিন্দু নাথ রায়।

"প্রকৃতির প্রতিদান"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কলাবউকে জোড়া বেল সম্বলিত বেলগাছের শাখার সহিত এমন ভাবে বাঁধা হয় এবং লাল পেড়ে শাড়ী পরাইয়া তাহার ঘোমটা দেওয়া হয়, যে নবযৌবনসম্পন্না পীনোন্নতপয়োধরা পরিপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠে। কবে এই প্রাচীন শারদীয় উৎসবের নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবতা বাদ পড়িয়া ক্রমে চারিটি হইলে যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী বা ব্রহ্মাণী এবং কার্ত্তিকীর পরিবর্ত্তে কার্ত্তিক, এবং কবে হইতে তাহাদের উৎসবের প্রতিমা গড়া হইল তাহার ইতিহাস এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এইটাই প্রণিধান যোগ্য যে আমাদের শারদীয়া পূজা শরৎকালের অশোক জয়ন্তী প্রভৃতি পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত গাছপালা লইয়া আরম্ভ ও শেষ যদিও এই প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর পুরাণ, তন্ত্র ও লোক সাহিত্য নানা ভাব, কবিত্ব ও সাধনার স্তর গড়িয়া তুলিয়া বাঙ্গালীর ভাবুকতা ও মণীষার সাক্ষ্য দিতেছে—দুর্গোৎসবের এই নবপত্রিকা সবই আমাদের নিকট পবিত্র। ইহাদের ছাড়া বট ও অশথ এবং নিম্ব ও তুলসীর শীতল ছায়া বা রোগবীজাণু নিবারণ ও স্বচ্ছন্দতা সঞ্চারেই হউক অথবা বীজের জনন-শক্তি ও প্রকৃতির পুনরুৎপাদন ভাবের সঞ্চারেই হউক নানা গল্প ও আখ্যায়িকাকে আশ্রয় করিয়া সেবা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে, শুভ বা অশুভ গৃহ কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে তাহাদের ফুলফলপাতার পরিচিত ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়।

পশুপক্ষী তরু-লতা সকলেরই মধ্যে এই প্রতীক বা রূপকের আত্মা বা স্বরূপ ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে। সেই উজ্জ্বল নবপ্রস্ফুটিত কহ্লার আমার অন্তরে শ্বেত-পদ্মাসনা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতীর চরণ কমলের স্পর্শ আনিয়া দেয় অথবা বিশ্বসৃষ্টির বিরাট বেদনা পুলকের অনুভূতি যেন মূর্ত্ত হইয়া আমার অঙ্গে অঙ্গে প্রতি বোধশক্তির মধ্যে সৃষ্টির প্রাণ স্পন্দন জাগাইয়া তুলে। পদ্ম যেমন একটি পর্ণের উপরে আর একটি পর্ণ সুসজ্জিত, এইরূপ অফুরন্ত চলিয়াছে, সেইরূপ সৃষ্টিও স্তরের পর স্তর জন্মাইয়া চলিয়াছে। তাহা ছাড়া পঙ্ক হইতে জন্ম এই শ্বেত পদ্মের তাই পদ্ম সমস্ত পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও আত্মার সেই অবিনশ্বর ঊর্দ্ধলক্ষ্য ও গতির প্রতীক। তাই যে দিকে চক্ষু ফিরাই খোদিত মন্দির গাত্রে কিংবা দৈনিক পূজার ধাতুপাত্রে, বিবাহ চেলাঞ্চলে কিংবা বিচিত্র পটাঙ্কনে কারুকার্য্য খোদিত দারুশিল্পে অথবা গৃহ প্রাঙ্গনের মাঙ্গলিক আলিপনায়, আমরা পুনঃ পুনঃ সেই পদ্মেরই অতুল শোভা ও তাহার পরিচিত পঙ্কের মধ্যে শুভ্রের সীমার মাঝে অসীমের ইঙ্গিত দেখিতে পাই। তরুণীর অলক্তরাগরঞ্জিত মোহন চরণ স্পর্শে রক্তিম অশোক কত না প্রণয় প্রণয়ীর আবেগ পুলকময় আখ্যায়িকার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া প্রেমপ্রণয়ের পরিণতির মূক সাক্ষী রূপে দাঁড়াইয়া আছে। নীলনব ঘনের গুরু গুরু গর্জ্জনে যখন কলাপ কলাপী উচ্ছ্বসিত নৃত্যে বিহ্বল তখন সেই শ্রাবণ বর্ষাপ্রকৃতির পুলক শিহরণ ফুটন্ত হর্ষে কদম্ব ফুলে আত্ম প্রকাশ করে, তখনই শ্রবণপথে সেই গোপী বিরহী বংশীবাদকের আকুল স্বনন ধরণীর প্রেমে ব্যাকুল মেঘদলের রুদ্ধ বেদনার সহিত আকাশে, বাতাসে বনানী-লোকালয়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়া কিশোর কিশোরীর প্রেমের মাঝে অনন্তবোধের বিচিত্র প্রতীক গড়িতে থাকে। অথবা রুদ্র বৈশাখের বালুকাতপ্ত শুষ্ক নদীগর্ভের বিপরীত তটে অবস্থিত চকাচকীর করুণ বিলাপ ও তাহাদের ক্ষণিক মিলন সম্ভোগের অবিরাম প্রণয়ের পর্য্যায় মিলন ও বিরহের প্রতীক রূপে জন্ম ও মৃত্যুর সেই চিরন্তন বিচ্ছেদ লীলার গাথা রচনা করে।

ভারতের জনসাধারণের চৈতন্যে সৌন্দর্য্য ও তুরীয় অনুভূতির বিশেষ ধারণাগুলি এইরূপে বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধমূল হইয়া ইহার দ্বারা আমাদের জাতীয় প্রাণ ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুযায়ী চিত্রকলা ও অলঙ্কারের একটি বিশিষ্ট ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাব প্রকাশের এই বিশিষ্ট ছাঁদের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকিলে আমরা আমাদের চিরন্তন প্রতীকগুলির ধর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহাদের নিগূঢ় ও নিবিড় পরিচয় লাভ করাইতে সক্ষম হইব না।

পশুপক্ষী আমাদের দেবতাগণের বাহন হইয়া কিরূপে পূজার ভাগ পাইতেছে এবং প্রত্যেক দেবতার সহিত তাঁহার বাহনের কি স্বভাবিক সম্বন্ধ সে কথার বিশেষ আলোচনা এখন হইবে না। সর্প একটী সাধারণ প্রতীক, আমাদের গ্রামে পথে শস্যক্ষেত্রে বা গৃহাঙ্গনে মনসা দেবী গৃহ ও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সর্পের তীর্য্যক ও বিদ্যুৎচঞ্চল গতি ও তাহার চর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা চিরকালই বিস্ময় জাগাইয়াছে, কিন্তু ভীতি বিস্ময়ের উপর সর্পের আবর্ত্ত বা কুণ্ডলাকৃতি যোগ সাধনার আবাহনকে ইঙ্গিত করিয়া শেষনাগশায়ী নারায়ণ ও ফণীভূষণ যোগীবর শিবের কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াছে। সর্পের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধের ইঙ্গিতও যে কিছু আছে তাহারও পরিচয় পাই লিঙ্গযোনির পার্শ্বে অনেক সময়ে সর্পের অধিষ্ঠান। এই লিঙ্গ ও যোনি সেই পুরুষ ও প্রকৃতির অনাদি সঙ্গম লীলার প্রতীকরূপে সৃষ্টির কারণ ও কল্পনাকে প্রকাশ করে। এবং বৃষভ সেই পরম-পুরুষের বিশ্ব সৃষ্টির জনন ক্ষমতাকে নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারই বাহন হইয়াছে। Egypt, Phrygia, Babyloniaতে যৌন সঙ্গমকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি ও সৃষ্টির রহস্যকে বুঝাইবার জন্য যে অনুকরণ মূলক অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে রূপক ও প্রতীকের দিকটা তত বেশী বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই যেমত বিকাশ লাভ করিয়াছে এই ভারতবর্ষে। এখানে শিবলিঙ্গের প্রতীক অথবা বৈষ্ণবদিগের চিহ্ন একেবারে শুধু Conventional লৌকিক রীতিগত Symbol, প্রকৃতির বা মানুষের জননক্রিয়ার অনুকরণে ক্রিয়া অনুষ্ঠান ইহা হইতে একেবারে সরিয়া পড়িয়াছে।

আমাদের চিত্রকলা ও অলঙ্কার যে বিশিষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এইবার আলোচনা করিব।

(ক) বেদের সেই প্রথম প্রভাতের সামগানে আমরা প্রথম প্রকৃতির প্রতিদানের পরিচয় পাই। প্রাকৃতিক জীবনের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্য অসংখ্য প্রকৃতি দেবদেবীর সৃষ্টি করিয়া নানা স্তব গান ও অলৌকিক গল্পের কারণ হইয়াছে।

(খ) বৌদ্ধযুগে ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতির এই দৈবমূলক ধারণা ও কল্পনা বস্তুতন্ত্র হইয়া সমস্ত প্রকৃতির অন্তরে প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছে। সহানুভূতি আরও জীবন্ত ও সতেজ হওয়াতে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু, পশুপক্ষী, লতাপাতা বৌদ্ধ শিল্প, চিত্রকলা ও লোক সাহিত্য আলোকচিত্রের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। দৈবের ভাব কিছু ঝরিয়া পড়িলেও আর একদিকে নৈতিক জীবনের প্রাচুর্য্য হেতু মানব-অদৃষ্টের সহিত বিশ্বের পরিণতি একটা সুসামঞ্জস্য রাখিয়া বিশাল ভাগ্যচক্রের অনুভূতি আনিয়াছে।

(গ) পরবর্ত্তী যুগে প্রকৃতির সহিত মানবের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আমাদের সুখ দুঃখ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের অবিরাম পর্য্যায়ের মধ্যে একদিকে ভগবানের সৃষ্টি রহস্য তাঁহার আত্ম নিয়োগ ব্যক্তিগত জীবনে যে অবিরত দুঃখভোগে একটা বৃহত্তর জীবনের সার্থকতা আনিতেছে তাহারই আভাষ দেয়; অপর দিকে, তৎকালীন জাতীয় জীবনের অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও ক্ষুধা প্রকৃতির শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে সমাপ্তি লাভ করিতেছে, এবং সেই জন্যই আমরা বর্ণধর্ম্মের লালিত পালিত জীবনের পরিণতি ও পরিসমাপ্তি দেখিতে পাই তাহা ছাড়া তপোবনে প্রকৃতির নিবিড় অন্তরে মানুষ, পশুপক্ষী ও তরুলতায় সখ্যতা ও সৌন্দর্য্যের স্নেহ ও প্রীতিময় আদান প্রদান যে শান্তিরসাপ্লুত সৌন্দর্য্য-রাজ্যের

সৃষ্টি করিয়াছে আধুনিক্ সভ্যতার কল্পনা তাহাতে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়।

আর এইখানেই ভারতীয় লোক সাহিত্যের বিশেষত্ব। প্রকৃতি ও মানুষের ভাব বিনিময় প্রকৃতি ও মানুষের অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য একটা মৈত্রীর ভাব কেবল ভারতবর্ষই আনিতে পারিয়াছে, পাশ্চাত্য প্রদেশে কি গ্রীক সাহিত্য, কি পরবর্ত্তী Romantic সাহিত্য Renaissance উভয়েই এই স্বাভাবিক ও ও প্রকৃত লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষের ও প্রকৃতির মধ্যে একটা দানবীয়, Tetantic বা Promethean বিরোধকে অবলম্বন করিয়া মানুষকে চিরকাল ত্রস্ত ও বিপর্য্যস্ত এবং প্রকৃতিকে মানব-অদৃষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন ও নির্লিপ্ত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিল্পকলা প্রকৃতিকে মানব চরিত্রের অনুযায়ী দৃশ্যে পর্য্যবসিত করিয়াছে, চীন চিত্রশিল্পী মানুষকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুযায়ী চরিত্র দান করিয়াছে, ভারতবর্ষ এই দুইয়েরই উপর-স্তরে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একটা বিশ্বাত্মক সম্মিলন ও শৃঙ্খলা আপনার শিল্পে ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে কিম্বা মানবাত্মার জড়ের বন্ধনকে ছিন্ন করাইয়া আর একটা অতিপ্রাকৃত স্তরে এই প্রাকৃতিক জীবন-মরণ লীলাকে দমন করিয়াছে।

(ঘ) পুরাণ ও তন্ত্র সাহিত্যে দেখি যে প্রকৃতির সহিত মানব জীবন ও অদৃষ্টের পরিচয় এত নিবিড় হইয়াছে যে প্রকৃতির বিচিত্র ও অভিনব লীলা নব নব বিগ্রহ ধারণ করিয়া, নব নব প্রতীকরূপে মানব জীবন ও বিশ্ব প্রকৃতির সম্বন্ধের নিগূঢ় রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছে। প্রাকৃতিক জীবনের রসসঞ্চারে উদ্ভূত পুরাতন কল্পনা এখন নূতন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত হইতেছে। লীলাময়ী প্রকৃতির নিত্য নব বৈচিত্র্য অথবা মানব-জীবনের বিভিন্ন ভাব ও অবস্থা যে কতটা বিরাট শূন্যের দিকে প্রধাবিত তাহাই সাহিত্য ও শিল্পে ব্যাপ্ত হইয়াছে।—অসংখ্যরূপ কল্পনায় এবং অসংখ্যরূপের লীলাধার সেই অমূর্ত্ত আদ্যা প্রকৃতির রহস্যোদ্ঘাটনে। আবার সেই মহাকাল বা মহাকালীর শূন্য গর্ভ হইতে সৃষ্টি বৈচিত্র্য একটা ক্রম-পরিস্ফুটতার অবিরাম ধারা অবলম্বনে বিশ্বপ্রকৃতির দৃশ্যপটে বিচিত্ররূপে অঙ্কিত হইতেছে কিম্বা বিরাট বিশ্বমঞ্চে সীমা ও অসীমের প্রেমলীলার অভিনয় পূর্ব্বরাগ, মিলন, অভিমান ও বিরহের, ব্যঞ্জনায় অনির্ব্বচনীয় মধুর রসে সিঞ্চিত।

ভারতবর্ষের শিল্পে সাহিত্যে সমুদায় ভাবই এখনও জাগ্রত, (১) প্রকৃতির একটা হুবহু অনুকরণ ও তাহাকে নৈতিক ও তুরীয় ভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা (২) ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ একটা বিশালতর মানব ভাগ্য ও পরিণতির আশায় সহ্য করিবার ক্ষমতা (৩) প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ই এক অমূর্ত্তের বহুরূপ, এবং সেই সমূর্ত্ত বহুরূপী হইয়া অনুলোম বিলোম গতিতে প্রকৃতি ও মানব জীবনের সৃষ্টি প্রবাহে ভাসিয়া চলিতেছে আবার এক সঙ্গে শূন্যে বিলীন হইতেছে, এই তুরীয় বোধ।

ভারতবর্ষের তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠান আমাদের ধর্ম্মসাধনার সহিত জড়িত হইয়া প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের সুবিধাবিধান করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, তীর্থ ভ্রমণে অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করে। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" আছে, যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে নাই তাহার সুখ নাই। মানুষের বসবাসে যে খুব ভাললোক, সেও পাপী হয়, কারণ ইন্দ্র পরিব্রাজকের বন্ধু। তীর্থের সংখ্যা করা অসাধ্য। পদ্ম-পুরাণে সার্দ্ধ তিনকোটি তীর্থের উল্লেখ আছে, একমাত্র এই ভারতবর্ষে যে কত সহস্র তীর্থ আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আর এইটাই খুব আশ্চর্য্য যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের অতীত ভৌগলিক ধারণাটি এখনকার ধারণা অপেক্ষা ব্যাপকতর ছিল। কাশী, কাঞ্চী, গয়া, অযোধ্যা, দ্বারাবতী, মথুরা, অবন্তী প্রভৃতি সকল দিককার নগর উত্তরের হিমালয় ও বদরিকা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত, পূর্ব্বদিককার চন্দ্রনাথ হইতে পশ্চিমের দ্বারকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যেখানে রমণীয় স্থান আছে তাহাই অতি পবিত্র। বিভিন্ন তীর্থে স্নান, দান, গমন, ও পূজাতর্পণাদির আবশ্যকতা এমনভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে

যে সমগ্র ভারতটাই প্রদক্ষিণ করিতে পারিলেই শুভ। যেমন নৈমিষারণ্য, বারাণসী, অগস্ত্যাশ্রম, কৌশিকী, সরযুতীর, শোণ, শ্রীপর্ব্বত, বিনাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী, এই সকল তীর্থ শ্রাদ্ধে প্রশস্ততম। স্নানের জন্য নদীদিগের মধ্যে বিশেষভাবে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি প্রশস্ততম। ইহাও খুব স্বাভাবিক যে নদীর যেখানে উৎপত্তি যেমন গঙ্গোত্রি, বা অমরকণ্টক, যেখানে নদীর প্রবাহ বিপুল ও উদ্দাম যেমন হৃষীকেশ, হরিদ্বার বা নাসিক যেখানে নদী দক্ষিণবাহিনী, যেখানে শাখাপ্রশাখা আসিয়া মিলিয়াছে যেমন প্রয়াগ, রামেশ্বর, দেবপ্রয়াগ কিম্বা সাগরসঙ্গম সবই পবিত্রতীর্থ, সেখানকার পূত সলিলে স্নান অতি পুণ্যের। সমগ্র ভারতবর্ষকে সম্মুখে রাখিয়া যখন যে সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সেই শিব, বিষ্ণু, সতী বা বিনায়কের পবিত্র ক্ষেত্র সমুদায় পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে নির্দ্দেশ করিয়াছে। দৈনিক প্রার্থনার সময় এই সমস্ত পবিত্র তীর্থভূমির নাম দেব দেবীগণের সহিত উচ্চারিত হইয়া সমগ্র দেশের চিত্র পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠে।

নদী সরোবরে পর্ব্বতে উপত্যকায় বন উপবনে শ্যামল সমতল ভূমিতে সাগর বেলায় অথবা আগ্নেয় গিরিনিতম্বে যেখানে যাহা সুন্দর, তাহাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎ যেখানে ধনীর জন্য হোটেল বা বিলাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে আমরা আমাদের পরম পবিত্র মঠ মন্দির ধর্ম্মশালা, চৌলট্রী নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃতির নিবিড়তর অনুভূতির আশ্রয়ে যাহাতে অতি দরিদ্রের পক্ষেও অনন্তবোধ স্বতঃই জাগ্রত হইতে পারে তাহার সুযোগ বিধান করিয়াছি। কাশ্মীর এমন রমণীয় স্থান যে সেখানকার ভূমিতে তিলমাত্র স্থান নাই যাহা পুণ্যভূমি নহে। প্রকৃতিকে ভারতবর্ষ নিঃসঙ্গভাবে ভোগ করিতে ভালবাসে। তাই অনেক সময় আমাদের তীর্থ সমুদয় দুর্গম গিরিকন্দরে অথবা গহন বিজন অরণ্য মধ্যে তমাল-তালীবনরাজিনীলা সাগর বেলায় অথবা বিপদ সঙ্কুল পর্ব্বত শিখরে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সাগর সঙ্গমে অথবা বলাকাশোভিত হ্রদ সরোবরে। প্রকৃতির ভীষণ বা কোমল, করুণ অথবা কঠোর, উদাস অথবা ভোগবিলাসী ভাবটি বিচিত্র স্থানে বিচিত্র রসবিগ্রহে ফুটিয়া উঠিয়া আমাদের পূজা পাইতেছে। তাই দক্ষিণে অনন্ত সাগরের বিস্তীর্ণ তটভূমিতে শেষশায়ী নারায়ণ, মধ্যে মধুস্রোতা গঙ্গাযমুনার উর্ব্বর শ্যামল ক্ষেত্রে শ্যামসুন্দর অথবা অন্নপূর্ণা উত্তরে চির তুষার শুভ্র হিমাচল তুঙ্গে চির কঠোর শিব সুন্দর; পর্ব্বতে ভৈরব, চামুণ্ডা, লোকালয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মী ভগবতী রাজরাজেশ্বরী, অরণ্যে রুদ্র, নৃসিংহ কালী, বালার্ক স্নাত শান্ত সরোবরে ব্রহ্মা, প্রলয়ঙ্কর উর্ম্মিমুখর সাগর বেলায় প্রলয়ঙ্কর জনার্দ্দন, ভারতবর্ষ বিচিত্র রূপক, আখ্যায়িকা, গল্প, স্থলপুরাণ সৃষ্টি করিয়া আপনার বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কত না খণ্ড রসবিগ্রহে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এক এক স্থলে এক একটা শাক্ত-যন্ত্র-সিদ্ধ পীঠ বলিয়া রক্ষিত। পরে সেই পীঠের উপর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পরে প্রতিমা বা মুখ ও হাত পা বসানো হইয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরাত্মাটি যেন অনেক সময়ে খণ্ডবিগ্রহে মানুষের অন্তরে সীমার মাঝে আপনাকে ধরা দিতেছে। কুমারিকা অন্তরীপের বিগ্রহ ও পূজাপদ্ধতির সহিত সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবস্তু ও ঘটনার যে সৌ-সামঞ্জস্য আছে তাহার সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি। এই সৌসামঞ্জস্যই, প্রকৃতির এই বহু বহু অনুকরণই ভারতের অসীমের সাধনার স্বাভাবিক ভিত্তি। কিন্তু ইহাকে আশ্রয় করিয়া ইহার উপর স্তরে স্তরে যে মানব ভাগ্য ও বিবর্ত্তনশীল অনাদ্যা প্রকৃতির লীলার কত বিচিত্র ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিকাশ লাভ করিয়াছে যে প্রকৃতির প্রতিদানের দিকটা অনেক সময় আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

সম্পাদক

"ভিক্ষার ঝুলি।"

আমরা বাঙালী সেজেছি কাঙালী
ভিক্ষার ঝুলি করেছি সার
ওই শোন ভাই কে ডাকে কাতরে
ক্ষুধার যাতনা সহেনা আর।

নাহি গেহ নাহি পেটে দিতে দানা
রাক্ষসী আজ দিয়েছে রে হানা
আয় ভাই তোরা সমুখে দাঁড়ানা
মাথায় করিয়া দুখের ভার।

তা'রা যে মোদের আধখানা প্রাণ
আজি নিরন্ন দুখে ম্রিয়মান
নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান
মুখ চেয়ে তারা রয়েছে কার।

মার কোলে শিশু কেঁদে মরে যায়
অসহায় প্রাণী করে হায় হায়
আয়রে বাঙালী আয় ছুটে আয়
এই ত দেশের সাধনা সার।

এস দীন তুমি যাহা পার দাও
বীর তুমি তব শকতি বিলাও
ধনী তুমি আজ দাও খুলে দাও
তোমার ধনের সকল দ্বার।

"বিদ্যার্থী-ভবন"
৬১নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আবশ্যকীয় কথা।

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্য্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায়, সে দিকে খেয়ালই নাই।

*　*　*　*

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই।" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শোনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলবেন, কবে তাঁদের সাধনা গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?"

"রবীন্দ্রনাথ"

*　*　*　*

"ইউরোপে, জাপানে, আমেরিকায়, শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরীব দেশেই শিক্ষাকে দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—একথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে।"

মহাত্মা রঙ্গদাস।

(১)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে মছলিপটনম্ নগরে এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের গৃহে মহাত্মা রঙ্গদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শকট নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। ধর্ম্মভীরু, সাদাসিদে, উদার ও সদাশয় ছিলেন বলিয়া সূত্রধর হইলেও অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে এই ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলেন নাই। রঙ্গদাস-জননীও পতির যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। এই পরদুঃখকাতরা ও দানশীলা মহিলা, পবিত্র চরিত্র মাধুর্য্যে দেবী বলিয়া কথিত হইতেন।

মহাপুরুষগণের সুবিস্তৃত বাল্যজীবনী সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। লোকলোচনের অগোচরে কেমন করিয়া শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সাধারণ বালকগণের সহিত ক্রীড়া, কৌতুক, আমোদ আহ্লাদে নিযুক্ত থাকিয়াও, তাঁহাদের নিভৃত মর্ম্মে কি ভাবের বন্যা ঢেউ খেলিয়া যায়, তাহা আধ্যাত্মিক তত্ত্বানভিজ্ঞ সাধারণ মানবের স্থূলদৃষ্টি কেমন করিয়া লক্ষ্য করিবে? শৈশবে রঙ্গদাস অতীব ধীর স্থির ছিলেন, বালসুলভ অধীরতা ও চাঞ্চল্য তাঁহাতে কখনই পরিলক্ষিত হয় নাই। উপযুক্ত বয়সে তিনি তেলেগু ভাষা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। লজ্জাকুণ্ঠিত বালক কাহারও সহিত মিশিতেন না। কখনও বা পাঠ করিতেন কখনও বা গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় উত্তর কালে রঙ্গদাসের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে রঙ্গদাস স্বল্পভাষী ও অতিরিক্ত বিনয়ী ছিলেন। উক্ত শিক্ষক মহাশয়ের আলয়ে, প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীশ্রী ভাগবত ও পুরাণাদি পাঠ হইত; রঙ্গদাস তাহার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন। যখন ভাবোন্মত্ত পাঠক গদগদ স্বরে ভক্ত ও ভগবানের মধুর লীলাবিলাস বর্ণনা করিতেন, উহা শ্রবণ করিতে করিতে রঙ্গদাসের মুখমণ্ডল আনন্দে প্রজ্জ্বল হইয়া উঠিত। কখনও বা বালক আনন্দের আতিশয্যে হাস্য করিতেন। এইরূপ সময় ভাবাবেশে তাঁহার অঙ্গবৈকল্যাদি লক্ষ্য করিয়া সাধারণ লোক তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন।

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ মাত্রই বালকের এই প্রকার ভাবোন্মত্ত অবস্থা, ভক্তি ও অনুরাগ প্রভৃতি দর্শনে শিক্ষক মহাশয় চমৎকৃত হইলেন এবং প্রতি রজনীতে তাহাকে পাঠ শুনিবার জন্য আগমন করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে রঙ্গদাস কেবলমাত্র পুরাণ পাঠ শুনিয়া তৃপ্ত হইতেন না। বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বালকবৃন্দকে একত্রিত করিয়া তিনি শ্রীভাগবত আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার সরস ভাবময় বর্ণনাভঙ্গীতে চঞ্চল শিশুগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া স্থিরভাবে উহা শ্রবণ করিত। রঙ্গদাসের মুখে ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতীত অপর কোন কথা ছিল না। পথে কোন পরিচিত বালকের সহিত দেখা হইলে কথা প্রসঙ্গে অন্ততঃ একবারও তাহাকে হরিনাম না শুনাইয়া ছাড়িতেন না। অধ্যয়নের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা মনযোগ ছিল না। বিদ্যালয়ে তিনি দেশীয় ভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন এবং ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত অঙ্ক কসিতে পারিতেন। এদিকে যথেষ্ট শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইলেও শিক্ষক মহাশয়ের আলয়ে পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতে যাওয়া তাঁহার একদিনও বাদ যাইত না। প্রহ্লাদ, নারদ, ধ্রুব, অম্বরিষ, হনুমান, ভীষ্ম, শুকদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অতীত যুগের লোকত্তর চরিত্র সমূহ পাঠকের মুখে শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় এতাদৃশ দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া যায় যে, উত্তর কালেও তিনি ঐ সকল

উপাখ্যান যেমনটি শুনিয়াছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে আবৃত্তি করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতেন।

দরিদ্র, রুগ্ন, অভাবগ্রস্থ কেহ দৃষ্টিপথে পড়িলেই রঙ্গদাসের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত; তিনি অনেক সময়েই কাঁদিয়া ফেলিতেন, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে সাহায্য করিবার উপায় অন্বেষণ করিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন দিবার জন্য যে অর্থ দিতেন, তিনি পথিমধ্যে সর্ব্বপ্রথম যে ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে দেখিতেন তাহাকে সব দান করিয়া ফেলিতেন এবং বেতন দিতে না পারিলে বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাইবেন না শুনিয়া অর্দ্ধ পথ হইতেই গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। এইরূপ ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটায় তাঁহার পিতা আর তাঁহার হস্তে বেতন না দিয়া অন্য উপায়ে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাজার হইতে কিছু ফল কিনিয়া আনিবার জন্য কয়েক আনা পয়সা দিলেন। পথিমধ্যে রঙ্গদাস পূর্ব্বাভ্যাসমত একজন অনশনক্লিষ্ট ভিক্ষুককে সমস্ত পয়সা দান করিয়া রিক্তহস্তে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। পিতা যখন তাঁহাকে ডাকিয়া কি ফল ক্রয় করা হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, রঙ্গদাস মৃদুহাস্যে উত্তর দিলেন "বাবা, আপনি যে ফল ক্রয় করিতে বলিয়াছিলেন, উহাতে আপনার ক্ষণস্থায়ী রসনার তৃপ্ত সাধিত হইত। একজন বুভুক্ষু দরিদ্রকে উক্ত অর্থ দান করিয়া আমি কি আপনার জন্য অতীন্দ্রিয় আনন্দ ক্রয় করিয়া আনি নাই?" ধার্ম্মিক ও উদার হৃদয় পিতা পুত্রের অদ্ভুত উত্তর শ্রবণ করিয়া আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর রঙ্গদাস বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট অষ্টবর্ষ কেবলমাত্র আত্মমগ্ন গভীর ধ্যান ও কঠোর তপস্যা ও একাগ্র সাধনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি প্রত্যহ গভীর নিশায় জাগ্রত হইয়া গোপনে কোন নির্জ্জনস্থানে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন; পরদিবস দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন না। বাটীস্থ পরিজনবর্গ ভাবিতেন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালের প্রথানুযায়ী বিবাহ প্রদান করিয়া উক্ত রোগ দূর করিবার অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবার রঙ্গদাসের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রঙ্গদাস প্রবলতম আপত্তির সহিত বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। যখন সমস্ত অনুরোধ ভৎর্সনা ইত্যাদি বিফল হইল তখন রঙ্গদাসের পিতা মনে করিলেন যে একমাত্র শিক্ষক মহাশয় চেষ্টা করিলে উহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। তদনুসারে বন্দোবস্ত করিয়া তিনি একদিবস পুত্রকে শিক্ষক মহাশয়ের আলয়ে প্রেরণ করিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হইয়াছিল আমরা নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

শিক্ষক। বাপু! এ রকম পাগলের মত বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজন উপেক্ষা করিয়া ইতঃস্তত ভ্রমণ করা ভাল দেখায় না। যাহাতে সংসারধর্ম্ম রক্ষা পায়, পিতা মাতার কোনপ্রকার মনোবেদনার কারণ না জন্মে তাহাই কর।

রঙ্গদাস। মহাশয় যখন আমি একাগ্রচিত্তে আপনার আলয়ে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতাম—তখন আমার কেবলি মনে হইত—সংসারের ভোগসুখে বিগতস্পৃহ এবং তীব্র মুমুক্ষু না হইতে পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না। আমি সেইপন্থাই অবলম্বন করিয়াছি। আর ইহা যখন অন্যায় নহে তখন আপনাদের আপত্তির কারণ কি? আপনাদের সকলের নিকট আমার নিবেদন অনর্থক আমার সঙ্কল্পে বাধা দিবেন না।

শিক্ষক। শাস্ত্র বলিতেছেন সন্ন্যাসের যোগ্য হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেককেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। উচ্চতম আত্মজ্ঞানলাভার্থীকে গার্হস্থ্যাশ্রমেই প্রথম শিক্ষালাভ করিতে হয়। সংসারের মিষ্ট ও তিক্ত উভয়বিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে মানবের মন সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে এবং অবশেষে বৈরাগ্য জাগিয়া তাহাকে মুক্তির পথ খুঁজিয়া লইতে প্রেরণা দেয়। ভোগের মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগের

সাধনা করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা। অতএব তোমার বিবাহ করাই যুক্তিযুক্ত! সংসার হইতে পলায়ন না করিয়া ইহার মধ্যেই সাধন ভজন কর! সংসারে থাকিয়া কি ধর্ম্ম হয় না? বৎস! আমার উপদেশ মত—আমাদের মত বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া কিছুদিন জগতের সুখ দুঃখগুলি ভোগ করিয়া লও, তারপর মোক্ষলাভ করিতে অগ্রসর হইও! সন্ন্যাসাশ্রম-রূপ সুদৃঢ় সৌধের গার্হস্থ্যাশ্রমই ভিত্তিভূমি! ভাবিয়া দেখ, কিছুদিন বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া সংসারের কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদনান্তে সন্ন্যাসী হইলে ভবিষ্যতে সংসারের প্রলোভন ইত্যাদিতে সতত অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইবে।

রঙ্গদাস! মহাশয়! আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশের সারবত্তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। বিবাহিত জীবনের শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও ভোগের মধ্যে ত্যাগের সাধনা করার অবশ্য একটা বাহাদুরী আছে। কিন্তু আমার মনে হয় বাহাদুরী লওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ করা। বিশেষ আমার আধ্যাত্মিক অবস্থা এত উন্নত নহে যে অশান্তি সঙ্কুল সাংসারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতেও অবিচলিত থাকিয়া সত্যের সাধনা করিতে পারিব। আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। এদিক ওদিক দুদিক রাখিয়া চলিতে পারিব না; অতএব একমাত্র শ্রীভগবৎসেবায় কালাতিপাত করাই শ্রেয়স্কর।

শিক্ষক। বৎস! আরও একটী কথা আছে। স্বীয় দেহের ভরণপোষণের জন্য অপরের গলগ্রহ না হইবার জন্যই ভগবান তোমায় হস্তপদাদি দান করিয়াছেন অতএব মানবের সাধারণ ধর্ম্মানুসারে তোমার ঐ গুলির যথাযথ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যেই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রদাম করিয়াছেন।

রঙ্গদাস। মহাশয়! ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ ভাবে পরিচালন বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অপারগ। এমন কি যদি ভগবানের সেবা ব্যতীত, অপর কাহারও সেবা করিয়া এ দেহ রক্ষা করিতে আমার বিশেষ স্পৃহা নাই। আপনি অস্থ হইতে, দেখিবেন, অতঃপর আমি আর কাহারও নিকট আহার্য্যদ্রব্য যাচ্ঞা করিবনা অথবা আহার করিবার জন্য হস্ত ব্যবহার করিব না। আপনারা দয়া করিয়া আমাকে নিজের মনমত চলিবার সুযোগ দিন।

শিক্ষক। যদি কেহ তোমাকে কোন খাদ্যদ্রব্য প্রদান করে তাহাহইলে তো গ্রহণ করিবে? অলসভাবে বসিয়া অপরের কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অন্নের অংশ গ্রহণ করা কি সঙ্গত মনে কর?

রঙ্গদাস। মহাশয় আহার করিবার স্পৃহা পর্য্যন্ত আমার নাই। অনাহারে যতদিন হউক না কেন যাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। যদি কেহ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কোন খাদ্য দ্রব্য প্রদান করে তাহা হইলে উহা ভগবানের দান জানিয়া আমি গ্রহণ করিব। জীবিকার্জ্জনের জন্য আমি কোনপ্রকার কর্ম্মে লিপ্ত হইব না। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি এই সব সাংসারিক বন্ধন আত্মজ্ঞান লাভের প্রবল অন্তরায় স্বরূপ।

শিক্ষক। পিতৃমাতৃঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সন্তানেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি যদি উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ না কর তাহাহইলে কেমন করিয়া ঋণমুক্ত হইবে?

ছাত্র। আমার অর্জ্জিত আধ্যাত্মিক সম্পদ তাঁহাদের প্রদান করিব। আমি আত্মজ্ঞান দিয়া ঋণ মুক্ত হইব।

শিক্ষক। যদি তুমি সাধনায় সিদ্ধলাভ করিতে না পার তাহইলে কতদিন এইরূপ ভাবে যাপন করিবে?

ছাত্র। আশীর্ব্বাদ করুন যেন এ পর্য্যন্ত না আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি সে পর্য্যন্ত অবিচলিত নিষ্ঠায় জীবন যাপন করিতে পারি।

রঙ্গদাসের উত্তরগুলির মধ্যে তাঁহার সরল হৃদয়ের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবিখানি কি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন তুলিয়া শিক্ষক মহাশয়কে তর্কে পরাস্ত করিবার ঔদ্ধত্য তাঁহার একটী কথার ভিতর দিয়াও অসংযত ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। তাঁহার

কথিত প্রত্যেকটী বাক্যের মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য, অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইবার প্রবলতম আগ্রহ ও আত্মনিষ্ঠা বিনয়নম্র ভঙ্গীতে উছলিয়া উঠিতেছে। শিক্ষক মহাশয় ভগবদ্ভক্ত ছিলেন ; কাজেই রঙ্গদাসের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া পরমানন্দিত হইলেন এবং বুঝিলেন যে এই বিবেক বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু সাধককে বিবাহের জন্য অনুরোধ করা একান্ত নিষ্ফল এবং রঙ্গদাসের পিতাকেও ঐ চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলেন।

এই সময় ঘটনাক্রমে একদিন রঙ্গদাসের পিতার একটী হস্তাঙ্গুলীতে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইল। বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও কোন প্রকার উপশম বোধ হইল না ; বরং বেদনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে একজন চিকিৎসক ব্যবস্থা দিলেন যে লেবুর রসে উক্ত ব্যাধিগ্রস্থ অঙ্গুলীটি ডুবাইয়া রাখিলে যন্ত্রণা দূর হইতে পারে। রঙ্গদাসের উপর তৎক্ষণাৎ লেবু আনয়ন করিবার ভার অর্পিত হইল। এই সুযোগে তিনি অগ্রে পিতাকে সাংসারিক জীবনের কঠোর দায়ীত্ব ও অসুবিধার বিষয় বুঝাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লেবু ক্রয় করিবার জন্য পয়সা গ্রহণ করিয়া তিনি পিতাকে প্রশ্ন করিলেন "বাবা লেবু ক্রয় করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমার একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি লেবু চাহিতেছেন কেন?"

যন্ত্রণায় অধীর পিতা ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর করিলেন "দুষ্ট, বালক, পাগলামী করিবার কি উপযুক্ত সময়? দেখিতেছ না, আঙ্গুলের বেদনায় আমি কি অসহ্য কষ্ট উপভোগ করিতেছি। তোমার সাক্ষাতেই তো ডাক্তার লেবুর রসে আঙ্গুল ডুবাইয়া রাখিবার কথা বলিয়া গেলেন ; তথাপি মূর্খের ন্যায় ঐরূপ প্রশ্ন করিতেছ কেন?"

"পিতঃ তাহা আমি জানি। এখন বলুন দেখি, যন্ত্রণা আপনি পাইতেছেন না আমি পাইয়াছি?"

পিতার ক্রোধ চরমে উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে মৃত দেখিতে ইচ্ছা কর? আমি যে কি অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেছি তাহা তুমি কেমন করিয়া অনুভব করিবে? যদি আমার যন্ত্রণার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভব করিতে তাহা হইলে আর দাঁড়াইয়া কৌতুকালাপ আরম্ভ করিতে না।"

ধৈর্য্যশান্ত কণ্ঠে রঙ্গদাস বলিলেন, "পিতঃ তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন বিবাহিত জীবন আমার পক্ষে যে কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ও অশান্তির আকর হইবে—তাহা আপনি কেমন করিয়া অনুভব করিলেন? আপনার অঙ্গুলীর যন্ত্রণা সামান্য লেবুর রসেই আরাম হইবে কিন্তু আমার যন্ত্রণা শত সহস্র চিকিৎসকের কোন ঔষধই আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না। একটা নিদারুণ অভিশাপ মস্তকে লইয়া আমাকে আজীবন দুঃখভোগ করিতে হইবে—অথচ যাহারা বিবাহিত—জীবনরূপ যন্ত্রণার অলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আমাকে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন করিতেছেন—আমি যেমন আপনার সহিত পাগলামী করিতেছি—তাঁহারাও কি তদ্রূপ আমাকে লইয়া পাগলামী করিতেছেন না? এখন হয়তো আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছেন—জানিয়া শুনিয়া আর আমাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন না। আমি মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই আপনার জন্য লেবু আনিয়া দিতেছি।"

এই ঘটনার পর হইতে তাঁহারা নিঃশেষে বুঝিলেন রঙ্গদাসকে বিবাহে সম্মত করান অসাধ্য। তাঁহারা রঙ্গদাসকে সমাজের আধুনিক প্রথানুযায়ী উন্মত্ত বলিয়াই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রতীকার স্বরূপ বিবাহরূপ মহৌষধ প্রয়োগ করিতে না পারিয়া সকলেই তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে একরূপ হতাশ হইয়া পড়িলেন। রঙ্গদাসের পিতা যদিও স্নেহশীল ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, তথাপি গতানুগতিকতার প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন নাই। এ হেন সন্তানকে লইয়া কি করিবেন অহর্নিশি এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন অবশেষে প্রতিবেশীগণের পরামর্শে...পুত্রকে "কাজের লোক" করিয়া গড়িয়া তুলিতে প্রস্তুত হইলেন। কারণ আধুনিক সংসারে যে অর্থোপার্জ্জন না করিয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করে ; তাহার মত অপদার্থ আর জগতে নাই জপ, ধ্যান, সংযম সাধনা ইত্যাদি আজকাল অনেকে মানব জীবনের নিষ্ফল অপব্যয় বলিয়া উচ্চকণ্ঠে লো

সমাজে নিঃসঙ্কোচে প্রচার করিয়া থাকেন। আর দুই চারি জন উদার হৃদয় সাংসারিক বিজ্ঞব্যক্তি গম্ভীরভাবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলেন বটে, "হাঁ এদিক সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া যদি সময় পাও তাহা হইলে ভগবচ্চিন্তা করিতে পার। তাই বলিয়া বেশী ভগবানকে ডাকিও না "বেহেড" হইয়া যাইবে। মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই অনর্থ ঘটে!"

যাহা হউক তাঁহারা ভাবিলেন রঙ্গনাথকে একটী কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিলে উহার নির্জ্জনে অবস্থান করিবার অসুবিধা হইবে। সর্ব্বদা লোকসঙ্গে থাকিলে, দশজনের দেখাদেখি উহার মতিগতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। পিতা ও ভ্রাতৃগণের অনুনয়, ভৎর্সনা আগ্রহ তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। ক্রমে তাঁহার ভবনে সাধনের মহাবিঘ্ন দেখিয়া একদিন বিরক্ত হইয়া পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইল, তথাপি রঙ্গদাস ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া পরিজনবর্গ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। স্নেহময় পিতা অনুতপ্ত হৃদয়ে বহু অনুসন্ধানের পর পুত্রকে গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং অতঃপর আর তাঁহার স্বাধীন চিন্তায় ও স্বচ্ছন্দ বিচরণে কোন ব্যাঘাত উৎপন্ন করেন নাই। বিপদ, বাধা, বিঘ্ন, অগ্রাহ্য করিয়া একাগ্র নিষ্ঠায় অবিচলিত চিত্তে রঙ্গদাস স্বীয় লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আদরও তাড়না, মমতা ও উপেক্ষা, কিছুতেই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

যে কয়েকদিন তিনি পিত্রালয় হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, সে কয়দিন আর কিছু আহার করেন নাই। তিনি কখনও কাহারও নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করেন নাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও কেহ কিছু প্রদান করে নাই। অথচ কয়েকদিনের উপবাসী রঙ্গদাস যখন বাটীতে আনীত হইলেন; সকলে বিস্ময়ে দেখিলেন তাঁহার পুণ্যোজ্জ্বল প্রশান্ত মুখচ্ছবি একটু ম্লান হয় নাই; সদানন্দময় রঙ্গদাস প্রফুল্ল হাস্যে সকলের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন,—কয়েকদিন পূর্ব্বে যে তিনি অশেষপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেন সে কথা সম্পূর্ণ-বিস্মৃত হইয়াছেন।

(২)

পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া রঙ্গদাস প্রত্যহ মছলিপট্টনম্ নগরস্থ পরম ভাগবত সাধু গোপালদাস ও ইস্মায়েল দাসের নিকট নিয়মিতরূপে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। উক্ত সাধুদ্বয়ের মধুর প্রাণস্পর্শী ভজন গান শুনিবার জন্য প্রত্যহ বহু ভক্ত তথায় সমবেত হইতেন। এই মহাত্মাদ্বয় রঙ্গদাসকে উত্তম অধিকারী বুঝিতে পারিয়া আগ্রহের সহিত সাধন তত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কঠোর তপস্যা ও গভীর ধ্যানে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল—কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল না; ভগবল্লাভের ব্যাকুল আগ্রহে অভিভূত হইয়া রঙ্গদাস কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

সাধু ইস্মায়েল দাসের নিকট একটী রমণী নিয়মিত-রূপে আগমন করিয়া একাগ্রচিত্তে ভজন গান শ্রবন করিতেন। শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে এই মহিলার বদনমণ্ডল এক দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত - আয়ত নেত্রদ্বয় সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে বৈরাগ্য ও প্রেমের শান্তোজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করিত। ইনিও রঙ্গ-দাসের ন্যায় ইস্মায়েল দাসের উপদেশমত সাধন অভ্যাস করিতেন। এই ভক্তিমতী ও সাধিকা মহিলা জাতিতে মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল চাদাম্মা। রঙ্গদাসের শ্রদ্ধাবিচিত্র-সম্ভ্রম-দৃষ্টি এই মহিলার উপর পতিত হইল। চাদাম্মাও, তাঁহার পবিত্র চরিত্র, তীব্র বৈরাগ্য অদ্ভুত সাধনানুরাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। প্রথম পরিচয়েই উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া হৃষ্ট হইলেন। সাধু ইস্মায়েল দাসের প্রদর্শিত পন্থায় ধ্যানাদি করিয়া উভয়েই শান্তি পাইতেছিলেন।

চাদাম্মা রঙ্গদাসের ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহার বৈরাগ্য ও সাধন রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য আগ্রহ, রঙ্গদাসের চেয়ে বড় কম ছিল না। উভয়ে একত্র হইলেই নানাপ্রকার

আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের আলোচনা হইত। স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা যেন বুঝিতে পারিলেন—সাধন পথে সম্যক্‌রূপে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর সাহায্য একান্ত আবশ্যক। যখন মুমুক্ষু সাধক আত্মজ্ঞান লাভের আশায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন; তখন গুরু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হন—তবে তাঁহারা এখনও যোগ্যতম গুরুর সন্ধান পাইতেছেন না কেন?

উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা লইয়া চাদাম্মা অবশেষে রঙ্গদাসকেই গুরুপদে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রঙ্গদাস ভাবিয়া আকুল হইলেন। কি মন্ত্রে তিনি চাদাম্মাকে দীক্ষা দিবেন। তিনি তো মন্ত্র, দীক্ষা প্রণালী ইত্যাদি কিছুই জানেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে এমন কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাহার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—যুক্তিতে বোধ হয় নাই। একদিন রঙ্গদাস, কেমন করিয়া চাদাম্মার ব্যাকুল হৃদয়ের শান্তি বিধান করিবেন ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে পতিত একখণ্ড কাগজ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কৌতুহলবশে তিনি উহা তুলিয়া লইলেন। কাগজখানি পাঠ করিতে করিতে রঙ্গদাসের মুখমণ্ডল আনন্দে প্রজ্জ্বোল হইয়া উঠিল,—উহাতে একটী মন্ত্র ও তাহার সাধন প্রণালী বিশদভাবে লিখিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ চাদাম্মার নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। চাদাম্মার বহুদিনের ঈপ্সিত বাসনা পূর্ণ হইল। তিনিও আনন্দের সহিত রঙ্গদাসকে দীক্ষা করিয়া রাজযোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে—সমন্বয় যুগে এই সুত্রধর ও মৎস্য বিক্রেত্রীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা—কৃত্রিম অধিকার বাদের গণ্ডী, সামাজিক নিষেধ একরকম অজ্ঞাতসারেই উপেক্ষা করিয়া এই মহিমাময় চেষ্টা—ইহাই নবযুগের সাধনা! যাঁহারা আপনাদিগকে নিম্ন জাতি বলিয়া মনে করেন—কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মনে করেন—আমরা উচ্চতম সাধনার অধিকারী নহি তাঁহারা একবার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া এই অভিনব সাধক সাধিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

আর যাঁহারা আভিজাত্যের অন্ধ অহঙ্কারে ধর্ম্ম ও সাধনাকে নির্ব্বোধের মত ব্যক্তিবিশেষের বা বংশ বিশেষের পৈত্রিক সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন এবং তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ সাধনার অধিকারী নহে—চেষ্টা করিলেও বিফল হইবে, এবং চেষ্টা করাও পাপ—এই অশাস্ত্রীয় নির্লজ্জ' মতবাদ সহায়ে অপরকেও অকুণ্ঠিত চিত্তে "অনধিকারী" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন—তাঁহারাও এই নবযুগের পূণ্যপ্রভাতে এই সকল সাধক সাধিকাকুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ভাবিয়া দেখুন, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের অর্থহীন কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী সহায়ে ভগবানের বিরাট ইচ্ছার গতিরোধ সম্ভব হইবে কি?

(৩)

কয়েকমাস মধ্যেই চাদাম্মার সহায়তায় রাজযোগোক্ত কয়েকটী বিশেষ সাধন আয়ত্ত করিয়া কৃতার্থ হইলেন। ক্রমে যোগজ শক্তির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রহস্য নিচয় উপলব্ধি করিয়া অপার আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সহসা একদিন সিদ্ধকল্পা সাধিকা চাদাম্মা যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন। চাদাম্মার শোকে অধীর হইয়া রঙ্গদাস নির্জ্জনে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী সাংসারিক সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন। বাহ্যজগত বিস্মৃত রঙ্গদাস নির্জ্জনস্থানে গভীরতম সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। আহার নিদ্রা প্রভৃতি জৈবিকধর্ম্ম এককালে পরিত্যাগ করিয়া দেশ কালাতীত-সত্বরে উপলব্ধি আকাঙ্ক্ষায় একাগ্রচিত্তে সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রঙ্গদাসের এই মৌনব্রত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আজকাল অনেক ভিক্ষুক এবং চরিত্রহীন লোক স্বীয় আলস্য ও দুশ্চরিত্রের উপর সন্ন্যাসের আবরণ নিক্ষেপ করিয়া সরলহৃদয় গৃহস্থগণকে ঠকাইয়া উদরান্নের সংস্থান করে। এইরূপে প্রতারিত হইয়া

অনেকে সন্ন্যাসী মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। অতএব আধুনিক কালে অনেকেই রঙ্গদাসকেও যে সন্দেহের চক্ষে দেখিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাধারণ স্থূলদৃষ্টি মানব কেমন করিয়া বুঝিবে এই তরুণ বালক কি মহান উদ্দেশ্য লইয়া মৌনব্রত ও কঠোর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কেমন করিয়া বুঝিবে তাহাদেরই মধ্যে বর্দ্ধিত বালক রঙ্গদাস অতীত যুগের মহাপুরুষগণের প্রায় সেই মায়াতীত ভূমাপুরুষকে উপলব্ধি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সংব্যবহার বা অসদ্ব্যবহার কিছুতেই রঙ্গদাসের চিত্ত বিচলিত হইল না। আত্মতৃপ্ত যোগী, একমাত্র শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। যে একবার ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হইয়া অতীন্দ্রিয় সুখ উপলব্ধি করিয়াছে তাহার সামান্য বাহ্যজগতের নিন্দা প্রশংসা, সুখ, দুঃখ বা দৈহিক অসুবিধার বিষয় ভাবিবার অবসর কোথায়?

স্বীয় জীবনাদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রঙ্গদাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐহিকবাসনাগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার চক্ষে জগত বিলুপ্ত হইল। সরল বিশ্বাসী বালক পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় শ্রীভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং কিছুমাত্র আত্মাভিমান না রাখিয়া সেই মংদিচ্ছায় শুষ্কপত্রের মত চালিত হইতে লাগিলেন। পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইত যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত নির্ব্বিকার তাহারাই অনুসরণ করিতেন। এমন কি বালকগণ পর্য্যন্ত অকারণ তাহাকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করাইয়া কৌতুকানুভব করিত; কণ্টকময় ভূমির উপর দিয়াই—হউক এই উদাসীন, বিগতব্যথ যোগী নির্ব্বিকার চিত্তে ভ্রমণ করিতেন—তাঁহার প্রশান্ত মুখদর্পনে তুষ্ট বা রুষ্ট কোন ভাবই প্রতিফলিত হইত না।

তাঁহার বাহ্যআচরণ সমুহ উন্মত্তবৎ হইলেও কতক লোক তাঁহাকে মহাজ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিল; এবং স্বার্থ সিদ্ধি মানসে নানাপ্রকারে তাঁহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। আবার কেহ তাঁহাকে উন্মত্ত, বিপথগামী সাধু বা ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার সাধুত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যঙ্গ, কৌতুক ও হীনোপায় অবলম্বন করতঃ যন্ত্রনা প্রদান করিতে লাগিল। এই সমস্ত ব্যাপার নিরিক্ষণ করিয়া কয়েকজন ব্যক্তি করুণা পরবশ হইয়া একদিন তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে আনয়ন করিল। শিক্ষক মহাশয়ের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া রঙ্গদাস নীরব হইলেন। সামান্য দুইচারিটী কথাতেই তিনি রঙ্গদাসের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি গোপনে তাঁহাকে বলিলেন "বৎস এইরূপ ভাবে জনসাধারণ তোমাকে বিরক্ত করিলে আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট বিঘ্ন হইবে। এমন কি লোকের অত্যধিক আদর অনেক সময় সাধকের পতনের কারণ হইয়া থাকে, মহামায়ার খেলা—কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। অতএব এরূপ ভাবে যদৃচ্ছবিচরণ না করিয়া কিছুদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সাধন ভজন করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর " রঙ্গদাস শিক্ষক মহাশয়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া পুনরায় গোপনে তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

দুইতিন বৎসরকাল পরে একদিন সত্যই তাঁহার জীবনে শুভদিন সমাগত হইল। দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূত প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার আজন্ম বিকল্পহীন মন সমাধিতে ডুবিয়া গেল। আত্মসমাহিত যোগীর বদন মণ্ডলে চরম পূর্ণানন্দে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। "মূকাস্বাদনবৎ"—এ "আবাঙ্ মনসগোচরম্" অবস্থা বর্ণন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

রঙ্গদাস সমাধিস্থ। দেহ জড় ও নিশ্চল—প্রাণবায়ু অছে কিনা সন্দেহ। ঘটনাক্রমে কয়েকজন লোক তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। রঙ্গাদকে তদবস্থায় দেখিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইঁহারা

পূর্ব্ব হইতেই রঙ্গদাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে এবম্বিধ অবস্থায় দর্শন করিয়া, জীবিত কি মৃত পরীক্ষা করিবার জন্য ডাক্তারের সন্ধানে জনৈক সঙ্গীকে প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষান্তে বলিলেন "ইনি জীবিত, ভয়ের কোন কারণ নাই।" সংবাদ পাইয়া বহুব্যক্তি একত্র তাঁহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। রঙ্গদাসের বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ দেখিয়া অনেকেই অনুমান করিলেন যে যোগীবর সমাধিস্থ হইয়াছেন। অনেকক্ষণ পর তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলণ করিয়া সমবেত জনসঙ্ঘের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। সমাধি অবস্থায় অনুভূত আনন্দ যেন উপযুক্ত ভাষার অভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেছে না!! অবশেষে "দম", "দম" বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। বালকের ন্যায় কলহাস্যে ভূমিতলে লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন! এখন হইতে "দম" "দম" তাঁহার এক বুলি হইল এবং মাঝে মাঝেই উচ্চারণ করিতেন। ঐরহস্যময় শব্দ উচ্চারণ করিবার হেতু কি ইহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য উত্তরকালে উহার ব্যাখ্যা করিয়া একটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিরন্তর যে আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব ইহাই উক্ত সঙ্গীতের প্রতিপাদ্য বিষয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার।

পিঞ্জরের শুক

(অনুবাদ)

যদুনন্দন তব নাম যেবা
করিয়াছে একবার
ভববন্ধনে দুঃখ পাইতে
হয়নাক তারে আর।
তব নাম আমি কোটী কোটী বার
করিগো বিরামহীন
বন্ধন মম দৃঢ় হতে দৃঢ়
হইতেছে নিশিদিন।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রেততত্ত্ব ও পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান।

(১)

(উপক্রমণিকা)

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরেও যে একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে এবং নৈসর্গিক ঘটনা ছাড়াও যে অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে এ সম্বন্ধে মানুষ চিরকালই বিশ্বাসবান। এ বিশ্বাসের মূলে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল কি না তাহা কেহ খোঁজ করিবার চেষ্টা করে না, তাহারা বিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট। প্রায় সব দেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সকল অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্য সমাজ—সভ্য হউক, অসভ্য হউক, উন্নত হউক বা অবনত হউক, সমস্ত সমাজেই এই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে। মানুষের জ্ঞান উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের প্রতি তাহার এই যে বিশ্বাস তাহা তিন ভাব ধারণ করে:—একদল বিনা বিচারে বিনা প্রমাণে সমস্তই সত্য ও সম্ভব বলিয়া মানিয়া লইতেছে; দ্বিতীয় দল প্রমাণ বা সাক্ষ্য সত্ত্বেও এ সব ব্যাপারকে, মস্তিষ্ক-বিকার ও বুদ্ধিভ্রম জনিত গাঁজাখুরী গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে; আর মাঝামাঝি একদল তাঁহারা বিশ্বাসও করেন না, অবিশ্বাসও করেন না—তাঁহারা সন্দেহবাদী। জ্ঞান বা সংস্কার হিসাবে সমস্ত মানুষ কখনো এক পদবীতে দাঁড়াইবে না, কাজেই অল্প বিস্তর এই বিশ্বাসভেদ জন সমাজে থাকিবেই। তবে জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতে এই অবিশ্বাস কমিয়া আসিতে পারে; বাস্তবিকই প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বরাজ্যে কোনো সীমা ভেদ নাই; মানুষের জ্ঞানগ্রাহ্য যাহা তাহাই তার কাছে প্রাকৃত; যাহা তাহার জ্ঞানের অতীত তাহাই তাহার কাছে অতিপ্রাকৃত। কাজেই জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে কালিকার অসম্ভব অপ্রাকৃত আজি যে সম্ভব ও প্রাকৃত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

যত প্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার ঘটে শুনা যায় তার মধ্যে সব-প্রধান কথা জীবাত্মার বিদেহাস্তিত্ব; আত্মা যে মরনান্তে দেহ-মুক্ত হইয়া সজ্ঞানে স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এতদিন কেহ পায় নাই; অথচ সব দেশে সব যুগে সবরকম সমাজে এই মত বলবৎভাবে মান্য হইয়া আসিয়াছে। যাবতীয় ধর্ম্মমতের সব-প্রধান ভিত্তি-ভূমি এই আত্মার বিদেহাস্তিত্ব-বাদ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যদি পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল তবে আর ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি নিষেধের এত বাঁধাবাঁধি মারামারি কেন? এই বিশ্বাসের মূলে কোনো প্রত্যক্ষানুভূতি ছিল কি না তাহা কেহ প্রশ্ন করে না, জানিতেও চায় না; ধর্ম্মপন্থীরা ইহা বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত। তবে অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদী সব দেশেই চিরকাল হইতে আছে। তাঁহারা প্রমানাভাবে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অসিদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দেন। 'প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করিব না' এই ভাবের মধ্যে ভাল ও মন্দ দুই-ই আছে। মন্দ এই যে অনেক সত্যকে আমরা অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হই। আমাদের সসীম পঞ্চেন্দ্রিয়ের বাহিরের কিছু নাই ইহা বলা একরূপ মূঢ়তা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস করিব না বলিলে অনেক জিনিসই বিশ্বাস করা হয় না, অথচ তাহারা খুবই সত্য। আবার 'প্রমাণ না পাইলেও সমস্ত বিশ্বাস করিব' এই ভাব আরো অনিষ্টকর। প্রকৃত জ্ঞানবৃদ্ধির পথে ইহাও অন্তরায়; এই অতিবিশ্বাস প্রবণতার ফলে মিথ্যার বৃদ্ধি হয়; লোকসমাজে নানা অনিষ্ট ঘটে। স্বার্থান্বেষী জুয়াচোরেরা মানুষের এই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় লইয়া নিজ নিজ ইষ্ট সাধন করে; জাতিমাত্রেরই ধর্ম্মজগতে ইহার কুফল উত্তমরূপে প্রকাশমান। মধ্যযুগে কি ভারতবর্ষে

কি ইয়ুরোপে সর্ব্বত্রই এই অন্ধ বিশ্বাসের বিষময় ফল ফলিয়াছিল। মিথ্যা-জ্ঞান ও কুসংস্কারে দেশ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, লোকের চিত্তের বল ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ মাত্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। তন্ত্র মন্ত্র, যাদুবিদ্যা ইন্দ্রজাল অভিচার প্রভৃতি নানারূপ মিথ্যার বাহুল্যে মানুষের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে পশু হইতে তাহার কোনো ভেদ ছিল না। নির্ভীকভাবে সত্য জ্ঞানের আলোচনা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

তার পর যখন বিজ্ঞানের জন্ম হইল তখন এই অতি-প্রাকৃতের উপর জ্ঞানী সত্যানুসন্ধী লোকদিগের একটা বিজাতীয় ঘৃণা দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক সন্দেহবাদী; প্রত্যক্ষ প্রমাণ বা পরোক্ষ অনুমান ব্যতীত সে কোনো ঘটনা বিশ্বাস করিতে রাজী নহে; অন্ধ বিশ্বাস সত্য নির্ণয়ের পক্ষে বাধাজনক, কাজেই বৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাসকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলেন। যা কিছু অতিপ্রাকৃত তাহাই অন্ধ বিশ্বাসের ফলজাত; কাজেই অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বৈজ্ঞানিকের চখে নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য হইয়া পড়িল। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাস কমিতে লাগিল; যে কেহ জ্ঞানাভিমানী বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে চাহিতেন তাঁহার কাজই হইত এই অতিপ্রাকৃতকে বর্জ্জন করা। ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিকের এই সন্দেহবাদ চরমমাত্রায় উঠিল; এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির বাহিরে কিছুই নাই থাকিতে পারে না ইহাই তাহার সম্পূর্ণ উক্তি হইল। অতিপ্রাকৃত ব্যাপার যে ঘোর কুসংস্কার ও মিথ্যা তাহার আর ভুল রহিল না। ঈশ্বর, পরকাল, পূর্ব্ব বা পরজন্মবাদ প্রভৃতি যা কিছু......মানুষের প্রিয় পূর্ব্ব সংস্কার—সমস্তই কুসংস্কারের পর্য্যায়ে পড়িল। জ্ঞানী বলিতে তখন একমাত্র বৈজ্ঞানিককেই বুঝাইত। জড় প্রকৃতির কার্য্য কলাপই একমাত্র তাহাদের আলোচ্য হইল। অন্যান্য অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা উহাদের হেয় ও বর্জ্জনীয় হইয়া পড়িল। এই ভীষণ প্রতিক্রিয়ার মূলে মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাসের মাত্রাধিক্য।

যুগে যুগে মানুষের এই মতি-চাঞ্চল্য সত্ত্বেও প্রকৃতি তাঁর সনাতনী প্রথায় ক্রিয়াশীলা রহিলেন। বিশ্বাস করি বলিয়াই ইহা ঘটিবে বা বিশ্বাস করিব না বলিলেই ইহা ঘটিবে না এ ধারা প্রকৃতির নহে। বৈজ্ঞানিকের এই অবিশ্বাস করা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটিতে লাগিল; যুগে যুগে যেমন ঘটিয়া আসিতেছিল তেমনি ঘটিতে লাগিল; মানুষ যেগুলার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল সে গুলাকে মানিয়া লইল, যে গুলার কারণ দর্শন করিতে পারিল না সে গুলা মিথ্যা ও অসম্ভব মায়া বা মতিভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু সকলের মনস্তত্ব সৌভাগ্য ক্রমে এক ছাঁচে গড়া নয়; অনেক পণ্ডিত সে গুলাকে মানিল না, মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু কেহ কেহ (ইহারা গতানুগতিকী নহেন) চখের উপর দেখিয়া মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না—তাঁহারা সাবধান ও সতর্ক পর্য্যবেক্ষণের ফলে মানিতে বাধ্য হইলেন—"আমাদের জ্ঞান-সীমানার বাহিরেও অনেক সব ঘটনা ঘটিতেছে যাহা আমরা আমাদের গোটাকয়েক জানা নিয়ম দিয়া বুঝিতে পারিতেছি না—ইহাদের কারণ নির্ণয় করা উচিৎ"। ইঁহারা বুঝিলেন যে "There are more things in heaven and earth than are dreamt of in our proud philosophy"।

স্বাধীনচেতা এইরূপ দু একজন সত্য-বন্ধুদের উদ্যোগে প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলি আজ জড় বৈজ্ঞানিকদের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এতকালের "উদ্ভট অতিপ্রাকৃত ব্যাপারগুলা" প্রাকৃত রাজ্যের আমলে আসিয়া নিয়মে ধরা ছোঁয়া দিবার লক্ষণ দেখাইতেছে।

কিরূপে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি এই অতি-শপ্ত বর্জ্জিত প্রদেশের উপর পড়িল তাহা দেখা যাউক। জীবাত্মার অবিনাশিত্বে মানুষের বিশ্বাস যত প্রাচীন প্রেত-তত্ত্বের আলোচনাও সেই পরিমাণে প্রাচীন। এই গুহ্য বিদ্যার আলোচনা প্রায়ই কোনো কোনো গুপ্ত সঙ্ঘ বা সমিতি দ্বারা সাবধানতার সহিত সাধারণের অজ্ঞাতসারে চালিত হইত। সম্প্রদায়ের বাহিরের কেহ বড় ইহাদের কার্য্যকলাপ বা পদ্ধতির খপর রাখিত না।

প্রাচীন রোমক, ইহুদী, মিশর ও ভারতবাসীদের দ্বারা এই বিদ্যার আলোচনা খুবই হইত, এবং উহারা এ বিষয়ে অসম্ভব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। চীন দেশের আধুনিক Taoist সম্প্রদায় এখনো এই বিদ্যার আলোচনা করেন Tylorএর Primitive Culture নামক পুস্তক পড়িলে জানা যায় ভৌতিক ব্যাপার লইয়া আলোচনা, কি সভ্য, অসভ্য সমস্ত জাতির মধ্যেই একটি প্রধান পরা-বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইত।

তারপর বিজ্ঞানের বৃদ্ধি ও প্রভাবের সঙ্গে এ সব আলোচনা......জ্ঞানীর পক্ষে হেয় ও বর্জ্জনীয় কাজ হইয়া দাঁড়াইলে উহা একরূপ লোপ পাইতে বসে। কেবল লোকলোচনের বাহিরে থাকিয়া দু একজন বা দু একটা গুপ্ত সম্প্রদায় লুকাইয়া ইহার আলোচনা করিয়া আসিয়াছে, তবে আধুনিক বিজ্ঞান-পণ্ডিতরা উহাকে ঘৃণিত কুসংস্কার ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতেছিলেন ; এমন সময় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে এমন কতক-গুলা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে যাহাতে করিয়া আধুনিক পণ্ডিতরা প্রেততত্ত্বের দিকে মনোযোগ করিতে বাধ্য হন।

(২) আধুনিক প্রেততত্ত্বালোচনা)

যে ঘটনা হইতে এই আলোচনার প্রথম সূত্রপাত তাহা আমেরিকার অন্তর্গত নিউ ইয়র্ক জেলায় ঘটে। ঐ জনপদে Hydesville নামক গ্রামে John Fox নামক এক ভদ্রলোক বাস করিতেন।

Jhon Foxএর পরিবারবর্গ অল্প ছিল। নিজে, তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা ছাড়া বাড়ীতে আর কেহই বাস করিত না। বড় মেয়েটীর বয়স ছিল পনেরো ও ছোটটীর বয়স বারো বৎসর। এই বাটীতে ঐ সময়ে ভৌতিক কাণ্ড ঘটিতে থাকে। আর কিছু নয় কেবল মাত্র দুপ্ দাপ্ শব্দ। কোথা হইতে কিরূপে এই সব শব্দ হইত কেহ স্থির করিতে পারিত না। অবশেষে স্থির হইল কোন অশরীরী মুক্ত আত্মা কোনো কিছু সংবাদ পাঠাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। এই অনুমান করিয়া বর্ণমালার অক্ষরানুযায়ী শব্দ সংখ্যা স্থির করিয়া মুক্তাত্মার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করা হইল। ফলে জানা গেল যে মুক্তাত্মা জীবিতাবস্থায় একজন ফেরীওয়ালা ছিল। তার মৃত্যুকালে বয়স হইয়াছিল ৩১ বৎসর। তিন কন্যা ও দুই পুত্র রাখিয়া সে মারা যায়। ডাকাতে টাকার জন্য তাহাকে খুন করে। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং শত শত লোক এই ব্যাপার দেখিতে ফক্সের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য বহু বাড়ীতেও এইরূপ ভৌতিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। বহু বৎসর ধরিয়া এই ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিতে থাকে। অবশেষে ফক্সের দুই কন্যার উপর সন্দেহ পড়ে যে উহারা কোন অজ্ঞাত উপায়ে এইরূপ শব্দ উৎপাদন করিত। অনেক চাপা চাপি ও ধরাধরির ফলে একটী কন্যা স্বীকার করে যে তাহার হাঁটু ও পায়ের বুড়া আঙুল হইতে হাড়ের সাহায্যে এই শব্দ করিত। অন্য কন্যাটী ইহাও অস্বীকার করে। মোটের উপর এই ব্যাপারের কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হইল না। Buffalo নগর নিবাসী তিনজন ডাক্তার সাক্ষ্য দেন যে বালিকার দুটি হাঁটু ও আঙুল চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে আর শব্দ হইত না। কিন্তু কিছুদিন পরে বিলাতের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ক্রুক্স (Crookes) D. D. Home নামক এক মিডিয়মকে লইয়া ও পদার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সার অলিভার লজ ইটালী দেশীয় ইউসোপিয়া প্যালাডিনো নামক অন্য এক মিডিয়মকে লইয়া যে সব পরীক্ষা করেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে কোনো কোনো বিশেষরূপ শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অলৌকিক উপায়ে এইরূপ শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং এ সম্বন্ধে জোর করিয়া 'হাঁ' বা 'না' বলা বড় কঠিন। পাশ্চাত্য চিৎ-তত্ত্বানুসন্ধান সমিতির (S. P. R.) অন্যতম সভ্য আরমার হিল্ বলেন যে তাঁর এক বন্ধু হঠাৎ বাড়ীর বাহির দেওয়ালে কতকগুলা প্রবল অস্বাভাবিক শব্দ শুনিতে পান। সে বাড়ীতে তৎকালে কোনো লোকই ছিল না, এবং নিকটে অন্য কোনো বাড়ীই ছিল না। তাঁর বন্ধু ইহাতে যার পর নাই ভীত হন। পরে খপর আসিল যে তাঁর এক প্রিয় ভ্রাতা দুর্দৈব ক্রমে হত হন। শব্দ শুনিতে পাওয়ার ২০ মিনিট পূর্ব্বে

ভ্রাতার মৃত্যু ঘটে। বহু বিশস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এইরূপ অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সহজে কোনো মতামত প্রকাশ করা অসমীচীন।

আর এক শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনা দেখা দিয়ে থাকে। অলৌকিক উপায়ে ভারযুক্ত জড়পদার্থের ইতঃস্ততঃ সঞ্চালন, দ্রব্যাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি এই শ্রেণীর ঘটনা।—ইহাদের অধিকাংশই অন্ধকার ঘরে মিডিয়মকে (মধ্যস্থ বা ভূতাবিষ্টকে) অবলম্বন করিয়া সম্পন্ন হইত। অধিকাংশই যে জুয়াচুরী, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা যোগে সমাধা হইত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তথাপি কতকগুলা ব্যাপার এমনি অসম্ভব উপায়ে ঘটিতে লাগিল, যে চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির পণ্ডিত সভ্যরা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কারণানুসন্ধানের জন্য নেপল্‌স্ সহরে ইউসোপিয়া প্যালাডিনোকে 'মধ্যস্থ' (medium) করিয়া অনেকগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায় প্রবঞ্চনা প্রতারণার পথ যতরকম উপায়ে সম্ভব বন্ধ করিলেন। পরীক্ষকদের মধ্যে তিনজন যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজীর সমস্ত গুপ্ত তন্ত্র মন্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন, কাজেই কৌশলে তাঁহাদের চক্ষে ধুলা দেওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। এত সাবধানতা ও সতর্কতা সত্ত্বেও তাঁহারা তৎকালীন দ্রব্যাদির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব, তিরোভাব ও স্থানচ্যুতি সম্বন্ধে কোনো কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না, এবং এগুলি যে কোনো অজানিত অলৌকিক উপায়ে ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই পরীক্ষাগুলির যথাযথ বর্ণনা চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণীর ২৩ সংখ্যক ভলুমে ৩০৬ পৃষ্ঠা হইতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাঠকবর্গ উহা পড়িয়া সমস্তই জানিতে পারিবেন।

ভৌতিক শব্দ বা দ্রব্যাদির আবির্ভাব, তিরোভাব বা সঞ্চালন এগুলি হইল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার। এ ছাড়া কতকগুলি 'আত্মিক' (psychic) ব্যাপার আছে যাহা হইতে আমরা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতের প্রকৃষ্টতর আর একটা আভাষ পাই। এতদুপলক্ষে মেস্‌মার ও সুইডেনবর্গের নাম উল্লেখ যোগ্য।

ফ্রেডরিক আণ্টন মেসমার (১৭৩৪—১৮১৫) ভায়েনা নগরীর এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। ইনিই সুবিখ্যাত 'মোহবিদ্যার' (mesmerism বা Hypnotism) প্রচারক। প্যারী নগরীতে ইনি রোগীকে মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়া তাহার রোগ চিকিৎসা আরম্ভ করেন। তাঁহার "নবচিকিৎসা বিধান' সাফল্য গুণে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু গুণী জ্ঞানী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চিকিৎসার বিশেষত্ব এই ছিল যে মুগ্ধাবস্থায় রোগী তাহার নিজের ব্যাধির কারণ নির্ণয় করিয়া নিজেরই প্রতীকার ব্যবস্থা নিজেই করিত। এই নবচিকিৎসা বিধানের প্রতিপত্তি এতই বাড়িয়া উঠিল যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত আমেরিকা ও ইয়ুরোপে বহু সংখ্যক লোক এই পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া রোগ চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মোহাবস্থায় মুগ্ধ ব্যক্তির জাগ্রত চৈতন্য সুপ্ত হইয়া যায় ও তাহার সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হইয়া উঠে এবং তদবস্থায় তাহার অস্বাভাবিক অন্তঃশক্তি বিকাশ লাভ করে; দূরদৃষ্টি, দূরাগত শব্দ শ্রবণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ জানিবার ক্ষমতা, স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধির প্রাখর্য্য সমস্তই অলৌকিক উপায়ে বাড়িয়া উঠে—এক কথায় তাহার অতীন্দ্রিয় বিষয় অবগত হইবার ক্ষমতা জাগিয়া উঠে। মেসমেরিজ্‌ম্ বা হিপনটিজমের অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ দেখেন নাই বা শুনেন নাই, এমন লোক খুবই কম আছেন।

সুবিখ্যাত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইমান্যুয়েল সুইডেনবর্গ ১৬৮৮ হইতে ১৭৮২ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিয়া এবং নানা ভাবে দেশের ও রাজ্যের সেবা করিয়া তিনি লোক সমাজে গণ্যমান্য হন। শেষ বয়সে তাঁহার অলৌকিক শক্তির হঠাৎ বিকাশ হয়। সময়ে সময়ে তাঁহার আপনা হইতে সমাধির মত অবস্থা হইত। এই অবস্থায় তিনি অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞানের পরিচয় দিতেন। তদবস্থায় তিনি যে সব বিষয়ে কথা

বলিতেন তাহাতে বুঝা যাইত তিনি অসংখ্য মৃত মহাপুরুষদের আত্মার সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতেন। বহু বহু রাজা, দার্শনিক, সাধু সন্ন্যাসী, পণ্ডিত ক্যালভিন, লুথার, সিসিরো, পল, মুসা প্রভৃতির মুক্তাত্মা তাঁহার কাছে দেখা দিতেন, তাঁহাকে উপদেশ দিতেন ও নানা অদ্ভুত তত্ত্বের সন্ধান দিতেন। এই অবস্থায় তাঁহার আর এক অদ্ভুত শক্তি জাগিয়া উঠিত। তাঁহার হাত দিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে নানা সদালাপ ও সাধু উক্তি, পরকাল সম্বন্ধীয় নানা সংবাদ লেখার আকারে বাহির হইত। এই সব অলৌকিক আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল পরকালতত্ত্ব। ইহাঁর প্রণীত 'Heaven and Hell' নামক পুস্তক পড়িলে এই সব বিষয়ের আভাষ ভালই পাওয়া যায়। তৎকালে সুইডেনবর্গের অলৌকিক শক্তির প্রভাব বড় কম হয় নাই। জ্ঞান জগতে ইহাঁর যশ নাম ও প্রতিপত্তি এত উচ্চে ছিল যে তৎকালিন মহা পণ্ডিতরাও তাঁহার উক্তি গুলিকে অগ্রাহ্য বা অবিশ্বাস করিতে পারিতন না। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক Kant এরূপ মাত্রায় সুইডেনবর্গের প্রভাবে পড়েন যে শেষ দিকে তাঁহার দর্শন মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়। Kant তাঁহার শাস্ত্র হইতে অতীন্দ্রিয় সত্ত্বাকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় যাহা ধরিতে ছুঁইতে পারেনা তাহার অস্তিত্ব যে আছে বা থাকিতে পারে তাহা তিনি মানিতে চাহেন নাই; কিন্তু সুইডেনবর্গের অদ্ভুত অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পাইয়া তিনি পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করেন।

এই সময়ে ইয়ুরোপের ধর্ম্ম রাজনীতি ও সমাজ জগতে নানারূপ আন্দোলন হইতে থাকে সবগুলির সমবেত ফলে এবং সুইডেনবর্গের অলৌকিক অভিজ্ঞতার সহায়তা পাইয়া জনসমাজে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবল আলোচনা চলিতে থাকে। তৎকালে Telepathy (ভোগ চালনা) বা subliminial consciousness (সুপ্ত চৈতন্য বাদ) প্রভৃতির তত্ত্ব জানা না থাকায় জন সাধারণ এসব ব্যাপার দেহমুক্ত প্রেতাত্মারই কৃত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল।

তারপর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিক নিবাসী বিখ্যাত মধ্যস্থ (medium) D. D. Home বিলাতে আসিয়া নিজ অতীন্দ্রিয় শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়া তদানীন্তন পণ্ডিত বর্গকে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে মনোযোগী হইতে বাধ্য করেন। ব্যবসাদার ভুতুড়েরা যে সব কৃত্রিম মিডিয়ম খাড়া করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা রোজগার করিত D. D. Home সেরূপ লোক ছিলন না। অবিশ্বাসী বা সন্দেহবাদী বিজ্ঞানপণ্ডিতরাও Home এর সততা এবং তৎঘটিত ঘটনার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন নাই; এ মত তাঁদের বহু পরীক্ষার ফল।

D. D. Home কেবল মাত্র সাধু উদ্দেশ্য লইয়া সমস্ত ইয়ুরোপের রাজন্য সমাজে, পণ্ডিতসমাজে ও জনসাধারণের নিজশক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি অর্থের প্রত্যাশী ছিলেন না, কেহ অর্থ দিতে গেলে লইতেন না, তবে রাজা রাজড়া বা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপহার দিলে অস্বীকার করিতেন না। কেহ কখনো তাঁহাকে কোনো প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিতে দেখেন নাই। বিখ্যাত কবি Browning "Sludge the Medium," নামক পদ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু কবিবর F. W. H. Myersএর কাছে নিভৃতালাপে স্বীকার করেন যে Home কে তিনি ফাঁকি জুয়াচুরী করিতে দেখেন নাই। Home এর অলৌকিক শক্তি খুবই বিচিত্র প্রকারের ছিল। যে সব লোক Homeকে মধ্যস্থ করিয়া পরলোক সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, Home তাহাদেরই মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন এবং এমন সব সংবাদ বহন করিতেন যাহাতে ঐসব মুক্তাত্মার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ হইতে পারিত না। হোমকে লইয়া যাঁহারা এইরূপ পরীক্ষা করিয়া মুক্তাত্মাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ পান তাহাদের মধ্যে Earl of Dunraven, Dr. Garth Wilkin son ও Dr. Gullyর নাম উল্লেখ যোগ্য। মোহাবস্থায় Home ধর্ম্ম ও পরকাল সম্বন্ধীয় অনেক সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু Home এর বিশেষত্ব ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক ব্যাপারের সংঘটনে। হোমের উপস্থিতিতে

জড়বস্তুর অলৌকিক উপায়ে স্থানচ্যুতি, আবির্ভাব তিরোভাব ঘটিত আপনা হইতে চেয়ার টেবিল শূন্যে উঠিত; টুল গুলা মেজের উপর দিয়া যেন নাচিতে নাচিতে চলিত, ফুলদানি হইতে ফুলের তোড়া আপনা হইতে উঠিয়া দর্শকদের মধ্যে বিতরিত হইত। যাঁহারা স্বচক্ষে এই সব ব্যাপার দেখিয়াছেন তাঁহারা এমন লোক যে তাঁদের কথা অবিশ্বাস কোনো-মতেই হইতে পারে না। ইহাঁদের মধ্যে Royal Societyর অন্যতম সভ্য, মহামনীষী বিজ্ঞানাচার্য্য পণ্ডিতবর ক্রুকস একজন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষন বিষয়ে ক্রুকস যে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করেন তাহা বিজ্ঞান জগতে সকলেরই ভাল জানা আছে; কাজেই এরূপ সাবধানী ব্যক্তিকে ঠকানো বড় সহজ কথা নহে। এই সকল অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে ক্রুকস সন্দেহ করেন না; কিরূপে যে তাহা ঘটিল তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না; তবে তাঁহার মতে এটা ঠিক্‌ যে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বা জানিত কোন নিয়মে বা আইনে ইহাদের কোনো ব্যাখ্যাই হয় না ইহা ভৌতিক কাণ্ড কিনা তাহা তিনি খোলসা করিয়া বলেন নাই। ১৮৮৬ খৃঃঅব্দে হোম্‌ পরকাল প্রাপ্ত হন। হোম্‌ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ছিলেন।

আধুনিক প্রেততত্ত্বালোচনার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য চতুর্থনাম রেভারেণ্ড ষ্টেন্‌টন্‌ মোজেস্‌। ইঁহার কার্য্য কলাপ ও জীবনী হোমের অপেক্ষা আরো আশ্চর্য্যকর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৬০ খৃঃঅব্দে ইনি অক্সফোর্ড কলেজ হইতে বি, এ ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৮৬৩ হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত পাদরীর পদে নিযুক্ত থাকেন ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইনি ওয়েন সাহেবের Debatable land নামক প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়িয়া তদ্বিষয়ে নিবিষ্ট চিত্ত হন। হোম্‌ এবং অন্যান্য মিডিয়মকে লইয়া অনেক পরীক্ষা করেন। তারপর ইনি নিজে মিডিয়ম শক্তি লাভ করেন। এই শক্তি প্রথমে জড়দ্রব্য সঞ্চালনে প্রকাশিত হয়, তারপর ইঁহার স্বতঃলিখন শক্তির (automatic writing) বিকাশ হয়। British National Association of spiritualists স্থাপনে ইনি সহায়তা করেন, এবং পরে Psychical R. Societyর সভ্য হন। শেষোক্ত সমিতির সভ্যগণের আত্যন্তিক সন্দিগ্ধতায় ইনি ইহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। ইহার পর London Spiritual Alliance এর (President) সভাপতিপদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৯২ খৃঃঅব্দে দেহত্যাগ করেন। বহু বৎসর ধরিয়া ইনি Light নামক প্রেততত্ত্বপত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

মোজেস্‌ হোমের মত ব্যবসাদার প্রেততাত্ত্বিক medium ছিলেন না। অনেক বিষয়ে তিনি হোমের অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর প্রেততাত্ত্বিক ছিলেন। জন সাধারণের মধ্যে নাম যশ বিস্তারের চেষ্টা তাঁহার ছিল না। তিনি প্রায়ই নিজ বন্ধুদের লইয়া বৈঠক করিতেন (Sat in a Seance)। তিনি নির্জ্জন-প্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহার মতিগতি, আচার ব্যবহার সর্ব্বজন প্রিয় ছিল। যাঁহারা তাঁকে উত্তমভাবে জানিতেন তাঁহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে মোজাস্‌কে খুব উচ্চ চরিত্রের লোক বলিয়া ধারণা হয়। কেহ তাঁহাকে কখনো কোনো প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিতে দেখেন নাই। তাঁহার 'ভরাবস্থায়' যে সব অদ্ভুত কার্য্য কলাপ ঘটিত তাহা বিশ্বাস করার কঠিনতা ছাড়া আর কোনো বাধা দেখা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে এই অজ্ঞাত রাজ্যের ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে ক্রমশঃই লোকের জ্ঞান বাড়িলে হয়তো এই সব আপাতঃ অসম্ভব ঘটনার সন্তোষকর ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে।

প্রেততত্ত্বের আলোচকদিগের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা উপস্থিত অসম্ভব। সমস্ত দেশে এতজ্জাতীয় সভা সমিতির সংখ্যা বড় কম নয়। ইহাঁরা যে সব medium লইয়া বৈঠক করেন তাহাদের মধ্যস্থতায় পরলোকগত মুক্তাত্মা-দের সম্বন্ধে যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহা কোনো কোনো স্থলে এমন প্রামাণিক যে তাহাতে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। শ্রীযুত জন্‌ আরথার ছিল একটী মিডিয়ম সম্বন্ধে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মিডিয়মের প্রেতালাপ করণশক্তি আশ্চর্য্য রকমের। যে সব মুক্তাত্মার সহিত ইঁহার কারবার হইত তাহাদের আকার প্রকার, স্বভাব ও পার্থিব জীবনের পরিচয় এমনি নিখুঁতভাবে দিত যে সে সব প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। Chance coincidence অর্থাৎ দৈবের মিল্ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। অবশ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বুঝাইতে প্রেতের অস্তিত্ব যে মানিতেই হইবে তার কোনো মানে নাই। Telepathy বা ভাব চালনার দ্বারাও ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে তবে ইহা স্থির যে এই সব ব্যাপারে উক্ত মিডিয়ম যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিত তাহা জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কোনো নিয়মের অধীন নহে।

ফরাসী ও জারমান্ দেশেও আধুনিক প্রেততত্ত্বের আলোচনা বড় কম নহে। কিন্তু ইটালী দেশে বিখ্যাত মিডিয়ম Eusapia palladion কে লইয়া ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান পণ্ডিতরা যে সব পরীক্ষা চালাইয়াছিলেন তাহা ষ্টেনটন্, মোজেসের কার্য্যকলাপের পরই বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। আচার্য্য Lombroso, Shiaparell, Merselli, Richet এবং Oliver Lodge প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতরা উক্ত মিডিয়মের কার্য্যকলাপের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন, তবে কারণ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উঁহাদের মধ্যে মত ভেদ থাকিতে পারে।

পৃথিবীর অপরাপর দেশেও প্রেততত্ত্বের আলোচনা কম বেশী সমানে চলিতেছে। আর্জেন্টিনা, স্পেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, রাশিয়া ও অষ্ট্রীলিয়াতে নানা সভা সমিতি এই তত্ত্বের আলোচনায় নিযুক্ত। তবে ইংলণ্ড আমেরিকা ও ফ্রান্স দেশে ইহার আলোচনা অপেক্ষাকৃত সমধিক প্রবল। দুর্ভাগ্যক্রমে অলৌকিক তত্ত্ব ও প্রেততত্ত্বের আলোচনা ভারতবর্ষের বহু প্রাচীন নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেরূপ কোনো আলোচনা হইতেছে না। এ কেবল ভারতবাসীর উপস্থিত জ্ঞান বিমুখতা ও জাড্যের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে'।

আধুনিক প্রেততত্ত্বের শিক্ষণীয় ও আলোচ্য বিষয় মোটামুটী হইতেছে যে জীবাত্মা দেহাতিরিক্ত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, এবং মুক্তাত্মার পারলৌকিক জীবন ইহলৌকিক জীবন হইতে বিশেষ তফাৎ নয়। প্রেতের পারলৌকিক জীবন যাপন প্রণালী অনেকটা ইহ জীবনের ধরণে। মৃত্যুর পর জীবাত্মার কাজকর্ম্ম আচার ব্যবহার একটা উচ্চতর লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চলিতে থাকে; এবং পারলৌকিক অবস্থার উন্নতি অবনতি ইহজীবনের কাজকর্ম্মের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। পুণ্যবান ইহজীবনের ফল পারলৌকিক সুখ ও ক্রমোন্নতি; আর পাপময় ইহজীবনের ফল পরলোকে দুঃখ ও অবনতির সূচক। দর্শন ও নীতির দিক দিয়া এই পরলোকবাদ বড় কম উপকারপ্রদ নহে। ভারতবর্ষীয় সনাতন কর্ম্মবাদ এই নীতিরই অনুযায়ী। ইহজীবনে যে যে যেরূপ কাজ করিবে পর জীবনে সে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিবে, এই বিশ্বাস জীবের অন্তরে প্রবল হইলে ইহ জীবনের নৈতিক উন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থানীয় হয়। ইহকালের সহিত পরকালের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহা কর্ম্মীর অন্তরে একটা গভীর শান্তি ও মনোরম সান্তনার সঞ্চারক দেহমুক্ত জীবাত্মার দেহান্তে। যে পৃথিবীর সহিত সমস্ত বন্ধনচ্ছেদ করেন না, বরং ইহলোকবাসী প্রিয়জনদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও উন্নতির জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট এই বিশ্বাস কিরূপ পরিমাণ মনে নৈতিক বল ও ভরসা সঞ্চার করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত Home. Stainton Moses 'Ensahia pallano প্রভৃতি medium দের অং কার্য্যকলাপ স্বচক্ষে দেখবার পর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ের সত্য নির্ণয়ের জন্য একটা সাধু চেষ্টা দেখা দিল। এ ছাড়া এতদ্বিষয়ে নানা মাসিক পত্রে ও পুস্তকে যে সব ঘটনার বিবরণী প্রকাশিত হয় তাহাও এই সাধুচেষ্টাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে। ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত Profassor sidguick প্রকাশ্য ভাবে বলেন যে এত প্রমাণ সত্বেও এইসব অলৌকিক ব্যাপারের কারনানুসন্ধানে আধুনিক জড়বিজ্ঞান যদি অমনোযোগী হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের পক্ষে সেটা দুরপনেয় কলঙ্কের কথা। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আর

সত্যের উপাসক; অসার মতের সেবক নহেন। মতের খাতিরে সত্যের আলাপ কদাপি বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং এমন একটা বিজ্ঞান সমিতির প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার যাহার লক্ষ্য হইবে এই অজ্ঞাত রাজ্যের সত্যসন্ধান। এই হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। আচার্য্য Banet Sidgwick, F. W. H. Myers Edmund Gurny St. Moses এবং অপর কয়জন প্রেৎতত্ত্ববিদের সাহায্যে এই সমিতির স্থাপন হয়। সমিতির উদ্দেশ্য হইল... তর্কশাস্ত্রানুযায়ী প্রমাণসংযোগে সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে চুড়ান্ত রকমে প্রমাণিত না হইলে কোনো তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গণ্য করা হইবে না। এ ব্যাপারে আপ্তবাক্যের কোন স্থান নাই, অনুমাণেরও নয়, কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণ গণ্য ও মান্য হইবে। প্রমাণ সম্বন্ধে এই ধরাবাঁধাকে লক্ষ্য করিয়া Times পত্রিকার কোন লেখক বলেন:—"The standard on evidence required by Psychical Researchers is about five times stricter than that required to hang a man for murder; Mr Padmore's standard is several degree stricter than that," অর্থাৎ এই সভার সমিতির সভ্যরা কোনো অলৌকিক কাণ্ডকে সত্য বা সম্ভব বলিয়া গ্রাহ্য করিবার জন্য এমন প্রমাণ চান যা খুনে আসামীকে ফাঁসি দেবার জন্য প্রমাণের চেয়ে পাঁচগুণ কড়া; আর মিঃ পড্‌মোরের মত সভ্যের মনোমত প্রমাণ তার চেয়েও বহুগুণে কড়া।

সন্দিগ্ধতার এইরূপ অতিমাত্রায় ও প্রমাণ বিষয়ে এত কড়াকড়ি দেখিয়া...ষ্টেনটন মোজেস্ ও তাঁহার সঙ্গীরা বিরক্ত হইয়া সমিতির সহিত সব সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন এমন কি Alfred Russel Wallace এর মত প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী মহাবৈজ্ঞানিকও...এরূপ প্রয়োজনীয় কড়াকড়িতে বিরক্ত হইয়া দলছাড়া হইয়া যান। এই কারণেই মৃত মহাত্মা Stead সাহেবও এই সমিতির প্রতি বিরক্ত হন। কিন্তু সত্যানুযায়ী জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানই সার; লোকের মতামত সন্তোষ অসন্তোষ কিছুই নহে। যাই হোক্ সত্যই শেষে সর্ব্বজয়ী। এত কড়াকড়ি ধরাবাঁধা সন্দেহ অবিশ্বাস সমস্ত ঠেলিয়া...মরণান্তে জীবাত্মার অস্তিত্ব রূপ সত্য প্রতিভাত হইয়াছে। Dublin এর Royal college of Science এর প্রধান অধ্যাপক W. Barret সব প্রথম Telepathy বা ভাবচালনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষার ফল সমিতির আলোচ্যবিষয় রূপে পাঠাইয়া দেন। এই হইল সমিতির পরীক্ষা ও প্রেক্ষণের সূত্রপাত।

ভাব চালনা (thought transference); মোহনিদ্রা (hypnotism) ভৌতিক কাণ্ড, স্বতঃ লিখন (automatic writing) স্বতঃ কথন, (automatic Speaking) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয় শ্রুতি সত্যস্বপ্ন, প্রাকদর্শন, প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই সকল পরীক্ষার আমূল বর্ণনা ও ফলাফল এই সভার ২৫ খানি বাৎসরিক বিবরণী ও ১৫ খানি জর্ণালে (পত্রিকায়) প্রকাশিত হইয়াছে। সভার বার্ষিক অধিবেশনীতে যে সকল জগন্মান্য মনীষি পণ্ডিতরা সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পণ্ডিতদের নাম উল্লেখ যোগ্য। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী A. J. Balfour, G. W. Balfour; দার্শনিক প্রবর Henri Bergson; Bishop Carpenter; রসায়নাচার্য্য Sir W. Crookes, মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত W. James; Andrew Lang; পদার্থ-তত্ত্ববিৎ, Oliver Lodge ও Lord Raleigh; F. W. H. Myers বিজ্ঞানাচার্য্য W. F. Barrett, দর্শনাচার্য্য Sidgwick ও তাঁহার বিদুষী পত্নী শ্রীমতী Sidgwick; এই সভার সভ্যদের মধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সাহিত্যিক, ও বৈজ্ঞানিকদের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমিতি-সমিতি মাত্র; সম্প্রদায় নহে; কাজেই ইহার সভ্যরা কোন এক ধরাবাঁধা ধর্ম্মমতের অধীন নহেন। সভ্যদের মধ্যে অতি-বিশ্বাসী প্রেততত্ত্ববিৎ হইতে সন্দেহবাদী নাস্তিক Dr. Bramwell পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। যদিও সভার প্রধান লক্ষ্য এই সব ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়, অর্ব্বাচীনমত গঠন নহে,—তথাপি এতদিনের

পরীক্ষা পর্য্যালোচনার ফলে উহাদের মধ্যে মত সম্বন্ধে দুইটি দল দেখা যায়। অধিক সংখ্যক সভ্যেরা Telepathy'র (ভাব চালনা) সত্যতা সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিত। অপর দলটী সংখ্যায় বলবান না হইলেও এই মত পোষণ করিতে অকুণ্ঠিত নহেন যে এই সব অলৌকিক ব্যাপার যে খুব সম্ভবতঃ কোন এক অজ্ঞাত অশরীরী স্বতন্ত্র দেহমুক্ত চৈতন্য শক্তির কাজ তৎপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের সংখ্যা বেশী না হইলেও এই মতাবলম্বীদের মধ্যে বর্ত্তমান স্বনামধন্য বহু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা এই মতপক্ষে যে সব প্রমাণ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রায় সমস্তই শ্রীমতী Piper নাম্নী এক মার্কিন মিডিয়মের সাহায্যে প্রাপ্ত।

শ্রীমতী Piper একজন "স্বভাব মিডিয়ম"—অর্থাৎ আপনা হইতেই তাঁহার 'ভাব' বা 'ভর' পাওয়া অবস্থা ঘটে। অনেক মিডিয়মকে বাহ্য প্রক্রিয়ার বলে মোহাবস্থায় আনিতে হয়, তার পর তাহার উপর "ভর' হয়; কোনো কোনো মিডিয়ম্ (মধ্যস্থ) আপনা হইতেই এই মোহ প্রাপ্ত হয় এবং তার পর উহার উপর প্রেতের 'ভর' হয়। Mrs. Piper এই শেষোক্ত শ্রেণীর midium। মোহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাঁহার অলৌকিক বাক্‌শক্তি বা হাত চালা শক্তি দেখা দেয়; এই সময়ে হাতে কলম বা পেনসিল দিলে, নানারূপ অলৌকিক কথা বিধিবদ্ধ হয়। ইহাকে ভূতাবেশ বলা যাইতে পারে। সত্যই কোনো দেহমুক্ত আত্মার ভর হয় কিনা বলা কঠিন। তবে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই অবস্থায় Mrs. Piper যে শক্তির পরিচয় দেন তাহা কোনো অলৌকিক স্বতন্ত্র জাতীয় জ্ঞানময় বুদ্ধিশক্তি। কারণ Mis. Piper যে জ্ঞানের পরিচয় দেন তাহা তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি চৈতন্যের বাহিরের জ্ঞান। Mrs. Piper এর প্রথম অবস্থায় জর্জ্জ পেলহাম নামধারী এক অশরীরী শক্তির ভর হইত। এই শক্তি জীবিতকালে এক উকীল ছিলেন এবং সভার মার্কীন সভ্য Dr Hodgson এর পরিচিত বন্ধু ছিলেন। উক্ত মুক্তাত্মা জর্জ্জ পেলহামেরই আত্মা কিনা ইহা স্থির করিতে Hodgson বহু পরীক্ষা করেন এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রায় ১২০ জন ভিন্ন ভিন্ন লোককে Mrs Piper এর সহিত সংবাদ গ্রাহী (sitter) রূপে নিযুক্ত করেন। এই ১২০ জনের ২৯ জন পেলহামের জীবিতকালের পরিচিত ছিল। সকলকেই ছদ্মবেশে গুপ্তনামে পরীক্ষা গৃহে আনানো হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পেলহাম-আত্মা প্রত্যেক 'আসনে' উহাদিগকে চিনিতে পারেন, উহাদের নাম ধরিয়া ডাকেন ও উহাদের সম্বন্ধে নানা গোপনীয় প্রামাণিক সংবাদ প্রকাশ করেন। বাকী ৯১ জন সম্বন্ধে Pelham কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করেন না। আলাপীদের মধ্যে যার সঙ্গে যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, যাকে যে ভাবে যে কথায় পেলহাম সম্বোধন করিতেন, ঠিক সেই ভাবে সেই পরিচিত সুরে ও কথায় সম্বোধন করেন।

এই উপলক্ষে একটা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। উক্ত পরিচিত ২৮ জনের মধ্যে একটী যুবতী ছিলেন। ইনি পেলহামের পরিচিত হইলেও পরীক্ষা কালে পেলহাম তাকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই। তার কারণ পেলহাম তাঁকে বালিকা বয়সে দেখিয়াছিলেন। এই পরীক্ষা প্রথম পরিচয়ের আটবৎসর পরে হয়। বালিকা যুবতীতে পরিণত হওয়ায় অনেকটা দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কাজেই সহসা চিনিতে না পারায় আশ্চর্য্য হইবার নহে। Dr. Hodgson যখন ইঙ্গিত করিয়া Pelham কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি Mrs Warner কে মনে করিতে পারিতেছনা?" উত্তরে পেলহাম তৎক্ষণাৎ যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি Mrs Warner এর কন্যা?" Mrs. Warner পেলহামের পরিচিত বন্ধু ছিলেন। Pelham তারপরেই Hodgsonকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওঁকে জিজ্ঞাসা করতো আমি যে ওঁকে এক বই দিয়ে ছিলাম তা ওঁর মনে আছে কিনা?" এছাড়া Pelham যুবতীকে আরো অনেক পুরাণো পরিচিত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন; Mrs Warner ও তাঁর আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধেও অনেক খপরাখপর করেন। সভার বিবরণীর

২৩ সংখ্যক তল্যুমে ইহার বিবরণ আছে। জীব আত্মার দেহাতিরিক্ত সত্বা সম্বন্ধে এই ঘটনাটী অনেকটা প্রামাণিক। যদি Telepathy দিয়া এই ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে যুবতীর পরিচয় সম্বন্ধে Pelhamএর এই স্মৃতিভ্রংশ ঘটিত না; অপর ২৮ জনের পরিচয় যেমন ভাবে ঘটিয়াছিল, ইঁহারও পরিচয় তেমনি ভাবেই ঘটা উচিৎ ছিল। শুধু তাই নয় পরীক্ষিত ১২০ জনেরই পরিচয় প্রদান মিডিয়মের পক্ষে সহজও সম্ভব পুরামাত্রায় হইত। আসীন ব্যক্তির (Sitter অন্তরস্থ ভাব বুঝিতে বা ধরিতে পারার পক্ষে পূর্ব্বপরিচয় অপরিচয়ের কোনো সার্থকতা থাকিতে পারে না। 'আসীন' ১২০ জনের মধ্যে কার কার সঙ্গে দেহী পেলহামের পরিচয় ছিল তাহা Mrs. Piper এর অপর চৈতন্ত কেমন করিয়া জানিতে পারিল? বিশেষতঃ যখন Piper এর সহিত দেহী-Pelham এর কোনো ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না। জীবিতকালে Pelham কেবল একবার Mrs. Piper কে ক্ষণিকের জন্ত দেখিয়াছিলেন মাত্র।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার প্রথম দিকে হজ্‌সন সাহেব এই সব ঘটনায় অলৌকিকত্ব অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখিতে আরম্ভ করেন। এমন কি এ গুলা যে প্রতারণা মূলক এই ধারণা তাঁহার মনে জন্মে, এবং তাঁর সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা এই ফাঁকি ধরিবার জন্ত নিয়োজিত হইল। কিন্তু প্রাণপন যত্ন ও চেষ্টা সত্বেও তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না; চোখের উপর এমন সব ঘটনা আশ্চর্য্যভাবে ঘটিতে লাগিল যে তিনি হার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বহুক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদিগকে ছদ্মবেশে ও ছদ্ম নামে Mrs. Piper এর বৈঠকে আনিয়াছিলেন; তৎসত্বেও এমন সব প্রামাণিক কথা ও কাহিনী Mrs. Piper এর স্বতঃ কথনেও হাতের স্বতঃ লিখনে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে হজসনকে স্বীকার করিতে হইল অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত বলিয়া একটা কিছু আছে। Mrs. Piper ও তাঁহার স্বামীর গতিবিধি কাজ কর্ম্ম গোপনে লক্ষ্য করিবার জন্ত হজসন কয়েকজন দক্ষ ডিটেকটিভ্‌ নিযুক্ত করেন; তাহারা কয়েক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত চেষ্টাতেও উহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কিছুই পাইল না। ইতিমধ্যে মৃত ব্যক্তির জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক প্রামাণিক সংবাদ জুটিতে লাগিল; অবশেষে হজসন সাহেব সিদ্ধান্ত করিলেন যে এই সব অলৌকিক ব্যাপার মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মারই কার্য্য এই অনুমানেই সমধিক সঙ্গত সমাধান। কিন্তু এরূপ অনুমান সত্বেও তিনি খাঁটী প্রেততত্ত্ববিৎ বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না; কারণ এত সত্বেও তিনি জড়দ্রব্যের স্বতঃ সঞ্চালন, বা প্রেতের মূর্ত্তিধারণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। এমন কি অন্যান্য সভ্যদের কৃত পরীক্ষার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন; অন্য কোনো মিডিয়ম তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিল না; কেবল Mrs Piper এর অলৌকিক শক্তির সত্যতা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

মিসেস্ টম্‌সন আর একজন এই শ্রেণীর মিডিয়ম। পয়সা রোজগারের জন্য নিজের শক্তি ব্যবহার করিতেন না। Sir William crookes, Sir Oliver Lodge Professor Sidgwick ও Myers প্রভৃতি ইহাকে লইয়া বহু পরীক্ষা করেন পরীক্ষালব্ধ ফল প্রায়ই খুব বেশী রকমের সন্তোষজনক। একদা Mrs B—নাম্নী এক প্রেত Mrs. Thomson এর মুখ দিয়া নিজের পার্থিব জীবনের অনেক আশ্চর্য্যকর ঘটনা উল্লেখ করে। অনুসন্ধানে সমস্তই নিখুঁৎ সত্য বলিয়া স্থির হয়। এই উপলক্ষে Mrs. B তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য সাক্ষ্য দান করে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে Mrs. B একটা নুতনধরণের পমেটমের প্রস্তুত বিধি (prescription) তাঁহার নোটবুকে টুকিয়া রাখেন কেহ তাহা জানিতেন না। Mrs. B—র প্রেতাত্মা ঐ ঘটনার উল্লেখ করেন। সত্যনির্দ্ধারণের জন্য তাঁহার নোটবুক তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হয়, প্রথমতঃ কোনো

সন্ধানই পাওয়া যায় নাই; পরে নোটবুকের শেষভাগে পাওয়া যায়, সে অংশ মৃত্যুর দিন কয়েক আগে লিখিত বলিয়া তখনো Index এর মধ্যে তাহার উল্লেখ ছিল না। ঘটনাটী তুচ্ছ হইলেও প্রমাণ হিসাবে ইহা অমূল্য। Telepathy বা Thought reading (মনপড়া, ভাব চালা) দিয়া ইহার কোনো ব্যাখ্যাই হয় না; কেননা পমেটমের precription এর কথা জীবিত কাহারও জ্ঞান গোচর ছিল না।

অনেকে বলেন প্রেতাত্মারা এই রকম তুচ্ছ ব্যাপার প্রকাশেই ব্যস্ত; উচ্চচিন্তা বা গভীর বিষয় সম্বন্ধে কোনো সংবাদ তাহারা দেয় না। সত্য, কিন্তু সেরূপ উচ্চজাতীয় দার্শনিক বা ধর্ম্ম তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রামাণিক মূল্য কোথায়? সভার উদ্দেশ্য হইতেছে প্রমাণ করা মৃত্যুর পর জীবাত্মা বিদেহাবস্থায় সত্যই থাকে কিনা; ইহা প্রমাণ করিতে গেলে প্রেতাত্মার এমন সব কথা বলা বা কাজ করা উচিৎ যাহা সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারা যায়। 'আমি যে সেই দেহধারী ব্যক্তিরই আত্মা' এইটী প্রমাণ করিতে গেলে প্রেতাত্মার এমন অতীত ঘটনা বা কথাবার্ত্তার উল্লেখ করা উচিৎ যাহা পৃথিবীতে বর্ত্তমান অন্য কোনো ব্যক্তি তাহা জানে বা অন্য কোনো চিহ্নের দ্বারা মিলাইয়া লইতে পারা যায়। সে ঘটনাটী বা কথা কাহিনীটী তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইতে পারে কিন্তু তাহার প্রামাণিক মূল্য অসীম। আর প্রমাণ হিসাবে এইরূপ ছোটখাটো তুচ্ছ কথা বা কাহিনীই বেশী মূল্যবান। অধিকাংশ স্থলে অতি ছোটে খাটো চলতি কথা, ইঙ্গিত বা ধরণ ধারণে, শব্দের সুরে বা উচ্চারণের তারতম্যে প্রেতাত্মার পার্থিব জীবনের সত্যতা চমৎকার ফুটিয়া উঠে। Sir Oliver Lodge এর মৃতপুত্র Raymond Lodge এর আত্মা যে সকল কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন তাহার মধ্যে, এইরূপ কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। Raymond জীবিতকালে তাঁর ভ্রাতাদের আদর করিয়া 'Pat' বলিতেন; কাহারও কাছ হইতে আলাপ শেষে যাইবার কালে 'Good bye and Good luck' এই কথাটী উচ্চারণ করিতেন; পারকালিক আলাপকালে তাঁহার এক ভাইকে 'বৈঠকে দেখিতে পাইয়া Pat বলিয়া সম্বোধন করেন; বৈঠক শেষে বিদায়কালে 'Good bye and Good luck' এই কথা উচ্চারণ করেন। মিডিয়ম বা তত্রত্য উপস্থিত পরীক্ষক বা দর্শকদের কেহ এসব তুচ্ছ কথার খপর রাখিতেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে এই সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ অতিসাধারণ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা কত। তত্ত্ব হিসাবে পরকাল বর্ণনা বা মুক্তিতত্ত্বালোচনা জ্ঞাতব্য বা মূল্যবান হইতে পারে প্রমাণ হিসাবে তাহারা নগন্য। সভা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সত্য নির্ণয়ে উদ্যত, তত্ত্ব শিক্ষার জন্য নহে।

প্রেততত্ত্ব সভা আর একশ্রেণীর প্রেতালাপকে (Spirit communication) প্রামাণিক বলিয়া বুঝিয়াছেন, এবং এইরূপে প্রাপ্ত বার্ত্তা সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহাকে ইংরাজীতে cross correspondence বলা হয়; বাঙ্গালায় ভগ্ন বার্ত্তা বলা যাউক। জিনিসটা হইতেছে এই—একই মুক্তাত্মার একটী সম্পূর্ণ অর্থবাচক বার্ত্তাকে ভাঙ্গিয়া ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা। প্রকাশ একই সময়ে হইতে পারে বা অগ্র পশ্চাৎও হইতে পারে। ভগ্নাংশে বার্ত্তাটী আদৌ বোধগম্য নহে; কিন্তু সমস্ত ভগ্নাংশগুলি যুড়িয়া একত্র করিলে তখন একটা গোটা অর্থ প্রকাশ পায়। 'এই জাতীয় বার্ত্তার প্রামাণিক মূল্য যে খুব বেশী একথা মৃত মহাত্মা মায়ারস্‌ ও সিজউইক জীবিতকালে প্রায়ই উভয়ে আলোচনা করিতেন। ফলে উহাঁদের দুইজনের এবং সভার অন্যতম কার্য্যাধ্যক্ষ হজ্‌সনের মৃত্যুর পর এই শ্রেণীর বার্ত্তা খুব আসিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে জীবিত কালেই, পরীক্ষার দ্বারা এরূপ বার্ত্তা বহন যে সম্ভব তাহা উঁহারা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়াছিলেন। মিশ্র বার্ত্তাবহের প্রণালীটা কিছু জটিল রকমের। কোনো একটা দৃষ্টান্ত আমূল বর্ণনা করিলে তবে উহার 'ধরণের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে বর্ণনা স্থান সাপেক্ষ তথাপি সহজ ধরণের দুএকটা

নিয়ে বিবৃত হইল; উহা হইতে এ জিনিসের কিছু আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। মিসেস্ ভেরাল নাম্নী এক শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা মিডিয়ম শক্তি সম্পন্না ছিলেন। জীবিতকালে হজসন ও মায়ার্স উভয়েই ইঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন; এবং ইঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া অনেক পরীক্ষা করেন। মিসেস্ পাইপার প্রেততত্ত্ব সভার প্রধান মিডিয়ম। ইঁহাকে মধ্যস্থ করিয়া সভার যাবতীয় পরীক্ষা চলিতেছে। হজ্‌সনের মৃত্যুর প্রায় সাত বৎসর পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী মিসেস পাইপারকে ভর করিয়া হজ্‌সনের আত্মা বার্ত্তা পাঠাইলেন "আমি মিসেস্ ভেরালকে 'arrow' এই কথা বলিয়াছি।" অনুসন্ধানে পরীক্ষকরা জানিতে পারিলেন ১১ই ফেব্রুয়ারী মিসেস্ ভেরালের হাত হইতে জাগ্রতভরাবস্থায় তিনটী তীরের চিত্র বাহির হয়; পরে ১৮ই তারিখে তিনি আপনা হইতে হটাৎ কয়েকটী কথা লিখিতে আরম্ভ করেন, প্রত্যেকটির আদ্যক্ষরদ্বয় 'ar,'; যথা arch; architectonic; architrave; প্রথম কথাটা তিনবার লিখিয়া পাশে একটা সরু খিলানের ছবি আঁকেন অনেকটা তীরের ফলকের মত। ভেরালপত্নীর কন্যা হেলেনও মাতার মত মিডিয়ম শক্তি সম্পন্না, তিনিও ১১ই তারিখে আপনা হইতে একটা তীরের ছবি আঁকিয়া পাশে 'many together' লিখেন। এরূপ আরও দুই চারিটা দৃষ্টান্ত উক্তবিষয়ের আলোচনা যথাস্থানে দেওয়া যাইবে। ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং ইহাদের প্রামাণিকতা এত বেশী যে একমাত্র এই শ্রেণীর ঘটনা হইতে জীবাত্মার বিদেহাবস্থা অনেকটা সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

প্রেততত্ত্ব সমিতির কার্য্যধারা অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ের অনুসারে চলিতেছে বৈজ্ঞানিকের ক্রিয়াপদ্ধতি দুইটী। প্রথম পর্য্যবেক্ষণ—দ্বিতীয় পরীক্ষা—। চোখের উপর যে সব ঘটনা ঘটিতেছে তাহা সাবধানে, অপক্ষপাত ভাবে পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জন পূর্ব্বক দেখিয়া লিপিবদ্ধ করা, এবং যে ক্ষেত্রে সম্ভব, কৃত্রিমউপায়ে দেশকাল পাত্র আয়ত্ত করিয়া সেই সব ঘটনাকে পুনর্ব্বার ইচ্ছাক্রমে ঘটাইয়া দেখা। শুধু ঘটনার পর্য্যবেক্ষন পরীক্ষাই বিজ্ঞানের কাজ নয়; ইহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে; তারপর বিশ্বব্যাপারে ইহাদের স্থান কোন্ খানে কি ইহাদের কি উদ্দেশ্য, অন্য অন্য বিজ্ঞানের সহিত নূতনাবিস্কৃত বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ এই সব গভীর রহস্যমীমাংসা বিজ্ঞানবিস্তার চরম উদ্দেশ্য। এতদিন ধরিয়া জড়রাজ্যের কার্য্যকলাপকেই নিজের আলোচ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছিল; এত দিন পরে হটাৎ আর একটী অভিনব অতীন্দ্রিয় রাজ্য হইতে নূতন ধরণের ঘটনা আসিয়া উপস্থিত। আধুনিক জীবিত বিজ্ঞানধুরন্ধরগণ আর উদাসীন থাকা অসমীচীন ভাবিয়া উহাদের অপক্ষপাত আলোচনা করিবার মানসে এই সভা স্থাপন করিয়াছেন। কাজ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে; এখনো ঘটনাবলীর পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ চলিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের কারণ নির্ণয়ের জন্য একটা ভালরকম মত Hypothesis খাড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে। কারণ একটা কাজ চালানো (working) Hypothesis না করিলে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। Working Hypothesis 'এর প্রধান গুণ হওয়া উচিত যে জানিত সমস্ত রকম এক জাতীয় ঘটনাকেই উহা সম্ভবপর করিয়া তুলিবে। Hypothesis বা মত একের অধিকও হইতে পারে। এক এক পণ্ডিত এক এক মত খাড়া করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। অলৌকিক তত্ত্বানুসন্ধানেও একের অধিক মত খাড়া হইয়াছে। কোনটী গ্রাহ্য? কোন মতটী মান্য হওয়া উচিৎ? উত্তর—যে মতটী সকল বা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক ঘটনার হেতু দর্শন করিতে পারিবে। এই লক্ষণে বিচার করিলে প্রেততত্ত্বানুসন্ধান ব্যাপারে কোন মত গ্রাহ্য হইতেছে বা হইবে?

ইহার উত্তর দিতে হইলে মত দুইটার বর্ণনা প্রয়োজনীয়। একদল পণ্ডিত বলেন সমস্ত ঘটনাই Telepathy (বা ভাবচালনা, মন পড়া) দ্বারা ব্যাখ্যাত

হইতে পারে। অপর দল বলেন—Telepathy সাহায্যে সমস্ত রকম ঘটনার সুন্দর সংগত ব্যাখ্যা হইতেছে না প্রেতবাদ সাহায্যে বরং সম্ভব হইতেছে, সুতরাং প্রেতবাদই (spiritualism) উপস্থিত কার্য্যকারী মত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তারপর ভবিষ্যতে যদি আবার এমন সব ঘটনা দেখা দেয় যাহা এই Theory দিয়া বুঝান যাইবে না তাহা হইলে তখন অন্যমতের আশ্রয় লওয়া যাইবে। প্রথম দল বলেন যে যদিই বা Telpathy উপস্থিত সমস্ত ঘটনাকে বুঝাইতে অক্ষম তার কারণ Telepathy-র আমূল তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই; Telepathy-র প্রসার কত দূর; ইহার ক্ষমতা কত, ইহার কার্য্য শক্তি কি অদ্ভুত তাহা এখনও পুরামাত্রায় বোধগম্য হয় নাই, হইলে তখন সমস্ত অলৌকিক ঘটনাই কেবল ইহার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইবে। Telepathy একটা বাস্তব ব্যাপার উহার পরিচয় আমরা কত মাত্রায় পাইয়াছি; পুরা পরিচয় পাই নাই; পরীক্ষায় উহা ধরা দিয়াছে কিন্তু প্রেতের অস্তিত্ব শুদ্ধ অনুমানের বিষয়; উহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ছায়ামূর্ত্তি দর্শন বা জড়দ্রব্যের স্বতঃ সঞ্চালন, স্থানচ্যুতি প্রভৃতি যদি Telepathy দিয়া ব্যাখ্যাত হয় তবে প্রেতের' অস্তিত্ব অনুমান করিবার প্রয়োজন কি?"

এ সম্বন্ধে সমিতির মতগত অবস্থা এই। এখনো বিশাল ভবিষ্যৎ ইহার সম্মুখে, একান্ত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমযুক্ত গবেষণার ফলে কোন মত জয়ী হইবে তাহা এখন বলা দুষ্কর—তবে সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে মতের লড়াই তুচ্ছ সত্যের সন্ধানই একমাত্র কাম্য। যে মত সহজে সুন্দর ভাবে সমস্ত অভাবনীয় ঘটনার মীমাংসা করিতে পারিবে তাহারই জয় হইবে; তাহাই সর্ব্বজনপূজ্য হইবে। এ সম্বন্ধে Sir Oliver Lodge তাঁহার স্বভাবসুলভ সত্যপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা সুধীমাত্রেরই বিবেচ্য—And I may say paranthetically that we do not care one iota which alternative fate is in store for them (supernormal occuncules): we only want the truth." (S of man page 21)।

ইত্যবসরে সমিতির সভ্য মাত্রেরই বর্ত্তমান কর্ত্তব্য হইতেছে সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া নিন্দা উপহাস তিরস্কার গায়ে মাখিয়া নির্ভীক চিত্তে অপক্ষপাত ভাবে এই সকল অলৌকিক ঘটনা গুলিকে অলৌকিক না ভাবিয়া, একটা বিশালতর প্রকৃতিরাজ্যের অজ্ঞাত অতীন্দ্রিয় অংশ হইতে আনীত প্রাকৃতিক ব্যাপার বলিয়া মানিয়া লইয়াই তাহার আবিষ্কারে মননিয়োগ করা। এইসব আপাতঃপ্রতীয়মান নিয়মহীন, উচ্ছৃঙ্খল উদ্ভট ঘটনাগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মাধীন করিয়া অজ্ঞাত রাজ্যকে জ্ঞাত রাজ্যের সীমানাভুক্ত করা। বিজ্ঞান তাহার জন্মকাল হইতে এইরূপেই chaos হইতে cosmos এর জন্মদান করিয়া আসিয়াছে।

এই উপলক্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য ক্রুক্‌সের নিম্নলিখিত সার কথা গুলি নব অনুসন্ধিৎসুর স্মরণীয় ও মনোনীয় বটে:—To ignore the subject would be an act of cowardice—an act of cowardice I feel no temptation to commit. To stop short in any research that bids fair to widen the gates of knowledge, to recoil from fear of difficulty or adverse criticism, is to bring reproach on science. There is nothing for the investigation to do but to go straight on; to explore up and down, inch by inch, with the taper of reason; to follow the light wherever it may lead, even should it at times resemble a will-o'-the wisp." অর্থাৎ অলৌকিক এই সব তত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচ্য বলে স্বীকার করতে আমি কিছু মাত্র ভীত নই...স্বীকার না করাটা ভীরুর কাজ বলে মনে করি—জ্ঞানের অজানিত রাজ্যে নিয়ে যেতে চায় এমন ইঙ্গিৎ ইষারাকে ভয় বা লোক লজ্জা বশতঃ অগ্রাহ্য করা কেবল বিজ্ঞানকে অপমান

করা; যে নির্ভীক সত্যের সেবক সে কোন দিকে না চেয়ে সোজা চলে যাবে উপরে, নীচে, অগমে দুর্গমে, পা পা করে চলবে, জ্ঞানের বাতি হাতে করে। দূরের অস্পষ্ট আলোবিন্দুকে লক্ষ্য করে কোথায় তা নিয়ে যায় যাক্...,সে আলো যদি আলেয়ার আলো হয় সেও স্বীকার—ঠিক এই ধরণের কথাই বলেছেন আচার্য্য Huxley :—Sit down before facts as a little child—be prepared to give up every preconceived notion - follow humbly wheresoever and to whatsoever abysses nature leads—" সত্যই তা, কেননা "Nothing is that errs from law."

অর্থাৎ (fact) তথ্যের কাছে শিশুর মত বসবে আগেকার সংস্কারগুলিকে ভুলে যাবে নতশিরে প্রকৃতির পিছু পিছু চলবে তা সে যেখানেই যাক দিশেহারা ধ্বংসকর আবর্ত্ত হয় সেও ভাল—"

৩৭ বৎসর ধরিয়া চিৎতত্ত্বানুশীলন সমিতির কার্য্য চলিতেছে। ফল ভালই হইতেছে। জগতের প্রায় সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরগণ এই সমিতির সভ্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। কোনো পণ্ডিত যে সভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তো দেখিতে পাই নাই। ইহাদের সমবেত চেষ্টা ও সাধনার ফলে প্রকৃতির অতীন্দ্রিয় রাজ্যও মানব প্রতিভার কাছে সীমানা ছাড়িয়া দিতেছে। যে বিষয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ অজ্ঞ বিশ্বাসীদের সাধন বস্তু ছিল, যাহার নামোল্লেখে জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতরা নাসা কুঞ্চিত করিতেন তাঁহারাও অল্পে অল্পে এই অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইতেছেন এবং নতশিরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন যে "we are greater than what we seem to be" যে "there are more things in heaven and earth etc ...

তথাপি কোন আন্দোলনই বিরোধের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই; এবং যে কোন নূতন চিন্তা বা নূতন তত্ত্ব গোড়া হইতেই সমানে আদর ও খাতির লাভ করে নাই। নূতনের শক্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বী আছেই। প্রেঃ তঃ সঃ প্রতিরোধী শক্তিহীন নহে। ইহার অগ্রগমনের পথে বাধা অনেক ও কঠিন। ইহার শত্রু সংখ্যা ঘরে ও বাহিরে অনেক। বৈজ্ঞানিক ইহাকে জ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিয়া মানিতে চাহেন না; ধর্ম্মজগতে ইহা তেমন আদর লাভ করে নাই। শাস্ত্রবিৎরা ইহাকে অনধিকার চর্চ্চা বলিয়া তিরস্কার করেন। স্বার্থপর প্রবঞ্চক ও প্রতারণা করা হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সকল অলৌকিক শক্তি অপ্রয়োগ ও অযথা ব্যবহার করিয়া ইহার উপর জনসাধারণের বিরাগ জন্মাইতেছে। পণ্ডিতরা এই বিদ্যার আলোচনা চেষ্টাকে পাগলামি ও ছেলেমানুষি বলিয়া উপহাস করিতেছেন যেমন হইয়া থাকে—কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও এই সমিতির সভ্যরা যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে গভীর নিষ্ঠার সহিত ও সত্যানুরক্ত হইয়া কাজ করিতেছেন তাহাতে দিন দিন ইহারই জয় হইতেছে...অবিশ্বাসীর দল কমিতেছে, সন্দেহবাদীরা বাধ্য হইয়া ইঁহাদের কথায় কান দিতেছেনা; প্রবঞ্চকেরা সরিয়া পড়িতেছে; পণ্ডিতরা স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিতেছেন; জনসাধারণ কৌতুহল চিত্তে ইঁহাদের কার্য্যফলাফল লক্ষ্য করিতেছে।

চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির এই সান্ত্বনার কথা যে তাঁহারা যে মহাসত্যের অধিকারে রত তার মত শুভ বিপ্লবকারী আবিষ্কার মানবজীবনের ইতিহাসে হয় নাই। স্বর্গীয় ভূতপূর্ব্ব মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোন্ এই সমিতির কার্য্য লক্ষ্য করে বলেছেন "It is the most important work which is being done in the world—by far the most important".

বাস্তবিকই দার্শনিকরাজ Hegelএর কথা দিয়া "Dr Haldar যা বলিয়াছেন তা খুবই সত্য "If it is held a valuable achievement to have discovered sixty ado species of the parrot, a hundred and thirty seven of veronica and So forth, it should surely be held a far more

valuable achievement to discover" whether man survives death or not? ৰাট্‌ ধরণের পায়রার উপজাতি আছে বা ১৩৬ ধরণের ভেরোণিকা আছে প্রভৃতি এ ধরণের অধিকারের চেয়ে দেহান্তে মানুষের সজ্ঞান ভাবে ও স্বতন্ত্র অবস্থার আবিষ্কার হাজার গুণে বড়।

(ক্রমশঃ)

শ্রী অতুলচন্দ্র দত্ত।

ভাববার কথা।

পূর্ব্ববঙ্গের ঝড়।

বহুদিন বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। তথাপি যে তাহার কঙ্কালসার অস্তিত্বটুকু কোন মতে বহন করিয়া আসিতেছিল—বাঙ্গলার ভাগ্য-নিয়ন্তা তাহাও সহ্য করিতে পারিলেন না। অনশনে ও অর্দ্ধাশনে জর্জ্জরিত শত শত দরিদ্র শীর্ণদেহখানি জীর্ণ কন্থায় আবৃত করিয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িয়া কাল কি খাইবে চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে স্তব্ধ নিশীথে মহাকালের বিষাণ বাজিয়া উঠিল। প্রলয় ঝঞ্ঝার রুদ্র তাণ্ডবে বলির পশুর মত কম্পিত বক্ষ উভয় হস্তে চাপিয়া সে সচকিতে শয্যাপরি উঠিয়া বসিল—তখন তাহার মস্তকোপরি অনন্ত আকাশ—সে আজ সর্ব্বস্ব হারা!! জননী সন্তান খুঁজিয়া পাইল না—শিশুর অর্দ্ধোচ্চারিত মা মা বুলি ক্ষুদ্র ওষ্ঠে ফুটিতে না ফুটিতেই থামিয়া গেল। ক্রন্দন, আর্ত্তনাদ, হাহাকার ছাপাইয়া অন্ধবিক্রমে ঝটিকা গর্জ্জন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যচক্রতলে পূর্ব্ব বঙ্গের বক্ষ নিষ্পেশিত ও দলিত করিয়া কালের বিজয়রথ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া গেল পিতা, পুত্র, পত্নী স্বজন হারাইয়া অসহায় অক্ষম বাঙ্গালী বুকভাঙ্গা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দৈবদুর্ব্বিপাক।"

দৈবের এতবড় নিষ্ঠুর লীলা বাঙ্গলায় আর হয় নাই। বিংশশতাব্দীর প্রথম উষায় ছত্রভঙ্গ, বিপন্ন বাঙ্গালীর মস্তকের উপর দিয়া ঝঞ্ঝা ও বন্যা দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নৈরাশ্য ও উদ্বেগ অবিরাম ধারায় বহিয়া যাইতেছে। সুপ্তজাতি আজও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে নাই! দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় এ অটল সহগুণ বাঙ্গালী কেমন করিয়া শিখিল, কেন শিখিল?

বেশীদিনের কথা নয় প্রবুদ্ধজাতির সেই উত্তেজনা জাগরণ হইতে একাল পর্য্যন্ত কত পরাজয়, লাঞ্ছনা ও আশাভঙ্গের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। আমাদের লক্ষ্য মহৎ তাই দুঃখও মহৎ।

বাঙ্গালীর সেবাধর্ম্মই এই দুঃসহ দুঃখকে মহত্বে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের "অভী" মন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম্মীগণ আজ বুকপাতিয়া জাতির দুর্ভাগ্য আলিঙ্গন করিতেছেন। চিরদিন দৈবে বিশ্বাসী বাঙ্গালী আজ ঈষদুন্মেষিত পুরুষকার সহায়ে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিণাম ব্যর্থ করিবার ব্যগ্র আগ্রহে শক্তি, সেবা ও সাহায্য লইয়া বিপন্নের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। প্রেমের স্নিগ্ধকণ্ঠে আজ মহত্ব ও পৌরষের বাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। করুণা-বিগলিত ভক্তি সবল আত্মনির্ভরশীল শক্তি সাধনার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে।

বাঙ্গালীর দুঃখ ও তাহার প্রতীকার চেষ্টায় এবার আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এক অভিনব বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। বাঙ্গালায় নেতার অভাব নাই। জননায়ক বলিয়া নিজেকে দেশের সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করিবার আগ্রহে অনেকেই বক্তৃতায় গগন বিদীর্ণ করিয়া থাকেন। জাতির দুর্দ্দিনে তাঁহারা কোথায়? দেশের কল্যাণ কামনায় যিনি একদিন অন্যায়কে উচ্চকণ্ঠে সমর্থন করিয়াছিলেন আজ তিনি কোথায়? বিবিধ প্রকার ন্যায় সঙ্গত ও অন্যায় উপায়ে ভোট সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে রাজসভায় প্রবেশ

করেন—আজ তাঁহারা কোথায়? ইঁহাদিগের অধিকাংশের ধাপ্পাবাজী আজ নিতান্ত কদর্য্যভাবে বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবার এই মহৎ দুঃখে পড়িয়া আমরা প্রকৃত নেতা চিনিয়াছি। বাঙ্গালার প্রকৃত জননায়ক উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধ্বংসের মুখে ছুটিয়া গিয়াছেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছেন, স্বহস্তে আর্ত্তের অশ্রুজল মুছাইয়াছেন, তাহার ক্ষুধিত মুখে আহার তুলিয়া দিয়াছেন। জাতি তাঁহাদিগকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। তাঁহারা যে আমাদের "মাথার মণি"।

বিবেকানন্দ-প্রচারিত সেবাধর্ম্মের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা না হইলেও, উহার পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। বাঙ্গলার বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলিও ধীরে ধীরে "সেবা-ধর্ম্ম" বরণ করিয়া লইয়াছেন। অনাগত দুর্ব্বিপাকের প্রতীকার করিবার জন্য, বাঙ্গালীকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করিবার জন্য নিঃস্বার্থ-হৃদয় কর্ম্মীগণ চেষ্টা করিতেছেন। সাময়িক প্রতীকারে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা অন্নবস্ত্রাভাব দূর করিবার জন্য, নূতন নূতন কর্ম্মসৃষ্টি করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ করিতেছেন।

উপর্য্যুপরি ভাগ্য বিপর্য্যয়ে সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী আজ আত্মজ্ঞ হইয়াছে। এত যে দুঃখ, এত যে অভাব তবুও সে শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া কাঁদে নাই—কাঁদিতে পারে নাই। তাহার গৃহ গিয়াছে, গরু বাছুর মরিয়াছে; ক্ষেতের শস্য উড়িয়া গিয়াছে। সে যে চিরসহিষ্ণু বাঙ্গালার কৃষক! পত্নী-পুত্র-হারা হইয়াও সে ভাবিতেছে—কিস্তির খাজনা তাহাকে কাছারীতে আদায় দিতে হইবে, নতুবা কলিকাতাবাসী জমিদারবাবুর বিলাসযজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিবে কি করিয়া? সে ছোটলোক, সে পতিত—তাহাদের হাতের জল খাইলে আমাদের জাতি যায়; কিন্তু তাহাদের বুকের রক্ত পরম আগ্রহে পান করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকি!

বাঙ্গলার গণবিগ্রহের এই অসীম লাঞ্ছনা, অসহনীয় অপমান—পুরোহিতগণ কোথায়? আজ পূজাপ্রার্থী হইয়া ঘটে ঘটে "নারায়ণ" বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সত্বর হও! হৃদয়ের রক্তে পূজার অর্ঘ্য রঞ্জিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মাথা নোয়াও! নীচতার উদগু কপটতা পদদলিত করিয়া বিগ্রহ রক্ষা কর! নারায়ণ বরদ হইয়া অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।

এতদিন বন্যা ও দুর্ভিক্ষ আমাদের সাথের সাথী ছিল—এইবার হইতে দুঃখকে পূর্ণতা দিবার জন্যই ঝটিকার আগমন। পুনঃ পুনঃ আঘাতে জীবন্মৃত জাতি মরিবে না। কেবল ভাঙ্গিবার জন্যই আঘাতের প্রয়োজন হয় তাহা নহে। গড়িবার জন্যও অনেক আঘাত করিতে হয়। এ আঘাত, গড়িবার জন্য—মারিবার জন্য নহে।

ভাইএর জন্য ভাইএর মর্ম্মান্তিক সহানুভূতি, পূর্ব্ব বঙ্গবাসী আমরা অনেক পাইয়াছি! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না, তাহা হইলে ভাইকে লজ্জা দেওয়া হইবে। দুর্দ্দিন দুর্যোগ এমন কিছু চিরদিনের নয়! তবু এই মহাসর্ব্বনাশের কবলে পড়িয়া অনেক সবল হস্তের সাহায্য আমরা পরমবিশ্বাস সহকারে আশা করিয়াছিলম—মুখ ফুটিয়া দায়ে পড়িয়া ভিক্ষা করিয়াছিলাম। আর কিছু দূরে থাক্ দুটী সহানুভূতির কথাও শুনি নাই। ইহাঁদিগকে আমরা অন্ধের মত অনুসরণ করিয়াছি-কতবার ইহাঁরা দলে দলে আসিয়া আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি কুড়াইয়াছেন, চাঁদার খাতার সাদাপাতার আড়াল দিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়াছেন, দেশের জন্য চীৎকার করিয়া আমাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছেন, আর আজ—বুকভাঙ্গা আর্ত্তনাদেও তাঁহাদের আসন টলিলনা তাঁহারা ভাবিবার অবসর পাইলেন না যে শত শত—যাক দুর্দ্দশার কাহিনী!

অভিমান আসে—আসা স্বাভাবিক। তবু ভগবানকে ধন্যবাদ আমরা অনেক দুঃখের কষ্টিপাথরে এবার কয়েকটী মানুষ কিনিয়াছি। আর দেখিয়াছি—সেবাপরায়ণ যুবকগণের তরুণ প্রাণে গৌরবময় মনুষ্যত্বেরও হিরন্ময় দেবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরত্নবেদিকার উপরে আজ গণবিগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালীর এ মৃত্যুর উৎসব—আয়োজন প্রস্তুত—চাই সাধক, চাই পুরোহিত।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার।

আশা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সত্যব্রত বহু চেষ্টা করিয়া ব্রহ্ম ও বিষ্ণুযশাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। শিবব্রতের সমস্ত মিথ্যার জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহার সংগৃহীত সমস্ত সাক্ষীই এমন গোলমাল করিয়া দিল এবং সর্ব্বোপরি চৌবেজি সাক্ষ্য দিবার সময় এমন করিয়া সমস্তই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ফেলিলেন যে ৩৮৬ ধারার মূল ব্যাপারই প্রমাণ হইল না। সেই কারণে ব্রহ্মযশা ও বিষ্ণুযশা বেকসুর খালাস পাইলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারে সত্যব্রত ও প্রিয়ব্রত একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। শিবব্রতের এই কার্য্য! সেই এই ভয়ানক অন্যায় ঘটাইয়া তুলিয়া তুইটী নিরীহ ব্যক্তিকে মাসাবধিকাল জেলে পচাইয়াছে। এ লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। সত্যব্রত এই দুঃখে শয্যাগ্রহণ করিলেন। একেই ত তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়াই ছিল, তাহার উপর এই একমাসব্যাপী উদ্বেগ ও পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল।

বিপদের উপর বিপদ শিবব্রতও আজ কয়দিন হইতে নিরুদ্দিষ্ট। সে যে কোথায় গিয়াছে কোন প্রকারেই জানা গেল না। প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হইয়া তাহার পিতাকে বলিল "উপায়?" সত্যব্রত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "উপায়" ভগবান। সে যে এমনভাবে আমার সমস্ত আশাই নষ্ট করিবে তা কে জান্ত? এর চাইতে হয়তো আরও অধঃপাতে যাবার পথ করতে চলে গিয়েছে। আর যদি বাস্তবিক লজ্জিত হ'য়ে থাকে তাহ'লে মরতে।"

প্রিয়। না বাবা তা হবে না, তাকে যেমন করেই হোক বাঁচাতে হবে। পরের ওপর ভার দিয়ে কোন কাজ হবে না, আমি স্বয়ং খুঁজতে বেরুব।

সত্য। তুমি নিশ্চিন্ত থাক প্রিয়, যে কাপুরুষ এরকম কাজ করতে পারে তার ম'রবার সাহস হবে না। দু'জন Detectiveকে লাগিয়ে দাও দু'দিনের মধ্যে তাকে খুঁজে বা'র করা যাবে।"

প্রিয়ব্রত ছল ছল নেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সত্যব্রত বলিতে লাগিলেন "তাকে খুঁজে পেলেই বা কি হবে? আমি তার মুখদর্শন ক'রব না। আমার এতে যে আঘাত লেগেছে, প্রিয়, তাতে আর বেশী দিন যে আমি সংসারে থাকব এর আশা ক'রো না। আমার মৃত্যুর পর তাকে এখানে এনো'। এখন যদি সংবাদ পাওত যা হয় ব্যবস্থা করো'।

প্রিয়ব্রত কাতর হইয়া বলিল "বাবা এতখানি নিষ্ঠুর হবেন না। শিবু এখনও ছেলে মানুষ, একবার ভুল করেছে বলেই যে অমনি তাকে একেবারে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করবেন এ হ'তেই পারে না।"

প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ব্রহ্মযশাকে ডাকিয়া আনিল। ব্রহ্মযশা আসিয়া বলিলেন "এ তোমার ভাল হচ্চে না, ভাই। এখন রাগ অভিমানের ওপরে উঠতে হবে। এ কি তোমার উপযুক্ত কথা। তুমি তোমার শিবব্রতের ওপরে ত ক্রোধ ক'রছ না, এ ক্রোধ করা হচ্চে ভগবানের ওপর। ভগবানের ওপর রাগ করা কি সাজে।"

সত্যব্রত শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিলেন "এ আমার কারুর ওপর রাগ করা নয়, এ হচ্চে বাপের কর্ত্তব্য। আমি যদি তাকে শাস্তি না দিই ভগবান হয়তো তাহ'লে তাকে আরও বেশী শাস্তি দেবেন। এই শেষবয়সে আমার চোখ ফুটেছে, ; আমি এতদিন পিতৃকর্ত্তব্য করিনি বলে আমার যে অনুশোচনা হচ্চে তার ফলে তাকে শাস্তি দিতেই হবে এবং সেও শাস্তি গ্রহণ করতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তোমরা বাধা দিওনা।"

প্রিয়। তাহ'লে অন্য কোনো শাস্তি বিধান করুন : আপনি

মুখ ফেরালে সমস্ত জগত মুখ ফেরাবে। কেউ তাকে স্থান দেবেনা। বাবা, আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা আপনার বিরাগ ভাজন হয়ে একদণ্ডও বেঁচে থাকা উচিৎ নয়।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ব্রহ্মযশা চলিয়া গেলেন। প্রিয়ব্রতও কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে মহামায়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পিতৃচরণতলে উপবেশন করিল। সত্যব্রত গম্ভীর মুখে তাহাকে বলিলেন "মায়া, আর কতদিন আমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবে? যথেচ্ছচারিতার ফল এত নিকটে ফল্‌ল, এখনও আমার কথা ঠেল্‌বে?"

মায়া নত মস্তকে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। সত্যব্রত নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিলেন। মায়া তখন কাতর ভাবে বলিল "বাবা, আর কিছুদিন সময় দেন, এখনও যে আমি মন ঠিক করতে পারছিনা। এখনও যে বুঝতে পারছিনা, কেন বিয়ে করতে হবে। কেন বাবা, আপনাদের সেবা ক'রে, সংসারে আরও পাঁচজনের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা ক'রে কি জীবন কাটতে পারে না তবে এতদিন কি শিখলাম। কেন এ ভূতের বোঝা মিছি মিছি ঘাড়ে নিলাম, যদি শেষে সেই হাতাবেড়ি হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যেই জীবন কাটাতে হবে।"

সত্যব্রত কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে তুমি কি ক'রবে স্থির করেছ? এই সময় হ'তে জীবনের উদ্দেশ্য যদি স্থির না করে নাও তা'হলে শেষে পস্তাতে হবে। বল তুমি কি করতে চাও?"

মায়া। আমি দেখাতে চাই যে মেয়ে মানুষও পুরুষদের মতই মানুষ। তাদেরও ছোট্ট সংসারের বাইরেও জীবন থাকা সম্ভব। আমি নিজের জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দেবো সংসারে পুরুষেরও যেমন অধিকার মেয়েদেরও তাই। বুঝিয়ে দেবো স্ত্রীলোক পুরুষের ছায়া মাত্র নয়।

সত্য। কি করে বোঝাবে?

মায়া। সেই বিষয়েই আপনার কাছে উপদেশ পেতে চাই। আমাদের জাতীয় নারীজীবনকে আমি এতদিন ঘৃণার চক্ষে দেখতাম; কিন্তু এখন আর তা করি না। এখন সেই জীবনকে আমি পরমভক্তির চক্ষে দেখতে শিখিছি। আর ভক্তি করতে শিখিছি বলেই তাকে ভালবাসতেও শিখিছি। কিন্তু তবু বলছি, আমার আজীবনের উদ্দেশ্যকে আমি ত্যাগ করব না।

সত্য। কেন?

মায়া। দেখতে চাই, একটা দিক যেমন আছে আর একটা দিক আছে কিনা? আমার একটা জীবন যদি বিফল হয়ে যায় তাতে সংসারের ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি সফল হই তা হ'লে অন্ততঃ একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করে যাব। এদেশে যেমন নারীজীবনের একটা আদর্শ সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, তেমনি যদি আর একটা আদর্শকেও এইখানেই সফল করতে পারি, তা হ'লে বুঝব ভারতই কর্ম্মভূমি, তা হ'লেই বুঝব যে জগতের সমস্ত আদর্শ ভারতেই সফলতা লাভের অপেক্ষায় আছে। বাবা আপনাকে সত্য বলছি নারীজীবনের অন্যপ্রকার সার্থকতা যদি না দেখাতে পারি তা হ'লে বুঝব উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চ উদ্দেশ্য এসব কেবল ভুয়ো কথা। দাগে দাগা বুলানই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সত্য। কি করবে তুমি? না হয় Flora Nightingale এর মত রোগী অনাথ আতুরের সেবা করে জীবন কাটাবে কিন্তু সেটাও নূতন কথা নয়, চির পুরাতন কথা। না হয় "নিবেদিতার" মত ছোট একটা স্কুল করে মেয়ে পড়াবে তাতেই বা তোমার কি এমন নূতন কাজ করা হবে? আর যদি পুরুষ মানুষের মত চাকরি বাকরি, বা ওকালতি ব্যারিষ্টারি বা অন্য কিছু করতে যাও এ বাঙ্গালা দেশে তা পেরে উঠবে না। তবে কি নূতন কাজ করতে চাও? আর যদি একদল নূতন সন্ন্যাসিনীর দল তৈরি করে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে বেড়াতে চাও—তাতেও বড় একটা নূতন কাজ হ'বে না। পুরুষ সন্ন্যাসীর দল আছে,

তার ওপর আর একদল বাঁ'ড়বে। তা হ'লে কি করতে চাও ?

মায়া। তাই ত' আমি জিজ্ঞাসা করছি ; আপনি আমায় বলে দেন কোন্ উপায়ে আমি বুঝিয়ে দিতে পারি যে আমরাও পুরুষদের মতই মানুষ।

সত্য। মা, যদি সত্য কথা শুনতে চাও তাহ'লে বলি যে, যা সনাতন নিয়ম তাই পথ, অন্য পথ নেই। আমাদের যা কাজ, তা তোমাদের নয়, তোমাদের যা কাজ আমাদের তা নয়। তোমরা যখন সেবা করবে তখন আমরা সেবা নেব, আবার আমরা যখন সেবা করব তখন তোমরা সেবা নেবে। কিন্তু উভয়ের সেবা ঠিক এক রকমের হবে না। সব জিনিষেরই যখন দু'টো দিক আছে তখন পুরুষ আর স্ত্রীর উভয়েরই কাজেরও তফাৎ হবে। সেই সত্যটাকে অস্বীকার ক'রে যদি আমরা পরস্পরের কাজ ধ'রে টানাটানি করি, তাতে সুফল কিছুতেই হবে না, অথচ যেখানে পরস্পরের মধ্যে নির্ভরতা থাকারই দরকার সেইখানে মারামারি কাটাকাটি দেখা দেবে। পুরুষ আর স্ত্রী উভয় মিলেই সংসার সমাজ রাষ্ট্র, এককে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব নেই।

মায়া। কিন্তু প্রয়োজন হলেই ত' দেখতে পাই পুরুষরা দেখান যে সংসারে কেবল তাঁরাই আছেন ; মেয়েরা যেন কেউই নয়। দেশের কাজে দশের কাজে তাঁরাই আছেন, আমরা কেউ নই।

সত্য। সেটা তোমার দেখার ভুলের দরুণ ঐ রকম দেখায়। যেখানে তোমাদের অস্তিত্ব, সেখানে না তাকিয়ে যেখানে পুরুষের অস্তিত্ব সে স্থানের প্রতি সলোভ দৃষ্টি দেও বলেই তাই হয়।

মায়া। এমেরিকায় ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একই বিষয়ে সমানাধিকার দেওয়া হয়েছে অথচ সেখানেত কোন রকম মারামারি কাটাকাটী হচ্চে না।

সত্য। পরের উদাহরণ দিতে যাওয়ায় অনেক বিপদ আছে। প্রথমতঃ সমস্ত সত্য জানবার কোন উপায় নেই, আর দ্বিতীয়তঃ যে জিনিস ওখানে সম্ভব তা' যে এখানেও সম্ভব হবে একথা কে বলতে পারে ?

মায়া। আমি দেখতে চাই তা' হতে পারে কিনা ?

সত্য। তা' হলে কি করবে ? কোন্ কাজ তুমি করতে চাও ?

মায়া। যা আমার দ্বারা হয় ওকালতি ব্যারিষ্টারী বা চাকরি না করলেও যে অন্য কোন রকম উপায় নেই একথা মানতে পারব না। দেশের দৈন্যের কারণ কেবল যে আমাদের পুরুষদের অকর্ম্মণ্যতায় ঘটেছে তা নয় মেয়েরা তার একটা কারণ। সংসারকে যদি কেবল আর্থিকভাবেই দেখা যায় তাহ'লেও মেয়েদের কাজ করার দরকার। কেবল ছেলে মানুষ করে আর পুরুষদের রেঁধে বেড়ে দিয়ে তাদের জীবন শেষ হবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আমার জীবনের উদ্দেশ্য হবে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, কেন পুরুষরা একা খাটবেন—আমরাও তাদের মত খেটে তাঁদের অন্নসংস্থানের সাহায্য করতে পারি। এবিষয়ে বুনো ধাঙ্গড়েরাও আমাদের ভদ্র পরিবার হতে ভাল। তাদের মেয়ে পুরুষ উভয়েই রোজগার করে। সেই-জন্য সংসারে উভয়ের সমানই অধিকার।

সত্য। ঘুরে ফিরে সেই অধিকারের কথাই আনছ। আচ্ছা সে কথা না হয় ছেড়ে দিলাম কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তুমি কি সবাইকে শিখিয়ে বেড়াবে, ওগো বাড়ি ঘরের কাজ কর্ম্ম ছেড়ে চাকরি করতে চল, বাণিজ্য করতে চল, লাঙ্গল ধরতে চল ? না হয় প্রফেসারি করতে চল, ওকালতি করতে চল, বক্তৃতা দিতে চল। আমাদের বাঙ্গালী পুরুষদের জীবনের প্রসারই বা কতটুকু ! এর মধ্যে তোমরাইবা কতটুকু নেবে আমাদেরই বা কতটুকু দেবে ?

মায়া। আমরা কাজে নামলে জীবনের কার্য্য ক্ষেত্র আরও বেড়ে যেতে পারে।

সত্য। কিন্তু কি যে তুমি করবে তাত' আমি বুঝতে পারছি না।

মায়া। বাবা তাই চিন্তা করুন, একটা পথ আবিষ্কার

করুন, আর আমায় তারই উপদেশ দেন। আমি এমন করে আর বসে থাকতে পারছিনা।

সত্যব্রত চিন্তিতভাবে বলিলেন "তোমার দুঃসাহস দেখে ভয় হচ্চে, মায়া, না আমি তোমায় কোন উপদেশ দিতে পারব না। এবিষয়ে উপদেশ কে যে দিতে পারবে তাওত জানি না।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তা হ'লে সর্ব্ব বিষয়ে আমি একলা হব। আমাকেই আমার পথ বের করে নিতে হবে।" মায়া চলিয়া গেল।

বিষ্ণুযশা যেদিন জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল সেদিন হইতে তাহার নিকট সংসার আবার একটী অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরিল। সমস্ত সংসারই তখন তাহার নিকট একটী প্রকাণ্ড কারাগার হইয়া দেখা দিল। মানুষ তাহার নিজের সৃষ্ট জেলের মধ্যেও যেমন হস্তপদ বদ্ধ জীব, বহিঃসংসারেও তাই।

বিষ্ণু এই মাসাবধিকাল অনেক কয়েদীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করিয়াছে। একজন বৃদ্ধ রুগ্ন অথচ পুরাতন পাপীর সঙ্গে বসিয়া সে পাথর ভাঙ্গিয়াছে, একজনের সঙ্গে সন্ধ্যায় চুপি চুপি গিয়া ঘানি টানিয়াছে, আবার কোন কোন রুগ্ন কয়েদীকে আপনার বাহির হইতে লব্ধ আহার্য্য লুকাইয়া লুকাইয়া দিয়া আসিয়াছে। এবং এই কারণে কত বিনিদ্র রজনী কেবল কাঁদিয়া কাটাইয়াছে।

সে এই সব চোর ডাকাতের মধ্যে বিশেষ ভাবে ইহাই লক্ষ্য করিয়াছে যে ইহারা প্রায়শঃই পশুদের মত বন্ধনের মধ্যেও নিশ্চিন্ত। তাহাদের যে ইহা অপেক্ষা ভাল অবস্থা হইতে পারে অনেকের এমন কি এ জ্ঞানও নাই। কেহ কেহ এমনও বলে যে জগতে সকলেই চোর ডাকাত; কাহারও বা চুরি বদমায়েসী ধরা পড়ে, কাহারও বা পড়ে না; কাহারও বা উচ্চতর অবস্থার দরুন তাহার ডাকাতি সৎকার্য্য বলিয়াই লোকে ধরিয়া লয়। সর্ব্বোপরি ইহারা এমনই অন্ধ, যে ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তুই ইহারা স্বীকার করে না। দু'একজন যাহারা সংসারে অবস্থা দুর্ব্বিপাক না ঘটিলে হয়তো ভাল হইতে পারিত তাহারাও এখানে আসিয়া সমস্ত সদ্বুদ্ধি হারাইতে বসিয়াছে তাহারা বলে ঈশ্বর বা ন্যায়ের রাজত্ব সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছে। বহিঃসংসারও কেবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, স্বার্থের জন্য গলায় ছুরী দেয় এবং অন্নের জন্য বহুকে চাপিয়া পঙ্কের মধ্যে ধরিয়া রাখে।

দেখিয়া শুনিয়া বিষ্ণু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে যেমন করিয়াই হউক এমন একটী সংবাদ তাহাকে আনিতে হইবে যাহাতে সংসারের লোক বুঝিতে পারে যে "সংসার দেবতারই রাজ্য দৈত্যের নয়।" যে দেবকে সংসার বর্জ্জন করিয়াছে, যিনি কাহারও একার নন, এবং যাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরুন কেহই কেবল মাত্র নিজের নয় সকলের, তাহারই প্রত্যক্ষানুভূতিকে জগতে আনিয়া দিতে হইবে। মানুষের নিজের গড়া স্বার্থের জালকে ছিন্ন করিয়া তাহাকে বৃহত্তম অস্তিত্বের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া না দিতে পারিলে কেন মিথ্যা এই অস্তিত্বের বোঝা সে বহিবে। সে বুঝাইবে ক্ষুদ্র স্বার্থে সুখ নাই বৃহত্তম স্বার্থেই সুখ, "ভূমৈব সুখং নাল্পে।"

কিন্তু সেই সর্ব্বতো এব সর্ব্বের, সেই সকলের ধনকে কেমন করিয়া সংসারের দুয়ারে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিবে? কে তাঁহার সহিত বিষ্ণুযশার পরিচয় করাইয়া দিবে? কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাইব? এই কর্ম্ম কোলাহল, এই আপনা গড়া জালের মধ্যে থাকিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইব কি করিয়া? কোথায় আছ তুমি সকলের ধন? এই সমস্ত সংসারকে ক্রন্দনের মধ্যে বন্ধনের মধ্যে মারামারি কাটাকাটির মধ্যে রাখিয়া কোথায় তুমি বসিয়া আছ? আমার মধ্যে এই বিরাট ক্রন্দনকে জাগাইয়া তুলিয়া কোথায় তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছ? তোমার জগৎ ভুলান হাসিটী আমায় দাও আমি জগৎকে তাহাই বিতরণ করিয়া দিই; একবার তার অশ্রু মুছাই।

বিষ্ণুযশা এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন একটী দরিদ্রের ভগ্নপ্রায় গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই গৃহের মধ্য হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, এবং কয়েক জন প্রতিবাসী সেই গৃহের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া জটলা

করিতেছে। বিষ্ণু তাহাদের প্রশ্ন করিয়া জানিল যে এই গৃহস্বামী মৃত্যুমুখে পতিত। সে ছিল ট্রামগাড়ির Conductor। মাসে ১৫টি টাকা রোজগার করিত কিন্তু সেইজন্য তাহাকে ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে হইত। এই কারণে তাহাকে তাহার সমস্ত পরিবারের সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধাশনে কাটাইতে হইয়াছে এবং তাহারই ফলে তাহার এই অকাল মৃত্যু!

বিষ্ণু রুদ্ধস্বরে বলিল "আর তোমরা এখন মজা দেখতে এসেছ? সে যত দিন জীবিত ছিল ততদিন কারও দৃষ্টি পড়ে নি? সে হয়তো আত্মহত্যাই করেছে কিন্তু তোমাদের চোখ কোথায় ছিল? ছি ছি তোমরা মানুষ না জানোয়ার?"

বিষ্ণু বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহাকে কেহ কেহ বাধা দিয়া বলিল, "যাবেন না মশায় হয়তো এ আত্মহত্যাই করেছে, আপনি পুলিস কেসে পড়ে যাবেন।" বিষ্ণু চীৎকার করিয়া বলিল "তোমরা ভগবানের তৈরি নও—পিশাচের তৈরি! দু ফোঁটা চোখের জলও কি ধার করে আনতে পারনি?"

বিষ্ণু সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার অন্তরাত্মা ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল। গৃহস্বামীর দুইটী ছোট ছোট ছেলে বসিয়া তাহার মাতার ক্রন্দনে যোগ দিয়াছে, আর একটী বৃদ্ধা অনবরত বক্ষে করাঘাত করিয়া ভগবানকে গালি দিতেছে। বিষ্ণু তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকটে গিয়া বলিল "মা তোমাদের ভয় নেই, আমি এসেছি। আমি তোমাদের ছেলে, আমায় বল কি করতে হবে"।

বিষ্ণুর কাতরোক্তিতে আরও কয়েকজন জুটিয়া মৃত ব্যক্তির অন্তিম কার্য্য সম্পাদন করিল, এবং সেই পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিয়া দিল। বিষ্ণু তাহাদের আশ্বাস দিয়া উপস্থিত দয়ালু কয়েকজনের প্রতি করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল "এ তোমাদের কাজ নয়, নারায়ণের কাজ। তাই মনে করে এদের সব ভার তোমাদেরই নিতে হবে। মনে ঠিক জেনো এদের সঙ্গে হরি স্বয়ং কাঁদছেন; যদি তাঁর ক্রন্দনে তোমাদের কাণ না ফোটে তা হ'লে তোমরা অতি হতভাগ্য। একবার নিজেদের অন্তরের দিকে কাণ ফিরিয়ে শোন তোমাদের অন্তরে বসে হরি এদেরই জন্য কাঁদছেন। শুনতে পাচ্ছ না? না পাও আমার এই বুকে হাত দাও শুনতে পাবে তিনি কাঁদছেন—আমি এমন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আর তোমরা পাচ্ছ না? শুন, শুন, একটু স্থির হয়ে শুন!"

বিষ্ণুর প্রচণ্ড ভঙ্গী ও আন্তরিক শক্তিতে উপস্থিত সকলেই অভিভূত হইল। সত্য যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখন প্রবল ভাবেই আপনাকে জানাইয়া দেয়। এতখানি সহানুভূতি এতখানি সত্যকার দুঃখ মানুষকে অভিভূত না করিয়া ছাড়ে না। সেই জন্য দু'একজন তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিল যে যত দিন এক মুঠাও অন্ন তাহাদের জুটিবে ততদিন ইহারাও তাহার অর্দ্ধেক অংশ পাইবে।

বিষ্ণু সমস্ত দিন অনাহারে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ও লক্ষ্মী তাহারই অপেক্ষায় সমস্ত দিন বসিয়াছিলেন। পুত্রকে উন্মত্তবৎ প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সজল নেত্রে বলিলেন "কি হয়েছে বাবা?" বিষ্ণু তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল "মা তোমারই মত ত' জগতের মা তবে কেন এত দুঃখ? তবে কেন অন্নাভাবে লোক মরে? তবে কেন পরের দুঃখ দেখেও সেই মায়ের সন্তানরা মুখ ফেরায়? মা আজ কি দেখলাম?—অন্নপূর্ণার সন্তান হয়ে মানুষ অন্নাভাবে মরছে?"

ভুবনেশ্বরী পুত্রকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "বাবা বিষ্ণু, সেই অভাব দূর করবার একটা উপায় করে কি কেউ দিতে পারে না?"

বিষ্ণু আজ যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে তাহারই একটা জলন্ত বর্ণনা করিতে লাগিল।

তাহাদের গলার আওয়াজ পাইয়া লক্ষ্মী ও তৎসঙ্গে মহামায়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। মহামায়া এখন প্রায়শঃই লক্ষ্মীর নিকটে বসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিত। তাহার পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর হইতে সে যে কি

করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে আসিয়াছিল।

মাতার সহিত কথা কহিতে কহিতে মায়া ও লক্ষ্মীর উপর দৃষ্টি পড়িবা মাত্র বিষ্ণু উত্তেজিত স্বরে বলিল "কি করতে বসে আছ? কেন বৃথা দিন কাটাচ্ছ? চারদিকে এত কান্না কাটী এত অভাব অবিচার আর তোমরা চুপ করে বসে থাকবে? তোমাদেরই একাজ করতে হবে—অন্নপূর্ণার অংশ না তোমরা? মাতৃহৃদয় না তোমাদের আছে? তোমরা কেমন করে চুপ করে থাকতে পার? আর বসে থেক না, আর ঘুমিয়ে কাটিও না। আর যদি কিছু না করতে পার অন্ততঃ পরের জন্ত ত' কাঁদতে পার—দু ফোঁটা চোখের জলেরও কি এত অভাব হয়েছে?"

মহামায়া কাতর হইয়া বলিল "কি করতে হবে বলুন, আমি প্রাণপণে তাই করব?"

বিষ্ণু। কি করতে হ'বে? ধিক্ তোমায়! এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে? নিজেরা সুখস্বচ্ছন্দে স্বাস্থ্য আর অগাধ অর্থের ওপরে বসে জগতের দীন-দরিদ্রের রক্ত শোষণ করতে করতে বলছ, কি করতে হবে?—একেবারে নিজেকে বিলিয়ে দাও—যাঁর চরণ ঐ ধূলা, মাটি, কাদার মধ্যে নিয়ত পড়ছে, যাঁর পদ্মহস্ত সংসারের পথ হ'তে কাঁটাখোঁচা সরাতেই ব্যস্ত——সেই ধূলা মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যাও। আপনাকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে ফেল—দিয়ে ফেল! একটুও আপনার জন্ত রেখোনা। কাঁদ-কাঁদ—কাঁদতে ভুলে গিয়েছ?

মহামায়া দুই হস্তে স্বীয় বদন আবৃত করিল। লক্ষ্মী তাহাকে টানিয়া দূরে লইয়া গেল। মহামায়া কাতর হইয়া বলিল "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—আমি ওঁর কাছেই যাব। তোমরা কেউ আমায় যা বলে দিতে পারবেন না, উনি তাই বলে দেবেন।"

লক্ষ্মী। উনি যে পথ দেখিয়ে দেবেন, সে পথ আমাদের পথ নয়। ওঁর মত অত শক্তি তোমার নেই দিদি, তাই বলছি ওঁর কথা শুনতে যেও না পাগল হোয়ে যাবে।

মায়া। আমি অমনি পাগলই হব, আমায় সব ভুলিয়ে অমনি পাগল করে দাও।

লক্ষ্মী। পাগলের দ্বারা সংসারের কোন কাজই হয় না। সংসারে যারা কাজ করে তারা শান্ত, তারা স্থির ধীর! ওঁদের মত লোকে ভাব দিতে পারেন, কাজ দেখাতে পারেন না। যদি কাজ করতে চাও, বাবার নিকট উপদেশ নাওগিয়ে। ওঁর কাছে যেওনা, ওঁকে সহ্য করা তোমার সাধ্য নয়। উনি যে ক্রমশঃ কি হ'য়ে উঠছেন তা কেউ বুঝতে পারে না। যে ক'দিন উনি জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন, সে ক'দিন উনি আমাদের এমন উদ্বেগের মধ্যে রেখেছেন যে, তা বর্ণনা করা যায় না। সারাদিন কোথায় কোথায় যে ঘুরে বেড়ান তার ঠিক নেই, কোন দিন কিছু খান, কোন দিন আহার্য্যের থালা নিয়ে গিয়ে পথে ছড়িয়ে দেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "আমি একা এত কেন খাব?" ওঁর মধ্যে এমন একজন জেগে উঠেছেন, যাকে কিছুতেই সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝবার জো নেই। তুমি বুঝতে পারবে না, তাই তোমায় এখন ওঁর কাছে যেতে বারণ করছি। আগে মা ওঁকে একটু শান্ত করুন তারপর যেও। এখন যদি ওঁর কথা শুনতে যাও, তা'হলে তোমার আগুণে ঝাঁপ দেওয়া হবে।

মায়া কিছুক্ষণ পরে আবার যখন বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইল তখন দেখিল, বিষ্ণু ছাতের উপর পদচারণা করিতেছে। মায়া কিছুক্ষণ সেই ভাবমগ্ন মানুষটীকে দূর হইতে দেখিতে লাগিল, শেষে বিষ্ণু যখন নিকটে আসিল তখন সে নম্রস্বরে বলিল "বলুন আমায় কি করতে হ'বে?"

বিষ্ণু একবার তাহার দিকে অন্যমনস্কের মত চাহিয়া যেন আপন মনে বলিতে লাগিল "কি করতে হবে? যার ভাবের অভাব তাকে ভাব দিতে হবে, যার কাজের অভাব তাকে কাজ দিতে হবে, যার সুখের অভাব তাকে সুখ দিতে এমন কি যার দুঃখের অভাব তাকে দুঃখ দিতে হবে, কাঁদাতে হবে। পারবে তুমি এ কাজের ভার

দিতে? তোমরা মায়ের জাত, তোমরা ভালবাসতে পারবে না? যেটা তোমাদের পক্ষে এত সোজা সেটা করতে পারবে না? মনকে, হৃদয়কে আটকে রেখেছ কেন? তাকে ছেড়ে দাও, তখন দেখবে সব সোজা হ'য়ে এসেছে। কি হবে ছোট্ট একটা সংসার তৈরি করে? সংসারটাকে একটু বড় ক'রে ফেলনা কেন? তুমি পারবে। আর তোমরা যদি না পার তো' কেউ পারবে না।"

বিষ্ণু নীরব হইল তারপর আবার পদচারণ করিতে করিতে ছাতের আর এক প্রান্তে চলিয়া গেল। মায়া কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল, তারপর দূর হইতে উদ্দেশে বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

রবিবার। লীলা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা মন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখিল, রাস্তার একটা গ্যাসপোষ্টের তলায় একটা লোক দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। রাত্রি প্রায় ৯টা। সকলে বাহির হইয়া যাওয়ার পর লীলা ও তাহার মাতা মন্দির হইতে বাহির হইয়াছিলেন। লীলা মন্দিরের সিঁড়ি হইতে নামিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইল। তাহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি তাহার মাতার পার্শ্বে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল 'মা ঐ দেখ শিববাবু দাঁড়িয়ে আছেন।" লীলার মাতা ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন "তাইত।"

দুইজনে গাড়ীতে চড়িয়া সহিসকে দিয়া শিবব্রতকে ডাকাইলেন। শিবব্রত আসিল না, দ্রুত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। লীলার মাতা দুঃখিত হইয়া বলিলেন "আহা, বেচারী এই কয়দিনে যেন শুকিয়ে আধখানা হ'য়ে গিয়েছে। যাই হোক ওর বাড়ীতে এখনি খবর দিতে হবে যে, ও এইখানেই আছে।"

লীলা কোন কথা বলিল না, কিন্তু শিবব্রতের মূর্ত্তি দেখিয়া সেও মনে মনে অত্যন্ত কাতর হইল। সেই শিবব্রতের এই অবস্থা! কোথায় গেল তাঁর সেই সযত্ন সজ্জিত সুন্দর সুঠাম গৌর দেহ? কোথায় গিয়াছে তাঁর সেই মধুর হাস্য? এ যেন সেই পুরাতন শিবব্রতের আত্মা পরলোক হইতে দেখা দিতে আসিয়াছে। লীলা অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল "ওঁকে কি কোন রকমে ফেরাতে পারা যায় না? উনি যেন আত্মহত্যার পথে চলেছেন!"

লীলার মাতা ব্যস্ত হইয়া বলিল "থাম থাম ও কথা বোল না। মা বাপের বাছা মরতে যাবে কেন? অনুতাপ হ'য়েছে তাই দু'দিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চে, আবার শুধরে যাবে।"

লীলা সেই রাত্রেই একখানা পত্র মহামায়াকে লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। মহামায়া তাহার উত্তরে লিখিয়া দিল কাল যেন একবার তাহার সঙ্গে লীলা দেখাকরে। সেই পত্রানুসারে লীলা প্রভাতে উঠিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় দেখে প্রিয়ব্রত তাড়াতাড়ি তাহাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেছে। সেও তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাহার দাদার কক্ষে প্রবেশ করিল।

শশিশেখর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "লীলা কাল কি তোমার সঙ্গে শিবুবাবুর দেখা হয়েছে?" লীলা গতরাত্রের সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিল। প্রিয়ব্রত সাগ্রহে অনেক প্রশ্ন করিল, কিন্তু শিবব্রতের বিষয় আর কিছুই লীলা বলিতে পারিল না। প্রিয়ব্রত হতাশ হইয়া বলিল "সে যদি এমনি করে আপনাকে হত্যা করে তাহ'লে কে তার জন্য দায়ী?"

লীলা এই কথায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন এই শিবব্রতের জন্য সেই দায়ী; সেই তাহাকে এইরূপে মরণের পথে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছে।

প্রিয়ব্রত চলিয়া গেলে শশিশেখর তাহার ভগ্নির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "এমন লোকের সঙ্গে তুমি কোন রকম ব্যবহার রাখতে পাবে না। যে হতভাগা আপন দোষে মরবে, অথচ তার অধঃপাতের জন্য দায়ী করবে অন্য লোককে, এমন লোকের জন্য চিন্তা করা চিন্তার বাজে খরচ। যাও, ওর বিষয়ে আর একটুও ব্যস্ত হ'য়ো না।"

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেল।

কিন্তু সমস্ত দিন একটুও স্বস্তি পাইল না। সারাদিন এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া দ্বিপ্রহরের সময় সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহাদের বসিবার হলে আসিয়া দেখে কে একজন তাহারই ফটোগ্রাফখানার সম্মুখে তন্ময়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রথমটা সন্ত্রস্ত হইয়া পিছাইয়া গেল কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল "শিবুবাবু।"

শিবব্রত চমকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। লীলা গম্ভীরভাবে বলিল "এমন চোরের মত এখানে আসার অর্থ কি? আপনার ভাইবোন এঁরা আপনার জন্য কতখানি উদ্বিগ্ন তা জেনেও আপনি সেখানে না গিয়ে এখানে কেন—?"

লীলার এই স্নেহলেশহীন কথায় শিবু মাথায় হাত দিয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া লীলা আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিল "কেন আপনি এমন হ'লেন! আমাকে যদি ভালই বাসতেন তাহ'লে আমাকে এতখানি লজ্জার মধ্যে ফেলে দেবার আপনার কি অধিকার? ছি ছি একটা সামান্য স্ত্রীলোকের জন্য আপনি কিনা করেছেন? নিরীহ দুটী প্রাণীকে মিছিমিছি জেলে পচিয়েছেন। এর পরও কি আপনার এখানে আসতে লজ্জা হোল না?"

শিবব্রত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল "ক্ষমা কর; আর আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব না।" তোমার সঙ্গে দেখা করব নাই স্থির করেছিলাম কিন্তু পারলাম না, লীলা, তাই একবার এসেছি। এতে তোমার কতটুকু ক্ষতি? আমি ত' কিছুই চাচ্ছি না কেবল একবার মাত্র দু'টো কথা বলে চলে যাব বলে এসেছি। তুমি আমার কথা দুমিনিটের জন্য শোনো এই আমার প্রার্থনা।"

লীলা গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনার সঙ্গে যদি আর একটুও সম্বন্ধ রাখি তা হ'লে একে ত সবাই বলবে যে আমারই দোষে আপনি এ রকম অধঃপাতে যাচ্ছেন, উপরন্তু আমিও আমাকে ক্ষমা করতে পারব না। যে লোক লোভের ও হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে এমন কাজ করতে পারে তার সঙ্গে কথা বলাও অন্যায়। তবে আপনার ভালর জন্য এইটুকু বলতে পারি যে আপনি অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনার যার কাছে ভাই বোনের কাছে আর বিশেষ ভাবে যাদের কাছে অপরাধী তাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিয়ে যদি সাধারণ মানুষ যেমন চলে সেই ভাবে আবার চলতে ফিরতে পারেন তাহ'লে সামান্য পরিচিতের সঙ্গে যে ব্যবহার করিতে পারি সেইটুকু হ'তে আপনাকে বঞ্চিত করব না। এখন যদি ভাল চা'ন ত' আপনার বাড়িতে ফিরে এসে সাধারণ মানুষে যা করে তাই করুন নচেৎ অধঃপাত হ'তে আরও অধঃপাতের পথে অগ্রসর হ'বেন।"

শিব। যদি জানতে লীলা আমি কতদূর অধঃপাতে গেছি, কতদূর মরণের পথে অগ্রসর হয়েছি তা হ'লে আমার জন্য অন্ততঃ একটা নিশ্বাসও ফেলতে। আমি মদ খাই, আরও অনেক অপকর্ম্ম করি কিন্তু সব তোমার জন্য—সব তোমার জন্য।

লীলা। আমি আর এক মুহূর্ত্তও আপনার কাছে থাকতে চাই না—আপনি এখনি এখান হ'তে চলে যান।

শিবব্রত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমায় তুমিই বাঁচাতে পারতে কিন্তু তা করলে না। যার জন্য তুমি আমায় এমন ভাবে পরিত্যাগ করলে তারও এতে ভাল হ'ল না। সেই ভণ্ডও আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। সেই হৃদয়লেশহীন বন্ধুদ্রোহী বিশ্বাস ঘাতক—"

লীলা অস্থির হইয়া বলিল "বেরিয়ে যাও এখান হ'তে তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়, বেরোও বলছি।" লীলার ভয়ঙ্কর ভঙ্গীতে সেই কাপুরুষ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। লীলাও দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িল।

বহুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া সে তাড়াতাড়ি মহামায়ার সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেল। মহামায়াও তাহারই অপেক্ষায় বসিয়াছিল। লীলাকে ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল "কি হয়েছে লীলা?"

লীলা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিল "শীঘ্র তুমি

বিষ্ণুবশার নিকটে গিয়া এই সব কথা বল।" মায়া গম্ভীর ভাবে বলিল "এতদূর হয়েছে? দেখ লীলা, আমাদের ওরা কি চোকে দেখে? নারীদের এই সম্মান? আর এই সম্মানের প্রার্থী হয়ে আমরা আমাদের সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ওদের পায়ে লুটিয়ে দিয়েছি—এমন কি আমাদের সমস্ত জন্মটাই ওদের এই বাসনার আগুনে আহুতি মাত্র।"

লীলা। কিন্তু ওঁকে এই পিশাচের হাত হ'তে রক্ষা করতে হবে।

মায়া। তুমি বিষ্ণুবশার জন্য চিন্তিত? তাঁকে ভগবান রক্ষা করবেন, কিন্তু আমার হতভাগা দাদাটীর তুমি একি করেছ তা একবার ভাবছ না? মানুষের আত্মা কি এমনি করে খেলা করবার জিনিষ? লীলা, বিষ্ণুদাদার জন্য একটুও চিন্তা ক'রও না, একবার এই মানুষটার দিকে সহানুভূতিতে চাও—ভেবে দেখ তার কি করেছ?

লীলা। আমি? তুমিও বলছ আমি করিছি?

মায়া। হ্যাঁ তুমি, তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। যাও, তোমার গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা করে এস তিনিও বলবেন যে তোমারই দোষ। ছোট দা, আমার সেই ছোট দাকে এমন করে নিষ্ঠুরা তুমি সাধুতার ভান করছ। ছিঃ ছিঃ লীলা তুমি না মেয়েমানুষ! যে দৃশ্য দেখলে আর কেউ হ'লে অনুতাপে আর সহানুভূতিতে মরে যেত তুমি সেই দৃশ্য দেখে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা না করে নিষ্ঠুর ভাবে তাড়িয়ে দিয়ে এখন এসেছ সাধু সাজতে? হায় হায় এমন রাক্ষসীর কাছে কেন তাকে যেতে দিতাম। তোমাদের মত মানুষেই আমাদের স্ত্রীজাতিকে এই অপমানের মধ্যে টেনে এনেছে তার ওপর পুরুষদেরও দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করেছে।

মায়া কান্দিয়া ফেলিল। লীলা স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। মায়া কিছুক্ষণ পরে বলিল "তোমাকেই এঁকে বাঁচাতে হবে। ভগবানের কাছে যে অপরাধ করেছ সেই অপরাধের এই শাস্তি তোমায় গ্রহণ করতে হবে।"

লীলা কাতর ভাবে বলিল "বল, যে উপায় হ'ক আমি তাঁকে যদি রক্ষা করতে পারি ত' তাই করব।"

মায়া। ছোট দাকে বিয়ে করে তাকে আবার ভাল করে দিতে হবে। এই তোমার শাস্তি।

লীলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আর কি কোন উপায় নাই?

মায়া। না আর কোন উপায় নেই।

লীলা। আমায় দু'দিন সময় দাও আমি চিন্তা করে দেখি।

মায়া। চিন্তা করবার সময় নেই, লীলা, যদি আরও কোন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটাতে না চাও তাহ'লে মনস্থির করে ফেল। নইলে আমি স্পষ্ট দেখছি এর ফল ভাল হবে না। শেষে অনুশোচনার আর অবধি থাকবে না।

লীলা। দয়া কর দুদিন সময় দাও।

মায়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল "বেশ, দু'দিন সময় নাও কিন্তু যদি ভাল চাও ত' আমার কথা ঠেল না, নইলে লীলা ভবিষ্যতে ভয়ানক হয়ে উঠছে।"

লীলা চিন্তিত মনে প্রস্থান করিল।

বৈকালে গিরিন্দ্রনাথ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্রবেশ করিয়া মহামায়াকে বলিল "শিবুকে এখনি দেখে এলাম, আমি তাকে ফেরাতে পারলাম না। তোমাদের যেতে হবে।"

মহামায়া। কোথায় আছেন তিনি?

গিরীন্দ্র। একটা বেশ্যা বাড়িতে লুকিয়ে আছে?

মায়া। কি ভয়ঙ্কর!

গিরীন্দ্র। ভয়ঙ্কর হোক আর যাই হ'ক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এখনি তোমার দাদাকে ডেকে নিয়ে চল।

মায়া। সেখানে কেমন করে যাব?

গিরীন্দ্র। ভাইকে উদ্ধার করতে যদি নরকেও যেতে হয় তাও যাওয়া উচিৎ; তর্ক করনা, চল। তার যা অবস্থা দেখলাম তাতে পাথর কেটে জল বেরুতে পারে। চল আর দেরী করও না।

মায়া। সেখানে গেলে বাবা কি বলবেন? দাঁড়ান বাবাকে জিজ্ঞাসা করি।

গিরীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল "তোমাদের কাছে এই সামান্য একটু অন্যায় আচরণও বড় হ'ল আর একটা লোক এমন হয়ে যাচ্ছে সেটা ভাবছ না—আর সে যে সে নয় তোমারই ভাই। তোমার দ্বারা হবে না প্রিয় কোথায় বল আমি তাকে নিয়ে আবার যাব, শ্যামাচরনকে ওখানেই বসিয়ে রেখে এসেছি।"

মহামায়া প্রিয়ব্রতের সংবাদ দিতে পারিল না, নিরুপায় হইয়া বলিল "এক কাজ করুন বিষ্ণুদাদাকে নিয়ে যেতে পারেন।" গিরীন্দ্র আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিষ্ণুর নিকট চলিয়া গেল।

বিষ্ণু সমস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গিরীন্দ্রের সহিত শিবব্রতের নিকট উপস্থিত হইল। শিবব্রত বিষ্ণুকে দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ এমন প্রচণ্ডভাবে তাহাকে গালিগালাজ করিল যে গিরীন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণ না থাকিলে বিষ্ণুর ভাগ্যে যে কি ঘটিত তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু বিষ্ণু স্থির প্রতিজ্ঞ, সে এমন কি শিবব্রতের পদধারণ করিতে উদ্যত হইবা মাত্র গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "থামুন আপনি, মানুষ অধঃপাতে গেলে যা হয় তার চূড়ান্ত দেখা গেল। শিবু তোমায় আর কি বলব, একে ত কতকগুলা মিথ্যা ধারণা নিয়ে তুমি এই লোকটির যথেষ্ট ক্ষতির চেষ্টা করেছ; তার ওপর সব চাইতে অধম যে কাজ, আপনাকে হত্যা করবার চেষ্টা করা, তাও তুমি করছ। তোমার স্থান যে কোথায় তা স্বয়ং যমরাজও স্থির করতে পারবেন না। আমরা চল্লাম কিন্তু মনে রেখো এর পর কেউই তোমায় ক্ষমা করবে না। ক্ষমার অতীত হ'য়ে গেলে ক্ষমা করা অন্যায়। এস শ্যামা আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।"

বিষ্ণুযশা ব্যস্ত হইয়া বলিল "ছি ছি গিরীনবাবু কি করছেন ওঁর ওপর কি এখন রাগ করবার সময়! জানি না আমি কি অপরাধ করেছি' কিন্তু আমার ওপরেই যখন রেগেছেন তখন আমি না খেয়ে না দেয়ে এখানেই পড়ে থাকব। যতক্ষণ না উনি আমায় ক্ষমা করেন আমি একপাও নড়ব না!"

গিরীন। আপনাকে এই নরকে আমরা কিছুতেই ফেলে যেতে পারব না। তা হ'লে আমাদেরও থাকতে হ'বে।

শ্যামাচরণ বলিল "তাহ'লে প্রিয়কেও ডেকে আনি গিয়ে তোমরা অপেক্ষা কর।" শ্যামাচরণ বাহির হইয়া গেল কিন্তু বেশী দূর যাইতে না যাইতেই দেখিল প্রিয়ব্রত একখানা গাড়ি করিয়া সেই দিকেই আসিতেছে। প্রিয়ব্রত আসিবামাত্র, শিবব্রত মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল। প্রিয়ব্রত আসিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, নীরবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গাড়িতে উঠিল।

ব্রহ্মযশা ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া শুইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী তাহার পদসেবা করিতে ২ বলিল "একি হ'ল বাবা? ব্রহ্মযশা বলিলেন "তাইত ভাবছি মা, একি হল? বিষ্ণু আমার একি হতে চল্ল।"

লক্ষ্মী। ওঁকে কিছু বোঝাবারও জো নেই। কোন কথা বলতে গেলে দুই চক্ষে জলভরে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকেন যে তখন সব কথা ভুলে যেতে হয়।

ব্রহ্মযশা চিন্তা করিতে ২ বলিলেন "কর্ত্তব্য করে চল মা, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। আর আমার কোন সাধ্য নাই। এতদিন জোর করে তাকে আমার মতে চালিয়েছিলাম কিন্তু সব চেষ্টা সব শিক্ষা বিফল করে সে আপন নিয়মেই গড়ে উঠল।"

লক্ষ্মী। বাবা আপনি যদি এত খানি ভরসাহীন হ'ন তা'হলে শেষে ওর কি হবে? আপনার শরীরও ভেঙ্গে গিয়েছে, অথচ সেদিকেও ওঁর দৃষ্টি নেই; এত করেও যদি ওঁকে আপনি আপনার মতে না আনতে পারেন তা'হলে আর কি উপায় হবে? যাই হোক বাবা আর এখানে নয়—চলুন অন্যত্র যাওয়া যাক।

ব্রহ্মযশা। অন্যত্র গেলেও আর কিছুই হবে না মা, ও আর ফিরবে না। ওর মধ্যে এমন একটা উন্মাদনা এসেছে, যাতে ওকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না

সংসারের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কেটে গিয়েছে, এখন কেবল একটা হাওয়ার অপেক্ষা। তা'হলেই দেখবে ও বেরিয়ে পড়েছে।

লক্ষ্মী। তা'হলে বাবা, আমি কি করব, আমার আর কি কাজ থাকবে?

ব্রহ্ম। ওকথা এখন নয়, এখন ওকথা যদি বেশী চিন্তা করি তা'হলে আমিও পাগল হয়ে যাব। তুমি জান না মা, আমার সমস্ত জীবন, এই একটী মাত্র কাজকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমার সমস্ত আশা বিফল করে দিয়ে ও চলে যায় তা'হলে আমারই বা কি হবে? আমিই বা কি নিয়ে থাকব?

এই সময়ে ভুবনেশ্বরী প্রবেশ করিয়া বলিলেন "লক্ষ্মী এ তোমরা দিনে দিনে কি হতে চল্লে? আজ সমস্ত কাজই পড়ে আছে। তারপর যে কাঁথা আসন গলাবন্ধ প্রিয়ব্রতের দীনাশ্রমের জন্য পাঠাবার কথা তাও পাঠান হয়নি। লক্ষ্মী, তুমি ক্রমশ এমন হয়ে যাচ্চ কেন?"

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিল দেখিয়া ভুবনেশ্বরী তাঁহার স্বামীকেও অনুযোগ করিলেন বলিলেন তুমিও দিন দিন আর এক রকমের হয়ে যাচ্ছ, কি হয়েছে তোমাদের? যে ছেলে গুলি রোজ তোমার কাছে পড়তে আসে তারাও আজ দু'দিন হতে আসেনা। এসব কি হতে চল্ল?"

ব্রহ্মময়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আর যেন আমি পারছিনা ভুবন। বিষ্ণু আমার সব শক্তি হরণ করেছে। সে আমার সব আশা নষ্ট করতে চলেছে।"

ভুবন। ষাট্ ষাট অমন কথা বল না, বিষ্ণু আমার যা হয়েছে তার জন্য তোমার পায়ে শত প্রণাম। এমন ছেলে কত জন্ম তপস্যা করে তবে পাওয়া যায় আর যে ছেলের জন্য তুমি এত চেষ্টা করলে যাকে এত চেষ্টায় এমন ভক্তিমান এমন দেবতার মত করে তুলেছ শেষে তার প্রতি তোমার এ ভাব হচ্চে কেন?

ব্রহ্ম। তুমি স্নেহে অন্ধ, তাই দেখতে পাচ্চ না যে বিষ্ণুর মতি গতি কোন দিকে। যখন সে তোমার সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে যাবে তখন তোমার চোক ফুটবে।

ভুবন। আমায় ছেড়ে সে কোথাও যাবেনা। আর যদি আমাকেও ছাড়ে তা'হলে তোমায় সে কি করে ত্যাগ করবে তাত বুঝতে পারছি না। আর যদি সবাইকে সে ছেড়ে হরি পদই আশ্রয় করে তা'হলেও সে গর্ব্ব রাখবার জায়গা নেই। হলেই বা আমাদের একটু দুঃখ এমন ভক্তকে যে এতদিন কোলে পিটে করে মানুষ করেছি তাই যে আমার বহুমান।

ব্রহ্ম। ছি ছি এতদিন পরে এ বুদ্ধি তোমার কোথা হ'তে জুটল? সংসার ছেড়ে বনেই যদি হরি পদকে আশ্রয় করা হয় তা'হলে আমিই বা কেন ফিরে এলাম? কি আশায় আমি এতদিন সংসারকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। ভুবন, এই সংসারেই নারায়ণকে দেখতে পেয়েছি তবেই ত' এখানে আছি নইলে তোমরা আমার কে?

ব্রহ্মময়া কথা কহিতে কহিতে উঠিয়া বসিলেন। ভুবনেশ্বরী-স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আমায় ক্ষমা কর আমি ভেবেছিলাম বিষ্ণু যা হয়েছে তাই বুঝি তুমি চাও।"

ব্রহ্ম। না আমি তা চাইনা। আমাদের দেশে তার অভাব কখনও হয়নি বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য দেব, কবির নানক এই রকম শত শত ত্যাগী বৈরাগ্যধর্ম্মী আমাদের দেশে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল একবারই জন্মেছিলেন। সেই মহা কর্ম্মী মহাযোগী মহা গৃহীকে আবার চাই—সেই মহান আশায় আমি বিষ্ণুকে সংসারের সকল দিকের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে তাকে গৃহধর্ম্মাবলম্বী করে তারই চেষ্টায় সেই জগদেক গৃহীকে আনবার আশায় আছি। কিন্তু বিষ্ণুর সবই হ'ল কেবল একটী মাত্র ভাবের অভাবে সে ভক্তির সর্ব্বস্ব ত্যাগকেই একমাত্র সারধর্ম্ম বলে গ্রহণ করতে চলেছে ভক্তির ভোগ বা নিষ্কাম কর্ম্মকে সে গ্রহণ করলে না। সর্ব্বজীবে দয়া তার লাভ হয়েছে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শনের পথে সে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু তার ফলে সে শান্ত সংযত না হয়ে উচ্ছৃঙ্খল

উন্মাদ হয়েছে। প্রেমে তাকে সবারই সঙ্গে বেঁধে না দিয়ে সংসার হ'তে খুলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ আমি চাই না, আমি যা চাই তা এই লক্ষ্মী বুঝেছে তাই এও আমারই সঙ্গে মর্ম্মাহত।"

ভুবনেশ্বরী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "কৈ আমিত এসব কিছুই বুঝতে পারিনা। আমি রোজই দেখি সে আপনা ভুলে পরকে নিয়ে পরের দুঃখ কষ্ট নিয়েই আছে। তার কাছে যারা আসে তারাও ত ঐসব ভাব নিয়েই যায়। প্রিয়ব্রত গিরীন্দ্র এমনকি মহামায়াও ত কৈ একথা বুঝতে পারে না। তারাও আসে তারপর চুপকরে বসে কতকথা শোনে তার পর সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দেয়। বিষ্ণু যদি অন্তরে ২ সংসার ছেড়ে পালাবারই কল্পনা করেছে তা'হলে অন্য কাউকে ত' সে ভাবের কোন কথা বলে না। আর যদিই বা তাই হয় তুমিই বা কেন তার মতি গতি ফেরাবার চেষ্টা করছনা।

ব্রহ্ম। তা করছি বৈকি সারা জীবনই করছি। আমার জীবন উৎসর্গ করে তাকে তাই বোঝাচ্ছি কিন্তু সে বুঝে না।

ভুবন। আমি বোঝাব।

ব্রহ্ম। তাই কর, তাই তোমার জীবনের ব্রত হক। সংসারে টাকা আনা পাইয়ের হিসাবের চাইতেও আদর্শকে বাঁচিয়ে চলাই প্রয়োজন গৃহিণীপনা অনেক হয়েছে এখন এই মহান কর্ত্তব্যকে তোমরা দু'জনে বাঁচাবার চেষ্টা কর। লক্ষ্মী, জেনো আর তোমার কোন কাজ নেই ঐ এক মাত্র কাজ।

লক্ষ্মী প্রণাম করিয়া ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত দিন একটুও স্বস্তি পাইল না। প্রিয়ব্রতের দীনাশ্রমের জন্য যে সব বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা পাঠাইয়া দিল, বহুবার উপর নীচ করিল, বাড়িতে কেহ অতিথি না থাকিলেও যে ঘরখানি অতিথির জন্য রাখা হইয়াছিল তাহাকে বারম্বার ঝাড়ামুছা করিল, বহুবার বিষ্ণুর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি নাড়িয়া চাড়িয়া সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিল। তবু যেন দিন কাটে না? এমন ত কোন দিন হয় না। কেন আজ বিষ্ণুর দেখা পাইবার জন্য তার এত ঔৎসুক্য? রোজই ত বিষ্ণু নানা স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রে বাটী প্রত্যাগমন করে, কিন্তু কৈ কোন দিনই ত এমন হয় না। আজ অকারণে কেবলই লক্ষ্মীর মন বিষ্ণুর দিকে ছুটিয়া চলিতে চাহিতেছে।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় হঠাৎ সেই পরিচিত পদ শব্দ শুনিয়া সে দুই হাতে হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া উপর হইতে নিম্নতলে ছুটিয়া গেল। কিন্তু মধ্যপথেই বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা হইল। বিষ্ণু ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বলিল "লক্ষ্মী! তোমার দাদাকে ধরে এনেছি।"

লক্ষ্মী। কোথায় তিনি!

বিষ্ণু। ঐ ঘরে বসে আছেন, কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া দাওয়া হয়নি। তুমি শীঘ্র তাঁর পূজাহ্নিকের ব্যবস্থা করে দাও, আর আমি মাকে ওঁর আহারের ব্যবস্থা করতে বলতে চল্লাম।

লক্ষ্মী। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

"যাও" বলিয়া বিষ্ণু উপরে চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তাহাদের অতিথি-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল চৌবেজী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ্মীকে দেখিবামাত্র তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "আমায় ক্ষমা কর।" লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল "দাদা অমন কথা বলবেন না, আমার অপরাধ হবে। আপনি বসুন আপনার সমস্তই জোগাড় করে দিই।"

চৌবে। আগে আমার কথা শোনো।

লক্ষ্মী। কথা পরে শুনব এখন থাক।

লক্ষ্মী নিমেষের মধ্যে সমস্ত জোগাড় করিয়া ভ্রাতার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করাইয়া তাঁহাকে আহ্নিকে বসাইয়া দিল। চৌবেজী আহ্নিক করিবেন কি কাঁদিয়াই বক্ষ ভাসাইলেন। তারপর কোনক্রমে সমস্ত সারিয়া ব্রহ্মযশার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "আপনারা দেবতা আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। লোভে পড়িয়া আপনাদের অনিষ্ট করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু তার শাস্তি ভগবান দিয়াছেন। আমার আর কিছুই নাই, এমন কি গৃহে ফিরিবার গাড়ি ভাড়া পর্য্যন্ত নাই। ভিক্ষা করিয়া এই কয়দিন কাটাইয়াছি, ক্ষুধার কলের

জল খাইয়া জাতি নষ্ট করিয়াছি, এখন আপনারা দয়া না করিলে আমি বাঁচিব না। আমি হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু আপনাদের নিকট ক্ষমা না চাহিয়া কিছুতেই ফিরিতে পারিলাম না। পণ্ডিত জি, আমায় ক্ষমা করুন।"

ব্রহ্মযশা হাসিয়া বলিলেন "ক্ষমা আর কি করিব, আপনি আমাদের আত্মীয় আপনার দোষ ধরিয়া আপনার উপর রাগ করিয়া থাকা অন্যায়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনার ওরূপ মতি হইল কেন।"

চৌবে। লোভ, পণ্ডিত জি, লোভ। আমি অতি দরিদ্র, শিবব্রত আমায় বলেন যে লক্ষ্মীকে হস্তগত করিতে পারিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে।

লক্ষ্মী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল "তা হ'লে বাবা ঐ টাকা গুলা যাতে উনি পান তাই করে দেন।"

চৌবেজী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না না অমন কাজ করিবেন না। আমার মত লোককে প্রশ্রয় দেওয়া উচিৎ নয়। আমার উচিৎ শাস্তি হ'ক, আমি এক পয়সা লইতে পারিব না। আপনারা দেবতা, কিন্তু পাপীর দণ্ড না দিলে আপনাদের অন্যায় হবে। আমি ভিক্ষা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতে পারি ভাল, নচেৎ রাস্তাতেই মরিব!"

লক্ষ্মী। ছি ছি আপনি অমন কথা বলবেন না। আমার যা কিছু অর্থ আছে সবই আপনার। আর যদি ইচ্ছা করেন আমার "ভৌজি" কে আর ভ্রাতষ্পুত্রকন্যাদের এইখানেই আনান, এর পর সম্বলপুরে আমরা সকলে একত্রেই থাকব। আমাদেরও যদি দুবেলা দুমুটো জোটে আপনারও অভাব হবে না।

চৌবেজী কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এঅবস্থায় কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে ব্রহ্মযশা গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ইহাই আপনার শাস্তি। যাদের অপকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাদের কাছেই আপনাকে উপকার লইতে হইবে। আমরা আপনার কোন কথা শুনিব না, কল্য আপনি আপনার গৃহে ফিরিয়া যান এবং শীঘ্র সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আপনার পরিবার সমেত সম্বলপুরে ফিরিয়া আসিবেন।"

চৌবেজী মরমে মরিয়া গেলেন কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিলেন না। লক্ষ্মী তাঁহাকে লইয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে শয়ন করাইল। তারপর বিষ্ণু আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলে, তিনি তাঁহার সংসারের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করিলেন। তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিষ্ণু বলিল "লক্ষ্মী, এঁর কিছুই করতে পার না? এঁর সমস্তই গিয়েছে, কিন্তু তুমি ত আছ? তোমার যা কিছু আছে এঁর উপকারে ব্যয় করনা কেন?"

চৌবে। সে কথা আর উহাকে শিখাইতে হইবে না।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া লক্ষ্মী ও বিষ্ণু চৌবেজিকে শয়ন করাইয়া আপনাদের কক্ষে ফিরিয়া গেল। শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মী, বিষ্ণুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। বিষ্ণু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল "ওখানে বসলে কেন? লক্ষ্মী বলিল "আজ তোমার জন্য আমি যে ব্যস্ত হয়ে ছিলাম!"

বিষ্ণু। কেন?

লক্ষ্মী। সে কথা বলছি, আগে আজ সমস্ত দিন কোথায় ছিলে তা বল।"

বিষ্ণু তাহাকে উঠাইয়া শয্যায় উপবেশন করাইয়া বলিল "লক্ষ্মী একটা কাজ করতে পার?"

কি কাজ?

বিষ্ণু। লীলাবতীর সঙ্গে যাতে শিবব্রতের বিবাহ হয়। আচ্ছা আজ সমস্ত দিন তাকে নিয়ে ঘুরেছি। তার মনের যে কি অবস্থা তা তোমায় কি বলব? সে যে ভালবাসাটা লীলাকে দিয়েছে তা যদি আর কিছুতে দিত, যদি ঐ ভালবাসা নারায়ণের চরণে উৎসর্গ করত তা হ'লে সে যে কত আনন্দের হ'ত কে জানে? মানুষ এমনি করে আপনাকে অপচয় করছে।

লক্ষ্মী। তবে কেন আবার ঐ লোকটার সঙ্গে লীলার বিবাহের চেষ্টা করতে বলছ?

বিষ্ণু। তা হ'লে বোধ হয় লীলার দ্বারাই ওর মন ঠিক

কাজে নিয়োজিত হবে। লীলাই ওকে ভাল করতে পারবে।

লক্ষ্মী। আর লীলা যদি তাতে অস্বীকৃত হয়। আমি তার মন জানি, এখন হয়তো তার পক্ষে এটা অসম্ভব।

বিষ্ণু। কেন? একটা লোকের এতখানি উপকার হবে আর লীলা তা করবে না। একটা লোক এমন করে আপনাকে নষ্ট করছে, আর তা' তারই জন্য তবু সে চুপ করে বসে থাকবে? এ হ'তেই পারে না।

লক্ষ্মী। লীলা যদি মনে মনে আর কাউকে আত্মসমর্পন করে থাকে?

বিষ্ণু। মনে মনে আত্মসমর্পন মানে কি?

লক্ষ্মী। যদি মনে মনে সে কাউকে স্বামী বলে বরণ করে থাকে।

বিষ্ণু। স্বামী বলে বরণ করে থাকে? সমাজ আর ধর্ম্মই মানুষকেই স্বামী স্ত্রী করে দিতে পারে। মনে মনে বরণ করা অর্থে আপনার আন্তরিক লোভের বশবর্ত্তী হয়ে একজনকে চাওয়া। সে বরণ করায় কোনই বন্ধন সৃষ্ট হ'তে পারে না। আর একজন তার জন্য মন প্রাণ দিয়ে কাঁদছে আর সে কেবল আপনার একটা লোভের বশবর্ত্তী তার উপকার করবে না? না লীলা এত নীচ নয়।

লক্ষ্মী। তা হ'লে শিবব্রত ওত একটা লোভের বশবর্ত্তী হয়ে লীলাকে চাচ্চে, তবে কেন তার লোভের প্রশ্রয় দিতে চাচ্চ?

বিষ্ণু। সে কথা ঠিক কিন্তু লীলাও অবিবাহিতা, শিবব্রতও তাই। এদের বিবাহও আগে স্থির ছিল। লীলাই তাকে তার প্রতি অনুরক্ত করেছে; এখন সে কর্ত্তব্য করবে না কেন? মানুষের যে সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা আছে, সেগুলাকে নানা রকম বন্ধন সৃষ্টী করে সংযত করবার জন্যই সংসার। লীলা ও শিবব্রতের মধ্যে বিবাহ না ঘটবার কোন কারণই নেই। আর অতই বা লীলা দেখতে যাবে কেন? বিবাহে ভালবাসার যদি এতই প্রয়োজন হয় শিবব্রতের নিকট হ'তে তা সে যথেষ্টই পাবে। আমি ত' বলি সংসারে স্নেহময়ী নারী জাতির আর কিছুই দেখার দরকার নেই। সে চিরদিনই আপনাকে উৎসর্গ করে মানুষের উপকার করে আসছে, সে ভালবাসার বন্ধনের মধ্যে বেঁধে মানুষকে পশুত্ব হতে দেবত্বের দিকে নিয়ে যাচ্চে। স্ত্রীলোকেরাও যেমন একজনকে ভালবাসতে শিখে শেষে সেই ভালবাসা ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমশঃ বিশ্বের দেবতার দিকে আপনাকে টেনে নিয়ে যাচ্চে, তেমনি তাকে ভালবেসে পুরুষেরাও ক্রমশঃ আপনার ক্ষুদ্র আত্মা থেকে বেরিয়ে হরিপদের দিকেই অগ্রসর হচ্চে। সত্য বলছি লক্ষ্মী, এমনদিন ছিল যখন আমায় যদি কেউ অমন করে চাইত তা'হলে হয়তো আমিও সমস্ত জীবন তার জন্য উৎসর্গ করতে পারতাম।

লক্ষ্মী। হয়তো লক্ষ্মীই তোমায় অমনি করে চাইছে। তুমি জাননা এও হ'তে পারে যে শিবব্রত লীলাকে যেমন সমস্ত দেহ মন আত্মা দিয়ে কাছে পেতে চাচ্চে তেমনি করেই হয়তো লক্ষ্মীও তোমায় চাইছে। তুমি কি তার জন্য তোমার এখনকার সব ভাব ছেড়ে থাকতে পার? তুমি কি তার জন্য এই সংসারে এই একজন হয়ে এর মধ্যে থেকে বাবা যেমনটী চান তেমনি মানুষ হ'তে পার?

বিষ্ণু কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "লক্ষ্মী, এ কথার অর্থ কি? আমার মত লোককে কেউ অমন করে ত' চাইতে পারে না। তুমি কি বুঝতে পারছ না লক্ষ্মী যে, সারা জীবন আমাকে এমন একজন টানছেন, যাঁর আকর্ষণের কাছে সব তুচ্ছ। আমি যে কত কষ্টে এখানে আমাকে আবদ্ধ রেখেছি তা তুমি বুঝতে পার না। শুধু বাবা মা আর তুমি, তোমাদের জন্যই আমি এখনও বসে আছি আর শয়নে স্বপনে সেই আকর্ষণকে অনুভব করে কাঁদছি। কিন্তু তাঁকে জানব, তাঁকে দেখব, তাঁকে এনে এই অবিশ্বাসী সংসারের ঠিক মাঝখানটিতে প্রতিষ্ঠিত করব। আমাকে এখন চাওয়া যা একটা হাওয়াকে চাওয়াও তাই। এখন আর কেউ আমায় পেতে পারে না, যাঁর সব এখন আমি তাঁর।

লক্ষ্মী। তবে যে বল্লে যদি কেউ তোমায় ভালবাসে তা হ'লে তার জন্ম তুমি সব করতে পারতে।

বিষ্ণু। আগে হ'লে হয়তো পারতাম, এখন আর পারি না। এখন আমায় যিনি অধিকার করেছেন তাঁর কাছে কে এগুবে। তিনি যেখানে আপন স্বত্বাধিকার স্থাপিত করেছেন সেখানে আর কেউ যাবে না। এখন অমন করে এ সংসারের কেউ আমায় টানতে পারবে না। যদি পারত তা হ'লে এতদিন বুঝতে পারতাম। সে আকর্ষণ আমার কাছে গুপ্ত থাকত না। মা পারছেন না, বাবা নয়, তুমি নও তাহ'লে আর কে পারবে? আমার কথা বিশ্বাস না হয় তুমি অনুসন্ধান করে দেখ।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ অধোবদনে চিন্তা করিল এবং মনে মনে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল "লীলা যদি তোমায় প্রাণ দিয়ে চায় তা'হলে তুমি সংসারে মন দেবে? বল, একবার বল যে তুমি তা'হলে তার জন্য সব করতে পারবে তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই প্রমাণ করে দেব যে সে তোমায় ঠিক অমনি কাতর ভাবেই প্রার্থনা করছে।"

বিষ্ণু। তার চাইতে কেন বলতে পারছ না যে তুমিই আমায় অমনি করে মন প্রাণ দিয়ে চাইছ। তুমি একবার সেই আপনা ভোলা জগৎ ভোলা প্রেমের আস্বাদ পাইয়ে দাও না আমায় লক্ষ্মী। বুঝিয়ে দাওনা কেন কি করে আপনাকে ভুলে ভালবাসার বস্তুতে মিশিয়ে যেতে হয়। তা হ'লে যে আমার অনেক শিক্ষা হয়। তোমার কাছে সব চেয়ে বড়—কর্ত্তব্য, সব চাইতে বড়—বাবার মতামত, বাবার আদর্শ। একটা আদর্শের পেছনে ছুটতে ছুটতে তোমরা সবই যে হারিয়ে ফেলেছ; আর জগতের অন্তরের মাঝখানটিতে যিনি প্রেমময়রূপে আছেন তাঁকেও অবজ্ঞা করেছ। পার লক্ষ্মী একবার সেই রকম উন্মাদ করা প্রেম দেখাতে? না পার যদি তাহ'লে অপেক্ষা কর আমি শেখাব, নিশ্চয় শেখাব। আমার মধ্যে সেই প্রেমের উদয় হচ্ছে।

লক্ষ্মী তাহার স্বামীর আরও নিকটে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল "আমি তোমায় তেমন করে বাঁধতে পারছি না বলেই একবার দেখতে চাই আর কেউ যদি তোমায় বাঁধতে পারে। তোমার ওপর আমাদের সমস্ত আশা নির্ভর করছে অথচ তুমি ভাবোন্মত্ত হয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছ। তোমায় আমি চাই আমার আর বাবার চিরদিনের আশার সফলতার জন্য। নইলে আমিত তোমার কেউ নয়। সংসারে আমরা যে জন্য এসেছি সেইটেই চিরদিন আমার কাছে সব চাইতে বড়। তোমার আর আমার মধ্যে সেই ভবিষ্যৎটাই একমাত্র বন্ধন। তা যদি না হবে তা হ'লে কি কারণে আমি তোমাদের কাছে আছি, কিসে আমায় তোমার পায়ে এনে ফেলেছে। একি তুমি বুঝতে পারছ না যে আমার আর কোন কাজ নেই কেবল সেই আদর্শকে সফল করাই কাজ। যাকে তুমি পেতে চাও তিনিই ত আমাদের অবলম্বন করে এই সংসারেই দেখা দেবেন। সেই কারণেই আমি তোমায় এই সংসারে বেঁধে রাখতে চাই। কিন্তু যদি আমি সে কাজ করতে না পারি আর লীলা সক্ষম হয় তাহ'লে আমার কর্ত্তব্যই হচ্চে তাকে এনে তোমার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, কারণ তার মনের কথা আমি জানি তাই এই সাহস করছি। বল যদি কেউ তোমায় মন প্রাণ দিয়ে সম্পূর্ণ ভালবাসে তাহ'লে তার জন্য তুমি সংসারে থাকবে?

বিষ্ণু। লক্ষ্মী! আমার বুকটায় হাত দিয়ে দেখ দিকি?

লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষে হাত দিয়া অনুভব করিল যে উহার বক্ষের মধ্যে ভয়ানক কম্পন উত্থিত হইতেছে। সমস্ত শরীর থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বিষ্ণু নিমীলিত নেত্রে কিছুক্ষণ থাকিয়া অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে বলিল "লক্ষ্মী, ছেড়ে দাও, আর আমায় বাঁধবার চেষ্টা করও না। কেউ পারবে না আমায় ধরে রাখতে! হরি যাকে চান তাকে আর কারও চাওয়া অসম্ভব। লীলার সাধ্য কি আমায় আমি যেমন চাই তেমন ভালবাসে। নিজের মন দিয়ে বুঝে দেখ যে লৌকিক প্রেমের খেলা খেলতে যারা আসে তারা কি আমার মত পাগলাকে ভালবাসতে চাইবে। তোমার ইচ্ছা হয় লীলাকে কালই ডেকে জিজ্ঞাসা করও সে আমায় বিবাহ করতে চায় কিনা।"

বিষ্ণু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহিরে উন্মুক্ত আকাশের তলে গিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মী কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জানুপাতিয়া বসিল। তারপর জোড় করে নিমীলিতনেত্রে নারায়ণের পদে আপনার আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়া শয়ন করিল

মহামায়াদের একটী প্রতিবাসীর গৃহে একটা বিবাহের উদ্যোগ হইতেছিল। বিবাহও একটী বালিকার এবং সে-ও মহামায়ার একটী ছাত্রী। মহামায়া এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য সেই প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া গৃহকর্ত্তাকে অনেক বুঝাইল। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না এমন কি মহামায়াকে অনেক দুর্বাক্য শুনাইয়া বিদায় করিলেন। মহামায়া তখন নিরুপায় হইয়া গিরীন্দ্রনাথকে ধরিল। গিরীন্দ্রনাথ বলিল "তোমার ছাত্রীগুলিকে অঙ্ক শিখাই, গল্প বলি এই ঢের তার ওপর এসব সামাজিক গুরুগিরি করতে পারব না। বিশেষতঃ বাল্য বিবাহ আমার মতে নিতান্ত অন্যায় নয়।"

মায়া। তর্ক করবেন না, এখনি যান ; আজকেই তাদের আশীর্ব্বাদ।

গিরীন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া কন্যাকর্ত্তার নিকটে গিয়া বুঝাইতে লাগিল। কন্যা কর্ত্তা বৃদ্ধ এবং একটু কোমল প্রকৃতির লোক। তিনি বলিলেন "বাবা সবই বুঝলাম, কিন্তু মেয়েটী ১২ পেরিয়ে ১৩য় পড়েছে আর বেশী বড় হ'লে তার যে বিয়ে দেওয়া শক্ত হবে।" গিরীন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার হাতে অনেক সৎ পাত্র আছে। মেয়েটীকে বড় করে তাকে বিবাহের দায়ীত্ব বুঝতে শিখিয়ে তার বিবাহ দিলে বিবাহের সব ফলই ফলবে। আর বিশেষতঃ আমাদের বিবাহের শাস্ত্র যদি একটু আলোচনা করে দেখেন, মন্ত্র-গুলা পড়ে দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন যে বড় করে বিয়ে দেওয়াই সনাতন রীতি।

কন্যাকর্ত্তা। কিন্তু বাপু, এত সস্তায় এমন ভাল পাত্র পাওয়া গিয়েছিল তা কি আর পাওয়া যাবে।

গিরীন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন "আপনি কুলীন কায়স্থ সন্তান, আপনি ছেলে কিনে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ? ছেলেমেয়ে কি ঘটি বাটী যে তার দাম দিচ্ছেন ? ভয় নেই আপনাকে লিখে দিচ্চি যে আপনার মেয়ের বিবাহে ব্রাহ্মণ ভোজন ছাড়া কোন ব্যয় হবে না। যদি হয় আমরা দেব আপনি লিখে নেন।"

কন্যাকর্ত্তা। না বাবা লিখে দিতে হবে না কিন্তু বাড়ির মধ্যে কি আমার কথা শুনবেন ? আমি যে তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠব না।"

গিরীন্দ্র। আপনার কাছে কালকেই টাকা মজুত করে রেখে দেব। আপনি এই টাকা যেমন করে খুসী বেঁধে রাখবেন যদি এর পর আপনার মেয়ের বিয়ে না হয় তা'হলে ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত করে আপনি আপনার মেয়ের বিয়ে দিবেন।

কন্যাকর্ত্তা আর কোন আপত্তি করিলেন না। গিরীন্দ্র সব কথা গিয়া মহামায়াকে জানাইল। মহামায়া রাগিয়া বলিল "ছি ছি টাকা ঘুস দিয়ে কার্য্যোদ্ধার করলেন! উন্নত মতের কি একটা মান্য নেই ?"

গিরীন্দ্র। আমাদের কার্য্যোদ্ধার নিয়ে কথা স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ। যদি আমাদের motive ভাল থাকে তাহ'লে means যদি সময় সময় একটু আদটু অন্যায় রকমের হয় তাতে কিছু যাবে আসবে না।

মহামায়া গুম্ হইয়া রহিল। গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "আর কিছু কাজ আছে ?"

মহামায়া বলিল "আপনি যে 'আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের' একটা খসড়া তৈরি করবেন বলেছিলেন তার কি হ'ল ?" গিরীন্দ্র নাথ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "দেখ মায়া ঐ সব আদর্শ টাদর্শ দেবে তোমার দাদা, শ্যামাচরণ করবে তার criticism, আমি করব সেটা কাজে পরিণতের চেষ্টা। এই রকম division of labour না করে নিলে চলবে না।"

মহামায়া বিরক্ত হইয়া বলিল "আপনি যদি আমার কাজ গুলাকে এমন অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন তা'হলে আর আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইব না।"

গিরীন্দ্র। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কাজকে অবজ্ঞা করব!

এতখানি দুঃসাহস আমার হতে পারে? তবে সব কাজের মধ্যে একটু হাসিখুসি ঢুকিয়ে দিতে পারলে সে কাজের গুরু গম্ভীর ভাবটা চলে যায় মনটাও বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকে। এতে কাজটাও হয়ে যায় মনটাও ভারাক্রান্ত হয় না।

মায়া। আমাদের এই কাজের মধ্যে হাস্যোদ্দীপক কিছুই নাই। এতে যে হাসতে চায় সে এর অপমান করে।

গিরীন্দ্র। তুমি যা আরম্ভ করেছ তার মধ্যে যে টুকু হাস্যরস আছে তা একদিন না একদিন তোমার চোখে পড়বেই। তবে নিতান্তই যদি Don Quixot বা Sanco Panza হয়ে থাক তা'লে আলাদা কথা।

মায়া আর কোন কথা বলিল না দেখিয়া গিরীন্দ্র চলিয়া গেল। মায়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে তাহার পিসীমাতা রাগিয়া অস্থির হইয়াছেন এবং তাঁহার ক্রোধের সমস্ত বিষাক্ত অংশটুকু তাহার ভ্রাতা প্রিয়ব্রত হাস্য মুখে উপভোগ করিতেছে। মায়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে বড় দা?" প্রিয়ব্রত বলিল "আমি পিসীমাকে বলেছি যে এখন আমাদের খরচ কমাতে হবে। চার দিকে যে রকম টানাটানি পড়েছে তাতে কোনদিন কি হয় বলা যায় না।"

মায়া। কিসের টানাটানি?

প্রিয়। কিসের আবার, টাকার? এ বৎসর আমাদের সমস্তই লোকসান হয়ে গিয়েছে তাত' জান। আমাদের বিশ্বাস করে কতলোক আমাদের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখেছে, এখন আমাদের credit বজায় রাখবার জন্য আর যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয় তা'রই জন্য আমি সবদিক হতে চেষ্টা করছি এসময় তোমরা যদি সাহায্য না কর, তা'লে আমি নিরুপায়।

মায়া। তাই বলে কি যারা আমাদের ও'পরে নির্ভর করে আছে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খেতে হবে? বাড়ীর খরচ কমান হবে না।

পিসীমা সুবিধা পাইয়া বলিলেন "বলত মা, তা কখনও হয়? যারা আমাদের মুখ চেয়ে আছে তাদের বঞ্চিত করে তোদের "ব্যাঙ্কো ম্যাঙ্কো" বাঁচাতে হবে? ও "ব্যাঙ্কো ম্যাঙ্কো" তুলে দিগে যা প্রিয়। খরচ কমাতে হবে বলে কি সতু বীনু কালীর ইস্কুলের মাইনে কাটবি, না ক্ষেতুর মা সদুর পিশির জলখাবার বন্ধ করবি? কোন দিন তুই বলে বসবি ঠাকুরের টেকলী দিয়ে কাজ নেই। না না এসব ক্ষ্যাপামী বুদ্ধি ছেড়ে দে প্রিয়।"

প্রিয়। আচ্ছা পিসীমা, যদি এমন দিন হয় যে আমাদের এই বাড়িটী পর্য্যন্ত বিক্রি করে তোমাদের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হয় তা'হলে—

পিসিমা কাণে হাত দিয়া বলিলেন "ষাট্ ষাট্ ও প্রিয় বাবা আমার, অমন কথা বলিসনে। মায়া তুই একটু প্রিয়কে বোঝা, জানিনে বাছা দিনে দিনে এ তোমাদের কি বুদ্ধি হচ্চে। তোর বাবার শরীর এমন হয়েছে তার ওপর এইরকম যদি হতে চল্ল তা হ'লে তোদের নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব?

পিসিমা ব্যস্ত হইয়া তাঁহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া গেলেন। মহামায়া ম্লান মুখে প্রিয়ব্রতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "দাদা তাই কি? আমরা কি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছি? কৈ তাত কিছুই বুঝতে পারিনে আমরা? তোমার public কাজগুলাও ত কৈ একটু কমাও নি?"

প্রিয়। যতক্ষণ না মরব ততক্ষণ ত' তা পারব না। সে গুলাকে বাঁচাইবার জন্য চারদিক হতে হাত গুটিয়ে আনবার চেষ্টা করছি। তোমাদের এসব এতদিন বলি নি তার কারণ তোমরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত আছ। আমার কাজ তোমাদের সকলকে রক্ষা করা, সেই করবার চেষ্টা করছি, তোমাদের যা কাজ তা তোমরা জান। তাই আমি তোমাদের ব্যস্ত করি নি।

মায়া। তাই তোমায় এত উদ্বিগ্ন দেখি। কিন্তু এও তোমার একার কাজ নয় আমাদেরও সাহায্যের প্রয়োজন। আমিও আজ হ'তে তোমায় সাহায্য করব। ছোটদা কি করছেন? তাকে কেন সঙ্গে নাও না?

প্রিয়। এই দেখ কি রকম অবস্থা আমাদের। আমরা ভাই বোন অথচ পরস্পর পরস্পরের খবর রাখি না। মায়া এটা কি ভাল?

মায়া। না তা ভাল নয় আজ হ'তে বাড়ীর ভার আমার, তুমি নিশ্চিন্ত মনে Office দেখ গে। ছোটদাকেও একটা কাজে লাগিয়ে দাও।

প্রিয়। তার ওপরে গিরীনদের সঙ্গে কাজ করবার ভার নিয়েছি। আর তাকে বসিয়ে রাখবার জো নেই।

মহামায়া গৃহস্থালীর নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ করিয়া দিল, এবং তাহার হাত পড়াতে শীঘ্রই সর্ব্বদিকেই অনেক সুবিধা হইয়া উঠিল। তাহার পিতার অসুস্থতা স্বত্বেও সে আপন খেয়ালে ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহার মনে মনে ধিক্কার জন্মিল। তাই সে ঘড়ি ঘণ্টা ধরিয়া তাহার পিতার সেবার ব্যবস্থা করিয়া গিরীন্দ্রকে ও শ্যামাচরণকে ডাকিয়া বলিল "যত দিন না আমাদের সংসারের অবস্থা সুধরাতে পারি ততদিন আমার কাজগুলা যেন পণ্ড না হয়।"

গিরীন্দ্র। গরুর কাজ ছাগলকে দিয়ে হবে কেন? তুমি যে বাড়ী বাড়ী গিয়ে তোমার মত প্রচার করে আস তাই বা আমি পারব কি করে, আর অমন বানিয়ে বনিয়ে প্রবন্ধই বা লিখব কি করে? তোমার Journalএর সম্পাদকী করতে পারি কিন্তু লেখক পরিচালক এবং পাঠক এক সঙ্গে এতগুলা হওয়া আমার দ্বারা অসম্ভব। তা ছাড়া তোমার দাদার তাঁবেদারীও আমায় চালাতে হবে—আজ এ গ্রামে যাও সমবায় সমিতির কাজে, ও জমিদারের কাছে যাও ধর্ম্মগোলার জন্য, ও কৃষি বিদ্যালয়ে যাও নূতন সারের উপাদান শিখতে এ এত আমি করি কি করে?

শ্যামাচরণ গম্ভীর ভাবে বলিল "আত্মপ্রশংসাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যার সমান বলেছে।"

গিরীন্দ্র। ঐ রে আবার মনু যাজ্ঞবল্ক্যের কবলে পড়ে গেলাম। দোহাই শ্যামা, একেই Frying panএ আছি তার ওপর Fire জুটিও না। এখন চল দেখি হরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে "——" লেনে যাওয়া যাক।

মায়া। ওখানে কেন?

গিরীন। আর সে কথা বোলো না, এগুলা আবার বিষ্ণু বাবুর কাজ; তিনি এই এক নূতন বিপদ জুটিয়েছেন। এক ট্রামগাড়ির কণ্ডাক্টারের মৃত্যু হওয়ার পর হ'তে তার বাড়ীর সমস্ত ভার নিয়েছেন তিনি। হরেন ডাক্তারকেও মজিয়েছেন। বেচারী এখন দিনে পয়সার পসার নিয়ে খেটে খেটে মল। আমায় খবর নিয়ে তার কাছে যেতে হচ্চে যে ওখানে একটী ছোট ছেলের আজ তিন দিন হতে কৃমি-বিকার হয়েছে। আমরাও যে বিকারে মারা যাই সে খবর ত কেউ রাখবে না কেবল "হুকুম" "হুকুম" "হুকুম"।

শ্যামা। অর্থাৎ উনি বলতে চান যে কেবল philanthropy তে কোন কাজ হবে না বলে উনি ঐ দরিদ্র পরিবারটীর অন্ন সংস্থানের ভার নিয়েছেন? কিন্তু ওঁর cottage industry নিয়ে খাটবার জন্য একটা family হাতে পেয়ে নিজেরও যে অনেকখানি সুবিধে করে নিয়েছেন তা বলছেন না।

মায়া প্রীত হইয়া বলিল "গিরীনবাবুর যত খাটুনি বাড়ছে ততই ওঁর ভাঁড়ামীও বাড়ছে।"

শ্যামাচরণ ও গিরীন্দ্র চলিয়া গেলে, মায়া তাহার পিতার নিকটে গিয়া তাঁহাকে ঔষধ পান করাইল। সত্যব্রত বলিলেন "মায়া, ভাগবৎ হতে উদ্ধব গীতাটা বা'র করে দাও ত', পড়ি।" মায়া শ্রীমদ্ভাগবৎ আনিয়া বলিল 'বাবা, আমি পড়ি না কেন?"

সত্য। তোমার ত' আরও কাজ আছে, কেবল আমায় নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে কেন?

মায়া। না বাবা আপনি যতদিন না সেরে উঠবেন তত দিন আমার সব কাজের আগে আপনি।

সত্যব্রত আর কোন কথা বলিলেন না। মায়া পড়িতে লাগিল, আর তিনি মিলিত নেত্রে শুনিতে লাগিলেন। মায়া যখন পড়িল:—

"পুংসোঽযুক্তস্য নানার্থো ভ্রমঃ সগুণ দোষ ভাক্
কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মেতি গুণ দোষধিয়ো ভিদা॥
তস্মাদ্যুক্তেন্দ্রিয় গ্রামো যুক্ত চিত্ত ইদং জগৎ।
আত্মনীক্ষস্ব বিততমাত্মানং মত্যধীশ্বরে॥"

তখন সত্যব্রত গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কেবল নিজের ওপর দোষগুণের বিচার কর্ম্মাকর্ম্মের নিয়ে থাকাতেই মানুষের বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিও গুণদোষ বিশিষ্ট হয়ে রয়েছে। কর্ম্মাকর্ম্ম বিশিষ্ট সমস্ত জগতের সঙ্গে যদি আমাকে তাঁরই অস্তিত্বের মধ্যে দেখতে পাই তা হ'লে আর ভয় থাকে না। তখন সবাই তাঁতে থাকার দরুণ পবিত্র হয়ে ওঠে। মহান বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এইত যথার্থ উপদেশ! যদুবংশ ধ্বংশের দিকে ছুটে চলেছে, সম্মুখে ভয়ানক সর্ব্বনাশ, তখন জগদ্‌গুরু এই উপদেশ দিচ্চেন—

সমস্ত জগৎকে আত্মায় অধিষ্ঠিত দেখ আবার সেই আত্মাকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখ।

লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "বাবা আপনি বেশী কথা বলবেন না, এখনি আপনার বুকের ব্যথাটা আবার দেখা দেবে। সত্যব্রত হাসিয়া বলিলেন "আমার বুকে ব্যথা! সর্ব্ব ব্যথাহর হরি আমায় দয়া করেছেন মায়া, মায়া, বুঝতে পাচ্ছ না তাই এই অধম অক্ষম শরীরটা ব্যথিত হয়ে উঠছে। তিনি যে দুঃখ-মূর্ত্তিতেই দেখা দেন। আমি এতদিন কেবল সংসারের কাজ নিয়ে, নিজের সদসদচেষ্টা নিয়ে অশেষ গর্ব্বে ঘুরে মরেছি। আজ আমার সমস্ত চেষ্টার ফল ভাঙতে আরম্ভ করে তিনি যে স্বয়ং আস্‌ছেন।"

সত্যব্রত নীরব হইয়া কম্পিত হস্ত দুখানি হৃদয়ের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি বলিলেন। পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "পড়, পড়, চুপ করলে কেন?"

মায়া পড়িতে লাগিল। এবং সে যখন চব্বিশ প্রকার গুরুর বর্ণনা নিঃশেষে পাঠ করিয়া "আজ আর নয়" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন সত্যব্রত ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে বলিলেন "কিন্তু এখন আর কারও কাছে উপদেশ চাই না, তুমিই আমার একমাত্র গুরু! হে জগদেক নাথ। আমার এই শেষ মুহূর্ত্তে তুমিই এসে দাঁড়িয়ে শেষ শিক্ষা দিচ্ছ, তোমায় প্রণাম করি।"

মায়া পিতার পদধূলি লইয়া বলিল "বাবা, আপনি কিন্তু আমাদের একমাত্র গুরু। তাই ভাবছি ছোটদাকে যদি এমন করে ত্যাগ করেন তাহ'লে কে তাকে শেখাবে, কে তাকে রক্ষা করবে?"

সত্যব্রত হাসিয়া বলিলেন "ত্যাগ করেছি, কে তোমায় বল্লে? সেই ত' এখন আমার সব চাইতে আপনার। সে দুঃখ পেয়েছে দুঃখ যত অনুভব করেছে ততই সে আমার বুকের মাঝখানটিতে গিয়ে উপস্থিত হচ্চে। তাকে যখন নারায়ণ দুঃখ দিচ্চেন তখন ত' তার প্রতিই যে তিনি অশেষ দয়া করছেন। আমি তাকে লক্ষ্য করছি আর আনন্দিত হচ্ছি। কিন্তু তাকে এখন কিছুদিন ঐ দুঃখের সঙ্গে থাকতে হবে তার পর একদিন তাকে আমার সমস্ত আশীর্ব্বাদ দিয়ে, আমি চলে যাব। তোমরা আমার গর্ব্বের সামগ্রী; সে আমার দুঃখের ধন। সে আমার পীড়িত পুত্র তাই সে আমার ভালবাসার জিনিস, বুক দিয়ে রক্ষা করবার বস্তু। তার জন্য কোন চিন্তা নাই!

মায়া সজল নেত্রে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

সীতা।

বাল্মীকির মধুবর্ষিণী লেখনী অমিথ্যা কবিত্ব-পূর্ণ এবং পাঠমাত্রেই মানসপটে প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রকৃত-চিত্র-উদ্ভাবক সরস ও মধুর ভাষায় যাহার চিত্র চিত্রিত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ধন্য মনে করিয়াছে অপিচ জগতের উচ্চ হইতেও উচ্চতর স্থানে, নীচ হইতেও নীচতরের দর্শনীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সাধারণকে বিস্ময়োন্মুখ করিয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে সীমাবদ্ধ ভাষায় যাহা প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর তাহাই মাত্র প্রকাশ করিয়া আপনা আপনি কবিকুলের কুলপতি ও জগতের চিরস্মরণীয় রহিয়াছেন তাঁহার সেই অতুলনীয় চরিত্রের চিত্র চিত্রিত করিতে যাওয়ায় স্বতঃই ইহা মনে হয় যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিদ্বারা ঐরূপ চরিত্রের আলোচনা ক্ষুদ্র সংদংশা (চিমটা) দ্বারা বৃহদায়তন বস্তু (জালা প্রভৃতি) ধারণের ন্যায় অসম্ভব আর ইহাও মনে হয় যে আমার এইরূপ অনধিকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত অথবা ন্যায্য নহে কারণ আমরা যদি কোন বিষয় লইয়া সমালোচনা করিতে যাই তাহা হইলে প্রথমতঃ উহাকে যাহাতে আমাদের এই অল্প শিক্ষিত সীমাবদ্ধ বুদ্ধির সসীম ভাষায় আবদ্ধ করিয়া লইতে পারি তদ্বিষয়ে সযত্ন রহি ইহার ; পরিণাম এই যে যাঁহা বৃহৎ ও মহৎ তাহাকে ক্ষুদ্র করিয়া গ্রহণ করা হয় আর যাহা অসীম তাহাও সসীম হইয়া যায়।

আগ্রহ যখন অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে তখন অক্ষমতা-জনিত লজ্জা বা মানুষী বুদ্ধির ভ্রান্তিমূলকতা প্রভৃতি গুণ ও দোষ-নিচয় আগ্রহের গুপ্ততম ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অতি গোপনে লুক্কায়িত থাকে আর উহার সেই অনিবার্য্য আগ্রহ তাহাকে স্বীয় কার্য্যে ব্যাপৃত করিতে সতত তৎপর রহে।

আমি জানি কবিকুলপতি বাল্মীকি উক্ত চরিত্রের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিবর্গ তাহাই পুনরুদ্দীরণ করিতে অক্ষম সুতরাং সমালোচনার কথায় আর কি বক্তব্য আছে। তথাপি আমি বলিব।

রাজর্ষি জনক পবিত্র হৃদয়ে পুণ্যব্রত সমাপন করিয়া স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে যাইয়া একটী কন্যা রত্ন লাভ করিলেন। লাঙ্গল-পদ্ধতিতে আবির্ভূত কন্যার নাম হইল সীতা, জনক কর্ত্তৃক পালিত ও পোষিত বলিয়া অপর নাম হইল জানকী।

শৈশবে জনকের ন্যায় রাজার গৃহে প্রতিপালিতা ননীর পুত্তলী, সংসারের দুঃখদারিদ্র্যের অরুন্তুদ যন্ত্রণা তাঁহাকে স্পর্শ বা অভিভূত করিতে পারে নাই। জনকের লোকাতীত প্রতিভা, জানকীর অলোকসাধারণভাবে উদ্ভবের অলৌকিকতা ও অনন্য সাধারণোচিত সৌন্দর্য্য প্রতিমা অবলোকন করিয়া তাহার বিবাহের জন্য ঐশধনু পণ করিয়া বসিল। জনক জানিতেন দেবদেব মহেশ্বরের যে সকল গুণ ঐশ্বর্য্য পূর্ণমাত্রায় বিকশিত রহিয়াছে অন্ততঃ আংশিকভাবেও সেই সকল গুণ বা ঐশ্বর্য্যের অনুমাত্রও যাঁহাতে বিকশিত, তাদৃশ মহান্ ব্যতীত ওই মহান্ কার্ম্মুক ভগ্ন করিতে কেহ সমর্থ হইবেন না। যাঁহার কোমল কমনীয়তা, সুন্দর সৌন্দর্য্য সরল সরলতা, উদার দাক্ষিণ্য পাবণ পবিত্রতা এবং লোকোজ্জ্বল সতীত্ব, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত বা ভবিষ্যতের অনন্ত কাল ব্যাপিয়া এই বিশ্বজগতকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও বিস্মিত ভাবে আবরিয়া রাখিয়া পবিত্র এবং উজ্জ্বলতম উচ্চ গ্রামের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে তাঁহার পরিণয় রামের ন্যায় আদর্শ পুরুষ ভিন্ন অন্যের সহিত কদাচ সম্ভবে না বা অন্যথা হইবার কখনও সম্ভাবনা ছিল না।

রাজর্ষি জনক জীবন্মুক্ত হইয়াও মানুষী বুদ্ধি একেবারে অভ্রান্ত না হইলেও অনেকাংশে ভ্রান্ত স্বকীয় জ্ঞানোজ্জ্বল প্রজ্ঞা বলে অপার্থিব গুণ-নিচয়ের সমষ্টি স্বরূপ ও মূর্ত্তিমৎ সৌন্দর্য্যরূপিণী উপযুক্ত ভর্ত্তৃ-নির্ণয়ে অভ্রান্ত হইতে পারিলেন

না তাই ধনুর্ভঙ্গ পণ স্থিরীকৃত হইল। পক্ষান্তরে তাদৃশ গুণ রূপ গরিমায় গরীয়ান্ রামচন্দ্রের ন্যায় পাত্র নিরূপণ ধনুর্ভঙ্গ পণ ব্যতীত সর্ব্বদা সীমাবদ্ধ বা ভ্রান্তিপূর্ণ মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় কদাচ সম্ভব হইত না।

আপাততঃ দেখিতে যাইলে সীতার জীবন দুঃখময় বলিয়াই মনে হয় বিবাহের পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে পতি-সুখ অনুভব না করিয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু উহাও যেন বনবাস হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল বা মরণ পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুপূর্ণ দুঃখের বিষণ্ণ অথচ অবিরাম প্রবাহে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাই লোকচক্ষে ওই ক্ষণিক সুখের ক্ষণিক চমক অনাবৃত সূর্য্য মেঘখণ্ডের ক্ষীণ চপলা স্ফুরণের ন্যায় স্পষ্ট বা প্রতিভাত হয় না।

যদিও জগতের অনেকাংশ লোকই এই মতের সমর্থক বা পরিপোষক তথাপি আমার মন উহাদের ওই মতের অনুমোদন বা সমর্থন করিতে ইচ্ছুক নহে, হয় ত সাধারণে ইহাতে কিঞ্চিৎ নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া অবজ্ঞাত অহঙ্কারে অন্য দিকে মুখ ফিরাইবেন আমাব মন ঐরূপে অবজ্ঞাত হইয়াও উহার দিকে দৃকৃপাত করিতে ইচ্ছা করে না আমার সতত ইহাই মনে লয় যে সাধারণে যে সময়কে সুখ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ঐ সময়টুকুও অল্প হইলেও সীতার পক্ষে উহা দুঃখের দীর্ঘকাল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। পরদুঃখ-কাতরা দয়া যেখানে চরম বিকাশে বিকশিত, যাঁহার হৃদয় সকল যত্ন সকল আগ্রহ সহকারে স্বামীর সমগ্র সেবাটুকু একাকী করিয়া লইতে সতত সচেষ্ট; পক্ষান্তরে যাঁহার একটা প্রাণের অপরিমেয় দয়ার প্রবাহ অথবা ধারণাতীত উচ্ছলিত স্নেহের বিশ্বপ্রসারী উচ্ছ্বাস জগতের মহান হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত সকল বস্তুকেই নিজের চির শান্তিময় সুকোমল ক্রোড়ে আঁকড়িয়া রাখিতে সকল অবস্থাতেই সতত সযত্ন, তাঁহার সেই বিকশিত উন্নত বৃত্তি-নিচয় দুই একজনে পরিব্যাপ্ত থাকিলে দুঃখাবহ হইত। পরম মায়াবী রাবণ যখন নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মূর্ত্তিমান কদর্য্যের ন্যায় সীতার পবিত্র মূর্ত্তি অপহরণে বিষধর ভুজঙ্গের লেলিহান রসনার ন্যায় করাল হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল তখনও সীতাদেবী আতিথেয়তা বিস্মৃত হইয়া দুরুচ্চার কটূক্তি বা একটী অভিশাপ-বাণী প্রয়োগে অপহরণ-লোলুপ রাবণের রাক্ষস বাহুকে ভয়বিত্রস্ত বা স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন না অপিচ তখনও তাঁহার কোমল হৃদয় ভর্ত্তার শুভানুধ্যান অন্বেষণেই ব্যস্ত। পক্ষান্তরে তাদৃশ ভয়াবহ অপহরণের ভীতিপূর্ণ ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভীত না হইয়াও স্বামী কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া যে কোন অবস্থায় উপনীত হইবেন সেই ভাবনায় তিনি অধিকতর উদ্বিগ্না, আর সেই জন্যই বনবাসিনী সীতা বনের পাখী, বনের পশু, বনের বৃক্ষ, বনের লতা, বনের ফুল প্রভৃতিকে করুণ সম্বোধনে সম্বোধিতা করিয়া স্বামীর নিকট তাঁহার প্রিয়তমার অপহরণ-সংবাদ প্রদানে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য করুণ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বাল্মীকের লোকাতীত প্রতিভাও এই স্থানে পর্ব্বত হইতে তৃণলতা পর্য্যন্ত কাঁদাইয়া ও যেন নিজের শোকাবেগের পূর্ণ বিকাশ করিতে না পারিয়া আপনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছে আর তাঁহার ঐ মধুরাক্ষরী লেখনীও যেন ঐ শোকেই আকুলিত হইয়া নীরব অশ্রুবিসর্জ্জনে প্রত্যেক বর্ণটীকে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। বাস্তবিকই উহা পাঠ করিবার সময় এইরূপ মনে হয় যে বাল্মীকির লোকাতীত প্রতিভা ও স্বর্ণময় লেখনী দুইই বাষ্পভারে আসন্ন হইয়া অসময়ে থামিয়া গিয়াছে।

রামচন্দ্র যখন অগ্নি পরীক্ষায় পরীক্ষিত সীতাকেও প্রজারঞ্জনের জন্য পুনরায় বনে পাঠাইলেন তখনও সীতার মহান্ ও কোমল হৃদয় তাঁহার শুভানুধ্যানে নিমগ্ন।

সুখের চরম বিকাশ অশ্রুতে, অন্যে যাহা বলে বলুক আমি যতই উহা লইয়া একটু গভীর চিন্তা করি ততই এইরূপ দৃঢ় ধারণা ও প্রতীতি জন্মে যে সুখের চরম বিকাশ অশ্রুতে। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণের অপ্রতুল নাই সুতরাং এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁহার দয়া বিশ্বজনীন, স্নেহ জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক, পৃথিবীর বিলয় পর্য্যন্ত যাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি প্রতি রমণী ও প্রত্যেক

পুরুষের পূজনীয়া রহিবে তাঁহার ন্যায় আদর্শ রমণীর রাজ সংসারে অবস্থান সুখ-বিকাশক হয় না। অথবা তাঁহার ঐ স্নেহ প্রভৃতি বিকশিত বৃত্তিনিচয় সামান্য দুই একজন বা দুই একটী বৃক্ষলতাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিতে পারে না পক্ষান্তরে সীতা বনবাসিনী না হইয়া যদি রাজ সংসারে বা রাজবাটী আসিতেন তাহা হইলে স্বামীর সমস্ত সেবা স্বহস্তে সংসাধিত করিয়া আপনাতে আপনি সুখী বা পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন না।

এইরূপে পূর্ব্বাপর সীতাচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে যখন সীতার নয়নে অশ্রু ছিল না তখন তাঁহার সুখের চরম বিকাশ হয় নাই। আর সীতার চরিত্র যদি ঐরূপ অশ্রুসিক্ত না থাকিত তাহা হইলে জগতে এত আদৃত, পূজনীয় ও লৌকিক হইয়াও লোকাতীত হইত না। বাস্তবিকই এইরূপে পরস্পর সীতাচরিত্রের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে সকল অবস্থা ও সকল সময়েই উহা লোকাতিরিক্ত পদার্থ এই লোক লোচনের দুর্নিরীক্ষ্য। সতীত্বের পূততম পবিত্রতা ঐ জানকীর নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া এই জগতকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য।

জন্মভূমি।

(অনুবাদ)

হেম পিঞ্জরে রাখিয়া অঙ্গ
বুলায়ে কমল পাণি,
দুগ্ধের সহ দাড়িম রসাল
রসধারা দেয় ছানি'।
নিশিদিন মোরে রামরাম নাম
শুনাইছে পরিজন
তবু সেই বনে জন্ম কোটরে
পড়ে' আছে মোর মন।

শ্রীকালিদাস রায়।

কাকীমার ছেলে।

সামান্য কি একটা ব্যাপার লইয়া যখন ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে রাধিকামোহন আলাদা ঘরে তার বন্দোবস্ত করিয়া লইতে বলিলেন, তখন সে বিষয়টির গুরুত্ব মোটেই উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

তখন সন্ধ্যা হয় নাই। কার্ত্তিক মাস। প্রকাশের স্ত্রী কিশোরী তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিবার জন্য আসিয়াছে। আকাশপ্রদীপটার তেল ও সল্‌তে বদলাতে সে ব্যস্ত। পাড়ার রামীর মা'র বাড়ীতে রোজকার 'হরিবোল' ধ্বনি হইতেছে। রাধিকার ছেলের কুকুরটা লেজ নাড়িতে নাড়িতে কিশোরীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। আস্তে আস্তে কুয়াসা জমাট বাঁধিতেছে। কিশোরী তুলসী তলায় গল-বস্ত্র হইয়া সংসারের কল্যাণ কামনা করিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিবার মানসে ঘরের দাওয়ায় উঠিল।

ঠিক এই সময়েই রাধিকা মোহন নিজ-স্ত্রীকে উপলক্ষ্য করিয়া অতি কর্কশভাবে বলিলেন—"কি গো? তোমার দেবরের আদরে বুঝি মজে আছ? আমার সম্মান যদি রাখতে চাও তবে যেন আর ছোট বাবুদের........." মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কিশোরী হঠাৎ যেন কি কাজে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। রাধিকা ছোট বৌমাকে দেখিয়া যেমন থামিয়াছিলেন ঠিক তখনই একবার ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"দেখ ছোট বৌমা আমাদের আর একসঙ্গে পোষালো না,—তোমরা এই বেলা থেকেই অন্য ব্যবস্থা কর।" এই বলিয়া গুরুচরণকে তামাকু দিবার হুকুম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(২)

গ্রামের ভিতর বনিয়াদি ঘর বলিয়া রাইমোহনের বেশ একটু খ্যাতি ছিল। গ্রামের প্রায় সমস্ত সালিশী মীমাংসা-তেই রাইমোহন ছাড়া চলিত না। এই সমস্ত নানা ব্যাপারে তাহার বেশ একটু প্রতিপত্তিও ছিল। কিন্তু রাইমোহনের মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকামোহন নিজের ব্যবহারে এবং চরিত্রগত নানা প্রকার দোষে সেই খ্যাতি ও সম্মানটুকু হারাইতে বসিয়াছে। রাইমোহন জীবিত থাকিতেই জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দিয়া যান। কনিষ্ঠ প্রকাশচন্দ্র তখনও কলিকাতা থাকিয়া কলেজে পড়িতেছে।

রাধিকামোহন গ্রামে থাকেন এবং ছোট বেলা হইতেই কুসঙ্গে পড়িয়া সরস্বতীর সঙ্গে বনিবনাও করিয়া উঠিতে পারিলেন না বরং ভোলানাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এদিকে পিতার অকস্মাৎ মৃত্যুতে বাড়ীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন রাধিকামোহন। অল্পদিনের মধ্যেই ভাইকে তিনি জানাইলেন যে তাহার পড়ার ব্যয় বহন করা তাঁহাদের এখন অসম্ভব। কাজেই তাহার কোনও চাকুরীর চেষ্টায় থাকিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

বাঙ্গালা দেশ! তাহাতে আবার তাহার মামা কিম্বা খুড়া এমন কি শ্বশুর ও নাই যিনি খুব বড় চাকুরী করেন। কাজেই কোন ভাল চাকুরীর আশা তখনই প্রকাশকে ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু পড়াই বা চলে কি করিয়া। একদিন মেসের ঘরে বসিয়া সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে নিজের কথা ভাবিতেছিল; এমন সময় তাহারই এক সমপাঠী বন্ধু আসিয়া প্রকাশের ঘরে উপস্থিত হইল। প্রকাশের মুখের চেহারা দেখিয়া সমপাঠী অখিল বলিল—"তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন রে?" অখিলচন্দ্র ধনীর পুত্র! কিন্তু ধনী বলিয়া তাহার কোনও রকম দেমাক্ নাই—বরং গরীব ছেলেদের সঙ্গেই তাহার চলা ফেরা ছিল বেশী। বিশেষতঃ সে প্রকাশকেই বেশী পছন্দ করিত। কারণ তাহার বেদনাতুর মুখখানা দেখিলেই অখিলের বুকে ভ্রাতৃভাবের উদয় হইত।

অখিলের প্রশ্ন শুনিয়া প্রকাশ প্রথমে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজকে সামলাইয়া লইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল। অখিল স্নেহে

বলিল—"আচ্ছা, আমাকে বল্‌তেও কি তো'র বাধা আছে?" প্রকাশ তবুও কথা বলিতে পারিল না, তখন অখিল পুনর্ব্বার বলিল—"আমি জানতুম যে তো'র ওপর আমার একটা দাবী আছে; কিন্তু আজ দেখছি আমার সেটা ভাবা নেহাৎ অন্যায় রকমের।" প্রকাশ বিশেষ কিছুই বলিতে পারিল না। কেবল বালিসের তলা হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। আর ভাঙ্গা গলায় বলিল—"বাড়ী গিয়ে প'ড়ো ভাই। আমাকে ক্ষমা করো।" অখিল চলিয়া গেল।

প্রকাশ অখিলদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই যাওয়া আসা করিত। অখিলের বাবা মা সকলেই প্রকাশের চরিত্রগুণে তাহাকে অখিলের চেয়ে কোনও অংশে কম দেখিতেন না। বিদেশে এই পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া প্রকাশ নিজেও খুব শান্তি পাইয়াছিল।

পরদিন ভোর হইতেই অখিল আসিয়া উপস্থিত—"প্রকাশ মা তো'কে ডেকে পাঠিয়েছেন।" প্রকাশের যেন হঠাৎ কেমন একটু সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে অখিলের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় কোনও কথা বার্ত্তা হইল না।

(৩)

সেবার বি, এ, পাশ করিয়া প্রকাশ এম্‌, এ পড়িতেছে—তখন কিশোরীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিশোরী অখিলের বোন্‌; ধনী-কন্যা কিন্তু বাপ মায়ের শিক্ষাগুণে সে প্রকাশের সহধর্ম্মিণী হইবার উপযুক্তা বটে। গরীবের ঘরে আসিয়া রাধিকামোহন কিম্বা তাহার স্ত্রী বামাসুন্দরীকে কোনও দিন তাচ্ছিল্য অথবা এমন কোনও ভাব দেখায় নাই যাহাতে কেহ কোনদিন বড়লোকের মেয়ে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারে। কিন্তু বামাসুন্দরী কেমই যেন কিশোরীর প্রতি তেমন সদয় ছিলেন না। সর্ব্বদাই তাহার দোষ ধরিবার জন্য আড়ি পাতিয়া থাকিতেন।

সেদিন নানারকম কাজের ভিড়ে কিশোরী রাধিকামোহনের পুত্র অরবিন্দকে সময়মত খাওয়াইতে ভুলিয়া গেছে। ছেলেও কাকীমার হাত ছাড়া আর কাহারও হাতে খাবে না বলিয়া বায়না ধরিয়াছে। বামাসুন্দরী গলা সপ্তমে চড়াইয়া পুত্রের পিঠে দু'ঘা বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—"আমার মরণ কেন হয় না—ছেলেটাকে পর্য্যন্ত বস করেছো গো!—যাক্‌ না হয় ছেলেটারই দোষ। কিন্তু তিনি যে বড়লোকের মেয়ে তাঁর হাতে গরীবের ছেলে ...."এমন সময় নিজের ঘর হইতে দৌড়াইয়া কিশোরী আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বামাসুন্দরী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কাজ নেই গো অমন আদর দিয়ে। আমরা গরীব, আমাদের তাই ভালো। কথায়ই বলে—মার চেয়ে যার বেশী আদর তাকে বলে ডাইনী!" বালক যখন কিছুতেই থামিল না, বামাসুন্দরী তাহার মুখে হাত দিয়া মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। অল্পক্ষণ পরে "মর্‌! মর্‌! মর্‌!" বলিতে বলিতে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। বালক তখনও "কাকীমা" "কাকীমা"! করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বালকের স্বর আর শোনা গেল না। বোঝা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

নিয়মিতভাবে আহার করিয়া ঘরে আসিয়া যখন সমস্ত ঘটনা শুনিলেন তখন রাধিকামোহন কিছুতেই আপনার রাগ থামাইতে পারিলেন না। বাহিরে আসিয়া প্রকাশচন্দ্রকে ডাকিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—"আমার সঙ্গে তোমার থাকা চলিবে না। আজই অন্য ব্যবস্থা করিয়ো।"

প্রকাশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। কিশোরীর কাছে সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কপালে হাত দিয়া বসিল। সেদিন দুপুরে কিশোরী কিম্বা বামাসুন্দরী কাহারও খাওয়া হইল না।

আসল কথাটা ছিল বামাসুন্দরী প্রথম হইতেই কিশোরীকে কিছুতেই আপন করিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। তাহার কারণও যে তাহার পক্ষে যথেষ্ট না ছিল এমন নহে। কিশোরী একে ধনীর মেয়ে তাহার উপর তাহার স্বামী গ্রামে রাধিকামোহনের চাইতে বেশী সম্মান ও সুখ্যাতি পাইতেছিল। যে রাধিকামোহনের প্রতাপে সমস্ত গ্রাম একদিন থরহরি কাঁপিত, তাহাকে আজকাল

কেহ ডাকেও না পোছেওনা। এই সমস্ত নানা প্রকার ব্যাপারে বামাসুন্দরী কিছুতেই আপন আসনে নিজে সুখী ছিলেন না। উপরন্তু একদিন গ্রামে সদরওয়ালা সাহেব আসিয়া প্রকাশকেই ডাকাইয়া গ্রামের উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন—রাধিকামোহনের খোঁজও করেন নাই। অধিকন্তু বামাসুন্দরী দেখিলেন তাহার স্বামীর বদনামই দিন দিন লোকমুখে প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু প্রকাশের সুখ্যাতি তাহাদের মুখে আর ধরে না। বামাসুন্দরীর পক্ষে এই সমস্ত সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু লোকে দেখিল কিশোরীর রূপ, গুণ এবং তাহার পিতার অর্থ—স্বচ্ছলতাই বামাসুন্দরীর প্রকৃত ঈর্ষার কারণ।

রাধিকামোহন অনেক দিন চুপ করিয়া থাকিয়া বামাসুন্দরীকে থামাইয়াছেন, কিন্তু সেদিন আর পারিলেন না—তাই ওরকম ভাবে ছোটভাইকে কথাগুলি শুনাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন দেখিলেন প্রকাশ বাড়ী নাই, তাই কিশোরীকে সামনে পাইয়া আবার সেইকথা গুলিই বলিলেন।

প্রকাশ ভাবিল—দাদা রাগের মাথায় কি ছাই পাঁশ কতকগুলি বলিয়াছেন; তাই সে সেগুলি ভুলিবার জন্য সারাটা দিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া রাত্রি হইলে বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু বাড়ী আসিয়া যখন বামাসুন্দরীর কোনও সাড়া শব্দ পাইল না এবং কিশোরীকে ঘরে বসিয়া কাঁদিতে দেখিল, তখন সে নিতান্ত হতাশ হইয়া বিছানা লইল।

পরদিন ভোর বেলা কলিকাতার প্রথম গাড়ী ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি কিশোরীকে লইয়া প্রকাশ রওয়না হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এমন সময় অরবিন্ কোথা হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া একেবারে কাকীমার কোলে চড়িয়া বসিল। বামাসুন্দরীও পেছন পেছন আসিয়া কিশোরীর কোল হইতে বালককে ছিনাইয়া বক্ বক্ করিতে করিতে নিজের ঘরে খিল দিলেন। বালক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—"কাকীমার সঙ্গে যাব।" শোনা গেল ভিতর হইতে অকথ্য গালি কিশোরীর কল্যাণে বর্ষিত হইতেছে। যাইবার সময় দেখা পর্য্যন্ত করিলেন না।

কিশোরী কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে উঠিল। রাস্তায় যতদূর পর্য্যন্ত বালকের স্বর শোনা যায় ততদূর পর্য্যন্ত উদ্গ্রীব হইয়া শুনিতে লাগিল। যখন আর শোনা গেল না তখন কিশোরী প্রকাশের কোলের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে।

(৪)

প্রায় একমাস হইল কিশোরী ও প্রকাশ কলিকাতা আসিয়াছে। এ যাবৎ বাড়ীর কোনও খবর পায় নাই।

কিশোরী দিনরাতই বালক অরবিনের জন্য কাঁদে—কিছুতেই তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাইতেছে না। দিন দিনই তাহার শরীর খারাপ হইতেছে—সে দিকে তাহার মোটেই খেয়াল নাই। প্রকাশও কেমন যেন বেমনা গোছের হইয়া পড়িয়াছে। অখিলের সাহচর্য্য কিম্বা তাহার বাবার উপদেশাদিতে কিছুতেই কিছু হইতেছে না।

হঠাৎ একদিন ভোর বেলা প্রকাশ রাধিকামোহনের একখানা চিঠি পাইল তাহাতে কেবল দু'লাইন লেখা ছিল—

"অরবিন্ বুঝি আর বাঁচে না। তার কাকীমাকে একবার দেখাইয়া যাও। ভাই ক্ষমা কর।"—

তোমার দাদা।

চিঠি পড়িয়া কিশোরী কাঁদিয়া ফেলিল এবং বাড়ী যাইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কিশোরী ও প্রকাশ যেদিন বাড়ী ছাড়িয়াছিল সেদিন হইতেই বালকের জ্বর। জ্বর থামে না। পিতামাতার শৈথিল্যে ওই জ্বরে বালকের বুকে কফ জমিয়া নিমোনিয়ায় পরিণত হইয়াছে।

কিশোরীরা যখন বাড়ীতে আসিল তখন তাহার পূর্ণ বিকার, কোনও প্রকার জ্ঞান নাই। বাড়ীতে আসিয়াই কিশোরী 'অরু' 'অরু' করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সুস্থ হইয়া বালকের কাছে যাইয়া যখন ডাক দিল তখন সে কেবল একবার চোখ মেলিয়া তাকাইল এবং দুই চোখ বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল। একটু পরেই বিকারের

তাড়নায় সে চীৎকার করিল উঠিল—"না না আমি যাব না—আর মেরনা মা! আর মেরনা!" পরক্ষণেই অচেতন হইয়া পড়িল। বামাসুন্দরী পাশেই বসিয়াছিলেন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—! কিশোরী এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার চোখে জল নাই বেদানাক্লিষ্ট মুখ খানায় ঘৃণায় কষ্টে একটা কালিমার ছায়া আসিয়া পড়িল। সে নীরবে সমস্ত সহ্য করিতে লাগিল।

রাত্রি তখন প্রায় বারটা; বালক পুনরায় চক্ষু মেলিয়া চারিদিক দেখিয়া লইল—কাহাকে যেন খুঁজিতেছে। কিশোরী মাথার গোড়ে বসিয়া বাতাস করিতেছিল হঠাৎ মুখের উপর চোখ পড়াতেই বালক আস্তে আস্তে বলিল—"কাকীমা যাও! সরে যাও, তুমি আমাকে কোলে নিয়োনা! মা মারবে! যাও! —আর কিছু বলিতে পারিল না! তাহার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। হঠাৎ ঘরের তেলের বাতিটা খুব জ্বলিয়া নিভিয়া গেল। রামাসুন্দরী আলো জ্বালাইবার জন্য উঠিয়া গেলেন। কিশোরী বালকের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

(৫)

বামাসুন্দরী সারাদিন রাত কাঁদাকাটি করেন এবং নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেই করাঘাত করেন; কিন্তু কিশোরী কাঁদিতে পারিতেছেনা। নির্ব্বাক শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহার চেহারা উন্মাদিনীর মত হইয়া গিয়াছে। রাত্রিতেও ঘুমাইতে পারে না! বালকের মৃতদেহ যখন তার কোল হইতে লইয়া গেল তখনও সে নির্ব্বাক, নিশ্চল ও নিরশ্রু!

প্রকাশকে একলা পাইয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল —চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"ওগো আমি যে আর পারি না! আমার বুকের ওপরে এত বড় ভার কে চাপিয়ে দিয়েছে? আমার বুক যে ফেটে গেল!"—

প্রকাশ মাথা নীচু করিয়া রহিল। তখন আবার সে বলিল—"আমাকে বলে দাও না গো কি করে কাঁদ্‌তে হয়! যন্ত্রণায় যে আমার সমস্ত পাঁজর ভেঙ্গে গেল! উঃ আর যে পারিনা।"—বলিতে বলিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া এক ঝলক তাজা রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। * * * * ডাক্তার বলিয়া গেল বেদনার ভারে ফুস্‌ফুস্‌ ফাটিয়া গিয়াছে।

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু।

মুক্তি।

বাসা বদল করে এই নতুন বাড়ীটায় এসে একদিন একখানা ছিন্ন ডায়রী পেলুম, তার তিনটি মাত্র পাতায় না জানি কার জীবনের ভীষণ যুদ্ধের এই ইতিহাস লেখা ছিল:—

"বিয়ে হল আমার জীবনের ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে যখন মানুষ থাকে অপরিণত, কিন্তু রমণীপ্রেমলাভের আকাঙ্ক্ষায় লোলুপ। মনটা ছিল তখন তরুণ, আশা ছিল অতি উচ্চ, আর বিবাহিত জীবনের মনগড়া ভবিষ্যতটা ছিল সোনালি রোদের রং মাখানো।

"প্রথম দেখা থেকেই এমন ভালবাসা প্রাণে জাগ্‌ল যেন যুগ যুগান্তরে সে ভালবাসা আমার মনে পত্তন গেড়েছিল; মনে হত সে ভালবাসার পূর্ণাহুতি হবে অবাধ মিলনে আর তা সার্থক হয়ে উঠ্‌বে কপোতদম্পতীর মত মৃদু প্রেমকূজনে।

"আকাশের জ্যোৎস্নার সঙ্গে প্রিয়তমার হাসি মিলিয়ে দেখতুম কোনটা সুন্দর—প্রেমের এই রকম স্পর্দ্ধা অবিশ্রান্ত গতিতে বাড়িয়ে দেখতুম যে আমার নয়নের 'আলোক' আর 'মনের কামনা' দিয়ে বিধাতা আমার প্রিয়াকে নির্ম্মাণ করেছিলেন।

"কিন্তু অবাধমিলন যে কত অভিশপ্ত তা তখন জানতুম না, জান্‌লেও বোধ হয় মান্‌তুম না, কেননা মানুষের রীতিই এই যে সে নিজেকে অন্যলোক থেকে পৃথক করে দেখে। কিন্তু সত্যই একদিন আমার নিজের মনভোলানো মিথ্যাকে উপ্‌ছে দিয়ে প্রেমিকের অভিশপ্ত জীবন মাথা তুলে উঠ্‌ল! গোপনতার আকর্ষণ তখন টুটে গেল যখন আমার স্ত্রীর মনের অলিগলির খবর পেলুম; আর তখন এল ঘোর সুষুপ্তির পর হঠাৎ জাগরণ, তার পূর্ব্বেও আমি যখন জাগিনি তখন আমার মন জেগে উঠে আমার স্ত্রীর ভেতর এমন একটা জিনিষ খুঁজেছিল যা তার কায়িক সৌন্দর্য্য আর আকর্ষণের অনেক উপরে। পূর্ণ মোহভঙ্গের পর আমিও নিজের অনুশীলনের মাপকাঠি দিয়ে তার অনুশীলনের পরিণতি খুঁজতে লাগলুম—সে কিন্তু না জেনে। এই থেকে অশান্তির উৎপত্তি হল, আর যে প্রেমনদী দুকূল ছাপিয়ে পূর্ণজোয়ারে বয়ে যাচ্ছিল, তাতে ভাঁটা পড়ল। মন একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব একটা অজানা কিছুর আকাঙ্ক্ষায় অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মনের মধ্যে নিবিড় অশান্তি জাগ্‌ল—পূর্ব্বে যেমন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মিলনের আশায় উদ্‌গ্রীব থাকতুম, তেমনি করে মুক্তি পাবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমায় চেপে ধরল। পূর্ব্বে যেমন আমার মনের নিভৃত কন্দরে প্রিয়ার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত অনুকরণ করত, তেমনি করে মনের সেই নিভৃত প্রদেশ থেকে আমি চাইতে লাগলুম শুধু মুক্তি।

"হায়রে স্বার্থান্ধ আমি! তখন কি জানতুম যে 'নারী নীরবে আপন অপমান সহ্য করে, কিন্তু প্রেম অপমান সহ্য করেনা!' স্বার্থের নেশায় ভরপুর হয়েছিলুম, 'প্রেমের সে পলে পলে মরণ' আমি দেখতে পাইনি; এ নেশাও ভাঙ্‌ল কিন্তু অ—তি বিলম্বে—যখন সে আমাকে চিরমুক্তি দিয়ে দূরে চলে গেছে।"

"ভেবেছিলুম মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই অবসাদ, এই অশান্তির শেষ হবে। ওগো, এ মুক্তি ত আমি চাইনি। কোথায় আমার সেই অশান্তি আর অনুশীলনের গর্ব্ব আজ! সে অশান্তিকে ধূলিধূসরিত করে আজ যে দারুণ অশান্তির আগুন আমার প্রাণে জ্বালা ধরিয়েছে! তখন যদি জানতুম—নারীর পরিণতি তার নিস্বার্থ প্রেমে! তার সে ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু! সে যে নিজেকে ভিখারীর চেয়েও রিক্ত করে আপনহারা হয়ে আমাকে সব দান করেছিল, ওরে পাষাণ, কোন্ মুক্তির পেছনে ছুটে

আজ এই অদৃশ্য পাষাণাকারার ভেতর বদ্ধ হয়েছিস্! মুক্তি চাই! এর পর আর কোন মুক্তি চাইব, কিন্তু এই যদি মুক্তি হয়, মুক্তিত পেয়েছি! আবার যে ওগো, সে কোন মুক্তি!"

শ্রীশচীন্দ্র নাথ মজুমদার।

জয়দেব।

কুসুমিত উপবনে, নবীন প্রভাতে,
অলিকুল আকুলিত বাসন্তী উষায়,
কুসুমসুরভিশ্লথ গোপকান্ত সাথে,
মধুর জ্যোছনা ভরা বিরহ নিশায়

কল্লোলিত রমণীয় সরসীর তীরে,
লবঙ্গলতিকাপাশে, কদম্ববিপিনে,
কাঁপায়ে নীথর নিশা, মৃদুলসমীরে,
উঠায়েছ মহাগীতি যমুনা পুলিনে।

হে পূজারি, অর্ঘ্য তব নহে পুষ্পদামে;
ভকতি চন্দন সিক্ত ; নব কিসলয়
অনাঘ্রাত অকুণ্ঠিত বালিকা হৃদয়
গাঁথিয়া মোহন মাল্যে, তিতাইয়া প্রেমে
সঁপিয়াছ, জয়দেব, ইষ্ট দেবতায়,
তাহারি মাধুরী আজি নারীপ্রেমে ভায়।

শ্রীননীগোপাল জোয়ার্দ্দার।

ভারতীয় নৌবাণিজ্য।

"হিন্দুরাজত্বকাল।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভারতের তক্ষণ, চিত্র ও মুদ্রাবলী হইতে সংগৃহীত সুস্পষ্ট প্রমাণ নিচয়।

সাহিত্যগত প্রমাণের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা অপর প্রমাণ সমূহের দ্বারাও বিশেষ ভাবে সমর্থন করা যাইতে পারে। সেই প্রমাণগুলি প্রধানতঃ স্মৃতিচিহ্নসম্বন্ধীয়। তাহাদিগকে প্রাচীন ভারতীয় শিল্প হইতে—ভারতীয় তক্ষণ ওচিত্রকলা হইতে—এবং ভারতীয় মুদ্রাবলী হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে, দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত প্রমাণাবলীর তুলনায় তাহারা অপ্রচুর হইলেও তাহাদের সুস্পষ্টতা, নিত্য নূতনতা আছে এবং কলাদেবী সুন্দর বস্তু সৃজন করিয়া তাহাতে যে চিরানন্দের ভাব প্রদান করেন, তাহার স্থায়িত্ব আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতের নৌশিল্পের উপর ভারতীয় শিল্পকলা যে এখনও আলোক সম্পাত করিতেছে, তজ্জন্য ভারতীয় স্মৃতিচিহ্ন গুলিকে এবং রাজকীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে পরিশ্রমস্বীকার করেন, সেই কর্ত্তব্য নিষ্ঠাকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতে হয়।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায়, জাহাজ ও নৌকার কতকগুলি প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। সাঁচির ভাস্করশিল্পের মধ্যে আবিস্কৃত প্রতিমূর্ত্তিগুলি তাহাদের মধ্যে প্রাচীন। তাহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছে। সাঁচির প্রথম সংখ্যক স্তূপের পূর্ব্বদ্বারের প্রতিমূর্ত্তিগুলির একটীতে দেখা যায় যে, একখানি ডোঙ্গা অমসৃণ তক্তাদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই তক্তাগুলি শণ কিম্বা দড়ির দ্বারা অপরিস্কার ভাবে পরস্পর সংগ্রথিত রহিয়াছে। প্রতিচ্ছবিটীর ভাব এইরূপ—"একটী নদী অথবা পরিস্কার জলরাশির উপর দিয়া সন্ন্যাসীবেশধারী তিনটি মনুষ্যকে লইয়া এক খানি নৌকা বহিয়া যাইতেছে। দুইজন নৌকাখানিকে বাহিয়া লইয়া যাইতেছে; আর মধ্যস্থলের লোকটী নৌকার কিনারায় হাত দুইটী রাখিয়া, ভক্তিভাবে তীরে দণ্ডায়মান চারিটি তপস্বীর প্রতি নতদৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন।' (২) স্যার ক্যানিংহামের মতে নৌকার মূর্ত্তিগুলি বুদ্ধদেব ও তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের প্রতিমূর্ত্তি। এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে বৌদ্ধগ্রন্থে বুদ্ধদেবকে "জন্ম মৃত্যুরূপ মহাসমুদ্রে তরণী ও ক্ষেপণি" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছ। (৩) কিন্তু জেনারেল এফ, সি, মেসলে (General F. C. Maisley) বলিতে ইচ্ছা করেন যে এই খোদিত ছবিটীর ভাব হইতেছে—"একজন পদস্থ সন্ন্যাসী অথবা পুরোহিত কোন দেশে প্রচার কার্য্যে যাত্রা করিতেছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভক্তি ভাবে তাঁহাকে বিদায় দিতেছেন।" (৪) দুইটী প্রধান কারণে তিনি এই মত প্রকাশ করেন;—প্রথমতঃ এই সমস্ত খোদিতমূর্ত্তি যে সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল তাহার কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে—পরে লোকে বুদ্ধদেবকে মনুষ্যমূর্ত্তিতে অঙ্কিত ও গঠিত করিতে আরম্ভ

১। General F. C. Maisley, *Sanchi and its Remains*, p. 42.

২। The Bhilsa Topes, 27.

৩। Foe-koue-ki, ch xxiv., note 11.

৪। Sanchi and its Remains p. 43.

করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ চামড়ার সরু সরু ফালি দিয়া বাঁধা এই জলযান খানি সাধারণ শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়। স্বয়ং বুধদেব সুসজ্জিত বজ্‌রায় আরোহণ না করিয়া ইহাতে আরোহণ করিয়াছেন—ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সাঁচির প্রথমসংখ্যক স্তূপের পশ্চিম দরজায় আর একটী খোদিত ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ভাব হইতেছে একটী জলরাশি; তাহার উপর একখানি বজ্‌রা ভাসিতেছে। বজ্‌রার অগ্রভাগে ডানাযুক্ত একটী শ্যেন কেশরী (Gryphon) এবং পশ্চদ্ভাগে মৎস্যের লেজ খোদিত। ঐ বজ্‌রা খানিতে, একখানি চন্দ্রাতপ একখানি শূন্য সিংহাসনের উপর আস্তীর্ণ রহিয়াছে। সিংহাসনের উপর একজন অনুচর ছাতা, এবং অপর একজন চামর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তৃতীয় ব্যক্তি বড় একটী দাঁড় লইয়া নৌকাখানি বাহিয়া যাইতেছে জলে নির্ম্মলজলজাত ফুল ও ফুলের কুঁড়ি এবং বড় শামুক দেখা যাইতেছে। পাঁচজনলোক বড় বড় কাষ্ঠ এবং বায়ুপূর্ণ স্ফীত চর্ম্মপেটিকা ধরিয়া ভাসিতেছে এবং ষষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখিয়া বোধ হইতেছে সে যেন বজ্‌রার অগ্রভাগের লোকটিকে তাহাকে জল হইতে তুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।" (৫) এই খোদিত ছবিটী বোধ হয় এই বিষয়টী প্রকাশ করিতেছে যে —কোন রাজা ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ কৃত্রিম জলাশয়ে জলক্রীড়া করিতেছেন; এই রাজকীয় বজ্‌রাখানিকে আজকালকার ধনীগণের প্রমোদপোতের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ছবিটির আর একটী গূঢ় ব্যাখ্যা করা যায়। বিশেষতঃ—ভগবান বিষ্ণুর প্রথমাবতারে মৎস্য মূর্ত্তির মত অথবা বুদ্ধদেবের প্রথম অবতারে কিম্বা প্রথম 'জাতকে' মকরমূর্ত্তির যেরূপ; উক্ত বজ্‌রাখানিকে যখন আমরা সেই মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই তখন ঐ গূঢ় ব্যাখ্যা আমাদের মনে স্বতঃ উদিত হয়। বুদ্ধদেব বিষ্ণুর নবমাবতারে জন্ম পরিগ্রহ করেন। লেফটেন্যান্ট ম্যাসি (Lieutenant Massey) কিন্তু বলেন যে "বুদ্ধদেবের পবিত্র দেহাবশেষ যখন ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে লইয়া যাওয়া হয়, তখন নাগগণ যে গতিরোধ করিয়াছিল, ইহা সেই ঘটনাটী প্রকাশ করিতেছে।" (৬)

কথা প্রসঙ্গে একথা বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত অদ্ভুত কল্পনাপূর্ণ মূর্ত্তি জলযানখানির অগ্রভাগে খোদিত রহিয়াছে, তাহা কোন সুদক্ষশিল্পী নিজের মৌলিক প্রতিভা দেখাইবার জন্য খোদিত করে নাই। প্রকৃত জলযানের উপর ঐ মূর্ত্তি খোদিত করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। (৭) এবং ঐসমস্ত ছবিতে খোদিত পোতাগ্রভাগের মূর্ত্তিগুলি পূর্ব্বোক্ত 'যুক্তিকল্পতরু'র গ্রন্থের শ্লোকে বর্ণিত মূর্ত্তিগুলির, একটী না একটির সহিত মিলিয়া যায়।

সাঁচির খোদিত মূর্ত্তিগুলির পর প্রাচীনতার হিসাবে, বোম্বাইএর নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র স্যাল্‌সিটী (Salsette) দ্বীপের অন্তর্গত ক্যান্‌হেরি (Kanhery) গুহার খোদিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহাতে উৎকীর্ণ লিপির দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, সেইগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে অন্ধ্রভৃত্য (Andhra-bhritya) অথবা সাতকর্ণীরাজ বশিষ্ঠিপুত্র (খৃঃ ১৩৩—১৬২) কিম্বা দ্বিতীয় গৌতমীপুত্র (খঃ ১৭৭—১৯৬) যে সময়ে রাজত্ব করেন, এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত ছবির মধ্যে একটীতে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে —একখানি জাহাজ সমুদ্রে ভগ্ন হইয়াছে এবং দুইজন মনুষ্য বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য "পদ্মপাণি-দেবতা"র নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। দেবতা সেইজন্য

৫। Sanchi and its Remains, p. 59.

৬। Mrs, Spier's Life in Ancient India. p, 320.

৭। সাঁচির বজরার অগ্রভাগের মূর্ত্তির সহিত 'যুক্তিকল্পতরু'র মূর্ত্তি মিলিয়া যায় বলিয়া কেহ সাহস করিয়া এমনও অনুমান করিতে পারেন যে সাঁচির মূর্ত্তিগুলি যত প্রাচীন, সেইরূপ প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিয়া গ্রন্থখানি সঙ্কলন করা হইয়াছে; অন্ততঃ যে অংশটী অগ্রভাগের মূর্ত্তির বিষয় বর্ণনা করিয়েছে সেই অংশটী তদ্রূপ

দুইটী দূত পাঠাইয়া দিতেছেন। ইহাই বোধ হয়, ভারতীয় তক্ষণশিল্পের মধ্যে সমুদ্র যাত্রার সর্ব্বপ্রাচীন প্রতিকৃতি। ৮

ভারতীয় তক্ষণ চিত্রশিল্পে, জাহাজ ও নৌকার অন্য সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবার কালে আমরা পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে খোদিত মূর্ত্তি সকলের মধ্যে, একখানি রাজকীয় বজ্‌রার প্রতিচ্ছবি, প্রস্তরের উপর উন্নত করিয়া সুন্দরভাবে খোদিত রহিয়াছে, দেখিয়াছিলাম। তাহার একখানি নক্‌সা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছি। উক্ত বজ্‌রার প্রতিচ্ছবিটী জগন্নাথদেবের মন্দিরের সেই অংশে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অংশটী দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত "কৃষ্ণদেবমন্দিরের" (Black Pagoda of Kanaraka) এক সময়ে একটী অংশ ছিল বলিয়া অদ্যাপি কথিত হয়। প্রতিচ্ছবিখানি সুস্পষ্টরূপে দেখাইতেছে—একখানি রাজকীয় বজ্‌রা বলিষ্ঠ দাঁড়িদের দ্বারা বেগে চালিত হইতেছে। ইহার বেগে জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা ও তরঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে—ইহা অতি সরলভাবে অথচ অতি সুদক্ষতার সহিত দেখান হইয়াছে। সমস্ত দৃশ্যটীতে, বিপদ হইতে অথবা অন্য কোন কারণে পলায়নের একটা ব্যস্তসমস্তভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। কক্ষটীর সৌন্দর্য্য এবং ইহার পরিকল্পনার সরলতা—বাস্তবিক বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভিতরে দোলায়মান আসনটী সম্পূর্ণ নূতন উদ্ভাবন; এবং বোধহয় 'সমুদ্রপীড়া'র হস্ত হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশে কল্পিত হইয়াছে। আবার আর একটী উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় এই যে, একগাছি দড়ি অথবা শিকল উপর হইতে ঝুলিতেছে এবং বজরার মালিক সেই গাছটী ধরিয়া, উদ্বেলিত জলরাশির উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। আমাদের শাস্ত্রের কোন্ দৃশ্যটী এই প্রতিমূর্ত্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। খুব সম্ভব, সাংসারিক জীবনের একখানি আলেখ্যকে এখানে সাজসজ্জার উপকরণ করা হয় নাই। পুরোহিতবর্গের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা চতুর্দ্দিকের খোদিত ছবিগুলি দেখিয়া, খুব সম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি বলিলেন, এই দৃশ্যের ভাব হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণকে রাজা কংসের ভীষণ কবল হইতে গোপনে ও অতি সত্বরতার সহিত উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে জলযানের প্রতিরূপ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে বর্ণিত 'মধ্যমন্দিরা' পোতের অনুরূপ।

ভুবনেশ্বরে "বিন্দুসরোবরে"র পশ্চিম দিকে যে একটী পুরাতন মন্দির আছে—এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখও প্রয়োজনীয়। ঐ মন্দিরটীকে 'বৈতাল দেউল' [Vaital Deul) বলা হয়। কারণ তাহার ছাদটী, একটি জাহাজ বা নৌকা উল্টাইয়া গিয়া যেরূপ, দেখিতে হয়, ঠিক সেইরূপ। 'বৈতাল' কথাটীতে অর্ণবপোত বুঝায়। ছাদটী, উড়িষ্যার স্থপতিশিল্পের পদ্ধতিতে গঠিত হয় নাই। কিন্তু ইহা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় মন্দির সমূহের, বিশেষতঃ মহাবোলপুরের 'রথের' সহিত অনেকটা সাদৃশ্যযুক্ত।

বিশ্ববিখ্যাত "অজন্তা"—গুহার চিত্রাবলীতে ভারতীয় প্রাচীন অর্ণবপোত ও নৌকার কতকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রতিকৃতি আছে। এখানে বৌদ্ধতপস্বীগণ জগতের শোক, তাপ, দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার আশায়, ঊনবিংশ অথবা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বে আগমন করিতেন এবং ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। এই গিরিসঙ্কটপূর্ণ ও কঠিনকৃষ্ণপ্রস্তরময় প্রদেশে এই সমস্ত চিত্রিত প্রাসাদসমূহ খোদিত করিয়া নির্ম্মাণ করিতে লোকে কত শত বৎসর ধরিয়া, কত না ক্লেশ, দক্ষতা, অধ্যাবসায় এবং সহিষ্ণুতার সহিত কার্য্য করিয়াছিল! আজ পর্য্যন্ত এই সমস্ত স্থপতিশিল্প অত্যুন্নত কল্পনার ও মহাদুরূহ কর্ম্মের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে। এই কার্য্যের বিরাটত্ব আমরা তখন

৮। Bombay Gazetteer, Vol. XIV, p. 165.

সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি, যখন আমরা মনে করি যে, "এই বিশাল কারু শিল্পকার্য্যের বেশীর ভাগই কৃত্রিম আলোকের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছে। এবং ভারতবর্ষের জলবায়ুর বিচিত্রতার মধ্যে ও বায়ুচলাচলহীন স্থানে, ঐরূপ সূক্ষ্মকর্ম্ম করা কতদূর কঠিন—তাহা বেশ উপলব্ধি করিবার জন্য মহতী কল্পনার প্রয়োজন হয় না।" (৯) ঐরূপ কার্য্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও সন্তর্পণে সম্পন্ন করিতে হইয়াছে ;—এবং এই কার্য্যের বিরাটত্ব ও সাহসিকতাও কম প্রশংসার বস্তু নহে। গ্রিফিথ্ সাহেবের নিম্নলিখিত অত্যুচ্চ প্রশংসা বাক্যের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে—"গুহাগুলি পর্য্যবেক্ষণের সুদীর্ঘ কালের মধ্যে একখানি প্রস্তরও দৈবাৎ বেশী করিয়া খোদিত করা হইয়াছে, অথবা ভুলক্রমে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এরূপ কোন একটী নিদর্শন আমি ধরিতে পারি নাই ; কারণ হঠাৎ এরূপ ভুলচুক্ হইয়া গেলে, এক টুক্রা পাথর বসাইয়া সে ভুলটী শোধ্রাইতে হইত এবং তাহাতে ঐ বিরাট সুচারু শিল্পটীতে একটু খুঁত থাকিয়া যাইত।" (১০)

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহা অনুমিত হয় যে, এই বিরাট শিল্পকর্ম্ম শেষ হইতে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃঃ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় হাজার বৎসরের বেশী লাগিয়াছিল। ত্রয়োদশ, দ্বাদশ, নবম এবং অষ্টম সংখ্যক গুহাগুলি কালানুক্রমে সজ্জিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এইগুলি 'সাতকর্ণী' রাজাদিগের (Satakarni King) অথবা 'অন্ধ্রভৃত্য' (Andhrabhrityas) রাজগণের অনুকম্পায় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে হয়। এবং প্রথম হইতে পঞ্চম সংখ্যক গুহাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধুনাতন এবং খৃষ্টীয় ৫২৫—৬৫০ বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। হুয়েন্ সাঙের (Hiuen Tsang) পর্য্যটনকালে তাহাদের খোদাই ও নির্ম্মাণকার্য্য সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত গুহার সম্বন্ধে হুয়েন্‌সাঙ্ সর্ব্বপ্রথম লিখিয়া গিয়াছেন। এই চৈনিক তীর্থপর্য্যটক নিজে 'অজন্তা' দেখেন নাই। কিন্তু মহারাষ্ট্রের নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশীর (Pulakeshi II.) রাজধানীতে অবস্থানকালে শুনিয়াছিলেন যে, "ঐ রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী আছে। তাহাতে উচ্চ উচ্চ মসৃণ খাড়া পাহাড় বড় বড় ফাটাল, অনেকদূর বিস্তৃত ও রাশীকৃত বড় বড় প্রস্তর খণ্ড বিস্তীর্ণ আছে। এইস্থানে অন্ধকার উপত্যকা মধ্যে একটী 'সঙ্ঘারাম' অথবা 'বিহার' নির্ম্মিত আছে।.........ঐ বিহারের চতুষ্পার্শ্বের প্রস্তরের দেওয়ালে 'তথাগতের' বোধিসত্ত্বঅবতাররূপ প্রারম্ভক জীবনের ভিন্ন ভিন্ন লীলা চিত্রিত আছে। এই সমস্ত দৃশ্য খুব সঠিকভাবে এবং সুচারুভাবে খোদিত হইয়াছে।" (১১)

অজন্তা গুহায় জাহাজ ও নৌকাগুলির প্রতিরূপ বেশীর ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যক গুহায় দেখিতে পাওয়া যায় আমরা জানি যে ইহা খৃঃ ৫২৫ হইতে খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। যে যুগে ভারতে আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভারতের চিন্তা ও সভ্যতা এসিয়া মহাদেশের অধিকাংশেই বিস্তৃত হইয়াছিল—এই সময় সেই যুগের সন্ধ্যাকাল। গুপ্ত সম্রাটদিগের বহুকাল ব্যাপী রাজত্বকালে ভারতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র ও শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং এমনকি এই সভ্যতা পূর্ব্বভূখণ্ডেও স্থানান্তরিত ও প্রসারিত হইয়াছিল—বাস্তবিক ইহা জাভা, কাম্বোডিয়, শ্যাম, চীন জাপানের সভ্যতা গঠনেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যর অবসানে, ভারতের রাজ তন্ত্র, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে কনোজের হর্ষবর্দ্ধন ও দাক্ষিণাত্যের দ্বিতীয় পুলকেশী—এই দুইজন নৃপতির হস্তে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এইজন নৃপতিই বিদেশের সহিত বিস্তৃতভাবে সম্বন্ধ

৯। J. Griffiths, The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta.

১০। Ibid.

(১১) Beal, Buddhist Records of the Western World Vol, II p.257.

স্থাপন করিয়াছিলেন। পুলকেশীর খ্যাতি ভারতের সীমা ছাড়াইয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পারশ্য রাজ দ্বিতীয় খস্রু (Khusru II) প্রভৃতি গোচর হইলে, তিনি তাঁহার রাজত্বের ছত্রিশ বৎসরে অর্থাৎ খৃঃ ৬২৫-৬ অব্দে পুলকেশীর দ্বারা বন্ধুত্বসূত্রে প্রেরিত একদল রাজদূতকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, উক্ত সৌজন্যের প্রতিদান স্বরূপ, পারশ্য হইতে একদল রাজদূত প্রেরিত এবং ভারতীয় দরবারে সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়াছিল।" (১২) অজন্তার প্রথমসংখ্যক গুহার প্রাচীরে অঙ্কিত একখানি বৃহৎ ছবিতে' পারশ্যরাজ দূতগণ বিশ্বাসজনক পত্রাদি মহাসমারোহে পুলকেশীকে উপহার দিতেছেন—এই ঘটনাটী খোদিত রহিয়াছে।

স্বভাবতঃ আশা করা যাইতে পারে যে, ভারতের নৌশক্তির ইহাও স্বর্ণযুগ। এই নৌশক্তি, ভারতীয় শিল্পকলায় অন্ততঃ ক্ষীণভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। শত শত অর্ণবপোত সমন্বিত রাজকীয় 'বহর' গঠিত হইয়াছিল; এবং পুলকেশীর নৌ-অভিযান "পশ্চিম সমুদ্রের অধিরাণী" (mistress of the western seas) (১৩) পুরনগরীকে শক্তিহীন করিয়াদিয়াছিল। এই সময়ে ড্রেক, ফ্রবিসার ইত্যাদির অথবা খৃষ্টধর্মপ্রচারকদিগের (Drake and Frobisher, or Pilgrim Fathers) অসমসাহসিক কার্য্যসকলের বহুপূর্ব্বে গুজরাটবন্দর হইতে —একথার পূর্ব্বে আভাস দেওয়া হইয়াছে—দুঃসাহসিক ব্যক্তিগণ দলে দলে প্রচুর উপার্জ্জনের আশায় সমুদ্র যাত্রা করিতেছিলেন। অবশেষে জাভা তাঁহাদের গতিরোধ করে, এবং তাঁহাদিগকে তথায় উপনিবেশ স্থাপনের যথেষ্ট সুবিধা ও অবসর প্রদান করে।

ডক্টর গ্রিফিথ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে অজন্তার জাহাজ ও নৌকার ছবিগুলিতে "প্রাচীনকালে ভারতের যে বাণিজ্য ছিল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ" প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুইখানি প্রদত্ত প্রতিকৃতির মধ্যে একটির ভাব হইতেছে—এক খানি সমুদ্রজাহাজ জলে ভাসিতেছে। তাহার অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ উচ্চ, আয়তক্ষেত্রের মত তিনখানি পাইল তিনটী সোজাভাবে দণ্ডায়মান মাস্তলের সহিত সংলগ্ন প্রত্যেক মাস্তলের সহিত একটী কপিকল আছে এবং তাহাতে সমচতুষ্কোণ মাস্তল খাটান রহিয়াছে। সম্মুখে ক্ষুদ্র পাইলখানি বায়ুতে পরিপূর্ণ। মঞ্চবিশেষ লম্বমান দণ্ডটীকে দেখিয়া জানা যায়, যে বায়ুভরে উড্ডীয়মান সম্মুখের পাইলখানি সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। এইরূপ পাইল সেদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় জলযানে দেখিতে পাওয়া যাইত। জলযানখানি ছাদবিশিষ্ট এবং তাহার পার্শ্বে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিবার জন্য কতকগুলি ছিদ্র আছে। ক্ষেপণিগুলি পোতের যথাস্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে পশ্চাতে আবার আর একটী দাঁড় রহিয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে কতকগুলি জালা রহিয়াছে এবং সম্মুখে দুইটী ও পশ্চাতে দুইটী মঞ্চ রহিয়াছে। (১৪) জলযান খানি "যুক্তিকল্পতরু" নামক আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত "অগ্রমন্দির" শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় চিত্রটী রাজকীয় প্রমোদতরণী। "এইখানি আভিজাতিক তরণীর মত, সম্মুখে ও পশ্চাতে চিত্রিত চক্ষু যুক্ত; মধ্যস্থলে চারিটী খুঁটার উপর চাঁদোয়া টাঙ্গান রহিয়াছে সম্মুখে একজন ছত্রধারণ করিয়া রহিয়াছে আর মাঝি একখানি 'মই'এর মত বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া দাঁড় চালাইতেছে। ব্রহ্মদেশীয় বর্ত্তমানকালের দাঁড় টানা নৌকাগুলিতে মাঝি বসিবার জন্য চেয়ার দেখিতে পাওয়া যায়—উক্ত 'মই'এর মত পদার্থটী তাহারই অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ; এই পোতে সম্মুখ ভাগে এক জন দাঁড়ি দণ্ডায়মান। এই জলযান খানি 'মধ্য মন্দিরা' শ্রেণীর অন্তর্গত; এবং 'যুক্তিকল্পতরু' তে বর্ণিত রাজা

(১২) Vincent A. Smith, Early History of India, pp 384, 385.

(১৩) See Sir Bhandarkar's Early History of the ch. x.

(১৪) Griffths, The Paintings in the Buddist cave Temples of Ajanta, p. 17.

দিগের প্রমোদভ্রমণের জন্ম ব্যবহৃত পোতের ঠিক অনুরূপ।

অজন্তা গুহার তৃতীয় চিত্রখানিতে,—দেখা যাইতেছে যে, বিজয় তাঁহার সেনানী ও জাহাজ সমূহের সহিত লঙ্কাদ্বীপে পদার্পণ করিতেছেন এবং তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। যে কারণে, বিজয় তাঁহার অনুচরবর্গ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের সহিত, বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত, 'মহাবংশ' 'রাজাবলীয়' ইত্যাদি পালিগ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বিজয়ের পোতসমূহ অন্ততঃ পঞ্চদশ শত আরোহী বহণ করিয়াছিল। কতকগুলি স্থানে থামিয়া—কোন কোন পণ্ডিতের মতে সে স্থানগুলি দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমদিকে অবস্থিত—ঐ নৌবহর সিংহলের দক্ষিণদিক দিয়া, তথায় উপনীত হইয়াছিল। যে দিন বিজয় সিংহলে পদার্পণ করেন, ঠিক সেই দিনেই বিজয়ের সুদূর মাতৃভূমিতে অপর একটী অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল;—ঐ দিন বুদ্ধদেব "নির্ব্বাণ" লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর বিজয় সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া একটী প্রধান রাজবংশের (Greater Dynasty) প্রতিষ্ঠাতা হয়েন।

সিংহল বিজয়, 'বৃহত্তর ভারতবর্ষ' (Greater India) স্থাপনের ভিত্তি এবং একটী জাতীয় কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। লোকের মনে, এই ব্যাপারে একটা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল ; এবং স্বভাবতঃ শিল্পিগণের কল্পনার উপরেও এরূপ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ, এই ঘটনাটী অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণ অনুমান করিয়াই, আমাদের অজন্তার জাতীয় চিত্রশালায় ইহার কোন স্থান হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে পারি। এবং ঐ একই কারণে, দ্বিতীয় পুলকেশীর পারস্ত রাজদূতগণের অভ্যর্থনার বিষয়টীও সেখানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলকেশির চিত্রখানিতে, প্রাচীনকালে এসিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতের স্থান কত উচ্চে ছিল, তাহা নির্দেশ করিতেছে। বাস্তবিক, অজন্তা ভারতেতিহাসের কতকগুলি বিস্মৃত অধ্যায় বিবৃত করিয়া থাকে।

জটিলতাপূর্ণ বর্ত্তমান ছবিখানির ব্যাখ্যা, গ্রিফিথ্ সাহেব যে ভাবে দিয়াছেন, সেইভাবে দেওয়া যাইতে পারে—কেন না উক্ত বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত আর কেহই নাই। ছবিখানির বামপার্শ্বে শাসনকর্ত্তা স্বয়ং প্রকাণ্ড শ্বেতহস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ধনুর্হস্তে সিংহদ্বার হইতে বাহির হইতেছেন। দুই জন সর্দ্দার ঐরূপ হস্তি পৃষ্ঠে চড়িয়া তাঁহার সহিত আসিতেছেন। প্রত্যেকের মস্তকে ছত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। ইঁহাদের সহিত পদাতিক সৈন্যগণ, কতকগুলি পতাকা ও বর্শা লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে। মাহুতসকল হস্তে অঙ্কুশ লইয়া, হস্তীর স্কন্ধদেশে প্রধামত স্বচ্ছন্দে বসিয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ তীর হাউদার পার্শ্বে ঝুলিতেছে। লোকেরা ছোট ছোট হাতাযুক্ত জামা গায়ে আঁটিয়া পরিয়াছে ; তাহাদের লম্বা ঝালর বিশিষ্ট কৌপীন ভাঁজে ভাঁজে পশ্চাতে ঝুলিতেছে। নীচে, নৌকার উপর চারিজন অশ্বারোহী সৈন্য বর্শাহস্তে বিরাজ করিতেছে। আবার দক্ষিণদিকে সৈন্যগণ তাহাদের হস্তী ও নৌকায় আরোহণ করিয়া যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে—যেন মুখ্য বীরগণ এই মাত্র বাণ ছুড়িয়াছেন বোধ হইতেছে। হস্তিগণ তাহাদের শুঁড় দুলাইতেছে। রাগিয়া গেলে তাহারা এইরূপই করিয়া থাকে। নিকটের লোকটী বাদ্যধ্বনি করিতেছে, তাহার ঘন্টার আন্দোলন দেখিয়া বুঝা যাইতেছে, যে সে চলিতেছে। র‍্যাফেলের "টানা জালেতে মাছ ধরা" এই ব্যঙ্গচিত্রের হিসাবে (Raphael's cartoon of the Draught of Fishes) এই সমস্ত মূর্ত্তিগুলির বেশ সমালোচনা করা যাইতে পারে যে—তাহার নৌকা এত ছোট, যে তাহার অঙ্কিত মূর্ত্তিগুলির সেখানে স্থান সঙ্কুলান হয় না। র‍্যাফেল যে উদ্দেশ্যে যে কাজ করিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পী সেই উদ্দেশ্যে সেই কাজ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার অঙ্কিত ঘটনাটী জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য, প্রথানুযায়ী কতকগুলি চিহ্নের দ্বারা, নির্জীব পদার্থগুলিকে ও আনুষঙ্গিক নৌকাগুলিকে ছোট করিয়া আঁকিয়া, হাতী ঘোড়া

এবং আরোহীদিগকে বেশ বড় ও স্পষ্ট করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।"

কিংবদন্তীর মতে বিজয়সিংহ বহুসংখ্যক অনুচর লইয়া (খৃঃ পূঃ ৫৪৩) সিংহলে যাত্রা করেন। ঐ দ্বীপের রাক্ষসীরা তন্ত্রমন্ত্রবলে তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলে। কিন্তু বিজয় স্বপ্নদর্শনে সতর্ক হইয়া এক অদ্ভুত অশ্বে উঠিয়া পলায়ন করেন। তিনি একদল সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে একটী মন্ত্র শিখাইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রচণ্ডভাবে রাক্ষসীদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে পরাভূত করেন। কতকগুলা রাক্ষসী ঐ দ্বীপ হইতে পলায়ন করে এবং কতকগুলা সমুদ্রে জলমগ্ন হয়। তিনি তাহাদের নগর ধ্বংস করেন এবং আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্বীপের নাম সিংহল রাখেন। (১৫)

(ক্রমশঃ

শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত।

দীন-কবি।

দীন তুই এলি শুনাইতে গীত
ভারত কবির সভাতে'
ভিখারীর গানে তুই এলি আজ
নিপুণ গায়কে ভুলাতে।

গন্ধে আকুল গোলাপ বকুল সতত বিরাজে যেখানে
তুচ্ছ শেফালি গুচ্ছ লইয়া তুই কেন এলি সেখানে,
(তোর) থেমে যা'বে গান, মুখ হবে ম্লান
দারুণ ঘৃণার আঘাতে।
দীন তুই এলি শুনাইতে গীত,
ভারত কবির সভাতে।

চিরপুরাতন বীণাটীরে তোর
লইয়া আপন করে,—
কম্পিত করে তুলিবারে তান
দাঁড়ায়ে একটী ধারে।

১৫। See Turnour's Mahawanso, Chs, 6-8.

ধূলায় ধূসর বীণাটি যে তোর সদাই কাঁদিয়া ফেরে,
হর্ষকাকলী অনাদরে ফেলি সে গান শুনিবে কে রে ?
(তোর) অভিমানী মন করিবে রোদন
বিফল বেদনা ভারে।
(যবে) কম্পিত করে তুলিবিরে তান
দাঁড়ায়ে একটী ধারে।

চল্ ফিরে চল্ ওরে দীন-কবি
বাণীর কুঞ্জ মাঝে,
গুণীর সভায় শুনাইবি গান
তোরে কি কখনও সাজে।
দিয়ে মহার্ঘ্য পাদ্যঅর্ঘ্য, এখানে এসেছে সবে,
তোর সামান্য পূজা নগণ্য কে আর সাদরে লবে ?
(তুই) চল ফিরে চল ত্যজি কোলাহল
আপন নীরব কাজে
গুণীর সভায় শুনাইতে গান
তোরে কি কখন সাজে।

শ্রীরবীন্দ্রমোহন গোস্বামী।

"নানা বিরোধী ভাবপুঞ্জের সমন্বয় বিধানই হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব। হিন্দু সব জিনিসেরই বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া আসল সত্তাটুকু পাইতে প্রয়াস করিয়াছে। সমস্ত ছাড়িয়া হিন্দু সত্যের পথ ধরিয়াছে। * * * হিন্দু ধর্ম্ম তোমার নহে, আমার নহে, ভারতের নহে, এসিয়ার নহে, প্রাচ্যের নহে, পাশ্চাত্যের নহে,—হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বজনীন সর্ব্বজাতীয়। হিন্দু ধর্ম্ম বিশ্বমানবের ধর্ম্ম" "সম্পাদক"

পুস্তক সমালোচনা।

অভিসম্পাত।—সঙ্গীত পরিষদ গ্রন্থাবলীর ২য় সংখ্যা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দে প্রণীত। ৬৭।১ বলরাম দের ষ্ট্রীটস্থিত সঙ্গীত পরিষদ হইতে শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানি সামাজিক নাটক। মূল্য ।।৹ পাঁচসিকা মাত্র।

গ্রন্থের অপর নাম **সমাজ কলঙ্ক**—তাহা হইতেই লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনেকটা অনুমান করা যায়। বিবাহের পণপ্রথা অধুনাতন সমাজ সমস্যার মধ্যে আমাদের মীমাংসার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থকার নিজের ব্যক্তিগত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাঁহার অন্যতম স্ত্রীচরিত্র মনোবীণার মুখদিয়া—"মৃণাল থাক সে চিরকুমারী গ্রন্থকার দেখাইতে চান যে ত্যাগ ধর্ম্মত্যাগ নিষ্ঠা সংযম প্রভৃতি চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে সমাজের এই দুরপণেয় কলঙ্ক অপনীত হইবে! লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ তিনি সমাজের সমস্যাগুলি লইয়া একে একে বাঙালীর সম্মুখে ধরিতে থাকুন—একদিন না একদিন মীমাংসা হইবে।

আমার ভুল। ছোট গল্প ও কবিতা। সঙ্গীত-পরিষদ গ্রন্থাবলী, ৩য় সংখ্যা! শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দোপাধায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১ কর্ণওওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য ৸৹ বার আনা।

ছোট গল্পের সঙ্গে মাঝে মাঝে কবিতা দিয়া পুস্তকখানি বিসদৃশ দেখাইতেছে। পুস্তকখানি কয়েকটী ছোট গল্পের (কবিতাও আছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি) সমষ্টি—এবং প্রথম গল্পটীর নামানুসারে পুস্তকের নাম করণ হইয়াছে "আমার ভুল"– গল্পটী চলনসই ৩১ পৃষ্ঠায় "হে বিশ্বনাথ! আজ বুঝতে পারছি তুমি আছ। নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছে কে?" দেখে "সাজাহানে"র দারার উক্তি মনে পড়ে। "শ্মশানঘাটের কথায়" ৪০পৃষ্ঠার চরিত্রহীন স্বামির স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ও সাধ্বী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যে কয়টী কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। "শিল্পী" "চোর" দুইটীই সুন্দর গল্প। "শিল্পী" গল্পের মধ্যে প্রাণস্পর্শী pathos ও "চোর" গল্পের মধ্যে যে প্রণয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতেই লেখকের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মুদ্রাকর প্রমাদ ও ছন্দহীন মামুলি কবিতার জন্য পুস্তক খানি অঙ্গহীন হইয়াছে।

অদৃষ্ট। একখানি সামাজিক উপন্যাস। শ্রীশ্রীধর-সমাদ্দার বি,এ, প্রণীত। প্রকাশক শ্রীত্রিপুরাসুন্দর সেন বি,এ, ইকনমিক বুক ডিপো, ১১নং কলেজ স্কোয়ার! মূল্য-১৲।

হিন্দুসঙ্গীত ও স্যার রবীন্দ্রনাথ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেন বেদান্তচিন্তামণি প্রণীত। মূল্য।√৹ রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের মুক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা ও প্রতিবাদ—সঙ্গীত পরিষদ হইতে প্রকাশিত। সঙ্গীতজ্ঞগণ বিচার করিবেন।

অর্ঘ্য। সঙ্গীতপরিষদ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গীয়া যাদুমণি দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী বি, এ কর্ত্তৃক লিখিত শোকোচ্ছাস

"পদ্মপাদ"

জাতিভেদ। লেখক শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য। মূল্য দেড়টাকা।

বিংশশতাব্দীর প্রথম প্রত্যুষে প্রতিক্রিয়ামূলক সমন্বয় যুগের ঘোষণাবাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বাঙ্গালীর তন্দ্রা ছুটাইয়া দিয়াছে। প্রভাতের প্রখর সূর্য্যালোকে প্রতিহত চক্ষু-অলস ব্যক্তি শয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, ডাকিলে সাড়া দেয়, বিরক্ত হয়—অত্যন্ত শয্যা ত্যাগ করে না। বাঙ্গালী জাতির আজ সেই অবস্থা।

নবযুগের অগ্রদূতগণ সমগ্র জাতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করিতেছেন। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র বাবুও তাঁহাদিগের

অন্যতম। তাঁহার লেখা শুধু কথার কথা নয়; কথার পশ্চাতে কাজ আছে—অতএব কাজের কথা। উল্লিখিত পুস্তকখানিতে কাজের কথা অনেক আছে—হিন্দুর বর্তমান সামাজিক জীবনের অনেক সন্দেহসঙ্কুল সমস্যার যুক্তি ও শাস্ত্রসঙ্গত মীমাংসা আছে। জাতিভেদ প্রথার সপক্ষে ও বিপক্ষে কত শাস্ত্র-হীন যুক্তি ও যুক্তি হীন শাস্ত্রের অবতারণা দেখিতে দেখিতে আমরা হয়রাণ হইয়া উঠিয়াছি। এই পুস্তকখানি আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম দিগিন্দ্র বাবু, পতিত বলিয়া অভিহিত জাতি সমূহের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া সব্যসাচীর মত শাস্ত্র ও যুক্তি সমভাবে, সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন।

স্থানে স্থানে অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায়ের বিবরণ প্রদান করিতে গিয়া লেখক কর্ম্মীজনোচিত ধৈর্য্য হারাইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছেন—কিন্তু প্রলাপোক্তি আদৌ নাই দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

আমাদের সমাজে বিপ্লব আছে, বিশৃঙ্খলা আছে,—তাহা কাহার দোষ? ইহা বিশদরূপে বর্ণনা করিতে লেখক বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ করেন নাই।

অদম্য উদ্যম লইয়া তিনি বহুগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন—সমাজের সর্ব্বস্তরে মিশিয়া যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। পুস্তক রচয়িতার উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে স্থানে স্থানে হৃদয়ের আবেগে গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়াছেন। স্বামিজী বলিয়াছেন "গালাগালি দোষ প্রদর্শন সংস্কারের পন্থা নয়।" সমাজসংস্কারককে অবশ্য অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া আঘাত করিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হয় যে পঙ্গুকে কশাঘাত করিলেই সে দণ্ডায়মান হইয়া চলে না কেননা, তাহার পক্ষে উহা অসাধ্য তাই তাঁহার "সুতীব্র বাক্যদণ্ড" অধিকাংশ স্থলেই আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই।

চতুরাশ্রমসমন্বিত হিন্দুসমাজের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণবিভাগ গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই প্রযোজ্য হইয়াছে। আধুনিক জন্মগত জাতিভেদ প্রাচীন স্মৃতি ও শ্রুতি সম্মত নয়। অথচ হিন্দুর জাতীয় জীবনে এমন এক সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্ত আসিয়াছিল, যখন তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য জন্মগত জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল—এবং আজ পর্য্যন্তও সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। যে সমস্ত প্রতিকূল শক্তির সহিত অবিরাম সংঘর্ষে হিন্দুসমাজ বাধ্য হইয়া রক্ষণশীল হইয়াছিল, এক্ষণে উক্ত কারণগুলি অন্তর্হিত হইলেও, গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইবার পথে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে—কৃত্রিম আভিজাত্যের গৌরব।

মাৎসর্য্যের অন্তরালে এই মিথ্যা গৌরববুদ্ধি কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মস্তিষ্ক এরূপ ভাবে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছে যে—সেখানে কোন প্রকার নূতন তত্ত্ব বা নীতির স্থান নাই। ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও কুসংস্কারের আবর্ত্তে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। সমাজের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দিগিন্দ্রবাবু "জাতিভেদ" গ্রন্থখানি প্রণয়ণ করিয়া হিন্দুসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। প্রত্যেকটী অধ্যায়ে লেখকের গভীর গবেষণা, শাস্ত্রালোচনা ও লিপিচাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের, আবেগ ও বিচারবুদ্ধি লইয়া রচিত এই পুস্তকখানি স্থানে স্থানে অনেকের পক্ষে সুখপাঠ্য না হইলেও সুপাঠ্য একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। "গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ", "শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার," "নিম্নশ্রেণী" এই তিনটী অধ্যায় পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণেতর—তাহাই বা কেন, ব্রাহ্মণগণেরও ইহা গভীর মনঃসংযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবার বিষয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় বা সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন, গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার হৃদয়ের উষ্ণরক্তে কতকগুলি নগ্নসত্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমাজের যে চিত্র তিনি সমাজপতিগণের চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যে তাঁহারাও না জানেন তাহা নয়। কিন্তু সমাজ-শাসন দণ্ড তাঁহাদের হস্ত হইতে চিরদিনের জন্ম খসিয়া পড়িয়াছে। শক্তিহীন দুর্ব্বল কেবল ঈর্ষা ও ঘৃণাপ্রকাশ ব্যতীত আর কি করিতে পারে? জাতির উত্থান ও পতন, উন্নতি ও অবনতি আজ আর এই মুষ্টিমেয় অন্ধ শাস্ত্রাভিমানী, ধনীর চাটুকার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের করায়ত্ত নহে।

নবযুগের প্রেরণায় নবীন ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ ও তপস্যাবলে বলীয়ান হইয়া হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি গঠন করিয়া সমাজকে পূর্ণতা প্রদান করিবেন। সমাজের কল্যাণকামী, নিঃস্বার্থ হৃদয় ব্রাহ্মণগণ জাতির মধ্য হইতে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত বহির্গত হইবেন। কোন বিশেষ বংশ বা শাখার মধ্য হইতে নহে। ইঁহারা যতদিন কর্ম্ম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইতেছেন—ততদিন জড়ত্ব ও অজ্ঞতার আবর্জ্জাস্তূপের উপর সমাসীন হইয়া যে মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় সমাজের শীর্ষে অবস্থান করিতেছেন, সমাজ তাঁহাদের যথেচ্ছাচারের লীলাভূমি হইয়া থাকিবেই।

কিন্তু কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানি তাহারই একটি নির্ঘোষ! এ গর্জ্জন সমাজ শুনিতে বাধ্য! সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ আজ দিগিন্দ্র বাবুর হিতোপদেশ কানে তুলুন আর নাই তুলুন কিন্তু একথা সত্য একদিন শুনিতেই হইবে। কারণ ব্রাহ্মণেতর জাতিসকল সত্যই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে; কে বলিতে পারে অদূর ভবিষ্যতে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেনা? সমাজসমস্যা আমাদের দেশে ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে; ইহা বুঝিবার ও বুঝাইবার মত সাহস ও সঙ্কল্প লইয়া যাঁহারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত তাঁহারা আমাদের বরেণ্য! "জাতিভেদ" পুস্তক খানির মধ্যে কয়েকটী সামান্য বিষয়ে যদিও আমরা একমত হইতে পারি নাই তথাপি লেখককে তাঁহার কঠোর সত্যপরায়ণতা নির্ভীক দৃঢ়তার জন্ম শতবার ধন্যবাদ প্রদান করিব।

পুস্তকখানির আগাগোড়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা দুঃসাধ্য। মোটামুটি কয়েকটী বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। ইহাতে ভাবিবার ও কার্য্যে পরিণত করিবার অনেক বিষয় আছে। উপসংহারে লেখককে বিনীত ভাবে বলিতে চাহি, স্থানে স্থানে একটু সংযত হইয়া বক্তব্য বিষয়গুলি বলিলেই ভাল হইত। অনেক স্থলে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থ হইতে তাঁহার ভাব অবিকল তাঁহার ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে; সেগুলি "কোটেসানের" মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল।

এ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলিবার আছে—তাহা আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে বলিতে হইবে।

চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ-রচয়িতা "জাতিভেদ" প্রণেতা, মূল্য ॥০ আনা। প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাণেতিহাসাদি আলোড়ন করিয়া গ্রন্থকার বর্ণবিভাগের একটী ধারা বা ক্রম আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, পতিত বলিয়া অভিহিত জাতি সমূহের পক্ষসমর্থন করে তাহাদিগের উৎপত্তি যথাযথ রূপে নির্ণয় করা। ব্যক্তি বিশেষের যোগ্যতার উপরই যে তাহার জাতি বা বর্ণ নির্ভর করে, ইহা তিনি শাস্ত্র হইতে অজস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন। বংশগত জাতি বা বর্ণের মূলে যে বাস্তবিক কোন যুক্তিসঙ্গত বা শাস্ত্রসঙ্গত কারণ নাই তাহা লেখক উত্তমরূপে বুঝাইয়াছেন। স্থানাভাবে এই গ্রন্থখানির বিস্তৃত সমালোচনা করিতে পারিলাম না। সমাজের হিতাকাঙ্খী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই এই গ্রন্থখানি পাঠ করিবেন এবং পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন—ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উপনিষৎ—ঈশ, কেন—(প্রথমভাগ)—অনুবাদক ও সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ। লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। লালকাপড়ের বাঁধাই—পকেট সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

উপনিষদের এই সংস্করণ খানি দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। গীতার ন্যায় উপনিষদ যাঁহারা নিত্যপাঠ করেন তাঁহাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করিয়াই পুস্তক রচিত হইয়াছে। শঙ্করভাষ্য সংক্ষিপ্ত করিয়া

"শঙ্করার্চ্চনা" নামে একটী টীকা সংযোজিত হইয়াছে। লেখক যথা সম্ভব অন্বয়ার্থ শ্লোকের যথাযথ অনুবাদ করিয়াছেন। স্বীয় মতানুযায়ী শ্লোকার্থ একটী স্থানেও বিকৃত করেন নাই অথচ "তাৎপর্য্য" বিস্তৃতভাবে শ্লোকার্থ আলোচনা করা হইয়াছে। অন্বয় ও অন্বয়ার্থ এবং তাৎপর্য্যসহায়ে পাঠক অনায়াসেই শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। উপনিষদের এই সুন্দর সংস্করণ খানির আমরা বহুল প্রকাশ কামনা করি।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার।

———o———

ছ খানা ছবি—

ছোট গল্পের বই—শ্রীযুক্ত পুলক চন্দ্র সিংহ প্রণীত—

নারায়ণ কার্ম্মেসী ৯৯নং অপার সারকুলার রোড্ হইতে ডাক্তার অনুকূল চন্দ্র মিত্র, এল, এম, এস, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আট আনা মাত্র।

এই গল্পগুলি "প্রকৃতি" ও "মহিলা" দুইখানি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—গ্রন্থকার সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সুন্দর করিয়া সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রকৃতির" ও "মহিলার" প্রচার অবস্থায় আমরা ওই গল্পগুলি বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি—গল্প ছয়টীর মধ্যে "স্নেহের জয়" "কল্যাণ কুমার" ও "গ্রামের কথা" এই তিনটী গল্প আমাদের খুব ভালই লাগিয়াছে।

লেখকের রচনা চাতুর্য্য ও ঘটনার সমাবেশে বেশ হাত আছে। এই পুস্তকখানি তরুণ বয়স্ক যুবকদিগকে বিশেষ ভাবে আনন্দ দান করিবে।

নবপ্রাণ-গীতিমালা—সঙ্গীত পুস্তক। একই লেখকের (শ্রীপুলক চন্দ্র সিংহ) লেখা—নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস হইতে প্রকাশিত মূল্য ।৹ আট আনা।

পুস্তকের সঙ্গীত গুলি যে নববিধান সম্প্রদায়ের জিনিস তাহা পুস্তকের নাম হইতেই অনেকটা অনুমান করা যায়। তবে আমরা এই গানগুলিকে কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা শাখা-গত ধর্ম্ম ধারণার দিক হইতে দেখিব না—এগুলির মধ্যে যে সাধারণ ও সার্ব্বজনিন ভাব, যে মানবীয় অনুপ্রেরণা সাধনার লক্ষ্য আছে আমরা তাহার দিক দিয়াই বিচার করিব।

কবি বলিতেছেন—

এসেছে নামিয়া নূতন সত্য অনাদি কালের ভেদিয়া জল্দা,
প্রেম ভক্তির নির্ঝর বাহি মিলেছে নূতন যমুনা গঙ্গা!
সদ্যঃস্নাত যতেক ভক্ত হেরিছে মেলিয়া পুলক নেত্র,
নব মিলনের যজ্ঞভূমি এ—সমন্বয়ের তীর্থক্ষেত্র।

সে "নব মিলনের যজ্ঞভূমি" ও "সমন্বয়ের তীর্থক্ষেত্র"—"নববিধান" সাধনার বেদিকা কিনা আমরা তাহার বিচার করিতে বসি নাই—আমরা আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া আশা ও উৎসুকতার সহিত এমনি একটা শুভ দিনের অপেক্ষায় আছি, কবির প্রাণের কথায় আমাদের প্রাণের কথা প্রকাশ হইয়াছে এই জন্যই বলি—

"The poet speaks the universal mind."

কবি আর এক স্থানে বলিতেছেন—

তোমার পতাকা ছিন্ন ভিন্ন,
ধূলায় লুটিছে গরিমা তার,
তোমার নামের মহিমার গানে
এ মহাশ্মশান জাগে না আর।

এস মা বীর্য্য-সিংহ আরোহি',
হাস মা, শুভদে নাশিয়া ভয়।
অমল আনন আভায় ধরায়
হউক পুণ্য প্রভাতোদয়।

* * * * * *

এই মাটিতে ফল্‌বে সোণা
এই ত নব বৃন্দাবন!

দেশ মাতৃকার প্রতি কবির এই ভক্তি ধর্ম্মজীবনের উচ্ছ্বাসে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। আর একস্থানে কবি আমাদের দেশের শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন—

"হেস না বিজ্ঞ নহে ছেলেখেলা,
অজ্ঞ বলিয়া করিও না হেলা,
আছে অধিকার মানুষ হ'বার
মূক যারা ম্রিয়মাণ
কলিজা কাটিলে একমত রাঙা, একমত সব প্রাণ

* * * *

পঙ্ক হইতে অঙ্কে তুলিয়ে, দাও ইহাদের ললাটে বুলিয়ে
স্নেহের পরশ করুক সরস, এই সব ছোট প্রাণ
লভিলে শিক্ষা, লভিবে দীক্ষা, (?) লভিবে ঋদ্ধিমান!"

এ দীক্ষা নববিধানের দীক্ষা হউক আর নাই হউক, এ দীক্ষা যে মহাপ্রাণতার বিশ্বমানবতার দীক্ষা তাহাতে সন্দেহ নাই!

কবির ভাব ও কবিত্বের কয়েকটী দৃষ্টান্ত—

"মুক্ত হইবে চিত্ত আমার ছুটিবে বাঁধন ভার।
তোমার নামের জপমালা হ'বে আমার কণ্ঠহার!
তাই হে কর প্রাণেশ্বর ভাঙিয়া মোরে গড়
লহ গো কাড়ি তোমারে ছাড়ি যা কিছু করি জড়!"

এইবার দু'একটী কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব—কবির

"হৃদয় আমায় ছুটেছে সাগর পানে
ইত্যাদি।

এবং আর এক স্থানে

"উৎসব দীপ জলেও জলে না যতবার তারে জালি
…… …বাড়াই মনের কালি"—ইত্যাদিতে

একটু আধটু রবিবাবুর ছায়া পতন হইয়াছে—গানের রাজাকে ছাড়াইয়া গান লেখা খুব কঠিন তবে এই পুস্তকে পুলক বাবুর যথেষ্ট কবিত্বও আছে।

"পদ্মপাদ"

মাসিক-কাব্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ—'লীলাময়ী' শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমান বিমানবিহারী—কবি সত্যেন্দ্রনাথের একজন অনুকারক। এবং এই হিসাবেই প্রবাসী ও ভারতীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। বিমান বাবু সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণ করিতেছেন বটে কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের তেজস্বিতা ওজস্বিতা ও গুরুগম্ভীর রচনা ভঙ্গির অনুকরণ করিতে পারিতেছেন না। যাহাতে সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব—বঙ্গ সাহিত্যে যাহাতে সত্যেন্দ্র-নাথের বাণী বা message ঘোষিত হইতেছে তাহার অনুকরণ কই দেখি না ত?

'লীলাময়ী' সত্যেন্দ্রনাথের চটুল রচনা ভঙ্গির অনুকরণে রচিত। ছন্দটাই অনুকরণে সাফল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু ইহাতে সত্যেন্দ্রনাথের মাধুর্য্য ও কলা চাতুর্য্য কই! সত্যেন্দ্রনাথের গুণ অনুকরণ করিতে না পারেন কবি দোষগুলি অনুকরণ করিয়াছেন। কবি বলিতেছেন—

"রঙের ছোঁয়াচ লাগে সকলখানে"
"রতন চুনিয়া ফেরে সাগর তটে"
ইত্যাদি।

"তরু কুমারী"—শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের দীর্ঘ কবিতা Walter Savage Landorএর ইংরাজী কবিতা হইতে অনূদিত। অনুবাদ ভাল লাগিল না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী রচিত—

"যে গেল সঙ্গে সুরে' কিছুই নিলনা।"

সুন্দর কবিতা। ভারতীয় হৃদয় তন্ত্রীকে ব্যথায় ঝনঝন্ করিয়া তুলিয়াছে। "গলাটী যাবে যে ভেঙে

ডেকে অবিরাম" ইহা অসহ্য। "অবগুণ্ঠনখানি পড়িছে খসিয়া" এ পংক্তিতে ১টী অক্ষর কম। মাঝে মাঝে যতিকষ্ট আছে। 'চিঠি' নামক সনেটটী চলনসই হইয়াছে—"ঘুম ভেঙে আজি তার পেয়েছি লিখন"—সনেটের আরম্ভ শেষ দুপংক্তিতে বেশ একটু মনস্তত্ত্বগত স্বাভাবিকতা আছে—

"আজি তাই মন নাহি লাগে কোনো কাজে
রহি রহি হিয়ামাঝে সে আনন্দ বাজে।

যমুনা। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়—"মন কবি"—ইন্‌জিনীয়ার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনের রচনা। যতীন্দ্র বাবুর কবিত্বের বিশেষত্ব ইহাতে বর্ত্তমান। তাঁহার Serio-comic toneটী ইহাতে বাজিতেছে—অনেক কঠিন এবং অনেকের অপ্রিয় সত্য কথাও তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—কবিতায় দু'চারিটী বেশ মৌলিক তুলিকাস্পর্শও আছে। বিদ্‌ঘুটে আলঙ্কারিকতাও আছে। তবু কবিতাটী সুরচিত হয় নাই—ছন্দ কেমন এলোমেলো। বাউলিয়া ভাবা তেমন জমাট বাঁধে নাই। একটা দাম্ভিক মুরুব্বিয়ানা পাঠককে ব্যথিত করিতেছ। "ঘুমের ঘোরে"—ঐ কবিরই। ১ম অংশের সহিত শেষাংশের তেমন মিল নাই। সমগ্র কবিতার ছাপ বড় অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে বেশ কবিত্ব আছে—

"উড়ে যায় অন্ধ কালের আকাশে
ডানায় শব্দ নাই।
খসে পড়ে বুঝি দেহের পালক
সে ভয় সর্ব্বদাই॥"

"নব ফরমাস দেই তোমা, সাজ' কলকের পর কলকে
বুকের রক্ত চল্‌কে (?) উঠুক হাড়গুলো যাক্ পল্‌কে
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঐ ছুটে যায় লক্ষমরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া।"

পরিচারিকা। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীপরিমল কুমারের "দরবেশ"। কবিতায় ছন্দোবন্দ মন্দ নহে। "বিহঙ্গ ভাসিল নীলিমায়"—পরিচারিকার মুদ্রাকরের কৃপায় বোধ হয় কবির 'বিহগ' বিহঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে এবং ছন্দঃ পতন ঘটাইয়াছে। আজকাল বাংলা কবিতায় "অসীম অজানায়" একটু অপব্যবহার হইতেছে বলিয়া মনে হয়। "মনোহারিনী কে ভুলাইল ধীরে" "কে মনোহারিনীর মন হরি' নিল" করিলে ভাল হইত। এ সকল স্থলে 'মিল' অপেক্ষা 'অনুপ্রাস'ই অধিক বাঞ্ছনীয়। "কবে যমুনায় টুটে যাবে হায় অভিসারিকার অভিমান?" এ পংক্তির সার্থকতা এখানে সুস্পষ্ট নহে। "ফিরিনু আবার আঁচলে তোমার" সুন্দর হয় নাই "বাহিরের আলো রাগিনী লীলায় ইঙ্গিত খুঁজে হারাইনু হায়" বড় অস্পষ্ট। 'চিরমানব'—না 'মহামানব'? 'হের গেহ হীন—স্বজন বিহীন' বড় অধম মিল। মোটের উপর কবিতাটী মন্দ হয় নাই। পরিমলকুমারের বিশেষত্ব এই কোন কবিতাই নেহাৎ নিকৃষ্ট হয় না—আবার কোন কবিতাই—প্রথম শ্রেণীর হয় না। কবি এই dull mediocrity হইতে কবে উচ্চে উঠিবেন! "বিরহলোক" শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবিতাটিতে মুদ্রাকরকৃত প্রমাদ বহু ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কবি কি বলিতে চাহিয়াছেন—বেশ বুঝা গেল না। প্রথম পংক্তিরই "লাজভান অধিকার আরো কত মিথ্যা ছলনায়" বুঝা যায় না। "সান্ত্বনার তরে বাহুসৌধ"—সান্ত্বনার জন্য সৌধ রচনার সার্থকতা থাকিলে "বাহু সৌধ" রচনার সার্থকতাও উপলব্ধ হইত। "সে ফুলের সে বসন্ত ক্ষতরক্ত ঝরা" ইত্যাদির মধ্যে কবিত্ব কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না "বুকের কেবল (?) শ্বাস মৃত্যু সম স্তব্ধ বারোমাস" ইহাই বা কি? কবিতার শেষ বা তৃতীয় স্তবকটী মন্দ হয় নাই।

"পতিত"—শ্রীকালিদাস রায়—তিনটী সনেটে সমাপ্ত। কবিতার ভাবটি মন্দ নহে—প্রকাশ কবিত্ব মধুর হয় নাই। সনেটের সংহত সৌন্দর্য্যের নিবিড়তা কই? কবিতায় Explanatory or critical Aalyssis পরিবর্জ্জব্য। কবির ratiocinative effort কবিতার প্রকাশকে স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক করিয়া তুলিয়াছে।

"উঞ্ছবৃত্তি"—শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিকের, কবিতার শেষ শ্লোকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। কবি কুমুদরঞ্জনের

কবিতায় আলঙ্কারিকতাই বিশেষত্ব, এ কবিতাতেও আলঙ্কারিকতা আছে কিন্তু তেমন জমে নাই।

"চন্দ্রমণির জন্মকথা"—Ema Wilcox হইতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষের দ্বারা অনুদিত। "ক্লান্ত দিবস খান" "পাক্‌ড়ে ফেলে বাঞ্ছিতারে" "চমক খেয়ে লাফিয়ে উঠে লাজে" 'ছুটে গিয়ে লুকুলো' "সূর্য্য কিরণ নাছোড়" ইত্যাদি ভাষাবিন্যাসে আমাদের আপত্তি আছে। অনুবাদ তেমন তরতরে ঝরঝরে হয় নাই। বিজয় বাবুর হাত যেমন পাকা ও মিঠে তাহার হিসাবে—অনিন্দ্য হওয়া উচিত ছিল। কবিতার শেষ পংক্তির প্রকাশটি বেশ সুন্দর।

"একসুর" শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়। উল্লেখযোগ্য নহে।

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্রের চারিটী সনেট। "সে কোথায়" "দুরন্ত" "চিঠি" ও "অভিসার"। কবিতাগুলিতে আশাপ্রদ কিছুই নাই। কবি মনকে বলিতেছেন—

"মাথা খাস পাখী তুই একবার থাম" এ কবিতার অন্তরালে যে বেদনা বাজিতেছে—তাহা সোজাসুজি দেখিলে ভারতীয় বর্ত্তমান অন্তরের অবস্থার ঠিক উপযুক্ত হইয়াছে।

মালঞ্চ। বৈশাখ। "কবির গৃহ" শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত। কবিতাটি মন্দ নহে। প্রকৃতির লীলা ভূমিতে কবির পর্ণকুটীর তথায়—

"নিষ্ঠুর ভুবনে
স্নেহময়ী কবিমাতা অক্ষম নন্দনে
স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি শত বজ্রাঘাত
সহেন হৃদয় পাতি।

তথায়—

কবি ভাবে মনে
বিশ্বের সৌন্দর্য্য বুঝি বেঁধেছে গোপনে
কবির কুটীরে বাসা।

কিন্তু এই যে আনন্দামৃত যাহা পান করিয়া কবি বিভোর তাহা কোথা হইতে আসিল তাহার কিকেহ খোঁজ রাখে?

"কে বুঝিবে হায়
নিরমম সংসারের কি কঠোর রণে
কত তীব্র সাধনার উদগ্র স্পন্দনে
পেয়েছে এ জয় মালা, হোমানল হতে
সমুত্থিত চরু হেন?"

জীবেন্দ্র বাবু কবির জন্য যে সান্ত্বনার ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা সুন্দর। যদিও কবি—

"নিরাশ্রয় নিঃসম্বল উপেক্ষালাঞ্ছিত
আত্মীয় স্বজনহীন জীবিকা বর্জ্জিত"
এবং ভিখারী—তবু—
"সিদ্ধি তপস্যায়—
হবে সত্য একদিন, প্রাণের প্লাবন
রচি হেথা নবতীর্থ ভক্ত অগণন
আসিবে সেদিন লয়ে, জানাতে কেবল
ব্যর্থ নহে কভু বিশ্বে তপ্ত আঁখিজল।"

"কলিমাহাত্ম্য"—চতুষ্পদী কবিতা তুলসীদাস হইতে অনুদিত। "মহত্বের মূল্য"—আর একটী চতুষ্পদী কবিতা। উহার একটী পদ বিষম রকম খোঁড়া। পংক্তিটী এই "আমরা স্বচ্ছন্দে আছি তুমি ঝড়ে মারা"। "বঙ্গমাতা" শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, একটী পংক্তিও নির্দ্দোষ নহে। কবিতায় না আছে ভাবের বিশেষত্ব না আছে ভাষার মাধুর্য্য না আছে ভঙ্গির নবীনতা। ২।৪টী পংক্তি উদাহরণ স্বরূপ দেখাইতেছি।

রাজর্ষি ঋষির পরশে যাহার পবিত্র হইল গেহ।
গঙ্গা যমুনার পুণ্যপূতধার শুদ্ধ করিল দেহ॥
* * * *
শিল্প বাণিজ্যের গৌরব গাহিল যাহার বিপণিপুঞ্জ।
* * * *
পাথার দুঃখেতে গলিয়া যেথায় উদিলা নিমাই চাঁন।
মুক্ত করিল মোক্ষদুয়ার দিয়ে সবে হরিনাম।"

হায়! হায়! চাঁদকে 'চাঁন' করিয়াও হরিনামের সহিত মিলিল না।

"চণ্ডীদাস জয়দেব যেথা বাদিলা বাণীর বীণা
প্রতাপ হুঙ্কারে কাঁপিল যেখানে ভয়েতে দিগঙ্গনা।"

উদ্বাহু কবি ছন্দঃশাস্ত্রের 1st book বা বর্ণপরিচয়ও এখনো পড়েন নাই। যাহা প্রাংশুলভ্য তাহার জন্ম হাত বাড়ান কি সঙ্গত হইয়াছে ?

কথক কবিরত্ন মহাশয়ের—"বর্ষশেষে" কবিতাটি বেশ হইয়াছে—

"শেষদিন বরষের ! এই শেষবার
খেয়াতরী লয়ে 'নেয়ে চলিল ওপার
শেষ শিখা শ্মশান বহ্নির, নদী তীরে
নিয়ে আসে। সর্ব্বশেষে চলিয়াছে ধীরে
মুছি শেষ অশ্রুনীর আপনার জন
শেষ করি উচ্চকণ্ঠে করুণ ক্রন্দন।
কি ভাবিছ বসি ? সব শেষ হয়ে আসে।
শুধু শেষ হয়নি পথের। পথপাশে
কেন চাহ বিছাতে শয়ন, উঠ যাত্রী।
অন্তহীন অজানিত পথে আসে রাত্রি।"

ইত্যাদি বেশ সুরচিত।

"পূজারী"—শ্রীশ্রীপতি প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের ! বোধ হয় কোনো সাহিত্য সম্মিলনী বা সাহিত্য সভার অধিবেশনে পঠিত সেই মামুলী বাগ্‌বিন্যাস। কোনো বিশেষত্ব নাই। বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মিলনীতে শুনিয়াছিলাম

"একশুধু মার চরণের তলে ধনীদীন ভেদ নাই গো
বিপ্র শূদ্র মহৎ ক্ষুদ্র সবারি হেথায় ঠাঁই গো;
* * *
ভক্ত কখনো রিক্ত কি হয় ? যাহা আছে তাই আনিও
কেহ এস করে তুলসী বিল্ব কেহ পারিজাত পাণি গো"

ইত্যাদি -

ইনিও গাহিয়াছেন—

"বিশ্বজননীর মন্দির বলে ভক্তের শুধু ঠাঁই
নাই সেথা নাই ধনী নির্ধন ছোট বড় ভেদ নাই।
নাহি থাকে যদি কাঞ্চন শালা মণিমুক্তার মঞ্জুন মালা
দুঃখ কি তাহে—ভরি আন ডালা ভক্তির ফুলে ভাই

ইত্যাদি। শ্রীপতি বাবু পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের ব্যবহৃত ভাষা-পুঞ্জের ও শব্দগুচ্ছের Permutation Combination করিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিতেছেন তাহা মিষ্টি হইতেছে বটে কিন্তু নুতন সৃষ্টি হইতেছে না। চাতুর্য্যের অভাবে অপরের ভাবকেও নিজ স্বীকৃত করিয়া লইতে পারিতেছেন না।

"বিধুরা"—শ্রীপ্রমথ নাথ দে বি এল বিরচিত। কন্দর্প ভস্মের পর রতির কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহাই কবিত্ব ভাষায় বিবর্ণিত। 'গান' নামক ক্ষুদ্র কবিতায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন মহাশয় বলিয়াছেন "আর কি থাকা যায়।" আমরা বলি তাই বলিয়া কবিতা লিখিয়া "মালঞ্চের" জঞ্জাল বাড়াইতে হইবে এমন কি কথা আছে ?

"অচেনা ছেলে"—কবি কুমুদ রঞ্জনের। বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

চাষীর কথা।

ঝাড়ছো কি সব বুলি ?
অন্নবিনা ভাঙলো দেহ,
উড়ছে মাথায় ধূলি।
আউস এবার হয়নি ভাল,
ছিল রোয়ার আশা,—
একটী রাতেই ধুয়ে নেছে,
পদ্মা সর্ব্বনাশা !
দেশের কথা বলি,

আর কেন গো বাবু তুমি,
প্রাণটা দিছ দলি ?
মহাজনের দায়ে—
চট পরে, যে কাটাচ্ছে দিন;
দুইটি ছেলে মায়ে।
কতই সাধে রুইনি যে পাট
পচছে পড়ে ঘরে,
নেয়না কেহ দিতে গেলে
বল্‌ছে না যে দরে!
পেটের ক্ষিদেয় মরি,—!
দেশের কথা ? চুপ করগো
দুইটী পায়ে ধরি।
যা ছিল গো ঘরে,—
দুখান থালা একটী কলস
বেচ্‌নু জলের দরে।
খড়ের ঘর যে দুখান ছিল
একটী দিলেম বেচে,
দুটো মাসই কাটল আমার,
পড়শী ঘরে যেচে!
কাঁদছে দুটী ছেলে,
বুকটা আমার জায়গো ফেটে,
তাদের কাছে গেলে!
আমার সবই ছিল—
ধানের মরাই 'গইলে' গরু
কপাল লুটে নিল
মোকর্দ্দমার বিষম ফাঁদে
উকীল ঘরে গিয়ে,
আমার সাধের বাস্তুভিঁটে
এসেছি গো দিয়ে।
যায় যে ক্ষুধায় প্রাণ,
আর কেন গো আমার দ্বারে
কি আর বাবু চান ?
দেশের মুখে ছাই
কে দেখে গো আমার ঘরে
লক্ষ্মী কৌটা নাই।
তিনটী দিনই ছেলের মুখে
যায়নি দুটী ভাত
কেঁদে কেঁদে কাটল আমার
তিনটী আঁধার রাত!—
কে চায় চক্ষু তুলি
মিছে কেন দেশের কথায়
ঝাড়ছো বাবু বুলি ?
জ্বলতে যদি পেটে—
অন্ন দুটি মিলতো নাগো
সারাটা দিন খেটে,
বুঝতে ওগো দেশের কথা,
লাগতো কেমন কাণে;
কামিজ আঁটা ভরা পেটে,
দুঃখ কে আর জানে ?
মরতে ঘরেই চাই—
সেলাম বাবু, বড় কথায়—
আমার কাজ আর নাই।

শ্রীকালিদাসী দেবী।

ভারতে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব।

বর্ত্তমান আশ্রমের কথা।

যাঁহারা এদেশের কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রম দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, রোগীগণকে আবশ্যকানুরূপ বাসস্থান ও বস্ত্রাদি দেওয়া হয় এবং তাহাদের ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য ঔষধ প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে সুখে রাখিয়া দুর্দ্দশা ভুলাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় না। যাঁহারা লোকহিতৈষণাবশে বিবিধ "মিশন" পরিচালন করেন তাঁহাদের যত্নেই ইহা হইতেছে। কিন্তু এই যত্ন সত্ত্বেও কি রোগীরা সব সত্যই সুখে থাকে? বাস্তবিক, রোগীরা সর্ব্বদাই মনে করে, তাহারা আশ্রমে আছে সে আশ্রম হাসপাতাল নহে। রোগী আরোগ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া হাসপাতালে যায়। আশ্রমে রোগীকে যথাসম্ভব যত্নে রাখিবার সু-ব্যবস্থা থাকিতে পারে; কিন্তু আশ্রম হইতে রোগীদের প্রায়ই আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়া আসা ঘটে না।

ইতঃপূর্ব্বে কোন কোন "মিশনের" আশ্রমে নানারূপ চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বিত হইত। কিন্তু কোনটিতে বিশেষ সুফল ফলে নাই। এদেশে বহুদিন হইতে চালমুগরার তৈল কোন কোন প্রকার কুষ্ঠের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কোন কোন আশ্রমে চালমুগরার তৈল দিয়া চিকিৎসা করাও হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর দেহে ইহার সুফল ফলিয়াছে। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সার লিওনার্ড রজার্স চালমুগরার তৈল হইতে সোডিয়ম গাইনোকারডেট প্রস্তুত করিয়াছেন। কেহ কেহ আশা করেন, এই ভেষজ রোগীর শিরায় প্রবিষ্ট করাইলে ও সেবন করাইলে সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। তবে বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত এই ভেষজে যে রোগ সারিবেই এমন কথা বলা যায় না।

আবশ্যক সু-ব্যবস্থা।

আমরা অবগত হইয়াছি কুষ্ঠরোগীদিগের মিশনের সম্পাদক মহাশয় ভারত সরকারের সাহায্যে ১৫ বা ২০ জন শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের দ্বারা আবিষ্কৃত সকল উৎকৃষ্ট ঔষধের ফল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন। তদ্দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করিবার সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইবে। বড়লাটের পত্নী লেডী চেমসফোর্ড দয়াপরবশ হইয়া এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। আমরা আশা করি, যাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

বিরাট ব্যাপার।

এ ব্যবস্থা ভালই হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিশাল দেহ এবং এদেশে প্রায় সব জেলাতেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোক বিদ্যমান। এ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত আয়োজন কখনই দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গতবারের আদমসুমারে দেখা গিয়াছে, ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৯ হাজারেরও অধিক কুষ্ঠরোগী আছে, কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই আশ্রমসমূহে আশ্রয় পাইয়াছে এবং "মিশন টু লেপারস্" এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়া নানা আশ্রমে প্রায় ৬ হাজার রোগীকে আশ্রয় দিয়াছেন। কিন্তু এই সকল আশ্রমেরও অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ৯টি আশ্রমে যত রোগী রাখা উচিত তদপেক্ষা অধিক রোগী রাখিতে হইয়াছে, ৬টিতে স্থানাভাব, অনেক আশ্রমে রোগীরা যাইতে চাহিলেও স্থানাভাবে যাইতে পারিতেছে না, ১০টি আশ্রমে নূতন গৃহ প্রয়োজন। অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বর্ত্তমানে যে সকল আশ্রম বিদ্যমান তদপেক্ষা অনেক অধিক আশ্রম প্রয়োজন।

মিশনের লোক, সরকার ও যে সকল জনহিতৈষী চিকিৎসক এই মহাব্যাধির ঔষধ সন্ধান করিতেছেন তাঁহারা আমাদের প্রশংসাভাজন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় প্রণালীতে এবিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তবে

ভাল হয়। আমাদের দেশে এই ব্যাধির স্বতন্ত্র চিকিৎসাপ্রণালী ছিল। প্রতিবাসিরা অদ্যাপি এই ব্যাধির নিদান নির্ণয় করিতে পারেন নাই; এবং চিকিৎসা সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এই ব্যাধির চিকিৎসা প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে প্রচলিত ঔষধের মধ্যে কেবল চালমুগরার তৈল য়ুরোপীয়েরা ব্যবহার করিয়াছেন এবং সুফলও পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে আরও নানারূপ ঔষধের উল্লেখ আছে এবং সে সকলও ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়াছে।

জাতীয় চিকিৎসাপ্রণালী।

আমাদের শাস্ত্রে আছে—কুষ্ঠরোগ অষ্টাদশ প্রকারের। এই সকল রোগে একই প্রকার চিকিৎসা অবলম্বীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিকিৎসা আছে; এবং একই প্রকার ব্যাধিতে রোগের অবস্থা, রোগীর স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি ভেদে চিকিৎসার প্রকার ভেদ হয়। বহু আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সে সকলের মধ্যে দ্রব্যগুণ, পাচন সংগ্রহ, ভাবপ্রকাশ, আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

এদেশে প্রাচীন ঋষিরা এই রোগের নিদান নির্ণয় করিয়া ঔষধ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা আভ্যন্তরীন প্রয়োগের জন্য বিরেচক, বমন ও রক্ত পরিষ্কার ঔষধ দিতেন। বাহ্যিক প্রয়োগের জন্য তৈল ও ঘৃত ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত হইত। অনন্তমূল, গুলঞ্চ, নিম্ব, রুদ্রবন্তী, চিরতা, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও অন্যান্য ঔষধ এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত।

কিন্তু প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া, মাত্রা ও প্রকার স্থির করিয়া প্রয়োগ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। কেবল স্বদেশজাত ঔষধ এবং সেই সকলের গুণ জানিলেই কুষ্ঠরোগে তাহা প্রয়োগ করিয়া সুফল লাভ করা যাইবে না। চিকিৎসককে রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে, কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে কাজ শিখিতে হইবে এবং দ্রব্যগুণ পরীক্ষা করিয়া শিখিতে হইবে। তাঁহাকে নানা অবস্থার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসার ফল লক্ষ্য করিতে হইবে—ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা একজন বিশেষজ্ঞের পরিচয় পাইয়াছি। তিনি আমাদের দেশের চিকিৎসা প্রণালীতে অভিজ্ঞ এবং কোনও হাতুড়িয়া ঔষধ ব্যবহার করেন না। তিনি কেবল শাস্ত্রীয় ঔষধই ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার চিকিৎসার ফল দেখাইয়াছেন। বেলগাছিয়া আলবার্টভিক্টর হাসপাতালের পরিচালকগণ কয়টি রোগীকে তাঁহার চিকিৎসাধীন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সার পার্দীলুকিস, ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, বাবু শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধানে তিনি রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নিকট তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, পিতা নিজাম রাজ্যে ও অন্যান্য স্থানে কতকগুলি কুষ্ঠরোগীকে চিকিৎসায় আরোগ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র বা আত্মীয় নাই যে, তিনি তাহাকেই এ বিদ্যা শিখাইয়া যাইবেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার লব্ধ বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তিনি তেমন লোককে শিখাইয়া এই চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তার সাধন করিতে ইচ্ছুক।

উপায় নির্দ্ধারণ।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির কথা বলা হইল, তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বব্যয়ে সালকিয়ায় একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে ২জন রোগী বাস করিতে পারে; আরও দুজনের স্থান হইতে পারে। এই আশ্রমে বহু রোগী চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এখন এই মহৎ অনুষ্ঠানের বিস্তৃতি সাধন প্রয়োজন। সেই জন্য কোন মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ সকল স্থান হইতে সুগম এবং কুষ্ঠরোগীদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যে স্থানের আবহাওয়া উত্তম এবং বৎসরের সকল সময় নাতিশীতোষ্ণ এমন স্থানই ভাল। হাসপাতালটি কোন হিন্দুর মন্দিরের নিকটে বা কোন বড় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকের সাহায্য পাইবার সুবিধা হয়। বিশেষজ্ঞটী বিনামূল্যে এই হাসপাতালে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি আরও বলেন, যে যে সকল যুবক আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়া কুষ্ঠরোগীদিগের হিতকল্পে জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং তাঁহাদের মত পরার্থপর যুবকদিগকে আপনাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা শিখাইতে প্রস্তুত হইবেন, তিনি তাঁহাদিগকে চিকিৎসাপ্রণালী শিখাইয়া দিবেন। তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ

হইয়াছেন, এবং জীবনের সায়াহ্ন দেবার্চ্চনায় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন। যাহাতে তাঁহার সঙ্গে তাঁহার লব্ধ জ্ঞান ও অনুসৃত চিকিৎসাপ্রণালী লুপ্ত হইয়া না যায়, তাহার উপায় করা আমাদেরই কর্ত্তব্য।

একবার যদি কুষ্ঠরোগীরা জানিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন হাঁসপাতাল আছে যে তাহারা তথায় যাইলে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না, পরন্তু চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিবে তাহা হইলে তাহাদের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইবে এবং তাহাদের আশীর্ব্বাদ এই হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিরে বর্ষিত হইবে। এই অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিলে পৃথিবীর নানা স্থানের শত শত কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারিবে। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে কি গৌরবের দিন হইবে। তখন দেশ বিদেশ হইতে শত শত কুষ্ঠরোগী রোগ মুক্তির জন্য ভারতবর্ষের এই হাঁসপাতালে আসিবে। আর এক কথা, এই চিকিৎসাপদ্ধতি একবার হাঁসপাতালে প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বজনবোধ্য হইলে—বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ক্রমে যোগ্যতর ব্যক্তির চেষ্টায় পূর্ণত্ব লাভ করিয়া কুষ্ঠরোগের অমোঘ ঔষধ প্রদান করিয়া পৃথিবী হইতে এই দারুণ ব্যাধি বিদূরিত করিতে পারিবে।

ব্যয়ের হিসাব।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একটি হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যদি সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করা হয় তবুও গৃহাদি নির্ম্মাণে ও ব্যয়নির্ব্বাহে লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে, প্রকৃত কাজ করিতে হইলে হাঁসপাতালে অন্ততঃ ১৬জন রোগীর স্থান হওয়া প্রয়োজন এবং তাহা বাড়াইবার ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। জমিতে ও বাড়ীতে আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ২৫৲ হাজার টাকা। প্রত্যেক রোগীর দৈনিক ব্যয় ন্যূনাধিক ১৲ টাকা। সুতরাং প্রথমে ৮জন রোগী লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে রোগীর বাবদে মাসিক ২৪০৲ টাকা ব্যয় হইবে। অন্যান্য খুচরা ব্যয় মাসিক ৭২৲ টাকায় কুলাইতে পারে। সুতরাং লক্ষ টাকার মধ্যে গৃহনির্ম্মাণাদি বাবদে ব্যয়িত ২৫ হাজার টাকা বাদে অবশিষ্ট ৭৫ হাজার শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা সুদে খাটাইতে পারিলে তাহার সুদে মাসিক ব্যয় এই ৩ ২৲ টাকা কুলাইয়া যাইবে। এইরূপে কার্য্য আরম্ভ করিয়া এককালীন দানে ও মাসিক সাহায্যে অবশিষ্ট রোগীদিগের ব্যয়নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইতে পারে। কারণ, প্রথমে যে সব রোগী হাঁসপাতালে আসিবে তাহারা আরোগ্য হইয়া গেলেই লোক এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। এদেশে পরোপকার করিতে ইচ্ছুক লোকের অভাব নাই; তাঁহারা যে এইরূপ সৎকার্য্য করিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ টাকা তাঁহারা যে এইরূপ সৎকার্য্যে সাহায্য করিবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এরূপ অনুষ্ঠানের জন্য লক্ষ টাকা অধিক নহে। অনুষ্ঠানের উপকারিতা বুঝিলে দশজন লোক অনায়াসে ১০,০০০৲ টাকা করিয়া দিতে পারেন, এমন কি একজনও এই টাকা একা দিতে পারেন।

উপরে যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কথা বলা হইয়াছে—তিনি পণ্ডিত কৃপারাম। পণ্ডিত কৃপারাম ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া যে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়াছেন, তাহা নানা পত্রে ও তাঁহার পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। প্রয়োজন হইলে তিনি আবার তাঁহার চিকিৎসার উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছেন। কেহ ১০ হাজার টাকা দান করিতে প্রস্তুত থাকিলে তিনি যদি দুইজন কুষ্ঠরোগীকে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠান তবে তিনি তাহাদের চিকিৎসা করিয়া সুফল দেখাইলে তবে দাতা দান করিবেন।

আমি এ বিষয়ে আমাদের দেশের কতিপয় নেতার সহিত আলোচনা করিয়াছি। কার্য্যের জন্য সমিতি গঠিত হইলে তাঁহারা সদস্য হইতে প্রস্তুত আছেন। এখন লোকের মতামত লইবার আশায় এই অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইল। যিনি এ বিষয়ে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ৮ নং নন্দীবাগান লেন, শালকিয়া, (হাওড়া জিলা) ঠিকানায় পণ্ডিত কৃপারামের নিকট পত্র লিখিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয়।
কলিকাতা।

শ্রীপীযূষকান্তি ঘোষ।

স্বত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল প্রাণের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ। পৌষ—১৩২৬ ১০ম সংখ্যা।

আলোচনী

"চিত্রকলা প্রদর্শনী"

ভারতীয় চিত্রকলা প্রতিষ্ঠানের একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়াছে। এ বৎসর উহার একটু বিশেষত্ব আছে। সমবায় অট্টালিকায় যে সাধারণ প্রদর্শনী হয় তাহা এখনো চলিতেছে; ইহা ছাড়া একটী বিশেষ প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে কলিকাতায় লাটভবনে। এই বিশেষ অধিবেশনে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল; লাট-নিমন্ত্রিত দশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিগণ ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। দুইটী প্রদর্শনী উপলক্ষে লর্ড রোণালডশে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তাঁহার ভারতীয় নব্য কলাতন্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশিত হয়। নব্য কলাতন্ত্রের উপাসকগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় চিত্রকলা চর্চ্চার অনুশীলন ও বিস্তারের জন্য একটী শিক্ষালয় স্থাপন কল্পে ২০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলা শিখাইবার জন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না; পূজনীয় অবনী বাবুর প্রাণপণ সাধনা ও চেষ্টার ফলে ভারতীয় চিত্রকলা বৈদেশিক সমজদারদিগের নিকট যথোপযুক্ত সম্মান ও যশ লাভ করিয়াছে; এবং গভর্ণমেণ্টও ইহার বিস্তার কল্পে অর্থ সাহায্যে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না। আমরা এখন আশা করিতে পারি এই সুকোমল অঙ্কুরটী যথাকালে একটী মহীরুহে পরিণত হইয়া প্রাচীন ভারতের লুপ্ত শিল্প-গৌরবের পুনরুদ্ধার করিবে।

লাটভবনের প্রদর্শনীতে সব শুদ্ধ ৮৯টী চিত্র প্রদর্শিত হয়; সব গুলিই বিশিষ্ট সুপরিচিত চিত্রকরের হাতের কাজ। সমবায় অট্টালিকার সাধারণ প্রদর্শনীতে তালিকানুসারে ১৪৮টী চিত্র প্রদর্শিত হয়; ইহার মধ্যে পূর্ব্ব প্রদর্শনীর চিত্রগুলিও ছিল।

অন্যান্য পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর প্রদর্শিত চিত্রগুলি সংখ্যায় ও শিল্পোৎকর্ষে খুবই ভাল ছিল। ভারতীয় চিত্র পদ্ধতি যে ক্রমশঃ লোকরঞ্জনে সমর্থ হইতেছে এবং লোকেও যে ইহার আদর বুঝিতেছে ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

সংখ্যায় ও শিল্পগৌরবে এবার পূজনীয় অবনীন্দ্রবাবু ও তদীয় যোগ্য শিষ্য নন্দলাল বাবুর চিত্রগুলির উল্লেখ সর্ব্ব প্রথমেই কর্ত্তব্য।

নন্দলাল বাবুর সব শুদ্ধ ২৩খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল চারখানি। (১) 'Daughter of the Soil';

(৩নং) (২) 'Oh the Waves, the Sky-devouring 'Waves' (৩) 'Departing Day.' (৪) 'Make Me Thy Poet Oh Night'! শেষ তিনখানির বিষয় বস্তু রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি হইতে গৃহীত। সব দিক দিয়া দেখিলে ছবি কয়খানি অত্যন্ত সুন্দর ও নন্দবাবুর হাতের যোগ্য বলিয়াই মনে হয়। তবে এ কথাও সত্য, বাকী অধিকাংশ চিত্রগুলিতে নন্দলাল বাবুর নাম না থাকিলে তাঁহার হাতের আঁকা বলিয়া ভ্রম না জন্মাইবার কিছু তেমন নাই। যে হাতে 'শিব ও সতী' 'কৈকেয়ী' বা 'দময়ন্তীর স্বয়ংবর' 'গঙ্গাবতরণ' প্রভৃতি চিত্র বাহির হইয়াছিল সে হাতের কোনো পরিচয়ই এসব চিত্রে পাওয়া যায় না। ১৬ নং চিত্র অর্থাৎ 'জালটানা' ছোটর মধ্যে খুব সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

এবারকার প্রদর্শনীতে কলা-রসজ্ঞদের পক্ষে অবনীন্দ্র-বাবুর চিত্রগুলি প্রধান আকর্ষণ ও উপভোগের জিনিস। তাঁহার দশখানি চিত্রের মধ্যে কোনটী যে সর্ব্বাপেক্ষা শোভনীয় তা হঠাৎ বলা বড় কঠিন। প্রায় সমস্ত চিত্র-গুলির বিষয় ও ভাব গীতাঞ্জলি হইতে গৃহীত। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাব শিল্পী অবনীন্দ্র নাথের তুলিকা স্পর্শে রেখায় ও বর্ণে ফুটিয়া ওঠার যেমনটী আশা করা যায় ঠিক তেমনটীই হইয়াছে। সমস্ত কবিতাটীর ভাব-মাধুর্য্য চিত্রের ভিতর দিয়া এমন সুন্দরভাবে সরল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা না দেখিলে বুঝা যাইবে না। যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলার রসবোধ মাসিকের প্রতিলিপিতে করিয়া থাকেন তাঁহাদের কাছে আমার এই সাম্নয় অনুরোধ একবার স্বচক্ষে গিয়া এই চিত্রগুলি দেখিয়া আসুন। খুব অল্প রংএ, সূক্ষ্ম রেখাপাতে ভাবের এমন অপূর্ব্ব বিকাশ আর কোন আধুনিক চিত্রকরে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকে ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রে মুখ চোখে ভাবের অভিব্যক্তির অভাব সম্বন্ধে আক্ষেপ করেন; এ আক্ষেপ অনেকটা সত্য। কিন্তু অবনীন্দ্রবাবুর এই কয়খানি চিত্রে বিশেষতঃ ১০৪, ১০৫, ও ১০৮ সংখ্যক চিত্রে এ অভিযোগ করিবার কিছু নাই। মুখের ভাব তুলিকার কোমল স্পর্শে অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয় ১১১ সংখ্যক অর্থাৎ 'Prisoner—Tell me, who was it that bound you' এবং ১১২ সংখ্যক অর্থাৎ 'The trumpet lies in the Dust এই দুখানি চিত্র কি বিষয় গৌরবে ও কি অঙ্কন কৌশলে তাঁহারা সবগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট। 'In search of the Parrot Princess' (১০১ সংখ্যক) চিত্রে রংএর সাহায্যে কল্পনা-লোক সৃষ্টি অতি সুন্দরভাবে সমাধা হইয়াছে।

শ্রীযুৎ সুরেন্দ্রনাথ করের ছয়খানি চিত্রের মধ্যে The Earth and the Sky (২৬ নং ও On the Slope of the Desolate River (২৭ সংখ্যক) চিত্র দুইটী উল্লেখ যোগ্য। পূর্ব্বোক্ত চিত্রের symbolism (রূপকত্ব) বেশ পরিস্ফুট, একটী রমণী নতমুখে ধরাপৃষ্ঠে দৃষ্টিনিবদ্ধা, অপরটী দূরে আকাশের দিকে তাকাইয়া; একজন পার্থিব ব্যাপার নিরতচিত্তা অপরজন অপার্থিব অধ্যাত্ম জগতে বিচরণশীলা। জীবাত্মার দুই ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির মূর্ত্তি স্বরূপ। Rest নামক চিত্রে বিশ্রামের ভাবটী নির্জ্জনতার সাহায্যে ফুটিয়াছে ভাল।

শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ দের দুইখানি চিত্র উল্লেখ যোগ্য। Dancing Shiva (৩৩ নং) ও Padmini (৩৫ নং)। নৃত্যশীল মহাদেবের নর্ত্তন ভঙ্গীটী সুন্দর হইয়াছে। 'পদ্মিনীর' ভাবটীও বেশ সুন্দর। রং ফলানোর কায়দা ও নিপুণতা ভারতীয় চিত্রকরদের একটী বিশেষত্ব; শ্রীমান শৈলেন্দ্র এ বিষয়ে খুব প্রশংসনীয় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। নৃত্যশীল মহাদেবে তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। 'নির্ব্বাসিত যক্ষের' চিত্রে বিষয়ের প্রাচীন ভাবটী বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের চিত্রে বর্ণবিন্যাসের কৌশল মন্দ নয়। 'শ্রীরাধিকার তমালতরু সম্ভাষণ' চিত্রে রাধিকার ভঙ্গীতে আড়ষ্ট ভাবটা কিছু বেশী মাত্রায়। তমাল বৃক্ষের বৃক্ষত্ব আছে কিন্তু তমালত্ব কিছু বুঝা যায় না। তা ছাড়া শ্রীরাধিকার আলিঙ্গন ভঙ্গীটা কি-রসের উদ্দীপক তাহা বুঝা কঠিন।

শ্রীযুত অসিতকুমারের 'শিবাজী' চিত্রখানি অতি

মনোহর। রেখা বৈচিত্র্যে ও বর্ণ কৌশলে বাস্তবিকই বড় মনোরম হইয়াছে। তাঁহার প্যানেল ড্রয়িংগুলি অতি উচ্চ দরের চিত্র। শুদ্ধমাত্র রেখাতে চিত্র যে কত ভাব-ব্যঞ্জক হয় তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'আলোর উৎস' (৪৯ নং) বুঝা গেল না। অনেক চিত্রের নাম তাহাদের অর্থদ্যোতক হয় নাই, ইহা একটী সেই শ্রেণীর চিত্র। 'জলঢালা' নাম দিলেও ইহা তাহাই বুঝাইত।

শ্রীযুত বেঙ্কটপার "গণেশের মহাভারত লেখা" চিত্রের বিষয় বহুপূর্ব্বে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর অঙ্কিত চিত্র হইতে গৃহীত। বর্ণের বাহার ছাড়া উহাতে প্রশংসনীয় কিছুই নাই। উভয় চিত্রকর বেদব্যাসকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন কেন বুঝিতে পারিলাম না। বেদ-ব্যাসের কি অনার্য্য গর্ভে জন্মদোষ ছিল বলিয়া ?

শ্রীমান দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ছয়খানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'Returning Home' (৭০ নং) দর্শনীয়—এই মাত্র। 'ধনুর্দ্ধারী রাম' (৭১ নং) চিত্রে ধনুর্দ্ধারী বটে, তবে অঙ্কিত মূর্ত্তিখানি রামের ধনু ধারণের পক্ষে অযোগ্য। শাল প্রাংশু,মহাভুজ বীরাগ্রগণ্য রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ভারতীয় চিত্রকরের হাতে পড়িয়া পিলে-রুগীর মূর্ত্তি ধারণ করিল কেন বুঝা দুষ্কর। বীরোচিত সুদর্শন সুগঠিত মূর্ত্তিতে আঁকিলে কি নব্য চিত্রকলার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না তাহা বুঝা কঠিন। ইচ্ছাকৃত এই সব অনাচারেই সাধারণের মনে নব্য চিত্র কলার উপর বিরাগ আসিয়া পড়ে। উঠ্‌তি মুখে নব্যকলার পক্ষে সেটা শুভ নহে। ইঁহার 'The Golden Thread' ও (৬৯ নং) তদ্রূপ। এ চিত্রের বক্তব্য কি বুঝা যায় না। 'Thread Golden' না হউক চিত্রের মূল্য golden বটে!

শ্রীযুত সারদাচরণ উকিলের 'সরস্বতী' বাস্তবিকই একটী সুন্দর চিত্র। কি ভাবে কি কল্পনায় কি বর্ণবিন্যাস বা অঙ্কন কৌশলে চিত্রখানি এবারকার একখানি সম্পদ স্থানীয় বলিয়া মনে হইল।

শ্রীযুৎ দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর 'Day-break (৭২ নং) ও 'The lover' (৭৪ নং) অতি সুন্দর চিত্র। বর্ণবিন্যাসের বাহাদুরী আছে।

শ্রীযুৎ বীরেশ্বর সেনের অনেকগুলি চিত্র এবারকার প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে "ওমার খৈয়্যমের" চিত্র কয়টী বড় সুন্দর লাগিল। ইঙ্গ-বঙ্গের ক্যারিকেচার খানি চিত্র হিসাবে মন্দ নহে তবে ভারতীয় চিত্র কলার নামে পরিচিত কেন হইল ? ক্যারিকেচার খাঁটী বিলাতি আর্ট। ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি-অনুযায়ী নহে।

শ্রীযুত সি, কে, ওয়ারিয়ারের 'কল্কি অবতার' (৮৬ নং) উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার নিসর্গ চিত্রগুলি ভারতীয় চিত্র-কলার অন্তর্গত বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ দেখি না।

শ্রীমান অরবিন্দ দত্তের 'In the Arms of Death (৯৭ নং) উল্লেখ যোগ্য চিত্র। বিষয় গৌরবে ও অঙ্কন কৌশলে ইহা একটী দর্শনীয় চিত্র।

শ্রীমান চারুচন্দ্র রায়ের 'সীতার অন্বেষণ' (৯৮ নং) চিত্রখানি বেশ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমান অনিল প্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'পূর্ণচন্দ্র' (৯৯ নং) সুন্দর চিত্র।

শ্রীমান অশ্বিনীকুমারের 'বিল্বমঙ্গল' চিত্রটী দর্শনযোগ্য। দেহাবয়বের নিম্নাংশ একটু দোষযুক্ত না হইলে চিত্রটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত।

এবারকার প্রদর্শনীর উৎকৃষ্ট চিত্রের মধ্যে শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'The Spirt of the River' (১০৩ নং) অন্যতম চিত্র। কল্পনায় ও অঙ্কন কৌশলে চিত্রটী অত্যন্ত সুন্দর। নবীন শিল্পীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। ভাবোৎকর্ষ ততোধিক।

পূজনীয় শ্রীযুত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আরতি' এবার-কার প্রদর্শনীর একটী বহুমূল্য সম্পদ। 'হরতাল দিন' (১১৫ নং) ভাবোৎকর্ষে অতীব মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক। তাঁহার নিসর্গ চিত্রগুলি চিত্র হিসাবে অতুলনীয়; তবে ভারতীয় চিত্রকলার বিশেষত্ব বর্জ্জিত। 'হিমালয়ে সূর্য্যাস্ত' (১১৯ নং) 'Through the Mist' (১২৮) Awakening of Kanchanjungha' (১২০ নং) 'Cargo Boats on the Pudma' (১২৬ নং) বাস্তবিকই অতুলনীয়। দক্ষতম শিল্পীর তুলিকাপাতের পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।

শ্রীযুত রতীন্দ্রনাথের 'A Victim of Inhuman Pleasure' (১৩২ নং) বাস্তবিক উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথের 'সপ্তপদী' বৃহৎ চিত্র এবং অতি কলা কৌশল ব্যঞ্জক।

শ্রীমান পুলিন বিহারী দত্তের 'Touch of Life' (১৩৭ নং) ভাবগৌরবে ও অঙ্কন কৌশলে একটী উল্লেখ যোগ্য চিত্র। অস্তপ্রায় জীবন দীপ হইতে নবজীবন তাহার ক্ষীণ দীপটী অতি সন্তর্পনে জ্বালিয়া লইতেছে। মানবজীবনের অনির্ব্বাণ দীপশিখা পুরুষ পরম্পরায় বর্ত্তমান থাকে এই ভাবটী চিত্রে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে!

শ্রীমান চঞ্চল কুমার ক্যারিকেচারে সিদ্ধ হস্ত। ভারতীয় শিল্পকলায় ক্যারিকেচারের স্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চঞ্চল কুমারের 'The Reed Pipe চিত্রটী গম্ভীর বিষয়ক। দৃশ্যটী মন্দ নয়। তবে বংশীবাদকের দেহভঙ্গীমায় লালিত্যের অভাব বোধ হয়।

শ্রীযুত লালা নারায়ণ প্রসাদের 'Slayer of Krishna' চিত্রটী অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। আহত হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাশীল মূর্ত্তিটী বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ণবিন্যাসেও চিত্রটী অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

স্বর্গীয় নটেশনের 'ভিখারী' (১৪৬ নং) অতি স্বাভাবিক ও সু-অঙ্কিত চিত্র। একেবারে নির্দ্দোষ। 'On the Temple Steps' চিত্রটীও উল্লেখ যোগ্য। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে নব্যচিত্রকলা একটী উদীয়মান শিল্পী হারাইল।

প্রদর্শিত চিত্রগুলি সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তা বলা হইল। সাধারণভাবে এই নব্য চিত্র শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা দরকার।

প্রথমতঃ প্রদর্শনীর অনেকগুলি চিত্রই ভারতীয় চিত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। তাহার মধ্যে ক্যারিকেচার ও নিসর্গ চিত্রগুলি প্রধান। প্রথম শ্রেণীর চিত্র অর্থাৎ ক্যারিকেচার বা ব্যঙ্গচিত্র; পুরা বিদেশী শিল্প দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্র অর্থাৎ নিসর্গ চিত্রগুলিও কতকটা তাই। পাশ্চাত্য চিত্রকলা হইতে ইহাদের ভেদ কোথায়? খাটী ভারতীয় চিত্র শিল্পের বিশেষত্ব উহার 'religious symbolism'এ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রূপকত্বে। একটী উচ্চ জাতীয় ভাবকে রেখা ও বর্ণে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং সেই ভাবটী ভারতীয় জ্ঞান, চিন্তা বা সাধনার দ্বারা লব্ধ হইবে। কোনো অঙ্কিত চিত্রে যদি এই তথা কথিত প্রাচীন 'religious symbolism' না পাওয়া যায় তাহাকে ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি অনুযায়ী বলা উচিত কিনা তাহা বিবেচ্য। এই লক্ষণে বিচার করিলে প্রদর্শনীর অনেক চিত্রকে 'ভারতীয় চিত্র' নাম দেওয়া কঠিন। আর যদি চিত্রের অঙ্কিতব্য বিষয়টী ভারতবর্ষীয় হইলেই তাহার 'ভারতীয় চিত্রকলা' নাম পাইবার দাবী ঘটে তাহা হইলে আর্টষ্টুডিওর অঙ্কিত দেবদেবীর চিত্র এই নাম-গৌরবে বঞ্চিত কেন?

দুর্গেশচন্দ্রের 'The Tonga' বা বিপিন চন্দ্রের 'The Glass bangle Seller' বা ওয়ারিয়ারের 'The Village Doctor' বা চঞ্চলকুমারের 'Bengalee National Band' বা নন্দলাল বাবুর 'His Only Companion' কি গুণে বা বিশেষত্বে 'ভারতীয় চিত্রকলা'র নামগৌরব লাভ করিল, অথচ আর্টষ্টুডিওর বা অন্যান্য শিল্পীর অঙ্কিত হিন্দু দেবদেবী বা ধর্ম্ম কর্ম্মের চিত্রগুলি এ নাম-গৌরব লাভে বঞ্চিত এই রহস্যটা আমি এখনো বুঝিতে পারিতেছি না।

সাধারণের মধ্যে অনেকেরই মনে এই ধোঁকাটা এখনো লাগিয়া আছে। আমি নিজে ভারতীয় চিত্রকলার একজন রসগ্রাহী, কিন্তু এখনো আমার এই ধোঁকা কাটে নাই। এখনো বুঝিতে পারি না বৌবাজারের ষ্টুডিও অঙ্কিত 'মদন-ভস্ম' বা 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেব' বা ওই-রূপ একটী চিত্রকে ভারতীয় চিত্রকলা বলিব না কেন, এবং 'The Village Doctor' বা 'The Tonga বা 'The Young Bride' কেই বা ভারতীয় চিত্রকলা বলিব কেন? উত্তরে হয়তো শুনিব Art Studioর চিত্রে ইংরাজী ভাব বেশী প্রবল। এই ইংরেজীভাব ও ভারতীয়ভাব উভয়ভাবের ব্যবধান বা পার্থক্য চিহ্নটী কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমান দুর্গাশঙ্করের 'Rama the Archer' এবং রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত

'রামের সমুদ্রশাসন' চিত্রটী ধরা যাউক। প্রথমটীতে কি এমন ভারতীয় ভাব এবং দ্বিতীয়টীতে কি এমন বিদেশী ভাব দেখা যায় যাহাতে প্রথমটী ভারতীয় শিল্প বলিয়া গণ্য হইল আর দ্বিতীয়টী অভারতীয় শিল্প বলিয়া দুষ্য হইল?

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে অনেক সমজদারের মনে এই ধোঁকা থাকিয়া যায়; এবং কোনো সন্তোষকর কৈফিয়ৎ পাওয়াও যায় না। ইহার একটা খোলসা রকমের বুঝাপড়া হইলে ভারতীয় চিত্র সম্বন্ধে লোকের মনে যে কুসংস্কার ও বৈরাগ্য আছে তাহা দুর হইতে পারে। সাধারণের মধ্যে অনেকেরই এখনো প্রবল ধারণা যে একটা বিশেষধরণের হাত পা মুখ চোখ অঙ্গ ভঙ্গী দিয়া আঁকিলেই তাহা ভারতীয় চিত্রকলা বলিয়া গ্রাহ্য; নচেৎ নহে। এই কুসংস্কারটী দুর হইলে নব্য কলাতন্ত্রের উপাসক ও সমজদার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িবে।

দ্বিতীয় কথা—প্রদর্শনীর অনেক চিত্রের মূল্য দেওয়া হইয়াছে অসম্ভব। যাঁহারা যথার্থ নামজাদা দক্ষ শিল্পী তাঁহাদের চিত্রের মূল্য অনেকস্থলে খুব কম, কিন্তু যাঁহাদের চিত্র ভ্যাজচানি মাত্র তাঁহারা দর দিয়াছেন হাতী বিক্রয়ের হিসাবে।

তৃতীয় কথা—ভারতীয় চিত্রকলাবিৎরা কি কেবলই অতীত ভারতের ঘটনা বা কীর্ত্তিকলাপ লইয়াই আলোচনা করিবেন? বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ভারত কি ভারত নয়? ভারতীয় চিত্রশিল্পের বিশেষ প্রকাশভঙ্গীটী লইয়া আধুনিক বা ভবিষ্যৎ ভারতের অবস্থা বা অদৃষ্টকে চিত্রের বিষয়ীভূত করা যায় না? অতীত ভারতের শিল্প অতীত সাধনা লইয়া কাটিয়াছে, বর্ত্তমান ভারতও কি সেই অতীতের মৃত কঙ্কাল লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে? এ বিষয়ে আমরা ভারতচিত্র শিল্পের গুরুদের নিকট পথ নির্দ্দেশ আশা করি। তাঁহারা নিজেরা ভারতশিল্পের যে ভাবটী ধরিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের শিষ্যরা সকলে সেই ভাবটী ধরিয়া নূতন সৃষ্টির পথে চলিলে অচিরে এই সযত্নপোষিত নবজাত শিশুকলা বর্দ্ধিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। এবং তাহা যে হইবে সে আশা এই বৎসরের প্রদর্শনী হইতে করা যায়। বহু দোষ সত্বেও এই নবীন কলা শিল্প ইহার মধ্যেই যথেষ্ট বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমানে মহা লাভ এই যে নব্যচিত্রকলাবিৎরা ভারত শিল্পের বিদেশী ঢং বদলাইয়া দিয়াছেন; এবং পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নিকট হইতে উহার পদোচিত সম্মান ও খাতির লাভ করিয়া নিজের একটা স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়াইবার স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

"নাট্য-সাহিত্য" *

(একখানি পত্র)

শ্রীযুক্ত 'উপাসনা' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

বিগত আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যার 'উপাসনা'য় "বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্য" আলোচনা এবং তৎপূর্ব্ব সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশমান আপনার রচিত "আলো-আঁধারী" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। কিছুদিন হইতে ক্ষীরোদ প্রসাদের লেখনী নিশ্চল। বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চ এখন শিক্ষানবীষগণের হাত পাকাইবার ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। কাঁচাগাছের ফল সু-তার ও সু-পুষ্ট হয় না। এই সব কাঁচা হাত হইতে যে সকল নাটক রচিত হয় রঙ্গালয়ের সত্বাধিকারীগণ তাহা কাটিয়া ছাঁটিয়া, মনোরম সাজসরঞ্জাম দৃশ্য-পটে সাজাইয়া, বায়স্কোপের ন্যায় চিত্তহর চমকপ্রদ করিয়া দর্শক বৃন্দের পকেট লুট করেন। একমাত্র অর্থোপার্জ্জন যাঁহাদিগের লক্ষ্য তাঁহাদিগের নিকট রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের উন্নতির আশা করা বৃথা। শুনিয়াছি, মাসমাস মিউনিসিপ্যালিটীকে ফাইন দেওয়া বাদে কেবল দল সম্বন্ধে মোটামুটি পাঁচহাজার টাকা উঁহাদের মাসিক ব্যয়। তার উপর নিজেদের সংসার আছে, তাহাতে আবার ভাত কাপড় অগ্নিমূল্য, এরূপ অবস্থায় রঙ্গালয়ে দর্শনীর হার যে বৃদ্ধি হয় নাই ইহা সত্বাধিকারিদিগের বদান্যতা। দয়ার উপর জুলুম চলে না। সুতরাং জাতির রুচিকে গন্তব্য পথে প্রেরণ করিয়া উন্নতির রাজসৌধ প্রদর্শন করানই এস্থলে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে হয়।

আপনি লিখিয়াছেন "এটা ঠিক যে বাংলায় শ্রেষ্ঠ প্রতিভা নাটককে ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে।" ইহা যে কতদূর মর্ম্মভেদী সত্য তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যাঁহাদিগের নিকট আমরা কাব্য সাহিত্য উপন্যাস রাজনীতি এমন কি শিশুপাঠ্য পুস্তক পর্য্যন্ত পাইয়া থাকি এবং সকল বিষয়ে উপদেশ পাইবার জন্য আমরা যাঁহাদের মুখাপেক্ষী, তাঁহারা রঙ্গালয়ের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না বা নাটক সম্বন্ধে কোনরূপ বাচনিক আলোচনাও করেন না। কেবল একমাত্র আপনিই গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া এই পরিত্যক্তক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছেন। আমি একজন রঙ্গালয়ের উপাসক এবং উন্নতির প্রয়াসী। সেই জন্যই বলিতেছি যখন এই বর্জ্জিত ক্ষেত্রে লেখনী চালনা করিয়াছেন তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করিয়া তাহাকে বিশ্রাম দিবেন না। এ দেশ সে দেশ নহে যেখানে "সুজনকা" এক কথা লক্ষ উপদেশের কার্য্য করে। বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্য আমাদের দেশে এখনও শৈশবকাল অতিক্রম করে নাই। এই তাহার শিক্ষারম্ভের সময়। কিন্তু নিরক্ষরকে অক্ষর পরিচয় করাইবার জন্য তাহার হাতে একেবারে ভারী বই দিলে—ভয় হয় কোন ফলই হইবে না। আপনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা আপনার বহু অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল। সাধারণের তাহাতে বোধোদয় হইবে না। একে ত শুনিতে পাই মানবজীবন ও চরিত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সংঘর্ষ ও সংস্পর্শ না হইলে নাটক লেখা ত দূরের কথা বুঝিবারও অধিকার হয় না। এরূপ স্থলে বালককে বুঝাইতে হইলে ধৈর্য্য সহকারে যে কি প্রণালী অবলম্বন প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণের রুচিকে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও মনের মত করিয়া গঠিত করিতে হইলে একটী প্রবন্ধের কাজ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে এ দেশে এখন গভীর অন্ধকারে। সে আঁধারে আলো জ্বালিতে হইলে চকমকী ঠুকিয়া স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে হইবে। আমরা 'আলো আঁধারীর' কবির নিকট

* সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন এই প্রেরিত পত্রের যথাযথ আলোচনা বাহির হইতে বিলম্ব হইবে

সে আলোক প্রাপ্তির আশা করি। নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, আলোক খুঁজিয়াছি কিন্তু পাই নাই। আপনার প্রবন্ধ পাঠে আমি দুই এক জনের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে তাহা সহজ বোধ্য নহে। এ দেশে গল্প সাহিত্যই এখন প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। গল্প পাঠে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত। উপন্যাস যে নাটক নহে সে কথা কেহ কেহ বুঝেন, কিন্তু কেন নয় সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আপনাকে প্রথম বুঝাইতে হইবে উপন্যাস ও নাটকে প্রভেদ কি? উপন্যাসের গল্পে এবং নাটকের গল্পে কোন তারতম্য আছে কিনা? তাহা হইলেই বুঝা যাইবে সকল উপন্যাস নাটকে পরিণত করা যায় না কেন। দ্বিতীয়তঃ মানব চরিত্র যখন উভয়ের উপকরণ, তখন সে সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই আমার মনে হয় অগ্রে বুঝান আবশ্যক চরিত্র কাহাকে বলে। এক ব্যক্তির সহিত অপরের পার্থক্য আমরা বুঝি চেহারায় এবং চরিত্রে। ব্যক্তিগত চরিত্রে চরিত্রে এইরূপ যে বিশেষত্ব থাকে তাহা উপন্যাসেই বা কি ভাবে এবং নাটকেই বা কিরূপে পরিপুষ্ট হয়? তৃতীয়তঃ কিরূপ চরিত্র নাটকে এবং কিরূপ চরিত্র উপন্যাসে স্থান পাইবার উপযোগী। চতুর্থতঃ ঔপন্যাসিক চরিত্র ও নাটকীয় চরিত্রের বিশিষ্টতা কি প্রণালীতে আঁকিতে, পুষ্ট করিতে ও ফুটাইতে হয়।

সম্ভবতঃ এই সকল অর্ব্বাচীন প্রশ্ন আপনার হাস্যোদ্দীপন করিবে এবং ইহাদের উত্তর দিতেও আপনার ধৈর্য্য থাকিবে না। কিন্তু যদি ধৈর্য্যের ও সময়ের অভাব না হয়, আপনার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় এই নগণ্য পত্রকে স্থান দান করিয়া সুস্পষ্টভাবে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে সাধারণের যে উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি অনেকের সহিত মৌখিক আলাপ ও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, উপন্যাস ও নাট্য সাহিত্যের পার্থক্য সম্বন্ধে সাধারণের মনে ধারণার বিশেষ অভাব। দুঃখ দৈন্যপীড়িত বাঙ্গালী জীবনে যে একটু আমোদপ্রিয়তা ও রসাস্বাদন-শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাকেই কুপথে চালিত করিয়া আমাদের জাতীয় রঙ্গালয় সকল জীবনরস সঞ্চয় করিতেছে। এই আদর্শ বর্জ্জিত দেশে মার্জ্জিত রুচির অভাব। উপন্যাস কাব্য নাটক সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জ্ঞান তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিগত বিদ্যার প্রভাবে ও প্রসাদে। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কাব্য নাটক সম্বন্ধে যে সকল সূত্র করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে—পাশ্চাত্য জগতে ঐ পথের পথিকদিগকে পথ দেখাইবার জন্য যে সকল পুস্তক আছে সেরূপ পুস্তক এদেশে একখানিও নাই। আপনি তাহা প্রণয়ন করিবার যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করি। রঙ্গালয় দর্শকগণের সহিত বিস্তর আলোচনা করিয়া যে সকল বিষয়ে তাহাদের অজ্ঞতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, আমি ক্রমে ক্রমে সে সমস্ত বিষয়ই প্রশ্নাকারে আপনার নিকট উপস্থিত করিব। মাসিক পত্রে এরূপ আলোচনার ফলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ উপকার হইবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল।

—

শীতের দিনের গান।

সূর্য্য ঠাকুর সূর্য্য ঠাকুর কোথায় তোমার ঘর ?
সাত সমুদ্র তের নদী তেপান্তরের পর ?
কুজ্ঝটিকার মাঠের শেষে হাওয়ার পর পারে ?
ময়দানবের মরীচিকা—মায়ার পাথারে ?
নিত্য কোথায় যাও ? মুখটি তুলে চাও,—
বেশী না হোক্ একটি রেখা—একটি রেখা দাও।

বেশী না হোক্ একটি রেখা—একটি রেখা দাও,
আজকে এই শীতের ভোরে মুখটি তুলে চাও ;
কৃপণ তুমি নও তা জানি—দরাজ তোমার হাত,
দরাজ হাতে বিকাও তুমি হাজার আশীর্ব্বাদ,
আমরা গরীব, দুখের নসিব পড়িনে যেন বাদ।

* * * *

ততটুকুই নেব মোরা যতটুকুন দেবে,
বেশী করে চাইব না কো--কেউ বেশী না নেবে।
কমই হোক্, বেশীই হোক্, শীতের ভোরের বেলা,
যাহা কিছু দেবে তারেও করব না কো হেলা।
মেয়েরা সব জড় হবে অন্দরের ছাতে,
পুরুষেরা দৌড়ে যাবে বাহির আঙিনাতে।
মিথ্যা যদি বলি, না হয় যেয়ো চলি,
না হয় তুমি আগুন সম রেগেই উঠো জ্বলি।

থরথরিয়ে থরথরিয়ে কাঁপছে আমার গাও,
সূর্য্যঠাকুর, সোণার ঠাকুর মুখটি তুলে চাও।
কুজ্ঝটিকার ধূসর ধোঁয়া তফাৎ করে দিয়া,
দূর্ব্বাদলের বুকের মাঝের শিশির শুষিয়া,
এস তুমি হাওয়া ঘোড়ায় বল্গা কষিয়া।

* * * *

সূর্য্য ঠাকুর, সূর্য্য ঠাকুর কোথায় তোমার ঘর,
সেকি সেই মগ মুলুকের পাহাড়গুলোর পর ?
স্ফূর্ত্তি—শুধু স্ফূর্ত্তি সেথায়—আলো আর আলোক ?
কাজের মাঝেও ঝরে সেথা স্বপ্ন পাখীর পালক ?
ভরা বুঝি সবি সেথায় গন্ধ এবং গানে ?
জলেও নহে, স্থলেও নহে,—মেঘের মাঝখানে
কোথায় তুমি থাকো ? পা-ই বা কোথায় রাখো ?
ভীত তোমায় করে না কো বজ্র মেঘের ডাকো ?

কন্‌কনিয়ে আস্‌ছে ছুটে পৌষ মাসের বাও,
সূর্য্যঠাকুর, করুণঠাকুর, মুখটি তুলে চাও।
মস্ত বড় রাজা তুমি, মস্ত বড় লোক,
হাজার ঘোড়ার রথটি তোমার লক্ষ ঘোড়ার হোক্,
বারেক শুধু মোদের পরে পড়ুক তোমার চোখ।

* * * *

একশ' মাণিক জ্বালা তোমার সোণার টোপরে,
ঝল ঝলিয়ে উঠছে হীরা পায়ের উপরে।
সর্ষে ক্ষেতের উপর দিয়া ফাঁকের বাড়ী ছাড়ি,
বাঁশের ঝাড়ে পিছন করে এস আমার বাড়ী।
অরুণ হাতে করুণ স্রোতে মাপ কাঠিটি নিয়ে,
ঝর্ণাঝরা আলো তোমার উঠাও ফেনিয়ে।
জামা কিনে পরি, নাইকো কাণা কড়ি,
জামার মত ছেয়ে ফেলো আলোর রথে চড়ি।

মাঘের শীতে কাঁপছে দেহ—কাঁপছে আমার পাও,
সূর্য্য ঠাকুর দয়ার ঠাকুর মুখের পানে চাও।
তোমার চাকা সোণায় ঢাকা আগুন দিয়ে ঘেরা,
সেগুন কাঠের আগুন সে যে সব আগুনের সেরা,
রাত দুপুরেও খেলুক সেথা আলোর বালকেরা।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

ভাব্‌বার কথা

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"।

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষ লাভ করে', পাশ্চাত্য জ্ঞানের আস্বাদ পেয়ে, আমাদের মত অক্ষম দুর্ব্বল অধীন জাতেরও মনে বড় একটা সাধ জেগে উঠেছে আমরাও ঐরকম হই। জ্ঞানে গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, বলে বীরত্বে ওদেরই মত হয়ে উঠি। এ ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। এক সময়ে আমরা বড় ছিলাম কিনা, তাই বড় হবার যে একটা মোহ তা আমাদের যে মুগ্ধ ক'রবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? অনেকে বিদ্রূপ করে বলেন ও বলবেন যে আমাদের এই অসম্ভব সাধটা কুঁজোর চিৎ হয়ে শোবার সাধের মত। তা কতকটা বটে; কিন্তু তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমার বিশ্বাস আমরা ঐরকম হ'তে পারি। ইংরাজির প্রবাদ বাক্যটা 'what man has done man may do' জাত সম্বন্ধেও খাটে। তা যদি না খাট্‌তো তা হলে 'মাছভাত খেকো' এসিয়ারই একটা জাত আজ মোটে অর্দ্ধ শতাব্দীর সাধনায় ও রকম হয়ে উঠ্‌তো না।

ভাল কথা। যদি তাই হয়, অর্থাৎ আমরাও ঐ রকম ধরণেরই বড় একটা জাত হয়ে উঠতে পারি তা হলে তা হবার কি কোনো লক্ষণ দেখা দিয়েছে? না তা হওয়ার এখনো অনেক দেরী আছে? যদি দেরীই থাকে তবে তার পথে বাধা কি? মানুষের মানুষ না-হওয়ার পথে যে সব বাধা, এ জগতের মানুষ হওয়ার পক্ষেও সেই বাধা।

বাধা আমাদের সমাজে, বাধা আমাদের ধর্ম্মে, বাধা আমাদের শিক্ষায়, বাধা আমাদের স্বাস্থ্যে, অর্থে, সামর্থ্যে। বাধা আমাদের, আচারে, ব্যবহারে, কাজে, কর্ম্মে, স্বভাবে এবং অভ্যাসে। আর বাধা আমাদের অত্যাধিক অন্ধ অতীত গৌরবে।

পাশ্চাত্য হিসাবে, পাশ্চাত্য ধরণে আমাদের বড় হ'তেই হবে; জাপান যেমন ভাবে হয়েছে। অতীতকালের হিন্দুয়ানী ধরণে, আর্য্যামির বাহাদুরী করে' হবে না। একটা প্রবাদ বাক্য আছে, "পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে"। কথাটা খুবই জ্ঞানের কথা। অবস্থায় প'ড়লে সব করতে হয়, খানা খাওয়া তো দূরের কথা। শোনা যায় বিশ্বামিত্র ঋষি দুর্ভিক্ষের দিনে পেটের জ্বালায় কুকুরের মাংস খেয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। তাতে তাঁর ঋষিত্ব বা ব্রাহ্মণ্য ক্ষুণ্ণ হয়নি' শাস্ত্রে তা লেখে। বিশ্বামিত্রের এই কাজে একটা মহৎ শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রাণের দায়ে অনাচারও গ্রাহ্য হয়ে থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যা সত্য জাত সম্বন্ধেও তা অনেক ক্ষেত্রে সত্য। পাঁচটা প্রবল জাতের সংঘর্ষে এসে একটা দুর্ব্বল জাতকে বাঁচতে হ'লে প্রবলের যন্ত্র তন্ত্র সম্বল করে' তাদের মত বলবান হয়ে' উঠ্‌তে হবে। এরি মধ্যে যতটুকু নিজস্ব বজায় রাখা সম্ভব তা রাখলেই হলো। তার বেশী নয়। পুরাতন জাতীয়তার নেশায় মত্ত হয়ে' নবীনকে অনাদর ক'রলে চলবে না। আমি আমাদের উন্নতির পথে যে বাধাগুলির কথা বলেছি সে গুলি দূর ক'রতে হ'লে পাশ্চাত্য ভাবে আমাদের আত্ম-সংস্কার দরকার। একটী একটী বাধা ধরে' পন্থা নির্দ্দেশ করাই ভাল।

প্রথম বাধা আমাদের সমাজে। সমাজে এখনো এমন সব দোষ আছে যা আমাদের নবভাবে গঠিত হয়ে ওঠ্‌বার অন্তরায়। বাল্য বিবাহ দূর করা; স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করা; বাল-বিধবার বিবাহ দেওয়া; শিক্ষিত নানা বর্ণের মধ্যে যে মারাত্মক ভেদ আছে তা উঠিয়ে দেওয়া; সমস্ত জাতের মধ্যে শিক্ষার পথ খুলে দেওয়া;—প্রাচীন কতকগুলা অর্থহীন অনুষ্ঠান-ক্রিয়াকলাপে বাজে অর্থ ব্যয়

না করা—প্রভৃতি অনেক গুলি সাধু সংস্কার খুব শীঘ্র হওয়ার দরকার হয়েছে।

আমরা দুর্ব্বল গরীব জাতি। অর্থ রোজগার করতেও অক্ষম। এ ক্ষেত্রে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার উপযুক্ত না হ'য়ে, ছেলে-পুলের বিবাহ দিয়ে তাদের সংসারী করে দেওয়াটা যে কত গর্হিত কাজ তা আমরা বুঝি না। অথচ কলেজে বা স্কুলে শিক্ষাধীন যুবকদের শতকরা ৫০ জন বিবাহিত। তারা লেখাপড়া শেষ না করে' বেরুতেই ২/৩ ছেলের বাপ হয়। তার পর সাংসারে ঢুকে সামান্য মাত্র রোজগার করে' বৃহৎ পরিবারবর্গের ভার বহন করতে বাধ্য হয়। কোনো রকমে, অর্দ্ধাশনে প্রাণ রক্ষা করে বটে; কিন্তু ছেলেপুলের ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া তাদের দ্বারা হয় না। দেশে এই রকমে দরিদ্রের সংখ্যা ও দারিদ্র্যের মাত্রা বেড়ে যাচ্চে। বংশ রক্ষার দোহাই দিয়ে বাপ মা ছেলেকে এই রকম করে ভারগ্রস্ত করে চলে যান্, তাদের অজ্ঞানকৃত কর্ম্মফল ছেলে বেচারারা বহন ক'রতে ক'রতে অকালে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে টিঁকে থাকে বা বিদায় নেয়।

বাঙ্গালীর মেয়ে মামুলী প্রথানুসারে অল্প বয়সেই মাতৃত্বের পদে আরোহণ করে। ইতর জীব যেমন স্বভাব অনুসারে যথাকালে জীব প্রসব করে, এঁরাও তেমনি করেন। তারপর ছেলেগুলিকে খাইয়ে পরিয়ে মেরে ধ'রে কোনো রকমে বড়ক'রে তোলেন। মানুষ ক'র্‌বার বিদ্যে এঁরা জানেন না। কেননা, ছেলে মানুষ করার মত শিক্ষা এঁরা কখনো পান্‌নি। ছেলেপুলের প্রাথমিক শিক্ষা, কি মানসিক, কি নৈতিক কি বা শারীরিক তা ঠিক মত ক'রে তোলা বড় একটা কঠিন বিদ্যা। এ বিদ্যা শিখ্‌তে হয়। আমাদের মেয়েরা তা কখনো শেখেনা। অনেকে বলবেন, 'তবে কি তারা ছেলে মানুষ করছে না?' উত্তর—না। ছেলেকে জীব হিসেবে বাড়িয়ে বড় ক'রে তোলা আর মানুষ করা অনেক তফাৎ। কেউ কেউ দেশের মহাপুরুষদের মা'য়েদের দৃষ্টান্ত তুলে ব'লবেন, "এঁরা কি ক'রে মানুষ হলেন?" উত্তর—কতকটা স্বভাব বুদ্ধি, কতকটা বা শিক্ষার ফলে। তবে দু'একটী মা তেমন থাকতে পারেন; সে তেমন তেমন ছেলের পুণ্যফল, কিন্তু অধিকাংশ মা অশিক্ষিতা; ছেলে মানুষ ক'রবার মত বিদ্যেবুদ্ধি তাঁদের নাই। এ কথা অপ্রিয় হ'লেও খুব সত্য। তারপর সংসারে গৃহিণীপনা ক'রবার মত একটা শিক্ষা, তা তাঁদের নাই। আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা; অল্প আয়ে স্বচ্ছলভাবে সংসার চালানো; পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী ক'রতে জানা; ঘর দোর অল্প ব্যয়ে অথচ কৌশলে সাজানো; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জানা ও তদনুসারে সকলকে চালানো; অল্প জিনিসে সুকৌশলে ভাল রাঁধতে পারা; জিনিসপত্র অপচয় না করা বা ক'রতে না দেওয়া, একটু ধাত্রী-বিদ্যা, বৈজ্ঞানিক-ভাবে রোগীর শুশ্রূষা করা, এ সব বিদ্যে কটী মেয়ে জানে বা শেখে? স্বভাব বুদ্ধিতে যার যতটুকু হয়। কিন্তু তা নয়, সমস্ত মেয়েকে—কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি নিম্নশ্রেণীর সকলকে—বিদ্যালয়ে এই সব শিখিয়ে নেওয়া দরকার। ছেলেদের যেমন বিদ্যার দরে দর যাচাই হয়, মেয়েদেরও তেমনি হওয়া উচিত। পাশ করা ছেলেদের যেমন বাজার-দর, এই সব শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েদের তেমনি বাজার-দর হওয়া দরকার। বিয়ের সম্বন্ধের সময় যেমন কনের বাপ পাশ করা জামাই খোঁজেন, তেমনি বরের বাপও যদি এই সব বিদ্যায় শিক্ষিতা মেয়ের খোঁজ করেন তাহ'লে ছেলে বিক্রয় করার জোর একটু কমে। দেশে যে সব বালিকা বিদ্যালয় বা কলেজ আছে তাতে এ সব শেখানোর কোনো ব্যবস্থাই নাই। এ যুগে কার্য্যকরী বিদ্যারই খুব আদর। পুরুষের পক্ষে যে বিদ্যা কার্য্যকরী, মেয়ের পক্ষে তা নয়। তবু যে কেন মেয়েছেলেরা শেক্সপীর, শেলী, হিগেল, ক্যাণ্ট, এ সব প'ড়ে গ্রাজুয়েট হ'তে যায় তা বুঝতে পারিনি। অবশ্য এ সব জানায় বা শেখায় দোষ নাই জানি, কিন্তু মেয়েরা যদি তাদের কার্য্যকরী শিক্ষা ছেড়ে পুরুষের মত M.A. B.A. পড়তে ব্যস্ত হয়, তা'হলে কী আশা তাদের কাছে? তারা যদি গ্রাজুয়েট হ'য়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygeine) গৃহপরিচালন বিদ্যা (Domestic Economy), রন্ধন (Cooking) সীবন (Sewing), রোগশুশ্রূষা (Nursing),

এ সব না জান্‌লো, তবে তাদের দ্বারা সংসারে কি উপকার হবে? অবশ্য ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য ও দর্শন একটু আধটু জানা দরকার, general training এরপক্ষে এটা দরকার; কিন্তু আমার মনে হয়, মেয়ে-ছেলেরা যদি স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগীসেবা, রান্নাবান্না করা, সন্তানপালন, আয়ব্যয় প্রভৃতি এই সবে ভাল শিক্ষা পেয়ে তাতে ডিগ্রি পায় তা'হলে আমাদের বেশী মঙ্গল হয়। দেশে এই ধরণের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। দেশে এখন শিক্ষিতা স্ত্রী-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা শিক্ষিতা মাতা ও গৃহিণীর বেশী দরকার। আমি একটি শিক্ষিতা (?) মহিলার কথা জানি যিনি ইংরাজী গল্প পড়িতে ও বলিতে পারেন, গল্প ও কবিতা লিখিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সন্তানপালন বিদ্যে জানা নাই, তিনি আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে জানেন না, ও লিভার রোগযুক্ত ছেলের পক্ষে ঘন দুধ যে বিষ তাও জানেন না। তাঁর এক ছোট শিশুর মাথায় উলের টুপী ও পা খালি থাকায় আমি তার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে বলাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিতা হ'লেন। এ রকম শিক্ষিতা রমণীর কোনো মূল্য আছে কি? স্ত্রীলোক শুধু স্বামীর রহস্য-সঙ্গিনী নন; তিনি জননী, গৃহিণী, শুশ্রূষাকারিণী; শুধু জীব-প্রসবিণী নন—জীব-পালিনী; এইটে বুঝে তাঁদের জন্য তেমনি শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। দেশে এমন সব স্কুল কলেজ হওয়া দরকার যাতে মেয়েদের এমনি সব কার্য্যকরীবিদ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়; আর তাঁরা বিদ্যা সমাপ্ত করে বাহির হলে, তবে বিবাহের দাবী করতে পারবেন—নচেৎ নয়। যে মেয়ে এই সব বিষয়ে practical পরীক্ষায় ফেল্ হবে তাদের সহজে বিবাহ হবে না। ১৬ বছর পর্য্যন্ত উহাদের শিক্ষাসমাপ্তির বয়স ঠিক হবে। ১০ বছর বয়স হতে বিদ্যালয়ে এই সব বিষয়ে শিক্ষারম্ভ হবে, ষোল বছর বয়সে শিক্ষা শেষ ক'রে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রী পেয়ে বেরিয়ে আসবেন। তখন বুঝতে হবে তিনি জননী ও গৃহিণী হবার অধিকার লাভ ক'রেছেন। একটা ১২।১৩ বছরের মেয়েকে ছেলের মা হ'তে দেখ্‌লে আমার মনে হয় সে জ্যান্ত পুঁতুল খেলা আরম্ভ ক'রেছে! সে নিজের খোঁজখবর করতে পারে না, নিজের শুভ অশুভ কিসে হয় বোঝে না, অথচ তাকে বাধ্য হয়ে আর কতকগুলি জীবের শুভাশুভের ভার নিতে হয়। অনেকে বলবেন, "তবে এতদিন ধরে বাঙ্গালা দেশে মানুষ হয়নি? বিদ্যাসাগর, দ্বারিক মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বড়লোক তবে কি করে হলো?" উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে—সুশিক্ষিতা মাতার সংখ্যা বাড়লে এই রকম মহাপুরুষের সংখ্যা আরো বাড়বে। হঠাৎ কখনো কখনো গাছে ভাল ফল দেখা দেয় বলে যে চাষ আবাদের দ্বারা তাদের সংখ্যা বাড়াতে পারবে না, এ যুক্তি যুক্তিই নয়। মোট কথা আমাদের বড় জাত হয়ে উঠতে হলে আমাদের মাতৃজাতিকে খুব উন্নত সংস্করণে গড়ে তুলতে হবে।

মেয়েরা সুশিক্ষিতা—না হওয়াতে আর একটা মস্ত অসুবিধা শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভোগ করেন। অনেক বাড়ীতে স্ত্রীরা সে-কেলে আচার ব্যবহার, রুচি, শিক্ষা সংস্কার অনুসারে চলেন; আর পুরুষরা নব্যরুচি ও সংস্কারে চলেন বলে একটা ভারী দাম্পত্য-অশান্তি দেখা যায়। এই ভিন্ন ও বিপরীত-মুখী, রুচি ও সংস্কারের বশীভূত হয়ে চলার জন্যে বাড়ীতে পুরুষেরা একভাবে ও মেয়েছেলেরা অন্যভাবে গঠিত হয়ে ওঠে। ফলে একটা বড় অশান্তি এমনিভাবে দেখা দেয় যে এতে করে গার্হস্থ্য জীবনটা উভয়পক্ষেই অসহ্য হয়ে উঠে। কাজেই মনে হয় শিক্ষা, সংস্কার ও রুচি স্ত্রীপুরুষের এক হওয়া দরকার। পরস্পর পরস্পরের কোনো সাহায্যেই আসেন না। একটা আন্তরিক সহানুভূতি কোনো পক্ষেই ঘটে না। স্ত্রী, পুত্রকন্যা প্রসব ক'রে, রেঁধে বেড়ে খাইয়ে, এঁটো খেয়ে, বার-ব্রত, ইতু-পূজো, ইঁদুর-পূজো করে কাটিয়ে দেন; ঘরবাড়ীতে স্বামী চাকরী বাকরী ক'রে, চপ্‌ কাট্‌লেট চা খেয়ে, গান বাজনা করে কাটিয়ে দেন। উভয়পক্ষে একটা বেশ সুখকর মিলন, উচ্চ অঙ্গের আলাপ, সম্ভাষণ কিছুই হয় না। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হ'লে এই অপ্রীতিকর ভাবটাও থাক্‌বে না।

আমাদের মানুষ হবার পথে আর একটা বাধা

নানা বর্ণ অন্তর্বর্ণ মধ্যে উপস্থিত সামাজিক ভেদ। নিম্নবর্ণের কথা থাক—উচ্চবর্ণদের মধ্যে এখনো যে মারাত্মক ভেদ আছে তা গৌরবের বিষয়তো নয়-ই বরং খুবই লজ্জার কথা। আধুনিক উন্নত শিক্ষার ফলে কি ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, কি কায়স্থ, কি বৈশ্য সবই প্রায় এক রকম অবস্থায় উঠেছেন— বিগত কৃতকর্ম্মের দোষে এঁরাতো আগেই স্ব স্ব বর্ণ ধর্ম্ম হারিয়ে বসে আছেন, তবু মিথ্যা গৌরবটুকু ছাড়িতে পারেন নাই—অথচ শিক্ষার ফলে সকলেই যে একই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। এরূপ ক্ষেত্রে এক আহার ও বিবাহ বিষয়ে একটা মিথ্যা ব্যবধান রেখে কেন যে মিছামিছি নিজেদের মধ্যে ঈর্ষ্যা রেষারেষি জাগিয়ে রাখা, তা জানিনি। আধুনিক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকথিত নিজ বর্ণ ধর্ম্ম মানবেন না, কাজে কর্ম্মে আচারে ব্যবহারে ইতর বর্ণের মত ব্যবহার করবেন, অথচ তিনি চান সমাজ তাঁকে মাথার উপর তুলে রাখবে, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে চরিতার্থ হবে! এ দাবী বড়ই অন্যায়। শতকরা ৯৫ জন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে আর সকল জাতের মত জীবন নির্ব্বাহ করছেন; তাঁর উপাধি আর পৈতে ছাড়া তাঁকে বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে জানবার উপায় নাই, তবু তিনি আজ সকলের চেয়ে উঁচু আসন, বেশী সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন। আধুনিক উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ফলে নিম্নবর্ণীয় অসংখ্য লোক যে স্বভাবে, সংস্কারে, আচারে, ব্যবহারে তাঁদের মত একই অবস্থায় দাঁড়িয়েছে—এটা অস্বীকার করার উপায় নাই, আর তর্কের জোরে অস্বীকার করবার চেষ্টাতে কোনো ফল নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে একত্র আহার বিহার ও বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনে তাঁদের কোনই ক্ষতি নাই। বরং জাতীয় উন্নতির দিক দিয়ে মহালাভ। এ কথা শুধু ব্রাহ্মণের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, সমস্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে। বৈদ্য, কায়স্থ, বৈশ্য সকলেরই নিজ নিজ একটা মর্য্যাদা গৌরব আছে, যে গৌরবের দোহাই দিয়ে তাঁরা নিম্নতর বর্ণকে হেয় বলে জ্ঞান করেন। এই যে একটা মিথ্যা-মর্য্যাদার অভিমান বা প্রত্যেক বর্ণকে অন্য বর্ণ হতে সাবধানে বেড়া দিয়ে রেখেছে তাতে করে জাতীয় উন্নতির কি বাধা হচ্ছে এটা বিচার করবার বিষয়। যাঁরা সর্ব্ববর্ণ মিলন-বিরোধী তাঁরা বলেন "কিছুই তো ক্ষতি হ'চ্চে না! যে যার গণ্ডীর মধ্যে থেকে খাওয়া দাওয়া, কাজকর্ম্ম ক'রে যাচ্চে, কোনো মারামারি লাঠালাঠি হচ্চে না, তবে ছত্রিশজাতকে মিশিয়ে তোলবার এই ঝোঁক কেন?"

এর উত্তরে আমার দুটী কথা বলবার আছে; প্রথম—এই যে "ছত্রিশ" জাতের মিশে যাওয়া"—কার্য্যতঃ তা ঘটেছে—ঘট্‌ছে—যেটা নলচে আড়াল দিয়ে সর্ব্বত্র চলছে সেটাকে প্রকাশ্য ভাবে চালানো—এই যা। দ্বিতীয়—এই মিশে যাওয়াটা জাতীয় জীবন উদ্ধারের জন্য অবশ্য এবং আশু প্রয়োজনীয়।

প্রথম কথা—প্রত্যেক সত্যবাদীই স্বীকার ক'রবেন যে শিক্ষিত সমস্বভাব সম্পন্ন সমস্ত বর্ণের মধ্যেই খাওয়ার দিক দিয়ে এই মিশে যাওয়া ঘটেছে। যে কেউ কলিকাতার Hotel, Restaurant ও Refreshing Room বা Tea Shop এ ঢুকেছেন তিনিই জানেন খাওয়া সম্বন্ধে জাত হিসেবে ধরা বাঁধা গিয়েছে। নিতান্ত সামাজিক কাজ ছাড়া আর সর্ব্বত্র সব ব্যাপারে এই জাত বিচার কেউ করেন না। বাড়ীর অভিভাবকরা বা সমাজের কর্ত্তা তা জানেন, জেনেও চোখ বুজে থাকেন এই ভেবে যে এ মিশে যাওয়া অনিবার্য্য অন্ততঃ এর নিরোধ তাঁদের ক্ষমতার অতিরিক্ত। যেটা ঘটছে, ঘট্‌বেই যার নিরোধ অসম্ভব যাতে কোনো কুফল হচ্ছে না, বরং একটা সামাজিক মৈত্রী ভাবের উদ্বোধন করছে তাকে আটকাবার বৃথা চেষ্টা কেন?

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বর্ণের মধ্যে ইতর বর্ণের সহিত অবাধ যৌনমিলনেরও অন্ত নাই; অথচ এই অপরাধীরা সমানে সমাজে শ্রেষ্ঠতার দাবী করে হৈ চৈ করেন। ইতরজাতির সহিত আহার বিহার করলে যদি জাত জায়, বা পতিত হ'তে হয় তা হলে শতকরা ৯০ জন তা হয়েছেন; তবু তাঁরা গায়ের জোরে সমাজের সেরা হয়ে থাকবার স্পর্দ্ধা রাখেন। যখন 'জাত' গিয়েছে তখন এই একটা অতি শুভকর মহা মিলনের বিরুদ্ধাচরণ করে লাভ কি?

নিজেদের ছোট ছোট গণ্ডী ভেঙে গিয়ে সব বর্ণ সব সম্প্রদায় সব দল মিশে যদি একটা মহাজাত গড়ে উঠে তবে তাতে বাধা দেবার ফল কি? উত্তরে অনেকে বলবেন "লুকিয়ে যে সব পাপ ছেয়ে পড়ছে আইন করে তার বিস্তারের সাহায্য করা কেন? যা গোপ্যভাবে হচ্চে তা প্রকাশ্যভাবে হবার অনুমতি দিলেতো দুদিনেই অনাচার দেশশুদ্ধ ছেয়ে পড়বে!" প্রতিউত্তর এই—একসঙ্গে খাওয়াটা কি একটা মস্ত মহাপাপ? ছোট বড় পাঁচটা জাত মিশে বসে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলে কি মস্ত পাপ হয়? যাঁরা এটা বলেন তাঁরা একথা আদৌ বিশ্বাস করেন না— করলে কখনো নিজে নিজে লুকিয়ে অনাচার করতেন না বা আত্মীয় স্বজন ছেলে পুলেকে তা করতে দেখলে চোখ বুজে থাকতেন না। শুধু এই, মর্য্যাদায় মিথ্যা-অহংকারে আঘাত পড়বে বলে করতে চান না। "আমি" বা "আমরা" যে খুব সেরা, সব-সেরা জাত এই শত শতাব্দীর বদ্ধমূল অভিমানটা নষ্ট হবে বলে এঁরা এইটে করতে চান না। ধর্ম্মে পতিত হবার ভয়ে নয়। কেন না শাস্ত্রে কথিত ধর্ম্মাচার একজনেরও ঠিক আছে কিনা জানি না। এ কেবল অন্ধ-সংস্কার, মিথ্যা বর্ণ-গৌরবের অভিমান! ছত্রিশ জাত মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ার পক্ষে একটা প্রধান যুক্তি হচ্চে এই সমস্ত বর্ণ, উপবর্ণ, অন্তর্ব্বর্ণ শিক্ষার সংস্কারে, স্বভাবে আহারে ব্যবহারে একরকম হয়ে দাঁড়ালে সমস্ত জাতটা দানা বেঁধে উঠে একটা মহত্তর আর বলবত্তর জাত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক হিসাবে এতে মস্ত লাভ; শুধু মস্ত নয় মহা-লাভ। এক একটা জন বা দল বা সম্প্রদায় নিয়ে তবে একটা জাতি (nation)—যে নেশনে unit গুলি সর্ব্ব রকমে একরকম শিক্ষা সংস্কার ও আচারের প্রভাবে crystailsed হয়ে তবে তাল বাঁধতে পারে নচেৎ নয়; আমাদের দেশে তা হয় নি। না হওয়ার পথে বাধা এই জাতিভেদ, এই উঁচু নীচুতে ভাগাভাগি ভেদা-ভেদি। সব দেশেই উঁচুনীচু ভেদ আছে কিন্তু তা শিক্ষাসংস্কার-গত; জন্মগত নয়, সে ভেদ অনতিক্রম্য নয়। একজন মুচি সুশিক্ষিত ও সভ্য হলে পাদরির মেয়েকেও বিয়ে করতে পারে, তাতে সমাজ বাধা দেয় না। আমাদের দেশে জেতে জেতে যে ভেদ তা অনতিক্রম্য। এতে করে দাঁড়িয়েছে এই যে একজন সর্ব্বগুণবান হীন-জাতীয় এক জন গুণহীন উচ্চ-জাতীয় লোকের কাছেও ছোট ও নগণ্য। স্বভাবতঃই এই গুণবান হীন-জাতীটীর মনে একটা ন্যায্য অভিমান হতে পারে। একজন আর এক জনের শুভ চেষ্টায় বাধা দেয়। তার প্রমাণ হাতে হাতে, এই যে স্বরাজ্য লাভের একটা চেষ্টা হচ্চে এতে হীন-বর্ণীয় নমঃশূদ্ররা প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বলে যে— উচ্চবর্ণীয়েরা স্বায়ত্ত-শাসন অধিকার পেলে হীনবর্ণদের উপর খুব অত্যাচার করবে। এদের এ ভয়ের কোন কারণ না থাকলেও ভয় হওয়াটা বিচিত্র নয় কেননা ঘর পোড়া ছেলে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়ই। ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের কি ফলাফল তা তারা হাড়ে হাড়ে শত শত শতাব্দী ধরে বুঝে এসেছে। যখন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘরের এত কাছাকাছি ব্যাপারে ভিন্ন মতাবলম্বী ও পরস্পর বিরোধী তখন এরা সব দলবেঁধে বৃহৎকাজে যোগ দেবে কি করে!

আপত্তিকারীরা বলবেন যে জাতিভেদ সত্বেও কি ভারতবাসীরা বড় বড় কাজে দলবেঁধে এক সঙ্গে কাজ করেন নি? উত্তর—যখন তা' তাঁরা করতে পারতেন তখন এমন ভাবের জাতিভেদ ছিল না। আর এই রাজনৈতিক সাম্য বা স্বায়ত্ত-শাসন পাবার মত বড় বড় চেষ্টা ছিল কিনা জানি না।

তার পর এই ছত্রিশ জাত মিলে গিয়ে একটা এক রকমের বড় জাত হওয়ার পক্ষে একটা বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনীয়তা আছে। আবহমান কাল হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিবাহব্যাপার বদ্ধ থাকায় প্রত্যেক বর্ণেরই রক্তের তেজ কমে এসেছে। এই গণ্ডীগুলো বড় হয়ে তার মধ্যে অন্য বর্ণের প্রবেশ লাভ হলে নূতন রক্তসঞ্চারের দ্বারা জীববৃদ্ধির খুব সম্ভাবনা হয়। গণ্ডী ভাঙ্গা এই মিলনের ফলে যে অপত্য জন্মাবে তার রক্তের একটা নূতন তেজ দেখা দেবে। জাতীয় মঙ্গলের দিক দিয়ে দেখলে এই নববংশ খুব একটা লাভের জিনিস। এখন প্রদেশের মধ্যেই এক বর্ণ অপর বর্ণের

সঙ্গে মিলিত হোক, এরপরে প্রদেশে প্রদেশে নানা বর্ণের মধ্যে মিলন হয়ে' সুদূর ভবিষ্যতে এই ভারতের পুণ্যভূমিতে একটা মহাজাতির অভ্যুদয় হতে পারবে যা না বাঙ্গালী, না পাঞ্জাবী, না মান্দ্রাজী, না মারহাট্টী নামে কথিত হবে, কিন্তু যার নাম হবে—মহাভারতীয় (Indian) এক রক্ত, এক ধর্ম্ম, একভাষা এক লক্ষ্য এক কর্ম্ম, এক আশা।

প্রতিপক্ষীয়রা এই নানা বর্ণের মধ্যে যৌনমিলন জনিত সুদূরের শুভ ফলটার দিকে না তাকিয়ে এক অমূলক আশঙ্কায় ভীত হয়েছেন। তাঁরা ভয় ক'চ্ছেন অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হ'লে একজন উচ্চবর্ণীয় এক অতি ঘৃণ্য হেয় নীচবর্ণের ঘরে বিবাহ ক'রে ব'সবেন। ধরুন এক জন বামুনের ছেলে রূপাকৃষ্ট হয়ে হয়তো একটা মুচির মেয়েকে বিয়ে করে আনবে। এ আশঙ্কা অমূলক। কেননা প্রথমতঃ আমাদের সমাজে বিবাহটা ছেলে বা মেয়ে স্ব-তন্ত্র হ'য়ে করে না; এ বিষয়ে তারা পর-তন্ত্র; বাপমার অধীন। কোনো শিক্ষিত সভ্য বাপ খামখেয়ালী ভাবে একটা মুচির ছেলে বা মেয়েকে, জামাই বা বউ ক'রতে চাইবেন না স্বতন্ত্রী কোনো ছেলে বা মেয়ে তাও করবে না; কেননা, বিবাহ মানে দায়িত্বহীন ক্ষণিক যৌন মিলন নয়; এটার উপর নিজেদের জীবনের ও বংশাবলীর শুভাশুভ নির্ভর করে। সমান শিক্ষা, সমান সংস্কার, সমান সভ্যতব্যতা, সমান আচার ব্যবহার সমান সামাজিক প্রতিপত্তি না থাকলে কোনো উচ্চবর্ণীয়, একেবারে নীচঘরে বিবাহ করবেও না, দেবেও না। তবে যেখানে এসব অবস্থা প্রায় সমান সেখানে উচ্চনীচ মিলন হওয়াই দরকার। একজন সাধারণ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের শিক্ষিত ছেলে, বা মেয়ে যদি কৃষ্ণদাস পাল বা ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত লোকের ছেলেকে বা মেয়েকে বিবাহ করেন তাতে তারও সমাজের ষোলোআনা লাভ। যাঁ'রা সর্ব্বরকমে সাধারণের বরেণ্য ও পূজ্য, তথাকথিত So called হীনবর্ণীয় হলেও তাঁরা সাধারণ উচ্চবর্ণীয়দের চেয়ে ঢের উচুঁতে, তাঁদের ছেলে মেয়েকে উচ্চবর্ণীয়েরা জামাতা পুত্রবধূ ক'রতে পারলে নিজেদেরকে ভাগ্যবান মনে করা উচিৎ। শিক্ষার সংস্কারে আচারে ব্যবহারে সর্ব্বরকমে মহত্ব লাভ করেও ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণতর হয়েও এঁরা যদি নিজ নিজ সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকেন এবং তাঁদের হতে সর্ব্বরকমে হীন ও অসমাবস্থ স্বজাতীয়দের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে বদ্ধ থাকেন তা'লে 'uplifiting of the degraded classes' অতি সুদূরপরাহত ব্যাপার। খুব দুর্ভাগা দেশ সেইটে, যেখানে উচ্চবর্ণীয় হীনাচারদুষ্ট হয়েও গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে চলে, জাতের অহংকার করে আর হীনবর্ণীয় অনেকে শিক্ষিত সভ্য ও পবিত্রাচারী হয়েও মাথা হেঁট করে সমাজের উঠানে পায়ের তলায় বসে থাকেন!

যে দেশের শিক্ষিতদের ১৫ আনা লোক মনে করেন যে ডাক্তার শীলের মত, ৺কৃষ্ণদাস পালের মত লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেলে একজন কদাচারী মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তানের ধর্ম্মগ্লানি হয় সে দেশে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চেষ্টা দেখলে হাসিপায়, লজ্জা করে ও দুঃখ হয়।

আমাদের বড় হওয়ার পথে আর একটা বাধা আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা। যতরকম বাধা আছে তার মধ্যে এইটে সবচেয়ে গুরুতর এবং সর্ব্বাগ্রে এইটের প্রতিবিধান দরকার। প্রাণী হিসাবে টিকে থাকাটা সব চেয়ে দরকারী। অথচ এই টিকে থাকাটাই আমাদের কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন। দেশের গুণী জ্ঞানী ও কর্ম্মীদের এইটেই এখন প্রধান ভাববারকথা। এই স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণগুলির নির্ণয় হলে প্রতিবিধান করা সম্ভব হবে। আমাদের এই স্বাস্থ্যহীনতার জন্য অপরে কতটা দায়ী তা বিচার করবার আগে আমরা নিজেরা কতটা অপরাধী তা দেখা দরকার। প্রথমতঃ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে যে সব নিয়ম-পালন দরকার তা আমাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন ভাল জানেন না, যাঁরা জানেন না তাঁরা হয় অর্থাভাববশতঃ না হয় ইচ্ছায় অভাবে তা পালন করেন্ না। যাঁরা জানেন্ না তাঁদের স্বাস্থ্যতত্ব ভাল করে শেখা দরকার। দুঃখের বিষয়

আমরা স্কুল কলেজে বাজে বিদ্যা আরম্ভ করতে দেহের রক্ত ও বাপমায়ের অর্থ বেশী নষ্ট করি, কিন্তু কার্য্যকরী জ্ঞান লাভ বিষয়ে তা করিনি। এর জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাপরিষৎগুলি। স্কুলে দশবৎসর ও কলেজে ৬।৭ বছর আমরা এমন সব বিষয় নিয়ে মাথা বকাই যা কাজের হিসাবে নগণ্য। ভাল করে এবং উপযুক্ত ভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে যে সব বিষয় শিক্ষা করা উচিত তা আমরা করি না। অর্থাৎ আমাদের দেশীয় শিক্ষাপরিষদ্‌গুলি সে শিক্ষার কোনো আয়োজন করেন নি। এমন একটা অস্বাস্থ্যকর রোগব্যাধিপুর্ণ দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কি করলে কি খেলে, কিরকম করে থাক্‌লে যে যমের চোখরাঙানি থেকে নিস্তার পাবে তা এ বৈজ্ঞানিক যুগে তারা জানতেও পায়না, একি কম দুঃখ! আর আমরা বাপ মায়ের পয়সা নষ্ট করে শেক্ষ-পীয়রের ধ্বংস করে বিদেশী সাহিত্যকলা মুখস্থ করতেই ব্যস্ত। দেশে যে অসংখ্য ইস্কুল কলেজ রয়েছে কোথায় ছেলেদের একটু স্বাস্থ্যতত্ত্ব শেখানো হয় দেখেছেন? আমরা অন্য অনেক বিজ্ঞান শিখি কিন্তু স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান আমাদের মত রুগ্ন জাতের পক্ষে মরণবাঁচনের উপায় তা আমাদের ছেলেরা শেখেনা কেন? অবশ্য অনেকে বলেবেন পেটভরে দুবেলা পুষ্টিকর খাবার খেতে পেলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়; বই পড়ে কি স্বাস্থ্যরক্ষা হয়? কথা আংশিক সত্য; কিন্তু স্বাস্থ্যতত্বের প্রাথমিক বিধিনিষেধ গুলা আয়ত্ব থাক্‌লে অনেক বিষয়ে মানুষ সাবধান হতে পারে, যা খেতে পাচ্ছে তারি মধ্যে পুষ্টিকর অপুষ্টিকর বিচার করতে পারবে; জল আর বাতাস তো আর পয়সালভ্য নয়; এদুটী বস্তুকে কি করে ব্যবহার করলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় তা তো জানা ভাল। খাদ্যাখাদ্যের দোষগুণ বিচারতো করতে পারে? অজ্ঞ জনক জননীরা স্বাস্থ্য তত্ব একটু জানলে অনেক হতভাগা শিশু অকালে প্রাণ হারায় না। মোটকথা, আমরাতো হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া অসহায় অক্ষম জাত—আমরা না হয় জানিনি, কিসে বা কি করলে আমরা ভাল থাকি; আমাদের পিতৃ স্থানীয় (Paternal) শাসক বর্গ তো তা বোঝেন যে এই দুর্ব্বল রুগ্ন জাতটার একটু স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা উচিৎ; কথায় আছে "তেষ্টায় কাতর চাইলাম জল গিন্নি কিনা আধখানা বেল—" আমাদের শিক্ষাও তাই; আমরা চাই এখন শিখতে একটু স্বাস্থ্যতত্ব, কৃষিতত্ব, বাণিজ্যতত্ব শিল্পতত্ব কিন্তু আমরা শিখি Platoর দর্শন, শেক্ষপীয়রের কাব্যকলা, Laplace এর বিশ্বতত্ব, প্রাচীনরোমের ব্যবস্থা তত্ব—ইত্যাদি যে সব এখন আমাদের কাছে ঠিক ওই 'আধখানা বেল'! দেশাচারও এই স্বাস্থ্যসম্বন্ধে বিরোধী ও অন্ধ। আমাদের এখন পুষ্টিকর খাবার খেয়ে গায়ে একটু বল শক্তি অর্জ্জন করা দরকার, কিন্তু যে সব সুলভ খাদ্য খেলে তা হবে তার অধিকাংশই শাস্ত্রনিষিদ্ধ; অন্ততঃ তামসিক খাদ্য বলে নিষিদ্ধ। ডিম্ মাংস পেঁয়াজ প্রভৃতি কতকগুলি পুষ্টিকর খাদ্যকে শাস্ত্রাচার্য্যরা তামসিক খাদ্য বলে দাগী করে দিয়েছেন! কাঁচকলা, আলো চাল কচু, কুমড়া, থোড় এ সব খুব সাত্বিক খাদ্য! কোনো এক স্বামিজী সে দিন বক্তৃতায় বল্‌লেন, আমরা তামসিক হ'য়ে পড়িছি—রাজসিক হওয়া উচিৎ – রজোধর্ম্মী না হলে কাজ করবার শক্তি হবে না, তার পর তিনি রজোধর্ম্ম বাড়াবার খাদ্য Prescribe কল্লেন, কাঁচকলা, আলো চাল, ঘৃত, দুগ্ধ, কচু ইত্যাদি। মাংস ডিম মাছ এ সবে নাকি তামসিক ক'রে ফলে! হারে অদৃষ্ট! এদের জোর করে সত্যি বলবার শক্তিটুকু নেই। কচু কাঁচকলা খেয়ে যদি রাজসিক হওয়া যায়, তা হলে গরু ভেড়া ছাগলের মত রাজসিক প্রাণী তো নাই-ই! আসল কথা অন্ধ দেশাচারকে শাস্ত্র বাক্য বলে চালানোর বিদ্যে এই দেশের মত কোথায়ও দেখলাম না।

অর্থ সমস্যা দেশের তো বক্তব্যের মধ্যেই নয়। আমরা যে একটা গরীব জাত তার আর সন্দেহটী নাই। আমরা আগেকার চেয়ে ধনী হয়েছি কিনা·· অর্থাৎ দেশে ধন বৃদ্ধি হয়েছে কিনা সে কণ্টকাকীর্ণ যুক্তিতর্ক করতে আমি পটু নই। বিশেষজ্ঞরা তা করুন। তবে দু একজন বিশেষজ্ঞ, যেমন সার R. C. Dutta বা মহাত্মা Digbyর মত ধরলে আমরা গরীব হয়ে যাচ্ছি। হই আর না হই আমার এখনকার বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের অর্থ বৃদ্ধির চেষ্টা তেমন

হচ্ছে না। দেশের সব দিকের মঙ্গল বাড়াতে গেলে যা পরিমাণ অর্থের দরকার তা আমরা অর্জ্জন করতে পারছি নি —আর যা পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত আছে তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। যে সব ধনী দেশে আছেন—ব্যবসাদার বা জমীদার—তাঁরা দেশের পাচরকম কল্যাণকর্ম্মে বড় টাকা খরচ করতে রাজি নন। তবে আগেকার চেয়ে রোজগার চেষ্টা ও সদ্ব্যয় প্রবৃত্তি বেড়েছে, অস্বীকার করবার নয়। দেশের এখন তিনটা বড় অভাব, শিক্ষাবিস্তার স্বাস্থ্যরক্ষা আর খাদ্যবৃদ্ধি। এই তিনটী কাজে আমাদের দেশীয় ধনকুবেররা অর্থ ব্যয় করতে অগ্রসর হন এইটী সকলের বাঞ্ছনীয়।

দেশের উন্নতির পক্ষে একটা মস্ত বাধা অতীতের প্রতি অত্যন্ত অন্ধ আসক্তি ও তজ্জাত বৃথা গর্ব্ব। যা কিছু সে কালের কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা—সবই 'সব্‌সে সেরা' ছিল—তেমনটি আর হবে না—হ'লনা—এই যে এক মিথ্যা অভিমান - এ বড় শক্ত। আধুনিক বিদেশী কোনো কিছুকে ভাল বললেই এঁরা খুব চটেন; সুতরাং এগুলির অনুকরণে আমাদের মধ্যে নূতন কিছু করা, বা ভেঙ্গে গড়া, পরিবর্ত্তন করা এঁরা খুব অপমানের বিষয় মনে করেন। যে অতীত ফিরবেনা বা যাকে ফেরালে অনিষ্ট হবে তার জন্য হা হুতোশ চেষ্টা চরিত্র করা এঁদের একটা নেশা। অতীতের মোহে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎকে ভুললে আমাদের মত পিছিয়ে-পড়া জাতের খুব অশুভ। সামাজিক বা ধর্ম্মগত যা আচার ব্যবহার রীতি নীতি সে সব পুরাতন বলেই যেন খুব উত্তম; সে গুলাকে বাঁচিয়ে তুলতে আর চালাতে হবে আর তাতেই আমাদের ভবিষ্য গতি ও মুক্তি—এ ধারণা বড় সাংঘাতিক। এঁরা একটা কথা ভুলে যান সমাজটা Organic body ইহার স্থিতি গতি বৃদ্ধি আছে, বাহিরের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সমাজটা বাঁচে, বাড়ে বা মরে। দুশো বা দুহাজার বছর আগেকার ব্যবস্থা এখন যে অনেক ক্ষেত্রেই চলে না, চললে সমাজ পশ্চাৎপন্থী হয়ে পড়ে এ কথা এঁদের বুঝানো যায় না। একটা কিছু ভাঙ্গা গড়ার বা নুতন কিছু করার-কথা হলেই এই "অচলায়তন"পন্থীরা অমনি হাঁড়ী থেকে জীর্ণ তাল পাতার পুঁথি খুলে বসেন আর বলেন "হঃ—শাস্ত্র কি বলছেন আগে দেখ, তার পরে এ কাজ করবে!" মোট কথা কবির কথিত "কর্ত্তার ভুতে" এদের পেয়ে বসেছে! এ ভুত না ছাড়লে উপায় নেই। প্রাচীনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ভাল, কিন্তু অন্ধ অনুরাগ কিছুতেই ভাল নয়। আধুনিকরা যে প্রাচীনদের চেয়ে অনেক বিষয়ে এগিয়েছেন, বড় হয়েছেন, জটীল হয়েছেন তাঁদের পাঁচটা পাঁচ রকম নুতন অভাব হয়েছে তাঁদের পূরণ দরকার একথাটা সোজা বুদ্ধিতে ভুল হয়ে যায়! আজ এই পর্য্যন্ত!

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

"যে শুনেছে নিজকর্ণে বিধাতার ডাক
পথি নিদ্রা মিছা খেলা সম্ভবে কি তার?
সে কি বলে, অন্ধগুলা পথে পড়ে থাক্?
সুপ্ত জনে না জাগায়ে সে কি আগে যায়?"

আলো ও ছায়া

রাজদ্রোহী।

ঘটনার মারপ্যাঁচ অনেক সময় মানুষের মুখে আত্মপ্রকাশ করে; ক্ষেমেশের মুখেও এইরকম একটা দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী কঠোর দারিদ্র্যের সহিত বিরামহীন সংগ্রামের বার্ত্তা পাওয়া যাইত। ক্ষেমেশের অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ খর্ব্ব আকৃতি, শুষ্ক বর্ণহীন ওষ্ঠাধর অসমতল ললাট ও তাহার উপরে ছোট করিয়া ছাঁটা রুক্ষ কর্কশ কেশরাজি কখনও কাহারও নয়নের পরিতৃপ্তি করে নাই তাহার উপর আবার তাহার দীর্ঘ অতি সুপুষ্ট নাসিকা যেন একটা অসামঞ্জস্যের বাহাদুরী লইবার জন্য অন্যান্য সমস্ত ক্ষীণ অবয়বগুলিকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহাদের সকলেরই সম্মুখে স্পর্দ্ধার সহিত বিরাজ করিতেছে; চক্ষু প্রায়ই স্তিমিত, নেত্রপল্লবদ্বয় ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টি ভূমিতে নিবদ্ধ, পাছে চক্ষুদ্বয়ের ভাষা কাহারও নিকট ধরা পড়িয়া যায়। এই সব ছাড়া আবার তাহার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী ও কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা সযত্নে আত্মরক্ষার ভাব প্রকাশ পাইত। বেশভূষায় একটা পারিপাট্যের অভাব সাধারণতঃ লক্ষিত হইত এবং সদা সর্ব্বদা আড়ষ্ট ও জড়সড় ভাবে উহা আরও অধিক লক্ষ্যগোচর হইত।

একটা মেসের একতলার ঘরের নানাস্থানে এক একটা করিয়া তক্তপোষ পাড়িয়া ছয়টি বিদ্যার্থী উচ্চশিক্ষার কুহকের তাড়নায়, সুদূর পল্লী পশ্চাতে ফেলিয়া, এইখানে আশ্রয় লইয়াছে, অর্থাৎ যখন আর বাহিরে থাকা চলে না তখনই তাহারা আসিয়া এইতক্তপোষগুলি আশ্রয় করে; এই তাহাদের দুর্গ, তাহাদের নিভৃত কুটীর; এইখানে বসিয়াই তাহারা পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ গুপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ভগবানের অস্তিত্ব লইয়া তর্ক বাঁধায়, রাজনীতি লইয়া একত্রে চীৎকার করে আবার সময়ে সময়ে অল্পগভীর প্রসঙ্গেরও উত্থাপন হয় তখন সকলে আপন আপন তক্তপোষ ছাড়িয়া একস্থানেই সমবেত হয়। তক্তপোষগুলির মধ্যে ব্যবধান বেশী নহে; স্থানের সংকীর্ণতা এই অনিচ্ছুক বস্তুগুলিকে পরস্পরের কাছে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাই তাহারা অসভ্য ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে আপনাদের অসন্তুষ্টি ঘোষণা করিতে ব্যস্ত।

ক্ষেমেশ এই ছয়জনের মধ্যে একজন, এবং যে-সে-একজন নহে কারণ কেবলমাত্র সেই ছয় জনের মধ্যে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। ক্ষেমেশের শয্যার শিয়রের দিকে একখানি রামকৃষ্ণ ও একখানি বিবেকানন্দের ছবি! ধূলিধূসরিত ম্লানভাবে লম্বমান এই দুখানি ছবি একটা আকস্মিক আধ্যাত্মিক প্রেরণার বন্যায় দুইআনা পয়সা খরচ করিয়া ক্ষেমেশ গত রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে বেলুড়ে কিনিয়াছিল; শয্যার অপর দিকে কার্ডবোর্ডে "তিনটী" শীর্ষক কতকগুলি মন্তব্য, এইগুলি নাকি সকল যুগের সকল ধর্ম্মের সারকথা, একটা কাঠের তাকের উপর কতকগুলি পুস্তক একরাশ পুরাতনখাতা, একটী চিম্‌নি-ভাঙ্গা টেবিল ল্যাম্প, একটী কোহিনুর পেন্সিলের শেষ চতুর্থাংশ, একটী দোয়াত ও দুইটী কলম; তক্তপোষের নীচে হইতে একটী সেকেলে বেতের ঝাঁপি উঁকি মারিতেছিল—এইখানেই ক্ষেমেশের গণ্ডী শেষ।

আজ কলেজ হইতে ফিরিয়া অবধি ক্ষেমেশের স্বভাবতঃ মৌনভাব যেন আরও গভীর হইয়াছে, সম্মুখে একটী বই খোলা ছিল কিন্তু তাহার দৃষ্টি আরও দূরদেশে—সেখানে জীর্ণ আবাসে তাহারই বিধবা মাতা ও বিবাহোপযুক্তা ভগ্নী দুঃখের জীবন চালাইতেছে ও ভীষণ সংগ্রামে ক্রমাগতই পিছনে হটিয়া পড়িতেছে—ক্ষেমেশের অগোচরে হাতের দশটী অঙ্গুলি আপনাদের মধ্যে কি এক সন্ধিবিগ্রহের বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিল।

আজ প্রথম সে গত তিনবৎসরের অভ্যাস ভাঙ্গিয়াছে আজ আর বিকালে দাদার বাসায় যাওয়া হয় নাই

দাদার নিকট তাহার যে বেশী কিছু প্রাপ্য ছিল তাহা নহে; কারণ দাদার সামর্থ্যটাও তাহার মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন এবং গলগ্রাহী পত্নী কন্যার দ্বারা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ তবে সেখানে যাইলে তাহার মনে একটা আরাম হইত, তাহার সঙ্কোচের কোন ব্যতিক্রম না ঘটিলেও একটা নীরব সহানুভূতিপূর্ণ অবস্থায় সে নিজেকে নিমগ্ন রাখিতে পারিত; কিন্তু কাল এই দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থার একটা বৈষম্য সে বুঝিয়াছে; উপলক্ষ তাহার চিররুগ্ন ভ্রাতৃজায়া; যাই হউক এই ব্যাপার লইয়া সে আর ভাবিল না কারণ আরও অন্য ভাবিবার বিষয় আছে। তিনটী বিভিন্ন আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক কুড়িটাকার উপর ভর করিয়া সে এই বিচিত্র পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার আয়োজন করিতেছিল; কিন্তু একটী চিঠিতে সে বুঝিছে যে তাহার এই অবলম্বন বুঝি যায়—দাদার বাড়ীর ঘটনার এই লইয়াই সূচনা।

ক্ষেমেশ এতদিন পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত শক্তিকে একটা কেন্দ্রের দিকেই চালিত করিয়াছিল, তাহার সমস্ত চেষ্টাটাই এই বি, এ পরীক্ষাতে নিয়োজিত ছিল, তাহার সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি, চরিত্রবল ও ক্ষমতা এই পরীক্ষার সেবাতেই তন্ময়, তাহার ভবিষ্যতের যেন এইখানেই সমাপ্তি, এই টুকুই তাহার জীবনের পরিণতি—যোগীর যেমন মোক্ষ। আজ সে অত্যন্ত বিচলিত, একি হইতে বসিয়াছে। এইত মরণ। অন্যায় অন্যায় ঘোরতর অন্যায়, কিন্তু এই অন্যায়ের শক্তি দুর্জ্জয়, গতি অপ্রতিহত—তৃণের ন্যায় তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে, বিরাটের অত্যাচারের সম্মুখে বিন্দুর মতন; প্রতিবিধান, উপায়, উদ্ধারের আশা—এসব মিথ্যাকথা ঘোর মিথ্যাকথা, মানবের ভাষার মধ্যে কোন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গপরায়ণ খল এই কথা গুলি চালাইয়া দিয়াছে—ক্রমশঃ ক্ষেমেশের দেহে একটা অবসাদ আসিতেছিল, এইটা স্বাভাবিক; শরীর ও মন অনেকটা নির্ব্বিকার অবস্থার মতন; তাহার ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া তাহার স্থানে একটা জীবন্ত বেদনার স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অবস্থায় মানুষ দার্শনিকের চক্ষে নিজেকে দেখে ও পরীক্ষা করিতে থাকে; রাগ ও দুঃখ স্বাভাবিক ভাবে অনুভূত হয় না, বোধ ও মনের মধ্যে একটা সাময়িক পর্দ্দা পড়িয়া যায়।

সে ভাবিতেছিল—'দুর্ব্বার সংসার দাবাগ্নি দগ্ধং দোধুয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ,—একটী অশ্রুবিন্দু তাহার চক্ষের কোণে টলমল করিতেছিল, যেন কোন আলা-উদ্দিন রাজ্যের একটী অতি ক্ষুদ্র অভিনব কুসুম, জগতের সমস্ত করুণাকে নিজের রূপে পর্য্যবসিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; এই অলক্ষিত অশ্রুকণা মানুষের পারিপার্শিক অবস্থা, রক্তমাংস এবং বাস্তব জগতের সংস্রবের বহুদূরে, এযে আত্মার নিকট আত্মার বেদনা-জ্ঞাপন, চক্ষুরও অজ্ঞাতসারে এই বিন্দু মানবের রহস্যময় গঠনের কোন অন্তঃস্থলহইতে গড়াইয়া পড়ে তাহার অনুসন্ধান আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই।

"কি মশাই, খুব পড়া লাগিয়ে দিয়েছেন দেখছি—" অজয় বাবুর গলার শব্দে ক্ষেমেশ চমকিয়া উঠিয়া বসিল —চোখের সেই একফোঁটা জল তরলপদার্থের স্বভাব ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া তাহার মুখের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িল, ক্ষেমেশ এই প্রথম ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিল; এই আকস্মিক এবং অভাবনীয় অবস্থায় পড়িয়া কিয়ৎকাল সেই যে কেবল নির্ব্বাক হইয়া রহিল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনস্রোত যেন বদ্ধ হইয়া গেল তাহার সমস্ত প্রাণশক্তি যেন শিথিল ও স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার পরই উত্তেজনা, ইহাও তাহার পক্ষে নূতন সে যেন আজ একেবারে আমূল নূতন হইতে বদ্ধপরিকর তাহার শিরায় শিরায় পাগল রক্ত ছুটিয়াছে দুরন্ত বিদ্রোহমন্ত্রের ছন্দের গতিতে তাহার বুকের মধ্যে শব্দ হইতেছে,—ধড়াস্, ধড়াস্—ভাঙ্, ভাঙ্। ক্ষেমেশ অজয়বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিল "—পড়ছি কোথায়, কাঁদছি—"

অল্পক্ষণব্যাপী একটা অস্বাভাবিক শান্তি সেই ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইল; ক্ষেমেশ কি বলিয়াছে, সে নিজেই চকিত, অজয় যাহা শুনিয়াছে তাহার কল্পনার জন্য তাহার শক্তি কখন স্বপ্নেও প্রস্তুত হয় নাই; দুই জনের মধ্যে সম্বন্ধটা এই সামান্য একটা ফোঁটা চোখের জলে আর এক

অনাবিষ্কৃত নূতন প্রণালী দিয়া ভাসিয়া গেল—তাহাতে দুইজনেই অভিভূত। ক্ষেমেশ প্রথমে কথা কহিল—স্বভাবকে যখন একবার বাহিরে সে ঠেলিয়াছে এবং নিজের মধ্যে এক অচেনা ব্যক্তিত্বের আস্বাদ বুঝিয়াছে তখন এই অনুভূতিকে আরও গাঢ় করিতে সে প্রয়াসী; সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া যাইতে লাগিল—"পড়ছি না; পড়ে কি হবে। আজকাল এই পড়ার জন্যে কি না করে আসছি, সব বাধা বিঘ্ন অত্যাচার চুপ করে সয়ে গেছি; এত সহ্য করছি তাই মনে একটা আশা ছিল যে সফল হব;—কেন, গরীব বলে কি তার কোনও ভাল হবে না এমনি করে আমাকে ঠকাবে, নিশ্চিন্ত হয়ে চেষ্টা করাতো হবেই না; চেষ্টা করাই বৃথা মিছামিছি—আমি প্রাণপনে চেষ্টা কর্ত্তে রাজী আছি কিন্তু এ যে সব চেষ্টারই বাহিরে; কি রকম করে যে ছেলেবেলা থেকে একটা বিশ্বাস হয়েছিল চেষ্টার বাইরে কিছু নেই; কি ঠকাই ঠকেছি—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একবার হাসিবার চেষ্টা করিল; দাহ করিবার সময় মৃতদেহের মুখে পেশী সঙ্কোচনের বৈচিত্র্যে অনেক সময় এই হাসির অনুরূপ একটা ভঙ্গী দেখা যায়।

অজয় এতক্ষণ এই প্লাবনের মধ্যে পড়িয়া পদদ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছিল—অজয় এই মেসের লোক না হইলেও এখানকার সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, সকলেই তাহাকে একটু সাধারণ হইতে উচ্চে আসন দিয়া আসিয়াছে; কবে কোন বন্ধুকে উপলক্ষ করিয়া যে এই সুন্দর যুবকটী এই মেসের সহিত এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছিল তাহা কেহই জানিত না তবে তাহার এই সাধারণ বন্ধুত্ব পদটী লইয়া কেহ কখনও ওজর আপত্তি করে নাই, সকলেই তাহাকে নীরবে মানিয়া লইত, প্রথম কারণ তাহার বেশ ভূষার কোন পারিপাট্য না থাকিলেও তাহার মধ্যে দারিদ্র্যের গন্ধমাত্র ছিল না, দ্বিতীয় তাহার কথাবার্ত্তা নানা বিষয়ে চর্চ্চার স্বাভাবিক শক্তির ফলে সকলকে আকৃষ্ট করিতে পারিত, তৃতীয় কারণ গত এম, এ পরীক্ষায় সে যে অত্যধিক সম্মান ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে এই কথাটা কেমন ভাবে সকলের মধ্যে প্রচার হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্থ ও শেষ কারণ তাহার নিরহঙ্কারিতা, সকল বিষয়ে গভীর আগ্রহ।

ক্ষেমেশ আবার কি বলিতে চেষ্টা করিয়া থামিয়া গেল; তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতটী শক্ত করিয়া ধরিয়া অজয় ডাকিল, "ভাই!—" এই আকস্মিক, ঘনিষ্ট সম্বোধনে সে চমকিত হইল না, এই যেন স্বাভাবিক তাহার চিরকালের প্রাপ্য; অজয় আবার অল্পক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিতে লাগিল; তাহার কথাগুলি যেন অত্যন্ত গভীর স্থান হইতে ঠেলিয়া জোরে বাহির হইতেছে—"ভাই—চারিদিকে আমাদের এই অন্যায়টা ঘিরে নেই কি? যেখানে হাত লাগাবে সেইখানে দেখবে অন্যায়, সমাজের মধ্যে দেখ, রাজ্যের মধ্যে দেখ, সংসারের মধ্যে দেখ, চারিদিকে এই পিশাচ অন্যায়টা মানুষের আগ্রহ আর মহৎ উদ্যমকে দুহাতে র'গড়ে পিশে ফেলছে—তোমার অত্যন্ত ইচ্ছে আছে, ভাল হবার, বড় হবার; শক্তিও তোমার প্রচুর, কিন্তু তোমাকে নিরুৎসাহ ক'রবার জন্য অন্যায় চারদিক থেকে তেড়ে আসছে—যখন আমরা এই অন্যায়টাকে বুঝতে পার'ব তার ঘা' যখন আমাদের বুকে লাগবে তখনই আমরা যদি প্রকৃত মানুষ হই, যদি মনকে চোখ ঠেরে ঘেয়ো কুকুরের জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে ঘেন্না করি তাহলে তখনই আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেগে যাব। এই পর, তোমার কথাটায় আমার দুঃখ হয়েচে ব'টে কিন্তু বিশেষ কোনও সহানুভূতি আমি দেখাতে চাই না বরং আমি দেখছি তুমি অন্যায়টাকে জানতে পেরেছ আর এখন তোমার কর্ত্তব্য, চারদিকে যেখানে অন্যায় আছে সেইখানে তাকে পাগলাকুকুরের মতন' তাড়া করে মারা—" ক্ষেমেশ অত্যন্ত মনযোগের সহিত কথা শুনিতেছিল, সে অজয়ের মুখের উপর চোখ রাখিয়া ব'লতে লাগল, প্রত্যেক কথার সহিত সে যেন তাহার এতদিনের পূর্ণ অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে বাহিরে টানিয়া আনিতেছিল, অল্পে অল্পে অন্যের নিকট আত্ম সমর্পণ করিতেছিল, উচ্ছ্বাস ও আবেগের আকস্মিকতা বা উত্তেজনা তাহার গলার স্বরে ছিল না—"আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি, অন্যায় আমার ওপর

হয়েছে—এ অন্যায় সকলের উপর হচ্ছে তাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লাগতে হবে, সেইটাকে নিয়ে দুঃখ না ক'রে বরং যুদ্ধটাকে জীবনের উদ্দেশ্য ক'রে ফেল্‌তে হবে—এ পর্য্যন্ত বেশ বুঝ্‌লুম, আমার মনে লেগেছে ঠিক, কিন্তু কেমন করে, তারই বা উপায় কি?" অজয়—"ঠিক পথে এসেছ ভাই—তবে শোন আমার কথা বলি—বক্তৃতার ভাবে কোনও কথা বলছি না, আমি অনেক দিন আগে এই অন্যায়ের কথা বুঝতে পেরেছি, ঠিক ঠেকে বোঝা আমার ভাগ্যে না ঘটলেও বুঝতে পেরেছি আর সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখেছি যে আমাদের দেশেই এই অন্যায়টা যেন আরও বিকট, এর তুলনা আর কোনও দেশে এ যুগে নেই আর তার কারণ হচ্ছে আমরা ভেড়ার মত একটা বড় অন্যায় কাজ সহ্য করি বলে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের এই ভীরুতা বা জড়তার জন্য আধ্যাত্মিকতার দোহাই আনি; এই ভণ্ডামী আর ভেঁড়ামি করে কষ্ট পাই আমরাই, কিন্তু এই যে দাস হয়ে থাকা আজ এতদিন নীরবে মেনে আসছি তা'তে অন্যায় সহ্য করাটা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে পেড়েছে; তাই আমি ভাবি দেশের যেখানে যে এই অন্যায়ের বিশ্রী চেহারা দেখতে পেয়েছে, সে তার ছোট স্বার্থের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসুক, নিজের উপর অন্যায় নিয়ে আক্ষেপ করে সমস্ত জীবন কাটানোর চেয়ে সমগ্র অন্যায়ের ওপর পূর্ণবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ুক—কোনও মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তিটা ঘেন্নার কথা কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আর দেশকাল পাত্র কিছু গ্রাহ্য না করে সেই অন্যায়কে দমন ক'রতে গিয়ে যদি হাজার হাজার লোকের মাথা উড়িয়ে দাও, তাতে গৌরব আছে—এযে ধর্ম্মযুদ্ধ—এটা গীতার মন্ত্র। তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে, তোমার বুদ্ধির বিষয়েও আমার খুব আস্থা আছে তাই প্রাণ খুলে তোমাকে সব কথাগুলো বল্লাম—আমার কথা বুঝতে পেরেছ বোধ হয়?' অজয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষেমেশের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মনের অনুশীলনটা এখন ক্ষেমেশের মুখের উপর স্থাপিত। ক্ষেমেশের মাথা সামনের দিকে, তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—হাতদুটী বেয়াড়া, আলগা-ভাবে কোলের উপর পড়িয়াছিল সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অনেকক্ষণ কেবল দুইজনের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শোনা যাইতেছিল, অজয় একটা অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছে, ক্ষেমেশ মাথা তুলিয়া বলিল—"আপনার সব কথা বুঝতে পেরেছি—" গলার স্বরে বিন্দুমাত্র বিশিষ্টতা ছিল না, যেন আপনা হইতে কোনও যন্ত্রসাহায্যে উচ্চারিত হইয়াছে কোনও ভাবাবেগের লেশ মাত্র নাই, ইঙ্গিতের সম্পর্ক নাই; সে এখনও অজয়ের নিকট একটা রহস্যবৎ, অজয় এবার জিজ্ঞাসা করিল "বাইরে যাবে, বেড়াতে?" ক্ষেমেশ—"আপনি যেখানে যেতে বলেন, যাবো, আমার মনে দ্বিধা নেই।" অজয় তড়িৎ গতিতে দাঁড়াইয়া উঠিল, ক্ষেমেশও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দুইজন দুইজনকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, ক্ষেমেশ স্থির, সে একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্ত, ভাবনাকে দূরে ঠেলিয়া কাজের জন্য প্রস্তুত, সমস্ত শক্তি কাজে লাগানোই যে তাহার অভ্যাস, কাজ লইয়া বেশী আলোচনা করা তাহার স্বভাব নহে—আর অজয়ও স্থির কিন্তু এই আবরণের পশ্চাতে একটা মাতঙ্গের কার্য্যকরী শক্তি যেন ছটপট্ করিতেছে—দুইজনে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল।

পথে অজয় ক্ষেমেশকে বুঝাইয়া দিল যে সে তাহাকে এক বিশেষ বন্ধুর নিকট লইয়া যাইতেছে; ক্ষেমেশ যেন স্বপ্নে চলিয়াছে, জনতার স্রোত, দুই পার্শ্বের দৃশ্যাবলী কোনও দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না কেবল অজয়ের কথা তাহার মনকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে; সমস্ত অবলম্বন বিচ্যুত হইয়া নিতল কালো জলরাশির মধ্যে সে যখন একখণ্ড নির্জ্জীব প্রস্তরখণ্ডের মত ডুবিতে বসিয়াছিল তখন যে তাহাকে শুধু রক্ষা করা নহে, তাহার মধ্যে নূতন জীবন-সঞ্চার করিয়াছে, তাহাকে সে সমস্ত সত্ত্বা দিয়া উপলব্ধি করিতেছিল। ক্ষেমেশের মধ্যে তাহার মনটাই প্রধান; যাহারা মন লইয়া সদাসর্ব্বদা নাড়াচাড়া করে ও চিন্তা-বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন রাখিয়া নিষ্কর্ম্মণ্য হইয়া উঠে সেই ধরণের না হইলেও ক্ষেমেশের জীবনটা

তাহার মানসিক ভাগ দ্বারাই পরিচালিত; সেইখানেই তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা তাই অজয় যখন তাহাকে এই মনের দিক্ দিয়া স্পর্শ করিল, তাহাকে ভবিষ্যৎ কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ এইরূপ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিল তখন তাহার মধ্যে সে এত সহজে সাড়া পাইল—অজয়ের প্রতি ভক্তিতে ক্ষেমেশের মন আপ্লুত; ইহারই নিকট যে সে একটা দুর্ব্বোধ্য অসামঞ্জস্যের মধ্যে একটা যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যের ধারার পরিচয় পাইয়াছে; যখন নিজের দুরদৃষ্ট তাহাকে বিচলিত করিয়া সংসারটাকে একটা অর্থহীন অসংলগ্ন ব্যাপার প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল তখন অজয় তাহাকে একটা বৃহত্তর কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে আবার জীবন্ত করিয়াছে। তাই ক্ষেমেশ এই psychological সম্মোহনে অজয়ের অনুসরণ করিতেছে।

রাস্তার ধারে একটা বৈঠকখানা খুব জমকালো রকমের একটা গানের আড্ডার মধ্যে সনৎ বসিয়াছিল, অজয় বাহির হইতে ডাকিতেই সে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বাহির হইয়া আসিল, তাহার পরিত্যক্ত তানপুরাটির তারগুলি তখনও কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার এই অসৌজন্যের জন্য বিলাপ করিতেছিল। সনৎ আড্ডা ছাড়িয়া অজয়ের সম্মুখে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী যাবে এখন?" এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেমেশের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অজয়ের দিকে প্রশ্নময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। অজয় উত্তরে শুধু বলিল—"চল—উনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে"—তিনজনে আবার চলিতে লাগিল।

অজয়ের মধ্যে যেমন একটা সদাসর্ব্বদা সৌম্য ও সুন্দর ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইত, সনতের ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার বেশভূষা ও আকৃতির মধ্যে একটা অযত্ন আত্মঘোষণা করিতেছে, তাহার আকৃতি বিশ্রী রকমের দীর্ঘ; কপাল প্রশস্ত, মস্তিষ্কের উপরিভাগ বিস্তৃত কিন্তু সেই অনুপাতে আবার মুখাবয়বের নিম্নভাগ অপরিপুষ্ট ও ক্ষীণ নাসিকা সাধারণ রকমের, গাল দুটী বেজায় বসিয়া গিয়াছে, ঠোঁট পাতলা ও ছোট এবং চক্ষুদুটী অনুজ্জ্বল। কিন্তু দুই বন্ধুর মধ্যে একটা সাদৃশ্য ছিল—সেটা তাহাদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা।

বড়রাস্তার বাঁকের মুখে একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে সনৎএর বাড়ী, একটী ক্ষুদ্র দ্বিতল বাসাবাড়ী; অজয় প্রথমে প্রবেশ করিল, তাহার পর ক্ষেমেশ এবং সনৎ সকলের পশ্চাতে। দ্বিতলের একটী কক্ষে তিনজনে প্রবেশ করিল; ক্ষেমেশ এইসব বিন্দুমাত্র বুঝিবার লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করে নাই; সমস্তটাই তাহার নিকট স্বপ্ন, কেবল অজয় বাস্তব, সে যন্ত্র-চালিতের মতন একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ঘরের মধ্যে কতকগুলি চেয়ার একটী ছোট টেবিল্ এবং রাশি-কৃত পুস্তক, এত ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে এত পুস্তকের সমাবেশ ক্ষেমেশ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

চিন্তার পর চিন্তা একটা শ্রেণীবদ্ধ চিত্রমালার ন্যায় ক্ষেমেশের মানসচক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল—সে সমস্তই অনুধাবন করিয়াছে, একটা আন্তরিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাহার মুখে প্রতিভাত; সে অবিচলিতভাবে আপনাকে এই অজানিত বিপদ্‌সঙ্কুল কর্ম্মধারার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়া অনিশ্চিত চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইল; নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম হইতে যে চিন্তার সূচনা তাহার জন্য ক্ষেমেশ সদা-সর্ব্বদা প্রস্তুত কিন্তু বিরুদ্ধ নিঃসম্পর্কীয় চিন্তা তাহার মানসিক গঠনের বিপরীত সুতরাং পীড়াদায়ক—সেই জন্যই ক্ষেমেশের এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন। একটা অবলম্বন চাই, আগে যাহা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহাকেই আশ্রয় করা যাউক, পরে তাহার গুণাগুণ বিচার্য্য—এই ক্ষেমেশের স্বভাবের বিশেষত্ব।

সনৎ বলিতেছে, "এই ক'লকাতা সমুদ্রে সবাই মিলে সাঁতার কাটছি আমরা, কখন কোনটানে পড়ে কোনদিকে ভেসে যাব তার ঠিক নেই তবে শেষে ঠিক নিমতলার ঘাটে গিয়ে লাগব, সেখানে সবাই ঠেকবে গিয়ে—কেন বাপু আমি তো আসতে চাইনি; জন্মাবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না তবে কেন জোর করে আমাকে পাঠানো, এ জুলুম কেন? এখানে এসে সংসারের নিয়মের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে হবে, আমি বলি ছেড়ে দে মা, আর ভাল

লাগে না, জীবনের এ অযাচিত সোহাগ আর সহ্য হয় না একটা কেউ কোথায় আছে যে ভয়ানক অন্যায় কর্চ্ছে যার ধর্ম্ম অন্যায়, স্বভাব অন্যায়, আর যার ক্ষমতা অসীম অপ্রতিহত—অন্যায়ের রাজ্য, অন্যায়ের খেলা"—ক্ষেমেশ বলিয়া উঠিল—"আর সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেওয়াই প্রকৃত জীবন"—সনৎ ব্যঙ্গস্বরে বলিল—"আস্ফালন করে করেই গেলুম, শুধু আস্ফালন আর আস্ফালন—" সনৎ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—যেন এই দুঃসাহসব্রতী যুবক, তাহার দুঃসাহসকে, আদর্শকে, জীবনকে এবং জগতকে ব্যঙ্গ করিয়া পরিতৃপ্ত,—এইরূপ হাসি ক্ষেমেশের নিকট একটু অসঙ্গত ঠেকাতে সে বিরক্ত ভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি কি মনে করছেন যে আমি ভয় পাব ?"

আবার সনৎ হাসিল—এই হাস্যে মানবের যুগে যুগে বর্দ্ধিত পুষ্ট সনাতন বৃত্তিগুলি ব্যাকুল উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে—এর অর্থ কি ?—সনৎ উত্তর দিল "ভয় পেলেই বা ক্ষতি কি ?" অজয় তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করিয়া ওঠাতে সনৎ নিরস্ত হইল।

অজয় ক্ষেমেশকে সমস্ত বুঝাইয়া দিল—তাহাদের কার্য্যপ্রণালী কি, তাহাদের আদর্শের সহিত কার্য্যপ্রণালীর কি সম্বন্ধ, তাহাতে সুবিধা কোথায় এবং আদর্শের মহত্ব বা শ্রেষ্ঠতা, সমস্তই সে যেন একটা আবেগের স্রোতে বলিয়া গেল—ক্ষেমেশ সমস্তই গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত—তাহার নিকট সমস্তই পরিষ্কার—তাহার পর অজয় তাহাকে বিপদের কথা বলিল—তাহারা রাজদ্রোহী, বিশাল ভারতে একটা মুষ্টিমেয় সংখ্যা কিন্তু তাহাদের শত্রু প্রবল, বিশাল, মৃত্যুর আশঙ্কা পদে পদে জীবনকে তুচ্ছ করিতে হইবে—ক্ষেমেশের মনে হইল সে যেন আর একটা রাজ্যে বিচরণ করিতেছে এই মুহূর্ত্ত হইতে যেন এই পুরাতন জীর্ণ শত দুঃখদৈন্যের স্মৃতিতে মলিন জগতের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—অপর এক জগতে সে অধিষ্ঠিত—সে জগৎ যেন পুরাতনের অনেক উচ্চে এবং স্বচ্ছ সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত ক্ষেমেশও নিজেকে সেই জগতের বাসিন্দারূপে দেখিল—নিজের উপর তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, এখন সে নিজেকে পূজা করিতেছে সে কি আর পশ্চাৎপদ হইতে পারে বিপদের কথায় সে হাসিল—সনৎও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে গাহিল—"তা বলে ভাবনা করা চলবে না—" অজয় নববিজয়ের উৎসাহে মৃদুকণ্ঠে সেই গানে যোগ দিল—"আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলে কি রইবি থেমে" !

* * * * * * *

নীরব নদীতীর—রাত্রির অন্ধকার সমস্তকে গ্রাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে—দুই তটে উচ্চ নীচ বেলাভূমি এবং অনন্ত বিস্তীর্ণ সমতল সহিষ্ণুতার সহিত রাত্রির অবসান প্রতীক্ষা করিতেছে, চঞ্চলতার লেশমাত্রও নাই সমস্তই যেন নিশ্চিন্ত মনে আলোর চিন্তায় নিমগ্ন—এই দিকব্যাপী অন্ধকারের সহিত যেন কোনও সম্পর্ক নাই। এই ঘন নিবিড় আলিঙ্গনেও ধরণীর প্রাণের সাড়া না পাইয়া হতাশ অন্ধকার গুম্ হইয়া রহিয়াছে।

ভরাপালে নৌকা চলিয়াছে, ক্ষেমেশের হাতে হাল—এই তাহার প্রথম অভিযান, বিরাট অন্যায়ের উপর প্রথম আক্রমণ—নৌকার সম্মুখে সনৎ এবং অজয়—অজয় ঘোর চিন্তামগ্ন, সনৎ গুণ গুণ করিয়া গাহিতেছে—নৌকার মধ্যস্থলে কয়েকটী নীরব মূর্ত্তি নানা ভঙ্গীতে উপবিষ্ট—একজন অতি অল্পবয়স্ক, স্কুলের ছাত্র, নৌকা ছাড়িতেই সে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বন্দেমাতরং বন্দেমাতরং"—একজন চাপাগলায় বলিল "চুপ, চুপ, কর" আর হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিল—ক্ষেমেশ কিয়ৎকাল অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বালককে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিল "কেবল স্নায়বিক উত্তেজনা—ঘটে আর কিছু নেই"—একটা জোলো হাওয়া নদীর জলকে কাঁপাইয়া বহিতে লাগিল—ক্ষেমেশের হাড়ের মধ্যে যেন তাহার শীতলস্পর্শ লাগিল—নৌকা তর তর করিয়া চলিতেছে।

ক্ষেমেশের হাতে হাল কিন্তু সে অন্যমনস্ক—একপার্শ্বে পাড় উঁচু নীচু হইয়া চলিয়াছে—একস্থানে হঠাৎ খাড়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে যেন বধির ভ্রূক্ষেপহীন জগতে অসহায়ের কাতর আর্ত্তনাদ কোথায় কোন কল্পিত ভগবানের চরণের আশ্রয় লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে—আর

একস্থানে পাড় আবার নদীবক্ষের সহিত সমান, উদ্ভিদ্‌রাজি স্রোতের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, চিরপ্রবাহমান স্রোতের সামীপ্যে তাহাদের নিশ্চল স্থিরভাব যেন করুণার জন্মস্থল, যৌবনে সর্ব্বপ্রথম নৈরাশ্যে হৃদয় এমনি দীনভাবে লুটাইয়া পড়ে। নদীর অপর তট হইতে দিগন্ত বিস্তৃত কর্ষিত ভূমি আর উপরে অপ্রতিহত আকাশ—সমস্তই শূন্য আর তাহার নীচে ক্ষুদ্র মানুষের চেষ্টা, অসহায় ধান্যশীর্ষগুলি, শিহরিতেছে—পর্দ্দা সরিয়া গেলে দেখা যায় মানবের আশা নিজের অস্তিত্বের জন্যই কত ক্ষুদ্র কত সন্ত্রস্ত কত সঙ্কুচিত যেন বহুযুগের চিরন্তন অপরাধী ক্ষেমেশ ইহাই লক্ষ্য করিয়া অন্যমনস্ক।

ক্ষেমেশের চিন্তাস্রোত তরঙ্গায়িত হইয়া চলিয়াছে—একদিকে অসমতল তটভূমির বক্ররেখা যেন তাহার মনের মধ্যে একটা আন্দোলন আনিতে সহায়তা করিতেছে—দ্বিধা সন্দেহ যেন অল্পে অল্পে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইতেছে কি এক মাদকে যেন তাহারা অভিভূত ছিল এখন যেন কিসের সংঘর্ষে তাহাদের অবসাদ কাটিয়াছে ক্ষেমেশ ভাবিতেছে.—সে যে কোন সূত্র ধরিতে পারিতেছে না, সে যেন খেই হারাইয়াছে, কক্ষচ্যুত তারকা যেমন ক্রমশঃ দূর হইতে দূরে বিকৃষ্ট হইয়া ধ্বংসের পথ ধরে সেও তদ্রূপ, —সংসারের বহু প্রবাহের মধ্যে সে যেন একটারও সহিত আর যুক্ত নহে—সে যেন অনাবশ্যক অতিরিক্ত; তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—সে তো একটা নিঃস্বার্থ ব্রতের সহিত যুক্ত তাহার একটা মহৎ কর্ত্তব্য আছে; সে যে দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়াছে; তাহার দেশ তাহার মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ সে নিজেকে অঞ্জলি দিয়াছে; "আমার মাতৃভূমি, আমার স্বদেশ—সুজলাং সুফলাং মাতরং" এই ভাবিয়া ক্ষেমেশ প্রসন্নমনে বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ধান্যক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দেশবাসী কৃষকেরা যাহাদের শ্রমে তাহার দেশ সুন্দর সুফল, তাহাদেরই জন্যে প্রাণ দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা আর পরাধীন পদদলিত না থাকে। কিন্তু পরক্ষণই আবার তাহার মনে প্রশ্ন হইল—চাষারা কি স্বাধীনতা চায়?—আবার সন্দেহের পালা। সত্য বলিতে কি তাহারা কেবল নির্ব্বিবাদে থাকিতে চায়, ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিতে চায় দুর্ভিক্ষ মড়ক আর বন্যা এই তিনের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট—শক্ হূন্ মোগল ইংরাজ কে যে দেশের রাজা তাহাতে তাহাদের বিন্দুমাত্র আসে যায় না। হইতে পারে তাহারা মূর্খ, স্বাধীনতার অভাব বোঝে না—দেশের মধ্যে এই অভাব কেবল মুষ্টিমেয় লোকে বুঝিয়াছে। ক্ষেমেশ ভাবিল "কিন্তু আমাদের এই কয়জনের অভাবকে একটা দেশব্যাপী ব্যাপার করিয়া তোলা বড় আস্পর্দ্ধার কথা।"

ক্ষেমেশের দৃষ্টি তাহার অজ্ঞাতসারে অজয়কে অনুসন্ধান করিতে লাগিল—অজয়কে পালের আড়ালে দেখা গেল না—অর্দ্ধশায়িত চঞ্চল স্কুলের ছাত্রটির উপর তাহার চক্ষু পড়িল "এই তাহার একজন সঙ্গী" ঘৃণা ও অবজ্ঞার একটা তরঙ্গ তাহার শিরায় শিরায় ছুটিয়া গেল।

সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সুপ্ত, নিশ্চন্ত, কেবল তাহারা এই কয়জনেই কিসের জন্য এত ব্যস্ত, তাহাদের কেন এত মাথা ব্যথা, এ অবমিশ্রিত অনধিকার চর্চ্চা ছাড়া আর কিছু নয়; এত আয়োজন একটা অলীকের পশ্চাতে, আদর্শ একেবারে কাল্পনিক; তাহাদের আজিকার লক্ষ্যস্থল এক গ্রাম্য জমীদারের বাড়ী, সেখানে লুট করিতে হইবে - উদ্দেশ্য মহৎ, দেশের কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ—কিন্তু মহৎকার্য্য তাহারা করিবে, এত গোপনে কেন? এই গোপনতা অসহ—মহৎ ও বিরাট যে সর্ব্বদা একত্রে থাকে; কিন্তু নৌকারোহী তাহারা তুচ্ছ—চতুর্দ্দিকে বিশাল জড়তার মধ্যে তাহারা একটা অকারণ অস্থিরতা ব্যতীত আর কিছু নহে—সমাজের জন্য সমষ্টির জন্য প্রাণদান উত্তম কিন্তু তাহার জন্য একটা বৃহত্তর ক্ষেত্র আবশ্যক—তুচ্ছ দস্যুবৃত্তি কি মহতের সহিত যুক্ত হইতে পারে?—ক্ষেমেশের মনে পুনঃপুনঃ এই সব প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল এক একবার অজয়ের উৎসাহদীপ্ত মুখ মনে পড়ে আর সে সবলে নিজের সন্দেহকে দূরে ফেলিয়া দেয় কিন্তু আবার সন্দেহ যেন আরও জমাট বাঁধিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে থাকে—রাত্রির অন্ধকার, নদীর রহস্যময় কুলকুল ধ্বনি অস্পষ্টতটভূমি যেন সমস্তই

এই সন্দেহের ছটায় অভিভূত, ইহার সুরে মুখরিত ইহারই ভাবে আপ্লুত।

ক্ষেমেশের দৃষ্টি অনিচ্ছা সত্বেও পুনঃপুনঃ সেই স্কুলের বালকের উপর পড়িতেছিল তাহার উদ্ভ্রান্তভাব লক্ষ্য করিতেছিল—তাহার মন একটা বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—ক্রমশঃ এই ভাব আরও বিকট হইয়া উঠিল।

মাতার বেদনা-মলিন মুখখানি ও সজল চক্ষুদুটী মনে পড়িল—তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তার মায়ের মুখের স্মৃতি ভাসিতে লাগিল—আর সদ্য পোড়ার-মুখী তার স্নেহের অতি আদরের ছোটবোন্ যেন নৌকার চারিদিকে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে—এক একবার নৌকায় উঠিয়া তাহার সম্মুখে বসে আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে—ক্ষেমেশ জানিত এ তাহার উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনা তাই সে চীৎকার করিয়া উঠে নাই—কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের মতন সে এই কল্পনাপ্রসূত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। দূরে কোথায় তাহার সেই জীবন একটা পরিত্যক্ত ভগ্ন কুটীরের মত পড়িয়া আছে আর সে এখন কোথায়—এ হাওয়াতে যে দম আটকে যায়—ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, চুরমার করে ভেঙ্গে ফেল—ক্ষেমেশের অন্তরতম ব্যক্তি আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—সে একটা জীবন ভাঙ্গিয়াছে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উৎসর্গ করিয়াছে ভাবিয়াছিল; কিন্তু সব ভুল; এ ভুলের সন্দেহের রাজ্য—ভাঙ্গ ভাঙ্গ চুরমার করে, ভেঙ্গে ফেল—চুপ করিয়া বসিয়া নির্লিপ্তভাবে এই অন্তহীণ ভাবনা অসহ্য। ভাঙ্গনের সুর যখন একবার জাগিয়াছে, তখন তাহার সমাপ্তি মরণে—যেখানে অনুভূতি চিন্তা ও স্পন্দন এক সঙ্গেই থামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ হইতে নদীর স্রোতের বেগ যেন একটু অধিক হইতেছিল, একটা যেন কিসের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল—ক্ষেমেশের মনে পড়িল এইখানে বাঁকের মুখে, ভৈরব ঘুর্ণী—অজয় তাহাকে বহুপূর্ব্বে সাবধান করিয়া দিয়াছিল—আশঙ্কার বেশী কিছু নাই—দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া থাকিলে নৌকা ঘুর্ণীর বহুদূর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইবে।

নদীর স্রোত চঞ্চল ও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তরঙ্গমালা আর শান্ত নহে এখন যেন কোন পৈশাচিক নিমন্ত্রণে, যাত্রী ক্ষুধিত দানবী দলের ন্যায় তাহারা ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জ্জন করিয়া চলিয়াছে। আর ঘুর্ণীর নিকট একটা ধবধবে সাদা আভা আর একটা বীভৎস গণ্ডগোল—জলরাশির গভীর গর্জ্জন শোষণের শব্দ একত্রে মিলিয়া হৃৎকম্প করাইয়া দেয়।

ক্ষেমেশের চক্ষু হইতে যেন একটা অস্বাভাবিক আলো ঠিকরিয়া বাহির হইতেছে সদ্য পোড়ারমুখী খন খন নৌকায় তাহার সম্মুখে উঠিয়া বসিতেছে আর খল খল করিয়া চপল হাসি হাসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—এ আবার কি রঙ্গ, ক্ষেমেশ পাগলের মত হইয়া উঠিল—সব জাহান্নাম যাক—নৌকার হাল ক্ষেমেশ ঘুরাইয়া দিল—নৌকার মুখ সোজা ঘুর্ণীর দিকে আর পাগলা হাতীর মত তাহার বেগ। ....।

* * * * * *

অজয় ডাকিল "সনৎ"। সনৎ "এই যে ভাই, আমি" এই বলিয়া তাহার কাছে ঘেঁষিয়া আসিল।

নৌকাটা যেন এখন একটা চেতন পদার্থ—কিন্তু ঠিক চেতনা বিলুপ্ত হইবার উপক্রমে—প্রলয় নৃত্যের ভঙ্গীতে নাচিতেছে—আর তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুধিত তরঙ্গরাজি তাহাকে ধ্বংসের দিকে চালিত করিতেছে—ভীমবেগে ঘুরিতে ঘুরিতে নৌকা ঘুর্ণীর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল।

দুম্ করিয়া একটা আওয়াজ হইল, একজন সহজে নিজেই মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইল। স্তব্ধ বিমূঢ় স্কুলের ছাত্র এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল—সে চীৎকার মর্ম্মভেদী—জলরাশির বিরাট আস্ফালন ও গর্জ্জনের মধ্যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। নৌকাও ঘুর্ণীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * * * *

প্রভাতে কয়েকজন গ্রাম্য লোকে জল হইতে একটা মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়াছিল—মৃতদেহ একটা অল্পবয়স্ক বালকের।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধু রঙ্গদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪)

"তীর্ণা স্বয়ং ভীম ভবার্ণব জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তি"—এই মহাবাক্যকে সার্থক করিবার জন্য রঙ্গদাস নগরমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সমগ্র জগত যেন তাঁহার দৃষ্টিতে এক অখণ্ডসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আচরণ দেখিলে নিতান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিও ইহা বেশ বুঝিতে পারিত। ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ইত্যাদি ভেদজ্ঞানবিরহিত, রঙ্গদাসকে যে যেখানে লইয়া যাইত—সদানন্দময় পুরুষ নিরাপত্তিতে তথায়ই গমন করিতেন। জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের হস্তেই আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। ক্রমে তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া মছলিপটনম সহরের বহুলোক তাঁহার ভক্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী সাধন ভজন ও ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে লাগিল।

রঙ্গদাসের বাহ্যআচরণসমূহ উন্মত্তবৎ ও অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কখনও রাত্রে কণ্টকাকীর্ণ স্থানে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেন, প্রভাতে তাঁহার দেহের দুর্দ্দশা দেখিয়া লোকে যত্নসহকারে অঙ্গ হইতে কণ্টকসমূহ উত্তোলন করিয়া ঔষধ লেপন করিয়া দিত। কখনও দেখা যাইত তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দ্রুত ধাবমান হইতেছেন। তাঁহার অঙ্গে প্রায়ই কোন বসন থাকিত না। সময় সময় কোন কোন দয়াদ্র্র ব্যক্তি তাঁহাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া স্বালয়ে লইয়া যাইতেন এবং সেবাশুশ্রূষা করিতেন। কখনও দেখা যাইত তিনি কর্দ্দমময় স্থানে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া আনন্দে গান করিতেছেন অথবা হাসিতেছেন। লোকে তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিত এবং কাপড় হারাইয়া না ফেলেন সেজন্য বস্ত্রখানি দৃঢ়ভাবে পরাইয়া দিত; হয়তো পরদিন প্রভাতে দেখা যাইত তিনি কোন খাল উত্তীর্ণ হইতে গিয়া সমস্ত ভিজাইয়া ফেলিয়াছেন।

সহরের রাস্তার উভয়পার্শ্বে চারাগাছগুলি রক্ষা করিবার জন্য যে সুদৃঢ় কণ্টকময় আবেষ্টনীগুলি আছে, একদিন প্রভাতে দেখা গেল তিনি সমস্ত রাত্রি বাহির হইতে না পারিয়া ক্ষতবিক্ষতঅঙ্গে তাহার মধ্যে বসিয়া আছেন। দুইজন রাখালের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম তাঁহার উপর পতিত হয়। রাখালবালকদ্বয় তাঁহাকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তিনি কোন উত্তর না দিয়া হাসিতে লাগিলেন। বালকগণ তাঁহাকে উন্মাদ স্থির করিয়া প্রহৃত হইবার ভয়ে তাঁহার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। এমন সময়ে একজন বয়স্কব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া যত্নসহকারে তাঁহাকে কণ্টকময় আবেষ্টনী হইতে বাহির করিয়া লইয়া আসিলেন। ইনি রঙ্গদাসকে মহাসাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সন্তর্পণে তাঁহার অঙ্গ হইতে কণ্টকগুলি বাহির করিয়া দিলেন। সেদিন তাঁহার অঙ্গে এত কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল যে উহা নিষ্কাষিত করিতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল এবং ক্ষতস্থানগুলি আরোগ্য হইতেও অনেক দিন সময় লাগিয়াছিল। এইরূপ একটা না আর একটা দৈহিক দুর্ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতে লাগিল। অবশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া রঙ্গদাসের শুভানুধ্যায়িগণ যুক্তি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

স্থানীয় বালকগণ রঙ্গদাসকে তাহাদিগের খেলার সাথী করিয়া লইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে প্রায়ই পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিত; তাঁহাকে ঘিরিয়া কর

তালি দিয়া নামসংকীর্ত্তন করিত। রঙ্গদাসও আনন্দে অধীর হইয়া ভাবাবেশে মধুর নৃত্য করিতেন, হাস্য কৌতুক করিতেন। বালকগণ তাঁহার স্কন্ধে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত, সময়ে অসময়ে তাঁহাকে লইয়া নানাপ্রকার কৌতুক করিত, তিনি তাহাতে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হইতেন না বরং উৎসাহের সহিত তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। সর্ব্বদা বালকবৃন্দ পরিবেষ্টিত রঙ্গদাসকে বালকের মতই কেবল হাস্য পরিহাস করিতে দেখিয়া মনে হইত বাস্তবিকই মহাপুরুষগণের চরিত্র "অলোকসামান্যম চিন্ত্য-হেতুকম্।"

ক্রমে মছলিপট্নম নগরে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিল, এবং তিনি জনসাধারণের এত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে যদি তিনি কাহারও গৃহে কিয়ৎকাল উপবেশন করিতেন তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিত। অনেকেই তাঁহার রঙ্গদাস নাম অবগত ছিল না, সেইজন্য সাধারণতঃ তিনি "দম" "দম" এই নামে অভিহিত হইতেন।

এই সময় হইতেই রঙ্গদাস অনন্যচিত্ত হইয়া সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহজবোধ্য অমৃতমধুর উপদেশগুলি শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ বহুব্যক্তি তাঁহার নিকট আগমন করিত। কেহ কেহ স্বালয়ে ভজনসভার অনুষ্ঠান করিয়া রঙ্গদাসকে তথায় লইয়া যাইতেন। শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু দেখা দিত; অঙ্গ রোমাঞ্চিত ও মুহুর্মুহু কম্পিত হইত এবং অবশেষে "দম দম" বলিতে বলিতে ভাবসমাধিমগ্ন হইয়া স্থির হইয়া যাইত। তাঁহার তৎকালীন পবিত্র-সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করিয়া নিতান্ত অভক্তের হৃদয়েও ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত হইত। সমাধি ভঙ্গে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গদাস ইঙ্গিতে কিছু আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। ইহা তাঁহার ভক্তগণ জানিতেন, কাজেই রঙ্গদাস কিছু না বলিলেও তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া থাকিতেন। মহাপুরুষের সমাধিভঙ্গ হইবামাত্র তাঁহার বদনে একটুকরা মিশ্রী কি ফল অর্পিত হইত। উচ্চতম ভাবভূমি হইতে বাসনা ব্যতীত মনকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব বলিয়া মহাপুরুষগণ ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামনা সহায়ে মনকে বাহ্যবস্তুতে সংলগ্ন করিয়া রাখেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও সমাধিভঙ্গে "তামাক খাব" "বাহ্যে যাব" ইত্যাদি বাসনা প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক রঙ্গদাস সমাধিভঙ্গে পুনরায় ভজন গানে মত্ত হইতেন অথবা উপদেশাদি প্রদান করিতেন। রঙ্গদাসের সঙ্গসুখ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে মছলিপট্নম সহর ভজনগানে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রত্যহ কোন না কোন বাড়ীতে ভজনসভার অনুষ্ঠান হইত। হয়তো কেহ ভজনসভার আয়োজন করিতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে রঙ্গদাসকে ইতিপূর্ব্বেই অন্য কেহ লইয়া গিয়াছে; তৎক্ষণাৎ উদ্যোক্তাগণ সভার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া রঙ্গদাসের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিতেন। রঙ্গদাসের পবিত্র উপস্থিতি ব্যতীত ভজনসভা জমিত না। ভজনগান শেষ হইলে রঙ্গদাস জিজ্ঞাসু ভক্তদিগকে তাহাদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ অথচ সরল সহজ উত্তর দিয়া সমস্ত সন্দেহের মীমাংসা করিয়া দিতেন। অনেকস্থলেই কেবল তাঁহার মধুর উপদেশের জন্যই ভজনগানের আয়োজন হইত। ভজন শ্রবণ করা অপেক্ষা তাঁহার শ্রীমুখের দুই একটী বাণী শ্রবণ করিবার জন্য জনসাধারণ সমধিক লালায়িত হইত।

একদিন একজন বিখ্যাত দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রবিদ্ কৃতবিদ্যব্যক্তি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মছলিপট্নম নগরে উপস্থিত হন। স্থানীয় থিয়োজফিক্যাল সোসাইটী গৃহে ইঁহার সহিত রঙ্গদাসের সাক্ষাৎ হয়। রঙ্গদাসের উচ্চভাব বুঝিতে না পারিয়া পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে ইনি রঙ্গদাসের সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল মধ্যেই এই বিদ্যা-বুদ্ধিহীন উন্মাদবৎপ্রতীয়মান অদ্ভুত সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব যুক্তির নিকট তাঁহাকে মস্তক অবনত করিয়া নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। এই ঘটনায় অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী শিক্ষিতব্যক্তি রঙ্গদাসের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন এবং ধর্ম্মবিষয়ক কোন সমস্যা মীমাংসা

করিবার প্রয়োজন হইলেই রঙ্গদাসের নিকট আগমন করিতেন।

এইকালে ধর্ম্মপ্রচারই তিনি একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিলমাত্র অবসর ছিল না। যিনি যখন সুবিধা পাইতেন তখনই রঙ্গদাসকে স্বালয়ে লইয়া যাইতেন। নানাস্থান হইতে সমাগত তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের সহিত ধর্ম্মালাপ করিতেই তাঁহার সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইত। যাঁহারা সাংসারিক কার্য্যপ্রয়োজনে দিবাভাগে আসিতে সমর্থ হইতেন না, তাঁহারা রাত্রিকালে রঙ্গদাসের উপদেশামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইতেন। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকে তাঁহাকে প্রচার কার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি উক্ত প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিতেন, জনহিতায় যদি দেহপাত হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার কোন ক্ষোভের কারণ নাই; যেহেতু যে জন্য দেহের প্রয়োজন—ভগবৎ কৃপায় তাহা তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে-অতএব দেহের জন্য যত্ন লওয়া অনাবশ্যক।

মহাপ্রাণ উদার হৃদয় রঙ্গদাস পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ধর্ম্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। 'তিনি কোন সাম্প্রদায়িকমত অথবা কোন প্রকার বিশেষ উপাসনাপ্রণালী প্রচার করিতেন না। সকল মতাবলম্বী ব্যক্তিকেই তিনি স্ব স্ব ভাব অব্যাহত রাখিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেন; এবং যাহাতে সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ ও সত্যলাভস্পৃহা বলবতী হয়—ইহাই তাঁহার প্রচারকার্য্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম-সমন্বয়ের মহাবার্ত্তাও, তাঁহার অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়াছিল, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সিদ্ধিলাভ করিবার পর তিনি যে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন—তাহার শেষ মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত লোককল্যাণ কমনায় ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। কতদিন তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতেন, "হে মোহনিদ্রায় অভিভূত মানবগণ। জাগরিত হও। মৃত্যুকাল অনিশ্চিত হইলেও—মৃত্যু নিশ্চিত;—অতএব এখন হইতেই প্রস্তুত হও।"

ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মছলিপট্টনম সহরে আর এমন কেহ ছিল না যে রঙ্গদাসকে না চিনিত। এমন কি পুরমহিলাগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সরল অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করিবার আশায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইতেন। রঙ্গদাস বালকের ন্যায় সরলভাবে ও নিঃসঙ্কোচে মহিলা-মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন; অথবা ভজন গাহিতেন। অনেক সময় তাঁহারা রঙ্গদাসের সেবার জন্য প্রচুর মিষ্টসামগ্রী ও ফলাদি তাঁহার সম্মুখে আনয়ন করিতেন কিন্তু রঙ্গদাস উহা গ্রহণ না করিয়া রিক্তহস্তে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেন। পাঠক-বর্গের স্মরণ থাকিতে পারে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে হস্তদ্বারা কোন খাদ্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, উহা কখনও ভঙ্গ করেন নাই!

(৫)

রঙ্গদাসের অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া ইতিপূর্ব্বেই অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য ও গুণানুরাগী ভক্তবৃন্দের মধ্যে কতিপয় শিক্ষিতব্যক্তি তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত উপদেশগুলি যথাযথ-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্নবান হইলেন। এই মহাত্মার একটী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তেলেগু ভাষায় উপস্থিত মত কবিতা রচনা করিয়া অনর্গল আবৃত্তি করিতে পারিতেন, এবং যখন যেভাবে বিভোর হইতেন, সেই ভাবের সঙ্গীত রচনা করিয়া গাহিতেন। এইরূপ কতকগুলি সঙ্গীত ও কবিতা একত্র করিয়া তদীয় গণ্টারস্থ ভক্তমণ্ডলী একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রত্যেক ভজনসভাতেই রঙ্গদাস মধুরকণ্ঠে স্বরচিত সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত করিয়া তুলিতেন। ধর্ম্মের জটিলতত্ত্বসমূহ, তিনি কখনও সুললিত কবিতায়, কখনও সরল সহজবোধ্য গদ্যে মীমাংসা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহিত করিয়া দিতেন। রঙ্গদাস বাল্যে সামান্য

লেখাপড়া করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এত গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, ভাষায় অদ্ভুত অধিকার, অপূর্ব্ব কবিতা রচনা-শক্তি কেমন করিয়া লাভ করিলেন? এ প্রশ্ন উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বরের দেবমানব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কথা!! তিনিও কি উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ অমূল্য উপদেশাবলী বালবোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত করেন নাই? তাঁহার মুখের দিব্যজ্ঞানপ্রদ বাণীসমূহ শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত, মনীষী দার্শনিক, পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী বৈজ্ঞানিক, প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক সকলেই ভক্তি ও সম্ভ্রমে মুক্তকণ্ঠে স্ব স্ব বহুবর্ষব্যাপী শ্রমলব্ধ জ্ঞানরাশি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিকই যাঁহারা দেশকালের পরপারস্থিত ভূমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন—সেই আত্মকাম জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের অসাধ্য কিছুই নাই। সিদ্ধপুরুষ রঙ্গদাস যে উপস্থিত মত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিতে পারিবেন—ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কেবল সঙ্গীত ও কবিতা নহে—ললিত-কলাবিদ্যায় তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। কথিত আছে অঙ্কিত চিত্রসমূহের দোষ ও গুণগুলি তিনি এমন নিপুণভাবে বিচার করিতেন যে, অনেক সময় মনে হইত তিনি সারাজীবন ধরিয়া যেন চিত্রবিদ্যাই আলোচনা করিয়াছেন। রঙ্গদাসের এক শিষ্য চিত্রকর ছিলেন। একদা তিনি রঙ্গদাসের সাধন-সহায়িকা ও গুরু চাদাম্বার একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করিবার জন্য আদিষ্ট হন। তৈলচিত্রখানি তাঁহার বাৎসরিক জন্মোৎসবে ব্যবহৃত হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। চাদাম্বার কোন প্রতিকৃতি ছিল না চিত্রকর কখনও তাঁহাকে স্থূলশরীরে দর্শন করেন নাই। দৈহিক বিশেষত্বগুলির বর্ণনা শ্রবণ করিয়া যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এমন কি পূর্ব্বদৃষ্ট কোন ব্যক্তির চিত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদির সাহায্য না লইয়া কেবল মাত্র কল্পনা হইতে অঙ্কিত করা যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন। এই সুকঠিন কার্য্যভার শ্রীগুরু আজ্ঞায় গ্রহণ করিয়া চিত্রকর বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রঙ্গদাস তাঁহার নিকট চাদাম্বার দৈহিক বিশেষত্বগুলি, বসন, ভূষণ, অলঙ্কার, তিনি যে ভাবে বসিয়া ধ্যান করিতেন, ইহা অতুলনীয় নিপুণতার সহিত এমন বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন যে চিত্রকরের আশা হইল তিনি উহা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবেন। শ্রীগুরুর উপর অগাধ বিশ্বাস লইয়া তিনি অঙ্কনকার্য্য আরম্ভ করিলেন। রঙ্গদাস তাঁহার চিত্রশালায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অঙ্কনকালে আবশ্যক উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং সামান্য একটা রেখাপাতের ক্ষুদ্রতম ত্রুটীটিও সংশোধন করিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন চিত্রখানি সমাপ্ত হইল তখন যাঁহারা চাদাম্বাকে দেখিয়াছিলেন সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিলেন ইহা তাঁহারই অনুরূপ হইয়াছে। চিত্রকরের বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন উন্মাদবৎ প্রতীয়মান এই মহাপুরুষ কেমন করিয়া চিত্রবিদ্যায় এবম্বিধ অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করিলেন। যাহা হউক শ্রীগুরু কৃপায় তিনি আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন ভাবিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। এই মনোরম ও অপূর্ব্ব চিত্রখানি এখনও মছলিপট্টনমে বিরাজিত থাকিয়া দর্শকবৃন্দের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

স্থানীয় গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ অথবা ব্রাহ্মণনামধেয় কতকগুলি সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি রঙ্গদাসের প্রতিষ্ঠা দর্শনে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠিলেন। অনেক উচ্চবংশজাত ব্যক্তি এমন কি তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত শূদ্র রঙ্গদাসের পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাদের অন্ধ-অভিমান-ক্ষুব্ধ-হৃদয় ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইঁহারা রঙ্গদাসকে উন্মাদ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং লোকসমাজে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য নানাপ্রকার নীচ উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরদল তর্কপটু-জ্ঞানাভিমানীগণ—যাঁহাদের হৃদয়ে একবিন্দু ভক্তি বা বিশ্বাস নাই; আধুনিক ইংরেজী-

শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া রঙ্গদাসকে বিবিধপ্রকারে, বিরক্ত করিতে লাগিলেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক বা ঈশ্বরভক্তগণকে দেখিলেই ইঁহাদের এইপ্রকার গাত্র কণ্ডুয়ণ উপস্থিত হয়। লোকে ধর্ম্মপরায়ণ হইবে বা সাধু-সিদ্ধপুরুষে ভক্তিমান হইবে ইহা যেন তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। ইহারা কখনও কখনও রঙ্গদাসকে স্বালয়ে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট জটিল দার্শনিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত করিয়া মনে করিতেন যে মূর্খ রঙ্গদাস বোধ হয় তাহার উত্তর করিতে পারিবেন না। কিন্তু যখন মহাত্মা রঙ্গদাস ভাবোন্মত্ত হইয়া উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিতেন তখন তথাকথিত পণ্ডিতগণের নতমস্তকে নীরব হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না। ছোট ছোট গল্পের সাহায্যে (ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মত) বক্তব্য বিষয়কে সুন্দরভাবে বিবৃত করিবার তাঁহার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। তাঁহার সুললিত উপদেশ ও গল্পগুলির কতক্ কতক্ উত্তরকালে শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক সযত্নে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি এত হৃদয়গ্রাহী, এত যুক্তিপূর্ণ—সর্ব্বোপরি এমন সরল যে একজন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিও অনায়াসে বুঝিতে পারে।

(৬)

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের প্রেসীডেণ্ট প্রখ্যাতনামা আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মছলিমপটনম নগরে পদার্পণ করেন। তখন স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি পূর্ব্ব হইতেই রঙ্গদাসের সহিত তাঁহার দেখা হইবার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামিজী সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত, এমন সময় রঙ্গদাস তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামিজী তখন বলিতেছিলেন, "ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণন করা অসাধ্য ব্যাপার। রামকৃষ্ণ বলিতেন, "লবণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গিয়েছিল; কিন্তু সমুদ্রে নামিবামাত্র যে নিজেই গলে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেল, তা খবর দিবে কে?" সেইরূপ যাঁরা সেই সচ্চিদানন্দকে জানবার জন্য অগ্রসর হন তাঁহারা সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দসাগরে মিলিত হইবামাত্র স্বয়ং সচ্চিদানন্দ হইয়া যান; সেই দিব্যঅনুভূতি বাক্য মনের অগোচর; অতএব সীমাবদ্ধ মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জন্যই বলিতেন "ব্রহ্মবস্তু কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।"

একজন দোভাষী রঙ্গদাসের ইঙ্গিতে স্বামিজীর কথিত বাক্যগুলি তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন. রঙ্গদাস উহা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত বলিলেন, "অনন্ত ব্রহ্মের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেই মুখ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। জিহ্বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়।"

(শ্রীরামকৃষ্ণও অনেক সময় তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে বলিতেন "ওরে সমাধি অবস্থায় যে সব অনুভূতি হয়; আমার ইচ্ছা হয় তোদের খুলে বলি কিন্তু কে যেন মুখ চেপে ধরে।)

রঙ্গদাসের কথা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া দোভাষী স্বামিজীকে বুঝাইয়া দিলেন। দোভাষী সাহায্যে কিয়ৎকাল কথোপকথন করিয়া এবং দৈহিক লক্ষণাদি দৃষ্টে রামকৃষ্ণানন্দজী সমবেত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইনি একজন পূর্ণজ্ঞানী! ইহার অতি উচ্চ অবস্থা! ইহার ন্যায় আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ কলিযুগে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় আপনারা সময় মত এই মহাপুরুষের সঙ্গ করিবেন; অনেক কল্যাণ হইবে।"

স্বামিজীর মুখে রঙ্গদাসের প্রশংসা শুনিয়া অনেকেই তৎক্ষণাৎ রঙ্গদাসকে ঘিরিয়া বসিলেন। তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্মান করা হইতেছে ভাবিয়া রঙ্গদাস স্বামিজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি হয়তো আমার সম্বন্ধে ইহাদিগকে অনেক কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন। যে মুখ হইতে অসত্য প্রশংসাবাক্য বহির্গত হয় তাহা অপবিত্র হইয়াছে।"

রামকৃষ্ণানন্দজী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "স্বামিজী! আমি আপনার খোসামোদী করিয়া একটী কথাও বলি নাই। আমি কেবল এই ভদ্রলোকদিগকে বলিয়াছি

যে সৌভাগ্যক্রমে আপনারা একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে আপনাদের মধ্যে পাইয়াছেন। অতএব তাঁহার আদর্শ জীবন অনুকরণ করা আপনাদের কর্ত্তব্য। ইহা কি অসঙ্গত উক্তি হইয়াছে ?"

রঙ্গদাস স্বামিজীর বাক্যের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন। ইহার পর আর কয়েক মিনিট উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হইল মাত্র। সাধারণের আশা ছিল উভয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার করিবেন। কিন্তু উভয়েই ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ—ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পরিপূর্ণ। তাঁহাদের আর কি জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে ? ঈষৎ-হাস্য-বিকশিত-বদনে ও অর্দ্ধমুদিত নেত্রে রঙ্গদাস কথোপকথনরত স্বামিজীর প্রতি সম্ভ্রমবিমিশ্র কৌতূহলের সহিত চাহিয়া রহিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন একান্ত নির্ভরশীল পুত্র পিতার গৌরবচ্ছটার নিকটে আসিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

এতদিন যে সমস্ত শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি রঙ্গদাসকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছিলেন, মহাপণ্ডিত সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণানন্দের কথায় তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইল। রঙ্গদাসকে একজন প্রকৃত মহাত্মা বুঝিতে পারিয়া আদর ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং স্ব স্ব আলয়ে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পুরস্ত্রীগণ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজে রঙ্গদাসের মধুর উপদেশ শুনিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। দিবারাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত রঙ্গদাসের পক্ষে বিশ্রাম করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

এইরূপ অবিরত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। কঠিনরোগে আক্রান্ত হইয়া মহাপুরুষ শয্যাগ্রহণ করিলেন। দেহত্যাগের একপক্ষকাল পূর্ব্বে তিনি শিষ্যবৃন্দকে বলিলেন যে তিনি দেহত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন অতএব সাধন সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিলে এই সময় মীমাংসা করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এ সংবাদ বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; নানাস্থান হইতে শিষ্যবৃন্দ ব্যথিতহৃদয়ে গুরুপাদমূলে সমাগত হইতে লাগিলেন। ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ জলস্রোতের মত আগমন করিতে লাগিলেন। রঙ্গদাসের পিতা, মাতা ও ভ্রাতাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগশয্যায় শায়িত মহাপুরুষের সৌম্য-মুখমণ্ডল প্রশান্ত হাস্যে অনুরঞ্জিত—নয়নে কল্যাণবর্ষী মনোহর দৃষ্টি দেখিয়া মনে হইত তিনি যেন সর্ব্বদাই এক দিব্যানন্দে ভরপূর হইয়া আছেন। আগ্রহ ও আবেগের সহিত উপদেশ প্রদান করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে "দম" "দম" বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিতেছেন—অনেক দর্শকই মনে করিতে লাগিলেন যে ব্যাধি তাঁহার ভাণ মাত্র। কিন্তু শরীরধর্ম্মের ব্যাভিচারে ব্যাধি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল। এক সপ্তাহ প্রবল জ্বরভোগ করিয়া অবশেষে শেষ সময় সমাগত হইল। ইহার মধ্যে তিনি ঔষধ সেবন তো দূরের কথা—একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। অনর্গল ধর্ম্মব্যাখ্যা নিরত রঙ্গদাস মুহূর্ত্তের জন্যও দৈহিক যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেন নাই। এমন কি শেষ সময়ের কয়েক মিনিট পূর্ব্বে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিলেন, "আপনি খুব যন্ত্রণাবোধ করিতেছেন কি ?"

মধুরহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন,."আমি যে পরমানন্দ উপভোগ করিতেছি ; দৈহিক যন্ত্রণা তথায় পৌঁছিতে পারে না।"

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর। রঙ্গদাস পূর্ব্বেই শিষ্যবৃন্দকে উক্ত দিবসের কথা এবং নিরূপিত সময়ের কথা রাখিয়াছিলেন, কাজেই সকলে সময় নিকটবর্ত্তী বুঝিয়া নীরবে গুরুর শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সমবেত শিষ্য ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-বিমিশ্র-শোকার্দ্র-দৃষ্টিস্নাত মহাপুরুষ "শিবোঽহম্" "শিবোঽহম্" উচ্চারণ করিতে করিতে দিব্যানন্দোজ্জ্বল বদনে মহাসমাধিতে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইলেন। সমস্ত মছলিপট্টনম সহরে বায়ুতাড়িত ক্ষিপ্ত অগ্নির ন্যায় এ সংবাদ পরিব্যাপ্ত হইল। দলে দলে নরনারী প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মহাপুরুষের পরিত্যক্ত দেহখানি দর্শন কামনায় আগমন করিতে লাগিলেন।

* * * *

যে স্থানে তাঁহার দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে, তদুপরি একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে তাঁহার একখানি সুবৃৎ তৈলচিত্র স্থাপিত আছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে মনোরম উদ্যান, স্থানটীকে পরম রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এইস্থানে তাঁহার জন্মোৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, হরিকথা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দ রঙ্গদাসের পবিত্র জীবন সম্বন্ধে আলোচনা বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন। ইহাদিগের চেষ্টায় মছলিপট্টনম, গণ্টার, বেজওয়াডা, বাপটালা, গুডিভাডা, মুক্তালয় ও পাটামাটালঙ্কা প্রভৃতি নগরে রঙ্গদাসের নামে "সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। "শ্রীরঙ্গদাস সমাজ" গুলির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। যে মহাপুরুষের নামের সহিত উহারা সংযুক্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে; তাঁহার চরিত্র, সাধনা ও সিদ্ধিই উহাদিগের পশ্চাতে প্রেরণা শক্তি দিতেছে।

গহনকানন—নির্জ্জন গিরিগুহায় ব্রহ্মানন্দমগ্ন সাধক আপনাতে আপনি মগ্ন—জগত তাঁহার সন্ধান পায় না। পরমকারুণিক শ্রীভগবানের কৃপায় লোক শিক্ষার জন্য নগরের কোলাহলের মধ্যে একটী সহস্রদল পদ্ম লোক-লোচনের সম্মুখে সহস্রার আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পারিজাত বিজয়ী সৌরভ আজও বিরাজিত থাকিয়া শত সহস্রব্যক্তির প্রাণ হরণ করিতেছে—প্রমাণ করিতেছে; অতীত যুগের ঋষিগণ প্রণীত শাস্ত্র, ও অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ সত্যসমূহ কল্পনা নহে—কর্ম্মপরিণত সত্য।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্তন্য ও রক্ত।

(অনুবাদ)

পরদোষ গুলি তেয়াগিয়া লয়
গুণগুলি সাধুজনা,
অসতেরা শুধু দোষ গুলি হেরে
পরিহরি গুণপনা।
দুগ্ধ তেয়াগি স্তনের রুধির
জোঁকগুলি করে পান
রুধির ছাড়িয়া স্তন্য পিইয়া
শিশুগণ ধরে প্রাণ।

শ্রীকালিদাস রায়।

"ছোট মা"

(১)

"আচ্ছা বল ত', তুমি কি সুরেন আর দিদিকে আনবেই না মনে ক'রেছ?"

স্ত্রীর কথাটার কোন উত্তর না দিয়াই ব্রজবাবু অন্যমনস্কভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সারদাসুন্দরী কোন জবাব না পাইয়া পুনরায় বলিলেন—"কি ভাবছ? কথাটার একটা জবাবই দাও না।"

কিন্তু জবাব দেওয়ার কিছু রেখেছেন কি? তাই তাহার অপরাধী হৃদয়ের সারাটা অন্তস্তল খুঁজিয়াও তিনি জবাব দেওয়ার মত কোন কথা যখন মিলিল না তখন শ্রাবণের জলে-ভরা মেঘের মত মুখখানি লইয়াই ব্রজবাবু আহারে মনোনিবেশের চেষ্টা করিলেন।

যখনি সারদাসুন্দরী দিদির কথাটি তুলিয়াছে স্বামীর চোখ দুটি কেন যে তখনি সজল হ'য়ে উঠেছে, তাহা তার যদিও বা জানিতে বাকি ছিল, অন্তর্য্যামীর নিকটও তাহা গোপন থাকে নাই! একবার নয়, দুইবার নয় অন্যূন দশবারও কি সে এ কথাটা তোলে নাই? কিন্তু কোন কাজের অছিলায় উত্তর না দিয়াই ব্রজবাবু বাহির বাড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছেন। কেন? সুরেন কি কি তার পর? ভগবান তাকে মাতৃত্বের পূর্ণ-বিকাশের অবসর দেন নাই বটে কিন্তু সুরেনই তার নারী হৃদয়টিকে পুত্রের সরস স্নেহে আপ্লুত করিয়া দিয়া যাইতে পারে! হায়রে নারীর প্রাণ! "মা" ডাকটি শুনবার জন্য, এতই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় যখন ছেলের প্রথম বিবাহ দেন, তখন তাঁর 'বেরজর' বয়স ছিল পনের বৎসর। বেহাই হরিহর গাঙ্গুলী তাঁরই মত অবস্থাপন্ন। জমিদারির আয় ২৫।৩০ হাজারের কম নহে। বিবাহে কি ঘটাটাই না হ'য়েছিল। তারপর দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছয় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। দেবতার আশীর্ব্বাদী পুষ্পের মত একটি পবিত্র শিশু দেখা দিল তাঁদের সংসারে। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় সে সুখ তাদের সইবে কেন?

একদিন তাঁর দূর সম্পর্কীয় কোন একটি ভ্রাতষ্পুত্র পূজা উপলক্ষে বেড়াইতে আইসে। ভ্রাতষ্পুত্রের শ্বশুর প্রদত্ত সচেইন ঘড়ি দেখিয়া, কি কুক্ষণেই তিনি বেহাইর নিকট ঘড়ি ঘড়ি চেইন চাহিয়া বসেন। সেই সাত বৎসর পূর্ব্বে যখন হরিহর বাবু টুকটুকে সুষমাকে সম্প্রদান করেন, তখন নাকি চেইন ঘড়ি দেওয়ারও কথা ছিল। রামগোপালবাবু এই সময় কথাটা বেহাইকে স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলেন নাই। তাহার উত্তরে হরিহরবাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, মুখুজ্যেমহাশয়ের তাহাতে একেবারে তেলে বেগুনে জলিয়া উঠিবারই কথা।

পরদিবসই নবজাত শিশুটিকে তার মাতার সঙ্গে মাতুলালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং মাসেকের মধ্যে ছেলের পুনরায় বিবাহ দিয়া বিহাইর সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। সুষমার পাল্কীতে উঠিবার সময় নাকি বৃদ্ধের চোখের কোণে, ও-পাড়ার বিধুখুড়ী দুই বিন্দু অশ্রু দেখিতে পাইয়াছিলেন। পিতার মনে যাহাই হইয়া থাকুক্, ফুঁ দিয়া বাতি নিভাইয়া দিলে আলোভরা ঘরের অবস্থাটা যেমন হয় স্ত্রীর প্রস্থানটাও "বেরজ"র হৃদয়টিকে তেমনি আঁধার করিয়া দিয়া গেল। আজ এ ছাড়াছাড়ি তাদের সাত বৎসর পরে। এ যে তার কতখানি ব্যথার কারণ, তা যে না এমন ভাবে ছেলে বেলা থেকে স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে থাকিয়া আসিয়াছে সে বুঝিবে না। বুকভরা ব্যথা লইয়া আঁখিভরা জল লইয়া, সে অনেক দিন কাটাইয়া দিয়াছে। সে যে গাঁজাখোরদের সর্দ্দার

এ'ত আর মিথ্যা নয়। দিনরাত বোসেদের পুকুরে একটা ছিপের উপরে উবুর হইয়া থাকাটাই কি প্রশংসার কথা? শ্বশুর লিখিয়াছিলেন "বাবাজি কি চেইন ঘড়ি ঝুলাইয়া, গাঁজায় দম দিয়া, বোসেদের পুকুরে মাছ ধরিবেন?"

কথাটা একটু কড়া রকমেরই হইয়াছিল। সত্যই ত' চেন ঘড়ি লইয়া সে কি করিবে? সে কি মানুষ? মূর্খ সে; তার অদৃষ্টে দুঃখ থাকিবে না ত' থাকিবে কার? বাপই ত তাহার জীবনটাকে অন্ধকারের ছাপ মারিয়া দিয়াছে; বাল্যের আদর, কৈশোরের তাচ্ছল্যই ত' তাকে অজ্ঞানতার দিকে টানিয়া লইয়াছে! নিজেকেও অপরাধীর গণ্ডীর বাইরে রাখিতে ভরসা হইল না তার। চেষ্টা করিলে সে মানুষ হইতে পারিত না কি?

তারপর আঠার বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মুখুয্যে মহাশয়ের মৃত্যুর পর "বেরজো" —ব্রজবাবু হইয়াছেন। অদম্য উৎসাহে তিনি এখন একজন বড় সংস্কৃতজ্ঞ। শিক্ষার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি তাঁহার গ্রামের দরিদ্র ও সাধারণ লোকদের সংমিশ্রণেই হইয়াছিল।

(২)

এই কয়মাস "আনি" "আনি" করিয়াও আজ পর্য্যন্ত সুষমা ও সুরেনকে আনা হয় নাই। কোন্ মুখে ব্রজবাবু আজ ১৮ বৎসর পর সেই লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা সুষমার নিকট উপস্থিত হইবেন? তিনি কি তার ক্ষমার যোগ্য? অন্যায়ের বিরুদ্ধে না দাঁড়ানটা কি তাঁরই ঘোরতর অপরাধ হয় নাই? কিন্তু তিনি ত' তখন পশুর চেয়েও অধম ছিলেন! পিতার ন্যায় অন্যায়ের উপর কথা কহিবার সাহস তাঁর কোন দিনই ত ছিল না!

তাই আজ ব্রজবাবু খাইতে বসিলে ব্যঞ্জননিরতা সারদাসুন্দরী বলিতেছিল—"আচ্ছা বলত' তুমি কি সুরেন আর দিদিকে আন্‌বেই না মনে ক'রেছ?"

স্বামীকে নীরব দেখিয়া পুনরায় বলিল—"দেখ আজকাল তুমি এত কি ভাব বলত'?" ভাতের থালা হইতে মুখ তুলিয়া ব্রজবাবু অর্থশূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সারদাসুন্দরী বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি, কথাটার একটা জবাব দাও।"

"কি?"

"সুরেন আর দিদিকে নিয়ে এস।"

"সতীনের ঘর করাটা কি বড় মিষ্টি হবে সারদা, যে তুমি—"

আজ স্বামী তাহাকে যাহা শুনাইয়া দিল, জীবনেও বুঝি তাহার জন্য সারদাসুন্দরী প্রস্তুত ছিল না। তবু মুখের কথাটা বলিবার অবসর না দিয়াই সে বলিল— "ছি, ছি, আমায় তুমি এত নীচ ভাব! তোমায় স্বামীরূপে পাওয়াটা যে কত জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল, তা যে না তোমায় পেয়েছে, সে ত' তাহা বুঝিবে না! আর তোমার মত স্বামী পেয়েও সতীনের ঘর করাটা কি বড় শক্ত কথা হ'ল! ভগবান যদি সুরেনকে আমাদের দিয়েইছেন, তবে কেন না সে আমাদের কাছে থাকবে?"

"কিন্তু সারদা, যার জন্য তুমি এত ব্যাকুল, সেই যে তোমার মাতৃত্বের মর্য্যাদা রেখে চ'লবে তারও ত' কোন নিশ্চয়তা নেই। তারপর সে এখন ডাক্তারি প'ড়ছে, বড়টি হ'য়েছে, সে-ই কি তার মাকে নিয়ে আস্‌তে স্বীকৃত হবে। মামাদের দিয়ে সে মানুষ; তার উপর দাবী করবার ত' আমার কিছুই নাই!"

একটু বিস্মিত হইয়া সারদাসুন্দরী বলিল, "সে কি কথা গো! বাপের দাবী ছেলের উপর নাই এতো কখনো শুনিনি! আর সুরেন যদি লেখাপড়া শিখে মানুষই হ'য়ে থাকে, তবে তুমি দেখো, সে দিদিকে নিয়ে নিশ্চয়ই আস্‌বে।"

কথা কয়টার মধ্যে কতখানি বিশ্বাস, কতখানি নির্ভরতা রহিয়াছে, তাহা ব্রজবাবুর বুঝিতে বাকি রহিল না; কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই বলিয়াই তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সারদাসুন্দরী বলিল—"কি চুপ ক'রে রইলে যে?"

"না—এই কথাগুলিই ক'মাস ধ'রে ভাবছিলাম। বাবা মারা গিয়েছেন; তাঁর মনে এ সম্বন্ধে কি ছিল তা

তিনি স্পষ্ট ক'রে একবারও ব'লে যান নাই। যদি আন্তরিক অনিচ্ছাই থেকে থাকে তাঁর তবে—"

"দেখ তুমি বলবার অধিকার দিয়েছ ব'লেই তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তেও সাহস পাই। একটা মস্তবড় ভুল নিয়ে যে তুমি তোলপাড় ক'চ্ছ তা হয়ত তোমার নিজের কাছেই ধরা প'ড়ছে না। দিদিকে আর সুরেনকে পাঠিয়ে কত বড় ব্যথা যে বাবা বুকের ভিতর পুষে রেখেছিলেন তা তখনকার তাঁর দুই বিন্দু অশ্রুই কি যথেষ্ট প্রমাণ দেয় নাই? এতেও তুমি বুঝতে পাচ্ছ না যে মনে মনে খুবই ইচ্ছা ছিল তাঁর, দিদিকে আন্‌বার জন্য।"

"নিজেই তিনি এর একটা বন্দোবস্ত ক'রতে পার্‌তেন তা'হ'লে।"

"কি যে বল তুমি তারও ঠিকানা নেই। বাবা যে চিরকালই একটু রাগী ও অভিমানী ছিলেন তা ত' তোমারও অজানা নাই। নিজে আনাটা তিনি অপমান ব'লেই মনে ক'র্‌তেন। তবু আমরাই কি তাঁকে কম ব'লেছি! মা ব'লতেন, আমি ব'ল্‌তুম—কিন্তু আত্ম-মর্য্যাদাটা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এই বুক ভাঙ্গা ব্যথা নিয়ে তিনি কতই না সহ্য ক'রে গেছেন। তা তুমি গিয়ে নিয়ে এস তাদের এখন। অন্ততঃ সুরেন যাতে মাঝে মাঝে আসে তার বন্দোবস্তটা ত আগে কর।"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া আহার সমাপ্তির পর ব্রজবাবু উঠিয়া পড়িলেন

তারপর দুই তিন মাসের মধ্যেও কিছুই হইল না দেখিয়া সারদাসুন্দরী ভাবিল এরকমভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার কোন অবসর আর স্বামীকে দিলে তার চলিবে না, তাই একদিন অন্য কথা পাড়িয়া বলিল— "চারু ত দেখতে দেখতে বড়টি হ'য়ে উঠল, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি? একটা বন্দোবস্ত ত ক'র্‌তে হবে ওর জন্যে!"

ব্রজবাবু একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এইবার বছর যেতে না যেতেই চারু বড়টি হ'য়ে উঠল!"

"তোমার কিযে হ'য়েছে আজকাল তা কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। স্নেহের চোখে চৌদ্দকে বার-বছরের দেখ্‌লে সমাজ ছেড়ে কথা কইবে ব'লতে পার? কথায় বলে 'লাখ কথায় বিয়ে', তা এখন থেকে না দেখলে শেষে তাড়াতাড়ি যাহোক একটা ক'র্‌লে কিন্তু চ'লবে না, তা ব'লে রাখছি।"

"যাও, তোমার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠবার যদি কারো যো থাকে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা সে হবেখন। চারুর বর অন্তর্য্যামীই ঠিক ক'রে রেখেছেন।" কথা কয়টার পর স্বামীকে নীরব দেখিয়া সারদাসুন্দরী বলিল "দেখেছ, কেমন একখান আসন বুনেছে ও। চারু—ও চারু তোমার সেই আসনখানা নিয়ে এসত' মা একবার।"

চারু তখন বাগানে ছিল; ঝি গিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"দিদিমণি মা ডাকছেন তোমাকে; সেই আসনখানা নিয়ে এস, বাবু দেখবেন।"

চারু আসনখানা লইয়া সারদাসুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইল, ব্রজবাবু তাহা দেখিয়া বলিলেন—"বাঃ বেশ হয়েছে ত'; কে তোমাকে বুনতে শিখিয়েছে মা? বাজারের আসনও ত অনেক সময় এমন হয় না!"

চারুর গণ্ডে কে যেন একটি লাল রেখা টানিয়া দিয়া গেল—সে বলিল—"কাকীমা শিখিয়েছেন।"

সারদাসুন্দরী নিজের গুণকীর্ত্তনটা সহ্য করিতে না পারিয়াই বোধ হয় কহিল—"বা রে পাগ্‌লি, আমি আবার তোকে কখন শেখাতে গেলাম। একদিন মাত্র ত' একটু দেখিয়ে দিয়েছিলাম। ও নিজেই এখানা তৈয়ের ক'রেছে।"

নিজে বুনতে শেখাটা যেন একটা মস্ত বড় অপরাধ এমনিভাবে চারু বলিল—"না কাকাবাবু, কাকীমা দেখিয়ে না দিলে' পারতাম বুঝি!"

"আচ্ছা, যা যা এখন" বলিয়া সারদাসুন্দরী স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; চারু চলিয়া গেলে ব্রজবাবু বলিলেন—"সবই ত তোমার জানা আছে সারদা, ও পাড়ার ভুবন মৃত্যুশয্যায় যখন চারুকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে যায় তখন ও তিন বছরের। কিন্তু তোমার আদর যত্ন না পেলে, এমনটি হয়ত ও হোত না।"

আচ্ছা বেশ হয়েছে; তোমার সঙ্গে তা নিয়ে ঝগড়া বাধাতে আমি চাই না।"

এই রকম আরো দু'এক কথার পর দুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। সারদাসুন্দরী ভাবিতেছে কেমন করিয়া পাড়িলে কথাটা বেশ ভাল রকম হইবে। ব্রজবাবু বুঝিলেন যাহা তাঁহার নিকট মর্ম্মপীড়াদায়ক তাহাই হয়ত এখন উঠিবে তাই তিনি একেবারে দাঁড়াইয়া বলিলেন "যাই দেখিগে ও পাড়ার চক্কোত্তিমশায়ের একবার আসার কথা ছিল।"

(৩)

গ্রীষ্মাবকাশে সুরেন বাড়ী আসিয়াছে। কিন্তু প্রবাস-জনিত কষ্টের পর "আপন কুটীর-বাসী" হইয়াও ত সে কৈ সুখী হইতে পারিল না। বিশ্বজোড়া একটা ভাবনার কোনই কূল কিনারা করিয়া উঠা তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। কুড়ি একুশ বছর বয়স হইতে চলিল তাহার; আজ পর্য্যন্ত সে পিতাকে দেখিল না, এ দুঃখ, এ ব্যথা কি তার আর রাখিবার স্থান আছে? একদিন খাইতে বসিয়া সুরেন বলিল—"মা, আমার ইচ্ছা হয় তোমাকে নিয়ে একবার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, কেন তিনি আমাদের ত্যাগ ক'রেছেন।

নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নি ইন্ধনসহযোগে আজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রশান্ত সাগরে ঢেউ খেলিলে যে তাহা কত বড় অশান্ত হওয়া সম্ভব সুরেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। নিজেকে সংযত করিয়া সুষমা বলিল—"বাবা তিনি ত' ত্যাগ করেন নাই। তাঁর কি দোষ? বাপের অবাধ্য হ'তে তিনি কখনো জানতেন না। সব দোষ আমাদের অদৃষ্টের।"

"তিনি যদি ত্যাগই করেন নাই তবে আমরা গেলে নিশ্চয়ই তিনি ফেল্‌তে পারবেন না।" কথাটা শুনিয়া মাতাকে একটু চিন্তিত দেখিয়া সুরেন পুনরায় বলিল—"তুমি কি ভাবছ মা? সঙ্কোচবোধ কর্চ্ছ যেতে? কিন্তু নিজের বাড়ী যেতে আবার সঙ্কোচ কিসের, বিশেষতঃ অন্যায় যখন আমরা কিছুই করি নাই।"

"না বাবা, সঙ্কোচ অসঙ্কোচের কথা এতে কিছুই নাই। তবে একটা কথা ভাবছি—সেখানে তোমার আর এক মা আছেন।"

"কেন মা, শুনেছি তিনি নিঃসন্তান। আমি ত' তাঁরও ছেলে, তবে কেন না তিনি আমাকে ভালবাসবেন!"

"সব মা-ই কি সমান রে পাগল! রাম বনবাসে গিয়েছিল কেন? তাঁর হ'তে তোর যদি কোন অমঙ্গল ঘটে সুরেন, তা হ'লে আমার কি হবে বাবা! তুই আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক। দুখিনী, আমি আমার দুঃখত' তুই ঘুচাবি, পারবি ত?" মায়ের দুঃখ? সে কি এমনি অপদার্থ যে—এ দেহখানা যাঁর রক্ত মাংসে তৈরি·· যাঁর ঋণ জন্মজন্মান্তর, যুগ যুগান্তরে শোধ করাও মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সেই সাধনার দেবী, দুঃখিনী তার জননী...তাঁকে জীবনে এতটুকু সুখী করিতেও কি সে অক্ষম? এমন অস্তিত্বে তবে তার প্রয়োজন?

একটা অব্যক্ত বেদনা আসিয়া তাহার বুকের ভিতরটা কেমন তোলপাড় করিয়া দিয়া গেল। অতি কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া সুরেন বলিল..."মা, মা, বল কি করলে তুমি সুখী হও। তোমার সুখ শান্তির জন্য সব সইতে পারি মা।"

পুত্রের কথায় মাতৃহৃদয়ে আনন্দের একটা উৎস ছুটিয়া গেল...সুষমা বলিল "তুই চিরজিবী হয়ে থাক বাবা, তা হ'লেই আমার সব দুঃখ কষ্ট ঘুচবে।" মায়ের আশীর্ব্বাদ পাইয়া সুরেন বলিল..."মা, না হয় আমিই গিয়ে একবার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। যাব মা?"

মায়ের অনুমতি পাইয়া সুরেন হৃষ্টচিত্তে দুধের বাটিটা কোলের কাছে টানিয়া লইল।

* * * *

বোসেদের বাগানের সুমুখ দিয়ে যে রাস্তাটা মুখুয্যে মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিয়াছে সেই নির্জ্জন পথে চিন্তাকুল

একটি পথিক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল! এ গ্রামে নবাগত হইলেও পথিক আমাদের পরিচিত সুরেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। অরুণদেব পশ্চিমাকাশে তাঁহার সোনালী রঙের কয়েকটি রশ্মি উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত করিয়া ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছেন। আলোক ও আঁধারের সে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ। বিহগকণ্ঠ মুখরিত নির্জ্জন সেই গ্রাম্যপথে কোনও লোকের দর্শনাশায় সুরেন যেন উন্মুখ হইয়া চলিয়াছে। এমন সময় পার্শ্বস্থ বাগানে পুষ্প-চয়ন নিরতা একটি বালিকাকে একটু সঙ্কুচিত ভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল... "এখানে ব্রজেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী কোন রাস্তায় যাব ব'লতে পার?

বালিকা সহজভাবে "এ বাড়ীই তাঁর" বলিয়া আবার তার ফুলতোলায় মনোনিবেশ করিল।

বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। কালো মেঘের মত একখানা ভাবনা লইয়া সুরেন তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহারই ত বাড়ী এ, অথচ আপনার বলিবার অধিকার জীবনে সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও পাইয়াছে কি?

বৃদ্ধ সরকার মহাশয় তাহার কোণের ঘরটিতে বসিয়া ধূমপানে নিরত হইবে এমন সময় কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল..."আসুন, উপরে এসে বসুন।" সুরেন বৈঠকখানায় গিয়া উঠিয়া বসিতে বৃদ্ধ পুনরায় বলিল..."মহাশয়?"—"আমি ব্রাহ্মণ"।

"প্রণাম হই" বলিয়া সরকার মহাশয় সাজানো ক'ল্কেটা একটি ব্রাহ্মণের হুঁকার উপর বসাইয়া আনিতেই সুরেন বলিল..."থাক্ থাক্ আপনার কষ্ট ক'রতে হবে না আমি তামাক খাই না।" বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল "মহাশয়ের কি উদ্দেশ্যে আসা হ'য়েছে?"

"এই কি ব্রজেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী? "আজ্ঞে হাঁ" "আমি মতিগ্রাম থেকে আস্‌ছি, আপনাদের বাবুর সঙ্গে একবারটি দেখা ক'রতে। আমার নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।" সুরেন কথা কয়টা বলিয়াই বৃদ্ধের সংকিত অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। সে জানিত না, মাত্র মতিগ্রামের নামটাই তার পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেমন অদৃষ্ট লইয়া জন্মিয়াছে সে, তাহাতে নিজের বাড়ীতে এমন ভাবে নিজে উপযাচক হইয়া পরিচিত হওয়াতে দুঃখ করিলে ত' তার চলিবে না। মৌনসাঁঝের সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া সুরেন বলিল..."আপনি..."

এই "আপনি" কথাটা অকস্মাৎ সরকার মহাশয়কে সম্ভবত একটা স্বপ্নরাজ্য হইতে বাস্তবজীবনের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া দিল। অতীতের স্মৃতিখানা তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সুরেনকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই সে বলিল..."আমি তোমাদেরই পুরোনো ভৃত্য রমানাথ। সে আজ কতদিনের কথা দাদাবাবু; যখন..." আর বুঝি বৃদ্ধ কথা কহিতে পারে না। অশ্রুতে তাহার চোখ ভরিয়া গিয়াছে। সেই বিদায়ের দিনটি তাহার জলভরা চোখের সুমুখে ছায়া-চিত্রের মতই চঞ্চল হইয়া নাচিতে লাগিল। তাহার এই দাদাবাবু যখন সেই ছোট্ট দাদাটি ছিল সেইত তখন তাহাকে মতিগ্রামে গিয়া রাখিয়া আইসে। আহা! বিদায় কালে শিশুর মাতার বেদনাক্লিষ্ট মুখখানি মনে ধরিয়া ব্যথায় বৃদ্ধের জীর্ণ হৃদয়টিকে শতধা করিয়া দিয়া গিয়াছে! কত বড় শক্ত স্নেহের ডোরে যে বৃদ্ধ আট্‌কা পড়িয়াছে সুরেন ত তাহা সবই বুঝিল! চক্ষু মুছিতে মুছিতে রমানাথ বলিল "এস দাদা বাড়ীর মধ্যে চল।"

এমন সময় চারু "রমাদা, কাকাবাবু ডাকছেন" বলিয়া একেবারে বৈঠকখানায় উঠিতেই একটু যেন অবাক হইয়া দাঁড়াইল। অপরিচিত একটি যুবকের সম্মুখে এমন সঙ্কোচ-বিহীনতার অপরাধে সে মরমে মরিয়া গেল। ইনিই না তাকে ব্রজবাবুর বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? কে ইনি? চারুর অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই রমানাথ বলিল..'যাও দিদি...বলগে যাচ্ছি।' চারু চলিয়া গেল, কিন্তু তাহারই পথের পানে সুরেনকে বিস্ময় বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল..."চল দাদা, বাড়ীর মধ্যে এস।"

এমন এক মুহূর্ত্তে আপন করিয়া লওয়া এ বৃদ্ধটিকে যে সুরেন তাকে আপনার অতি আপনার বলিয়া চিনিল। সে বলিল—"তোমার ঋণ রমাদা, আমরা জীবনেও শোধ ক'রতে পারব কি না জানি না। মার কাছে শুনেছি তুমি আমাদের কত আপনার।"

"দাদা, সে ঋণের দাবীত' এ বৃদ্ধ তোমার কাছে ক'রতে যায় নাই।

তবে তুমি এসব কথা কি ব'লছ। আর আপনার কথা যদি ব'লেছ—এ বুড়োর তোমরা ছাড়া আর কে আছে ভাই যাকে সে আপনার ব'লতে পারে। কিন্তু সে কথা যাক্, চল এখন বাড়ী যাই। সুরেন একটু দ্বিধার সহিত কহিল—"কিন্তু রমাদা—" "এতে আর কিন্তু কি আছে ভাই! তোমার বাড়ী তুমি ভিতরে যাবে এতে ত' আর 'কিন্তু'র কিছুই নাই। চল বলিয়া বৃদ্ধ গমনোদ্যত হইল। এ যেন সুরেনের পক্ষে এক অপরিচিত পান্থশালা; থাকিবার স্থানও হেথায় সে পাইবে কি না তাহাও ত তার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহই জানে না!

(৫)

"মা, তুমি এমন মা আমার।" বলিয়া সুরেন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল। আজ সারদা সুন্দরীর মাতৃজীবনে প্রথম অরুণোদয় হৃদয় মরুতে আজ যেন খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। সেখানে আর কত ফুল ফুটিল, মলয় পবন বহিল, কুঞ্জে কুঞ্জে আজ কত শত পাখী মঙ্গল গীতি গাহিয়া গেল তাহা সারদা সুন্দরীই জানে।

চারু—চারু যখন প্রথম আসিয়া তাহাকে কাকীমা বলিয়া ডাকে সেও এক সুখের দিন ছিল বটে। সারাটা মাতৃহৃদয় সেই তো আবরিয়া রাখিয়াছিল। তবে 'মা' যে প্রবহমান আনন্দের, তৃপ্তির স্বর্গীয় একটা উৎস আর "কাকীমা"টি তারই একটি শাখা মাত্র এতো সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই এর আগে! নাইবা সুরেনকে সে পেটে ধরিয়াছে, তা ব'লে সে যে তার দেবতারই রক্ত মাংসে তৈরী তাহা একদিনের তরেও ত' তার ভুল হয় নাই। গর্ব্বে, আনন্দে, তাহার হৃদয়খানা শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল "বাবা আমারই জন্য তোমাদের এ দুর্দ্দশা।"

একটা অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় সুরেনকে একেবারে মূক করিয়া দিয়া গেল। এঁকেই উদ্দেশ্য করিয়া তার মা একদিন বলিয়াছিল—সেখানে তোর আর এক মা আছেন'! কিন্তু দেবীকে সৎমা বলিলে যে অপমান করা হয়! সুরেন বলিল—"ছোট মা, অতি বড় মিত্রও যদি এসে বলে যে এ তোমা হ'তেই হ'য়েছে, তবু যে তোমায় একবার দেখেছে, একবার যে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলেছে, অন্ততঃ যে কখনো তা' বিশ্বাস ক'রবে না।"

"বাবা, যে নিজে ভাল, অতি বড় শত্রুকে পর্য্যন্ত সে মন্দ দেখে না। তোর উপযুক্ত কথাই হ'য়েছে সুরেন।"

কিন্তু এর জবাব সুরেন কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সারদা সুন্দরী বলিল—দেখ্‌, আমার কি ভোলা মন! এতক্ষনে হয় ত খাবার কখন তৈরী হয়ে গিয়েছে। একটু ব'স বাবা, খাবারটা নিয়ে আসি।"

জল খাওয়া শেষ করিয়া সুরেন কহিল "কে তৈয়ের ক'রেছে এ খাবার ছোট মা?" "কেন খাবারটা ভাল হয়নি! বল্লুম আমি ছেলেমানুষ তুই—তুই এ সব পারবি কেন চারু! কিন্তু তা কি ও কিছুতেই শোনে। যা ধর্‌বে তা করা চাইই ওর। ও চারু, চারু দুটো পান সাজতে কখন ব'লেছি তোকে—তা এখনো হ'ল না?"

যেন অনুমতিটুকুর জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল এমনি ভাবে "এই যে কাকীমা" বলিয়া চারু আসিয়া পান রাখিয়া গেল। "কে ব'ল্লে মা খারাপ হ'য়েছে। বেশ ত হয়েছে।" বলিতে বলিতে ডিবা হইতে সুরেন দুইটি পান তুলিয়া লইল। কথা কয়টায় তৃপ্তির একটা উজ্জ্বল আলোক সারদা সুন্দরীর মুখখানাকে একেবারে উদ্ভাসিত

করিয়া দিয়া গেল। অন্য কথা পাড়িয়া সে বলিল "সুরেন, দিদিকে নিয়ে কবে এখানে আসবি তা হ'লে ?"

"তোমরা যখন অনুমতি ক'রবে তখনি আসব।"

"এর মধ্যে আর অনুমতির কি দেখ্‌লিরে সুরেন, যে একথা ব'লছিস্ ? তাঁর নিজের বাড়ীতে তিনি আসবেন তা'তে আবার মতামতের কি আছে!" "আচ্ছা আজ তাহ'লে যাই মা ?"—বলিয়া সুরেন গড় হইয়া প্রণাম করিতেই নীরদা সুন্দরী বলিল—"বেশ কথা বলছিস্ ত'। আজই যাবি কিরে ?"

ঠিক সেই সময় ব্রজবাবু বৈঠকখানায় নীরব নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। আজ যেন আনন্দের একটা মহাসমুদ্রে পড়িয়া কোনই কূলকিনারা পাইতেছেন না। ব্যর্থ দিনটা যে তার আজ এমন ভাবে সার্থক হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত! যে কালো মেঘখানা মাঝে মাঝে আঁধার হৃদয়টীকে আঁধারতর কালিমায় ঢাকিয়া দিয়া যাইত হয়ত' বা সময় সময় ঝড়ও বহাইত, কোন্ যাদুকর আসিয়া আজ তাহা সরাইয়া দিয়া গেল! পুত্রের উপস্থিত তাঁহার অতীত জীবনটাকে একেবারে বন্যার জলের মত হু হু করিয়া কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল

(৬

শ্রীচরণেষু—

সুরেন দা, কি অপরাধ ক'রেছি আমি, এবার সেই বাড়ী থেকে এসে অবধি একদিনও আমার সঙ্গে আর দেখা ক'রলে না। বড় কাকীমার চিঠিতে জান্‌লাম তুমি ভাল আছ। তিনি ত' একেবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছেন,—লিখেছেন, "তোদের ভিতর আবার এ কি হ'ল চারু! সুরেন কি তোর সঙ্গে দেখা করে না যে আমাদের কাছে তার খবরের জন্য লিখিস্ ?" আচ্ছা বল ত' এমন ভাবে লজ্জা দিয়ে আমাকে তুমি কি খুব সুখী হও! না হয় একটা অন্যায় করেছি তা ব'লে কি তার মার্জ্জনা নাই! তোমরা পুরুষ মানুষ—আত্মীয় স্বজনের খবরাখবর না নিয়েও সারা জীবন তোমরা বিদেশে কাটিয়ে দিতে পার কিন্তু ভগবান আমাদের এখনোত' ততটা নির্ম্মম হ'তে শেখান নাই!

তোমার আগ্রহ দেখে কাকাবাবু, বড় ও ছোট কাকীমা সকলে আমায় স্কুলে পড়ার জন্য মত দিয়েছেন। কিন্তু কতবার ত' বলেছি তোমাদের এমন নির্লজ্জ মেয়েদের সঙ্গে এক মুহূর্ত্তও থাকতে আমার আর ইচ্ছা যাচ্ছে না। কিন্তু যাক্ সে কথা, চিঠি পেয়েই যদি তুমি নিশ্চয়ই না আস তবে জেনো আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিগ্‌গিরই কাকাবাবুকে আসতে লিখবো আর এবার একজামিন আমি কিছুতেই দেব না।

ইতি—তোমার স্নেহের বোন চারু।

পুঃ—কাল রাত্তিরে আমার জ্বর হ'য়েছে জানবে।

ইতি—তোমার—ইত্যাদি।

সকাল বেলা মড়ার হাড়গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সুরেনের হাতে দুইখানা চিঠি দিয়া গেল। তাহার ছোট মা লিখেছে—"বাবা সুরেন, চারুর চিঠির ভাবে, জানলাম, সম্প্রতি তুমি তার সঙ্গে বিশেষ দেখাশুনা কর নাই। তোমার কোন অসুখ করে নাই ত' ? বড় চিন্তিত আছি। চিঠি পাওয়া মাত্র জবাব দিও।"

চারুর চিঠিখানা আগাগোড়া সে একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল। অতি বড় অপরাধীরও এ রকম একখানা চিঠি পাইলে সুরেন বোধ হয় স্থির থাকিতে পারিত না। তা ছাড়া অপরাধই বা চারু এমন বেশী কি করিয়াছে। অন্যায়ের মধ্যে বলিয়াছিল এবার সে কিছুতেই কলিকাতা যাইবে না-হ'লই বা তার একজামিনের বছর—তার সে প'ড়বে না সুরেন রাগিয়া বলিয়াছিল—"তুই বড় জ্যেঠা হ'য়েছিস্ চারু। সকলে ব'লছে যেতে তা-না তোর কথাই উপরে থাকবে ?" চারুও কোন অংশে কম যায় না—সে বলিল "সকলে আবার কে বলছে ? এক ত তুমিই আমার পিছনে লেগে জ্বালাচ্ছ। বড় দুঃখেই সুরেন ব'লেছিল—"চারু, তোর খুসী তুই পড়বি না। আমিই তোকে জ্বালাচ্ছি।

এই তিন বার ধ'রে ঠিক যাওয়ার সময়টিতে তুই এমনি ক'রে আসছিস্ যেন আমি তোর অতি বড় শত্রু। কিন্তু চারু আজ আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি—আর যদি কখনো তোকে জালাতন করিত—" শেষ করিবার আগেই তাড়াতাড়ি তাহার আঁচলখানা দিয়ে সুরেনের কথাটা চাপা দিয়া চারু হাসিতে লাগিল। কিন্তু চারু তাহাকে শত্রু মনে করে—এ কথাটা সুরেন যে মনেও স্থান দিতে পারিয়াছে এইটাই তার সব চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হইয়াছিল। কে জানে কখন তার ভাসাভাসা চোখ দুটি সজল হ'য়ে উঠেছিল—শরতের ভরা জ্যোৎস্নায় এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন।

আজ সুরেনের সেই দিনের ঘটনাটি মনে পড়িল—তার সঙ্গে মনে পড়িল, সেই জলে ভরা আঁখি দুটি। সত্যই কি চারু তাহাকে পর ভাবিয়া এমন ব্যবহার করে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়া তো সঠিক কোন জবাব পাইল না। কিন্তু এই যে চারুর জ্বর, এর জন্য শুধু সেইত দায়ী। প্রাণটা তাহার একটা অজানা আশঙ্কায় একেবারে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিবার শক্তি বুঝি তার লোপ পাইয়াছে! তাড়াতাড়ি একটা পাঞ্জাবী কাঁধে ফেলিয়া চটিজোড়াটা পায়ে দিয়াই সুরেন বাহির হইয়া পড়িল। মেসে আসিয়া দেখে ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। বামুন ঠাকুর অনুগ্রহ করিয়া খাবারটা একখানা থালা চাপা দিয়া না রাখিয়া গেলে হয়ত' সে দিন তাহার খাওয়াই হইত না।

সুরেন ৫টার সময় ডাওসিসান কলেজ হোষ্টেলে চারুর ঘরে গিয়ে দেখিল সে বিছানায় শুয়ে আছে। হৃদয়টা তার একটা হাতুড়ীর ঘায়ে যেন চূর্ণ হইয়া গেল। অপরাধীর মত সে জিজ্ঞাসা করিল—"চারু, এখন কেমন আছ?"

"আমি ভাল হ'য়ে গেছি" বলিয়া চারু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া সুরেনকে বিস্ময়ে নির্ব্বাক দেখিয়া বলিল—"একি সুরেন দা একেবারে হা-ক'রে ব'সে রইলে যে!"

"এ সব কী চালাকী হ'চ্ছে চারু। মিছে কথাটা লিখতে একটু লজ্জাও ক'রল না।" কথা কয়টা চারুর মুখখানাকে একেবারে সাদা ফেঁকাসে ক'রে দিয়ে গেল। নিজেকে একটু সামলাইয়া সে বলিল—"কিন্তু এবার তুমি একবারও আমার সঙ্গে দেখা করিনি কেন?"

"আমার খুসী।"

"খুসী তোমার!"

"হ্যাঁ, তা নয় ত কি? তুই তোর যা খুসী ক'রতে পারিস্—আর আমারই বুঝি একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাক্‌তে নেই।"

"কিন্তু সুরেন দা, সে জন্য কি তুমি কম শাস্তিটাই দিয়েছ আমাকে! সেই দিন থেকে আসবার আগে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে একটা কথা পর্য্যন্ত বলনি। সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে ব'সে কতবার ভেবেছি—এখনি হয়ত' দাদা এসে বলবে—'চল চারু গাড়ী এসেছে।' কিন্তু আমি তোমাদের পর তাই তুমি আমার সামান্য একটা কথায় এমন ব্যবহার ক'রেও থাকতে পারলে! তারপর ছোট কাকীমার সুপারিসে আমাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ। এসে একবারটি দেখা পর্য্যন্ত ক'রলে না। মনে ক'রলুম ক্ষমা চেয়ে পাঠালে হয়ত' আসবে। কিন্তু তবু তোমার রাগ প'ড়ল না।" "মিনতি বেদনা আঁকা" কণ্ঠস্বর ক্রমেই চারুর ভার হইয়া আসিতেছিল। এতগুলি কথা কহিতে চারুর যে বেদনা লাগিল, তাহা সুধু বুঝি সে নিজেই জানে। এমন মুখরা ত' চারু জীবনেও হয় নাই। সে কাঁদিয়া ফেলিল। হৃদয়ের অর্দ্ধেক শোণিত শোষণ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বহিয়া গেলে সুরেন বলিল—"চারু, এত মুখরা এত দুষ্ট হ'য়েছিস্ তুই!"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে চারু কহিল—"দুষ্ট আবার কি? এ রকম না ক'রলে আসতে তুমি?"

"আর এ রকম ক'রলেই যে আমি আসবো তাই বা তোকে কে বল্লে?"

"বাঃ, বেশ কথা ব'লছ ত'। এও আবার কারুকে ব'লে দিতে হবে, তবে আমি জানব!"

"সে যাক কিন্তু দেখত' চারু, কতগুলি ক্ষতি ক'রলি আজ তুই। আমি একটা বাসা ভাড়া ক'রে এসেছি;

মেসের চাকটা একটা ঝি আর দরোয়ানে বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত ক'রে রাখবে। এগুলো ত' সব দণ্ডই হবে!"

এক ঝলক রক্ত অসিয়া চারুর সুন্দর মুখখানাকে একেবারে রাঙাইয়া দিয়া গেল। খোলা জানলাটার দিকে তাকাইয়া বলিল—"সুরেনদা, নটার আগে আর আমার চিঠি কখনই পাওনি; তুমি কিন্তু এত সব ক'রলে কখন? কলেজত' যাওইনি, খাওয়াটাও হয় ত' সময় মত হয় নাই!"

কথা কয়টা শুনিয়া সুরেনের একটু রাগই হইল, সে বলিল—"তোদের বুদ্ধি কিন্তু বেশ চারু যাহোক্! তোর এদিকে অসুখ ক'রেছে, আর আমার সময় মত খাওয়াটাও চাই, আর কলেজও যেতে হবে আমাকে! তোরা পারিস এ রকম নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে।"

"বাপরে! রাগ যে এখনো পড়েনি দেখছি! যাও এখন একখানা গাড়ী আনতে একটা বেয়ারাকে ব'লে এস। ঘরে ব'সে ব'সে আর ভাল লাগে না।"

একজামিনের চাপ এত বেশী প'ড়েছে যে সুরেনের একমুহূর্ত্তও ফুরসৎ পাইয়া উঠিবার যো নাই। এবার তার final; পাশ এবার তাকে যে রকম করিয়া হউক করিতেই হইবে। তাই সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। মেসের আর আর ছেলেদের প্রায় সকলেরই জানা ছিল—সুরেনই এবার প্রথম হবে। কথাটা শুনিলে কিন্তু সে হাসিয়া বলিত 'ভাই পাশ ক'র্‌তে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

তাহার সমপাঠী বিনয় আসিয়া একদিন বলিল - ওরে গাধা, শেষটায় কি তুই পাগল হবি!" "কি যে বলিস্ বিনয়, একটু প'ড়লেই যদি লোক পাগল হ'ত, তা হ'লে পৃথিবীটা এতদিনে একটা মস্ত বহরমপুর হ'য়ে দাঁড়াত।" বিনয় বলিল এই বুঝি তোর একটু পড়া। কিন্তু ভাল কথা মনে হ'ল—হ্যাঁরে সুরেন তোর বোনের Roll No.টা না কত? Matriculationএর Female candidate-দের marks শুনলাম দাদা Tabulate ক'চ্ছেন।" "Marks Tabulated হচ্ছে? তুই যদি ভাই আমার একটু উপকার করিস্। চারুর Roll Noটা দিয়ে দিচ্ছি তোকে, দেখে তুই একেবারে একটা Telegram ক'রে দিয়ে আসবি"। "ফেল হ'লেও!" "ফেল চারু নিশ্চয়ই হবে না।" "তবে আর দেখ্‌বার দরকার কি?" "তবু to be doubly sure." বিনয় Roll No ও একটা টাকা লইয়া চলিয়া গেলে আবার সুরেন তার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

পরীক্ষার পর বাড়ী যাইতেই সুরেনকে দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া গেল। একি সেই সুরেন! এত রোগা হ'য়ে গিয়েছে সে! গ্রামের ডাক্তার আসিয়া পরদিন বলিয়া গেল "বড় সুবিধার কথা নয়। Consumptionএর first stage. এখন একবার change এ না গেলে পরে একটু ভয়ের কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।"

সেই দিনই ব্রজবাবু পুত্রকে ডাকাইয়া বলিলেন—"দেখ সুরেন, পরীক্ষার জন্য শরীরটাকে এমন ভাবে খারাপ ক'রে ফেলতে পারে লোকে, এ ধারণাটা মোটেই আমার ছিল না - কিন্তু যা' হওয়ার হ'য়ে গিয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যেই তোমাকে হাওয়া পরিবর্ত্তন ক'রতে যেতে হবে।"

কথাটা শেষে চারুর কাণেও গেল। সুরেনের সঙ্গে তার ছোট মার যাওয়াই ঠিক হইল। সঙ্গে একজন দরোয়ান, একটি ঝি ও একটি চাকর থাক্‌বে। যাওয়ার দিন সকাল বেলা চারুর সঙ্গে দেখা হইতেই সুরেন বলিল—"একি! মুখখানা ত একেবারে প্রলয়ের মেঘের মত হয়ে রয়েছে দেখ্‌ছি। হ্যাঁরে চারু আমাদের সঙ্গে নাকি যেতে চেয়েছিলি তুই? না লক্ষ্মী বোন্‌টী—পাগলামিটা ছাড়। ভগবান করুন তোর যেন কখনো change এ যেতে না হয়। তার চেয়ে একটা কাজ কর চারু। এর পর পরের ঘরে গেলে ত' আর পারবি না। এইবারে গিয়ে I. A. class টায় join কর্। scholarship টা অমনি অমনি যাবে? বাবাকে ব'লে দিই, তিনি গিয়ে তোকে Hostleএ রেখে আসবেন' এখন।' বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগিল। জলিয়া উঠিয়া চারু বলিল—"তার চেয়েও বলনা কেন সুরেন দা, 'এ বাড়ীতে আর তোর স্থান নেই চারু।' তোর যেখানে

খুসী চ'লে যা।' আমি তোমার চক্ষুর শূল হ'য়েছি। আমাকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ। অতি বড় দিব্বি রইল সুরেন দা যদি তুমি আমার হ'য়ে কাউকে কিছু বল।"

কাছেই একখানা চেয়ার ছিল, তাড়াতাড়ি সুরেন তাহাতে বসিয়া পড়িল। বিদ্যুৎ যেমন একখানা মেঘকে হঠাৎ চিরিয়া দিয়া যায়, চারুর কথায় সুরেনের হৃদয়খানাও তেমনি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। শুষ্ক ওষ্ঠে রক্তের আভা ফিরিয়া আসিলে সে বলিল—'চারু, আমি তোকে তাড়াতে পারলেই বাঁচি। প্রার্থনা কর্ চারু, আর যেন তোর সুরেন দা তোকে বাড়ী থেকে তাড়াতে ফিরে না আসে।" কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চারু দেখিল, গর্ব্বিতার উপযুক্ত শাস্তিই তার সুরেন দা তাকে দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ওরে গর্ব্বিতা, এ তুই কি করিলি এ। সত্যই যদি তোর সুরেনদার কোন মঙ্গলামঙ্গল ঘটে তবে ওরে ও অহঙ্কৃতা সে দুঃখ রাখবার স্থান তোর একটি বই আর দুইটী থাক্‌বে কি?

বিশ্বযোড়া বিষাদাশ্রু একটা মহাসমুদ্র চারুর হৃদয়ের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। দুই চক্ষু চাপিয়া অজ্ঞাতসারে সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল। কিন্তু আর যে মানে না! একটি দুইটি, এমন শত সহস্র মুক্তা ঐ বুঝি তাহার হাতে ফাঁক দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই সময় শুনিতে পাইল তার বড় কাকীমা ডাকিতেছে—"ও চারু, চারু।"

চক্ষু মুছিয়া গিয়া চারু বলিল—"কেন কাকীমা?"

"একি চারু, কাঁদছিলি! ওরে পাগলি, বেড়াতে যাওয়ার এতই সখ! ওরা ফিরে এলে আমরা গিয়ে একবার ঘুরে আসব'খন। আর তুই গেলে তোর কাকাবাবুকে কে দেখবে বল্ দেখি? যা চান ক'রগে যা। বেলা কতখানি হ'য়েছে সে খেয়াল আছে।"

চারু নীরবে কাপড় গামছা লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

(৮)

সুরেনের থাকা না থাকাটার সঙ্গে চারুর দৈনন্দিন সমস্ত কাজের যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতান র'য়েছে তাহা ত' সে এর আগে স্বপ্নেও জানিত না। সুরেন তার কে যে তার অনুপস্থিতি চারুর নাওয়া খাওয়াটা পর্য্যন্ত এমনভাবে বিস্বাদ করিয়া দিয়া যাইবে! এ কয়টা দিন ধরিয়া সে যেন কি এক রকমের হইয়া গিয়াছে। সুষমা চারুর আগুনের মত মেজাজটার কোনই কিনারা করিয়া উঠিতে না পারিয়া একদিন বলিল—চারু মা, এ কয়দিন থেকে তুই আমার সঙ্গে এমন-তর ব্যবহার ক'রছিস্ কেন বল দেখি? সুরেন তার ছোট মার ছেলে; তার বদলে পেয়েছি আমি তোকে। তুই যদি পর ভাবিস আমাকে চারু তাহ'লে ওরা সকলে কি মনে ক'রবে বল ত'।"

চারু বুঝিল কতখানি ব্যথা তার বড়কাকীমার অন্তরে নিহিত রহিয়াছে; আর বুঝিল বলিয়াই সসম্ভ্রমে তাহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল—"এ সব তোমার বড় অন্যায় কথা কাকীমা। কখন আবার আমি তোমাকে পর ভাব্‌তে গেলাম। তুমি যে আমাকে কতখানি ভালবাস তাত সবই আমি জানি। আমায় ক্ষমা কর কাকীমা; বল ক্ষমা ক'রেছ।"

"ওরে পাগলি, তোকে বুঝতে আমি এখনো পারলুম' না" বলিয়া সাদরে চারুর মাথাটি সুষমা তাহার বুকের উপর টানিয়া লইল। স্নেহমন্দাকিনীর একটা কলস্রোত চারু তাহার কাকীমার বুকের ভিতর শুনিতে পাইল।

মাসখানেক পর একদিন সুষমা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত আসিয়া বলিল—"চারু, চারু যাত' শীগ্‌গির ক'রে—তোর কাকাবাবু ত' কোথায় বেরিয়েছেন—শীগ্‌গির দেখে আয় ত' মা, কোত্থেকে নাকি একখানা তার এসেছে।"

"বর্গী এল দেশে" কথাটা যেমন ছেলেদের একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিয়া যায়, Telegramএর কথাটায়ও চারু তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া টলিতে টলিতে বাহির বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার সারাটা অন্তর থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। হে ঠাকুর, হে অন্তর্য্যামী, তার সুরেন দাদাকে কুশলে রেখো দেবতা।

দূর হইতে চারুকে আসিতে দেখিয়া রমানাথ বলিয়া উঠিল "দিদি, শীগ্‌গির দেখবি আয়।"

"কি হ'য়েছে রমাদা?" বলিতে বলিতে চারু আর বেশীদূর যাইতে পারিল না। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া তাহার সমস্ত শরীরখানা অবশ হইয়া পড়িল। প্রকৃতিস্থ হইলে বিস্মিত হইয়া রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল—"চারু, দিদি, একি?"

"কৈ, কি রমাদা? কাল রাত্তিরে মোটেই ঘুম হয়নি তাই রোদের মধ্যে আস্‌তে আস্‌তে শরীরটা কেমন ক'রে উঠেছিল। কিন্তু রমাদা তুমি ডাকছিলে কেন শীগ্‌গির বল?"

"বেশ, ডাকব আবার কেন? সুরেন পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছে। তার এক বন্ধু কে বিনয়বাবু তার ক'রেছেন।"

চারুর মুখখানা রক্তে লাল হইয়া গেল। পরিবর্ত্তনটুকু লক্ষ্য না করিয়াই যেন বৃদ্ধ বলিল—"দিদি চল্, বাড়ীর ভিতর রেখে আসি তোকে। এমনভাবে রোদে থাক্‌লে শরীরটা আরো খারাপ ক'রবে।"

"কেন রমাদা, এরই মধ্যে আমার এমন কি হ'ল যে তোমার গিয়ে আমাকে রেখে আস্‌তে হবে?" বলিয়া হাওয়ার মত চারু বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। রমানাথ মনে মনে বলিল—"না এমন আর কি হ'য়েছে! তবে সব চেয়ে বড় রোগটাই তোমার ঘাড়ে এসে চেপেছে দিদি।"

চারুকে দেখিয়াই সুরেনের মা বলিল—"দিন দিন তুই এ কি হ'তে চললি চারু? কোন কাজেই এখন আর তোর মন লাগে না। কখন তোকে পাঠিয়েছি খবরটা জেনে আসতে, তা তুই এলি এখন! কিসের তার এসেছে শুন্‌লি?"

তাহার নিজের অবস্থাটা মনে হ'তেই চারু বুঝিল মায়ের প্রাণ পুত্রের জন্য কতখানি ব্যস্ত থাক্‌তে পারে। তাই সে নম্রভাবে বলিল—"কাকীমা আমার অন্যায় হ'য়েছে। যেতে যেতে পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল, সেইজন্যই একটু দেরী হ'য়ে গিয়েছে।"

"যেমন চলবার ধরণ তোর। লাগেনি তো?"

"মোটেই না। কিন্তু কি খাওয়াবে আমাকে তাই বল আগে; তা নইলে কিন্তু খবরটা তুমি পাচ্ছ না।"

সুষমার অন্তরের উপর যে মস্ত গুরুভারটা জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল তাহা নামিয়া যাইতেই সে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—"তুইই ত' খাওয়াচ্ছিস্ চারু আমাদের, আমরা আবার তোকে কি খাওয়াব। তবে এটুকু স্বীকার ক'রতে পারি যে, শীগ্‌গিরই তোর বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে একটা নেমন্তন্নের যোগাড় ক'রব। তোমার সেদিন উপোস্, কিন্তু খেতে হবে মা।"

গোলাপীরঙের মত মুখখানা লইয়া চারু বলিল—"যাও কাকীমা, বড় দুষ্টু হ'য়েছ আজ কাল তুমি।"

"আচ্ছা আমি দুষ্টুই হ'য়েছি। কিন্তু এখন বল দেখি তুই, কিসের তার এসেছে?"

"দাদা পরীক্ষায় প্রথম হ'য়েছে।"

মায়ের মুখখানা মেয়ের মতই আনন্দে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি চারুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সুষমা বলিল—"চারু কিছু মনে করিসনে মা।"

"আজকাল তোমার কি হ'য়েছে কাকীমা? তুমি কথা বল্লেই নাকি আমি কেবল কিছু মনে করি।"

"না মা" তুই কি আমাদের তেমন মা। বলিতে বলিতে সুষমা চারুর শিরশ্চুম্বন করিল।

(৯)

সারদাসুন্দরী চিঠি লিখেছে—"দিদি, নানান জায়গা ঘুরে আমরা এখন ৺পুরীধামে আছি; কাল রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী রওনা হইব। সুরেন ভাল আছে।" ইতি সেবিকা তোমার স্নেহের বোন সারদা।

আজ যে সুরেনের বাড়ী আসিবার কথা, চারুর ত তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুল হয় নাই। সুরেনের ঘরখানা নানা রকমে সাজাইয়াও যখন তার কিছুতেই মন উঠিতে ছিল না, তখন দরজার সুমুখে কাহার জুতার শব্দ শুনিয়া চারু চমকিয়া উঠিল। নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার মত এতটুকু স্থানও যদি সেথায় সে পাইত!

কাষ্ঠ পুত্তলির মত চারুকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সুরেন বলিল—"আবার তোকে জ্বালাতে বাড়ী আস্‌তে

হ'ল চারু। কিন্তু কি ক'র্ব, ভগবান না নিলে সত্য সত্যই ত' আর আত্মহত্যা ক'র্তে পারি না!"

কে যেন চারুর কানের কাছে আসিয়া একটা বিকট অট্টহাসি হাসিয়া গেল। বিদায়ের দিনের সকাল বেলাটি চার নিমেষের মধ্যে হৃদয়কোণে জাগিয়া উঠিল; কিন্তু এতদিন পরও আজ যে তার সুরেনদা আসিয়া এমন ব্যবহার করিতে পারিবে, এত' তার স্বপ্নেরও অগোচর। এই অফুরন্ত দিনগুলি ধরিয়া সে কত সুখের বাসরই না মনে মনে সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

কিন্তু সে আজ কি শুনিল এ! আত্মহত্যা করিলে চারু সুখী হইত। তাও আবার সুরেনের মুখ হইতেই এ কথাটা শুনিতে হইল! একটা অব্যক্ত আশঙ্কায় চারুর সারাটা নারীহৃদয় শিহরিয়া উঠিল। হে অন্তর্যামী, অন্তরের কথা জানিতে তোমার ত' কিছু বাকি নাই! ঘোড়াকে হঠাৎ চাবুক মারিলে সে যেমন অস্থির হইয়া ছুটিয়া পালায়, চারুও পাশ কাটাইয়া তেমনি ব্যস্ততার সহিত ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিকেল বেলা বারান্দায় বসিয়া সারদা সুন্দরী তাহার দিদির নিকট সমস্ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিতেছিল। পাশে চারু বসিয়া আছে। নানা কথার পর সারদা সুন্দরী বলিল—কিন্তু দিদি, গিরিডিতে গিয়ে দুতিন দিন আমার যা ভয় হ'য়েছিল তার আর তোমায় কি ব'লব। হাওয়া পরিবর্ত্তনে গিয়ে কোথায় শরীর ভাল হবে, তা নয়, সুরেন যেন আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়তে লাগলো। যাওয়ার বোধ হয় সাত আট দিন পরই এমন জ্বর হ'ল যে সেই রাত্তিরেই ভুল ব'কতে আরম্ভ ক'রলে। কথার মাথা মুণ্ডু কি কোন মানে আছে? একবার শুনলাম "আচ্ছা চল্লুম ত' আমি, কিন্তু কেমন ক'রে ও ব'য়ে ওকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই আমি বাঁচি।" আবার হয়ত' চোখ মুখ লাল ক'রে ব'লছে "এই প্রতিজ্ঞা করলুম আমি।" কখনো কেঁদে কেঁদে ব'লছে "ওরে আমি তোর মিত্র না হ'লেও শত্রু নই এ তুই ঠিকই জানিস।" হয়ত' কখনো কেঁদেই আকুল, আবার পরক্ষণেই হাসিতে ঘরখানা ভ'রে গিয়েছে। এমন ভয় হ'ল এ সব দেখে যে তক্ষনি আবার ডাক্তার ডাক্তে পাঠালুম। ডাক্তার এসে বল্লে 'শারীরিক পরিশ্রমের পর হয়ত কোন রকম মানসিক কষ্ট হ'য়েছে তাই—এ রকম হ'য়ে থাক্বে। কিন্তু আমি ত সবই জানতাম। কী আর মানসিক কষ্ট থাকবে ওর। তা শুনে ডাক্তার বল্লে' তা না হ'লেও অত্যধিক মস্তিষ্কের পরিচালনায়ও অনেক সময় অমন হ'তে দেখা গিয়েছে, তা ভয়ের কোন কারণ নাই। এ ওষুধটা খেলে কিছু পরেই ভুল বকাটা থেমে যাবে।' সত্যই দিদি, শেষ রাত্তিরে প্রলাপটা ক'মে যেতেই সুরেন ডাক্লে "ছোট মা'।" সমস্ত কথা শুনিয়া সুষমা কহিল "তুই ত' বোন্ একবারও এ সব বিষয় কিছু লিখিসনি?" সারদা সুন্দরী বলিল "তাতে তোমাকে চিন্তিত রাখা বইত নয়, তাই আর লিখিনি" "আর তাই সব চিন্তা ভয় নিজেই মাথা পেতে নিয়েছিলে।" "চারু এ রকম ক'চ্ছে কেন দিদি? ঝি-ও কি শিগ্‌গির একঘটি জল নিয়ে আয় ত'।"

চারুর মুখখানা ততক্ষণে সাদা বরফের মত হইয়া গিয়াছে। রক্ত যে সে মুখে কখনো ছিল তা' তখনকার সে মুখ দেখলে কেউ ব'লতে পারতো না। চারু একটু সুস্থ হইলে সারদা সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল—"এ রকম হয়ে গেলি কেনরে চারু হঠাৎ?" কি জানি কাকীমা, আমার মাথাটা যেন কি রকম ঘুরছিল।

সুষমা বলিল "আর দিন রাত নাওয়া নেই, খাওয়া নেই,—কেবল বই মুখে ক'রে থাকলে হবে না এ রকম? কারুর কথাত তুই শুনবি না। এখন একটু শুয়ে থাক্‌গে যা।"

চারু আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। কিন্তু মাথাটা যে তার কেন হঠাৎ ঘুরিয়া উঠিল সে নিজে ত তাহা খুব ভাল রকমই জান্ত। আর জানত সুধু তার অন্তর্যামী। ছি ছি দিন দিন এ তার কি হইতে চলিল? পদে পদে এমন হইলে কাঁহাতক সে নিজেকে সামলাইয়া চলিবে? তার সুরেন দা তাকে এত ভালবাসে!—গলিয়া চারুর জল হইয়া

যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল। কেমন একটা আবেগ আসিয়া চারুর সবগুলি ইন্দ্রিয় শিথিল করিয়া দিয়া গেল। খোলা জানালাটার ভিতর দিয়ে বাহিরে চেয়ে থেকেও সে জান্‌তে পার্‌লো না, কখন সন্ধ্যার অরুণিমাটুকুকে সরাইয়া দিয়া মস্ত একখানা ঘন কালো মেঘ, তাহার স্থান লইয়াছে।

(১০)

তারপর মাসখানেক বাদে একদিন ঘুম হইতে উঠিয়া চারু যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকালবেলা থেকেই রান্নার একটা মহাধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আজ নাকি চারু ও তার সুরেনদাকে কারা আশীর্ব্বাদ ক'রতে আস্‌বেন এ পক্ষ থেকে রমানাথ গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছে। সারাটা অন্তস্তল মথিত করিয়া একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বালিলে যেমন প্রথমে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, চারুর প্রাণটাও তেমনি ঘুম হইতে উঠিয়া এ সংবাদটার কোন কিনারা করিতে পারিল না। অদূরে তার বড় কাকীমাকে দেখিয়া চারু ডাকিল "কাকীমা।" "কেনরে চারু" বলিয়া সুষমা কাছে আসিতেই সে বলিল "আমি কি ক'রেছি কাকীমা, তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?" চারুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সুষমা বলিল—"ষাট্‌ তাড়িয়ে দিতে যাব কেন চারু তোকে।"

"তবে এ সব কেন?" "ওঃ, এই জন্যে বলছিস্‌ তাড়িয়ে দিচ্ছি তোকে। তুই কি ব'ল্‌তে চাস্‌ চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বি।" "হ্যাঁ কাকীমা, চিরকাল আমি তোমাদের সেবা ক'রেই কাটাব

"যেমন ছেলেমানুষ হ'য়েছিস্‌ তুই। যা, যা, এখন।"

"না না কাকীমা, সত্যি বলছি আমি, বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রোনা তোমরা আমার।"

"চারু।" তাকে কে যেন একটা কশাঘাত করিল চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া সুষমা বলিল "ছিছি, লজ্জাও করে না তোর, এ সব কথা নিয়ে আমাদের সঙ্গে তর্ক ক'রতে। আমি মনে ক'রলুম 'এ আর কিছু সত্যি হ'তে পারে না' কিন্তু তোর ভাব দেখে মিথ্যা বলে মনে করতেও ত সাহস হয় না। দু'পাতা ইংরিজি প'ড়লে কি এমনি নির্লজ্জ হ'তে হয়! তখনই ব'লেছিলাম আমি সুরেনকে 'কাজ নেই মেয়েছেলেদের ইস্কুলে দিয়ে' আজকাল তোদের সাহেবি মেজাজের কাছে এগুতে পারব কেন আমরা!" সুষমা চারুকে একেবারে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ করিয়া দিয়া গেল।

দিদিকে তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া সারদা সুন্দরী ডাকিল "শুনেছ দিদি, আমি ত' অবাক হয়ে গেছি। আজকাল ছেলে মেয়েগুলো সব হ'ল কি বল দেখি?" সুষমার মেজাজটা বড় বিশেষ সুবিধা ছিল না তখন; সে জবাব দিল—"নেঃ একটা কথাও যদি এই গুছিয়ে কইতে পারিস্‌। হবে আবার কি? মাথা আর মুণ্ডু হ'য়েছে ওদের। সব শুনেছি বোন, সব জানি। চারুর কথা বলছিস্‌ ত তুই?" "চারুর কথা! না! কেন চারু আবার কি ক'রেছে?" "সব বলব'খন; তুই কার কথা বলছিলি তবে?" "সুরেনের কথা।" "তার হেঁয়ালি যদি বুঝবার কারুর যো থাকে! দেখ্‌ বোন আর জ্বালাসনে, কি হ'য়েছে, বল্‌।"

"নাগো না, এ মোটেই হেঁয়ালি নয়; খুব একটা সত্যি কথা। তবে শোন সুরেন আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে বলে কি জান? এখন নাকি তার বিয়ের সম্বন্ধটা না ক'রলেই ভাল হ'ত। এই সবে সে পাশ ক'রেছে, পসার টসার এখনো ভালো ক'রে তার কিছুই জমেনি।" সুষমা গম্ভীর ভাবে বলিল—"তাতে তুই কি বল্লি?" আমি বল্লাম তোর রমাদা কোথায় কি মেয়ে দেখে এসেছে তা'ত আমরা কিছুই জানি না। তবে পসারের কথা যা বল্লি—তা পসার তোর বেড়েই বা কি হবে? খাওয়া পরার জন্যে ভাবতে হবে কি? আর বাড়লেই বা পসার, টাকাকড়ি ত' কারুর কাছে থেকে নিবিই না তুই মনে ক'রেছিস্‌ দেখছি" তারপর। উত্তরে সুরেন বল্লে 'টাকা নেব কাদের কাছ থেকে ছোট মা? আর আমি চাইলেই বা এ সব গরীবগুলো যাদের খেতেই যোটে না, তারা সব টাকা দেয় কোত্থেকে বল দেখি?

উল্টে বরং তাদের দিলে লুটি খেয়ে বাঁচতে পারে তারা। কথাটা শুনে দিদি আমার ভারি আনন্দ হ'ল। আমি বল্লাম—তোর উদ্দেশ্য কি খুলেই বল না? টাকা রোজকার না ক'রে তুই বিয়ে করবি না এই ত'? "কি জবাব দিলে তার ও" বলিয়া সুষমা উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সারদা সুন্দরী বলিল—"যা জবাব দিলে ও তার, তা' ওর কাকে খুবই ছোট ব'লে বোধ হতে পারে, আমি কিন্তু তা মোটেই ছোট ব'লে মেনে নিতে পারলুম না। সুরেন বল্লে 'ঠিক তাই'। কি ব'লব দিদি, এত রাগ হ'ল কথাটা শুনে আমার তখন যে কিছুতেই আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না—বল্লাম 'বিয়ে ক'রে কি মেম সাহেবদের মত আলাদা হ'য়ে যাবি নাকিরে সুরেন, যে টাকা রোজকারের কথা তুলছিস্?"

"ও নিশ্চয়ই জবাব দেওয়ায় আর সাহস পায় নি।" "না দিদি, চুপ ক'রে থাকলে বুঝি যতটা সুখী আজ আমি হ'য়েছি, তার সিকিও হতে পার্ত্তাম না। ফিরে আসবার সময় পায়ের ধূলো নিয়ে সুরেন বল্লে—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর ছোট মা। বিয়ের কথা নিয়ে তর্ক তোমাদের সঙ্গে করা আমার উচিত হয়নি আর সে সাহস ও আমি রাখি না--তবে না চাইতেই তোমার কাছ থেকে ক্ষমা পাব ব'লেই হয়ত ব'লেছিলাম সম্বন্ধটা এখন না ক'রলেই হয়ত ভাল হ'ত ছোট মা।' কথা কয়টা দিদি, গর্ব্বে আমার বুকখানা উঁচু ক'রে দিয়ে গেল। ধন্য মা আমরা যারা এমন ছেলে পেয়েছি।" কথাগুলি সমস্ত শুনিয়া সুষমার স্বতঃই মনে উঠিতেছিল নিজেই কি সে এতটা ভাল সুরেনকে বাসিতে পারিত।

ছোট হইলেও সম্ভ্রমে তাহার সারাটা প্রাণ সারদা-সুন্দরীর স্বচ্ছ সরল হৃদটিকে অনেক দিন আগেইত বরণ করিয়া লইয়াছিল সে। তাই আজ এই কথাগুলি সুষমাকে নূতন করিয়া বিস্মিত করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল—"সারদা তোর এ কথা কয়টা শুনে একটা আশঙ্কার ছায়া যেন আমার মনটার চা'রধারে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা দুজনেই কেন এরকম কথা ব'লছে।" "কেন চারুও কিছু কিছু ব'লেছে নাকি!" হ্যাঁ ঐ রকমেরই কতকগুলি কথা; চারু যেন বিয়ের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তার পর সুরেন হাওয়া পরিবর্ত্তনে যাওয়ার পর চারুর হঠাৎ পরিবর্ত্তনটার কোনই কৈফিয়ত আমি এতদিন দিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। কিন্তু আজ যেন স্পষ্ট আবরণটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে এ কথাটাত' সারদা, আমরা একদিনের তরেও ভেবে দেখেনি। তা হ'লে বোধ হয় চারুকে চিরকালের তরে আমাদেরই কাছে রাখাটা বড়বেশী দুরূহ ব্যাপার হ'ত না" "দিদি ডাক্তার যে মানসিক কষ্টের কথা ব'লেছিল তা সে তবে মিথ্যে বলেনি। কিন্তু তখন—?" "মানসিক কষ্ট তখন দাদার মনে আমার খুবই ছিল মা! এ বুড়ো তার একটু খবর রাখে।"

হঠাৎ পিছনের দরজা হইতে রমানাথের কথা শুনিয়া সারদাসুন্দরী বলিল—কে, কাকা? কি জান কাকা তুমি? "সেদিন এ বুড়ো তোমাদের যাওয়ার জন্য জিনিষ পত্র গুছোচ্ছিল, এমন সময় দিদির আমার একটু জোর গলা কাণে এল। বয়সটা একটু বেশী কিনা তাই দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে, ব্যাপারটা দেখবার জন্য কেমন যেন ইচ্ছে হ'ল—দেখলাম দাদা আমার সাদা ছাইয়ের মত মুখখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল। দিদির তখন আমার উগ্র-মূর্ত্তি।" কথা কয়টা শুনিয়া সুষমাকে লক্ষ্য করিয়া সারদা-সুন্দরী বলিল—"তাই দিদি, অভিমান জড়িত প্রলাপের মধ্যে কান্নার সুর!" রমানাথ বলিল—"আর ঠিক সেই জন্যই দিদির আমার বড়মার সঙ্গে এমন ব্যবহার মেজাজটা বিশেষ ভাল ছিল না কিনা তখন!" সারদাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল "কাকা, এসব কথা তুমি আগে বলনি কেন আমাদের কাছে! এখন উপায়?" "এ বুড়ো কি লজ্জা সরমের মাথাটা একেবারেই খেয়েছে মা?" বলিয়া সরকার মহাশয় লাঠিটা খট্ খট্ করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর দুইজনে অনেক পরামর্শের পর যাইয়া ব্রজবাবুর নিকট কথাটা পাড়িতে তিনি জলিয়া উঠিয়া বলিলেন—"একটা জাতকুল নিয়ে কথাবার্ত্তা।" অগত্যা সারদা সুন্দরী কহিল—"দেখ সমস্ত ভেঙ্গে ব'ল্লে হয়ত'

তোমার অমত হবে না।” “আমি কোন কথা শুন্‌তে চাই না” বলিয়াই ব্রজবাবু ঝড়ের মত ঘরের বাহির হইয়া গেল।

বিকেল বেলা রমানাথ আসিয়া খবর দিল—যাঁরা আশীর্ব্বাদ ক'রতে এসেছেন তাঁরা আর বাড়ীর ভিতর আস্‌বেন না। আশীর্ব্বাদ মেয়েদেরই একটা আচার বইত নয়। কাজটা তাদের ছুবোনকেই সেরে নিতে হবে যথারীতি আশীর্ব্বাদ কার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

(১১)

“সুরেন দা অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমার মনে, অনেক অপরাধ তোমার চরণে ক'রেছি। আজ জন্মের মত বিদায় দেবার সময়, ক্ষমাটাও তার সঙ্গে ক'রতে ভুলো না সুরেন দা।” “চারু!” “না, না, এ চারু চা'রু বলবার সময় নয়। বল আমায় মার্জ্জনা করেছ।” “মার্জ্জনা! ক্ষমা! —কিন্তু অন্যায় অথবা অপরাধ ক'রলেই ত' লোকে মার্জ্জনা ক'রে থাকে। তোর ত' ক্ষমা করবার মত কোন অপরাধই খুঁজে পাচ্ছি না চারু!” নিজেকে একটু প্রকৃতস্থ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে যখন চারু উবুর হইয়া সুরেনের পায়ের ধুলা লইল তখন দুই বিন্দু অশ্রুও তার চক্ষু হইতে ঝরিয়া সুরেনের পায়ে অঞ্জলী দিয়া গেল। চমকিয়া সুরেন বলিল—একি! আজকে দিনেও কাঁদছিস্‌ চারু! ভাখ দেখি আমার চোখ দুটো--অতি-বড়-রোদে ফাটা মাঠও বুঝি এত শুষ্ক হয় না।” চারুর বুঝিতে ত' বাকি রহিল না, হৃদয়ের কতখানি নীচে বিষাদের একটা মহাসমুদ্র নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। বুঝি তাহাতে ঢেউ খেলিলে সমগ্র পৃথিবীখানা ভাসিয়া যাইত। অতি ধীরে চারু কহিল--“কথাটা মিথ্যা নয়, আজকের দিনটা আমার হাসি কান্নার বাইরেই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সুরেন দা, যতটা খারাপ ব'লে মনে ক'রতে আমাকে, হয় ত পরে জানতে পারবে ততটা মন্দ আমি ছিলাম না।” “চারু, চারু, এও কি সত্যি বলে মনে ক'রে নিতে হবে?” “সত্যি এ পৃথিবীতে সবই হ'তে পারে সুরেন দা; কিন্তু ভগবান যা তাঁর অভিপ্রায়ের বাইরে ফেলে দেন, অতিবড় সত্যি হ'লেও ত' তাকে মিথ্যা ব'লেই মেনে নিতে হবে।” হৃদপিণ্ডটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেও বুঝি সুরেন এত দুঃখ পাইত না। কিন্তু সমুদ্রে যার শয্যা, শিশিরের সে কি কোন ভয় রাখে! জীবনটা ত' তার দুঃখে কষ্টেই কাটিয়াছে। হৃদয়খানা চিরিয়া সে বলিল—“আশীর্ব্বাদ কচ্ছি চারু, এই মোহের আবরণটা ছিঁড়ে ফেলে যেন, সুখী হ'তে পারিস্‌ তুই।” “ভগবান করুন তোমার আশীর্ব্বাদ, আর—না—না আর কিছু নয় —সুধু ঐ আশীর্ব্বাদটুকু নিয়েই যেন সুখী হ'তে পারি। কিন্তু আমারও ত' একটা প্রার্থনা আছে আজ তোমার কাছে সুরেন দা। হয়ত জীবনে এই প্রথম, এই শেষ। বল রাখবে।” “কি!” “যাই হোক তোমার রাখতেই হবে। আমার বৌদি যে হবে আজ, তাকে ভুলেও তুমি কোন রকমে মনে কষ্ট দিতে পারবে না, এইটুকু মাত্র তোমায় স্বীকার কর্ত্তে হবে। বড় হতভাগী আমি সুরেন দা জীবনে যদি কখনো শুনি যে আবার—যে তুমি সংসার পেতে সুখী হয়েছ তবু হয়ত কতকটা শান্তির রেখা দেখ্‌তে পাব আর এর পর সে ছাড়া তোমার কারুর কথা ভাব্‌বার অধিকার থাকবে না, এটুকুও ভুলো না। “চারু, রাক্ষুসি, এ তুই কি ক'র্‌লি? যা রাখা একেবারে অসম্ভব শেষে সেই অনুরোধের বন্ধনেই ফেলে দিয়ে গেলি আমাকে। কি নিয়ে বাঁচব আমি তাহ'লে চারু! অপরাধী হ'লেও, এতবড় শাস্তি সহ্য ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে কিনা সেটুকুও একবার ভেবে দেখ্‌লি না?” প্রাণটাকে কুলিশ অপেক্ষাও কঠিন করিয়া চারু বলিল—“কিন্তু মনে থাকে যেন সুরেন দা এইটিই ছিল আমার শেষ অনুরোধ।” বলিয়া আবার সুরেনের পায়ের ধূলা লইয়া চলিয়া গেল। চলিয়া গেল সত্য—আনন্দের, সুখের, উৎসাহের পৃথিবীগুলিও ত' নিয়ে গেল তার সঙ্গে—।

বিবাহ বাড়ী। বড় ধুমধাম পড়ে গিয়েছে। যুবকের মত খাটিয়াও আজ রমানাথ তৃপ্তির কোনই সীমা খুঁজিয়া পাইতেছে না। মাঝে মাঝে একটু আড়ালে গিয়া আনন্দের দুই বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া না আসিলে, তার বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছে। কিন্তু এই যে সুখের ভাণ্ডার এটা কি শুধু তারই একটা ইজারামহাল আজ?

সন্ধ্যার পর দলে দলে লোক আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ও পাড়ার নববাবু বলাবলি করিতেছিলেন "এ কি রকম ব্যবস্থা ? বিয়ের সময় ত' হয়ে এল, এখনো বর ক'নের সঙ্গে দেখা নেই ! ব্রজবাবুর যেমন কাম, একটা বুড়োর হাতে কিনা শেষটায় সমস্ত ফেলে দিয়েছেন। আর ছেলের বিয়ে ; তা নিজের বাড়ী না হ'লেই কি চ'লত না ! যত সব খামখেয়ালি।"

ঠিক সেই সময় রমানাথ বাড়ীর মধ্যে গিয়া বলিল— "কৈ বড়মা, দিদিকে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখেছ ত' ?" "কিন্তু কাকা, শুনছি নাকি বর ক'নে কেউই আসেনি এখনো ?" "কে বল্লে তোমাকে ! সব ঠিক, সব ঠিক। কিছু ভাবতে হবে না তোমাদের, এ বুড়োর খবরত তোমরা সবই জান —সে যা ধরবে তা না ক'রে কিছুতেই ছাড়ে না।" "কিন্তু আমি বলি কি কাকা—"। "কিছু বলতে হবে না, কিছু বলতে হবে না তোমার। যাওমা দিদিকে গিয়ে নিয়ে এস এখন।" বলিয়া সুষমা কোন অবসর দেওয়ার পূর্ব্বেই রমানাথ চারুর ঘরে চলিয়া গেল। "আচ্ছা মেয়েলোক গুলোর কি আক্কেল দেখ দেখি। দিদিকে আমার ঘরে একলা ফেলে চ'লে গেছে।" বলিয়া রমানাথ নীরবে একটু হাসিয়া লইল। চারুকে শুয়ে থাকতে দেখে পুনরায় সে বলিল—'একি দিদি, একলাটি শুয়ে আছিস্ যে।" চারু নিরুত্তর। রমানাথ বলিল—"রাগ করেছিস্ দিদি ?" "না" "তবে যে কথা কইছিস্ না ?" "আমার কথা কওয়া না কওয়ায় কার কি এসে যায়।" "তা এসে যায় কিনা এর পরেই টের পাওয়া যাবে। চল দিদি এখন সময় যে হয়ে এল।" ইন্দ্রের বজ্রও বুঝি চারু এর চেয়ে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এটাওত তাহার না পারিলেই চলিবে না। কঙ্কালসার হিন্দু-সমাজের যে শোণিতপান না করিলে ক্ষুধা মিটে না। হিন্দুর বালবিধবা হলেও ত অন্ততঃ একটা চিন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইত। মরিলেও কি সে সুখী হইতে পারিবে ? তার সুরেনদার মনে কষ্ট দিয়া ইন্দ্রাণী হইলেও তার শান্তি কোথায় ! তারপর তার সুরেন যে পৃথিবীতে আছে, সেখানে থাকা কি কম লোভনীয়, কম সৌভাগ্যের কথা হ'ল ? মঙ্গলময়ের করুণা আজ সে যেমন ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার অবসর পাইল তেমন বুঝি আর কেউ কখনো পায় নাই।

রমানাথ চণ্ডিমণ্ডপে লইয়া গিয়া চারুকে ক'নের আসনে বসাইয়া দিল। কিন্তু একি ! হে ঠাকুর যদি সত্য হয়, বুক চিরিয়া রক্ত দিতেও তোমাকে তা'হলে চারু কুণ্ঠিত হইবে না। এমন সময় রমানাথ বলিল—"কেমন দিদি, এইবারে হয়েছে তো দ্যাখ্ দেখি এখন কাকুর কথা কিছু এসে যায় কিনা।" লজ্জায় চারু মুখখানা নীচু করিয়া রহিল বিস্ময় আর আনন্দের দুইটা বন্যা দুইদিক হইতে আসিয়া যেন সুরেনকে কোথায় ভাষাইয়া লইয়া গেল তাহা সে নিজেই টের পাইল না।—কিন্তু এই বিয়ে বাড়িতে আজ সব চেয়ে বেশী সুখী কে ? এমন দিনেও মুখের হাসির সঙ্গে চোখে অশ্রুর ঢেউ খেলিতেছে কার ?

শ্রীঅমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি

তুচ্ছের সম্মান।

ষষ্ঠীতলায় সিঁদুর মাখান জমান পাথর নুড়ি
সেথা গিয়ে কেন করি প্রণিপাত দুর্ব্বল বাহু জুড়ি'
ফুল দল দিয়া পূজি'
কাহারে সেথায় খুঁজি ?
তোমরা বলিবে, 'মিছে করা ঐই আশা
অন্ধ-ভকতি সকল করম-নাশা।
তুচ্ছ জড়ের মাঝে
বিশ্ব-চেতনা রাজে
লীলাময় প্রাণ শিলাময় ছেয়ে আছে
মর্ম্মের কথা সে যে আমাদের, সত্য মোদের কাছে।

যুগলকিশোর পাঁচুঠাকুরের বছর বছর মেলা
মোদের ঘরের লক্ষ্মী-মায়েরা গাছে বাঁধে ইট ঢেলা,
মনের মানসচয়
চির বাঁধা সেথা রয়
তোমরা হাসিবে বলিবে—"বুদ্ধি বটে!"
আমরা বলিব যা'র যা' ভাবনা শেষে ঠিক তাই ঘটে।
অক্ষয় বটে 'তার,'
মূর্ত্ত-কামনা তার
দর্শন পড়ি সেজেছে বুদ্ধিমান
মন দিয়ে ধন পাওয়া যে সহজ নাইক সেটুকু জ্ঞান।

পাষাণ-খণ্ডে সিঁদুর লেপিয়া 'শীতলা মায়ের' নামে
মুচি ও চাঁড়াল ছোঁওনা যা'দের এই যে ফিরিছে গ্রামে,
দেবতার নাম করে'
ভিক্ মাগে ঘরে ঘরে—
তোমরা বলিবে 'ছোটলোক বড় পাজি
ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে করে, কারসাজি'।

———

আমরা ভক্তিভরে
যাহা পাই দিই ধরে'
দীনের দেবতা চিরদিন বরণীয়
বিশ্বমায়ের নিঃস্ব ছেলেটী সবার অধিক প্রিয়।

দেবতার পীঠে দুঃস্থ আর্ত্ত শত শত নর-নারী
'ধর্ণা' ধরিয়া দিবসরাত্রি পড়ে' আছে সারি সারি;
এর কি মূল্য নাই?
তোমরা বলিবে তাই;
আমরা বলিব বুক চিরে ডাকা তা'র ফল ঠিক আছে,
প্রাণের সে ডাক—তাকি হ'তেপারে বিফল তাঁহার কাছে?
পাষাণে পরাণ জাগে
যদি সে মুক্তি মাগে!
এ সব তর্ক যুক্তির কথা নয়—
অন্তর হ'তে যে ধ্বনি উঠিছে সেটা কি মিথ্যা হয়?

সিক্তবসনে হিন্দুনারী যে নিত্য ঘাটের কূলে
ধারাজল ঢালে আনত আননে অশথ বটের মূলে
ছোঁয়াইয়া মাটী শিরে
নিজঘরে যায় ফিরে
তোমরা বলিবে "অন্ধ এ প্রথা তোমাদেরি ভাল সাজে
তুচ্ছ গাছ ও পাথরের পূজা দেখে মরে' যাই লাজে!"
উজাড়িয়া ভরা ঝারি
ঢালে পবিত্র বারি
সে যে রমণীর অপূর্ণ সাধ পূর্ণ কলসে রয়
পুণ্যপরশে তীর্থ-সলিল চিরগৌরবময়!

মাদুলী কবচ দেবতা মানতে তোমাদের হাসি আসে
তোমরা বলিবে "তুচ্ছ এ সব, বিপদ কভু কি নাশে?"
দুর্ব্বল মোরা অতি
তাই হেন মতি গতি,

তোমরা বলিবে "মানুষ নিজের বিপদ ডাকিয়া আনে
সংসার মাঝে ঠিক বুঝে' চলা? কয়জন তাহা জানে?"
হেয় নগণ্য মাঝে
কত কল্যাণ রাজে—
দেবতা ধেয়ায়ে বসে' থাকি মোরা, তাই মনে পাই বল
বিশ্বাসে সদা মিলায় বস্তু তর্কে আছে কি ফল?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

আশা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৩২)

লীলা প্রভাতে উঠিয়াই মহামায়ার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভাই একি ঠিক সংবাদ? ওঁরা কি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

মায়া। ওঁদের এখানকার কাজ যদি শেষ হয়ে থাকে তাহ'লে মিছি মিছি বসে থাকবেন কেন?

লীলা চিন্তা করিয়া বলিল "যাবার আগে আর একবার বিষ্ণুযশার সঙ্গে দেখা হয় না?"

মায়া। গেলেই হয়। তবে সব সময় তিনি বাড়ীতে থাকেন না। ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় যদি যাও ত' দেখা হতে পারে। কিন্তু দেখা করে কি হবে, তাঁর যা বলবার তা বলেছেন এখন সেই অনুসারে কাজ কর।

লীলা। তিনি কাছাকাছি না থাকলে—

মায়া। কাছাকাছিটা তোমার মনের ভ্রম। মানুষের দেহটা যতই কাছে আসুক তার আত্মাকে যদি অন্তরের মধ্যে না নিতে পার তাহ'লে সে দূরেই থেকে যাবে। তিনি যা, তুমি অন্তরে অন্তরে তাই হ'ও তাহ'লে সব দূরত্ব এক নিমিষে দূর হয়ে যাবে।

লীলা। যাবার আগে তাঁর শেষ উপদেশ শুনতে চাই।

মায়া। বেশ তাই শুনতে যেও।

লীলা। তুমিও সঙ্গে চল।

মায়া। এখনও সেই অভয় পদের কাছে যেতে তোমার ভয়!

লীলা। অন্য ভয় নেই মায়া, কেবল ভয় তাঁর প্রচণ্ড শক্তিকে। তাঁকে একা আমি সহ্য করতে পারব না বলে তোমাকে আশ্রয় করতে চাচ্ছি।

মায়া। এখন আর কোন দিকে দেখবার সময় নাই আমায় তিনি যেখানে রেখেছেন, যা করতে বলেছেন তাই করছি, আমার আপনার জনদের আরও আপনার করছি, সবাইকে আপনাভুলে ভালবাসতে চেষ্টা করছি। আর আমার কোন কাব নেই, আর আমার তাঁর কাছে যাবার ত দরকার নেই। তবে যদি তোমার দরকার থাকে তাহ'লে আমায় যেতেই হবে।

তাহাই হইল, দ্বিপ্রহরে লীলা ও মায়া বিষ্ণুযশার বাটীতে উপস্থিত হইল। বিষ্ণুযশা তখনও আইসে নাই

বলিয়া তাহারা লক্ষ্মীর নিকটে গিয়া বসিল। লক্ষ্মী লীলাকে দেখিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "এক-দিন কি ভুলেও এখানে আসতে নেই যখন তোমাদের ছেড়ে যাবার উপক্রম করছি তখন এলে লীলা।"

লীলা। কেন তোমরা যাচ্ছ? আর যদি যাবেই তাহ'লে দেখা দিলেই বা কেন? তোমাদের না দেখাই ভাল ছিল।

লক্ষ্মী। অতখানি ভালবাস আমাদের মত পথিকদের ওপর ফেলে তুমি ভাল কর নি। কিন্তু যাই হ'ক যদি আমাদের একটা কিছু উপকার কর তাহ'লে চিরদিন তোমার কাছে থেকে যাই, তাহ'লে কখনও তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না।

লীলা। কি উপকার, দেখি যদি সাধ্য হয় ত' নিশ্চয় করব।

লক্ষ্মী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া যে প্রস্তাব করিল তাহাতে লীলা ও মায়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "ছি ছি কি বল তার ঠিক নেই; উনি আমার গুরু। ওঁর কাছ থেকে আমি নব জন্ম লাভ করেছি। আমি ওঁকে ওঁর পরম গতি হ'তে টেনে এনে পাঁকে ডুবাতে চেষ্টা করব? কি বলছ তুমি?"

লক্ষ্মী। কিন্তু আমরা যে ওঁকে এই পাঁকের মধ্যেই ধরে রাখতে চাই তা না হলে এই পাঁক হতে পদ্ম জন্মাবে কি করে! ভাই এ সাহায্য তোমার করা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি ওঁকে যে চক্ষে দেখেছ তাতে আর আমি কোন কথা বলতে পারব না। বুঝেছি এ নারায়ণেরই ইচ্ছা, তবে তাই হ'ক।

লক্ষ্মী বালিসে মুখ লুকাইয়া শুইয়া পড়িল। মহামায়া তাহাকে অতি যত্নে তুলিয়া ধরিয়া বলিল "ভাই বিষ্ণু দাদা যা হয়েছেন তা কি তোমরা চাও না?"

লক্ষ্মী তখন তাহাদের আজীবনের চেষ্টা ও আদর্শের কথা বর্ণনা করিয়া বলিল "ভাই আমি আমার সমস্ত জীবন এই একটী কাজে উৎসর্গ করেছি। আমি তাঁর কাছ হ'তে আর কিছুই কখনও চাইনি কেবল চেয়ে-ছিলাম যে আমার দেবোপম শ্বশুরের এক মাত্র আশা তিনি সফল করেছেন। মায়াদিদি, সেকি অপূর্ব্ব ব্যাপার হ'তে পারত, যে দিন আমাদের এই ক্ষুদ্র গৃহে সেই জগৎপাবন স্বয়ং এসে দেখা দিতেন—রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে আমাদের নিমিত্ত মাত্র করে তিনি উদয় হ'তেন! কিন্তু হায়! সব বোধহয় বিফল হ'তে চল্ল। তাই চেষ্টা করছিলাম যদি ওঁকে কোন রকমে গৃহধর্ম্মের মধ্যে আদর্শ-গৃহী করে ধরে রাখতে পারি। কিন্তু এখন বুঝি তা হয় না।

লক্ষ্মীর উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লাবিত বদনমণ্ডলে এই কথা বলিতে বলিতে এমন একটা গভীর দুঃখের আলো ও ছায়া পতিত হইল যে লীলা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "তুমি সে কাজ পারলে না, এই এত রূপ, এই এত শক্তি, এতখানি মহিমা নিয়ে তুমি যখন তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছ তখন আমার মত একগাছা শুষ্কতৃণ তাঁকে বাঁধবে?"

এই সময়ে নিম্নতলে বিষ্ণু আসিয়া ডাকিল "মা"। ভুবনেশ্বরী পূজায় বসিয়াছিলেন, লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল "তোমরা বস আমি আসছি।" সে নীচে নামিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "লীলা ভাই চল তোমায় উনি নীচেই ডাকছেন। বাইরের ঘরে শিবব্রত এসে বসে আছেন।"

লীলা ব্যস্ত হইয়া বলিল "শিবু বাবু? তিনি এখানে কেন? লক্ষ্মী বলিল "তা জানি না, চল।"

তিনজনে নামিয়া গেল। বিষ্ণু গম্ভীর মূর্ত্তিতে তাহাদের তিনজনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া লীলাকে বলিল "তোমাকে দেবতার পদে উৎসর্গ করেছিলাম এখন তোমার নিজের অস্তিত্ব আর নেই। তাই তোমায় আশীর্ব্বাদী ফুলের মত হয়ে শিবব্রতের জীবন পবিত্র করতে হ'বে। তাকে বিবাহ করতে হ'বে।"

লীলা অধোমুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, সে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল "আপনি আমায় যেখানে রাখবেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ। শিবব্রত যদি আমাকেই চান আমিও তাঁকেই অবলম্বন করব।"

শিবব্রত ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতেই বিষ্ণু বলিল "এই আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় দিলাম। একে হৃদয়ের অতি নিকটে রেখে তোমায় সংসারে চলতে হবে। মনে রেখো এ তোমার সম্পত্তি নয়, যথেচ্ছাচারিতার অন্যমনস্কে খেলা করবার বস্তু নয়—এই তোমার মত লোকের পক্ষে ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। এই নারী তোমায় যেন স্বর্গের দিকেই নিয়ে যান এই ভাবেই সংসারে চিরদিন চ'ল। তোমার মত লোকের পক্ষে এই স্নেহময়ী আত্মভোলা নারীই একমাত্র অবলম্বনের বস্তু। দেখো যেন তোমার অপব্যবহারে এই স্বর্গের বস্তু নষ্টের কারণ না হ'য়ে দাঁড়ায়।"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া হস্ত বাড়াইয়া দিল। শিবব্রত কম্পিত হস্তে নত মস্তকে লীলার হস্ত গ্রহণ করিল। মায়া বিষ্ণুযশাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বিষ্ণু করজোড়ে বলিল—

যৎকৃতং যৎ করিষ্যামি তৎসর্ব্বং ন ময়াকৃতং।
ত্বয়া কৃতংতু ফল ভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥

(৩৩)

প্রিয়ব্রত অফিসে বসিয়া কতগুলি চিঠি পড়িতে ছিল এবং সহি করিতেছিল। কয়েকজন কর্ম্মচারী মোটা মোটা খাতা বগলে করিয়া তাহার আদেশের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় শ্যামাচরণ সেই কক্ষে কোন এক নামজাদা কোম্পানির annual report হস্তে লইয়া প্রবেশ করিল। প্রিয়ব্রত হাসিয়া বলিল "শ্যামা এত দেরী হ'ল যে?"

শ্যামা। এই report টা দেখতে দেখতে দেরী হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনার প্রয়োজন। মূলধন ওয়ালারা যে লাভের সমস্তটাই নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দে লাগাবে তা হ'তে পারে না।

প্রিয়। আলোচনাটা বাড়ীর জন্য রেখে stockটা একবার মিলিয়ে আর দালালরা আমাদের যে দর দিয়েছে তার সঙ্গে রেলী ব্রেহামদের দরটা মিলিয়ে table টা তৈরি করে দাও। গুণেন বাবু, আপনি শ্যামাকে সাহায্য করুন।

শ্যামাচরণ অন্য কক্ষে চলিয়া গেল। প্রিয়ব্রত সমস্ত চিঠিগুলি সহি করিয়া ফেলিয়া দিয়া জনৈক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একখানা খাতা লইয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে ইত্যবসরে আর একজন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল "খাজাঞ্চি মহাশয় জিজ্ঞাসা করছেন যে আজ কি টোলের টাকাটা পাঠাইতে হবে? তিনি চেক ভাঙ্গাতে ব্যাঙ্কে লোক পাঠাচ্ছেন।"

প্রিয়। আমি সকালে খবর পেয়েছি ও টোলে আজ দু'মাস হ'তে একটি ছাত্রও পড়ছে না, অথচ আপনারা দু'মাসেরই বিল করেছেন এখন হ'তে ও সমস্ত কাজ বাড়ী হ'তে হবে। ও সমস্তর ভার শিবব্রত নিয়েছেন। অফিসকে ঠিক অফিস না রাখলে দেখছি চলছে না, সকলেই অন্যায় advantage নিচ্ছে। কর্ম্মচারিটী লজ্জিতমুখে চলিয়া গেল। প্রিয়ব্রত তখনকার মত সমস্ত কার্য্য সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া বলিল "দীনাশ্রমের আরও চারখানা খাট চাই! চারজন নূতন রোগী জুটিয়াছে।" প্রিয়ব্রত একখানা কাগজে কি লিখিয়া দিয়া বলিল "শিবব্রতের কাছে যাও। সে যা হয় করবে। এই পত্রখানা তাকে দিও।" প্রিয়ব্রত শ্যামাচরণের নিকটে গিয়া বলিল "কতদূর হ'ল?"

শ্যামা। এক আধ ঘণ্টার কাজ নয়, তুমি যাও আমি পরে যাচ্ছি।"

প্রিয়। কতটুকু বাকী আছে দেখি?

শ্যামাচণের কার্য্য দেখিয়া প্রিয় হাসিয়া বলিল তর্কের সময় যে মুখে খৈ ফোটে, কাজের সময় তুমি এত slow। দাও আমি করছি। তুমি একটু জিরোও।"

শ্যামাচরণ হাঁফ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "বাঁচলাম ক্রমাগত ঐ টাকা আনা পাই যোগ করা যায়? তোমার যেমন কাজ নেই আমাকে দিয়ে এই সব নিরস কাজ করিয়ে নিতে চাও।"

প্রিয়ব্রত কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাজ করিয়া

চলিল। শ্যামা কিছুক্ষণ এ ঘর ও ঘর ঘুরিয়া দু'একখানা কাগজ পত্র উল্টাইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া একজন typist এর নিকটে গিয়া বসিয়া বলিল "আশুতোষ বাবু আপনার এই টরেটক্কাটা আমায় শিখিয়ে দেন ত' ?"

Typist হাসিয়া বলিলেন "এ কি একদিনে শেখা যায়। কিছুদিন তাহ'লে চেষ্টা করতে হবে।"

শ্যামা। ক'দিন লাগবে ?

টাইপিষ্ট। তা' একমাসও লাগতে পারে দু'মাসও লাগতে পারে।

শ্যামা। আপনি না দেখে লিখতে পারেন ?

টাইপিষ্ট। তা' পারি বৈকি !

শ্যামা। আচ্ছা আমি dictate করি আপনি না দেখে লিখুন।

শ্যামাচরণ কিছুক্ষণ typistটীকে dictate করিয়া শেষে তাহাও তার ভাল লাগিল না। তখন সে তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

শ্যামা। আপনি এতে যা পান তার চাইতে ব্যবসা করলে ত' বেশী পেতে পারেন।

টাইপিষ্ট। ব্যবসায় ত' টাকা চাই ? আমাদের যে অন্ন ভক্ষ ধনুর্গুণ, অবস্থা, ব্যবসা করিব কি দিয়া ?

শ্যামাচরণ বলিল এই যে কোম্পানীর অধীনে সে কার্য্য করিয়া তাহারই সে shareholder হইতে পারে। তাহাদের ইচ্ছা আছে এ কোম্পানীর যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছে সকলকেই অংশ করিয়া লওয়া হইবে। তাহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল ইত্যবসরে প্রিয়ব্রত কার্য্য শেষ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। শ্যামাচরণ প্রিয়ব্রতকে বলিল "আমি তোমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা proposal করছিলাম যে সমস্ত কর্ম্মচারীদের যদি shareholder করে নেওয়া যায় তাহ'লে বোধ হয় কাজও ভাল হ'তে পারে, চুরি টুরিও কমে যায়। Co-operative system এ তোমাদের এই কোম্পানীটাকেও চালাও না ?"

প্রিয়। ও সব কথা অফিসে বসে হ'তে পারে না, চল বাড়ী যাওয়া যাক বাবার আজ জ্বর বেড়েছে দেখে এসেছি।

উভয়ে অফিসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল শিবব্রত কয়েকজন যুবকের সঙ্গে কি একটা পরামর্শ করিতেছে। তাহাদের দুইজনকে দেখিয়া শিবব্রত নিকটে আসিয়া বলিল "এঁরা কলেজের ছাত্র, এঁদের ইচ্ছা তুমি যে "......" স্থানের famine relief organize করেছ এঁরা তাতে যোগ দেন।"

প্রিয়। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ,' এঁদের পড়াশুনা ছেড়ে ওখানে যেতে বলতে পারি না। আপনাদের বাপ মা এখানে লেখা পড়া শিখতে পাঠিয়েছেন আর সেই-জন্য তাঁরা হয়তো যথেষ্টই খরচ করচেন। এমন অবস্থায় পড়াশুনা ছেড়ে এসব কাজে গেলে তাঁদের অমতে কাজ করতে বলা হবে। আমরা সে রকম উপদেশ দিতে পারব না।

একজন ছাত্র নম্রস্বরের বলিল "এখন হতেই ত' public কাজে যোগ দিতে শিক্ষা করা উচিৎ। আমরা যদি এখন না শিখি তা' হলে সংসারের নানান ঝঞ্ঝাটে ঢুকে আর কি এসব কাজের সময় পাব ?"

প্রিয়। এখন যা করবেন সবই হুজুগে পড়ে, ক্ষণিক উত্তেজনার বসে ; কিন্তু আপনাদের এই ভাবটা যাতে চিরস্থায়ী হয় তার বন্দোবস্তটা আগে করুন ! কোন গতিকে ছাত্রাবস্থায় philanthropic কাজগুলো সেরে গিয়ে তারপর শেষে পুরা দস্তুর সংসারী হয়ে জীবনের কাজের সময়টা কাটিয়ে দেবেন এই যদি মনে করে থাকেন তা হ'লে এখনকার সমস্ত কাজই ভণ্ডামী হবে। একটু নামের চেষ্টায় আর কতকটা ভেতরকার উত্তেজনায় কতকটা বা দলে পড়ে অপরিপক্ক মস্তিষ্ক ছাত্রেরা দু'দিনের জন্য খুব তোড় জোড়ে কাজ করেন, তারপর দেখি, সেই কেরানী, মুহুরী না হয় ডেপুটী মুনসেফ আর খুব জোর হয়তো বিলেত গিয়ে সিবিল সার্বিস পাশ করা না হয় ব্যারিষ্টার হওয়া। অবশ্য এগুলো যে অন্যায় তা বলছিনে তবে এইটুকু বলতে পারি যে এই সব কাজের

মধ্যে এখনকার philanthropyর আভাষমাত্রও থাকে না।

ছাত্র। এই সমস্ত কাজ করাকে আমাদের শিক্ষারই অঙ্গ মনে করে নিতে দোষ কি? আমাদের ইউনিভার্সিটীতে এসবের বন্দোবস্ত নেই বলে আপনাদের ধরেছি, আপনি আমাদের এই সব শিক্ষার উপায় বিধান করুন।

প্রিয়। তা করতে পারি কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের অভিভাবকদের অনুমতি প্রথম দরকার। দ্বিতীয় দরকার আপনাদের অবকাশ, পড়ার সময় পড়া, কাজের সময় কাজ। যে সময় স্কুল কলেজের vacation সেই সময় বাড়িতে স্ফূর্ত্তি করতে না গিয়ে তখন যদি এই সব বিষয়ে স্ফূর্ত্তি দেখান তা হ'লে কাজ হবে। নচেৎ আমি কোন রকম সাহায্য করতে পারব না আমাদের দলে যাঁরা কার্য্য করেন তাঁদের এই সমস্ত কাজ করাও হয় তার ওপর তাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহও হয় বাড়ির লোকেরা যে শেষে বলবেন যে ছেলেদের পড়িয়ে শুনিয়ে অকর্ম্মণ্য করে তোলা হয়েছে তা হ'বে না। আপনাদের ইউনিভার্সিটির পড়া শুনার পর এক একটা বিষয়ের technical education পেতে হবে তার পর এই সব কাজে হাত দিতে পাবেন। এতে যদি স্বীকৃত হ'ন তাহ'লে আমাদের কাছে আসবেন আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করব।

ছাত্র। Famine relief এ যাব এতে আবার technical education এর কি দরকার?

প্রিয়। দু'মণ চাল আর দশখানা কাপড় জুগিয়ে দিলেই যদি আমাদের এই দেশব্যাপী famine এর relief হয় তা হ'লে আপনাদের একাজে যোগ দেবার কোন দরকার নেই। Government নিজে যে সকল লোক লাগিয়েছেন তাদের কাছে কিছু চাঁদা পাঠিয়ে দেবেন তা হ'লেই যথেষ্ট হবে আর যদি সত্যিকার relief work করতে চান্ তাহ'লে সে বিষয়ে শিক্ষিত হন। দু'চার পয়সা দান করে বা একদিনের ভাত কাপড় জুগিয়ে দিলে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকেরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। এখন বাড়ি গিয়ে এই সব বিষয় ভেবে মন স্থির করে এই শিবব্রতকে সংবাদ দেবেন, তারপর আমাদের যা কর্ত্তব্য তা স্থির করব।

ছাত্রগণ বিরক্ত হইয়া গুজুর গুজুর করিতে করিতে প্রস্থান করিল। শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিল "আহা ওদের এমন করে আশা ভঙ্গ করলে!" প্রিয়ব্রত গম্ভীর মুখে বলিল "দেখ দিখি বেয়াড়া বুদ্ধি! পড়া শুনা ফেলে কোন দূর দেশে সব famine relief এ যাবে,—এ সব কাজ যেন cricket foot ball match খেলতে যাওয়া। ঘরে মা বাপ ওদের পড়াশুনার খরচ জোগাতে জোগাতে হয়রান হচ্ছে আর ওঁরা সে সব কাজ ফেলে হবেন philanthrophist!"

তাহারা যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে! মায়া তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। প্রিয়ব্রতকে দেখিয়া সে ম্লান মুখে বলিল "বাবার সমস্ত দিন জ্বর ছাড়ল না, বড় ডাক্তার ডাকতে চাইলাম উনি বারণ করলেন। এখন যা'হয় একটা উপায় কর।"

প্রিয় তাড়াতাড়ি তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে ব্রহ্মদশার সঙ্গে তাহার পিতা মৃদুস্বরে কথা বলিতেছেন। প্রিয়ব্রত প্রবেশ করিলে সত্যব্রত তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "এখন তোমরা একটু বাইরে থাক, এক ঘণ্টা পরে এস।"

প্রিয়। আপনার সারাদিন জ্বর ছাড়েনি, আমরা বড় ডাক্তার ডাকতে চাই।

সত্য। সেটা অন্যায় খরচ হবে। যাদের বড় ডাক্তার ডাকবার ক্ষমতা নেই তাদের যে ভাবে চিকিৎসা হয় আমারও সেই রকম হবে। তার বেশী আমি কিছুতেই করতে দেব না। কেন তোমরা ব্যস্ত হচ্ছ প্রিয়? আমার এই দেহের ওপর তোমাদের চাইতে আমার দৃষ্টি কম তা' মনে করছ কেন? আমি এই দেহ দিয়ে যা করিয়েছি তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট এখন

এ বলছে "আর আমি পারছি না" তাই একে এখন জিড়ুতে দিতে হবে।

প্রিয়। কিন্তু সেটা কি আত্মহত্যা হবে না ?

সত্য। আত্মহত্যা হ'ত যদি না আমি আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা'ত করি নি, আমার চিকিৎসার ত' কোন ত্রুটী হয় নি সেবাও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তা বলে অযথা এই দেহের প্রতি লোভ দেখালে আমি নিজেরই অনিষ্ট করব। তোমরা যত বড়ই ডাক্তার ডাক এ যাত্রা আর রক্ষা নাই। আমি তা' স্পষ্ট জানতে পেরেছি। ভগবান আমার দেহকে ফিরে নিতে চাচ্চেন, তোমরা সহস্র চেষ্টা করলেও তাঁর অমোঘ হস্ত হ'তে আর এ দেহকে রক্ষা করতে পারবে না। এখন বাইরে যাও— আপন আপন কর্ত্তব্যে মন দাও গে। আমার জন্য চিন্তা কর না।

প্রিয়ব্রত অতি কাতরভাবে একবার ব্রহ্মযশের দিকে চাহিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

(৩৪)

মেরুপ্রদেশে শুনিতে পাওয়া যায় ছয় মাস দিন, ছয় মাস রাত্রি। সেই ছয় মাস রাত্রের মধ্যে তিন মাস উষা ও সন্ধ্যা আর তিন মাস সম্পূর্ণ অন্ধকার। কিন্তু সেই তিন মাস পূর্ণান্ধকারের মধ্যে ভগবানের দয়ায় "অরোরা বারিয়ালিস" নামক অপূর্ব্ব আলোকছত্রে মাঝে মাঝে আকাশ মণ্ডল শোভিত হইয়া উঠে বলিয়া তদ্দেশবাসীদের অনেকটা সুবিধা হয়।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ আর সেই নিস্তব্ধতার উপর গভীর অন্ধকার অচল অটল ভাবে বসিয়া আছে। সহসা সেই অন্ধকারকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া আকাশের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত ইন্দ্রধনুর ন্যায় একটী উজ্জ্বল রেখা অর্দ্ধবৃত্তাকারে দেখা দিল। তারপর ক্রমশঃ সেই মূল রেখা হইতে অসংখ্য নানাবর্ণের রশ্মিসমূহ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পর ঐ সমস্ত রশ্মি সমূহ আকাশ প্রান্তরে একটা চঞ্চল নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। তখন সেই চঞ্চল বৈদ্যুতিক আলোকের সহায়তায় মেরুবাসীগণ আপনাদের দিনের কর্ম্ম সারিয়া লইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে অসাড় জীবন-হীন হীমপ্রান্তর তাহার উপর মৃত্যুর ন্যায় চেতানাহীন অন্ধকার। এই দৃশ্যের মধ্যে যখন সেই আলোকছত্রের উদয় হয়, তখনই ঐ জীবনহীন মরুপ্রান্তরে জীবনের আভাব দেখা দেয়। যদিও ঐ আধ আলো, আধ অন্ধকারের মধ্যে ঐ আলোকের অস্থিরতার তলে সমস্তই প্রেতের মত অস্পষ্টভাবে নড়িতে চড়িতে থাকে তথাপি ঐ সময়েই মেরুপ্রদেশে জীবনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু তাহার পর যখন ক্রমশঃ উষা দেবী দেখা দেন যখন তাহার মৃদু অথচ স্থির আলোকে "অরোরার" পীড়া দায়ক বৈচিত্র্য ও চঞ্চলতা দূর হইয়া যায় তখনই যেন মরুদেশবাসীরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

বিষ্ণুযশার অবস্থা এতদিন মরুপ্রদেশের দীর্ঘ রাত্রির মতই ছিল। মাঝে মাঝে অরোরার ন্যায় আলোকছত্রে তাহার অন্তরাকাশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত আবার পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া যাইত। তাহার চিত্ত সেই অস্থির আলোকের নৃত্যে পীড়িত হইয়া যেন চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইত কোথাও শান্তি পাইত না। একবার চঞ্চল এবং বৈচিত্র্যময় আলো, পরক্ষণেই অচল অটল অন্ধকার। এই চাঞ্চল্যের জন্য সেও চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আর বলিতেছিল কোথায় তুমি ? হে আমার স্থির আলো হে ধ্রুবপ্রকাশ কোথায় তুমি ? এই বিশাল নারীর তরঙ্গ সঙ্কুল জীবন সমুদ্রের মধ্যে ইহার উদ্দণ্ড নৃত্যের মধ্যে তোমার প্রকাশ ও চঞ্চল তোমাকে কিছুতেই এখানে স্থির বিশ্বাসের সহিত প্রাণের সমস্ত শক্তিতে ধরা যাইতেছে না। ধরা দাও, স্থিরভাবে আমার কাছে প্রকাশিত হও, আমার সমস্ত অস্থির ধ্রুব-আলোকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হও।

বিষ্ণু এইভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একদিন তাহার অন্তরের অন্ধকারের মধ্যে উষার আলোক

দেখা দিল। সে দিন সে কোন আয়োজন করে নাই, কোন চেষ্টাই তাহার ছিল না কিন্তু অতি সহজে অতি অনায়াসে সেই পরম আলোক তাহার চিত্তাকাশে দেখা দিল।

গড়ের মাঠে একটা ফুটবল ম্যাচ হইতেছিল সেই উপলক্ষে বহুজনসমাগম হইতেছে দেখিয়া বিষ্ণুযশা একব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল "ওখানে কি হচ্ছে?" সেই লোকটী হাসিয়া বলিল "আপনি কোথা হ'তে আসছেন? এত বড় Shield matchএর খবর রাখেন না!" লোকটী চলিয়া গেলে বিষ্ণুযশা ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই ভাল দেখিতে পাইল না; কেবল মাঝে মাঝে সেই বিপুল জনসংঘ আলোড়িত করিয়া 'go on, go on' আর করতালির শব্দ উত্থিত হইতেছিল। সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এই এতগুলা লোক কেবল একটা খেলা দেখিবার জন্য জুটিয়াছে আর চীৎকার করিতেছে। ইহাদের কি আর কোন কাজ নাই? সময় কাটাইতে হইবে বলিয়া এই ঠেলাঠেলি, মারামারি করিতে জুটিতে হইবে? এই এতগুলা মহাপ্রাণী কেবল খেলা দেখিতে উন্মত্ত! জীবন এদের কাছে খেলা—আনন্দ এদের কাছে সুধু ঠেলাঠেলি গুতাগুতিতে! নিজেরাও স্থানের জন্য গুতাগুতি করিতেছে এবং যাহা দেখিতেছে তাহাও পরস্পরকে আঘাত করার চেষ্টা পরস্পরকে পরাজিত করার চেষ্টা মাত্র।

বিষ্ণু চিন্তা করিতেছে এমন সময় হঠাৎ তাহার অতি সন্নিকটে একটা ভয়ানক গোলমাল উত্থিত হইল। বিষ্ণু দেখিল কয়েকজন লোকে মারামারি আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাদের পায়ের চাপনে কয়েকটী বালকও মারা যাইবার মত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ২।১ জন পুলিশও জুটিয়া গিয়া গোলমাল আরও পাকাইয়া তুলিয়াছে। বিষ্ণু তাড়াতাড়ি সেই বালক কয়টিকে বাঁচাইতে গেল এবং দু'একঘা খাইয়া তাহাদের সরাইয়া আনিয়া বলিল "তোমরা কার সঙ্গে এসেছ?

রোরুদ্যমান বালকগুলির নিকট হইতে কোন সংবাদই পাওয়া গেল না। বিষ্ণু তখন নিরুপায় হইয়া তাহাদের নানা উপায়ে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহাদের অভিভাবকগণও খুঁজিতে খুঁজিতে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু তাহাদের ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন "নিজেরাও এই রকম বৃথা সময় কাটাচ্ছেন ওইটুকু ছেলেদেরও তাই শিক্ষা দিচ্ছেন। জীবনটা খেলাও নয় খেলা দেখাবারও নয়।" অভিভাবকগণ দু'একটা কড়া রকম উত্তর দিয়া চলিয়া গেলে, বিষ্ণু ভাবিল "একি হ'য়েছে! এই এতগুলা লোক উন্মত্ত হয়েছে নাকি! নারায়ণ কি এদের পরিত্যাগ করেছেন! এই এত বড় মহানগরী, এত লোকজন বাড়ী ঘর সবই ঠিক আছে অথচ এখানে তিনি নেই! বিষ্ণুযশা চলিতে চলিতে একস্থানে ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, চতুর্দ্দিকে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিতেছে। উর্দ্ধে আকাশেও একে একে তারা ফুটিয়া উঠিতেছে আর নিম্নে বিস্তীর্ণ প্রান্তরও অসংখ্য উজ্জ্বল আলোক বিন্দুতে শোভিত হইয়া উঠিতেছে। চৌরঙ্গীর বড় বড় বাড়ীগুলিও অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া দর্শকের মনকে আকর্ষণ করিতেছে। বিষ্ণু সব দেখিল—আলো দেখিল, লোকজন দেখিল, চলন্ত গাড়ীগুলির রক্ত চক্ষুর দ্রুত চলন ফিরন সবই দেখিল। কিন্তু তার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল যে এই মদিরোন্মত্ত জীবনের মধ্য হইতে নারায়ণের অস্তিত্বকে দূরে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুর ক্রমশঃ মনে হইল যেন কলিকাতা তাহার সমস্ত জন সঙ্ঘ, সমস্ত আয়োজন প্রয়োজন সমস্ত রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ শব্দ লইয়া এক মহা শূন্যতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহার উর্দ্ধে কিছুই নাই তাহার অধোদেশেও কিছুই নাই, সব শূন্য! ক্রমশঃ ক্রমশঃ কলিকাতা দূরে দূরে সরিয়া যাইতেছে—ক্রমশঃ তাহার শব্দ মুছিয়া গেল শেষে যে আলোক দেখা যাইতেছিল তাহাও গেল—রহিল এক বিরাট শূন্যতা! বিষ্ণুর চতুর্দ্দিক হইতে ক্রমশঃ দেশের বন্ধন কালের বন্ধন

ধসিয়া গেল এবং তাহার মনে হইল যেন একটা অনন্ত শূন্যতার মধ্যে সে ঝুলিয়া রহিয়াছে। সে জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় প্রাণপণ বলে বলিল "কে আছ কে আছ সব যায় বাঁচাও।" তখন তাহার অন্তরের মধ্যস্থল হইতে তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে বাজাইয়া তুলিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া কে বলিল "আমি আছি ভয় নেই।" বিষ্ণু স্পষ্ট শুনিল "অহমস্মি।" বলিয়া সে তাহাকে আশ্বাস দিতেছে। বিষ্ণু মনে মনে প্রশ্ন করিল "কোথায় তুমি ?" সে কথার উত্তর পাইল না। কিন্তু ইহার পর আর তাহার সজ্ঞা রহিল না। যখন সে জাগিল তখন শুনিল যে তাহার সমস্ত বহিরন্তর ভরিয়া একটী ধ্বনি বাজিতেছে—"আছি—আছি—আছি" আর কিছুই নয় কেবল "আছি আছি।" সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়ভাবে বলিল "তুমি যখন আছ তখন তোমায় পাবই, আমার কাছ থেকে তুমি আর আপনাকে লুকাতে পারবে না। যতদূরে গিয়ে হ'ক যেখানে হ'ক তোমায় একদিন আমার ঠিক অন্তরে মাঝখানটীতে ধরা দিতেই হবে। রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ ব তাতেই তোমায় ধরা দিতে হবে।"

বিষ্ণু নিশ্বাস ফেলিয়া অনেক দিনের পর আজ অতি প্রশান্তভাবে হাস্যোজ্জ্বলমুখে গৃহাভিমুখে ফিরিল। যাহা এতদিন খুঁজিতেছিল তাহাই যেন আজি তার কোলাহলের মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তাহার অন্তরে ধরা দিয়াছে। এতদিন যাহা খুঁজিতেছিল, যে আহ্বানের ধ্বনি তাহাকে এতদিন ক্রমাগতই ব্যস্ত করিতেছিল আজ সেই আহ্বান স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। এখন বিষ্ণুর কার্য্য সেই শব্দকে, সেই মহান অস্তিত্বের ভাষাকে সকলের নিকট স্পষ্ট করিয়া দেওয়া। এখন সেই "অহমস্মি" বাক্যটী সংসারের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া শুনাইতে হইবে—ইহাই একমাত্র সাধনার বস্তু। নইলে আর যে কাজের জন্যই সে চেষ্টা করিবে সেই কাজের পরই মন প্রশ্ন করিবে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্ ? মনের এই চিরন্তন প্রশ্নের একেবারে নিবৃত্তি সাধিত করিতে গিয়া সে যদি নিষ্ফল হয়, যদি এই কার্য্যে তাহার দেহের পতন হয় তথাপি আর কোন কার্য্য নাই।

বিষ্ণু পথে চলিতে চলিতে শুনিল একজন পরিচিত মুসলমান ফকির গাহিতেছে :—

"ক্যা ক্যায়দা বঁকা ক্যায়সী—যব উসকে
আপনা ঠাঁয়রে।"

বিষ্ণু কিছুক্ষণ ঐ ফকিরটীর মধুর গজল শুনিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল "ভাই ঠিক বলিয়াছ! কতদিন তোমার ঐ গানটা শুনিয়াছি কিন্তু আজ আমার মনে ওটা যেমন ভাবে প্রবেশ করিল এমন কোনদিন করে নাই। কি সত্য কথা!—"যখন তুমি আছ আর আমি তোমার প্রেমিক আছি তখন চিরমরণ চিরজীবন দুই আমার কাছে সমান!"

বিষ্ণু সেই মুসলনমান ফকিরকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথে যাইতে যাইতে আজ দেখিল আনন্দের হাট বসিয়াছে। লোকের ঠেলাঠেলি বালকদের চীৎকার, কাগজ বিক্রেতাদের ফুল বিক্রেতাদের ডাক হাঁক, ট্রামের সোঁ সোঁ, গাড়ির ঘড় ঘড় ঘোড়ার টক্‌বগ সবই মিলিয়া মিশিয়া সেই একটী মাত্র ধ্বনিতে পরিণত হইতেছে—সেই গুরু গম্ভীর সব ভুলান নাদ "আমি আছি।" কেহ শুনিতেছে না; তা' না শুনুক তবু সেই একই নাদ এই সকল ধ্বনিকে গাঁথিয়া তুলিয়া এক করিয়া আপনাকে প্রকাশিত করিতেছে। সেই একমাত্র মহান "অস্মি"তার আনন্দেই যেন এই সমস্ত জনসমূহের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বগুলি একীভূত হইয়া একটী মাত্র বিরাট "চিৎঘনানন্দমূর্ত্তি" ধারণ করিতেছে। যাহারা অংশ মাত্র তাহারা সেই বিরাট অংশীর সংবাদ রাখে না তবু তাহারা তাঁহার অস্তিত্বেই অস্তিত্বমান; তাঁহার আনন্দেই আনন্দিত।

এই মহান সংবাদ তাহাদের দিতে হইবে। সেই এক মাত্র বার্ত্তা, জ্ঞাপন করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাই লাভ করিতে হইবে। সুস্পষ্টভাবে সেই একমাত্র "জ্যোতিষাং জ্যোতিকে" হৃদয়ে ধরিয়া আনিয়া ইহাদের সম্মুখে ধরিতে হইবে, তদ্ভিন্ন অন্য কাজ আর তার নাই।

গ্রীক দার্শনিক "আর্কিমেডিসের" মত প্রথম সত্যো-

পলব্ধির প্রবল আনন্দে সে গৃহে প্রবেশ করিয়া মাতাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল "মা আজ বড় আনন্দ পেয়েছি; তুমি আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু দাঁড়াও ত'।" ভুবনেশ্বরী একবার তাহার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া তাহার পর তাহার নিকটে বসিয়া বলিলেন "বাবা আর এমন করে পাগলের মত ঘুরে বেড়িও না, শান্ত হও।" বিষ্ণু কিছুক্ষণ মাতৃস্পর্শ অনুভব করিয়া শেষে হাস্যোজ্জলমুখে বলিল "মা আর ভয় নেই আমি জগতের যা একমাত্র বার্ত্তা তার স্পষ্ট আভাষ পেয়েছি। এখন কেবল তাকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে এনে দেওয়ার দরকার।"

ভুবন। যা পেয়েছ তাই কেন সকলকে জানাও না।

বিষ্ণু। যা পেয়েছি তা উষার আলোর মত, সকলের চ'খে তা ধরবে না। সে কথা জানিয়ে বেড়ালে কেউ বিশ্বাস করবে না। সূর্য্যের মত উজ্জ্বল হয়ে সেই মহান সত্য যখন সকলের চ'খের উপর জ্বলে উঠবেন তখনই সবাই বিশ্বাস করবে।

পশ্চাৎ হইতে ব্রহ্মযশা জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন "তা' তোমার সাধ্য নয়। একমাত্র সে কাজ যিনি পারেন তাঁকেই নিয়ে এস—নহিলে তোমার সমস্তই মিথ্যা হবে।"

বিষ্ণু জীবনে সেই প্রথম পিতাকে প্রণাম না করিয়া তীরবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমারই সাধ্য আমি করিব! আর যদি না পারি—"

ব্রহ্মযশা। তিষ্ঠ! তোমার মধ্যে ঐ দেখ দ্বিধা রয়েছে—তোমারও মন বলছে "যদি না পারি" যিনি পারবেন তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা, কোন "যদি" থাকবে না। আমি বলে রাখছি তুমিও আমারই মত আশাহত হ'বে। যিনি ভূমা যিনি "সর্ব্বতো এবং সর্ব্বঃ" তাঁকে মুঠোর মধ্যে করে এনে কেউ কখনও দেখাতে পারে না। তাঁকে দেখবারও যেমন শক্তি চাই দিব্যচক্ষু চাই, তেমনি স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর না হ'লে আপনার বিশ্বব্যাপ্ত রূপ কেউ দেখাতে পারবে না।"

বিষ্ণু কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া শুইয়া পড়িল। ভুবনেশ্বরী নতজানু হইয়া করজোড়ে স্বামীকে বলিলেন "একি করলে? তুমি এমন ছেলেকে অভিশাপ দিলে?" ব্রহ্মযশা গম্ভীরস্বরে বলিলেন "স্থির হও অভিশাপ দিইনি যা সত্য কথা তাই বলে দিয়েছি, ওকে সাবধান করে দিয়েছি। বুঝতে পারছ না আজকার অনুভূতি নিয়ে ও তোমার কাছে এসেছে। নারায়ণের স্পর্শলাভ হয়েছে, কিন্তু তবুও ভুল করছে তাই সাবধান করে দিলাম—ওকে অসাধ্য সাধনের ইচ্ছা হ'তে নিবৃত্তি করে সাধ্য পথ বলে দিলাম। আজও যদি ও আমার কথা না শোনে তাহ'লে বুঝব আর আশা নাই। যে শান্তভাবে ভগবানের সান্নিধ্যকে স্পর্শকে, প্রকাশকে, গ্রহণ না করবে তার ভাগ্যে অশেষ দুঃখ। যে ধ্রুবজ্যোতিকে ছেড়ে মরীচিকার পেছনে ছুটবে তার ভাগ্যে জল লাভ অসম্ভব।

বিষ্ণু ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। ব্রহ্মযশা তাহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন "বৎস বিষ্ণু, আমার উপর ক্রোধ কর না।" বিষ্ণুযশা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "ক্রোধ! কি বলছেন বাবা? আজ যিনি আমায় ছুঁয়েছেন তিনি কি আমায় সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হ'তে মুক্ত করেন নি? আজন্মের গুরু! আজ আপনি আমায় বুঝালেন না এইটিই আমায় ব্যথিত করেছে নইলে এই অশ্রু দুঃখের নয় আনন্দের! কিন্তু তথাপি আপনাকেই আমি বলছি, আমার সর্ব্ব বন্ধন কেটে গিয়েছে আর কেউ আমায় বেঁধে রাখতে পারবেন না। যিনি সকল আবরণ ছিন্ন করে সকল বাধা অতিক্রম করে এসে আমায় দয়া করেছেন তিনি যখন টানছেন তখন আর কেউ আমার নয়। এখন একমাত্র তিনি আমার আর তাঁকে আমি লাভ করব—তাঁকেই পেতে হ'বে নইলে মরণ বাঁচন আমার দুই সমান।

ব্রহ্মযশা ধীরে ধীরে আপন কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। ভুবনেশ্বরীও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। বিষ্ণুযশা উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "লক্ষ্মী"। লক্ষ্মী নিকটে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। বিষ্ণু ডাকিতেই সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। বিষ্ণুযশা বলিল "লক্ষ্মী, তুমিও কি

আজ আমায় বিশ্বাস করিবে না? তুমিও কি মনে কর আমি পারব না—আমার চেষ্টা অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র!"

লক্ষ্মী কোন কথা বলিতে পারিল না কেবল নত বদনে দাঁড়াইয়া রহিল। বিষ্ণু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বেশ তা হ'লে আমি এক হ'লাম! তাই ভাল তিনিও যখন এক তখন আমিও একা!" লক্ষ্মী সেই কক্ষের অস্পষ্টালোকে বিষ্ণুর যে মূর্ত্তি দেখিল তাহাতে সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। বিষ্ণু ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "লক্ষ্মি, আমি পারবই!"

লক্ষ্মী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "তাই যেন হয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আদর্শ কর্ম্মচারী

অহো! কর্ম্মচারীর মধ্যে সেই তো ভক্ত এবং শ্রেষ্ঠ,
যে, দিনে দুবার সাম্‌নে এসে নাচে ধিনিকেষ্ট,
আর, দরবারে যে হাজির করে হুজুগ আচ্ছা আচ্ছা,
ঐ, কার বাড়ীতে কোন্ বেড়ালের হল কটা বাচ্চা,
আর মনিব যদি একটু তাতে করেন মৃদুহাস্য,
অমনি, মুখের পানে চেয়ে চালায় তারই টীকাভাষ্য,
বস্, এমনি করে তিন তুড়ীতে তালিম রাজকার্য্য,
আর, যত পারে কমিয়ে আনে মনিবের আহার্য্য
কারণ, সেই তো প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী ভক্ত অগ্রগণ্য,
যে, জড়দেহ ধসিয়ে তাঁরে করে স্রেফ্ চৈতন্য,
আর, পঞ্চভৌতিক দেহটার যা' কষ্ট এবং গ্লানি,
তা, বে-ওজরে লয় চিরদিন নিজের স্কন্ধে টানি,
আর, এতদর্থে ঘি, দুধ যত করে নিজের ভোগ্য,
বলে, গ্রহণ সেতো দাসের কার্য্য, ত্যাগই প্রভুরযোগ্য,
তবে, দাসের উচিত রাখা প্রভুর নিশানা বা মার্ক,
তাই, বড় করে, তিলকমালা, মাথায় রাখে আর্ক,

আর, প্রভু যদি ফাউল ধরেন, অমনি মলে কর্ণ
ঐ, সঙ্গে সে গিরগিটির মত বদলে ফেলে বর্ণ।
আর, না জানুক সে কিছুই তবু হয় সে সব জান্তা,
এবং অতীব একগুঁয়ে যেন কৈকো নেহি মাণ্ডতা,
আর আইনে জ্যাকসেনের গুরু ডাক্তারীতে এম্, ডি
আর, দর্শন, স্মৃতি সকল কথায় করবে দাঁত খেমৃটি
আর, সদসতে তুল্য প্রীতি, খাঁটি পরমহংস
আর, শক্তকে দেয় লম্বা সেলাম, নিরীহকে বংশ,
আর, শুধু নিজের আরজিপেশ, আর নিজের
নালিশ রুজু
আর, প্রভুভক্তি বজায় রাখ্তেই বাঁচতে তাহার যত্ন
আর, তদর্থেই সম্পত্তি বাগায়, লোটে ধন ও রত্ন।

শ্রীশরদিন্দুনাথ রায়।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শব্দের শক্তিও অদ্ভুত। অভিধাশক্তি, লক্ষণাশক্তি, স্ফোট প্রভৃতি লইয়া তার্কিকেরা মারামারি করুন, আমরা আপাততঃ ওদিকে ভিড়িব না। একটা মসৃণ কাচের উপর সূক্ষ্ম ধূলিরেণুসমূহ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে বসিয়া বেহালার একটা গৎ বাজাইতেছি। শব্দ-তরঙ্গগুলি ধূলিরেণুগুলিকে ধীরে ধীরে সাজাইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে আকারিত করিয়া দিবে। শব্দের নিজের ছন্দের (harmony) অনুরূপ একটা মূর্ত্তি সৃষ্টি করার শক্তি রহিয়াছে। অতএব শব্দ শুধু চাঞ্চল্যের সঙ্কেত নহে; তার গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তি আছে। জগতে গড়াভাঙ্গা মানে চাঞ্চল্য; শব্দও গড়িতে ভাঙ্গিতে পারে; অতএব শব্দ চাঞ্চল্যের আত্মীয় ও প্রতিনিধি। রূপ বা রসের সত্য সত্যই বাহিরে একটা কিছু গড়িবার ভাঙ্গিবার শক্তির আমরা পরিচয় বড় একটা পাই না। ভিতরে রূপের বা রসের ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি অস্বীকার করিতে আমার সাহস নাই। শব্দ স্পষ্টতঃ শক্তিস্বরূপ (dynamic) এবং স্রষ্টা (creative)। শুধু ধূলিকণা লইয়া নহে, অন্যান্য উপায়েও শব্দের এই স্বরূপ ও সামর্থ্য ও পরীক্ষিত হইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আবিষ্কৃত রেডিয়াম

(radium) নামক দ্রব্য নিয়তই তাপ বিকিরণ করিতেছে দেখা যায়। এ তাপের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত। আমরা জানি যে তাপ কোনও একটা বস্তুর অণুগুলির এলো-মেলো ভাবে স্পন্দন মাত্র (irregular molecular quiver); যে জিনিষের দানাগুলি ঐরূপ ভাবে কাঁপিতেছে সেই জিনিষটা আমাদের অনুভূতিতে গরম বলিয়া ঠেকে। রেডিয়াম অত তাপ পাইতেছে কোথায়? ব্যাখ্যাটা বোধ হয় এইরূপ:—রেডিয়ামের পরমাণু (atoms) গুলি ফাটিয়া যাইতেছে; বিজ্ঞানের পরমাণু সাবয়ব ও পরিমিত দ্রব্য মনে রাখিবেন। পরমাণুর টুকরা গুলিকে ইলেক্‌ট্রন বলা যাক্। সেই ইলেক্‌ট্রনগুলির কতক-কতক রেডিয়ামের ভিতর হইতে ভীষণ বেগে বাহিরে ছুটিয়া আসিতেছে; কতক বা রেডিয়ামের অন্যান্য অণুতে ধাক্কা (collision) পাইয়া সে-গুলিকে কাঁপাইয়া দিতেছে। অণুগুলির এই প্রকার দোলনই তাপরূপে অভিব্যক্ত হয়। কতকগুলি সমিধ্ সাজাইয়া লইয়া শিক্ষা নামক বেদাঙ্গের ঠিক নির্দ্দেশ মত 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি বেদমন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছি 'এই শব্দের মূলে যে স্পন্দ vibration) রহিয়াছে সেটা যেমন বায়ুকে কাঁপাইয়া তোমার আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইতেছে, সেইরূপ সমিধের দানাগুলিতেও ধাক্কা দিতেছে। সে ধাক্কা এরূপভাবে ছন্দোবদ্ধ যে, সে ধাক্কার ফলে সমিধের পরমাণুগুলি ফাটিয়া যাইলেও যাইতে পারে। পরমাণুর ভিতরে ইলেক্‌ট্রনগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট বেগে ও রীতিতে ঘুরিতেছে; তাদের ঘোরার একটা ছন্দঃ আছে (hormonic motion)। আমার উচ্চারিত মন্ত্রগুলির ছন্দঃ (অর্থাৎ শব্দতরঙ্গের ছন্দঃ) ইলেক্‌ট্রনের গতি ছন্দের অনুরূপ অথবা অনুপাতী হইলে তাহার সহিত সংযুক্ত (compounded) হইয়া তাহাকে উপচিত করিয়া তুলিতে পারে। দুইটা বেহালা যদি একসুরে বাজান হয় তবে যেমন সুরদ্বয়ের সংযোগ ও উপচয় হয়, সেইরূপ। এখন ইলেক্‌ট্রনগুলির বেগ, উপচয়ের ফলে যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা (critical value) ছাড়াইয়া যায়, তবে তাহারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া আসিবে। তারা কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া গেলেই পরমাণু ফাটিয়া গেল; গ্রহগুলি কক্ষচ্যুত হইয়া ছট্‌কাইয়া গেলে সৌরজগতের যেমন অবস্থা হইবে সেইরূপ। কক্ষচ্যুত গোটাকতক ইলেক্‌টন অবশ্য প্রবলবেগে সমিধের দানাগুলিতে ধাক্কা দিবে এবং সেগুলিকে কাঁপাইতে থাকিবে। এ কম্পনের অভিব্যক্তি কিসে? তাপে। পুনঃ পুনঃ কিছুক্ষণ ধরিয়া এ ব্যাপার চলিলে তাপ ক্রমশঃ উপচিত হইয়া সমিধ্ জ্বালাইয়া তুলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রশক্তিতে সমিধ্ জ্বলিয়া উঠিল। রেডিয়ামের দৃষ্টান্তে এ কথাটাকে আর নিতান্ত গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ভাবিয়া দেখিতে এবং পরীক্ষা করিতে হইবে। পরীক্ষণীয় ব্যাপারে সুসংস্কার কুসংস্কারের কথা অবান্তর কথা—সেখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়কেই সাবধানে পথ হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

ইলেক্‌ট্রনগুলিকে নাড়াচাড়া করার সামর্থ্য যদি শব্দের থাকে (থাকা অসম্ভব নয়), তবে সেগুলিকে ছড়াইয়া সাজাইয়া শব্দ অনেক অঘটন ঘটাইতে পারে। ঈথারের দানাগুলি অথবা ইলেক্‌ট্রনগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া শব্দ যে দেবতার তৈজসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে, সে কথার ব্যাখ্যা আপনারা হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাইবেন। আরও এক কথা, জলীয় বাষ্পের, মেঘের দানা রূপে পরিণত হইবার পক্ষে এক-একটা ঘনীভাবকেন্দ্র (centres of condensation) চাই, অন্ততঃ পাইলে সুবিধা হয়; কোনও একটা ইলেক্‌ট্রন বা অন্য সূক্ষ্ম জিনিষকে কেন্দ্রস্বরূপ না পাইলে জলীয় বাষ্প জমাট বাঁধিয়া জলকণায় পরিণত হয় না, সুতরাং মেঘও হয় না। এখন যদি আমরা ধরিয়া লই যে যজ্ঞীয় ধূম ছাড়া মন্ত্রোচ্চারণ-জনিত শব্দ স্পন্দগুলি উপযুক্তভাবে ইলেক্‌ট্রন ছড়াইয়া দিয়া ঐরূপ ঘনীভাবের কেন্দ্রসমূহ রচনা করিয়া দিতে পারে, তবে মন্ত্রশক্তির ফলে পর্জ্জন্য ও বৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। এ ক্ষেত্রেও ভাবিয়া দেখার কথা অনেক। প্রথমতঃ, শব্দের ইলেক্‌ট্রন পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সত্য সত্যই সম্ভাবনা আছে কি না; অভিব্যক্ত শব্দ

(sound) যে বায়ুস্পন্দগুলি সৃষ্টি করিতেছে শুধু সেগুলির কথা বলিতেছি না; অভিব্যক্ত শব্দের মূলে যে চাঞ্চল্যাত্মক পরশব্দ রহিয়াছে সেটার কথাও ভাবিতে হইবে। হ্রীং বা ক্লীং উচ্চারণ করিতে যাইলে আমার ভিতরে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ প্রথমতঃ হয়; পরে তাহা উচ্চারণ যন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া বাতাসকে চঞ্চল করে সেই বাতাসের চাঞ্চল্য শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চঞ্চল করিয়া তোমার ও আমার শব্দজ্ঞান জন্মায়। গোড়ায় সেই প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ; আপাততঃ আরও তলাইয়া না হয় নাই-ই দেখিলাম। এখন প্রশ্ন এই—প্রাণশক্তি স্বরূপতঃ কি? তাহার স্পন্দ ঈথার অথবা ইলেকট্রন পর্য্যন্ত পৌঁছায় কি না? আবার, মন্ত্রশক্তি দ্বারা এ সকল অঘটন-ঘটনা যদি সম্ভবপর বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয়, তথাপি এ প্রশ্ন রহিয়া যাইবে—বেদোক্ত ও তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগুলিই সেই মন্ত্র কি না? এ গুলি ভাবিয়া দেখার কথা এবং পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লওয়ার কথা আমি এখানে ঘোটাকয়েক কথা প্রশ্নরূপে পাড়িয়া পরীক্ষা ও মননের জন্য একটা পতিত জমির দিকে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাটা এরূপও হইতে পারে, অন্য প্রকারও দাঁড়াইতে পারে। বস্তুর মোটা মোটা দানাগুলিকে শব্দ যে সাজাইয়া গুছাইয়া লইতে পারে, তাদের একটা বিশিষ্ট আকার দিতে পারে, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে একখানা ধূলিধুসরিত কাচের সম্মুখে বেহালার গৎ বাজাইয়া পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি! অন্ততঃ এ সব পরীক্ষিত ক্ষেত্রেও আমরা শব্দকে স্রষ্টা (creative) বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। এই জন্য বলিতেছিলাম শব্দ জগতের মৌলিক স্পন্দের (causal stress এর) খুবই উত্তম সঙ্কেত আদি কারণের কার্য্য প্রবাহরূপে ব্রহ্মের জগৎরূপে আবির্ভূত হইবার যে উপক্রম ও অবস্থা, তাহাকে শব্দব্রহ্ম বলিলে বেশ সুসঙ্গতই হয়। ইহা যেন একটা বিরাট সুষুপ্তির পর বিরাট জাগরণ; মহামৌন-ব্রত-ভঙ্গের পর প্রথম আলাপন। ইহার উপক্রম একটা চাঞ্চল্যে—"এক আমি, আমার আর এক থাকিলে চলিবে না, বহু হইতে হইবে," এইরূপ "ঈক্ষণে"। মৌনের অবস্থা অশব্দের অবস্থা; তারপর আদিম চাঞ্চল্যের যে প্রথমা বাক্ বা বাণীমূর্ত্তি তাহাই প্রণব। এ কথাটা পরে পরিষ্কার হইবে।

সৃষ্টিটা প্রজাপতি মহাশয়ের সখের যাত্রা। তিনি দলের অধিকারী। তিনি যেই একদিন "এতে" এই শব্দ করিলেন, অমনি তেত্রিশ কোটী দেবতা যাত্রার দলের ছোক্‌রাদের মত সাজিয়া গুজিয়া আসরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতএব দেবতাসৃষ্টি শব্দপূর্ব্বিকা।—এইরূপ বেদের ব্যাখ্যা করার দিন আর নাই। শব্দব্রহ্ম মানে এ নয় যে একজন কেহ থাকিয়া থাকিয়া এক-একটা শব্দ করিতেছেন, আর এক-একটা পদার্থ সৃষ্টির আসরে আসিয়া হাজির হইতেছে। এ মোটা কথাটা ভিতরের সূক্ষ্ম কথার সঙ্কেত মাত্র। শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্য অসম্ভব নহে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু প্রজাপতি যে শব্দ-সাহায্যে সৃষ্টি করেন তাহা কোন্ শব্দ? বেদে পুরাণে দেখিতে পাই যে প্রথমতঃ তাঁহার ধ্যানে বেদশব্দগুলি আবির্ভূত হন। বেদশব্দ বলিতে কি বুঝিব? এমন একটা শব্দ যাহার সহিত একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের এবং একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। 'গৌঃ' শব্দটা শুনিলাম; মনে নৈয়ায়িক মহাশয়ের দেওয়া লক্ষণ ও আকৃতিবিশিষ্ট একটা জন্তুর ছবি উদিত হইল; চাহিয়া দেখি সত্যই একটা গরু স্বচ্ছন্দমনে ঘাস খাইতেছে। প্রথমটা শব্দ, দ্বিতীয়টা প্রত্যয় এবং শেষেরটা অর্থ বা বিষয়। তোমার আমার কাছে এ তিনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইলেও পুরাপূরি নিত্য নহে। 'গৌঃ' শব্দটার মানে যদি আমার জানা না থাকে তবে তাহা শুনিয়া আমার বিশেষ কোনও প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি হইবে না অপিচ 'গৌঃ' এই শব্দের বাচ্য বা অর্থ গরু নামক জন্তুটিরই যে হইতে হইবে এমন কোনও বাঁধাবাঁধি আইন নাই। আমরা পাঁচজনে আজ হইতে পরামর্শ করিয়া শুধু অসাক্ষাতে নয় সাক্ষাতেও, যদি পরস্পরকে 'গরু' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করি, তবে আমাদের ঠকায় কে? যাদের ভাষা বিভিন্ন তারা হয়ত গরুকে গরু

বলে না, আর কিছু বলে; আমরাও ইচ্ছা করিলে গরুকে গরু না বলিয়া আর কিছু বলিতে পারি। কাজেই শব্দ ও অর্থ, বাচকও বাচ্যের মধ্যে নিয়ত সম্বন্ধ কোথায়? শব্দ শুনিয়া প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তিও যে সকলের মনে একই রকম হয়, এরূপ নহে। 'গরু' এই শব্দ শুনিয়া আমার মনে পড়িল সেই শ্যামলা গাইটি, যার দুধ প্রসন্ন গোয়ালিনী বেচিয়াই মরিত কখনও খাইত না, এবং যার সাক্ষ্য দিতে স্বয়ং কমলাকান্তকে কাটগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল; তোমার হয়ত মনে পড়িল কৈলাসের সেই বৃষরাজ যিনি দেবাদিদেবের রজতগিরিনিভ বপুটী বহন করিয়া স্থাবরজঙ্গমের সর্ব্বত্র হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যয় ঠিক একরূপ হইল না। কাজেই আমাদের ব্যবহৃত কোন শব্দ একটা নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় মনে জাগাইতে পারে, অথবা না-ও পারে; তার একটা চিরনির্দ্দিষ্ট বাচ্য বা অর্থ থাকিতে পারে, না-ও থাকিতে পারে। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক আমরা ভবিষ্যতে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এখন প্রশ্ন এই—প্রজাপতি ধ্যানে যে বেদশব্দ পাইলেন তাহাও কি এই জাতীয়? উত্তর পাইতে হইলে কয়টা কথা আমাদের পরিষ্কারভাবে মনে রাখা চাই। প্রথম, প্রজাপতি বা ব্রহ্মার মনে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা, সেটা আদৌ শব্দ নহে; সেটা চাঞ্চল্যাত্মক, উন্মেষাত্মক পরশব্দ মাত্র। আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি, ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। তারপর ধ্যানে বেদশব্দগুলির আবির্ভাব। এ শব্দগুলি শব্দতন্মাত্র।

প্রজাপতি ধ্যানে যে শব্দ শুনেন তাহা সেই নিরতিশয় শব্দ তাহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহার কর্ণ পারমার্থিক কর্ণ (absolute ear)। আমাদের, এমন কি যোগীদেরও ঠিক সে শব্দ শোনার সম্ভাবনা আমি যে শব্দটিকে 'গৌঃ' রূপে শুনিতেছি প্রজাপতির কর্ণে তাহার শোনা নিশ্চয়ই অন্যরূপ। তাঁহার যে শোনা তাহাই 'গৌঃ' এই শব্দের প্রকৃতি, তোমার আমার শোনা সে শব্দের অল্পবিস্তর বিকৃতিমাত্র। যোগী সেই খাঁটী শব্দের কাছাকাছি যান, কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতির ভূমিতে না উঠিতে পারিলে, তাঁহারও ঠিক খাঁটী শব্দ শোনা হয় না। প্রণব' ওঁ, হ্রীং, ক্রীং প্রভৃতি শব্দও আমরা যেভাবে শুনি বা বলি সেটা তাদের প্রকৃতি নহে, বিকৃতি। যতই উপরের থাকে (plane) উঠিব, ততই শব্দগুলি স্ব স্ব প্রকৃতির অনুরূপ হইয়া আসিবে। একটা বর্ত্তিকা হইতে আলোকরশ্মি স্তরের বাহনের (medium) ভিতর দিয়া আমার চোখে আসিয়া পড়িতেছে; ধর, স্তরগুলি ক্রমশই জমাট (dense) হইয়া আসিয়াছে; এ অবস্থায় রশ্মি ঠিক সরলভাবে আমার চোখে পৌঁছিবে না, বাঁকিয়া চুরিয়া, ছিন্নভিন্ন হইয়া আসিবে। ইহাই রশ্মির বিকার (refraction)। শব্দের বেলাও যে অনেকটা এইরূপ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রজাপতি তাঁহার পারমার্থিক শক্তির দ্বারা যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন ও শুনিতেছেন, তাঁহার মানসপুত্র সনৎকুমার অবিকল সেইটি উচ্চারণ করিতে ও শুনিতে পারেন না—তাঁহার বলা ও শোনা ঈষৎ বেঠিক হয়, কারণ তিনি যে প্রজাপতির এক থাক নীচে। আবার সনৎকুমারের পর যিনি বলিলেন ও শুনিলেন তাঁহার আরও একটু দোষ হইল। এইরূপে গুরুপরম্পরায় নামিয়া আসিয়া সেই আদিম শব্দমালা যখন আমার রসনায় ও কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাহাদের নিরতিশয়তা অপগত হইয়াছে, স্বাভাবিকতা অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব ব্রহ্মার ধ্যানে যে বেদশব্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা তোমার আমার শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যাইতে পারে না। নানা কারণে আমাদের থাকে আসিতে আসিতে শব্দের সঙ্কর ও বিকার হইয়াছে। এ কথার আলোচনাও পরে হইবে। তবে গুরুপারম্পর্য্য থাকাতে, সাঙ্কর্য্য (confusion) ও বিকৃতি (degeneration) যতটা হইতে পারিত, ততটা হয় না। প্রত্যেক গুরুই প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহার শিষ্যকে ঠিক নিজের শব্দসম্পদ অক্ষুণ্ণভাবে বহিয়া দিতে; এই কাণ্ডটাই বেদের প্রথম অঙ্গ—শিক্ষা। শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থায় ইহার প্রথম স্থান। সর্ব্বদাই যথাযথভাবে শব্দধারা পাইতে ও বহাইয়া দিতে গুরুশিষ্যপরম্পরা

সচেষ্ট ছিলেন ও আছেন! এ চেষ্টা না থাকিলে আরও বিকৃতি ও গোলযোগ হইত। পার্শ্বস্থ চিত্রে 'কখ' রেখা দ্বারা যদি আমরা শব্দের প্রকৃতি (pure, normal transmission) বুঝাই, তবে অপর দুইটি 'কগ' ও 'কঘ' বক্ররেখার মধ্যে মাঝেরটি গুরুপরম্পরায় শব্দসন্ততি (transmission of sounds) বুঝাইতেছে এবং বাহিরের বক্ররেখাটি গুরুপরম্পরা না থাকিলে যতটা বিকৃতি হইতে পারে তাহাই বুঝাইতেছে। সমান্তরাল রেখাগুলি (horizontal lines) দ্বারা বিভিন্ন থাকের অনুভব সামর্থ্য দেখান হইয়াছে।

শুধু রমেশ দত্তের বেদ অথবা মক্ষমূলারের বেদ পড়িয়া নহে, কাশীতে গিয়া রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদপারগ আচার্য্যের নিকট শিক্ষা কল্প প্রভৃতি অঙ্গের সহিত যে বেদ শব্দ আমরা শুনিয়া থাকি ও পড়িয়া থাকি, সে বেদশব্দও খাঁটী, অবিকৃত বেদশব্দ নহে, হইতে পারে না। বেদ শব্দের বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় রূপ প্রজাপতির ধ্যানের মধ্যেই আবির্ভূত হইতে পারে; ঋষিদের দর্শনে শব্দের বা মন্ত্রের যে রূপ ধরা পড়ে তাহাও প্রায় বিশুদ্ধ (approximate); তোমার আমার রসনায় ও কর্ণে তাহা অনেকটা বিকৃত। এ বিকৃতির হেতুগুলি পরে আলোকিত হইবে। এখন আমরা যে কথাটা বুঝিতে চাহিতেছি তাহা এই। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, সুতরাং বৈকুণ্ঠধামে তাঁহার উৎপত্তি। বৈকুণ্ঠধাম গোলোকধাম, এবং গো শব্দের অর্থ বাক্ ইহা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। স্বয়ং শিবজী কি যেন কি-একটা নেশা করিয়া গাহিতেছেন ও নাচিতেছেন; আর "বাজাও ত গজবদন লম্বোদর মৃদঙ্গ নন্দভরে"। অই বিরাট্ নৃত্যে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যিনি বিষ্ণু, তাঁহার সাত্ত্বিকভাব হইল. তিনি চঞ্চল হইলেন। এ চাঞ্চল্য কি সহজ চাঞ্চল্য? সৃষ্টির গোড়ায় সর্ব্বব্যাপী চিৎশক্তিতে যে দুই হইবার, বহু হইবার জন্য চাঞ্চল্য দেখা দেয়, ইহা সেই চাঞ্চল্য। ইহাই গোলোকের পরাবাক্ বা পরশব্দ। পরশব্দের যে লক্ষণ আমরা দিয়া রাখিয়াছি তাহা আপনারা যেন মনে রাখিবেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"—সেই বিষ্ণুপদ যখন চঞ্চল হইল তখনই গঙ্গা আবির্ভূতা হইলেন। এ কোন গঙ্গা? এ যে সনাতনী বেদময়ী শব্দময়ী গঙ্গা। ইহার তিন ধারা আমরা জানিতে পারিয়াছি—ঋক্, সাম, যজুঃ। সত্যসত্যই যে কত ধারা তাহা কে জানে? বিষ্ণুপদে যখন গঙ্গার উদ্ভব হইল, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে কমণ্ডলুতে ধরিয়া লইলেন। এখানে পরাবাক্ অপরাবাক্ হইল, পরশব্দ শব্দতন্মাত্র হইল, শব্দের মূলীভূত চাঞ্চল্য, বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দরূপে প্রকাশিত হইল। কোথায়? প্রজাপতির ধ্যানে অথবা পারমার্থিক কর্ণে। ব্রহ্মাতে আসিয়া শব্দের প্রকৃতি শব্দের প্রকৃতি হইল। নাস্তিক মহোদয় এ ব্যাখ্যায় রাগ করিবেন না। আমরা আপাততঃ যাঁহাকে প্রজাপতি বলিতেছি তিনি আমাদেরই অনুভব সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা মাত্র জীবে অনুভব সামর্থ্যে নানান্ থাক্ রহিয়াছে (a veriable magnitude, a series)। এই থাক্‌গুলির (seriesএর) পরাকাষ্ঠা (limit) কোথায়—ইহারই অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা প্রজাপতিকে পাকড়াও করিয়াছি। গণিতশাস্ত্রে ও বিজ্ঞানে কিরূপ পরাকাষ্ঠার অন্বেষণ হামেষা চলিতেছে; তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র আপত্তি দেখা যায় না। আমার প্রজাপতিকে নাস্তিক মহোদয় যদি কেবল একটা কল্পিত পরাকাষ্ঠা (conceptual limit) বলিয়াই মনে করেন, তাহা হইলেও আপাততঃ আমি উচ্চবাচ্য করিব না। উড্‌রফ সাহেব তাঁহার শব্দের ব্যাখ্যায় গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নজির লঙ্ঘন করিয়া রায় দেন নাই, এই কথাটি যদি এ পর্য্যন্ত খোলসা করিয়া বলিতে না পারিয়াছি তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত বৃথায়ই বকিয়া মরিয়াছি। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়কেই আমরা পাত পাড়িয়া বসাইয়া দিয়াছি; যিনি যে ভাবে লইবেন; রসগোল্লা পাতে পড়িলে যিনি বিনা ওজরে মুখে তুলিয়া দিয়া রসাস্বাদন করিবেন তাঁহাকেও আমরা ডাকিয়া বসাইয়াছি; আর যিনি পাতের রসগোল্লার দিকে চাহিয়া 'এটা সংজ্ঞামাত্র, কল্পনামাত্র, অথবা সত্যসত্যই একটা কিছু' এইরূপ বিচার করিতে করিতে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবেন, তিনিও আমাদের নিমন্ত্রণে বাদ যান নাই। সে যাহাই হউক, প্রজাপতির কমণ্ডলুতে যে গঙ্গা রহিলেন, তিনি ঠিক

আমাদের মর্ত্তের গঙ্গা নহেন। জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠায় যে শব্দরাজি, যে বেদ রহিয়াছে, আমাদের কুণ্ঠিত, কৃপণ জ্ঞানে সে শব্দরাজির, সে বেদের, ঠিকভাবে ও পূরাপূরি-ভাবে থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব, বেদেরও নানান্ থাক্—Veda-series। একটা যদি চরম থাক্ থাকে তবে তাহাই পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বেদ (pure and perfect Veda)। যে গল্পটা পাড়িয়াছিলাম সেটা চলুক। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে হর-জটায় আসিয়া সুর-শৈবলিনী পথ হারাইয়া, অপ্রকট হইয়া, কুলু-কুলু ধ্বনি করিতে লাগিলেন! ইহা হইল শব্দের এবং বেদের সূক্ষ্ম, অব্যক্ত অবস্থা—যে শব্দ যোগীরা দিব্য কর্ণে শুনিতে পান। মহাদেব যোগেশ্বর এ কথাটাও আপনারা মনে রাখিবেন। শেষে গোমুখীতে পতিতপাবনী শৈলসুতাসপত্নী বসুধা-শৃঙ্গারহারাবলীরূপে বসুন্ধরায় নামিয়া আসিলেন। ইহাই শব্দের ও বেদের স্থূল প্রকট মূর্ত্তি। গোমুখীর 'গো' মানে বাক্; গল্প এইখানে শেষ হইল; শব্দের পূর্ব্বব্যাখ্যাত সব কয়টা থাক্ আপনারা এই গল্পের মধ্যে পাইলেন ত? বিষ্ণুর চাঞ্চল্য পরশব্দ; ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে গঙ্গার আবির্ভাব শব্দতন্মাত্র বা শব্দের নিরতিশয় অবস্থা; হরজটাজালে গঙ্গার অবগুণ্ঠিতাবস্থা সূক্ষ্ম শব্দ; শেষে গোমুখী হইতে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ শব্দের স্থূল অবস্থা।

ব্রহ্মার ধ্যান যে বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ কিসে? বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দকে চিনিয়া লইব কি লক্ষণ দ্বারা? পূর্ব্বেই বলিয়াছি—অর্থ ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিত্য, অব্যভিচারী সম্পর্ক থাকিলে, তবে বিশুদ্ধ শব্দ হয়। কাণ ধরিয়া টানিলে যেমন মাথাকে আসিতে হয়, সেইরূপও যে শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার বাচ্যবিষয় অথবা অর্থ তৎক্ষণাৎ নির্ম্মিত হইবে তাহাই শব্দতন্মাত্র, বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ। বাইবেলে আছে—ঈশ্বর বলিলেন "আলোক হউক," আর অমনি আলোক হইল। বেদেও দেখিতে পাই প্রজাপতি "এতে" প্রভৃতি শব্দ করিলেন, আর এক জাতি সৃষ্টিপদার্থ আবির্ভূত হইল। যে শব্দ হইলে তন্মূলীভূত বা তজ্জন্য স্পন্দক্রিয়া একটা বিশিষ্ট পদার্থ তৎক্ষণাৎ গড়িয়া ফেলিবে, তাহাই সমর্থ ও স্রষ্টা শব্দ, তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ধর 'গৌঃ' এই জাতীয় শব্দ, যদি হয়, তবে যেই 'গৌঃ' শব্দ হইবে, অমনি তাহা সত্য সত্যই একটা গো সৃষ্টি করিয়া ফেলিবে। যদি তাহা পারে তবেই তাহা নিরতিশয় শব্দ নতুবা নহে। নিরতিশয় শব্দ ও তাহার বিষয় বা অর্থের মধ্যে এমনই বাঁধন, শব্দ হইলে অর্থকে নির্ম্মিত হইতেই হইবে। বিশুদ্ধ শব্দ হইল, তাহার বিষয় বা অর্থ কোথায় তার ঠিকানা নাই, এমন হয় না। বলা বাহুল্য, আমাদের শ্রুত বা উচ্চারিত কোন শব্দেই এ লক্ষণ খাটে না, সুতরাং কোনটাই বিশুদ্ধ নহে। অবশ্য প্রত্যেক শব্দেরই অল্পবিস্তর ভাঙ্গিবার গড়িবার শক্তি আছে। প্রত্যেক শব্দই ছোট-খাট এক একজন ব্রহ্মা ও রুদ্র। কিন্তু তাই বলিয়া যেই আমি "টাকা" এই শব্দটা উচ্চারণ করিব' সেই সে শব্দস্পন্দগুলি অণু-পরমাণুগুলিকে সমন পাঠাইয়া ধরিয়া আনিবে এবং সাজাইয়া গুছাইয়া "রূপেয়" গড়িয়া দিবে, টাকশাল ফাঁদিয়া বসিবে, এমন আশা কেহ করে না। আমার অভিপ্রেত পদার্থটি রচিয়া দিবার শক্তি আমাদের চলিত শব্দগুলির নাই। মুনি ঋষিদের উচ্চারিত শব্দের নাকি কতকটা এ সামর্থ্য—বস্তুকে গড়িয়া হাজির করে দিবার শক্তি—ছিল। কপিঞ্জল শ্বেতকেতুর আশ্রমে যাইতে যাইতে শূন্যপথে কোনও বিমানচারী এক সিদ্ধকে তাড়াতাড়ি যেমন লাফাইয়া যাইলেন, অমনি সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে শাপ দিলেন—ঘোড়া হও; কপিঞ্জলকে ঘোড়া হইতে হইল। এখানে শব্দশক্তি না অপর কিছু? দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া কন্বমুনির কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া হাঁকিলেন—অয়মহং ভোঃ। শকুন্তলা বেচারী স্বামিচিন্তায় ডুবিয়াছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা রাগে গস্‌গস্ করিয়া "আঃ অতিথিপরিভাবিনি!" ইত্যাদি বলিয়া শাপ দিলেন। শাপ ফলিল। কিসের জোরে? এ সব দৃষ্টান্তে যাহাই হউক, আমাদের শব্দগুলি সাধারণতঃ এমনই ফাঁকা আওয়াজ যে বাক্‌সর্ব্বস্ব কথাটা আমাদের কাছে গাল'ই হইয়া আছে। শব্দ হইলেই অর্থ যদি আপনা হইতেই ঘটিত, তবে বাঙ্গালীর মত সার্থক হইত আর কে?

যাহাই হউক, অর্থকে গড়িয়া তুলিবার সামর্থ-বিশিষ্ট যে শব্দ তাহাই নিরতিশয়। এখানেও সেই পরাকাষ্ঠার (limitএর) কথা। সকল শব্দই কিছু না-কিছু নাড়াচাড়া দিয়া ভাঙ্গিবার গড়িবার চেষ্টা করে। তারা বাতাসের ঢেউ, করিবারই কথা। কোনও শব্দ বেশী, কোনও শব্দ কম। সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ শব্দগুলি গড়ার দিকে কতক কৃতিত্ব দেখায়। তাই বলিয়া যেই আমি জলদগম্ভীর সুরে গাহিব "বৃষ্টি পড়িছে টুপ্ টাপ্" সেই পর্জ্জন্যদেব সত্যসত্যই এক পশ্লা বর্ষিয়া যাইবেন, এমন মেঘমল্লার আমি সাধিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে তানসেন দীপকরাগে পুড়িয়া মরিয়াছিলেন, একথাও স্মরণ রাখিবেন। অর্থাৎ আমার যে ছন্দোবদ্ধ শব্দটি অনেক পরিমাণে ব্যক্ত, গুণিব্যক্তির সাধাগলায় বাহির হইলে তাহাই আবার সার্থক। কাজেই প্রশ্ন উঠিতেছে —শব্দের কিছু-একটা গড়িয়া তুলিবার সামর্থ্য কতদূর পর্য্যন্ত। এখানেও নাস্তিক মহাশয় আমি মাথা নাড়িতে দিব না। যদি শব্দের সৃষ্টি-সামর্থ্যের (dynamic or creative function এর) একটা পরাকাষ্ঠা থাকে তবে তাহাই নিরতিশয় শব্দ। ইহাকেই সার জন্ উড্রফ স্বাভাবিক শব্দ (natural name) বলিতেছেন। তাঁহার নিজের ভাষায় স্বাভাবিক শব্দের লক্ষণ (test) এইরূপ :—the sound being given, a thing is evolved conversely, a thing being given a sound is evolved. যদি শব্দটা থাকে তবে তার অভিধেয় বস্তুটা গড়িয়া উঠিবে ; যদি বস্তুটা থাকে তবে তার শব্দ (অবশ্য শুনিবার কাণ থাকিলে) অভিব্যক্ত হইবেই। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থ যেন আমার হাতের দুইটা পিঠের মতন এদিক্ ওদিক্।

মাথার উপরে পাখা ঘুরিতেছে, তার শব্দ আমি শুনিতেছি ; কিন্তু আমার চশমার উপর একটি জলবিন্দু বা ধূলিকণা রহিয়াছে তাহার শব্দ কি আমি শুনিতে পাই? তাহার আবার শব্দ! আছে বৈকি! আমার ভৌতিক কর্ণের কাছে নাই ; যোগীর দিব্যকর্ণের কাছে হয় ত থাকিতে পারে ; পারমার্থিক কর্ণের কাছে নিশ্চয়ই আছে। কি ভাবে? মনে রাখিবেন, চাঞ্চল্য থাকিলেই যে কর্ণ নিরতিশয়রূপে শুনিতে পায়, তাহাই পারমার্থিক কর্ণ। ইলেক্ট্রনের চলাফেরাই হউক, ঈথার তরঙ্গগুলির অভিযানই হউক, অণুপরমাণুগুলির কম্পনই হউক, অথবা এ সকল অপেক্ষা স্থূল কোন রকম চাঞ্চল্যই হউক—পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যে সবই শ্রুত হইবে। দিব্যকর্ণেও ইহাদের অনেকগুলি শ্রুত হইতে পারে। এখন দেখা যাক্, চশমার উপর এই জলকণাটি কি? বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলের দানা পরস্পরকে ধরিয়া বাঁধিয়া এই জলকণাটি গড়িয়া রাখিয়াছে। প্রত্যেক দানা (molecule) র মধ্যে আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের পরমাণুগুলি রহিয়াছে ; তাহাদের ভিতরে ইলেক্ট্রনগুলি আবার সৌরজগতে গ্রহ-উপগ্রহের মত পাক দিতেছে। দানাগুলি কাঁপিতেছে ; পরমাণুগুলি নিজেদের একটা ব্যূহরচনা করিয়া (রসায়নশাস্ত্র ইহা space representation দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে) স্পন্দিত হইতেছে ; আর ইলেক্ট্রনগুলার ত কথাই নাই। অতএব জলকণাটি চাঞ্চল্য-বিশিষ্ট ; বিশেষভাবে তলাইয়া দেখিলে উহা চিদ্বস্তুর ভিতরে একটা চাঞ্চল্যবিশেষ ছাড়া আর কিছুই নহে। সুস্থির জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম ; একটি কেন্দ্র করিয়া লইয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অপর জায়গায় আর একটা ঢেলা ফেলিলে অপর একটা উত্তেজনার কেন্দ্র আমরা পাই। এইরূপ বহু উত্তেজনা-কেন্দ্র (centres of disturbance) আমরা পাইতে পারি। জগতে যে সকল বস্তুকে আমরা এক-একটা দ্রব্য বলিতেছি তাহারা (এবং আমরা নিজেরাও) ঐরূপ এক একটা উত্তেজনার কেন্দ্র। আধার বা উপাদানটা কি তাহা আপাততঃ ভাবিয়া দেখার দরকার নাই ; শাস্ত্র সেটাকে চিদবস্তু বা চিৎসত্তা বলিয়াছেন। কতকগুলি শক্তি (forces) দ্বারা এক একটা উত্তেজনা-কেন্দ্রের সৃষ্টি হয় স্থিতি হয়। জলে একটা আবর্ত্ত উৎপাদন করিতে এবং তাহাকে কিছুক্ষণ বাহাল রাখিতে অনেকগুলি শক্তির সমাবেশ আবশ্যক। সেই গুলিই

আবর্ত্তের সৃষ্টি ও স্থিতির মালিক। সাহেব সেগুলিকে constituting force বলিয়াছেন। তুমি আমাকে টানিতেছ, আমি তোমোকে টানিতেছি; তুমি একটা শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, আমি আর একটা। কিন্তু এই টানাটানি ব্যাপারকে যদি সমগ্র, সমস্ত করিয়া দেখা যায় তবে তাহার ইংরাজি পরিভাষা হইবে stress (শক্তিগুচ্ছ বা শক্তিব্যূহ); বর্ত্তমান দৃষ্টান্তে শক্তিব্যূহের দুইটা অংশ (elements or partials)—তোমার টানা ও আমার টানা। শক্তিব্যূহ শব্দটা ব্যবহার করিয়া আমরা বলিতে পারি যে জলের আবর্ত্তটির মূলে শক্তিব্যূহ (causal stress) রহিয়াছে, তোমার মূলেও একটা শক্তিব্যূহ, আমার মূলেও একটা, সকল জিনিষের মূলেই এক একটা শক্তিব্যূহ রহিয়াছে। আমরা নিজের প্রয়োজনমত ব্রহ্মাণ্ডটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা দেখিতেছি এবং ভাবিতেছি বুঝি একটা টুক্‌রার সঙ্গে আর একটা টুক্‌রার সম্পর্ক নাই, শক্তিব্যূহগুলি সব দুর্ভেদ্য ও পরস্পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, উদাসীন। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু সেরূপ নহে। এই ব্রহ্মাণ্ড একটা বিরাট্ অবিচ্ছিন্ন শক্তিব্যূহ (an infinite system of stress); যাহাকে জলের আবর্ত্ত বা ঈথারের আবর্ত্ত বলিতেছি সেটা সেই বিরাট ব্যূহের একটা অঙ্গ বা অবয়ব (partial) মাত্র। এখন জলকণার কারণীভূত শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে—ইলেক্‌ট্রনদেরই বল আর স্থূলতর দানা-গুলারই বল—সেই চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে (absolute ear) শ্রুত হইলে যে শব্দাভিব্যক্তি হল, সেই শব্দই জলকণার খাঁটি স্বাভাবিক শব্দ। জলকণার বেলায় যেরূপ, এই খড়ির টুক্‌রা বা অপর যে কোনও দ্রব্য ("চেতন, অচেতন উদ্ভিদ") এর বেলাতেও সেইরূপ। প্রত্যেকের সৃষ্টি ও স্থিতির মূলে শক্তিব্যূহ (constituting or causal stress) রহিয়াছে; নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্যে সেই শক্তিব্যূহের যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি, তাহাই পদার্থের বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ। জীবকোষেরর চলা-ফেরা হইতেছে; হ্রাসবৃদ্ধি হইতেছে; তাহার ভিতর ভাঙ্গা-চোরা (anabolism, katabolism) চলিতেছে; এই সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্যের মূলে যে শক্তিব্যূহ, তাহাই শব্দজ্ঞান জন্মাইলে, আমরা জীবকোষের স্বাভাবিক শব্দ পাই। আমি অবশ্য এ শব্দ ভৌতিক কর্ণে শুনিতে পাই না। ইলেক্‌ট্রনের চলাফেরা, ঈথারে আবর্ত্ত শুনিব কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিক ও যোগী দিব্য কর্ণে অতিন্দ্রীয় শব্দগুলির কতক কতক হয়ত শুনিতে পান; আমরা পারমার্থিক কর্ণের যে সংজ্ঞা দিয়াছি, তাহাতে যেখানেই শক্তিব্যূহ কোনও প্রকার চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিবে, সেখানেই সে চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শব্দরূপে শ্রুত হইবে; এবং তাহাই সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক শব্দ। যে জিনিষের যাহা স্বাভাবিক শব্দ, তাহাই তাহার নাম দিলে আমরা স্বাভাবিক নাম (Natural Name) পাই।

স্বাভাবিক শব্দ বস্তুর বীজ মন্ত্র। যথা 'রং' অগ্নির বীজমন্ত্র। যে জিনিষটাকে আমরা অগ্নি বলিতেছি, তাহার মূলে অবশ্য শক্তিব্যূহ (constituting force) রহিয়াছে; সেই শক্তিব্যূহ আমাদের চক্ষুকে উত্তেজিত করিয়া অগ্নির রূপজ্ঞান জন্মায়; ত্বগিন্দ্রিয়ের স্নায়ুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তাপজ্ঞান জন্মায়; কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া কোনও শব্দজ্ঞান জন্মায় না। পারমার্থিক কর্ণে কিন্তু তাহার একটা শব্দ আছে; দিব্যকর্ণও সে শব্দ কতকটা ধরিয়া ফেলিতে পারেন। দিব্যকর্ণ সেইশব্দকে 'রং' বলিয়া শুনিয়াছেন; এটি পরীক্ষণীয় ব্যাপার—রসায়নশাস্ত্রের অনেক ব্যাপার যেরূপ; আমরা যতক্ষণ পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া না লইতেছি, ততক্ষণ গুরুমুখে ও শাস্ত্রমুখে কেবল আমাদের শুনিয়াই রাখিতে হইতেছে যে লং বং রং যং হং এইগুলি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌ব্যোমের স্বাভাবিক নাম' এবং বীজমন্ত্র। পারমার্থিক কর্ণের সংজ্ঞা আমরা করিয়া লইয়াছি; কিন্তু কর্ণ স্পর্শ করার অধিকার আমাদের নাই; আমরা খুব জোর দিব্যকর্ণ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারি। এই দিব্যকর্ণের নজিরে আমরা বলিতেছি যে, অগ্নি বা ব্যোমের মূলে যে শক্তিব্যূহ রহিয়াছে, তাহার যে শব্দরূপে অভি-ব্যক্তি (acoustic equivalents) তাহাই অগ্নির বা

ব্যোমের বীজমন্ত্র—রং হং। অবশ্য দিব্যকর্ণরে শোনা শব্দ প্রায় বিশুদ্ধ, নিরতিশয় নহে; এইজন্য সাহেবের ভাষায় রং বা হং হইতেছে *approximate* acoustic equivalents of the underlying stresses or constituting forces of fire and æther. শুধু পঞ্চভূতের কেন, যত্র জীব তত্র শিব, যত্র শিব তত্র শক্তি; কাজেই জীবমাত্রেরই একটা নিজস্ব বীজমন্ত্র আছে। আমি দীক্ষার সময় গুরুমুখে যে মন্ত্র পাই, সেটা আমার নিজস্ব বীজমন্ত্রের অনুরূপ অথবা অনুকূল হওয়া চাই; বিরোধ হইলে, আমার ভিতরকার শক্তিব্যূহ (causal stress) অস্বস্থ, এমন কি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। গানে গলার সুর ও যন্ত্রের সুরের গরমিল (dis-harmony, discord) হইলে যাহা হয়, কতকটা তাহাই। বীজমন্ত্রের বা স্বাভাবিক নামের আর বেশী দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করার সময় আজ আমাদের নাই। বীজমন্ত্র মৌলিক (simple) ও যৌগিক (compound) হইতে পারে। "রং" মৌলিক বীজ, "হংসঃ", "হ্রীং" "ক্রীং" প্রভৃতি যৌগিক। আর এক কথা। স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্রকে আমরা যেন গুলাইয়া না ফেলি। শঙ্খ বাজাইলাম, অথবা কাক ডাকিল; এখানে শঙ্খের শব্দ বা কাকের ডাককে আমরা সাধারণতঃ স্বাভাবিক শব্দ বলি। আমাদের লক্ষণ অনুসারে ঠিক স্বাভাবিক নহে। যে শক্তিব্যূহ শঙ্খকে শঙ্খ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই যে শব্দরূপে অভিব্যক্তি (পারমার্থিক কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক), সেইটাই শঙ্খের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র হইবে। অবশ্য শঙ্খধ্বনিটা শঙ্খের বীজশক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বই সম্বন্ধশূন্য নহে! কাকের ডাক শুনিয়া আমরা কাকের নাম দিয়াছি কাক; এ নাম কাকের বীজমন্ত্র নহে; তবে কাকের ডাকটা কাকের কাকত্ব হইতেই নিঃসৃত হইতেছে; এইজন্য কাকের বীজমন্ত্রের নাম যদি মুখ্য (primary) স্বাভাবিক নাম হয়, তবে তার ডাক শুনিয়া তাহাকে যে নাম আমরা দিয়াছি, সে নামকে আমরা বলিব, গৌণ (secondary) স্বাভাবিক নাম।

স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের মোটামুটি বিবরণ আপনারা পাইলেন। সাহেব স্বাভাবিক নামের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন সেটা বিশেষভাবে দেখার বিষয়। সে শ্রেণীবিভাগ (classification) প্রবন্ধান্তরে বিশেষভাবে আলোচিত হইলেই ভাল হয়। আজ আপনাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্য নয়, জাগাইয়া দিবার জন্যই সেই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখমাত্র করিলাম। বীজমন্ত্রের গোড়ার কথা গুলি (principles) আমরা এই প্রবন্ধে কতকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম; শ্রেণীবিভাগটি বুঝিলে গোড়ায় কথা কয়টি বুঝিবার আরও সুবিধা আমাদের হইতে পারে। আপাততঃ, স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্রের দুইটা দিকই আপনারা যেন স্মরণ রাখিবেন। কোন দ্রব্য মানে, একটা শক্তিব্যূহ ও ও চাঞ্চল্যের কেন্দ্র; একটি থাকিলেই তার একটা শাব্দিক প্রতিকৃতি (acoustic equivalent) থাকিবে —পারমার্থিক কর্ণেই হউক আর দিব্যকর্ণেই হউক; তাহার বীজমন্ত্র। এই একটা দিক্। পক্ষান্তরে বীজমন্ত্র বা স্বাভাবিক শব্দ থাকিলেই দ্রব্য সঞ্জাত বা আবির্ভূত হবেই; যোগীরা 'রং' উচ্চার করিলে অগ্নির আবির্ভাবের সম্ভবনা আছে। তুমি আমি 'রং' অথবা 'অগ্নিমীলে' প্রভৃতি যৌগিক মন্ত্র পুনঃপুনঃ রীতিমত ছন্দে উচ্চারণ করিলে শক্তির সংহতি (summation of stimuli, superposition of motions) হইয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে, অন্ততঃ জঠরানল ত বটেই। ইলেক্ট্রনগুলি পুনঃপুনঃ ধাক্কা দিয়া মাথার উপর ঐ তারের মধ্যে যেমন বিজ্‌লি বাতি জ্বালাইয়া দিতে পারে, এখানেও সেইরূপ। আমার উচ্চারিত মন্ত্র বিশুদ্ধরূপে স্বাভাবিক নহে, কাজেই তাহাকে ফল দেখাইতে হইলে ধ্বনি ছন্দ প্রভৃতি বাহাল রাখিয়া বারবার আমায় সেটী জপ পুরশ্চারণ করিতে হয়।

শেষকথা, মন্ত্রের পরীক্ষা করিয়া দেখার কথা, বিজ্ঞানের কথার মত। হয়ত পরীক্ষায় সেগুলি 'হিং টিং ছট্' রূপেই ধরা পড়িতে পারে; আপাততঃ আমরা জানি না। তবে এটা বিলক্ষণই জানি যে

ারতের পঁচিশ কোটি হিন্দুর (শুধু হিন্দুর কথাই ালিতেছি) জীবনে মরণে, বিবাহে শ্রাদ্ধে, ক্রিয়াকর্ম্মে ও নিত্য নৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও ।তটা আধিপত্য করিতেছে, সেটা আমরা দু'পাঁচজন বাচাল কূপমণ্ডূক বাজে আলোচনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেও, সেটার চেয়ে বেশী কেজো কথা আমিত কমই দেখিতে পাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভ্রান্তি

বরঅঙ্গে উছলিছে লাবণ্য উল্লাস,
ঘনকৃষ্ণ ভ্রূরেখায়, রক্ত ওষ্ঠাধরে,
শান্তির ত্রিদিব স্বপ্ন আঁকা গর্ব্বভরে,
নেত্রযুগে সিগ্ধোজ্জল জ্যোতির বিলাস।
বিকশিত মুখপদ্মে মন্দ মৃদুহাস,
নির্ম্মল ললাটখানি দীপ্ত মহিমায়,
বাহুযুগ বিশ্বে যেন আলিঙ্গিতে চায়
বঙ্কিম গ্রীবায় কিবা গরিমা বিকাশ।

বিস্ময়ে চাহিনু নেত্র ফিরিল না আর,
কি সুন্দর, কি সরল কিবা সুকুমার !!

অন্তরে অন্তরে জাগে ভাবের উচ্ছ্বাস,
প্রসারিত পূরোভাগে রূপ-মাধুরিমা ;
আলিঙ্গন আশে মেলি ব্যগ্র বাহুপাশ—
একি ভ্রান্তি! এ যে মূক পাষাণ প্রতিমা!

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার।

জীবন্মৃতা।

ভক্তিমতীর জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে তিনটী বৎসর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীরের রক্ত জল করিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে দত্তপুরের অমূল্য মুখুয্যের পুত্র নরেশকে পাইয়া তারিণী চাটুয্যে একটা নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অমূল্য মুখুয্যে তিনপুরুষে কুলীন। নরেশ এণ্ট্রান্সস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তাহার পিতার অবস্থা ভাল না হইলেও নরেশ নিজেই যে তিনচারিটা 'পাশ' করিয়া একজন বড় 'চাকুরে' হইয়া ভক্তিমতীকে সোনায় মোড়াইয়া দিবে এবং ভক্তিমতী কলিকাতায় বাস করিবে এই আশাতেই তারিণীর স্ত্রীর হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। তারিণীও এমন সদ্বংশজাত সুপাত্রটী পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি কন্যার অতুলনীয় রূপরাশি ও নগদ সাড়ে সাতশত টাকা দিয়া নরেশকে জামাতা রূপে বরণ করিয়া লইলেন। অবশ্য এই টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে তিন বিঘা জমি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এমন সৎপাত্রটী লাভের আশায় তিনি সাত বিঘা জমির মধ্যে তিন বিঘা বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিশেষতঃ তখন তিনি কলিকাতায় এক মাড়োয়ারীর দোকানে চাকরি করিতেন। তিনি ভাবিলেন, "ভগবান দিন দিলে ও রকম কত বিঘা জমি আসতে পারে। কিন্তু, ভগবান তাঁহাকে সে দিনও দেন নাই, তাঁহার সে তিনবিঘা জমিও আর ফিরে নাই।

* * * * *

বাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া তারিণী দুইবৎসর পড়িয়া রহিলেন। কর্জ্জ করিয়া, স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করিয়া, কোনরূপে সংসার চলিতে লাগিল। অবশেষে, সারিয়া উঠিয়া যখন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, তখন দেখিলেন মাথাখাড়া করিবার উপায় নাই, দেনার চাপ এত বেশী! তারিণী চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন এমনি দুর্দ্দিনের মাঝে একদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে সংসার সমুদ্রে একা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। দুইটী পুত্র ও একটী চার বৎসরের কন্যা লইয়া তারিণী বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কাজেই তখন বিধবা ভগ্নী জ্ঞানদাকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইলেন।

* * * * *

বিবাহের কয়েকমাস পরেই নরেশ সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিল। গ্রামে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া অলসভাবে দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। মানুষের মন কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, যখন সুচিন্তার অভাব হয়, তখন দুশ্চিন্তা আসিয়া মনের উপর রাজত্ব চালায়। তাই, নরেশের মন ভাবিতে লাগিল, "আমোদ পাওয়া যায় কিসে?" দেখিল, গ্রামের আরও পাঁচজনের সঙ্গে মিশিয়া মদ্যপানে বেশ অমোদ আছে। অল্পদিনের মধ্যে নরেশ পুরা মাতাল হইয়া পড়িল। এদিকে, বৎসর চারি পাঁচের মধ্যে ভক্তিমতী নরেশকে দুইটী কন্যারত্ন উপহার দিল। এতদিন মাতাপিতার অনুতাপ ও তিরস্কার ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় কন্যাটি জন্মাইবার পর নরেশের মন ফিরিল, তাহার চাকরী করিবার ইচ্ছা হইল। পুত্রের সুমতি দেখিয়া তাহার মা 'হরিরলুট' দিলেন। পিতা, তাঁহার কোন এক বন্ধুকে ধরিয়া কলিকাতার এক আপিসে তাহার ত্রিশটাকা বেতনের একটী চাকরী যোগাড় করিয়া দিলেন। আপিসে কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার বেতন বৃদ্ধি হইল। কলিকাতা একটী ভয়ানক প্রলোভনের জায়গা; মনের রাশ একটু আলগা করিয়া দিলেই মন যেখানে ইচ্ছা লইয়া যাইবে। তখন জিনিষপত্র এত মহার্ঘ ছিল না, নরেশের বেতনের প্রায় অর্দ্ধেক টাকাই বাঁচিত। সে ঐ টাকা দিয়া তাহার নেশা চরিতার্থ করিত। সে ভাল ভাল মদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিল, ক্রমে আরও পঙ্কিল নেশার স্রোতে জীবন ভাসাইয়া দিল। অভাগী

ভক্তিমতী এবারেও একটী কন্যা প্রসব করিল। নরেশ বাবাকে অর্থ সাহায্য কোনদিন করে নাই শুধু মাঝে মাঝে বাড়ী আসিত কিন্তু কয়েক মাস হইতে সে আর বাড়ীও আসে নাই ; পত্র দিলে উত্তর ও দেয় নাই। তাই একদিন নরেশের গর্ভধারিণীর বিশেষ অনুরোধে নরেশের পিতা তাহার কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন্ তাঁহার পুত্র—শুধু মাতাল নহে অন্য দোষও ঘটিয়াছে। শুনিয়া বৃদ্ধের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে বাকী রহিল মাত্র। সে রাত্রিতে নরেশ বাসায় ফিরিল না! পরদিন প্রাতে যখন ফিরিল, তখন লজ্জায় নরেশ পিতার সহিত কথা কহিতে পারিল না। তাহার পিতাও অধিক কিছু বলিলেন না, শুধু একবার বাড়ী যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। "আচ্ছা" বলিয়া নরেশ নতমুখে বসিয়া রহিল। সেই দিনই তাহার পিতা বাড়ী ফিরিলেন ভাবিতে লাগিলেন, "ভগবান! শেষ পর্য্যন্ত এই দেখিবার জন্যই বাঁচিয়া ছিলাম।"

(২)

কয়েক বৎসর পরে নরেশের পিতা ও মাতা উভয়েই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। নরেশের সংসারে স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ রহিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে স্ত্রী ভক্তিমতী ও কন্যা তিনটীকে কলিকাতায় আনিয়া একটী বাসা ভাড়া করিতে হইল। একটী গলির মধ্যে স্যাঁতসেঁতে দুইখানি ঘর, বাতাস বা আলোক প্রবেশের কোন উপায় নাই। কনিষ্ঠ কন্যাটীর জন্মাবধিই অসুখ, ভক্তিমতীরও শরীর ভাল ছিল না কাজেই নরেশকে একজন ঝী রাখিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধা, বিশ্বস্ত ঝী মিলিল। বেলা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নরেশ অফিসে থাকিত; বাসায় ভক্তির নিকট ঝীই থাকিত। ভক্তি সারাদিন 'ঝী মায়ের' সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইত সন্ধ্যার সময় স্বামী বাড়ী ফিরিতেন। কয়েকদিন পরে ভক্তি দেখিল স্বামী আর ঠিক সময়মত বাড়ী ফিরিতেছেন না। রাত্রি ১২ টার সময় চক্ষুলাল করিয়া যখন বাড়ী ফিরেন, তখনও মুখ দিয়া মদের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। স্বামীর অবস্থা দেখিয়া, কিছু বলিতে সাহসে কুলায় না।

কনিষ্ঠ কন্যাটীর কয়েকদিন হইতে জ্বর হইয়া ছিল। সেদিন অফিসে যাইবার সময় ভক্তি নরেশকে বলিয়া দিল, "আজ একটু সকাল ক'রে এস, কা'ল থেকে চাঁপার জ্বরটা বেড়েচে।" নরেশ একটা "আচ্ছা" বলিয়া চলিয়া' গেল। কিন্তু সেদিনও সন্ধ্যায় ফিরিল না। পর দিন নরেশ ভক্তিকে বলিল "তোমার বালা দু'গাছা দাও"। ভক্তির আর যে দুইখানি গহনা ছিল, নরেশ একে একে সমস্তই ঘুচাইয়া ফেলিয়াছিল তাই সেদিন ভক্তি জিজ্ঞাসা করিল "কি হবে? আমি মনে করছি ঐ বালা দু'গাছি বাঁধা দিয়ে চাঁপাকে ডাক্তার দেখাবো।" নরেশ অমনি পদদলিত সর্পের ন্যায় ফোঁস্ করিয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "ডাক্তার দেখাবে, বটে! এক রাশ মেয়ে! একটা যায়ত ভালই তাকে আবার ডাক্তার দেখান কেন?" ভক্তি জানিত, স্বামীর সহিত তর্ক করিলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিবে, কাজেই আর কিছু বলিল না। নরেশ নিজেই বালা দুইগাছি বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ভক্তি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। মায়ের জন্য কাঁদিল, ভাবিল মা থাকিলে তাহাকে বোধ হয় কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। একবার মনে করিল, বাবাকে পত্র লিখিয়া দেয়। কিন্তু সে বাবার কষ্টের সংসারের কথা সমস্তই জানিত, কাজেই আবার ভাবিল, তাঁহাকে কষ্ট দিই কেন? ঝী এতক্ষণ কোথায় গিয়াছিল, সে আসিয়া ভক্তিকে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদছ কেন মা?" পূর্ব্ব ব্যাপারটী গোপন করিয়া ভক্তি বলিল "চাঁপা আমার ভাল হবে, ঝী মা!" ঝী বলিল "ভয় কি মা, ভাল হবে বৈকি, ডাক্তার আসছেন।" ডাক্তারের কথা শুনিয়া ভক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারের ভিজিটের টাকা কোথায় পাব?" ঝী বলিল সে ভার তোমার নয় মা, আমার।" ঝীএর সঞ্চিত যে অর্থ ছিল, তাহা হইতেই ঝী ডাক্তার বাবুর ভিজিট দিতে গেল। কিন্তু অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারবাবু টাকা লইলেন

না। কিন্তু চাঁপা বোধহয় এ দুঃখের সংসারে ফুটিবার যোগ্য ছিল না, তাই মুকুলেই ঝরিয়া গেল। ভক্তি কাঁদিতে লাগিল। মায়ের কান্না দেখিয়া তাহার অপর দুইটী কন্যা জয়া ও বিজয়া কাঁদিতে লাগিল। ঝী ভক্তিকে বলিল, "তুমি থামো মা, তুমি না থামলে ওরা যে থামে না!"

(৩)

কয়েকমাস পরে ভক্তি আর একটী কন্যা প্রসব করিল। নরেশ কন্যাটীর দিকে একবারও তাকাইল না। কিন্তু প্রসবের পরই ভক্তির ভয়ানক জ্বর ও সূতিকা হইল। কন্যাটীও অতিশয় দুর্ব্বল। মায়ের দুধ না পাইয়া তাহার বাঁচা ভার হইয়া উঠিল। তিনচারি দিন গেল; নরেশ ডাক্তারের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না দেখিয়া একদিন ঝী বলিল "বাবু, ডাক্তার ডেকে আনুন, মা যে আমার আর বাঁচে না, মেয়েটার জন্যে ত তত ভাবছি না।" প্রকৃতপক্ষে ভক্তির এ দু'দিনকার অবস্থা দেখিয়া নরেশের বোধহয় একটু ভয় হইয়াছিল, তাই সে এবার ডাক্তার ডাকিল। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "প্রাণের আশঙ্কা তত দেখছি না, তবে সেরে উঠতে বোধ হয় অনেকদিন লাগবে—বড় দুর্ব্বল ক'রে ফেলেছেন।" এক সপ্তাহ কাটিল কিন্তু ভক্তির অসুখ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল, ক্রমশঃ দিনে দুইবার ফিট হইতে আরম্ভ হইল। নরেশের হাতে একটী পয়সাও ছিল না, ভক্তির আর একখানি গহনাও ছিল না। কেই বা ডাক্তার ডাকে? অভাবের সময় মানুষের হাতে পয়সা না থাকিলে মাথার ঠিক রাখা কঠিন। নরেশও এ কয়দিন কি একরকম হইয়া গিয়াছিল। দুইদিন ডাক্তারও আসিল না, রোগী একটু সাগু ভিন্ন আর কিছু পথ্যও পাইল না। সেদিন সন্ধ্যার সময়েও নরেশ অফিস হইতে ফিরিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যখন ফিরিল, তখন ভক্তির অজ্ঞান অবস্থা, ঝী বলিল, "বাবু, মা ত আজ একটু দুধ সাগু ভিন্ন আর কিছুই পায় নাই, সে টুকুও খেতে পারে নাই। কি করি!—মেয়েটাও আর দুধ গিলচে না!" "মেরে ফেল" বলিয়া নরেশ চীৎকার করিয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে ভক্তির অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল, কোলের মেয়েটাও সেদিন আর বাঁচে না। ঝী দেখিল, মেয়েটা মরে মরুক ভক্তিকে বাঁচানই আগে চাই। তাই সে মেয়েটীকে নরেশের হাতে দিয়া যে ডাক্তার সেদিন ভিজিট লন নাই, সেই ডাক্তারকে ডাকিতে গেল। কিন্তু তাহাকে পায় নাই, তারপর বাজার করিয়া যখন ফিরিল, তখন দেখিল, মেয়েটী মারা গিয়াছে। সে কাঁদিল না; শুধু "ভক্তি" বলিয়া দুইবার ডাকিল, ভক্তিও সাড়া দিল না, নাসিকার নিকট হাত লইয়া দেখিল নিশ্বাস বহিতেছে। ঝী, নরেশকে কি বলিতে গেল; কিন্তু কি জানি কেন, নরেশকে দেখিয়া তাহার ভয় হইল, তাই সে কিছু বলিতে পারিল না। জয়া ও বিজয়া পাশের বাড়ীতে খেলা করিতে গিয়াছিল, তাহারা আসিলে ঝী দুটী দুটী করিয়া মুড়ী খাইতে দিল।

ঝী-এর প্রাণপণ চেষ্টায় ও ডাক্তার বাবুর দয়ায় ভক্তি একটু সারিয়া উঠিল। একদিন ঝীকে বলিল, "ঝী মা, এইবার বাবাকে একবার খবর দাও, তিনি আমাকে একবার নিয়ে যান্।" ভক্তির বাবাকে খবর দেওয়া হইল। তিনদিন পরে তারিণী চাটুয্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। ভক্তির অবস্থা দেখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ঝী বলিল, "এখন কাঁদিবার সময় নয় বাবা, যাতে এ বাঁচে তাই করুন।" তারিণী, স্ত্রীর মাকড়ী দুইটী বন্ধক দিয়া কয়েকটী টাকা আনিয়াছিলেন ডাক্তার ডাকিলেন; পথ্যের ও ঔষধের রীতিমত ব্যবস্থা করিলেন। ভক্তি সামান্য একটু করিয়া সারিয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তিকে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ডাক্তারকে সেদিন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "এইবার খুব সাবধানে নিয়ে যেতে পারেন, ষ্টেশন থেকে পাল্কী ক'রে নিয়ে যাবেন।" পাশের ঘরে নরেশ জয়া ও বিজয়াকে লইয়া ঘুমাইতেছিল। সেই রাত্রিতে তারিণী ভক্তিকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "বাড়ী যাবে মা ?" ভক্তি বলিল, "হাঁ, বাবা, বাড়ী যেতে বড্ড ইচ্ছে হয়, আমি ত আর বাঁচব না, একবার ভাই বোনগুলিকে আর পিসিমাকে দেখতে বড্ড ইচ্ছে হয়।" আরও চুপে চুপে ভক্তি বলিতে লাগিল, "বাবা, একটা কথা—কাউকে বলি নাই, কেউ জানে না। কোলের মেয়েটা বোধহয় মরত না! ঝী যখন ওঁকে মেয়েটা দিয়ে কোথায় গেল, উনি তখন গলা টিপে মেরে ফেললেন। আমার তখন জ্ঞান ছিল, কিন্তু কিছু বলিতে পারলাম না চোকটা বুজে প'ড়ে রইলাম। উনি মনে করছিলেন আমি তখন অজ্ঞান।" শুনিতে শুনিতে তারিণীর শরীর শিহরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "না, মা, তোমাকে আর এখানে রাখছি না।"

নরেশের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত কোন কথা হয় নাই, যাইবার সময়ও তারিণী কোন কথা বলিলেন না। নরেশ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। ঝী কাঁদিতে লাগিল। ভক্তিও কাঁদিতে কাঁদিতে ঝীকে বলিল, "আর জন্মে যেন্ তোমাকেই মা পাই।" সকলেই গাড়ীতে উঠিল। জয়া ও বিজয়া বাবা উঠিল না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা ম'শায় বাবা কই ?" গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, নরেশ একবার বাহির হইল, রাস্তার সেই গাড়ী খানির দিকে চাহিয়া রহিল।

সেইদিন ঝীও ঐ বাসা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(৪)

ভক্তি যখন বাড়ীতে পৌঁছিল তখন তাহার অবস্থা দেখিয়া পিসিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ভক্তির যে আর কিছু নাই দাদা, শুধু এ হাড় ক'খানা কি করতে নিয়ে এসেছ।" সত্য সত্যই ভক্তির সে কাঁচাসোণার মত রং পোড়া কাঠের মত হইয়া গিয়াছিল, ভোমরার মত কাল গোছাগোছা চুলগুলির চিহ্নপর্য্যন্ত ছিল না, ভাসা ভাসা চোখদুটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ভক্তি বলিল, "কেঁদো না, পিসিমা, আমি তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতেই এসেছি।" ভক্তির এ অবস্থা দেখিয়া পাড়ার কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

তারিণীর সাংসারিক অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। নিজের চারি বিঘা মাত্র জমি, তাহার ধানে সারাবৎসর কুলায় না, কাজেই ভগ্নীর শ্বশুরালয় হইতে তাহার খোরাকীর ধানগুলিও আনিতে হয়। নিজে গ্রামের এক মুদিখানার দোকানে খাতা লেখেন, মাসে তিন টাকা বেতন পান। জ্যেষ্ঠপুত্রটী গ্রামের স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাকে আর অধিকদূর পড়াইতে পারেন নাই। আর একটী তখনও গ্রামের স্কুলেই পড়িত। চিন্তায় চিন্তায় তারিণীর চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছিল, কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এতকষ্টেও তিনি অতি প্রত্যুষে খড়মপায়ে সাজিহাতে করিয়া ফুল তুলিবার সময় ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া যে গানখানি গাহিতেন, সেখানি এখনও ছাড়েন নাই।

সেদিন সন্ধ্যার সময় জ্ঞানদা বলিল, "দাদা গ্রামের রমেশ ডাক্তারই ত এতদিন দেখ্ চেন, কিছু ত ভাল বুঝতে পারছি না, এখনও ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভুল বকে। তেমনি ধারা কিছু খেতেও চায় না, আমি বলছিলাম দেবীপুরের বড় ডাক্তারকে একদিন আনলে হত না!"

তারিণী বলিলেন, "পাল্কীভাড়া আর ভিজিটে অন্ততঃ ৪।৫ টাকা লাগ্ বে। হাতে একটাও টাকা নাই। তুমি বোধহয় জান না, দোকানে সাত টাকা ধার, তার উপর আবার এই ক'দিন ধারেই জিনিষ আসছে। কাছে একটা টাকা ছিল, কাশিদাদা সেদিন কালনা যাচ্ছিলেন, ভক্তির জন্য বেদানা আন্ তে দিয়েছি। আর যে হাতে কিছুই নাই, দিদি!"

জ্ঞানদা বলিল, "আমার মল চা'রগাছা না হয় বাঁধা দাও, দিয়ে টাকা আন।" তারিণী বলিলেন, "তোমার যে আর কিছুই থাক্ বে না, তাহ'লে ?" জ্ঞানদা উত্তর করিল, "আমার কিছু থাকার দরকার নাই, ভক্তি আগে বাঁচুক। হাঁ, হাঁ, আজইত মোড়ল কাকার দুধের দামের টাকা তিনটে দিয়ে যাবার কথা। সে দিয়ে গেলেই ত হবে।" তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "তিন

টাকা কেন ?" জ্ঞানদা বলিল, "ভক্তি আর ছোট মেয়েটার জন্য তিনপোয়া দুধ রেখে সবটাই ত মোড়ল কাকাকে 'রোজ' দিই। তারিণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সেকি তুমিও রাত্রে একটু দুধ খাও না, একবেলা দুটো কি ছাই খাও! বারবার বল্‌ছি রাত্রে একটু দুধ তুমি নিজে খেয়ো, নইলে শরীর থাকবে কেন ?' ছি এমনি করে কি শরীরটা নষ্ট করে!" জ্ঞানদা কোন উত্তর করিল না। তারিণী হুঁকাটী লইয়া উঠানের আমগাছের তলায় একটী মোড়া লইয়া বসিলেন। আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া উঠিল। আকাশে দেখিতে দেখিতে তারা ফুটিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, "তারাগুলি সহানুভূতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকেই চাহিয়া আছে, বাতাস দীর্ঘনিশ্বাসে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

অবশেষে বড় ডাক্তারকে আনান হইল। তিনি বলিলেন, "এখন আর আমাকে কি জন্য ডেকেছেন ? এখন ত কোন আয় দেখছি না!"

আশার বিদ্যুৎ ও নৈরাশ্যের মেঘের মধ্য দিয়া আরও দুইদিন কাটিল। পরদিন ভক্তির অবস্থা দেখিয়া তারিণী কাঁদিতে লাগিলেন। জ্ঞানদা বলিল, "সে কি দাদা, তুমিই যদি কাঁদ, তবে ছেলেগুলোকে বুঝাবো কি ক'রে!" সেদিন আর তাহাদের বাড়ীতে হাঁড়ী চড়িল না প্রতিবেশীরা ছেলেগুলিকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইল। রাত্রিতে ভক্তি বড়ই প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিল। এক একবার বলিতে লাগিল, "মামীমা, এত রা'ত হ'ল উনি এলেন না কেন ?" আবার কখনও বলিল "মেয়েটাকে মেরেছ, আমাকেও মারবে নাকি ?" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল "ওগো, এসেছ, আমার কাছে বস, তোমার পায়ে মাথা রেখে মরি।" জ্ঞানদা বলিল, "ওকি বলছিস্ মা চুপ কর। ভক্তি চুপ করিল।

সেই রাত্রিতেই ভক্তি চিরনিদ্রায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। এতদিনে তাহার কষ্টের অবসান হইল।

* * * * *

পরদিন প্রাতে নরেশ ভক্তিকে দেখিতে আসিতেছিল। তখনও গ্রামে প্রবেশ করে নাই, মাঠে একটী বটগাছের তলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিল। দেখিল একটু দূরে শ্মশানে একটা শবদাহ হইতেছে। পাশের জমীতে এক কৃষক লাঙ্গল দিতেছিল। নরেশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের গ্রামে কে মারা গেল ?" কৃষক উত্তর করিল, "আজ্ঞে, পশ্চিম পাড়ার তারিণী চাটুয্যের বড় মেয়েটী ম'শায়; অনেকদিন থেকে ভুগছিলেন! ম'শায়ের কোথা থেকে আসা হচ্চে ?"

কৃষক আর কোন উত্তর পাইল না। নরেশ সেই গাছের তলায় শুইয়া পড়িল। গাছে কতকগুলি পাখী বসিয়াছিল, তাহারা "পৎ" "পৎ" শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল।

শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষা-প্রণালী।

রোমকগণ গ্রীসদেশ জয় করিলে রোম নগরে অনেক গ্রীক শিক্ষক যাইয়া যুবকগণকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষা প্রণালী গ্রীক শিক্ষকগণের প্রণালীর অনুযায়িক হইলেও কালক্রমে উহা কিয়ৎ পরিমাণে পৃথক হইয়া যায়। রোমকগণের আদর্শ virtus বা বীরত্ব ছিল। verless বলিলে মনুষ্যত্ব বীরত্বও সত্য নিষ্ঠা বুঝায় আর তাহাদের শিক্ষা প্রণালীতে বালকগণ যাহাতে প্রকৃত মনুষ্য হয় তাহার চেষ্টা করা হইত। খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ডে Grammar school স্থাপিত হয়। এই সকল Grammar school এ Trivum ত্রৈবিদ্যা অর্থাৎ ব্যাকরণ, ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্র আর quadrivum (চতুর্ব্বিদ্যা) অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করা হইত। পূর্ব্বে আমাদের টোলে ন্যায় শাস্ত্রের যেরূপ আদর ছিল, ইউরোপে মধ্য যুগে অরিষ্টটল প্রণীত ন্যায় শাস্ত্রও অন্যান্য গ্রন্থের তদ্রূপ আদর ছিল। অরিষ্টটল বা অন্য কোন পণ্ডিত যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অকাট্য ও সত্য বলিয়া গৃহীত হইত। গ্রীস দেশে অরিষ্টটলের সময় লোকের চিন্তা স্রোতের সামঞ্জস্য দেখা হইত। they tried to bring their thoughts into person with one another মধ্যযুগে লোকের চিন্তাস্রোত আরিষ্টটল বা অন্য পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে যাইতেছে কিনা তাহা দেখা হইত they tried to bring with their thoughts into person authority ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে Ignatieas Loyola ইগনোসিয়াস লায়লা নামক এক বিচক্ষণ ব্যক্তি এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায় Jesuit নামে অভিহিত হয়। Jesuits এরা ইউরোপের নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারা কূটনীতি শিক্ষা প্রদান করিতেন—The end justifies the means। উদ্দেশ্য সৎ হইলে যে কোন উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যাইতে পারে ইহাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল। তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনার্থে নরহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। Jesuits দিগের তর্ক কিরূপ কুসংস্কারযুক্ত ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাইবেলে লিখিত আছে Shed no blood রক্তপাত করিবে না। Jesuit পণ্ডিতগণ পাষণ্ড দলনার্থে (to check the heretics) স্থির করিলেন তাহাদিগকে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিলে রক্তপাত করা হইবে না তন্নিমিত্ত তাহারা heretics দিগকে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিতে লাগিলেন আর ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিও (Shed no blood) পালন করিলেন।

ইউরোপে অনেক বিখ্যাত শিক্ষক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে Locke, Postalvzzi jacotti, Rosseau, Herbert spencer ও Froebel এর নাম উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক লাক (Locke) ছাত্রদিগকে সকল দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণ বিচার করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, Till we see with our eyes and perceive it by our understanding we are as much in the dark as before" যে পর্য্যন্ত না আমরা নিজে বস্তু পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারি সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে থাকিব অর্থাৎ ঐ বস্তুর গুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিব। তাঁহার মতে বালকগণ প্রথমে নীতিশিক্ষা করিবে, তৎপরে জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে। পোষ্টালজী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুইজারলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পোষ্টালজী গাক্রদ ও লিওনার্ড নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে বালকগণকে নিজহস্তে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত আর কেবল মৌখিক শিক্ষায় কোন ফল হয় না ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি অন্যস্থানে এই উপদেশ যে কৃষক ও শ্রমজীবিদিগের সন্তানগণকে কৃষিক্ষেত্রে ও কারখানায় (workshop এ) শিক্ষা দেওয়া উচিত তিনি ফ্রান্স ও সুইজারলণ্ড দেশে শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে বলেন

"The reform needed is not that the school coach should be better horsed but that it should be turned on a new track" শিক্ষার সংস্কার করিতে হইলে উৎকৃষ্ট শিক্ষকের আবশ্যক নাই, কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পেষ্টালজীর এইমত অনুসারে বঙ্গদেশে কার্য্য করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহার অন্যান্য মত অনুসারে কার্য্য করিলে আমাদের বালকগণকে কৃষিকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত এরূপ শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক শিক্ষক যেন বালকগণকে বুঝাইয়া দেন যে ভারতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি না করিলে ভবিষ্যতে আমাদের আহারীয় সামগ্রী মিলিবে না। অতএব প্রত্যেক বালক যেন কিরূপে ক্ষেত্রের শস্য বৃদ্ধি হয় ও উদ্যানের আম, জাম, কাঁঠাল ও নারিকেল অধিক পরিমাণে ফলে সে বিষয়ে যত্নবান হয় আর আমাদের দেশীয় ধনীগণ যেন বিদেশ হইতে কল আনাইয়া ও কারখানা প্রস্তুত করিয়া এ দেশীয় লোকের দ্বারা তাহা পরিচালিত করিতে যত্নবান হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে অনেক যুবকের আর্থিক উন্নতি হইবে।

Jacotti ফ্রান্স দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলিতেন "Every one can teach and more over can teach that which he does not know himself" প্রত্যেক ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম আর যে বিষয়ে কোন ব্যক্তি অনভিজ্ঞ সে বিষয়েও সে ব্যক্তি শিক্ষা প্রদান করিতে পারে। Jacotti যাহা বলেন তাহার বোধ হয় অর্থ এই প্রত্যেক বালক ও বালিকা নিজে অন্যের সাহায্য না লইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে আর শিক্ষক পথ দেখাইয়া দিবেন। যদি কোন বালককে ভূগোল শিক্ষা দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে একখানি মানচিত্র রাখিয়া তাহাকে নিজে পর্ব্বত নদী প্রভৃতি দেখিয়া লইতে হইবে।

রুষোর মতে বালক বা বালিকার বার বৎসর বয়স হইলে তাহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে বালক বা বালিকার হস্তে কোন পুস্তক দেওয়া উচিত নয়। Froebel কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীর প্রবর্ত্তক। ইহার ও মণ্টেসরী সম্বন্ধে আমরা পরে দুই এক কথা বলিব।

ভারতবর্ষ ইংরাজ অধিকৃত হইলে এখানে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ হয়। এই শিক্ষা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ডেভিড হেয়ার, রাজা রামমোন রায় ও মেকলো সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভারতবাসী এই তিন মহাত্মার নিকট ইহার জন্য চিরকাল ঋণী থাকিবে। ইংলণ্ডে প্রথমে অক্সফোর্ড (oxford) ও কেম্ব্রিজ নামে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পরে ম্যাঞ্চেষ্টর, লণ্ডন প্রভৃতি আরও কয়েকটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা হয়। মিউটিনীর পর এদেশে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা হয়। এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহার গঠন সম্বন্ধে কিছু বাদানুবাদ হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশ বিবরণ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কেন গঠিত হইল তাহা পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে তিন শ্রেণীর বিদ্যা ছিল, যথা Elementary schools মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয় Grammar schools এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় Centres of education। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে আমাদের কাশী, মিথিলা ও নবদ্বীপের টোলের ন্যায় ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত এবং তথায় দূরদেশ হইতে ছাত্রগণ আসিয়া উপদেশ প্রাপ্ত হইত। ঐ সকল শিক্ষার কেন্দ্রে লাটিন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা হইত। একাদশ শতাব্দীতে আনসেলম্ ও তাঁহার শিষ্য আবিলার্ড শিক্ষা প্রদান করেন। আনসেলম্ (Anselm) ইতালী দেশের অন্তর্গত পিডমণ্ট (Piedmont) নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন অভিজাত ও সম্ভ্রান্তব্যক্তির সন্তান ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে তাঁহার সকল সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতাগণকে

বিতরণ করিয়া দরিদ্র ব্রত অবলম্বন করেন এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে বহুদিবস নিযুক্ত থাকেন। প্রথমে তিনি নর্ম্মাণ্ডি (Normandy) প্রদেশের (Bec) বেক নামক নগরে ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষকের পদগ্রহণ করেন আর ঐ স্থানে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে। ইহার পর তিনি প্যারি নগরে যাইয়া শিক্ষা প্রদান করেন। আবিলার্ড তাঁহার শিষ্য। আবিলার্ডের প্রকৃত নাম পিয়ার। তিনি বাল্যকালে মাংস প্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তাঁহার সহপাঠীরা Havelard বা মাংসভুক বলিত। এই নাম হইতে তাঁহার নাম Abelard হইয়াছে। ইনি প্যারি নগরে ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষাপ্রদান করিতেন। ইঁহারা দুইজনেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভক্তি ও বিশ্বাস জ্ঞান অপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই কথা বলিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস যেমন গাইতেন "দে মা আমায় পাগল করে, চাইনা আমি জ্ঞান বিচারে" ইঁহারা তদ্রূপ উপদেশ দিতে দিতে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন ইহাদের ছাত্রেরা প্যারি, পাডুয়া ও বলোন নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং ঐসকল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা মিলিত হইয়া এক এক মণ্ডলী স্থাপন করেন। প্রত্যেক মণ্ডলীকে প্রথমে Studium generale বা universale এবং তৎপরে universetas বলিত। Studium শব্দের অর্থ এক নগরের বিদ্যালয়সমূহ এবং generale শব্দের অর্থ সাধারণ। Studium generale এর অর্থ এক নগরস্থ যে সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ লোকের পুত্রগণের প্রবেশের অধিকার ছিল, সেই সকল বিদ্যালয়। কালক্রমে studium generale এর পরিবর্ত্তে universitas নাম ব্যবহৃত হয়। এই universitas হইতে university শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। university কে আমরা বঙ্গভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় বলি। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপবাসীরা পৃথিবী গোলাকার তাহা জানিতেন না। আমাদের পুরাণে জম্বুদ্বীপ, শকদ্বীপ প্রভৃতি যেরূপ সপ্তদ্বীপের উল্লেখ আছে, উহাদের গ্রন্থে সেইরূপ নানাস্থানের নাম ছিল। ইহা ব্যতীত তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন ওসেনাস (Oceanus) নামক একটী নদী পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে কলম্বাস আর ভাস্কো-ডিগামা জলপথে নানাদেশ অধিকার করিলে এবং ড্রেক ও মাগিলন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলে লোকে পৃথিবী গোলাকার ইহা বুঝিতে পারে। মুদ্রা যন্ত্র আবিষ্কার করা হইলে গ্রীকভাষায় হোমার হিসিয়ড ও প্লেটোরচিত গ্রন্থসকল ও লাটিন ভাষায় ভার্জিল, ওভিড ও হোরেস রচিত কাব্য সমূহ সকলেই পড়িতে সক্ষম হন। এইরূপে অনেকেই লাটিন ও গ্রীকভাষায় ব্যুৎপত্তি-লাভ করেন। তজ্জন্য সে সময় শিক্ষিত লোক বলিলে লাটিন ও গ্রীকভাষাভিজ্ঞ লোক বুঝাইত। লোকের যখন এইরূপ ধারণা ছিল, সেই সময় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। এই কারণেই ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন ও গ্রীকভাষার অত্যাধিক আদর ছিল। ঐ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি বা ফরাসি ভাষার প্রথমে তত আদর ছিল না। ছাত্রেরা সে সময় কলেজে লাটিন ভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিত। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ সকল একই নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহাদের কলেজ সমূহের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক প্রায় সকলেই ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। কিন্তু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় যে সময়ে সংস্থাপিত সে সময় ফরাসি ও জার্ম্মাণভাষায় পারদর্শিতা লাভ করা প্রয়োজনীয় বোধ হইত। সেই কারণে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী ফরাসীভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন ও গ্রীক ভাষার তত আদর করা হয় নাই। এই সকল কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুযায়ী হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে পর শিক্ষা-বিভাগ সংগঠিত হয় আর শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারিকে (Derector of Public Institution) নাম দেওয়া হয়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীবেচারাম নন্দী।

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র বি-এ, কর্ত্তৃক "শিশির প্যাবলিশিং হাউস," কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত তিনখানি পুস্তক (উপন্যাস) আমরা অনেকদিন হইল সমালোচনার্থ পাইয়াছি—গতানুগতিক ভাবে পুস্তকের সমালোচনা করা বা আসল খাঁটী সত্যকথা বলিয়া প্রীতিভাজন কিম্বা অপ্রীতিভাজন হওয়ার উপর নির্ভর করিতে গেলে সমালোচনা চলে না। আজ যে এত কথায় মুখবন্ধ করিতে হইতেছে তাহার কারণ, আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম সেরূপ হইল না—কথার সত্যতা শুধু রঙ বে-রঙের ছোট বড় লম্বা অক্ষরের মধ্যেই পর্য্যবসিত রহিয়া গেল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত হতাশ হইয়াছি—প্রকাশকের অর্থাভাব ও লেখকের অভাব যে বাঙলা দেশে আছে সেকথা হঠাৎ স্বীকার করিতে রাজী নই। এইরূপ পুস্তক দেখিয়া ইহাই মনে হইতেছে যে হয় যথেষ্ট পুস্তক সংগ্রহ হইতেছে না অথবা পুস্তক অপর্য্যাপ্ত আসিয়াও উপযুক্ত নির্ব্বাচনের অভাবে ফেরৎ যাইতেছে। যাই হোক এই নবীন প্রকাশকের কর্ম্মপদ্ধতি ও উদ্যম দেখিয়া যে আশা এখনও আমরা ত্যাগ করি নাই—তাহা যেন পূর্ণভাবে সার্থক হয়।

"সাধের বৌ"—উপন্যাস সিরিজের প্রথম উপন্যাস। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র।

এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা একটা উদ্দেশ্যকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে; এই শ্রেণীর গল্পকে অনেকে একটু তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন; কারণ গল্প-পাঠক আমোদ চাহেন, উত্তেজনার জন্য লালায়িত, তিনি গ্রন্থকারের নিকট নৈতিক উপদেশ সহ্য করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু আর একদিকে গল্পের মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য একান্ত আবশ্যক; ভাল গল্প এই উদ্দেশ্যের সাহায্যে স্ফূর্ত্তি লাভ করে; ইহার অভাবে উহা দাঁড়াইতে পারে না। এই অবস্থায় লেখকের কর্ত্তব্য বেশ জটিল হইয়া পড়ে; তাঁহাকে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়; উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে অথচ তাহার শক্তি যেন পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে।

আর এক শ্রেণীর লেখক শুধু সুন্দরকে ভাষায় ফুটাইয়া পাঠকের সম্মুখে ধরেন—তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সার্থকতা। সাধারণের পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক সারবান উপন্যাসেরই প্রয়োজন—এই শ্রেণীর উপন্যাস লেখকের কৃতিত্ব উদ্দেশ্যের মহত্বে ও ঘটনা সমাবেশের চাতুর্য্যে।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ—এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যকে বেশ একটা স্বাভাবিক চাতুর্য্যে গোপন করিয়াছেন ইহা খুব প্রশংসনীয়। বিগত যুদ্ধে সভ্যতার যে দিকটা একেবারে অলীক ও মানবত্বহীন বলিয়া অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল, পাঁচকড়ি বাবু সেই দিক হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রলুব্ধ মনকে ভারতবর্ষের ঘরের দিকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"ইয়ুরোপের কোনও দেশ * * * জীবন মরণের প্রহেলিকা এখন ভাবে নাই, বাঁচিতে হয় কেমন করিয়া তাহা ইয়ুরোপ জানে না। ইয়ুরোপ মরিতে ও মারিতেই শিখিয়াছে" "ইয়ুরোপ সেইদিন বাঁচিতে শিখিবে, যেদিন গতি ও উন্নতির বাজে কথা ভুলিয়া স্থিতির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িবে।" মামুলি আস্ফালন পূর্ণ বক্তৃতার আহ্বান হইতে ইহার একটা বিশেষত্ব আছে।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যে চিত্র তিনি দেখাইয়াছেন তাহা Utopia চিরকালই মনোরম এবং বর্ত্তমান দুঃখদ্বেষ সংক্ষুব্ধ সংসারের মধ্যে এই স্থির অবিচলিত সংঘের চিত্র এই Utopia আরও বিশেষ মনোমুগ্ধকর—ইহা

বস্তুতন্ত্রহীন কিনা তাহা বর্ত্তমান সমালোচনার বাহিরে। "সাধের বউ" আবেগ ও চরিত্রের সংঘাতে আর্টিষ্টিক হয় নাই—গ্রন্থকার নিজেই মুখবন্ধে বলিয়াছেন "সাধের বউ উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা * * * তাই ইহাতে তেমন চরিত্রের উন্মেষও করিবার চেষ্টা করি নাই। সে সব বাকী দুইখানা পুস্তকে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে। সাধের বৌ আমার বক্তব্যের উপক্রমণিকা মাত্র।" এই পুস্তকের মধ্যে আর্ট থাক বা না থাক ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। তবুও হিন্দুর গার্হস্থ্য চিত্রের মধ্য দিয়া সুন্দর ও মধুর ভাব এবং. সুখদুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে সরল ও স্বাভাবিক জীবন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মাটী নিবি গো' বলিয়া যে ভাবে দেশাত্মবোধকে তিনি হিন্দুসমাজের অনুভূতির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সত্যই হৃদয় একটা সম্ভ্রম ও গৌরবের আতিশয্যে নুইয়া পড়ে।—"মাটী লক্ষ্মী, মাটী শেষের সম্বল। যাহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে তাহার মাটী আছে।" তবে তিনি মাটী ও খ্যাওরার জের বড় বেশী টানিয়াছেন। বইখানিতে অনেকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ আছে।

পাঁচকড়ি বাবু প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক—তাঁহার দক্ষ লেখনী উপন্যাস-সাহিত্যের উপকারই করিবে—ক্ষতির ভয় নাই। তিনি আশা করিয়াছেন "এই সন্ন্যাসীদের চেষ্টায় আমাদের ভাঙা হিন্দু সমাজ আবার গড়িয়া উঠিবে।" একস্থানে তিনি বলিয়াছেন "তান্ত্রিক আমরা সবাই * * * তান্ত্রিক সাধনা ছাড়া কলিতে অন্য সাধনা প্রশস্ত নহে" আবার অন্য একস্থানে বলিয়াছেন "* * বৈষ্ণব ধর্ম্মের মজা কি জান? ইহা সদ্য ফলদাতা, এক লক্ষ নাম জপ কর, হাতে হাতে ফল পাইবে, তাহার উপর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমন্বয়ের ধর্ম্ম, এখন সমন্বয় ছাড়া গতি নাই।"—এই সব প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া তিনি গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—সমাধান তাঁহার হাতে, আমরা তাহারি প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সহধর্ম্মিণী। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। মূল্য ১৲ একটাকা। এখানি "উপন্যাস সিরিজের দ্বিতীয় উপন্যাস" (?) —উপন্যাস নামের অযোগ্য। একটা ডিটেক্‌টিভ গল্পের ছাঁচে মন ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। পাকা ডিটেক্‌টিভ গল্পলেখক এই পুস্তক প্রণয়ণকালে এমন অসামঞ্জস্য ও বস্তুতন্ত্রহীন ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যে তাহাতে বাস্তবিকই হতাশ হইবার কারণ আছে।

ইহাতে সাধু ভাষার আদ্য-শ্রাদ্ধও যথেষ্ঠ হইয়াছে যথা—"তাঁহারই সমস্ত প্রাণটা কি যেন একটা নব আশা লইয়া নবভাবে সজ্জিত হইবার জন্য নব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

"—* * দুই পার্শ্ব নব-পল্লব-মণ্ডিত-সরল-তরুরাজি পরি বিবিধ বিহগকুলের কলধ্বনি মুখরিত।"

"—তাহার হৃৎপিণ্ড যে উপরিয়া যায়।" ইহা ছাড়া "চারু সর্ব্বাঙ্গী" "কমল-কমা," "ভয়ঙ্করী-কালসর্পী," "অশেষ ক্লেশাকর," "ততোহধিক" প্রভৃতিরও অভাব নাই।

—"এই নিদারুণ আন্তর দেবাসুর দ্বন্দে নিপীড়িতা, —সে এখন প্রচণ্ড ঝটিকা বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গমালা-সমাকুল মহাসাগর বক্ষে নিপতিতা।" ইত্যাদি।

এইরূপে গল্প শেষ করিয়া কলেবর বৃদ্ধির জন্য "সর্ব্বনাশিনী" শীর্ষক এক "ভৌতিক কাহিনী"র অবতারণা করিয়া পাঠকের সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে। ইহাতে "নির্জ্জন দুর্গমস্থান," প্রতি পদে পদে আছে, অতএব পাঠকের "একটি বার পাদ-স্খলন হইলেই সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া অস্থিপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা।" "দুর্গম গিরিভূগু দেশের অতি দুর্গম স্থানে" "সমস্ত দিন পাদচারে আমরা নিতান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া" পড়িয়াছি তবে "শুনিয়াছি তাঁহার (কমিশনার সাহেবের) আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটীটী (অর্থাৎ যেখান হইতে "সর্ব্বনাশিনী"র উৎপত্তি) একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে" নচেৎ ভবিষ্যতে আরো সর্ব্বনাশের সূচনা হইত।

বঙ্গের নিলাম। শ্রীযতীন্দ্র নাথ পাল প্রণীত মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ। বর্ত্তমান সমাজের বর-পণ প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই গল্পটী লিখিয়াছেন। কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার শোচনীয় অবস্থাকে বিবৃত না করিয়া তিনি অর্থলোলুপ বরের পিতার মূঢ়তাকে

সাধারণের সম্মুখে উপহাসের সামগ্রীরূপে ধরিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ঘটনা পরম্পরার মধ্যে এতই সমাবেশ-চাতুর্য্য ও কলা-কুশলতার অভাব যে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে!! পুস্তক পাঠকালে শরৎ বাবুর "বড়দিদির" ঘটনা ও চরিত্রাঙ্কন সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া বড় হতাশ করিয়া দেয়।

বরের পিতা রামজীবন বাবুর বেগুনের ক্ষেতে, বিপিন বাবু সুকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া উপস্থিত,—পরক্ষণেই নলিনীর ননদের সহিত বিবাহ না দিলে চলিবে না বলিয়া নলিনীর জেদ,—পরমুহূর্ত্তেই স্থানীয় সবজজ বাবু একই উদ্দেশ্যে হঠাৎ আসিয়া হাজির, —এইত গেল বেগুন ক্ষেতে বেলা দ্বিপ্রহরের ব্যাপার। বিশ্রামের পর সেই দিনই ডাকযোগে বাল্যবন্ধুর চিঠিতে একই বিবাহের সম্বন্ধের কথা—আবার সেই মুহূর্ত্তেই প্রমথ বাবুর মেয়েরাও একই উদ্দেশ্যে আসিয়া হাজির— একসঙ্গে পাঁচ পাঁচটা বিবাহের সম্বন্ধ একই দিন, এমন কি একই সময়ে অন্ততঃ দুইটী করিয়া উপস্থিত হওয়ার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা তাহা শুধু গল্পের আর্টকেই নষ্ট করে না—আরো অনেক জিনিষ নষ্ট করে।

তারপর এক ফর্দ্দ হারানর ব্যাপারকে ৩৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত টানিয়া আনা হইয়াছে।—এইরূপ long drawn monotonyতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে—বিরক্তিটা প্রকাশকেরই উপর বেশী হয়। রামজীবন বাবু "তাঁহার বাল্যবন্ধু উমাপতি উকিলের পরামর্শে তাহার পুত্রকে কলিকাতা নিলাম অফিসে পাঠাইয়া প্রকাশ্যভাবে নিলাম করিবেন স্থির করিলেন......সেই অনুযায়ী কার্য্যও তখনই সম্পাদন হইয়া গেল।"— এসব "Impossible possibility!" সুকুমার একজন বুদ্ধিমান এম-এ পাশ করা 'আধুনিক যুবক তাহাকে নিলাম অফিসে পাঠানর মধ্যে একটা impossiblity আছে তাহা লেখক বেশ বুঝিয়াছেন তাই তার পরের ছত্রেই তিনি apology দিয়েছেন "এই পৃথিবীতে এমন এক একজন আছে যাহারা নিজের সম্পূর্ণভার অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদের নিজের কোন মতামত থাকে না তাহারা ঠিক যেন কলের পুতুলের মত কাজ করিয়া যায়। সুকুমার ঠিক সেই শ্রেণীর লোক তাহা ছাড়া শিশুকাল হইতে আর একটা দৃঢ় ধারণা ছিল যে পিতাই জগতের সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ।" যাক, এইরূপে বরকে নিলামের দরে চড়াইয়া যথেষ্ট নাকালের পর একটা মামুলি সিদ্ধান্তে উপনীত করান হইল। গল্পামোদী পাঠকও ইহাতে কতদূর আমোদ পাইবেন জানি না। এই পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর প্রমাদের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে—সাধারণ কথাগুলিকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া একটা নূতনত্বের সৃজন করা হইয়াছে—যথা—হইতে ছিল, করিয়া ছিল, আসিতে ছিল ইত্যাদি, আরো চুল, শিথীল, আচল, ক্লীষ্ট প্রভৃতি অজস্র মুদ্রাকর প্রমাদ আছে। তাহাছাড়া "রাগের সাঁজ", একই স্থানে "বাসন্তী লিখিতেছিলেন," আবার "সে (বাসন্তী) জিজ্ঞাসা করিল", "মাধবী কণ্ঠে একটু ভ্রুকুটী দিয়া বলিল" একই ছত্রে 'কাসি' ও 'কাশি'—সূর্য্যকিরণের সঙ্গে চিটা গুড়ের তুলনা "কেদারার দিকে আহ্বান দেখাইয়া" "সূর্য্যের কাল আভা" "শিহরের নিকটে" ৮৮ পৃষ্ঠার দুর্ব্বোধ্য "সে", "বিপর্য্যস্ত হাঁপায়ে" "দ্বিতীয় সুবিধার চেষ্টায় থাকুন" "গেরো"র স্থানে "গোরা" প্রভৃতি গেরোতে বইখানি পূর্ণ, খুঁটিনাটী বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয় তাই এই পর্য্যন্ত। পদ্মপাদ।

ভ্রম সংশোধন :—

৬২৪ পৃষ্ঠায় শেষ ছত্রে 'যায়' স্থলে 'যার' হইবে।
৬৬৮ „ ৯ম ছত্র ছাড় হইয়াছে——
এইরূপ হইবে—,
"আর, কোথাও করে হাঁক ডাক আর কোথাও

সত্ত্বাধিকারী—মহারাজ স্যার শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই।

সম্পাদক—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

উপাসনা সমিতিকর্ত্তৃক শ্রীমুকুন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ। | মাঘ,—১৩২৬ | ১০ম সংখ্যা।

আলোচনী।

অতীতের মোহ।

একটা বড় বনেদী বংশ ভাগ্যের ফেরে দুরবস্থায় এসে পড়লে প্রায়ই দেখা যায় সে বংশের বংশধরেরা পূর্ব্বপুরুষের বড়মানুষি চালচলন, গর্ব্ব-গৌরবের দোহাই দিতে বড় ভালবাসে। পাছে পাড়ায় হঠাৎ-বড়লোকেরা তাদের হীন দীন ভাবে আর ভেবে তুচ্ছ জ্ঞান করে এই জন্যে যেখানে সেখানে কারণে অকারণে নিজেদের বংশমর্য্যাদা বা পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের জয়ডঙ্কা বাজাতে আরম্ভ করে। ফলে অনেক সময় সত্যের চেয়ে মিথ্যার বহরটা খুব বড় হয়ে ওঠে এবং সেটা বেশীভাগ সজ্ঞানে হয়; কারো পূর্ব্বপুরুষের হয়তো ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল সে ঘোড়ার সঙ্গে দুটো হাতী যোগ করে দেয়; ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও কথা ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন খাটে, জাত সম্বন্ধেও তেমনি খাটে। এককালে খুব বড় ছিল এমন একটা জাত কুষ্টির দোষে বা কৃতকর্ম্মের ফলে ছোট হয়ে দুর্ব্বল, অক্ষম পরাধীন হয়ে পড়লে সেও বড়াই করতে ছাড়ে না—"আমরা এই ছিলুম এই করেছিলুম, আমাদের এ ছিল, ও ছিল, আমরা জানতাম না কি? করিনি কি?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইটাই হচ্চে 'অতীতের মোহ'। হয়তো গণ্ডীর বা মাত্রার মধ্যে ধরা বাঁধা থাকলে মাত্রা পরিমাণে এই নেশা বা মোহটা দুর্ব্বল অধঃপতিত জাতের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু বাড়াবাড়িটা কিছু না। সেটা একটা রোগলক্ষণ! সুস্থ দেহের ও মনের লক্ষণ মোটেই নয়। দুর্ব্বলে সবলা নাড়ীর মত, এই দুর্ব্বলে সজোর মস্তিষ্ক সর্ব্বনাশিকা!

সম্প্রতি আমাদের দেশে—দেশ বলতে ভারতবর্ষে বল্‌ছি একদল প্রাচীন বিদ্যার্ণবদের মধ্যে এই নেশার ঝোঁকটা বড় বেশী মাত্রায় এমন কি হাস্যকর পরিমাণে দেখা দিয়েছে। এই নেশার প্রধান বাহ্য লক্ষণ হচ্চে বেদপুরাণ থেকে প্রমাণ করা যে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের বড় বড় যত সব আবিষ্কার তা আমাদের ঋষিরা আগেই করে ফেলে ছিলেন। আমরা কোন্ সময় নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সেই সময় পাশ্চাত্য জাতিরা এসে সব ফুস্‌লে চুরি করে বার করে নিয়ে গিয়ে নিজেদের নাম দিয়ে মৌলিক আবিষ্কার বলে জাহির করছে! এমনি সব বেইমান! যা-হোক আমরা সে সব ধরে ফেলেছি! এখন দেখা যাচ্ছে বেদেই সব আছেন!

কেমিষ্ট্রী বল, ফিজিকস্ বল, অ্যাসট্রনমি বল, জিওলজি বল, আর বিবর্ত্তনবাদই বল—রেলগাড়ী, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, জেপ-লিন, টেলিগ্রাফ্ যাকিছু বল সব, সমস্ত, বেবাক্ ঋষিরা বার করেছিলেন। আমাদের কপাল নেহাৎই মন্দ তাই সে সব লোপ পেয়ে গেল, রয়ে গেল দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, অহল্যা ইন্দ্রের কুচ্ছা, কুন্তীর দুর্ণাম, রাবণের দশ মুণ্ড, কৃষ্ণের ব্রজলীলা, এই সব যার জন্যে বিদেশীর কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এ সবের ওই সব গোখাদকের দল কি বুঝবে! কাজেই তারা ওই সব ধরে ঝুটো তর্ক করে আমাদের অসভ্য বলে প্রমাণ করছে।

পাঠক ও পাঠিকারা মনে করছেন হয়তো আমি রঙ্গ-রহস্য করছি। সত্যিই না, এই সব যে ঝড়াঝড় প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তার নজীর আছে—আমাদের বাঙ্গলা দেশের বেদজ্ঞ পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্তরত্ন মহাশয় উঠে পড়ে লেগে আজ বার বৎসর যাবৎ চতুরবেদ সমুদ্র মন্থন করে প্রমাণ করে তবে ছেড়েছেন আমাদের কলের গাড়ী, ষ্টীমার, বাইসাইকেল, এরোপ্লেন ছিল; আর ভরসা দিয়াছেন প্রমাণ করবেন যে সবমেরীন্, যুদ্ধজাহাজ, ট্রেঞ্চ-যুদ্ধ, ওয়ারলেস্ টেলিগ্রাম, টরপেডো এসবও জানা ছিল এবং সেকালে দুবেলা ব্যবহার হতো! বিশ্বাস না হয় গত মাসের আর এ মাসের "নারায়ণ" দেখবেন। এমন কি ইয়ুরোপটাও নাকি 'হরিয়ুপীয়া' ছথ নামে ভারতবর্ষের কোন খাঁজে জোড়া ছিল; কোন মন্বন্তরের জলপ্লাবনে ছিঁড়ে ভেসে গিয়ে আধুনিক স্থানে লেগে গেছে! উ:—একেবারে পুকুর চুরী মশাই! প্রাচীন পুরানো 'উপাসনা' খুজলে এই সব মূল্যবান গবেষণা পাবেন। গুপ্ত-রত্নের কৃপায় আমরা এই সব লুপ্ত-রত্নের পুনরধিকারী হচ্ছি। তাঁর জয় জয়কার! কত নাম করবো—আমাদের 'হরি-কুলেশ'কে 'গিরীশ'রা চুরি করে নিয়ে গিয়ে হারকিউলিস নাম ভাঁড়িয়ে রেখেছিল। এসব আমরা এতদিন খেয়ালই করিনি, ভাগ্যে ছিল 'বেদ' আর ছিলেন এই সব বেদজ্ঞরা, খুব চুরি ধরা পড়েছে!

সম্প্রতি 'ভারতবর্ষে'ও দেখলাম বেদ থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবীর সূর্য্যার্ক প্রদক্ষিণ, মাধ্যাকর্ষন, কেপলারের 'ল' ইত্যাদি করে অনেকগুলা নিগুঢ় জ্যোতিষতত্ত্ব সে কালে অর্থাৎ সুদূরতম বৈদিক যুগে জানা ছিল!

আবার মাদ্রাজ অঞ্চলে কোন বেদপণ্ডিত প্রমাণ করছেন যে—(অক্টোবর সংখ্যক Indian Review ৭১১ পৃষ্টায় দেখুন) ঋগ্ বেদটা আগাগোড়া জড় বিজ্ঞানের শাস্ত্র! 'যজ্ঞ' মানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এক্‌সপেরিমেণ্ট! দেবতারা সব প্রাকৃতিক শক্তি যথা Electricity, magnetism, heat, light, এমন কি প্রথম ঋক্‌টা যার প্রথম লাইন "অগ্নীমীলে পুরোহিতং ঋত্বিজং" ইত্যাদি সে আর কিছুই নয় Oxygen গ্যাস তৈরির যে দুটী রাসায়নিক উপায় আছে তারই বর্ণনা অর্থাৎ তড়িৎ সাহায্যে জলকে উপাদান ভেদকরা—আর chlorate of potash কে decompose করে oxygen পাওয়ার প্রথা! শুধু তাই না তারা Hydrogen গ্যাসও তৈরী করতে জানতেন, আর ঐ দু গ্যাসকে তড়িৎযোগে মেশালে যে জল হয় তাও জানতেন! আবার Organic Chemistry তাঁদেরও দিব্য জানাছিল; প্রমান alcohol হতে aldehydes তৈরী করতেও তাঁরা জানতেন! অপিচ Voltaic উপায়ে তড়িৎ তৈরী তাও জানতেন!

তবেই না কথা হচ্চে তাঁরা না জানতেন কি? এই সব অদ্ভুৎ তত্ত্ব মোক্ষমুলর জানতে পারেননি বা জানতে পেরেও হিংসেতে চেপে গিয়াছেন; কিন্তু মোক্ষমুলর যাক্ সায়ন, জৈমিনি এঁরাও ধরতে পারেন নি! এরা নাকি বেদকে সেরেফ ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্র বলে গেছেন। আর তাঁরাই বা জানবেন কি করে? তখনতো তাঁদের মাথা অত পাকে নি; গুঢ়তত্ত্ব ফুটতে পায় নি মগজে। কাজেই গুপ্তরত্ন মহাশয় যে স্থানে অস্থানে সায়ন, শঙ্কর, প্রভৃতির ব্যাখ্যাকে আমলে আনেন নি, অগ্রাহ্য করেছেন, সাফ ঝেড়ে বলে দিয়েছেন 'সায়ন' ওটার মানে বোঝেন নি, শঙ্কর ভুল করেছেন—দত্তজা তো কীটস্যকীট তা সে মিথ্যে নয়। এদের কাছে সায়ন, শঙ্কর জৈমিনি দাঁড়াতে পারবেন কেন?

এই গুপ্তজার বেদপ্রতিভা অতি ভয়ঙ্করী কেহ কেহ বলবেন হয়তো প্রলয়ংকরী। কলিকাতায় সম্প্রতি একটী

Rationalistic association হয়েছে; তারই একটা 'বিবাহতত্ত্ব' নাম দিয়ে Bulletin বেরিয়েছে লেখক গুপ্তরত্ন মহাশয়। ইনি বেদ থেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে—শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়—সত্য মিথ্যে ভগবান জানেন আর জানেন বেদ বিধাতারা—যে সে কালে অর্থাৎ ঋষিযুগে নাকি ভাই ভগ্নী, বিমাতা সতীনপুত্র ইত্যাদি বিরুদ্ধ সম্পর্কেও 'পতিত্ব' 'উপপতিত্ব' সম্বন্ধ চলতো!

সাধকরে বলি বেদ হয়েছে' এদের হাতে 'ভানুমতীর হাড়' ভেল্কি দেখানোর যন্ত্র! কল্পতরু! যার যা প্রমাণ করতে ইচ্ছে হচ্চে ঐ 'বেদ' খুল্লেই সব জলবৎ প্রমাণ হয়ে যাচ্চে! দ্বিজেন্দ্রলাল বড় দুঃখেই সেই হাসির গানটা লিখে ফেলেছিলেন—

"গীতায় মরে আছি বাবা গীতায় মরে আছি—"

আর কটা বছর বাঁচলে তিনি ঐ 'গীতা' স্থলে 'বেদ' বসাতেন তবে ছাড়তেন—"বেদেই মরে আছি বাবা বেদেই মরে আছি।" আর বড় দুঃখেই ডাক্তার রায় লিখিয়াছিলেন বাঙ্গালীর মাথার অপব্যবহার—'বনেদী মাথা' যাবে কোথা? কি একটা মাথার রোগ আছে না? যা এক পুরুষ অন্তর দেখা দেয়? এরোগটাও সেই জাতের। রঘুনন্দনী যুগে উঠেছিল—মাঝের যুগে থেমে যায় আবার এই যুগে ফুটে উঠেছে!

রোগটা বড় ছোঁয়াচে। দেখাদেখি অনেকের ঝোঁক চেপেছে।

ইতিহাসের দিক দিয়েও অনেক অভিনব তত্ত্ব প্রমাণ হয়েছে! আধুনিক উন্নত ধরণের শাসন তন্ত্র স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি অনেক রকম তন্ত্রই বেদমন্ত্রের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল, গবেষণার ছুরীর খোঁচায় সব বেরিয়ে পড়ছে! ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল রংএর অভাবে ফুটে উঠছে! যা কিছু ইংরেজ জর্ম্মণ ফরাসী মার্কীণরা আবিষ্কার করছেন বা করেছেন তা সবই যে আমাদের ছিল তার চূড়ান্ত প্রমাণ চতুর্ব্বেদের মধ্যে থেকে পাওয়া যাচ্চে একথা শুনলে কোন স্বদেশীর বুক ফুলে না আটায় ইঞ্চি হয়ে উঠবে? কেবল এই কথাটা না জানা থাকার জন্যই আমরা সভ্য জগতে হেঁটমুণ্ড হয়ে ছিলাম! এখন এই সব বেদজ্ঞের মাথার আশীর্ব্বাদে আমরা বিদেশীদের জোর করেও বলতে পারবো যে—ও সব আমাদের জানা ছিল! দেখাচ্ছ বা বড়াই করছ কিসের মশাই? খুলুন আমাদের বেদ্ পুরাণ দেখবেন সব আছে সব ছিল! কেবল জগৎটাকে মায়ার কুজ্ঝটিকা ভেবে আধ্যাত্মিকতার নেশায় একটু মজগুল হয়েছিলুম বা একটু বেহুঁস হয়ে ছিলুম পার্থিব গৌরবের দিকে অত খেয়াল করি নি তাই কোথায় কি হয়ে গেল! তা না হলে" ?—

এইতো এক শ্রেণীর পণ্ডিত! আজন্ম প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করে এদের এখন ধ্যান জ্ঞান হলো—'প্রাচীন ভারতে আধুনিক যুগের সমস্তই ছিল তার প্রমাণ করা'। যেন 'বাইসাইকেল এরোপ্লেন-সবমেরীণ-রেল-ষ্টীমার' প্রভৃতি না থাকাটা একটা জাতের পক্ষে বড় লজ্জার কথা! তেমনি এক শ্রেণীর পাঠকও আছেন তাঁরা এই সব আজগুবি কথা অম্লান বদনে হজম করেন, এবং অতীতের এই মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হয়ে নেচে কুঁদে হেসে কেশে বগল বাজিয়ে অস্থির হন আর পাঁচ জনকেও করে তুলেন।

প্রথম ধরা যাক্ এবং মেনে নেওয়া যাক্ আমাদের 'ওইসব সভ্যতার অত্যাবশ্যকীয় কলকারখানা যন্ত্রতন্ত্র ছিল; কিন্তু জিজ্ঞাস্য সে সব গেল কোথায়?' গেলই বা কেন?' তার কোনটারই কি বস্তুগত চিহ্ন পড়ে' নাই? থাক্‌তে থাক্‌লো বেদ পুরাণে রূপক মূর্ত্তিগুলি? খোলসা ভাবে সাদাসিধা ভাষায় এই সব যন্ত্র তন্ত্রের বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না তার কারণ কি? যদি Electrolysis বা বিদ্যুৎ যোগে জলের উপাদান ভেদ বা Chlorate of potash হতে Oxygen gas তৈরি করার প্রথাটা জানাই ছিল আর তার বস্তুগত প্রয়োজন বোধ হয়েছিল তবে তা সাধা সিধা ভাষায় লিপিবদ্ধ না হয়ে অগ্নির স্তব ভাবে রচিত হল কেন? আর এ কথা যদি সত্যই হয় যে বেদপুরাণ গীতা তন্ত্র সব আসলে তত্ত্ব বা ধর্ম্ম গ্রন্থ নয় এ সব ছদ্মবেশী Physics, Chemistry, Geology Biology তা হলে সায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যকার টীকাকারেরা এসব তত্ত্ব অবিদিত ছিলেন কেন? তাঁরাতো ঘুণাক্ষরে কোথাও বলেননি যে অগ্নী মীলে পুরোহিতং

ঋত্বিজং ইত্যাদির গুঢ়ার্থ হচ্চে Oxygen gas তৈয়ারীর রাসায়নিক Process! বা অন্ত কোন ঋক্ হচ্চে aeroplane এর তত্ত্বার্থ বোধক। পাঠক ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক সংখ্যার নারায়ণের মধ্যে দেখিবেন বেদ পণ্ডিত শ্রীউমেশ চন্দ্র গুপ্তরত্ন ঋকের পর ঋক্ তুলিয়া দেখাইয়াছেন, "যদিহস্তে তদন্যত্র যন্নেহস্তি ন তৎ ক্বচিৎ—" অর্থাৎ যাহা ভারতে ছিল তাহাই অন্যত্র গিয়াছে যাহা এখানে ছিলনা তাহা অন্যত্রও বিদ্যমান নাই! আবৃত্ত ঋক্‌গুলির সায়ন কৃত ব্যাখ্যা যে ভুল ও অসঙ্গত ইহাও গুপ্তরত্ন বুঝাইয়া দিয়াছেন! ঋকের প্রকৃতার্থ যে aeroplane গঠন বর্ণনা বা ব্যবহার বর্ণনা ইহা সায়নাদি অজ্ঞ ব্যক্তিরা জানিতেন না! না জানিবারই কথা কেননা সায়নাদির মাথা বাঙ্গালীর মাথা ছিল না!

এই যে একটা প্রচণ্ড মাত্রায় মিথ্যা দেশ-প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে এর ফল কিন্তু বড় সুবিধের নয়! অতীতের মোহ নেশা সব নেশারই মত বড় সাংঘাতিক! যত সব বড় বড় মাথা সব বসে গিয়েছে প্রমাণ করতে ইংরেজ মাকিনদের যা আছে বা তারা যা করেছে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা তাই করেছেন তাঁদের তাই-ই ছিল!

একটা কথা ভাবলে এই বৃথা বড়াইটা ঠাণ্ডা হয়; ছিল বলে গৌরব করায় লাভ কি? নাইতো? ছিলই যদি তাহলে আমরা কেন আগে পুনরাবিষ্কার করতে পারলাম না? আমি এক কালে কুস্তীগির ছিলাম এখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছি বল্লে প্রতিদ্বন্দী কুস্তিগীর হার মানবে. না, ছাড়বেওনা আর এ কথা বলে বেড়ালে লোকে হাসবে, গায় থু থু দেবে; বাহাদুরী দেবেনা নিশ্চয়ই। যদি বুদ্ধিবলে বা চেষ্টাবলে আমরা একটা নূতন, কল কৌশল বার করে নিজেদের আর্থিক অভাব কিছু মোচন করিতে পারতাম; দেশের সামান্য একটা অভাব ঘুচাতে পারতাম তা হলে বাহাদুরী করা সার্থক হত। বেদপুরাণে Physics, Chemistry; কামান Zeppelineএর অস্তিত্ব দেখাবার জন্যে যে সব বিদ্যানিধি, বেদাম্বুধি, তত্ত্বরত্ন Ph. Dর মগজ ব্যয় হচ্চে সেই সব মগজ যদি চেষ্টা গবেষণা করে একখানা সুতা তৈরীর কল, বা একটা জমির নূতন সার আবিষ্কার করেন তা হলে হতভাগা দেশের একটু কাজ হয়। নচেৎ "মামার বাড়ী এক গোয়াল গরু ছিল" বলে ধেই ধেই করে নাচলে নিজের পেটে এক ছটাক্ দুধ যাবে না! হতে পারে দু দশ হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা নৌকা জাহাজে চেপে সাত সুমুদ্দুর পার হয়ে ব্যবসা করতে যেতেন! যেতেন; যেতেন—তাতে কি? এ তত্ত্ব বাহান্ন হাজার কীটদষ্ট পুঁথি খুঁজে বার করার চেয়ে একটা Joint stock কোম্পানী খোলাতে আর তাকে সফল করে চালানোতে ঢের লাভ! যারা দু দশ জনে মিলে একটা দোকান চালাতে পারে না, যাদের দেশে এখনও এক বছর বৃষ্টি না হলে তিন বছর ধরে ভেড়ার মত মানুষ মরে, তাদের পূর্ব্বপুরুষরা যবদ্বীপে, বলিদ্বীপে জাহাজে চেপে বাণিজ্য করতে যেতেন এ কথা জেনেও লজ্জা আর বিশ্বের দরবারে জানিয়েও লজ্জা!

তার পর যদি তাও সব সত্য হতো অর্থাৎ বেদের গুহাতে Physics. Chemistry,—or astronomyর নবাবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি নিহিত আছে বন্দুক কামান, রেল ষ্টীমার এইরোপ্লেন কথা ও তত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে—এই যে সব কথা, গা-জুরী ধরে নেওয়া, মেনে-নেওয়া কথা এসবের প্রমাণ কই? সত্য, সোজা, সরল সাধাসিধা কথাকে বুদ্ধির আগুন তাতে গলিয়ে বেঁকিয়ে নিজের মনমত করে একটা তত্ত্বে খাড়া করা, আর লোক চখে ধুলো দিয়ে, বিদ্যের ভেল্কি লাগিয়ে ভ্যাবা চ্যাকা করিয়ে দেওয়া—এত বড় অপব্যবহার মস্তিষ্কের আর কখনো কোনো জাতের মধ্যে হয়েছে কিনা জানিনি! এই সব লেখক মনে করেন, সব পাঠকেই বুঝি ঘাস খেয়ে থাকে! তাই সায়ন বা দত্তজাকে গাল দিয়ে দুটো স্বদেশীর মনযোগান কথা বল্লেই তারা ঘাড় পেতে মেনে নেবে।

তার পর এক কথা। এই যে প্রাণপণ চেষ্টা যে বেদ বেদান্তে Physics, Chemistry, astronomy. Geology; রেলষ্টীমার, কলকারখানা, এসবেরই অস্তিত্ব প্রমাণ পাওয়া যায়—এ হতে কি সুন্দর ভাবে প্রমাণ দেওয়া হচ্চে না যে প্রাচীন অধ্যাত্মতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব হতে আধুনিক জড়তত্ত্ব, কলকারখানাতত্ত্ব, ঢের ভাল, বাঞ্ছনীয় ও লোভনীয়? এই সম্প্রদায়ের গোঁড়ারাই গলাবাজী করে বলেন "ইয়ুরোপের

এই কল-কারখানার সভ্যতার চেয়ে আমাদের সনাতনী সাত্ত্বিক সভ্যতা ঢের ভাল! আমরা জড়তত্ত্বে কখনো মন দিই নি; আমাদের নজর ছিল নাসাগ্রভাগের অধ্যাত্ম বিন্দুতে! আমরা কপ্‌নী এঁটেই ধ্রুবলোকে যেতাম—” তাই যদি, তবে ঋক্‌বেদে, পুরাণে, তন্ত্রে, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের তত্ত্ব খোঁজবার জন্যে এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? নিশ্চয়ই মনে মনে বিশ্বাস জড়বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন না হলে সভ্যতা দাঁড়ায় না! জড়বিজ্ঞানেই মানুষের ঐহিক মুক্তি; এই জড়বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদেই আজ এত বড় আধ্যাত্মিক জাতটা এক জড়োপাসক জাতের পদানত!

এই কিছুকাল আগে আমাদের পৌত্তলিক বলে বাহিরের লোক গাল দিলে আমরা বেদখুলে দেখিয়ে দি আমাদের মত একেশ্বরবাদী নিরাকার উপাসক জাত আর নাই—ছিলনা! আজ আবার আরম্ভ হয়েছে উল্টো সুর! আমাদের অধ্যাত্ম শাস্ত্রটা আসলে, astronomy, physics, chemistry! মাথার বিকার আর মস্তিষ্কের অপব্যাহার আর কাকে বলে?

এইরূপ চেষ্টার ফলে খুব বেশী রকম ক্ষতি হচ্চে। সাধারণ অজ্ঞ, অল্প শিক্ষিত লোকদের, ও শিক্ষিতদিগের মধ্যেও বটে; এই সব ইচ্ছাকৃত মিথ্যা ধারনা বা বিশ্বাস জন্মিয়া দেওয়া হচ্ছে। যাকে বলে Literary Dishonsety, ‘সাহিত্যিক ভণ্ডামি’ বা ‘অসাধুতা’ এ তাই। যেখানে যাহার যা অর্থ নহে; যে অর্থ হইতে পারে না; যে সিদ্ধান্ত কিছুতেই হয় না; কেবল বুদ্ধির jugglery দেখাইয়া, চোখ রাঙ্গাইয়া, কুটার্থ করিয়া, সায়নাদিকে মূর্খাতিমূর্খ বানাইয়া মিথ্যার প্রচার করা সাহিত্যের দরবারে মহাপরাধি বলে গণ্য হওয়া উচিৎ। আর সাধারণ জাতীয় চরিত্রের ওপর এই মিথ্যা অতীত গৌরবের নেশার কুফল যে কত তার শেষ আছে?

অতীতের গৌরব বোধ মাত্রানুসারে উপকারী; কিন্তু অতীতের মোহটা কিছুই নয়; সব চেয়ে খারাপ মিথ্য অতীত গৌরবের মোহ। যা ছিলনা তার অস্তিত্ব কল্পনা করে, আর নিরীহ নির্দ্দোষ বেদপুরাণের ঘাড়ে তার প্রমাণ ভার চাপিয়ে দেওয়া—এতে ভালতো হয় না, মন্দই ঘটে। দুর্ব্বল ধাতে বেশী নেশা ভাল নয়। স্বাধীন ভবিষ্য উন্নতির চেষ্টার পক্ষে উত্তেজক না হয়ে অবসাদক হয়ে পড়ে। দেবতা বা মুনি ঋষিরা, এইরোপ্লেনে চাপতেন ক্লোরেট অফ্ পটাশ থেকে অক্সিজেন তৈরী করতে জানতেন, এ বলে ঢাক পিটুলে যে খুব জাতীয় গৌরবের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তা হয় না; আধুনিক কলকারখানা জানা না থাকলেও ব্যাস বশিষ্ট বিশ্বামিত্ররা হীন ছিলেন না; আর বৈদিক সভ্যতা এ সবের অভাবে নগণ্য ছিল না; এই কটী কথা মনে রাখ্‌লে এই সব দিগ্‌গজীয় মস্তিষ্কধারীরা অনর্থক দীপ তৈল নষ্ট করবেন না।

এই বাজে কাজে মাথা না বকাইয়া দুটো কাজের কাজে অর্জ্জিত বিদ্যাকে লাগালে দেশের অনেক লাভ হয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্রদত্ত।

কর্ম্মক্ষেত্র

স্বপন রাজ্য ভেঙ্গে গেছে আজি মোর,
সত্যের দেশে কর্ম্মের ভেরী গরজি উঠেছে ঘোর।
বন্যার সম ছোটে হাহাকার,
নাহি দয়া স্নেহ নাহিরে বিচার,
মথুরার পুরে কংস-কারায় গর্জ্জেছে পশুবল,
পুণ্যের আলো আঁধারে মলিন কোটী আঁখি ছলছল্;
বাসর-শয়নে কি করে, রহিবে আর ?
ধর্ম্মের দেশে কর্ম্মকাতর ডাকে ওই বারেবার।

বিরাট সত্য হাঁক ছাড়ে বারে বারে,
বিপুল-ভুবন-কর্ম্মের ভেরী মন্দ্রিত আজি দ্বারে।
মুছে দি'ছি শত চুম্বন রাগ,
শ্লথ হ'য়ে আসে প্রণয় সোহাগ,
সাধের সে ফাগ-কুঙ্কুমে আজি দলিয়াছি করি হেলা,
শেষ আজি হ'তে কুঞ্জভবনে মিলনের ফুল খেলা।
সাধুর অশ্রু কাঁদায়ে দিয়াছে প্রাণ,
মথুরার পথে কোটী নরনারী মাগিছে পরিত্রাণ।

ভেঙ্গে দি'ছি আজ যৌবন-মধুবন,
রুদ্র-দহনে আর্ত্ত মেগেছে আশ্রয় জনেজন।
অন্নের তরে কাঁদে ক্ষুধাতুর,
চরণে দলিত অনাথ আতুর,
অভাগা নিঃস্ব ঘৃণ্যের সম বহন করিছে প্রাণ,
সাগরের সম ওঠে নিশিদিন উচ্ছ্বসি অপমান।
বিলাস-লীলায় আর কিগো থাকা চলে ?
আগুন লেগেছে শান্তির সুখ-নন্দন-গৃহতলে।

একতিল আর অন্তর নহে থির,
মর্ম্ম-কাতর-আহ্বান ওই ভেসে আসে জননীর।
তুচ্ছ আজিরে ফুল শরাসন,
রমণী-হিয়ার মদির বাঁধন,
কঠোর-সত্য কর্ম্মের রথ দাঁড়ায়ে যে আজি দ্বারে,
ফিরাবার ছলে পিছনে যে আর বৃথা ডাকা বারে বারে,
গোকুলের পানে আর কিরে ফিরা সাজে ?
ধর্ম্মের ত্রাণে দিতে হবে ঝাঁপ কর্ম্মের রণ-মাঝে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভাববার কথা।

(১)

অসবর্ণ বিবাহ।

এই বাঙ্গলা দেশে অনারেবল প্যাটেল মহোদয়ের হিন্দু সমাজ অন্তর্গত আন্তর্জাতিক বিবাহের বিল নিয়ে যে বিজাতীয় রকমের বাক বিতণ্ডা চ'লচে তাহ'তে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এ ব্যাপারেও বিপক্ষ এবং পক্ষ দুই দলই আছে। এখন আমাদের দেখবার বিষয় হচ্ছে এই যে ইহাদের কোন্ পক্ষের যুক্তি বলবৎতর ও কোন পক্ষের জয় হ'লে দেশের ও সমাজের সুবিধা হয়।

এই বিল যদি আইন হয় তাহ'লে সে আইন মোটেই বাধ্যতামূলক হবে না। ঠিক বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইনের মতই হবে। সুতরাং আমার ত' মনে হয় এ নিয়ে মারামারি কর্ব্বার কোন প্রয়োজন নাই, করে কোন লাভও নাই।

তবে নাকি অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিচ্চেন এবং ব'লচেন যে এই আইন হ'লে হিন্দুর হিন্দুত্ব আর থাকবে না ও সব একাকার হ'য়ে যাবে। শাস্ত্র থেকে বেছে বেছে অনেকে শ্লোক রূপ আমোঘ অস্ত্রও নিক্ষেপ করচেন। তাঁরা বোধ হয় একটা কথা ভাবেন নি যে ঠিক ওর পাল্টা অস্ত্রও ঐ শাস্ত্র থেকেই পাওয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রও যাদুকরের ঝুলির মত'। যার যা ফর্মাস্ তাই তা থেকে বা'র করা যেতে পারে। একদিক্ দিয়ে দেখলে বাস্তবিকই শাস্ত্র আমাদের কত উদার। কিন্তু যাঁরা গোঁড়া শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁরা যে কেন এমন মুদ্দার মত তা বুঝেই ওঠা দায়। স্বাধীন চিন্তার ক্ষীণ রক্ত স্রোতও তাদের মধ্যে বহে না। গুরুভার শাস্ত্রের চাপে তাঁদের যেন একেবারে কব'র হ'য়ে গিয়েছে। তাই কোথাও একটু অন্য রকম জীবন্ত ব্যাপার দেখলেই তাঁরা একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন—ভয়ে কি না বলা কঠিন।

অথচ তাঁরা এ কথাটা ভেবে দ্যাখেন না যে সেই সেকেলের শাস্ত্র দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় চ'লবে কি না। তা যে চ'লতে পারে না—তা যাঁরা গোঁড়া শাস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁরাও হাড়ে হাড়ে বুঝচেন। আর তা চ'লবেই বা কি করে? শাস্ত্র সেই যুগের সমাজের জন্য সেই সময়ের মানুষের তৈয়ারী—তখন কার মানুষের জ্ঞানের সমষ্টি। তাঁরা এখনকার অবস্থা কল্পনাও কর্ত্তে পারেন নি। তা যদি পার্ত্তেন তা হ'লে আমাদের এই ব্যাপার নিয়ে হয়'ত এত মারামারি কর্ত্তে হত না। তবে অবশ্য কোন কোন শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব'লবেন যে শাস্ত্র সনাতন চিরন্তন ভগবৎ বাক্য—শাস্ত্র কর্ত্তরা ত্রিকালজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ইহার একটা কথাও যে সত্য নয় ও সত্য হতে পারে না তা বোধ হয় আজকালকার দিনে আর বিশেষ ক'রে ব'লতে হবে না। সেইজন্য আমার মনে হয় যে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ নিয়ে তর্ক না ক'রে একত্র দেশের ও সমাজের সকল অবস্থার উপর লক্ষ্য রেখে এই বিলের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিচার করা কর্ত্তব্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যা দ্যাখা যাচ্ছে তাতে আমার মনে হয় যে এ দেশে আন্তর্জাতিক বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। তা না থাকলে কেবল মাত্র চারিটী জাতি হ'তে এতগুলি বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হ'ল কি করে। আর এদের কোনটাই হিন্দু সমাজের বাহিরে নয়। তা ছাড়া শোনা যায় শাস্ত্রেও নাকি "অনুলোম" বিবাহের বিধি আছে অর্থাৎ উঁচু জাত নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে পারে। কিন্তু "প্রতিলোম" বিবাহ অর্থাৎ নীচু জাত উঁচু জাতের মেয়েকে বিবাহ করা নাকি একেবারে নিষিদ্ধ। এর প্রথমটা কোন ন্যায় সংগত যুক্তিতে ন্যায়, আর দ্বিতীয়টাই বা কোন্ ন্যায় সংগত যুক্তিতে অন্যায় তা বোঝা কঠিন। একমাত্র

যুক্তি এই মনে হয় যে শাস্ত্র কর্ত্তারা বোধ হয় তখন সব চাইতে উঁচু জাত ছিলেন।

এখনও কুমিল্লা চাটুগাঁ প্রভৃতি স্থানে বৈদ্য ও কায়েস্তর মধ্যে বিবাহ হচ্চে এবং তারা হিন্দু সমাজের মধ্যেই আছে। ইহার অনেক দৃষ্টান্তও দেওয়া যেতে পারে। তার পর বৈষ্ণবদের মধ্যে কি হয়? তারা কি হিন্দু নয়? সমাজের নিম্নস্তরের জাতীগণের ভিতর ত' ভিন্ন জাতীর মধ্যে বিবাহ চলিত আছে। তারাও ত' হিন্দু ব'লেই পরিচয় দ্যায়। এই সব দৃষ্টান্ত যে র'য়েছে তাতে কি হিন্দু সমাজের কোন ক্ষতি হয়েছে? কই কোন ক্ষতিই ত' নজরে পড়ে না।

বিপক্ষ দলের কেহ কেহ যাঁহাদের শাস্ত্রের উপর খানিকটা মমতা আছে, তাঁহারা বলেন যে এ ব্যবস্থা যদি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হয় ত' তা আপনিই হয়ে যাবে। তার জন্য আইনের দরকার হয় কি? এর সব চাইতে সোজা উত্তর বোধ হয় এই যে সে কালে ঠিক যে কারণে শাস্ত্রের বিধির দরকার হ'য়েছিল এখনও ঠিক সেই কারণে আইনের দরকার। সমাজের পক্ষে তা যদি কল্যাণকর না হয় ত' সে আইন "মৃত ব্যবস্থা"—যাকে ইংরাজি ভাষায় বলে dead letter—হয়েই থাকবে। সেজন্য আমাদের ভয় পাবার কিছু নাই। সমাজ ত' সত্যই একটী জীবন্ত জিনিষ। ইহাও সাধারণ জীবের মতই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়েই বেঁচে চলে। তবে মানুষের সমাজ ঠিক ইতর জীবের সমাজের মত নয়। কারণ মানুষের সমাজে বুদ্ধির বিকাশটা সব চাইতে বেশী হয়েছে। তাই সে সমাজ শুধু অবস্থার দাস হয়ে বাঁচতে চায় না। তার সঙ্গে নিজের বুদ্ধির পরিচালনা ক'রে প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে অনুকূল ক'রে নিতে চায়। সেইজন্য এই বিলের আবির্ভাব এবং সেই জন্যই এ বিল আইন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তারপর সব একাকার হয়ে যাবার ভয়। সে ভয় ত' অনেক দিন থেকেই আছে। কিন্তু একাকারও সব সময়ে হয়েই চ'লেছে। কোন বিধিনিষেধই তা ঠেকিয়ে রাখতে পার্ব্বে না। বর্ণ ধর্ম্ম ত' অনেক দিন আগেই গিয়েছে। তার দোহাই আর এখন কেহ বড় দ্যায় না। আর আশ্রম-ধর্ম্ম, তার অবস্থাও সকলেই দেখতে পাচ্চেন। চতুরাশ্রম এক সঙ্গে ক'রে বোধ হয় ক'লকাতায় "মহৎ আশ্রম" খোলা হ'য়েছে। এখন শুধু গার্হস্থ্যাশ্রমকে আর চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে নবাবী অন্দর করে কোন ফল নাই। মূলচ্ছেদ বহু পূর্ব্বেই হ'য়ে গিয়েছে—পত্র পুষ্প তাতে আর গজাতেই পারে না—শুধু শুষ্ক কাঠের জন্য এত মারামারি কেন?

বিপক্ষ দলে এমন অনেকে আছেন যাঁরা বলেন যে সামাজিক কোন ব্যবস্থার জন্য আমাদের গভর্ণমেণ্টের কাছে যাবার কি প্রয়োজন? ইহাঁদের অনেকেই ভিতরে ভিতরে এই আন্তর্জাতীক বিবাহের পক্ষে। তাঁরা বলেন যে সতীদাহ নিবারণ বা বিধবা বিবাহ প্রচলনের আইন গভর্ণমেণ্ট যখন করেছিলেন তখনকার চাইতে এখন আমাদের সমাজের জীবনীশক্তি অনেক বেড়েচে; আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আমরাই কর্ব্ব। বেশ, উত্তম কথা—তা যদি কর্ত্তে পারেন তা হ'লে ত বাস্তবিকই গভর্ণমেণ্টের কাছে আইনের জন্য যাবার কোন দরকারই নাই। কিন্তু সত্যকার অবস্থাটা কি? কোন দোষের জন্য কাহাকেও নিগ্রহ কর্ত্তে হ'লে সমাজের তথাকথিত মালিকেরা এমন জোরে কোমর বেঁধে দাঁড়ান যে তখনকার ঐক্য দেখলে চমৎকৃত হ'তে হয়। মনে হয় যে কোন সুব্যবস্থা নূতন ক'রে কর্ব্বার সময় এ ঐক্য থাকে কোথায়? আসল কথা সমাজের এখন তেমন কর্ত্তাই নাই। যাঁরা কর্ত্তা হ'তে চান, তাঁদেরও পূর্ব্বেকার ক্ষমতা বা অবস্থা নাই। যে ব্রাহ্মণ তখন সমাজের আধিপত্য কর্ত্তেন—শাস্ত্র প্রণয়ন কর্ত্তেন—এমন কি দেশের রাজা পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনে যাঁহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল—সে ব্রাহ্মণ আর নাই। কি ক'রে এবং কি কারণে তাঁদের আধিপত্য গেল সে তর্ক তুলবার এস্থান নয়। তবে আধিপত্য যে গিয়েছে সেটা বোধ হয় সকলের কাছেই প্রত্যক্ষ। সেই কারণে মনে হয় গভর্ণমেণ্টের আইনের বিশেষ প্রয়োজন আছে—আর তার সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে আরও উন্নতির পক্ষে সাহায্য কর্ব্বে, কারণ এটাত' তাঁরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে আধুনিক সমাজের জীবনী শক্তি অনেক বেড়েছে। তবে তাঁদের এই বিলের বিরুদ্ধে আপত্তির মূলে যে কারণটি রয়েছে সেটী হ'চ্চে একটী মহৎ উদার Sentiment, এই Sentiment যদি সত্যি হয় তাহ'লে তার চাইতে ভাল আর কি হ'তে

পারে। যেদিন সকলের মনে এই Sentiment সত্য হ'য়ে উঠবে সেদিন ত' সমাজের উন্নতির জন্য আর চিন্তাই কর্ত্তে হবে না। কারণ জাতির বা সমাজের উন্নতির পক্ষে এই Sentimentই পথপ্রদর্শক। বিবেকবুদ্ধি থাকে অনেক পিছনে পড়ে। শুধু তর্কের খাতিরে এই মহৎ মনোভাবকে আসরে না নামিয়ে তাকে সত্য ক'রে উপলব্ধি কর্ব্বার শক্তি যেন আমাদের হয়।

তার পর Political দিক থেকেও এই বিলের যথেষ্ট স্বার্থকতা আছে। এখন আমরা সমগ্র জগতের সকল জাতির সঙ্গে সমান অধিকার পাবার জন্য ব্যগ্র। ভারতবর্ষের বাহিরে সকল জাতির কাছে আমরা ভারতবাসী ব'লেই পরিচিত। যে প্রস্তাব নিয়ে এই বিল তা যদি সমাজে চলে তাহ'লে কি এই ভারতবাসী শব্দটা আরও সত্য হ'য়ে উঠবে না? বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালী শুধুই বাঙ্গালী—সেখানে আর এই ৩৬ জাতের খবর বড় কেউ নিতে চায় না। যে সংস্কারকে জন্মগত সংস্কার ভেবে নিয়ে আঁকড়ে ধ'রে ঘরে ব'সে আছি কত সামান্য কারণে এমন কি দেশ ছেড়ে বিদেশে গেলেই সেই সংস্কার আর নিজেরই মনে পড়ে না, অন্য জাতির নজরে পড়া ত' দূরের কথা। এখনকার যুগে যখন জগতের সম্মুখে আমরা ভারতবাসী ব'লেই নিজের গৌরবে দাঁড়াতে চাচ্চি তখন আমাদের সেই পরিচয়ই যাতে সত্য ও স্বার্থক হ'য়ে ওঠে আমাদের তাই করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই আইন আমাদের ঐদিকে এগিয়ে দেবার একটী উপায়। এতেত' এত বাধা হওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং ঘোরতর অন্যায় ও অর্থহীন বলে মনে হয়।

জীব বিজ্ঞানের অর্থাৎ Biologyর দিকে থেকে দেখলেও এ প্রস্তাবকে মেনে নিতে হবে। বহুকাল ধরে একই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিবাহটা আবদ্ধ থাকাতে আমাদের জাতির রক্তটা ক্রমেই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে। এই ভয়েই বোধ হয় আমাদের দেশে এক গোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ! যখন হ'তে এই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়েছে সেই সময় থেকে আর সেটা নিশ্চয়ই বহু বহু পূর্ব্বে—একেই জাতির মধ্যে বিবাহ অনবরত চলাতে তার মধ্যে আত্মীয়তা ক্রমেই নিকট হ'তে নিকটতর হচ্চে! নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহতে সাধারণতঃ ফল ভাল হয় না—উত্তরোত্তর স্বাস্থ্য ও শক্তি কমিয়া আসে। এটা Biology তে এক রকম ঠিকই করেছে; আর তাহা যে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার কর্ব্বেন না। যাহারা পালিত পশু Breed করায় তাহাদের মধ্যে একটা চলিত কথা আছে যে "Breed in to fix type, breed out to secure vigour, in general compromise" এটা উহাদের সাধারণ চলিত কথা হ'লেও বিজ্ঞান যে-সকল তথ্য এ সম্বন্ধে নির্ণয় করেছে তাহা এই কথারই পরিপোষক। আমরা নিশ্চয়ই "পালিত পশু" সমাজের অন্তর্গত নই কিন্তু এটাও নিশ্চয় যে আমরা Biologyর বাহিরের জীবও নই। আমাদের সমাজে এখন "Breed out"এর বেশী দরকার বলে মনে হয়। কারণ Type আমাদের বহুদিন fixed হ'য়ে গিয়েছে—তার জন্য Breed in করার প্রয়োজন আর বড় বেশী দেখা যায় না।

এখন আমাদের সমাজে চাই স্বাস্থ্য, চাই শক্তি, চাই উর্ব্বরতা—তার জন্য সমভাবাপন্ন সমান অবস্থার বিভিন্ন জাতির মধ্যে Breed out করায় যে খুব সাহায্য হবে তাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে যদি আমাদের টিঁকে থাকবার বাসনা থাকে ত' যত রকম উপায়ে পারা যায় আমাদের সমাজকে সুস্থ ও সবল করে তুলতেই হবে। আর সেই সকল উপায়ের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটার দিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ ভাবে দরকার। এটা অবশ্য সত্য যে ঠিক Biological necessity দিয়ে কোন সমাজে কখন বোধহয় বিবাহ সম্বন্ধটাকে স্থির করা হয় নি। তবু আমার মনে হয় এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য, Sentiment ধর্ম্ম, কবিত্ব প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে শুধু জীব-বিজ্ঞানের সাহায্য নিলে সমাজের লাভ বই লোক্‌সান হবে না। আর এটাও বোধ হয় ঠিক কথা যে আমরা এই বিবাহ সম্বন্ধটা নিয়ে যতই কবিত্ব করি না কেন, এ সম্বন্ধের গূঢ় কারণ বোধ হয় Biolgical—জীবের একটা Primary instinct থেকে উদ্ভূত। যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন মানব জাতির আদিম অসভ্য অবস্থায় সমাজে সুস্থ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবের সাহায্য ক'রত এখন এই সভ্য অবস্থায় সেটা অনেক দূরে স'রে গিয়েছে। কারণ মানব সভ্যতা ত' প্রধানতঃ প্রকৃতির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাহাকে জয় করার প্রয়াস হ'তেই উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতিও প্রতিশোধ নিতে ছাড়চে না। এই সভ্য সমাজে দেখা যাচ্চে যে জাতটা যেন ক্রমশঃই বিশেষ আমাদের ওই বাঙ্গালা দেশে—ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। সেটা নিবারণ কর্ত্তে হ'লে ও সমাজকে সঞ্জীবিত করতে হ'লে অবশ্য নানাদিক থেকে নানা উপায় অবলম্বন করতে হবে। তার মধ্যে অন্ততঃ একটী উপায় আমার মনে হয় যে এখন এমন কোন Artificial Selection এর প্রয়োজন যা সমাজের সুস্থ সবল ও যোগ্য ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবে ঠিক আদিম অবস্থার Natural Selectionএর মতই সাহায্য করে। আর এই Artificial Selection কে কার্য্যকরী ক'রে তুলবার জন্য এ আন্তর্জাতিক বিবাহ কর্ব্বার প্রথা একটী প্রধান উপায় হবে তাতে সন্দেহ নাই।

কাহারও কাহারও এমন ভয় হয়েছে শোনা যাচ্চে যে ভদ্রলোকের ছেলে হয় ত একটী ছোট লোকের মেয়ে বিবাহ করে একেবারে পারিবারিক শান্তি নষ্ট করবে। এ ভয়টা বোধহয় একেবারে নিরর্থক। কারণ আমার মনে হয় যে প্রায় সমান অবস্থার বিভিন্ন জাতি ছাড়া এ সম্বন্ধের কথা উঠতেই পারে না। তবে এখন যাদের খুব ছোট লোক বলা যাচ্চে তারা যদি কালে ভদ্রলোকের সমানই হ'য়ে ওঠে তখন আর আপত্তি করবার বা ভয় করবার কিছু থাকবে না, থাকা উচিতও হবে না। এটা সম্প্রসারণ ও আদান প্রদানের যুগ! এখন নিজের জিনিষটী একান্ত ক'রে ধ'রে ঘরের কোণে ব'সে থাকবার চেষ্টা শুধু ব্যর্থ হবে তা না নিতান্ত অনর্থকরও হবে।

শ্রীনারায়ণদাস মজুমদার।

(২)

শিক্ষাসমস্যার যৎকিঞ্চিৎ

পৃথিবীর যেদিকে চাওনা কেন সব দিকেই উন্নতির একটা সাড়া পড়িয়াছে। উন্নতির সেই ঢেউ আমাদের গায়েও যে দুই একটা ধাক্কা না মারিতেছে তাহা নহে; কিন্তু উন্নত হইবার যে আমাদের প্রবল ইচ্ছা ও অনুভূতি তাহা যে কি রকম ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে তাহা ভাবিবার দিন উপস্থিত হইয়াছে। কারণ এখন মানুষের ভিতর এমন একটা শক্তি, এমন একটা বিশিষ্টতা প্রবেশ করিয়াছে যাহা আমাদের সকল সময়েই জগতের সমস্ত লোকের সঙ্গে চলবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। আমরা নিজকে ধন্য মনে করবো যদি আমরা ঠিক এই সময়কার সাতন্ত্র্য রক্ষা করে নিজের পথ করে চলতে সক্ষম হই।

পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় নূতন ভাব নূতন চিন্তা যখন কোন এক দেশে প্রবেশ করে, তখন সে কেবল আত্ম সুখানুভূতি নিয়ে সুখী থাকতে পারে না; নিজের যা বিশিষ্টতা নিজের যা সাতন্ত্র্য অন্য সকলকে দিয়ে তাদেরও নূতন পথ ধরিয়ে দেয়। আমেরিকা তার জাতীয়তার নূতন পতাকা যেদিন প্রথম উড়ালো, সেদিনও হয়ত ফরাসীরা তাদের সেই নিগ্রহের ভিতর আপনাদের কোনও রকম করে টেনে নিয়ে চলছিল; তারা তখনও হয়ত ভাবতে পারে নি' যে ফরাসী প্রজাতন্ত্র দেশকে আপন করে নিয়ে যাবে। তারা তখনও ধনীদের অত্যাচারেই আপনাদের সুখ দুঃখ মিশিয়ে ছিল। 'ব্যাসটাইল'ই (Bastille) ছিল তখনকার তাদের আরামের জায়গা। এই গারদকে যেদিন তারা আপন ঘর কন্নার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলো সেদিন নূতন জ্ঞানে তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বললো 'রাজা প্রজা আমরা সবই এক' —এটা মানতেই হবে, সেদিন থেকেই তাদের মুক্তি হলো। তারা দেখলো যে একটা নূতন আলো এসে তাদের উন্নতির পথ আলো করে ধরেছে। সেই আলোকে তারা নিজেদের রাস্তা বেশ দেখে নিলে; তাই তাদের উন্নতি আরম্ভ হলো। নিজেদের একটা জাতি করে গড়ে তবে ছাড়লো।

আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর নূতন আলো তাই কেবল তা'দের কেন সকলকেই জগতের ভিতর নূতন করে দেখবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। এই তড়িতের অনুভূতি সমগ্র দেশকে বলছে "এগোও, এগিয়ে চল"। তাই দেখছি সমস্ত জাতি আজ তার সাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত;—আমরাও বাদ পড়িনি।

এই যে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী মহাসমর হয়ে গেল, তাতে যে

শিক্ষা জগৎ পেয়েছে তার মূল মন্ত্র কি? জাতীয় জীবন, জাতীয় সাতন্ত্র্য, জাতীয় শিক্ষা, আর জাতীয় একতা ঠিক নয়, জাতীয় আত্মানুভূতি—যা জগতের সকলের। হিংসা এবং দ্বেষ, জগতের পিপাসা! এই পিপাসা দূরীকরণার্থেই মনে হয় সকলে ব্যস্ত! তাই দিন মজুরীরা শুদ্ধ সকলে বলছে 'জগত আমাদের—আমরা জগতের'! এই জন্যই কি না বল-সেভিষ্টরা চির নিয়ত ব্যস্ত? আর এই জন্যই না কি সকলে নিজের মান জ্ঞান বিশ্বকে দিতে চাচ্ছে?

কিন্তু আমরা যে তার কিছুই বুঝ্‌ছি না! আমরা সেই আবহমান কাল থেকে যে পথ ধরেছি, ঠিক সেই রকম ভাবেই এই নূতন আলোকে বরণ করছি। এই আলোর বিশিষ্টতা আমরা অনুভব করছি কোথায়? নিজেদের রোজকার কাজকর্ম্মে, শিক্ষায় নীতিতে, আচার ব্যবহারে নূতনত্বের কিছুই ত বিকাশ পাচ্ছে না!

কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও আচার ব্যবহার যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, সেই রকম ধর্ম্ম জ্ঞানকেও কথঞ্চিৎ বদলাতে হয়। এখানে ধর্ম্ম ঠিক তার গণ্ডীবদ্ধ মানে নয়, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত; মানুষের বিশ্বজনীনতার ধর্ম্ম! এখন সমাজকে তার সেই গোঁড়ামি ত্যাগ করতে হবে, তার সকল কাজের ভিতর নাগপাশ বন্ধন ছাড়তে হবে। যদি সে তা না ছাড়তে পারে তবে তাকে অনেক বিষয়ে নিজের অসুবিধা ভোগ কর্‌তেই হবে। তাই দেখা যায় আমরা যা'দের স্থান দিই না, সেই সমস্ত মনীষীরা আপনাদের স্থান করে নিচ্ছেন সব অন্য জায়গায়। এই জন্যই হিন্দু সমাজ আজকাল এতটা হীন বল হয়ে পড়ছে। হিন্দু ধর্ম্মেরও এক সময় ছিল যখন নানাজাতীয় সকলকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়ে নিজের আত্মোন্নতি করেছে। যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং মুসলমান ধর্ম্ম সমগ্র হিন্দুস্থানকে গ্রাস করবার চেষ্টা দেখ্‌ছিল সেই সময় হিন্দু ধর্ম্ম তার গণ্ডীর বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছিল বলেই সে সে সময় আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। এই Assimilation কিম্বা absorb করবার ক্ষমতা যদি তার না থাক্‌তো তবে হিন্দু সভ্যতা কিম্বা হিন্দু আচার পদ্ধতি বলে আমাদের কিছুই থাক্‌তো না। ছেড়ে দেওয়া, কিম্বা বাদ দেওয়াই যদি ধর্ম্মের মূলমন্ত্র হয় তবে তা টিঁক্‌তে পারে না। তাই বলে এটা বলা ঠিক হবে না যে কোনও Peculiarity রক্ষা করা উচিত নয়। মানুষের যে জাতীয় ধর্ম্ম তাই রক্ষা করতে এবং তাই আমাদের উন্নত করতে পারবে।

অন্যদিকে একেশ্বরবাদী শিখদের কথা একবার ভেবে দেখুন। তাদের ধর্ম্ম মুসলমানদের চেয়েও টলারেন্ট বলেই তাদের যত নির্যাতন পেতে হয়েছে মোগলদের হাতে। মুসলমানেরা ভাব্‌ল এবং সত্য সত্য দেখ্‌লো যে শিখধর্ম্ম সমগ্র গণ্ডিবদ্ধ ধর্ম্মকে গ্রাস করছে। হয়ত বা মুসলমান ধর্ম্মকে পেছনে ফেলে চলে যাবে। তার কারণও তা'রা বেশ টের পেল—তাদের সামাজিক বিভাগ ছিল কর্ম্মে—জন্মে নয়। এই ভীতি দূর করবার জন্য তা'রা এমন নৃসংশ-ভাবে অত্যাচার আরম্ভ করলো যে মুসলমান ধর্ম্মের যে আসল কথা তা তারা ভুলেই গেল। এই অত্যাচার এবং অবিচারের মধ্যে যে জাত বাড়ে তাকে ক্ষয় করা সহজ ব্যাপার নয়।

একটা কথা উঠিয়াছে এবং আমরাও বলি যে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের একটা শিক্ষাও দরকার। কিন্তু ধর্ম্মের আচার পদ্ধতি পালন করাটাই কেবল ধর্ম্ম নহে। দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে আমাদের ঐ ধর্ম্মানুভূতি উপলব্ধি করতে হবে। Practical কোনও কাজের ভিতর দিয়ে এই শক্তিটাকে জান্‌তে হবে। অনেকেই দেখা যায় যে বাইরের ভড়ং এ খুব ধর্ম্মকর্ম্ম করছেন কিন্তু তিনি জানেন না কি করে সহযোগীর সঙ্গে চল্‌তে হয়। এই সমস্ত বোঝাপড়া করবার জন্য আমাদের মন এখন মেতেছে এবং এই সমস্ত সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সমাধান করবার সময় এসেছে।

আজকাল দেশময় শিক্ষা নিয়ে যে একটা আন্দোলন চল্‌ছে তার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে এতদিন আমাদের ছিল পেটের সংস্থান করবার জন্য শিক্ষা; আর এখন সে শিক্ষায় আমরা পেটের সংস্থান করতে পার্‌ছিনে বলে।

এটা মানুষের ধর্ম্ম, কেবল মানুষ কেন সকল প্রাণীরই ধর্ম্ম আহার করা চাই! এই আহারের যেদিন সংস্থান হবে না, সেদিনই যত সব গোলযোগের সম্ভাবনা! সে সময় থেকে

তার উপায় উদ্ভাবন করা দরকার হয়ে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখে আস্‌ছি, বাপ দাদারা সব লেখাপড়া শিখে কেবল চাকুরী করিয়াই আসিতেছেন অন্যদিকে বড় তাদের ভাববার সময় থাকে না! এই যে একটা ধারণা আমাদের বদ্ধমূল হয়ে গেছে তাকে যে কোন রকমেই ছাড়ানো সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌ছেনা, বিশেষতঃ আমাদের এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর। ব্যবসাটাকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখি বলেই আজ আমাদের খাওয়ার জন্য সকলের দ্বারে হাত পাতিতে হইতেছে। দুনিয়া শুদ্ধ সকলেই যখন চাকর হইবার অভিলাষী তখন প্রভু কে হইবে? এটাও কি আমাদের চৈতন্যকে একটু জাগরূক করে না? এই চিন্তাটা যখন আজ আমাদের মনে এক একবার সাড়া দিচ্ছে তখন উহাকে খোরাক দিয়ে ওর পথ চলবার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে।

সাংসারিক সুবিধা অসুবিধার দিক হইতে দেখিতে গেলে আমাদের বর্ত্তমান অধ্যাপনা প্রণালীকে আমূল পরিবর্ত্তিত করা উচিত এবং সেই রকম ভাবে আমাদেরও তৈরী হওয়া দরকার।

সে দিন এক বক্তার মুখে শুনলাম মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা ঠিক করেছেন যে আমাদের কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা ১৬ বৎসর বয়স হইতে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়ের মধ্যে মানুষকে যদি কোনও কাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে সেটা তার পক্ষেও যেমন মঙ্গল আবার তেমনি সমাজের পক্ষেও মঙ্গল। এর মানে হচ্ছে এই যে পড়া পড়া পড়া করে' আমাদের যে জীবনী শক্তিটা ২৫।২৬ বৎসর পর্য্যন্ত নষ্ট হচ্ছে, সেটা নষ্ট না হয়ে পূর্ণ মাত্রায় আমরা কাজে লাগাতে পারি, আর সেই সমস্ত কাজে সহজেই সফলতা লাভ করা যায়।

গিলে গিলে যে হজম শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তা আর নষ্ট হতে পারে না; বরং সেই শক্তিটা একটা নূতন পথ পেয়ে নূতন ভাবে গড়ে উঠ্‌তে থাকে। এই জন্যই মনীষীরা আজকাল এত উঠে পড়ে লেগেছেন যাতে আমরা আমাদের মনোবৃত্তিগুলোকে কাজে লাগাতে পারি! এই কাজের অভাবেই ত আজকাল আমাদের সমাজে যত সব অকর্ম্মণ্যের আড্ডা!

সমাজের উন্নতির জন্য সকলেই ব্যস্ত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে আমরাই ত নিজেরা সব সমাজের অমঙ্গল কামনা করছি। মিছামিছি এই বর্ত্তমান শিক্ষার দোহাই দিই!

আমাদের সমাজের ভিতর যে রকম সমস্ত বিদেশী আবর্জ্জনা ঢুকেছে, সেগুলোকে বার করতে না পারলে আমাদের জগতের সঙ্গে চলা ভার হয়ে উঠ্‌বে। বিদেশীর আক্কেল শূন্যতা যেটুকু সেটুকুই আমরা অতি যত্ন করে ঘরে তুলে নিই, আর যা ভাল, আয়াসসাধ্য তা থেকে বহুদূরে থাকি।

গ্রামের গৃহস্থ যে বেচারা! তার ছেলেকে সে সহরে পড়বার জন্য পাঠায়; কিন্তু লাভ কতদূর কি হয়? শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন, ঐ সমস্ত গৃহস্থের ছেলেরা মেসের ভাত খেতেই ভালবাসে; আর অনেকেই ছুটীর সময় পর্য্যন্ত নিজের গ্রামে, নিজের চালাঘর বলে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন! সহরের চাকচিক্যময় বস্তু দর্শনে ও অপরিণাম দর্শিতার ফলে দিন দিন এই সমস্ত যুবক সম্প্রদায় অজ্ঞতার কুয়াসায় নিজেদের ঢাকিয়া ফেলিতেছে। শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার বাহিরের খোলসটাই পরাইয়া দিতেছে, ভিতরের জিনিস কিছুই পাইতেছি না!

জাতীয় জীবনের যে ধাপে আমরা এখন পা বাড়িয়েছি, এখন এসব কথা ছেড়ে আমাদের বিচার করলে চলবেনা। বিশেষতঃ যখন আমাদের 'সুজলা সুফলা বঙ্গ' ও অনুর্ব্বরা বলিয়া প্রতীয়মান হচ্ছে!

শিক্ষার ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবন উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে পরম জ্ঞান ও ধর্ম্ম! ভোগবিলাস শিক্ষার প্রকৃত দেয় নয়। আমাদের নিজস্ব বলে জান্‌বার কিম্বা চিন্‌বার এমন কি আছে যাতে আমরা বাঙ্গালী বলে গর্ব্ব করতে পারি? খাওয়া, পরার এবং পড়ার সকলের ভিতরেই একটা নেশা ঢুকে পড়েছে! মনে হচ্ছে যেন চোখ বুজেই আছি! আর যাদের বাস্তবিকই ঠকাবার শক্তি এবং ক্ষমতা আছে তারা আমাদের চোখে কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে! এই যে আমাদের চোখ বুজে থাকবার ফল যার জন্য আজ সমগ্র দেশময় একটা অশান্তির ও অভাবের

আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, তার জন্য কি আমরাই দায়ী নই ?

গরীব চাষাদের দিকে চেয়ে দেখ বেচারারা কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দেশের কেউ তাদের অভাবের সময় একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবেনা, কিন্তু উপকার পাওয়ার সময় ষোল আনা। দিন দিন তাহারা আমাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তার দিকে আমরা তাকিয়েও তাকাচ্ছি না !

একবার অভাবের সময় তোমার কাছে হাত পাতলে সে যে দু'টা টাকা পেল তার সুদ এবং আসলের তাগাদার জন্য বেচারা, কি বলে Co-operative Loan Office থেকে টাকা এনে তোমাকে দিলে; কিন্তু সেই থেকেই তার ধারের recurring চল্‌লো ! সে আর জীবনে তা শোধ দিতে পারবে কি না কে জানে ? এই রকম কয়েক বৎসর পর সে যখন লোন আফিস্ থেকে টাকা ধার করতে এলো—বিদেশীরা বল্‌লেন যারা পাট চাষ করবে তাদেরই কেবল টাকা দেওয়া হবে, অন্য কাউকে নয় ! কারণ সরকার তখন নিজের দেশের অভাব অনুযায়ী চাষীদের টাকা দাদন করবেন। গরীব বেচারা চাষারা বাধ্য হয়েই পাট চাষ করবে; নিজেদের জমীর উপর, এমন কি চাষ আবাদের ওপরও নিজের কোনও ক্ষমতা থাকবে না ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার ধান কিম্বা পাটের আবাদ করবেন। এতে দেশের লোক থাক্ বা নাই থাক।

এই রকম করিয়া যে আমরা ভাতের গ্রাসটিও ইচ্ছা পূর্ব্বক মুখে দিতে পরিব না তাহার দিকে ত ধনীদের একটুও চোখ নাই ! নিজের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা লইয়াই তাঁহারা ব্যস্ত, অন্যের খবর নেওয়ার সময় কৈ ? তাঁহাদের উচিত —সকলে মিলিয়া প্রত্যেক জেলায় সহর তলীতে মধ্যবিত্ত যুবকদের দিয়ে এক একটি agricultural farm খোলান। সেখানে তারাই চাষ আবাদ করবে। আর Scientific wayতে চাষ করবার প্রণালী অন্য চাষাদের শেখাবে। তবে যদি কোনও প্রকার খাওয়ার ব্যবস্থাটা চল্‌তে পারে। agriculture এ B. Sc. কিম্বা ঐ ধরণের একটা কিছু পাশ করে আমাদের যে কেবল চাকুরীর আশা করতে হবে। তখন কি হ্যাট কোট পরে মাঠে কাজ করা সম্ভবপর ? এই প্রকার এক একটি সমিতি হইলে বোধহয় দেশের যথার্থ উন্নতিই হইবে। মানুষ অনাহারে মরিবে না।

আমাদের চাষীরা অনেকেই জানে না—কি কি উপায়ে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হয় ? চাষীদের এইসব শিক্ষা দেওয়াও আমাদের কাজ। কিন্তু কৈ জমীদাররা তো কেবল সরকারের আইন সমর্থন করবার জন্য লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিতে পারেন। আজ দেশের এই দুর্গতির সময় ধনীদের কাজ বেশী ! দেশশুদ্ধ লোক তাঁদের দিকেই চেয়ে আছে।

এই রকম Practical training এ যে কেবল কাজ করা গোচের শিক্ষা হবে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কৃষিজ্ঞান—যন্ত্র চালনাদি সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই অল্পবিস্তর হতে থাকবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে শিক্ষার গোড়ার দিকটায় Practical training হওয়া উচিত; অর্থাৎ ইহাই হচ্ছে বস্তু-জ্ঞানের ভিত্তি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষানুযায়ী ছেলেরা কতকগুলি পুঁথিগত গৎ মুখস্থ করে—বিভিন্ন কতকগুলি বিষয়ের খিচুড়ী পাকায়—শিক্ষার নামে অ—আ শিক্ষাই হয় বেশী। এই সমস্ত জঞ্জালের ভিতর দিয়ে আসল বৃত্তিটা বিকাশ লাভ করতে পারে না।

আলো এবং বাতাস যা মানুষকে বেড়ে উঠ্‌বার জন্য সাহায্য করে—তা পুঁথির তাড়া ভেদকরে মানুষের কাছে এগোতে সাহস করে না।

এই গেল একদিক। অন্যদিকে দেখ্‌তে গেলে—দেখা যায় আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা আত্মনির্ভরতার সাহস টুকু আস্তে আস্তে কমিয়ে দিচ্ছে। তার কারণও ঐ Practical training এর অভাব। আর এর পরিবর্ত্তে ছেলেরা সব হচ্ছে এক একটি মূর্ত্তিমান ভোগ-বিলাসের নমুনা। মানুষ হওয়া ত দূরের কথা—পেটে খাওয়ার সংস্থান টুকু পর্য্যন্ত করে উঠ্‌তে পারি না।

আগেই বলা হয়েছে ধর্ম্ম এবং শিক্ষা এক সঙ্গে হওয়া দরকার। কারণ দেখা যায় জীবনে অনেক বিদ্বান লোক ধর্ম্মভয় বলে কিছু মানেন না। তাহারা বলেন 'জীবনে যা দরকার, যা আমাদের কাজে আস্‌বে, তাই ধর্ম্ম !' কিন্তু এর সত্য মোটেই নেই। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের

ব্যবসা বাণিজ্যাদি ভোগ বিলাসের দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সততা হারাচ্ছে। এটা একটা নেহাৎ গুরুতর কথা—এটা ভাব্‌তে হবে এবং এর জন্য উপায়ও উদ্ভাবন কর্‌তে হবে।

শ্রীসত্যরঞ্জন বসু।

চাষার-গর্ব্ব

ব'লবে বল নিরেট চাষা,
নেহাৎ ছোটলোক ;
তোমার মুখের মধুর বাণী
মোদের ভূষণ হোক।
আমরা চাষা আমরা চাষী,
এ দুটী নাম ভালই বাসি
অসভ্য তো ঘরেই আছি
নাইকো তাতে শোক!
আমরা বোকা চাষার ছেলে,
হাজার ছোট লোক!

ভাঙা কুটীর মাঝে মোদের
সন্ধ্যা সকাল কাটে,
সারাটা দিন যায় যে চলে
শস্য ভরা মাঠে!
মা-টীর ধূলি বেশের সেরা,
সারা দেহ তাতেই ঘেরা
কচ্ছ ঘৃণা তাই না দেখে?
তাইতে কাছে গেলে,
ঘৃণায় ছোট মুখ ফিরিয়ে,
মোদের পিছন ফেলে।

ওই যে তোমার সভ্য দেহ
নধর কান্তিখানি,
আমার বুকের রক্ত দিয়ে
নিত্যি বাড়াই আমি।
শ্রাবণ ঘন বরিষণে,
পোষের শীতের দিনে
অগ্নি-ভরা চৈত্রে রোদে
চাদর ছাতা বিনে!
এম্নি করে তোমার তরে,
শস্য আনি জুটাই ঘরে
সভ্য তুমি তাইতে আজি,
আমরা ছোট লোক ;
তাতেই বলি তোমার গালি
আমার ভূষণ হোক।

আমরা বটে হইনি বড়
সভ্য সহর মাঝে ;
নেওনা কেহ মোদের ডেকে
দেশের দশের কাজে।
ছায়া ঘেরা পল্লীবাসে,
গোধন চরা শ্যামল ঘাসে

দিনটা কাটে নদীর কূলে
তরুর মূলে মূলে,
ভাইটী বলে আদর করে,
নেওনা কভু তুলে !
(তবু) তোমার তরেই খেটে,
চাষার ছেলের সারা জনম,
সুখেতে যায় কেটে !

আমরা নেহাৎ ছোট,
তোমরা বড়—পরের পায়ে
নিত্যি পড়ে লোটো।
হইনি মোরা মস্ত কবি,
এইটী শুধু জানি ;
কালিদাসেও জন্ম দিল,
মোদের লাঙ্গলখানি।
জ্ঞানী বিজ্ঞ স্বদেশ ভক্ত,
গড়ে ভাঙ্গে মোদের রক্ত
আমরা আছি তাইতে বুঝি
জাতটা আছে বেঁচে ;
তোমরা কবে ঘর ছেড়েছ,
পরের কথায় নেচে।

তোমরা হবে বড়—।
সভ্য ভব্য ভাই বোনেরে
তাইতে জড় কর ?
আমরা যত মূর্খ চাষা,
রাখবে ফেলে পিছে ?
বিফল হবে চেষ্টা তোমার
টানবো মোরা নীচে।
দূরে যতই রাখবে ঘৃণায়
ধরবো ততই জোরে,
আঁধার ঘরে রাখবে যত,
ফেলবো আঁধার ঘোরে।
বড়ই যদি হবে।
নিরেট চাষায়—ভাইটী বলে,
আগেই সাথে লবে।

শ্রীকালিদাসী দেবী।

আশা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ধীরে ধীরে সত্যব্রত মহাশয়ন গ্রহণ করিলেন। আত্মীয়গণ পরিবেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিবব্রতকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন "বাবা বড় সাধ করে তোমার নাম রেখেছিলাম শিবব্রত! দে'খো আমার সে সাধ যেন নিস্ফল না হয়, যা শিব যা' মঙ্গল কর্ম্ম তাই চিরকাল ক'র। তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি তোমার কাজ যেন মঙ্গলের হয়।" শিবব্রত কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পদধূলি লইয়া বলিল তাই হবে বাবা, এ জীবন নূতন করে আরম্ভ করব।" মহামায়া লীলাকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল "বাবা এই আপনার ভবিষ্যৎ পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করুন।" সত্যব্রত তাঁহার কম্পিত হস্ত লীলার মস্তকে রাখিয়া বলিলেন "দেখো মা শিবব্রতের জীবনব্রত যেন শিবের দিকে অগ্রসর হয়।"

সকলে সরিয়া দাঁড়াইলে সময় আসন্ন দেখিয়া ব্রহ্মযশা সত্যব্রতের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুত।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

শিবব্রত একবার উর্দ্ধদৃষ্টিতে ব্রহ্মযশের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, তারপর মৃদুস্বরে কয়েকবার "ব্রহ্মপর্ণমন্ত্র" বলিয়া সেই হাস্যরেখা মুখ হইতে মিলাইতে না মিলাইতে দেহত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মযশা কিছুক্ষণ নিমিলিতনেত্রে থাকিয়া শেষে রোরুদ্যমান প্রিয়ব্রতকে বলিলেন "বৎস তোমার এই সাধুচরিত্র পিতা চিরজীবন ভগবদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইনিই তোমার পক্ষে যেন একমাত্র আদর্শ হ'ন। আর কোন দিকে চেওনা। জীবনে এঁর চাইতে' বড় হবারও আশা করনা, নিস্ফল হ'বে।" প্রিয়ব্রত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আমার জীবনে কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, এঁকে অনুসরণ করে চলাই আমার এক মাত্র কার্য্য।"

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইয়া গেলে মহামায়া পরদিন ব্রহ্মযশার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যজ্ঞাবসানে যজ্ঞভূমির ন্যায়, দাহাবসানে শ্মশানের ন্যায় ব্রহ্মযশার গৃহ জনশূন্য! একজন ভৃত্যের উপর সমস্ত দ্রব্য পাঠাইবার ভার দিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। ভৃত্যের নিকট মহামায়া লক্ষ্মার লিখিত একখানি পত্র পাইল। লক্ষ্মী লিখিয়াছে—

"তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। বাবাও আমাদের সম্বলপুরে রাখিয়া, কিছু দিনের জন্য তাঁহারই খোঁজে বাহির হইবেন। আমাদের এখানকার কাজ ফুরাইয়াছে, তোমরা আমাদের পরমাত্মীয় তোমাদের নিকট বিদায় লওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান শোকের অংশভাগী করিয়া তোমাদের দুঃখের উপর আরও দুঃখের বোঝা চাপাইতে সাহস হইল না, তাই না বলিয়া চলিয়া আসিলাম, আশা করি ক্ষমা করিবে। জানি না আর দেখা হইবে কি না, কিন্তু তোমাদের ভুলিতে পারিব না। আর যদি তিনি কখনও ফিরেন তাহা হইলে তোমাদেরও কখন ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন না। সেই ভবিষ্যতের পূর্ণ মিলনের আশায় এস আমরা দু'জনেই চাহিয়া থাকি। আমার জীবনে আর কি কাজ আছে, আর কি রহিল, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে উদয় হইতেছে, কিন্তু আশাবধিং গতঃ— আশার অন্ত নাই, সেই আশা করাই আমার একমাত্র অবশিষ্ট আছে। তুমিও তাহাই ক'র, এক দিন না এক দিন তোমার আশাও সফল হইবে। আর যদি তা না হয় তাতেই বা কি আসিয়া যাইবে, জীবন অনন্ত, কার্য্যেরও অন্ত নাই। এজন্মে না হয় পরজন্মে হইবে। কার্য্য করিতে আসিয়াছি কার্য্য করিয়া যাইব; ফলাফল নারায়ণের হস্তে। তবে তিনি মানুষের মনে আশাকে সর্ব্বদাই জাগাইয়া রাখেন তাই মানুষ মরে না, আশাও মরে না।

তুমি আমার প্রণাম জানিবে। ইতি—

তোমারই ছোট ভগ্নী

"লক্ষ্মী"

মায়া পত্র পড়িয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল শেষে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "ভালই করেছেন।" তারপর কিছুক্ষণ প্রেতের মত এধার ওধার ঘুরিয়া সমস্ত দ্রব্য নাড়িয়া চাড়িয়া শেষে দেখিল বিষ্ণুযশার একজোড়া খড়ম পড়িয়া আছে। মায়া ত্রস্ত হস্তে তাহা গ্রহণ করিয়া ভৃত্যকে বলিল সব জিনিষ যখন ওখানে নিয়ে পৌঁছে দেবে তখন ব'ল একজোড়া খড়ম আমি রেখেছি।"

গৃহে আসিয়া সে লক্ষ্মীকে পত্রের উত্তর দিল। মায়া লিখিল "তোমাদের দুঃসাহস যে যাহা সকলের জন্য আসিয়াছে তাহাকে তোমাদের ঐ ক্ষুদ্র সংসারটীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাও। নারায়ণ যাহাকে চাহিতেছেন তাহাকে তোমরা কি করিয়া ধরিয়া রাখিবে? তিনি ভালই করেছেন, তাঁর জন্য আমার কোন ক্ষোভ নাই তাঁকে শত শত প্রণাম।

তাঁর এক জোড়া পাদুকা পাইয়াছি, তাহা হইতে তোমরা আমায় বঞ্চিত করিতে পাইবে না। যখন কার্য্য করিতে করিতে ক্লান্ত হইব তখন ঐ খড়ম জোড়ার নিকটে গিয়া বসিব, আর ভাবিব এই খড়ম জোড়া যাঁর, তিনি—

"যঃ আত্মদা বলদা যস্ত বিশ্ব উপাসতে।"

তাঁকেই অবলম্বন করিয়াছেন। সেই চিন্তা আমাকেও বল দিবে, আমাকেও ঠিক পথে চালাইবে, আমারও ক্লান্তি হরণ করিবে।

তোমাদের সঙ্গে দেখা হইল না বলিয়া যে ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলাম। সংসারে তিনি আমায় যাহা করিতে বলিয়া গিয়াছেন তাহাই করিব। চোখের দেখাটাই বড় নয়, প্রাণের মিলনটাই মিলন। তোমরা আমার অন্তরেই বসবাস করিবে।

কিন্তু মাঝে মাঝে পত্র দিও সেই আশায় রহিলাম।"

পত্র পাঠাইয়া মায়া কিছু দিন সামলাইয়া লইবার জন্য স্বীয় কক্ষের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিল। তাহার অবস্থা অনুভব করিয়া গিরীন্দ্রনাথ একদিন তাহাকে ডাকিয়া আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এ তুমি কি করছ? তুমি যদি নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা কর তাহ'লে অপরেই বা তোমার কাজ কত দিন চালাবে? তুমি এরকম ভাবে লুকিয়ে থাকলে চলবে কেন?"

মায়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল "গিরীন বাবু, আপনাকে আর আমি আবদ্ধ রাখতে চাহিনে, আপনি মুক্ত।"

গিরীন্দ্র। এ কথার অর্থ কি?

মায়া। এ কথার অর্থ আর কিছুই নয়, আপনি আপনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করুন, আমার জন্য আর অপেক্ষা করবেন না।

গিরীন্দ্র। তোমার জন্য অপেক্ষা করছি একথা যদিও মিথ্যা নয় তবুও সম্পূর্ণ সত্যও নয়। আমি তোমাকেই যে কেবল চাই তা নয়, তা ছাড়া এটাও দেখাতে চাই যে আমাদের অতিক্রম করেও সংসারে তোমাদের কোন অস্তিত্ব নাই। পুরুষ আর স্ত্রী নিয়েই যখন সংসার তখন একে অন্যকে উল্লঙ্ঘন করে চলতে পারে না। আমি প্রমাণ করে দেব আমিও তোমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নই। আর তা প্রতি পদেই প্রমাণ হচ্ছে, কিন্তু তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাচ্ছ না। দেখতে পাও আর নাই পাও চিরদিনের জন্য যদি এ প্রশ্ন তোমার কাছে অমিমাংসিতই থাকে তবু আমি কিছুতেই এ আশা ত্যাগ করতে পারব না যে 'তুমি আমার যেমন প্রয়োজনীয় আমিও তোমার তেমনি' এ কথাটা একদিন না একদিন তুমি বুঝবে। এই আশাই আমার সকল কর্ম্মে উৎসাহ দিচ্ছে এবং চিরদিনও দেবে।

মায়া সজল নয়নে কাতর হইয়া বলিল "গিরীন বাবু, দয়া করে আমায় ত্যাগ করুন। আমি আমার জীবনকে একটী মাত্র উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছি। সেই উদ্দেশ্যের কাছে ভাই কেউ নয়, বন্ধু কেউ নয় লৌকিক স্নেহ ভালবাসা এসবও কিছু নয়। আমি আমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেব যে মহৎ উদ্দেশ্যে, মহৎ কার্য্যে মানুষ চিরদিনই একক নিঃসঙ্গ। এখানে নর নারীতে কোন প্রভেদ নেই। নারীকে ছেড়ে এমন কি সংসারকে ছেড়েও যদি পুরুষের অস্তিত্ব থাকে তা'হলে পুরুষকে অতিক্রম করেও নারীর অস্তিত্ব আছে। বিষ্ণুযশা যেমন সকল-বন্ধন ছেদন করে প্রমাণ করে দিলেন যে নারায়ণ যখন আহ্বান করেন তখন তাঁর কাছে দেবোপম

পিতা স্নেহময়ী জননী—দেবীতুল্যা স্ত্রী এরা কেউ কিছু নয় ; তেমনি আমার জীবনেও তাই প্রমান হবে।

গিরীন্দ্র। কি করে! তুমি কি অমনি সমস্ত ত্যাগ করে একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করে সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যেতে চাও?

মায়া তা চাই না আমি এই সংসারের মধ্যেই সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকব, দূরে যাবনা। আমাদের হিন্দু সংসারে বিধবা হয়ে অনেকেই কার্য্যতঃ প্রায় এই রকম সন্ন্যাসিনী হয়েই আছেন। কিন্তু তাঁদের এই কার্য্য সজ্ঞানকৃত নয়, কতকটা সমাজের চাপে কতকটা স্বীয় ধর্ম্ম বুদ্ধির জন্য! আমি জেনে শুনে জ্ঞানের স্বাধিনতায় ঐ সন্ন্যাস অবলম্বন করব!

গিরীন্দ্র। কিন্তু ততঃ কিম্!

মায়া। তারপর কি? তা জানিনে, জানতে চাইনে। আমার উদ্দেশ্য প্রমান করে দেওয়া যে আপনারা ছাড়াও আমরা আছি, আপনাদের মত সমস্ত কাজই করব, কিন্তু আমার কোন বন্ধন না থাকাতে আমার সমস্ত কাজই "অনাশ্রিত কর্ম্মফল" হবে। আপনারা যদি ইচ্ছা করলে স্নেহ ভালবাসার ওপরে উঠে সংসারে থেকেই "সন্ন্যাসী যোগী" হ'তে পারেন তাহ'লে আমরা কেন পারব না? আপনারা না ভালবেসে নিঃস্বার্থপর হয়ে কাজ করতে পারবেন আর আমাদের ভালবাসতেই হবে, অন্য একটা লোকের সঙ্গে একবারে এক হয়ে যেতেই হবে তবে কাজ করতে পারব একথা সত্য নয়। আমি আমার জীবনে দেখাব লৌকিক ভালবাসা না বেসে, নিজের হাত পা না বেঁধেও সংসারের আপনার লোক হওয়া যায়। আমিও এইটে প্রমাণ করবার আশায় জীবন ধারণ করব। আমায় আপনি দয়া করে ছেড়ে দেন।

গিরীন্দ্র। সংসারে থেকে মেয়ে মানুষ তা কখনও পারে নি। তুমি কোন না কোন রকমে ভালবাসবেই।

মায়া। তা বাসব নিশ্চয়ই বাসব, তাই আমার সাধনা। নিজেকে মুক্ত রেখেও ভালবাসা যায়। যে ভালবাসা আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখকে ভুলে কেবলমাত্র পরের সুখ দুঃখকেই আপনার মনে করে', সেই ভূমাভিমুখী প্রেমের মধ্যে আমি নিত্যমুক্ত থাকব। এ রকম ভূমা-প্রেম, জগতে বিরল নয়, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি, আস্বাদ পেয়েছি তাই আপনাকে মুক্ত রাখতে চাই, তাই আপনার প্রবল শক্তির নিকট হ'তে দূরে থাকতে চাই, আমাকে দয়া করুন আমায় ত্যাগ করুন।

গিরীন্দ্র জীবনে এই প্রথম অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল, টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "আমি তা হ'লে কি করব?" মায়া ত্রস্তে নিকটে আসিয়া বলিল "ছি গিরীন বাবু আপনার মুখে এই কথা নিতান্তই অশোভন আপনি ত' চিরদিন স্বাধীন, চিরদিন নিজের ওপরই নির্ভর করে আসছেন, আপনাকে দেখেই ত আমার সাহস হচ্ছে যে আমিও পারব।"

গিরীন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ভয় নেই আমি এতদূর নীচ নই যে তোমায় তোমার পথ হ'তে জোর করে টেনে আনব। তুমি চিরদিন মুক্তই থাক, তবে আমি আমার আশা ছাড়ব না। আমায় তুমি না চাও আমি তোমায় চাইবই, তবে আজ হ'তে সে কথা আর তুমি জানতে পারবে না। আমি বলছি আমায় ভয় করে চলবার তোমার প্রয়োজন নেই, নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তোমার যখন যা প্রয়োজন হবে আমায় ব'ল আমি কোন রকম লাভের আকাঙ্ক্ষা না রেখে তা করে দেব। তোমার আমার মধ্যে আজ হ'তে সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি জানি তুমি যা করবে তাতে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে কিন্তু তাতে তোমার ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। মানুষে মানুষের সাহায্য নিয়েই থাকে, তাতে কারও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না। এই মনে করে তুমি অসঙ্কোচে আমায় তোমার যখন প্রয়োজন হবে ডেকে পাঠিও।

মায়া চিন্তা করিয়া বলিল "আচ্ছা তাই হ'ক। আমি যখন কেবল মাত্র আপনাকেই ভয় করি তখন এ ভয়কেও জয় করতে হবে। আপনার সঙ্গে থেকে আমার এই দুর্ব্বলতাকে জয় করব। আপনাকে আর দূরে দূরে ঠে'লে রাখব না। কিন্তু ও কথা যাক আর একটা কথা, বড়দাদা কত দিন এমন

ভাবে কাটাবেন। তিনি বিয়ে করে যাতে সম্পূর্ণ সংসারী হ'ন তাই করে দেন। তাঁর বিবাহের ঠিকঠাক্ করে দেন, বাবার সপিণ্ডকরণ হয়ে গেলে তাঁর বিবাহ দিতে হবে।

গিরীন্দ্র। তোমার দাদার মত লোকের বিবাহ করাও যা, না করাও তাই। কোন বিষয়েই সে উদাসীন নয় অথচ কোন জিনিষেও সে লিপ্ত নয়। তাকে বিবাহ করতে বলতে বলছ বলছি, সেও যে বিয়ে করবে না তাও নয়;—তবে তার ইচ্ছাটাই তার কাছে সব চাইতে বড়। তার যখন প্রয়োজন বোধ হবে তখন সে বিবাহ করবে, কারও অনুরোধ উপরোধের অপেক্ষা রাখবে না। আর যদি তা তার অপ্রয়োজনীয় বোধ হয় তাহ'লে হাজার মাথা কুটলেও সে করবে না।

মায়া। তবু আমাদের চেষ্টা করে দেখতে হবে।

গিরীন্দ্র। বেশ তা' করব।

আশা ছাড়ি নাই, ওগো দীনের একমাত্র ভরসা, তোমার আশা ছাড়ি নাই। এই যে চতুর্দ্দিকে অন্ধকারকে ঘেরিয়া অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে তবু আশা ছাড়ি নাই। আকাশে আলোর আভাষ নাই, বাতাস হাহাকার করিয়া দূরে দূরে চলিয়া যাইতেছে, জগত নির্ব্বাক তবু আশা ছাড়িব না। অন্ধকারই যেমন অন্ধকারের শেষ নয় নিষ্ফলতা তেমনি আশার শেষ নয়। আজ সমস্ত জগৎ মুখ ফিরাইয়াছে বলিয়া তুমি মুখ ফিরাও না। তুমি যদি মুখ ফিরাইতে তাহা হইলে জগৎ কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিত? তাহা হইলে ইহার এত সুখ এত দুঃখ এত বৈচিত্র্য কাহাকে অবলম্বন করিয়া 'সূত্রে মণিগণাইব' রহিয়াছে? তুমি মুখ ফিরাও না অন্ধকার হইতেও ঘোরতর "অন্ধতামিস্রেও তুমি, উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতম দুর্নিরীক্ষ্য আলোতে তুমি আছ; দিন দিনান্তরে রাত্রি হইতে রাত্র্যান্তরে দেশ হইতে দেশে যুগ হইতে যুগে তুমি পরিব্যাপ্ত ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে আছ—তোমার আশা যে ছাড়ে সে তোমাকেই ছাড়ে, আমি তোমার চরণের আশা ছাড়িয়া কোন অন্ধকারের দিকে ছুটিব? আমি আমার ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে তোমায় চাহিয়াছিলাম তুমি আমার সেই উদ্ধত ইচ্ছাকে নিষ্ফল করিয়াছ, কিন্তু এই নিষ্ফলতা যে তোমার স্বহস্ত দত্ত এ গর্ব্ব ত' তুমি আমার নষ্ট করতে পারবে না। চিরদিন আমি এমনি আশা করিব, যুগে যুগে জন্মে জন্মে তোমায় চাহিয়া পাইব না, ধরিতে গিয়া ধরিতে পারিব না, এই লুকাচুরি খেলিব, তোমায় আমায় এই যে লুকাচুরি চলিবে তাহা হইতে 'ত' তুমি আমায় নিবারিত করিতে পারিবে না। তোমায় ছুঁই ছুঁই করিয়া ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারিব না সেই যে পরম নিষ্ফলতার গভীর দুঃখ, মিলনোম্মুখ চির বিরহের অনন্ত কাতরতাই আমার সম্বল হ'ক। সব দর্প সব চেষ্টা সব সাধনা শেষ হয়ে যাক সুধু তোমার কেবল তোমারই বিরহ আমার অন্তর বাহিরের সমস্ত অন্ধকারকে পূর্ণ করিয়া রহুক।

গভীর মেঘাচ্ছন্ন নিশায় আশাবরী নদীতটে ব্রহ্মযশা নির্ব্বাক নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দিনের কর্ম্ম শেষ করিয়া দিনের দেনাপাওনা শোধ করিয়া আশাবরীর অন্ধকার নদীতীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রাণের চিরদিনের আশা এই আশাবরীর ন্যায় অন্ধকারের মধ্য দিয়াই বাহিয়া চলিতেছে। সেই প্রবাহের শেষ নাই—দূরে অতি দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে,—অন্ধকার প্রান্তর পার হইয়া দেশে দেশে যুগ হইতে যুগান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার শেষ নাই—তাহা শেষ হইবার নহে।

ভুবনেশ্বরী গভীর দুঃখকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার সংসার পাতিয়াছেন। লক্ষ্মীও তাঁহার ভ্রাতার সংসারকে এখানে টানিয়া আনিয়া আবার হাসি অশ্রুর হার গাঁথিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ব্রহ্মযশা সকল কার্য্যের মধ্যে সকল অবসরের মধ্যে যেন কিসের আশায় চাহিয়া থাকেন। সকল কর্ম্মই তিনি নিয়মিতরূপে করেন তবু অন্তরে অন্তরে তাঁর প্রতীক্ষার ভাব সদা জাগরূক রহিয়া যায়।

আজ আশাবরীর তটে দাঁড়াইয়া সেই প্রতীক্ষাকে সেই প্রাণের চিরন্তন চেষ্টাকে অন্ধকারের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া গভীর কণ্ঠে ব্রহ্মযশা ডাকিলেন "এস তুমি এস!" কোন উত্তর নাই—সমস্ত জগৎ নিরুত্তর নির্ব্বাক! আশাবরীও যেন কলস্বরে সেই গভীর আহ্বানকে বহন করিয়া চলিয়া গেল,

বাতাসও যেন সেই আহ্বানকে বহিয়া লইয়া দূর পর্ব্বতগাত্রে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু তবু মনে হইল যেন দূর হইতে একটা প্রতিধ্বনি উত্তর দিতেছে কি উত্তর দিতেছে বুঝা গেল না তবু বোধ হইল যেন প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, জগতের শেষ হইতে দূর নক্ষত্রালোক হইতে অনন্ত আকাশের সর্ব্বাশেষ স্থান হইতে প্রতিধ্বনি আসিতে চেষ্টা করিতেছে। ওরে মন ভয় নাই আশাকে ধরিয়া রাখ, একদিন তোর প্রাণের গভীর আহ্বানের প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি সমস্ত জগৎ সংসারের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে। ভয় নাই ওরে ভয় নাই।

ব্রহ্মযশা ডাকিলেন "বিষ্ণু"—পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মী ডাকিল "বাবা!" ব্রহ্মযশা প্রথমে চমকিত হইয়া উঠিলেন, শেষে লক্ষ্মীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন তুমিই আমার তুমিই আমার লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই ব্রহ্মযশা কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মী বলিল "বাবা ঘরে চলুন।"

ব্রহ্মযশা রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "তাই যাব মা, আমি কিছুতেই বাইরে যাব না। এখানে না পাই তাঁকে আর কোথাও পেতে চাইনে।"

পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া সেই মহাসন্ন্যাসী গৃহাভিমুখে ফিরিয়া গেলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

আধপয়সার মহাজন।

শর্ম্মাপুরের চাষীদের পলাশডাঙ্গার হাটে যাইবার পথই হইতেছে ঐ গ্রামের মুখুযোদের দরজা দিয়া। শনি মঙ্গল বারে হাট বসে—হাট সকালে হয়। চাষীরা সময়ের তরকারি বাজ্‌রা ভরিয়া লইয়া কখন ডান হাতটী কখন বাঁ হাতটী দিয়া বাজ্‌রা ধরিয়া খালি হাতটী ঘন ঘন দুলাইতে দুলাইতে দ্রুতই যায়, পাছে বেলা হইয়া পড়ে। তাহাদের বাজ্‌রার উপর মুড়ির বৃহৎ পুঁটুলি ও হুঁকার শীর্ষভাগটি অগ্রেই নজর পড়ে।

গোকুলের বয়স বেশী নয়, যোয়ানই বটে, কিন্তু সে তাহার বাজ্‌রা লইয়া দলের লোকের সঙ্গে আসিতে পারে না, কেবলই পিছাইয়া পড়ে। হাটের নিকটে আসিয়া যখন দেখে যে হাট বসিয়া গিয়াছে, তখন তাহার যেন চমক ভাঙ্গে, সেই পা কতক দৌড়িয়া আসিয়া বাজ্‌রা নামাইয়া 'বড় হাঁফাইতে থাকে। একদিন তাহার জায়গায় অপর চাষী বসিয়াছিল, তাহাতে গোকুল ডাগর চোক দুটী ছলছল করিয়া বলিয়াছিল, হাঁরে, আমি কি এমনই ছিলাম?—সেই দিন অবধি তাহার জায়গায় কেহ আর বসে না—খালিই থাকে।

একদিন চাষীরা তাহাদের গৃহিণীদের কথা বলিতে বলিতে আসিতেছে—"মাগীরা কি বজ্জাৎ; বাড়ী হ'তে বাহির হইতে হয় না, বাড়ীর মধ্যেই নড়ে চড়ে, তবু মন পাইবার যো নাই, কি বলিস তুই পরাণ, বলনা, তুইত রামায়ণ মহাভারত পড়িস।" পরাণ বলিল, "ভাই, ঐ মন পাইবার যো নাই জিনিষটিই আমাদিগে এত ভারী মোট বহায়, তাদের হাসিটুকুই যে আমাদের ভাতের উপর কলাইয়ের ডা'ল, মুড়ির উপর গুড়।" গোকুল একজনকে ডিঙ্গাইয়া যাইয়া পরাণের পাছু পাছু চলিল। পরাণ বলিতে লাগিল, "এ বোঝার চেয়ে যে ভূতের বোঝা কত ভারী তবু ত কেউ সে বোঝা নামাইতে চাই না, ভূতে পাওয়া মানুষের মত কেমন একটা ঘোরে ঘোরে কাজ করিয়াছি।" গোকুল হঠাৎ বলিয়া উঠিল,

'পরাণ, কাপড়খানা নিলি না ?" "সে দামী কাপড়, আমি আর কি করব, কতবার বলেছি, তুইত নিস্‌না ! সে কি আর আমাকে রাখ্‌তে আছে রে ! গোকুই যদি গেল, তবে আর গলার ঘণ্টানিয়ে কি করব !"

"কতবার আর কবে বল্লে গো !"

পরাণের কথা সকলের ভাল লাগে নাই। একজন গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"নাঃ ও কথা শুনতে চাই না, কোথা থেকে হয়, খবর রাখবে না, এই কাল রাত্রিরেই তোর খুড়ী গঙ্গা নাইতে যাবার বায়না ধরলে, দুই এক কথায় রাগ চাপলো শেষে ঘর থেকে বার ক'রে দিয়ে তবে একটু ঘুমুতে পাই। মাগী সদাই বলে অমন স্বামীর স্ত্রী, শীতকালে একখান দশহাত কাপড় পাই না পরতে, ছেলের গলায় একটু রুপার হাঁসুলি তাও নাই, অমুক, তমুক। কি আমাকে দারোগা জমাদারই দেখেছে ! কি না তোরা দিস্‌ ছ'কাঠা ভূঁয়ে বেগুন, আর আমার থাকে এক বিঘায়। পরাণ বলিল, "খুড়ো, রাগ করো না—এই যে সেদিন তুমি মেলা দেখতে গিয়ে এক টাকা দেড়টাকা উড়িয়ে এলে, যাত্রা শুনতে গিয়ে কুপন খেলে দুটাকা ফুঁকে দিলে, সেগুলো কোত্থেকে হয়, খবর রেখে কর কি ? ওসব কিছু নয় খুড়ো, আসল কথা এই, মাগীদের সুখশোয়াস্তি আমোদ প্রমোদ কিছু আছে এ আমারা মনে করতেই পারি না। খাবার আগে আমরা কি খবর রাখি খুড়ো, কোন জিনিষটা আমরা কতটা খেলাম আর কতটুকু তাদের জন্য রইল, সব বিষয়েই ঐ রকম। তোমার তামাকের খরচ কত খুড়ো ? ছেলে হ'লে তবু কিছু জোরের সহিত থাকে নইলে তো কেনা বাঁদী।" গোকুল সেদিন কেমন করিয়া একবারও মোট না নামাইয়া কোমরে হাত না দিয়া যে হাটে আসিয়া পৌছিল, তাহা সে নিজেই ঠাওর পাইল না।

এইখানে গোকুলের একটু ইতিহাস বলা দরকার। ইহারা দুই সহোদর, গোকুল কনিষ্ট। জ্যেষ্ঠের দুইটি পুত্র গোকুলের স্ত্রীর বন্ধ্যা অপবাদ ছিল। গোকুলের স্ত্রীর নাম অশ্বিনী। অশ্বিনী নিঃসন্তান বলিয়া দুঃখ করিলে গোকুল বুঝাইত—দেখ দুঃখ করিও না, আমি সমস্ত বিষয় বেচিয়া গুরু মহাশয় রাখিয়া এক পাঠশালা বসাইব, পাঠশালার সকল ছেলেই তোমায় মা বলিয়া ডাকিবে। কুটুম আসিয়াছে বলিয়া গোপনে রাত্রে সন্দেশ কিনিয়া আনিয়া অশ্বিনীকে খাওয়াইত। এখন সেই অশ্বিনীর হল ব্যারাম। গোকুলের ইচ্ছা একটু ভাল করিয়া চিকিৎসা করাই, কিন্তু মুখ ফুটিয়া দাদাকে কিছু বলিতে পারিল না। দাদাটিও খরচ খতাইয়া দেখিয়া গ্রামের ধম্বন্তরির চিকিৎসাই বাহাল রাখিল, ফলে অশ্বিনী ইহলোক ত্যাগ করিল। তা'রপর গোকুল ইহলোকেই থাকিল বটে, কিন্তু অনবরতই পরলোকটা হাতড়াইত। একদিন বলা নাই, কহা নাই, সে পৃথকান্ন হইল। ইহার ভাবগতিক দেখিয়া কেহ দ্বিতীয়বার বিবাহের কথাই তুলিল না।

গোকুল হাটে যায়, রোজ পিছাইয়া পড়ে—একদিন সে মুখুর্য্যেদের বাঁকে পৌছিয়াছে তখন মাথাটাকে খানিক বিশ্রাম দিবার জন্য দুইহাতে করিয়া বাজরাটা তুলিয়া ধরিল, এমন সময় বাড়ীর ভিতরে কে একজন ডাকিতেছেন, শুনিতে পাইল—অশ্বিনী। বোঝাটা ঝুপ করিয়া মাথায় পড়িয়া গেল। গোকুল বাকী পথটুকু সেই ডাক শুনিতে শুনিতেই হাটে গেল। গোকুল প্রত্যহই সেই খানে আসিলেই কেমন বড় চঞ্চল হইয়া উঠে, বাড়ীর সামনের পথটুকু না ফুরায় এই তাহার কামনা হয়। কিন্তু গোকুল জানিত না যে সপ্তমীর সানাই রোজ বাজেনা, ধানের শীষে, ঘাসের শিশিরে, কাশ ফুলের শ্বেতাভায়, বালার্ককিরণের হেমবরণে শরতের শ্যামল-অঙ্গ অমল আভায় রোজ ঝলসে না—স্বর্গের বার্ত্তা লইয়া কানের কাছ দিয়া, মৃদুবাতাস প্রাণকে উচাটন করিয়া রোজ বহিয়া যায় না।

একদিন গোকুল আর যেন হাঁটিতে না পারিয়া মুখুয্যেদের বাড়ীর একটু দূরে মোট নামাইয়া গামছা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক ৯।১০ বৎসরের একটি বালকের হাত ধরিয়া বাটীর বহির হইল, এবং অশথ-তলায় দাঁড়াইয়া কে বলিল, এই যে অশ্বিনী তোর ছেলে আজ সকাল সকালই উঠেছে—কিহে সম্বন্ধী, আজ একবার গুরুমহাশয়কে কৃতার্থ করবার জন্য পাঠশালা অঞ্চলে যাবে না কি ? গোকুল থতমত খাইয়া মোট উঠাইয়া টলিতে টলিতে হাটে গেল। সন্তানের হাত ধরা জননীর শোভা

তাহার চোখের সাম্‌নে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার শূন্য গৃহস্থলী মনে পড়িল, পীড়ের ধূলা জমাট বাঁধিয়া আছে, বাসনগুলা সব দাগে ভরা, উঠানে ঘাস, রান্নাঘর যেন আঁস্তাকুড়, বাড়ীর স্নিগ্ধতা নাই, ঘরের আলো নাই, সব খাঁ খাঁ করিতেছে—আর সন্তান! পরের মঙ্গল সাধিবার ইচ্ছার জীয়নকাটি, পৃথিবীর স্নিগ্ধ ভাবগুলির রসদ? গোকুলের কেবল শিশুটিকেই মনে পড়িতে লাগিল। গোকুল শপথ করিল সে পথ সে ত্যাগ করিবে। পরদিন মোড়ের মাথায় আসিলে, এক পা এ'দিক, এক পা ওদিক করিয়া অশথতলা দিয়াই ভাসিয়া পড়িল। অশ্বিনীকে কদাচিৎ কখনো দেখিলে সম্ভ্রমে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত, সে আনত চক্ষে কেবল হাতের তলায় ছোট সেই মানবটীকে খুঁজিত।

হাটুরেদের মধ্যে একটি ছোকরা গোকুলের উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত কিছুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিল সে একদিন বলিল, "গোকুলানন্দ, এক ছিলিম তামুক সাজ, খেয়ে দুজনে যাচ্ছি এখন, আমার শরীরটা বেশ ভাল নাই অত যেতে পারচি না।" গোকুলের পাঁচেও হাঁ, সাতেও হাঁ, সে মোট নামাইয়া তামাকু সাজিল। সে ছোকরাটার নাম নিতাই।

নিতাই তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ এক প্রতিবেশী পুত্রকে বড় পেয়ার করিত। তাহাদের পুরোহিত ছেলেটির নাম রাখিয়াছিলেন—চানক্য চরণ, সকলে তাকে চেন্‌কা বলিয়া ডাকিত। কলিকা হাতে করিয়া নিতাই হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল—"বল্লিস কি গোকুল, চ্যান্‌কা যদি আমার অপর সব চাষার ছেলেদের মত হ'ত তবে আমার এত দগ্‌দগানি থাকৃতনা—সে যে গুণের সাগর।" গোকুল বুঝিল তাহাদের দুই জনার দুই খানা প্রাণেরই দুই পিট আটায় ভর্‌া, বাতাস উঠিয়াছে ঠেকাঠেকি হইলেই বিষম জমাট বাঁধিয়া যাইবে—তাহারও প্রাণের ভিতরকার বৃত্তিগুলা সজাগ হইয়া উঠিল। সে বলিল, "তার মঙ্গলই ত তোমার আগে, দেখো সে বড়লোক হ'বে। এত ছেলের এখানকার ইস্কুলে পড়াচ্ছে সে কিনা ঝোক ধরলে, সহরে পড়বে। যাই বল, প্রাণটা তা'র খুব ডাগর।"

"আশীর্ব্বাদ কর তাই হ'ক তবে কথাটা কি জানিস্ গোকুল, সে বুঝেছে ব্যাটাত খুব ফেরেই পড়েছে, ও আমার জন্য সদাই ভগবানকেও ডাকবে, সবই করবে, তা আমি ওর মুখ পানে চাই না চাই, এই না? কলকেটা ধপ করে নামিয়ে রেখে বলতে লাগিল—তা দেখিস তুই আমি সবই করব, কিন্তু তা'র মুখপানে আর চাইব না। আমি বলি যে 'হে ভগবান, চানক্য যে এই নেমকহারামি করচে এর পাপ যেন তা'কে না স্পর্শায়। সবই আমি বুঝি, সে কি তার পড়াশুনা করবে না, না, নিজের কাজ করবে না, কেবল আমার চিন্তে নিয়ে থাকবে তা নয়, তবে দেখি তার কাছে অপর সকলও যেমন, আমিও তেমনি। না গোকুল ও রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে কিছুই নয়। আমি দেখেছি আমার সঙ্গে ব্যবহারে কেমন যেন তার একটা ফাঁক থাকে, দেখানো ভাব প্রকাশ পায়, কিন্তু সামান্য আত্মীয়ের কাছেও খুব স্বাভাবিক ভাব। তুই হাসছিস গোকুল মনে করছিস্ আচ্ছা হয়েছে।" গোকুল বাধাদিয়া বলিল, "না, নিতু, সত্যি না, আমি ভাবচি জ্যালামোর ধন রে, তুই ও আস্বাদ জানিস।" "গোকুল আমি তোমার ও কথা শুনব, কয়দিনই কেমন কেমন দেখচি, কিন্তু বোঝ, তুই হয়ত বলবি, অনেকটা বয়সের ফারাক, কিন্তু আমি যে এই এখন তোর সঙ্গে কথা কচ্চি, কিন্তু তার কথা যখন একমনে ভাবি, তাকে নিয়ে মনে মনে কত রকমের গড়নগড়ি তেমন স্ফূর্ত্তি করে বয়সে খুব ছোকরাই বা কয়জন পারে। স্ফূর্ত্তিইত বয়সের মাপ।"

"মনে মনে গড়নগড়ি"—বাহবা নিতু।

"কিন্তু—না, গোকুল, আমার সব গেল, আমি মানুষ, আমারও ত কাজ আছে; সে যদি ধরা দিত, তবে এই আমা হ'তেই কত অক্ষমের কত কাজ হ'ত—এটাও ত তার ভাবা উচিত, আমি যে একেবারে মাটী হই সেটা ত তার করা উচিত নয়? আমি চাই কি? গোকুল বাধাদিয়া বলিল, "সে খুব কম, আমি জানি, কেবল দিতে চাই কিন্তু সে দেওয়াও যে নেওয়া তাই!"

"গোকুল, মনে হ'চ্ছে তোর কাছে ডাকছেড়ে কাঁদি।"

"কিন্তু সেও ত তোমাকে স্নেহ করে, একদিন যে বল্‌ছিল—"

"কি বলছিল ? আজ বড় রোদ গোকুল—কি, কি বলছিল ?"

"বলছিল ও আছে বলেই আমার কিছু হবে।"

"ও বল্লে ? আচ্ছা আচ্ছা তোর কি বল দেখি ব্যাপার ?"

"সে আর একদিন শুনো এখন চল। গোকুলের হঠাৎ মনে পড়ে গেল পরাণের হাত কাটিয়া গিয়াছে তুল ধরিতে পারিবে না, যে গোকুলকে তা'র জিনিষ কটাও বেচে দিতে বলেছিল।"

নিতাই উঠিয়াই অনেকটা আগাইয়া গেছে। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল পরাণের তরকারি বেচিয়া দিবার গোকুলের আর কোন তাড়াই নাই, ঘোর অন্যমনস্কভাবে হাঁটিতেছে। একটু দাঁড়াইয়া গোকুলকে কাছে লইয়া অপ্রতিভভাবে বলিল, "গোকুল কি বল, আমি না শুনে কিছুতেই ছাড়বো না। শোকের ধাক্কা খাওয়ার পর ত সামলে এসেছিলি।" গোকুল কিছু বলিল না। তখন নিতাই তা'র দিকে সম্মুখ হইয়া বোঝা মাথাতেই খপকরে এক হাতে তার একটা হাত ধরিয়া ফেলিয়া নিতান্ত আপনার ভাবে বলিল, "গোকুল বলবি নে ? দেখ বলবার এমন লোক আর পাবি না। বল—বল !" গোকুল বলিল "কি জানি ভাই, পলাশ ডাঙ্গার এক ব্রাহ্মণ কন্যার নাম অশ্বিনী। সেই নামই হয়েছে আমার কাল।" "দেখতে কেমন ?" "বেশ সুশ্রী। কুশ্রী হলে কি নাম ভাল লাগত ? আমার ত ভাই নাম পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সম্পর্ক, নামের পর ত আর তাঁকে দেখতেই পাই না, সবটাই সেই হতভাগীর চিন্তায় ভরে যায়। নিতাই যাই হস্ এ তুই বুঝবি না। তোর হচ্ছে বিয়ে হবার আগের ভালবাসার মত আর এ আমার অন্য রকম কি না ! দূর দূর বড় মুস্কিল, কিন্তু ভারি মজাও চল ভাই বেলা হয়ে গেল" নিতাই কোন ভূমিকা না করিয়াই বলিল—দেখ গোকুল এতে কেবল শত্রু হাসবে, বলবে যত বাড়াবাড়ি তত ছাড়াছাড়ি। সে বড় ছড়পাতলা লোক হে, সেই কি একটা গানে আছে না,—"তখন তা'র মন যোগাও," আর তাই বা কি করে আমার ত কখনও সে মন যোগাবে না। সে যে পরের কথায় আমায় এত কাঁদালে এই বড় দুঃখ।"

"পর আর কি করে, যখন তাদের জন্য তোমায় দুঃখ দিলে তখন তারাই তা'র আপনার।"

"তা' ত বটেই," গোকুল বাধা দিয়া বলিল "তুমি বড় অভিমানী, তুমি যা' করে, "তা—ত বটেই বল্লে," তা'তে যেন এ ধারটা কেবলই ফাঁকা আর তাদের দিকটা খুব জমাট, এমনি ; কিন্তু তা'ত নাও হ'তে পারে।" নিতাই কি ভাবিতেছিল, কিছু পরে বলিল "দেখ গোকুল পরকে আপন করতে যাওয়ার দুঃখ বড়। নিজের কোঁচলে ঢিল থাকলে কাঁধে এসে পাখী বসে না জানি, কিন্তু সত্যি যে ভাই এ আমার মোওয়া। এমন সময় একজন হাটুরে গলি হইতে বা'র হইয়া ইহাদের দেখে ফিচ্ করে হেসে ফেল্লে। ইহারা দুইজনেই বুঝিল হাট ভেঙ্গে গেছে। নূতনটি বলিল, "যাও, আমার কিছু ছিল না, তাই ফিরছি এখনও হাট পাবে।' গোকুল ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— "পরাণ কি করছে ? সে বামুন পাড়ায় কমে সমে ঠাউকো দিয়ে মুড়ি খাচ্ছে। নিতাইয়ের সঙ্গে গোকুল আর আসিত না, সে বড় বকে।

কার্ত্তিক মাসের পীতবর্ণের রৌদ্রটুকু বিরলপত্র অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া হাটতলায় অপূর্ব্ব কারপেট বুনিয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর পলাশডাঙ্গার ছোট হাটটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। গোকুল এক খরিদ্দারের সঙ্গে কাজিয়া করিতেছে, হটাৎ দেখিতে পাইল ময়ূরকণ্ঠী একখানি রেপার গায়ে দিয়া মুখুয্যেবাড়ীর সেই ছেলেটি কাছেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। খদ্দেরটি বলিতেছিল—"নে, তোর পলি-মাটির বেগুন, সার দিতে হয় না, কিছু না, পয়সায় তিনটে দিবি না ? কে নেবে তোর দেড়টী করে। সন্ধ্যে বেলায় নিখরচায় পাথুরে গাই দুইতে যাই. যে বলছিস, সে ব্রহ্মতেজ আছে বলেইত। 'দে বেটা একটা ফাও দে। এ তিনটের ত একটা পয়সা দিয়েছি।" গোকুল তাড়াতাড়ি তাকে একটা বেগুন দিয়া সরাইয়া দিল। ছেলেটি ইহার মধ্যে পাশের চাষীর নিকট বেগুন কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। গোকুল রাগিয়া আগুন হইয়া বলিতে লাগিল, সর্ব্বনেশে বামুণের দরুণই ত তা'র অপর খদ্দের সব ফিরিয়া গেল,

আসচে হাটে দেখব তখন কেমন বাজরার সামনে দাঁড়িয়ে কাজিয়া করে!

গোকুল কেবল বেগুণ বেচে। ছেলেটি বেগুন কেনা সমাপ্ত করিয়া যখন আর এক জায়গায় মুলা কিনিতে গেল, গোকুল ত'ড়াক ক'রে উঠে গিয়ে তাকে বল্‌লে "তোমার সেরটা একবার দাওত, আমারটা কোথায় ফেলেছি দেখতে পাচ্ছি না। দেখ সাপের চেলে খলুই তেজী বেশী।' ছেলে বামুন দেখে যেন ঠকিও না, নরম দেখে মুলো দিও।" "বামুন ঠাকুর তা'ত জানি না। গোকুল চিন্‌লে কি করে?" গোকুল কেমন এক রকম মুখে আপন জায়গায় আসিয়া বসিয়া পড়িল। হাট ভাঙ্গিয়া গেলে গোকুল রাস্তায় ভাবিতে আরম্ভ করিল—যারা দর করে, তাদের ঠকাতে দোষ নাই কিন্তু ছোট ছেলে ইত্যাদিকে ঠকানর চেয়ে অধর্ম্ম আর নাই, তা'বাদে, সরলচিত্ত ছেলেদের একটু বেশী দিলে তাদের খুব আনন্দ হয় এবং সে আনন্দ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছায় ইত্যাদি

হাটে আসা গোকুলের আর কামাই নাই এখন গোকুল খরিদ্দারের পথপানে বড় চাহিয়া থাকে। হাটের লোকজন বায়স্কোপের ছবির মত মনে হয়। ময়ূরকণ্ঠী রেপারখানি হাটে আসিলে গোকুলের সব গোলমাল হইয়া যায়। গোকুলের আর এক বিপদ ঘটিয়াছে, ব্রহ্মাণ সন্তানটিকে প্রণাম করিতে যে হাত উঠে না আর, কি করে তবে সে ডা'কে! কয়েক হাটই খদ্দের এল গেল, কিন্তু ডাকা হ'ল না। খদ্দেরটি হাটে আসিলেই গোকুল মুখে ভয়ানক একটা শব্দ করিয়া উঠিত, খদ্দের চাহিত বটে, কিন্তু হায়রে! চোখের ডাক বুঝিবার তখনও তা'র সামর্থ্য হয় নাই।

নবান্নর হাট, তরকারি পত্র অগ্নিমূল্য, তাহাও সকলে পাইতেছে না। গোকুল প্রথমেই কিছু মুলো, লালআলু, শাক, আদা, কলা কিনিয়া রাখিল। তার বেগুনগুলি বিক্রী হইয়া গিয়াছে, গুটি চারেক আছে। যখন দেখা গেল খদ্দেরটি একজন প্রতিবেশীর সাহায্যে আজ তরকারি কিনিতেছে তখন গোকুল তার বেগুনগুলি বিক্রী করে ফেলায় মাথায় ঘা মারিল, তার শূন্য বাজরার দিকে কে নজর দিবে! আজ আর ডাকিতে মুস্কিল নাই—কিন্তু কি লইতেই বা সে ডাকিবে! হাট ভাঙ্গিয়া গেলে, যাত্রার গানের জন্য বাঁধা আসর, দল না আসিলে যেমন এলকুতে আসে—লালআলু, আদাটুকু তেমনি করিতে লাগিল। নিতাই দেখিল গোকুলের বাজরার সামনে একটা বাউরীর মেয়ে আঁচল পাতিয়াছে এবং গোকুল তা'র আঁচলে তাড়াতাড়ি করে বেগুন মুলো ফেলিয়া দিতেছে। নিতাই শুধাইল "ওকি গোকুল?" "আর বলো না, পাপের ভোগ, একজন কিন্‌তে দিয়েছিল, এলো না।" নিতাই মুচকি হেসে ফেল্‌লে।

একদিন গোকুল কুমড়ার ফালি খুব মোটা মোটা করিয়া দিয়া বাজরায় সাজাইয়া রাখিয়াছে—দুপয়সার ফালি এক পয়সায় দেখিয়া তাহার খদ্দেরটি কিনিতে আসিল,—"এস বাবা এস, ক'ফালি দেব, গেরস্তঘর, কিছু বেশী করে নাও, চার ফালি দিই, কেমন?" খদ্দের চারিটি পয়সা দিলে গোকুল বলিল, "বাবা এক ফালি ছোট আছে ওটা আধপয়সা, আজ আধলা নাই, ফিরে হাটে আসিয়া লইয়ো, নিয়ে যেয়ো যেন, কেমন বাবা!" খদ্দের ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলে, গোকুল একজন তামাক খাইতেছিল, খপ্‌ করে তার হুঁকা হইতে কলিকা তুলিয়া লইয়া আর একজনকে খাইতে দিল—এবং নিজে আর একজনার কোঁচলে মুড়ী খাইতে আরম্ভ ক'রল। তরকারী বিক্রয় হওয়াতে সে তখন মুড়ী খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল গোকুলের এই অনর্থক উৎপাত কেহ লক্ষ করে নাই, একজন করিয়াছিল সে গোকুলের মাথায় একটা চড় মারিল।

পরের হাটে আধপয়সার মহাজনটি তাগাদায় আসিল—কিন্তু গোকুলের সেদিন আধলা নাই—তার পর হাটে মহাজন তাগাদায় আসিল না দেখিয়া গোকুল নিজেই ডাকিল—কই গো বাবা, আধলা নিলে না? কিন্তু যখন আধলা দিবার দরকার হইল তখন আর কিছুতেই গোকুল আধলা খুজিয়া পাইল না, অপরাধের হাসি হাসিয়া গোকুল বলিল, লক্ষ্মীবাবা কাল লইয়া যাইয়ো। এমনি করিয়া গোকুলের ভুলে অনেক হাটই আধলা দেওয়া হইল না। তারপর সব অন্ধকার—মহাজন আর হাটে আসে না। সে সন্ধানই লয়

কি করিয়া, সে যে মহাজনের নামটিও জানে না। বাড়ীর পাশ দিয়া হাঁটাহাঁটি করিতে করিতে একদিন শুনিল, তার মহাজন বাড়ী চলিয়া গিয়াছে আম খাইতে আবার আসিবে।

*   *   *   *

আষাঢ় মাস, ভয়ানক বাদল, কেহ বাটীর বাহির হইতে পারিতেছে না গোকুল গোটাকয়েক ডাঁটা লইয়া বাহির হইল বাটীর বাহির হইতেই ভয়ানক শীত করিতে লাগিল—জীর্ণ শীর্ণ গোকুলের তবু যাওয়া চাই। খাবারের সময় অতীত হইলে দাদার খোঁজ হইল, গোকুল কোথায় গেল। কেহ কেহ বলিল, সকালে বাজরা লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। দাদা ঊর্দ্ধশ্বাসে হাটের পথে ছুটিল। মাঝপথে এক বটবৃক্ষ তলে দেখিল, গোকুল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার হাতটি মুঠা করা, মুঠার ভিতর একটি আধলা।

শ্রীএককড়ি দে।

জ্ঞানদাস।

নবীন নীরদে গেছে দিগন্তর ভরি,
ঘনায়ে আষাঢ়-সন্ধ্যা নামে অবনীতে,
থেকে থেকে চকে যায় বিদ্যুৎ-প্রহরী,
ঝম্ ঝম্ ঝরে জল, ঝঞ্ঝা চারিভিতে।

জনহীন পথহীন শ্যামলতারাশি—
মসীমাখা চিত্র আঁকা তরুছায়া তলে,
কণ্টক-আকীর্ণ পথে সিক্ত মুখশশী,
অভিসার অভিলাষী ছিন্ন পদে চলে।

সঙ্কেত মুরলী আজ থেমে গেছে, হায়,
নিশার আঁধার চিরি' নাহি কাঁপে তান,
মত্ত দাদুরী-বোল ঝঙ্কারিয়া যায়,
শঙ্কিত-নয়ন রাধা অবসন্ন প্রাণ।

এ দুর্য্যোগে জ্ঞানদাস তুমিই একাকী
ভুলায়েছ পথক্লেশ রাধা পার্শ্বে থাকি'।

শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার।

বিবেক ও ধর্ম্ম।

(Dryden)

সূর্য্যালোকপরিপুষ্ট অন্তরীক্ষে চন্দ্র তারকায়
ক্ষীণ জ্যোতিঃ পথভ্রান্ত পথিকের হয় না সহায়,
ধরণীর বনপথে যাত্রা তারা করে না নির্দ্দেশ—
আলোকিত করে তারা স্বর্গপথ, উর্দ্ধে নভোদেশ।

জীবাত্মার অন্তস্তলে বিবেকের ক্ষীণ জ্যোতিঃ লেখা
ঐহিক জগতে দূর করেনাক সংশয়ের রেখা
যেই দেশে উন্মূলিত নিখিলের সকল সংশয়
ইঙ্গিতে কেবল তাহা সে দেশের দেয় পরিচয়।

বিশ্ব-প্রদ্যোতক রবি উদে যবে পূর্ব্ব নভোদেশে
চন্দ্রতারকার দীনজ্যোতিঃ কোথা মিলায় নিমেষে।
ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভানু যবে পুণ্য দীপ্তিপুঞ্জে ভায়
বিবেকের ক্ষীণদ্যুতিঃ ম্লান হয়ে কোথায় লুকায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

বঙ্গসাহিত্যে আভিজাত্য।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের গতি ও প্রবাহ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কোন জাতি বা সমাজের প্রকৃত ইতিহাস অবগত হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় তাহার সমসাময়িক সাহিত্য অধ্যয়ন করা। কিন্তু সাহিত্যে সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার কাহিনী ধ্বনিত হইলেও, তাহা এক অর্থে জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষের জন্য নহে। সাহিত্যের লেখক ও পাঠক মনোজগতের একটু উচ্চস্তরে বাস করেন—কর্ম্ম-জগতের জনসাধারণ সে স্তরে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-রস অনুভব করে না করিতেও পারে না। অতএব সাহিত্য চিরকালই শিক্ষিত শ্রেণী-বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিন্তু এই মুষ্টিমেয় কতিপয় চিন্তাশীল ও কল্পনাকুশল ব্যক্তি যে সমস্ত ভাব অনুভব ও আলোচনা করেন, তাহাই ক্রমে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া যায়। এইরূপে যুগে যুগে সাহিত্য সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে।

ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে পাশ্চাত্য জগতে এক নব-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। এ যুগ সাম্য, মৈত্রী, বিশ্ব ও ভ্রাতৃত্বের জয়পতাকা হস্তে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। শতশতাব্দীর অত্যাচার ও উৎপীড়নে মানবআত্মা সঙ্কুচিত প্রায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আত্মার শাশ্বত আলোক নিভিবার নহে—কবি, যিনি ঋষি তিনি আসিয়া ফুৎকার দিয়া তাহা দ্বিগুণতরবেগে জ্বালাইয়া দিলেন। রুসোর বিশালপ্রাণ দারিদ্রের ক্রন্দনে কাঁদিয়া উঠিল, স্বার্থোদ্ধত অবিচারের নির্ম্মম নিষ্পীড়নে নিষ্পেষিত আত্মার উদ্ধারের জন্য তাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইলেন। নূতন আকারে বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতারূপ পুরাতন সত্য তাঁহারা উদ্‌ঘোষণা করিলেন। এই যুগ-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের শিষ্যমণ্ডলী ও লক্, হিউম্, গিবন্ প্রভৃতি উদারচেতা লেখকগণ সাহিত্যে সর্ব্বসাধারণের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এই সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজ রাজনীতিতে গণতন্ত্রপ্রথা অবলম্বন করিয়াছে। ধন ও জাতি এতকাল যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিয়া সাধারণকে শাসন করিয়া আসিতেছিল তাহার অবসানের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। মানুষ তাহার বাহিরের আবরণের জন্য কবির নিকট প্রিয় নহে, সে যে তাহার নিজের মনুষ্যত্বের উজ্জ্বল আলোকে ভাস্বর, নবযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্য তাহাই প্রচার করিতে লাগিল।

এতকাল উচ্চবংশের নরনারীরাই কাব্য নাটক ও উপ-ন্যাসের নায়ক নায়িকার পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সাহিত্যে সাধারণের ভাব ও জীবন চিত্রিত করা দূষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সাহিত্য সমাজের এক অংশকেই চিত্রিত করিত। ইহাতে পদে পদে মনুষ্য আত্মাকে অপমান করা হইত। নবযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যে সাধারণকে সাহিত্যের বেষ্টনীর মধ্যে আনা হইল—এ যুগের কবি বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য শিকারী Simon Lee ও পার্ব্বত্য বালিকা Lucyর জীবনের মধ্যেও উচ্চশ্রেণীর কবিতার উপকরণ পাইলেন। সাহিত্যের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশে পাশ্চাত্য জীবন পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

আমরা কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই যুগবাণীর আহ্বানে ভাল করিয়া সাড়া দিই নাই। অথচ আমাদের পক্ষে সাড়া দেওয়া শুধু উন্নত ও মহৎ হইবার জন্য দরকার নহে, কিন্তু জীবন রক্ষার জন্যই প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত না বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রাণ একতানে বাজিয়া উঠিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের উন্নতির আশা, কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইবে। এক প্রাণতা আনিতে হইলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি বিরাট সহানুভূতি সৃজন করিতে হইবে। এ মহৎ উদ্দেশ্য বক্তৃতার দ্বারা বা স্বার্থের সম্মিলনের দ্বারা হওয়া সুকঠিন। সাহিত্য-কেই এ কার্য্য করিতে হইবে—সকল সমাজেই সাহিত্য একার্য্য করিয়া আসিতেছে। কবি এইখানেই prophet।

প্রাচীন হিন্দুসভ্যতা কুলীনতন্ত্র ছিল, কিন্তু সে সভ্যতাকে পাশ্চাত্য aristocracyর দোষগুলি স্পর্শ করিতে পারে নাই, কেন না প্রাচীন হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানকে, ধন ও জাতির অনেক উর্দ্ধে স্থান দিতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণের জীবনী ও কথা খুব কমই পাওয়া যায়। হিন্দু-সভ্যতা সাধারণকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিলেও বড় বেশী শ্রদ্ধার চক্ষেও দেখিতেন না। সংস্কৃতের নায়কনায়িকা দেববংশসম্ভূত বা রাজকুলোৎপন্ন হওয়া চাইই। সে সাহিত্যে সাধারণকে যতটা না হইলে অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তওটাই মাত্র আনা হইয়াছে। ভাসের নাটকগুলিতে ও 'মৃচ্ছকটিকে' জনসাধারণকে শুধু তাহাদের নিজেরই জন্য দু'একবার প্রেক্ষাগৃহের দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে আনা হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই—তাহাদের সহিত অন্তরের বন্ধন স্থাপনের কোন প্রয়াস ইহাতে নাই। সংস্কৃত ভাষাই ছিল উচ্চশ্রেণীর ভাষা—জনসাধারণ প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। কিন্তু যখন প্রাকৃত ভাষায় সাহিত্য রচিত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সাধারণের ভাব ও জীবন তাহাতে বেশ চিত্রিত হইতে লাগিল। পালিসাহিত্যে সাধারণকে বেশ একটি মহিমান্বিত অবস্থায় অঙ্কিত করা হইয়াছে। বহু প্রাকৃতের সম্মিলনে উৎপন্ন বঙ্গভাষাতেও গণতন্ত্রের প্রভাব ইংরাজশাসনের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত দেখা যায়।

"ধর্ম্মমঙ্গলে" বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবসম্ভূত একটা উচ্চ ও নীচের মিলন লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস দেশের জন-সাধারণের সহিত সহানুভূতি বোধ করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের উচ্চশ্রেণীর আধ্যাত্মিক কবিতার মধ্যেও সুন্দর জাতীয় জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহারা ভগবান বলিয়া নিশ্চয় জানিলেও, মাধুর্য্যভাব দ্বারা তাঁহাকে যথার্থ গোপকুমার রূপে দেখাইয়াছেন। গোপগণের গোচারণ, ব্রজাঙ্গনার জল আনয়ন, তাহাদের দুগ্ধদধি বিক্রয় প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে সমাজের গতি তখন কোন দিকে ছিল। বিদ্যাপতি রাজসভায় কবি হইয়াও সাধারণের সহিত নিজের জীবন মিশাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালের কবি ভারতচন্দ্রও রাজ-সভার ঐশ্বর্য্যে ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া জনসাধাণকে দূরে সরাইয়া রাখেন নাই। তার পর শ্রীচৈতন্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে সাম্য ও মৈত্রীর নীতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে। 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ" ইহাই হইতেছে এ যুগের সাহিত্যের মূলমন্ত্র। সাহিত্য যে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে—তাহা এই যুগের প্রেমিক লেখকগণ প্রচার করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত-সেবক শ্রীগোবিন্দ কর্ম্মকার তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতে (কড়চা) শ্রীপ্রভুর উদার বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন। তারপর কত নীচ ও অস্পৃশ্যজাতি ভক্তিগলিত প্রাণে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেবের চরণতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা-দিগকে প্রভু কেমন করিয়া আলিঙ্গন দিয়া বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন—তাহারই কাহিনী কত ভাগ্যবান কবি নিজ নিজ কাব্যে বর্ণনা করিয়া বঙ্গদেশকে বাঙ্গালী জাতিকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী সামান্য কালকেতু ব্যাধকে নায়ক করিয়া এক বিরাট জাতীয় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে কাব্যের মধ্যে ব্যাধরমণীর বারমাস্যাবর্ণন, তাহার সপত্নীর বিবাদ, তাহার সুখদুঃখের কথা এমন সরল ও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে আজ আমরা ইংরাজী শিক্ষার রুচি-বিকারগ্রস্ত হইয়াও তাহা সাদরে পাঠ করিতেছি। 'কবিকঙ্কণ' তদানীন্তন বঙ্গসমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও এমন উদার সহানুভূতি, বিরাট হৃদয় কেমন করিয়া লাভ করিয়া-ছিলেন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনিই বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যের প্রথম ও শেষ কবি যিনি দেখাইয়াছেন যে, যে আশা আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও নৈরাশ্য ধনীর হৃদয়ে স্পন্দিত হইতে থাকে, ঠিক সেই সব ভাবই নীচ ব্যাধ জাতির মধ্যে ক্রিয়া করে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'ও মালিনী, কোটাল ও গ্রাম্যবধূদিগের চিত্রে সাধারণের কথা পাওয়া। খাটি বাঙ্গলার শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "পৌষপার্ব্বণ," "ননদ-ভাজ," "পাঁঠা" প্রভৃতি কবিতায় দেশের সামাজিক অবস্থা ও রুচি অঙ্কিত হইয়াছে।

মুসলমানগণের ধর্ম্মের মধ্যে সাম্যের কথাটা খুববেশী জোড় দিয়া বলা হইয়াছে। সে ধর্ম্মের উপাসনায় সাহান্ সাহা বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া দীনদরিদ্রকে পর্য্যন্ত এক স্থানে

বসিতে হয়। তাঁহাদের ব্যক্তিবোধ ও প্রাকৃতভাষার স্বাভাবিক গণতন্ত্রমুখীতা একীভূত হইয়া যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার ফলেই বোধ হয় আমরা ঐ সাহিত্য পাইয়াছি।

কিন্তু ইংরাজীশিক্ষা আসিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অভিজাত্য-মুখী করিয়া তুলিল। যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইংরাজীশিক্ষা পাইতে লাগিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা ও সভ্যতা দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, তাঁহাদের আর দীনা বঙ্গভূমি ও সরলা বঙ্গভাষার প্রতি কোন শ্রদ্ধা রহিল না। ইংরাজীশিক্ষা প্রবর্ত্তনের যুগে অনেক ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক স্বধর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কালক্রমে বিদেশী সভ্যতার মোহমদিরা অল্পে অল্পে কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য আমাদের হৃদয়কে এতই অধিকার করিয়া আছে যে, দেশের জনসাধারণের সহিত কথাবার্ত্তা বলা আমাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ও দেশের দশের মধ্যে অন্তরের বন্ধন সূত্র শ্লথ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে যে একতার বলে ব্রাহ্মণ, প্রতিবেশী শূদ্রকে দাদা, কাকা বলিয়া ডাকিত, তাহা আর রহিল না। অথচ পাশ্চাত্য সাহিত্য আসিয়া আমাদের ভাবরাজিকে অশেষবিধভাবে সমৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে জীবনের গতিকে অন্যমুখে চালিত করিয়াছে। ইংরাজী ভাষার অর্থকরীতা ও ভাবসমৃদ্ধতা, সংস্কৃতকে অনাদৃত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষার বই লেখার ভার ইংরাজী শিক্ষিত গণের উপরই পড়িল। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা প্রয়োজন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের মধ্যে যে স্বদেশ ভক্তি সৃষ্টি করিয়া দিল, তাহারই দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হইতে লাগিল। এ হিসাবে ব্রিটিশ শাসনে বঙ্গভাষার উপকার করিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষিত বাংলা লেখকগণ স্বদেশভক্তি প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু স্বজাতীয়তাকে তখনও তাঁহারা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা জন্মভূমির পূজার বেদীতে জনসাধারণকে আহ্বান করেন নাই। তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে তাঁহাদের সম অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের কথাই বলা হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় যে কয়খানি গ্রন্থ মহাকাব্য নামে চলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে এক খানিতেও জাতীয় মিলনের চিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। মধুসূদন তো কোনদিন দেশের জনসাধারণের জীবন ভাল করিয়া জানিবার পর্য্যন্ত সুযোগ পান নাই। হেমচন্দ্র ও নবীন চন্দ্রের কাব্যগুলিকে আমরা সাদরে জাতীয় মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। হোমার, দান্তে ও মিল্টনের অমর মহাকাব্য যেমন তাঁহাদের যুগের জাতীয় সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস, আমাদের কবিগণের কাব্য তাহা মোটেই নয়।

আমার মনে হয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের Romantic movement উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যিকগণের উপর ভাল করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাই দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ক্ষমতাশালী লেখকেরও উপন্যাসে সমাজের এক অংশের কথা। তাঁহার "চন্দ্রশেখর" "দেবী চৌধুরাণী" "মৃণালিনী" পূর্ব্বশতাব্দীবাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা লইয়া লেখা। "বিষবৃক্ষ" "ইন্দিরা", "কৃষ্ণকান্তের উইল", "রজনী" কায়স্থ জমীদারগণের সংসার কথা। "রজনীর" চিত্রটি সাধারণের কথা আনিতেছিল—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র "রজনীর" জীবনকে কুলীনসম্প্রদায়ের সঙ্গে গাঁথিয়া দিলেন। "রাধারাণীর" সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা।

রমেশচন্দ্র "সংসার" উপন্যাসের প্রথমেই বলিয়াছেন যে বড় ঘরের বড়কথা শুনিতে সকলেই ভালবাসে, অতএব তিনি বড় লোকের কথাই বলিবেন। "মাধবীকঙ্কন", "বঙ্গবিজেতা", "জীবন সন্ধ্যা" ও "জীবন প্রভাত" ক্ষত্রিয়বীরগণের জীবন চিত্রে পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের অনুকরণে যে সমস্ত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দিয়া আর প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন নাই। ৺তারকনাথ গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা" এই যুগে হইয়াও, অনেকটা আভিজাত্যের সম্মোহন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

সাহিত্যের মধ্যে নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব জনসাধারণের উপর বিস্তার করে। এবং নাটকগুলি দেশের সমসাময়িক রুচির অনুযায়ী সাধারণতঃ রচিত হয়। বঙ্গদেশের নাট্য সাহিত্যেরও কৌলিন্য ভাব। তাহাতেও স্বদেশীকতা আছে কিন্তু স্বজাতীয়তা অল্প। "জনা", "প্রফুল্ল", "ম্যাক্‌বেথ",

পাষাণী", "পরপারে", "চন্দ্রগুপ্ত", "নুরজাহান", "ভীষ্ম", প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটকগুলি পুরাণ আভিজাত্য, হিন্দুরাজ্য বা মুসলমান শাসনের কথা লইয়া রচিত। গণকে (Demos) কদাচিৎ ষ্টেজে আনা হয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে "নীলদর্পণের" লেখক, এক নাটক রচনা করিয়াই দেশের পরম উপকার সাধন ও অমর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। আমাদের stageকে Elizabethan Stage এর ন্যায় সর্ব্বশ্রেণীর মিলনক্ষেত্র করিয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু অল্পে অল্পে আলোকের রেখা দেখা দিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার (natural reaction) ফলে, ও বঙ্গসাহিত্যের উপর Romantic movementএর প্রভাবে, সাহিত্যে জন সাধারণের কথা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কবিবর রবীন্দ্রনাথ

"-এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"

এই মহাবাণী গাহিয়া বঙ্গ সাহিত্যে এক নব যুগের আবির্ভাবের সূচনা ঘোষনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় "হাঘরে," "কৃষাণীর ব্যথা" ও শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁহার অধিকাংশ গাথায় সাধারণের প্রকৃত জীবন অঙ্কন করিয়া জাতীয় একতার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন।

গল্প-সাহিত্য বঙ্গদেশে নূতন। কিন্তু এই গল্প-সাহিত্যেও ভালভাবে সাধারণের কথা বলা হইতেছে না। তবে এ অংশে অন্যান্য শাখা অপেক্ষা সাহিত্যে গণতন্ত্র-নীতি বেশী প্রচার হইতেছে। প্রভাতবাবুর গল্পে দেশের সাধারণের কথা দূরে থাকুক, পারিবারিক জীবনের কথা পর্য্যন্ত বিরল। মহিলা লেখিকাগণ মনস্তত্ত্বঘটিত চরিত্র বিশ্লেষণ লইয়া এতদূর ব্যস্ত যে সাধারণের প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর তাঁহাদের নাই। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুখিরাম রুই প্রভৃতির চিত্র সাহিত্যে অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি লেখকগণ অধুনা সাধারণের সহিত শিক্ষিত উচ্চ জাতিগণের মিলন আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই মহৎ চেষ্টা সাহিত্যিকগণের মধ্যে সাধারণ হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্গসাহিত্যে humanity করুণার সঞ্চার করিবার জন্য পতিতাদের জীবনী কাব্যে ও উপন্যাসে স্থান পাইতেছে। আধুনিক সাহিত্যে পতিতাদের লইয়া যতটা সাহিত্য রচিত হইয়াছে, এতটা যদি নীচ পতিত বঙ্গের জাতিগুলিকে লইয়া হইত তবে বঙ্গদেশের অন্য প্রকার অবস্থা দেখা যাইত।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ভদ্র সমাজের কথা ছাড়িয়া দিয়া চাষাভূষা ও দুর্ভিক্ষ ম্যালেরিয়ার কথা আলোচনা করিলে সৌন্দর্য্য মাটি হইবে আর্ট প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু সত্যই কি তাই? ইউরোপের আধুনিক সাহিত্য ত এই জনমণ্ডলীর কথা লইয়াই গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। George Eliotএর Adam Bede, Romola প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর উপন্যাস সাধারণের জীবনকথা লইয়া লিখিত। Dickensএর অধিকাংশ নভেলগুলিতে অতি তুচ্ছ সাধারণের কথা। Hugo, Balzac, Zola এই দরিদ্রগণের কথা গাহিয়াই অমর হইয়া গিয়াছেন। Barnardshaw তাঁহার socialistic novelsএ সামান্য কারিকরদের মধ্য হইতে নায়ক নায়িকা লইয়াছেন। Tolstoy কৃষকদের জীবন লইয়া সুন্দর সুন্দর নাটক ও গল্প রচনা করিয়াছেন। Sands at Seventy, Democracy প্রভৃতি আমেরিকার কাব্যগুলিতে সাধারণকে, গণকে কি শ্রদ্ধার চক্ষেই না দেখা হইতেছে।

সকলেই সাহিত্যে সাধারণকে আনিয়া জাতীয় পুষ্টি সাধন করিতেছেন।

জাতীয় সাহিত্যে সমগ্র জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়া উঠা উচিত। যতকাল তাহা না হইয়া সাহিত্য মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজেরই একচেটিয়া হইয়া থাকিবে, ততদিন তাহা জাতীয় সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না। বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের সমক্ষে ও বাঙ্গালীকে অন্যান্য জাতির মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইলে বঙ্গসাহিত্যের আভিজাত্যমুখীতা ত্যাগ করিতে হইবে।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

মায়ের দান।

রামলাল পথ চলিতে চলিতে কেবলই বলিতেছিল, "মা, এদীনের প্রতি এ অত্যাচার কেন?"

বিদেশে সামান্য বেতনে রামলাল যে চাকুরী করিত, তাহাতে তাহার সংসার কোন মতেই চলিত না। কখন কখন অর্দ্ধ অনশনে তাহার সুবৃহৎ পরিবারকে থাকিতে হইত। পৈতৃক জমিজমা যাহা ছিল, তাহাতে কয়েক বৎসর ফসলাদি না হওয়ায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দেনা হয়, এবং খাজনাদি বাকি পড়ে, এবং এই সকল পরিশোধের জন্য পৈতৃক জমিজমা বিক্রয় করিয়া রামলালকে বিদেশে সামান্য বেতনে চাকুরী করিতে হয়। ভাল চাকুরী করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি রামলালের ছিল না। দারুণ দুর্ভিক্ষ ও দুর্ম্মূল্যের দিনে রামলালের সংসার অতি কষ্টে চলিত,—পরিবারস্থ লোক এক বেলা খাইতে পাইত, কখন কখন তাহাও পাইত না। অভাব বশতঃ রামলালের স্ত্রীর গহনাগুলি সমস্তই আবদ্ধ ছিল, এবং তাহার পর ঘটিবাটি পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। স্বামীর সংসারের অভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, রামলালের স্ত্রী এই সংসারের জন্য তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়াও যেন সন্তুষ্ট নহে—তাহার বরং দুঃখ এই যে তাহার এমন কিছুই নাই, যাহা বিক্রয় বা বন্ধকের জন্য দিয়া সংসারের আর একটু কষ্ট নিবারণ করিয়া, রামলালের চিন্তা আর একটু লাঘব করে। স্বামীকেই এক অনন্ত ঐশ্বর্য্য জ্ঞান করিয়া রামলালের সংসারের জন্য যে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছে।

রামলালের মনে একটা চিন্তা কখন কখন উদিত হইত যে অদৃষ্ট তাহার প্রতি অন্যায় করিতেছিল, এবং এই অন্যায়ের কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু একদিন না একদিন যে এই অন্যায়ের পরিবর্ত্তে ন্যায়, অবিচারের পরিবর্ত্তে বিচার ঘটিবে, এ বিশ্বাসও তাহার ছিল, কিন্তু কখন বা কি প্রকারে, তাহা সে না বুঝিয়াও বুঝিত।

ধনীর পক্ষে পূজা যেরূপ সুখের, গরীবের পক্ষে সেইরূপ দুঃখের। অন্নবস্ত্রহীন পরিবারের নিকট কোন মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, কি বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবে, এই চিন্তা যন্ত্রণায় রামলালের বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। পূজার কয়দি[illegible] পরিবারস্থ লোককে দুই বেলা খাইতে দিতে পারে, এ[illegible] সম্বল করিয়া ত সে বাড়ী আসিতে পারিতেছে না। [illegible] যে নিজেও অর্থ, বস্ত্র অন্নহীন।

ধনীর প্রাণহীন সুখ অপেক্ষা, দীনের, সত্য আন্তরি[illegible] দুঃখ অধিক গভীর। ধনীর উত্তপ্ত সুখে সে জগদীশ[illegible] কহে না, "তোমায় এত কৃপা বরিষণ কেন?" কিন্তু দীনে[illegible] সরস, শীতল দুঃখে সে জগন্মাতাকে স্মরণ করিয়া ব[illegible] "মা, এ দীনের প্রতি আবার বিমুখ কেন?" রামলাল আ[illegible] প্রাণ উন্মুক্ত করিয়া জগজ্জননীকে ডাকিয়া কহিল, "মা অনেক সহ্য করিয়াছি, আর কত সহ্য করিব!"

প্রায় ৭।৮ মাস রামলাল বাড়ী আসে নাই। পূ[illegible] একেবারেই আসিয়া পড়িয়াছে। রামলাল স্থির করিয়াছে ষষ্ঠীর দিন রওয়ানা হইয়া সপ্তমীর দিন বাড়ী পৌঁছিবে বাড়ীতে তাহাকে পদব্রজেই আসিতে হয়। কর্ম্মস্থল হইতে বাড়ী এক দিবসের পথ।

কোন বাধা বশতঃ ষষ্ঠীর দিন রামলাল বাহির হইতে পারিল না। সপ্তমীর দিন দ্বিপ্রহরে বাহির হইবে স্থি[illegible] করিল।

দ্বিপ্রহর আসিল, রামলাল যাত্রা করিবে, এমন সময় ডাকওয়ালা তাহাকে একখানি চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। রামলাল চিঠিখানি খুলিল। খবর—রামলালের একটি কন্যা হইয়াছে, কন্যা ও প্রসূতি ভাল আছে।

রামলালের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল, তাহার বক্ষের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল। রামলালের পক্ষে মৃত্যুও কমনীয়, কিন্তু কন্যা সন্তান নহে। এতদিন ধরিয়া যে দারুণ দুঃখ বহন করিয়া আসিতেছিল, যে কষ্ট এতদিন ধরিয়া ক্রমেই বাড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও কি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

তাহার কি এইরূপ চরমে লয় পাইতে হইবে? এবং ইহাই যে চরম, তাহাই বা কে বলিল? বিধাতা কি তাহাকে এত দুঃখ কষ্ট দিয়াও সন্তুষ্ট নহে? পূজা সমাগত—জগজ্জননীর আগমন, জগজ্জননী কি তাহার জন্য এই দান আনয়ন করিলেন?

রামলাল অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ চিন্তা করিল, এবং তাহার সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় একটি কন্যার জন্ম যে কি ভীষণ দুঃখের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিতে চলিল, রামলাল তাহাই স্মরণ করিয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করিল।

সপ্তমীর সন্ধ্যা। রামলাল সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখান হইতে বাড়ী এখনও বিস্তর পথ। এই গ্রামে মায়ের আগমন ও তজ্জন্য ধুমধাম হয়। সন্ধ্যার সময় যখন শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্যধ্বনি রামলালের কর্ণে প্রবেশ করিল, রামলাল আর স্থির থাকিতে পারিল না। রামলাল দেখিল, পূজার বাড়ীতে মণ্ডপের সম্মুখে, আরতি-দর্শনাভিলাষী সমবেত জনতার মধ্যে সেও একজন।

নানা শোভায় শোভিত, নানা গন্ধে সুগন্ধ, আলোক তরঙ্গে তরঙ্গিত, মণ্ডপে ভগবতীর আরতি হইতেছে। মণ্ডপের দাওয়া হইতে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতিতে দিগ্‌দিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। অন্য দিকে ঢাক, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যরাজী যেন গগন বিকম্পিত করিতেছে। আরতির এই বিচিত্র শোভা পরিদর্শনরত নরনারী জগন্মাতা ভগবতীর দিকে করজোড়ে, স্তিমিত নেত্রে দণ্ডায়মান। রামলালও করজোড়ে মায়ের চরণ যুগলে নয়ন স্থাপন পূর্ব্বক সেই বিপুল জনতা মধ্যে দণ্ডায়মান।

আরতির বিপুল সমারোহ যেন রামলালকে অভিভূত করিল সেই ধূপধুনা গন্ধরাজি, সেই আলোক তরঙ্গ, সেই বাদ্যধ্বনি, সেই বিপুল জনতা যেন এক যড়যন্ত্রে পরিণত হইয়া তাহার সম্মুখ হইতে এক যবনিকা উত্তোলন করিয়া লইল। রামলালের মনে হইল, চৈতন্যময়ী জগজ্জননী ভগবতী আজ ভক্তের আহ্বানে আসিয়া, সমস্তই দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। রামলালের মুখ হইতে আপনা হইতেই অস্পষ্ট সুরে বাহির হইল, "মা, তুই করুণাময়ী, তবে, দীন দুঃখ কষ্ট জর্জ্জরিত অভাগার প্রতি এ অত্যাচার কেন? দুবেলা দুই মুষ্টি অন্নও ত পরিবারস্থ লোককে দিতে পারি না, তার উপর গরীবের ঘরে কন্যা সন্তান কেন? মা, তোর দয়া নাই। যারা আদরের ধন, প্রাণের প্রিয়, তারা হয়েছে চোখের বিষ—তাদের চিন্তায় ভয় হয়, তাদের দুর্দ্দশা ভেবে গরীব জর্জ্জরিত—মা, তুইই কষ্টে ফেলে এমনি করেছিস। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অর্থহীন, দেনার ভয়ে গরীব যাচ্ছে, তার উপর এ উৎপাত কেন মা? যদি দিলি, তোর দান তোরই থাক, কেবল নে মা আমায়, বাঁচিয়ে রেখে আর কষ্ট দিসনে।"

আরতি শেষ হইল। জনতা ভাঙ্গিতে লাগিল। রামলাল পুনরায় পথে।

পশ্চাৎ হইতে কে একজন রামলালের স্কন্ধ স্পর্শ করিল, রামলাল ফিরিয়া দেখিল, পরিণতবয়স্ক, ত্যাগির-বেশে একটি লোক। রামলালকে সে বলিল, "ভাই!" রাম বলিল, "কে তুমি আবার? কি বলছ?"

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল, "তুমি আরতির সময় যা বলেছ, মা সবই শুনেছেন। আমার যা কিছু আছে—অবশ্য মায়ের ইচ্ছায় কিছু আছে—সবই তোমার মেয়ের হবে, চল। আমি তার ধর্ম্ম পিতা, তোমার সংসারের যাবতীয় ভার আমায় জানবে। চল—"

রামলাল বাধা দিয়া বিরক্তি সহকারেই বলিল, "কি জ্বালা পাগলা না কি?"

সে ব্যক্তি এ কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "না পাগল নয়, শোন। আরতির সময় আমি তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তুমি আপন মনে যা বলছিলে, সবই আমার কানে গিয়েছিল। ভাই, আমারও সতী, সাধ্বী, সুন্দরী স্ত্রী ছিল, আমারও একটি সোনার সংসার ছিল। কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার একটি কন্যা হয়। আমার সেই পতিভক্তি পরায়ণা স্ত্রী, আমার দুর্ব্যবহার ও চরিত্রহীনতার জন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে থাকতো। আমার সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হয়ে, কাঙ্গালিনীর মত তাকে পিত্রালয়েই থাকতে হোত। সেখানে তার কষ্টের আর হেলার অবধি ছিল না। যাকে

স্বামী আদর করে না, তাকে কে আদর করে? এ অবস্থার মধ্যেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়।

"আমি তখন উশৃঙ্খলতার স্রোতে জ্ঞানহারা হয়ে ভাসছিলাম। হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল—তাতে যেন আমার চৈতন্য হল। আহা, আমার জীবনে সে যেন এক প্রবল দমকা হাওয়া কোথা থেকে ছুটে এসে আমার সমস্ত মতি গতি, একেবারে উল্টো দিকে ফিরিয়ে দিল।

* * * *

"আমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিনেই করব বলে মনে করলাম। আমার স্ত্রী তখন পিত্রালয়ে সূতিকা-গৃহে আবদ্ধ। যে কারুর ভালবাসা পায়নি, কারুর আদর পায়নি, যার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কেবল দুঃখের খনি ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা, ভাবলাম, তার কাছে গিয়ে আকুল হয়ে কেঁদে ক্ষমা চাইব, আমার চক্ষের জল দিয়ে তার তাপিত বক্ষ শীতল করব। আমার প্রাণের প্রবল ঝটিকা আর কিছুতেই থামল না।

"বন্ধু, তখন নিশীথ রাত্রি। সমস্ত দিন পথ পর্য্যটনের পর আমি তার পিত্রালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত। প্রাণের উদ্বেগ আর সহ্য করতে পারি নি। প্রাণের আবেগ বাটীস্থ আর কাউকে ডেকে আমার হঠাৎ আগমন ঘোষণা করবার সময় দেয় নি। আমার কেবল এক প্রবল চিন্তা—যে আমার সেই লাঞ্ছিতা, অনাদৃতা, যার সমস্ত বুক ব্যাথায় ভরা, সমস্ত প্রাণ জর্জ্জরিত, সমস্ত আশা ব্যর্থ—যাই আগে তার কাছে গিয়ে আমার অনুতাপ আর চক্ষের জল দিয়ে ক্ষমা চাই।

* * * *

"ক্ষুদ্র সূতিকা-গৃহে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলছিল। ঘরের এক কোনে ধাত্রী নিদ্রামগ্ন, একটু দূরে অপর দিকে একটি শয্যায় দুইটি প্রাণী। আহা আমার প্রিয়ার সেই মুখখানি, নিদ্রিতার সেই মুখখানি, যে মুখে সব লাঞ্ছনা, সব অনাদর নিদ্রিত, আমার প্রিয়ার সেই করুণ, কোমল, কাতর মুখখানি, সেই প্রাণভরা, সহিষ্ণুমাখা, ধৈর্য্যভরা মুখখানি, সেই কোমল-দৃঢ়, প্রেমভরা মুখখানি কত লাঞ্ছনা, কত অনাদর, কত কষ্টকে সেই মুখ আশ্রয় দিয়েছে, সেই সুপ্তিভরা মুখের দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিলাম জানিনা, কিন্তু অল্পক্ষণ নয়। তার নিশ্বাস যেন আমার বুকের ভিতর এসে পৌঁছিল—সেই নিশ্বাসের সঙ্গে তালে তালে যেন আমার বুকের স্পন্দন হতে লাগল। আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, আমার বুকের ভেতর থেকে যেন আমার প্রাণ বেড়িয়ে পড়তে চাচ্ছিল, আমি তার নাম ধরে ডাকলাম, "সুরমা," তারপর আবার, "সুরমা"।

"স্বাভাবিক কার্য্যেরফল স্বাভাবিক হয়। দুর্ব্বলশরীর, রুগ্না, দুর্ব্বলমস্তিষ্ক,—সদ্যপ্রসূতি, আমার সুরমা গভীর নিশিথে নিদ্রাবশে, ঘরে, শিয়রের নিকট আগন্তুক দেখে ভয়ে চীৎকার করল, তারপর মূর্চ্ছিতা।—সে মূর্চ্ছা—!

"স্বামীর সোহাগ, স্বামীর আদরের মধ্যেত তার একদিনের পরিচয়ও হয়নি—স্বামীর আগমন ত কখন জানেনি, কেন না সে ভয় করবে? তার মুখচ্ছবির জীবন্ত প্রতিবিম্ব, সেই মাতৃহীনা শিশুকন্যা দুদিনমাত্র রইল—স্বর্গ থেকে সুরমা এসে, অভিমানে, অবিশ্বাসে, যেন আমার কোল থেকে তাকে নিয়ে গেল। আমার সব শেষ। ভাই, যদি একবার শুনত, একটু অপেক্ষা করত, যদি একবার আমায় প্রাণভরে কেঁদে ক্ষমা চাইতে দিত।

"আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, হোলনা, আমার বুকের যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ল। গৃহ ছেড়ে, দেশ ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু সে শান্তি কোথাও নেই,—আমার সব ভালবাসা, সব মমতা যে আমার রুদ্ধবুকের ভিতর আঘাত কচ্ছে!

"ভাই,—ভাই বলেই তোমায় গ্রহণ করেছি—আমার এ যন্ত্রণা কি তুমি একটু লাঘব করবে না? আমার কিছুই নেই, তোমার সবই আছে। মা আমার সবই নিয়েছেন, তোমায় সবই দিয়েছেন। আমার যা কিছু আছে, সবই তোমার, দিনান্তে একবার তোমার মেয়েকে বুকেধরে ঠাণ্ডা হতে দিও—আর কিছু নয়।—চল।"

রামলাল নির্ব্বাক। উভয়ে তাহার গৃহপথে চলিল।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার।

স্বাভাবিক শব্দ বা মন্ত্র

(শেষাংশ)

গতবারে আমরা শব্দের গোড়ার কথা কতকপরিমাণে আলোচনা করিয়াছি। শব্দের দিক্ হইতে দেখিতে যাইয়া আমরা আমাদের জগৎ প্রত্যয়ের (experience of the world এর) পাঁচটা থাক্ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি—অশব্দ, পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্ম শব্দ এবং স্থূল শব্দ। শেষ তিনটাকে আমরা জড়াইয়া অপরশব্দ সংজ্ঞা দিয়াছিলাম। সম্মুখে বিশাল জলরাশি। জলে যদি চাঞ্চল্যের লেশ না থাকে, জলরাশি যদি একখানা স্ফটিক দর্পণের মত সম্মুখে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার অবস্থা অশব্দের অবস্থা। জলে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তরঙ্গগুলি ছুট্‌'ছুটি করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে উঠিতেছে; ইহাই হইল পরশব্দের অবস্থা। আমি বা অপর কেহ সে ঊর্ম্মিচাঞ্চল্য শুনিবার জন্য উপস্থিত না থাকিলেও তাহা পরশব্দ। কারণ, আমরা স্পন্দ বা চাঞ্চল্য মাত্রকেই পরশব্দ বলিব, এইরূপ পরামর্শ করিয়া লইয়াছি। সে চাঞ্চল্য শ্রবণযোগ্য ও শ্রুত হউক, আর নাই হউক। তারপর, স্বয়ং প্রজাপতি মহাশয় তাঁহার কর্ণে, অর্থাৎ নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য দ্বারা, জলরাশির সেই চাঞ্চল্য শুনিলেন; অবশ্য এমনভাবে শুনিলেন যার চেয়ে বেশী ও খাঁটিভাবে শোনা আর হইতে পারে না। ইহাই হইল শব্দতন্মাত্র—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তরঙ্গচাঞ্চল্যের বিশুদ্ধ, অবিকৃত বাণীমূর্ত্তি। ইহাই শব্দের প্রকৃতি ও আদর্শ (standard)। ঢেউগুলি যতই ছোট হউক না কেন, চাঞ্চল্য যতই মৃদু হউক না কেন, এমন কি বাহিরে স্পষ্টতঃ কোনওরূপ চাঞ্চল্য না থাকিয়া যদি শুধু অণু-পরমাণু-ইলেক্‌ট্রন্‌গুলারই চাঞ্চল্য থাকে, তবুও তাহা প্রজাপতির কর্ণের নিকট পাশাইয়া যাইবে না; কারণ, আমাদের সংজ্ঞা-মত সে কর্ণ যে শ্রবণশক্তির পরাকাষ্ঠা, নিরতিশয় শ্রবণসামর্থ্য। যিনি কল্পিত পরাকাষ্ঠা বলিতে চাহেন তিনি তাহাই বলিয়া তৃপ্ত হউন। পক্ষান্তরে, চাঞ্চল্য যতই বিরাট্, বিপুল হউক না কেন তাহাও প্রজাপতি শব্দরূপে শুনিতেছেন। কোনও স্পন্দ তোমার আমার শ্রবণযোগ্য হইতে হইলে একটা অধঃরেখা এবং একটা ঊর্দ্ধরেখার মাঝের কোনও অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হইবে। সূক্ষ্মতার একটা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইলে সেটা আর আমাদের শ্রবণযোগ্য হইবে না; আবার বিপুলতার একটা সীমা লঙ্ঘন করিলেও সে আমাদের কাণে শব্দরূপে ধরা পড়িবে না। প্রজাপতির বেলায় এইরূপ কোন সীমারেখা নাই। এ প্রকার শ্রবণসামর্থ্যের কথা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। যেখানে ধাপের উপর ধাপ, থাকের উপর থাক দেখিতে পাই, সেখানেই একটা পরাকাষ্ঠার কথা, চরমের কথা আমরা ভাবিয়া লইতে পারি; সেই পরাকাষ্ঠার ভূমিই প্রাজাপত্য-পদবী—ঐশ্বর্য্য; যোগশাস্ত্র যাহার লক্ষণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।"

সে যাহাই হউক, এখন অগস্ত্য যদি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করিবার সঙ্কল্প করিয়া আমাদের সিন্ধুতটে গিয়া উপস্থিত হন, তবে তিনি তাঁহার দিব্যকর্ণে হয়ত সাগরের এত মৃদু স্পন্দগুলির ভাষা শুনিবেন, যেগুলি তোমার আমার ভৌতিক কর্ণে আদৌ কোন সাড়া দেয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও বৈজ্ঞানিক যোগীরা তাঁহাদের যন্ত্ররূপ দিব্যকর্ণের সাহায্যে যে সমস্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট জিনিষের স্পন্দগুলিকে ধ্বনিরূপে ধরিয়া ফেলিতেছেন, সেগুলির ভাষা যে অমনভাবে কোন কালে আমরা শুনিতে পাইব, তাহা পূর্ব্বে কল্পনায় আনিতেও সাহস করিতাম না। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে যৎকিঞ্চিৎ

দক্ষিণা ফেলিয়া দিলেই টেলিফোঁ নামক যন্ত্রের নলটি কাণের সন্নিকটে আনিয়া তাহাকে দিব্যকর্ণ বানাইয়া লইতে পারিব, এবং সেই দিব্যকর্ণের মাহাত্ম্যে, তুমি কাশীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিলে,আমি এই তত্ত্ববিদ্যাসমিতির গৃহে বসিয়া ধ্যানস্থ (clairvoyant) না হইয়াই তাহা অবিকল শুনিতে পাইব। তত্ত্ববিদ্যার অনুশীলকেরা ধ্যানধারণাপ্রসাদাৎ সে কাজ বে-খরচায় হাসিল করিয়া ফেলিতে পারেন; সুতরাং তাঁহাদের আর এখানে খরচা করিয়া টেলিফোঁর বন্দোবস্ত করিতে হয় নাই। তবে আবার, বিজ্ঞানও বোধ হয় তত্ত্ববিদ্যার ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। টেলিফোঁএ তোমার ও আমার মধ্যে তার টাঙ্গাইয়া লইতে হয়। তাহাতে হাঙ্গামা অনেক, খরচ বিস্তর। আমাকে যে পরিমাণে জড়ের সহায়তা লইয়া অভিলাষ পূরণ করিতে হইবে, সেই পরিমাণে জড়ের কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়া তার গোলামি করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলাম আর কাজ হইল—এমনটা হইবে না; কাজ করিতে গেলে বাহিরের যে পাঁচটা জিনিষের উপর আমাকে নির্ভর করিতে হয় তাহাদের রীতিমত ভাবে যোগাযোগ করিয়া লইতে হইবে। এই জন্য বৈজ্ঞানিকের টেলিফোঁ আমার অনেক সুবিধা করিয়া দিলেও আমায় স্বাধীন করিয়া দিতে পারে নাই। শুধু টেলিফোঁ কেন, বৈজ্ঞানিকের অনেক আয়োজনই আমাকে গোলাম করিয়া রাখিতেছে—বাহিরটার কাছে, পরের কাছে। দেওয়ালে ঐ বোতামটা টিপিলাম আর মাথার উপর সুরঞ্জিত কাচপুরীর ভিতর কেমন নিমেষে বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠিল। বেশ মজা। কিন্তু যে বিরাট্ তারের ব্যূহ আমাদের সহরটার মাথার উপর আকাশকে ছাইয়া রাখিয়াছে, অথবা আমাদের পদনিম্নে সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর কলেবরে শিরা প্রশিরার মত নিজেকে চালাইয়া দিয়াছে। সেই তারের স্থল-বিশেষে যদি একটু গোলযোগ বাধিয়া যায়, তবে আমি দেওয়ালে বোতাম টেপা কেন, মাথামুড় খুঁড়িয়া আমার নিমতলা প্রাপ্তির সম্ভাবনা করিয়া তুলিলেও, আমার ঘরের ভিতর অন্ধকারের জমাট একটুখানিও ভাঙ্গিবে না। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের মায়াপুরী আমাদের চিনাইয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেটা যে আবার গোলামখানাও, এ-কথাটাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। বিজ্ঞানও মর্ম্মে-মর্ম্মে সেটা বিলক্ষণ অনুভব করেন। তাই টেলিফোঁ টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া, বিজ্ঞান, সূক্ষ্ম ও দূরবর্ত্তী স্পন্দগুলিকে ধরিবার আর এক রকম ফন্দি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি আচার্য্য ম্যাক্সওয়েল ও হার্জ। মর্কোণি-নামা পুরোহিতের কর্ম্ম-কুশলতায় সে মন্ত্রের যথাযথ বিনিয়োগ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা পাইয়াছি তারহীন বার্ত্তাবহ। সমুদ্রের গভীর জলে তার (clabe) ফেলিয়া রাখিবার আর তেমন দরকার নাই; লম্বা খুঁটি পুঁতিয়া শত শত যোজন তার টাঙ্গাইয়া আর না রাখিলেও খপরের বিনিময় চলিতে পারে। এ দৃষ্টান্তে তারের গোলামি আমাদের কমিল বটে, কিন্তু বাহিরে যে যন্ত্র আমাদের তৈয়ার করিয়া রাখিতে হইতেছে, সময়ে সময়ে সেটা এমন বিশাল মূর্ত্তিতে দেখা দেয় যে তাহার সম্মুখে আমাদের মত আদার ব্যাপারীর প্রাণ বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। তারহীন বার্ত্তাবহে আমাদের শক্তির বিস্তার বাড়িয়াছে এবং বাহিরের গোলামী অপেক্ষাকৃত কমিয়াছে বটে, কিন্তু শক্তির পরাকাষ্ঠায় আমরা অবশ্য পৌঁছাই নাই, এবং আমাদের গোলামিও একেবারে অপগত হয় নাই। শক্তির পরাকাষ্ঠা যেখানে তাহাই প্রাজাপত্যপদবী; যে ভূমিতে উঠিলে সমস্তই আত্মবশ তাহাই স্বারাজ্যসিদ্ধি। ইহাই লক্ষ্য। বিজ্ঞানও নানা ভুল-ভ্রান্তি, সংশয়-সংস্কারের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যের অভিমুখেই চলিয়াছে। তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতবর্ষের অধ্যাত্মশাস্ত্র যদি ঠিক হয়, তবে তাহার অনুশীলনের ফলে মানুষ ঐ লক্ষ্যের দিকে আরও কাছাইয়া আসিতে পারে। যে ঈথারতরঙ্গগুলি তারহীন বার্ত্তাবহ যন্ত্র (co-herer) পাতিয়া ধরিতেছে, সেগুলি এবং তার চেয়েও সূক্ষ্ম কম্পনগুলি যদি আমরা শুধু ধ্যানেই ধরিয়া ফেলিতে পারি, তবে শক্তির পরাকাষ্ঠার দিকে বেশী অগ্রসর ত হইলামই, অধিকন্তু সে শক্তি, বাহিরের সম্বন্ধে অনেক বেশী নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইল; দূরের সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি গ্রহণ করিতে, বাহিরে

একটা যন্ত্র বানাইয়া পাতিয়া রাখিতে আর হইল না। এ দৃষ্টান্তে সেই পূর্ব্বের কথাটাই পরিষ্কার হইতেছে—দিব্যকর্ণের বা যোগজ শব্দপ্রত্যক্ষের নানা থাক্ রহিয়াছে; যেমন যন্ত্র তেমন শোনা; আবার ধ্যান ধারণা যত গাঢ়; অনুভবও তত গভীর। এই দিব্যকর্ণের চরম পরিণতি পারমার্থিক কর্ণে; সকল যোগজ বিভূতির পূর্ণবিকাশ স্বয়ং যোগেশ্বরে। বলা বাহুল্য, তোমার আমার স্থূল কর্ণেরও শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তারতম্য রহিয়াছে। বিভিন্ন জীবের ত কথাই নাই।

জলরাশির দৃষ্টান্ত লইয়া আমরা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রবন্ধে ব্যাখ্যাত প্রধান কথা কয়টাই আবার ঝালাইয়া লইলাম। শব্দের পাঁচটা থাক্ এবং শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের তিনটা থাক্' ইহাই একটা প্রধান কথা। আর একটা প্রধান কথা, স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রের লক্ষণ। দ্রব্য একটা শক্তিব্যূহ। সেই শক্তিব্যূহ যে চাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহা যদি কোনও নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা শব্দরূপে গৃহীত হয়, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক নাম বা বীজমন্ত্র। এরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রের নিজের দ্রব্য বা অর্থ গড়িয়া তুলিবার শক্তি আছে। আমরা গুরুমুখে বা সাধনায় যে বীজমন্ত্রগুলি পাই, সেগুলি অল্পবিস্তর পরিমাণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ। এইরূপ হইবার যে কারণ আছে, তাহা আমরা সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বপ্রবন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আমাদের চলিত বীজমন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ নহে বলিয়া তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি (অর্থ গড়িয়া লইবার শক্তি) একপ্রকার সুপ্ত বলিলেই হয়। মন্ত্রোদ্ধার ও মন্ত্রচৈতন্য এবং জপ পুরশ্চারণ প্রভৃতির দ্বারা সে শক্তি ধীরে-ধীরে জাগাইয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দেখাইয়া এই কয়টা কথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে প্রয়াস পাইয়াছি।

জড়জগতের সবিতা গ্রহ-উপগ্রহগুলির আদিম অবস্থা রূপে একটা বিপুল নীহার-সমুদ্র কল্পনা করিতে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও ভালবাসেন। ঋষিরাও জগতের (শুধু জড়জগতের নয়) আদি কারণ বা উপাদানকে কারণসলিল রূপে ভাবিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা আর-যাহা হউন আর না-ই হউন, কবি। তাঁহাদের বেদপুরাণগুলি কাব্য-সম্পদে অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখন, এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি আপনারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি? কারণসলিলে অনন্ত-শেষ-শয্যায় শুইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যোগ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছেন। তাঁহার নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সমাসীন রহিয়াছেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু-কৈটভনামক দৈত্যদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'—ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা বিপন্ন হইয়া যোগনিদ্রার স্তব করিয়া বিষ্ণুকে জাগাইলেন। বিষ্ণু জাগিয়া দৈত্য দু'টার সঙ্গে লড়াই করিলেন। দৈত্যযুগল প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন, "আমরা খুসী হইয়াছি; তুমি আমাদের কাছে বর লও।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমরা আমার বধ্য হও।" এ গল্পটার রহস্য কি? আমরা যে শব্দ-বিজ্ঞানের আলোচনা এই দুই দিন ধরিয়া করিতেছি তাহারই গোড়ার কথা কয়টি এই গল্পের মধ্যে লুকান রহিয়াছে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চৈতন্য। তিনি এক বই, দুই নহেন। কিন্তু এক এক হইয়া থাকিলে ত সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির জন্য নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া দুই করিয়া লইতে হয়। তাঁহার এক ভাগ বা দিক্ (aspect) হইল আধার বস্তু; অপর ভাগ বা দিক্ হইল আধেয় বস্তু। অনন্ত-শেষ-শয্যা এই জাগতিক আধার বস্তুর সঙ্কেত; এবং সে বিরাট্ আধার বস্তু একটা অপরিসীম শক্তিব্যূহ (an infinite system of stresses)। আমরা মনে করি, বুঝিবা এই জলবিন্দুটিকে গোটা দু'চার শক্তি গড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে; আমাদের হিসাবের সম্ভাবনা ও সুবিধার জন্য আমাদিগকে ব্যাপারটাকে নিতান্ত ছোট করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে আধার-শক্তি জলবিন্দুর অণু-পরমাণু প্রভৃতিকে ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেটা ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল শক্তিব্যূহ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। জলবিন্দু কি জলবিন্দুরূপে বাহাল থাকিত, যদি তাহাকে পৃথিবী, বাতাসের রেণু প্রভৃতি টানিয়া ও চাপিয়া ও ধরিয়া না রহিত? পৃথিবী ও তার এত সাজ-সরঞ্জাম কি সম্ভবপর হইত, যদি সৌর-জগতের ও ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর দ্রব্য তাহাকে টানিয়া ও চাপিয়া ও সামলাইয়া না রহিত? এইপ্রকার টানিয়া,

চাপিয়া রাখার নাম আমরা এক কথায় দিয়াছি শক্তিব্যূহ (stress)। অতএব জগতে এমন কোনও কিছু ছোট বা অল্প নাই যাহার আধার-শক্তিকে আমরা অনন্ত-শেষ-শয্যারূপে ভাবিতে না পারি। কারণ, আমরা দেখিতেছি যে, তাহার আধার-শক্তি (constituting forces) নিখিল-শক্তি-ব্যূহের এক তিলও কম নহে। তুমি আমি অল্পই দেখিতে শিখিয়াছি, তাই অল্পর মূলে ও অল্পকে ঘিরিয়া যে ভূমা ও বিরাট্ রহিয়াছে, তাহাকে সহজে ধরিতে ছুঁইতে পারি না। বিজ্ঞান অনেক মাথা ঘামাইয়া পৃথিবী ও আতাফলের টানাটানির একটা বিবরণ দিল; বিবরণ খাসা হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে আটখানা হইতেছি। কিন্তু ভুলিয়া যাই যে, শুধু-একটা গণিতের ফরমাসী আতাফল ও পৃথিবী লইয়াই এ বিশ্বের কাণ্ড-কারখানাটা চলিতেছে না। দুইটা ছাড়িয়া তিনটা জিনিষের টানাটানি বুঝিয়া-পড়িয়া লইতে লাপ্লাসের মত মাথাও ঘুরিয়া যায়; নিখিল শক্তিব্যূহের বিবরণ দিবে কে? বিবরণ দিতে পারি আর নাই পারি, তাহাই কিন্তু ছোট, বড়, মাঝারি সকলেরই মূলে; আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডটাকে বিষ্ণু আধার-শক্তিরূপে ধরিয়া রাখিয়াছেন; সেই আধারশক্তির সঙ্কেত অনন্তশয্যা।

তারপর নাভি-কমল। তাহার উপর ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। কে ব্রহ্মা? তিনি শব্দব্রহ্ম বা ব্রহ্মের শব্দ-প্রবাহরূপে অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তি যাঁহাকে আধার ও আশ্রয় করিয়া হইতেছে তিনি সর্ব্বব্যাপী আত্মার অথবা বিষ্ণুর অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ মূর্ত্তি—সেই নিখিল শক্তিব্যূহ (সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ) যাহার কথা আমরা এতক্ষণ ধরিয়া বলিতেছি। ঘড়ি বাজিয়া উঠিল; এই বাজা ব্যাপারের মূলে ঘড়ির ভিতরকার চাকাগুলির, দোলক প্রভৃতির শক্তিগুলি (forces) রহিয়াছে; শুধু ভিতরকার হিসাব দিয়াই আমাদের রেহাই নাই; বাহিরের তাপ, আলোক, তাড়িত-চৌম্বক-শক্তি ও অপরাপর দ্রব্যের আকর্ষণ, এই বাজা ব্যাপারের পিছনে অবশ্যই রহিয়াছে। তবেই ঘড়ি যখন বাজিতেছে তখনও তাহার মূলে সেই অনন্তদেবই রহিয়াছেন, যাঁহার সহস্র শীর্ষ, সহস্র অক্ষি প্রভৃতি বেদবাণী আমাদের বারবার শুনাইতেছেন। এই দৃষ্টান্ত বুঝিলে আমরা বুঝিব কেন শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাকে অনন্ত-শয্যাস্তীর্ণ বিষ্ণুর নাভিকমলে বসাইয়া রাখা হইল। গল্পটা শুনিতে আজগবি, কিন্তু ইহা সৃষ্টির বা অভিব্যক্তি-প্রবাহের মূল কথাটির দিব্য প্রতীক, এ কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। নাভি-বিবর হইতে পদ্মমৃণাল উদ্গত হইয়া আমাদিগকে ইহাই সঙ্কেতে জানাইতেছে যে, ব্রহ্মা শব্দ-ব্রহ্ম; কারণ সকলপ্রকার শব্দাভিব্যক্তির মূলে যে নাদ বা প্রণবোচ্চার, তাহা ত নাভিস্থানকে বিশেষতঃ আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। নাদধ্বনি যে নিখিলধ্বনি-বৈচিত্র্যের মূল উৎস। প্রণবের আলোচনাস্থলে এ কথাটির আমরা বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ নাভিকমলে শব্দব্রহ্মরূপ ব্রহ্মা কেন বসিলেন তাহার একটা কৈফিয়ৎ আমরা পাইলাম। সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা চিদ্বস্তু নিজেকে যেন দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগে নিখিল-শক্তিব্যূহ-স্বরূপ আধার বা আশ্রয় হইলেন; অপরভাগে নিখিল-বেদশব্দাত্মক কলেবর ধরিয়া আধেয় বা আশ্রিত হইলেন। শব্দের স্রষ্টৃত্ব আমরা পূর্ব্বেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। শব্দের এই প্রকার সৃষ্টি-সামর্থ্য স্মরণ রাখিলে, আমাদের আর গোল হইবে না, কেননা বিষ্ণুর নাভিপদ্মোপরিস্থিত শব্দব্রহ্মকে সৃষ্টির মালিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ আবির্ভূত হয়; সেই বেদশব্দপূর্ব্বক সৃষ্টি হইয়া থাকে—জগৎ সেই শব্দ-প্রভব। বেদশব্দ মানে স্বাভাবিক শব্দ, এটা যেন মনে থাকে; অর্থাৎ কোনও পদার্থের মূলীভূত চাঞ্চল্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত হইলে যে বিশুদ্ধ, নিরতিশয় শব্দ হয়, তাহাই; আমরা যেগুলিকে বেদশব্দ বলিয়া কহিতেছি ও শুনিতেছি, ঠিক সেগুলি নহে। আমাদের আপ্ত (inspired, revealed) শব্দগুলিতেও অল্পবিস্তর বিকৃতি ও সাঙ্কর্য্য হইয়াছে।

ব্রহ্মা শুধু আধার-কমলে বসিয়া আছেন এমন নহে; তাঁহার একটা বাহনও আমরা যুটাইয়া দিয়াছি; সেটা হংস। হংসটা কি? কোনওপ্রকার শব্দ উচ্চারণ ও শ্রবণ করিতে যাইলে প্রাণশক্তির পরিস্পন্দ (vital

functioning) যে আদৌ হয়, সে পক্ষে হালের বিজ্ঞানও আর সন্দেহ রাখে না। সেই প্রাণন ব্যাপারের স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্র হংস; প্রাণিমাত্রেই, শুধু মানুষে নয়। গভীর রাত্রিতে জাগিয়া স্থির হইয়া বসিয়া শুনিলে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দটাকে মোটামুটি (roughly) 'হংস' বলিয়াই মনে হয়। সাধকের দিব্য কর্ণে প্রাণনক্রিয়ার, যে প্রায় বিশুদ্ধ ধ্বনি (approximate acoustic equivalent) ধরা পড়ে, তাহা যে সত্য সত্যই 'হংস' সে বিষয়ে শাস্ত্র, গুরু ও মহাজনেরা একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন। হাতে-কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখার জিনিষ; শুনিয়াই মাথা নাড়িয়া বিশ্বাস বা অবিশ্বাস প্রকাশ করায় কোনই লাভ নাই। বাহনের পরিচয় ত পাইলাম। বাগ্‌দেবী সরস্বতীর বাহনও হংস এ কথাও আপনারা স্মরণ রাখিবেন। বিরিঞ্চির হস্তে আবার অক্ষসূত্র। ইহা বর্ণমালা অর্থাৎ শব্দসমূহের মৌলিক অংশগুলি (units or elements of sounds)। যথা 'গৌঃ' এই শব্দে গকারৌকার-বিসর্জ্জনীয়াঃ, গ, ঔ, :। মহামেঘপ্রভ' ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, অপর কোন দেবতার গলদেশে ইহাই মুণ্ডমালারূপে দুলিয়াছে। আসলে কিন্তু ইহা মাতৃকা—বর্ণময়ী। কমণ্ডলু, চতুরানন প্রভৃতির বিবরণ দিতে যাইলে আমাদের পুঁথি আর শেষ হইবে না। আপাততঃ শব্দের দিক্ হইতে মোটা মোটা আরও দু'টো-একটা কথা আমরা ভাবিয়া দেখিব। নাদধ্বনি প্রধানতঃ নাভিস্থানে উত্তেজনা বিশেষ হইতে সঞ্জাত হয়, এবং বাহন হংস প্রাণন ক্রিয়ার শাব্দিক মূর্ত্তি—এই দুইটি কথা মনে রাখিলে, আমাদের আর বুঝিতে বাকি থাকিবেনা যে, শব্দব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মা শব্দতন্মাত্রবপুঃ, অর্থাৎ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ শব্দসমষ্টিই ব্রহ্মার কলেবর; আর, তিনি যাহার উপর আশ্রয় করিয়া এবং যাহাকে বাহন করিয়া রহিয়াছেন, সেই নাভিকমল ও হংস স্পন্দাত্মক পরশব্দের প্রতিমূর্ত্তি। অতএব স্পন্দাত্মক পরশব্দকে মূল করিয়া শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ এই ত্রিবিধ অপরশব্দের যে ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছিলাম, তাহার একটা সাঙ্কেতিক বিবরণ (symbolic representation) গল্পটার মধ্যে আমরা পাইলাম। আপাততঃ গল্প বলিয়াই চালাইতেছি, কিন্তু ঠিক গল্প ইহা নহে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাধার আত্মা। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছুর অভিব্যক্তি হইতেছে তাহার মূল বিষ্ণুতে। বিষ্ণুই অভিব্যক্ত হইতেছেন। আমরা যাঁহাকে বিষ্ণু আখ্যা দিতেছি তাঁহাকে, বৈজ্ঞানিকের তরফের উকিল হার্বার্ট স্পেন্‌সার হয়ত 'অজ্ঞেয় শক্তি' (Inscrutable Power) বলিয়া ছাড়িয়া দিবেন। নাম যাহাই দেওয়া হউক, বিষ্ণুই বলি আর আত্মাশক্তিই বলি, এই বিশ্বাভিব্যক্তির মূলে ও অন্তরালে একটা কিছু রহিয়াছে। নিখিল সৃষ্টির সম্ভাবনা, সূচনা ও প্রেরণা তাহারই ভিতরে। সেই বস্তুটি শব্দতন্মাত্ররূপে, শব্দপরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন—অর্থাৎ, প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই মূলবস্তু হইতে আবির্ভূত হইতেছেন। সেরূপ আবির্ভাবের জন্য পরশব্দের আবশ্যকতা যে আছে তাহা পূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু পরশব্দ থাকিলেই হইবে না, দু'টো একটা বাধা বা অন্তরায় অতিক্রম না করিতে পারিলে সেরূপ অভিব্যক্তি হইবে না। আমি শব্দ শুনিতেছি। আমার শ্রুত শব্দ নিরতিশয় শব্দ বা শব্দপরাকাষ্ঠা নহে। কেন নয়? পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা শব্দ শোনার যে সমস্ত উপাদান ও নিমিত্তের আলোচনা করিয়া রাখিয়াছি, তাহাতে এই কথাটা পরিষ্কার হইয়াছে যে আমার শোনা শব্দতে বিকার (deformation) ও সঙ্কর (confusion), এই দুইটি দোষ অল্পবিস্তর থাকিবেই।

আমার স্থূল, ভৌতিক কর্ণ অবিকৃত ও অসঙ্কীর্ণ শব্দ গ্রহণ করিতে যোগ্য নয়। আমার ভিতরে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তাঁহার ইহাই কর্ণমল। এই কর্ণমল রহিয়াছে বলিয়া, আমার শ্রবণ-সামর্থ্যের এই ত্রুটি ও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, আমি নিরতিশয় শব্দ বা স্বাভাবিক শব্দ শুনিনা; এইজন্য আমার শোনা শব্দ স্থূল শব্দ, শব্দতন্মাত্র নহে; আমার কর্ণ ভৌতিক কর্ণ, পারমার্থিক কর্ণ (absolute ear) নহে। শব্দ শোনার সামর্থ্য আমার মধ্যে পরাকাষ্ঠায় পৌছিতে পারে নাই; পারে নাই তার প্রমাণ, আমায় কাণে যন্ত্র লাগাইয়া অথবা ধ্যানস্থ হইয়া অনেক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে হয়। অভিব্যক্তির ধারা কোনও একটা

বাধাতে ধাক্কা পাইয়া যেন থামিয়া রহিয়াছে, শেষপর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যেই অভিব্যক্তির এই দশা দেখি। যতটা অভিব্যক্তি হইলে সম্পূর্ণতা হয়, পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা এখনও কোথাও হইয়াছে দেখি না। কি যেন একটা কি প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, ষোল আনা ফুটিয়া উঠিতে দিতেছে না। আমার শ্রবণ সামর্থ্যের এই যে দোষ বা প্রতিবন্ধক তাহাকে কর্ণমল বলিলে, বেশ বলা হয় না কি? বিষ্ণু মানে সর্ব্বব্যাপী; কাজেই যেখানে কর্ণ বা শ্রবণ-সামর্থ্যের আয়োজন বা ব্যবস্থা, সেইখানেই এই বিষ্ণু-কর্ণমল। অর্থাৎ কর্ণমল শুধু তোমার আমার ঘরওয়া কথা নহে. ইহা একটা জাগতিক ব্যবস্থা। তবে তোমার আমার দৃষ্টান্তে মূল তথ্যটি বুঝিবার সুবিধা আমাদের হইতে পারে। এখন, আমি যদি শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইতে চাই, তবে অবশ্য আমাকে কর্ণমল পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আমার ভৌতিক কর্ণটাকে পারমার্থিক কর্ণ করিয়া লইতে হইবে। কর্ণ নির্ম্মল না হইলে শ্রবণ নিরতিশয় ও বিশুদ্ধ হইবে না। আমরা যে সকল লক্ষণ ও পরিভাষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে এ সকল কথা বলিয়া আমরা একটা কথাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছি মাত্র। কর্ণমল বা শ্রবণ-শক্তিনিষ্ঠ দোষ দুই কারণে হইতে পারে, অথবা তাহার বিবৃতি দুই প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। আবরণ ও বিক্ষেপ—তমঃ ও রজঃ। শব্দ হইল, অপরে শুনিতে পাইল, আমি পাইলাম না; এ ক্ষেত্রে কি যেন শব্দটাকে আমার কাছ হইতে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; এই আবরণের জন্য বহু সূক্ষ্ম শব্দ আমি শুনি না, অনেক বিপুল শব্দও আমি শুনি না; দুইটি সীমা রেখার মধ্যে, একটা গণ্ডীর ভিতরে শব্দ আসিয়া হাজির হইলে, তবে আমি তাহাকে শুনিতে পাই। ইহার পরিভাষা করা হউক—তামসিক কর্ণমল। আবার শব্দ শুনিলেও ঠিকভাবে শোনার সম্ভাবনা আমার নাই। একই সময়ে নানা জিনিষের উত্তেজনা নানা শব্দ জন্মাইতেছে। বাগানে বসিয়া রহিয়াছি—কাকের ডাক, ঝিঁঝিঁর ডাক, চিলের ডাক প্রভৃতি কত শত শব্দ যে মাখামাখি জড়াজড়ি করিয়া আমার কাণে আসিতেছে, তার হিসাব কে দিবে? মোটামুটিভাবে সেগুলিকে আমি আলাদা করিয়া চিনিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যে তাহারা মাখামাখি করিয়া, সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, সে পক্ষে আর সন্দেহ আছে কি? জলে একটা ঢেলা ফেলিলাম; একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইতে চারিধারে সুশৃঙ্খলার সহিত ঢেউগুলি কেমন ছড়াইয়া পড়িতেছে। আর একটা ঢেলা ফেলিলাম; নূতন একটা উত্তেজনার কেন্দ্র হইল, এবং তাহাকে বেড়িয়া আরও এক সার ঢেউ ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পূর্ব্বের ঢেউগুলি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সঙ্ঘর্ষ হইল, ফলে, নূতন ও পুরাতন উভয়েই নিজস্ব প্রকৃতি ও শৃঙ্খলা হইতে অল্প-বিস্তর বিচ্যুত হইল। ইহা তাহাদের সাঙ্কর্য্য (interference of waves)। আমাদের শ্রুত শব্দগুলির এইরূপই দশা। কোন একটা জিনিষের নিজস্ব প্রকৃতি আমরা শব্দে তাই ধরিতে পারিতেছি না; যেটাকে কোন জিনিষের শব্দ বলিতেছি সেটা নিশ্চয়ই তাহারই নিজস্ব ও স্বাভাবিক শব্দ নহে। এ বিশ্বের হাটে সকলেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতেছে; এ হট্টগোলের মধ্যে আমার হারানো মামার গলা বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে এক রকম অসম্ভবই হইয়া পড়িয়াছে। তবে অবশ্য 'অধ্যেতৃবর্গ-মধ্যস্থ-পুত্রাধ্যয়ন-শব্দবৎ' মামার ডাক একেবারে যে না শুনিতেছি এমন নহে; সে ডাক আর পাঁচটা ডাকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। জগতের নিখিল সামগ্রীর যে ক্ষেত্রে গোলে হরিবোল দিবার ব্যবস্থা, সে ক্ষেত্রে আমি বিকৃত, ভেজাল শব্দ শুনিতেই বাধ্য। ভেজাল ধরিয়া সংশোধন করিয়া লইবার সামর্থ্য আমার কর্ণের নাই। ইহা কর্ণের আর এক দোষ—ইহার নাম দিই রাজসিক কর্ণমল। এই কর্ণমলের দরুণ শোনা শব্দগুলিও গোল পাকাইয়া যাইতেছে—প্রকৃতি বা স্বভাব হইতে বিচ্যুত, বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই প্রকার কর্ণমলের একটা মধু, অপরটা কৈটভ; একটা তমঃ, অপরটা রজঃ। এই কর্ণমলের সংস্কার না হইলে, কি আমাতে, কি তোমাতে, কি প্রজাপতিতে, পারমার্থিক কর্ণ অথবা শব্দ-গ্রহণ-শক্তি-পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইতে পারে না। বিষ্ণু,

প্রজাপতি বা ব্রহ্মারূপে নিখিল স্বস্বাভাবিক বা বৈদিক শব্দরাশি অভিব্যক্ত করিতে যাইতেছেন ; সেরূপ অভিব্যক্ত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই; যতক্ষণ কর্ণমল রহিয়াছে। রূপকচ্ছলে বলা হউক, কথাটা কিন্তু সোজা, এবং কথাটায় আপত্তি করার কিছু নাই। অভিব্যক্তিধারা (stream of evolution) কে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে হইলে, সকল গণ্ডী, সকল বাঁধাবাঁধি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, এ কথা বলিলে উক্তেরই শুধু পুনরুক্তি করা হয় মাত্র। যে নির্ম্মল হইবে তাহাকে ময়লা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা বলিলে নূতন কোন কথা বলা হয় কি ? তুমি জলে ঢেলা ফেলিয়া দিলে, আমাকে, তার শব্দ শুনিতে হইলে কাণ হইতে আঙুল সরাইয়া লইতে হইবে। সেইরূপ কারণসলিলে যে চাঞ্চল্য, তাহাকে নিরতিশয়ভাবে শুনিবার প্রয়োজন হইলে, শ্রবণ সামর্থ্যের কুণ্ঠা ও কৃপণতা, অর্থাৎ কর্ণমল থাকিলে ত চলিবে না! এই জন্য প্রাজাপত্য অধিকার নিরুদ্বেগে করিতে হইলে কর্ণমল দূর করাই চাই। এই জন্যই শাক্ত বলিতেছেন মধু কৈটভ 'বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ'। দৈত্যদ্বয় বিনষ্ট না হইলে, অর্থাৎ কর্ণমল বিদূরিত না হইলে, ব্রহ্মার পদবী, অর্থাৎ নিরতিশয়-শ্রবণ-সামর্থ্য, অক্ষুন্ন ও চরিতার্থ হইতে পারে না। 'বিষ্ণুর যোগনিদ্রা না হইলে আবার দৈত্য দুইটার প্রাদুর্ভাব হয় না।

বীজের মধ্যে যাহা প্রসুপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে তাহা যদি জাগ্রত ও পরিস্ফুট হইয়াই থাকিত, তবে ত বীজ গাছ হইয়াই রহিত। বীজ হইতে ধীরে-ধীরে অঙ্কুর এবং অঙ্কুর হইতে ধীরে ধীরে গাছ হইতেছে—এই ক্রমিক ও ধারাবাহিক ব্যাপারটারই তাহা হইলে কোনই অর্থ থাকিত না। অভ্যুদয় বা ক্রমবিকাশ নামক প্রবাহটা তাহা হইলে নিরর্থক হইয়া রহিত। বীজের মধ্যে যে বিষ্ণু রহিয়াছেন, যে বৈষ্ণবী-শক্তি রহিয়াছেন, তিনি নিদ্রিত রহিয়াছেন বলিয়াই বীজ আপাততঃ বীজই হইয়াছে ; সে শক্তির নিদ্রা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থা (potential condition) যেমন যেমন অপগত হইবে, বীজের পাদপরূপে পরিণতিও তেমনি প্রকৃত হইতে থাকিবে। এই জন্য সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বিষ্ণু না ঘুমাইলে ও জাগিলে কোনও জিনিষের বাড়া-কমা, উদয়-বিলয়ের প্রসঙ্গই অর্থহীন হইয়া যায়। জিনিষের হ্রাস বৃদ্ধি মানেই তার ভিতরকার শক্তিব্যূহের বিভিন্ন অবস্থা। বিশ্বের উদয় বিলয় হইতেছে দেখিয়াই আমরা ভাবিতেছি যে, যে বস্তুটি বিশ্বের বীজ বা মূলরূপে রহিয়াছেন, তাঁহার একরকম সঙ্কোচ ও বিকাশ যেন আছে। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধ শক্তি, অথবা নিখিল শক্তির আশ্রয় যে জগন্নিবাস, তাঁহার অনন্ত শক্তিব্যূহ সকল সময়ে ঠিক একভাবে থাকিলে, কোনরূপ চলা-ফেরা, হ্রাস-বৃদ্ধি, উদয়-বিলয় সম্ভবে না, সুতরাং সৃষ্টি অথবা জগৎ বলিলে যাহা বুঝি সেটা আদৌ সম্ভবপর হয় না। এটা বিজ্ঞানের পরীক্ষিত ও স্বীকৃত কথা, দর্শন-শাস্ত্রের দুর্বোধ্য হেঁয়ালি নহে। বিজ্ঞান যাহাকে কার্য্যকরী শক্তি (Energy) বলেন, তাহার দুইটি অবস্থা আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রচ্ছন্নাবস্থা (potential বা static condition) ; অপরটা উদার বা ব্যক্ত অবস্থা (kinetic condition)। জলের কণিকাগুলি নূতনভাবে বিন্যস্ত ও সজ্জিত হইলে বরফ হইল ; এই অভিনব বিন্যাসের (new cofiguration এর) ফলে বরফের উৎপত্তিতে প্রচুর তাপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ; আবার বরফ যখন গলিয়া জল হইতে থাকিবে তখন সেই প্রচ্ছন্ন তাপশক্তি হিসাবে ধরা পড়িয়া যাইবে। পুনশ্চ, জল যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখনও ঐ প্রকার একটা অবস্থা হয়। জলের ভিতর যে বিষ্ণু রহিয়াছেন তিনি সব সময়ে ঠিক এক অবস্থায় থাকিলে জল জলই রহিয়া যায়, বরফ বা বাষ্প হইতে পারে না। এরূপভাবে দেখিলে, আমার মধ্যেও বিষ্ণু রহিয়াছেন, তোমার মধ্যেও রহিয়াছেন ; আমার ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তিনি সব সময়ে ঠিক সমবস্থ হইয়া থাকিলে আমিও সব সময়ে সমবস্থই রহিয়া যাইতাম। আমার জ্ঞান ও কর্ম্ম সব সময়ে ঠিক এক ভাবেই হইত ; হয় না যে, ইহাতেই বুঝিতেছি, আমার মূলে একটা পরিবর্ত্তনের ও ক্রমিকতার বন্দোবস্ত রহিয়াছে ; আমার জ্ঞান ও শক্তি যে অল্প ও সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহাতেই বুঝিতেছি, অথবা এই ব্যাপারটাকে বলিতেছি, যে, বিষ্ণু আমার মধ্যে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন

হইয়া রহিয়াছেন। আমার অভিভূতাবস্থাই আমার বিষ্ণুর যোগ নিদ্রা। আমার যে ক্রমিক বিকাশ বা অভ্যুদয় তাহাই আমার বিষ্ণুর জাগরণ। শুধু আমার বেলায় নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেই এই প্রকার ব্যবস্থা হইয়া রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই জগৎ, জগৎ। রহিয়াছে বলিয়াই সৃষ্টি হইতেছে বিকাশ হইতেছে। এই জাগতিক রহস্য ও সৃষ্টির গোড়ার কথাটি স্মরণ রাখিলে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ও প্রবোধ, এই পৌরাণিক গল্প শুনিয়া আর হাসিব না। কার্য্যকরী শক্তির (Energyর) ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক হাসিয়া থাকেন কি?

ঘুমাইয়া থাকিলেই জাগা হয়, নামিয়া থাকিলেই উঠা হয়। বিষ্ণু কারণসলিলে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। ইহা যেন বিশ্ব-শক্তির একটা মগ্ন ও মূর্চ্ছিত অবস্থা (static condition)। এভাবটা সব সময়ে থাকিলে কোনও পরিণতি ও পরিবর্ত্তন অবশ্য থাকে না। যে ধারাটিকে সৃষ্টি বলিতেছি সেটি আর আদৌ চলে না। বিষ্ণু আর ব্রহ্মারূপে, সৃষ্টিকর্ত্তাভাবে দেখা দিতে পারেন না। ব্রহ্মাতে শব্দ গ্রহণ সামর্থ্যের যে পরাকাষ্ঠা, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্র শুনিবার ও বলিবার শক্তির যে চরমোৎকর্ষ, তাহা সম্ভবে না যদি বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত না হন। বীজের শক্তির ব্যক্তাবস্থা মানেই অঙ্কুরাদির উদ্গম। যোগনিদ্রাবস্থাতেই কর্ণমল সম্ভবে; সেই অবস্থাতেই মধুকৈটভের প্রাদুর্ভাব। ব্রহ্মা স্তব করিয়া যোগনিদ্রা ভাঙ্গিলেন—প্রচ্ছন্নকে (potentialকে) উদার (kinetic) করিয়া লইলেন। যোগনিদ্রাভঙ্গে কর্ণমল, অর্থাৎ শ্রবণ-সামর্থ্যের অল্পতা ও কৃপণতা, অপগত হইল। মধুকৈটভের সংহার হইল। মধুকৈটভ শব্দের বিকার ও সঙ্কর। শব্দের বিকার ও সঙ্কর ঘুচিয়া গেলেই শব্দ বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক হইল। বীজমন্ত্রগুলির উদ্ধার ও চৈতন্য হইল। এইরূপ সমর্থ (dynamic ও creative) বীজমন্ত্রগুলি না পাইলে ত সৃষ্টি হইবে না, ব্রহ্মার অধিকারই সাব্যস্ত হইবে না। মধুকৈটভ বিনাশের পর ব্রহ্মা নিরুদ্বেগ ও চরিতার্থ হইলেন।

মধুকৈটভের আখ্যায়িকার ভিতরে শব্দের পূর্ব্বালোচিত সব-কয়টা আসল কথা পাইলাম ত? আখ্যায়িকাটির এরূপ ব্যাখ্যাই আমরা দিতেছি কেন? কোন আখ্যায়িকার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে বসিয়া প্রথমেই ধীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, তাহার মধ্যে কোনও নির্দ্দেশসূত্র, স্পষ্ট সঙ্কেত, অথবা দিগ্‌দর্শন (sign post) প্রচ্ছন্নভাবে দেওয়া আছে কি না। বর্ত্তমান আখ্যায়িকায় সেরূপ সঙ্কেত তিনটি। প্রথম সঙ্কেত ব্রহ্মার ধ্যানে নিখিল বেদশব্দ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। কাজেই ব্রহ্মা শব্দসম্পর্কীয় শক্তির পরাকাষ্ঠা; বেদশব্দ মানে বিশুদ্ধ ও নিরতিশয় শব্দ। এইরূপ শব্দকে, অর্থাৎ বীজমন্ত্রকে, পুরোহিত করিয়াই ব্রহ্মার সৃষ্টিযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া থাকে, অন্যথা, হয় না। মধুকৈটভ যে কাহারা তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য অতি স্পষ্ট সঙ্কেত রহিয়াছে—বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ। বস্তুতঃ 'কর্ণমল' এই শব্দটিই এ মহারহস্য-পেটিকার চাবিকাটি। তারপর ব্রহ্মা যোগনিদ্রার প্রবোধনের জন্য যে স্তব করিলেন, তাহা যে মুখ্যতঃ বাগ্‌দেবতার, শব্দব্রহ্মের স্তব; ব্রহ্মা শব্দব্রহ্ম হইবার জন্য পরমা বাকের স্তুতি করিতেছেন—সাধক তাঁহার সিদ্ধিকে বরণ করিয়া লইতেছেন। "ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারস্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।" ইত্যাদি স্তব শুনিয়া আর সংশয় থাকে কি, কিসের এ স্তব, কেন এ স্তব?

সেদিন আমরা গঙ্গার গোলোকধামে উৎপত্তি, ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থিতি, হরজটাজালে অবগুণ্ঠন এবং শেষকালে গোমুখীদ্বারে ভূতলে অবতরণ—এই আখ্যায়িকাটিরও শব্দ-পক্ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি। গোলোক ও গোমুখীর 'গো' শব্দ সেখানে আমাদের নির্দ্দেশসূত্র (guiding clue); আর ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া অগ্রসর হইতে হইতে এই মহারহস্যটিরই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে গঙ্গা বেদশব্দ-ময়ী; ভগীরথের ঐ শঙ্খধ্বনিত শব্দসঙ্কেত; এবং তাহাই গঙ্গামাহাত্ম্যের মর্ম্মকথা আমাদিগকে ডাকিয়া শুনাইয়া যাইতেছে। গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে বেদশব্দধারা, বীজ-মন্ত্রসমষ্টি কতক কতক তোমার আমার কাণে আসিয়া পৌছিতেছে; কর্ণমলের দরুণ তাহার বিকৃতি ও সঙ্কর অবশ্যই কিছু হইয়াছে; কিন্তু গুরুশিষ্যের অবিচ্ছিন্ন

সম্প্রদায় না থাকিলে বীজশব্দগুলির যতটা বিকৃতি ও সঙ্কর হইত, সম্প্রদায় থাকায়, ততটা হইতে পারে নাই। আমাদের প্রচলিত শব্দগুলির নানাকারণে বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ হওয়ায় একটা রোগ আছে। সেদিন চিত্র আঁকিয়া এ রোগের একটা নিদান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। কর্ণমল ও রসনামলের মাহাত্ম্যে আমাদের শ্রুত ও উচ্চারিত শব্দগুলি গোল পাকাইয়া ক্রমশঃই ভেজাল ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে। শব্দ যত অস্বাভাবিক হইবে ততই তাহা অশক্ত ও অসমর্থ হইতে থাকিবে। শব্দ হইবে অথচ বিষয়ের কোনও ঠিকানা থাকিবে না, বকিয়া মরিব কিন্তু অর্থ অদৃষ্টে যুটিবে না। এইরূপ অসমর্থ (uncreative) শব্দ লইয়া জীবন-যাপন ঝকমারি, সাধন ও সিদ্ধি ত দূরের কথা। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ভগবান্ যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন, একথা তাঁর নিজমুখে শুনিয়াছি। ধর্ম্মের ও সদাচারের একটা আদর্শ (standard) আবার বাহাল করিয়া দিতে, তাঁহার আমাদের এই কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ। বিষ্ণু আসিলেন কিন্তু তাঁহার পাদোদ্ভবা গঙ্গা আসিলেন না, এমনটা হয় না। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসিলেন বিষ্ণু; আর শব্দ-বিভ্রাট্ দূর করিয়া স্বাভাবিক ও সমর্থ শব্দসমষ্টির ধারা পুনঃ বহাইয়া দিয়া জীবের সুখদা মোক্ষদা হইবার জন্য আসিলেন গঙ্গা। স্বাভাবিক শব্দ ও বীজমন্ত্রগুলি হারাইয়া ফেলিলে জীব তার অন্তরাত্মার ইষ্টদেবতার জন্য মণিমণ্ডপ, রত্নসিংহাসন গড়িবে কি দিয়া? কপিল আদিবিদ্বান্ শ্রুতি বলিতেছেন; তাঁহা হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় স্বাভাবিক শব্দরাশি, নিখিল বেদ প্রবাহিত হইতেছে; সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেই কল্যাণ ও চরিতার্থতা। সগরপুত্রগণ মদোদ্ধত হইয়া সেই আদি বিদ্বানের অবমাননা করিল, ধর্ষণা করিল; মানুষ, সেই আদি বিদ্বান্ হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্বাভাবিক শব্দ ধারা গুরুশিষ্যপরম্পরায় বহিয়া আসিতেছে, তাহাকে উপেক্ষা করিল, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইল; বলিল—"আমরা শ্রুতি-স্মৃতি মানিতে যাইব কেন? বেদ যাহাকে স্বাভাবিক শব্দ বলিতেছে সেটাই যে স্বাভাবিক শব্দ তার প্রমাণ নাই; আমাদের চলিত শব্দেরই বা দোষ কি? আমরা এইগুলির দ্বারাই কাজ চালাইব।" এই অবিচারপূর্ব্বক, অপরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্রোহের ফলে শব্দসঙ্কর ও শব্দবিভ্রাট্ সীমা উপ্‌চাইয়া ভয়ানক হইল। সম্প্রদায়ে (tradition এ) ও শব্দসঙ্কর ছিল, তবে তার বাড়াবাড়ি হইতে পারে নাই, এবং সেটাকে সারিয়া লওয়ারও একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সম্প্রদায় মানিব না বলাতে, শব্দ-সঙ্কর আর ছাড়াইয়া গেল; সেরূপ শব্দসঙ্করের ফল নিষ্ফলতা, বৈয়র্থ্য। ইহাই সগরপুত্রগণের ভস্মত্বপ্রাপ্তি, জীবসাধারণের পাতিত্য। ভগীরথ তপস্যা করিয়া, আবার সেই বীজশব্দময়ী সনাতনী বেদবাণীকে মঙ্গল-ভৈরব শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে এই পতিত ধরায় বরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। পথিমধ্যে জহ্নুমুনি একবার সেই পুণ্যতোয়াকে পান করিয়া আবার বাহির করিয়া দিলেন, পদ্মাসুর পথ ভুলাইয়া অন্য পথে লইয়া যাইতে গেল। স্বাভাবিক শব্দ-রাশির মর্ত্ত্যে বাহাল থাকিয়া আমাদের চতুর্ব্বর্গ সাধন করার পথে দুইটি প্রধান বিঘ্ন বা অন্তরায়। বিস্মৃতি ও বিকৃতি। ভুলিয়া গেলে চলিবে না, আবার রূপান্তরিত, বিকৃত করিয়া ফেলিলেও চলিবে না। জহ্নুমুনি প্রথমটার সঙ্কেত, পদ্মাসুর দ্বিতীয়টার সঙ্কেত। তবে জহ্নুমুনি কেওকেটা নহেন, তাঁহার বিস্মৃতি যোগবিস্মৃতি, নির্ব্বীজ সমাধিতে, তুরীয়ভাবে যে প্রকার বিস্মৃতি হয় সেই প্রকার বিস্মৃতি। সে ত অশব্দের অবস্থা, সে অবস্থায় শব্দের, এমন কি স্বাভাবিক শব্দেরও, কি স্মরণ থাকে? ইহা হইল শেষ থাকের অনুভূতি; ইহার সহিত নীচের থাকের অনুভূতিগুলির সম্বন্ধ একটা চিত্র-সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিলে লাভ বই ক্ষতি নাই।

ক সাধারণ অনুভূতি (Normal of Experience)
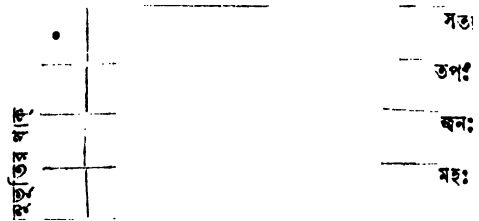
ক-রেখা আমাদের সাধারণ-অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Normal Experience)। খ-রেখা যোগীদের অনুভূতির দ্যোতক রেখা (Curve of Yogik Experience)। গ-রেখা এমন এক উচ্চ থাকের অনুভূতি বুঝাইতেছে, যেখান হইতে আর পুনরাবৃত্তি না হইতেও পারে। আত্মা সত্যস্বরূপের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই 'শরবত্তন্ময়' হইয়াই থাকিয়া গেলেন, তাহার সংবাদ বহন করিয়া নিম্নলোকে আর নামিয়া আসিলেন না। আবার কোনও আত্মা অমৃতের আস্বাদ পাইয়া আমাদিগকে তাহার কথা শুনাইবার জন্য সাধ করিয়া যেন আমাদের থাকে নামিয়া আসিলেন—শাস্ত্র রচিয়া জীবশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা ও মন্ত্রবক্তা ঋষি। ইঁহারাই গুরু। গ-রেখা দ্বারা এমন এক আত্মার গতি ও পদবী আমরা দেখাইয়া দিলাম, যিনি আর নামিয়া আসিলেন না। ঘ-রেখায় পাইতেছি ঋষি, পূর্ব্বাচার্য্য ও গুরুবর্গকে। অনুভূতির একটা মুখ্যধারা শব্দ। সুতরাং শব্দের নানন্ থাক্ বুঝাইতেও এই চিত্রের ব্যবহার চলিবে। জহ্নুমুনি বেদশব্দ রাশি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া যদি তাহা শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে চালাইয়া না দেন, তবে ত ধারা ঐখানেই থামিয়া গেল; আমাদের মত ভস্মত্বপ্রাপ্ত সগরসন্ততিগণের উদ্ধারের ত কোনও ব্যবস্থা হইল না। তাই জহ্নুমুনিকে জঙ্ঘা চিরিয়া আবার গঙ্গাজীকে বাহির করিয়া করিয়া দিতে হইল। 'জঙ্ঘা' বলিতে উত্তমাঙ্গ হইতে অধমাঙ্গে অবতরণ—উচ্চ থাক্ হইতে শিষ্য-সম্প্রদায়-কল্যাণ-কামনায় নিম্ন থাকে নামিয়া আসা বুঝান হইল। পদ্মাসুরের পিছন পিছন গিয়া আমাদের আর পথভ্রষ্ট হইবার প্রয়োজন নাই। সাধক-সম্প্রদায়-প্রবাহটাকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য, বেদশব্দের গ্লানি ও শব্দসঙ্করের অভ্যুত্থান নিবারণ করিবার জন্য, ভগীরথের তপস্যাকে সূত্র ও উপলক্ষ্য করিয়া, সনাতন শব্দমালার আমাদের লোকে যে অবতরণ, তাহাই গঙ্গার আবির্ভাব—এই মূল কথাটি উপাখ্যানের ভিতর হইতে স্পষ্ট হইয়া উঠিল না কি? পরশব্দ, শব্দতন্মাত্র, সূক্ষ্মশব্দ ও স্থূলশব্দ, এই কয়টি ধাপে ধাপে শব্দ যে আমাদের লোকে (plane-এ) নামিয়া আসে, তাহার সন্ধান এই আখ্যায়িকার মধ্যে আমরা পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। 'সনাতন শব্দমালা শুনিয়া নাস্তিক মহাশয় যেন চমৎকাইয়া না উঠেন। ইহা একটা সংজ্ঞা, যেমন গণিত শাস্ত্রের অনেক সংজ্ঞা। সংজ্ঞাটি এই:—যে কোনও দ্রব্যের মূলে অবশ্যই একটা শক্তিব্যূহ (System of Constituting Forces) রহিয়াছে। যদি সেই শক্তিব্যূহ জনিত চাঞ্চল্য কোনও পারমার্থিক শ্রবণসামর্থ্যের কাছে শব্দরূপে ধরা পড়ে, তবে সেই শব্দই সে দ্রব্যের স্বাভাবিক শব্দ, বীজমন্ত্র বা বৈদিক শব্দ। বলা বাহুল্য, লক্ষণ মানিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, এ প্রকার শব্দের সহিত তাহার বিষয়ের বা অর্থের সম্বন্ধ নিত্য বা সনাতন। কোনও দ্রব্যের তিনটি বিন্দু সংযুক্ত করিয়া, ধর, একটা সরলরেখা পাইলাম; এখন দ্রব্যটি স্থিরই থাকুক আর চলিয়াই বেড়াক, তাহার সেই তিনটি বিন্দু যদি এক সরল-রেখাতেই বরাবর থাকিয়া যায়, তবে সেই দ্রব্যকে গণিতের পরিভাষায় কঠিন দ্রব্য (Rigid Body) বলে। সত্য সত্যই সেরূপ কোন জড়দ্রব্য আছে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তার কোন মনগড়া (*a priori*) উত্তর দেওয়া যায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও, স্ব স্ব অর্থের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনে বদ্ধ ('বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' উপমা দিবার জিনিষ হইয়া আছে) কোনও স্বাভাবিক শব্দমালা সত্যসত্যই আছে কি না, তাহারও কোনও মনগড়া উত্তর দেওয়া যায় না। ইহারও সত্যতা পরীক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের কিন্তু লক্ষণ ও পরিভাষা করিতে কোনই বাধা নাই। কেন এইরূপ পরিভাষা করিতেছি তাহার কৈফিয়ৎ পূর্ব্বপ্রবন্ধে বোধ হয় কতকটা পরিষ্কার হইয়াছিল। নাস্তিক মহাশয়ের সঙ্গে আপাততঃ আমরা আর আলাপ করিব না। মধুকৈটভবধ ও গঙ্গার ভূতলে অবতরণ, এই দুইটা বৃত্তান্তের মধ্যে আমাদের শব্দ তত্ত্বের অনেক মর্ম্মকথা আমরা টানিয়া বাহির করিতে পারিলাম। উপাখ্যানের যে যে অংশে শাস্ত্রকারেরা রহস্যোদ্ঘাটনের চাবিকাটিটি ফেলিয়া রাখিয়াছেন, সেই সেই অংশ হাতড়াইয়া আমরা একবারে বিফলমনোরথ হই নাই। পূর্ব্বোপাখ্যানে 'কর্ণমল' শব্দটি এবং পরের উপাখ্যানে 'গোমুখী' প্রভৃতি শব্দ না পাইলে, আমাদের তথ্যান্বেষণ সহজ ও সফল

হইত না। "গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি"—গঙ্গা সলিলে অবগাহন করিয়া এই মন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে গঙ্গার মন্ত্রাত্মিকা মূর্ত্তিটিই উজ্জ্বল হইয়া হৃদয়ে জাগিয়া উঠে; মন্ত্র বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেই তাহা অর্থসফলতায় ধন্য হইয়া উঠিবে, এই মহাসত্যটিই আমাদের বুদ্ধিতে ভাসিয়া উঠে। তবে আশঙ্কা হয়, কলির প্রভাবে শব্দসঙ্কর, শব্দবিকার ও শব্দ-সঙ্কোচ যে-মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে গুরুপরম্পরাগত স্বাভাবিক শব্দমালা গঙ্গারূপে এই মেদিনীমণ্ডলের কলুষ-কলঙ্ক ক্ষালন করিতে, সাধকের যোগক্ষেম বহন করিয়া আনিতে, আর বেশী দিন বুঝি থাকিবেন না। ভগবানের মীনকলেবরে বরাহমূর্ত্তিতে যে পুনঃ পুনঃ বেদ সমুদ্ধার, প্রলয়পয়োধিজলে বটপত্রে শয়ান হইয়া তাঁহার যে বেদ রক্ষা—সে সকল কথার তলাইয়া আলোচনা করিতে যাইলেও আমরা শব্দতত্ত্বেই গিয়া উপনীত হইব। তবে সে আলোচনার অবসর আজ আর আমাদের নাই। মোটামুটি উপাখ্যান দুইটির যতটুকু আলোচনা আমরা করিতে পারিলাম, তাহাতে, আশা করি, আমাদের বেদ-পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি যে একেবারে গুলির আড্ডায় রচিত হইয়াছে, এরূপ মনে করিতে নাস্তিক মহোদয়েরও কতকটা দ্বিধা অতঃপর হইবে।

আমাদের দেওয়া শব্দের বিবরণটি শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কতটা কাছে বা দূরে রহিয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিজের বিশ্বাস, বড় বেশী দূর দিয়া যায় নাই। দুই-একটা পরিভাষা পণ্ডিত মহাশয়দের দেওয়া পরিভাষার সঙ্গে হয় ত ঠিক খাপ্ না খাইতে পারে। পরশব্দকে 'পরশব্দ' বলিবার ভিত্তি কি? আমরা যাহাকে শব্দতন্মাত্র বলিলাম তাহাই কি আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুমোদিত শব্দতন্মাত্র?—এইরূপ দুই-একটা পরিভাষা-সংক্রান্ত প্রশ্নের ঠিক্ উত্তর, কি দিব, সে বিষয়ে হয় ত কতকটা ভাবনা হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্ হইতে অগ্রসর হইয়া সার জন উড়রফ আমাদিগকে বেদ-শব্দের ও মন্ত্রের যে লক্ষণ ও ব্যাখ্যান দিলেন, তাহা আদৌ শাস্ত্রের দিক্ মাড়াইল না, একথা বলিলে, আমার বোধ হয়, কতকটা আনাড়ীর মত কথা বলা হইবে। দর্শনগুলিসম্বন্ধে যাহাই হউক, উপনিষৎ বা অধ্যাত্মশাস্ত্র নৈয়ায়িক মহাশয়ের ফরমাইশ-মত ঠিক্ চলেন নাই। শিশু জিজ্ঞাসা করিল—পৃথিবী কেমনধারা পথে সূর্য্যের চারিধারে পাক্ দিতেছে? আমি তাহাকে বলিলাম—বৃত্তের মত গোলাকার পথে। কিন্তু পথ ত ঠিক বৃত্তের মত নয়; শিশু বড় হইলে, তার বুদ্ধি আরও একটু পরিপক্ক হইলে, আমি ভুল সংশোধন করিয়া দিলাম; বলিয়া দিলাম যে পথটি বৃত্ত নহে, বৃত্তাভাস (ellipse)। বিশেষজ্ঞেরা জানেন যে এখানেও অব্যাহতি নাই, প্রয়োজন-মত আরও সংশোধন করিয়া লইতে হয়। অধ্যাত্মশাস্ত্রেও এইরূপ। শিষ্যের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইল, গুরু বলিলেন, 'তুমি যে অন্ন খাইতেছ তাহাই ব্রহ্ম'। পরে সংশোধন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণ ব্রহ্ম'। এইরূপে শিষ্যের অধ্যাত্ম-দৃষ্টি যতই প্রস্ফুটিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহাকে গুরু ব্রহ্মের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিলেন; 'ব্রহ্ম' শব্দটা বাহাল রাখিলেন, কিন্তু তাহার লক্ষণ ক্রমশঃ বদ্‌লাইয়া দিতে লাগিলেন; শেষকালে শিষ্য আপনিই উপলব্ধি করিলেন যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। একই শব্দের এই পাঁচটা লক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি ফেলিয়া রাখিলে নৈয়ায়িক মহাশয়ের শিরঃপীড়ার গুরুতর কারণ অবশ্যই ঘটিবে, কিন্তু যেখানে সাধকের বুদ্ধি ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া একটার পর আর একটা, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর, লক্ষণ আবিষ্কার করিয়া লইতেছে, সেখানে আগাগোড়া একটা শব্দই বাহাল রাখিলে ক্ষতি নাই; বরং তাহাই স্বাভাবিক। ব্রহ্ম কি—আত্মা কি—তাহাই আমি জানিতে চাহিয়াছি; আমার জানা ক্রমশঃই হয় ত গভীরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকিবে; কিন্তু আমার অনুসন্ধান অন্বেষণের জিনিষ ত একই রহিয়াছে—ক্রমশঃ তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে ও ধরিতে পারিতেছি মাত্র। এ ক্ষেত্রে আমার অন্বেষণের সামগ্রীর নামটা বদ্‌লাইয়া না ফেলাই ভাল। তাই, অন্নই ভাবি, আর প্রাণই ভাবি, আর মনই ভাবি, আমি খুঁজিতেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে। যেমনটা বুঝিতেছি তেমনটা লক্ষণ দিতেছি। অধ্যাত্মশাস্ত্রের ইহাই

রীতি। অরুন্ধতী-দর্শনন্যায়। নধোঢ়া বধূকে পাতিব্রত্যের নিদর্শনস্বরূপ অরুন্ধতী-নক্ষত্র দেখানর প্রথা পূর্ব্বে ছিল। অরুন্ধতী কিন্তু ছোট তারা, সহজে দেখা যায় না। তাই নিকটের একটা স্থূল, উজ্জ্বল তারার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বধূকে বলিলেন—'ঐ দেখ অরুন্ধতী'। যখন বধূর দৃষ্টি তাহাতে সুস্থির হইল তখন আবার স্বামী বলিলেন—না ওটা নয়, উহার নিকটে যে ছোট তারাটি রহিয়াছে, উহাই অরুন্ধতী'। অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই রীতিতে আমাদের আত্ম-সাক্ষাৎকারের পথপ্রদর্শক হইয়া থাকেন। শব্দ একটা, তার পরিভাষা পাঁচ রকমের। যাঁহারা উপনিষৎগুলি ভাল করিয়া ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে 'আকাশ', 'প্রাণ', 'বায়ু' প্রভৃতি শব্দের পরিভাষা ও প্রয়োগ পূর্ব্বোক্ত অরুন্ধতী-দর্শন-ন্যায়ে হইয়াছে। শেষ শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মবস্তুই লক্ষ্য, কিন্তু তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বলিয়া, এই শব্দগুলির মোটা মোটা লক্ষণগুলি আদৌ আমাদের সম্মুখে উপনীত করা হইয়াছে। এই নজিরে সার জন উড্রফ চৈতন্যের সম্পন্দ চঞ্চল অবস্থাটাকে পরশব্দ বলিয়া অন্যায় করেন নাই। বিশেষতঃ শ্রুতি জগৎ-প্রবাহকে যে শব্দপূর্ব্বক বলিতেছেন তাহা মূলতঃ স্পন্দন বা চাঞ্চল্য বই আর কিছুই নহে। সাম্যাবস্থার (cosmic equilibrium এর) অবসানে যে বৈষম্যের প্রথমোন্মেষ (initial cosmic dis-equilibrium) তাহাকে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কি বলিব? সাংখ্যকার প্রকৃতি এবং শব্দতন্মাত্রের মাঝে যে মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার নামক দুইটা তত্ত্ব বসাইয়াছেন, সে দু'টাকে জড়াইয়া, পরশব্দ বলিলে দোষ হয় না; কারণ, সে তত্ত্ব দুইটা বৈষম্যাত্মক এবং বিক্ষোভাত্মক; এবং আমাদের পরিভাষা মত, বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্যই পরশব্দ। শ্রুতি ঈক্ষণাপূর্ব্বক শব্দতন্মাত্র ও আকাশের সৃষ্টি করিতেছেন; আমরা সেই ঈক্ষণাকে পরশব্দ বা 'পশ্যন্তীবাক্' বলিতে পারি না কি? বলা বাহুল্য, আমরা শব্দের দিক্ হইতেই হিসাব লইতেছি। ইহাই সৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা ইহাকে পরশব্দ বলিয়া নৈয়ায়িকের কাছে হয় ত দোষ করিলাম, কিন্তু শ্রুতির রীতি-পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া যাইলাম কি? শব্দতন্মাত্র-সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা আর করিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন, আমাদের লক্ষণমত, ইহা বিশুদ্ধ স্বাভাবিক শব্দ—নিরতিশয় শ্রবণ-সামর্থ্য দ্বারা গৃহীত শব্দ।

স্বাভাবিক শব্দের কিভাবে পরীক্ষা লইতে হইবে, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছি। দ্রব্য ও অর্থ থাকিলেই যে শব্দ থাকে (অবশ্য পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত), এবং যে শব্দ থাকিলেই তাহার অর্থ নিশ্চিত হইয়া যায় (অবশ্য বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে), সেই শব্দই স্বাভাবিক শব্দ। ইহাই স্বাভাবিক শব্দের পরীক্ষা (test)। স্বাভাবিক শব্দ-সম্বন্ধে আর দুইটি আসল কথা বলিয়া আমরা আপাততঃ বিদায় লইব। প্রথম কথাটি এই। লাটিম ঘুরিতেছে, তার ঘোরাটা অবশ্য একটা অক্ষের (axis of rotation এর) অবলম্বনে হয়; আমাদের পৃথিবীও একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া পাক খাইতেছে। চুরুটের ধোঁওয়া পাক দিতে দিতে উপরে উঠিতেছে, এইরূপ পাক দেওয়াও অবশ্য-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। হেল্মহোল্জ ও লর্ড কেল্‌ভিন্ মনে করিতেন যে অণুগুলি ঈথারসাগরে ঐরকম এক-একটা আবর্ত্ত। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাদের আবর্ত্তনও এক-একটা অক্ষ আশ্রয় করিয়াই হইতেছে। ইলেক্‌ট্রনগুলা অণুর (atom এর) ভিতরে নাকি পাক খায়—সেখানেও তবে অক্ষ ভাবিয়া লইতে আমাদের অধিকার আছে। যেখানে গতি কেবল একদিকে সোজাসুজি চলিয়া যাওয়া, সেখানে সেই গতির রেখাটিই অক্ষ। যেখানে আবর্ত্তন (rotation) সেখানে অক্ষ সেই রেখাটি, যার চারিধারে এবং যার আশ্রয়ে আবর্ত্তন হইতেছে। গাড়ীর চাকার অক্ষ যেমন। যে দুই প্রকারের গতি বলিলাম, সেই দুইটার বিবিধ সংমিশ্রণে সকল প্রকার গতি হইতেছে। এইজন্য অক্ষের সাহায্যেই সকল প্রকার গতির হিসাব আমাদের লইতে হয়। গণিত-শাস্ত্র অক্ষের সাহায্যে (co-ordinate axes এর সাহায্যে) গতির (curve of motion এর) বিশ্লেষণ ও বিবরণ দিতে গিয়া নিতান্ত আজগবি একটা কিছু করিয়া বসেন নাই। তাই আমাদের বলিতে সাহস হয়, অক্ষের কথা গত্যাত্মক এই জগতের গোড়ার একটা কথা। গতির

পরীক্ষা করিয়া ইহা আমরা পাইলাম। পদার্থসমূহের, বিশেষতঃ সজীব পদার্থসমূহের উৎপত্তি কিরূপে হইতেছে, তাহা যদি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি, তবে আমরা অক্ষ (axis of generation) জিনিষটাকেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই। গাছ হইতেছে—একটা মূলকাণ্ডকে অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে; একটা পাতা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, একটা মুখ্য শিরাকে অবলম্বন করিয়া শত শত শিরা প্রশিরা পত্রাবয়বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অতএব এখানে অক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে। একটা লতা এই বর্ষার রসে বাড়িয়া গাছ ছাইয়া ধরিয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখিব একটা মূল অক্ষের আশ্রয়ে লতার নানাদিকে নানা ফেঙ্ড়া বাহির হইয়াছে। একটা মূল (primary) অক্ষ; তাহা হইতে আবার কত গৌণ (secondary) অক্ষ বাহির হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ পরীক্ষা করিলে দেখি মেরুদণ্ড (Spinal axis) কে আশ্রয় করিয়া স্নায়ুজাল সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাণনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছে। ভাইজ্মান প্রভৃতি জীবতত্ত্ববিদেরা আমাদের বলিয়াছেন যে বংশপরম্পরায় একটাই বীজপদার্থ (Germ plasm) বরাবর বহিয়া যায়; তোমাতে আমাতে তাহার অল্প-বিস্তর বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু আমাদের ভিতর বংশগত বীজটি, তাহার নিজস্ব প্রকৃতিটিকে প্রায় অবিকৃত ও অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াই, বহিয়া যায়। আমার পিতামহ, পিতা ও আমি একই অক্ষকে আশ্রয় করিয়া লতার নানা ফেঙ্ড়ার মত এদিক-ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু আমাদের সকলকে একসূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিতে বংশধারা, লতার মুখ্য অক্ষ-দণ্ডটির মত, অবিচ্ছিন্নভাবেই বহিয়া যাইতেছে। আমার উৎপত্তি, আমার পিতার উৎপত্তি এই অক্ষকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছে। আর দৃষ্টান্ত লইব না, তবে কথাটা দাঁড়াইল যে, অক্ষ জিনিষটা সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি ব্যাপারে গোড়ার কথা। অক্ষ, মুখ্য বা গৌণ হইতে পারে—লতার দৃষ্টান্তে, মূল অক্ষ ছাড়া, ফেঙ্ড়াগুলিরও ছোট ছোট অক্ষ আছে। এখন সমস্যা এই—জগতে বিচিত্র শব্দ রহিয়াছে; নানা জীবের নানা শব্দ; নানা জাতির নানা ভাষা; তোমার আমার শব্দও ঠিক এক নহে; বিশ্বে এই শব্দ-বৈচিত্র্যের উৎপত্তি—নানাপ্রকার ভাষার উৎপত্তি—কি কোনও অক্ষ আশ্রয় করিয়া হয় নাই; ধ্বনিবৈচিত্র্যগুলি ভাল করিয়া খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে তাদের মধ্যে আমরা কি কোন কোনও মূল শব্দের (primaries)আবিষ্কার করিতে পারি না? ফুরিয়ারের রীতিতে গণিতবিৎ যে কোনও জটিল ছন্দোবদ্ধ গতিকে (complex harmonic motion কে)সরল ছন্দোবদ্ধ গতিতে (simple hermonic motion এ) ভাঙ্গিয়া দেখাইয়া দিতে পারেন, একথা আপনারা ভুলিবেন না। বিরাট্ শব্দ-বৈচিত্র্যের ভিতরে আমরা কি একটা অবিচ্ছিন্ন মৌলিক শব্দ-ধারা আবিষ্কার করিবার আশা করিতে পারি? লতা টানিয়া তার মুখ্য মেরুদণ্ডটি আমরা যেরূপ বাহির করিয়া লইতে পারি, সেইরূপ? এ প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের সেরূপ আবিষ্কার করিতে পারাই উচিত; এবং তাহাই যদি হয়, তবে এটা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে,শব্দের এই বিরাট্ বিশ্বরূপ মূর্ত্তির যাহা মেরুদণ্ড (axis of generation), নিখিল শব্দরাশির যাহা মূল প্রকৃতি, তাহাই সেই স্বাভাবিক শব্দপ্রবাহ, বেদশব্দ ধারা, গঙ্গার আবির্ভাব, যাহার কথা এই দুই দিন ধরিয়া আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্"—এই অব্যয় অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে আমরা এতক্ষণে চিনিতে পারিলাম কি? প্রাজাপত্য-ভূমি হইতে আমাদের থাকে শব্দ প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, তাই অধঃশাখ এই বৃক্ষ। বৃক্ষের একটি মূলকাণ্ড অবলম্বন করিয়া চারিদিকে নানা শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পড়ে, পত্র পুষ্পাদি উদ্গত হয়, সেইরূপ প্রজাপতির স্বাভাবিক শব্দ বা বীজমন্ত্রগুলি নিম্ন ভূমিতে (lower plane এ) নামিয়া আসিতে গিয়া একটা মেরুদণ্ডের আশ্রয় লইয়াছে—সেই মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়াই নিখিল শব্দ-বৈচিত্র্য একটা মহা পাদপের মত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; সেই মেরুদণ্ডই হইল স্বাভাবিক শব্দধারা, যাহা গুরুপরম্পরাক্রমে কতক পরিমাণে আমাদের কাছেও পৌঁছিয়াছে। এ স্বাভাবিক শব্দ-ধারাই সকল শব্দের প্রকৃতি ও আশ্রয়।

সে ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষটিকে চিনিয়াছে, সে বেদ চিনিয়াছে—বস্তুৎ বেদ সে বেদবিৎ। যাবতীয় শব্দের সঙ্গে স্বাভাবিক শব্দের সম্বন্ধ এই প্রকার।

আরে একটা কথা। একটা চুম্বক লইয়া পরীক্ষা করিলাম। সেই চুম্বকটি যে শক্তিব্যূহ (field, lines of force) রচনা করিয়া রাখিয়াছে, আমরা পরীক্ষা দ্বারা সেই শক্তিব্যূহের (·lines of forceএর) একটা প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিতে পারি। বিজ্ঞানাগারে প্রত্যেক বালককে এইরূপে পরীক্ষা করিয়া চৌম্বক শক্তি ও তাড়িত শক্তির সমাবেশ বা সংস্থানের নক্সা আঁকিয়া ফেলিতে হয়। যে নক্সা খানা আমরা পাই তাহা সেই শক্তিব্যূহের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual representation)। এখন দেখুন, রং বা হং এক একটা বীজমন্ত্র। ইহারা এক-একটা শক্তিব্যূহের শাব্দিক প্রতিকৃতি। কথাটা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। কিন্তু সেই সেই শক্তিব্যূহের এক-একটা চাক্ষুষ প্রতিকৃতি (visual or optic equivalent) ও থাকিবে। চুম্বকের যেমন ধারা থাকে। আমরা ধরিতে পারি আর নাই পারি, আছে। চুম্বকের বেলায় যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনি পরীক্ষা দ্বারা সেই চাক্ষুষ প্রতিকৃতি আমাদের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়। ফল কথা, শব্দের দিক্ হইতে দেখিলে শক্তিব্যূহ যেরূপ স্বাভাবিক শব্দরূপে ব্যক্ত হয়, রূপের দিক্ হইতে দেখিলে, তাহা সেইরূপ স্বাভাবিক রূপভাবে ব্যক্ত হয়। শব্দের বেলায় যেমন পারমার্থিক কর্ণ, দিব্যকর্ণ ও ভৌতিক কর্ণ রহিয়াছে, রূপের বেলায়ও তেমনি পারমার্থিক চক্ষু, দিব্যচক্ষু ও ভৌতিকচক্ষু থাকিবে। স্বাভাবিক শব্দকে আমরা বলিয়াছি মন্ত্র, আর স্বাভাবিক রূপকে আমরা বলিতেছি যন্ত্র—যথা, শ্রী-যন্ত্র। বৈদিক যজ্ঞ এবং তান্ত্রিক হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে মন্ত্র যেমন চাই, যন্ত্রও তেমনি চাই; মন্ত্র ও যন্ত্রের "কুসংস্কার" এতক্ষণে আমরা একটু বুঝিতে পারিলাম, কি ?

আমরা এতক্ষণ ধরিয়া খাঁটি স্বাভাবিক শব্দের আলোচনাই করিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক শব্দের অর্থটাকে স্থিতিস্থাপক (elastic) মনে করিয়া সার জন্ উডরফ ইহার বেশ একটা শ্রেণীবিভাগও আমাদের দিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম আজও আমাদের আর অবকাশ নাই। সে শ্রেণী বিভাগের সামান্য একটু নমুনা দেখাইয়াই আজিকার মত, ক্ষান্ত হইব। অপর শব্দ লইয়া শ্রেণী বিভাগ করিতেছি।

অপর শব্দ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক (artificial)। কোন একটি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য আমরা অনেক সময় যদৃচ্ছক্রমে (' arbitrarily) কোন একটি বাচনিক সঙ্কেত (vocal sign) ব্যবহার করিয়া থাকি; যে সঙ্কেতটি ব্যবহার করিয়া থাকি, সেই সঙ্কেতটি ব্যবহার না করিয়া অন্য সঙ্কেত ব্যবহার করিলেও চলিত; যে নামে ডাকিতেছি সে নামেই ডাকার নিয়ত হেতু নাই। যেমন, আমরা কোন ব্যক্তিকে যদু বা হরি এই নামে ডাকিয়া থাকি। এই নাম অস্বাভাবিক কৃত্রিম বা মনগড়া নাম। বলা বাহুল্য আমাদের স্বাভাবিক শব্দ নামের যে লক্ষণ তাহা এ-সব ক্ষেত্রে নাই। নাম স্বাভাবিক হইতে হইলে তাহাকে পদার্থের সত্তা ও স্বরূপের সঙ্গে কোনও রূপ সম্পর্ক রাখিতেই যে নাম দিতেছি তাহার একটা হেতু বা কৈফিয়ৎ থাকিবেই। সুতরাং এ রকম নাম আমরা আমাদের খোস খেয়াল মত দিতে পারি না।

তারপর, স্বাভাবিক নাম আবার দুই প্রকার—নিরতিশয় ও সাতিশয়; প্রকৃত বিকৃত (pure এবং approximate)। পারমার্থিক কর্ণে শ্রুত শব্দতন্মাত্রই নিরতিশয় শব্দ; তাহাই শব্দের প্রকৃতি। শ্রবণ সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা নাই, এমন কর্ণে শ্রুত শব্দ সাতিশয় শব্দ; তাহা অল্প বিস্তর বিকৃতিপ্রাপ্ত; একবারে খাঁটি শব্দ নহে। দিব্য কর্ণ ও লৌকিক কর্ণ এই শব্দ শুনিতে সমর্থ। নিরতিশয় শব্দের পরিভাষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। সাতিশয় শব্দের শ্রেণীবিভাগ আমরা করিতেছি। কোন পদার্থ রহিয়াছে, তাহার মূলীভূত শক্তিব্যূহ সমষ্টিভাবে (as a whole) দিব্যকর্ণে যে শব্দ উৎপাদন করে, সে শব্দ সেই পদার্থের মুখ্য (primary) সংজ্ঞা। এইটি পদার্থের বীজমন্ত্র। যেমন অগ্নির মুখ্য নাম রং; আকাশের হং; প্রাণনক্রিয়ার হংস; ইত্যাদি। এইগুলি

মৌলিক অথবা যৌগিক (simple অথবা compound) হইতে পারে। রং পূর্ব্বোক্ত প্রকারের, হ্রীং বা ক্রীং শেষোক্ত প্রকারের। মৌলিক বীজগুলির সংযোগে বা সংমিশ্রণে যৌগিক বীজগুলি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পদার্থের শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে (specifically) আংশিকভাবে, ক্রিয়া করিয়া যে শব্দানুভূতি জন্মায় সে শব্দকে, সেই পদার্থের গৌণ (secondary) নাম বলা চলিবে। এ নাম বীজমন্ত্র নহে। ধর কাক ডাকিল; তাহার ডাক শুনিয়া তার নাম দিলাম কাক; এখানে যে শক্তিব্যূহ কাককে কাক করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই একটা আংশিক অভিব্যক্তি তাহার ডাকে; কাকের চলা-ফেরা, খাওয়া-বসা প্রভৃতি অপরাপর অভিব্যক্তিও রহিয়াছে; কাক শব্দও নানা রকমের করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, 'কাক' এই শব্দটা কাকের গৌণ স্বাভাবিক নাম। আবার কাক নিজেই ডাকে; কেহ তাহাকে ডাকাইয়া দেয় না। অতএব, তাহার শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত। ঢাকে কাটি দিয়া তাহার ধ্বনি শুনিলাম; ধ্বনি শুনিয়া তার নাম দিলাম ঢাক। এই নাম তাহার গৌণ স্বাভাবিক নাম। তবে এ ক্ষেত্রে শব্দ স্বতঃ-সম্ভূত নহে, পরতঃসম্ভূত। এই দুই স্থলেই শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রবণেন্দ্রিয়টাকে উত্তেজিত করিতেছে; কাকের শব্দ বা ঢাকের শব্দ আমি শুনিতেছি ও শুনিয়া নাম দিতেছি।

কিন্তু আমাদের অধিকাংশ শব্দ অন্য রকমের। অগ্নির মুখ্য স্বাভাবিক নাম বা বীজ রং। কিন্তু তাহাকে অগ্নি বলিতেছি কেন? অগ্নি জ্বলিলে তাহার লেলিহান্ শিখা এবং কুণ্ডলাকারে উর্দ্ধগামী ধূম আমরা দেখি; এই বক্রগতি বা আবর্ত্তের মত গতি বুঝাইতে চাই; তাহা করিতে গিয়া 'অগ্' ধাতু আমরা আবিষ্কার করি; তাহার উপর যথাযোগ্য প্রত্যয় করিয়া 'অগ্নি' শব্দ পাই। এই 'অগ্নি' শব্দ আমাদের চোখে দেখা অগ্নির একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইতেছে। শুধু 'রং, বলিলে এই ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বিশেষভাবে সূচিত হয় না। 'অগ্' ধাতু 'অ' ও 'গ' এই দুইটা বর্ণের সমাবেশে হইয়াছে; 'গ' খুবসম্ভবতঃ দিব্যকর্ণে শ্রুত বক্রগতির মুখ্য স্বাভাবিক নামের উপাদান। প্রত্যেক বর্ণ এক-একটা অর্থের (যোগ-ভাষ্যকারের মতে নিখিল অর্থের) মুখ্য নাম বীজ; এবং তাহাদের বিবিধ সংযোগ ও সংস্থান দ্বারা কোনও-একটা পদার্থের বা ক্রিয়ার মুখ্য স্বাভাবিক নাম হওয়া বিচিত্র নহে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করিব। একটা ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য 'অগ্নি'; অপরাপর ধর্ম্ম বা সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য সেইরূপ 'বহ্নি' (হুতদ্রব্য দেবতার উদ্দেশ্যে বহন করে), 'হুতাশন' 'বৈশ্বানর' (বিশ্বনর বা সর্ব্বজীবে পাচকাগ্নিরূপে বর্ত্তমান) প্রভৃতি নাম রহিয়াছে। কাকের ডাকের মত এগুলি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাণে শোনা'শব্দের অনুরূপ নহে। শক্তিব্যূহ ব্যষ্টিভাবে চক্ষু, ত্বক্ প্রভৃতি অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিকে চেতাইয়া কতকগুলি ধর্ম্ম ও সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের দিতে পারে—যেমন অগ্নির দৃষ্টান্তে বক্রগতি প্রভৃতি। সেই ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ধাতু, উপসর্গ, প্রত্যয়াদি লইয়া আমাদের এক-একটা নাম গড়িয়া লইতে হয়—আমরা নিজেরাই গড়িয়া লই, অথবা পরম্পরাক্রমেই প্রাপ্ত হই। এগুলিও খুবই প্রয়োজনীয় শব্দ। এগুলির যথাযথ সংযোগ সংস্থান করিয়া সমর্থ দেবমন্ত্র বা তান্ত্রিক মন্ত্র হইতে পারে। তবে এ বিরাট্ ব্যাপারের আলোচনায় আজ আর প্রবৃত্ত হইব না।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়।

কবি ও কাব্য

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

রবীন্দ্রনাথের কাব্যযুগে কবিতা রচনা করিয়া বাংলাদেশে যাঁহারা অল্প বিস্তর যশঃলাভ করিয়াছেন কবি যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথের মত তিনি আপনার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কারণ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের অনুপম কাব্যসৌন্দর্য্য। ভাব ভাষা ও ছন্দের অপরূপ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এমন নব নব কাব্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন যে রসজ্ঞ পাঠকগণ সহজে তাহা ছাড়িয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন না। সুতরাং ভারতের যে বাণীকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের দিব্য সংগীত সুধা বর্ষণ করিতেছে সেখানে স্বল্পপ্রতিভাশালী অন্য কাহারও বীণা-ধ্বনি উপযুক্ত শ্রোতা আকর্ষণ করে নাই।

ইহার দ্বিতীয় কারণ এই সকল কবির উপর রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ প্রভাব। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের যুগে এই প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রহিয়াছেন এমন গদ্য কি পদ্য লেখক আছেন কিনা অনেক সময় আমাদের মনে সন্দেহ হয়। শ্রদ্ধেয় আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন তাঁহার রচনাও অলক্ষ্যে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। বাংলা কবিতা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের এই প্রভাব বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত অধিক। কাব্যের যে সকল বাহ্য উপকরণ—ছন্দ, ভাষা ও উপমা (imageries), এমন প্রচুর পরিমাণে রবীন্দ্রনাথ তাহা বাংলা সাহিত্যে দান করিয়াছেন তাঁহার দিব্য অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতির এমন সূক্ষ্মতম স্পন্দন তিনি কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় এবং প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যকে অবলম্বন করিয়া এত অসংখ্য ভাব তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে এই সকল সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া কবিতা রচনা বর্ত্তমান কালে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহার imageries কবিতায় আসিয়া পড়িবেই তাঁহার ভাবও পরিকল্পনার ছায়াপাত অনেকটা অবশ্যম্ভাবী হইবেই। অধিকাংশ পাঠকই এই জন্য বিচার না করিয়া এই সকল বর্ত্তমান কবিতাকে রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অনুকরণ বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। রবীন্দ্রনাথের বাক্যের ধ্বনি কোনো কবিতায় শ্রবণ করিবামাত্র তাহা যে রসহীন অনুকরণ তাহাই ইঁহারা মনে করেন।

কিন্তু ইহা ন্যায় সঙ্গত নহে। সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির কবিতা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইঁহাদের বীণা নিক্কন না হইলে বঙ্গের সারস্বত উৎসবের অঙ্গহানি হইত। বাঙ্গালী পাঠক ইহাদিগকে সম্পূর্ণ আদর না করিয়া আপনাদের রসজ্ঞানের দীনতাই প্রকাশ করিতেছেন।

যতীন্দ্রমোহন 'লেখা' 'রেখা' 'অপরাজিতা' 'নাগকেশর' ও 'বন্ধুর দান' নামক পাঁচখানি কবিতাপুস্তক ক্রমান্বয়ে রচনা করিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের অধিকাংশ কবিতাই বাংলা দেশের কোনো না কোনো মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন বাংলা মাসিক পত্রের একজন নিয়মিত কবিতা লেখক। এই সকল কবিতা পুস্তকের মধ্যে 'বন্ধুর দান' পুস্তক খানির অধিকাংশ কবিতাই তাঁহার অন্যান্য পুস্তক হইতে গৃহীত; উদ্দেশ্য তাঁহার গাঁথা গুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করা। প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যারদিক দিয়া দেখিলে যতীন্দ্রমোহন তাঁহার সমসাময়িক অন্যতম কবি সত্যেন্দ্রনাথের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কাব্যের সৌন্দর্য্য বিচারে কে প্রধান তাহার তুলনামূলক সমালোচনা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না।

যতীন্দ্রমোহন খণ্ড কবিতা-লেখক। নানা অবস্থা ও ভাগ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার কবিতা রচিত হইয়াছে। কাব্যের শ্রেণীবিশ্লেষণ সহজ না হইলেও আমরা স্থূলভাবে তাঁহার কবিতাগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। যতীন্দ্রমোহনের কতকগুলি কবিতা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত; কতকগুলি প্রেম সম্বন্ধীয়, কতকগুলি গাথা, কতকগুলি বর্ণনাত্মক, কতকগুলি শিশু সম্বন্ধীয় এবং কতকগুলি নিরবচ্ছিন্ন কল্পনামূলক বা contemplative mood হইতে উদ্ভূত।

যতীন্দ্রমোহন রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা বিশেষতঃ যে গুলি প্রথমভাগে রচিত তাহার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। রেথার অনুশোচনা নামক কবিতাটী রবীন্দ্রনাথের 'ভ্রষ্টলগ্ন' স্মরণ করাইয়া দেয়। 'অভিযোগের'

যে সুখ আমি তোমাতে পাই
সে সুখ সখি তোমার কই
সে মোহ কোথা তোমার প্রাণে
যাহাতে আমি মোহিত হই।

প্রভৃতি পদগুলি পড়িলেই রবীন্দ্রনাথের 'আমার সুখ' কবিতার কথা পাঠকের স্বতঃই মনে হয়। নাগেশ্বরের 'প্রণাম' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'আবেদন'এর ছায়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারা যায়। 'ভুল' কবিতাটির—

ছিল একদিন চাহিলে যে দিন
নয়ন ভুলিত সব চাওয়া
* * *
আজ আর তবে চাহিয়া কি হবে
সেদিন স্মরণ করনি যে

[illegible] পড়িতেই রবীন্দ্রনাথের সেই "[illegible] বারে নয়নজলে" সংগীতটির—

[illegible]গের বাণী যদি হতো কানাকানি
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে?
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

প্রভৃতি পদগুলির কথা মনে পড়ে। তাঁহার 'ভ্রষ্টযাত্রা' ও 'সাধনার' প্রেরণা (inspiration) রবীন্দ্রনাথ হইতে লওয়া। 'পদ্মাতীরে' পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথের বলাকার কথা অনেক স্থানেই মনে হয়। (অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।) কবিতার ভাষা ও ছন্দ বিষয়েও যতীন্দ্রমোহনের ঋণ রবীন্দ্রনাথের নিকট অপরিশোধনীয়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অগৌরবের কোনো কারণ নাই; ইহাতে যতীন্দ্রমোহনের কাব্য রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ বলিয়া কোনো নিরপেক্ষ সমালোচকই মনে করিবেন না। যতীন্দ্রমোহনের স্বাধীন শক্তির ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে যথেষ্টই বিদ্যমান। শব্দ-যোজনায়, ভাবব্যঞ্জনায় লালিত্যে এবং আন্তরিকতায় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের পর যতীন্দ্রমোহনের স্থানই সর্ব্বোচ্চ।

যতীন্দ্রমোহন খণ্ড কবিতা লেখক। খণ্ড কবিতার লক্ষণ হইতেছে কোনো একটা বিশিষ্ট অবস্থা বা ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া তাহারা কবির প্রাণের বিশিষ্ট ভাব অনুভূতিকে প্রকাশ করে। এই অনুভূতি যে পরিমাণে কবির চিত্তকে অতিক্রম করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সংক্রমিত হইতে পারে কবির প্রাণের এই ভাব যে পরিমাণে বিশ্বমানবের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে কবিতার সফলতাও সেই পরিমাণে হয়।

কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিতার মধ্যে আমরা অনেকস্থলেই Lyric এর এই লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিতে পাই। শুধু ভাবের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে প্রথম শ্রেণীর lyric তাঁহার রচনার মধ্যে অধিক নাই তবে তাঁহার ভাবসম্পদ সর্ব্বত্র মহার্ঘ না হইলেও ভাব ও ছন্দ তাঁহার অতি মধুর। যতীন্দ্রমোহন সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই তবে তাহার সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সঙ্গীতের ধ্বনি (music) শুনিতে পাই যাহা বর্ত্তমান বাংলা কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কাহারও কবিতায় আমরা পাই না। ভাষার কর্কশতা অথবা ছন্দের পঙ্গুতা তাঁহার রচনার মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করিলেও আমরা প্রাপ্ত হইনা।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতার প্রধান বিশেষত্ব তাঁহার গভীর সহানুভূতি এবং আন্তরিকতা। তিনি যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত মন দিয়া তাহা দেখিয়াছেন, তিনি যাহা বর্ণনা

করিয়াছেন তাহাতেই "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" দিয়াছেন। কবিতার মধ্য দিয়া তিনি কোনো নীতি উপদেশ জ্ঞাতসারে প্রদান করিতে যান নাই অথবা সমালোচকের আসন গ্রহণ করেন নাই। কাব্য ও দর্শন যে পৃথক তাহা অনেক কবিই ভুলিয়া যান তাই তাঁহারা কবিতাকে কেবলমাত্র রূপক করিয়াই উপদেশ প্রচারের চেষ্টা করেন। আবার কেহ বা প্রকাশ্যভাবেই তত্ত্বকথা প্রচার করিতে গিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করেন। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে ইহাই প্রভেদ যে কাব্যে যদি কোনো তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে তবে তাহা রসের মধ্য দিয়া স্বতঃই unconsciously ফুটিয়া উঠে, আর দর্শনের মধ্যে তাহা যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে সজ্ঞান ভাবে ব্যক্ত হয়। কবি আপন প্রাণের গভীরতম অনুভূতির সাহায্যে যাহা প্রকাশ করেন তাহার মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া একটা সার্ব্বজনীন সত্যের ছায়াপাত হয়। শ্রেষ্ঠ কবি কখনই আপনার রচনার মধ্যে তত্ত্বকে প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেন না। 'জন্মাষ্টমী' 'মিলন' 'শ্মশান পারের সন্ন্যাস' 'আঁখি' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা ভিন্ন অন্যত্র যতীন্দ্রমোহনের দার্শনিকতা কাব্যের সীমা অতিক্রম করে নাই। কিন্তু শুধু দার্শনিকতা ও নীতি উপদেশ নহে, তাঁহার সমসাময়িক কবি সত্যেন্দ্রনাথের মত তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া কোনো একটা বিশেষ বাণী বা message ও আজ পর্য্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নাই lyric এর যাহা লক্ষণ তাহাই তাঁহার কবিতায় বর্ত্তমান তাঁহার অনেক কবিতাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইতে উৎপন্ন। কোনো একটা বিশিষ্ট অবস্থা বা ঘটনা হইত মানুষের মনে যে ভাব সঞ্চার হয় lyric এর কবি তাহাকেই ভাষা ও ছন্দের মধ্যে দিয়া ব্যক্ত করেন। যতীন্দ্রমোহনের কবিতাগুলি তাই জীবনের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র ও অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ ইহার অনেক গুলিতেই এমনই কাব্যরস জমিয়া উঠিয়াছে যে তাহার মধ্য দিয়া মানুষের প্রাণের এক একটী চিরন্তন ভাবের চিত্র অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার রেখার 'অনুশোচনা' 'সমুদ্র ফেনার প্রতি', অপরাজিতার 'বাতায়নের দীপ', নাগকেশরের 'কেয়াফুল' 'পদ্মাতীরে' 'বাঁশীওয়ালা' 'ভুল' 'বহ্নিশিখা' 'রথযাত্রা' "প্রেমোন্মাদ" প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর কবিতাগুলির সহিত ইহাদের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহাদের অনেকগুলির মধ্যেই ঠিক একটা সুস্পষ্ট অর্থ সর্ব্বত্র ব্যক্ত হয় নাই অথচ পাঠকের মনের উপর ইহারা এমনই একটা প্রভাব রাখিয়া যায় যে মনের সুপ্ততম তন্ত্রীগুলিও এক অপূর্ব্ব পুলকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। যতীন্দ্রমোহনের রচনার মধ্যে এইগুলিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল লাগে। বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার অবকাশ আমাদের নাই। যতীন্দ্রমোহনের পাঠকগণকে আমরা এইগুলিই সর্ব্বপ্রথম পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাদের ভাষা ভাব ও ছন্দ অধিকাংশ স্থানেই খুব সুন্দর হইয়াছে। 'সমুদ্র ফেনার প্রতি' কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়ে যে অনির্দ্দিষ্টের এবং অজানিতের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

'সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরাণ পাগল করা,
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে
যাবরে সেই অচিনদেশে
যেথা আছে নিখিল শেষে সকল শ্রান্তি হরা।

সেই যে 'অচিনদেশ' যাহার গোপন রহস্য চিরদিন মানুষের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে তাহার প্রতি উন্মাদনা যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় বিশেষভাবে অন্যত্র এমনতর ব্যক্ত হয় নাই। যতীন্দ্রমোহনের কল্পনা সাধারণতঃ অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যের সন্ধানে ছুটে না; তবে তাই বলিয়া দৃষ্ট স্থূল জগতের সীমার মধ্যেই তাহা যে সর্ব্বদা পরিতুষ্ট থাকে তাহাও [illegible]। [illegible] জড় ও চেতন—মানুষের নিভৃত হৃদয় মনে [illegible] করিয়া যে সূক্ষ্মতম আনন্দ জাগাইয়া তুলিতে [illegible] মোহন 'কেয়াফুল' 'পদ্মাতীরে' ও 'রথযাত্রা' প্রভৃতি কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি ধরিতে চাহিয়াছেন; এইজন্য একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থের গণ্ডীর মধ্যে ইহাদিগকে ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। ভরা শ্রাবণের 'বাদলের বিহ্বলতায়'

মাঝে নদীতীরে দুঃখিনী পসারিণীর আকস্মিক 'কেয়াফুল চাই' রবে চিত্তে যে ভাবের উদ্রেক হইয়াছে

—ঝর ঝর ঝরে জল
আঁখি করে ছল ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ—

তাহাকেই কবি 'কেয়াফুলের' মধ্যে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সায়াহ্নে পদ্মাতীরের প্রশান্ত গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কবি হৃদয়ে যে 'বিশ্বের অব্যক্ত বাণী ধ্বনি' উঠে কথাহীন গানে' তাহাকেই 'পদ্মাতীরে' কবিতায় প্রকাশিত করিয়াছেন। 'সাধনা' 'ভ্রষ্টযাত্রা' 'বাতায়নের দীপ' 'বহ্নিশিখা' 'দল ও পরিমল' প্রভৃতি খণ্ড কবিতাগুলিতে কবি ভাবকে একটী চিত্র অথবা রূপকের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। চিত্রগুলি বড় সুন্দর বড় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিশেষতঃ 'বহ্নিশিখা' ও 'বাতায়নের দীপ' আমাদের অত্যন্ত মধুর লাগিয়াছে। মানুষের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের প্রতি বাহিরের বৃহৎ প্রকৃতির যে চির ঔদাসিন্য "বাতায়নের দীপে" তাহাকেই প্রকটিত করিয়াছেন। ঐ বাতায়নের দীপ যাহা প্রতি 'সন্ধ্যায়' এবং 'স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে' গৃহটী আলোকিত করিত এবং "আপন সৌভাগ্যগর্ব্বে আপনি বিভোর" হইয়া যাহার রশ্মি স্মারা-নিশি ভোর হাসিত তাহা মুহূর্ত্তে 'রুষ্ট প্রকৃতির যেন অব্যর্থ আঘাতে' নিবিয়া গেছে। গৃহ অন্ধকার হইয়াছে। কিন্তু নিষ্ঠুর বিরাট প্রকৃতি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। আজো—

চামেলি ফুটিয়া ঝরে—চন্দ্র রহে চাহি
শিহরে খর্জ্জুরকুঞ্জ—পিক উঠে গাহি;
বাহিরে বৃহৎ বিশ্ব তেমনি চঞ্চল—
শুধু ঐ দীপখানি জ্বলেনা কেবল?

প্রকৃতির উদাসীনতার এই সংক্ষিপ্ত চিত্র বাস্তবিকই অতি মনোরম।

অশ্রু ও বেদনার মধ্য দিয়াই যে সর্ব্বত্যাগী প্রেমের প্রকৃত সার্থকতা তাহাই "বহ্নিশিখার" দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 'অঙ্গে অঙ্গে বিদ্যুৎ-জ্বালা হানিতে' থাকে, 'বেদনা-অশ্রু শিখারূপ' হইয়া জ্বলিতে থাকে—কিন্তু তবুও তাহাকে গ্রহণ করিয়াই প্রেম প্রিয়তমের স্পর্শ লাভ করিয়া জীবন-ধন্য করিতে চাহে। শুধু তার একমাত্র প্রার্থনা এই যে

হে মোর মরণ শেষ নিবেদন নির্ব্বানে শুধু তার—
ধূম-অঙ্কিত লাঞ্ছনা-কালী লিখোনা ললাটে আর;

যতীন্দ্রমোহনের রচনার মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের অনুভূতির পরিচয় তেমনতর নাই। লৌকিক জগতের স্নেহ প্রেম করুণা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি গুলির চিত্রই তিনি অধিক প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার গাথা গুলির সমুদয়ই এই চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের "তুলিই লিখন" এবং রবীন্দ্র-নাথের "কথা ও কাহিনী" ও আধুনিক গাথাগুলি ভিন্ন এ প্রকার কবিতা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে আর কেহ অধিক রচনা করেন নাই। গাথা রচনায় সফল হওয়া সহজ নহে। গদ্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র গল্পের ন্যায় ইহাতে অর্থ প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য।

যতীন্দ্রমোহনের অধিকাংশ গাথাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁহারই নূতন প্রচলিত অসম ছন্দে রচিত। কিন্তু সুখের বিষয় আপনার প্রতিভাবলে যতীন্দ্র-মোহন অনেকস্থলেই ইহাতে সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'মেঘরাজ' 'গৌরী' 'জটাই' 'বস্ত্রদান' প্রভৃতি গাথা অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু 'ময়না' 'ভক্তির জয়' 'রাখাল' প্রভৃতি গাথা আমাদের ভাল লাগে নাই। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়াই ইহাদের মধ্যে একটী অখণ্ড রস জমিয়া উঠে নাই। আশা করি যতীন্দ্রমোহন কাব্যের এই বিভাগে আরও অধিকতর কবিত্ব শ্রীত্বই প্রদর্শন করিবেন।

যতীন্দ্র মোহনের এই গাথাগুলির মধ্যে তাঁহার কবিতার যে প্রধান বিশেষত্ব তাহাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। সেটী হইতেছে তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি এবং পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতি ও রসসঞ্চার করিবার ক্ষমতা। কবিতার লক্ষণ কি তাঁহা লইয়া সমালোচকেরা চিরদিনই নানা মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ

কাব্যের অন্য লক্ষণ যাহাই হউক না কেন যাহা পাঠকের হৃদয়ে এই সহানুভূতি ও রসসঞ্চার করিতে না পারে আমরা তাহাকে প্রকৃত কবিতা বলি না। যতীন্দ্র মোহনের কবিতার বর্ণনার বিষয় যাহাই হউক না কেন তাঁহার কবিতার ভাব অনেক স্থলেই সাধারণ হউক না কেন তিনি সর্ব্বত্রই পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি নিজে যাহা অনুভব করিয়াছেন পাঠককেও তাহা অনুভব করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই অনুভূতি বড় প্রবল—তাঁহার হৃদয় বড় করুণ বড় সহানুভূতি পূর্ণ তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিও বড় তীক্ষ্ণ। হিন্দু বিধবার প্রাণের করুণ কাহিনী, অন্ধবধূর হৃদয়ের গভীর দুঃখ, আশ্বিনে নববধূর চিত্তে পিতৃগৃহের বেদনাময়ী স্মৃতি এ সকলই তিনি এমন নিপুনভাবে চিত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে পড়িবামাত্রই পাঠকের হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

যতীন্দ্রমোহনের বর্ণনাশক্তি উচ্চশ্রেণীর। তাঁহার বর্ণনার ভাষা ও ভঙ্গী অতি মনোরম। তিনি শুধু বস্তুর বাহ্যরূপটী বর্ণনা করিয়া সন্তুষ্ট হন না। অধিকাংশ স্থলে এই বাহ্যরূপটীর প্রতি তেমনতর মনোযোগই প্রদান করেন না।

অনেক কবিই বিস্মৃত হন যে কবিতা ঠিক ফটোগ্রাফ নহে। তাঁহারা মনে করেন যে বস্তুর প্রত্যেক অংশ সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করিলেই বর্ণনা সার্থক হইল। কিন্তু কাব্য এই অতিরিক্ত বাস্তব প্রীতির ফলে অধিকাংশস্থলেই বস্তুভারাক্রান্ত হইয়া নীরস হইয়া পড়ে। শ্রেষ্ঠ কবি তাহা না করিয়া বস্তুর অন্তরের রূপটীকেই ফুটাইতে চেষ্টা করেন তাই অনেক সময়ে দুই এক ছত্রেই তাঁহারা বর্ণনীয় বিষয়কে পরিস্ফুট করিতে সমর্থ হন। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় এই শক্তির আমরা পূর্ণ পরিচয় পাই। তিনি স্বল্পভাষী, অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর প্রায়ই তাঁহার মধ্যে দেখিনা, খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতে গিয়া কবিতাকে তিনি ভারাক্রান্ত করেন না। 'গোধূলি' 'সরোবরে সন্ধ্যা' 'জ্যোৎস্নাময়ী' 'শ্রাবণে' 'খেয়াডিঙ্গি' 'সন্ধ্যায় মিলন' 'সমুদ্রফেনার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা; অপরাজিতার 'কোজাগরী লক্ষ্মী' 'বিধবা 'বাতায়নের দীপ' এবং নাগকেশরের 'পদ্মাতীর' পত্র লেখা 'বঙ্গবধূ' 'রামায়ণ স্মৃতি' 'বঞ্চিতের বিদায়' প্রভৃতি কবিতাগুলির বর্ণনা অতি উচ্চ শ্রেণীর।

'সরোবরে সন্ধ্যা' কবিতাটীর ষোল ছত্রের মধ্যে সন্ধ্যার শান্ত স্তব্ধ মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য আশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

'শরাস্তৃত সরোবর ; তীরে তীরে তারি তালীবন শ্রেণী
শ্যামল-সরসী শিরে পদ্ম-বিভূষণা শৈবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী ধূসর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে
ঝিল্লির মঞ্জির মালা ঝিনি ঝিনি ঝিমি বাজে পায়ে পায়ে,

কবি ভাষার মধ্য দিয়া ঠিক যেন সন্ধ্যার মন্থর আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'খেয়াডিঙ্গি' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি না।—

পাটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙ্গা বাই
তবু আমার হাটের সাথে কোন বাঁধন নাই ;
শিরা-ওঠা খাটা হাতে হালের গোড়া ধরি
আমি শুধু আপন মনে এপার ওপার করি ;

* * * *

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে
রাঙাজলে এপার ওপার এক্‌সা করে দিয়ে ;
লগির গোড়া পায়না তলা, মিলেনা আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার ঘাটের ডিঙ্গা বই।
হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টলমলিয়ে ডিঙ্গা আমার চলে তারি কোলে।'

ছত্রগুলি পড়িতে পড়িতে কুলপ্লাবিনী বর্ষার একটি গভীর সৌন্দর্য্য ভরাবন্যার মাঝখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উদাসীন খেয়ামাঝির একান্ত অভ্যাস চালিত ডিঙ্গা বাইবার চিত্রটী আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে।

'বিধবা' কবিতার প্রথম চারি ছত্রেই কবি হিন্দু বিধবার ধ্যানস্তিমিত যোগিনীমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আঁচলে-ঝাপা দীপের মত তনুটী বেড়ি দুকূলে
রুক্ষকেশ এলায়ে পিঠে বক্ষে—
কে তুমি দেবি দেখাও আলো তুলসী বেদী দেউলে
নিত্য সাঁঝে নীরব নত চক্ষে ?
নামায়ে দীপ যুক্তকরে কিসের তব মিনতি
চাওয়ার তব কি আর হেথা আছে গো—
কণ্ঠ বেড়ি টানিয়া বাস্ কাহারে কর প্রণতি
দেবতা নিজে তোমারি কৃপা যাচে গো ?

বর্ণনাত্মক কবিতা সাহিত্যে ইহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বিধবার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা ও কামনাকে কবি ইহার মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমন্ত করিয়া দিয়াছেন। 'পত্র লেখা' কবিতাটীতে কবি বিরহিণী নারীর প্রিয়তমোদ্দিষ্ট সমস্ত তন্ময়তা ও প্রেম

'উদাস করুণ দৃষ্টি নিরাশায় ভরা ;
ব্যর্থতার বেদনায় পরিম্লান জরা—
বিপদ পাণ্ডুর মূর্ত্তি।

পাঠকের মানস নয়ন সার্থক করিয়া দিয়াছে। 'রামায়ণ স্মৃতি' ত একেবারে বাল্মীকির চিত্রপটের অনুরূপ রামসীতার প্রণয় বিরহের কাহিনীগুলি কবি নিপুন চিত্রকরের মত ভাস্বর তুলিকাপাতে আমাদের সম্মুখে পর পর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন 'বঙ্গবধূর' লজ্জানম্র প্রেমময় চিত্র বড় সুন্দর বড় মধুর হইয়াছে।

'পদ্মাতীরে' কবিতায় কবি পদ্মার গম্ভীর মধুর সৌন্দর্য্য অতি সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনটী ছত্রে সূর্য্যকিরণ মণ্ডিত পদ্মা-বক্ষের তরঙ্গচঞ্চল চিত্র কেমন মনোরম ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

মনে হয় ছোট ঐ উর্ম্মিমালা, প্রাতঃ সূর্য্যকরে
আলোকের কলহংস ভেসে যায় যেন কলস্বরে
লক্ষ লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি।

'আলোকের কলহংস'—স্বপ্নটী আমাদের বড়ই মধুর লাগিয়াছে। অল্প ভাষায় যতীন্দ্র মোহন কেমন সুন্দর বর্ণণা করেন তাহার আর একটীমাত্র দৃষ্টান্ত আমরা দিব।

বৈশাখী-দিবা, দ্বিপ্রহরে আলোক পাঁপড়িগুলি
একে একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়েছে ঢুলি
নিপর নিঝুমতন্দ্রা আহত নীলের বক্ষ চিরে
ক্লান্ত করুণ চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে

চারিটী লাইনের মধ্যেই নিদাঘ মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ক্লান্তির অবসাদ ভাবটী কবি প্রকাশিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কিন্তু তাঁহার কল্পনা আবার একটু অতিরিক্ত চড়িয়া গিয়াছে—বর্ণনা সেখানে অতি রঞ্জিত হইয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছে। আমরা কেবল মাত্র একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম—

সিঁদুরে আম টকটকে লাল
অস্তরবির আবির মাখি
ওষ্ঠে তোমার লজ্জা পেয়ে
সরম রাখে পাতায় ঢাকি।

অবশ্য কবিতাটীর ভাবের অনুরোধে অতিরঞ্জন একটু স্বাভাবিক—কিন্তু তবুও উহার পরিমান art এর সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে।

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া যতীন্দ্র মোহন বাগচিদের কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটীর মধ্যে তিনি একটী চিরন্তন রস সৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতত্ত্বপরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছেন। অধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যে মাইকেল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কবিই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জীবিত যুবক কবিদের মধ্যে কালিদাস ও যতীন্দ্র মোহনই এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফল হইয়াছেন। যতীন্দ্র মোহনের 'শিব সপ্তক' 'মথুরার রাজা' এবং 'রথযাত্রা' তাঁহার এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাদের ভাব, ভাষা ও ছন্দ সকলই অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে 'শিব সপ্তকের' স্থানে স্থানে কালিদাসের 'বিশ্ব ও বিশ্বনাথ' কবিতার একটু ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে কবিতাটী কবির নিজস্ব। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় অন্য কবিতা না লিখিলেও কেবল এই একটী কবিতাই যতীন্দ্র মোহনকে বাংলা সাহিত্যে যশস্বী করিতে পারিত। ইহাতে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া

শিবের যে সর্ব্বত্যাগী আত্মভোলা প্রেমময় রূপ কবি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনুপম। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা অবলম্বনে যে সকল কবিতা রচিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 'মথুরার রাজা' ভাব ভাষা সরলতা ও মর্ম্মস্পর্শিনী শক্তিতে অদ্বিতীয়, অতি উচ্চস্থানীয়। শ্রীকৃষ্ণ লীলার সেই চির পুরাতন কাহিনীর মধ্যদিয়া কবি মানুষের এমন একটী চিরন্তন প্রণয়গর্ব্বের ও অভিমানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে তাহা পাঠকের সুপ্ততম হৃদয়তন্ত্রী জাগাইয়া তুলে।

যতীন্দ্র মোহন যুবক কবি—প্রেমের কবিতা তাঁহার রচনার অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু যৌবন স্বভাব সুলভ প্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা ও মাদকতা দুই একটী কবিতায় ভিন্ন তাহার মধ্যে আমরা পাই না। তাঁহার প্রেমের চিত্র যে কয়েকটী দেখিতে পাই প্রায় সবগুলিতেই একটী শান্ত সংযম ও ত্যাগের ভাব পরিস্ফুট। (যতীন্দ্র মোহনের প্রথম কবিতাপুস্তক 'লেখা' আমরা দেখি নাই সুতরাং তাহাতে কি আছে তাহা জানিনা)

যতীন্দ্র মোহনের প্রেমের কল্পনা অতি উচ্চ। প্রেমই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পদার্থ; জগতে যে হতভাগ্য মর্ত্ত্যজীবনে ভগবানের এই মহা আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহার জীবন ও মৃত্যু তুল্য।

জীবনে সে নহে বাঞ্ছনীয়
যে জীবনে প্রেম তার বসিবার বাঁধে নাই বাসা
(নাগকেশর ১৭৭ পৃঃ

জগৎ নশ্বর, জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু ইহার মধ্যে প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমই বিশ্বে একমাত্র অমর।

'কোথা রাজা, কোথা রাজ্য কোথা রাজধানী।
এসেছে গিয়েছে কত বুদ্বুদের মত;
কত না মহতী কীর্ত্তি হ'য়েছে বিগত—
ইতিহাস কথা সার! প্রেম শুধু আছে,
ল'য়ে তার নিত্য সুধা নরচিত্ত মাঝে?
(রামায়ণ স্মৃতি)

তাই এই নশ্বর জগতের গৌরব শুধু প্রেম হইতেই 'অনন্ত জগৎ শুধু অনন্ত—'সে প্রেম রত্ন পেয়ে।'

তাই এই প্রেম স্পর্শে প্রেমিকের জীবনের যাহা কিছু দৈন্য, যাহা কিছু মলিনতা মুছিয়া যায়; তাঁহার যত কিছু বেদনা সকলই আনন্দে পরিণত হয়। তিনি ইহাকে আর বেদনা বলিয়াই মনে করেন না।

'ভাল যে বাসি—তাই সে সখি
এত যে দুখ বেদনা পাই;
ভাল যে বাসি তাইত সখি—
বেদনা মাঝে বেদনা নাই।

এই বেদনা ও অশ্রুর মধ্য দিয়াই প্রেমের প্রকৃত সার্থকতা হয় এবং প্রিয়তমের সহিত যে মিলন তাহা সফল হইয়া উঠে; 'বহ্নি শিখার' মত এই প্রেমের স্পর্শেই জীবনের মৃত্তিকাদীপটী আপনার গৌরব ও উজ্জ্বলতা লাভ করে।

আমার বলিয়া যাহা কিছু—কোন অর্থ কি তার আছে—
তোমারি পরশ শুধু তারে প্রিয়, সার্থক করিয়াছে।'

কিন্তু এই যে প্রেমের সার্থকতা ইহা মোহের মধ্যে হয় না; মোহ প্রিয়তমকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চায় কিন্তু তাহার ফলে সে আপনারও প্রিয়তমের উভয়ের জীবনই ব্যর্থ করিয়া দেয়। 'দল ও পরিমলের' মধ্যে কবি এই ভাবটী সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন।

প্রকৃত প্রেম এইরূপ পবিত্র বলিয়াই তাহা পূজার নামান্তর। প্রিয়তমের প্রতি মানুষের যে প্রেম তাহার মধ্য দিয়াই দেবতা আপনার অর্ঘ্য গ্রহণ করেন। সুতরাং প্রেমকে নিরবচ্ছিন্ন মর্ত্ত্য এবং মানুষী বলিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

'কহিল কে যেন কাণে কাণে বাছা মম
প্রেমে মোর পূজা জানিস শ্রেষ্ঠতম;
পূজার অর্ঘ্য লয় নাই প্রেম, কাড়ি
বহিয়া আগিয়ে দিয়াছে আমার বাড়ী।'

নিরবচ্ছিন্ন মর্ত্তের মরণধর্ম্মশীল নহে বলিয়াই প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। দেশ কাল ও জড়ত্বের ব্যবধান

তাহার মিলনের পথে বাধা দিতে পারে না; আপনার অন্তরের মধ্য দিয়াই আপনার অন্তরঙ্গের সহিত তাহার মিলন সংঘটিত হয়।

'কোথা প'ড়ে আছে দেহের সীমানা, কোথা মিলে
আসি প্রাণ,
অন্তরায়ের অন্তর টুটি, মিলনের মহাগান ?'
(রেখা পৃঃ ১৭)

দেহের গণ্ডীর মধ্যে এই মিলন তাই আবদ্ধ হয় না; জীবন ও মৃত্যুর কোনো গভীর অন্ধকারেই ইহা আপনার প্রিয়তমের সন্ধান হারায় না। ক্ষণিকের পরিচয়েই প্রিয়তম চির আপনার হইয়া পড়ে; প্রেমিক দর্প ভরে বলেন—

বারেক যখন পেয়েছি তার গোপন পরিচয়
বারেক যখন ভুলিয়েছে মোর মন
তখন আমি যাবই কাছে যেমন ক'রেই হয়
জীবন মরণ রইল আমার পণ ?

প্রেমের এই সুদৃঢ় প্রত্যয় ও বিপুল গর্ব্ব মিথ্যা নহে। কারণ প্রেম কখনও প্রিয়তমের মিলন হইতে বিচ্যুত হয় না। এ জীবনে না হয় জীবনের পরপারে, স্থূল জড়দেহে না হোক্ সূক্ষ্মতম চিন্ময় শরীরে—একদিন না একদিন প্রেমিক আপনার প্রিয়তমের মিলন লাভ করিবেই

একদিন পাব তারে, স্বর্গ যদি সত্য কভু হয়
নিশ্চয় সে পাব তারে মৃত্যুহীন জানি যে প্রণয়।
(রেখা পৃঃ ১৯)

যতীন্দ্রমোহনের প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির মোটামুটি ভাব আমরা প্রদর্শন করিলাম। কাব্য হিসাবে ইহার অধিকাংশই তেমন উচ্চশ্রেণীর নহে সাধারণ ধরণের। রেখার 'মিলন' 'প্রেম' অভিযোগ' অপরাজিতার 'পূজাগৃহ' নাগকেশরের 'সন্ধান' 'বিদায়' 'মিনতি' প্রভৃতি কবিতা অর্থের দিক দিয়া দেখিলে বিশেষ সুখ্যাতির উপযুক্ত নহে। কিন্তু 'পত্র লেখা' অন্ধবধূ 'অন্ধপ্রেম', 'বহ্নিশিখা' 'প্রেমোন্মাদ' 'সাধনা' 'রামায়ণ স্মৃতি' 'বঞ্চিতের বিদায়' 'দল ও পরিমল' প্রভৃতি কবিতাগুলি আমাদের অত্যন্ত মনোরম লাগিয়াছে।

যতীন্দ্রমোহনের এই সকল রচনার মধ্যে প্রধান উপভোগের বিষয় হইয়াছে তাঁহারা চিত্রাঙ্কন কারিণী শক্তি এবং রসসৃষ্টি। 'পত্রলেখা' 'অন্ধবধূ' ও 'অন্ধপ্রেম' কবিতা তিনটীতে যথাক্রমে প্রেমের যে তন্ময়তা, অভিমানপূর্ণ বেদনা একান্ত প্রেমান্ধতা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত মধুর। আর্ট হিসাবেও ইহারা বড় সুন্দর হইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহনের রচনার মধ্যে শিশু হৃদয়ের নানাভাবকে অবলম্বন করিয়া লিখিত কতকগুলি কবিতা আমরা পাই। রবীন্দ্রনাথের পর শিশু বিষয়ক কবিতা অন্য কোনো বাংলা কবির মধ্যে আমরা এমনতর আর দেখি না। এই সকল কবিতার প্রেরণা (inspiration) তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক রবীবাবুর অন্ধ অনুকরণ বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুর' মধ্যে একটা দার্শনিকতা অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনে তাহা নাই। ইহা শুধুই শিশুপ্রাণের ভাব সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই বিশেষত্ব বর্জ্জিত তবে ইহাদের ভাষা ও ছন্দ সুমিষ্ট। যতীন্দ্রমোহনের কবিতার বিশেষত্বের কথা আমরা প্রায় সকলই বলিয়াছি। এখন তাঁহার কল্পনা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব; কারণ কল্পনা হইয়াই প্রধানতঃ কবিতা, ছন্দও ভাষা তাহার বাহ্যরূপ মাত্র। কল্পনা শক্তিশালিনী হইলে ভাবরসে হৃদয় পরিপূর্ণ হইলে ভাষা ও ছন্দ অধিকাংশ স্থলে আপনা হইতেই তাঁহার অনুরূপ হয়। যতীন্দ্রমোহনের কল্পনার প্রধান বিশেষত্ব তাহার সংযম। উদ্দামতা এবং অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য তাঁহার মধ্যে একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। অথচ এইজন্য যে তাহা নির্জ্জীব অথবা নিস্তেজ তাহা নহে। তাহা অতি ধীর, অথচ অতি প্রাণপূর্ণ। তাঁহার বর্ণিত "বঙ্গ বধূর" মত উহার সৌন্দর্য্য শান্ত ও মধুর 'মাধুরী তোমার মোমে মাখা যেন মৌচাক ভাঙ্গা মধু'। তবে সময়ে সময়ে তাঁহার কল্পনা যে উদ্দীপ্ত (catching fire) হয় না এমনও নহে। সমুদ্র ফেনার

অন্তহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কল্পনা কেমন উধাও হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপভোগ্য।

"সিন্ধু উদ্দেশে" কবিতায়—

—দিক হ'তে দিগন্তরে শুধু
দুর্নিবার বারিরাশি নিরন্তর বহিতেছে ধুধু—
মৃত্যুময় মহামরু"—

সমুদ্রের এই 'ভীমমূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভীষণ' তাঁহার কল্পনাকে কিরূপ তেজস্বী ও উদ্দীপ্ত করিয়াছে তাহা উল্লেখ যোগ্য।

— এস এস হে উগ্র বিরাট
শান্তিবারি ছড়াইয়া মঙ্গলের মন্ত্র কর পাঠ।
এস হে সলিলরূপী ঘনজটা এসহে ধুর্জ্জটি!
এস হে প্রলয়ঙ্কর উর্ম্মিনাগ পরিহিত-কটী
কমঠ কপাল কণ্ঠে, ভৈরব হুঙ্কারে শিঙা মুখে
এস হে শঙ্কর দিপ্ত! হান শূল ধরা দৈত্য বুকে।

সিন্ধু সম্বোধনের এই সকল পদ তেজ ও গাম্ভীর্য্যে রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু সে তেজস্বীতা যতীন্দ্রমোহনের কল্পনায় অতি বিরল।

যতীন্দ্রমোহনের কল্পনার দ্বিতীয় বিশেষত্বের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতন্দ্রীয় জগতের গোপন রহস্যের সন্ধানে উহা উধাও হইয়া ছুটে না অথবা স্বপ্ন পরীরাজ্যের রামধনুরঙে আপনাকে রঞ্জিত করে না। সাধারণতঃ সে লোকালয়ের মানুষের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিতেই উহা ব্যস্ত। এই চিত্রাঙ্কনী প্রতিভাই তাঁহার কবিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। ইহাতে তাঁহার সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান গভীর ভাবে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহার কল্পনা একদিকে যেমন শুধু স্থূলরূপ লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে না তেমনি আর একদিকে উর্ণনাভের নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভট রূপ সৃষ্টি করে না। বিশুদ্ধ কল্পনার কবিতা তাঁহার রচনায় ৪।৫টার বেশী আমরা পাই নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যেও ধোঁয়ার ন্যায় অস্পষ্টতা নাই। একটা অখণ্ড চিত্র মানস চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। 'বসন্ত সম্ভব' 'স্বপ্নরাণী' 'কোজাগরী লক্ষ্মী' প্রভৃতি কবিতা ইহাদের দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

বাহ্যপ্রকৃতির প্রতি যতীন্দ্রমোহনের বিশেষ কোনও প্রকার মনোভাব (attitude) তাঁহার কল্পনার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। wordsworth, shelley রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিরা প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড প্রাণধারার সন্ধান পাইয়াছেন কিন্তু এরূপ ঋষির দিব্য দৃষ্টি অতি দুর্লভ। যতীন্দ্র মোহনের মধ্যে ইহা আমরা পাই না। কিন্তু প্রকৃতি যে প্রাণহীন জড় এমন ধারণাও তাঁহার রচনায় স্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই। প্রকৃতির শান্তিময় মধুর সৌন্দর্য্যের প্রতি তিনি উদাসীন বা অন্ধ নহেন। নববর্ষার 'সৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গনে বৃষ্টির হোরীখেলা' মধুমাসের ভূবন ভুলান বসন্ত সৌন্দর্য্য, শরতের 'শুভ্র রোদের সাদা আলিপনা' কোজাগরী পূর্ণিমার 'তৃপ্তিভরা দীপ্তিময়ী মূর্ত্তিখানি' কাঞ্চন ও শঙ্খমণির অনাদৃত বিষণ্ণ শোভা তাঁহার চক্ষু ও মন আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই সকল দেখিতে দেখিতে নিজের ব্যক্তিগত, জাতিগত অথবা সার্ব্বজনীন সুখ দুঃখের কথাই অধিকাংশ স্থলে তাঁহার মনে হয়। 'কাঞ্চন' কবির 'ছোট খাটো যত শৈশব অভিনয়ের কথা' স্মরণ করাইয়া দেয়; সন্ধ্যামণি 'জন্মদুখিনী' বঙ্গ বিধবার কথা কবির মনে আনে। মধুমাসের ভুবনভরা আকুলতা ও উৎসবের মধ্যে 'মুক পরাণ প্রিয়ার চরণের শিঞ্জিনী এবং ধরণী রাণীর গোপন বারতার, সন্ধান তিনি পান। 'ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ণ আষাঢ়ের' আকাশের প্রতি চক্ষু চাহিলে স্বদেশ মাতার কাতর রোরুদ্যমানা মূর্ত্তিই কবি দর্শন করেন। কিন্তু মানুষের সুখ দুঃখ ও চিন্তা কল্পনা নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র প্রাণ যে ইহাদের আছে এমন ভাব তিনি ব্যক্ত করেন নাই। কেবল 'আগমনী' ও 'কোজাগরী লক্ষ্মী' নামক অপরাজিতার দুইটী কবিতায় আমরা প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের, প্রকৃতি রাণীর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। 'আগমনীতে' শরতের শুভ্র শান্ত সুষমার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রমণীয় আবির্ভাব দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছেন।

'দশ দিকে তোর হেরি রূপরাশি, কোন দিকে নাহি পাই
স্বরূপের মাঝে মন ও চক্ষু ডুবে যায়—ডুবে যায়।
একবার কাছে আয়,
দেখা দেখা আজ—দেখা দেমা আজ মূর্ত্তির মহিমায়।

'কোজাগরী লক্ষ্মীতে' শারদপূর্ণিমাকে মূর্ত্তিমতী করিয়া কবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

শঙ্খ ধবল আকাশ গাঙে
স্বচ্ছ মেঘের পালটী মেলে
জ্যোৎস্না তরি বেয়ে তুমি
ধরার ঘাটে কে আজ এলে ?
ক্ষীরোদ সাগর ছেঁচা চাঁদের
টিপটী দেখি ললাট-পটে,
কুমুদমালার বরণডালা
লুটায় তব চরণ তটে,

ভাবে, ভাষায় ও কল্পনায় বিশ্ব প্রকৃতির এই চিত্র অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহনের কবিতা বিস্তৃতভাবে যথাশক্তি আমরা আলোচনা করিলাম। বাংলা কবিতা সাহিত্যে তিনি যে আপনার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই পরিচয় যাহা আমরা আজ পর্য্যন্ত পাইয়াছি তাহা তাঁহার প্রতিভার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয় নাই। এখনও তাঁহার কবি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রম করে নাই। ছন্দ ভঙ্গী ভাষা ও ভাব সর্ব্ববিষয়েই রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার ঋণ যথেষ্ট। তবে সুখের বিষয় এই যে তিনি অন্ধ অনুকরণকারী নহেন; আপনার প্রতিভার বলে তিনি যাহা গ্রহণ করেন তাহাকে আপনার করিয়া লইতে পারেন। আশা করি এই শক্তির বলেই তিনি শীঘ্রই সাহিত্যে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র পথ করিয়া লইবেন।

কয়েকটী ভিন্ন নূতন ভাব ও ছন্দ তিনি এখনও সাহিত্যে বিশেষ কিছু দান করেন নাই। কিন্তু তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাও অকিঞ্চিৎকর নহে। তিনি দিয়াছেন সরলতা ও আন্তরিকতা ভাষার মাধুর্য্য ও ছন্দের লালিত্য এবং কতকগুলি অতিসুন্দর ও মনোরম ভাষা চিত্র। কবির প্রাণ লইয়া তিনি জন্মিয়াছেন, ছন্দের সঙ্গীত অনুভব করিবার কর্ণ তাঁহার আছে, ভাষা সম্বন্ধে তিনি ধনবান সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তিনি যথেষ্ট দিয়াছেন; তাঁহার কল্পনার উদ্দাম ও স্বেচ্ছাচারী নহে, অনাবশ্যক হইয়া বাংলার আড়ম্বর নাই মনে হয়, তাই প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবি হইয়া কবিতা-সাহিত্যের পরিপুষ্ট করুন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা করিতেছি।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

'ভূতের ভয়'

যখন আমি প্রথম লোক মরা দেখিয়াছিলাম তখন আমার বয়স ছিল অল্প। একটা লোক যাকে বরাবর কথা কইতে, চলে বেড়াতে দেখে আসছি, যার সঙ্গে দিনের মধ্যে কতরকম সম্বন্ধ স্থাপন কর্ত্তাম, সে হঠাৎ মরে গেল; শুকনো কাঠের মতন বিশ্রী শক্ত আড়ষ্ঠ হয়ে গেল—আবার শুনলাম তাকে সেইদিনই পোড়ান হবে, কোনও মায়া করা হবে না; সমস্ত স্নেহের সম্বন্ধ ঘুচিয়ে তার সমস্ত চিহ্ন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে—আমার হাত পাগুলো পাথরের মতন ভারী হয়ে উঠল, আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সব হজম কর্ত্তে লাগলুম।

সেইদিন থেকে আমাদের বাড়ীটা আমার চোখে একেবারে বদলে গেল। বাড়ীর যে সব জায়গা আমার প্রিয় ছিল, যেখানে আমি পালিয়ে সকল শাসনের হাত থেকে আশ্রয় নিতাম, সেই সব নিভৃত জায়গাগুলি যেন এক অদৃশ্য উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে—আনাচে

কানাচে কে যেন সর্ব্বদা ওৎ-পেতে হাঁ করে বসে আছে, আমার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে—আমার পায়ে পা জড়িয়ে যেতো, সমস্ত দৌড়াদৌড়ি এক নিমেষে বন্ধ হতো।

রাত্রে পড়তে বসে মনে হোতো টেবিলের তলাটা ভারী অন্ধকার জমাট; ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে পা দুটো চেয়ারের ওপর তুলে বসতাম; বিছানায় শুয়ে ভাবতাম, একটা প্রকাণ্ড বীভৎস মাথা, একগাছা চুল নেই, খাটের পাশ দিয়ে উঠছে, এইরকম আরো কত কি, কোনটা ছোট ছেলের মতন হাত, পা, আকৃতি, কেবল মুখটা কুকুরের ন্যায় লাল জিভটা বার করে রয়েছে, কোনটা আবার কেবল অন্ধকারের মধ্যে থেকে দুটো বেজায় লম্বা সরু হাত আর সাদা সাদা লম্বা লম্বা আঙুল।

অন্ধকারে আমার চোখ চাইতে ভয় লাগত আমি জোর করে চোখ বুঁজে বিছানার চাদরখানাকে পাগলের মতন টানাটানি করে রাত কাটিয়ে দিতাম; রাত্রি আমার কাছে নরকের মতন হয়ে উঠল, ভোর হলে তবে আমি আমার সহজ নিঃশ্বাস ফেলতাম, কপালের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা দপ্দপানি থেমে যেতো। প্রকাণ্ড বাড়ীটা একদল অদৃশ্য ভয়ঙ্কর জীবের আবাস হয়ে উঠল; এবং তাদের অস্তিত্ব ঘন ঘন আমার সকল কাজ ও খেলার মধ্যে এমন প্রভাব বিস্তার কর্ল্লে যে একদিন মা আমায় জিজ্ঞাসা করে বসলেন্ "হাঁরে খোকা তোর কি অসুখ কচ্ছে?"

বিরাট লজ্জা এসে আমার মুখ চেপে ধরল, আমি যে ব্যাটাছেলে, কাছেই দিদি, আমার বোন দাঁড়িয়েছিল। আমার মনে কিন্তু তখন হচ্ছে, মা'র কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে কেঁদে ফেলি।

নিজের মনে মনে একলা বসে কতরকম যে কাকুতি মিনতি কত্তাম তার ইয়ত্তা নেই; কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর কাছে কত্তাম না; তবে আমার শিশুহৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে যে সেগুলো ফুঁড়ে বেরুত সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার কেবল ভয় কখন এইরকম একটা চেহারা চোখের সামনে পড়ে যাবে। আমার সমস্ত সময়টা খালি সব জায়গা থেকে পালিয়ে পালিয়ে কাটত—আর সন্ধ্যা হয়ে এলেই, রাত্রি বেলার কথা তেবে আমি আড়ষ্ট হয়ে যেতুম।

যাহো'ক মাসখানেকের মধ্যে বাবা আমাদের পশ্চিমে নিয়ে গেলেন। তার পর অনেক বৎসর কেটে গেছে—আমি তখন পূর্ণবয়স্ক যুবা। ইতিমধ্যে আমার আর সে বাড়ীতে যাওয়া হয় নাই; পৈতৃক বাড়ী খালিই পড়ে থাকে; দুএকজন দূরসম্পর্কীয় তারই এক কোণে মাথা গুঁজে আছে। বাল্যকালের যে ভয়টা আমার মনে ছাপ মেরে দিয়েছিল, সেটা সংসারের নানা শিক্ষা, অনুভূতি ও জ্ঞানের সংঘর্ষণেও কখন কখন একেবারে লুপ্ত হয় নি; ভূতের গল্প উঠলেই আমার গায়ের মধ্যে কেমন ছম্‌ছম্ কর্ত।

এইবার আসল কথা বলি, আমি কেমন করে ভূতের ভয় পেয়েছিলাম; এমন ভয় যেন মানুষে না পায়।

* * * * *

একটা কাজে আমাকে বাড়ী আসতে হয়েছে; সঙ্গে কেউ নেই, দুদিন দিনের জন্যে আসা, একটা ব্যাগে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কতকগুলি জিনিষ; ষ্টেশনে আমার জন্যে একটা লোক অপেক্ষা করেছিল একটা গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছান গেল। একটা ঘর বেশ পরিষ্কার করে আমার জন্যে ঠিক করা হয়েছে; বৈঠকখানার একটা বড় দেওয়ালগিরিকে স্থানচ্যুত করে এইখানে আনা হয়েছে, তার উজ্জ্বল আলোকে ঘরটা সরগরম হয়ে আছে; বুড়ো মালী এসে অভ্যর্থনা, আপ্যায়ণ করতে লাগল, সেই আজ গৃহস্থ আর আমি অতিথি—তারই তত্ত্বাবধানে বাড়ীটা থাকত। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার কোন হাঙ্গাম করে দরকার নেই বলে মালী প্রমুখ বান্ধব জনকে বিদায় দিয়ে, অর্দ্ধ সমাপ্ত খবর কাগজটার ভাঁজ খুলে বিছনায় বসে পড়লুম। মালী বল্লে 'বাবু তাহ'লে আসি, আপনে সাবধানে থাকবেন।' আমার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি—কেন সাবধান কিসের—কিন্তু বলা হলো না; মালী চলে গেল—ওঃ আর কি,—অমন বসে থাকে—ঘড়ি খুলে দেখলাম রাত্রি নয়টা।

বাড়ীটা অনেক মহল; পুরুষানুক্রমে বাড়িয়ে কর্ত্তারা

বাড়ীটাকে একটা বিশাল ব্যাপার করে তুলেছেন, চারদিকে পুরাণো বাগান, আনুষঙ্গিক নোনাধরা উচু দেওয়াল আর মাঝে দুটো পুকুরও আছে। আমি উঠে দরজাটা বন্ধ কত্তে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে তার কোনও উপায় নেই। দরজাটা ভেজিয়া আবার স্বস্থানে এসে বসলাম। গ্রীষ্মকাল জানালা সব খোলা; বাহিরে বেশ চাঁদের আলো; জোছনার ঢেউ এসে বাড়ীর কার্ণিশে ধাক্কা খেয়ে যেন খল্ খল্ করে হাঁসছে; পাশের উঠানেও বেশ আলো; বেলতলায় আলো আর ছায়ার কুচি একটা জটলা পাকাচ্ছে। চাঁদের আলোর ঔজ্জ্বল্য আর শুদ্ধতার মধ্যে যে এমন একটা হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার ভাব আছে তা আমার আগে মোটে ধারণা ছিল না—বীভৎস রঙ্গরসে বিপর্য্যস্ত করবার উৎকট অভিলাষ। অল্প হাওয়ায়, ভেজান দরজাটা খুলে গেল, আমি চমকে উঠলাম; দরজার পরে রোয়াক তারপর উঠানের ওপাশে পূজোর দালানে একটা আলো মিটমিট্ করে জলছে। আর সব ঘরের দরজা বন্ধ—নিঝুমের পালা, অশরীরী আততায়ীরা সব সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

না:, ও সব কিছু নয়—আমি একবার জানালা গুলোর দিকে তাকালাম, চারিদিকে ছায়ার বাজী লেগেছে, বড় বড় ছায়ার টুকরো দেওয়ালের গায়ে, উঠানের উপর; আবার দরজার দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বসে ভাবতে লাগলাম, খাটের তলায় একবার ভাল করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু তখন আমি অপারগ। ভূত বলে সত্য কিছু নেই; আত্মা কোনও বস্তু নয়; আর সত্যই যদি তার অস্তিত্ব থাকে তবে সে নিশ্চয়ই অদৃশ্য—আর আমার সঙ্গেই বা তার সম্পর্ক কি—মন কিন্তু কিছুতেই বুঝিতে চাহে না; দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি স্বাভাবিকের দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। কাতর আর্ত্তনাদ, উচ্ছৃঙ্খল হাসি, বিরামহীন ক্রন্দন, সব মনে পড়ল; তারা যেন এক একটা বাস্তব অবয়ব নিয়েছে কিন্তু তাদের বীভৎস আকৃতি কেবল সেই অসম্ভব উত্তেজিত কল্পনাকেই ধরা দিচ্ছিল। আমার চারিদিকে একটা ছুটোছুটি পড়ে গেল একটা চাঞ্চল্যের সাড়া, সেই নির্জ্জনতা জীবন্ত হয়ে উঠে কখনও বা হাহাকার করছে আর কখনও বা আস্ফালন কচ্ছে। আমি ছেলেবেলাকার মতন কাকুতি মিনতি করতে লাগলাম—নিজের দৈন্য আর ক্ষুদ্রতা আর কখনও এমন ভাবে উপলব্ধি করি নাই—ওগো আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও—বুকের মধ্যে তখন ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্ছে আর কপালের মধ্যে দপ্ দপ্ করে তার উত্তর দিচ্ছে।

আমার সমস্ত রক্ত হঠাৎ হিম হয়ে গেল, সমস্ত ভয় থেমে গেল, দরজার পাশেই যে সেই মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে—সর্ব্বাঙ্গ সাদা কাপড়ে ঢাকা খালি মুখটা দেখা যাচ্ছে আর একগোছা চুল; সে কি চুল? কালো সাপের মতন কাপড়ের ওপর দিয়ে বেয়ে পড়েছে—চোখ দুটো জল জল করছে, গালের হাড় উচু; আর ফ্যাকাশে সাদা রং, পাতলা ঠোট দুটো পর্য্যন্ত সাদা। কাপড়ের মধ্যে থেকে সরু শীর্ণ হাতটা বার করে আমাকে ডাকল—একবার, দুবার, আমি উঠে পড়লাম, সে চলতে লাগল আমি তা'র অনুসরণ করলাম—আমার যেন পায়ের তলাটা ছাড়া আর কিছু নেই।

উঠান পার হয়ে একটা ভাঙ্গা দরজার মধ্যে দিয়ে আমরা বাগানে প্রবেশ করলাম পুরাণো বাগান, রাস্তার ওপর আগাছা জন্মে সব একাকার হয়ে গেছে; কতকগুলো বড় বড় গাছের তলা দিয়ে আমরা চলেছি; ছোট ছোট দুএকটা ডালপালা এসে আমার মুখে লাগছে—আমার তখন জ্ঞান নেই কেবল ভয়; সম্মুখের স্ত্রীমূর্ত্তি এঁকে বেঁকে কি রকম এক ভাবে চলেছে। ঘামে আমার সমস্ত তখন ভিজে গেছে, মৃদু হাওয়ায় গা কেঁপে উঠে আমায় জানিয়ে দিচ্ছে যে আমি কখনও বেঁচে আছি—বরফের ধারা গা দিয়ে যেন গড়িয়ে পড়ছে—আমি শিউরে উঠলাম।

একটা গাছের তলায় একটা কোদাল ছিল; মেয়ে মানুষটি সেটা আমার হাতে তুলে দিল—আমরা আবার চলতে লাগলাম। কতকগুলো খোলার ঘর, মালীরা সপরিবারে সেখানে থাকে; তার পাশ দিয়েই আমরা চলেছি—আমার একবার ইচ্ছে হ'ল চীৎকার করে ডাকি, কাছেই তো মানুষ আছে, আমারই মতন রক্তমাংসের মানুষ, সবাই ছুটে আসবে। 'হা: হা: হা:' একটা বিকট হাস্যে আমার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল; প্রেতযোনির হাঁসি, গলার আওয়াজে কি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, কেউটে সাপ

যেন গা মন্ত্র জড়িয়ে ধরে রয়েছে—কিন্তু সে অবস্থাতেও আমার আশ্চর্য্য মনে হোলা যে মালীদের নিশ্চিন্ত নিদ্রা কি ও ভাঙ্গে না। সম্মুখের মুর্ত্তির উপর একটা বিরাট ঘৃণায় আমার মন পূর্ণ—ভয়ের ঘৃণা, ও যে পিশাচী।

ক্রমে আমরা বাগানের সর্ব্বপুরাতন অংশে এসে পড়লাম; কাদার মধ্যে আমার পা বসে যেতে লাগল; ছোট ছোট আগাছা মাঝখানে একটু জায়গা পরিষ্কার। পিশাচী অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে আমায় বল্‌লে—'এইখানে খোঁড়—' খুব মৃদুস্বরে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে—ওজর আপত্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হাতে যেন জোর নেই, শরীরের সমস্ত গ্রন্থি গুলো আলগা হয়ে গেছে—অতি কষ্টে মাটি খুঁড়ে যেতে লাগলুম। হঠাৎ পিশাচী এসে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিলে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত গায়ের রক্ত ছল্‌ছল্ করে উঠল; সে গর্ত্তের মধ্যে থেকে একটা ছোট্ট শিশুর কঙ্কাল টেনে বার করলে; তারপর সেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল; অজস্র চুম্বন সেই কঙ্কালের উপর বর্ষিত হচ্ছে, আর পিশাচীর মুখ দিয়ে তখন আদরের আধ আধ কথা বেরুচ্ছে; তার সোহাগের আলিঙ্গনে শুকনো হাড়গুলো খড়খড় করে উঠল; পিশাচী তখন তন্ময়; সে এই অদ্ভুত সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত। আমি পাথরের মতন দাঁড়াইয়া রহিলাম—জগৎ তাহার সমস্ত কুৎসিত নগ্নতাকে প্রকটিত করিয়াছে—এই মাতৃস্নেহ না বিভীষিকা।

আমার চোখের সামনে এই দৃশ্য তখন নেচে বেড়াচ্ছে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন দৌড়াচ্ছি, খুব বেগে কিন্তু এই ঘৃণিত দৃশ্য আমার চোখের সামনেই রয়েছে; যে দিকেই চোখ ফিরোই, এ দৃশ্যের হাত থেকে উদ্ধার নেই শেষে আমি যেন ঘুরতে লাগলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই পৈশাচিক ছবি যেন চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করে রয়েছে—আমার মাথার মধ্যে রক্ত চিন্ চিন্ কর্চ্ছে। কতক্ষণ পরে পিশাচী আমায় বলল "ধর, আমি আসছি, যেন পড়ে না যায়" আমার কোলে সেই কঙ্কাল দিয়া নিমিষের মধ্যে পিশাচী বৃক্ষান্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেল। কঙ্কালের ছোট হাতটা আমার কাঁধের উপর পড়েছিল, ঠিক যেমন স্বাভাবিক মানব শিশু থাকে। এই শুকনো হাড়ের বোঝা তখন আমার কোলে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী কিন্তু ভয়ে আমি চলচ্ছক্তিহীন; ফেলিয়া দিবার সাহসও নাই, শিশুকঙ্কাল কোলে, সেই নির্জ্জন বাগানে একলা রহিলাম।

চাঁদের আলো অনেকটা ম্লান বাগানের মধ্যে বড় বড় গাছের তলায় জমাট অন্ধকার আর চারিদিক হইতে কাহারা যেন আমাকে শাসাইতেছে—বিকট পিশাচ ও দানব মূর্ত্তি সব আমাকে ঘিরিয়া নাচিতেছিল, তাহাদের সকলের লক্ষ্য যেন সেই শিশুকঙ্কালের উপর; আমি ভয়ে চোখ বুঁজিলাম—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে শত শত কঙ্কালের শীর্ণ হস্ত আমার ক্রোড়ের কঙ্কালের উপর পড়িবে বলিয়া আমার মনে হচ্ছিল—দানবী ক্ষুধার সেই সামগ্রীটার স্পর্শে আমি বিমূঢ়—ঘোরতর ইচ্ছা, যে এই শিশুর অস্থিমালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিই, একটা কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠি—কিন্তু শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি নাই।

পিশাচী এখন ও ফিরিল না এর চেয়ে যে তার উপস্থিতি ভাল—সে তবুও পরিচিত।

পাশে আসিয়া পিশাচী দাঁড়াইয়াছে, তাহার হাতে একটা দুধের বাটী আর ঝিনুক। আমার শরীরের সমস্ত শিরা, পাথেকে মাথা পর্য্যন্ত চড়্ চড়্ করে উঠল তার পরই যেন একটা বাঁধন আল্‌গা হয়ে খুলে গেল—আমি জ্ঞান হারালুম।

* * * * *

অনেকদিন জ্বর আর মাথার ব্যারামে ভুগে যখন সেরে উঠলাম, তখন একদিন শুনলাম—ওই বাড়ীতেই আমাদেরই জ্ঞাতি একটি বিধবা পুত্রহারা হয়ে পাগল হয়ে যায়—আমি যাকে দেখেছিলাম সে পিশাচী নয়, সেই পাগলী; বাড়ীতেই থাকে আর সমস্ত রাত বাগানে ঘুরে বেড়ায়—বাগানে যে তার কি রত্ন পোঁতা আছে তা আমি বুঝতে পারলাম।

শ্রীবিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুঃখের দায়ে

(১)

হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মেমারীর পোষ্টমাষ্টার। মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনে তিনি বৃহৎ সংসার অতি কষ্টে প্রতিপালন করেন। পল্লীবাসীরা ব্রাহ্মণকে যাহার যাহা সামর্থ্য—কেহ বা ক্ষেতের আলু, পটল, তরকারি, কেহ বা মাচার লাউ, কুমড়া; কচি কচি পুঁইয়ের ডগা, কেহ বা নবপ্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এক আধ ঘটি পাঠাইয়া দেয়। তাহাতেও বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টারের কম সাশ্রয় হয় না। পল্লীগ্রামে পোষ্টমাষ্টারের সম্মান পল্লীবাসীদের নিকট কম নহে—তাহাতে আবার হৃষিকেশ বাবু ব্রাহ্মণ। সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে যে কেহ খাম পোষ্টকার্ড কিনিতে আসে বা অন্য কোন কার্য্যে ডাকঘরে আসে সকলেই অবনত মস্তকে বলিয়া যায়, "মাষ্টার মশাই পেন্নাম হই গো।"

মেমারীতে বৃদ্ধের দিনগুলো সুখে দুঃখে বেশ একরকম কেটে যাচ্ছিল। তাঁর মধ্যে মধ্যে দুঃখ কেবল এইজন্য হইত, যে ডাকঘরের কার্য্য করিয়া তাঁর কেশ পক্ক হইয়া গেল, তবু বেতন মাত্র এই ত্রিশটি টাকা—এই দুঃখ দৈন্যের দিনে ইহাতে কি আর সংসার চলে? কোম্পানী বাহাদুরের কি বিচার নাই?

(২)

ব্রাহ্মণ বিধাতার দানকে মাথায় তুলিয়া লইয়া বেশ শান্তিতে দিন যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু, সহসা এমন এক নির্ম্মম অঘটন ঘটিল যে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সেদিন অন্নপূর্ণা পূজা। কাঁসর, ঘণ্টার রবে ক্ষুদ্র গ্রামটি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে মায়ের পূজা। বৃদ্ধ পোষ্টমাষ্টার হৃষিকেশ বাবুরও সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ উদরপূর্ত্তি করিয়া প্রসাদ পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা পদ্মাবতী তামাক সাজিয়া হুঁকাটী পিতার হস্তে আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ কন্যার মুখপানে চাহিয়া নীরবে একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন। হুঁকাটী হাতে লইয়া, কি করিয়া বয়ঃস্থা কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবেন তাহাই আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন—তাঁর যে কিছুমাত্র সম্বল নাই, সুপাত্রে অর্পণ করিবার একমাত্র উপায় যে টাকা তাই তাঁহার নাই। মাত্র দুইশত টাকা অভাব, অনটনের মধ্যেও তিনি অতিকষ্টে ডাকঘরের সেভিংস্ব্যাঙ্কে জমাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কি আর আজকাল কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাত্রের পিতার ৫।৬ হাজার টাকার দাবীর নিকটে তাহা যে সমুদ্রে পাদ্যঅর্ঘ্য? ব্রাহ্মণ ভাবিয়া কিছু কুল পাইলেন না।

তামাক খাইতে খাইতে ব্রাহ্মণ যখন এই সব চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন তখন সহসা দ্বারে, ডাকঘরের কেরাণী সিধুবাবুর ঘন ঘন করাঘাত ও 'মাষ্টার মশাই বাহিরে আসুন' বলিয়া চীৎকার শুনিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ হুঁকাটী হাতে লইয়াই উন্মুক্তগাত্রে বাহিরে আসিলেন এবং আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই আফিসে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তকে যুগপৎ শতবজ্র খসিয়া পড়িল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণের গাত্রে সজোরে এক পদাঘাত করিলেন ও বলিলেন "এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।" বৃদ্ধব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে সুস্থ করিবার মত এতটুকুও দয়া সাহেবের হইল না কিম্বা তাহার এতটুকু প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করিলেন না। কেরাণীবাবু মাষ্টার মহাশয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি বাধা দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "আফিসের খাতাপত্র দেখাও, তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।"

প্রায় দশ মিনিটকাল ব্রাহ্মণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে

অগ্রসর হইল না। একজন প্রতিবেশী চাষা ডাকঘরে বাবুদের চিঠি ফেলিতে আসিয়াছিল, সে মাষ্টারবাবুকে এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার বাড়ীতে দৌড়িয়া গিয়া বলিল, "মা! সর্ব্বনাশ হয়েছে, মাষ্টারবাবু মূর্চ্ছা গেছেন; দিদিমণি শীগ্‌গির একঘটি জল ও একখান পাখা নিয়ে এস।"

(৩)

পদ্ম তাড়াতাড়ি একঘটি জল ও একখানি হাতপাখা লইয়া মতিচাষার সহিত আফিসঘরে দৌড়িয়া আসিল। পিতাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার চক্ষে সমস্ত পৃথিবীটা যেন এক মুহূর্ত্তে অন্ধকার বলিয়া বোধ হইল। দ্রুতি জলের ঘটি হইতে জল লইয়া হৃষিকেষ-বাবুর মুখে ও চক্ষে ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল, পদ্ম পিতার ভূলুণ্ঠিত মস্তকটি ক্রোড়ে লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "মা এসেছ। আমায় ঘরে নিয়ে চলনা মা।" পিতাকে কথা বলিতে শুনিয়া পদ্মর মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

পদ্ম সাহেব ও কেরাণীবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেই-দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল। "সিধুদাদা! বাবাকে ঘরে তুলে নিয়ে যেতে দয়া করে আপনি কি একটু সাহায্য করিবেন? হ্যাঁ সিধুদাদা, বাবা হঠাৎ এমন মূর্চ্ছা গেলেন কেন? কেউ কি তাঁকে কিছু বলেছিল?"

সিধুবাবু সভয়ে বলিলেন, 'সাহেব তাঁকে লাথি মেরে-ছিলেন তাই।'

সে সক্রোধে বলিল, "সিধুদাদা, ঐ সাহেব বাবাকে লাথি মারিল; আর আপনি তাই চুপ করে দেখলেন, কিছু বললেন না। বাবার শীর্ণদেহখানি মাটীতে এতক্ষণ অসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইল, আর আপনারা যমদূতের মত তাঁর মৃত্যুপ্রতীক্ষা ক'রে বসে থাকলেন।" তারপর সেই বালিকা সাহেব যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন তাহারই নিকটবর্ত্তী হইয়া কোমল-কঠোর কণ্ঠে বলিল, "সাহেব তুমি কি মানুষ নও যে মানুষের বেদনা এতটুকুও বোঝ না? আমার বৃদ্ধ পিতার কি এমন গুরুতর অপরাধ হয়েছিল যে তুমি তাঁর বুকের জীর্ণপাঁজরের উপর লাথি মারলে। সাহেব, বড় হতভাগিনী আমি, তাই আমার পিতার নিদারুণ অপমান আমাকে নীরবে সহ্য করতে হ'ল। ভগবান তোমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাই সেই ক্ষমতা গৌরব আজ তুমি খুব বাড়িয়ে তুললে, প্রভুত্বটা আজ খুব নূতন রকমে উপভোগ করলে।" পদ্ম জানিত না যে সাহেব বাঙ্গালা মোটেই বোঝেন না।

বালিকার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই সাহেব দৃষ্টি নত করিলেন—বালিকার কুসুমপেলব মুখের ভ্রূকুটীতে কি যেন একটা দাহিকাশক্তি ছিল। তাহার বাক্যের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে কি যেন একটা জ্বালাময় দংশন ছিল—সাহেব তাহাতে মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন। মনে অত্যন্ত রাগ হইলেও সাহেবের বাক্য নিঃসৃত হইল না।

তারপর পদ্ম বলিল, 'সিধুদাদা বাবাকে একটু ধরবেন কি?'

সিধুবাবু সাহেবের মুখের দিকে একবার সভয়ে তাকাইয়া হৃষিকেশ বাবুর নিকটে আসিলেন। সাহেব কিছু বলিলেন না। সকলে ধরাধরি করিয়া হৃষিকেশ বাবুকে ঘরে লইয়া গেলেন।

(৪)

সাহেব যাইবার সময় হৃষিকেশ বাবুকে শক্তিগড় পোষ্টাফিসে বদলি হইবার হুকুম দিয়া গেলেন। সে স্থানে মেমারী অপেক্ষাও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব। ম্যালেরিয়া জ্বরে গ্রামের অধিকাংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও অনেকেই গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পলাইতেছে। পাঁচ টাকা কম বেতনে অর্থাৎ পঁচিশ টাকা বেতনে বৃদ্ধব্রাহ্মণ শক্তিগড় পোষ্টাফিসের ভারগ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ চাকরী ছাড়িয়া দিলেও সংসার চলে না। চাকরীতে এমন কি জীবনে পর্য্যন্ত তাঁহার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা হইয়াছিল, কিন্তু পুত্রকন্যার মুখ চাহিয়া ব্রাহ্মণ অকূলে ভাসিতে পারি-লেন না। আজকাল সারাদিনই তিনি কি ভাবেন—সে ভাবনার বুঝি কূলকিনারা নাই। কখন কখন ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘুমাইয়া পড়েন, কখন বা তাঁহার চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। আফিসের

কাজেও আজকাল তাঁহার খুব ভুল হয়—আর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আফিস হইতে ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র আসে। খাম, পোষ্টকার্ড বেচিতেও অনেক পয়সার হিসাব ঠিক হয় না।

পদ্মর যে কি উপায়ে বিবাহ দিবেন ব্রাহ্মণ কেবল দিবানিশি তাহাই ভাবেন। কোন ভদ্রলোক ডাকঘরে আসিলে তিনি তাঁহার নিকট পাত্রের সন্ধান লন। কিন্তু স্নেহপরবশ পিতার কোন পাত্রই পদ্মাবতীর উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে হয় না। কোন পাত্রটী তৃতীয় পক্ষের, কোনটি বা মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের কিন্তু একেবারে মূর্খ, কোনটি বা সামান্য তেল-নুনের দোকান চালায়। ইহাদের সহিত কি অমন সুশ্রী ও সুশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়। পদ্মাবতী রাত্রে ঘুমাইলে ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত গভীর রাত্র পর্য্যন্ত অনেক পরামর্শ করেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী জোর করিয়া বলিলেন, "দেখ, এই গ্রামের যাহার সহিতই হউক আগামী ফাল্গুনের মধ্যেই পদ্মর বিবাহ দাও। আর দেরী করিলে কি জাতি কুল রক্ষা হয়।" তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "মেয়েটাকে কি শেষে জলে ফেলে দেবে?" কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অবশেষে তিনি পত্নীর মতেই মত দিলেন।

পিতার শুষ্ক মুখ ও মাতার বিষণ্ণতা আজকাল পদ্মকে গোপনে অত্যন্ত ব্যথা দেয়। সে বেশ বুঝতে পারে যে মাতাপিতার দুঃখের সেই একমাত্র কারণ। জীবনটা আজকাল যেন তাহার নিকট বড়ই দুর্ব্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে। তাই সে প্রত্যহ যখন গৃহপ্রাঙ্গনে তুলসীমঞ্চের তলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত তখন গৃহকুট্টিমে মাথা ঠুকিয়া অন্তরের সহিত ভগবানকে জানাইত, নারায়ণ, এ হতভাগিনীকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে, পিতামাতার দুঃখের আগুন নিবিয়ে দাও। তাঁদের যদি দিবারাত্রই তুষানলে দগ্ধ করিলাম, তবে আর আমার এ তুচ্ছ জীবনের প্রয়োজন কি? আত্মহত্যা মহাপাপ, সেইজন্য সে উপায় অবলম্বন করিতে আজও সাহস করি নাই। বিবাহের পূর্ব্বে আমার মরণ কি হবেনা ভগবান?"

(৫)

নদীর কিনারায় একবার ভাঙ্গন ধরিলে তাহা যেমন থামে না, তেমনি সংসারেও একবার দুঃখ ও অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে সে আগুণ শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয় না। ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বিধাতার অমেয় করুণার এককণামাত্রলাভেরও বুঝি অধিকার ছিল না। দেশে সে বৎসর ম্যালেরিয়ার বড়ই প্রকোপ। যে একবার জ্বরে পড়িতেছে সে আর উঠিতেছে না। ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষীয় একটী পুত্র ও একটী শিশুকন্যা ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া প্রায় বিনাচিকিৎসাতেই অবশেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিল। তাহার একমাস পরেই ব্রাহ্মণপত্নীও পুত্রকন্যার শোকে ৫ দিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ শোকের গুরুভারে অধীর হইয়া পড়িলেন। মাতৃহীন দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ও কন্যা পদ্মাবতীর মুখের দিকে চাহিতেও তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইত। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহাদের অদৃষ্টে যে কি হইবে তাহা ভাবিতেও বৃদ্ধের হৃদয় এক অজানা আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিত। নীরব অশ্রুমোচন ও বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস সম্বল করিয়া তিনি জীবনের আসন্ন সন্ধ্যার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

রন্ধনাদি গৃহস্থালী ও ছোট ভাইটীর সেবা যত্ন করিতে করিতে পদ্ম যখনই অবসর পাইত তখনই মাতা যে ঘরে অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন সেই ঘরে ছুটিয়া গিয়া ভূমিতে পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিত। মৃতা জননীকে আহ্বান করিয়া পদ্ম অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিত, "মাগো, আর যে দুঃখ শোক সহিতে পারি না মা। আমার জীবনের সাধ অনেকদিন হইতেই ত' মিটে গেছে মা। এ হতভাগিনীকে পথ দেখিয়ে দাও মা, আমিও তোমার কাছে যাব।"

দুঃখ শোক ও অতিরিক্ত ভাবনায় ব্রাহ্মণের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনিও অবিলম্বেই জ্বরে পড়িলেন। প্রথমবার ডাকঘরের কুইনাইন খাইয়া জর সারিল বা চাপা পড়িল। কিন্তু দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই আবার জ্বরে পরিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ জ্বরে জ্বরে ভুগিয়া ও তাহারই উপর অতি কষ্টে ডাকঘরের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশেষে তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

৫।৬ দিন জ্বর অল্প অল্প ছিল, তাহাতেই রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়াই আফিসের কাজ করিলেন, কারণ না করিলে আফিসের আর অন্য কেরাণী নাই যে তিনি করিবেন। সপ্তম দিনে জ্বর ১০৫°।১০৬° ডিগ্রী উঠিল ও তাহার সহিত বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। পদ্ম ও তাহার ভ্রাতার মুখ শুকাইয়া গেল। গ্রামে ভাল ডাক্তার ছিল না একজন হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন, তাঁহারই দয়ার উপর গ্রামের রোগীদের জীবন মরণ নির্ভর করিত। ডাকঘরের একজন পিওন তাঁহাকেই তিনদিন পূর্ব্বে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি তাঁহার চির অভ্যাস মত কুইনাইন মিক্‌শ্চারের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আজও তিনি আসিয়া রোগীকে দেখিলেন ও কি ঔষধ পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। পদ্ম তাঁহার পদতলে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'ডাক্তারবাবু বাবাকে কেমন দেখিলেন। আপনার তাঁকে বাঁচাতেই হবে।' এই কথা বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, রোগটা কিছু শক্ত ও বেঁকে দাঁড়িয়েছে। তা কিছু ভয় নেই; সারতে সময় লাগবে।"

তাঁহার বরঞ্চ বলা উচিত ছিল যে এ কঠিন রোগের চিকিৎসা তাঁহার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়, কিন্তু বলিলেই পদ্ম কি উপায় করিতে পারিত।

ডাকঘরের কার্য্যও এদিকে অচল হইয়া পড়িল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট পোষ্টমাষ্টার বাবু অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁহার অসুখের সংবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভাগ্যহত পোষ্টমাষ্টারের উপর তাঁহার কি যে জাতক্রোধ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন লোক নিযুক্ত করিলেন না। ডাকঘরের একজন একটু ইংরাজী জানা পিওনই খাম পোষ্টকার্ড বিক্রয় করিত ও ডাক ছাড়িত, আবার মাষ্টার মহাশয়ের সেবাও করিত।

(৬)

বিধাতা এ দুঃখতাপদগ্ধ সংসারের প্রতি আর ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার দয়াল হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইল

সেদিন বিকালে গ্রামের জমিদার হরীশ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ইন্দ্রনাথ ভ্রমণে বাহির হইয়া, তাহার নামে একটি পার্শেল আসিবার কথা ছিল, তাহারই একবার অনুসন্ধান করিবার জন্য ডাকঘরে আসিল। ইন্দ্রনাথ কলিকাতার বাটীতে থাকিয়াই মেডিক্যাল কলেজে পড়িত। এবার এম, বি পরীক্ষা দিয়া সে দেশে পিতামাতার নিকট আসিয়াছে। ডাকঘরে আসিয়া জানালার বাহির হইতে সে পিওনকে জিজ্ঞাসা করিল, "পোষ্টমাষ্টার বাবু কোথায়?" পিওন বলিল, 'বাবু, মাষ্টার মহাশয়ের বড়ই কঠিন অসুখ, বাঁচিবেন কিনা সন্দেহ।' ঠিক সেই সময়ে পদ্ম আফিসের ভিতর ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে সেই পিওনকে বলিল, "মধুদাদা! বাবা কি রকম করছেন! ওগো ডাক্তার বাবুকে একবার এখনই ডেকে নিয়ে এস। ইন্দ্রনাথ সেই ত্রস্তা বালিকার প্রতি নির্নিমেষ চক্ষে তাকাইল। এত রূপ সে জগতে কখন দেখে নাই। তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর যে একটা স্নিগ্ধ করুণ ভাব ছিল, তাহার সজল চক্ষুতে একটা যে করুণ ভাষা ছিল, তাহা ইন্দ্রনাথকে ব্যথিত করিল। সে তাড়াতাড়ি জানালার বাহির হইতে বলিয়া উঠিল, "আমি কি তোমার পিতাকে একবার দেখতে পারি? আমিও এবার মেডিক্যাল কলেজের এম, বি পরীক্ষা দিয়া ডাক্তার হইয়াছি।"

চকিত হইয়া পদ্ম সেই সৌম্যকান্তি যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় আবার চক্ষু নত করিল। সে মধুদাদাকে আস্তে আস্তে বলিল, 'মধুদাদা ওঁকে এসে দেখতে বল।"

মধু ইন্দ্রনাথকে ১০।১২ বছরের সময় জমিদার বাড়ীতে অনেকবার দেখিয়াছিল, তারপর হইতে আর দেখিতে পায় নাই কারণ ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত। হঠাৎ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সে বলিল, 'আপনি ইন্দ্রনাথবাবু, হরীশবাবুর বড়ছেলে? বাবু আপনি দয়া ক'রে এখানে এসেপড়েছেন, আমাদের ভাগ্য। বাবু, ভিতরে আসুন, মাষ্টারবাবুকে দেখবেন?"

ইন্দ্রনাথ রোগীকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল রোগীর অবস্থা দেখিয়া সে একটু ভীত হইল। রোগী

তখনও প্রলাপ বকিতেছেন। ইন্দ্রনাথ মধুকে পাঠাইয়া গ্রামের ডিস্পেন্সারী হইতে দুএকটী ঔষধ যাহা পাওয়া গেল তাহাই আনাইয়া লইল এবং বাড়ীতে মাতাকে সমস্ত ব্যাপার লিখিয়া পাঠাইল। তৎক্ষণাৎ সকলেই আসিয়া পড়িল। বাড়ী হইতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইলে ইন্দ্রনাথ গোমস্তাকে কলিকাতা হইতে কতকগুলি ঔষধ আনিবার জন্য তখনই পাঠাইয়া দিল। নিজে শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রাণপণে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। পদ্মও অক্লান্তভাবে পিতার সেবা করিতে লাগিল ও ইন্দ্রনাথ যাহা যাহা চাহিল সলজ্জভাবে তাহাই আনিয়া দিতে লাগিল। গোমস্তা কলিকাতা হইতে প্রায় ৬ঘণ্টা পরে ঔষধ আনিল। তখন ইন্দ্রনাথ দুই তিনটী ইন্‌জেকসন্ করিল। কিন্তু রোগীর অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না। ইন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল যে তাঁহার মৃত্যুর আর বেশী বিলম্ব নাই।

পদ্ম সজল ও উৎকণ্ঠিত নেত্রে পিতার রোগপাণ্ডুর মুখের প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার ভাইটী পিতার শয্যা হইতে একটু দূরে একখানি মাদুরের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। পিতার অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় ভয় হইল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। ইন্দ্রনাথেরও চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সে পদ্মকে কাঁদিতে বারণ করিল।

(৭)

রাত্রি তখন প্রায় তিনটা। বৃদ্ধের তখন যেন একটু জ্ঞান হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া শয্যার দুই পার্শ্বে একবার তাকাইলেন। তারপর তিনি ধীরে ও অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 'মা পদ্ম! তুমি এখনও জেগে আছ। বিশ্বনাথ কোথায়? তাকে আমার কাছে একবার নিয়ে এস। আমার যে যাবার সময় হয়েছে মা।' পদ্ম কাঁদিতে কাঁদিতে বিশ্বনাথকে পিতার নিকট উঠাইয়া আনিল।

তিনি তাঁহার রোগশীর্ণ হস্তখানি অতি কষ্টে তাহাদের উভয়ের মস্তকে স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন তিনি পার্শ্বে অপরিচিত ইন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে একজন ডাক্তার মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আপনি কে? ডাক্তারবাবু? আর ডাক্তারবাবু—আমার যে পরপারের ডাক এসেছে। আমার পুত্র ও কন্যাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছি ডাক্তার বাবু! তাদের পথের ভিখারী ক'রে যাচ্ছি। এমন পিতাও আমি তাদের হয়েছিলাম। মা পদ্ম, তোরা কার কাছে থাকবি মা, তোদের যে গাছতলাতেও স্থান নেই। আমি তোদের রাক্ষস পিতা—মরবার সময় তোদের এতটুকুও সম্বল রেখে গেলাম না। আমি মরলে, তোরা ভাই ভগ্নীতে হাত-ধরাধরি ক'রে ভিক্ষা করিস্—না না, তার চেয়ে তুই বিষ খেয়ে মরিস্—পারবি কি মা? আর ছেলেটা পৃথিবীর কণ্টকময় পথের উপর দিয়ে রক্তাক্তপদে এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত 'হা অন্ন, হা অন্ন' ক'রে ছুটোছুটী করবে—কাহারও না কাহারও দয়া হবেই। কেমন যুক্তি দিলাম ডাক্তারবাবু, ভালনয় কি?" একনিশ্বাসে এত কথা বলিয়া তাঁহার হিক্কা হইতে লাগিল। ইহা ঠিক মরণেরই অচিরাগমন ঘোষণা করিয়া দিল।

পদ্ম ও তাহার ভ্রাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথও মুমূর্ষু পিতার হৃদয়ভেদী দুঃখে ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। ইন্দ্রনাথ একটু সংযত হইয়া বলিল, "দেখুন, আমি এই গ্রামের জমিদার হরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আমার পিতাকে আপনি বোধ হয় জানিতেন। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি। পদ্ম ও বিশ্বনাথ আমাদের বাড়ীতেই থাকিবে। তাহাদের সমস্ত ভরণ পোষণের ভার আমার পিতা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। পদ্মর যাহাতে সুপাত্রে বিবাহ হয় তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপনি আমার কথার উপর নির্ভর করুন।"

তখন বৃদ্ধ যেন অমরার শান্তি লাভ করিলেন। তিনি সজলচক্ষে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, দীর্ঘজীবী হও। ভগবান আমার জীবনব্যাপী কাতরক্রন্দন শুনিয়া তোমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমার মহানুভব পিতার তুমিই উপযুক্ত পুত্র। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। পদ্মকে যখন তোমার হাতে দিলাম, তখন সে একটি সৎপাত্রে নিশ্চয়ই পড়িবে। এখন তবে আমি শান্তিতে মরিতে পারি।"

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ নেত্র নিমীলিত করিলেন। বোধ হয় পরমাত্মার ধ্যানে ব্যাপৃত হইলেন। তাহার ক্ষণকাল পরেই মৃত্যুর মাধুরী সেই রোগশীর্ণ মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িল।

পদ্ম ও তাহার ভাইটীকে ইন্দ্রনাথ অনেক প্রবোধ দিতে লাগিল, পিতৃশোকাতুর ছুইটী হৃদয়ে তাহা অনেকটা শান্তি আনিয়া দিল।

প্রদোষের পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিল। সমস্ত শেষ হইয়া গেলে, পরদিন পদ্ম ও তাহার ভাইটী পিতার স্মৃতিটি বক্ষে লইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ইন্দ্রনাথদের বাড়ীর গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল এমন সময় একজন সাহেব বাইসাইক্লে চড়িয়া ডাকঘরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ইন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোষ্টমাষ্টারের কি অসুখ হয়েছে বলতে পারেন?" ইন্দ্রনাথ বলিল, "তিনি কাল রাত্রে মারা গেছেন।" তখন পদ্ম সাহেবকে চিনিতে পারিয়া বলিল, "কি সাহেব, আমার পিতাকে আবার কি শাস্তি দিতে এখানে এসেছ? এখন তিনি তোমার ক্ষুদ্র প্রভুত্বের একেবারে বাহিরে।"

সাহেব যে মুখের বাণী শুনিয়া পূর্ব্বে একদিন শিহরি উঠিয়াছিলেন, আজও সেই বজ্রগম্ভীর বাণী শুনিয়া তাঁহ হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। সাহেব ধীরে ধীরে অন্তর্হি হইলেন।

* * * * *

ইন্দ্রনাথের পিতা ও মাতা পদ্ম ও বিশুকে অনে আদর করিলেন। পদ্মের দেবীপ্রতিম মুখের দিকে চাহি ইন্দ্রনাথের মাতা মুগ্ধ হইলেন। এত রূপ তিনি ক দেখেন নাই। তাহাকে পুত্রবধূ করিতে তাঁহার ইন্দ্রনাথের পিতার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল।

তারপর এক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ইন্দ্রনাথের সহিত প যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। ইন্দ্রনাথ এখন কলিকা ডাক্তারী আরম্ভ করিয়াছে। ইন্দ্রনাথ পদ্মকে রাগাই জন্য মধ্যে মধ্যে বলিত, "আচ্ছা আমি যদি তোমা ডাকঘরে না যাইতাম?"—

পদ্ম কিন্তু কিছুতেই রাগিত না। সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া উত্তর দিত, "ওগো দেবতা, তোমার অসীম দয়া!"

শ্রীহরিদাস মুস্তোফী।

এখন এসেছে আমাদের শুধু কাজের সময়,—সেইটিই বোধহয় পৃথিবীতে বই লেখা ও ছবি আঁকার চাইতে অনেক বড় জিনিষ—আমরা আগে চাই লোকশিক্ষক পরে চাই চিত্রকর।

হপ্‌ম্যান

সমাজের সারবস্তু পারিবারিক জীবন—

ইব্‌সেন

একজন শ্রমজীবিকে দেখ্‌লুম—একটা অন্ধকূপ ঘরের ভিতর "বইলারের" কাছে দাঁড়িয়ে সে কাজ করচে—পরণে তার শত ছিন্ন মলিন কাপড়, কঠোর পরিশ্রমে সে একেবারে নুয়ে পড়েছে!—মুখখানা তার একেবারে এমন শুকনো, এমন মর-পড়া—সমস্ত গা বেয়ে তার ঘাম পড়ছে—তার প্রশান্ত বুকখানা যেন ভেঙ্গে পড়ছে—টানা নিশ্বাসের সঙ্গে যেন আর ওঠানামা করতে পারচে না—

হপ্‌ম্যান

মাসিক কাব্য সমালোচনা।

পল্লীবাণী। বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক—পর্য্যন্ত। নববর্ষে'। কবি সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী ।চিত ‘১২টি লহরে ভকতিমালা' ১২ পংক্তিতে সমাপ্ত। ।চনা অনবদ্য নহে—উল্লেখযোগ্যও নহে।

‘সু'—রচিত "প্রেম" সুরচিত নহে। রচনায় বিন্দু-মাত্র বিশেষত্ব নাই। আবার গণ্ডস্তোপরি বিস্ফোটকঃ—শেষ দু'লাইনে মিলের অভাব।

এস প্রেমময়ী প্রাণে, আমার হৃদয়
আকাশ সাগর সনে প্রেমে গলে যায়।

‘যায়' কে ‘বয়' করিলেও হইত।

"সম্মিলনী"—ইচ্ছামতী কূলের বাণী সম্মিলনীর দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে শাহাদা হোসেন মহোদয় কর্তৃক রচিত। কবিতায় রচনা সৌকর্য্য আর কিছু না থাক মুসলমান কবির মুখে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি আমাদের অন্তরে পীযুষ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে।

"মহাতীর্থ এভারত বিশ্বমানবের,
স্বর্গ হতে পূততর ধূলিকণা এর।
হেথা দেবী মহেশ্বর-মৌলি নিবাসিনী,
পাতককলুষ হরা সুর তরঙ্গিনী।
ভগীরথ কম্বুনাদে তরল লহরে,
অবতরি আছে, বদ্ধ ভক্ত প্রেম ডোরে।
ঋষিকণ্ঠ বিনিঃসৃত মন্ত্রবেদগান,
ছেয়ে আছে, হেথাকার পবন বিমান।
বক্ষে এর বিরাজিত সেই বৃন্দাবন,
কালিন্দী সৈকতে যার কুলবালাগণ।
বিকচ কুসুম চয়ি' দিত কুতূহলে,
বংশীধর রাখালের শ্রীকরযুগলে।

* * * *

হেথায় বিরাজে দেবি সে পুণ্য কেবল,
অজ্ঞতা তিমির মাঝে আলোক উজল।
ফুটাইল যেথা সেই তাপস প্রবর,
সোহম সাধক ধীর আচার্য্য শঙ্কর।"

ইত্যাদি ইত্যাদি—

মুসলমান কবির হৃদয়ের উদারতার নিকট শীর্ষ নত করি। ভারতের মহামন্ত্র তিনি শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাই বলিয়াছেন—

"সেই মন্ত্র মহাগীত ঝঙ্কারে যাহার,
ভেদজ্ঞান বিশ্ব হতে দূরিয়া আবার।
আসিবে সে সাম্যভাব উদার মহান,
লয়ে সাথে পুনঃ প্রীতিপুণ্য সামগান।"

"প্রভু! সাজালে ভিখারীবেশ"—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত রচিত কবিতাটিতে বৈরাগ্য আছে, ভক্তি আছে ও আন্তরিকতা আছে—কিন্তু রসমাধুর্য্য কলাচাতুর্য্য ও পদলালিত্যের অভাবে কবিতা হয় নাই! কবিতাটি যদি বিরাশি লাইনে সমাপ্ত না হইয়া ২০।২৫ লাইনে সংহত হইত এবং কবিত্বলেশ শূন্য অংশগুলি পরিবর্জ্জিত হইত তাহা হইলে নেহাৎ মন্দ হইত না। সংযম যে বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রথম সাধন সোপান একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন?

"ফুল"—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র রচিত। কবি বলিয়াছেন—

হেথায় সেথায় সকল ঠাঁয়ে
বিশ্বে শুধু কুঁড়ির লীলাই বেশী
হরি, যোগ্যজনের তুমিই জানো মন
ফুলে ফুলে ভিড় করে' যে লাগছে ঠেসাঠেসি
হরি, তাদের ভিতর অধমও একজন।

কবি এখনো কোরক। কিন্তু "কুঁড়ির ভিতর কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে"। কবির মুকুলিত শক্তি আশাপ্রদ।

"রূপের দেহ"—সম্পাদক। 'কবিতাটি যদিও ছন্দোবন্ধে তত্ত্বকথা—তবুও আমাদের ভালই লাগিয়াছে—

দেহের রূপে যৌবনেরি ছুটী দিনের রাজটীকা
রূপের দেহে অনন্তেরি চিরন্তন চিৎ-শিখা
মৃণ্ময় এই দেহের রূপে চোখের নেশা অন্ধ করে
চিন্ময় সেই রূপের দেহে ধ্যানের মকরন্দ ঝরে।
দেহের রূপটী কামের তরী মোহের দাহ মগ্ন হয়
রূপের দেহ রাইকিশোরী মাধর্য্যের মর্ম্মে রয়।"

"বর্ষ-অন্তে"—শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা মজুমদার। কবিতায় কবিত্বের উপকরণ ছিল কিন্তু গদ্যাত্মক ভাষার চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

"প্রিয়ের আশায়"—জালালুদ্দিন রুমীর ভাবাবলম্বনে রচিত—রচয়িতা শ্রীকালিদাস রায়। বিশেষত্বশূন্য।

"ইচ্ছামতী"—শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় রায় চৌধুরী রচিত। ছন্দ সম্বন্ধে দিগ্বিজয় বাবুর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। কবিতার নিম্নে লেখা আছে "এই কবিতার ছন্দের সহিত নদীতরঙ্গের উত্থান ও পতনের মিল আছে" আমরা পড়িতে গিয়া দেখিলাম বন্ধুর গিরি সঙ্কটে উত্থান ও পতনের মধ্যে হোঁচট খাইয়া পড়িবার ভয় আছে। পাঠকগণ নমুনা দেখুন—

সাজি কভু ষোড়শী যুবতী
ব্রীড়াময়ী আর ধীর গতি
ভাবুক জন মন ভুলাও
ত্রস্ত তোমার দুকূল বাস
হতাশ প্রাণে দেয় আশ্বাস
দূর হ'তে লহর ছুটাও।

অলমিতিবিস্তরেন। তবে ইচ্ছামতীর ছন্দঃ সরস্বতী ইচ্ছাময়ী হইতে পারেন কিনা তাহা সত্যেন্দ্রনাথ বিচার করিবেন। ভাষারও মিল সম্বন্ধে কিছু নমুনা দেওয়া যাক্।

তোমারি তীরে এক মহান্
সূক্ষ্মবুদ্ধি মানব প্রধান
সমর্পিল দেহ রাজকার্য্যে
প্রতিভায় যার রাজশক্তি
হইল স্থাপিত রাজভক্তি
পরাজিত শত্রু রণমাঝে

অন্যত্র—আজিও বঙ্গ যাহার কীর্ত্তি
উচ্চকণ্ঠে গাহিছে গীতি
তাহারো তুমি হেরিলে শেষ।
আবার—কত মাল্লা আর মহাজন
নীল আকাশের চন্দ্রাতপে
বিশ্বপতির খাস মণ্ডপে
তাঁরি গানে হয় নিমগন।

কবির ব্যাকরণ জ্ঞানও চমৎকার। কবি কর্ত্তায় অধিকরণের বিভক্তি দেন—অধিকরণে কর্ত্তৃবিভক্তি দেন—যথা—

১। গণিল প্রমাদ দিল্লীশ্বরে
২। শ্রান্ত পথিকে নিদ্রা যায়
৩। চলেছি আজ কোন্ স্বরগের দেশ।

"উৎকলবঙ্গ কাঁপিল থরে" "ঘুচায় তাদের তপ্ত শ্বাস" "দুকূল বাস (?) হতাশ প্রাণে দেয় আশ্বাস" ইত্যাদি ক যে অদ্ভুত ভাষাবিন্যাস আছে তাহার উল্লেখ করিয় অযোগ্যের সম্মান করিতে চাহি না। আমরা এই উদাহ কবিকে জিজ্ঞাসা করি ইচ্ছামতীর সম্বন্ধে রচনা বলিয়া বি ইচ্ছামতই লিখিতে হইবে? আষাঢ়ের প্রথমে শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় বসন্তের গান গাহিয়াছেন—তবে ইহা বিগত বসন্তের স্মৃতি। উদাসমন্থর ছন্দে রচিত।

প্রভাতে জাগরণ ক্লান্ত আঁখি
চমকিছে হায় থাকি'থাকি
শুষ্ক জীর্ণ পাতাগুলি শুধু পথ মাঝে
আছে পড়ে তার বুকে বাজে।
অভিসার রজনীর চরণের অলক্তরেখা
করুণ কাহিনী তাহে লেখা।

"প্রেমসম্পুট"—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর, সম্পাদকের দ্বারা অনূদিত। এবার ১ম সর্গ বাহির হইয়াছে।

"শ্রীমতী তখন আসিয়া পারশে,
বহুত বিচারি মনে পুছিলা তাহারে কুতূহল বশে।
"কে তুমি দাঁড়ায়ে কোণে?"

এই চণ্ডিদাসী ভঙ্গিতে অধিকাংশই অনূদিত কিন্তু মাঝে মাঝে রবীন্দ্রীয় ভঙ্গীর আবির্ভাব যেন একটু রসভঙ্গ করিয়া দিতেছে—যথা

"অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী জানি　　খোল গো হৃদয় দ্বার
কেন লজ্জিত শঙ্কিত প্রাণী　　অধোমুখে রহ আর"

অনুবাদ—বেশ ললিত মধুর হইতেছে।

"রথযাত্রা"—শ্রীযোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবিতায় কবিত্ব না থাকুক—ভক্তি আছে প্রথমটা বেশ আরম্ভ হইয়াছিল।

মাধব! কি হেরিনু কহনে যায়।

কিন্তু যখন—"নিত্যশুদ্ধ নিরঞ্জন রহস্য এমৃন্মন
চিন্তায় সে বুঝিতে না পারে
পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ　　অসম্পূর্ণ কি কারণ
জগন্নাথ হেরিহে তোমারে।"

ইত্যাদির আবির্ভাব হইল তখন কবিতার মহাদুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল আবার যখন

সৎচিদানন্দ এবে　　মিলিত তুরীয় ভাবে
হেরি আজি সুখে সমাসীন
আছহে পুলক পূর্ণ　　হইয়ে ইন্দ্রিয় শূন্য
অব্যক্তে কি হইতেছ লীন" ইত্যাদির

আবির্ভাব হইল তখন দণ্ড কমণ্ডলুর আঘাত লাভ করিয়া কবিতার একেবারে তিরোভাব ঘটিল।

"শোকস্মৃতি"—শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ দত্ত রচিত। কবির নামের সহিত ভাষাবিন্যাসের সামঞ্জস্য আছে যথা শ্রূয়তাম্—

কবে কোন্ পুণ্যস্নাত বসন্তের প্রফুল্ল প্রভাতে
সমীরণ প্রবিধূত মন্দাকিনী কনক সৈকতে
ত্রিদিব কুমারী কর বিস্খলিত কম্পিত মন্দার
তরল চঞ্চল বক্ষে" ইত্যাদি ইত্যাদি—

না উপহাস নয়—কবির বেশ শব্দ বৈভব আছে—তবে মাঝে মাঝে অপব্যবহার দৃষ্ট হয়—যথা—

"একবিন্দু অশ্রুধারা" "নাহি শান্তি শান্ত্বনাম্বু দিয়া" "প্রসন্ন স্ফটিক" "বিস্মিতি অশনিঘাতে বিদীর্ণ" ইত্যাদি—

"অপূর্ব্ব মৃগয়া"—শাহাদাৎ হোসেনের উর্ব্বসীরূপা কবিতার মৃগয়া বলিলেই হয়। ভাষা অসিকৃপাণ ভল্লপরশুময়ী।

মুদ্রাকর বোধ হয় মিলের অত্যন্ত পক্ষপাতী সেজন্য কবির পরম অমিত্র-ছন্দের কবিতাটিকে মিত্র করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন—পল্লীবাণীতে প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপ—

"করুণ সঙ্গীত এক উঠিল সহসা
ভাসি মেদুর সমীরে নিবিড় তমসা-
ময়ী সেই বনভূমে, চকিত বিস্মিত
নেত্রে অবন্তীর নাথ শুনি সে সঙ্গীত
মধু চাহিল নয়ন তুলি, মেঘমুক্ত
সপ্তমীর অর্দ্ধ শশধর—উন্মুক্ত
প্রকৃতিবক্ষে অকস্মাৎ ঝাঁপি দিল পূত
রৌপ্যবাস।"

বোধ হয় কবির পাণ্ডুলিপিতে ছিল এইরূপ—

"করুণ সঙ্গীত এক
উঠিল সহসা ভাসি মেদুর সমীরে
নিবিড় তমসাময়ী সেই বনভূমে
চকিত বিস্মিত নেত্রে অবন্তীর নাথ
শুনি সে সঙ্গীত চাহিল নয়ন তুলি
মেঘমুক্ত সপ্তমীর অর্দ্ধ শশধর
উন্মুক্ত প্রকৃতিবক্ষে অকস্মাৎ ঝাঁপি
দিল পূত রৌপ্যবাস।"

এরমধ্যে কেবল বাদ গেল "মধু"। কিন্তু কবির পাণ্ডুলিপিতে মধু থাকিবার কথা নহে—তা ছাড়া 'মধু'ত শোনা যায় না। "শুনি সে সঙ্গীত মধু" এই 'মধু' নিশ্চয়ই মুদ্রাকরের সংযোজন। এখন সমস্যা হইতেছে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে "অর্দ্ধ শশধর" কাহার লাভ করা উচিত?

"মধুর মিলন"—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ও এম, সি, মির্জ্জা রচিত। চণ্ডীবাবু কবে O. M. C. Mirja উপাধি পাইলেন এবং আরব কি পারস্য কোথা হইতে পাইলেন জানিনা—আজকাল O. B. E. উপাধি দেখিতে পাই—কিন্তু এই অদ্ভুত উপাধি কখনো দেখি নাই। (এম, সি, মির্জ্জা মহোদয় মার্জ্জনা করিবেন)। "সু অভিনিবেশ" ইত্যাদি দুই একটী শব্দ বাদ দিলে কবিতাটি মন্দ হইত না।

ভারতবর্ষ—শ্রাবণ, ও ভাদ্র "একটী টাকা" শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কবিতার বিষয় নির্ব্বাচন যেমন সুন্দর হইয়াছে—নামকরণ তেমন কবিত্বময় হয় নাই। বিষয়টি বড়ই কবিত্বের উপযোগী। একজনের বৃদ্ধপ্রপিতামহ ঠগী ছিল। সে বহুজনের গলায় ফাঁস দিয়া হত্যা করিয়া অর্থার্জ্জন

করিত। ঐরূপে আহৃত একটি টাকা ত্রিশূল চিহ্নিত ছিল—সেই টাকা বহু হাত ঘুরিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং সেই টাকা গলায় লাগিয়া গৃহস্থের শিশুপুত্রটি মারা যায়—তাই কবি বলিয়াছেন—

"গায়েতে ইহার কত কণ্ঠের মরণের স্বরমাখা"

"শ্বাসরুদ্ধের নিশ্বাস ছাড়া তৃপ্তি উহার নাই।"

দুঃখের বিষয় কবিতাটীর রচনাভঙ্গি সন্তোষজনক হয় নাই—কোন খানেই রস জমে নাই।

"টাকা লাগায়েছে গলে"—"আবার নিয়েছে লাগ" "যেমনেতে হোক্ করিবি" 'গায়েতে' 'বুকেতে' 'কণ্ঠেতে' ইত্যাদি পদবিন্যাস আদৌ সুষ্ঠু বা শিষ্ট হয় নাই—পাদপূরণে 'হায়' 'আহা' 'যে' ইত্যাদির বারবার ব্যবহার কবির লেখনীর উপযুক্ত নহে। ছন্দটিও যেন বিষয়ের উপযোগী বলিয়া মনে হয় না।

"পুষ্করা পাওয়া"—"পাপের মূষল" ইত্যাদি পদবিন্যাসে বেশ ব্যঞ্জনা আছে।

"আবাহন"—শ্রীপতি প্রসন্নের। "মঞ্জু" "মঞ্জীর" "অঞ্জন" "বিশ্বভুবন বাঞ্ছিত ধন" ইত্যাদি অনেকগুলি মিষ্ট শব্দের মিশ্রন তার কলঝঙ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন।

এ শুভলগনে নব আবাহনে
এস মা অলকানন্দা
এস দেবজন বাঞ্ছিত ধন
বিশ্বভুবন বন্দ্যা
মঞ্জুল তব মঞ্জীর যায় (?)
নন্দ (?) কমল ফোটে বসুধায়
মঙ্গল হার (?) কণ্ঠে তোমার
অঞ্জন ফুল গন্ধা (?)
জয় দেব-জন বাঞ্ছিত ধন
বিশ্বভুবন বন্দ্যা।

কবি আবাহন কাহাকে করিতেছেন তাহা বুঝা যায় না। একবার বীণাপাণি একবার অলকানন্দা বা স্বর্গগঙ্গার নাম করিয়াছেন। "আজি বরষায় স্নিগ্ধধারায়" দেখিয়া মনে হয় স্বর্গঙ্গা আবার "আজি মধুমাসে আকাশে বাতাসে" ইত্যাদি দেখিয়া মনে হয় বীণাপাণি। "অঞ্জন ফুলগন্ধা" কোন সমাসে সমাপ্ত হইল? "হৃদেদিলে জ্ঞানবীতি" "জ্ঞানবীতি" কি পদার্থ? "নিখিল ভুবন পুলক মগন লভেছে হিয়ার সাড়"—অস্যার্থঃ?

"মনে পড়ে" শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার—কবিতার বিষয়টি বেশ সুস্পষ্ট নহে ভাবটি কেমন স্মৃতির আকাশে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাসা ভাসা। তবু ছন্দোলীলায় সুবিচিত্র ভাষায় খাসাখাসা চিত্র চয়নে ও ঠাসাঠাসা শব্দ বয়নে বেশ জমজমাট।

"রামেন্দ্র স্মৃতি"—শ্রীমান পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের রচিত। কবিতায় সাহিত্যরথী মহাপুরুষের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রকটিত হইয়াছে।

তবে রচনা তেমন কবিত্ব মধুর হয় নাই ভাষা অনেক স্থলে গদ্যাত্মক—মিলও বড় দুর্ব্বল ও দীন। ভাষার নমুনা যথা—স্বাতন্ত্র্য আর জাতীয় নিষ্ঠা
করেছিল যার প্রাণ প্রতিষ্ঠা
সর্ব্বতোমুখী সেবায় যাহার স্বদেশ জননী ধন্য।

কবি বলিয়াছেন "রিক্ত আসার হেরি জলধর"—সত্যই রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে জলধর বাবুর ভারতবর্ষ রিক্তপ্রবন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। রামেন্দ্র বাবু প্রবন্ধ গৌরবে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

"বাবুবিলাস"—শ্রীনিবিড়ানন্দ নকলনবীশ—সুন্দর সরস কবিতা। ছন্দ ও ভাষা সর্ব্বত্র ছন্দের উপযোগী না হইলেও আমরা কবিতাটির সম্পূর্ণ উপভোগী হইয়াছি।

"গৃহলক্ষ্মী"—শ্রীকালিদাস রায়। বহুদিন পরে আবার ভারতবর্ষে কবি কালিদাসের সহিত সাক্ষাৎ।

"মুক্তি"—শ্রীমতী লীলাদেবীর। লেখিকার মুক্তি কবিতার মুক্তিটুকু শুক্তির মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে।

"বনবাস"—শ্রীকুমুদরঞ্জনের। বনবাস ত একবার হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়—আবার কেন? কবিতাটী অতি সুন্দর। "দিশেহারা হয়ে ছুটেছি কেবল স্বর্ণমৃগের জন্য" "শৈশব সুখস্বর্গ আমার সরযূর তীরতীর্থে" ইত্যাদি পংক্তিগুলি সুন্দর। "অজয়" ও "সরযূর" মধ্যে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য সৌষ্ঠব রক্ষিত হয় নাই। কবিতাটির নাম অপূর্ব্ব বনবাস দিলে আরো সুন্দর হইত।

"প্রতিভা"—আশ্বিন। "তোমার প্রতি" শ্রীগিরিজা কুমার বসু। আপন প্রিয়ার গুণগান। কবিতাটির দুই পংক্তি আমাদের ভাল লাগিয়াছে ১। শশাঙ্কে কলঙ্ক যেন কপালে ঐ টিপটি গো। ২। চিৎকমলের বীণাপাণি হৃৎ-কুমুদের পৌর্ণমাসী। কবি বলিয়াছেন "বক্ষে তোমার মন্দাকিনী কণ্ঠে ভ্রমর গুঞ্জরে" মন্দাকিনীর সহিত ভ্রমরের সম্বন্ধ নির্ণয় স্বতই পাঠকের মনে আসিবে। "ইন্দ্রধনু ভ্রূতে ভালে শশীকলা লুকিয়েছে। ওষ্ঠে তোমার রক্তজবা গণ্ডে গোলাপ মিশিয়াছে। গণ্ডের সহিত গোলাপের এবং শশীকলার সহিত ভালের উত্তম মিল হইতে পারে কিন্তু "লুকিয়েছে ও মিশিয়াছে" এ দুটীতে একেবারে অধম মিল। কবি কয়েকটী পংক্তিতে তাঁহার প্রিয়ার যে আরতি করিয়াছেন সেই আরতীর পঞ্চ প্রদীপের তৈল দশা ও আলোক কোনটিই তাঁহার নিজস্ব নহে সবই পূর্ব্ব কবিগণের দেবালয় হইতে আহৃত।

"সোণার বাংলা"—শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। কবিত্বহীন ভাষায় বর্ত্তমান বঙ্গের দুর্ভিক্ষের কথা। সোনার বংলায় কবিতার দুর্ভিক্ষ নাই যাহা কিছু দুর্ভিক্ষ অন্নবস্ত্রের আর কবিতায় রসের।

"শরৎ"—(রঙ্গ কবিতা) শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের রঙ্গ ভঙ্গিমার অনুসরণে ব্যঙ্গ প্রচেষ্টা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী। আশ্বিন। "দুঃখের রাজ্যে" শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। এ কবিতাও আগে কোন্ পত্রিকায় যেন পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। সম্পাদকের file এর তলায় বোধ হয় পড়িয়াছিল। কুমুদ বাবুর লেখনী অবিশ্রান্ত কবিতা প্রসব করিতেছে সকল গুলির হিসাব রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন। বর্ত্তমান কবিতা অতি সুন্দর।

"ধরণী" শ্রীমান পরিমল কুমার। তৃতীয় শ্লোকটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

ওমা তোর বুঝি বক্ষের মাঝে বাজে বেদনার হাহাকার
দগ্ধ পাঁজর দহি হলো হীরা তপ্ত হিয়ায় অনিবার
নিখিলের দুখে নয়নের জল মর্ম্মর হলো জমি অবিরল
বিদলিত বুকে শোণিত ধারায় রক্ত শিলার সরণী॥

"৺ রামেন্দ্রসুন্দর"—শ্রীকরুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকোত্তরযাত্রী মহাপুরুষের আত্মার প্রতি কবির যোগ্য অর্ঘ্য।

হে রামেন্দ্র হে সুন্দর তোমার "অরোরা" সম হাসি,
স্মৃতির দর্পণে মম আরো স্পষ্ট উঠিতেছে ভাসি
মনে পড়ে যেন কোন প্রহেলিকা ভাতি
এ জাগর ঘুম ঘোরে স্বপনের সাথী
অপরূপ নববস্তু সনাতন রহস্য কল্পনা
অন্তরের তলে মোর দেয় আলিঙ্গন।
কি সত্তায় কি ভাবে সে আছেগো সেখানে
সে বোধেরে বুঝাইতে ভাষা হার মানে
অর্দ্ধমুক্ত দ্বার পথে হেরি মুগ্ধ প্রাণে
অন্তর বাহির দোঁহে এ উহারে টানে।
চলে দোঁহে কি শাশ্বতী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া
পিছে ধায় দার্শনিক ক্ষুদ্র তার মানদণ্ড নিয়া।
জীবনের বিরাট অরণ্য বর্ত্ম দিয়া
আবছায়ে লুকাইয়া যায় সে চলিয়া
জ্যোৎস্না দেয় হাতছানি তায়
মুকুলিত গীতিকাব্যে সুকুমার ললিতকলায়
সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে কতকড়ি কোমলপর্দ্দায়
শুভক্ষণে তারে চেনা যায়
তুলনায় অতীত সে অনির্ব্বচনীয়
সে পরম প্রিয়।"

"সমাজ-সঙ্গীত"—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। কবি বলিতেছেন—

অসীমপথে ছুটেযেতে ঐ কে আমায় ডাকে
ওগো শূন্য ওগো ঊর্দ্ধ
ধরার কারায় আমি রুদ্ধ
পাতাল আমায় মাতাল করে আঁকড়ে টেনে রাখে

"অতীতের স্বপ্ন"——শ্রীপতিপ্রসন্ন। ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ। ভাবানুবাদ বলিয়া কবি ভালই করিয়াছেন—তাহা হইলে আর বাদানুবাদের ভয় নাই। অনুবাদ মন্দ হয় নাই। "তুহিন আহত পত্রের মত হায়"—এই পংক্তিতে দুটী অক্ষর বেশী হইয়া গিয়াছে "উৎসবগত কক্ষ" কি? "অতী-

তোৎসব" বা "বিগতোৎসব" হইলে সমাসে সম্মান রক্ষিত হইত।

"গান"—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে পুনর্লিখিত বলিলেই হয়।

দান। গানের পরই দান। উল্লেখ যোগ্য কিছুই নাই।

"এস"—শ্রীসোনামাথা দেবীর—

"সকল বাসনা পরে মোর রাখ তব অভয় চরণ।"

"অরুণা"—শ্রীকালিদাস রায়।

সুপ্রশস্ত রক্তরেখা তোমার শাড়ীর
চারিপ্রান্তে গণ্ডী রচি রহিয়াছে ঘিরে
গোধূলি ললাটে যেন সন্ধ্যাভ্র আবীর
সিন্দুরের বিন্দু যাচা পড়িয়াছে শিরে।
করপদ কোকনদ। অধর শোনিমা
তাম্বুলের রাগে বিশ্বে জিনেছে বরণে
কলুষ পরশ হতে রচিয়াছে সীমা
কবে দুটী লাল কলী, অলক্ত চরণে।
এলে কি আজিকে দেবি সর্ব্বাঙ্গ ভূষিয়া
কামনারে বলি দিয়া তাহারি রুধিরে?
এলে কি করালী মায়ে পূজার তুষিয়া
নির্ম্মাল্য প্রসাদী জবা মালা লয়ে ফিরে?
ভক্তিভরে সসম্ভ্রমে চেয়ে রই আজি
একি রূপে হে ভৈরবি আসিয়াছ সাজি!

এই কটী পংক্তিতে কবি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব বড় সুস্পষ্ট।

প্রবাসী—শ্রীরমণীমোহন ঘোষ। মাদ্রাজে "যেথা চারি ধারে শুধু নিশ্চল কঠিন শিলার স্তূপ "বসিয়া" কবি শরৎ আগমনে বঙ্গজননীর 'অমল শ্যামল রূপের' জন্য আকুল হইয়াছেন। এই কবির রচনায় বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও ছন্দ ও পদবিন্যাসগত ক্রটী থাকে না। এ কবিতাতেও সে ক্রটী নাই।

"কৌষেয় ও কাষায়"—শ্রীকালিদাস রায়। সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য শাক্যসিংহ প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এক ব্যাধের সহিত তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের অনুপযোগী পরিধেয় কৌষেয় বসন তাহার কাষায় বসনের সহিত বিনিময় করিতেছেন এবং এই বিনিময়ের ফলে ব্যাধের অন্তরে ধর্ম্মনিষ্ঠা জাগিয়া উঠিল এবং সে বুদ্ধদেবের শিষ্যত্বগ্রহণ করিল। ইহাই এই কবিতার আখ্যানাংশ।

মানব জীবনাংশুক জীবরক্ত বিন্দুদাগে
ঘৃণিত মলিন,
আনন্দ শুভ্রতা দিয়ে এস মোরা করি তায়
আবার নবীন।
কৌষেয়েরে জীর্ণ করি দূর কর জগতের
দম্ভ মোহ দ্বেষ
কাষায়ে পবিত্র করি রচি এস মানবের
নির্ব্বাণের বেশ।

নির্ব্বাণ আত্মার চিরলয়—এই চিরলয়ের বেশ আবার কি? নির্ব্বাণের পূর্ব্বাবস্থা পূর্ণনগ্নতা—যখন দৈহিকবাস, আত্মিক বাস পর্য্যন্ত বিচ্যুত হইবে তখন আবারও বেশ। "নির্ব্বাণ সাধনার বেশ" বলিলে কথাটা সুষ্ঠু হইত।

"পঞ্চভূত"।

ওই যে বাহিরে শত শত প্রাণীর আর্ত্তনাদ, নিখিলবিশ্বে মাথা রাখতে এতটুকু স্থানের জন্য এই যে তা'দের প্রাণপাত—বাস্তবিক তুমি তাদের জন্য একবার ভাব?—একমুঠো দানার জন্য তারা প্রখর রৌদ্রে কি পরিশ্রমটাই করছে! আমরা ত সুখেই আছি—যে দিকে ঝাসে হয়ে যাচ্ছে সে দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আমরা আমাদের ছায়াসুপ্ত আবাসে চুপটি করে বসে আছি—

ইব্‌সেন

বর্ণ বিভাগ ও জাতি ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মানব আমরা, আমরাও ইতরেতর জড় চেতনের সাদৃশ্যে শিশ্নোদর মূর্ত্তিদ্বারা আত্মসুখ সম্পাদনে রত থাকিলেও সেই সুখের সেই মোহের তমিস্রা মধ্যে যখন সেই শুভ মুহূর্ত্তে স্বীয় নিয়তি রেখা দেখিতে পাই তখন দেখিতে পাই যে পর আমার সর্ব্বস্ব আমার ধন। পর না থাকিলে আমি থাকি না। স্ত্রী পুত্রাদি স্বজনগণকে লইয়া যে পরসেবা আরম্ভ হয় তাহা প্রতিবেশী পল্লীবাসী, নগরবাসী, দেশবাসী ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর সেবাব্রত গ্রহণ করিবার জন্য সে চিরব্যাকুল। তাহার এই বাসনা সর্ব্বগ্রাসী। বিপুল বিশ্বের রাজত্ব, পার্থিব ধন রত্ন রাণীর অধিশ্বরত্ব সুস্থ সবল যৌবন মদান্বিত নবীন দেহ, সুকুমারীর সুস্থ দেহলতার প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি সমস্ত পার্থিব বাসনা সৃষ্ট সুখ সৌভাগ্য সমূহ অর্জ্জন জন্য চিরলোলুপ কিন্তু তদুপযোগী শক্তি সামর্থ্য কোন মানবের একের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব নহে।

বিভিন্ন স্বার্থ বা বিভিন্ন ভোগোপকরণ লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকরই বিভিন্ন কর্ম্মজ্ঞান কুশল ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে হয়। বাসনার বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে বহু লোকের বহু আয়াসের বহু পরিশ্রম ও সময়ের প্রয়োজন হয়। মানবীয় বিলাস বাসনার রঙ্গভূমি মহানগরী সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য একজন মানবের স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জন করা অসম্ভব। এইজন্যই মানবকে পরস্পরের সহায়তাকল্পে কেহ হল, কেহ হলাহল, কেহ অসি, কেহ মসী প্রভৃতি অগণ্য উপকরণ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের পুষ্টির জন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের কর্ম্মানুরূপ ফলভাগী। প্রত্যেকের আত্মশক্তি যে পরিমাণে পর সেবায় নিযুক্ত সেই পরিমাণ তাঁহার বাসনাগ্নির ইন্ধন রাশি সুলভ। আত্মসুখান্বেষণে জীব শ্রেষ্ঠ মানব মানবেতর জীব জন্তু, তরু গুল্ম ইষ্টক প্রস্তর, জল বায়ু সকলের সেবা করিতে বাধ্য। সুতরাং আত্মসেবার মোহমদিরা বিভ্রান্ত মানব পরসেবার জীবনব্যাপী অনাদিব্রত লইয়া আবির্ভূত। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে জড় চেতনে, জড়ে জড়ে। চেতনে চেতনে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন, জড় চেতন নির্ব্বিশেষে পরস্পরের সেবা করা সৃষ্টির সনাতন বিধি। মানব তাহা অতিক্রম করিবে কিরূপে? সুতরাং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সৃষ্টির সার প্রতি মানবের মধ্যে সংখ্যাতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও জড় চেতন নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করা রত থাকাই মানব ধর্ম্ম। এইখানে অগণ্য ভেদ সমূহের মধ্যে এবং তথা কথিত বর্ণ ও জাতি-ভেদ মধ্যে এক অচ্ছেদ্য অভেদ নীতি বিদ্যমান। এই ভেদাভেদ নীতি যে মানব যতটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি মানব ধর্ম্মে ততদূর উন্নত ও সেই পরিমাণ লব্ধ কাম হয়েন। হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড হিন্দুর বর্ণবিভাগ প্রভৃতি এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ নীতি প্রসূত। পাশ্চাত্য রজত কাঞ্চন নির্ম্মিত সমাজের নব প্রসূত জাতি ভেদ অপেক্ষা হিন্দুর গুণকর্ম্ম বিভাগ জনিত জাতিভেদ যে কত শ্রেষ্ঠতর তাহা জড় বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের বিষয় নহে। জড় বিজ্ঞানের অন্তরালে যে লোকাতীত বিদ্যাজ্ঞান দৃশ্যাদৃশ্য অস্তত্র সৃষ্ট নিয়ামক তত্ত্বিদ্যা পারদর্শী দিব্য চক্ষুষ্মান মহাপুরুষ ব্যতীত ক্ষুদ্র মানবের ভোগ সুখ বাসনা মুগ্ধ সংকীর্ণ হৃদয় আত্মভিমানের চিরদাস তথা কথিত নায়কগণ হিন্দুর বর্ণ বিভাগকে বিপর্য্যস্ত করিতে সম্পূর্ণ-রূপে শক্তিহীন। সর্ব্বদর্শী লোকক্ষয়কারী অনাদি বৃদ্ধ-কাল ইহার সাক্ষী।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে অসংখ্য বর্ণ ও জাতিভেদ বিদ্যমান থাকিলেও হিন্দুর সকল বর্ণের বা জাতির মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির একান্ত

অভাব এখনও পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। একজন মানবের পক্ষে বা একটি মানব সমাজের পক্ষে সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেক মানবের সমস্ত অভাবমোচন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হওয়াতে অনাদিকাল হইতে মানব দলবদ্ধ হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্ম বা বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সহানুভূতির অত্যন্তাভাব ঘটিলে মানবের' পক্ষে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। পৃথিবীর বক্ষোপরি যে অনধিক তিনশত কোটী নরনারী বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদের এই অপরিমেয় সংখ্যা একদিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। প্রাচীন পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি সমগ্র ধরণীপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন নরসমাজের যে সকল কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া অথবা জনশ্রুতি অবলম্বনে অধুনাতন মানবের পথ প্রদর্শক হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অতি প্রাচীনকালে অতি অল্পসংখ্যক নরনারী বিচরণ করিতেন। ধরণীপৃষ্ঠ তখন স্বভাবজাত বনরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। সেই সকল কানন-ভূমির মধ্যে ইতস্ততঃ এক একটি নরপরিবার বাস করিতেন। বনজাত সুমধুর কন্দমূলদল; নির্ঝরিণী বা প্রস্রবণদত্ত বিমল সুপেয় পানীয় এবং বনজাত উদ্ভিদ বল্কল তাঁহাদের আহার্য্য পানীয়ের অথবা শীতাতপ, বাতবর্ষানিবারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আদি মানব অগ্নির বা অস্ত্রের ব্যবহার পর্য্যন্ত জানিতেন না। স্রষ্টার কৃপায় মানবপরিবার যেমন ক্রমশঃ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে থাকিলেন তদনুরূপ তাঁহাদের অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচনের জন্য উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা ক্রমশঃ প্রথমে প্রস্তর ও পরে লৌহ বিনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহারের ও কাননচারী জীবসমূহের দেহজাত আমমাংস ক্রমশঃ ইন্ধন যোগে পাক করিবার প্রণালী শিক্ষা করিলেন। সংখ্যাধিক্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভাবের পরিমাণ বৃদ্ধি জনিত তাহা মোচনকল্পে বিশ্বস্রষ্টার আশীর্ব্বাদ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানব ক্রমশঃ বনজাত শস্যরাজি স্বীয় আয়াসে বহুল পরিমাণে উৎপাদন জন্য কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিলেন। নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃষি-যোগ্য ভূমিখণ্ড পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাহা কর্ষণ করিবার আয়োজন উপস্থিত হইলে নরবুদ্ধি ক্রমশঃ লৌহাস্ত্রের আবিষ্কার করতঃ হস্তে পরশু ও স্কন্ধে হল ধারণ করিয়া আহার্য্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছিলেন। বৃক্ষত্বক বা পশু চর্ম্ম যখন দেহাবরণের সর্ব্ববিধ অভাব মোচনে অসমর্থ, অপ্রচুর বা অশিষ্ট বোধ হইতে থাকিল তখন মানবীয় মস্তিষ্ক নানাবিধ তন্তুজাত দৃঢ় ও স্থূলবস্ত্রের উদ্ভাবন করতঃ স্ব স্ব অঙ্গরক্ষার ব্যবস্থা করিতে থাকিলেন। কাননচারী হিংস্র পশুগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া মানবকে স্বীয় করধৃত কুঠারাদি আততায়ী হননের জন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে হিংসার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গদোষে মানব সর্ব্বপ্রথমে হিংসাবৃত্তিকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে আদিমানব নগ্ন বা অর্দ্ধ নগ্ন দেহে তথাকথিত অসভ্য অবস্থায় বিচরণ কালে যেরূপ ছিলেন এখনও প্রকৃতিগত সেইরূপই আছেন। তদানীন্তন তরুকোটর, গিরিগুহা বা পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমানকালের ইষ্টক, প্রস্তর বা লৌহ বিনির্ম্মিত সুধাধবলিত, নানা নয়নরঞ্জন কারুকার্য্য খচিত, সৌদামিনীসেবিত গগনস্পর্শী, হর্ম্ম্যবাসী, বনফলমূল অথবা আমমাংস বা অপক্ক মাংসের পরিবর্ত্তে নানাবিধ রসনার উন্মাদন চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য পেয় আহার্য্যপুষ্ট, নির্ঝরিণী বা নদীবাহিত পঙ্কিল সলিলের পরিবর্ত্তে সুসংস্কৃত গৃহভিত্তি সংলগ্ন যন্ত্রমুখলব্ধ সুপেয় পানীয়দ্বারা পরিতৃপ্ত, কাননকক্ষে অথবা ঘন-সন্নিবিষ্ট উপবন বেষ্টিত ক্ষুদ্রপল্লীমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-ভাবে হিংস্রজীবকুলের করাল দংষ্ট্রাস্পর্শ ভয়ে সদা শঙ্কিত থাকার পরিবর্ত্তে জনসঙ্ঘ শব্দময়ী নয়নরঞ্জন-রথ্যাবিপণী বিভূষিত যান বাহন সমন্বিত আলোক-মালাবিভাসিত নগরবাসী এবং নিকটবর্ত্তী জনপদ সমূহের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা কল্পে বাতবর্ষাতপ প্রপীড়িতদেহে কঙ্করময় ধুলিধূসরিত বা কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিবাহনের পরিবর্ত্তে লৌহবর্ত্ম সুশৃঙ্খলিত অথবা ধাতু-

প্রস্তর বিনির্ম্মিত মসৃণ রাজপথ অবলম্বনে ভূপৃষ্ঠোপরি বাষ্পবিদ্যুৎ পরিচালিত বা পশুনরবাহিত যান বাহন, খরস্রোতা স্রোতস্বিনী ও বিশাল বারিরিধিবক্ষবিহারী মানবীয় বিলাসিতাপুষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণ্য বাষ্পীয় তরণী অথবা নবাবিষ্কৃত যথেচ্ছগতি সমন্বিত বিহঙ্গগতি বিনিন্দিত বিমানচারী বিদ্যুৎগতিস্পন্দন সমূহ অবলম্বনে ভূলোকের সর্ব্বত্র গমন সমর্থ, আত্মগরিমাস্ফীত তথাকথিত সুসভ্য মানব তাঁহার আদি পিতৃগণের ন্যায় জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হস্তে তুল্যরূপেই ক্রীড়নক মাত্র আছেন। তাঁহার বিজ্ঞান পুষ্ট, রসায়নরসিত উৎকট চিকিৎসা শাস্ত্র, তাঁহার গভীর গবেষণা প্রসূত নগরসৌষ্টব প্রাণালী অথবা তাঁহার কৃষিবাণিজ্য-নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি বা তাঁহার উন্নত ধর্ম্মনীতি তাঁহার আত্মরক্ষা কল্পে তাঁহাকে বিন্দুমাত্র সহায়তা করিতে পারে নাই। মানবীয় সুখদুঃখ অনুভূতি সমভাবেই মানবের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অন্যপক্ষে আদি মানবের বা প্রাচীন নরসমাজের অনায়াসলব্ধ জীবযাত্রা নির্ব্বাহ জনিত সুস্থদেহ ও স্বতঃতৃপ্ত মানব যখন সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি সমৃদ্ধিপুষ্ট প্রকৃতিদেবীর বিবিধ ক্রীড়াদর্শনে ভীতিবিহ্বল বা বিস্ময়াকুলচিত্তে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের যবনিকান্তরালে অবস্থিত মহামহেশ্বরের বিবিধ বিচিত্র লীলাগাথা ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে গান করতঃ অমৃতত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন সেই তথাকথিত অসভ্য পিতৃদেবগণের তৎকালরচিত সেই সকল ভগবদগুণকর্ম্মগাথা আধুনিক ধনজন বিদ্যাবুদ্ধি আভিজাত্য বা বারুণী মদবিহ্বল সভ্যতার ভুজঙ্গভৃঙ্গবিহারী বিলাসিনী বিলাসীগণের সংসার যন্ত্রণাক্লিষ্ট নৈরাশ্যাকুল অতৃপ্ত হৃদয়ে এখনও পর্য্যন্ত শান্তির সুধারা ঢালিয়া দিতেছে।

এইরূপে পূর্ব্বাপর আলোচনাকালে দেখা যায় যে মানব যখন স্বভাবের বক্ষে সরল শিশু ছিলেন তখন যেরূপ মনোবৃত্তি বা সুখদুঃখ বা অপূর্ণতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এখনও ঠিক তদ্রূপই আছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে সেই প্রাচীনকালে তাঁহাদের অভাবের পরিমাণ ও অনুভূতি অল্প ছিল বলিয়া তাঁহাদের সরল নিরাকাঙ্ক্ষ হৃদয় প্রায় সদা তৃপ্ত থাকিত আর ইদানীন্তন কালের দুরাকাঙ্ক্ষ মানব স্বীয় উৎকট বাসনা ও কল্পনা প্রসূত অগণ্য অভাবরাজি দ্বারা যে পরিমাণে সদা প্রপীড়িত তাঁহার হৃদয়ের শান্তি বা আত্মতৃপ্তি তদনুপাতে সুদূরে অপসৃত হইয়াছে। মানবশৈশবের মানব সমাজ এইরূপে সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়া কেহ বা কৃষি বাণিজ্য, কেহ বা অপরের প্রত্যক্ষসেবা কেহবা পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য মীমাংসা বা বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেশরক্ষা কল্পে সমাজের নিয়ামকরূপে অপর কেহ বা তাঁহাদের প্রত্যেকের অবলম্বিত বৃত্তি সুচারুরূপে অল্পায়াসে সুসম্পন্ন করিবার উপযোগী উপায় ও বিধিপদ্ধতি নিরূপণ, সর্ব্বজীবের সর্ব্বকালের নিত্য অশান্তিপ্রদ সংসারজ্বালা হইতে অব্যাহতি লাভ কল্পে সর্ব্ব বিশ্বের এক অদ্বিতীয় নিয়ামক বিশ্বপতির সর্ব্বসুমঙ্গল শ্রীচরণতলে আত্মোৎসর্গ করিয়া চিরশান্তিময়ের শান্তিময় ক্রোড়ে চির আশ্রয়লাভের উপায় উদ্ভাবন অথবা তদীয় গুণরূপ নাম ও লীলা অবলম্বনে তাঁহারই হেয় প্রতিফলিত মূর্ত্তি ভুবনচারী অগণ্যজীব সমূহের সেবাকার্য্যে জনসমূহকে রত রাখিয়া প্রত্যক্ষে ও পরক্ষে তদীয় শ্রীচরণ সেবা লব্ধ চিরপিপাসিত চিরঅতৃপ্ত মানবকে সর্ব্বকর্ম্মবন্ধন ক্ষয়জাত অমৃতত্ব লাভে উদ্বুদ্ধ করিবারজন্য শাস্ত্র গ্রহণ করতঃ পরস্পরের সেবারত থাকিয়া জীবত্বের পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এইবর্ণবিভাগ সর্ব্বত্র সর্ব্বকালের মানবসমাজগুলিকে পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে। ইহার মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ নাই, ঈর্ষ্যার হলাহল নাই বা প্রভুত্বের গরিমা নাই। আছে কেবল পরস্পরের সাহায্য, পরস্পরের মধ্যে প্রীতির মধুর মিলন এবং পরস্পরের সেবারত থাকিয়া সেবানন্দে আত্মতৃপ্তি। কিন্তু হায়! মলিনতা লইয়া জগতের জন্ম। চির অমলিন, চিরমঙ্গলদীপ্ত স্বতঃতৃপ্ত আত্মারাম শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব তাঁহা হইতে যত দূরে দূরে যতদীর্ঘকাল বিচরণ করিতে থাকিবে

ততই মলিনতা দ্বারা অধিকতর কলঙ্কিত হইবে। সৃষ্টির প্রথমে জীব শ্রীভগবানের সান্নিধ্য হইতে সবে মাত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া মায়ার জগতে মায়াবদ্ধ হইয়াছিল সুতরাং তাহার হৃদয়নিহিত সদ্‌গুণরাজি তখনও ভাস্বর ছিল। পরম প্রেমময়ের প্রীতির প্রবাহে তখনও জীব হৃদয় সিক্ত ছিল, সুতরাং প্রথমতঃ যখন কেহ কৃষিবাণিজ্য কেহ শাস্ত্র ও অন্যকেহ বা সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্ববিধ সেবায় স্বেচ্ছায় বা স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছায় স্বীয় অধিকার ও শক্তি অনুযায়ী আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তখন তাহার মধ্যে উচ্চনীচ অভিমান প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, রাজা প্রজা বা সেব্য সেবক অভিমান জাগিয়া উঠে নাই। বৃত্তি বিশেষের পরসেবায় উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নিবন্ধন কাহারও দৈহিক পরিশ্রমে কাহারও বা মানসিক শ্রমে এবং অপর কাহারও বা উভয়বিধ পরিশ্রমে রত থাকিতে হইলেও একমাত্র সনাতন পুরুষের বা তদীয় শক্তির বহুধা বিলাসমূর্ত্তিগুলির সেবাই মানবীয় ধর্ম্ম বা মানবীয় কর্ম্ম নামে অভিহিত ও মানবীয় কর্ত্তব্যরূপে নিরূপিত হইয়াছিল। সুতরাং ক্রমশঃ যখন জড় ও জীব মায়ার মহামোহিনী শক্তির ক্রীড়া মানবীয় অহমিকারূপে মানব বিশেষকে স্ব স্ব প্রভুত্ব লাভের অবসর প্রদান করতঃ কাহাকেও প্রভু কাহাকেও দাস, কাহাকেও রাজা কাহাকেও প্রজা কাহাকেও বা উত্তমর্ণ কাহাকেও অধমর্ণ এবং কাহাকেও বা গুরু ও কাহাকেও শিষ্য প্রভৃতি বহুবিধ উৎকর্ষাপকর্ষের প্রহেলিকাকবলে নিক্ষিপ্ত করিলেন তখন চিরভ্রান্ত জীব বা জীবশ্রেষ্ঠ মানব মানবেতর হিংস্রজীবরাজির অনুকরণে তুল্যদেহধারী, তুল্যহৃদয় বিশিষ্ট স্বজাতীয় মানবের প্রাণে ব্যথা দিয়া আত্মসুখলাভের বিষম মোহ-বাগুরায় আবদ্ধ হইলেন। এই ভ্রান্তি বা এই মোহ বর্ত্তমানকালের কলুষকামনাদগ্ধ জাতিভেদের জনক। এই পশুত্বের অনুকরণজ ভেদাংশকে দূরে পরিহার করিয়া মানব যদি পুনরায় কখন পরস্পরের সহায়তাকল্পে বিভিন্নবৃত্তি অবলম্বন জনিত বিভিন্ন শ্রেণী, দল, জাতি বা বর্ণবদ্ধ থাকিয়াও প্রাচীনগণের ন্যায় পরস্পরের সেবারত থাকিতে সমর্থ হয়েন তবে তাঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন বিদ্বেষবিজৃম্ভিত ভেদ বিদ্যমান থাকিবে না। কেহবা মস্তক, কেহবা উদর কেহবা করচরণাদি ইন্দ্রিয়স্বরূপে, অন্যপক্ষে কেহবা নরসমাজের পিতা, কেহবা ভ্রাতাবন্ধু, কেহবা সন্তান কেহবা দাসদাসীরূপে বিশাল নরপরিবারের পরস্পরে ভিভিন্ন সেবারত থাকিয়াও এক বিশাল অভেদ নীতির উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক নরনিয়ন্তা বিশ্বনিয়ন্তার সেবাকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাচীনগণের ন্যায় ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন। গুণকর্ম্মানুসারে ইতরেতর বিবেচনাকালে যাঁহারা ভগবৎতত্ব, ভগবৎকর্ম্ম বা ভগবৎ গুণগাথা অবলম্বনে মানবকে শ্রেষ্ঠতর জীবনলাভের সন্মার্গে পরিচালিত করেন তাঁহারা অবশ্যই নরসমাজের শ্রেষ্ঠস্থানে আসনলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের অবলম্বিত বৃত্তি তাঁহাদিগকে চিরসংযত চিরতৃপ্ত ও চির করুণ হৃদয়ে উন্নিত করিয়া তুলে এবং জীবের দুঃখ নিবৃত্তিকল্পে তাঁহাদের করুণব্যবহার মানব মাত্রকেই শান্তিকামনায় তাঁহাদের নিকট শরণাপন্ন করিয়া রাখে। নিম্নতর বৃত্তিধারী সমগ্র মানবকে তাঁহারা গুণকর্ম্মের উৎকর্ষানুসারে এক হইতে অন্যবৃত্তিতে পরিচালিত করিয়া এই অগণ্য জাতিভেদকে এক মহান্ অভেদের মিলনমন্দিরে মিলিত রাখিতে সমর্থ হয়েন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণের অবলম্বিত প্রত্যেক বৃত্তি মানবের সংখ্যাধিক্যজনিত জীবনসংগ্রামের ব্যাপকতার অনুপাতানুসারে বহুধা অন্যবৃত্তিতে বিভক্ত হইয়া তদবলম্বনকারী জনসমূহকে এই যে অসংখ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছে, যাহা ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে "জাতিভেদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন নরসমাজ সমূহের নিকট নিত্য নিন্দনীয় হইয়াছে অথচ যে বৃত্তিভেদ বা জাতিভেদ সংখ্যাতীত কলেবরলাভ করিয়া মানবীয় অহমিকা অভ্যুদয়লব্ধ আধুনিক সভ্য আখ্যাধারী ভূতলচারী সর্ব্বদেশীয় মানব নির্ব্বিশেষকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে তাহা কখনও ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। ভেদ চিরদিনই আছে ও চিরদিনই থাকিবে। এই ভেদের মধ্যে অভেদ রক্ষা করাই মানবধর্ম্মের সার্থকতা। ভারতীয় বর্ণবিভাগ পূর্ব্বোক্তরূপে বহু

অবান্তর জাতিবিভাগে পরিণত হইলেও এবং অহমিকা মদবিহ্বল মানবজীবন লাভ করিয়া ভারতীয় হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শাস্ত্র ও শস্ত্র ব্যবসায়ীগণের মধ্যে অধিকাংশ মানবকালের আন্তিকুহকে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া অন্তবর্ণ বা জাতিগুলিকে আত্মেতর বিবেচনা করে তাঁহাদের উপর অযথা প্রভুত্ব বিস্তার পরায়ণ হইলেও বহু অন্তর্বিপ্লবে ভারতজননীর বক্ষ বিদারিত এবং বহুধা বহির্বিপ্লবে তদীয় সুকরুণ হৃদয় মথিত হইলেও ভারতীয় হিন্দুর তথাকথিত নিম্নবর্ণ বা জাতীয় জনসমূহ কখনও বিলাসবিহ্বল আত্মগরিমাস্ফীত পাশ্চাত্য আদর্শ লব্ধ নবসভ্যতার উন্মাদনায় উন্মাদিত পাশ্চাত্য সমাজস্থ নরনারীগণের বক্ষজাত উৎকট সাম্যমন্ত্রের কুমন্ত্রনায় আত্মপ্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। বর্ণ বা জাতি-বিভাগের মৌলিকতত্ত্বে ভারতীয় হিন্দু আপামর সাধারণ সকলেই অভিজ্ঞ না হইলেও এবং হিন্দুসমাজ বন্ধনের ক্রমশিথিলতা নিবন্ধন বহুধা সঙ্কর বর্ণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইলেও হিন্দু সমাজে এমন কেহ দুর্ভাগ্য ছিল না যে আত্ম অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া উচ্চের প্রতি শ্রদ্ধা নীচের প্রতি স্নেহ ও সহানুভূতি এবং সমকক্ষের প্রতি প্রীতিবিস্তার পূর্ব্বক দিনান্তে অন্ততঃ একটি বারও পরম প্রীতিময়ের লীলা অনুভব করিতে অসমর্থ হইত।

যে হিন্দুর মহিমাময় আদর্শ "যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে, শ্মশানে স্বরগে সম" দৃষ্টিলাভ করিতে উদ্বুদ্ধ সেই হিন্দুর বিশাল হৃদয়ে বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত ভেদবুদ্ধি এতাধিক প্রসারলাভ করিতে কখন স্বতঃই সমর্থ হইত না। বর্ত্তমানকালের হিন্দু সমাজধৃত বর্ণবিভাগ বা জাতিবিভাগগুলি প্রাচীন হিন্দুর অভেদনীতি নিয়মিত গুণকর্ম্ম বিভাগ অনুসারে স্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া আদর্শ মনুষ্যত্বলাভের সোপানশ্রেণী নহে। হিন্দুর নিবৃত্তি মূলক শৃঙ্খল সমাজের উপর, হিন্দুর কোটী প্রাণের প্রাণ প্রেমময় পরদেবতার প্রেমরজ্জুবদ্ধ হিন্দুর বর্ণবিভাগের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী বহুবিধ নব অভ্যুদিত অপুষ্ট, অর্দ্ধনিয়মিত, বলদৃপ্ত, শিশ্নোদর পরায়ণ সংখ্যাতীত ভেদবহুল বিদেশীয় রজতকাঞ্চন প্রবাল মণিমুক্তা প্রেমবদ্ধ সমাজের বিলাসবিহ্বল নরনারীগণ আপতিত হইয়া স্ব স্ব আসুর প্রভাব বিস্তার করতঃ হিন্দুরবর্ণ ও জাতিভেদগুলিকে স্বধর্ম্ম ও স্বকর্ম্মচ্যুত করিয়া বৈদেশিক অসম্বদ্ধ জাতিদের অঙ্গীভূত করিয়াছে। এইরূপে বাহিরে হিন্দুর বর্ণভেদ ও তদন্তরে পরস্পর পাশ্চাত্য জাতিভেদ বিমিশ্রিত এক অপূর্ব্ব জাতিভেদ হিন্দুসমাজকে বিপর্য্যস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য চাকচিক্যময়ী নবীন সভ্যতায় প্রত্যেক ব্যক্তিই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতঃ পার্থিব বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির উদ্দাম চেষ্টা লইয়াই উন্মত্ত। পক্ষান্তরে স্ব স্ব শ্রেণীস্থ নরনারীগণকে পরস্পরের নিকট দাসত্ব অবলম্বনে পরস্পরের সেবা ব্রত রাখিয়া চিরশান্তিলাভ কামনায় পরস্পরের সহকারীতালব্ধ আশীর্ব্বাদ পুষ্ট হৃদয়ে সকলের হৃদয়নিধি চিরশান্তিময়ের ক্রোড়ে চির আশ্রয়লাভের সমবেত চেষ্টা লইয়াই হিন্দুর বর্ণ ও জাতিবিভাগের মণিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অন্ন বস্ত্রের জন্য নিম্নশ্রেণী মানবগণের দ্বারে ভিক্ষুকরূপে বিরাজমান এবং শস্ত্রবলে বলীয়ান প্রভুশক্তি সমন্বিত তথাকথিত হিন্দুরাজ রাজেশ্বর ব্রাহ্মণের চরণে চিরবিক্রীত এবং ধর্ম্মশাসনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজবিধি নিয়মিত শ্যালিকা বিবাহরূপ কোন অনুষ্ঠান অবলম্বনে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। পক্ষান্তরে ভগবৎকরুণাপ্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি নামলাভে তদীয় প্রজা আখ্যাধারীগণের আশীর্ব্বাদলাভের জন্য লালায়িত অন্যদিকে সর্ব্বনিম্নবর্ণের শূদ্র আখ্যা প্রাপ্ত দাসদাসী কন্যাপুত্রগণ ইতরেতর নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববর্ণের নর-নারী গণের প্রতি মাতা পিতার ন্যায় স্নেহ ও করুণাকোমল বক্ষে সর্ব্বসাধারণের সেবারত। বর্ত্তমান সময়ের অন্যান্যকে পদানত করিয়া আত্মপ্রভুত্ব বিস্তারের উগ্র আয়াসের অন্তরালে যে কালজীহ্ব ভেদনীতি বিদ্যমান তাহার তুলনায় হিন্দুর প্রাচীন জাতিবর্ণভেদ কোন ক্রমে ভেদ শব্দ বাচ্য না হইয়া এই বিপুল বৈচিত্র্যময় বিশ্বের বহুধা ভেদ সমূহের মধ্যে আলৌকিক কৃপালব্ধ মানবীয় ধীশক্তি যতদূর অভেদ কল্পনা করিতে সমর্থ ততদূর অভেদের

একতুঙ্গ মিলনমন্দিররূপে কালবক্ষ সুশোভিত করিয়া আসিয়াছে। হিন্দু আমরা, আমাদের নিজস্ব হারাইয়াছি, তাহার স্মৃতিটুকুও বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাই আজি শত যন্ত্রনায়, শত ব্যথায় প্রপীড়িত হইয়া করুণ আর্ত্তনাদে বিশ্বপ্রাণকে সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছি ও জগতের চক্ষে হেয়াতিহেয় পদবিলাভ করিয়াছি।

শ্রীভগবানের মুখবিগলিত আর একটি মহামহীয়সি উক্তি এখন আমাদের একমাত্র গতি বলিয়া বিবেচিত হয়। "স্বধর্ম্মেনিধন শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ" এই উজ্জ্বল নীতির বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক প্রভৃতি প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারিত বিকৃত ব্যাখ্যা দূরে পরিহার করিয়া সরল সহজ অর্থ অনুসরণে হিন্দুসন্তানকে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে স্ব স্ব শিক্ষা বা স্বীয় অবলম্বিত বৃত্তির অধিকার অনুযায়ী হিন্দুর শ্রুতি স্মৃতি, হিন্দুর আগম, হিন্দুর পুরাণ প্রভৃতি সৎ শাস্ত্র সুশিক্ষিত করিয়া হিন্দুর ভগবান ভক্তের ভগবানের করুণাকোমল শ্রীচরণপ্রান্তের সুশীতল কিরণকণার সুবিমল আলোক হিন্দুসন্তানের বক্ষ বিকশিত করিতে পারিলে হিন্দুর বর্ণবিভাগ ও জাতিভেদের মধ্যে এক মহামিলন জাগিয়া উঠিবে নচেৎ একই ভোজনগারে যথেচ্ছ—

আহার বিহার করিতে পারিলে অথবা সকল ভেদ ঘুচাইয়া উচ্ছৃঙ্খলদাম্পত্য বিধিবদ্ধ এক অভেদ নরসমাজ গঠন করিতে গেলে তাহার পরিণামে আবার কত ন্যাশন্যালিজম্, সোসিয়ালিজম্, বলসেভিজম্ প্রভৃতি হলাহল উৎপন্ন হইয়া মানবকে ধ্বংশের কবলে কবলিত করিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এই অসাধ্য সাধন কে করিবে? ব্রাহ্মণ লইয়াই হিন্দুর হিন্দুত্ব; কালের শাসনে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেবের চরণছায়া লাভে বঞ্চিত। তিনি ব্যতীত স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব ব্যতীত আর কেহ বা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি বা ব্রাহ্মণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? তিনি আসিবেন! তাঁহার যে প্রতিজ্ঞা আছে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে, সাধুগণের পরিত্রাণের ও দুষ্কৃতির দলন জন্য চিদ্ঘন আনন্দঘন দয়াঘন রসঘন রসরাজ বিগ্রহ তিনি যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত।

গোবিন্দদাস।

আষাঢ় গিয়াছে চ'লে ঘনঘটা লয়ে;
এসেছে শরৎ নামি' শেফালি মালিকা ;
মেদুর মারুত আসে নীপগন্ধ ব'য়ে,
স্মিতহাস্যে নাচে ওই গোপাল বালিকা।
মঞ্জুল বঞ্জুল বনে ফুঠে উঠে ফুল,
পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার কুঞ্জে বিরাজে,
কদম্বকুসুম গন্ধে মাতে অলিকুল,
মূর্চ্ছিত মলয় শিরে বেনুগীতি বাজে।
এ নির্জ্জনে প্রকৃতির হিয়া অন্তরালে
বংশীসুরে মিশাইয়া সুমধুর তালে,
প্রেমের আনন্দগান আপনার মনে,
হে গোবিন্দ, গেয়েছিলে সেই কুঞ্জবনে।
ভক্তির প্লাবনে সিক্ত পদ সুধাধারা।
বৈষ্ণব গগন ভালে তুমি শুকতারা

শ্রীননিগোপাল জোয়ারদার।

"পঞ্চামৃত"

শিক্ষার আদর্শ

(য়ুরোপের জগদ্বিখ্যাত মনীষী আনাতোল ফ্রাঁসের বক্তৃতা।
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

অধ্যাপকগণ, বন্ধুগণ, শিশুশিক্ষার প্রণালীর কিরূপ পরিবর্ত্তন ও সংস্কারসাধন করা যেতে পারে সেই বিষয় আলোচনা করার জন্য আমরা আজ এই সভায় সম্মিলিত হয়েছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে খবরের কাগজে গ্রে সাহেব এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেছিলেন, তা' পড়ে আমি বড় আনন্দলাভ করেছিলুম। তিনি বলেন, "এই বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের এইকথা বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছে যে আগামীকালের সাধারণ শিক্ষার প্রণালী গতকালের প্রণালী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে বাধ্য"

আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ আপনাদের হাতে, এই কথা মনে করে আবেগকম্পিত হৃদয়ে আমি আপনাদের দু'এক কথা বলচি।

শিশুদের চিত্তবৃত্তি আপনারা যে ভাবে বিকশিত করে তুলবেন তার উপর আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে। আজ পৃথিবী পাপের ভারে মুহ্যমান, জিত এবং বিজিত উভয়েই হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত, ঈর্ষার বিষদিগ্ধ-বাক্য বিনিময়ে মত্তপ্রায়।

যুদ্ধের ফলে এই যে সামাজিক এবং নৈতিক বিপর্য্যয় ঘটেছে এবং যুদ্ধ অবসানে সন্ধিপত্র এই বিপর্য্যয়কেই

যখন চিরন্তন করে তোল্‌বার অভিপ্রায় জানাচ্ছে, তখন সব জিনিষকে পুনর্গঠিত সুসংস্কৃত করে তোলবার ভার আপনাদের উপর রয়েচে। যদি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ে তুলতে না পারেন তবে ইউরোপ মত্ততার বর্ব্বরতার নিম্নতম স্তরে নেমে যাবে।

লোকে বলবে "কেন এই বৃথা প্রয়াস? মানুষের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।" হাঁ, তা' ঠিক, পরিবেষ্টনই মানুষকে গড়ে তোলে, আর এ কথাও ভুললে চলবে না যে খাদ্য এবং বাতাসের চেয়ে শিক্ষাই মানুষকে রূপান্তরিত করে।

যে শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশের অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে যাচ্চে সে শিক্ষাকে আর টিঁকৃতে দেওয়া চলবে না! সমস্ত বিদ্যালয় থেকে দূর করে দাও সেই শিক্ষা যে শিক্ষা শিশুদের মনে নরহত্যাপ্রিয়তা এবং পাপপ্রবণতা জাগিয়ে তোলে।

শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হত্যা, অত্যাচার, দুর্ব্বল-পীড়ন এবং দুর্ব্বলদের পৃথিবী থেকে চিরবিলুপ্তির ইতিহাসে ভরা। Cinemaতে ছেলেদের এই সব ছবি দেখানো হয়, আর সৈনিকের বেশ পরে ছেলেরা সব বুক ফুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এ অবস্থা শুধু জর্ম্মনিতে নয়, আমাদের দেশেও তাই।

বন্ধুগণ, এই সব নিদারুণ অভ্যাস দূর করতে হবে। অধ্যাপকরা শিশুদিগকে কর্ম্ম এবং প্রেমের জয়গান করিতে শিক্ষা দিন, যুদ্ধ-বিরোধকে ঘৃণা করতে শিক্ষা দিন্। পরের প্রতি ঈর্ষা, এমন কি অতীতের শত্রুর প্রতি বিদ্বেষভাব যেন তাদের মনে স্থান না পায়।

বন্ধুগণ, বিদ্বেষকে ঘৃণা করতে শেখান্। সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপনাদের গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে একথা ভুলুলে চলবে না। শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করে সামাজিক বিপ্লব জাগিয়ে তুলে সব বলিষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষ তৈরী করে তুলুন। যারা কর্ম্মী, বীর তারাই বাঁচবে, আর সব বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এই সব শুভ চিকীর্ষু কর্ম্মীরা কেবলমাত্র স্বজাতির জন্য নয় সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য, একথা যেন তারা না ভোলে।

দগ্ধ কর সেই সব বই যা মানব-বিদ্বেষের সমর্থন করে কর্ম্ম এবং প্রেমের জয় গান কর। আপনারা এমন সব বীর তৈরী করে তুলুন যারা এই উগ্র গর্ব্বস্ফীত স্বাজাত্য এবং Imperialismকে পদদলিত করে পৃথিবী থেকে চিরনির্ব্বাসিত করতে পারবে।

আর যুদ্ধ নয়, আর বাণিজ্য নিয়ে রেষারেষি নয়; আমরা চাই এমন কর্ম্ম এবং শান্তি। সব মানুষই এক, এই চেতনা যদি আমাদের মনে জাগ্রত না হয় তবে আর আমাদের ধ্বংস থেকে কে রক্ষা করবে?

বন্ধুগণ, আমার অন্তরের একটি একান্ত বাসনা আপনাদের কাছে নিবেদন করুচি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে একটা আন্তর্জাতিক শিক্ষকসমিতি সংগঠিত হোক্ এবং তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে স্থির করুন কি প্রণালীতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং এমন সব ভাব প্রচার করুন যার ফলে পৃথিবীতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে আর "সব মানুষ এক" এই ধারণা বিশ্ববাসীর মনে বদ্ধমূল হবে।

একটা জগৎজোড়া আমূল পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে। পাপশক্তি আপনার বিষে আপনি জর্জ্জরিত হয়ে মরবে। নরহন্তা, লোভী, নিষ্ঠুর যারা তারা দূষিত রক্তাধিক্যে নিজেরাই ফেটে মরুচে।

গর্ব্বান্ধ ও পাপিষ্ঠ উপরওয়ালাদের দুর্বৃত্ততার উৎপীড়নে জনসাধারণ পিষ্ট ক্ষত বিক্ষত হচ্চে, কিন্তু তবু এই জনসাধারণ মাথা উঁচু করে জেগে উঠবে, বিশ্ববাসী এই জনসাধারণ এক মহামিলন ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং socialistদের এই ভবিষ্যদ্বাণী তারাই সফল করবে "সকল কর্ম্মীর মিলনেই জগতে অক্ষয় শান্তি স্থাপিত হবে।"

"শান্তি-নিকেতন"

(অগ্রহায়ণ)
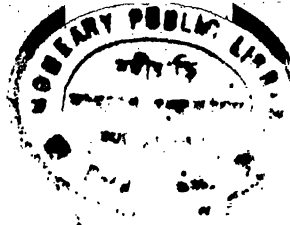
উপাসনা

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দুসভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু, তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অটল, অচল বিশ্বাসের শক্তিতে তুমি অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের ইন্দ্রিয়ের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিবে, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয়ের উপর জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দুসমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার-মথুরা, তোমারি কৈশোরের মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগর-সৈকত।"

১৫শ বর্ষ | ফাল্গুন ও চৈত্র—১৩২৬ | ১১শ, ১২শ সংখ্যা।

আলোচনী

(ক)

স্বাস্থ্য—সমস্যা।

শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই এখন প্রধান চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ কিসে দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়। দারিদ্র্য রোগ, অজ্ঞান ও দুর্ব্বলতা চারদিক হইতে চারটা বিকট দৈত্যের মত হাঁ করিয়া সমস্ত দেশটাকে গিলিতে বসিয়াছে। সমস্যা বড়ই কঠিন, কোন অভাবটার যে আগে নিরাকরণ দরকার তা ঠিক করিয়া বলা যায় না। কোন্‌টা যে কারণ আর কোনটা যে কারণ-ফল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মনে হয় দারিদ্র্য ঘুচিলে স্বাস্থ্য আসিবে, খাটিবার ক্ষমতা হইবে, জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া দেশের অর্থবৃদ্ধির পথ সন্ধান করা যাইবে; আবার মনে হয় রোগের হাত হইতে আগে রক্ষা না পাইলে সম্পদ বৃদ্ধির বা শিক্ষা বিস্তার কি করিয়া সম্ভব; অন্যদিক দিয়া ভাবিলে দেখা যায় শিক্ষা বিস্তার না হইলে স্বাস্থ্য সম্পদ কোথা হইতে আসিবে? আবার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অর্থের প্রয়োজন? যুগপৎ তিনটা অভাব একত্র দূর করিতে হইবে অথচ উপায়ই বা কি?

১৯০৭ সংস্করণের Imperial Gazetteer of India গ্রন্থে যে সরকারী মৃত্যু-তালিকা দেওয়া আছে তাতে দেখা যায় ১৮৮১—১৯০০ সন পর্য্যন্ত ২০ বছরের মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশে হাজার করা মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৯০ সালে হাজার করা ২২.১। ১৮৯৫ সালে হাজার করা ৩০.৭। ১৯০০ হাজার করা ৩০.১৮। ১৯১২ সালে হাজার করা ৪২.৩৪। এই সব মৃত্যু নানা রোগ ঘটিত হইলেও এক ম্যালেরিয়ার দাবী সব চেয়ে বেশী। এই ম্যালেরিয়া দেশকে কিরূপে জনহীন ও নির্জীব করিয়া ফেলিতেছে তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। একা এই মহাযুদ্ধে যত সংখ্যক জীবনাশ হইয়াছে আমাদের দেশে প্রত্যেক বৎসরে তত লোক শুধু ব্যাধিতেই মরে। আর সব ব্যাধির চেয়ে ম্যালেরিয়াতে বেশী মরে। ম্যালেরিয়া আমাদের আটপৌরে রোগ হইয়া পড়িয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু যেমন নৈসর্গিক জীব-ধর্ম্ম, বাঙ্গালাদেশের জীবদের তৃতীয় নৈসর্গিক ধর্ম্ম যাবজ্জনমং তাবৎ ম্যালেরিয়াক্রমণং তৎপর মরণং!

অথচ শুনি নাকি আমরা ক্রমোন্নত হইতেছি ; সভ্য-যুগে, সভ্যজাতির অভিভাবকতায় থাকিয়া গুণে জ্ঞানে বিদ্যায় এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে বাড়িতেছি যদি তবে মরিতেছি কেন এত ক্রমোর্দ্ধ সংখ্যায় ? আধুনিক সভ্যতার একটা দম্ভ যে মানুষ ব্যাধিকে জয় করিতে পারিয়াছে। দম্ভ মিথ্যা নহে। সভ্য মানুষ অনেক ব্যাধিকে মানব সমাজ হইতে তাড়াইয়াছে, অনেকের বিষদাত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, অনেককে কাবু করিয়াছে। ডাক্তার রস্ যখন প্রথম বৈজ্ঞানিক উপায়ে সিদ্ধান্ত করিলেন যে মশাই ম্যালেরিয়ার বাহন তখন মশক বধ যজ্ঞারম্ভ করিয়া পৃথিবীর অনেক স্থান ম্যালেরিয়া মুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। চেষ্টার ফলে যে সব প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুই চারি ঘর আধমরা গোষ্ঠীর বাসভূমি ছিল সে সব স্থানকে পূর্ণভাবে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা হয়, এখন সে সব দেশে অসংখ্য নগর গ্রাম দেখা দিয়াছে, ইতালীর রোম নগরের নিকট ক্যাম্পানা জনপদ ও পানামা খালের তীরবর্ত্তী দেশ আরো অন্যান্য দেশগুলি এইভাবে চেষ্টা ও বুদ্ধিবলে ম্যালেরিয়া মুক্ত হইয়াছে।

যদি এক সভ্যজাতি বিজ্ঞানবলে অর্থ সাহায্যে অন্যত্র এই অঘটন ঘটাইয়া থাকেন তবে আমাদের শাসক জাতি ইংরাজও চেষ্টা করিলে কি হতভাগা বাঙ্গলা দেশটাকে তেমনিভাবে রোগমুক্ত করিতে পারেন না ? পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, ম্যালেরিয়া-বীর Donald Ross নিজেই জাতিতে ইংরাজ! অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারেনা কেননা ঐশ্বর্য্যে ইংরাজ রাজ অদ্বিতীয়। আমাদের মত গরীব জাত যদি এই যুদ্ধে ১৫০ কোটী টাকা ব্যয় করিতে পারে, তা হইলে যেখানে আমাদের মরণ বাঁচনের কথা সেখানে যে আমরা আর ১০০ কোটী টাকা খরচ করিতে পারিব না এ কথা চলেনা। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য যদি সরকার বাহাদুর কোনো ধনী জাতের কাছে দু দশ কোটী টাকা ধার চান তা কি পাইবেন না ? ভারত আক্রমণের ভয় তো আর নাই, ধরা যাউক যুদ্ধ বাবৎ দু এক বছরের খরচ বাঁচাইয়া যদি ম্যালেরিয়া ক্যাম্পেনে খরচ করা হয় তা কি সম্ভব নয় ? খুবই সম্ভব, এবং আমাদের এখন যে অবস্থা তাতে অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে হইবে। রাজসাহায্য বিনা আমাদের আর গতি নাই। তাঁরা প্রসন্ন হউন।

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী লর্ড বিকনস্‌ফিল্ড বলিতেন "Health is the statesman's first duty" রাজনীতিবিদের প্রথম ও প্রধান কাজ প্রজা সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে নজর করা। আমাদের রাজনীতিজ্ঞরা যতটা সময়, চিন্তা ও চেষ্টা রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্য খরচ করেন তার এক চতুর্থাংশও যদি এই স্বাস্থ্য সমস্যায় দেন তাহা হইলে অনেকটা সুফল হয়। আগে প্রাণ তারপর অন্য সুখ সুবিধা ; জাতের প্রাণ নদীতে যে ভাঁটা পড়িতেছে তা তাঁহারা না দেখিলে কে দেখিবে ? আজ ৪০ বৎসর আন্দোলনের ফলে জল না পাইয়া আধখানা বেলই পাইতেছি এই আন্দোলন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য বেশী ভাল হইলে অনেক সারালো লাভ হইত।

(খ)

শিক্ষা—সমস্যা।

গত মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন গুপ্ত মহাশয় 'আমাদের শিক্ষা সমস্যা' নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ বাহির করেন। প্রবন্ধটী গবেষণার দিক দিয়া খুব মৌলিক। ইহাতে ভাবিবার ও ভাবাইবার অনেক কথা আছে। নলিনী বাবু রোগের ঠিক মূল ধরিয়াছেন। এত বৎসরের ব্যয়সাধ্য শিক্ষা ব্যবস্থা সত্বেও আমরা কেন মানুষের মত মানুষ হইলাম না তাহা তিনি জাতের মনস্তত্ব আলোচনা করিয়া দেখাইলেন। রোগ বুঝিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে যেমন কুফল হয়, ধাত বুঝিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না না করিলে শিক্ষার কুফল ফলিবেই। বিজাতীয় ভাবে বিজাতীয় শিক্ষা হজম করিতে গিয়া আমাদের এদিক ওদিক দুদিক গিয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন শিল্পকলা শিখিয়া মানুষ হইতে গিয়া লাভ হইয়াছে এই যে নিজের বা দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার মত শিক্ষা লাভ করি নাই। কফ-প্রধান ধাতুতে ঠাণ্ডা খাওয়া দাওয়া যেমন ধাতুর দোষবৃদ্ধি করে, তেমনি ভাব ও কল্পনা প্রধান ধাতু লইয়া জন্মানোতে বাঙ্গালীর পক্ষে কাব্য সাহিত্য দর্শনের

আলোচনা উদ্ভব হইয়াছে। ধাত না বদলাইলে কোনো কাজ হইবেনা, আর ধাত বদলাইয়া তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার যে ইঙ্গিত নলিনী বাবু করিয়াছেন তাহাই একমাত্র সমীচীন পন্থা। জগতে যে সব জাতি কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে ও দেশের উন্নতি করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত আমাদের এখন অনুকরণীয়। শিক্ষায় ও সভ্যতায় বাঙ্গালী এখন ভারতীয় জাতিদের শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে তাহারা অনেক পশ্চাতে।—আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোভনীয় ডিগ্রির লাভে ব্যস্ত এবং তাহাই পাওয়াকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া তাহারই ছায়ানুসরণ করিতেছি এদিকে মাড়োয়ারী প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা আমাদের দেশের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যে দখল লাভ করিয়া বসিয়া আছে। সোনার বাংলার স্বর্ণ ও শস্যসম্ভার বন্ধুর মাড়ওয়ার দেশকে সম্পন্ন ও সুভোগ্য করিতেছে আর মরু মাড়োয়ারের শ্রমনিষ্ঠা ও ব্যবসা বুদ্ধি বাঙ্গলাকে মরু করিয়া তুলিতেছে। আমাদের চোখ ভিতরে ফুটিয়াছে বাহিরে ফুটিতেছেনা। বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, কোন পথে গেলে কি ভাবে চলিলে সোনার বাঙ্গালার শ্মশান হওয়া বন্ধ হয়। মাড়োয়ারীদের পন্থায় চলিয়া অল্প বয়স হইতেই এখন বাঙ্গালীর ছেলেদের আত্মনির্ভরতা যোগে বাণিজ্য ব্যবসার সূত্র ধরিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জেলায় জেলায়, কৃষিও শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করা ও ছেলেদের ঐ জাতীয় শিক্ষা বেশী দেওয়া ছাড়া পথ দেখা যায় না।

দেশের যারা বৈশ্যজাতিয় কর্ম্মকার জাতি (artisans)—যথা, কৃষক, বণিক, কামার, ছুতার, তাঁতি, দোকানদার, তিলি, তাম্বুলি, যাহারা পুরুষানুক্রমে চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আসিতেছিল তাহাদের মধ্যেও এখন সভ্য-বিদ্যা শিখিবার নেশা প্রবল দেখা যায়, ফলে জলছাড়া মাছের মত ইহাদের অবস্থা হয়; না হয় যথার্থ কার্য্যকরী বিদ্যা-শিক্ষা, না থাকে পৈতৃক ব্যবসা বা কুলধর্ম্মে আসক্তি ও নিপুণতা; দুনৌকায় পা দিয়া ইহারা নিজেদেরও অনিষ্ট করিতেছে দেশেরও দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে। এখন যদি আবার স্বপথে চলে ও স্বধর্ম্মে মন দেয় তাহা হইলে কতকটা আশা আছে। দেশে শিল্প ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ইহারা তথায় নিজ নিজ কুলবিদ্যা নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভাল করিয়া শিখিতে পারে এবং নব নব উপায়ে বংশানুক্রমিক স্বভাববুদ্ধি ও অর্জ্জিতবিদ্যার সংযোগে নিজের সাংসারিক অবস্থা ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে। যে সব সুযোগ ও সুবিধা নিজের হাত ছাড়া হইয়া পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে তাহা রক্ষা পাইবে; দেশেরও সুদিন ফিরিবে।

(গ)

সমাজ—সমস্যা

দেশের হীন জাতিদের (depressed classes) উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া লইয়া তাহাদের উচ্চ সামাজিক অধিকার দেওয়ার জন্য নানা স্থানে আন্দোলন হইতেছে। দেশের পক্ষে এটা শুভ লক্ষণ। হীন জাতিরদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্রে, স্বভাবে সংস্কারে উন্নত হইয়াছেন তাঁহাদের সমাজ সভায় হেয় ও বর্জ্জণীয় করিয়া রাখায় যে কতটা বলক্ষয়-কর তাহা এখনো অনেকে বুঝিতেছেন না; ঠিক-ভাবে ধরিতে গেলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত হীনজাতিয় কোনো ব্যক্তি যে আজকাল তেমন ভাবে ঠেলা হইয়া আছেন তা নয়; প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি উচ্চ জাতিদের সহিত একত্র আহার বিহার করেন; কেবল প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে লইয়া সমভাবে ব্যবহার করিতে অনেকে ভয় পান, এটা মাত্র লোক নিন্দা ভয়, ভিতরের বিবেক ভয় নয়। যদি ইঁহারা অন্তরে অন্তরে বুঝিয়া থাকেন যে একজন তিলি, তামিলি বা তাঁতি জাতির শিক্ষিত উন্নত চরিত্র ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার বিহার দূষ্য নহে তবে কেন এ ভণ্ডামি অভ্যাস করেন ও মিথ্যাই মূঢ় লোকের নিন্দা-ভয়ে কাতর হন? একথা কি স্বীকার্য্য নয় যে দেশে, সমাজে বা জাতিতে শিক্ষা সংস্কারে উৎকৃষ্ট লোকের সংখ্যা বেশী সেই সমাজ বা জাতি বাস্তবিকই প্রাণ বলে বলীয়ান! তাই যদি তবে আমাদের এই দৌর্ব্বল্যের দিনে জাতিয় দেহে বলসঞ্চার করা কি উচিৎ নয়? সমস্ত দেশেই দেখা যায় একটা জাতি সম্প্রদায়

বা দল গুণে, জ্ঞানে পাণ্ডিত্যে ধর্ম্ম ও চরিত্রে শীর্ষস্থানীয়, এই দলই জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা; এই দলকে বা জাতিকে আদর্শ বোধ করিয়া নিম্নশ্রেণীরা উপরে উঠিয়া শীর্ষ-জাতিকে পুষ্ট করিয়া তুলে। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ এই পদে আসীন ছিলেন, অন্যান্য জাতি বা বর্ণ ব্রাহ্মণ culture কে আদর্শ করিয়া—অনুশীলন বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভকে লক্ষ্য করিতেন। হইতও তাহা, বিশ্বামিত্রাদির ব্রাহ্মণত্বলাভ বিখ্যাত দৃষ্টান্ত। গোঁড়া দল ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ করিবেন, তাঁহাদের প্রলাপে কান দিবার দরকার নাই। আমি অন্ততঃ এই অন্ধ গোঁড়াদলকে জাতের শত্রু বলিয়া ভাবি। দেশের উর্দ্ধগতির পথে এই অচলয়াতনপন্থীরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের মত মাথা তুলিয়া আছে।

হীন জাতিদিগকে স্বজাতির অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ ভাবিয়া তাহাদের সংস্কার করিয়া জাতিতে তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করা দরকার। শাস্ত্র ব্যবসায়ী সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা উদার মতাবলম্বী ও জাতির উন্নতি পন্থী তাঁহারা সমবেত হইয়া একটা ধর্ম্মসভা করিয়া সমাজের নূতন ব্যবস্থার ভার লউন। জাতির বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের ও ভবিষ্য আশা আকাঙ্খার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা পুরাতন জীর্ণ শাস্ত্র সব ত্যাগ করিয়া নূতন শাস্ত্র তৈয়ারী করুন, রঘুনন্দন যদি অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন, ইঁহারা পারিবেন না কেন? ব্রাহ্মণের শাস্ত্র প্রণয়ণ স্বত্বাধিকার। এই নব ধর্ম্মসভার পশ্চাতে থাকিবে দেশের গন্যমান্য বিদ্বান, পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা, তবে তাঁহারাও নব্যপন্থী উন্নতির সহায়ক হইবেন। এখনো ব্রাহ্মণ বাক্য ব্রাহ্মণ ব্যবস্থার জোর আছে; তাই মনে হয় এই ধরণের একটী ধর্ম্মসংঘ সমাজকে নূতন ভাবে গড়িতে পারিবেন।

এই সভার কাজ হইবে পুরাতন ভিত্তিতে নূতন সমাজ মন্দির গড়িয়া তোলা। বর্ণ বা জাতি বিভাগ কোনো না কোনো রূপে চিরকালই সমাজে থাকিবে; তবে সেই জাতি বিভাগ নূতন ধরণে গঠিত হউক।—যাহারা যথার্থ নিষ্ঠাবান, ত্যাগী দেশও দশহিত-ব্রত, বিদ্যা বুদ্ধি যুক্ত ও উন্নত চরিত্র তাঁহারা হউন ব্রাহ্মণ, পৈতাধারী। হইলেই মাত্র সেই দাবীতে কাহারও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবেনা।

দেশশাসক রাজা বা রাজনীতিবিদ ও সৈন্য সেনানীরা থাকুন ক্ষত্রিয় পদে। ব্রাহ্মণ বা ছুতার জাতীর লোক ও যদি রাষ্ট্রশাসন বিদ্যা বা যুদ্ধাদি কাজে শক্তি নিপুনতা প্রকাশ করেন তাঁহারা হউন ক্ষত্রিয়; যাঁহারা চাষবাস ব্যবসা বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের অর্থাগম করিবেন তাঁহারা হউন বৈশ্য। যাঁহারা সমাজের সেবা করিবে তাঁহারা শূদ্র হইয়া থাকুন। এই ধরণের জাতিভেদ বৈদিকযুগে ছিল। আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক সেই পরিচিত পুরাতন রূপে। রাঁধুনী বামুন ভট্টাচার্য্যের ছেলে হইলেও সে শূদ্র ভাবে গণ্য হইবে। আর বাস্তবিকই হইতেছেনা কি? আপত্তিকারীকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার বাড়ীতে যদি ৺কৃষ্ণদাস পালের মত লোক পদার্পন করেন তিনি কি তাঁহাকে তাঁর রাধুনী বামুনের চেয়ে বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা বা আদর খাতির করিবেন না?—না করেন না? যথার্থ গুণগ্রাহী অন্তরদেবতা যখন বলিতেছে তখন এক মিথ্যা অর্থহীন কুসংস্কারকে ভয় করিয়া অন্যথাচারণ করিবেন কি?

এইরূপে কোনো একটা উপায়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উপরে উঠিবার সুযোগ না দিলে আমাদের স্বায়ত্ব শাসন অধিকার লাভে কোনো ফল হইবে না। বিদ্যালাভ ও চরিত্র গঠনের ফলেও যদি অন্ত্যজবর্ণীয়রা মনে মনে বুঝিতে পারেন তাঁহারা দাসত্বের জন্য Eternally doomed তাহা হইলে ইহার পর একটা প্রবল বিপ্লবের সূচনা হইবেই। ছোটজাত হইলেও মানুষ মানুষ তার মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইলে সে একটা ভীষণ তেজের আধার হইয়া পড়ে তখন তাহাকে তার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিতে গেলে ফল অশুভ হইবেই। যে ব্যক্তি সাধন পুণ্যফলে নিজেকে মনুষ্যত্বের অধিকারী করিয়াছে তাহাকে তাহা হইতে সবলে বঞ্চিত করা আর যে শ্রেষ্ঠবর্ণীয় লোক নিজকৃত পাপের ফলে সত্যভাবে জাতি সম্মান হারাইয়াছে তাহাকে তাহা অবাধে ভোগ করিতে দেওয়া একই শ্রেণীর কাপুরুষতা। যাঁহারা দর্শনের দোহাই দিয়া সর্ব্বজীবে এক আত্মার সত্তা দেখেন নাই জ্ঞানাভিমানীরা যদি আত্মার

দিক দিয়া মানুষের জাতি বিচার না করেন তাহা হইলে বাহিরের লোক হাসিয়া টীট্‌কারী দিলে রাগ করেন কেন ?

মোট কথা আমি যে সংস্কার পন্থী নব্য ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠানের কথা বলিলাম তাহা স্থাপিত হইলে সমাজের এই সব অসঙ্গতি ও অসমতা দূর হইবে।

সকলেই জানেন বাঙ্গলার মহাক্ষমতাশালী দুই এক মহাত্মা ব্যক্তির সৎসাহসপূর্ণ দুএকটা সংস্কার কার্য্যের শাস্ত্র দেখাইয়া সমর্থন করিয়াছেন অনেক বড় বড় উপাধিধারী সংস্কৃতজ্ঞ প্রধান পণ্ডিত।

ধরা যাউক তাঁহারা সমাজ সংস্কারের সমর্থক ও সহানুভূতিশীল। এই শ্রেণীর সব পণ্ডিতগুলিকে লইয়া দেশের নেতারা একটী ধর্ম্মসভা করিলেন। সভার উদ্দেশ্য হইবে নূতন শাস্ত্র গড়িয়া জাতীয় উন্নতির অনুকূল নূতন নূতন ব্যবস্থা বিধিনিষেধ প্রণয়ণ করা। দেশের শিক্ষিত নব্যপন্থীরা সকলেই তাঁহাদের একার্য্যে সহায়তা করিবেন। নূতন শাস্ত্র code রচিত হইয়া পুস্তকাকারে দেশের সমাজে সমাজে বিলি হউক, জনসাধারণ জানুক দেশের শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়র নূতন শাস্ত্র মত প্রচার করিয়াছেন, উহা মানিলে ধর্ম্ম হানি হইবে না। দেশের অনেক নব্যপন্থী রাজা মহারাজাও এই নূতন শাস্ত্রানুসারে কাজ করিলে দেশে আর বাধাবিরোধ থাকিবে না। অবশ্য অনেক বিরোধী আন্দোলন হইবে, হউক, ও অমন হয়-ই। দুর্ব্বল ও অক্ষম গতানুগতিকদের চীৎকার অরণ্যে শি—র চেঁচামির মত ফল প্রসব করিবে। এই নব্য মহাসভার গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

(ঘ)

দেশে

'শিশুপাল বধ'

শুধু বাঙ্গালা দেশে নয় সমস্ত ভারতবর্ষে শিশু জাতির অকাল মৃত্যু ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাও সভ্যতার আওতায় আসিয়া পড়াতে বরং এইটা না হওয়াই উচিৎ ছিল। কিন্তু হইতেছে উল্টা। শিশু-মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের লোক-বল একটা মস্ত বল; অথচ এই লোক বল আমাদের ক্রমশঃই কমিতেছে। রোগে অনাহারে ত অসংখ্য বয়ঃস্থ লোক ধ্বংস লাভ করিতেছে তার উপর সদ্যজাত মানব কুঁড়ীগুলিও ঝরিয়া যাইতেছে। কারণ আর কিছুই নয় সেই দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা।

দারিদ্র্যের জন্য গর্ভাবস্থায় প্রসূতির পুষ্টিকর খাদ্যাভাব তার ফলে শিশুর প্রথম খাদ্য স্তন্যদুগ্ধের অভাব; দেশে গরুর, দুর্দ্দশার জন্য ভাল ও প্রচুর গো দুগ্ধের অভাব আর স্বাস্থ্য বিজ্ঞান নামজানা থাকাতে প্রসূতির ও বাড়ীর লোকের শিশু স্বাস্থ্যে তাচ্ছিল্য। প্রথমতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের অদৃষ্ট গর্ভে সন্তান উৎপাদন এবং ঘন ঘন উৎপাদন এই হইল প্রাণশক্তিহীন অপুষ্টদেহ শিশু বংশের উৎপত্তির কারণ। তারপর জন্মলাভ করিয়া নিয়মমত লালান-পালন পায় না। Economic দুরবস্থা হইতে যে সব কারণ তাহা রাখিয়া এখন অজ্ঞান হইতে যে সব কারণের উৎপত্তি তাহার একটু আভাষ দিয়াছি। (১) প্রসূতির অপুষ্ট দুর্ব্বল গর্ভ (২) প্রসূতির সন্তানপালন জ্ঞানের অভাব (৩) প্রসূতির ও বাড়ীর অন্যান্য লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য।

এ সব নিরাকরণের জন্য curative (আরোগ্যমূলক) পন্থা হইতে preventive (প্রতিষেধ মূলক) পন্থা আগে গ্রাহ্য হওয়া উচিৎ।

একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা মেয়েদের বেশী বয়সে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে বিবাহ দেওয়া এবং বিবাহের আগে যথাবিধি মায়ের কর্ত্তব্য করণের সহায়কারী যে শিক্ষা তাহা তাহাদের দেওয়া। সন্তান পালন, ধাত্রীবিদ্যা, শিশু চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবিধি, রোগ শুশ্রূষা এই সব বিদ্যা মেয়েদের খুব ভালমত জানা উচিৎ; এই সব জানিয়া শিখিয়া যৌবনে বিবাহ করিলে শিশুদের অকাল মৃত্যু অনেকটা কমিয়া আসে। এখনো আঁতুড় ঘরের যে ব্যবস্থা আর গর্ভিণীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সাবধানতার ব্যবস্থা দেখা যায় তাহাতে সভ্য বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। দেশের প্রাচীনারা এ সব বিষয়ে যা কিছু কিছু জানিতেন নবীনাদের অজ্ঞতায় তাহা গিয়াছে।

দারিদ্র্য জনিত যে সব কারণে শিশু মৃত্যুর [illegible] তাহার আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

"বাসন্তী"

আজি বসন্তের পূর্ণ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝে
আমি শুধু মরে যাই, মরে যাই কি দুঃসহ লাজে!
একা আমি বহু নিয়ে তবু মোর নাহি সার্থকতা
আমার আমিত্ব তুমি, তুমি ছাড়া সব ব্যর্থ কথা!

তুমি আছ—আমি আছি, বিশ্ব আছে আছে কম্পপণ
তোমারে লইয়া মোর সাধনায় আত্ম সমর্পণ।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তুমি কোটিসূর্য্যে আলোকিয়া পথ,
পশ্চাতে দিতেছ শক্তি?—হ'ব নাক ব্যর্থ মনোরথ;
গিরিদরী উত্তরিয়া হাত ধরে' লয়ে চল তুমি,
পথের কণ্টক দলি' চলি আমি অন্ত-বনভূমি!

দুরু দুরু কাঁপে প্রাণ নিঃসঙ্গ যে পাথয় বিহীন
তোমারি আশায় আছি এতদিন, সারারাত্রি দিন;
দৃষ্টি আছে দৃশ্য নাই, শ্রুতি আছে নাহে শব্দ মূলে
বেদনা প্রবাহ আসি রাশি রাশি লাগে হৃদিকূলে
জ্ঞাতা আছে জ্ঞেয় নাই, কোথা রস কোথা অনুভূতি?
সর্ব্বময় তুমি ছাড়া সর্ব্বকর্ম্মে বিচ্যুতি!

এই দেহ এই মন এই আমি এই যে সংসার
কেমনে গড়িয়া তুলি' তোমা বিনা সব একাকার!
বসন্ত উঠেছে জাগি' সঙ্গে তার বসন্ত-সেনানী
ফুলে কিসলয়ে তাই ভরে গেছে সমস্ত বনানী,
পাখী আজ সপ্তস্বরা, আলোকের বন্যা ভেসে যায়
পবনের উতরোলে আর্ত্তপ্রাণ করে হায় হায়!

শিরা উপশিরা ময় বাসনার একি ব্যাকুলতা
প্রতি অঙ্গে গুমরিছে কামনার একি কাতরতা !
প্রতি অস্থিরন্ধ্রে আজ উঠিয়াছে বেদনার সুর
হে মোর হৃদয়-ধন, আজি তুমি কোথা,—কতদূর ?

ওই যে অসীমশূন্য অভাবের দীনতায় খুন
বাতাস হতাস সম, হা হা করে ফাগের ফাগুন,
ভূমি আজ তৃষাতুর, নির্ঝরিণী হয়েছে চঞ্চল,
বিশ্বের বিকাশে ফুল্ল বাসনার রাঙা শতদল !
উর্দ্ধে, অধে, মধ্যে পাশে শুধু আজ বিকাশের আশা
তুমি কোথা? কোথা আমি? কে মিটাবে এ তীব্র তিয়াষা ?

'বাসন্তী পূর্ণিমা'
১৩২৬ ।

মি—

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। গ্রামবাসীরা রোগে ও অন্নকষ্টে ক্রমশঃ শীর্ণ ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। কৃষির অবনতি হইয়াছে, শিল্পসমুদয়ও নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এমন কি গ্রামবাসিগণের ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধেও অবনতি দেখা যাইতেছে।

পল্লীগ্রামের এইরূপ অবনতির জন্যই আমরা ক্রমশঃ দীন হীন হইয়া পড়িতেছি।

বাস্তবিক পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন আমাদের জাতীয় উন্নতির একমাত্র উপায়।

এইরূপ উন্নতির জন্য সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। দরিদ্র ও দুর্ব্বল কৃষক শিল্পী ও শ্রমজীবী একত্র হইয়া কাজ না করিলে সফলতা লাভ করিতে পারিব না।

আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস ও সহানুভূতির অভাব নাই। সকলে সমবেত হইয়া কার্য্য করিবার প্রণালীও দেখা যায়। যাহাতে কার্য্য করিবার এই প্রণালী পল্লী-সমাজের সকল অনুষ্ঠানেই সম্যক্ ও সুচারুরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপযুক্ত উপায় বিধান করিতে হইবে।

আমাদের সমস্ত আয়োজন যাহাতে সমগ্র দেশে বিপুলভাবে বিস্তৃত হইয়া, আমাদের জাতীয় অবনতি প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহার জন্য গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায়, জেলায় জেলায়, একনিষ্ঠকল্যাণকর্ম্মী পল্লীসেবকের প্রয়োজন। পল্লীসেবকগণের ভাবুকতা, উদ্যম এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের উপরেই জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। এই পল্লী-সেবকগণের কল্যাণকর্ম্মে সুবিধা ও সুযোগবিধানের জন্য দেশের শিক্ষিত ধনী এবং জমিদারবর্গকে মুক্তহস্ত ও সদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

সম্পাদক—

নিবেদন

আজ একটী ক্ষুদ্র নিবেদন নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি। ক্ষুদ্র বলেই উপেক্ষা না করে যদি একটু দয়া ও ধৈর্য্যাবলম্বন করে শোনেন ত' আমার শ্রম সফল মনে কর্ব্ব।

আমার প্রথম কথা হ'চ্ছে এই যে আজ ১০ বৎসর ধরে আনুমানিক লক্ষ টাকার উপর খরচ করে এই যে সম্মিলনী চলছে এতে বাস্তবিকই কি কোন ফল হ'য়েছে? বিশেষ কোন স্থায়ী উপকার হয়েছে বলে কি আপনাদের মনে হয়?

যে সকল বৈষ্ণবকুলচূড়ামণিগণ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আশা করেন না যে এই সম্মিলনীতে এসে তাঁদের কোন ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। তাঁরা পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও সম্ভবতঃ তেমনিই আছেন। বৎসরান্তে একস্থানে একত্র হয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে গোটাকতক বক্তৃতা করে সেই ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির বিশেষ কিছু উন্নতি হওয়া সম্ভব কি? সারা বৎসর তাঁরা নিজেদের উন্নতির জন্য যে কর্ম্ম করেছেন তাতে যদি তাঁদের কিছু না হ'য়ে থাকে ত' বৎসর শেষে এ কয়দিনে কিছুই হতে পারে না। সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির দিক দিয়ে দেখলে এরূপ সম্মিলনী থেকে কোনই উপকার হওয়া সম্ভব নয়।

এরূপ সম্মিলনী তখনই সার্থক হয়, যখন সামাজিক উন্নতি করা তার উদ্দেশ্য হয়—যখন সমাজে সত্যকার বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার করা তার লক্ষ্য হয়। তবেই এ থেকে কোন স্থায়ী উপকারের আশা করা যেতে পারে। কিন্তু বৎসরে মাত্র ৩ দিন একত্র হয়ে ধর্ম্মালোচনা, সঙ্কীর্ত্তন ইত্যাদি করে সে উদ্দেশ্য সফল করার মোটেই কোন ভরসা নাই এই কয় বৎসরের কার্য্য আলোচনা করলেই দেখতে পাবেন যে এই দিকে কোন কাজই হয়নি—বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও, বিশেষ কোন প্রসার হয়নি।

চৈতন্যদেবের সময় একবার বৈষ্ণবধর্ম্মের অবস্থা চিন্তা করুন। কিরূপ প্রেমের বন্যায় তিনি দেশকে ভাসিয়েছিলেন একবার স্মরণ করুন। এই ধর্ম্মটী তখন কেমন একটী জীবন্ত জিনিষ ছিল একবার ভেবে দেখুন। তারপর তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে ক্রমে এই ধর্ম্মে প্রাণস্পন্দন ক'মে এলো—কেমন করে ক্রমান্বয়ে তার অবনতি হ'তে লাগল তাও আপনারা সকলেই জানেন। এই অবনতির অবশ্য অনেক কারণ আছে। আমি এখানে কেবল ৩টী প্রধান কারণের উল্লেখ কর্ব্ব। প্রথম—চৈতন্যদেবের মত একজন অশেষ শক্তিসম্পন্ন মহাত্মার—যাঁহাকে লোকে যুগাবতার ব'লে থাকে তাঁর অভাব। দ্বিতীয় জ্ঞানচর্চ্চার অভাব। তৃতীয় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির দিকে লক্ষ্য যাওয়া। এই শেষ কারণ সম্বন্ধে আমি একটু বিশেষ ক'রে ব'লতে চাই।

ধর্ম্মের প্রথম উৎপত্তি যে ভাবেই হোক না কেন ক্রমে তাহা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত হয়েই দাঁড়ায়। অন্ততঃ এযাবৎ যত ধর্ম্ম আমাদের সমাজে উঠেছে সকল ধর্ম্মেরই শেষে লক্ষ্য হ'য়ে পড়েছে ব্যক্তিগত উন্নতি। প্রথমে যে নীতি-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্মের উপর সাধারণ ধর্ম্ম গড়ে উঠে তার উপর আর শেষে তেমন নজর থাকে না। সমাজের সাধারণের কথা তখন আর মনেই আসে না, তখন কোন আচার পালন ক'র্লে, কিরূপভাবে উপাসনা ক'র্লে, আত্মিক উন্নতি হবে, নিজের মুক্তি হবে সেইটাই ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব হ'য়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তিগত, উন্নতিও ধর্ম্মের একটা উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই, তাঁহারও বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এইটাই ধর্ম্মের প্রধান ও শেষ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কারণ বাস্তবিক, পক্ষে ব্যক্তি কি? সমাজে তার স্থান কতটুকু সমাজ কি শুধু ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র? তা'ত নয়। ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেইজন্য ব্যক্তিগত উন্নতি যখন সমগ্র সমাজের উন্নতির পরিপোষক

হয় তখনই তাহার সার্থকতা যখন ব্যক্তিগত বিকাশ সমগ্র সমাজের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে তখনই তাহার উদ্দেশ্যের চরম সফলতা। নতুবা একজন ব্যক্তির উন্নতি হ'ল আর না হ'ল, তাতে সমাজের কি আসে যায়? ব্যক্তি যখন শুধুই ব্যক্তিমাত্র, সমাজের অঙ্গ নয়, তখন তার অবনতিতে বা উন্নতিতে সমাজের কোন ক্ষতিও নাই কোন বৃদ্ধিও নাই। কেহ তার কোন খোঁজ রাখা মোটেই আবশ্যক মনে করে না। শুনতে পাওয়া যায় হিমাচলের গহ্বরে নাকি কত যোগী ঋষি আছেন। তাঁহাদের খোঁজ কে রাখে? সমাজ তাঁহাদের কাছে কোন প্রত্যাশা করে কি? তাঁহারা নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি, নিজেদের মুক্তির চিন্তায় সমাধিস্থ। সমাজের তাঁরা কেহ নন। সমাজের সম্বন্ধেই লোকে ভাল বা মন্দ, মহাত্মা বা মূঢ়, উন্নত বা অবনত, উচ্চ বা নীচ, ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক। ভগবানও যখন মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে সংসারে অবতীর্ণ হন তখনই তিনি অবতার। সমাজের অঙ্গ না হ'লে ব্যক্তির জীবনের কোন মূল্য আছে কিনা জানি না। তাই আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে যে একটা কথা চ'লে আসছে যে "একা আসিয়াছ ভবে একাই যাইতে হবে" এ কথার কোন সুঅর্থ নাই। মাতৃগর্ভ হ'তে তুমি একটা পৃথক জীব হিসাবে ভুমিষ্ট হ'লে, তা মনে হ'তে পারে। কিন্তু সমাজের ভিতর দিয়ে সমগ্র সংসারের পারিপার্শিক অবস্থার আনুকূল্যে ও প্রাতিকূল্যে তোমার জীবন বাঁচিয়া চলে। সমগ্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ না থাকলে তোমার জন্মও অসম্ভব হ'ত—বেঁচে থাকাত' দূরের কথা। সুতরাং সংসারে তুমি একা এ মনে করার তোমার কোনই অধিকার নাই—এবং তোমার নিজের উন্নতির চেষ্টা করারও বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। এরূপ চিন্তার ধারা আমাদের একেবারে ত্যাগ ক'র্তে হবে। তাই পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব'লেছেন।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ......................
......................ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধকরি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রহে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।"

(নৈবেদ্য)

মানুষের চরমগতি লক্ষ্য ক'রে তিনি লিখেছেন—

"চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
লক্ষ কোটী প্রাণী সাথে একগতি মোর।"

(সোণারতরী)

অন্যত্র তিনি ব্যক্তিগত মুক্তির আদর্শ সম্বন্ধে ব'লেছেন—

"বিশ্ব যদি চ'লে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে,
আমি একা ব'সে র'ব মুক্তি সমাধিতে?"

(সোণারতরী)

"জন্মেছি যে মর্ত্ত্যকোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।"

(সোণারতরী)

এখন আমাদের দেশে চাই সেই ধর্ম্ম যা আমাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়ে দেবে যে আমরা সকলে একই ভগবানের সন্তান আমরা ভিন্ন নই, ভিন্ন হ'তে পারি না—আমাদের জাতি এক, আমাদের গোত্র এক, আমাদের উদ্দেশ্য এক—আমাদের কর্ম্ম আমাদের স্বাভাবিক গুণ অনুসারে বিভিন্নভাবে নিয়মিত হ'লেও তাহা একই লক্ষ্যে ছুটে চলেছে।

আর এই উদ্দেশ্য সফল করতে চৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সক্ষম। তাহা সম্পূর্ণ এই যুগেরই উপযোগী। এমন প্রেমমূলক ধর্ম্ম জগতে আর কোথায় আছে জানি না। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই প্রেমকে শুধু ভগবানের প্রতি প্রেম মনে করে এতদিন কেবল ব্যক্তিগত ভাবে এই ধর্ম্ম আচরণ করা হ'চ্ছে। যে প্রেমের বন্যায় 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়' অবস্থা হয়েছিল সেই সর্ব্বভূতে প্রেমের আদর্শ, যাতে চৈতন্যদেব একেবারে পাগলের মত হয়ে পড়েছিলেন, সে আদর্শ হারিয়ে

গিয়েছে। কাজেই এখন আমাদের মধ্যে, এমন কি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী সকলের মধ্যেও, সে প্রাণের টান আর দেখতে পাওয়া যায় না। যে প্রীতিতে যে প্রেমে মানুষের উপর মানুষকে ঘৃণা করতে দেয় না, কাহাকেও পর ভাবতে দেয় না, সকলকেই আপন ক'রে নেয়, আমাদের মধ্যে সে প্রেম এই? আমরা সকলে যদি এই প্রেমে অনুপ্রাণিত হ'তে পারি তা হ'লে আমাদের সমাজের অবস্থাটা কি হয় একবার ভেবে দেখুন দেখি? সমাজে তখন আর কদাচার থাকতে পায় না, কুনীতিও দূরে পলায়ন করে। এ কথাটা বোধ হয় আপনারা সকলেই স্বীকার কর্ব্বেন যে মানুষের সমাজে সত্যকার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ব্যাভিচারের মাত্রা খুবই কম। পৃথিবীতে সব চাইতে সেটা আপনার সম্বন্ধ মাতা পুত্রের সম্বন্ধ সেখানে ব্যভিচারের কথা বোধ হয় কেহ কখনও শুনেন নাই। মানুষের মধ্যে সম্বন্ধ যত নিকট হ'তে নিকট তর হবে, ব্যভিচারও ততই দূরে সরে যেতে বাধ্য হবে। এক বৈষ্ণব ধর্ম্মই এখন মানুষের মধ্যে এই একাত্মভাব আনতে পারে সমস্ত সমাজকে প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলতে পারে সকল কদাচার ও দুর্নীতি দূর করে সংসার কেই স্বর্গ করে তুলতে পারে, ধর্ম্মের এর চাইতে বড় সার্থকতা আর বোধ হয় কল্পনা করা যায় না। সেই জন্যই চৈতন্যদেব সাধারণে প্রচার করেছিলেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি।" আচণ্ডালে প্রেম দান করতে হবে এ তাঁহারই শিক্ষা। সন্ন্যাস গ্রহন করার পর নীলাচলে অবস্থান কালেও চৈতন্যদেব সমাজের সাধারণের চিন্তা ত্যাগ করতে পারেন নি তাই তিনি নিত্যানন্দকে বলেছিলেন—

> "প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজ মুখে।
> মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেম মুখে॥
> তুমিও থাকিলা যদি মুণি ধর্ম্ম করি।
> আপন উদ্দাম ভাব সব পরিহরি॥
> তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
> বল দেখি আর কেবা করিবে উদ্ধার॥
> ভক্তি রস দাতা তুমি তুমি সম্বরিলে।
> তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে॥

চৈ-ভা।

বাস্তবিকই এই ত ধর্ম্ম। অবতার যদি সত্য হয় তার সার্থকতা ত এইরূপে প্রেম বিলানতেই, যাহাতে মূর্খ পণ্ডিত বিচার করে না, দরিদ্র ধনী বিচার করে না, নীচ উচ্চ বিচার করে না,—যাহাতে পতিত বলে উপেক্ষা করে না, দুঃখী বলে ছেড়ে যায় না, দীন বলে পরিত্যাগ করে না—যাহাতে জাতিবিভাগ দেখে না, ধর্ম্মবিভাগ দেখে না, গুণবিভাগ দেখে না। এই জন্যই চৈতন্য অবতার। দাঁড়ি ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার করেন নাই। তাই তিনি শূদ্র রামানন্দ রায়কে বলেছেন—

> "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেহ নয়।
> যেই কৃষ্ণতত্ত্ববক্তা সেই গুরু হয়॥"

চৈ-চ।

তিনি যবন হরিদাসকে বিনা বিচারে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁর কি বিচার আচার থাকতে পারে, তিনি যে প্রেমেই পাগল। যাঁরা খাঁটী চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম আচরণ করবেন তাঁরা জাতিবিচার করেন চলতেই পারে না। এই ধর্ম্মে জাতিবিচার থাকলে শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতি শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু হ'তেই পারতেন না। যবন হরিদাসও অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে স্থান পেতেন না। এখন আবার চৈতন্যদেবের এই খাঁটী বৈষ্ণবধর্ম্মই প্রচার করতে হবে। তবেই সম্মিলনী দ্বারা একটা সত্যকার কাজ হবে।

তাই বৈষ্ণব সম্মিলনীর সভ্যগণের নিকট আমার নিবেদন যে তাঁরা এখন এই প্রচার কার্য্যে হাত দেন। তাঁদের মধ্যে এমন লোক হয়ত অনেক আছেন যাঁরা খুব আগ্রহ সহকারে একাজে ব্রতী হ'তে চাবেন। তবে সাধারণ্যে এই ধর্ম্মের আদর্শ প্রচার করা খুব শক্ত হবে। কারণ এখন বোধ হয় ঠিক চৈতন্যদেবের সময়ের অবস্থা আর নাই এবং তাঁর মত প্রচারকও নাই। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে। তাকে অস্বীকার করবার উপায় নাই। আর সেটা এমন জিনিষও নয় যে যাদুকরের যষ্টী হেলনে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। সেইজন্য এখানকার প্রচারকদের খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। এখন বৈষ্ণবধর্ম্মের সেই সকল সত্য প্রথম প্রচার

আরম্ভ করতে হবে যা সাধারণে খুব সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই সকল সহজ সাধারণ সত্যের ভিতর দিয়া তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করতে হবে। এখন অধিকাংশ লোকেই হয়ত একটু বেশী স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। আজকাল জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে হ'লে একটু স্বার্থ না দেখলে হয়ত চলে না। কিন্তু তাদের এটা বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে শেষ পর্য্যন্ত অন্যের প্রতি সহানুভূতিই স্বার্থপরতার চাইতে অনেক বেশী কাজ করে। সহানুভূতিই যে সমাজ বন্ধনের মূল কারণ—সেটা যে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নতম জীবের সমাজ থেকে আরম্ভ করে জীবজগতের উচ্চতম পরিণতি মানবসমাজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে তার মূলে এই সহানুভূতি। এই সব চিরন্তন সত্য সাধারণ্যে প্রচার করলে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখলে তবে ক্রমে তাদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের আরও গূঢ় ও মধুর সত্য প্রচার করা সহজ হবে। তা না হ'লে প্রথম থেকেই তাদের মধ্যে ভাগবতের গীতার বা ষট্ সন্দর্ভের তত্ত্বপ্রচার করতে গেলে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব বলেন শুনেছি যে তিনি সাধারণের কাছে ভাগবতের সমস্ত অংশ ব্যাখ্যা করেন না। কারণ ঐ গ্রন্থে এমন স্থান আছে যার তত্ত্ব সকলে বুঝবে না, এবং অনেকেই ভুল বুঝবে। তাতে কুফলই বেশী হবার সম্ভাবনা। এর দৃষ্টান্ত বোধ হয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যেও বিরল নয়। ঐ কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবিকই ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে রীতিমত জ্ঞানার্জ্জন করা চাই। সেই জন্য এখন দরকার মানুষের যে একটা সহজ ধর্ম্মজ্ঞান আছে সেইটার সাহায্য নিয়ে তার কাছে প্রচার করা সেই সব সাধারণ সত্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মের সেই সকল সরল শিক্ষা, যেমন ধরুন "জীবে দয়া, নামে রুচি" ইত্যাদি যাহা তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার কর্ম্মের ভিতর দিয়া কাজ করে' সেগুলিকে সুন্দর ও মধুর করে তুলবে। তখন তারা ভোগের মধ্য দিয়েই ত্যাগের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারবে। তখন তাদের ভক্তি ও কর্ম্মের মধ্যে সফলতায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। তবেই দেখতে পাওয়া যাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম সার্থকতা।

আমার শেষ নিবেদন কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের নিকট। তিনিই এযাবৎ এই সম্মিলনীর ব্যয়ভার বহন করে আসছেন। সকল সৎকার্য্যেই এমন মুক্তহস্ত দানবীর সত্য সত্যই বিরল। এই সম্মিলনীর জন্য তিনি এই কয় বৎসরে বোধ হয় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু এই খরচের অনুপাতে কাজ হয়েছে বলে মোটেই মনে হয় না। অথচ এই টাকায় সম্মিলনীর দ্বারা কত কাজ করা যেতে পারত। অনেকে হয়ত বলবেন যে মহারাজার টাকা তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি খরচ করতে পারেন, তাতে আর কারও কি বলবার অধিকার আছে? তাত' নিশ্চয়ই। তিনি যখন নিজের জন্য খরচ করেন তখন অবশ্য কারও কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু যখন তিনি সাধারণের কার্য্যের জন্য ব্যয় করেন তখন সাধারণের কিছু বলবার অধিকার জন্মায়। অন্ততঃ যে ভাবে খরচ করলে সাধারণের যথার্থ উপকার হবে এবং তাঁর খরচ করারও সার্থকতা বেড়ে যাবে সে উপায় দেখিয়ে দিলে বোধ হয় দোষের হয় না। সেইজন্য আমার নিবেদন এই যে তিনি প্রতি বৎসর যে ১৫।২০ হাজার টাকা খরচ করছেন এই টাকা নিয়েই কাজ আরম্ভ করুন। এ টাকা কম নয়। একটী কমিটী গঠিত করা হোক যাতে বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং অন্যান্য সাধারণ পণ্ডিত ও কার্য্যক্ষম ব্যক্তিগণ সভ্য থাকবেন। তাঁরা ঠিক করবেন কি ভাবে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করা যাবে। এ স্থলে কিরূপভাবে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে তার একটা ইঙ্গিত্ দেওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে দোষের হবে না। আশা করি সুধীবর্গ সেটায় একটু কর্ণপাত করবেন। এই প্রচার কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। এই শিক্ষা হ'তেই জ্ঞান বৃদ্ধি হবে এবং এই জ্ঞানের সাহায্যেই আসল প্রেমমূলক ভক্তির বিকাশ হবে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে প্রধান শিক্ষা সমস্ত ভেদাভেদ দূর করা সেটাও প্রচার তখন সুকর হয়ে উঠবে। ধর্ম্মের দিক থেকে

ভারতের ভবিষ্যভাগ্য গড়ে তুলতে এক বৈষ্ণবধর্ম্মই পারে। কারণ এই ত্রিশ কোটী লোককে এক মহাজাতিতে পরিণত করতে এই ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সক্ষম। আর আমার মনে হয় আমাদের এই কাজ সুরু করতে হবে পল্লীগ্রাম থেকে। কারণ সেইখানকার অবস্থাই বোধ হয় এখন সকল রকমেই খারাপ। প্রথম বৎসর ৫ খানি গ্রাম নিয়ে একটা পরীক্ষা আরম্ভ করা যেতে পারে। তার জন্য ৫ জন প্রচারক ও একজন পরিদর্শকের প্রয়োজন। গ্রামে পাশাপাশি ৫ খানি গ্রাম নিলে বোধ হয় সুবিধা হ'তে। তাতে হয়ত প্রচারক একজন কখনও যেতে পারে। এই কাজে প্রথম বৎসর ৬।৭ হাজার টাকার বেশী বোধ হয়; খরচ হবে না। তার পর কার্য্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কমিটী তাঁদের টাকা বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করবেন। এরূপ ভাবে কাজ যদি ভাল না হয় ত' কমিটী কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তন করে নূতন প্রণালী গ্রহণ করবেন। মোট কথা এই প্রণালীতে সমস্ত বৎসর ধরে যদি সুচারুরূপে কাজ চালান যায় তা হ'লে ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই একটা দেখাবার মত জিনিষ হবে আশা করা যায়। নতুবা এখন যা হচ্ছে তা প্রতি বৎসর এত টাকা খরচ করে—বৃথা কি না জানিনা—শুধু কতকগুলি বৈষ্ণব মহাত্মা একত্রিত হ'য়ে ক্ষণিক মানসিক আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সার্থকতা কি? তাই মহারাজা বাহাদুরের নিকট সানুনয় নিবেদন যে তিনি এখন সত্যকার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারের দিকে লক্ষ্য দিন এবং দেশের সমাজের ও ধর্ম্মের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।*

শ্রীনারায়ণ দাস মজুমদার।

পুরাণ-পুকুর

আমলী আমের গাছের ফাঁকে বটের ছায়ায় জল ঢাকা
দুর্ব্বাদলের সবুজ শোভায় পল্লীপুকুর যায় দেখা;
শ্যেওলা পানায় জল ঢেকেছে শাফলাফুলের ফুটছে ঝাড়
জাম কাঁঠাল আর বাঁশ পাতাতে পূর্ণ এবে পুকুরপাড়।

এর জলেতে স্নান করা আর ঝাঁপ দিয়ে সেই 'জল খেলা'
পড়ছে মনে আজকে আমার সখাসখীর মুখগুলা,
গামছা দিয়ে কোমর-আঁটা বিনিসূঁতোর হার গলে'
ফুর্ ফুরে সেই জলের হাওয়া সখীর কেশের দোল্‌দোলে।

সাঁতরে আনা শাফ্‌লাফুলের মালা দিব কার হাতে
পড়ছে মনে সখাসখীর মান অভিমান আজ প্রাতে,
ভঙ্গ আজি স্বপ্ন আমার ছোট্টকালের সুখের ঘর,
মনএস্রাজে করুণ সুরে বুলিয়ে কেবা যাচ্ছে ছড়?

---

* গৌরীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কাশিমবাজারের অধিবেশনে পঠিত।

আগাছাতে পথ ভরেছে পুকুরপাড়ে যায়না কেউ,
জলভরা সেই কল্‌সী দিয়ে তোলেনাকো জলের ঢেউ,
যায়না সেথা গেরস্থ বউ মুখঢাকা তার গুণ্ঠনে,
রণরনিয়ে উঠেনা ঘাট কঙ্কনেরি নিক্কণে।

"পিউ কাঁহাহায়" ডাক্‌ছে পাখী চাতক যাচে "ফটিক্ জল"
"বউ কথাকও"—কওগো কথা ব্যথীর আজি মন বিকল,
সাধাসাধি শুধুই পাখী নিজন পাড়ার পুকুর ধার
জল নিতে আর কইতে কথা আস্‌বেনা বউ জলের ধার।

মন কাঁদে মোর পাখীর সনে হাঁক দিতে চাই "পিউ কাঁহা"
বুকফেটে মোর উঠছে শুধু "সাহারারি সেই হা হা",
নিদাঘ দাহ দূর করেছি এর জলেতে স্নান করে
বুকের দাহ দূর করি হায় কোন মায়াবীর মন্তরে।

ওগো আমার পানায় ঢাকা পাড়াগাঁয়ের সেই পুকুর,
ওগো আমার বাল্যকালের সখাসখীর স্বপ্নপুর,
ফল্গু আমার, সিন্ধু আমার, ওগো আমার গঙ্গাজল,
ত্রিধারাতে পুণ্য তোমার লুক্কায়িত বক্ষতল।

তোমার শীতল সলিল মাঝে সখাসখীর পাই পরশ,
পানার ফাঁকে সুনীল জলে স্নেহ আঁখির সেই দরশ,
পদ্মফুলে প্রীতির মধু, মৃণাল মাঝে বাহুর ডোর
ঝাঁপ দিব আজ তোর জলেতে বক্ষে নে বক্ষে তোর।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ কর।

স্নেহের ক্ষুধা

(১)

সুনেত্রা পত্র পড়িয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল। পত্রের প্রতি অক্ষরে ব্যথ্যার যে একটা আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল তাহা তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। সুনেত্রা ভাবিয়া পাইতেছিল না কি করিয়া লোক এমন পাষাণ করিয়া হৃদয় গড়ে, হৃদয়ের করুণা ও সুখ দুঃখের সহানুভূতির ভাব গুলি কি করিয়া এমন শিথিল হইয়া পড়ে। দয়াদাক্ষিণ্য কি এমনি করিয়া লালসার আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে? সর্ব্বোপরি তাহা স্নেহের বুভুক্ষা মিটায় কি করিয়া?—

সুনেত্রা ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না। তবু ঠিক করিয়া রাখিল, রমেশ আসিলে তাহার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবে। সে তাহার ক্ষুদ্র কুকুরটাকে স্নান করাইল, তাহাকে খাওয়াইল, বিছানায় শোয়াইয়া চুম্বন করিল তবু আর তৃপ্তি হইল না; কেবল একখানা শীর্ণ রোগ পাণ্ডুর মুখ আর একটী কুসুমকলির মত শিশু তাহার নয়নের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। টীয়ার খাঁচার নিকট যাইয়া তাহা পরিষ্কার করিল। আবার আসিয়া কুকুরটাকে বুকে করিয়া শুইল। আজ সে কোন কাজেই তৃপ্তি পাইতেছিল না।

রমেশ ঘরে ঢুকিল। সুনেত্রা দেখিয়াই বুঝিল, রমেশ প্রকৃতিস্থ নয়। অন্য দিন হইলে বোধ হয় সুনেত্রা চুপ করিয়া যাইত; কিন্তু আজ আর সে পারিল না, বলিল "সেখানে গিয়াছিলে?"

"সেখানে—কোথায়?"

"কেন—কাশীপুরে?"

রমেশ একটু বিচলিত হইয়া উঠিল, বলিল "কেন, কাশীপুরে যেতে হবে কেন?" সুনেত্রা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "কেন, তুমি কি কিছুই জান না? ছিঃ—আর লুকাতে চেষ্টা করোনা; দেখতো—" বলিয়া সে পত্রখানি রমেশের কোলে ফেলিয়া দিল। রমেশ পত্রখানির দিকে চাহিয়াও দেখিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুনেত্রা ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল "ছিঃ রমেশ বাবু, স্ত্রী তোমার মৃত্যুশয্যায়, এই শেষ সময় তোমায় একবার দেখ্‌তে চেয়েছে, তোমারি সন্তান নিয়ে সে অকূল সমুদ্রে পড়েছে, তার একটা হিল্লে কর্‌তে পারছে না বলে মরতেও পারছে না—আর তুমি এখানে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ? পত্র পড়্‌লে অতি বড় যে পাষাণ তার চোখেও জল আসে এমনি কাকুতি মিনতি করে লিখেছে। আর আমার কাছে মিথ্যে কথা বল্‌বার কি দরকার ছিল? ছিঃ—"

রমেশ বুঝিল তাহার অসাবধানতায় রমার পত্র সুনেত্রার হাতে পড়িয়াছে, এখন আর কোন কথা সুনেত্রার নিকট গোপন করা চলে না। সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "তা' আমি যেয়ে কি করব"? সুনেত্রা জ্বলিয়া উঠিল, বলিল "তুমি যেয়ে কি করবে? একথা বলতে তোমার লজ্জা হলো না? একবার কি ভেবে দেখেছ, কার জন্য তোমার স্ত্রী—রমার সারা জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে; ভেবে দেখেছ কি কার জন্য সে আজ মরণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে! ছিঃ ছিঃ এই নিয়ে তুমি ভালবাসার বড়াই কর।" বলিতে বলিতে রাগে দুঃখে সুনেত্রার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

অপরাধীর অপরাধ যে পর্য্যন্ত প্রকাশ না হইয়া পড়ে সে পর্য্যন্ত সে কুণ্ঠিত থাকে। যখন তাহার দোষ বাহির হইয়া পড়ে তখন সে একেবারে মরিয়া হইয়া দাঁড়ায়। রমেশ দেখিল, সুনেত্রাকে এখন আর কোন কথা গোপন করিয়া লাভ নাই—আর গোপন করা যাইবেও না। সে বলিল "তবে শোন সুনেত্রা, এরজন্য কেবল আমাকে দায়ী করলে চলবে না। রমার এ অবস্থার কারণ যে কেবল

আমি নই একথা বোধ হয় তুমিও মনে মনে জান। তুমিও ভেবে দেখেছ কি আমার এ অধঃপতনের কারণ কে? আমিও দশ জনের একজন হতে পারতাম আমরও সুখের সংসার হতে পারত, কিন্তু তা হ'তে পারেনি কারজন্য জান? তোমার জন্য। আজ তুমিই আবার তার জন্য অনুযোগ দিচ্ছ। ছিঃ—"

সুনেত্রা অবাক হইয়া গেল। রমেশ যে এত বড় নির্ল্লজ্জ এ তাহার ধারণার অতীত ছিল। সুনেত্রা উষ্ণভাবে বলিল "রমেশ বাবু, একথা বলা তোমাকেই সাজে,—হাঁ, যে নিজের স্ত্রী নিজের পুত্রকে এ অবস্থায় ফেলে স্থির থাকৃতে পারে, তাকেই সাজে। তুমি এতবড় নির্ল্লজ্জ যে আমার কাছে, যেখানে সত্য বল্লেও কোন ক্ষতি হ'তনা, সেখানেও মিছে বলতে কুণ্ঠিত হওনি। ধিক্,—আগে তোমাকে—তোমার স্বরূপ জানলে কখনো আমার এখানে আস্তে দিতুম না। শোন রমেশ বাবু, যদি ভাল চাও, তাদের কাছে যাও, নইলে প্রায়শ্চিত্ত করবারও সময় পাবে না, বলে দিচ্ছি," রমেশ ভুল বুঝিল, সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, বলিল "যদি ভাল চাই?—যদি না যাই তবে তুমি কি করবে শুনি?" সুনেত্রা রাগিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "তোমায় এ বাড়িতে ঢুকতে দিব না।"

"কি এত দূর—আচ্ছা—" রমেশ আর ক্ষণ বিলম্ব করিল না; ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

(২)

রমেশ ধনীর সন্তান না হইলেও পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তিনটী সন্তানের মৃত্যুর পর একপ্রকার সন্তানের আশা ত্যাগ করিয়া অনেক মাদুলী, বকুল বিচি, আমড়ার আঁটি গলায় ধারণ করিয়া রমেশের জননী রমেশকে পাইয়াছিলেন। সুতরাং যাহা হয় তাহাই হইল। রমেশের উপর শাসনের পরিবর্ত্তে আদরই অধিক পরিমাণে বর্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে রমেশও যখন বুঝিল যে সে 'সবে ধন নীলমণি," তখন তাহারও মাথা বিগড়াইতে আরম্ভ হইল। পিতা কিছু বলিলে মাতা পুত্র বুকে করিয়া না খাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মহা অনর্থ ঘটাইতেন। পিতা বেগতিক দেখিয়া বৃদ্ধ বয়সে আর সংসারে আগুণ জ্বালাইতে চাহিতেন না। তিনি নীরব হইতেন।

সাবালক হইবার কিছু পূর্ব্বেই রমেশের পিতৃবিয়োগ হইল। যেটুকু বাধা ছিল তাহাও দূর হইল। বন্ধুগণ রমেশকে বুঝাইল, স্ফুর্ত্তি লুটিবার স্থান কলিকাতা—পাড়া গাঁ নয়। রমেশ জননীকে যাইয়া ধরিল সে কলিকাতায় যাইয়া পড়া শুনা করিবে, পাড়াগাঁ বলিয়াই এখানে তাহার কিছু হইতেছে না। মা প্রথমে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রের অশ্রুজলে তাহা ভাসিয়া গেল। রমেশ কলিকাতায় আসিল।

কলিকাতায় যে উদ্দেশ্যে সে আসিয়াছিল তাহা পূর্ণ করিতে তাহার কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইল না। তাহার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা সমুদ্রের বন্যার মত বাড়িয়া চলিল, বাড়ী হইতে ঘন ঘন বই, কলেজের বেতন প্রভৃতির বাবদ টাকা আসিতে লাগিল; কিন্তু সেই সব অর্থের অধিকাংশই আবগারী বিভাগের আয় বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এই সময়ই সুনেত্রার সহিত রমেশের প্রথম পরিচয়।

ক্রমে দুই একটা করিয়া রমেশের গুণকীর্ত্তির কথা জননীর কাণে উঠিতে লাগিল। প্রথমে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ভাবিলেন লোকে হিংসায় এই দুর্ণাম রটায়। পরে যখন সিন্দুক শূন্য হইয়া আসিতে লাগিল, পুত্রের চিঠিতে, তখন তাহার মনেও সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, অবশেষে একদিন তিনি পাড়ার এক বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পুত্রের বাসায় যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দেখিলেন রমেশ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহে মদের বোতল, বমি প্রভৃতিতে এক হাঁটু। রমেশের জননী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিদেশে বিভুঁয়ে, কি করিবেন ভাবিয়া কূল পাইলেন না। পরে বৃদ্ধের পরামর্শে অচৈতন্য পুত্র বুকে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সকলে বলিল—ছেলের বিয়ে দাও, রাঙা বৌ ঘরে আন; দেখবে ছেলে পোষ মানবে।" জননীও ভাবিলেন "হুঁ, ঠিক, ছেলের বিয়ে দেব।" বঙ্গদেশে কনে বড়

সুতরাং, কাজেই রমেশেরও একদিন রমার সহিত বিবাহ হইয়া গেল।

লোকের কথা ফলিল। রমেশের একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ইতি মধ্যে হঠাৎ একদিন রমেশের জননী স্বর্গারোহন করিয়া বসিলেন। এতদিন মাতাই সংসার চালাইতেন রমেশ কোন ধার ধারিত না। কিন্তু এখন তাহার পূর্ব্বকার স্বচ্ছন্দগতি সংযত করিতে হইল। রমেশ দেখিল একখানা বাড়ী ও কিছু তৈজসপত্র ব্যতীত জননী কিছু রাখিয়া যান নাই। রমেশ চক্ষে আঁধার দেখিল। কি করিয়া সংসার চালাইবে ভাবিয়া পাইল না। একা নয় যে যেমন তেমন করিয়া চলিয়া যাইবে। স্ত্রী আছে, অধিকন্তু শিশুটার দুধ যোগানই অধিক চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল, কিই বা করিবে—আর কিই বা সে করিতে পারে? বিদ্যা বুদ্ধি যেটুকু ছিল, তাহাও চর্চ্চার অভাবে ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। সকলে পরামর্শ দিল "কলিকাতায় যাও সেখানে বন্ধু বান্ধব অনেক আছে, তারা একটা কিছু করে দিতে পারবেই।" রমেশ কলিকাতায় আসিল।

রমেশের কলিকাতায় আগমনের পরে দেড় বৎসর পর্য্যন্ত রমা স্বামীর নিকট হইতে চিঠি পত্র টাকা পয়সা রীতিমতই পাইতেছিল। কিন্তু ক্রমে তাহা বিরল হইয়া উঠিল। পরে একেবারে বন্ধ হইল। রমা অনুযোগ দিয়া পত্র লিখিল—রমেশ নীরব রহিল। রমা অভিমান করিয়া পত্র লেখা বন্ধ করিল।—তাহাও বৃথা হইল। আবার কাকুতি মিনতি করিয়া পত্র লিখিল—কোন উত্তর পাইল না। সংসার অচল হইয়া উঠিল; একে একে সকল তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইল;—আর চলে না। রমার পিতৃকুলে কেহ নাই, সুতরাং তাহার দাঁড়াইবার ঠাঁইও ছিল না—সে স্বামীর ভিটাতেই পড়িয়া রহিল। চিন্তায় ভাবনায় স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। ক্রমে জ্বর আরম্ভ হইল।—একদিন বিছানা হইতে আর উঠিতে পারিলনা।

এই সময় রমেশ সুনেত্রার ঘরে মহোৎসবে মাতোয়ারা।

৩

নির্ব্বানোন্মুখ দীপ জ্বলিল। রমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "দিদি, খোকাকে আমি কার কাছে দিয়ে যাবো—কে আমার খোকাকে দেখ্‌বে এভেবে যে আমি মরতেও পারছিনে।" যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রমা এই কথাগুলি বলিল সে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "তুমি ভাল হবে রমা; মরবার কথাকি ভাব্‌তে আছে বোন্; তুমি ভাল হবে।" রমা একটু হাসিল; বলিল "ভাল হ'ব—একেবারে ভাল হ'ব। এখনো আশ্বাস দিচ্ছ দিদি! আমার যে আর দেরী নেই, তাকি আমি বুঝ্‌তে পারছিনে? আর ভাল হয়েই বা কি হ'বে—একদিনের জন্যও তাঁকে সুখী করতে পারলুম না—নিজেও সুখী হ'তে পারলুম না; আমার বেঁচে কি হবে? তবে খোকার জন্য এক একবার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে; কেন ও হতভাগা আমার কোলে এসেছিল, দিদি?—কেন এ স্বর্গের জিনিষ আমার ভাঙ্গা কুঁড়েতে এসেছিল?" রমা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার দুইচক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শুশ্রূষা কারিনীর চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "রমা আজ হ'তে তোমার খোকার ভার আমি নিলুম। তুমি কিছু ভেবোনা; এখন শান্ত হয়ে একটু ঘুমোও ত দিদি।" রমা উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, আবেগ ব্যাকুলিত কণ্ঠে বলিল "নিলে? সত্যি তুমি আমার খোকার ভার নিলে, দিদি? তুমি কে জানি না—কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পূর্ব্ব জন্মে তুমি যেন আমার কেউ ছিলে। তুমি কে, দিদি?—রমা উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে শুশ্রূষা কারিনীর হাত চাপিয়া ধরিল। দিদির হৃদয়েও একটা ঝড় বহিতেছিল। সে আর পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল "শুনবে রমা, আমি কে? আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ—আমিই হতভাগিনী সুনেত্রা।" সুনেত্রা দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

রমা খানিকক্ষণ অবশের মত পড়িয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল "তুমি যেই হও, তুমি, আমার দিদি। এ দুঃসময়ে আর কেউত, আসেনি—এক তুমিই এসেছ।

এখন আর তোমাকে ভয় নেই; এখন তুমিই আমার সবচেয়ে বড় বান্ধব।" রমা একটু থামিয়া বলিল "তাঁকে আমার হয়ে বলো, তিনি যেন খোকাকে গ্রহণ করেন। আমি পরপার হ'তে দেখে সুখী হব। আর তোমাকে কি ব'লবো দিদি, আমার সর্ব্বস্ব ধন তোমায় দিয়ে যাচ্ছি; এই নাও।" রমা পুত্রকে সুনেত্রার কোলে দিল। সুনেত্রা শিশুটিকে বুকে করিল। উঃ একি শান্তি! তাহার বুভুক্ষিত তৃষিত হৃদয়ে, একি অমৃতের ধারা! সুনেত্রা খোকাকে জোরে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার হৃদয়ে আজ সেই নারী জাগিয়া উঠিল, যাহার কোন আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, কিছু নাই; আছে শুধু বিসর্জ্জন আর শুভেচ্ছা। সুনেত্রা বুঝিতে পারিলনা কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে তাহার এই মরুহৃদয়ে মাতৃ-স্নেহের সুরধুনী নিখিল ভুবনের সারা বুক প্লাবিত করিতে চলিয়াছে। এ তৃপ্তি, এ শান্তি এতদিন কোথায় ছিল? এযে অন্ধের নয়ন লাভ, ভিখারীর সিংহাসনে আরোহণ!

সহসা সুনেত্রার চমক ভাঙ্গিল, দেখিল রমা কি যেন যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে। সুনেত্রা রমার হাত ধরিল। রমা ইঙ্গিতে খোকাকে কাছে আনিতে বলিল। সুনেত্রা খোকাকে তার বুকে দিল। সুনেত্রা ঔষধ ঢালিয়া মুখে দিতেই দেখিল দীপ নিবিয়াছে।

৪

রমেশ রাগ করিয়া পাঁচ দিন সুনেত্রার বাড়ী গেল না। পরে যখন রাগ পড়িয়া আসিল, তখন ভাবিল, এ বিবাদের মূল কারণ কি? অনেক ভাবিল; ভাবিয়া পাইল সুনেত্রার অপরাধ কোথায়? সুনেত্রা কিসের জন্য তাহার সহিত ঝগড়া করিয়াছে। রমেশের অনেক দূরে দৃষ্টি পড়িল, দেখিল একটি বালিকা তাহাকেই একান্ত আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। কি অগাধ বিশ্বাসে সে তাহাকে আপনার ভাবিয়া লইয়াছিল। সে আজ কোথায় কে জানে? আর দেখিল একটি কুসুমপেলব শিশু—কি সুন্দর? রমেশের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর মনে পড়িল সেই বিদায়ের দিন—সেই মিনতিভরা দুইটি করুণ আঁখি। আর মনে পড়িল, রমা হাত দুখানি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল "চিঠি লিখো কিন্তু।" তারপর সে কি করিয়াছে—রমেশ আর ভাবিতে পারিল না। তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল। হঠাৎ সে আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল "ঠিক্ বলেছ সুনেত্রা, আমি প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো।"

রমেশ চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সুনেত্রার বাড়ী আসিয়া শুনিল, সুনেত্রা পাঁচদিন হইল কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঝি তাহা জানে না। সে যে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছিল; সুনেত্রা সে অবসরও তাহাকে দিল না। সে ব্যথিতহৃদয়ে বসিয়া রহিল। দেয়ালের ঘড়িতে ঠঙ্ করিয়া একটা বাজিল। রমেশের চমক ভাঙ্গিল। এখন না গেলে আর গাড়ী ধরা যাইবে না। সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইল।

বাহির হইয়া যাহা দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে পুলকে স্তম্ভিত হইয়া রহিল—দেখিল বাড়ীর দুয়ারে সুনেত্রা পুত্র বুকে করিয়া বিশ্বজননীরূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

আত্মতুষ্টি (?)

জমিদারী কাজে পোক্ত যে মোরা
হোম্‌রা চোম্‌রা অতি ;
দেখনা মোদের কৌশল-বঁলে
প্রভুর কেমন গতি !

ঘুরিয়াছি কত দেশ,
পাকিল মাথার কেশ ;
মোদের কর্ম্মে দোষ দাও সবে,
তোমরা চপল মতি ;
বুদ্ধির গুণে হইতে চলেছি
আজিকে লক্ষপতি !

শুনিবে কি মোরা কি কাজ করিয়ে,
প্রভুরে ভুলায়ে রাখি !
তোষামোদ মাখা কথা দিয়ে শুধু—
সকল গলদ্‌ ঢাকি !

কাছারীতে যবে আসি,
বার্‌ কত শুধু কাশি,—
সম্মুখে রাখি কাঠের বাক্স,
নিদ্রাদেবীরে ডাকি।
'মুলতবী' থাকে হিসাব নিকাশ,
দিয়ে যাই শুধু ফাঁকি।

দপ্তরীগুলি বেজায় বাধ্য,
তামাক সাজিয়ে আনে,
নাশ করি কত সিগারেট, চা
মুনিবে কি তাহা জানে !

কাছে যবে যাই তাঁর,
ক'রে থাকি মুখ ভার ;
"বসে খেটে খেটে ধরিয়াছে বাত"
বুঝাই করুণ গানে,
ভাবে সোজামনে, "এমন চাকর,
মিলিবেনা কোনও খানে"।

দিনেকের তরে যাইবে মুনিব,
চাই তবু দেখা করা,
হ'ক শেষ রাত, হ'ক না দুপুর,
জুটি যত ধামাধরা,

বদনে কুটিল হাসি,
ভিতরে স্বার্থরাশি ;
প্রতিকাজে করি রক্ত শোষণ,
পড়িনাকো তবু ধরা,
পেলে কিছু, লিখি, "জমা ও খরচ
সত্য কথায় ভরা"।

কাগজ কলম পেন্সিল নিব
কিছুই রয় না বাকি ;
চুপ ক'রে ফেলি পকেটের মাঝে,
ঘরে নিয়ে তারে রাখি।

পঞ্জিকা দেখে আসি,
সন্দেশ লুচি গ্রাসি,
সপ্তাহ দুই উনুন্ বন্ধ,
গোপনে বোঝাই ঢাকী !
পরস্পরে মোরা যে এমন,
প্রীতির বাঁধন রাখি !

যদিও মোদের বাণীর সহিত,
বাল্যে হয়েচে দ্বন্দ্ব ;
সময় কাটাতে, ছল করি তার
ভালবাসি গান ছন্দ।

পাঠাগারে মোরা গিয়ে,
ব'সে থাকি বই নিয়ে,
মতলব করি নূতন নূতন
কাজ করি সব বন্ধ।
আমাদের গুণে অনেক সময়ে
অমাদেরই লাগে ধন্ধ !

তোমরা যে বলো "দিন যবে যাবে,
কি কবে ধর্ম্ম কাছে" ?
বালক তোমরা, এজগতে কি গো,
এখন (ও) ধর্ম্ম আছে ?

রক্ষক বুকে হানিয়াছি ছুরি,
দেবতার ধন করিয়াছি চুরি ;
হয়নি বিচার,—লক্ষ্মী যে তবু,
সিন্দুকে বাঁধা আছে।
ধর্ম্মের নামে উঠিলে কাঁপিয়া,
ধরা কি কখনও বাঁচে ?

শ্রীশশিভূষণ দাস।

বেদ ও বিজ্ঞান *

আকাশ ও ঈথার।

সে দিন আকাশের পরিচয় লইতে গিয়া ছান্দোগ্যশ্রুতির এক উপাখ্যান পড়িয়া রাখিয়াছিলাম। উদ্‌গীথ অথবা প্রণব বিদ্যায় কুশল তিন জনে মিলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সকলের শেষ গতি কি, বা পরম আশ্রয় কোথায়? সাম গান করিতেছি; এই ব্যাপারের আশ্রয় কি?—স্বর। স্বর নহিলে গান হয় না। স্বরের অবলম্বন কি?—প্রাণ। প্রাণের অবলম্বন কি?—অন্ন। অন্নের অবলম্বন কি?—আপঃ। কেন না, বৃষ্টি বা রস নহিলে শস্য-ফলাদি অন্ন জন্মে না। জল কোথা হইতে আসে? একজন আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন—"অসৌ লোকঃ"—ঐ উপরের লোক হইতে, জল আসে। সোজাসুজি ভাবে হিসাব একরূপ মন্দ নয়। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল কি? যিনি উপরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"বাস্, ঐখানেই 'ইতি' দাও; আর গোল করিয়া লাভ নাই। যে জগৎটাকে দেখিতে শুনিতে পাইতেছি, তার গতি বা আশ্রয় এমন একটা কিছু, যেটাকে আমরা কোন মতেই দেখিতে শুনিতে পাইব না। চেষ্টা করিতে যাওয়াও বৃথা। বস্তুর খোসাতেই আমাদের দৃষ্টি পরিসমাপ্ত; সার পর্য্যন্ত তাহার দৌড় নাই। সেই অদৃষ্ট (unseen) ই মূলাধার।" বক্তা হালের বৈজ্ঞানিক হইলে বলিতেন:—এই যে কাগজখানা আপনাদের কাছে পড়িতেছি, তাহাতে ছোট ছোট টুক্‌রার সমষ্টি। প্রত্যেক টুক্‌রায় আবার গণনাতীত মলিকিউল বা দানা। প্রত্যেক দানার ভিতরে একাধিক অণু (atom)। অণুর ভিতরে আবার বোধ হয় তাড়িত কণিকা (corpuscles) গুলির সুশৃঙ্খলার সহিত আবর্ত্তন চলিতেছে'. 'একটা তাড়িত-কণিকা হয়ত ঈথারের এক স্থানে একটা ঘূর্ণিপাক অথবা ঐ রকম একটা কিছু। এই শেষ কথাগুলি আমি কিন্তু হলফ করিয়া বলিতে পারিব না। কথাগুলি যদি সত্যও হয়, তবু আমি সম্প্রতি বলিতে পারিতেছি না—ঈথার কিম্ভূত-কিমাকার এবং কিরূপেই বা ঈথারের স্থানে স্থানে পাকের বা বিক্ষোভের (strain এর) সৃষ্টি হয়? কাগজটা শেষ পর্য্যন্ত গিয়া হয়ত ঈথারই হইল, কিন্তু ম্যাক্‌স্‌ওয়েল, টম্‌সন্ ও লার্‌মর সাহেবের লেখা পড়িয়াও আমায় কবুল করিতে হইতেছে যে, আমি ঈথার দেখি নাই, কস্মিন্‌কালে দেখিবার প্রত্যাশাও করি না। নিখিল জড়দ্রব্যের গতি, "জ্যায়ান্" ও "পরায়ণ" ঈথার সুতরাং অদৃষ্ট হইলেন। সাবেক কালের পণ্ডিত জগতের প্রতিষ্ঠা বুঝাইতে "অসৌ লোকঃ" বলিয়া উপরে আঙ্গুল দেখাইয়াছিলেন. তিনি এই বিপুল অদৃষ্টকেই আভাসে আমাদের জানাইয়াছিলেন। তিনি এই মহারহস্যটিই আমাদের বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আমরা যেটাকে দেখিতেছি তাহার মূল রহিয়াছে শেষ পর্য্যন্ত এমন জায়গায় যেখানে আমাদের দৃষ্টি আর চলে না। সেই শেষ ভূমিকে হালের জড়বিদ্যার মত ঈথারই বল, সাংখ্যের মত অব্যক্তই বল, বেদান্তের মত সদসদ্ বিলক্ষণা অনির্ব্বাচ্যা মায়াই বল, আর যাহাই বল; তার সব চেয়ে স্পষ্ট ও সরল বিবৃতি হইতেছে—'অসৌ লোকঃ'—ঐ আমাদের দৃষ্টির পরপারে অজানা একটা দেশ। আমি যতদূর দেখিতেছি বুঝিতেছি, সেই গণ্ডী বাহিরে কোনও এক স্থান—An Unseen Universe, an undiscovered country. কাপড় পরিতে জানে না, কাঁচা মাংস খায়, এমন বর্ব্বরকে জিজ্ঞাসা কর—'তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, মরিয়া কোথায় যাইবে?'—সেও ছান্দোগ্যশ্রুতির মত উপরে আঙ্গুল দেখাইবে; আমায় বুঝাইতে চাহিবে—এমন একটা কিছু, যাহার হদিশ সে তার নিত্য-পরিচিত, নদী, পাহাড়,

* জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ-জ্ঞানপ্রচার সমিতিতে পঠিত।

বন, প্রান্তর, পশু, পক্ষী, শত্রু, মিত্রের মাঝখানে সুস্থির ভাবে পাইতেছে না। উপনিষদের ঋষি যে আজব কাণ্ডকারখানাটাকে "ঊর্দ্ধমূল মবাক্ শাখম্" এবং গীতায় শ্রীভগবান যেটাকে আবার "ঊর্দ্ধমূলমধঃ শাখম্" মহাপাদপ-রূপে বলিয়াছেন, তার নাম সংসার, এবং তার মূল উপরের দিকে অজানা লোকে। আমমাংসভোজী বর্ব্বর যে দিকে অঙ্গুলি দেখাইল, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া ভগবান্ও সেই দিকেই দেখাইলেন; আবার শুনাইলেন যে "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্ত নিধনান্যেব"—জিনিষগুলি কোথা হইতে আসিতেছে তাহাও বলিতে পারা যায় না; কোথায় বা মিলাইতেছে, তাহাও জানা যায় না; নাম যাহাই দেওয়া হউক না কেন, সেই আদি ও অন্ত দুইই অপ্রকাশিত। "ব্রহ্ম," "প্রকৃতি," "মায়া" "Ding-an-Sich" অথবা "Inscrutable Power" কিংবা Elan Vital" বলিয়া শুধু আমাদের মুখ চাপিয়া ধরা হইতেছে মাত্র। ওসব কথা শুনিয়া শুধু এইটুকু বুঝিতেছি যে আসল ব্যাপারটা আমরা কিছুই বুঝিতেছি না—ignoramus. ইহারই পরিভাষা অদৃষ্ট এবং ইহাকে ছান্দোগ্য "অসৌ লোকঃ" বলিয়া ইঙ্গিত করিয়া, এবং "ন স্বর্গং লোকমতিনয়েৎ"—ঐ লোকের পরপারের খবর আর জানিতে চাহিও না এই কথা বলিয়া আমাদের বোঝাপড়ার মামলার অনেকটা সুবিধা করিয়া দিলেন। নয় কি? ইহা কি হইতে, উহা কি হইতে, সেটা আবার কি হইতে, এইরূপ অন্বেষণ করিতে করিতে বলিলেন—এ সব আসিয়াছে ঐখান হইতে—অদৃষ্ট হইতে। এটা কুঁড়ের দর্শন, নির্জ্জলা "অদৃষ্টবাদ" –একথা বলিয়া যিনি আপত্তি করেন করুন; বিজ্ঞান ঠেকিয়া হুঁসিয়ার হইয়াছে। সে বলিতেছে—"এবমেব," "তথাস্তু"।

উপরের দিকে আঙ্গুল দেখাইবার বাতিক বিজ্ঞানের অনেক দিন হইতেই আছে। কোপার্নিকাস ঐ আদিত্য-মণ্ডলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—ঐ সূর্য্যই আমাদের ধরিত্রীকে, আরও কত জ্যোতিষ্ককে ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং আপনার চারিধারে পাক খাওয়াইতেছেন। আমাদের এই লোকের প্রতিষ্ঠা 'অমুষ্মিন্ লোকে'—ব্রহ্মের ঐ বৈবস্বত মূর্ত্তিতে। এ যেন ছান্দোগ্য শ্রুতিরই কথা চেহারা বদলাইয়া আমার কাছে পশ্চিমদেশ হইতে আসিতেছে। উদ্গাতা আসিয়া উষস্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমি ত উদ্গীথ গান করিব, কিন্তু কোন্ দেবতা যে উদ্গীথের আশ্রয় এবং উদ্গীথে অনুগত, তাহা ত জানি না; তাহা না জানিয়া গান করিলে স্বস্তি নাই; অতএব আপনি আমাকে বলুন—"কতমা সা দেবতেতি"—সেই দেবতাটি কে? উষস্তি কোপার্নিকাসের মত ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি তুলিয়া বলিলেন—আদিত্যই সেই দেবতা; কেন না, স্থাবর জঙ্গম "সর্ব্বানি হবা ইমানি ভূতানি" ঐ উপরিস্থিত আদিত্যেরই গান করিয়া থাকে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য 'গায়ন্তি' কথাটার মানে দিলেন 'শব্দয়ন্তি' 'স্তুবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ'। 'নিখিলভূত আদিত্যের স্তব করিতেছে—এ বাক্যের যে কি অভিপ্রায়, তাহা আপনারা অবসরমত ভাবিয়া দেখিবেন। ধাতুর অর্থ লইয়া বিচার করিবার স্থল ইহা নহে; তবে কথাটার মর্ম্ম এই যে, নিখিলভূত আদিত্যকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। 'যার খাই তার গুণ গাই'—আদিত্যই এই দুনিয়াখানার খোরাক পোষাকের মালিক, কাজেই নিখিল বস্তু জাতের মধ্য হইতে অন্তরাত্মা যে আদিত্যের অভিমুখেই বন্দনাগীতি তুলিয়া দিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

কোপার্নিকাসের পর কাণ্ট, লাপ্লাস প্রভৃতি পশ্চিমদেশের অনেক সুধী বার বার ঐ উপরের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আকাশের স্থানে স্থানে কোয়াসার মত খানিক খানিক নীহারিকা (nebulœ) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নীহারিকাসুন্দরীর ফটো বৈজ্ঞানিক তুলিয়া রাখিয়াছেন; সুন্দরীর নাড়ীনক্ষত্রের খবরও Spectrum analysis দ্বারা কতক কতক জানিতে পারা গিয়াছে। পশ্চিমদেশের অনেক পুরোহিত ঠাকুর ঐ সুন্দরীর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—মূঢ়! কাহার মুরতি দেখ, চেন নাকি উহারে? ঐ ত করিল এই বিশ্ব রচনা। উহারই গর্ভে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ তারকাদির জন্ম হইয়াছে। জন্ম বিবরণ আর একদিন শুনাইব। সম্প্রতি উহারে প্রণাম কর। আমাদের এই

বসুন্ধরার গোড়া কোথায়? আদিত্যে কি? যদি আদিত্যে হয়, তবে তাহার আবার গোড়া কোথায়? এইভাবে গোড়া খুঁজিতে সুরু করিয়া পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা শেষে ঊর্দ্ধে নীহারিকালোকের পানে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন—ঐ দেখ আদিম জন্মভূমি। ইহাও "অসৌলোক:" বলিয়া উপরের দিকে তাকাইবার মতন নহে কি? আজকালকার পণ্ডিতেরা আবার সূর্য্যমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া অনেক সূক্ষ্ম তথ্য আমাদের শুনাইতেছেন। সূর্য্যের প্রভাবে সৌরজগতে যে কি প্রকারে তাড়িত শক্তির ধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত রহিয়াছে তাহার বিবরণ Arihenius প্রভৃতি পণ্ডিতেরা আমাদিগকে দিতেছেন। 'ইলেক্‌ট্রন' কথাটা আমাদের শ্রোতৃবর্গের কাছে আর বোধহয় নূতন নহে। এখন জনৈক সাহেবের উক্তি শুনুন;—"It is estimated that the sun drains the space as far out as one-sixth of the distance of the nearest star of its free electrons, and thus maintains a constant circulation of electricity throughout the solar system." ইলেক্‌ট্রিসিটির সূক্ষ্ম কণিকাগুলিকে (বিশেষতঃ নেগেটিভ্ ইলেক্‌ট্রিসিটির) 'ইলেক্‌ট্রন বলে; এবং এই ইলেক্‌ট্রনগুলাই নানারকমের ব্যূহরচনা করিয়া নানাজাতীয় অণু (সোণা, রূপা সীসা প্রভৃতি) বানাইয়া থাকে। ইহাই আমাদের পূর্ব্বকথিত ইলেক্‌ট্রন থিওরি। তবেই সূর্য্য আমাদের জগতে তাড়িত শক্তির সঞ্চালন করিতেছেন। তাহার ফলে যে কি হইতেছে এবং তাহা না হইলে যে কি হইত, তাহা এখন ভাবিয়া দেখার দরকার নাই। বিশ্বের শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই যে সূর্য্য রহিয়াছেন এমন নয়। জড়পদার্থের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতেছেন আমাদিগকে সূর্য্য। মোটা মোটা জিনিষগুলাকে প্রকাশ করিয়াই সূর্য্যদেব অব্যাহতি পান নাই; জড়ের অণুর ভিতরে ঐ ইলেক্‌ট্রনগুলা কিভাবে ব্যূহরচনা করে তাহা বুঝিতে গিয়াও টমসন প্রভৃতি হালের ঋষিগণকে সূর্য্যের পানেই তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছে। সৌরজগতে যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহগুলা বৃত্তাকার পথে ঘুরিতেছে, অণুর মধ্যেও তেমনি একটা Positive electic charge দ্বারা বিধৃত হইয়া negative charge গুলি (অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রনগুলি) ঘুরিতেছে—মহাবেগে ঘুরিতেছে। সৌরজগৎ বিরাট; অণু যেন তাহারই বামনাবতার (miniature)। বিরাটের বেলা যেমনটা বন্দোবস্ত, বামনের বেলাতেও তেমনটা। একটা ভূমা, অপরটা অল্প। তোমার আমার হিসাবে অণুর অন্দরমহলটা অপরিসর, অল্প স্বল্প। কিন্তু সে অন্দর মহলের কাণ্ডকারখানাটা যখন সৌরজগতেরই মতন, তখন তার মধ্যে যে জীব বাস করে (করে না যে এমনটা হলফ করিয়া কে বলিতে পারে?) তার হিসাবে অণু না হইতে পারে। যে যেমন মাপকাটি হাতে পাইয়াছে, তার হিসাব, গণাগাথা সেই রকমই হইবে। যাক্, এ কথার আলোচনা এখানে করিব না। ফলকথা, এখন বৈজ্ঞানিকেরা অণুর যে সংবাদ আমাদের শুনাইয়াছেন, তাহা জ্যোতির্ব্বিদ্ মহাশয়ের পত্রিকার গোড়াতেই বহুদিন হইতে আমরা পাইয়া আসিতেছি। এখনকার Electric theory of Matter যেন অনেকটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত Planetary theoryরই পকেট সংস্করণ। এই পকেট সংস্করণের রহস্য প্রাচীনেরাও অবগত ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ইহার প্রমাণ পরে দিব আপাততঃ, বিরাট যে কি ভাবে বামন সাজিয়া বিশ্বের ছোট-খাট সকল আড্ডাতেই ঘুরিয়া বেড়াইতে চান; শুধু 'মহতো মহীয়ান্' রূপে আমাদের ধারণাকে ছাড়াইয়া গিয়া তাঁর সাধ মিটে নাই, 'অণোরণীয়ান্' রূপে রেণুর মধ্যে গা ঢাকা দিয়া তিনি যে আবার কেমন লুকোচুরি খেলাও খেলিতে ভালবাসেন;—এই কথাটার একটা আভাস ইঙ্গিত লইয়া যান। যে ব্রহ্ম এই অসীম আকাশে নিজেকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আমার হৃৎপুণ্ডরীকাভ্যন্তরস্থিত 'দহর' অথবা অল্প আকাশে নিজেকে পুরিয়া রাখিয়াছেন; 'অন্তরিক্ষসৎ' ও 'ব্যোমসৎ'—অর্থাৎ অন্তরিক্ষ, ও ব্যোম ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তিনিই আবার 'দ্রোণসৎ ও নৃষৎ'—অর্থাৎ, সোমরস পাত্রে ও মানুষের অন্তরে বাস করিতেছেন। যাঁহার ভয়ে 'অগ্নিস্তপতি,' 'সূর্য্যও তপতি,' ইন্দ্র, বায়ু এবং মৃত্যু যাঁহার ভয়ে ধাবিত হইতেছেন; এমন রাজরাজেশ্বর তিনি,

তাঁহার আবার কেমন ধারা সাজিতে সাধ হয়, শুনিবেন? "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা। সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।" শ্রুতি রাজরাজেশ্বরকে ভয় করিবেন কি; অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—ও গো, এই দেখ তোমায় চিনিয়া ফেলিয়াছি। চিনিতে কিন্তু বেগ পাইতে হইয়াছে। যাঁহার ভয়ে (কিনা, বিধানে) ইন্দ্র, চন্দ্র, মিত্র, বায়ু, বরুণ তটস্থ হইয়া আপন আপন কাজে ছুটিতেছে, পান হইতে চুণটুকু খসিবার উপায় নাই, তাঁহাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা" বলিয়া চিনিতে খাটিতে হইয়াছে। "তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেৎ"—মুঞ্জাতৃণের মধ্য হইতে ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে যেমন ইষাকাটিকে বাহির করিতে হয়, তেমনি সেই দিন দুনিয়ার মালিককে হৃৎপুণ্ডরীকের মধ্যে অজ্ঞাতবাস হইতে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যে অজ্ঞাতবাসে স্বয়ং গাণ্ডীবধন্বা নপুংসক আর স্বয়ং বৃকোদর বল্লভ—আমাদের মালিকটিও সেই অজ্ঞাতবাসে বেশ 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র' হইয়া বিরাজ করিতেছেন; প্রাণবায়ু আর অপান বায়ুকে লইয়া দিব্য উপরে ও নীচে ছুড়াছুড়ি করিতেছেন, কিন্তু "মধ্যে বামন মাসীনং"—কিন্তু মাঝখানে বামন হইয়া বসিয়া আছেন, "তংবিশ্বে দেবা উপাসতে"—তাঁহাকে সকল দেবতারা উপাসনা করিয়া থাকেন। ছান্দোগ্যশ্রুতিও আদিত্যমণ্ডলে হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু পুরুষের বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—অক্ষিমধ্যে বামনাকৃতি যে পুরুষটিকে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিত্যপুরুষের সঙ্গে তিনি অভিন্ন; আদিত্যপুরুষের যাহা রূপ, পর্ব্ব ও নাম অক্ষিপুরুষেরও তাহাই। বিরাটকে লইয়া এইভাবে ক্ষুদ্রের সঙ্গে সমীকরণ প্রাচীনেরা অনেক জায়গায় কষিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিরাট ও ক্ষুদ্রের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা ব্যবহারিক সম্বন্ধ। আমার ব্যবহারে যাহা বিরাট তাহা, আমার চাইতে বড় কোনও জীবের ব্যবহারে, হয়ত ক্ষুদ্র; পক্ষান্তরে, আমার ব্যবহারে যেটি ক্ষুদ্র, আমার চাইতে ছোট কোনও জীবের ব্যবহারে, তাহা হয়ত বিরাট। আমার ব্যবহারই ব্যবহার নহে এবং আমাদের দেখাই দেখা নহে। অণুবীক্ষণ দেখিতে হারি মানিয়া গিয়াছে, এমন সব প্রাণিদের বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই যে গত বৎসর আমরা এক কোটি ভারতবাসী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেলাম, সেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বাহন যে সব প্রাণী, তারা কত হ্রস্বকায়, অথচ শরীরের এক একটা সেলের মধ্যে ইহারা আমাদের রক্তকণিকা গুলার সঙ্গে যে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া থাকে, তাহার কাছে ইউরোপীয় মহাসমর কোথায় লাগে? এই সব সূক্ষ্ম প্রাণিদের চালচলন, কাণ্ড-কারখানা আবার কত অদ্ভুত? বিজ্ঞানশাস্ত্রে সে সকলের বিবরণ পড়িবার কালে মনে হয় বুঝিবা গলিভার সাহেবের সঙ্গে কোন্ এক লিলিপুটিয়ান দেশে বেড়াইতে আসিয়াছি। মনে প্রশ্ন উঠে—প্রাণিদেহের সূক্ষ্মতার পরাকাষ্ঠা বা শেষ সীমা কোথায়? কত ছোট প্রাণী হইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইবে না, তবে শ্রুতি প্রাণের অণুত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে প্রাণের অণুত্ব লইয়া বিচার ও প্রমাণ প্রয়োগ আছে। আচ্ছা, সে যাহাই হউক, ঐ অণুপ্রমাণ প্রাণীরা হয়ত একটা পার্টিকেল, অথবা একটা মলিকিউল, এমনকি একটা এটমের মধ্যে বেশ ঘরকন্না করে। করে না, এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারিবে না। অবশ্য এখনও প্রমাণ হাতে উপস্থিত হয় নাই; তবে ভাবী প্রমাণের জন্য লাইন ক্লিয়ার দিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত। বাস্—ঐ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সূক্ষ্ম ভূত গুলাতে গিয়াই "ইতিশেষঃ" করিব, এমনটা পণ করিয়া বসিয়া থাকিলে বেজায় গোঁড়ামি হইবে। এখন, আমার ব্যবহারে যেটা সূক্ষ্ম জিনিষ সেটা ঐ বামন ভূতগুলার ব্যবহারে হয়ত বিরাট। হিসাব পরিমাণ লইবার যে কোনও সর্ব্বভূত সম্মত মাপকাটি—কোনও unique frame of reference নাই, এ কথা এই বিংশ শতাব্দীতে Principle of Relativity বড় গলা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ছোট বড়র মামলা আপাততঃ মুলতুবি থাকুক। আমরা কথাটা পাইলাম ইহাই:—সূর্য্যদেব তাঁর নাতি পুতি, অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহগুলিকে লইয়া বেশ নির্ব্বিবাদে ঘরকন্না করিতেছেন; তাঁহার এই বিশাল সংসারখানার দিকে তাকাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা জড়ের মর্ম্মের পরিচয় আমাদের শুনাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাহিরে সৌরজগতে যে নক্সা অণুর

ভিতরে বা অন্দরমহলেও সেই নক্সা—ইহাই টমসন প্রভৃতি জাঁদরেল বৈজ্ঞানিকদের কথা। আমরা শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম যে, এই প্রকার সূক্ষ্মের মধ্যে বিরাটের প্রতিরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা প্রাচীনদেরও ছিল এবং বিজ্ঞান যদি অধুনা অণুর ভিতরে একটা জগতের সন্ধান পাইয়া থাকেন, তবে পিতৃলোক হইতে বৃদ্ধেরা তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টিই করিবেন। সূক্ষ্ম, বিরাটেরই পাল্‌টি ঘর, স্থূলব্রহ্মাণ্ডে যে ব্যবস্থা ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডেও সেই ব্যবস্থা—একথাটা শ্রৌতসিদ্ধান্তের অনুকূল কথা। দিনকতক আগে রসায়ন বিদ্যা অবিভাজ্য শক্ত শক্ত কতকগুলা অণুর সাহায্যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের হিসাব দিতে গিয়া সিদ্ধান্তমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছিল। স্ব-স্ব-প্রধান সত্তর পঁচাত্তর জন মোড়ল পদার্থ সল্লাপরামর্শ করিয়া এই জগৎটা গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে, এপ্রকার বর্ণনা পড়িয়া, বিশ্বরহস্যের কুজ্ঝটিকা আরও ঘন হইয়া ঘিরিয়া আসিতেছে, ইহাই মনে হইত। সেই বেদের "একই সদ্‌বস্তুকে বিপ্রেরা বহুরূপে বলিয়া থাকেন," সেই উপনিষদের একই জিনিষ জানিলে "সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"—ইত্যাদি সিদ্ধান্তগুলিকে প্রাণের অন্তস্তলে, সুস্থির বিশ্বাসের সিংহাসন পাতিয়া বসাইয়া রাখিতে পারিলেও, পরীক্ষা ও বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া লইতে সাহস পাইতাম না। পদার্থবিদ্যার বহুজড়বাদ আর শ্রুতির এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান—এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের কোনও সূত্র খুঁজিয়া পাইতাম না বলিয়া প্রাণে সত্য সত্যই অস্বস্তি বোধ করিতাম। এখন, পদার্থবিদ্যা অণুর ভেকি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষকের স্বচ্ছ, নির্ম্মল দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে, সূক্ষ্মের ভিতরে বিরাট, অণুর ভিতরে মহান্‌, কেমন ধারা শ্রুত্যুক্ত সেই বামনের মত, অক্ষিপুরুষের মত, প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন। মহাকাশে হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু আদিত্য পুরুষ, অর্থাৎ আদিত্যাভিমানী চৈতন্য; আর অক্ষির অন্তরে দহরাকাশেও তিনিই। বিজ্ঞানও বলিতেছেন—"তথাস্তু"। তবে বিজ্ঞানের পরিভাষা অন্য প্রকারের। আদিত্যপুরুষের হিরণ্যশ্মশ্রুরাজি বিজ্ঞানের ভাষায় electro-magnetic agitation in æther, যাহাকে আমরা বলি রশ্মিজাল; আর এটমের অন্তরে "দহরাকাশে" যে পুরুষ রহিয়াছেন তাঁহার হিরণ্ময়বপুঃ হইতেছে—স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌সের সেই Radiant Matter; গোল্‌ডষ্টাইনের সেই Cathod Rays টমসন্‌, ষ্টোনি ও লজ্‌ সাহেবের সেই Corpulscles and Electrons. মহাকাশে যে ব্রহ্মের গৌরব সকল সীমা হারাইয়া প্রসারিত রহিয়াছে, দহর বা অল্প পরিমাণ আকাশেও সেই ব্রহ্মকেই অন্বেষণ করিতে হইবে—ইহাই হইল প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার একটা মূল সূত্র। এ সূত্রের ভাষ্য আমরা বহুদিন ভুলিয়া বসিয়াছিলাম—উপলব্ধি ত 'দূরে আস্তাং"। পশ্চিমদেশের যে পদার্থবিদ্যার নাম এখনই করিলাম, সেই পদার্থবিদ্যা সূত্রের উপর নূতন করিয়া ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। পদার্থবিদ্যা অপরাবিদ্যা সন্দেহ নাই; কিন্তু এই অপরা বিদ্যার মন্দিরে যে সমস্ত একনিষ্ঠ সাধক নিজেদের জীবনরুধির দেবীর ভৃঙ্গার্থ অকাতরে ঢালিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহাদের সে বলিল শুধু যে ঐহিক অভ্যুদয়ের পথটাকেই পাকা করিয়া দিয়া গেল এমন নহে; নিঃশ্রেয়স অথবা অপবর্গ লাভের সম্ভাবনার কাছাকাছি মানবাত্মাকে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়া গেল। বহুর মধ্যে এককে দেখাইয়া দিয়া, অস্থির, অধ্রুবের মধ্যে সুস্থির ও ধ্রুবের একটা আভাস আমাদিগকে পাইতে দিয়া, পশ্চিমের বর্ত্তমান অপরাবিদ্যা, বেদের পরাবিদ্যার সেই অক্ষর বস্তুটিকেই ক্রমশঃ আমাদের পরিচয়ের মধ্যে আনিয়া দিতেছে। এহেন অপরাবিদ্যাকে আমি অভিবাদন করিতেছি।

ছান্দোগ্যের আখ্যায়িকায় উদ্গীথকুশল এক ব্রাহ্মণ এই সমস্ত লোকের গতি বুঝাইতে উপরের দিকে আঙ্গুল দেখাইলেন। বিজ্ঞান ও দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতে-ছেন নানা ভঙ্গিতে—এই কথাটা খোলসা করিয়া বলিতে গিয়া আমাদের এতখানি সময় গেল। সময়টা বাজে নষ্ট হইয়াছে, ভরসা করি, এমনটা কেহ মনে করিতেছেন না। আমাদের লাভ হইয়াছে তিন দফা। প্রথমতঃ, ঐরূপ উপরে আঙ্গুল দেখানর মানে আমরা বুঝিতে পারিলাম। এই ব্যক্ত চরাচরকে বুঝাইতে গিয়া অব্যক্তের দিকে ইসারা করা হইল এখানে। ইহাই হইল আখ্যায়িকার ও অংশের আধ্যাত্মিক (মর্ম্মান্তিক বলিব কি ?) ব্যাখ্যা। তারপর,

দ্বিতীয়তঃ, উপরের দিকে তাকাইয়া, দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গলোকই এই নিখিল ভূতের আশ্রয়, এ কথা যদি বলি, তবে দিলাম আধিদৈবিক ব্যাখ্যা। এ স্বর্গলোক জিনিষটাকে বিজ্ঞান এখনও হজম করিতে পারে নাই, সুতরাং আধিদৈবিক ব্যাখ্যায় শিষ্ট-বিজ্ঞান এখনও নারাজ; তবে এ ক্ষেত্রেও বেদ ও বিজ্ঞান এই দুই পক্ষেরই খোলাখুলি ভাবে একটা বোঝাপড়া হ'বার খুবই দরকার রহিয়াছে; আমাদিগকেও সে বোঝাপড়া হ'বার একটা সুবিধা এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে যথাসম্ভব করিয়া দিতে হইবে। দেবতা কাহারা? এক একটা জড়পদার্থে এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অগ্নি—সকলেরই। কেন, চালক কেহ না থাকিলে জড় কি নিজে চলাফেরা করিতে অক্ষম? আবার, অতীন্দ্রিয় শক্তিগুলি, যথা—মন, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়—ইহারাও চেতন এক একটা কিছু না পাইলে যেন অশক্ত; এ শক্তিগুলিরও শক্তিমান্ কেহ কেহ আছেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এ কথা কয়টিকে খুব ফলাও করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু সত্যকার ব্যাপারখানা কি? বিজ্ঞান এ ক্ষেত্রে "ন যযৌ ন তস্থৌ।" এই ত গেল আধিদৈবিক ব্যাখ্যার সমস্যা। তারপর, তৃতীয়তঃ, আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। দেবতা ছাড়িয়া দিয়া মাথার উপরে সত্য সত্যই যে আদিত্যমণ্ডল রহিয়াছে, তাহার দিকে তাকাইয়া এ সকল ভূতের ঠিকুজী কোষ্ঠী লইবার একটা চেষ্টা চলিতে পারে। বিজ্ঞান এর বেলায় খুবই মজবুত। কোপানিকাস্ হইতে সুরু করিয়া টমসন্ প্রভৃতি অনেকেই কেমন ধারা উপরের দিকে তাকাইয়াই ভূতবর্গের ঠিকুজী কোষ্ঠী তৈয়ারি করিয়া ফেলিতেছেন, তার বিবরণ আমরা সংক্ষেপে দিয়া রাখিয়াছি। শুধু কি বড় বড় ভূতগুলার জন্মপত্রিকা মিলিয়াছে ঐ আকাশে—"অমুষ্মিন্ লোকে"—ছোট ছোট আণবিক ভূতগুলারও কোষ্ঠী আমরা লিখিয়া ফেলিতেছি; উপরের ঐ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পানে চাহিয়া। সৌরজগতের নকসায় অণুর অন্দরের জগতের নক্সা কল্পনা করিতেছি। বিরাট জগতে নীহারিকার দানা জমাট করিয়া যেমন ধারা জ্যোতিষ্কগুলাকে গড়িতেছি, একটার চারি ধারে আর পাঁচটাকে পাক খাওয়াইতেছি; সূক্ষ্ম জগতেও সেইরূপ ঈথারে ইতস্ততঃ ধাবমান মুক্ত (free) electron গুলাকেও ক্রমশঃ বাগ মানাইয়া পরস্পরের শক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতেছি এবং তাহাদের নানা রকম ব্যূহ রচনা করিতেছি; এই এক একটা ব্যূহ এক একটা এটম্। জড়ের মর্ম্ম বুঝিতেছি ঐ আকাশের পানে চাহিয়া, জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যূহ রচনা লক্ষ্য করিয়া। অতএব, উপরের দিকে আঙ্গুল দেখানর যে আধিভৌতিক ব্যাখ্যা, সেটা খুব লাগসই হইতেছে। শ্রুতির সাঙ্কেতিক ভাষায় (short hand এ) লেখা সূত্রগুলি বিজ্ঞান আমাদের সহজজ্ঞান ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। ইহাই তৃতীয় দফা লাভ। শেষে, কঠশ্রুতি দেহরূপ রথে আরূঢ় যে বামনটিকে, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে, আমাদের চিনাইয়া দিলেন, তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি হইলে অবশ্য আর "পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে"; কিন্তু আপাততঃ. এই মুখের পরিচয়েও, আমরা যাহা পাইয়াছি, তাহা আমাদের তিন দফা লাভের উপর একটা মস্ত ফাউ—যেমনতেমন ফাউ নহে। মহাকাশের ও দহরাকাশের মধ্যে বেশ সুন্দর একটা মিল রহিয়াছে, ভেদ অনেকটা ব্যবহারিক, এই তথ্যটি দেখাইয়া দিয়া শ্রুতি আমাদের হাতে যে ফাউ তুলিয়া দিতেছেন, বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের বাজারে যাচাই করিতে গিয়া দেখি, তার দাম বড় বেশী কম নয়। শ্রুতি স্থানে স্থানে যে অন্দরমহলটাকে 'গুহা' বলিয়াছেন, 'দহরকাশ' বলিয়াছেন, সেটাকে শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। বিজ্ঞান ও চকিতপদক্ষেপে সেই অন্দরমহলের চৌকাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া ভিতরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ক্লাউজিয়াস্, মাক্সওয়েল প্রভৃতি সামান্য একরত্তি জায়গায় মলিকিউলদের ছুটাছুটি ধাক্কাধুক্কির হিসাব দিয়া, জড়ের সদর দেউড়ি পার হইয়া, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন; তারপর, বিজ্ঞানাচার্য্যগণ দরজার পর দরজা খুলিয়া একেবারে অন্দরের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। রসায়নবিদ্যা মলিকিউল ভাঙ্গিয়া এটম্ দিলেন; এখন আবার এটম্ চেয়ে সহস্র সহস্র গুণ ছোট Corpuscle এ গিয়াও আচার্য্যেরা ভাবিতেছেন—

"আশাবধিং কো গতঃ"? ভিতরের এক মহলে ঢুকিয়া প্রথমে মনে হইল এটা নিশ্চয়ই নিরেট পদার্থ; এর ভিতরে আর ফাঁকা নাই, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িবার আর গুপ্তদ্বার নাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বেচারি দুর্য্যোধনকে ময়দানবের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার দৌরাত্ম্য অনেক সহিতে হইয়াছিল; যেখানে সত্যই দ্বার রহিয়াছে, সেখানে তিনি দেখিতেছেন দ্বার নাই, যেখানে সত্যই নাই, সেখানে ভাবিতেছেন আছে। জড়ের ইঞ্জিনিয়ার কে তাহা আমি জানি না, তবে দেখিতেছি যে বিজ্ঞানকে দুর্য্যোধনের মত পথ হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক জায়গাতেই অকারণ থম্‌কিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে অথবা চলিতে গিয়া সম্মুখে অতর্কিত বাধায় ঠক্কর খাইতে হইয়াছে। বেশ কিছুদিন এটম্‌গুলা লইয়া কাটিল; এখন দেখি তারও অন্দরের দুয়ার ফাঁক হইয়া গিয়াছে এবং মাঝের দহরাকাশ ধরা পড়িয়াছে। দহরাকাশ বলিয়া দহরাকাশ! সেই অল্পপরিসর আকাশটুকুর মধ্যে মহোৎসর্গের আয়োজন চলিতেছে। তৈজস অণুগুলার (electronsদের) কত বেগে না ছুটাছুটি—আমাদের পৃথিবী সেকেণ্ডে আঠার মাইল চলিয়াও তাহাদের কাছে বাতে পঙ্গু বলিলেও চলে। আর সেই দহরাকাশে তৈজস ভূতগুলা কি চালাও জায়গাই না পাইয়াছে—মোটেই ঘেঁষাঘেঁসি নাই। আমার হিসাবের দহরাকাশ তাদের হিসাবে অসীমাকাশ বলিলে অত্যুক্তি হয়; আমি যেটাকে ভাবিয়াছিলাম গোষ্পদ তারা সেটাকে দেখিতেছে একটা সীমাহীন সমুদ্র—ঈথারের। আমার উর্দ্ধ, অধঃ এবং চতুর্দ্দিকে যে শান্ত, সীমাহীন গগন প্রসারিত তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া নমস্কার করিলে দোষ হয় না, আর ঐ তৈজস ভূতগুলার চোখে চোখ মিলাইয়া আমি যদি ঐ দহরগুহালীন ঈথারসাগরকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিবাদন, করি, তবে তুমি আমাকে ক্ষুদ্রাশয় পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করিবে কি? ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ছোটকে ছোট করিয়া দেখিতেন না, আর নবীন পদার্থ-বিদ্যাও ছোটর মুখে বড় কথা শুনিতেই ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইতেছেন। প্রাচীনেরা ব্রহ্মকে এক নিঃশ্বাসে "মহতো মহীয়ান্" এবং 'অণোরণীয়ান্' বলিয়া ফেলিলেন; ইহার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকপক্ষেই এতদিন চলিতেছিল। 'অণুর মত দুর্বিজ্ঞেয়' এই রকম একটা ভাষ্য লিখিয়া কোনও মতে শ্রুতির মুখরক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু হালের বিজ্ঞানে আচার্য্যের এই ভাষ্যের উপর যে বিস্তৃতটীকা রচনা করিতেছেন তাহা শ্বেতদ্বীপের ক্যাভেণ্ডিশ্ ল্যাবরেটরিতে রচিত হইলেও, এবং তার ফলে অণুর নূতন নামকরণ হইয়া Corpuscle, অথবা Cambridge atom, অথবা Electron এইরূপ একটা ম্লেচ্ছপরিভাষা আমাদের কাণে পৌঁছিলেও, আমরা বোধ হয় এই নূতন বিলাতী টীকার কল্যাণে, সেই পুরাতন শ্রৌত 'গুহা' ও 'দহরাকাশ'কে, এবং তল্লীন ব্রহ্মবস্তুটিকে শনৈঃ শনৈঃ ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছি। ম্লেচ্ছ বলিয়া বিদ্যাকে অবজ্ঞা করিলে অবিদ্যারই ভজনা করা হয়; বিদ্যা জাহ্নবী ধারার মত যে ক্ষেত্র দিয়া বহিয়া যায় তাহাকেই পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে; শ্বেতদ্বীপ হইতেই আসুক আর পীতদ্বীপ হইতেই আসুক, সে জাহ্নবীধারা স্পর্শ করিতে পারিলে জীবের শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে সন্ধিবন্ধন হইয়া যায়। ক্রুকস লজ প্রভৃতি তৈজস বস্তুর যে সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার ফলে, আমাদের অনেকদিনের উপেক্ষিত, অপরিষ্কৃত বুদ্ধিগুহা ও মলিন দহরাকাশ বোধ হয় অচিরাৎ অভিনব আলোক-রশ্মিসম্পাতে সজাগ ও স্বচ্ছ হইয়া উঠিবে; এবং তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবেন আবার সেই হিরণ্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু পুরুষ যাঁহাকে, বেদ আদিত্যমণ্ডলে এবং অক্ষির অন্তরে ভূমা এবং অল্প, এই দুইরূপে দেখাইয়া আমাদিগকে অমৃত-স্বরূপের আস্বাদ লইবার উপায় করিয়াছেন। শ্বেতদ্বীপে বায়ুশূন্য কাচপুরীতে (vacunm tubeএ) যে তৈজসভূত আজ কয় বছর হইল জন্মিয়াছে, কৃতজ্ঞতা ভারাবনত হৃদয়ে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে আমার ত কুণ্ঠা নাই; ঐ তৈজসভূতের সাহায্যেই জড়ের, প্রাণের ও মনের 'প্রত্যগাত্মা' মুঞ্জাভ্যন্তরস্থিত ইষীকার মত আমরা খুঁজিয়া হয়ত বাহির করিতে পারিব। পক্ষান্তরে, হে অভিনববেদের ঋষি বিজ্ঞানাচার্য্যগণ! তোমাদের বিনিদ্র নয়ন যন্ত্রের অষ্টপাশে যে তত্ত্বকে সঙ্কুচিত ও বদ্ধ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সে তত্ত্ব

যে ভূমা এবং তাহাকে ধরিতে বাঁধিতে যাইলে, বৃন্দাবনে সেই শ্রীমতী যশোদার নন্দদুলালকে বাঁধিয়া রাখার চেষ্টার মত, একটা চির নিস্ফল চেষ্টাই করা হইবে, এ কথাটি যেন ভুলিও না। যশোদা তাঁর আদরের নীলমণির মুখ-বিবরে সারা ব্রহ্মাণ্ডটা রহিয়াছে দেখিয়া চিনিয়াছিলেন; তোমরাও অণুর দহরাকাশে একটা জগতের অয়োজন দেখিয়া চিনিবে না কি এই চেনাটি না হইলে কিন্তু সুখ নাই—'নাল্পে সুখমস্তি।" •

আখ্যায়িকার যে ব্রাহ্মণ উপরের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—"অসৌ লোকঃ"—তাঁহার অভিপ্রায় আমরা একরূপ বুঝিলাম। আর একজন উহাতে আপত্তি করিয়া নীচের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—"অয়ং লোকঃ"—এই দৃষ্টলোকই নিখিলভূতের গতি ও আশ্রয়। এই 'অয়ং লোকঃ' কথাটাকেও আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও অধিভৌতিক এই তিনভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ভাষ্যকারেরা অধিদৈবিক অর্থটাই আপাততঃ আমাদের সামনে ধরিয়াছেন, কারণ সেইটাই সোজা অর্থ। স্বর্গের দেবতাদের খোরাক পোষাক ত আমরাই এখানে যজ্ঞে ঘি ঢালিয়া এবং নানারকম আহুতি দিয়া যোগাইয়া থাকি। আমরা রসদ না যোগাইলে অমর বেচারিরা 'ফেমিনেই' মারা যাইতেন। পিতৃগণের অবস্থাও তথৈবচ। যে যজ্ঞে সব প্রতিষ্ঠিত, সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা আবার এই লোকে। অতএব সংসার-পাদপটাকে উল্টাইয়া দেখিয়া কোনই ফায়দা নাই—মূলটা অধোদিকেই রহিয়াছে। কঠশ্রুতি এবং গীতার চোখের ব্যারাম হইয়া থাকিবে। গীতা কিন্তু "পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ" বলিয়া দেবতা ও মনুষ্যের পরস্পরের নির্ভর ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা যজ্ঞে আহুতি দিলাম, তাহা দেবতাদের ভোগে লাগিল! দেবতারাও ভোগে খুসি হইয়া আমাদের শস্যক্ষেত্রে জল ঢালিয়া দিলেন, আরও অশেষ প্রকারে আমাদের প্রত্যুপকার করিলেন। এই গেল আধিদৈবিক ব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবতা কাহারা, কি স্বরূপ তাঁহাদের, যজ্ঞে উৎসৃষ্ট আহুতি তাঁহাদের ভোগে লাগে কি প্রকারে—এ সমস্ত প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব যতক্ষণ আমরা না দিতে পারিতেছি, ততক্ষণ আধিদৈবিক ব্যাখ্যাকে লইয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া থাকিব, এমন কি সময় সময়ে এই ব্যাখ্যার বোঝা বুদ্ধির কন্ধে বহিয়া মনে ভাবিব এটা একটা আধি-ব্যাধিরই সামিল। ব্যাখ্যা ব্যাখ্যার মত না হইলে তাহাকে বিজ্ঞানের আসরে বাহির করিবার উপায় নাই। তারপর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এ ক্ষেত্রে আমরা কাহারও কাছে মাথা হেঁট করিব না। রূপকে ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় আমাদের পুরাণকারেরা অদ্বিতীয়। শ্রুতিও রূপক, প্রতীক প্রভৃতি ভাল বাসিতেন। ভালবাসিবারই কথা। নিজ-বোধ-গম্য বস্তুটিকে যেখানে পরের কাছে, জিজ্ঞাসুর কাছে, শিষ্যের বুদ্ধির দ্বারে পৌছাইয়া দিতে হয়, সেখানে গোড়ায় তুলনা ছাড়া, আভাস ইঙ্গিত বা সঙ্কেত ছাড়া, ভাবনার যোগ স্থাপন হইবে আর কিসের দ্বারা? Analogies বা উপমান ছাড়া বিজ্ঞান আমাকে তাঁহার ঈথারের কথা, অণু-পরমাণুর কথা বুঝাইতে পারেন কি? আলোকরশ্মি কেমন করিয়া চলে, শব্দতরঙ্গ কেমন করিয়া চলে, ইত্যাদি অনেক কথারই বোঝাপড়া চলিতেছে উপমার ও প্রতীকের সাহায্যে। সে যাহাই হউক, ছান্দোগ্যশ্রুতি 'অয়ং লোকঃ' এই কথা দ্বারা কাহার দিকে ইঙ্গিত করিলেন? নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা Experience. আমি যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ধরিতেছি, ছুঁইতেছি, মনে অনুকূলভাবে বা প্রতিকূলভাবে অনুভব করিতেছি, তাহাই আমার প্রত্যক্ষ। আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর বাঁচিয়া থাকিতে ইহাকে 'প্রাতিভাসিক জগৎ' বলিয়া গিয়াছেন! 'প্রত্যক্ষ' কথাটাকে শুধু বাহ্য প্রত্যক্ষ যেন মনে না করা হয়। ঐ যে গোস্বামীমহাশয়ের চিত্রপট অথবা নিমাই সন্ন্যাসের চিত্রপট আমি দেখিতেছি, ওটা বাহ্য প্রত্যক্ষ। দেখিয়া মনে একটা শান্ত ও করুণ রসের মাখামাখি বোধ করিতেছি। এটা মানস প্রত্যক্ষ। এসব লইয়াই আমাদের প্রাতিভাসিক জগৎ—'প্রাতিস্বিক' নামটার প্রস্তাবও কেহ কেহ করিয়াছেন। নাম যাহাই দেওয়া যাক্, এই প্রাতিভাসিক জগৎটাই সব জিনিষের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। এই হলে আলোকমালার ছটায় দাঁড়াইয়া আমি যে বক্তৃতা করিতেছি এবং আপনারা দশজনে শুনিতেছেন, একথা কে বলিল? আমি অনুভব করিতেছি। আমাদের বাঙ্গালা দেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর যে

রহিয়াছে, তাহা কে বলিল ? আমি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি; আপাততঃ না দেখিলে শুনিলেও মনে বিশ্বাস করিতেছি, এবং বিশ্বাস করা না করা আমার মনেরই একটা বৃত্তি বা ব্যাপার; সুতরাং এ দৃষ্টান্তেও প্রাতিভাসিক জগৎ ছাড়াইয়া আমি যাইতে পারিলাম না। নিজের ছায়া বরং নিজে লাফাইয়া যাওয়া যায়, নিজের কাঁধে বরং নিজে উঠিতে পারা যায়, কিন্তু প্রাতিভাসিক বা প্রাতিস্বিক জগতের যে ঐন্দ্রজালিক বেষ্টন রেখা তাহা কোন মতেই ডিঙ্গাইয়া যাইতে পরা যায়না। আমি চক্ষু মুদিলেই জগৎ অন্ধকার; আপনারা পাঁচজনে "আলো" "আলো" করিয়া গগন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেও সে অন্ধকার আলো হয়না। মজার কথা এই যে, আমি যে এই তত্ত্ববিদ্যার গৃহে সভা ডাকিয়া বক্তৃতা করিতেছি, এ সমস্ত ব্যাপারখানা, মায় আপনারা পর্য্যন্ত, আমারই প্রতিভাসিক জগতের ভিতরে। অবশ্য, আপনারা আমার পর এবং বাহিরে আছেন, এ কথা আমি ভাবিতেছি, এবং সেইরূপ ভাবিয়াই ব্যবহার করিতেছি; কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে আসিয়াই ভাবিতেছি এবং প্রাতিভাসিক জগতে থাকিয়াই ব্যবহার করিতেছি। কথাটা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন; এখানে আপাততঃ আর খোলসা না করিলেও চলিবে। আমি জানিতেছি বলিয়াই সৌরজগৎ ও ইলেক্‌ট্রনদের জগৎ, স্বর্গ নরক, দেব দানব, ভূত প্রেত— সমস্তই রহিয়াছে। আমি না জানিলেও থাকিতে পারে এইরূপ আমি বিশ্বাস করি সন্দেহ নাই, কিন্তু সে বিশ্বাস ত প্রমাণ নহে, ও সমস্ত সত্যসত্যই আমার জানার বাহিরে রহিয়াছে এ বিষয়ে। অতএব, এই যে প্রাতিভাসিকলোক— আমার অনুভব বা Experience—তাহার উপর সমস্তই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাতিভাসিকলোককে রামেন্দ্রসুন্দর আদর করিয়া ডাকিতেন "আমি" বলিয়া। আচার্য্যের দেওয়া নামটা লইলে, বলিতে হয়, এই সারা বিশ্বটা যাহার উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেটা "আমি"। আমি আছি ত সবই আছে, আমি নাই ত কিছুই নাই। এ কথাটা মোট ও সাদা কথা হইলেও এর চেয়ে গূঢ় রহস্যও আর নাই। খুব বেশী তলাইয়া না দেখিলেও, সোজাসুজি ভাবে "অয়ং লোকঃ" এ কথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়াইবে:—আমি কতক কতক দেখিতেছি; এগুলি আমার নিজস্ব প্রত্যক্ষ; দেখিয়া শুনিয়া এমন অনেক বস্তুর অনুমান, আন্দাজ বা কল্পনা করিতেছি, যেগুলি আপাততঃ আমার দেখা শোনার মধ্যে আসে নাই; হয় ত কস্মিনকালেও আসিবে না। এবম্বিধ অনুমান, কল্পনা প্রভৃতি কিন্তু প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়াই হয়—ধোঁয়া দেখিয়া যেমন দূরে পাহাড়ে আগুনের অনুমান করি, মঙ্গল গ্রহে আবহাওয়ার অবস্থা দেখি এবং নানারূপ রেখাদি দেখিয়া, সেখানে বুদ্ধিমান জীব থাকিতে পারে, এইরূপ যেমন কল্পনা করি। অতএব পাইতেছি যে, আমার দেখা শোনাই আমার পরিচিত ও কল্পিত জগতের গোড়ায়: আমার দেখা শোনার নাম দেওয়া হউক—"অয়ং লোকঃ"। তবে দাঁড়াইল যে, "অয়ং লোকঃ" নিখিল জগতের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। সংক্ষেপে, ইহাই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। তারপর, আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। উপরের আধ্যাত্মিক ব্যাখায় বিজ্ঞানের আদৌ আপত্তি নাই। আধিভৌতিক ব্যাখ্যাটা বিজ্ঞানের তরফ হইতে দিলেই ভাল হইবে। দুই রকমে দেওয়া গেল। প্রথমতঃ, উপরের দিকে তাকাইয়া যেমন জড়ের নাড়ী নক্ষত্রের সংবাদ আমরা অনেক স্থলে পাইয়াছি, তেমনি আবার নীচের দিকে তাকাইয়া, আমাদের পরিচিত মাটী জল, বাতাস, আগুন নাড়িয়া চাড়িয়া, আমরা জানিতে পারিয়াছি কেমন করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র এলেকার বাহিরে সুদূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্কপুঞ্জ চলাফেরা করে, পরস্পরকে প্রদক্ষিণ পরিক্রমণ করে, এমন কি, কি কি মসলায় লক্ষ কোটী যোজন দূরবর্ত্তী তারকা বা নীহারিকা গঠিত তাহা আমরা Spectrum Analysis করিয়া বলিয়া দিতে পারি। আমাদের এই পৃথিবীর কোনও জিনিষ উক্ত যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার কেমন ধারা আলোকচিত্র—আলোকচিত্রে কেমন ধারা রংবেরংয়ের রেখার সমাবেশ। এখন, ধ্রুবতারার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া যদি সেইরূপ একখানা আলোকচিত্র পাই, তবে বুঝিব ধ্রুবতারায় পূর্ব্বোক্ত জিনিষটা রহিয়াছে। বসুন্ধরা আমাদের ঘর; এই ঘরের খবর ঠিক করিয়া পাইয়া, তবে আমাদের বাহিরের খবর অনেক সময় বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। সব সময় যে,

এমন হয়। কোন কোন সময় বাহির হইতে ঘরে আসিলেই গোড়ায় সুবিধা হয়। যাক্—আর দৃষ্টান্ত লইয়া পুঁথি বাড়াইব না, "অয়ং লোকঃ" যে কেমন করিয়া "অসৌ লোকঃ" কে আমাদের জ্ঞানের এলেকায় পরিচয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তাহা আমরা কটাক্ষে দেখিয়া লইলাম। অতএব অন্ততঃ আমাদের জ্ঞানের দিক্ হইতে এ কথা খুবই বলা চলে যে "অয়ং লোকঃ" সবারই আশ্রয়। বালক বুঝিতে চায় কিরূপে পৃথিবী সূর্য্যের চারি ধারে ঘুরিতেছে। আমি একটা দড়িতে ঢেলা বাঁধিয়া পোঁ পোঁ করিয়া ঘুরাইয়া বলিয়া দিলাম—এই ভাবে। এ ক্ষেত্রে "অসৌ লোকঃ" কে বুঝাইতেছি "অয়ং লোকঃ" দ্বারা; অদেখা অজানাকে বুঝাইতেছি দেখা ও জানার দ্বারা। আমি কেল্‌ভিন্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হুজুর, আপনার ঈথারে অণুর পাক ঘুরে কেমন ধারা? তিনি মুখ হইতে খানিকটা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন—ঐ দেখ, ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে; উহাই নমুনা। আমি শুধাইলাম কেন হয়, কিরূপে? C. T. R. Witlson সাহেব একটা কাচপাত্রের মধ্যে জলীয় বাষ্প পুরিয়া তাহার চাপ কমাইয়া দিলেন, এবং মধ্যে কতকগুলা ইলেক্‌ট্রনের কেন্দ্র (unclei) ছাড়িয়া দিলেন। এক একটা কেন্দ্রের চারি ধারে এক একটা জলবিন্দু জমাট বাঁধিল। সাহেব Stokes সাহেবের দেওয়া 'মন্তর' আওড়াইয়া তাদের সেন্‌সাস্ পর্য্যন্ত লইয়া তবে ছাড়িয়া দিলেন। বিশেষজ্ঞেরা রহস্য অবগত আছেন। সে যাহাই হউক, এ সমস্ত দৃষ্টান্তেও 'অয়ং' এর সাহায্যেই 'অসৌ' কে বুঝিতে হয়। ইহা কি একরূপ 'অসৌ'র 'অয়ং' এর উপর প্রতিষ্ঠা নহে। জ্ঞানের আয়তন কি আয়তন নহে? এই এক ভাবে আধিভৌতিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারেন। আর এক ভাবও আছে। ঈথার, অণু পরমাণু—এগুলা সব সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ভূত। এ সমস্ত সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা যে কতটা বস্তুতন্ত্র তাহা বলা কঠিন। ঈথার লইয়া আমরা দেখিব যে ইহাকে পদার্থবিদ্যা কতবার কতরূপে ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িয়াছেন। ঈথার আমাদের পরিচিত জড় দ্রব্যের মতন কিনা—এ বিচারে আর "হালে পানি" পাওয়া গেল না দেখিয়া, বিজ্ঞান-কর্ণধারেরা হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছেন। ঈথার সম্বন্ধে Sub-natural, Super-natural প্রভৃতি বিশেষণ শিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা ভয়ে ভয়ে ইতিমধ্যেই দিতে সুরু করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার ঈথার সচল (moving) কি অচল (Stagnant) তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা বিবাদ করিয়াছেন। অণুগুলার 'ভরম' ভাঙ্গিয়া গিয়া হাঁড়ীর খবর বাহির হইয়া পড়াতে পদার্থবিদ্যা সরমে মরমে মরিয়া রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সে আস্ফালন আর নাই। অণুর ভিতরে দহরাকাশ এবং তার মাঝখানে একটা জলজীয়ন্ত আস্ত জগৎ—এ কাণ্ড দেখিয়া রসায়নবিদ্যা অপ্রতিভ হইয়া আছেন; অপ্রতিভ হইবেন না?—তাঁর "বিদ্যার ঘরে" আজ যে সত্য সত্যই চুরি ধরা পড়িয়াছে; তাঁহার বিদ্যার গুপ্ত বিলাস কক্ষে যে নাগরটি সুড়ঙ্গ কাটিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছেন, তিনি যে সত্য সত্যই সত্যশিবসুন্দর, তাহা, আইস ওগো প্রাচীন ঋষিকুলোদ্ভব ভারতবাসি! আমরা জ্ঞানাঞ্জন বিলেপিত নেত্রে আবার একটিবার দেখিয়া লই! পশ্চিমদেশের ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটারিকে একটা "ক্ষুধিত পাষাণ" বলিয়া চিনিতে পারিয়া, তাই বিজ্ঞানের দু-একজন বাউল ফকির "সব ঝুঁট হ্যায় তফাৎ যাও" রবে হাঁকিয়া হাঁকিয়া তাহারই চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! আমাদের রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর জ্ঞানগৌরবভারাবনত কলেবরে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দুলাইয়া জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া "তামা তুলসী গঙ্গাজল" স্পর্শ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—বিজ্ঞানেরও বিরাট পুরীটা মায়াপুরী! যাহা হউক, ছড়িদার মহাশয়েরা যতই গোল করিয়া বেড়ান না কেন, বড় বড় পাণ্ডারা গুপ্তকক্ষে চুপি চুপি পরামর্শ আঁটিতেছেন—বিজ্ঞানের কার্‌বার চালান যায় কি লইয়া? ঈথার, অণু প্রভৃতি বাহাল থাকিবে কি? অথবা, ওসব গোলমালে না গিয়া সোজাসুজি বলিব—কার্য্যকরী শক্তি বা Energy কে উড়াইয়া দিবার উপায় নাই; সুতরাং যদি Energy-quanta দ্বারা জড়ের হিসাব দিই, অর্থাৎ বলি যে, "matter is a complex of energies found together at the same place", তবে ঈথার, অণু প্রভৃতির হাত এড়ান গেলে, ভবিষ্যতে অপ্রতিভ হবার আর কোনও আশঙ্কা থাকিল না। অর্থাৎ, বলিতেছি যে একটা দ্রব্য একটা

শক্তিগুচ্ছ বা শক্তিব্যূহ। কাহার শক্তি কোথায় কাজ করিতেছে, জানিনা। কিন্তু কাজ যে হইতেছে, সুতরাং কাজ করাইবার মত শক্তিগুচ্ছ যে আছে তাহা অস্বীকার করিব কিরূপে? এ ব্যাখ্যায় সুবিধা হইল কি অসুবিধা হইল, তাহা এখন বিচার করিব না। শুধু 'Energy-quanta' অথবা 'centres of force' বলিয়া বোধ হয় নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। গোলমালের ভয়ে ঈথার, তাড়িত প্রভৃতি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে চাহিলেও, বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত "সে কম্লী" আমাদের ছাড়িবে না। সে যাহাই হউক, অস্‌ওয়াল্ড প্রভৃতি "quanta" দ্বারা জড়ের যে বিবৃতি দিতেছেন, তাহাতে "অসৌ" ছাড়িয়া "অয়ং" এর উপরই নির্ভর করা হইয়াছে। Energy কাজ করে, সুতরাং সাক্ষাৎ—"অয়ং"; ঈথার প্রভৃতি কাজ করে কি না জানি না, তবে কাজের অধিষ্ঠান ও বাহনরূপে কল্পিত হইয়াছে, সুতরাং সে অসাক্ষাৎ—"অসৌ"। বিজ্ঞান নানা গোলমালে পড়িয়া "অসৌ" এর পুরাণো মায়া কাটাইয়া "অয়ং" এর প্রতিই পক্ষপাত করিতে আরম্ভ একটু আধটু করিয়াছেন। যাহা হউক, আধিভৌতিক ব্যাখ্যা এই খানেই শেস হইল। ব্যাখ্যা তিন দফা; তার উপর একটা ফাউএর প্রত্যাশা এবারও করেন নাকি? এই ফাউএর মধ্যেই তত্ত্ব নিহিত—সতর্ক হইবেন।

একজন উপরে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলেন—"অসৌ" সকলের গতি এবং আশ্রয়; অপরজন নিচে আঙ্গুল দেখাইয়া "অয়ং" সকলের গতি ও আশ্রয়। উভয়ের ওকালতি আমরা শুনিলাম। একজন অদৃষ্টকে বড় করিলেন; অপরজন দৃষ্টকে বড় করিলেন। একজন খুঁজিলেন বাহির; অপরজন খুঁজিলেন ঘর। একজনের দৃষ্টি 'অমুষ্মিন্'; অপরজনের দৃষ্টি 'ইহ'। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া দেখা কি মানবাত্মার মধ্যে চিরন্তন নহে? এ বিবাদ কি শুধু ছান্দোগ্যের দিনের বিবাদ? আমরা এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছি, তাঁহাদের মধ্যে যে কোন দুইজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন—সকলের মূল ও গতি কি? জবাব মোটামুটি ঐ দুইরকমই পাইবেন। একজন উপরের দিকে—অদৃষ্টের দিকে—অঙ্গুলি নির্দেশ করিবেন; অপরজন, নীচের দিকে—দৃষ্টের দিকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, তাহারই দিকে—দেখাইবেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই একবার নাসিক্য-প্রাণ, মুখ্য-প্রাণ প্রভৃতি অসুর-বিদ্ধ হইয়াছিল; তাই নাসিকায় সুগন্ধ দুর্গন্ধের ভেদ জ্ঞান, রসনায় সুরস কুরসের পার্থক্যজ্ঞান, ইত্যাদি। আদিমকাল হইতে আমাদের বুদ্ধিও বোধ হয় অসুর বিদ্ধা হইয়া রহিয়াছে—তাই আমাদের ঘটে ঘটে বিচার মনন হরেক রকমের হইতেছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কি? প্রয়োজন সমন্বয়। হেগেল পন্থীরা thesis, antithesis ও synthesis এর কথা বলিয়া থাকেন। বাদী প্রতিবাদী ঝগড়া করিতেছে; একজন মাঝে পড়িয়া শালিশি করিয়া দিলেন, লেঠা চুকিয়া গেল। আমাদের এই "অসৌ" ও অয়ং" এর মধ্যে চিরদিনের মামলা আপোষ হইবে কি প্রকারে? প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মকদ্দমা কাঁচা। "অসৌ' বলিয়া উপরে আঙ্গুল দেখাইলে তত্ত্বের একদেশ মাত্র দর্শন হয়; "অয়ং" বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও সেই দোষ। দোষের সেরা দোষ একদেশদর্শিতা—তিন কাণার হাতী দেখা। তিনজন অন্ধ কখনও হাতী দেখে নাই, রক্ষকের খোসামোদ করিয়া একদিন তাহারা তিন জনে হাতীর উপর গিয়া পড়িল; এবং যে হাতীর যে অঙ্গে হাত বুলাইয়া দেখিল, সে সেই অঙ্গটাকেই হাতী ভাবিয়া বসিল। কাণে হাত বুলাইয়া কেহ ধারণা করিল, হাতী নিশ্চয়ই কুলার মতন। পায়ে হাত বুলাইয়া কেহ ধারণা করিল, হাতী নিশ্চয়ই থামের মতন। ইত্যাদি। তারপর পরস্পরের অভিজ্ঞতার হিসাব লওয়া। পরিণামে, লাঠালাঠি। তখন জমাদার মাঝে পড়িয়া তাহাদের আংশিক অভিজ্ঞতা-গুলাকে জোড়া দিয়া সত্যকার গোটা হাতীর ধারণা বানাইয়া দিল। গল্পটা মামুলি—কিন্তু দোষটা যে আমাদের মধ্যে পুরাণো হইয়া কোন মতেই ঝরিয়া পড়িতেছেনা।

তাই, ছান্দোগ্যশ্রুতি "অসৌ" ও "অয়ং" বলিয়া কাণাদের লাঠালাঠি বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতে সম্মত হইলেন না। প্রবাহণ নামক জৈবলি শালাবত্যকে কহিলেন—তুমি "অয়ং" বলিয়া যে লোক দেখাইয়া দিতেছ, সে লোক এবং তাহাতে প্রতিষ্ঠিত নাম নিশ্চয়ই অন্তবৎ—অনন্ত নহে।

খণ্ডিত, অন্তবৎ দ্রব্যে নিখিল দ্রব্যের প্রতিষ্ঠা হয় না; যে সকলকে ঠাঁই দিবে তার এতটুকু হইলে চলিবে কেন? যেখানে পদার্থনিচয় 'এটা সেটা' এইরূপ আলাদা আলাদা হইয়া বাস করিতেছে এবং চলাফেরা করিতেছে, সে স্থানটা অখণ্ডিত—"Continuum"—হওয়া চাই। "অসৌ" "অয়ং" এর ব্যাবর্ত্তক, এবং "অয়ং" "অসৌ"এর অধিকারের বাহিরে। দুইটাই 'অন্তবৎ', খণ্ডিত। চাই কিন্তু একটা infinite Continuum—এমন একটা কিছু যেটার সম্বন্ধে বলা চলিবেনা যে—ইহা এতদূর পর্য্যন্তই, আর নাই; অপিচ, সেটার মধ্যে জোড়াতাড়া, ফাঁক ফোঁক থাকিলে চলিবে না। ফাঁক ফাঁক হইয়া যে জিনিষটা রহিয়াছে, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য বড় আর একটা চাই। টেবিলের উপর খানকতক বই ফাঁক হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদের আশ্রয় দিয়া রহিয়াছে কে? এই টেবিল। এই এক দৃষ্টান্তেই ব্যাপারটা বুঝিয়া লউন। আমরা আজ বরাবর উপাখ্যানের মধ্যে খুঁজিতেছি কি মনে আছে ত? নিখিল পদার্থের গতি ও আশ্রয়। যেমন তেমন আশ্রয় নহে, ঘর নহে, পৃথিবী নহে—শেষ আশ্রয়। ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইব তাই দেখিতেছি। "অসৌ" "অয়ং" প্রভৃতি সর্ব্বনামের রূপ লইয়া আমাদের লাভ নাই। আমরা চাই "পরোবরীয়ান্ লোকঃ"। সেই পরোবরীয়ান্ লোক যে কেমনটি হইবেন তাহার একটা আভাস এখনি পাইলাম। তিনি হইবেন ভূমা, তিনি হইবেন বিপুল। ছোট কিছু চরম আশ্রয় স্থান হইতে পারেনা। সে বিপুলকে পাইব কোথায়? উপরে আঙ্গুল দেখাইয়া কি? হুঁ, সেখানেও তিনি। নীচে আঙ্গুল দেখাইয়া কি? হাঁ সেখানেও তিনি। আশে পাশে দশ দিকে?—হাঁ, সেখানেও তিনি। এদিকে আছেন, ওদিকে নাই, বলিলেই তিনি আর বিপুল রহিলেন না। এখন এ সমস্ত পরিচয়ের পর আর বলিয়া দিতে হইবে কি, কে সেই বিপুল, কে সেই ভূমা? শ্রুতি তাই শেষকালে বলিতেছেন—"অস্য লোকস্য কা গতি রিত্যাকাশ ইতি হোবাচ; সর্ব্বাণি হবা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি, আকাশো হি এবৈভ্যো জ্যায়ান্, আকাশঃ পরায়ণম্"। এই লোকের গতি বা আশ্রয় আকাশ। আকাশ হইতেই নিখিলভূত উৎপন্ন হইতেছে এবং আকাশেই আবার নিখিল ভূত লয় পাইতেছে; অতএব সকলের চেয়ে আকাশ বড় এবং এ সকলেরই আকাশই পরায়ণ—কিনা, পরম গতি। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মপক্ষে এ 'আকাশে'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাতে শেষ পর্য্যন্ত কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাটা প্রথমতঃ নীচের পরদায় করিয়া পরে ক্রমশঃ উপরের পরদায় করিলে বোধহয় ঠিক হইবে। ব্রহ্ম আপাততঃ বাদ দিলে, এ আকাশ কোন্ আকাশ? ফাঁকা জায়গা কি? শূন্য কি? শূন্য হইতে জগতের, বিশেষতঃ জড়জগতের উৎপত্তি হয়, এবং শূন্যে গিয়া সবই পর্য্যবসিত হয়, এ কথা শুনিলে বিজ্ঞান লাঠি বাহির করিবেন। আকাশ "অসৎ" কিছু নহে, নিখিল বস্তুর অভাব নহে, 'সৎ' একটা কিছু। সীমাহীন, রন্ধ্রহীন একটা কিছু মৌলিক বস্তু হইতে সবই হইতেছে এবং তাহাতেই সব মিলাইয়া যাইতেছে' ইহাই ঐ শ্রুতির অভিপ্রায় বোধ হয়। এটা হয়ত স্বরূপ বিবৃতি নহে; আমরা আপাততঃ ঠিক স্বরূপ-বিবৃতির চেষ্টা করিতেছি না। ক্রমশঃ মুঞ্জাতৃণের খোসা বাদ দিয়া ইষীকাটি বাহির করার চেষ্টা করিব। আচ্ছা, এই সীমাহীন মৌলিক পদার্থটী কি বিজ্ঞানের ঈথার? হাঁ, না—দুই উত্তরই দিব। ঠিক ঈথার কি না 'আকাশ' তাহা হলফ করিয়া বলিতে পারিবে না; তবে ইহা ঈথার-সিরিজের পরাকাষ্ঠা—œther in the limit, 'Continuum' বা একটানা জিনিষের কল্পনায় বেশি কমি আছে। বাতাস একটানা জিনিষ মনে হয়, কিন্তু নহে; জল বেশী একটানা কিন্তু ঠিক নহে; এই ধাতু খণ্ড আরও একটানা, কিন্তু ঠিক নহে—ইহার দানাগুলার ভিতরে ফাঁক আছে। এইরূপ 'continuum' খুঁজিতে খুঁজিতে œtherএ গিয়া হাজির হইলাম; কিন্তু ঈথার কি একেবারে জমাট জিনিষ?—বোধ হয় নহে, কারণ ঈথার শক্তি প্রয়োগে রূপান্তরিত (strained) হইতে পারে। একটা রবারবল টিপিলে চেপ্টা হইয়া যায়; কেন? ঠিক জমাট জিনিষ নয় বলিয়া। অতএব ঈথারদেরও নানাম্ থাক (series)

আছে। সুতরাং প্রশ্ন উঠে—শেষ থাক কোথায়? একেবারে একটানা (continuous) সমবস্থ (homogeneous) জিনিষ কি? সেই জিনিষই আদর্শ ঈথার, এবং তাহাই বেদের আকাশ, এ আকাশকে strain করা চলিবে কি? আজ প্রশ্নটা পাড়িয়া রাখিলাম। এ সম্বন্ধের অর্থাৎ আকাশ, বায়ু ও ঈথারের সম্বন্ধের, বিচার আগামী বারে হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

বাণী—বীণা

আজ বঙ্গের বীণ্ কার মঙ্গল গায়!
শত সন্তান-বন্দন কারপায় ধায়!
সব শঙ্কা-সরম-দুখ-লজ্জা' দূরি,—
সে যে জাগ্রত আজি সারা বক্ষজুড়ি!

সে যে কণ্ঠেতে বর্ষিছে স্বর্গসুধা,
সে যে সঞ্জীব-রসে হরে চিত্তক্ষুধা;
সে যে অঞ্চল-ছায়ে করে সন্তাপ দূর,
সে যে কল্লোল ঢালি দেয় অন্তর-পুর!

আজ মন্দির ঝঙ্কৃত—সঙ্গীতময়,
সব অন্তরে উল্লাস-হিল্লোল বয়!
সারা বিশ্ব উজলি' তার হাস্য ফুটে,
যেন পুঞ্জিত মেঘ টুটি' সূর্য্য উঠে!

সে যে সন্তানে বিতরিছে শান্তি নিতি,
ওগো ভগ্ন-বীণায় দেয় পুণ্য-গীতি;
সে যে সৌরভ ধারা ঢালি, মুঞ্জরে প্রাণ,
সে যে অক্ষয় জ্ঞান করে অন্তরে দান!

তার মঙ্গল মঞ্জুল মঞ্জীর-ঘায়—
যেন কল্যাণ বঙ্গের অঙ্গন ছায়!
তার উচ্ছল উজ্জ্বল দীপ্তি-রাগে—
শত ফুল্লকমল মন-কুঞ্জে জাগে!

তার মঙ্গল মধুময় পদতল-ছায়—
কত বাল্মীকি কালিদাস আশ্রয় পায়!
সে যে শান্তির বিগ্রহ—কান্তিময়ী,—
জয় বিশ্বভুবনজন চিত্তজয়ী!

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

দাসবোধ

প্রস্তাবনা

শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী

মহান্ ভগবদ্ভক্ত সাধু, কবি এবং রাজনীতিজ্ঞ শ্রীরামদাস স্বামীর নাম ভারতবাসীর নিকট সুপরিচিত। যবন-পদ-দলিত মহারাষ্ট্র ভূমিতে স্বীয়তপস্যা এবং অত্যদ্ভুত বুদ্ধিবলে স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি "সমর্থ" উপাধী লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশে ইনি শ্রীহনুমদ্দেবের অবতার বলিয়া পূজিত; যাহা হউক ইনি যে একজন অসামান্য শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। অন্যান্য ধর্ম্মগুরু মহাপুরুষদিগের মধ্যে ইঁহার বিশেষত্ব এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লোকোদ্ধারের জন্য রামদাস স্বামী অবশ্য প্রয়োজনীয় তিনটী উপায় অবলম্বন করিয়া ছিলেন। (১) নীতি স্থাপনা, (২) ধর্ম্মস্থাপনা, (৩) রাজ্য স্থাপনা। ইঁহার চরিত্রবিচার ও পূর্ণ সমালোচনা এক্ষণে আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। আমরা শুধু সংক্ষেপে মুখারম্ভের জন্য দুই একটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

গোদাবরীতীরে বীড়প্রান্তে জাঁব নামক গ্রামে শকাব্দা ১৫৩০ (ইং ১৩০৮) চৈত্রমাসে শুক্লা নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহর সময় অর্থাৎ ঠিক রামজন্ম সময়ে শ্রীরামদাস স্বামী অবতীর্ণ হন। ইঁহার পিতা সূর্য্যাজী পন্ত এবং মাতা সাধ্বী রাণুবাঈ উভয়েই অসাধারণ পবিত্রচিত্ত এবং ভক্তিযুক্ত ছিলেন। সূর্য্যাজী পন্ত বাল্যকাল হইতেই সূর্য্যনারায়ণের উপাসক ছিলেন। ১২ বৎসর কাল সূর্য্যদেবের আরাধনান্তর, কথিত আছে, তিনি সূর্য্যদেবের নিকট হইতে দুই পুত্র বরদান প্রাপ্ত হন। শক ১৫২৭ অব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই পরে শ্রেষ্ঠ এবং রামীরামদাস এই দুই নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহার সার্দ্ধ দুই বৎসর পরে আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের নায়ক নারায়ণ, যিনি পরে শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেন, তাঁহার জন্ম হয়।

কথিত আছে সমর্থ বাল্যকালে অত্যন্ত উপদ্রবী ও চঞ্চল ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত এবং হাস্যবদন থাকিতেন কিন্তু মর্কটের ন্যায় সদাচঞ্চল ও বৃক্ষারোহণে তৎপর ছিলেন। খুবসম্ভব শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসমসাহসিকতা এবং বলবত্তার জন্যই সাধারনের বিশ্বাস যে তিনি শ্রীহনুমান দেবের অবতার ছিলেন। সমর্থ এইরূপ ক্রীড়াশীল এবং চপল হইলেও অধ্যয়নে অতীব মনোযোগী এবং প্রতিভাশালী ছিলেন। উপনয়নসম্পন্ন হইবার কিছুদিন পরেই সমর্থ পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর, এই সময় হইতেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ স্বয়ং তাঁহার বিদ্যাভ্যাস করাইতে থাকেন। সমর্থের গ্রন্থদৃষ্টে যদিও ইহা বুঝা যায়না যে তিনি সংস্কৃতে পূর্ণ পণ্ডিত ছিলেন তথাপি ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি উপনিষদ্, ভাগবৎ ইত্যাদি গ্রন্থ সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার সূক্ষ্মবিচার শক্তি এবং বহুশ্রুত অতুলনীয় ছিল। নিম্নের ঘটনা হইতে তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় এবং প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার. প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ কোনও এক শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করেন। সমর্থ ইহা দেখিয়া ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করেন, আমাকেও মন্ত্র প্রদান করুন,। তাঁহার ভ্রাতা উত্তর দিলেন, তুমি এখনও অত্যন্ত অল্প বয়স্ক, মন্ত্রোপদেশের যোগ্যতা এখনও তোমার হয় নাই। এইরূপ উত্তর শুনিয়া সমর্থ গ্রামের বাহিরে হনুমদ্দেবের মন্দিরে যাইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। কথিত আছে তিনি মহাবীরের কৃপায় শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

মাতা রাণুবাঈ বালক নারায়ণের বিবাহ দিবার জন্য

চেষ্টা করিতেন কিন্তু নারায়ণ বিবাহ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। একবার বিবাহের আয়োজন করাতে তিনি গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ছিলেন, অবশেষে বন্ধুশ্রেষ্ঠ অনেক সাধ্যসাধনার পর পুনরায় তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া রাণুবাঈ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রেষ্ঠ মাতাকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন যে নারায়ণ যখন বিবাহ প্রসঙ্গে এত বিরক্ত হয় তখন বর্ত্তমানে বিবাহ স্থগিত থাকুক কিন্তু মাতা বলিলেন, যেকোন প্রকারে নারায়ণের বিবাহ দিতেই হইবে।

অবশেষে একদিন রাণুবাঈ নারায়ণকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি আমার কথা শুনিবে কিনা বল।" সমর্থ উত্তর দিলেন "মা; এবিষয়ে প্রশ্ন করিবার আবশ্যকতা কি? আপনার আজ্ঞা কিজন্য পালন করিবনা, নমাতুঃ পরং দৈবতম্॥" ইহা শুনিয়া রাণুবাঈ বলিলেন, "পুত্র তবে তুমি বিবাহ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই এত পাগলামী কর কেন? তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল অন্তরপটধারন (অনুষ্ঠান বিশেষ) পর্য্যন্ত কোন গোলমাল করিতে পারিবে না।" সমর্থ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, অন্তর পটধারন পর্য্যন্ত কোন-রূপ গণ্ডগোল করিব না।" সরল হৃদয়া মাতা বালকা সমর্থের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। তৎপরে মাত জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট সবকথা বলিলে তিনি ঈষদ্ হাস্যকরিয়া বলিলেন "বেশ্ত।" নারায়ণের বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। এক কুলীন এবং ধনবানের সুন্দরী কন্যার সহিত সম্বন্ধ হইল। খুব উৎসবের সহিত লগ্নতিথির দিন সকলে কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। সমর্থও সকলের সহিত আমোদে যোগ দিলেন। সীমন্ত পূজন, পুণ্যাহ বাচন প্রভৃতি লগ্নসময় উপস্থিত হইলে উভয় ভ্রাতা পরস্পরের প্রতি চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তরপটধারণের সময় উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণগণ একত্র মঙ্গলাষ্টক পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলে একসঙ্গে "সাবধান" বলিলেন। সমর্থও অন্তরপটধারন পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ মাতৃআজ্ঞা পালন করিয়া ঠিক এই সময়ে লগ্নমণ্ডপ হইতে উঠিয়া পলায়ণ করিলেন। অনেকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল, কিন্তু তিনি রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন! মাতা পুত্রের পলায়ণ সংবাদে অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "নারায়ণ কোথাও না কোথাও আনন্দে থাকিবে তাহার জন্য দুঃখিত হইওনা"।

বিবাহ সভা হইতে সাবধান হইয়া দ্বাদশ বর্ষীয় সমর্থ স্বীয় জাঁবগ্রামের পঞ্চবটীতে লুকাইয়া রহিলেন। সেখান হইতে পারে নাসিক পঞ্চবটীতে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পূজা সমাপনান্তর আরও দুই তিন মাইল পূর্ব্বে ঠাকলী নামক গ্রামে চলিয়া আসিলেন। এখানে এক পুরাতন এবং বিস্তৃত বৃক্ষের নিম্নে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইতেন এবং কটি পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জপ করিতেন। তৎপরে দ্বিপ্রহরে মাধুকরী-ভিক্ষার জন্য পঞ্চবটীতে যাইতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের পূজা নৈবেদ্যাদি সমাপন করিয়া ভোজন করিতেন। ইহার পর কিছু সময় ভজন করিতেন এবং পুনরায় সন্ধ্যাকাল হইতেই জপধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এই সময়ে তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না, কাহারও গৃহে যাইতেন না। অবিরত জলে দাঁড়াইয়া থাকার জন্য তাঁহার কটিদেশ হইতে দেহের নিম্নভাগ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পরন্তু ঐ সময় ধ্যান মগ্ন থাকায় তিনি এ সকল কষ্ট অনুভব করিতে পারিতেন না। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহন করিয়া তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন এবং প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন এবং সম্পূর্ণরূপে মনোজয় সম্পন্ন করিয়া দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন।

মনোজয় করিবার জন্য সমর্থ যে প্রকার তীব্র তপস্যা করিয়া ছিলেন, সেইরূপ লোকোদ্ধার বা ধর্ম্মস্থাপনার জন্য দেশ পর্য্যটন দ্বারা স্বদেশ স্থিতি এবং তীর্থযাত্রা দ্বারা ধর্ম্মের দশা অবগত হইয়াছিলেন। তিনি বার বৎসর কাল পদ-ভ্রমণে সমস্ত ভারত খণ্ডের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া বিবিধ প্রকার আধিভৌতিক তাপ অনুভব করিয়াছিলেন, ভিন্ন ভিন্ন জন-স্বভাব পরীক্ষা করিয়াছিলেন;

সামাজিক, ধার্ম্মিক, রাজকীয় আচার ব্যবহার দেখিয়াছিলেন, নানাপ্রকার সাধু-সঙ্গ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রহস্য জ্ঞাত হইয়াছিলেন; অনেক প্রকার রাজ্যপ্রবন্ধ, প্রাকৃতিক রমণীয় দৃশ্য সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন। ফলকথা স্বদেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত আবশ্যকীয় জ্ঞান দেশ পর্য্যটন এবং তীর্থযাত্রাদ্বারা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই সমুদায় অভিজ্ঞতার ফল বলিয়াই দাসবোধ গ্রন্থের বিশিষ্টতা।

অনন্তর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পরে নারায়ণ আপনার জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করেন। এদিকে মাতা পুত্রবিয়োগে ব্যাকুল হইয়াগিয়াছিলেন, নিরন্তর ক্রন্দন করায় তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইয়াগিয়াছিল। নারায়ণ ভ্রমণ করিতে করিতে নিজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া শ্রীহনুমানজীর দর্শনাদি করিলেন এবং তৎপর স্বীয় বাটীতে যাইয়া দ্বারদেশ হইতে "জয় জয় শ্রীরঘুবীর সমর্থ" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। মাতা নিকটস্থ ঘরেই উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি বধূকে (শ্রেষ্ঠ-পত্নী) ভিক্ষাদিতে আজ্ঞা করিলেন। সমর্থ শুনিয়া অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মা, এ বৈরাগী অপর বৈরাগীদের মত ভিক্ষা লইয়া যাইবে না"। রাণুবাঈ দ্বিতীয় বার সমর্থের কথা শুনিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি! নারায়ণ আসিলি?" ইহা শুনিতেই রামদাস স্বামী মার চরণে প্রণত হইলেন। মাতা পুত্র উভয়ের নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মাতা রাণুবাঈ যখন পুত্রের মস্তকে এবং মুখে আদর করিয়া হাতবুলাইতে গিয়া সমর্থের বৃহৎ জটাজূট এবং শ্মশ্রু স্পর্শ করিলেন তখন তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "ওরে নারায়ণ তুই কতবড় হইয়াছিস্! আমার ত আর চক্ষু নাই যে আমার নারায়ণকে পুনরায় দেখিব"। মাতার এইরূপ দীন বচন শ্রবন করিয়া নারায়ণের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল। তিনি মাতার চক্ষু স্বীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র রাণুবাঈ পুনর্ব্বার চক্ষু লাভ করিলেন। মাতা চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র তুই এইরূপ ভূতবিদ্যা কোথা হইতে শিখিলি?" সমর্থ তখন একপদ রচনা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ঐ পদের তাৎপর্য্য এই যিনি সকল মহাভূতের প্রাণভূত এই বিদ্যা তাঁহারই করুণার ফল। সমর্থ কয়েক দিবস গৃহে আনন্দ পূর্ব্বক থাকিয়া যখন বিদায় লইবেন তখন রাণুবাঈ অত্যন্ত শোকাতুরা হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া সমর্থ মাতাকে আধ্যাত্ম জ্ঞানপ্রদান করিলেন। ভাগবতে কপিল-মুণি যে আত্মবোধ মাতাকে দিয়াছিলেন সেই আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়া রাণুবাঈ শান্তিলাভ করিলেন। ইহার পর শ্রীরামদাস স্বামী ধর্ম্মপ্রচার এবং মঠস্থাপনা কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ছত্রিশ বৎসর।

লোকোদ্ধার কার্য্য সম্বন্ধে তিনি স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "উত্তম উত্তম গুণ সকল নিজে শিখিয়া লোক-দিগকে শিক্ষা দিবে প্রচণ্ড সমুদায় (অর্থাৎ শক্তিমান লোক-দিগকে) একত্রিত করিবে কিন্তু গুপ্তভাবে। সমস্ত জগতকে উপাসনা এবং আত্মারামের ভজনে প্রবৃত্ত করা-ইবে। লোকদিগকে নিজের কর্ত্তৃত্বের পরিচয় দিবে কারণ যখন লোকে বুঝিবে যে ইনি প্রকৃত সাধু মোহন্ত তখন তাহারা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে ইচ্ছা করিবে।

ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে সমর্থ চাফল নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি প্রথম কয়েক বৎসর বন, পর্ব্বত গুহার মধ্যে বিচরণ করিতেন, লোকালয়ে কদাচিৎ আগমণ করিতেন। তখন তাঁহার চিত্ত নিত্য অখণ্ডরূপ ভগবানে নিমগ্ন থাকায় তিনি অবধূতবেশে পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। চাফল গ্রামে অবস্থান কালে সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। ঐ স্থানেই তিনি বহু নিস্পৃহ মোহন্ত গড়িয়া তুলিয়া মহারাষ্ট্রদেশে বহু স্থানে স্থাপিত মঠগুলিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে উপাসনা ও ভক্তিমার্গের বহুল প্রচার করিয়া তিনি জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া ছিলেন। স্বধর্ম্মের জাগরণ হওয়াতে, দেশে স্বাভিমান এবং ঐক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সকলের মধ্যেই স্বতন্ত্রতা এবং ধর্ম্মরক্ষা করিবার প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগ্রত হইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার মহারাজ শিবাজীর কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহার মনে এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎলাভের জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু ঐসময়ে রামদাস স্বামীর অবস্থান সকলেরই অজ্ঞাত ছিল, আরও তিনি কখনও একস্থানে থাকিতেন না। অবশেষে একদিন অনিবার্য্য দর্শন লালসায় মহারাজা শিবাজী

একাকী বনপর্ব্বতে সমর্থের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অনেক কষ্টের পর ঘোর কাননমধ্যে এক ঔদুম্বর বৃক্ষের নীচে শিবাজী সমর্থের দর্শনলাভ করিলেন। ঐ স্থানেই শিবাজী মহারাজ মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করেন। ঐদিন প্রকৃত সদ্‌গুরু এবং মুমুক্ষু শুদ্ধ, স্বাতন্ত্রেচ্ছুক শিষ্য উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার এবং লোকোদ্ধার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সমর্থ এবং শিবাজীর সম্বন্ধ অতি নৈসর্গিক এবং গভীর।

শ্রীসমর্থ শিবাজীকে মন্ত্রোপদেশ প্রদান করিয়া আজ্ঞা দিয়াছিলেন, রাজ্য স্থাপন করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করাই তোমার মুখ্য ধর্ম্ম। দেব এবং ব্রাহ্মণের সেবা করিবে, প্রজার পীড়া দূর করিবে এবং তাহাদিগকে পালন ও রক্ষা করিবে। ঐ সময়ে সমর্থ শিবাজী মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তোমার মনে যে ইচ্ছা হইবে তাহাই পূর্ণ হইবে। এই আজ্ঞানুসারে শিবাজী রাজ্যস্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং স্বামীজির আশীর্ব্বাদে তাঁহার উদ্যোগ সফল হইয়াছিল এবং তাঁহার সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল। শিবাজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শত্রুদমন এবং বিপুল ধন প্রাপ্তি ইহা শ্রীগুরুর কৃপার ফল। মহারাজ শিবাজী একদা রামদাস স্বামীর চরণে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিয়া গুরুপদ সেবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার পূর্ব্বের উপদেশ মত কর্ম্মকর তাহা হইলেই আমার সেবা হইবে।" ইহার পর মহারাজ শিবাজী সমর্থ স্বামীর আজ্ঞানুসারে চাফল গ্রামে এক মঠ এবং শ্রীরঘুবীরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং রামদাসী সম্প্রদায়ের জন্য বহু গ্রাম এবং ভূমি দান করেন। শিবাজীর আগ্রহাতিশয্যে রামদাসস্বামী কিছুদিন সজ্জন গড় দুর্গে বাস করেন। ঐ স্থানে শিবাজী এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

একদিবস রামদাস স্বামী ভিক্ষা করিতে করিতে সিতারা দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া "জয় জয় শ্রীরঘুবীর সমর্থ" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। শিবাজী ইহা দেখিয়া এক কাগজ খণ্ডে "শ্রীসমর্থের চরণে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিলাম" ইহা লিখিয়া পত্র মোহরাঙ্কিত করিলেন এবং দ্রুত বাহিরে আসিয়া সমর্থের ঝুলিতে ঐ পত্র প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। সমর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিবা, এ কেমন ভিক্ষা দিলে? ঝুলিতে একমুষ্টি চাউল দিলে দ্বিপ্রহর সময়টা কাটিত। আজ কি কাগজের টুকরা দিয়াই আমার আতিথ্য করিবে? ইহা বলিয়া গুরু পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, "শিবা রাজ্যত আমাকে দিয়াছ এখন তুমি কি করিবে? শিবাজী যুক্তহস্তে প্রার্থনা করিলেন, "আপনার চরণ সেবায় কালক্ষেপ করিব।" সমর্থ শুনিয়া সহাস্যে উত্তর করিলেন, "বাবা, যাহার যে কাজ তাহাই করা উচিত। ব্রাহ্মণের জপতপ এবং জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্ম আর ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করাই ধর্ম্ম। এই প্রকার নিজ নিজ কার্য্য করাতেই জীবের মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়। আপন আপন কর্ম্ম যথোচিত রীতিতে সম্পাদন করাতেই জন্মের সার্থকতা। ঐ সময় সমর্থ রাজা জনকের রাজধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, "শিবা আমার মত বৈরাগীর রাজ্যের প্রয়োজন কি? আর যদি অঙ্গীকার করিলাম তবে রাজ্যপালনের জন্য একজন প্রতিনিধি আবশ্যক। প্রতিনিধি তুমিই হও আর এরাজ্য আমার এইরূপ জ্ঞান করিয়া রাজ্যপ্রবন্ধ কর।" শিবাজী ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তখন প্রার্থনা করিলেন, "তবে আমাকে দয়া করিয়া আপনার পাদুকা প্রদান করুন। উহাকেই স্থাপন করিয়া আমি রাজ্যপালন করিব।" সমর্থ এই প্রার্থনা স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে মহারাজ শিবাজী আপনার পতাকা গৈরিক বর্ণের করাইয়া লইয়াছিলেন। মারাঠার ভগঝাণ্ডা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

শিবাজী মহারাজ যখন সজ্জনগড়ের দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন তখন একদিবস নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত লোকদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, এতগুলি লোককে পালন করিতে পারিতেছি, এজন্য আমি ধন্য। এই প্রকার চিন্তা করিতেই তাঁহার মনে একপ্রকার অভিমান উপস্থিত হইল। এমন সময় অকস্মাৎ সমর্থ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী গুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া

তাঁহার অকস্মাৎ আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমর্থ কহিলেন, "তুমি শ্রীমান্ সহস্র সহস্র লোকের পালন কর সেজন্য তোমার কারখানা দেখিতে আসিয়াছি।" শিবাজি কহিলেন, "সমস্তই আপনার কৃপার ফল।" এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময়ে সমর্থ নিকটবর্ত্তী এক প্রস্তরখণ্ডের নিকট যাইয়া কহিলেন, "একজন শিল্পীদ্বারা এই পাথর দুইখণ্ড কর, কিন্তু যেন বেশী ধাক্কা না লাগে এবং দুইখণ্ড সমান হওয়া চাই।" পাথর দুইখণ্ড হইবামাত্র উহার ভিতরে হরিদ্রাবর্ণের অংশ হইতে কিছু জল এবং একটী জীবিত ভেক নির্গত হইল। এই আশ্চর্য্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। সমর্থ তখন কহিলেন, "শিবা তোমার অসীম যোগ্যতা এবং তোমার লীলা অগাধ। দেখ এইরূপ আশ্চর্য্যকারক ব্যাপার আর কে করিতে পারে?" শিবাজী কহিলেন "ইহাতে আমার যোগ্যতা কি আছে?" সমর্থ কহিলেন, "কেন নাই? তুমি ছাড়া জীবের পালনকর্ত্তা আর কে আছে? শিবাজী মহারাজ তখন সমস্ত বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "আমার মত পাপিষ্ঠের কিছু হইবে না, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। সমর্থ কহিলেন, "আমি ক্ষমা করিবার জন্যই এই সময়ে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে তুমি ঐ সরকারের (রাম) বড় ভৃত্য, তোমার হাত দিয়াই তিনি অপর সকলকে দান করাইয়া থাকেন, সুতরাং ইহাতে তুমি কদাচ অভিমান করিবে না।" ইহা শুনিয়া শিবাজী গুরুচরণে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মাতার সঙ্কল্পানুসারে একবার সমর্থ প্রতাপগড়ে স্থাপিত দেবীর চরণে স্বর্ণপুষ্প অর্পণ করিতে গিয়াছিলেন। সমর্থ দেবীর পূজা সমাপনান্তর দেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন। এই স্তুতিতে তাঁহার আত্মচরিতের কিছু ছিল। অন্তিম চারি পদ্যে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধে প্রার্থনা করেন, উহা উল্লেখ যোগ্য। উহার ভাবার্থ এই—হে মাতঃ তোমার নিকট মাত্র এক প্রার্থনা আছে, যদি বরদান দাও তবে এই বরদান কর যে, তুমিও যাহার অভিমান রাখ, সে সর্ব্বথা তোমারই, সেই শিবাজীকে রক্ষা কর। আমার চক্ষুর সম্মুখে তাহাকে বৈভবের শিখরে স্থাপন কর। আমি শুনিয়াছি তুমি অনেক দুষ্টের সংহার করিয়াছ, কিন্তু এখন সেই কথা প্রমাণ কর। সমস্ত দেবগণ আমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন। তুমি কতদিন আর আমাদিগের এইরূপ পরীক্ষা লইবে? হে দেবি তুমি ভক্তের মনোবাঞ্ছা শীঘ্র পূর্ণ কর; আমি অত্যন্ত আতুর হইয়া গিয়াছি এজন্য আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার ইচ্ছা সফল কর।" শিবাজী মহারাজ ধন্য যাঁহার জন্য সদ্‌গুরু দেবীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শক ১৬০২ অব্দে শিবাজী মহারাজের স্বর্গলাভ হয়। এই সমাচার শ্রবণ করিয়া সমর্থ অত্যন্ত শোকার্ত্ত হন। শিবাজীর বিয়োগের পর হইতেই রামদাস স্বামী আর বাহিরে আসিতেন না, তিনি সর্ব্বদা ভগবদ্ চিন্তনেই মগ্ন থাকিতেন। শম্ভাজীর রাজ্যাভিষেকে তিনি স্বয়ং গমন করেন নাই একজন শিষ্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে শম্ভাজীর ঘোর সাহসিক কার্য্য এবং চরিত্র শ্রবণ করিয়া তিনি একখানি উপদেশপূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্র অতীব মহত্বপূর্ণ ছিল, উহা পাঠ করিয়া সমর্থের রাজনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঐ সময়ে সম্ভাজী কুসঙ্গে পড়িয়া এতদূর অধঃপতিত হইয়াছিলেন যে ঐ পত্রে তাঁহার কোনও লাভ হয় নাই।

শক ১৬০৩ অব্দে মাঘী কৃষ্ণা নবমীতে সমর্থ দেহ রক্ষা করেন। অন্তকালের কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি অন্ন ত্যাগ করেন এবং আহারের মধ্যে কেবল স্বল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতেন। ঐ সময়ে শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহার অন্তিম দিনের কথা জানিতে পারিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হয়, তদনুসারে শিষ্যদিগের সম্মুখে শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করেন, উহার তাৎপর্য্য—রঘুকুল তিলকের সময় (রামনবমী) আগতপ্রায় এজন্য সব সাঙ্গোপাঙ্গ একত্র ভোজন করা প্রয়োজন। তাঁহার শিষ্য উদ্ধব স্বামী তৎক্ষণাৎ উক্ত শ্লোকার্দ্ধ পূর্ণ করিয়া উত্তর দেন, উহার তাৎপর্য্য—অন্তিম দিন নবমীর স্মরণ রাখা প্রয়োজন এজন্য শীঘ্রতার সহিত কার্য্যসিদ্ধি করা প্রয়োজন। এই শ্লোকার্দ্ধ শুনিয়া সমর্থ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং

সকলকে ভক্তিপদ গান করিতে আজ্ঞা দিলেন। অষ্টমীর দিবারাত্র ভোজন উৎসব হইল, সমস্ত শিষ্য একত্রিত হইলেন। নবমীর দিন সমর্থ পালঙ্ক হইতে নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং শিষ্যদিগের আগ্রহাতিশয্যে সামান্য মিশ্রি এবং শুষ্ক আঙুর ভক্ষণ করিয়া জলপান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যগণ তাঁহাকে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সমর্থ বলিলেন, "তবে আমাকে উঠাইয়া পালঙ্কের উপর স্থাপন কর।" আজ্ঞা পাইয়া উদ্ধব স্বামী তাঁহাকে উঠাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু সক্ষম হইলেন না। তৎপর দুইজন শিষ্য মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিফল হইলেন। অবশেষে প্রায় দশ ব্যক্তি মিলিত হইয়া চেষ্টা করিলেন তথাপি সক্ষম হইলেন না। কিছুক্ষণ পরে সমর্থ সকলকে একটু দূরে সরিয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন। সকলে সরিয়া গেলে যখন সমর্থ বায়ু আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন শিষ্যেরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সমর্থ তাহাদিগকে বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত আমার কাছে থাকিয়া তোমরা কি শুধু ক্রন্দন করিতেই শিখিয়াছ?" শিষ্যেরা কহিলেন, "সগুণমূর্ত্তি হারাইতেছি এখন কাহার সহিত ভজনা করিব আর কাহারইবা সহিত বাক্যালাপ করিব?" রামদাস স্বামী অন্তিম উত্তর দিলেন, 'পরে যে আমার সহিত আলাপ করিতে চাহিবে সে যেন "দাসবোধ" আদি গ্রন্থ পাঠ করে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করাই প্রত্যক্ষ আমার সহিত আলাপ করা জানিবে।" ইহা কহিয়া সমর্থ একাদশ বার "হর হর" বলিয়া শেষে "রাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়াই যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রপ্রান্তের একমাত্র সিদ্ধরত্ন, মহাপুরুষ, রাজনীতিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, ভক্তি, জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান অবতার স্বীয় আরাধ্য রামে বিলীন হইলেন।

সূচী পত্র

পঞ্চম দশক

ষষ্ঠ দশক

সপ্তম দশক

অষ্টম দশক

নবম দশক

দশম দশক

প্রথম দশক

প্রথম সমাস

"শ্রীরাম"

শ্রোতাগণ প্রশ্ন করেন ইহা কোন গ্রন্থ, ইহাতে কি বলা হইয়াছে এবং ইহা শ্রবণ করিলে কি লাভ হয়? ॥১॥ এই গ্রন্থের নাম দাসবোধ, ইহাতে গুরুশিষ্যের সংবাদ এবং স্পষ্টরূপে ভক্তিমার্গ বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥ এই গ্রন্থে নববিধা ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য লক্ষণ এবং বিশদভাবে অধ্যাত্মনিরূপণ করা হইয়াছে ॥৩॥ এই গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে ভক্তিযোগে মনুষ্য নিশ্চয় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারে ॥৪॥ মুখ্যভক্তি, শুদ্ধজ্ঞান, আত্মস্থিতি, শুদ্ধ উপদেশ, সাযুজ্যমুক্তি, মোক্ষপ্রাপ্তি, শুদ্ধস্বরূপ, বিদেহস্থিতি, অলিপ্ততা মুখ্যদেব, মুখ্যভক্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা, মুখ্যব্রহ্ম, নানামত ইত্যাদি বাক্যের নিরূপণ করা হইয়াছে এবং "আমি কি" ইহাও নির্দেশ করা হইয়াছে। মুখ্য উপাসনা নানাপ্রকার কবিত্ব, নানাপ্রকার চাতুর্য্য, মায়ার উৎপত্তি, পঞ্চভূত এবং কর্ত্তা প্রভৃতির লক্ষণ এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে ॥৫—১১॥ ইহাতে নানাপ্রকার সংশয় ভঞ্জন করা হইয়াছে এবং বহুপ্রকার প্রশ্নের সমাধান করা

হইয়াছে ॥১২॥ এই প্রকার উপর্য্যুক্তবিষয়ের ন্যায় বহুধা নিরূপণ করা হইয়াছে, সমস্ত গ্রন্থে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে সে সমস্ত বিশদভাবে এইস্থানে বলা যাইতে পারে না ॥১৩॥

তথাপি সমস্ত দাসবোধ বিশ দশকে বিভক্ত করিয়া বিশদ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক দশকের বর্ণিত বিষয় উহাতে বলা হইয়াছে ॥১৪॥ অনেক গ্রন্থের সম্মতি, উপনিষদ্ বেদান্ত, শ্রুতি, শাস্ত্র এবং মুখ্য আত্মপ্রতীতি ইত্যাদি লইয়া এই গ্রন্থের রচনা হইয়াছে ॥১৫॥ বহুগ্রন্থের সম্মতি লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে এজন্য ইহাকে মিথ্যা বলা যাইতে পারে না, তথাপি প্রত্যক্ষ অনুভব দ্বারাই এই বাক্যের প্রমাণ বুঝা যাইবে ॥১৬॥ যদি কেহ মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া এই গ্রন্থ মিথ্যা বলিয়া প্রচার করে তবে বুঝিবে সে বহুশাস্ত্র গ্রন্থ এবং ভগবদ্ বাক্যেরও উচ্ছেদ করিতেছে ॥১৭॥ শিবগীতা, রামগীতা, গুরুগীতা, গর্ভগীতা, উত্তরগীতা, অবধূতগীতা, বেদ, বেদান্ত, ভগবদ্-গীতা, ব্রহ্মগীতা, হংসগীতা পাণ্ডবগীতা, গণেশগীতা, যমগীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদি নানাগ্রন্থের সম্মতি দ্বারাই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে ভগবদ্‌বাক্য বিদ্যমান এবং তাহা যথার্থ ॥১৮—২০॥ এমন কে পতিত আছে যে ভগবদ্ বাক্যে অবিশ্বাস করে? এই গ্রন্থে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভগবদ্‌বাক্য হইতে অন্যথা নহে ॥২১॥ সম্পূর্ণ গ্রন্থ না দেখিয়া ব্যর্থ দোষ, যে দুরাত্মা দুরভিমানী পুরুষ মাৎসর্য্যের জন্যই এইরূপ করে। তাহার মনে অভিমানের জন্য মাৎসর্য্য, মাৎসর্য্যের জন্য তিরস্কার উপস্থিত হয়, এবং পরে পরে ক্রোধ বিকার উপস্থিত হয় ॥২২—২৩॥ ইহা নিশ্চয় যে ঐ মনুষ্য অহংকারের জন্য দুষ্টচিত্ত হইয়া কাম ক্রোধে সন্তপ্ত হয় ॥২৪॥ যে কাম ক্রোধের অধীন তাহাকে হিতকথা কিরূপে বলিব? দেখ, রাহু অমৃতপান করিয়াও বিনষ্ট হইল। আচ্ছা এখন এ সমস্ত কথা থাকুক যাহার যেরূপ অধিকার সে সেইরূপেই লইবে, কিন্তু সকলেরই অভিমান পরিত্যাগ করা উচিত ॥২৫—২৬॥ শ্রোতাদিগের প্রথম প্রশ্ন "এই গ্রন্থে কি বলা হইয়াছে" সেই প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া হইল ॥২৭॥

এখন শ্রবণ করার ফল কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ এই গ্রন্থ শ্রবণ করিলে লোকের আচরণ পরিবর্ত্তিত হয় সংশয়ের মূল সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয় ॥২৮॥ সুগম পথ প্রাপ্ত হওয়া যায়, দুর্গম সাধনের আবশ্যক হয় না এবং সাযুজ্য-মুক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় ॥২৯॥ এই গ্রন্থ শ্রবণ করিলে অজ্ঞান, দুঃখ এবং ভ্রান্তি নাশ হয়, শীঘ্র জ্ঞানলাভ হয় ॥৩০॥ যোগীদিগের পরম ভাগ্য স্বরূপ বৈরাগ্য লাভ হয় এবং বিবেক সহিত চাতুর্য্যলাভ হয় ॥৩১॥ যাহারা ভ্রান্ত নিকৃষ্ট গুণযুক্ত ও কুলক্ষণ তাহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সুলক্ষণযুক্ত হয় এবং ধূর্ত্ত, তার্কিক অথবা বিচক্ষণ ব্যক্তি অবসর সময়ে ইহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হন ॥৩২॥ যে অলস সে উদ্যোগী হইয়া যায়, পাপীর পশ্চাত্তাপ হয়, ভক্তিমার্গের নিন্দুক ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হয় ॥৩৩॥ বদ্ধ মুমুক্ষু হয়, মূর্খ দক্ষ হয় এবং অভক্ত ভক্তিমার্গ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করে ॥৩৪॥ এই গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার দোষ নাশ হয়, পাপী পবিত্র হয় এবং ইহার শ্রবণমাত্র উত্তম গতি লাভ করে ॥৩৫॥ দেহবুদ্ধির সন্দেহপূর্ণ ভ্রম এবং সংসারের সমস্ত উদ্বেগ এই গ্রন্থের শ্রবণে হয় ॥৩৬॥ ইহার ফলশ্রুতি এইরূপ, ইহার শ্রবণে অধোগতি নাশ হয় এবং মনের বিশ্রাম ও সমাধান লাভ হয় ॥৩৭॥ আরও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই, যে যেরূপ ভাবনা করিবে তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইবে, যে মনুষ্য মাৎসর্য্য পোষণ করিবে তাহার উহাই লাভ হইবে ॥৩৮॥

শ্রী—

খুদকুণ দীঘি

যদি কভু এই পথে এসো তুমি হে পথিক
খুদকুণ দীঘি যেন দেখো,
শ্যাম মণ্ডপের মত আছে বুড়া বটগাছ
তলে তার কিছু খণ থেকো।
কি সুন্দর উচ্চ পাড়' স্নিগ্ধ কাকচক্ষু জল
আছে প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ি'
পদ্ম ফুলে ঢাকা বুক সুরভিত সমীরণ
কত পাখী ডাকে ফিরি ঘুরি।
কেহ বলে বুড়ী এক খুদ্ খেয়ে দিন যাপি'
দিল এ বিশাল দীঘি খান,
কেহ বলে একরাতে 'বিশ্বকর্ম্মা' দিল গড়ি
কেহ বলে নবাবের দান।
বলে এই বটতরু কামরূপ হ'তে উঠি
চলুন্তি মন্ত্রেতে এলো হেতা,
সেই সব ডাকিনীরা আজও গাছে বাস করে
রজনীতে শুনা যায় কথা।
হয়ত একটী রাতে উড়িয়া যাইবে গাছ
এই ভয়ে রাখালেরা হায়,
শিকড়ের চারি দিকে ছোট ছোট গোঁজ পুতি
দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে যায়।
ঘোর পরিচিত এক আছে ঘুর ঘুরে বুড়ী—
দেয়াসিনী রক্ষা-কালিকার,
বছরে পূজার দিনে আজও ঠিক নিয়মিত
দুইবার 'ভর' হয় তার।
সে বলিল 'জানো বাবা এখানে ছিলনা দীঘি
ছিলনাক' গাছ পালা কোনো

ছিলনা নিকটে গ্রাম তিয়াসার বিন্দু বারি
কেমনে হইল তাহা শোন।
বামুনের মেয়ে এক যেতেছিল স্বামীসনে
ছেলে কোলে এই পথ দিয়ে,
বাসনা তাদের মনে 'যাজিগ্রামে' থাকি কাল
গঙ্গা নাবে কাটোয়ায় গিয়ে।
তখন বোশেখ মাস উঠেছে দারুণ রোদ
কাঁদে ছেলে জল জল করে,
নিকটেতে গ্রাম নাই পিপাসায় ছাতি ফাটে
কোথায় যাইবে বল দোড়ে।
দেখিতে দেখিতে আহা শাকমূর্ত্তি হ'ল ছেলে
মুখেতে সরেনা তার কথা,
মাতা পিতা আঁখিনীরে ভাসায় তাহার মুখ
মাঝ মাঠ, জল পাবে কোথা?
"জল" "জল" করি ছেলে বুঝিরে মিলায়ে যায়
কাঠ্ ফাটা রোদ আহা মরি,
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তবে যোগাসনে বসিলেন
বাঁচাবেন তনয়ে কি করি?
'সঞ্চিত ব্রহ্মণ্য তেজ মায়ের অগাধ স্নেহ
একসনে করিলেন দান
পিতা হ'ল ছায়াময় সুশীতল বটতরু
জননী হইল দীঘিখান।
সে ছেলে কোথায় গেছে যুগ যুগ কত ছেলে
এই স্নেহনীর করে পান,
অক্ষয় বিটপী যেন ব্রাহ্মণের পদছায়া
ভীতেরে আশ্রয় করে দান।

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

চোখের জল

আগের দিন পাশের বাড়ীতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেছে। ভাট বামুন ভোর বেলায় তার ছোট্ট ঘণ্টাটা টুং-টুং টুং করে বাজাচ্ছে আর সুর করে বল্‌ছে—"কি ছরাদ করলি রে।"

সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারিনি। শরীরটা অবসন্ন। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। টপ টপ করে বৃষ্টি এল। ছাদের উপর কতকগুলা আমকাঠ শুখাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে উঠে জানালা খুলে চাকরদের বল্‌লাম "ওরে ছাতে কাঠগুলা বুঝি ভিজে গেল ;—শিগ্‌গির করে ওঠ্" কারো সাড়া পেলাম না। শোঁ শোঁ করে ঝড় উঠল। আমি সদরে এসে রোয়াকের পৈঠায় উঠ্‌ছি—কে যেন পিছন থেকে এসে ডাক্‌লে "দাদা"। আমি থমকে দাঁড়ালাম—বল্‌লাম—কে ও!

"আমি"

"আমি কে ?"

"আমি তারা"

স্বর যেন কেঁপে কেঁপে—থেমে থেমে—আধভাঙা হ'য়ে উচ্চারিত হ'ল। আমি ভাষা ভুলে গেলাম। জিব অসাড় হ'য়ে গেল। রাগ দুঃখ অভিমান মায়া সবকটা সে দিন আমার প্রাণের ভিতর একসঙ্গে জড় হ'য়ে একটা ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়ে দিয়েছিল। ভাবলাম ব্যাপার কি? যে তারা তার শ্বশুরের শ্রাদ্ধে আমার চাকরদের পর্য্যন্ত ডেকে একখানা লুচি দিতে পারেনা। সেই তারা মাথা হেঁট করে আজ আমার বাড়ীতে এসেছে। আমার সঙ্গে সেধে কথা কইতে এসেছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লাম "কি রে—মতলব কি?"

তারা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌ল। আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে বল্‌লে "দাদা, বল তুমি সব ভুলে যা'বে?"

আমি রেগে বল্‌লাম "কি ভুলব! ভগিনী ভগিনীপতি হ'য়েত যথেষ্ট করেছ—লোকবলে—পয়সাবলে আমার পুকুরটা কেড়ে নিয়েছ—গ্রামের মধ্যে আমায় একঘরে করেছ—আমায় দেশত্যাগী করাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ—এগুলা সব ভুলতে বলছিস্? এগুলা ভুলব?"

তারা আমায় পায়ে ধরে বল্‌লে "দাদা—তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—আমি দোষী নই—কি করব—একজনের হাতে আমায় দিয়ে দিয়েছ—তাই—।"

রাগ বা অভিমান যাই বল—প্রাণে কি একটা উদয় হ'ল। বল্‌লাম "আজ একটা নূতন কথা শিখলাম—জোর করে একজন আর একজনের প্রাণের উপর আধিপত্য করতে পারে। আগে জানতাম্ যথার্থ প্রাণ যা—তা প্রাণই থাকে। একজনের হাতে সঁপে দিয়েছি বলে কি প্রাণের ক্রিয়াগুলো পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিস্।"

তারার মুখখানা পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল। মাথা হেঁট হইয়া—ঢোক গিলিয়া বলিল "আর কি আমার মা আছে—যে আমার প্রাণের কোনখানে কি হচ্ছে—পাঁতি পাঁতি করে দেখবে। নিরালায়—অনাদরে পড়ে পড়ে প্রাণে যে উই ধরে গেছে। কে তার আদরযত্ন করবে! যত্ন করবার যারা তা'রাই যে আমায় পায়ে ঠেলেছে।"

"পায়ে ঠেলব কেন? তোরাই যে আমায় পর করে দিয়েছিস্"

তারা মাথা তুলিয়া জোর করিয়া বলিল "আমি পর করে দিয়েছি? ভাই কখনো বোনের পর হয়! ভাইয়ের প্রাণে এক ঘা লাগলে বোনের প্রাণে যে শত প্রতিঘাত হয়—ভায়েরা কি সে খবর রাখে?"

আমি বল্‌লাম "—নিশ্চয়ই রাখে"

"যদি রাখে—তবে তাঁরা তাঁদের বোনের স্নেহ মমতার উপর এত সন্দিহান হন কেন? ভায়ের যে বোন—সে চিরকালই বোন। লক্ষবার পোড়ালেও সোনা সোনাই থাকবে।"

টপ্ করিয়া একফোটা চোখের জল তারার বুকের

উপর ঝরে পড়ল। আমার যা কিছু সমস্ত যেন তখন ওলটপলট হ'য়ে গেল। আমার মনে অভিমান—স্বার্থ আত্মসম্ভ্রম—বিবাদ বিসংবাদ সব সেই তারার মৃদুল মধুর স্নেহের নিকটে হার মানলে। জলভরা চোখে তারার ডানহাতটা ধরে বললাম "আয় দিদি আয়, বাইরের যা জঞ্জাল তা বাইরেই থাক্—আমারা ভাই বোন হ'য়ে—আগেকার মত একবার মায়ের ছবির নীচে বসিগে চল্। প্রাণের যা কিছু কালী মায়ের পুণ্যস্মৃতিতে ধুয়ে মুছে যা'ক। সারাবিশ্বের হিংসাদ্বেষ এতদিন খেটেখুটে একেবারে ফাঁকি পড়ে যা'ক।"

তারা একটু হেসে বললে "আগে আমার বাড়ীতে চল—তুমি গেলেই সব মিটে যা'বে। আচ্ছা, আমি কোথায় দাঁড়াই বল দেখি, একদিকে ভাই—আর একদিকে স্বামী। তার উপর একগ্রামে পাশাপাশি বাড়ী।"

মানুষের প্রাণ। আবার আত্মাভিমান জেগে উঠল। বললাম "আমায় কি করে যেতে বল্‌ছিস্! কাল হাড়ীডোম পর্য্যন্ত তোর বাড়ীতে খেয়ে গেল। কৈ তোদের বাড়ীর পাশে দাদা আছে বলে কেউ খুঁজেছিলি। রমেন এসে বলতে পেরেছিল কি—দাদা চলুন—আপনাকে যেতেই হ'বে"

"যে আসবার সে ঠিক এসেছিল। আমি দুবার এসে কেঁদে কেঁদে ফি'রে গেছি। তোমরা মায়ামমতার দেওয়া—নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছ, তাই জোর করে কিছু ব'লবার শক্তি আমার এল না। খিড়কীর ঘাটে তোমার ছেলেদের গোটাকতক সন্দেশ খাইয়ে—লুকিয়ে চোখের জলে ভেসে আমি বাড়ী ফি'রে গেছি। আমার ভাইপো ভাইঝি, আমার পর। —একি আমার কম দুঃখ! —কে আমার অন্তর খুঁড়ে দেখবে—যে আমার সারা বুকটার ভিতর আগুন ধরে গেছে।"

আর কথা কইলে না। আঁচল খানা চোখে দিয়ে তারা কাঁদতে লাগল। আমি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম—"আচ্ছা যা, তোর সঙ্গে কি—যার সঙ্গে ঝগড়া—তার সঙ্গে আছে। খবরদার আর কাঁদিস না। বেলা হ'ক, আমি যা'ব।"

"নিশ্চয় যা'বে?"

"হাঁ, ৮৷৯ টার সময় একবার এসে আমায় নিয়ে যাস্।" তারা মুচকে হেসে বললে "বৌদিদি যদি বারণ করে?" আমি হেসে বললাম "তা হ'লেও যা'ব—তুই যা।"

তারা হাস্‌তে হাস্‌তে চলে গেল। তখন প্রায় সকাল হ'য়ে এসেছে। সারা রাত্রিত আর ঘুম হয়নি। ভেবে ভেবেই রাত কেটেছে। চাকরদের ডেকে দিয়ে—ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

শুয়েও স্বস্তি পেলাম না। বিছানায় কে যেন শেঁকুলকাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। যত পাশফি'রি প্রত্যেক লোমকূপে যেন কত কাঁটা ফুটতে লাগল। অনেকদিন পরে মৃত্যুশয্যায় শয়ানা আমার সেই মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। উঃ মা যে তাঁর মরণের একটু আগে তারাকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। সেই আমি—যে তার ছোট বোনটীর নিখিল দুঃখের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা করে—তার মাকে হাস্‌তে হাস্‌তে চিরবিদায় নিতে দিয়েছিল। কত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফে'ললাম। গুমরিয়া গুমরিয়া কত কাঁদলাম। হায় ভগবান্, একি করলে—আমার সে উদার প্রাণের এত অধঃপতন! মুমূর্ষু মায়ের সঙ্গে চাতুরী! তারাত কোন দোষের দোষী নয়। সে যে এখনো তার দাদা-গত প্রাণ। সে কি করবে! সে যে নারী হ'য়ে জন্মগ্রহণ করেছে। বিধাতা যে তার মায়ামমতার মাথায় চির-অধীনতার ডাণ্ডশ্ ঠেকিয়ে রেখেছে। নাইবা দেখলাম, বুঝতে পারিত—রমেন সেদিন জাল করে আমার পুকুরটা কেড়ে নিলে সে দিন থেকে তারার বুকে যে তুষের আগুন জ্বলে আছে। সে যে আমার বোন্—রক্তের টান আছে বলেইত সে তিনদিন তিন রাত্রি নিরন্ন—নিরম্বু—নির্নিদ্র হ'য়ে কাটিয়েছে।

রাশি রাশি চিন্তার বিচার—বিশ্লেষণ করে করে স্থির করলাম—আমার সম্পত্তিই তারার যত সুখের অন্তরায়। এইত মা আমার চলে গেছে—সম্পত্তিত তাঁর সঙ্গে যায়নি। আমারও ত একদিন—সে দিন আসবে। তবে কেন এমন পবিত্র—সরল—স্বর্গীয় ভগিনীস্নেহকে অবহেলাতে পথের

ধূলায় মাটী করব! সে যে আমার নীরব ব্যথার নীরব ব্যথী। সে যে আমার চির উত্তপ্ত অশান্তি-মরুর মাঝখানে স্নিগ্ধ শ্যামল ওয়েসিস্। হ'ক আমার দুঃখ কষ্ট তারা যে আমার মুমূর্ষু মায়ের সঁপে দেওয়া বস্তু। মনকে খুব দৃঢ় করে—মনে মনে বললাম—রমেন আমার যতই শত্রুতা করুক—যা'ক আমার সমস্ত সম্পত্তি—তবু তারার সুখের জন্যে আমি সারা জগতের দুঃখকে বরণ করে নেব।

২

বেলা আটটার সময় তারা আসিয়া বলিল—"দাদা, তবে চল"

আমি বললাম "এসেছিস্?—আচ্ছা চল্"

শত চিন্তা নিয়ে দুই বৎসরের পর সেদিন ভগিনীর বাড়ীতে গেলাম। কি-জানি-কেন তখন প্রাণটা যেন কেমন একতর হ'য়ে গিয়েছিল। আমি যেন কত অপরাধী। রমেন,—সে ব্যবহারে পরের চেয়েও আমার আরও বেশী পর হয়েছে,—তার বাড়ীতে আমার খুব অন্তরঙ্গ নিজের বোনের আহ্বানে মাথা হেঁট করে যাচ্ছি। রক্ত মাংসের শরীর—সংসারীর মন ত! মনের সঙ্গে মারামারি করে সে দিন যে তারার আবদার রক্ষা করতে পেরেছি—এতেই আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

একটা ঘরে গিয়ে বসলাম। তারা জলখাবার দিতে এল। জিজ্ঞাসা করলাম "রমেন কোথা?"

তারা আমার কথায় কান না দিয়া—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেল। দেখলাম—শতবেদনার পুঞ্জীভূত অভ্র মেঘের মত তাহার চোখদুটীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত মুখটার উপর সেই মেঘের ছায়া পড়েছে।

খাবার খেতে খেতে পাশের ঘরে তারার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। হাতের খাবার হাতে রইল। শুনলাম—তারা বলছে "একবারটী চল—যতই হ'ক—তোমার বয়সে বড়—মানে বড়, না হয় ক্ষমাই চাইলে' দাদাভগিনীপতিতে ঝগড়া—কেবল লোক হাঁসানো বইত নয়!

রমেন বলিল "কিসের জন্যে ক্ষমা চাইব!—আমার বাপকে জেল খাটাতে গিয়েছিল—সে দুঃখ আমার মনেও যে যাবে না। বাবা আমার বড় দুঃখে মরেছেন।"

"তোমরা জোর করে পুকুরটা কেড়ে নিলে, দাদা শুধু মোকদ্দমা করেছে। এর জন্যে তাঁকে এত শাস্তি দিচ্ছ! তোমরাও জাল করে, পুকুরটা নিয়েছ—তাতেও হয় না?"

"না হয়, না—যাও, ওর সঙ্গে আমার মনের মিল হ'বে না—তাতে তোমায় ত্যাগ করতে হয়—তাও স্বীকার"।

"দাদা মাথা হেঁট করে তোমাদের বাড়ীতে এলেন। তুমি তাঁর অপমান কর্ল্লে! লোকে কি বলবে—তাদের কাছে আমার মুখ পুড়ে যাবে যে!"

"নাও এখন ওসব ভাল লাগে না—অত টান যদি, ভায়ের কাছে থাকগে যাও"।

আর কোন কথা শুনতে পেলাম না। অনুভব করলাম—কে-যেন পাশের ঘর থেকে গম্‌গম্ করে বাহির হ'য়ে গেল। কি লজ্জা! কেন এসেছিলাম। প্রাণটা পুড়ে যেতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে তারা আসিল। দেখলাম—আমার হৃদয়ের অপমান—দুঃখ—বেদনা—অনুতাপ সবগুলা কে—যেন তার মুখের উপর—চোখের ভিতর তুলি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে।

তারা আমার মুখে দিকে চেয়ে চেয়ে কেঁদে ফে'ললে আমি বললাম—"তার আর কান্না কি! আমি তবে যাই" মনে করেছিলাম—তারাকে দুকথা শোনাব—পারলাম না তারা মাথা হেট হয়ে দাঁড়িয়ে রহিল আর আমি পা পা করে ঘরের বাহির হ'য়ে পড়লাম। প্রত্যেক সিঁড়িতে নামি আর কতকি ভাবি।

নীচে এসে পৌছেছি—তারা উপর সিঁড়ি থেকে আমার পিছু ডাকলে। পিছন ফি'রিয়া বললাম "কি আবার?"

দেখি তারা পড়-পড় হ'য়ে ছুটে আসছে। দুচোখ বয়ে জল পড়ে তার বুক ভেসে যাচ্ছে। আমি বললাম "কি রে—কি হ'য়েছে—ব্যাপার কি?"

তারা কান্না মাখা স্বরে বললে "পালাও—পালাও দাদা—এই খিরকীর দরজা দিয়ে—সদর দিয়ে যেও না—তোমার পায়ে পড়ি—মাতালদের সব লাগিয়ে দিয়েছে—তারা তোমায় বাগে পেয়ে আজ অপমান করবে—আমি জানালা দিয়ে দেখ্‌তে পেয়েছি—সকলে দাঁড়িয়ে সদরে বলাবলি ক'রছে"

আমি নির্ব্বাক—নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। জ্ঞানশূন্য হ'য়ে মনে মনে বলে ফে'ললাম—"আমার এমন শত্রুর মাথায় বজ্রাঘাত হয়নি কেন ?"

তারা বললে "দাদা—এতদিনে বুঝ্‌তে পেরেছি নারীর দুর্ব্বলতা কোনখানে—আমি তোমার ছোট বোন—নির্ব্বুদ্ধিতায় একটা ভুল করে ফে'লেছি—তার ত আর চারা নেই। কি হ'বে ?"

"কিসের কি হ'বে ?"

"তোমার উপর আমার জোর খাটে—তাই বলছি—ক্ষমা করতে হ'বে"

"কাকে ? তোকে—না—আমার শত্রুকে"

"তোমার শত্রুকে"

দপ্‌ করে আমার রোষাগ্নি জ্বলে উঠে আবার নিবে গেল। তারার সুখে আমি সুখী—আর তার অধিকাংশ সুখ নির্ভর করছে আমার শত্রুর উপর। চোখ জলে ভরে এল। দীর্ঘনিশ্বাস ফে'লে বললাম "আচ্ছা—তাই হ'ক—তুই তোর দাদাকে কেটে কেটে নুনের ছিটা দে" এই পর্য্যন্ত—আর কিছু বিশেষ বললাম না—তার মুখ দেখে বলতে পারলাম না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া নীরবে চলে এলাম।

(৩)

বহু দুঃখে কষ্টে পাঁচ বৎসর, কেটে গেছে। মামলা মোকদ্দমা করে, সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছিলাম। যে দিন দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম—সেদিন যে আমার কি কষ্ট তা স্মরণ করে আজও আমার চক্ষে জল আসে। পৈত্রিক সম্পত্তি নাড়িয়া চাড়িয়া জীবনের সব সময়টা কাটিয়ে দিয়েছি। ভালরকম লেখাপড়াও শিখিনি। আজকালকার দিনে আমার তখন যে কী অবস্থা,—তা আমার মত লোকই বুঝতে পারে। স্ত্রী পুত্রকন্যা সকলকেই শ্বশুর বাড়ীতে রেখেছিলাম একজন আত্মীয়ের সাহায্যে চন্দননগরে এক জমিদারের বাড়ীতে একটা চাকরী পাই। সেই চাকরীটাই তখন আমার—আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের ভাত-ভিত্তি।

ভগবান ভাঙা-ভাগ্যই ভাঙেন। আমার স্ত্রী পুত্রকন্যার জন্যে তিনি যে অনেক দুঃখকষ্ট গড়ে রেখেছেন এ সুখটাও রাখবেন কেন ? আমি ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হ'য়ে পড়লাম। অসুখ অগ্রাহ্য করে ২।৩ মাস কাটিয়ে দিলাম। মাঘমাসের শীতে সেই নীচেকার সেঁতসেঁতে ঘরে ম্যালেরিয়ার দারুন কম্পজ্বর আর সহ্য করতে পারলাম না। বাবুর কাছে ছুটী চাইলাম। ভয়ানক কাজের ভিড়। বাঙ্গালী মনিব কিনা—বাঙ্গালীর সুখদুঃখ অনুভব করবে কি করে ? ছুটী পাইলাম না। কর্ম্মত্যাগ করে—ষ্টেশনে এসে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ট্রেনের শব্দ শুনিয়া আরোহীরা কোলহল করিয়া উঠিল। আমার তখন ভয়ানক কম্প লেগেছে। হাত পা দেহ সব থর থর করে কাঁপছে। কোনপ্রকারে কষ্টে দাঁড়াতে গেলাম; পারলাম না—মাথা ঘুরে পড়ল। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে প্ল্যাটফরমের কাঁকরের উপর বসে পড়লাম।

গাড়ী আসিয়া থামিল। আমি তখন অবসন্ন—চেতনাশূন্য প্রায়।

হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম। সেই স্বর। সেই ভোরবেলায়—আমার সদরের পৈঠায় বর্ষার ঝির ঝির শব্দের মাঝে যে করুন ক্ষীণ স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। আজ আবার সেই কণ্ঠস্বর। সেই তুমুল কোলাহলকে বিদীর্ণ করিয়া যেন তারার সেই "দাদা—দাদা" রব কাঁপিয়া কাঁপিয়া আমার তৃষিত শ্রবণে সুধা ঢালিয়া দিল। শরীরে যেন কত বল পাইলাম। মাথা তুলিয়া দেখি—সত্যসত্যই—তারা। উন্মত্তের ন্যায় তারা আমার কাছে ছুটে এসে বললে—"দাদা—তুমি এখানে—তোমার কি অসুখ করেছে ?"

চক্ষে আর জল রাখতে পারলাম না। কে—যেন আমার গলার নলীটা টিপে ধরলে। কথা কইতে দিলে না। তার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদতে লাগলাম—কান্না—ভাইবোনের কান্না—কেবল চোখের জল।

গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল। রমেন গাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া তারার হাত ধরিয়া বলিল—"শিগগির চলে এস—গাড়ী ছেড়ে দিলে যে।"

তারা কাঁদিয়া উঠিল—বলিল "ওগো তোমার পায়ে

পড়ি—দাদাকে নিয়ে চল দাদার অসুখ করেছে—কেউ নেই তাঁর সাহায্য করতে—দয়ার ভিখারী হয়ে পড়ে আছেন।"

আর কথা কহিতে দিলে না। রমেন জোর করিয়া টানিয়া নিয়া তারাকে গাড়ীতে তুলিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ীর চাকাগুলা আমার সমস্ত প্রাণটা যেন ভেঙ্গে পিশে চুরমার করে দিয়ে গেল। অনেকক্ষণ সেই গাড়ীর দিকে ব্যাকুল হয়ে চেয়ে রইলাম। তারপর আমার কি হ'ল তা জানি না। সেইখানে যেন অবশ হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। একজন কুলী আসিয়া আমায় ডাকিয়া দিল। রাত্রি ৮টার সময় অতিকষ্টে ট্রেণে করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলাম। পরদিন একজন দয়ালু ভদ্রলোক আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

(৪)

নিঃস্ব হ'য়ে রোগ দুঃখ-দৈন্য নিয়ে কোনপ্রকারে শ্বশুর-বাড়ীতে ৯।১০ মাস কেটে গেল। দিনত আর চলে না। বিধবা শাশুড়ীর যা-কিছু ছিল—সব আমার জন্যে খুইয়েছেন। যা দু একটা ঘটী বাটী ছিল একে একে তাও বাঁধা পড়েছে। প্রত্যেক দিনটী এক একটা বিপদের রাত্রির মত বুকটা জীর্ণ করে দিয়ে কেটে যেতে লাগল।

একদিন বৈঠকখানার রোয়াকে বসে দামোদরের শুষ্ক বালুচড়ার দিকে চেয়ে আছি। ডাক পেয়াদা আসিয়া ডাকিল "বাবু, মনি-অর্ডার আছে।"

বিশ্বাস হ'ল না। জিজ্ঞাসা করলাম "কার—আমার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

ফ'রমখানা হাতে করিয়া দেখি—তারা আমায় ৫০৲ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। নীচে লিখেছে—"তোমার চিকিৎসার জন্যে টাকা পাঠালাম। এঁর শরীরের অবস্থা খুব খারাপ। হাওয়া বদলাতে গিয়েছিলাম—কিছুই ফল হয়নি। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়—সেদিন আমরা ফি'রে এসেছি।" ইতি "তারা"

রাগে শরীর কাঁপতে লাগল। ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এ জল ঢালার ব্যাকুলতা কেন? যতবার সেই মেয়েলী হাতে বাঁকা বাঁকা অক্ষরে তারার সাক্ষর আমার চক্ষে পড়িল—ততবার আমার চক্ষে জল এল। কিন্তু ক্রোধ দমন করতে পারলাম না। রমেনের ব্যবহারগুলা ঘিয়ের মত হ'য়ে আমার ক্রোধাগ্নির উপর ঝরে পড়তে লাগল। মনি-অর্ডার ফিরাইয়া দিলাম।

পেয়াদা চলিয়া গেলে—আবার আমি দামোদরের সেই বিস্তৃত বালুভূমি দেখিতে লাগিলাম। না—না ভুল বলছি—কিছু দেখিনি—চেয়ে চেয়ে কত—কি ভাবছিলাম।

(৫)

একমাস পরে আমাদের ঘাটে একখানা নৌকা আসিয়া লাগিল। আমি তখন বাড়ীর ভিতর। আমার ছেলে মেয়েরা আনন্দে নৌকা দেখ্‌তে গেল। সহসা ক্রন্দনের রোল উঠ্‌ল। একি? উৎসুক হ'য়ে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"হ্যাগা—একি? কে অমন করে কেঁদে কেঁদে আস্‌ছে?" সে আমার কথায় কোন উত্তর না দিয়া খিড়কীর দিকে ছুটিল। কি সর্ব্বনাশ? আমার স্ত্রীও কাঁদছে। আমার শরীর চিন্ চিন্ করে উঠ্‌ল। দরজার দিকে চেয়ে দেখি—অনেক দিনের পর হতভাগী তারা তার দুঃখী দাদার সঙ্গে নির্ব্বিঘ্ন হ'য়ে দেখা করতে আস্‌ছে। বঙ্গনারীর ভয়ানক শাস্তি বৈধব্য নিয়ে আস্‌ছে! আর তাকে কেউ আস্‌তে বাধা দেয়নি। কিন্তু কে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে? তার সেই পাড়ালা কাপড় হাতের নোয়া—গালভরা হাসি সব কেড়ে নিয়েছে। কত-দিন পরে তারা আজ আমার সেই আগেকার মত ছোট্ট বোনটী হ'য়ে ঘরে এল। কিন্তু তাতেওত শান্তি পেলাম না। একি করলে ভগবান্, একদিন ক্ষোভে দুঃখে বড় কষ্টে যাকে অভিসম্পাত করেছি—আজ তার মৃত্যুই আমার অভিশাপ হয়ে ফি'রে এল। যে তারাকে সুখী করবার জন্যে আমি জীবনপণ করেছিলাম—আজ সেই তারা একজনের অভাবে এত চোখের জলে ভেসে এসেছে। তার চক্ষের জল এই যে আমার চক্ষে চিরবন্যার সৃষ্টি

করে দিয়েছে। এই কি আমার নিজের অভিসম্পাত?—এই কি আমি চেয়েছিলাম?—আমি যত কষ্টই পেয়ে থাকি কিন্তু আমার অভিশাপের যে সত্যমূর্ত্তি এই রকম ভয়ঙ্কর তাও, কি একবারও ভেবে দেখেছিলাম। আমার অভিসম্পাত এই মূর্ত্তি নিয়ে আজ এতদিন পরে আমার কাছেই ফিরে এল?

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

—o—

ঘর-ছাড়া

হাজার তর দোষ হয়েছে, বহু রকম ক্রটি,
এবার আমায় মাপ কর মা, ধরি চরণ দুটি।
শিষ্ট ছেলে নইমা তোমার, সুবোধ নহি মোটে,
কাজের বেলা তাইতো আমার হাজার বাধা জোটে।
ওমা আমার এমনিতর বিবশ ভোলা মন,
সাম্নে যেতে পিছন টানে মিছের প্রয়োজন।
ভয়ে ভয়ে পায়ে তোমার ছুটে এলাম ওমা,
এবার আমায় মাপ কর গো কর আমায় ক্ষমা।

তাও বলি মা, তোমার কোকিল এমন যদি ডাকে,
ফুলগুলি সব ফুটে ওঠে পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
ফাগুন হাওয়া দেয় যদি মা, মাঘের বায়ে সাড়া
পঞ্চমীতে উছলে ওঠে জ্যোৎস্না গাঙের ধারা,
স্বপ্ন যদি দৃষ্টিটারে আগ্‌লে বসে রয়,
আপ্‌নারে মা, সাম্‌লে রাখা সহজ সেতো নয়!
আমার একার দোষ নহেতো আজের সকল ক্রটি,
এবার আমায় মাপ করমা, ধরি চরণ দুটি।

মনের নেশা রঙিন হয়ে মাঠ ফেলেছে ছেয়ে,
চোখ্ যে আমার ফেরে না মা, মাঠের পানে চেয়ে।
ঐ দেখ মা, আমের গাছে আজ ধরেছে বোল,
আমের মুকুল বুকের মাঝে বাধায় বুঝি গোল।

বসন্তেরি বিভল ভাষা ঐযে পথে ঘাটে,
হৃদয় আমার বিকালো এই প্রাণ-হারণোর হাটে।
পথ যদি মা ভুলে থাকি নয় সে আমার দোষ,
এবার আমায় মাপ কর মা, করিস্‌নে মা রোষ।

দণ্ড যদি দিস্‌মা তবে আজ মানিনে ক্ষতি,
নজর আমার নেইমা মোটেই দুঃখ সুখের প্রতি।
অনেক ক্ষতি হয়েছে মা—আরো অনেক হবে,
অনেক আশা জানি মাগো স্বপ্ন হয়েই রবে।
জানি আমি সাধ্যমত দেইনি তোরে ফাঁকি,
তবু তোরে দেওয়ার মত অনেক আছে বাঁকি।
অভয় তোমার পায়ের কাছে ছুটে এলাম ওমা,
এবার আমায় মাপ কর গো কর আমায় ক্ষমা।

শ্রীহেমেন্দ্র লাল রায়।

—:০:—

ভাববার কথা

(১)

বাঙ্গলা দেশের হতভাগিনী বালিকা সমাজে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি আবার দুইটী আত্মহত্যা ঘটিয়াছে। বঙ্গবাসী কাগজে সে দিন দেখিলাম বাঁকুড়া না বীরভূম জেলায় কোনো ভদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে একটী অনূঢ়া বালিকা স্নেহলতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করতঃ দরিদ্র বাপ মাকে কন্যাদায় হইতে নিস্তার করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। দ্বিতীয় আত্মহত্যা বা খুন হাওড়া লিলুয়ার নিকটবর্ত্তী কোনো গ্রামে ঘটিয়াছে। হতভাগিনী বালিকা বধূ ছিল। জনরব তাহাকে তাহার শাশুড়ী অপর দুইটী প্রতিবেশিনী বা বাড়ীর স্ত্রীলোকের সাহায্যে জোর করিয়া ধরিয়া গায়ে কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিয়া পুড়াইয়া মারে। মৃত্যুকালে সে নাকি পুলিশের কাছে এই মর্ম্মে জবানবন্দী দেয় তদনুসারে তার শাশুড়ী ও ঐদুটী সাহায্যকারিণী গ্রেপ্তার হইয়া বিচারাধীন হয় পরে প্রমাণাভাবে নাকি মুক্তি পায়। যদি তাই হয় তবে এটীকেও আত্মহত্যা বলিয়া ধরা যাউক, যদিও এ জাতীয় শাশুড়ী ও এ ধরনের অত্যাচার বিরল নহে। শ্বশুর বাড়ীর লোক জনের ও স্বামীর অকথ্য অত্যাচারে মরিয়া হইয়া আত্মহত্যা করার কাহিনী এই সে দিন একটা ঘটিয়া গিয়াছে। অনেকে এখনো তাহা ভুলেন নাই। বালিকার নাম ছিল লীলাবতি।

এই সব ব্যাপারে মানুষকে না ভাবাইয়া ছাড়েনা।

দেশের ও জাতের মহাপাতকের ভার বোলো কলায় পূর্ণ না হইলে সভ্য সমাজে নারীহত্যা দেখা দেয় না। এই যে পাপের স্রোত দেখিতে দেখিতে বাড়িতে চলিয়াছে ইহার প্রতিকার কি ?

সম্প্রতি ফেব্রুয়ারী সংখ্যার মডার্ণ রিভিউতে ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে বালিকাদের ওভেরি বা ডিম্বকোষের গঠনদোষে একরকম ব্যাধি, জন্মায়। এই ব্যাধির ফলে তাহাদের মস্তিষ্কে স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটে তাহাতেই মানসিক বিকৃতি হয় এবং উহারা আত্মহত্যা পরায়ন হয়। যে সকল বালিকা এ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাদের ঐ প্রকার ব্যাধি ছিল, মৃতদেহ পরীক্ষায় উহা স্থির হইয়াছে। পুলিস্ সার্জ্জন মেজর সিংহ ডাক্তার সুন্দরী মোহনকে এ তত্ত্বের পরিচয় দেন।

এ তত্ত্ব একটা কারণ হইতে পারে ; শরীরের সঙ্গে মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহাতে এরকম ঘটিতে পারে ; কিন্তু একটা কথা এই যে Immediate coure বা আশু বা সাক্ষ্যাৎ কারণ বলে এ কি তাই ? নিশ্চয়ই নহে। ওভেরির অপুষ্টতা বা গঠন দোষ অনেক মেয়েরই থাকিতে পারে ; তাহারা তো আত্মহত্যা করিতেছেনা ? এই সব আত্মহত্যার আশু কারন অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মেয়েরা আত্মহত্যা করে (১) দরিদ্র অনূঢ়া মেয়ে যাহারা বিনা নিজদোষে 'ধেড়ে মেয়ে' হইয়া উঠার জন্য বাপ মা ও আত্মীয়স্বজনের কাছে নিন্দিত গঞ্জিত হয় ; বা বাপ মায়ের দুশ্চিন্তা ক্লিষ্ট মুখ ও দারিদ্র্য পীড়িত অবস্থায় দেখিয়া লজ্জায় ও ঘৃনায় মনমরা হইয়া পড়ে। (২) রূপহীনা বা দরিদ্র ঘরের মেয়ে পরের ঘরের বউ হইয়া গিয়া রূপহীনতার জন্য স্বামীর কাছে ও বাপের পয়সার অভাবের জন্য শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে নির্য্যাতন ভোগ করে। ইহারাই অবশেষে বাঁচিয়া থাকাটা বিড়ম্বনার কারণ বুঝিয়া গত্যন্তর না থাকায় মরিয়া হাড় জুড়ায়। হইতে পারে ওভেরির গঠন দোষ বশতঃ তাহাদের আত্ম-হত্যার ঝোঁকটা একটু বেশী। লাঠির ঘা খাইয়া মারা যাইতে পারে যাহাদের মাথা দুর্ব্বল এবং যাহাদের মাথা সবল উভয় শ্রেণীই, যাহাদের সবল মাথা তারা বাঁচিয়া যাইলেও যাইতে পারে। কিন্তু যাহাদের মাথা দুর্ব্বল তারা মরিবেই ; এ স্থলে যদি তর্ক করা যায় ইহাদের মৃত্যুর কারণ মাথার দুর্ব্বলতা তাহা হইলে যারা লাঠিমারে তাহাদের দোষ খালাস্ হয়না। এ ক্ষেত্রেও তাই। ওভেরির দোষ থাকে থাক্ কিন্তু তাহাদের আত্মহত্যার জন্য দায়ী তাহাদের ওভেরি নয় এই রাক্ষস সমাজ। এই সব নরপিশাচ স্বামী ও শ্বশুর, ও নারী পিশাচী শাশুড়ী ননদী এবং অর্থলোলুপ নর রাক্ষস বরের বাপ। যতদিন সমাজে এই জাতীয় রাক্ষস রাক্ষসী থাকিবে ততদিন কুমারী ও বধূবলি সমাজ প্রথার বেদীতে চলিবেই।

ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাস যে সব প্রতিষেধক ব্যবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহা এই :—

(ক) ওভেরীর এই জাতীয় দোষ যাহার থাকিবে রজোদর্শনের পর তাহার চিকিৎসা বিধান।

(খ) রজোদর্শন কালে বালিকাদের বিশেষরূপ সাবধানে রাখা।

(গ) আকালিক ও অযথা মানসিক উত্তেজনার হেতু হইতে উহাদের রক্ষা করা যথা খারাপ নভেল নাটক পড়া বা অভিনয় দর্শন, বা পড়াশুনার চাপ, বা অশ্লীল কথাবার্ত্তা কওয়া বা দৃশ্য দেখা এসব বন্ধ করা :—

(ঘ) যে সব নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথার অস্তিত্ব জন্য অনূঢ়া বালিকারা মানসিক হীনতা মর্ম্মপীড়া সহ্য করে বা বিবাহিতা বালিকারা স্বামীগৃহে নির্য্যাতন সহ্য করে তাহা রহিত করা। তদর্থে।

(১) বেশী বয়সে বিবাহ না হইলে যে বাপ মায়ের সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় তাহা আইন করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। জন সাধারণকে শাস্ত্র সাহায্যে বুঝাইতে হইবে যে কন্যা বেশী বয়স পর্য্যন্ত অনূঢ়া থাকিলে মহাপাতক হয়না বরং সন্তান উৎপাদন পক্ষে মঙ্গল-জনক হয়।

(২) যে সব স্বামী বা শ্বশুর শাশুড়ী বিনাদোষে বধূকে নির্য্যাতন করিবে তাহাদের সমাজ কর্ত্তৃক শাস্তি বিধান হওয়া উচিৎ।

(ঙ) আত্মহত্যা যে মহাপাপ আত্মহত্যা করিলে যে আত্মা পরলোকে যমযাতনা ভোগ করে তার ভয়াবহ চিত্র মেয়েদের ভাল করিয়া ধারণা করিয়া দেওয়া।

(চ) যে সব সংবাদপত্রে এই সব আত্মহত্যার কথা বিবৃত হয় তাহা উহাদের পাঠ করিতে না দেওয়া।

ডাক্তার সুন্দরীমোহনের উক্ত পন্থা নির্দ্দেশ জ্ঞানীমাত্রেই সমর্থন করিবেন। আমাদের এখন আর একটী কাজ করা উচিত। মেয়েদের বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া ব্যাটা ছেলেদের মত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখাইতে পাঠানো উচিৎ। লেখাপড়ায় মন নিযুক্ত থাকিলে তাহারা মনের খোরাক পাইবে, অন্যমনস্ক থাকিবে, জ্ঞানবৃদ্ধির ও চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিবে কি ন্যায় কি অন্যায়। মনের স্বাস্থ্য রাড়িলে শরীরের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকিবে। পুরুষ ছেলেদের মত তাহারাও ফাঁকা বাতাসে ছুটাছুটী খেলাধূলা করিবে। বিবাহের চিন্তা বা কাম চিন্তা মনে স্থান পাইবে না। বাপমাও বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন ও বুঝিবেন যে বেশী বয়সে বিবাহই বাঞ্ছনীয়। নিজের ও প্রসূত সন্তানের পক্ষেও মঙ্গল। ছেলেদের বিবাহ যেমন তাদের ইচ্ছাধীন মেয়েদেরও তাহা হইবে। আর বিবাহের পাত্র নির্ব্বাচনে বাপ মা মেয়েদেরও মত লইবেন। যদি অর্থাভাবে বিবাহ নাও হয় সেও ভাল। অবিবাহিত ছেলে যদি বাড়ীতে থাকিতে পায় মেয়েও কেন পাইবে না? যাঁহারা মেয়ের চরিত্র খারাপ হওয়ার ভয় করেন তাহারা বাপ মা হওয়ার যোগ্য নন।

মোট কথা স্বাস্থ্যকর বলকারক শিক্ষার অভাবেই মেয়েছেলেরা এত বেশী Nenrotic বা Hysteric ধাতের হয়।

কার্য্যকরী জ্ঞান অর্জ্জনে চিত্ত নিযুক্ত থাকিলে স্নায়ুযন্ত্র অকারণ আলস্য ফলে এত বিকার প্রবল হয় না; কতকটা বয়স পর্য্যন্ত Co-education অর্থাৎ ছেলে ও মেয়েদের একত্রভাবে থাকিয়া লেখাপড়া করা বোধ হয় এই Nenrotic ধাতুর প্রতিষেধক; বিভিন্নপ্রকৃতির লোক একসঙ্গে থাকিলে, উভয়ের ধাতুর ও স্বভাবের সমতা হয়; স্ত্রী ও পুরুষ একত্র থাকিয়া মেলা মেশা লেখাপড়া আলাপ পরিচয় করার ফলে উভয়েরই ধাতুগত একটা বৈষম্যের সমতা আসে; পুরুষের পক্ষে নারীকে কেবলমাত্র যৌন সম্বন্ধের চোখে দেখা কমিয়া আসে, নারীর পক্ষেও পুরুষকে লজ্জা ও ভয়ের ভাবে দেখাটাও অনেকটা কমিয়া আসে; উভয়কে পূর্ণমাত্রায় আলাদা করিয়া রাখায় উভয়েরই মনে এই ভাবগুলা প্রবল করিয়া দেওয়া হয়; উচ্চবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ জীব যে উভয়েই অনেক বিষয়েই উভয়ে সমানে মেলা মেশা করিয়া আলাপ পরিচয় করিয়া যে পরস্পরের সাহায্যকারী হইতে পারে এটা বুঝিতে পারিলে তখন উভয়েই এমন একটা ক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারে যেখানে Sex পার্থক্যটা কিছু কালের জন্যও ভুলিতে পারে; মিলন পক্ষে যে কৃত্রিম বাধাটা সমাজ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে, সেটায় ফল হইয়াছে এক বিপদ এড়াইতে গিয়া অন্য বিপদের হাতে পড়া। লৌকিক চক্ষে যৌন চরিত্র বজায় রাখিতে গিয়া আমরা উভয়েরই মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি ও বিকাশের অবসর বন্ধ করিয়া দিয়াছি। যে ভয় এড়াইতে এই মিলন বাধা সে ভয় বেশী করিয়াই জাগ্রত থাকিয়া মনকে সেইভাবে অভ্যস্ত করিয়া দেয়। সকলেই দেখিয়াছেন একটা ভদ্র বাঙ্গালীর মেয়ে পথে ঘাটে রেলে বাহির হইলে তাহারই ভাই জাতীয় জীবরা কিরূপভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। ব্যঙ্গচিত্ররসিক গগনবাবুর সেই চোখ দেওয়ার রেলষ্টেশনের ছবিটা মনে করুন। ব্যাপার সত্য। স্পষ্ট কথা বলিলে অনেকে রাগ করিবেন। এখন কথা হইতেছে কেন এমন হয়? এমন হইয়াছে? অসূর্য্যম্পশ্যা নারীজাতির উপর পুরুষের এই যে যৌন আকর্ষণটা এটা বাড়িয়া গিয়াছে ঐ সামাজিক বন্ধনের জন্য? রুদ্ধ পিপাসা অবসর পাইলেই প্রবলভাবে প্রকট হয়। আকর্ষণের জিনিসকে ঢাকিয়া রাখিলে এই আকর্ষণ পিপাসা বাড়ে, কমেনা এটা মনস্তত্বের একটা সোজা কথা। অবাধ মেলা মেশা থাকিলে, পরিচয়ের ও ঘনিষ্ঠতার ফলে এভাবটা থাকে না, বরংচ সামাজিক সভ্যতা ভব্যতায় আইন ধরিয়া চলিতে বাধ্য হইয়া মানুষ আত্মসংযম অভ্যাস করে। নারীকে তখন মানুষ অন্য চোখে দেখিতে চেষ্টা করে;

নারীর মর্য্যাদা ও সম্মান বাড়ে। সমস্ত সভ্য দেশে তাই; নারীর সম্মান ও খাতির এইজন্য বেশী। এই অবাধ মিলন একটা মহা পরীক্ষার ক্ষেত্র; এখন মেয়েদের বাহিরে আসা; পুরুষদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা নিষিদ্ধ বলিয়া লোকেও আদব-কায়দা বা আত্মসংযমের জন্য সচেষ্ট হয় না; কিন্তু এটা প্রচলিত হইলে তখন প্রত্যেক লোক নিজের ঘরের নারীর সম্ভ্রম মনে করিয়া অন্য নারীরও সম্ভ্রম গ্রাহ্য ও মান্য করিবেন। এতে নারীরও সৎসাহস বাড়ে পুরুষেরও পৌরুষত্ব প্রকাশ পায়। সকলেই লক্ষ করিয়াছেন একটা মেমসাহেব রাস্তায় যখন চলেন তখন লোকে তত লক্ষ্য করে না; দেখিলেও তেমন কিছু মনে ভাবেনা, কিন্তু স্বদেশীয় কোনো সম্ভ্রান্ত পুরমহিলা যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে বা স্বেচ্ছায় বাহির হইয়াছেন, অমনি ভদ্র ও ভদ্রেতর সব লোকের ঔৎসুক্য চোখ ফাটিয়া বাহির হয়, অনেকে অনেক ইঙ্গিতও করে। কেন এমন হয়? এ শুধু অভ্যস্ত ধরা বাঁধা বিধি নিষেধের ফল। অবাধ মিলন থাকিলে এটা হইত না। নারীর বাহিরে আসা বা অবাধে মেলা মেশা ব্যাপারটা সামাজিক রীতি হইলে লোকেও সেটা স্বাভাবিক বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইত। নারীও বিপদে আপদে মনের তেজ ও সাহস দেখাইতে পারেন। সর্ব্বদা সবক্ষেত্রে, সববয়সে, সর্ব্বাবস্থায় "আমরা হীন, অসহায়, পর নির্ভরশীল" এই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারাও মনুষ্যত্বহীন ভীরু জীব হইয়া পড়িয়াছে।

স্বীকার করি অবাধ মিলনে, বিপদ ও আছে, প্রলোভনের অবসর বেশী, কুপথে যাইবার সম্ভাবনাও আছে; কিন্তু এ তর্ক বৃথা ও দুর্ব্বল। বাতাসের সঙ্গে ধূলা আসে বলিয়া বাতাস লইব না এ যেমন তর্ক উহাও তেমনি। প্যাক করিয়া আলমারিতে তুলিয়া রাখিলে পিতলও উজ্জ্বল থাকে, কোন্‌টা পিতল কোন্‌টা সোণা ঠিক জানিতে হইলে বাতাসে ফেলিয়া রাখা উচিৎ। হাত পা চোখ বাঁধিয়া রাখিলে সবাই সৎ বা সতী হইতে পারে; বাধা. বিপদ ও প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যে সৎ বা সতী সেই সত্য সৎ ও সতী। আর যে অসৎ বা অসতী হয় সে বাহির হইতে হয় না, ভিতর হইতে হয়। জন্মগত সংস্কার ও স্বভাব চরিত্র নির্ণয়ে বেশী দায়ী; বাহিরের অবস্থা তত নহে। শতকরা ৯০টা ব্যাটাছেলে যদি ছাড়া পাইয়া, বিদেশে থাকিয়া, স্বাধীন হইয়া ভাল থাকিতে পারে তবে শতকরা ৯৫টা মেয়েও ভাল থাকিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের সতর্ক নজর থাকিলে কোনো ভয় নাই।

তারপর এক কথা একটুখানি কৃত্রিম সৌখীন সতীত্বের বা সততার জন্যে ছেলে মেয়েদের মনের বিকাশটা কি একদম বন্ধ করাই ভাল? ভাল মন্দের ভিতর দিয়া তাহারা বাড়িয়া উঠুক। হাজার প্রতিকুল অবস্থার ভিতর দিয়া একটা বনের ফুল যদি শোভা সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে কাল্পনিক বাধা বিপদের ভিতর দিয়া সহস্র সাবধানতা সত্বেও অনুকুল অবস্থার ভিতর থাকিয়াও একটা মানব ফুল ফুটিয়া উঠিবে না? এমনি করিয়া অন্তঃসৌন্দর্য্যে ফুটিতে গিয়া যদি শতকর ৫০টা পোকায় নষ্ট করে সেও ভাল, তবু আলোবাতাস ও জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া শতকরা ১০০টা অপুষ্টকুঁড়ী হইয়া পড়িয়া থাকিবে সে কিছুতেই ভাল না।

একটা মিথ্যা ধর্ম্মের শাসনভয়ে বা মিথ্যা পুণ্যের প্রলোভনে আমরা সমাজের আধখানা অঙ্গকে টীপিয়া মারিতেছি, বাড়িতে দিতেছি না; কি যে ভয়াবহ পরিনাম এই মহাপাতকের কি করিয়া লোকে বুঝিবে? নারী জীবজননী, জীবধাত্রী আর এই জীব লইয়া সমাজ বা জাতি। পুরুষরা গুণে জ্ঞানে, বলে সব রকমে বড় হইয়া চলিয়াছে, আর তাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী তার সন্তানসন্ততির প্রসূতি ও ধাত্রী অক্ষম, অজ্ঞ, ও অপুষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিতেছে; আমরা মহাপুরুষ দেখিলেই বলি 'কেমন গর্ভে জন্ম!' মহাপাতকী দেখিলেও বলি 'কেমন গর্ভে জন্ম!' মানুষের ভালমন্দে তার মায়ের যশ বা নিন্দা—কেন? কারণ বেশীভাগই গর্ভের দোষ গুণ, সন্তানে বর্ত্তে। এটা বিজ্ঞানেরও কথা। আর আমাদের ভবিষ্য জাতটা যে গর্ভে জন্মাইতেছে তাহা কেমন ভাবিলেও শিহরিয়া উঠি! কতকগুলা ১২।১৩ বা জোর চৌদ্দ বছরের দুর্ব্বল, অপুষ্টাঙ্গ অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য Hysteric মেয়ের গর্ভে জন্মাইতেছে

আমাদের এই জাত যে মায়েরা অন্ধের মত ভালবাসিতে পারে মাত্র (সে কুকুর বিড়ালেও পারে!) যারা শিশু পালনের উপায় জানেনা, দায়িত্ব বুঝেনা, যারা শিশু লইয়া পুতুল খেলা করে মাত্র—যারা শিক্ষিত নয় বলিয়া শিক্ষা দিতে জানেনা—যারা নিজের স্বাস্থ্য রাখিতে পারেনা বলিয়া গর্ভজাতের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারেনা যাদের নীতিজ্ঞান নাই বলিয়া ছেলেকে নৈতিক বলে বলীয়ান করিতে পারেনা! যাদের ঘোর অজ্ঞতা বশতঃ দেশে শিশুমৃত্যু বাড়িয়া চলিয়াছে। তারাই ভবিষ্যতে ভারতজাতির মাতৃস্থানীয়া?

এইতো হতভাগা জাতির মাতৃজাতি! ইহাদের পরিচয় দেবার মত মাতৃজাতি করিতে হইলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে চোখ রাখিতে হইবে। তাহাদের মানুষ বলিয়া ভাবিতে হইবে, ছেলের চেয়ে তাদের আদর খাতির বেশী করিতে হইবে কেননা তারা জীব জননী, জীবধাত্রী! তা না করিলে তারা জন্মাইলে বাড়ীতে কান্না কাটী পড়িবে, তাদের অন্নপ্রাসান হইবেনা, মেয়ে ছেলে বলিয়া; তাদের বিবাহব্যাপার বাড়ীর একটা বিপদ বলিয়া গন্য হইবে তারা ভুলিয়া একটু কুপথে পা দিলে অস্পৃশ্যা ও তিনকুলত্যক্তা হইবে। দৈহিক নিয়মানুসারে বিবাহের আগে তাহাদের ঋতু হইলে চৌদ্দ পুরুষ নরকগামী হইবে—জানলা দিয়া রাস্তায় মুখ বাড়াইলে গৃহস্থের কুলধর্ম্ম কর্পূরের মত উড়িয়া যাইবে—এই রকম যেখানে মেয়েদের সমাজমূল্য সেখানে পুড়িয়া মরা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর কি?

স্বামীর মনের মত হইলনা বলিয়া সে হতভাগিনীর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিবে, স্বামীর বাপ মা ছেলেকে আর একটা বৌ আনিয়া দিবে আর সে বেচারী জন্মদুঃখিনী হইয়া কোনো কুলে আশ্রয় পাইবেনা পথে তার দাঁড়াইবার স্থান হইবে না,—এ ক্ষেত্রে তার পুড়িয়া মরা ছাড়া উপায় কি? রোগে ভুগিয়া বা পাপ করিয়া স্বামী মরিল, দোষ হইল তার, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ প্রতিবেশী প্রভৃতি সকলে তার উপর পড়িল সে 'কালামুখী' 'রাক্ষসী' ইত্যাদি। সর্ব্বনাশ হইল সবচেয়ে তার, জীবনব্যাপী শোকের আগুন শিখায় পুড়িয়া মরিবে সে—কোথায় আর সকলে তাকে সান্ত্বনা দিবে বেশী না যমের অপরাধ তার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাকেই নির্য্যাতন?—এ ক্ষেত্রে পুড়িয়া মরা ছাড়া তার উপায়ান্তর কি? প্রকৃতির নিয়মানুসারে মেয়ের বয়স বাড়িতেছে দেহে যৌবন চিহ্ন দেখা দিতেছে এও তার অপরাধ? মা মাসী, দিদিমা, খুড়ি জেঠী আদি করিয়া গঞ্জনা টিট্‌কারী আরম্ভ করিল ধেড়ে মেয়ে ধিঙ্গি হচ্ছেন, 'যমের অরুচী' 'পাপের ফল' ইত্যাদি উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে দাঁড়াইতে নড়িতে অহর্নিশি এই সুধা-বাক্যের সূচিবেধ? পুড়িয়া মরে কি সাধে? যার বিন্দু-মাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান আছে সেই পুড়িয়া মরে—অসাড় যারা তারাই সহিয়া থাকে—কেন যে তারা কেরাসিনের আগুনে সব জ্বালা নিভায় তা তাদের অবস্থায় যারা পড়ে তারাই জানে? তাদের ওভেরির বা জরায়ুর অপবাদ দেওয়া ভুল—যারা তাদের আত্মহত্যার কারণ স্বরূপ সেই পাষণ্ডদের operation দরকার ওভেরি ব্যাচারীর সঙ্গে ছুরী চালানোয় কিছু হবেনা। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো যেমন logic আর লীলাবতির গুনধর শ্বশুর স্বামীর কীর্ত্তির জন্য লীলাবতির ওভেরিরে দায়ী করাও তেমন?

হতভাগিনীদের আগুনে পুড়িয়া মরা বন্ধ করার এই কটা পন্থা নির্দ্দেশ করা যায়:—তার আগে একটা কথা বলি; সেকালে সমাজের প্রাণ ছিল, সমাজের বলবান বিধাতা ছিল; কেউ অপরাধ করিলে সমাজ বিধাতা ব্রাহ্মণ শক্তি ও রাজশক্তি মিলিত হইয়া অপরাধীর শাস্তি বিধান করিতেন; এখন ব্রাহ্মণের শক্তি টীকি নাড়ায়, নস্য নেওয়ায়, ঘোঁটপাকিয়ে নির্দ্দোষীর জাতমারায়, লুকাইয়া শুদ্রপ্রতিগ্রাহী হওয়ায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অগ্রাহ্য করায় আর জাতের মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে—রাজা বিদেশী, বিধর্ম্মী বলিয়া আমাদের সমাজ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ ও নিষিদ্ধ—সুতরাং সমাজ—অপরাধীর শাস্তি বিধান নিজেদের হাতে লইতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় মঙ্গলকামী নিঃস্বার্থ স্বাধীন চিন্তাক্ষম অনেক লোক আছেন তাঁরা একযোগে সমবেত হউন, জাতি সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে একমত একযোগ হউন, হইয়া এই অপরাধীদের শাস্তি

বিধানের ভার নিন। প্রত্যেক গ্রামে, নগরে জেলায় তাঁরা বদ্ধবদ্ধ সংঘে গঠিত হইয়া এই অপরাধীদের শাস্তি বিধানে তৎপর হউন—যেখানে শুনিবেন স্নেহলতা লীলাবতির আত্মহত্যার পুনরভিনয় হইতেছে সেই বাড়ীর লোককে সমাজে অপদস্থ ও একঘরে করুন। তাদের কীর্ত্তিকলাপ কাগজে ছাপাইয়া অপরকে সাবধান করুন ও তাহাদিগকে দেশনিন্দিত করুন। অবশ্য নিজেরা প্রকাশ্য ভাবে বাহিরে ভিতরে এই সব অপরাধ মুক্ত থাকিতে চেষ্টা করিবেন। নচেৎ তাহাদের শাস্তি কেহ গ্রাহ্য বা ভয় করিবে না। ইহাঁরা নিজেদের মধ্যে নবপ্রবর্ত্তিত মতে বিবেক-চালিত হইয়া বিবাহাদি সম্পন্ন করিবেন। এইরূপ দশজনে মিলিয়া একটী আদর্শ নব্যতন্ত্র গড়িয়া তুলিলে কালক্রমে তাঁহারাই ভবিষ্য বংশের অনুকরণীয় আদর্শ হইয়া পড়িবেন। এ পথে চলিতে গেলে সৎসাহস প্রচুর পরিমানে দরকার; তাহা দেখাইতে হইবে। হাজার বৎসরের পুরাতন জীর্ণ কীটদষ্ট অসৎশাস্ত্রকে 'মাথায় থাকুন' বলিয়া বিসর্জ্জন দিয়া নূতন অবস্থানুযায়ী নূতন শাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!' ইহাঁরা বাঙ্গলার মাতৃজাতির উন্নতিকামী হইয়া মেয়েদের নব-মতে নব ভাবে গড়িয়া তুলুন প্রতিজ্ঞা করুন মেয়েরা যাবৎ সুশিক্ষিতা ও সুপুষ্টদেহ না হইবে তাবত বিবাহের যোগ্য হইবে না। এবং ছেলেরা শিক্ষা শেষ না করিয়া, উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে পাইবে না। যদি বিপুল জ্ঞানশক্তি সম্পন্ন বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় জাতকে বাঁচাইতে হয় তাহা হইলে রুগ্ন অপুষ্টদেহ বালক বালিকার মিলনোৎপন্ন ক্ষীণজীবি রুগ্ন সন্তান হইতে তাহা হইবে না। যুবক যুবতীদের ধ্যান ও জ্ঞান এই হইবে যে তাহারা ভবিষ্য ভারত-জাতির জন্মহেতু এবং জন্মদাতা (?) কাম সেবা ও কামজ সন্তান উৎপাদনের জন্য বিবাহ নয়; ইহকালের পিণ্ডের যোগাড় নাই অথচ পরকালের পিণ্ডের ভাবনায় অপক্ক অপুষ্ট গর্ভে কতকগুলা কুকুরছানা উৎপাদন করানোর এই যে বাঙ্গালী বাপমায়ের ব্যগ্রতা ইহার প্রতিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজের অমঙ্গল বিনাশের জন্য বিদেশী রাজাকে দিয়ে আইন করাইতে গেলে দেশের আত্মাভিমানে আঘাত পড়ে; নিজেরাও কিছু করিবনা, পরকে দিয়াও করাইবনা, এ বড় অদ্ভুৎ আবদার! রাজা বা রাজপুত্র আসিলে দেশের তর্করত্ন ন্যায়পঞ্চানন ও চূড়ামণিরা হিন্দুমতে আশীর্ব্বাদ করেন, রাজ পূজার ব্যবস্থা করেন, রাজদত্ত উপাধি ও পুরস্কার লইতে ভিঁড় করেন; কেননা হিন্দুর চক্ষে রাজা দেবতা তা যে জাতির বা যে ধর্ম্মের হউননা; তাই যদি তবে রাজাকে দিয়ে সমাজরক্ষক আইন করাইবার বেলা ধর্ম্ম জাগিয়া উঠে কেন? এই কি রাজভক্তির লক্ষণ? যাক্ সে কথা; রাজাকে দিয়া আইন করাইতে হইবে যে ভারতের বাংলা বা অন্যদেশে ছেলেরা শিক্ষাবস্থায় বিবাহ করিতে পারিবেনা, আর মেয়েরা ১৬।১৭ বছরের আগে বিবাহিত হইবেনা, আর যে লোক ছেলের বিবাহে পণ নিবে সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। সাক্ষাৎ ভাবে গভর্ণমেণ্টের সংযুক্ত স্বদেশী সমাজপতি লইয়া গঠিত সমাজ সভা (Social Council) এই দণ্ড ব্যবস্থা করিবেন, যে মানিবেনা, রাজশক্তি তাহাকে মানাইবে। এই সভার মেম্বর হইবেন, দেশের গুনীজ্ঞানী উদার মতাবলম্বী লোক (Heterodox দল ভুক্ত)। গোঁড়া orthodox দলকে দূরে বর্জ্জন করিতে হইবে। জাতীয় উন্নতির চাকা পিছন হইতে যাদের টানিয়া ধরার কাজ তাহাদের সংযোগ যত না থাকে তত ভাল।

যাগ এ কথা এখন মেয়েদের পুড়িয়া মরার প্রতিবেধক পন্থা নির্দ্দেশ করি।

(১) মেয়েদের বিবাহ বয়সের কোনো সীমা না রাখা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানযুক্তি দ্বারা মেয়েদের অভিভাবকদের বুঝানো যে রজোদর্শনের আগে বিবাহ না হওয়ায় কোনো অধর্ম্ম নাই, মনু চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন জ্ঞানীরা তাহা বলেন না। বলিলেও এ কালে মান্য নয়।

(২) মেয়েরা ছেলেদের মত লেখা পড়া করিবে, মুক্ত স্থানে চলা ফেরা করিবে, দরকার হয় শরীর রক্ষার জন্য তাদের উপযোগী ব্যায়াম করিবে। পুরুষদের সহিত অভিভাবকের সাক্ষাতে বা নিয়োগে অবাধে মেলা মেশা করিবে।

(৩) বিবাহ ব্যাপারে তাহাদের রুচি অভিরুচি কতক মাত্রায় অভিভাবকরা মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

(৪) অর্থউপার্জ্জন করিবার মত বিদ্যা, শিল্পকলা শিখিবে, কেননা স্বামী পরিত্যক্তা বা উৎপীড়িতা হইলে বা বিধবা হইলে নিজের উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিবে। পরের দ্বারস্থ বা ভিক্ষাজীবি হইতে হইবেনা।

(৫) বিবাহের পর যদি কন্যার অভিভাবক দেখেন কন্যার স্বামী, ক্লীব, বা কুষ্ঠ উপদংশাদি জঘন্য রোগে পীড়িত লম্পট ও ব্যভিচারী কন্যার বিনাপরাধে তাহাকে ত্যাগ করিয়া দারান্তর গ্রাহী তাহা হইলে সেই কন্যার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবেন। কারো অজানিত দোষ ফলে মেয়েরাই ঐহিকসুখ ভোগে বঞ্চিত থাকিবে আর পুরুষেরা যথেচ্ছাচারী হইবে ইহা পিশাচ সমাজেই ঘটে! এবং শোভা পায়। যাঁরা কৌটাল্যের অর্থশাস্ত্র পড়িয়াছেন তাঁরা জানেন হিন্দু যখন জাতের মত একটা জাত ছিল তখন মুনিজাতীয় চাণক্য নিজে এই সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং এই ব্যবস্থানুসারে কাজ চলিত। তখন সমাজ ও শাস্ত্রকারীদের হৃদয় বলিয়া একটা জিনিষ ছিল; তখন সমাজশাস্ত্র জাতের 'জাত-মারা' রঘুনন্দনী কলে পরিনত হয় নাই! তখন সমাজে নারীর মর্য্যাদা ১৬ আনায় রক্ষিত হইত। শাস্ত্রের সহৃদয় উদার উক্তিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া বিগড়াইয়া মুচড়াইয়া নিজের মত করিয়া প্রচার করিবার হিংস্র প্রবৃত্তি তখন হয় নাই।

(৬) বালিকা বিধবাকে তো পুনর্ব্বার বিবাহিত করিতেই হইবে। যে ইচ্ছা করিয়া তাকে বিবাহ করিবে তার কেহ প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেনা। আর এই পুনর্বিবাহিত বিধবার অভিভাবকরা বিড়ম্বিত হইবেনা।

(৭) শ্বশুরালয়ে যদি কোন বালিকা বধূ উৎপীড়িত হয় বা পরিত্যক্ত হয়, তবে তাহার অভিভাবকরা স্থানীয় নবপ্রবর্ত্তিত সমাজ সংঘের নজরে এই ব্যাপার আনিবেন। সংঘ উহার প্রতিকার করিবেন।

(৮) দেশের শিক্ষিত মহিলারা একটা নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করিবেন, তাঁহাদের কাজ হইবে, পতিতা, উৎপীড়িতা, অনাথা, অসহায়া এই সব ভগিনীদের হিতকামনায় জীবন উৎসর্গ করা। তাঁহারা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ভিতর দিয়া সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান প্রচার করিবেন; সাহিত্য রচনা করিয়া নারী জাতির মঙ্গলজনক উপদেশ প্রচার করিবেন। নারীর সহায় নারী। এই কথাটা মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।—এখনো ১৫ আনা পুরুষ নারীকে cooking ও childproducing machine আত্মসুখস্বার্থ-সেবার দাসী বলিয়া জানে ও তদ্বৎ ব্যবহার করে; নারীই নারীর মর্য্যাদা ও মান রক্ষা করিবে। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সোরাবজী বা সরলা দেবীর মত বিদুষীদের কাছে আমার নিবেদন তাঁরা রাজনীতির চর্চ্চা পুরুষদের হাতে দিয়া তাঁদের হতভাগিনী ভগ্নিদের উন্নতি ও উদ্ধার করে মন, শক্তি ও অবসর দান করুণ।

(৯) বিপত্নীক বৃদ্ধ পুরুষরা বালিকার পানিগ্রহণ করিতে পারিবেনা।—যে সব সদ্ব্রাহ্মণ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পতিত ধ্বজাকে খাড়া করিতে ব্যস্ত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পঞ্চাশ উর্দ্ধে বানপ্রস্থ না করিয়া মেয়ের বয়সী ছোট বালিকাকে বিবাহ করিয়া কেঁচে গণ্ডুষ করেন; ইহাঁরা এতই ইন্দ্রিয় সুখ পরায়ণ যে যাহার প্রতি স্বভাবে বাৎসল্য ভাব আসে সেই কচি মেয়ের সঙ্গে অন্য ভাব বাঁধাইয়া বসিতে লজ্জা বোধ করেন না। তাঁহারা বুঝিতে চান না যে অসহায়া মেয়েগুলা দায়ে ঠেকিয়া মুখ বুজিয়া কি মানুসিক অশান্তিই ভোগ করে। জীব-ধর্ম্মানুসারে ইহারা যদি মনেও অন্যাচরণ করে তখন নরকের সপ্তদ্বার ইহাদের জন্যেই মুক্ত হয়। এই সব কামসেবকদের উচিৎ সমবয়সী কুমারী বা বিধবার পাণি গ্রহণ করা।

এইরূপ একান্ত অন্তরে কাজ করিলে আর এই পন্থার অনুসরন করিলে তবে অচিরে আমাদের মেয়েদের পুড়িয়া মরা বন্ধ হইবে; তাহাতেও যদি না হয় তখন ডাঃ সুন্দরী মোহনের কথিত "ও ভেরির" Surgical operation এ চরম পন্থা স্বরূপ হাত দেওয়া যাইবে। আপাততঃ তিনি বাকী যে সব পন্থা দেখাইয়াছেন তাহা অনুসৃত হউক—হইলে বাঙ্গালার নারীজাতির সব দুর্দশা ঘুচিবে তাহারা উঠিবে, জাগিবে এবং শ্রেয় লাভ করিবে এবং মাতৃজাতির পুত্রে ভবিষ্য জাতিটাও উঠিবে, জাগিবে এবং শ্রেয় লাভ করিয়া ধন্য হইবে।

শ্রীঅতুল চন্দ্র দাস।

—•—

ভক্তের জয়

(গাথা)

আজি শ্রীবাসের আঙ্গিনা যেন জীবের তীর্থধাম,
ভাবে বিহ্বল, ভক্তের দল, গান করে হরিনাম।
কেহ বা বাজায় শিঙা করতাল, কেহ বা বাজায় খোল,
স্তম্ভিত করি গগন পবন—ওঠে কীর্ত্তন রোল।
চৌদিকে নাচে বৈষ্ণব গণ, মাঝ খানে গোরা চাঁদ,
দক্ষিণে তার ঠাকুরনিতাই—রূপের অতুল ছাঁদ!

নৃত্য মগন গৌর নিতাই, ভক্তেরা গায় গান,
সার্থক হল উৎসব আজি শ্রীবাস ভাগ্যবান!
পুলকে মত্ত ধার্ম্মিক দ্বিজ, সাত্বিক ভাবে ভোর,
বার বার বলে—"প্রাণের দেবতা এসেছেন গেহে মোর।"
"নদীয়ার আজ পুন্য প্রভাত, আয় তোরা ছুটে আয়,
প্রাণভরে দেখ্ গোলকের শোভা—ক্ষুদ্র এ আঙ্গিনায়!"

নারী-কণ্ঠের ক্রন্দন ধ্বনি সহসা পশিল কাণে,
কীর্ত্তন ছাড়ি' ছুটিল শ্রীবাস অন্তঃপুরের পানে;
দেখে তথা—তা'র রুগ্ন শিশুটী, তখনি গিয়াছে মরি—
কাঁদিছে পত্নী—মৃত সন্তান—বক্ষে চাপিয়া ধরি;
যত্নের ধন, গেছে ফাঁকি দিয়ে, শুধু দু'দিনের জ্বরে;
স্বামীরে হেরিয়া, ব্রাহ্মণী আরো কাঁদিছে উচ্চ স্বরে!

সভয় চিত্তে কহিল শ্রীবাস—"ওগো! কাঁদিওনা আর—
কীর্ত্তন হবে এখনি বন্ধ—শুনিলে এ হাহাকার;
নাচিছেন প্রভু আঙ্গিনায় মোর, ভক্তগনের সনে,
উৎসব যদি ভেঙ্গে যায়, তবে বড় ব্যথা পাব মনে!
চুপ্ চুপ্—শুধু, আজিকার দিন—করিওনা চিৎকার;
উন্মাদ আমি; রাখো অভাগিনি! এ মিনতি অভাগার।"

স্বামীর বচনে সাধ্বী রমণী—নীরব হইল হায় !
রহিল বসিয়া শব কোলে করি' পাষাণ প্রতিমা প্রায় !
মুহূর্ত্তে মুছি' আঁখির অশ্রু, শ্রীবাস আসিল ফিরে,
আবেগে প্রভুর চরণের ধূলি তুলিয়া লইল শিরে,
নব উদ্যমে বাজিয়া উঠিল—শিঙ্গা করতাল খোল,
হুঙ্কার করি' গাহিল শ্রীবাস—"হরি হরি হরি বোল"।

সাধের নৃত্য সহসা ছাড়িয়া চাহি শ্রীবাসের প্রতি,
কহিলেন প্রভু—'কেন থেমে যায় নৃত্যের তাল যতি ?
কেন পণ্ডিত ! কীর্ত্তনে আজ প্রাণে নাহি পাই সুখ ?
বল কি কারণ, চঞ্চল মন, কেন কেঁপে ওঠে বুক ?
কি জানি কেন এ-অশিব চিন্তা আকুল করিছে মোরে !
ঘটেনি ত কোন বিঘ্ন বিপদ ? বলহে প্রকাশ ক'রে ?

ঈষৎ হাসিয়া কহিল শ্রীবাস, দু'টি হাত যোড় করি'—
"কি বিপদ তা'র, তুমি গৃহে যা'র, রয়েছ গৌরহরি ?
তোমার নামের প্রভাবে, ঠাকুর ! সকল অশুভ নাশে,
জগতের দুখ—যন্ত্রনা দিতে পারে কি তোমার দাসে ?
নাচো—নাচো তুমি, প্রাণের দেবতা! প্রেমময়! রসরাজ !
বহু আরাধনে, তোমা হেন ধ'নে, এগৃহে পেয়েছি আজ।"

বলিতে বলিতে—যুগল নয়ন ভরিয়া আসিল জলে,
মূর্চ্ছিত হ'য়ে, পড়িল শ্রীবাস—গৌরের পদ তলে !
পুত্র-শোকের সংবাদ ক্রমে জানিতে পারিল সবে,
প্রভুর কর্ণে, শুনায় সে'কথা—কেহ অনুচ্চ রবে ;
বিস্মিত হয়ে, মৃত্তিকা হ'তে তুলি শ্রীবাসের দেহ,
লইলেন নিজ অঙ্কে তুলিয়া—কিযে সে অসীম স্নেহ !

প্রভু অঙ্গের অমিয়-পরশে—শ্রীবাস চেতনা পায়,
রাঙ্গা হাত খানি শিরে বুলাইয়া কহেন ঠাকুর তায়—
"ধন্য শ্রীবাস ! ভক্ত প্রধান ! পূর্ণ প্রেমিক তুমি ;
আজি হ'তে হ'ল তোমার এ গৃহ—ধরার তীর্থভূমি।

এমন করিয়া করিবারে জয় কে পারে—পুত্রশোক ?
তোমার কীর্ত্তি—বঙ্গের মাঝে, চির দিন গাবে লোক।"

"এমন ধৈর্য্য, এমন ভক্তি, দেখিনি জীবনে কভু,
পত্নীর কোলে, সুতের মৃত্যু, কাতর হওনি তবু !
কি ব'লে তোমায় সান্ত্বনা দিব ? ভাষা না যুয়ায় মুখে ;
স্নিগ্ধ হইল—দগ্ধ এ প্রাণ—তোমারে ধরিয়া বুকে !
সংসার মাঝে, হারায়েছ তুমি—একটী মাত্র ছেলে।
আজ থেকে তুমি "গৌর নিতাই" দুইটী পুত্র পেলে !!

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত।

—:০:—

বৈজ্ঞানিক প্রেততত্ত্ব

(২)

অলৌকিক পরিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

যে সকল অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক উপায়ে কারণ নির্ণয় করিবার মৎলবে চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির (সাইকিক্যাল সোসাইটী) স্থাপনা তাহাদের মোটামুটী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ—কায়িক ঘটনা (Physical Phenomena) ; দ্বিতীয় ভাগ—মানসিক ঘটনা (Psychic Phenomena)।

কায়িক ঘটনাগুলি প্রায়ই জড়বস্তু অবলম্বন করিয়া দেখা দেয়,—আর মানস ঘটনাগুলা মানুষের মস্তিষ্ক ক্রিয়ার সাহায্যে প্রকট হয়। কায়িক ঘটনাগুলা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ; শূন্য হইতে একটা বই বা ইট পড়িতেছে, বা ঘরের মেজে হইতে একটা টেবিল উপরে উঠিতেছে—অবশ্য অজ্ঞাত অলৌকিক উপায়ে—কি, একটা বহুকাল আগে মৃত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখা গেল—বা একটা শব্দ হইতেছে শোনা গেল, এই সব হইল জড়-গত ব্যাপার ; সমস্তই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। মানস ঘটনাগুলি সমস্তই আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য ; মানুষের মস্তিষ্ক সাহায্যে এইগুলি প্রকাশ পায়। উভয় শ্রেণীর ঘটনা দেখিলে বুঝা যায় যেন কোনো এক অশরীরী অলৌকিক শক্তি অজানিত বিধিনিয়মে কাজ করিয়া যাইতেছে, এবং আমরা তাহার কতকের বা জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া এবং কতকের বা মন দিয়া পরিচয় পাইতেছি। কথান্তরে বলিতে হইলে এই বলা যায় যেন 'অলৌকিক টী' এক অশরীরী অদৃশ্য সত্তা; জগৎবাসীকে নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে কতকটা বা তার শারীর ক্রিয়ার দ্বারা, কতকটা বা তার মানস ক্রিয়ার দ্বারা ; বাস্তবিক এই ভাবেই আমরা জীবের পরিচয় পাই ;

চোখের সম্মুখে একটা আগন্তুক মাটী হইতে উপরে সাত হাত লাফাইল;—ইহাতে তার শারীর শক্তির পরিচয় পাইলাম; তার পর সে একটা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিল। আমরা বুঝিলাম সে খুব বিদ্বান। কথিত এই অলৌকিকের পরিচয়ও আমরা ওইরূপ দুই উপায়ে পাইতেছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জড় বস্তুকে অবলম্বন করিয়া, কখনো বা জীবিত মানুষের মস্তিষ্ক সাহায্যে এই অজ্ঞাত অলৌকিক আত্ম পরিচয় দিতেছে। ভাব চালনা (Telepathy) অতীন্দ্রিয় দর্শন,—শ্রবন (Clairaudience, Clairvoyance) সত্য স্বপ্ন, মোহাবিষ্টের (Medium) দ্বারা স্বতঃ লিখন (Automatic writing) বা ভাষণ এই সব হইল অলৌকিকের মানস-ব্যাপার।

এই প্রবন্ধে আমি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অলৌকিক ব্যাপার গুলিরই বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি।

ক। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কায়িক-ব্যাপার

(Physical Phenomena)

এ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যাপার অনেক প্রকারের। অজ্ঞাত অলৌকিক উপায়ে জড়বস্তুর চলাচল; আবির্ভাব; তিরোভাব, স্থানপরিবর্ত্তন, গতিপরিবর্ত্তন, প্রেতমূর্ত্তিধারণ, বাদ্যধ্বনি করা, শব্দ করা প্রভৃতি এ সব হইল এই জাতীয় ব্যাপার। লোকে এগুলি উপস্থিত থাকিয়া সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে; সাধারণতঃ এই সব জড়-গত ব্যাপার নৈসর্গিক উপায়েই ঘটে; মূলে একটা প্রাকৃতিক নিয়মের কাজ থাকে। অনেক ঘটনার প্রথম দর্শনে এ কারণ সহজে ধরা পড়েনা; পরে খোঁজখবরে দেখা যায় একটা জানিত কারণ আছে। কিন্তু এ শ্রেণীর এই সব ঘটনার কোনো জানিত পরিচিত প্রাকৃতিক কারণ পাওয়া যায় না। আপনা হইতে একটা অচেতন বস্তু মাধ্যাকর্ষনের বিধি-নিষেধ না মানিয়া উপরে উঠিতে লাগিল; বা কিছু-না হইতে একজন মৃতব্যক্তির মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল বা দ্রব্যাদি বিনা সাহায্যে চলাচল করিতে লাগিল ইহা এক ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজীর দ্বারাই হইতে পারিত। সত্যই যে বিনা ফাঁকি ফন্দীতেও এমন ঘটনা ঘটে এবং লোকে প্রত্যক্ষ করে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না, এখনো অনেকে করেন না; অথচ এই অঘটন ঘটিতেছে এবং ঘটিয়াছে—শুধু তাই নয় এমন সব লোকের চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে যে তাঁহাদের সাক্ষ্য প্রমান বিশ্বাস না করিলে জ্ঞান জগতের কোনো কথাই বিশ্বাস করা যায় না। যে সব সত্যপ্রিয় লোক জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনার ফলে প্রাকৃতিক জড় বিজ্ঞানকে জগন্মান্য ও জগৎপূজ্য করিয়াছেন এ সব সাক্ষ্যপ্রমান তাঁদেরই দেওয়া। শুধু যে এসব ব্যাপার তাঁহাদের চোখের সম্মুখে ঘটিয়াছিল তাঁহারা দেখিয়াই খালাস ছিলেন তা নয়; তাঁহারা নিজের ইচ্ছিত স্থানে নিজেরা হাতে কলমে পরীক্ষা, খোঁজ খবর তদন্ত তল্লাস করিয়া এই সব ঘটনার সত্যতা ও সম্ভবতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। নিম্নে কয়েকটা এই জাতীয় ঘটনার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি। ঘটনাগুলি বিখ্যাত জগন্মান্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের দ্বারা পরীক্ষিত ও বর্ণিত।

(১) বিখ্যাত মিডিয়ম (যে ব্যক্তির দেহ বা মস্তিষ্ককে অবলম্বন করিয়া অলৌকিক আত্মপ্রকাশ করে তাহাকে 'মিডিয়ম' বলে) ষ্টেন্টন মোজেসের মোহাবস্থায় যে সব অদ্ভুৎ ব্যাপার ঘটিত তাহা Dr. Speer নিম্নলিখিত-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। রয়াল সোসাইটীর অন্যতম সভ্য Dr. Marshall Hall বলেন—"যে সব গুণ ও শক্তি থাকিলে লোকে নিরপেক্ষ ও দক্ষ পরীক্ষক হইতে পারে Dr. Speerএর তা পূর্ণমাত্রায় ছিল; ভৌতিক ও অলৌকিক ব্যাপারে Dr. Speerএর কোন বিশ্বাস ছিল না; বরং তিনি ঘোর জড়বাদী ছিলেন; কেবল সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি মোজেস্‌কে লইয়া পরীক্ষা করিতেন। জড়বিজ্ঞানে বিশেষতঃ শারীরতত্ত্ব ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ দখল ছিল।" Dr. Speer মোজেসের physical phenomena সম্বন্ধে এই বলেন—

"মোজেস্ মোহাবিষ্ট হইলে, ঘরের ভিতর নানারূপ শব্দ শোনা যাইত; সামান্য আঙুলের টোকা হইতে ভয়ানক জোরের পায়ের শব্দের মত শব্দ হইত। প্রত্যেক প্রেতাত্মার নিজ নিজ আলাদা ধরণের শব্দ ছিল। শব্দ শুনিলেই বুঝিতাম অমুক আত্মা আসিয়াছেন। আমাদের

প্রশ্নের উত্তর এই 'ঠোকা' শব্দে পাইতাম; অক্ষরানুসারে ঠোকার সংখ্যা স্থির করা থাকিত। খুব বড় বড় উপদেশ, বক্তৃতা কথাবার্ত্তাও এই উপায়ে সুন্দর ও সুসংলগ্ন ভাবে পাওয়া যাইত। উচ্চশ্রেণীর আত্মারা শব্দদ্বারা আগমন জানাইত না, একটা মধুর বাজনার শব্দ বা সুর শুনিলে বা আলোর জ্যোতি দেখিলে বুঝিতাম কোনো উচ্চশ্রেণীর আত্মা আসিয়াছেন। পরীক্ষা ঘরে উপস্থিত সকলেই নানা রকমের আলো দেখিতে পাইতেন। এই আলো-গুলি দুই রকমের ছিল; ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও মানস-গ্রাহ্য, তার মানে কতকগুলা আলোবিন্দু বা গোলক ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সকলেই চোখ দিয়া দেখিতে পাইতাম; আর কতকগুলি আলো সকলে দেখিতে পাইতাম না, যাঁহারা অতীন্দ্রিয় দর্শী তাঁহারাই দেখিতে পাইতেন। খানিকটা যেন উজ্জ্বল বাষ্পের মত চোখের কাছে ফুটিয়া উঠিত। অনেক সময়ে নানা রকম মনোহর গন্ধ দ্রব্য দর্শকদের নিকট উপস্থিত হইত। মৃগনাভি, ভারবিনা খস্ খস্ ইত্যাদি। কখনো কখনো হটাৎ খুব সুগন্ধপূর্ণ বাতাস ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে দিয়া বহিয়া যাইত। কখনো কখনো তরল গন্ধ দ্রব্য আমাদের হাতে ঢালিয়া দেওয়া হইত। উপরোধ করিলে আমাদের রুমালেও ছড়াইয়া দিত। বৈঠকের শেষে, মিডিয়মের মাথা দিয়া ঘামের মত এই সব গন্ধ ক্ষরিতে থাকিত। পিয়ানো, হারমনিয়াম, বেহালা, বাঁশী, ইত্যাদির নানা রকম বাদ্যধ্বনি শোনা যাইত। আমার একটু গীতবাদ্য জানা ছিল; বাজনার শব্দে বেশ বুঝিতাম বেশ তালমান লয় বিশুদ্ধ ধ্বনি। এই সব বাদ্যধ্বনি দুরকমের উৎপন্ন হইত। ঘরে যন্ত্র থাকিলে সেই যন্ত্র হইতে সুর উঠিত; ঘরে যন্ত্র না থাকিলেও সুর শোনা যাইত। কখনো কখনো অশরীরী উপায়ে লেখা দেখা যাইত। আমাদের সম্মুখে টেবিলে কাগজ পড়িয়া থাকিত, কখনো বা, পেনসিল বা সীসার টুকরা রাখিয়া দিতাম। কাগজে আপনা হ'তে লেখা ফুটিয়া উঠিত। আমরা যে সকল প্রশ্ন করিতাম তাহার উত্তর লেখায় বাহির হইত; কখনো বা আপনা আপনি নিজ মন্তব্য লিখিয়া দিত। ভারি জড় দ্রব্যের চলাচল, নাড়া-চাড়া প্রায়ই ঘটিত। চেয়ার টেবিল আপনা হইতে স্থানান্তরিত হইত। কখনো কখনো টেবিলটা এমন ভাবে কাত হইত যে বিনা ধরায় বা অবলম্বনে তা হইতে পারে না। আমরা যে টেবিলটার চার দিকে বসিতাম সে একটা খুব ভারি মেহগনি কাঠের টেবিল; মধ্যে মধ্যে সেটা নড়িয়া উঠিয়া চলিতে থাকিত; আমরা তাড়া-তাড়ি চেয়ার তুলিয়া পথ ছাড়িয়া দিতাম। অভেদ্য জড়ের বাধা না মানিয়া অন্য জড় বস্তু তার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে বা যাইতেছে এমন দৃষ্টান্তও আমরা দেখিয়াছি। পরীক্ষা ঘর চতুর্দ্দিকে বন্ধ, দরজায় খিল আঁটা; অথচ দেয়াল বা দরজা ভেদ করিয়া অন্যঘর হইতে জিনিসপত্র চলিয়া আসিতে দেখিয়াছি। কেমন করিয়া যে আসিল তার কারণ ব্যাখ্যা করিতে সাহস হয় না, তবে আসিল সে আমরা সব সজ্ঞানে ও সুস্থজ্ঞানে অ দেখিয়াছি।"

(২) অন্যতম মিডিয়ম D. D. Home. যখন বিলাতে আসিয়া অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে থাকেন তখন অনেক গুণীজ্ঞানী পণ্ডিত হোমেরও মোহাবস্থায় এইরূপ আশ্চর্য্য ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। দ্রষ্টা ও পরীক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত পদার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সুনামধন্য W. Crookes সাহেব ছিলেন; তিনি স্বয়ং হোমকে লইয়া নিজের বাড়ীতে স্বাধীনভাবে বহুদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ঠিক পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারের মত ব্যাপার ঘটিতে দেখেন। হোমের মোহাবস্থায় ভারি দ্রব্যাদির চলাচল, নড়াচড়া, শব্দ, সুর, স্বাধীনভাবে লেখা; অজ্ঞাত উপায়ে বন্ধ ঘরে দূর হইতে দ্রব্যাদির আবির্ভাব প্রকৃতি নানা অদ্ভুৎ ঘটনা ঘটে। তিনি পরে স্বরচিত Notes of an enquiry into the phenomena called Spiritual নামক গ্রন্থে এ সবের বিস্তারিত বিবরন দিয়াছেন। প্রেততত্ত্বের দোহাই দিয়া অনেক জুয়াচোর প্রবঞ্চক কত লোককেই ঠকাইয়াছে; কাজেই ক্রুক্সের প্রথম ধারণা ছিল, হয়তো এও সেই রকম খুব চতুর জুয়াচুরী। কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী সতর্কতা, ও সাবধানতার সহিত এই সব তদন্ত তল্লাস করিয়া তিনি

স্বীকার করিতে বাধ্য হন—"The phenomena whatever the couse did really happen and that they could not be explained by orthodox science" পরীক্ষা কালে ভারি জড়দ্রব্যগুলা যে আপনা হ'তে নড়াচড়া করিত ইহার মূলে কোনো ফাকী জুয়াচুরী বা হাতের কারচুপি আছে কিনা ধরিবার জন্য ক্রুক্‌স্ একটী স্বতঃক্রিয়াশীল balanc তৈয়ারী করেন। দর্শক দিগের মধ্যে কাহারো বা মিডিয়মের নিজের কারচুপিতে জিনিষগুলা নড়ে কিনা তাহা ইহাতে ধরা পড়িত; কিন্তু এই যন্ত্র সাহায্যে তাহা ধরা পড়ে নাই। হোমকে লইয়া যে সব বৈঠক হয় তাহার একটাতে Lord Lind say উপস্থিত ছিলেন। ইনি সাক্ষ্য দেন মোহাবস্থায় হোমের দেহায়তন প্রায় ১ ফুট দীর্ঘ হইয়াছিল। ইনিও ভারি চেয়ার টেবিলকে বিনা শক্তিপ্রয়োগে আপনা হইতে উপরে উঠিতে দেখেন। হোমের দৃষ্টান্তে ইনি এবং আরো দুচারজন দর্শক জলন্ত অঙ্গার হাতে করিয়া ধরিয়া নাড়া চাড়া করিয়াছেন, অথচ কোনো জ্বালা যন্ত্রনা অনুভব করেন নাই। ইহারাও সজ্ঞানে নানা সুরের শব্দ শুনিয়াছেন; গন্ধ পাইয়াছেন; তরল গন্ধদ্রব্য হাতে করিয়া গায়ে মাখিয়াছেন, এবং নানারকম আলো ঘরে চলিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন।

(৩) বিলাতের অন্যতম স্বনামধন্য বিজ্ঞানাচার্য্য Lord Rayleigh হোমের এই সব আশ্চর্য্য কাণ্ডকারখানা, স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সাইকিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি হইয়া তিনি যে অভিভাষন করেন তাহা হইতে এ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি তুলিয়া শুনাইতেছি। তিনি বলেন—"পণ্ডিত প্রবর ক্রুক্‌সের রচিত পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ পড়িয়া ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের এ সম্বন্ধে বক্তব্য ও মন্তব্য পড়িয়া মনে বুঝিলাম এ সম্বন্ধের আলোচনায় উদাসীন থাকা সত্যানুসন্ধীর পক্ষে উচিৎ নয়। হোমকে লইয়া তখন সকলে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমিও গিয়া তাহাতে যোগদান করি। ব্যাপার সব স্বচক্ষে দেখিয়া নিজে স্বাধীনভাবে আলোচনা আরম্ভ করিতে স্থির করি। মিসেস্ জেন্‌কেল্ মিডিয়ম শক্তিসম্পান্না ছিলেন। তাহাকে লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করি। পরীক্ষা ফলে যে সব ঘটনা ঘটিতে দেখিলাম তাহা হইতে সন্দেহ যুক্ত যা কিছু বাদ দিয়াও এমন সব ব্যাপার থাকিল যা কোনো রকমে ব্যাখ্যা করা যায় না বা অগ্রাহ্যভাবে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই সব পরীক্ষাকালে মনুষ্যবুদ্ধিতে ও শক্তিতে যতদূর সতর্ক ও সাবধান হওয়া যায় তা হইয়াছিলাম। তৎসত্বেও যা ঘটিল তা আমাদের জানিত প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। পরীক্ষা ঘরে, আমি, আমার স্ত্রী ও মিডিয়ম ছাড়া কেহ ছিল না। কাঁচি ছুরী, কাগজকাটা ছুরী প্রভৃতি শূন্যে উড়িয়া উঠিতে লাগিল, আমাদের বসিবার চেয়ারগুলায় কে যেন প্রবল ধাক্কা মারিতে লাগিল; আমার কোটের কাপড় ধরিয়া কে যেন টানিতে লাগিল। ঘরের ভিতর দু একটা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আলোক পণ্ড ভাসিতে দেখিলাম; অথচ ঘর উত্তমভাবে বন্ধ। যে সময় শব্দ শোনা যাইতেছিল তখন মিডিয়মের ২।৩ পা ভালমতই বাঁধা ছিল। পরীক্ষা শেষে আমরা ঘরের বাহির হইব এমন সময় এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। আমি আমার স্ত্রী ও মিসেস্ জেন্‌কেন্ একত্র দাড়াইয়া আছি; কয়েক হাত দূরে আমাদের বৈঠক টেবিল। প্রকাণ্ড ভারী টেবিল। অথচ টেবিলটা ধীরে ধীরে কাৎ হইতে লাগিল; শেষে কাৎ হইতে হইতে মাটী ছুঁইবার মত হইল; তারপর আবার ধীরে ধীরে পূর্ব্বাবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিল আমাদের নিকট হইতে নাগালের বাহিরে। আমরা তো স্তম্ভিত। তিনজনেই সবল, সুস্থকায়, নীরোগ সম্পূর্ণ সজ্ঞান, সজাগ। তখন আমাদের যে বয়স তাহাতে চোখের দোস হইতেই পারে না, মতিভ্রম যে ঘটিয়াছিল তাহাই বা বলি কি করিয়া? যদি ঘটে তিনজনেরই কি একসঙ্গে ঘটিল? মোহ? তাই বা কি করিয়া—কে মুগ্ধ করিল? ব্যাখ্যা কি দিব? প্রাকৃতিক জানা নিয়মে তার ব্যাখ্যা হয়ই না। * * * ঘটনা সব সত্য কোনো সন্দেহ নাই; এ সমস্যা মীমাংসা বৈজ্ঞানিকদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

(৪) ইটালীর অন্যতম মিডিয়ম Ensapia Palladino কে লইয়া ইয়ুরোপের তদানীন্তন বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা

অনেক পরীক্ষা করেন। আচার্য্য রিচেট্, লম্ব্রসো, জ্যোতির্ব্বিৎ শিয়াপারিলী; আচার্য্য কুরী (curie) দার্শনিক হেনরি বাঁরসোঁ, অলিভার লজ্, ফ্লামারিয়োঁ এরা Eusapia কে লইয়া পরীক্ষা করেন। সাইকিক্যাল সভার অন্যতম সভ্য হজসন্ Eusapiaর দু একটা চালাকি ধরিয়া ফেলায় সভার রিপোর্টে ইউসেপিয়াকে প্রতারক বলিয়া অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু সার অলিভার লজ বলেন, দুচারিটা ক্ষেত্রে ফাঁকির চেষ্টা করিলেও উহার সমস্ত কাণ্ড মিথ্যা নয়; কতকগুলা বাস্তবিকই খাঁটী, সুতরাং অনুসন্ধান যোগ্য। তাঁর কথায় আবার তাহাকে লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ হয়; সভা তিনজন নামজাদা ঐন্দ্রজালিককে এই এই তদন্তে নিযুক্ত করেন। H. Corrington, W. Baggally, Hon. E. fielding. ইহাদের নাম। ১৯০৯ সালে দীর্ঘ পরীক্ষার পর ইহারা report দেন যে Eusapiaর কৃত কাণ্ডগুলা খাঁটী ও সত্য। পরীক্ষায় সত্য ও খাঁটী বলিয়া যে সব ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় তার মধ্যে, দ্রব্যাদির চলাচল, বাদ্যধ্বনি, ঠোকা শব্দ, গন্ধদ্রব্যের আবির্ভাব, নানা রকম আলোর উৎপত্তি, ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব, হাত ও মুখের মূর্ত্তিদর্শন এই কতকগুলা ব্যাপার দেখা যায়। ইহাদের তদন্ত ও তল্লাসে সন্তুষ্ট হইয়া সভা এগুলি সত্য বলিয়া বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন (২৩ সংখ্যক বিবরণী ৩২৯-৩০ পত্র)

(৫) ইটালীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আচার্য্য Lombroso এই আন্দোলনে যোগ দিবার পর প্রেতবাদের ঘোর প্রতিবাদী ও বিপক্ষ ছিলেন, এমন কি এসব যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জুয়াচুরি ইহা প্রতিপন্ন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনায় তাঁহার মত ও মতি পরিবর্ত্তিত হয়। Lombroso র এক কুমারী রোগিণী ছিল; ইনি বহুদিন হইতে নানা স্নায়ুরোগে ভুগিতেছিলেন, এবং এই অবস্থায় ইহার দেহ ও মস্তিষ্ক অবলম্বন করিয়া অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিত। অনেকের ধারণা হইয়াছিল, রোগিণীর দেহে এক প্রেতের ভর হইয়াছে। আচার্য্য তাহা বিশ্বাস করিতেন না; অবশেষে একদিন তিনি দিনের বেলায় রোগিণীকে দেখিতে আসেন। রোগিণী বিছানায় ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, ঘরে কেহ ছিলনা; লম্ব্রসো গিয়া কাছে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। রোগিণীর মাথার কাছে একটা তেপাইয়ে একটা ফুলদানে একতোড়া ভায়লেট ফুল ছিল; হটাৎ আচার্য্য দেখিলেন, রোগিণীর সেই দিকের হাত হইতে একটা নীলাভ ছায়াময় হাত (যেন বাষ্পে তৈরি) বাহির হইয়া ফুলদান হইতে ফুলের তোড়টা তুলিয়া তাহার কোলে ফেলিয়া দিল! আচার্য্য হতবুদ্ধি। প্রকাশ্য দিবালোক, ঘরে আর কেহ নাই; ফাঁকি চালাকি বা কারচুপি হইতে পারেনা আর হইবে কার? রোগিণী নিজে মোহাচ্ছন্ন বা নিদ্রাবিষ্ট ছিল। সেইদিনের সেই ঘটনার ফলে তাঁহার অলৌকিকে বিশ্বাস হয়; তিনি এই ব্যাপার পৃথিবীর অনেক সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দেন।

এখন এই সব ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জড় ব্যাপারের ঘটনা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস হইতে পারে কিনা, পাঠক নিজে বিচার করুন। যে সকল ব্যক্তি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতেছেন তাঁহারা জগৎপূজ্য মহাপণ্ডিত ও সন্দেহবাদী জড়বৈজ্ঞানিক। তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিবার হেতু কি? সাধারণ লোককে ঠকাইবার তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? তাঁহাদের যে মস্তিষ্ক বিকৃত নয় তা বলা বাহুল্য। পণ্ডিত প্রবর Crooks যখন জড়ের চতুর্থাবস্থার (radiant matter) কথা শুনাইলেন, মূলাপ্রকৃতি বা protyle এর সংবাদ দিলেন তখন কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাস করে নাই, আচার্য্য শিয়াপেরিলী যখন মঙ্গল গ্রহের খালের সংবাদ প্রচার করেন তখন কেহ তাহার কথা অগ্রাহ্য করে নাই কেহ ইহাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে কোনো কথা তুলেন নাই। তবে এসব ব্যাপারে তাহাদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য হইবে কেন? ইহারা অবশ্য ঘটনাই লক্ষ্য করিতেছেন; ইহাদের সত্যাসত্য সম্বন্ধে প্রমান দিতেছেন। কারন ব্যাখ্যা করিতে ইহারা সাহসী হন নাই।

সভার বিখ্যাত সভ্য Frank Podmore (Thought Transference & Appanition গ্রন্থের রচিয়তা) সকল সভ্য হইতে সমধিক অবিশ্বাসী ও সন্দেহবাদী; ইনিও ক্রুকসের সাক্ষ্য ও প্রমান অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই।

তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এসব সত্য; তবে কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলেন, খুব সম্ভব ইহারা অজ্ঞাত উপায়ে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই সব দেখিয়াছিলেন অজ্ঞাতসারে মন্ত্র মুগ্ধ হইয়া অনেকগুলি একসঙ্গে ছায়ামূর্ত্তি বা দৃশ্য দেখিতে পারে এমন দৃষ্টান্ত আছে। যাঁহারা Mesmerise বা Hypnotise করেন তাঁহারা এমন করিতে পারেন এর প্রমান আছে; কিন্তু অনেকগুলি লোক একসঙ্গে একাদিক্রমে মন্ত্রাহত হইয়া অথচ সজ্ঞানে ভ্রম দেখিবে এমন পরীক্ষা কোথাও হয় নাই। Podmore বলেন ইহা পরীক্ষিত না হইলেও স্বভাবে ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু Podmore এর এ ব্যাখ্যা অসম্ভব। হোম বা মোজেস্ কে লইয়া যে সব পরীক্ষা হয় তথায় Crookes বা অন্যান্য দ্রষ্টা ও পরীক্ষক দিগকে মোহমুগ্ধ করিয়াছিল? মিডিয়ম নিজেই তো তখন মোহাবিষ্ট থাকিত। Podmore বলেন 'মিডিয়মের জাগ্রত চেতনা অসাড় ছিল বটে কিন্তু তার সুপ্তচৈতন্য (Subconscious nees Subliminal Self) সক্রিয় ছিল' ইহারই অদৃশ্য ক্রিয়া ফলে পরীক্ষক ও দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ঐ সব করিয়াছিল। এই অদ্ভুত, উদ্ভট অসম্ভব Theory যে কতদূর শ্রদ্ধেয় তা পাঠক বুঝিবেন।

প্রেতবাদীরা সমানে স্বীকার করেন, এ সকল বিদেহ আত্মা বা প্রেতদের কাজ। ষ্টেন্টন্ মোজেস ও হোমের দেহযন্ত্র অধিকার করিয়া অনেক বিদেহ আত্মা বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর আত্মা পৃথিবীবাসীদের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম ও নীতিমত এবং উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রচার করিতে চান; পাছে লোকে সে সকল উক্তিকে মিডিয়মেরই বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল ভাবিয়া অগ্রাহ্য করে এই জন্য উক্ত আত্মারা ঐ সকল অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নিজদের আত্মত্ব প্রমান করিতে সচেষ্ট।

যাইহোক সাইকিক্যাল সোসাইটী মনে করেন এ সব ব্যাপার যে বিদেহ আত্মার কাজ এ অনুমানের এখনো সে পরিমান অনুকূল প্রমান পাওয়া যায় নাই। আর Physical phenomena হইতে জীবআত্মার মরনান্ত অস্তিত্বের প্রমান কখনো হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ সব ব্যাপার এতাবৎ অজ্ঞাত অভিনব কোনো প্রাকৃতিক শক্তি বলেও হইতে পারে অথবা মিডিয়মেরই অন্তরস্থ কোনো অজ্ঞের অলৌকিক শক্তির ফলও হইতে পারে। সত্যেই যদি মরনান্তে জীবের আত্মা স্বতন্ত্র ভাবে সজ্ঞানে থাকিতে পারে এবং মায়া মমতা স্মৃতি বজায় রাখিয়া পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে আলাপ করিতে পারে তা হইলে তার চূড়ান্ত প্রমান Psychical বা চিৎঘটিত ব্যাপার হইতেই পাওয়া যাইবে। অপিচ এই জাতীয় ঘটনা খুবই সুলভ। ভাল, বিশ্বাসী মিডিয়ম পাইলে পরীক্ষক ইচ্ছানুসারে যেথা সেথা যখন তখন পরীক্ষা করিতে পারেন। এই জন্য চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সভা উপস্থিত Physical ব্যাপার স্থগিত রাখিয়া Psychical বা চিৎঘটিত মানস ব্যাপার গুলিরই বেশী আলোচনা করিতেছেন। আজ ৩০ বৎসর ব্যাপী সেই আলোচনার ফলে যে আশ্চর্য্য তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা খুবই আশ্বাসজনক। পর প্রবন্ধে আমরা এই সকল মানস-গ্রাহ্য ব্যাপারগুলির পরিচয় দিব।

খ। মানস গ্রাহ্য অলৌকিক ঘটনা

(Psychical Phenomena)

(১) টেলিপ্যাথী (ভাব-চালনা)

মোহাবিষ্ট বা অনুভূতিপ্রবণ (Sensitive) লোকের মস্তিষ্ক অবলম্বন করিয়া অনেক সময় অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সাধারণ জ্ঞানে বা বিজ্ঞানে এ সব ঘটনার কোনোই সন্তোষকর ব্যাখ্যা দিতে পারেনা। এই শ্রেণীর মধ্যে অনেক রকম ঘটনাই দেখা যায়; তাদের মধ্যে খুব সচরাচর এই গুলি:—ভাব-চালনা (Telepathy); অতীন্দ্রিয়দর্শন (Clairvoyance) অতীন্দ্রিয়শ্রবণ (Clairaudience); সত্য স্বপ্ন, প্রেত বা মায়ামূর্ত্তি বা মায়াদৃশ্য দর্শন (Apparition, Hallucination) প্রাগ্দর্শন বা ভবিষ্যদর্শন (Prevision) স্বতঃভাষন (Automatic speech) স্বতঃ লিখন (Automatic writing).

এই গুলির মধ্যে শেষ দুইটী ব্যাপার অর্থাৎ medium বা মোহাবিষ্টের দ্বারা স্বতঃ লিখন ও স্বতঃ ভাষন লইয়াই

সভা মনোমত ভাবে পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষন চালাইতেছেন, এবং এই দুইটী হইতেই আত্মার মরনান্ত অস্তিত্বের চূড়ান্ত প্রমান পাওয়া যাইতেছে। পর প্রবন্ধে এই দুইব্যাপারের সুবিস্তার আলোচনা করা যাইবে; উপস্থিত বাকী কয়জাতীয় অলৌকিক ব্যাপারের বর্ণনা ও ব্যাখা করা যাইবে।

সাইকিকাল সভা সর্ব্বপ্রথম Telepathy বা ভাব চালনা (বা মন চালা) লইয়া তাঁহাদের পরীক্ষা আরম্ভ করেন। টেলিপ্যাথী কথাটী পণ্ডিতপ্রবর মায়ার্সের তৈয়ারী করা। অদৃশ্য অজ্ঞাত, অপ্রাকৃত উপায়ে একজনের মন হইতে অন্যজনের মনে কোনো ভাব বা অনুভূতি (Sensation) জাগাইয়া তোলার নাম টেলিপ্যাথী। সাধারণতঃ আমরা মনের ভাব অপরকে জানাই কি করিয়া? হয় লিখিয়া, বা কথা বলিয়া বা ইঙ্গিত করিয়া। উভয় ব্যক্তি পরস্পরের ইন্দ্রিয়শক্তির সীমার মধ্যে থাকা চাই; না উভয়ের মধ্যে জড়ের ব্যবধান ও সংযোগ থাকিবে। টেলিপ্যাথীর বিশেষত্ব এই, কোনো কায়িক ব্যাপার বা জড়ের সাহায্য না লইয়া এই ভাব চলাচল ঘটিবে। রাম আছে কলিকাতায় শ্যাম আছে সিম্‌লায়; রাম মনে মনে ভাবিল আজ ঠিক বেলা ২টার সময় শ্যাম একটা পেনসিল লইয়া কাগজে একটা পাখী আঁকিবে; বা যদু একখানা বই খুলিয়া পড়িবে; যথা সময়ে উভয়ে ঠিক কাজ করিল, রাম শুধু ইচ্ছা বলে শ্যাম ও যদুকে এই কাজ করাইল। বা রাম নিজ জিভে একটু চিনি লাগাইয়া, পাশের ঘরে চোক বাঁধা শ্যামকে জিজ্ঞাসা করিল কিসের আস্বাদ পাইলে? শ্যাম বলিল চিনির। এইরূপ নীরব ইচ্ছাবলে অন্যের মনে ভাব বা অনুভূতি জাগানো কে টেলিপ্যাথী বলে। যাহার মনে এই ভাব জাগোনো হয় সে জাগ্রত বা মোহাবিষ্ট উভয় অবস্থাপন্ন হইতে পারে। পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা হিপ্‌নটিজিম্ মেস্‌মেরিজম্ কাণ্ড দেখিয়াছেন তাঁহারা এই টেলিপ্যাথীর কাজ বুঝিতে পারিবেন। সহজ সজ্ঞান অবস্থাতেও কোনো, কোনো লোক এইরূপে পরের ইচ্ছিত ভাব বা অনুভূতির বশ হইতে যে পারে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সমস্ত লোকের এই শক্তি নাই; কাহারো কাহারো মস্তিষ্ক যন্ত্র স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ; তাহারাই এইরূপ পর প্রেরিত ভাব বা অনুভূতির বশ হয়; তবে ইহাও ঠিক সকলের মধ্যেই এই শক্তি সুপ্তাবস্থায় আছে, অনুশীলনে উহা ফুটিয়া উঠে।

সব দেশেই বা সব যুগেই কোনো না কোনো সময়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু এতদিন বিজ্ঞানজ্ঞানভিমানী পণ্ডিতরা এটাকে মিথ্যা বা কুসংস্কার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

সাইকিক্যাল সোসাইটী যে অবস্থায় পড়িয়া এই অলৌকিক শক্তির সত্যতা নির্ণয়ে যত্নপর হন সে কাহিনী বেশ আশ্চর্য্য। ডবলিন বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের আচার্য্য পণ্ডিত প্রবর ব্যারেট্ তাঁহার কোনো বন্ধুর কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পান। তিনি ইহার অভিনবত্বে আকৃষ্ট হইয়া নিজে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকয়বর্ষব্যাপী নীরন্ধ্র পরীক্ষার ফলে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন যে এ একটা অদ্ভুৎ অজ্ঞাত মানস শক্তি বটে; তিনি যতগুলি পরীক্ষা করেন তার মধ্যে সফলতার সংখ্যা হিসাব করিয়া দেখেন দৈবের মিল নয়; সত্যই এক চিত্ত অপর চিত্তে পরিচিত প্রাকৃতিক উপায় ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে ভাব জাগাইতে পারে এবং সে উপায়টা যে কি তা বর্ত্তমান মানবজ্ঞান কোনো মতে ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। আচার্য্য তখন লণ্ডনের Royal Society বিজ্ঞান সভার সভ্য দিগকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রথম প্রথম কেহ তাঁহার অনুরোধ কর্ণপাত করেন না। না করিলেও ঘটনা যেমন ঘটিতে থাকিল; অবশেষে চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে অলৌকিকের সংবাদ ইহাঁদের কানে পৌছিতে লাগিল; ফলে সভ্যদের মধ্যে যাঁহারা লোকমত বা অন্ধবিশ্বাসের অপেক্ষা সত্যকে বেশী সম্মান করিতেন তাঁহারা ইহার তত্ত্বনির্ণয়ে মন দিলেন। আচার্য্য সেজউইক্ রাজনীতিবিৎ মন্ত্রী ব্যালফুর, পণ্ডিতপ্রবর মায়ার্স ও এডমণ্ড গারনি আচার্য্য ব্যারেটের সহিত যোগদিয়া অনুসন্ধানে মন দিলেন, এবং অবিলম্বে স্বাধীন পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষনের ফলে সিদ্ধান্ত করিলেন চিত্ত হইতে চিত্তান্তরে অলৌকিক উপায়ে ভাবের চলাচল ঘটিতে পারে।

সাইকিক্যাল সভা ইহাদের মত শিরোধার্য্য করিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে (১) ভাব প্রেরক (agent) ইচ্ছাবলে নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী সজাগ গ্রাহকের (recipient) মনে ভাব বা অনুভূতি (Thought or sensation) জাগাইতে পারে (২) যে প্রেরক ইচ্ছাবলে মোহাবিষ্ট (Hypnotised) গ্রাহকের মনেও ভাব বা অনুভূতি জাগাইতে পারে (৩) যে প্রেরক দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী গ্রাহকের দেহে ইচ্ছানুযায়ী গতি বা অন্যরকম অবস্থা ঘটাইতে পারে (৪) যে প্রেরক দূরবর্ত্তী গ্রাহকের চক্ষে ইচ্ছিত যে কোনো মূর্ত্তী বা দৃশ্য জাগাইতে পারে (৫) যে প্রেরক দূরবর্ত্তী প্রেরকের মস্তিষ্কে তার অজ্ঞাতসারে যে কোনো ইন্দ্রিয়বোধ বা মানসিক সুখদুঃখ হর্ষরাগাদি যে কোনো ভাব জাগাইতে পারে।

পাঠক Frank Podmore বিরচিত Apparition and Thought Transfernce গ্রন্থ পড়িলে উক্ত পাঁচ প্রকার পরীক্ষার দৃষ্টান্ত অনেক পাইবেন।

এইতো গেল পরীক্ষা লব্ধ টেলিপ্যাথীর প্রমান। আপনা হইতে স্বাভাবিক অবস্থাতে গ্রাহকের অজ্ঞাতসারে এমনি সব ঘটনা যে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহারও বিশ্বাস্ত ও প্রামানিক দৃষ্টান্ত সাইকিক্যাল সভা সংগ্রহ করিয়াছেন। কঠিন লক্ষণের দ্বারা ও সাক্ষাৎ তদন্তে ইহাদের সত্যতা প্রমানিত না করিয়া সভা এ সব দৃষ্টান্ত পুঁথিগত করেন নাই। উক্তপুস্তকে ও সভার বার্ষিক বিবরণীতে এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

'গ্রাহকের' স্বপ্নাবস্থাতেও যে টেলিপ্যাথী যোগে ভাব বা অনুভূতি বোধ হইতে পারে তাহারও বহু বিশ্বাস্ত দৃষ্টান্ত সাইকিক্যাল সভা সংগ্রহ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও গ্রাহক পরীক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেও জ্ঞাত থাকিতে পারেন বা নাও পারেন; তবে আপনা হইতে এরূপ ঘটনা ঘটে তাহার দৃষ্টান্তই বেশী।

এক্ষনে আমরা পরীক্ষা ঘটিত ও স্বভাব ঘটিত দুইজাতীয় টেলিপ্যাথীরই এক একটা দৃষ্টান্ত দিব। এ সম্বন্ধে আরো বেশী দৃষ্টান্ত জানিতে ইচ্ছা থাকিলে পাঠক Podmore রচিত উক্তগ্রন্থ পড়িলে পাইবেন।

(ক) ১—গ্রাহকের জাগ্রতাবস্থায় আস্বাদবোধ

১৮৮৩সালে, মিঃ গাথ্রী, গারনি ও মায়ার্স মিস্ ই— ও মিস্ র কে—লইয়া পরীক্ষা করেন। 'গ্রাহক'রা দূরে চোক বাঁধা অবস্থায় আসীনা। প্রেরকরা নিজ নিজ মুখে ভিনিগার, সরিষা, চিনি, লংকা, ফটকিরি, মদ প্রভৃতি জিনিষ ঠেকাইয়া উহাদিগকে কিসের আস্বাদ বলিতে বলেন। এক বৈঠকে ৩২ বার পরীক্ষা হয়। বেশীভাগ পরীক্ষার উত্তর সঠিক পাওয়া যায়; অনেক ক্ষেত্রের আন্দাজে ঠিক আস্বাদের ধারণা দেওয়া হয়। অনেক সময় আস্বাদবোধ ঠিক হইলেও ঠিক ভাবে তার বর্ণনা করা সহজ অবস্থাতেই কঠিন; অজানিত কোনো জিনিষের আস্বাদকে জানিত স্বাদের তুলনায় বুঝাইতে গিয়া ভুল হয়।

(ক) ২ বেদনাবোধ

পরীক্ষক পূর্ব্বোক্ত তিনজন; 'গ্রাহক' উক্ত মিস্ র—, ও অন্যান্য কয়েকজন। পরীক্ষকরা নিজদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে চিমটী কাটিয়া বা ছুঁচ ফুটাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "কোন স্থানে এবং কি বোধ হইতেছে—" ২০টী পরীক্ষার মধ্যে ১৩টী ঠিক হয়, দুইটী ভুল হয়, বাকী গুলি আন্দাজে ঠিক হয়।

(ক) ৩—শব্দবোধ

শব্দবোধ জাগোনো সম্বন্ধে যে সব পরীক্ষা হয় তাহাতে তেমন সফলতা পাওয়া যায় নাই; তবে স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এরূপ পরীক্ষায় প্রেরক মনে মনে একটা জিনিসের নাম করিবেন ও ভাবিবেন "গ্রাহক আমার মানস-উচ্চারিত কথার শব্দ শুনিতে পাউক—" এ জাতীয় পরীক্ষায় সফল না হইবার কারণ আছে। সেরূপ সংখ্যায় পরীক্ষা হয় নাই, হইবারও সুবিধা নাই; তা ছাড়া আধুনিক মানুষের দর্শন ইন্দ্রিয়টা সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর ও ক্রিয়াশীল, কানের চর্চ্চা তত বেশী নয়; দর্শন যন্ত্রের ক্রিয়াশীলতা ও তৎপরতা এত বেশী যে, পরীক্ষক

মনে মনে একটা জিনিসের নাম করিলে গ্রাহকের মনে তার শব্দ জাগিবার আগে ছবিটা জাগিয়া উঠে। বাস্তবিকই আমাদের মনে দৃষ্ট বস্তুর ছবিটা যেমন স্পষ্টভাবে জাগে, শোনা শব্দের ছবি (impression) তেমন জাগে না।

ক (৪) Idea বা ভাববোধের জাগরণ

আচার্য্য Richet প্রায় দশজন লোককে লইয়া ২৯২৭টা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষক মনে মনে একটা জিনিসের কথা ভাবিবেন, 'গ্রাহক' উহার নাম করিবে। ৭৮৯ টা উত্তর ঠিক হয়; অর্থাৎ Chance বা দৈবের মিলে যাহা হইবার কথা তাহার অপেক্ষা বেশী। মিঃ গারনি নিজে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। ১৭টা বৈঠকে সব শুদ্ধ ১৭৬৫৩ টা পরীক্ষা করা হয়; ৪৭৬০ টা সফল হয় দৈবমিলের সংখ্যা ৪৪১৩।

মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক জার্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত অকরবিজ একবার নানা দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করেন; ৭০ টা পরীক্ষা হইয়াছিল। ইনি এক একবার এক একটা জিনিষ ছবি, দৃশ্য, অক্ষর সংখ্যা, বা ব্যক্তির নাম, মনে করেন, গ্রাহক অধিকাংশক্ষেত্রেই ঠিক উত্তর দেয়।

ক (৫) গ্রাহকের চোখের সম্মুখে বস্তুর মানসচিত্র জাগাইয়া দেওন

প্রেরক ইচ্ছা করিলে গ্রাহকের চোখের সম্মুখে ব্যক্তি বস্তু বা দৃশ্যের ছায়ারূপ জাগাইতে পারেন। ডাক্তার ব্লেয়ার, গাথরি ও আর্চাধ্যি লজ্ প্রভৃতি অনেক পরীক্ষক এ লইয়া অসংখ্য অসংখ্য পরীক্ষা করেন। অনেক স্থলে গ্রাহককে দৃষ্ট ছবির রূপ আঁকিয়া দেখাইতে বলা হয়। Podmore রচিত Thought Transfernce গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

উপরি-বর্ণিত পরীক্ষাগুলি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে টেলিপ্যাথী বা ভাব-চালনা রূপ অলৌকিক শক্তিটা একটা সত্য ব্যাপার, কু-সংস্কার বা মিথ্যা ব্যাপার নহে। সাইকিক্যাল সভা শুধু পরীক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। আপনা হইতে ঘটিত অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া উহাদের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত-তল্লাসে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। ইহার পর অজানিত অলৌকিক উপায়ে একচিত্ত অপর চিত্তে যে ভাব বা অনুভূতি জাগাইতে পারে এ তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না।

স্বাভাবিক অবস্থায় আপনা হইতেই কোনো কোনো লোকের চিত্তে হটাৎ এইরূপ একটা অনুভূতি, বেদনা, বা ভাবভ্রম ঘটিয়াছে, এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দূরবর্ত্তী তাহারই কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর সত্যই সেই অনুভূতি, বেদনা বা ভাব ঘটিতে দেখা গিয়াছে। অথচ উভয়েই এ বিষয়ে অজ্ঞ। agent বা ভাব-বোধয়িতার মনে আদৌ সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান থাকে না। যাহার ভ্রম-বোধ হয় সেও জানেনা যে দূরবর্ত্তী কোনো আত্মীয়ের সত্যই এরূপ ঘটিয়াছে কিনা। এই সকল ভ্রম-বোধ সাধারণতঃ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (১) ইন্দ্রিয়ানুভূতি (২) মানসিক চিন্তার অনুভূতি (৩) মানসিক ভাব যেমন সুখ, দুঃখ, ভয় ইত্যাদি বা কল্পিত দৃশ্যের অনুভূতি (৪) কাজ করিবার প্রবলবাসনা বোধ। আমরা অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে এক একটী করিয়া বর্ণনা করিব। Frank Podmore রচিত গ্রন্থে বা সার অলিভার লজের 'জীবাত্মার দেহান্ত অস্তিত্ব' (Survival of man) নামক গ্রন্থে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।

(১) ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভ্রমবোধ

বিখ্যাত চিত্রকর মিঃ সিভারনের পত্নী একদিন রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসেন ও হঠাৎ মুখে একটা প্রবল আঘাতের বোধ করিয়া ভাবিলেন ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল দিয়া চাপিয়া ধরেন; পরে দেখেন রক্ত টক্ত কিছু না। সেটা ভ্রম। তার পর তিনি শুইয়া পড়েন। পর দিন তাঁহার স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসেন। খানা খাইবার সময় তিনি ঘন ঘন রুমাল দিয়া মুখ চাপিয়া ধরেন। তাঁহার পত্নী প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন না। তার পর লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠেন "আরথার আমি বুঝেছি কি হয়েছে তোমার মুখে আঘাত লেগে ঠোঁট কেটে গিয়েছে।" শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হন, কেননা ব্যাপার সত্যই তাই অথচ তিনি

ও কথা পত্নীকে বলেন নাই। পরে তাহার স্ত্রী তাঁকে সমস্ত কথা বলেন। যে সময় তিনি এই ভ্রম-বোধ করেন ঠিক সেই সময় তাঁহার স্বামী উক্ত স্থানে আঘাত পান। অথচ তিনি জানিতেন না সত্য ইহা ঘটিয়াছে। মিঃ সিভারন্‌ও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার স্ত্রীর দেহেও উক্ত বোধ ঘটাইয়াছে।

(২) মানসিক চিন্তার ভ্রম বোধ

এরূপ বোধ প্রায়ই ঘটে। কোনো লোক দূর দেশে হইতে-খবর না দিয়া বাড়ী করিতেছে; বাড়ীর কেহ না কেহ (খুব নিকট সম্বন্ধযুক্ত) আগে হইতেই যেন বুঝিতে পারেন অমুক বাড়ী ফিরিতেছে। অনেক সময় প্রত্যাশিত ব্যক্তি ঠিক আসিয়া পৌছায়। নিম্নে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে তাহা অন্তরূপ।

মিসেস্ বারবারের দৃষ্টান্ত—"আমি একদিন সকালে বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিয়াই ছেলেদের লইয়া খাইতে বসি। আমার ছোট মেয়ে বছর আড়াই বয়স খুব তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালিনী ও অনুভূতি প্রবণ (Sensitive) সে দিন সকালে দোকানে একটা কালো কোঁকড়া চুল ওয়ালা বড় কুকুর দেখি। আমি সেই কথাটা মেয়েকে বলবো মনে করেছি, করে, তার চোখের দিকে তাকিয়েছি এমন সময় কি কারণে অন্যমনস্ক হই। তার দু এক মিনিট পরেই আমার খুকি বলে উঠ্‌লো 'দোকানে একটা কাল কুকুর দেখেছ?' আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম 'হাঁ দেখেছি' কি করে জানলে। সে উত্তর না দিয়ে বলে উঠে "তার গায়ে মজার চুল"। আমার আর এক ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে "কি রংএর ইউলিম্? সেটা কি কাল?" উত্তর "হাঁ।"

(৩) মন কল্পিত দৃশ্যে বা চিত্রের ভ্রম বোধ

আচার্য্য রিচেটের প্রদত্ত দৃষ্টান্ত :—"১৮৮৮ খৃঃ ২রা জুলাই সোমবার সন্ধ্যা ৮টার সময় আমি সমস্ত দিন ল্যাবোরেটারীতে কাটাই। শ্রীমতি লিওনিকে লইয়া মেসমেরিজম্ পরীক্ষা করিতেছিলাম। একটা খামের মধ্যে একটা লেখা পুরিয়া তাহাকে বলিতে বলিয়াছি; সে বলিতে চেষ্টা করিতেছে এমন সময় আমি হটাৎ ব্যাকুলস্বরে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করি "লেংলির কি হলো?" লিওনি অমনি উত্তর করিল "লেংলি বা হাত পুড়িয়ে ফেলেছে আগুনে নয় কি একটা শিশি থেকে ঢালতে গিয়ে নাম জানিনি কি। "আমি জিজ্ঞাসা করি 'কিরকম জিনিষ?' লিওনি উত্তর করিল "পাতলা মত, কটা বাদামি রংএর।" পরে সন্ধানে জানিলাম সেই দিন বেলা চারটার সময় লেংলি একটা পাত্রে খানিকটা ব্রোমিন ঢালতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলেছে।" ঘটনা সত্য।

(৪) মানসিক ভাবের (হর্ষ শোকাদি) ভ্রম-বোধ

কখনো কখনো দেখা যায় লোকে অকারণ একটা মানসিক উদ্বেগে বা চাঞ্চল্যে অস্থির হইয়া উঠে; কেন যে তা হইল বা তাহার হেতু কি তখন কিছু বুঝিতে পারেনা।

মিঃ ফ্রেবস্ বর্ণিত ঘটনা :—"১৮৮৬ খৃঃ। ২৪শে নভেম্বর বিকাল বেলা আমার মনটা হটাৎ যার পর নাই চঞ্চল হয়ে উঠে। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে না পেরে সমস্ত বিকাল বেলাটা ঘুরে ঘুরে বেড়াই। উদ্বেগ ক্রমশঃই বাড়তে থাকে, সন্ধ্যার সময় খুবই বেশী হতে লাগলো। এমন কি রীতিমত ভয়ে দাঁড়ালো। আমার মনে হতে লাগলো কে যেন পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষে শোবার ঘরে ঢুকলাম। সমস্ত ঘরটা মশারীর এদিক ওদিক ভাল করে দেখলাম, কেউ কোথায় নাই। যখন বসলাম তখন আবার সেই রকম বোধ হতে লাগলো, শেষে অসহ্য বোধ হওয়াতে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে বসলাম। তাকে বললাম," দেখ আমার মনটা হটাৎ বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে বোধ হচ্ছে কে-যেন আপনার লোক আঘাত পেয়েছে বা মারা গিয়েছে।" বন্ধুর বাড়ী থাকতে সে ভাবটা থেমে গিয়েছিল। পরে বাড়ী ফিরে এলে আবার খুব বেশী হতে থাকে, পরদিন আমার ঠাকুরদার বাড়ী গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম বিগত দিন অর্থাৎ ২৪শে আমার বাবা চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে খুব জখম হন। পরে বাবার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেসা করে জানলাম, সত্যই তাই ঘটেছিল। ঘটবার আগে তিনি আমাকে ভাবেননি; কিন্তু পড়বার মুহূর্ত্তেই বাড়ীর সমস্ত আপনার জনের মূর্ত্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।"

(৫) কাজ করিবার ঝোঁক ভ্রম

কথনো কথনো টেলিপ্যাথীর প্রভাবে মানুষের মনে হটাৎ একটা অচিন্তিত কাজ করিবার ঝোঁক হয়। এমন অনেক বিশ্বস্ত ঘটনার বৃত্তান্ত শোনা যায় যে ব্যক্তিবিশেষ হটাৎ অকারণে যার পর নাই উদ্বিগ্ন হইয়া কোথাও গিয়াছেন এবং গিয়া দেখেন কাহারো কঠিন পীড়া বা মৃত্যু হইয়াছে।

মিসেস্ হ্যাড্‌শেল বর্ণিত ঘটনা :—"১৮৯১ খৃঃ, মে মাস। কয়েক বৎসর আগে এক বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান কালে হটাৎ আমার মনটা উদ্বেগ ও ভয়ে এমন চঞ্চল হইয়া ওঠে যে বাড়ী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ি। বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখি আমার এক ছেলে ঘরে ভিজা কাঠের ধোঁয়াতে একেবারে দম বন্ধ হইয়া মরিবার মত হইয়াছে। আমি সেই সময়ে না ফিরিলে ছেলে মারা যাইত।"

দ্বিতীয়—"আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কোন জেলার একটী মহিলা একবার হটাৎ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া পড়েন। তাঁহার মনে হইল তাঁর কন্যার খুব কঠিন পীড়া; তার সাহায্য দরকার হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি জামাতাকে টেলিগ্রাফ করেন ও বাড়ী ফেরেন। উদ্বিগ্ন হইবার কোনো কারণ ছিল না। কেননা তাঁর কন্যা ভালই ছিল। বাড়ী ফিরিয়া তিনি দেখেন সত্যই কন্যার খুব পীড়া।"

তৃতীয় আর্কডিকন ক্রুসের বর্ণিত ঘটনা :—আমি একবার এক নবনির্ম্মিত গির্জ্জায় ধর্ম্ম বক্তৃতা দিতে যাই। পথে যাইবার সময় একটা দেয়ালে বভরিলের বিজ্ঞাপন স্বরূপ একটা প্রকাণ্ড গরুর মাথার চিত্রের দিকে নজর করি। এর আগে অনেকবার তেমন চিত্র দেখি; কিন্তু সেবার যেন কি মনে হইল ছবিটাকে সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিলাম "দূর লক্ষীছাড়া জানোয়ার অমন করে তাকাস্‌নি! স্ত্রীর কোনো বিপদ হল নাকি?" হঠাৎ মনে হতেই ব্যস্ত হয়ে বাড়ী ফিরি। ফিরে গিয়ে দেখি আস্তাবলে ঘোড়ার ডাক্তার আমার ঘোড়ার চিকিৎসা করছে আর ওদিকে আমার স্ত্রী ও মেয়ে একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে। আমি যে সময় এই দৃশ্য দেখি ঠিক সেই সময় ওদের ঐ দুর্ঘটনা ঘটে।"

স্বতঃঘটিত বা পরীক্ষা ঘটিত এই সব দৃষ্টান্ত দ্বারা একরূপ নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে অলৌকিক অজ্ঞাত উপায়ে এব মানব মস্তিষ্ক নিকট বা দূরবর্ত্তী অন্য মস্তিষ্ক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বেদনা, ভাব বা চিন্তার অনুভূতি ঘটাইতে পারে। এই যে অদৃশ্য শক্তি ইহার স্বরূপ কি, ক্রিয়া পদ্ধতি কিরূপ, তাহার কোনো নিরাকরণ হয় নাই। কোনোরূপ অদৃশ্য সূক্ষ্মতর জড়পদার্থের সাহায্যে এই ভাবচালনা ঘটে না জড়াতিরিক্ত কোনো ব্যাপার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তাহাও এ পর্য্যন্ত ঠিক হয় নাই; মানব চৈতন্য বস্তুটী যে কি তাহার রহস্য ভেদ না হইলে ইহার রহস্যভেদ সম্ভব নহে। চিৎশক্তি ও আমাদের পরিচিত জড়শক্তি ইহাদের মধ্যেই বা নিগুঢ় কি সম্পর্ক তাহারই বা কি মীমাংসা? যাই হউক এ একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভুল নাই। মাধ্যাকর্ষন শক্তি যেমন একটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিপন্ন শক্তি এও তেমনি; উত্তরের আসল স্বরূপ অজ্ঞান গুহায় নিহিত। আমরা অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর অলৌকিক ব্যাপারের পরিচয় দিব।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

—:০:—

দূরের কথা।

বহু দিন পরে অতি দূর হ'তে
যদি সে নিকটে এল ;—
দূরটি কেবল রেখেছে সে মনে,
নিকট সে ভুলে' গেল

বাঁধিলাম তারে বাহু-পাশ দিয়া
চোখে দুটি চোখ রেখে,
বিরহ-ব্যাকুল উঠিল কাঁদিয়া
দূরের সেটিকে দেখে।

হিয়ার পরশ এমন সরস
আমাতে মরিনু আমি,
নীরস বিলাপে কাঁদিয়া উঠিল
"ওগো কোথা আছ স্বামী !"

জানি আমি সে যে খুঁজিছে আমারে
আমি জানি খুঁজি' তারে
ব্যবধানে শুধু হৃৎ পঞ্জর,
সেখানে রেখেছে কারে ?

মৃদু-চঞ্চল অধরে তাহার
চুম্ব করিনু দান,
মৃদু-গুঞ্জিত নিঃশ্বাসে ঘন
গাহিনু মিলন-গান।

পরশ তাহার কাঁপিয়া উঠিল
পরশের আলাপনে,
পুলক তাহার পলক-বদ্ধ
সেই দূর-আবাহনে ?

ওগো দূর ! তুমি এস মোর কাছে,—
কাছ, তুমি দূরে যাও,
আমার দুখের এ নব সঙ্গীত
সবারে শুনায়ে দাও।

—প্রসাদ।

—:০:—

সমানে সমান

বা

বুনো ওল ও বাঘাতেঁতুল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ডেপুটী—দেবীবাবু। (বুনো ওল।)

২য় মুনসেফ্, সব্ ডেপুটী, সব্ রেজিষ্ট্রার, সরকারী ডাক্তার — ঐ বন্ধুগণ।

কৃপারাম—পুরাতন আর্দ্দালি।

মাণিক—খানসামা।

পেস্কার, বেহারা ও দারোয়ান।

স্ত্রী।

ডেপুটী বাবুর স্ত্রী—(বাঘাতেঁতুল।)

প্রথম মুন্‌সেফের স্ত্রী—

নূতন ঝি—

নন্দর মা—

——:•:——

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ডেপুটীর খাস-কামরা। ডেপুটী বাবু আসীন। পেস্কার বাবু সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

পেস্কার। হুজুর গরীবের মা-বাপ। ওরা সামান্য-লোক, ওরা কি হুজুরের রাগের যোগ্য? ওরা নিতান্তই ক্ষুদ্র বই তো নয়—

ডেপুটী। সেটি তো ওঁদের মনে থাকে না। "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে"—আমি কি করব? নন্দলাল তো নন্, নন্দ-দুলাল! আমি একটা ডেপুটী—একটা হাকিম—পথে আমায় দেখ্‌লে লোকে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে প্রায় নর্দ্দমায় গিয়ে পড়ে, আর, ও বেটা কিনা কেবল সিগারেট্‌টা একটু মুখ থেকে নাবিয়ে, হন্ হন্ ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়—এত বড় গরম।

পে। অজ্ঞান—ও আপনার মর্য্যাদা কি বুঝ্‌বে হুজুর? অজ্ঞান বই তো নয়।

ডে। তাইতো জ্ঞান দিচ্ছি—এইবার টের পা'ক্ বেটা। এতবড় আস্পর্দ্ধা? হুঁ, আবার—সেদিন—বাদ্‌লা, বাজারে মাছের আম্‌দানি ছিল না বল্‌লেই হয়, সবে একটা চলনসই রকম মাছ এয়েছিল, তাই বেটা কিনে নে' গেল! তিনি আগে দর করে'ছিলেন—মাথা কিনে ছিলেন! আমার চাপড়াশী যখন গিয়ে দাঁড়াল, অমনি সেটা ছেড়ে দেবে তা নয়, আবার বলা হ'ল, "বাড়ীতে লোক এয়েছে, মাছটা না নিলেই চল্‌বে না" এতবড় মাছলেনে-ওলা! বেটাকে এবার দেখাচ্ছি।

পে। তবু—তবু হুজুর দয়া না ক'রলে—

ডে। যাও, বকিও না। তোমায় ওকালতি করতে ডাকা হয় নি। যা সহি করবার ছিল, হ'য়ে গ্যাছে। এখন যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গে।—আবার দাঁড়িয়ে রইলে যে?—যাও।

পে। যে আজ্ঞে। (পেস্কারের সভয়ে প্রস্থান)

হুঁ, এক ঢিলে দু'দুটো পাখী—বেটাও জব্দ, আবার ওদিকে No conviction, no promotion—সেটাও তামিল। বস্, ও দুই-ই হ'বে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে নন্দর মার প্রবেশ)

নন্দ-মা। হুজুর, ধর্ম্মাবতার, আমার নন্দকে রক্ষা কর।

ডে। কে তুমি?

ন-মা। আমি নন্দর মা। দোহাই হুজুর, আমার নন্দকে ফিরে দাও। ওতো ওরই গরু, বিক্রি করে'ছিল। কিনে সে লোকটা কিছুতেই দাম দিলে না; আবার গরু ফিরে চাইলে তাও দিলে না। সে হ'ল জবর-দস্ত লোক, নন্দ ছেলেমানুষ, কিছুতেই না পেরে, কি আর করে বাবা, সে যখন বাড়ী ছিলনা, সেই ফাঁকে, নন্দ তার নিজেরই গরুটা খুলে এনেছে, এই বই তো নয়।

ডে। সে লোকটা ডায়েরি করিয়েছে তার গরু চুরি গেছে। চোরাই গরু নন্দর কাছে পাওয়া গেল। তাইনা তাকে অগত্যা গ্রেপ্তার ক'রে হাজতে রাখ্‌তে হ'ল; আইনের ব্যাপার আমি কি করব? তুমি মেয়ে মানুষ তাই বুঝছ না। আমি আইনের মালিক হ'য়েতো আর আইন অমান্ত করতে পারিনে।

(সয়তানী হাসি)

ন-মা। তুমি সব পার বাবা। নইলে, আমরা মরে যাব, সংসারটা ডুবে যাবে। বাছা আমার কখনো এমন কাজ করেনি—আর না হয় করবে না। দোহাই বাবা—

(পায়ে ধরিতে যাওয়া)

ডেপুটী। তুমি আমাকে বে-আইনী কাজ করতে বলছ? তোমার ছেলেকে যে তাহ'লে বাধ্য হ'য়ে আরও বেশী শাস্তি দিতে হ'বে. এটা বুঝছ না—এ হে-হে-হে?

ন-মা। না, না, তা'হলে আমি যাচ্ছি। দোহাই মা রক্ষেকালি, তুমিই বাছাকে রক্ষা ক'রো। (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)।

ডে। কোন্ হ্যায়, বেয়ারা!

বে। (প্রবেশান্তে সেলাম করিয়া) হুজুর!

ডে। কাহে মাগীকো আনে দিয়া? জেনানাকো বেগর-এত্তালা-ছোড় নে-কো কভী না, মগর মাগী ক্যা জেনানা হ্যায়?

বে। হুজুর, দেখা নেই।

ডে। দেখা নেই! তব্ ক্যা নিদ্ যাতা রহা? উল্লুকা বাচ্চা।

বে। (সেলাম করিয়া) হুজুর মা-বাপ্। গোস্তাকি মাফ্ কিয়া যায়।

ডে। মাফ্ কিয়া যায়! বেটা এত্তালা না দিয়ে এক বুড়ী মাগীকে—

বে। হুজুর, ময় ওহি তো কহ্‌তা হুঁ। নিদ্ তো নেহি গয়া, বাকি ঠিক্‌সে দেখা নেই।

ডে। বস্, আজসে আঁখ খুল যায়েগা, আভি হি হাওয়াই দেতা। তোমারা এক রূপেয়া জরিমানা হুয়া—যাও।

(বেয়ারার প্রস্থান)।

বেটা idiot! হাত পায়ের ছিটে ফোঁটা দেখ্‌লেই তো টের পাওয়া যায়। এতদিনে এই আক্কেলটুকু হ'লনা—বেটা ছাতু—useless!

(বিরক্তি সহকারে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মাণিকের প্রবেশ]

মা। ঝি ছুঁড়ী ফুল তুল্‌তে গেছে; এই পথেই ফিরবে। মান্‌কে হুঁসিয়ার? আজ কিন্তু পারাই চাই। এমন খাসা নিরবিলি জায়গা, ভয় কি? না, বাবা, ভরসাই বা কি? গিন্নীর সোহাগের বাঁদী, গিয়ে যদি একখানাকে একশো খানা ক'রে লাগিয়ে দেয়, তবেইতো গিইচি। নাঃ, লাগাতেই বা যাবে কেন, গালিগালা তো আর নয়, দুটো মনের কথা, মুখ কস্‌কে ব'লে ফেলে দিই, যা থাকে অদেষ্টে। কিন্তু ছুঁড়ীর যে কড়া মেজাজ যেন কাঠখোট্টা, তাইতো রোজ এগুই আর পিছুই।

তা—মিষ্টি কথায় ভিজ্‌তেও তো পারে।

পারে বৈ কি—পারে বৈ কি। (চাহিয়া ও একগাল হাসিয়া) ঐ যে, আসচে। মাণিক, মরিয়া হও দাদা, নইলে সব ভেস্তে যাবে।

[ফুলের সাজি হস্তে নূতন ঝির প্রবেশ]

মা। (গদ্‌গদ্ স্বরে) কে,—নূতন ঝি-ই-ই?

নূ-ঝি। আরে মর, আবার সুর ভাঁজে কে? কেও? মাণিক। হাঁ, ভাল কথা, খানকতক টিকে নিয়ে এস দেখি অন্দরে, ধুনো দেওয়ার টিকে ফুরিয়ে গেছে।

(প্রস্থানোদ্যম)

মা। এ-এ-একটু দাঁড়াও না নূতন-ঝি, আমি এইখেনেই এনে দিই।

নূ ঝি। (বিস্ময়ে) কেন গা?

মা। আমার অন্দরে যেতে বড় ভয় করে।

নূ-ঝি। আচ্ছা, যাও, চট্ ক'রে নিয়ে এস।

মা। চ'লে যেও না যেন, দোহাই তোমার।

(প্রস্থান)।

নূ-ঝি। বেশ, টিকে ক'খানা নিয়েই যাই। মা-ঠাক্‌রুণের ফুলের তো যোগাড় হ'ল। এখন রেকাব ক'রে শোয়ার ঘরের টেবিলে রেখে দিই গে। বাবুতো ঘরে আস্‌বেন রাত্ দুকুরের পর, নেশায় চুর হ'য়ে। ও যেখানকার ফুল সেখানেই পড়ে শুকোবে, সকালবেলায় ঘর ঝেঁটিয়ে, ঝাট্‌নের সঙ্গে আবার পাঁশ-গাদায় ফেলতে হ'বে বৈতো নয়। কাজ কি বাপু রোজ রোজ এ সং ক'রে? তা শোনে কে?

দেখ্‌তে দেখগে কর্ত্তা গিন্নীতে কুরুক্ষেত্তর লেগেই আছে। কিন্তু দুকুর-বেলা, একটু গা গড়াবে, তা নয়, ঐ গুণের সোয়ামীর জন্যে হয় কম্ফোর্ট বুনুচেন, নয় কার্পেটের জুতো হ'চ্ছে। ওমা! সেই জুতো পায়ে দিয়ে সোয়ামী কিনা সাঁঝ না হ'তে চল্‌লেন ঠাকরুণদের বাড়ী।

বলে—

রাই কাঁদেন হা-পিত্যাশী
কালা ভজেন কুব্জাদাসী।

পোড়া জুতোর অদেষ্টেতো এই মান, তবু বুনেই যাচ্ছে। একটু আলিস্যিও নেই বাপু! করুগে যা খুসী। আমরা দাসী, বাঁদী, অত কথায় কাজ কি? তবে যা ব'লেছি, তাই পরাণটা পোড়ে।

[মাণিকের টিকা হস্তে প্রবেশ]

মা। (সনিঃশ্বাসে) কিন্তু আমার এই পরাণটা নূতন-ঝি, পোড়ে শুধু তোমারি জন্যে।

নূ-ঝি। মর, ড্যাক্‌রা, বড় যে বাড় দেখ্‌ছি। নে, এখন টিকে গুলোন দে, ঢের দেরি হ'য়েছে।

মা। মাইরি, নূতন ঝি, দেরি নয়। তোমার জন্যে— সে আর কি বল্‌ব'—অহহ!

নূ-ঝি। (স্বগত) হুঁ, রোস, তাহ'লে একটু বাঁদর-নাচ দেখ্‌তেই হ'ল। (প্রকাশ্যে) কেন আর তামাসা করছ, কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিচ্ছ?

মা। কেন, কাটা ঘায়ে কেন? তুমি বুঝি কাউকে ভাল বেসেছিলে?

নূ-ঝি। এত বড়টী হ'লুম, তা' আর বাসিনি? আহা, সে ঠিক্ এম্‌নিটি ছিল—ঠিক্ তোমারি মতন দেখ্‌তে—

মা! (কাছ ঘেঁষিয়া) তাই নাকি, তাই নাকি? তারপর?

নূ-ঝি। সে আমার জন্যে ঠোঙ্গা ক'রে খাবার নিয়ে এসে যখন দাঁড়াত—আহা ঠিক্ এম্‌নি। এম্‌নি ক'রে মুখ-পানে চেয়ে, সব ভু'লে গিয়ে হাঁ ক'রে থাকৃত। আমি সেই ফাঁকে ঠোঙ্গাটি হাতে নিয়ে (গ্রহণ) এক একখানি তুলে, মুখে গুঁজে দিতুম (তদ্রূপ করণ)।

মা। থু, থু, আর রাম, রাম! এযে টিকে? থু-থু-থু!

নূ-ঝি। (সনিঃশ্বাসে) আমার কি আর জ্ঞান আছে?

মা। যাক্, যাক্। নূতন-ঝি, ভুলে যাও ভুলে যাও, যখন আমারি মতন বল্‌ছ, তার বদলে এই আমাকে—

নূ-ঝি। তুমি কি আর অত আবদার সইবে? আমার আদর, সোহাগ, সবই যে ছিষ্টিছাড়া—তুমি কি আর বরদাস্ত কর্‌বে? কিন্তু—সে বড় ভালবাস্‌ত।

মা। আমিও বাস্‌ব, আমিও বাস্‌ব। সোহাগ একটু ক'রেই দেখ না।

নূতন-ঝির গীত। (কীর্ত্তন)

নূ-ঝি। ওঁর——

পোড়ার-মুখো, লক্ষীছাড়া, হতচ্ছাড়া, মিন্‌সে,
মনপ্রাণ বিকিয়ে পায়ে নাথি ঝাঁটা কিন্‌সে।

মা। আহা বল রে বল।

নূ-ঝি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও, আর গুণে যাও।

মা। আহা বল রে বল।

নূ-ঝি। হতচ্ছাড়া মিন্‌সে।

বয়াখুরে উনপাঁজুরে আঁটকুড়ের ব্যাটা;

হাড়্‌হাভাতে, আবাগের পো, ছুঁচো, পাজি, ঠ্যাঁটা।

মা। আহা বল রে বল।

নূ-ঝি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও আর শুণে যাও।

মা। আহা বলরে বল।

নূ-ঝি। আঁট্‌কুড়ের ব্যাটা।

পিরীত তো পরের কথা, অলপ্পেয়ে, ড্যাক্‌রা,

ঝেঁটিয়ে আগে বিষ ঝাড়ি আর,ভাঙ্গি তোর ন্যাক্‌রা।

মা। এও বল্‌তে নাকি?

নূ-ঝি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও আর শুণে যাও।

মা। তবে বল রে বল।

নূ-ঝি। অলপ্পেয়ে ড্যাকরা।

মড়িপোড়া, ঘাটের মড়া, ওলাউঠো ময়না,

তোর জন্যে শকুন, শেয়াল দিয়ে আছে ধর্‌না।

মা। আঁা, একি কথা গো?

নূ-ঝি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও আর শুণে যাও।

মা। বেশ, বলরে বল।

নূ-ঝি। ওলউঠো—মরনা।

মা গঙ্গা নেয় না তোকে, চুলোয় তুই যা' না,

দুটি চক্ষু খেয়ে কি যম, হ'য়ে আছে কাণা?

মা। বাবা, ভয় যে লাগে?

নূ-ঝি। আমি বলে যাই, তুমি শুনে যাও আর শুণে যাও।

মা। আর কাজনি বলে—

নূ-ঝি। চুলোয় তুই যা না,

(রাগিণী) যমের অরু-ই-ই-ই—

(কর্ণাকর্ণ)।

মা। আহাহা? একেবারে ফুলের মত হাত। হঠাৎ অত সোহাগ করিস্‌ নে রে। আনন্দে আমার চোখ্‌ দিয়ে জল গড়াছে।

নূ-ঝি। (টিকার গুঁড়া হস্তে লইয়া) আহা মুছিয়ে দিই। (মুখময় লেপন)।

মা। (হাত দিয়া দেখিয়া) একি? আঁা, একি?—

নূ-ঝি। ফুলের মত হাত কিনা, তাই তার কিঞ্চিৎ পদ্মরাগ লেগে গেছে। বুঝ্‌লে হাঁদারাম? আর প্রেম কর্‌তে আসবে? এতেও শিক্ষা না হয়, গিন্নীকে ব'লে জুতোপেটা করাব।

(প্রস্থান)

মা। দরকার হ'বে না। নেশা ছুটে গিয়েছে বাবা। পেরণাম। যাক্‌, এটা বেশ বোঝা গেল যে, সে বরঞ্চ ঢের ভাল, যে গোড়াতেই পষ্ট ঝেড়ে ফেলে দেয়, বলে—"মুখ ধুয়ে এস গে।" কিন্তু বাবা এমনতর 'গিয়ে মুখ ধোওগে'—ব্যাপার যে অক্লেশে ঘটাতে পারে, তেমন ঠাঁই আর কস্মিনকালে ঘেঁষ্‌চিনে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[ডে-গৃহিণী সোফায় আসীন। বিরক্তিভরে পুস্তক ও সেলাই—একের পর আর গ্রহণ ও ত্যাগ করিলেন। শেষে চক্ষু বুঁজিয়া হেলিয়া কপালে মুষ্টি স্পর্শ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন]

[নূতন-ঝির প্রবেশ।]

নূ-ঝি। মা আপনার জলখাবার কি এইখেনে দেব?

গৃ। (বিরক্তিভরে) না।

নূ-ঝি। তবে আসুন বাবুর খাওয়া হয়ে গ্যাছে,—নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বইতো নয়।

গৃ। (রাগিয়া) যাচ্ছে যাক্‌, তোর কি? বকাস্‌নে, যা।

নূ-ঝি। তা হ'লে—

গৃ। (চটিয়া) আবার?

(নূতনঝির প্রস্থান)

[ডেপুটী গৃহিণীর পূর্ব্ববৎ অবস্থান।—ডেপুটীর চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ।]

ডে। ছড়িগাছটা গেল কোথায়? বেকুব, ছড়ি নেই? মানকে বেটা—

গৃ। মানকে বেটার দোষ কি? ছড়ি আমি এনেছিলুম—

ডে। (চমকিয়া, চাহিয়া) এঁ্যা, এঁ্যা—তুমি এনেছিলে—তুমি? বেশ, বেশ—(হাসিবার চেষ্টা করিয়া) তা ছড়ি আবার আনতে গেলে কেন?

গৃ। কাজ ছিল। হয়েছে। নিতে পার। (সম্মুখে টেবিলে রক্ষা, ছড়ি লইয়া ডেপুটীবাবু গমনোন্মুখ)

বেড়াতে যাচ্ছ,—যাও; কিন্তু ফেরবার সময় আর কখনো যেন তোমার ঐ বন্ধু কটিকে সঙ্গে এনো না। কাল রাত্তিরে এ বাড়ীতে যে বাঁদরামিটা হয়েছে—যথেষ্ট, এ তাড়িখানা নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী। তোমার যদি সে জ্ঞান না থাকে, আমার আছে। তাঁদের ব'লে দিও আর তুমিও মনে রেখো।

ডে। কৈ, এমন কিছু তো—

গৃ। হয় নি?—বটে! পোলাওর পুষ্পবৃষ্টি ক'রে আলুর দম মাথায় চটকে ধেই ধেই নেত্য ক'রে, পেয়ালা, প্লেট ভেঙ্গে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে—তবু হয় নি? বলছ কি ক'রে? লজ্জা করে না? অবাক্ হয়ে চাইছ যে—আমি সব জানি, ঢুকরে নিজে তোমার বৈঠকখানা দেখে এয়েছি। সাফ্ কল্লেও সব যায় নি? ছোলার ডাল আর ঝোলের দাগ এখনও দেয়ালময় টিট্‌কিরী দিচ্ছে, ছি!

ডে। তা' তা—ওরা একটু বেয়াড়া হ'য়েই পড়ে'ছিল বটে। আমার তা দেখ, আমি—বুঝলে কিনা—আমার কিন্তু—

গৃ। (ভেঙ্গচাইয়া) একটুও দোষ নেই কেমন? আমি যে সব দেখিছি। প্রথম ছিটকে এসে আঁস্তাকুড়ে প'ড়ে ড্যাং গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন কে? সেটি দ্বিতীয় মুনসেফ্ বাবু নন? জানালায় ব'সে সব দেখেছি। তোমরা যে তাঁকে উদ্ধার কর্ত্তে এসে একে একে সেই বন্ধুবরের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে আঁস্তাকুড়ে সদগতি লাভ কর্লে তাও অজানা নেই। কৃপারাম আর মাণ্‌কে এসে হাতাসাঁই করে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল—তোমার স্মরণ না থাকতে পারে, আমার আছে—হাড়ে হাড়ে জাগছে—আমি তো আর নেশা ক'রে আক্কেল হারাই নি।

ডে। তা—তা—তা হ'বে। হয়ত আমারও একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছল। বারে বারে অনুরোধ করতে লাগল—বন্ধুলোক।

গৃ। পরমবন্ধু! আহাহা! বন্ধুতার একেবারে পরাকাষ্ঠা। তা' সে যাইহোক্, আর এ চৌকাট্ যেন তাঁরা মাড়ান না। স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, ভাল হবে না। যদি না শোন, নাকে কাঁদতে কাঁদতে বাপের বাড়ী যাব না, এখন থেকেই ব্যবস্থা কর্ব্ব। বাড়ীতে সব খুলে লিখে দেব। চাকরীস্থলে এসে তোমার কি বিদ্যে হয়েছে শ্বশুর ঠাকুররা জানুন, জেনে বিস্মিত করুন।

ডে। না না তা' করো না। এই নাক মলা, এই কান মলা—আর কখনো অমন কাজ হবে না।—ও কেলেঙ্কারিটা ক'রো না।

গৃ। কেলেঙ্কারীর ভয় আছে নাকি? শুনেও সুখী হলুম; যাক্ বেড়াতে যাচ্ছ—যাও,—যা বলেছি মনে থাকে যেন।

ডে। থাক্‌বে থাক্‌বে। আবার অমন কাজ? আর নয়—এই কানমলা খাচ্ছি। আর নয়।

(প্রস্থান)।

গৃ। তোমার ও কানমলা ঢের দেখা আছে। ওপরওলার কম্‌লিতেও বোধ হয় ঘাঁটা পড়ে গেছে, সান নেই নইলে, আজ কানমল, কাল মনে থাকে না? ওতে আর ভুলছিনে। নিজেকেই একটু চেষ্টা করতে হচ্ছে দেখি যদি পারি। (চীৎকার করিয়া) নূতন ঝি ও নূতন ঝি—

(নূতন ঝিএর প্রবেশ)।

নূ-ঝি। কি মা ঠাকরুণ, খাবারটা?

গৃ। না, সে হবে'খন। তুই যা দিকি মাণ্‌কেকে একবার ডেকে আন, এখুনি।

(ঝি-এর প্রস্থান)।

মাণিক—আহা সাত রাজার ধন, অমন গুণধর খানসামা কি আর হয়?—পেয়ারের চাকর! হ'বে না? বেটা পাজির ধাড়ি, ওকে দিয়েই এটা করাতে হচ্ছে। এখন একটা চাবি-কুলুপ চাই (লইয়া) হাঁ—ঠিক হ'বে।

[মাণিক সহ নূতন ঝি'র প্রবেশ]

ঝি। এই যে মা ঠাকরুণ।

গৃ। মাণকে! এই নে চাবি-কুলুপ—বৈঠকখানায় এখনি কুলুপ দিয়ে চাবি আমায় দিয়ে যাবি।

মা। আজ্ঞে, আলো বাতি করতে হবে।

গৃ। চোপরও, আবার জবাব কাট্‌ছিস্। আমার হুকুম, যা শীগ্‌গির।

মা। বাবু হাওয়া খেয়ে ফিরলে—

গৃ। বল্‌বি আমি বন্ধ করিয়েছি—আমার কাছে চাবি আছে—যা, এখনই যা বলেছি ক'রে আয়।

[চাকরের তালা চাবি লইয়া প্রস্থান]

আর্ত্ত্ নূতন ঝি, তোরও কতকগুলো কাজ আছে। খুব হুঁসিয়ার। যেমন যেমন বল্‌ব করতে পারা চাই। আয়, এখন সঙ্গে আয়।

(দুজনের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

(তালা চাবি হস্তে মাণিকের প্রবেশ)

মা। মৎলবটা কতক কতক মালুম হচ্ছে। বাঘ-রেশে মেয়ে বাবা। নাঃ—কুলুপ ঠিক দিতেই হচ্ছে ওতে কোনও তঞ্চকতা চল্‌বে না। কিন্তু আমাকেই ডেকে হুকুম! এর অর্থ কি? নিজের বিশ্বাসী দাসী বাঁদী থাকতে—শেষটা কিনা—আমাকে—

নূতন ঝি। (লুক্কায়িত থাকিয়া) দেখ দেখি, বিদঘুটে খেয়াল নয়?

মা। কিন্তু সে নিশ্চিন্ত নেই। আমার ওপর ঠিক চোখ আছে।

নূ-ঝি। হুঁ—একেবারে পটলচেরা। আর, তা ছাড়াও কিছু আছে; ক্রমে টের পাবে।

মা। তামিল কর্ত্তেই হবে, নইলে সে মেয়ে অনায়াসে হাণ্টার কস্‌তে পারে, কিছু বিচিত্তির নেই বাবা।

নূ-ঝি। বিচিত্তির এখন নেই, কিন্তু কথার পর দেখো বেশ একটু চিত্তির বিচিত্তির অন্ততঃ পিঠখানায় খুঁজে পাবে।

মা। যাই কুলুপটা দিয়ে আসি। পেছনে ঠিক চর আছে।

(প্রস্থান)।

[নূতন ঝিএর প্রবেশ]

নূ-ঝি। চর নয় রে গাধা, এ সোঁতাল নদী। কি গাইতে গাইতে ধেয়ে আসছি জানিস্?—এই কুলু-কুলু-কুলু-কুলু-কুলুপ। আহা! এ কণ্ঠে আর কিছু নেই—শুধু এই কুলু-কুলু-কুলু-কুলু-কুলুপ।

(একগাছি সুতহারে ঝুলান ছোট একটি কুলুপ প্রদর্শন) আর এই ধব্‌ধবে বালির মত সাদা আঁচলে নীচের পানে মাথা হেলান ছোট্ট একঝাড় বাঁশের মতন এই এক থোপা চাবিকাঠি—দরকার তো হ'তে পারে। ওই যে আস্‌ছে—স'রে পড়ি।

(লুক্কায়িত হওন)

(মাণিকের প্রবেশ)

মা। কুলুপ তো দিয়ে এলাম। কিন্তু মুস্কিল দেখ্‌ছি; বাবুদের ফূর্ত্তির ফাঁকে গরীবের দুপয়সা উপরি মেলে, আজ আর সেটা হচ্ছে না। তা তো বুঝলাম, কিন্তু একেবারে যদি বন্ধ হ'য়ে যায়? যদি হয়? ও বাবা!—পেয়ালা, প্লেট, গেলাস—সোডা, চানাচুর, ঘুগনি—এ সব কেনা যে একদম বন্ধ হ'য়ে যাবে। উপায়? এঁ্যা! না, না তা'কি হ'তে পারে, বাবুরা যখন একবার মজা পেয়েছে ও ঠিক চল্‌বে নইলে, শুক্‌নো নিছক মাইনেতে আমার চল্‌বে কেন?—

(গীত)

(শুধু) মাইনেতে কি গুণ করে?
(আরে) মাইনে আমি চাইনে, যদি উপরিতে মোর পেট ভরে।
আরে—মাইনে, সে তো পাঁচটা টাকা পাই,
তাতে চলে কি আর ছাই?

(ওরে) মাসটা গেলে দশটা চাকি তার ওপরে চাই,
বাজারে তাই নই কো বেজার মিলুই হিসেব মন্তরে।
কিন্তু মাছি মেরে হায় রে কলিকাল !
শুনি তিনশো গালাগাল—
কিন্তু, বাবুরা যে হাতী গেলেন, লাখ্ দুলাখের মাল,
তাদের, উল্টে আরো মান বেড়ে যায়,
খেতাব মেলে রাজ-দোরে।

—আড্ডা তো আজ বন্ধ। কিন্তু ফূর্ত্তি আমার বন্ধ হচ্ছে না দাদা। (কোমরে লুকান বোতল দেখাইয়া) এক বোতল মাল বেমালুম পার ক'রেছি। যাই আমার কুঠ্রীতে লুকিয়ে আসি। আমারও চল্‌বে। চাই কি, ফাঁক পেলে বাবুর মেজাজটাও খোস ক'রে দিতে পারব। বাবা, গা'য়ে বাছুরে ভাব থাকলে, মাঠে গিয়ে দুধ দেয়। যাই এটা আগে রেখে আসি। আবার চাবি পৌছে দিতে হ'বে। কিন্তু এই ফাঁকে যদি কেউ—উঁহু, একটা তো মোটে দরজা—চাবিটা দিয়ে, তারপর কোথাও নড়্‌ব।

(প্রবেশ)

[নূতন ঝি'র প্রবেশ]

নূ-ঝি। পরে আর কাজ কি? আমি না হয় আগেই সেটা দিয়ে দেই।

(শেকল টানিয়া দেওন)

মা। কেও—আরে-আরে—

নূ-ঝি। আমি আগেই ভেবেছিলুম লাগতে পারে।

(কুলুপ বহিষ্করণ)

মা। (ভিতর হইতে) এ আবার কি ?

নূ-ঝি। এই কুলু-কুলু-কুলু কুলু-কলুপ। (কুলুপদেওন)।

মা। আরে আমি যে ভেতরে রইলেম্। দেখছ না ?

নূ-ঝি। কই না, দেখ্‌তে পাচ্ছি নে তো। তুমি মিছেমিছি ঠাট্টা কচ্ছ বুঝি ?

মা। ঠাট্টা কি রকম ?

নূ-ঝি। তা নয় না কি ? হবে।

মা। তা'হলে খুলে দাও।

নূ-ঝি। সে দোব'খন।

মা। দোব'খন! কখন ?

নূ-ঝি। যখন আমার খুসী। এখন নিরিবিলি ব'সে বসে আরও কিছু মৎলব ফাঁদ।

মা। এর মানে ?

নূ-ঝি। বুঝলে না? এই তুমি যেম্‌নি কুকুর, আমি তেম্‌নি মুগুর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[প্রথম মুনসেফ্ বাবুর স্ত্রী ও ডেপুটী বাবুর স্ত্রী আসীনা]

মু-স্ত্রী। কি কর্ব্বে বোন্, পুরুষ মানুষ।

ডে-স্ত্রী। কেন দিদি, পুরুষ হ'লেই কি মানুষ হয়? পুরুষ তো পশুতেও হ'য়ে থাকে, ওতে আর বাহাদুরী কি ?

মু-স্ত্রী। না, তা নেই বটে, কিন্তু (হাসিয়া) তোমার কর্ত্তাটী পুরুষও বটে, মানুষও বটে কাজেই পুরুষ মানুষও বটে—তাতে তো আর সন্দেহই নেই।

ডে-স্ত্রী। কেন, মানুষের মত আকার ব'লে ?

মু-স্ত্রী। (হাসিয়া) তবে তুমি আমার বোনাইটীকে বাঁদর বল্‌তে চাও নাকি ?

ডে-স্ত্রী। না, দিদি, আমি তা বল্‌তে চাইনে, আমার তা উচিত নয়। কিন্তু লোকে কি বল্‌ছে—সাম্‌নে না হোক্ আড়ালে? সেটা একবার ভাব দেখি। যখনি তা মনে হয়, ঘেন্নায়, লজ্জায়, রাগে আমার জ্ঞান থাকেনা, মনে হয় একটা কুরুক্ষেত্র ক'রে ফেলি।

মু-স্ত্রী। (গম্ভীর হইয়া) ছিঃ বোন্, অত রাগ কর্ত্তে নেই। আমরা হিন্দু স্ত্রী। স্বামী আমাদের দেবতা, আমরা তাঁদের পূজারিণী। তাঁরা প্রভু, আমরা সেবিকা, দাসী।

ডে-স্ত্রী। কিন্তু স্বামী দেবতা যদি ঘণ্টাকর্ণ হ'ন তা'হলে তাঁর পূজার উপচারও সেই রকম হওয়া উচিত—গাছ কয় কোঁৎকা লাঠি। (সহসা দুঃখিত ভাবে)—নইলে যে পূজা বিফল হ'য়ে যায়, তিনি গ্রহণ করেন না (দীর্ঘনিঃশ্বাস)।

মু-স্ত্রী। কিন্তু সে ব্যবস্থার অধিকার আমাদের নেই, স্বামী বিপথে গেলেই বা কি কর্ব্বে বোন্, তাকে শাসন ক'রে ফেরাবার তুমি কে ?

ডে-স্ত্রী। আমি কেউ নই ? তবে কে ফেরাবে ? ও পাড়ার পদীপিসী ?

মু-স্ত্রী। তা যেই করুক, আমরা তো আর গুরুমশাই নই, আমাদের যে কেবল স'য়ে সায় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে হ'বে। আমরা যে সহধর্ম্মিণী।

ডে-স্ত্রী। কিন্তু দিদি, এঁদের মত স্বামীর খাঁটি সহধর্ম্মিণী হ'তে গেলে সে যে মদও খেতে হয়, বাগানবাড়ীতেও যেতে হয়। তুমি কি তাই বল ? স্বামী সংসারধর্ম্ম কর্ব্বেন আমি তাঁর দোসর হব, এই না কথা ; কিন্তু তিনি যদি কেবল অধর্ম্মই করেন, তাহ'লে তাঁকে সংশোধন কর্ব্বার চেষ্টা না কর্লে হয় তাঁর সঙ্গে অধর্ম্ম কর্ত্তে হয়, নয় তাঁকে ত্যাগ কর্ত্তে হয়—এ দুটোর কোন্‌টা কর্ব্বে বল ?

মু-স্ত্রী। এঁ্যা, না, তা' অধর্ম্মই বা কর্ব্বে কেন ? ত্যাগই বা কর্ব্বে কেন ? তোমার মত তুমি থাক্‌বে, তাঁর মত তিনি থাক্‌বেন।

ডে-স্ত্রী। অর্থাৎ, দুটো জীবন দুই উল্টো দিকে বইতে থাক্‌বে, তা'হলে বিয়ের বাঁধনে ধর্ম্মের বাঁধন, দুটোপ্রাণ এক ক'রে দেওয়া—সেটা কথার কথা ? গঙ্গাজল, নারায়ণ আর হোমের আগুণ সাক্ষী ক'রে লম্বা লম্বা শপথ করা—সব মিছামিছি ? না দিদি হিন্দুর বিয়ে অত ছেলেখেলা নয়। আর তাও দেখ, তাঁকে ব'য়ে যেতে দিলে, তাঁকে নিয়েই যখন আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম তখন আমারও যে ইহকাল পরকাল সেই সঙ্গে যায়।

মু-স্ত্রী। তা হ'লে তুমি নিজের দিকটাই দেখ্‌ছ ?

ডে-স্ত্রী। তা দেখ্‌ছিনে। কিন্তু যদি তাই দেখ্‌তাম তবুও তো তাঁর দিকে দেখা হ'তো। তিনি আর আমি কি ভিন্ন ? যিনি আমার সমস্ত, আমার সর্ব্বস্ব, যদি আমার আত্মতৃপ্তির জন্যই তাঁকে নিখুঁত দেখ্‌তে চাই, সেটাকি কেবলই স্বার্থপরতা ?

মু-স্ত্রী। না না, তা নয়। তবে ভালবাসার ধর্ম্ম কি জান ?—

ডে-স্ত্রী। আমি যা জানি, তাতে চোখ বুঁজে থেকে গোল্লায় যেতে দেওয়া ভালবাসার ধর্ম্ম নয়। ভালবাসি ব'লেই তো তার দারুণ ব্যাধির কথা জেনে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। ওষুধ তেত হলেও তাই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কি করব, আমার কপাল (দীর্ঘশ্বাস)।

মু-স্ত্রী। (হাসিয়া) তা হ'লে ভেতরে ভেতরে নৈবিদ্যিটে পুরোদস্তরই আছে। কেবল বাইরে পাক্‌কটা খাস্‌নে, কেমন ? যাক্‌, এও সাবিত্রী ব্রতই বল্‌তে হ'বে, তবে একেলে কিনা, বাইরের আকারটা একটু বদ্‌লেছে। ভেতরের ভক্তিটুকু কম নেই। আহা তোর ব্রত সফল হোক।

ডে-স্ত্রী। আশীর্ব্বাদ কর দিদি, আমার স্বামীকে যেন তাঁরই যোগ্য দেখ্‌তে পাই। এই হিন্দুনারীর পবিত্র হৃদয়ে যাঁর স্থান, তিনি যেন সে আসনের মর্য্যাদাটুকু রাখ্‌বার মত হ'ন। তাঁর মনে ব্যথা দিতে আমি ব্যথা পাইনে ? দেখাতে যে পারিনে দিদি, নইলে দেখ্‌তে এ বুকের ভেতর রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়্‌ছে।

মু-স্ত্রী। শুধু শুক্‌নো শাসনে কিছু নাও হ'তে পারত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোর এই গভীর ভালবাসা—এর জয় হ'বেই হবে।—এখন তবে আসি বোন্‌। আজ আবার শনিবার, ছেলেপুলেরা সকাল সকাল স্কুল হ'তে ফিরবে।

(উত্থান)

ডে-স্ত্রী। আচ্ছা দিদি, মাঝে মাঝে এস। কথায় কথায় বেশ থাকি।

মু-স্ত্রী। আস্‌ব বৈকি।

(প্রস্থান)

ডে-স্ত্রী। শনিবার ? তাইতো বটে ! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ)

(ডেপুটীর প্রবেশ)

ডে। এ ঘরে এতক্ষণ কে ছিলেন ?, মুনসেফ্‌ বাবুর স্ত্রী বুঝি ?

ডে-স্ত্রী। হ্যাঁ। আজ এত সকালে যে ?

ডে। কোর্টে বিশেষ কাজ ছিল না সকাল সকালই চলে এলুম। হ্যাঁ দেখ, আগে তোমায় বলা হয় নি, ভুল হ'য়ে গেছ্‌ল। আমি একটা পোষাকের জন্য কল্‌কেতায় অর্ডার দিয়েছিলুম—আজ পার্শেলটা এসে প'ড়েছে। ষ্টেশন থেকে ছাড়িয়ে আন্‌তে হয়। মোট

প্যাকিং ট্যাকিং শুদ্ধ ৩৭৲ টাকা কয়েক আনা দিতে হ'বে। আটত্রিশটে টাকা দিলেই চল্‌বে। এখন দেবে?

ডে-স্ত্রী। তা দিচ্ছি। তোমার পোষাক এয়েছে তাও বোঝোনা? একশোবার বোঝো। (হাতবাক্স হ'তে বাহির করিয়া) এই নাও, চারখানা দশ টাকার নোট। কিন্তু দেখ, পোষাকের বাক্সটা এলে পাঠিয়ে দিয়ো, আমি আগে দেখ্‌তে চাই। (স্বগত) [প্রস্থান করিতে করিতে] তোমারি টাকা তোমাকেই সন্দেহ? কিন্তু সে যে তোমারই হিতের জন্য—যদি বুঝতে পার্ত্তে!

(প্রস্থান)

ডে। সন্দেহ কর্‌বে আগেই জানতুম্‌। বাক্স দেখাত হ'বে। হুঁ, শক্ত প্যাঁচ খেলেছে বটে। কিন্তু হারাতে পার্চ্ছে না। আমিও ঠিক করেই রেখেছি, বল্‌ব—একেবারে প'রেই তোমাকে দেখাব ভাবছিলুম, কিন্তু কি রকম জান, মাল্‌টা বোধহয় গোলমাল্‌ ক'রে ফেলেছে। সে আমার গায়ে হ'ল না। দ্বিতীয় মুন্‌সেফ্‌ বাবুকে বেশ fit করেছে। তিনি ওটা নিয়ে গেলেন। দামটা যখন হয় দেবে'খন। এখনি দিতে আর কি ক'রে বলি? আমাকে আবার একটা order পাঠাতে হয় দেখ্‌ছি। (একটু মুচকি হাঁসিয়া)

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্দরের কক্ষ

(নূতন ঝি'র প্রবেশ)

নূ-ঝি। বাক্স তো এল। কিন্তু মাণকে ঐ যে মুটেকে বল্লে "আস্তে নাবা, ধপাস করে ফেলিস নি, ভেঙ্গে যাবে"—তার মানে কি? পোষাক আবার ভাঙ্গবে কি? যাই, মাঠাকরুণকে খবর দিইগে, আর এ কথাটাও বলিগে।—

ঐ যে মাঠাকরুণ এই ঘরেই আস্‌ছেন।

(ডে-স্ত্রীর প্রবেশ)

ডে-স্ত্রী। কি রে এয়েছে?

নূ-ঝি। হ্যাঁ মাঠাকরুণ, কিন্তু পোষাকের আবার ভাঙ্গবে কি, সেইটে বুঝতে পাচ্ছিনে।

ডে-স্ত্রী। কি রকম?

নূ-ঝি। তা কি করে বল্‌ব? মাণকে মুটেকে বল্লে "আস্তে নাবা, নইলে ভেঙ্গে যাবে।"

ডে-স্ত্রী। হুঁ, (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা রূপারামকে একবার পাঠিয়ে দে দিকি।

নূ-ঝি। আরদালীকে?

ডে-স্ত্রী। হাঁ, শীগ্‌গির যা। বলগে "মা বললেন, এখনি যেতে হ'বে জরুরি দরকার আছে।"

(নূ-ঝি'র প্রস্থান)

সন্দেহ আগেই হয়েছিল—এখন তো বোঝাই যাচ্ছে—কেবল চোখে দেখা বাকী। রূপারাম বিশ্বাসী বুড়ো, মনিবকেও ভারি খাতির করে। সহজে গুমোর ভাঙ্গতে চাইবে না। তবু আমার কাছে মিথ্যা বল্‌বে না। কথাটা আদায় কর্ত্তেই হবে।

(রূপারামের প্রবেশ)

রূ। (সেলাম করিয়া) মাঈজী হামাকে বোলিয়েছেন? কি হুকুম?

ডে-স্ত্রী। ষ্টেসন থেকে যে বাক্সটা এল, সেটা কোথায়?

রূ। বৈঠকখানামে ধরিয়েসে।

ডে-স্ত্রী। তাতে কি আছে?

রূ। আভিতক্‌ তো খুলেনি মাঈজী, ভিতরে কি আছে হামি তো দেখে না।

ডে-স্ত্রী। তবু—

রূ। উপরে কি তো লিখা আছে, হামি হ'ল গাঁওয়ার আদমি, ইংরেজী লিখা পড়ি তো জানে না। হামি কি সমঝি?

ডে-স্ত্রী। ঐ রকম বাক্সে ক'রে এ বাড়ীতে কোনদিন মদ এয়েছিল বলতে পার?

রূ। (মাথা নীচু করিয়া) মাফ্‌ করিয়ে মাঈজী। হামি গোলাম, নিমকের নোকর, হামার ওতে দরকার কি?

ডে-স্ত্রী। দরকার নেই, তবে তো তুমি খুব নেমকের নোকর! মনিবের সর্ব্বনাশ হয়, আর তুমি পুরাণো লোক, এতদিন এ সংসারে আছ, অথচ একটু দরদ নেই।

রূ। (শিহরিয়া) দরদ নেই। মাঈজী, মনিব হামার

জান্‌সেভি বহুৎ বড়। আউর ক্যা কহি ? মনিবকে ওয়াস্তে হামি জান্ দিতে পারে।

ডে-স্ত্রী। তাই বুঝি মনিবকে জাহান্নমে পাঠাবার জন্ম জান্ কবুল ক'রেছ ? কিছুতেই সত্যি কথা বলবে না, পাছে মনিবের ভাল হয় ? এই তোমার দরদ ! হুঃ !

কৃ। দরদ আছে না আছে রাম জানে। কিন্তু হামার মুখসে একথা বাহার হোবেনা।

ডে-স্ত্রী। ঐ তো বার হ'য়েই গেল।

কৃ। (চমকাইয়া) কৈ, হামি কি বোলিয়েছি ?

ডে-স্ত্রী। চমকাচ্ছ কেন ? আমি তো আর বাহিরের লোক নই। আমার কাছে বললে তোমার মনিবের ইজ্জত যায় না। কেলেঙ্কারী হ'চ্ছে তা আটকাতে পাচ্ছ না, আমার কাছে লুকাচ্ছ !

কৃ। সচবাৎ ! বাকি হাম জবান সে কুছু বোলতে পারবে না মাঈজী। হামি বাকস্ লিয়ে আপ্‌কো সামনে ধরিয়ে দিছি। আপনি নিজে দেখে লেন। (দ্রুত প্রস্থান)

ডে-স্ত্রী। হাঁ, নেমকের চাকর বটে। তুমি যে মনিবের জন্ম জান দিতে পার তা' আমি জানি ; কিন্তু মনে আঘাত না দিলে যে বেরুত না—তাই দায়ে পড়ে কটু বলতে হ'ল। কি করব !—বুড়ো আপনি বাক্স আনতে গেছে, বেশ কথা। বাক্সটাই চাই। একবার হাতে পেলে সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

(কৃপারামের প্রবেশ)।

কৃ। এই যে মাঈজী। আভি হামাকে ছুটি দিলে। বড় দরকার আছে। (ব্যস্ততা প্রদর্শন)।

ডে-স্ত্রী আচ্ছা যেও। খোলবার আগেই যেতে চাও ? এইত ! আই হবে, বাক্সটা শুধু আর একটা ঘরে দিয়ে যাও।

কৃ। বহুৎ খুব। বহুৎ মেহেরবানি। (সেলাম)।

ডে-স্ত্রী। (উচ্চৈঃস্বরে) নূতন ঝি।

নূ-ঝি। (প্রবেশান্তে) এই যে মাঠাকরুণ।

ডে-স্ত্রী। এ বাক্সটা যে ঘরে গহনার সিন্দুক আছে সেই ঘরে যাবে। সঙ্গে গিয়ে নাবিয়ে নিগে। তুই ওখানেই থাকিস। আমিও যাচ্ছি এখুনি।

(সকলের প্রস্থান)

ডেপুটীর বৈঠকখানা

[সবরেজিষ্ট্রার Patience খেলায় রত। ডেপুটী ও দ্বিতীয় মুন্‌সেফ্ কথোপকথনে ব্যস্ত, সবডেপুটী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া একবার ইহার একবার উহার পানে তাকাইতেছেন]

২য় মু। আরে ও রেজেষ্ট্রীসাহেব ! ও কি ছাই Patience খেলছ ? এস এক হাত Bridge খেলি। যা হচ্ছে Current fashion—শুধু fashion কেন ? Passion বলতে পার।

ডে। আরও বলতে পার—The very standard of human civilization, the richest harvest of intellectual cultivation.

স-রে। (তাসের সম্বন্ধে) ক্যাবাৎ, একেবারে টেক্কা ! (মুন্‌সেফ্—ডেপুটীর প্রতি) হুঁ, তা তো হ'ল। কিন্তু মশাই ! খেলবেন কি দিয়ে ? এ হচ্ছে বাড়ীর মেয়েদের Reject করা পাচ প্যাক খুঁজে পাচরঙ্গা তাস মিশিয়ে তবে খাড়া করা, পকেটে ছিল, নইলে অনেক সময় মিছে নষ্ট হ'ত।

(পুনঃ খেলায় রত)

স-ডে। সব-রেজেষ্টার বাবু তালে ঠিক আছেন, কাজের লোক কিনা।

ডে। বাড়ীতে তো তাস ছেল, কিন্তু মাপ্‌কে বেটা অন্দরে আটক রইল। কিবা করা যায় ? এত করে বল্লুম ! Oh, the inexorable গিন্নি !

২য়-মু। মাণিক বুঝি তোজের বন্দোবস্তে গিন্নির ফরমাস খাটছে ?

ডে। হুঁ, এতদিন তো ওর ওপর খড়্গহস্তই ছিলেন। আজ দেখ্‌ছি মাণিকের কদর বুঝ্‌তে পেরেছেন। কিন্তু গিন্নী যে জহুরী হ'য়ে পড়্‌লেন, মাণিকটীকে চিনে ফেল্‌লেন বিপদ দেখছি। বল্লেন কি জান ? তোমরা তামাক টামাক খাও না, চুরুট, সিগারেট খাও, একমুঠো টেবিলে রেখে দিলেই চলবে। খানসামার বিশেষ দরকার নেই। আর

নিতাভই যদি দরকার হয় নূতন চাকর উদ্ধবই তা' পারবে। বেটা একে গয়লা—তাতে হালে আমদানী, একেবারে indecent তাই তাকে আর ডাকাইনি, সে বেটা কিছু জানেও না। উদ্ধব—আহা, কি নাম! একেবারে Sound echoing the sense!

২য় মু। মরুক্ গে। হাঁ ভাল কথা, আমার গিন্নী আজ আবার অসুখ কোরেছেন দিন বুঝে, বুঝ্‌লে?

ডে। তবে যে তুমি চলে এলে?

স ডে। হাঁ, আপনি যে?—তা হ'লে—

স রে। (তাসের প্রতি) তাইত, বিবিটা? নাচার। সাহেবের ঘাড়ে যে তিরির তেরস্পর্শ বাবা!

২য় মু। বল্লুম না দিন বুঝে ব্যায়রাম—ও কিছু নয়। হাঁ, আর এক কথা। কাল কি তোমার নেমন্তন্ন আছে? জমিদার হলধর রায়ের বাড়ী?

ডে। বল কিহে? জমিদার মানুষ, আমার নেমন্তন্ন কর্ব্বে না? তুমি হলে খতেন, খত আর বাকী খাজনার হাকিম, তোমায় বরং না কর্ত্তে পারত। আমি যে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

স-ডে। হেঁ, হেঁ, উনিই হচ্ছেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

মু। (হাসিয়া) তা বটে—পেয়াদার সর্দ্দার—সেটা খেয়াল ছেল না। কিন্তু কৃষ্ণধন ভট্টচাজ্জি উকিলের বাড়ীর সেই কেলেঙ্কারীর পর আবার নেমন্তন্ন খাব? তাই ভাবৃছি। বাপ্! মনে হলেই গা শিউরে ওঠে। আমি বল্লুম আমাদের যায়গা কোথায়? বল্লে কি না—"আজ্ঞে, বামুন কায়েত ভিন্ন ভিন্ন জাত সব ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ব্যবস্থা।"

ডে। Hang your জাত! Barbarous!

মু। আমি বসতে রাজী নই দেখে, আবার হাসি টেপাটেপি চল্‌তে লাগ্‌ল! একজন চাপা গলায় বল্‌লে—স্পষ্টই শুন্‌তে পেলুম—"ওহে সে জাত নয় সে জাত নয়, এ হাকিম জাত।"—এতদূর ব্যাপার কিছুতে একটা আলাদা ঘর দিলে না। হ্যাঁ, তুমি তো আর যাওনি, গেলে টের পেতে।

ডে। গেলে সেটা হয়ত হতই না।

স-ডে। হ্যাঁ, উনি গেলে ওটা হতই না।

ডে। কাল দেখ্‌বে আগেই সব ঠিক হয়ে আছে। Might is right. বাবা এ সে জাত নয় যে মান্ধাতার চেয়ে পুরাণো, প'চে দুর্গন্ধ হ'য়ে গেছে। আমাদের এজাত জন্মালেই পাওয়া যায় না দস্তুর মত acquire কর্ত্তে হয়। এর prestige জোর করেও বজায় রাখ্‌তে হবে।

মু। কিন্তু first munsiff চলেছেন ঠিক তার উল্টো দিকে। তিনি সেদিন dirty বামুনগুলোর সঙ্গেই বসে পড়লেন।

ডে। তোমার senior টী দল ছাড়া। আমরা for courtesy's sake সরকারী ডাক্তারটিকে হাকিমের দলে promotion দিয়ে নিলুম, দলটাকে পুরু কর্ব্বার জন্ত, আর তিনি কিনা তফাৎ রইলেন!

স-ডে। (চাপাকথায় ও ইসারায় স-রে-কে দেখাইয়া) আর ওঁকেও বুঝি promotion দিয়েই—?

ডে। কেন, উনি তো ছিলেনই—রেজেষ্টারী হাকিম? শোনেননি নাকি? (হাসিয়া) হা-হা, নূতন হাকিম কিনা?—ও নামটা সম্বন্ধে কিছুদিন একটু বেশী Particular হওয়ারই কথা বটে।

মু। না না অতটুকু liberal হ'তে হ'বে বৈকি? নইলে, দল পুরু হওয়া চাই। হাজার হ'ক্ আমরা ৫ দেশ এ দেশের মালিক, দলের বাহিরে তো মেশা যায় না।

ডে। অবিশ্যি। আর, আমাদের ভেতর যাই থাক্, যখন বাইরের সঙ্গে কথা তখন আমাদের এই ক'জনেই একদল—একজাত। নইলে, (স-ডে-কে দেখাইয়া) ওঁকে যে উঠোনে খেতে দিত। হাকিম জাত, এখন পারে কে?

স-রে। (খেলিতে খেলিতে তাসের প্রতি) যাক্, এ গোলামটা তো উঠে গেল! বাঁচ্‌লেম!

(ডাক্তারের প্রবেশ)

ডে। Hallo, Doctor, so late?

ডা। আরে দাদা সেই ধরণী চরণের পাল্লায় পড়েছিলাম।

ডে। ধরণী চরণ! intolerable gos-ling কেবল বাজে কথা। তবে আমরা কেবল snubbing দিই, সুবিধে কর্ত্তে পারে না। Approach করে এই তার audacity.

ডা। তা তোমরা হাকিম। আমি ডাক্তার মানুষ লোকের সঙ্গে পট্ রাখ্‌তে হয়, তোমাদের মত দাঁত খিচুতে তো আর পারিনে। কাজেই সরবার সুবিধে কর্ত্তে না পাল্লেই কাণ ফেলে শুনতে হয়। বলে কিনা School টা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, হাকিম বাবুরা কমিটির কর্ত্তা, আমি বল্‌তে গেলে তাড়িয়ে দেন, আপনি তাদের বন্ধু—অনুগ্রহ ক'রে—

মু। আঃ! আবার সেই কথা? যত বাজে কথা আর বাজে কাজ!

স-রে। (খেলিতে খেলিতে) তার চেয়ে এই আমার মত মুখ বুঁজে তুলোপেঁজ না বাবা যে একটা কাজের মত কাজ হবে।

ডা। যা বলেছ। কিন্তু কই দাদা, হাঁপিয়ে এসে পড়লুম, ব্যাপার কি? মাল কোথায়? মাণিক কোথায়, আমাদের মা-ণি-ক?

মু। সবুর ভায়া সবুর। কলকেতা থেকে বাক্স বোঝাই মাল এয়েছে, ভয় কি? তবে সেটা এখন নয়, পরে।

ডা। কেন?

মু। আজ আমাদের খাওয়ার মালিক host নন স্বয়ং hostess—অর্থাৎ কিনা হাজিফ্—অর্থাৎ কিনা গৃহিণী নিজে।

ডা। A rare luck!

মু। তিনি নিজে পছন্দ ক'রে খাবার তৈরি করাচ্ছেন। এবং আদেশ এই, অন্দরের বারান্দায় গিয়ে খেতে হবে, যাতে তিনি সেটা আড়াল থেকে দেখবার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। কাজেই আগে drink টা না করাই ভাল, কি জানি?

ডা। কিন্তু হ'লে ভাল হ'ত হে—ওটা হচ্ছে first class appetiser তা জানো ত'?

মু। আরে দাদা Hunger is the best sauce.

ডা। তা বটেই তো। বেশ, বেশ তা', এখন দেরি কি?

ডে। বোধ হয় হয়ে গেছে, যাই, আমি একবার নিজেই দেখে আসি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অন্দর

[ডেপুটী গৃহিণী—একখানি কাগজ হস্তে পাঠ।]

ডে-গৃ। ঠিক হয়েছে—(দূরে চাহিয়া) এই যে ভাবৃছিলুম ডাকৃতে পাঠাই—তা ভালই হয়েছে।

(ডেপুটীর প্রবেশ)

ডে। হ্যাঁ গা, আর কত দেরী? রাত দশটা যে বেজে গেল।

গৃ। দশটা বেজে গেছে? ঠিক জান?

ডে। হাঁ, সে নিশ্চয়—সে তো অনেকক্ষণ বেজেছে।

গৃ। তবে এই কাগজখানা দেখ। জোরে পড়, আমি শুনৃব।

(ডেপুটীর পত্র পাঠ)

দারোগা বাবু!

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি এখানে মাঝে মাঝে রাত্রি ৯টার পর বে-আইনী ভাবে মদ বিক্রয় হয়। বিশেষ আজ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কনেষ্টবলদের বিশ্বাস নাই। আপনি নিজে তাহার খবরদারি করিবেন। যদি অন্যথা হয়, আমি উপরে report করিব। ইতি

ডেপুটীর গৃহিণী।

(ডেপুটী গৃহিনীর পত্র গ্রহণ)

ডে। এর অর্থ কি? তুমি এ লিখ্‌তে গেলে যে? আজ চুরি ক'রে মদ কিনতে যাবে! তুমি কি করে জানলে? কে কিনতে যাবে?

গৃ। কেন? তোমার লোক।

ডে। আমার লোক? কেন?

গৃ। কারণ কলকেতার সে পোষাকের বাক্সের জিনিষ পত্র সব যে আমার গহনার সিন্দুকে বন্ধ। এমন ফুর্ত্তিটা কি মাটী হতে দিতে? একটু চেষ্টাও কর্ত্তে না? কিন্তু এখন দেখ্‌লে তো। সাবধান! নইলে আমি এই চিঠি দারোগার কাছে নিশ্চয় পাঠাব।

(প্রস্থানোদ্যম)

(ফিরিয়া) হাঁ খাবার হয়েছে, আমি সাজাতে চল্লুম। তুমি বাহিরে যাও, খবর পেলে সঙ্গে করে এনো। ওঁরা

এসেছেন, বেশ—খেয়ে দেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত যে যার বাড়ী চ'লে যান। বুঝলে?

(প্রস্থান)

ডে। অ্যাঃ। সব মাটী। ছি ছি, এখন বলি কি? এমন মাগ্ও হয়! ইস্, এত বড় শত্তুর! দূর হোক্ ছাই, ফূর্ত্তির জন্যে একটা দোস্‌রা বাড়ী নিতে হ'চ্ছে, নইলে আর চলেনা। ছেলে নাই পুলে নাই, কি করব টাকা? কে খাবে? ফূর্ত্তি করব না? দেদার কর্ব্ব। দুহাতে উড়াব। তোফা বাগানবাড়ী ভাড়া নেব। তোফা বাইজী আন্‌ব, তোফা! তোফা!! তুমি আমার কি করতে পার, সে তখন দেখা যাবে। বাঁধা মাইনে গুণে নাও, ট্রাভেলিং আছে। T.A. র খবর তো পাচ্ছ না। বাড়ীতে হ'লে অল্প খরচে হ'চ্ছিল, বুদ্ধির দোষে বুঝলে না। তেমনি ভোগ। আমার কি? ছেলে পুলে নেই যে ভবিষ্যৎ ভাব্‌তে হ'বে। নিজের ওপর বাণিজ্য ক'রে টাকা বাঁচিয়ে যখের ধন বাঁচিয়ে যাব, কি গরজ? ফূর্ত্তি! দেদার ফূর্ত্তি—একবারে উধাও হ'য়ে যাওয়া চাই—বস্। এই হপ্তার ভেতরেই বাড়ী নেব—যেখানে মেলে—মাণ্কে!—

(মাণিকের প্রবেশ)

মা। হুজুর!

ডে। বেটা গাধা, সাম্‌লে রাখ্‌তে পারিস্ নি?

মা। কি হুজুর?

ডে। (খিঁচাইয়া) কি হুজুর! বেটা হারামজাদা, বাক্সকে বাক্স পার হয়ে গেল!

মা। এঁজ্ঞে!

ডে। (খিঁচাইয়া) এজ্ঞে। বেটা ও ধারে বুঝি গ'ড়্ দিয়েছিস্ রোস্। তোকে দূর আগে করতে হ'বে।

(প্রস্থান)

মা। অ্যাঁ বাক্সপার! এ আরদালীর কাজ, গিন্নির হুকুমে চুপ্ ক'রে সরিয়েছে। হায় হায় হায়।

(নূতন ঝির প্রবেশ)

গীত।

এখন মাগ্‌কে কর্‌বি কি?
এখন মাগ্‌কে কর্‌বি কি?
(এ যে) রাম রাবণে লড়াই বেধে প্রাণটা খোয়ালি।

নূ-ঝি। কেমন ফল্‌লো কিনা আজ?

মা। যাও যাও, ও ভিরকুটিতে নেই কোন আর কাজ,

নূ-ঝি। ও—আরও খোয়ার চাই বুঝি, তাই গুমর ছোটেনি?

মা। (ক'রে) চপ্-কাট্‌লেট্, পোলাও কারি পার।
(শুধু) পান খেয়ে কি মুখশুদ্ধি তার?'

নূ-ঝি। হুঁ——উ——উ?

মা। চাই শেরী শ্যাম্পেন——

নূ-ঝি। কেন, নর্দ্দমা' ড্রেণ, মুখভরা মাছি?
যেমন উনুনমুখো দেব্‌তা, তেমনি ঘুটো নৈবিদ্যি।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্দরের কামরা

[ডেপুটী কাগজ সহি করিতেছেন]

ডে। (শেষ করিয়া) আঃ বাঁচা গেল। আড্ডায় বেরুব, তা নয় কতকগুলো কাগজ সহি কর্ত্তে এনে হাজির। বাগান বাড়ীর দিকে মন টান্‌ছে, তা বোঝেনা—আফিসের গাড়ী দাঁড় ক'রে রেখেছি—আরদালী!

[কৃপারামের প্রবেশ]

কৃ। হুজুর!

ডে। হুয়া, লে যাও। (কাগজগুলি প্রদান)

[ডেপুটী বাবু চাদর,ছড়ি লইতেছেন, এমন সময় পথে দ্বিতীয় মুনসেফ্ হাঁকিলেন]

দেবীবাবু, এখনো বাড়ীতে ব'সে?

ডে। হাঁ, এই যে যাই। (প্রস্থানোদ্যত)

[কুল হস্তে গৃহিণীর প্রবেশ]

ভিতর হইতে দুয়ার বন্ধ করিয়া কুলুপ দিয়া, চাবি জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিলেন। হাঁকিলেন—

"নূতন ঝি!"

(নেপথ্যে—"যাই গিন্নি মা!")

ডে-স্ত্রী। (জানালা দিয়া চাহিয়া) এই যে—যা, ঐ চাবিটে বড়মোন্‌সোব্ বাবুর স্ত্রীর কাছে রেখে আয়। রাত্তির আটটার পর তাঁর বেড়াতে আসবার কথা আছে,

তখন এটা আনতে বলিস্। [এই বলিয়াই উল কার্পেট লইয়া ডেপুটী বাবুর জুতা বুনিতে লাগিলেন।]

ডে। (সক্রোধে ও সগর্জ্জনে) ব্যাপার কি?

[গৃহিনী নিরুত্তর ও নিরুদ্বেগে পূর্ব্ববৎ]

ডে। বটে!—(খিঁচাইয়া) আবার বালাই নেই! চুত্তোরি, কিছু কি বলতে দিয়েচে——

(অশান্ত ভাবে পদক্ষেপে)

ব'য়ে গেল—সব চুলোয় যাক্ (চেয়ার পদাঘাতে উল্টাইয়া দেওন)—চুলোয় যাক্ (জিনিষ পত্র ছড়াইয়া ফেলন)—চুলোয় যাক্ (আল্‌না ভূমিসাৎ করণ)

[পুনরায় পদক্ষেপ। সহসা পথের দিকে চাহিয়া] নন্দ বাবু ও নন্দ বাবু, কই, দেখ্‌ছি না তো। কতক্ষণ আর পথে দাঁড়িয়ে থাকবে? চ'লে গেছে।

(বসিয়া পড়িলেন)

[সহসা উঠিয়া বাম করতলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া সচীৎকারে] কার হুকুমে মুন্‌সেফ বাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি পাঠালে?

ডে-স্ত্রী। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া শান্ত স্বরে) মাতলামি ক'র না—

ডে। (ঘুঁসি পাকাইয়া সহুঙ্কারে) তোমার বড় বাড় হ'য়েছে, যা' খুসী তাই করছ—জান, তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেল্‌ব, রক্তারক্তি কর্‌ব, খুন করব!

ডে-স্ত্রী। (কার্পেট ফেলিয়া ক্রোড় হইতে রুল লইয়া ধীরভাবে) যা পার কর; কিন্তু, মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি। আমি তোমার মাথাও ভাঙ্গবনা, রক্তারক্তিও কর্‌ব না, খুনও কর্‌ব না; কিন্তু এই রুল ছুঁড়ে তোমার পায়ের গোঁছে এম্‌নি মার্‌ব যে পনর দিন যেন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে না পার। তারপর ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে খবর দেব যে আমার স্বামী মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছিল বলে আমি নিজেই তার পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী ক'রে রেখেছি, এতে আদালতের কাজের ক্ষতির জন্ত মাতাল ডেপুটীর যা' দণ্ড হওয়া উচিত হোক্—আর, আমরাও হয় হোক্।

[পুনরায় সেলাই লইলেন। হতবুদ্ধি ডেপুটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন]

[নূতন ঝি'র প্রবেশ ও গীত]

মিছে কারো দোষ ধ'রনা, ঠাঁই হিসাবে দুই-ই ভাল।
চোখ্ জুড়ান প্রদীপটি কেউ, কেউ ঝাঁকান বিজলী আলো।
কেউ—ঠাণ্ডা, তরল মিছ্‌রি পানা,
কেউ—গরমা গরম ঘুংনি দানা,
আবার—হয়ত একটু নুন চড়া তার, হয়ত আবার দিব্য ঝাল ও।
আবার—বকুল বলে লুটিয়ে পড়—
কিন্তু—গোলাপ একটু বোঁটা দড়—
আছে—গন্ধ, মধু, রূপের ঘটা,—কাঁটাই শুধু নয় ধারাল।

[কৃপারামের প্রবেশ]

কৃ। নৌতুন—ঝি!

ঝি। (লজ্জিত হইয়া) কে, আরদালী? কি খবর?

কৃ। মাঈজীকে বোলিয়ে দেও—বাবু বোলিয়েসেন কি আজ্ রাত্‌কো বাহার মে রহ্‌বেন, ঘরমে আইবেন না।

ঝি। বাবু কোথায়?

কৃ। তিনি কচ্‌হরিসে সিধা বাগান বাড়ীমে গেইয়েসেন। হামি ভি কোচ্ বাকস্ পর ছিলো। গাড়ী ঘুরিয়ে এইয়েসে। হামার উপর খবর দেনে কা, আউর মালিক কো ভেজনে কা হুকুম আসে। তুমি মাঈজীকে বোলিও, হামি যাই!

(প্রস্থান)

ঝি। নাঃ. ভদ্দর লোকগুলো বড় বেয়াড়া বাপু। আমাদের চাষা ভুযোর ঘরে এত নয়। তাদের হায়া লজ্জা আছে। এত হ'য়ে গেল, তবু আক্কেল হ'ল না। যাই মাকে বলি গে।

(প্রস্থান)

ডে-স্ত্রী। গাড়ী ফিরে এল যেন বোধ হ'ল। ব্যাপার কি? কই, তাঁকে তো দেখ্‌ছিনে আজ তো আবার সেই পোড়া শনিবার!—(দীর্ঘশ্বাস)

(নূতন-ঝি'র প্রবেশ)

নূ-ঝি। মা ঠাকরুণ, বাবু খবর পাঠিয়েছেন, আজ আর আসবেন না। গাড়ী বরাবর বাগান বাড়ী গেছ্‌ল। বাবুকে পৌছে ফিরে এল।

ডে-স্ত্রী। হুঁ। (চিন্তা।—সহসা উঠিয়া) শীগ্‌গির যা, কোচ্‌ম্যান্‌কে ঘোড়া খুল্‌তে বারণ কর। গাড়ী নিয়ে এখুনি বাবুকে আন্‌তে যাক্‌। বলে যেন যে গিন্নীমার বড্ড কলিক ব্যাথা ধরেছে। তাতেও না আসেন, তখনি ফিরে আস্‌বে। যা বল্‌গে।

নূ-ঝি। কিন্তু, কি জানি মা ঠাক্‌রুণ, তিনি কি আস্‌বেন?

ডে-স্ত্রী। না আসেন ঐ গাড়ীতে আমিই বাগানবাড়ী যাব।

নূ-ঝি। ওমা, কি ঘেন্নার কথা! ছি! মাঠাক্‌রুণ।

ডে-স্ত্রী। বকিস্‌নে, যা, বলে আয়।

(ঝির প্রস্থান)

ডে-স্ত্রী। 'ছি' আবার কি? মাথায় কেউ পুকুর খুঁড়্‌লে কি ভিজে বেড়াল সেজে থাকা যায়? তিনি সম্মান খুইয়ে ইতর আমোদ কর্‌ছেন; আমি কার সম্মানের ভয়ে কোণে বসে থাক্‌ব? মাতালের স্ত্রীকে মাতাল স্বামীর যুগ্যি দজ্জাল তো হ'তেই হ'বে, নইলে আর সহধর্ম্মিনী পদটা সার্থক হয় কি ক'রে? একেবারে একাত্মা না হ'লে সংসারে-ধর্ম্মই বা টিক্‌বে কেন?

(শুষ্ক হাসি)

(নূতন-ঝি'র প্রবেশ)

ব'লে এয়েছিস্। বেশ।—হ্যাঁ, শাখ্‌, আর একবার যা। দারোয়ানকে একবার ডেকে আন্।

(নূতন-ঝি'র পুনঃ প্রস্থান)

বোধহয় যেতেই হ'বে। আগেই সব ঠিক্ ক'রে রাখি, যেন গাড়ী ফির্‌লে একটুও দেরী না করতে হয়। দেখি কতদূর দৌড়। সহজে ছাড়্‌ছিনে। ভেবেছ ঘর সাজাতে, আর খেয়ালমত খেলা করতে একটা পুতুল এনেছ। যেমন লোকে আনে—আর 'পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনতে পায় না; কাজেই তাদের ভয় নেই। কিন্তু তোমার সমূহ আছে। আমি পুত্তলিকা নই। এত দিনে সেটুকু টের পাওয়া উচিৎ ছিল।

(দারোয়ানের প্রবেশ)

ডে-স্ত্রী। দারোয়ান জী!

দা। ক্যা হুকুম, দিদিমণি।

ডে-স্ত্রী। তুমি আমার বাপের বাড়ীর পুরাণ আমলের বিশ্বাসী লোক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।

দা। কাঁহা দিদিমণি। আলবৎ যায়েগা, কাহে নেই।

ডে-স্ত্রী। আমি বাবুকে আন্‌তে বাগান বাড়ী যাব।

দা। (মাথা চাপড়াইয়া) হায়রে বাপ্! দিদিমণি, এ কা বোলে হো? জামাই বাবু আজ হামকো মার ডালে গা। মৎ যাও, দিদিমণি।

ডে স্ত্রী। দরকার হ'লে আলবৎ যাব। তৈয়ার হও। আমার হুকুম।

দা! (দুঃখিত ভাবে) তব্ যানেহি পড়ে গা।

ডে-স্ত্রী। বেশ, যাও, কৃপারামকে শুদ্ধ ব'ল গে। তাকেও যেতে হ'বে। দু'জনে দু'খানা লাঠি বাগিয়ে ছাদে আর কোচবাক্সে বস্‌বে। যাও, তৈয়ার থাক।

দা। মগর জামাই বাবুকো হাম মু'দেখানে নেই সেকেঙ্গে—

ডে-স্ত্রী। না পার নেই নেই, বাগানে ঢুকে গাড়ীর কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকো।

[মাথা চুল্‌কাইতে চুলকাইতে দ্বারবানের প্রস্থান। নূতন-ঝির প্রবেশ]

নূ-ঝি। মা-ঠাকরুণ, গাড়ী ফিরে এল। বাবু ব'লে পাঠিয়েছেন—তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না। এসেই বা কি কর্‌বেন? অসুখ ক'রেছে, ডাক্তার এনে ব্যবস্থা করতে হ'বে। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাগান বাড়ীতে; তাই, গিরীন বাবুকে ডেকে দেখাতে ব'লেছেন।

ডে-স্ত্রী। হুঁ, তাহ'লে যেতেই হ'ল। নূতন-ঝি, চল্, তুই-ও যাবি।

নূ ঝি। যাব বৈ কি মা-ঠাক্‌রুণ। তুমিই যখন যাচ্ছ, তখন যেতেই হ'বে, চল। দোহাই মা কালী, কুল দিস্‌মা।

(উভয়ের প্রস্থান)

[বাগান বাড়ীর দ্বারবানের কক্ষ সম্মুখ]

(নূতন-ঝির প্রবেশ)

নূ-ঝি। বাগান বাড়ীর দারোয়ানের মুখে বাবু এতক্ষণ খবর পেয়েছেন যে গিন্নীমার অসুখ দেখে জরুরি কথা বল্‌বার জন্য ডাক্তার নিজেই এসেছেন। এ ডাক্তার বাবু বাবুদের দলের লোক নন; কাজেই ও মজ্‌লিশে নিশ্চয়ই ডাক্‌বেন না—বাবু নিজেই বেরিয়ে আস্‌বেন। ধন্যি মার বুদ্ধি! ঐ যে আস্‌চেন। যাই, লুকোই গে।

(অন্তরালে স্থিতি)

[বাবুর প্রবেশ। বিপরীত দিকে গিয়া—]

ডে। Good evening, Doctor, Hallo! আরে, এদিকে'দ্বার' বন্ধ কেন ?

[দ্বার খুলিবার মত হস্ত সঞ্চালন ও দৃষ্টি নিক্ষেপ]

এ কি!——

[গিন্নির একখানি হস্ত বাহির হইয়া বাবুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ ও বাবুর হুমড়ি খাওয়ার ভাব]

ডে। কি সাহস! কি সাহস! মেয়ে মানুষের এত সাহস, ওঃ, অবাক্ করলে।

[গিন্নির গাড়ী হইতে নামিয়া প্রবেশ]

ডে-স্ত্রী। (আদরের সুরে) গাড়ীতে ওঠো, বাড়ী যে'তে হবে।

ডে। (আকুল হইয়া) কি সর্ব্বনাশ! বাগানে মুন্‌সেফ, ডেপুটীরা সব এসেচেন—একি কেলেঙ্কারী করতে এলে, আমার জ্যান্ত মুখটা পুড়িয়ে দেবে ?

ডে-স্ত্রী। (গম্ভীর ভাবে) আগুন জেলেছ, বাতাস দিয়েছ নিজে মুখ বাড়িয়েছ, তা' না হ'লে আমার ক্ষমতায় কি এত কুলোয় ? এখন ভাল চাও তো বাড়ী চল—

ডে। (কাচু মাচু করিয়া) ভদ্রলোকেরা সবাই রয়েছেন, কি বল্‌ব ওঁদের কাছে ? দোহাই তোমার, বাড়ী ফিরে যাও-

ডে-স্ত্রী। (দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া) মাতলামি কর্‌বার লোভে যাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা, তারা তো খুব ভদ্দর! তুমি যাদের কান্না রাখ। ওঠো বল্‌ছি গাড়ীতে——

ডে (মরিয়া হইয়া) আমি যেতে পার্‌ব না।

ডে-স্ত্রী। যেতে পার্‌বে না ? বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি—— (প্রস্থানোদ্যম)

ডে। (ব্যস্ত হইয়া) হাঁ হাঁ কর কি ? কর কি ? পাগল হ'লে নাকি ?

ডে-স্ত্রী। মাতালের স্ত্রীর পক্ষে পাগল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। (হাঁকিয়া) দারোয়নজী! আরদালী!

[উভয়ে সেলাম করিয়া দাড়াইল]

উ। হুজুর!

ডে-স্ত্রী। তোমরা বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, হুঁসিয়ার হ'য়ে ইজ্জত বাঁচিয়ে চ'লো। হুকুম দিয়ে রাখছি যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদ লাঠি চালিও। তারপর মামলা বাজীর ঠেলা সামলাবে তোমাদের ঐ ডেপুটী মনীব। ব'লে রাখছি, লাট্ সাহেবের নাতিই হোক্, নাৎজামাই-ই হোক্, কারুর খাতির ক'রো না—চল ঐ নাচের মজলিশে—

ডে। (সভয়ে) রক্ষা কর, রক্ষা কর—আমার ঝকমারি হ'য়েছে। পাঁচ মিনিট সময় দাও, ওঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে আসি।

ডে-স্ত্রী। আচ্ছা যাও। কিন্তু কথা রইল, যাবে আর ফিরবে, নইলে আমি গিয়ে হাজির হ'ব, মনে থাকে যেন।

[ডেপুটীর প্রস্থান]

(রিষ্ট ওয়াচের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) পাঁচমিনিট কেন ? দশ মিনিট দেখ্‌ব। তার মধ্যে না ফের, আমিও, ঝি, দারোয়ান, আরদালি নিয়ে বরাবর ঐ নাচের মজ্‌লিশে গিয়ে উঠ্‌ব। এ নিশ্চয়।

(নূতন-ঝির প্রবেশ)

নূ-ঝি। মা-ঠাক্‌রুণ, বাবু সত্যি আস্‌বেন গো। আমি ওঁর সঙ্গে গাড়ীতে যেতে পার্‌ব না বাপু। চাষার মেয়ে, এটুকু দিব্যি হেঁটেই যাব।

ডে-স্ত্রী আচ্ছা, আরদালী থাক্, তোর সঙ্গে যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

[ডেপুটীর পুনঃ প্রবেশ]

ডে। নাঃ, চরম! আর চল্‌লো না। বাপ্! এ সব ছাড়্‌তেই হ'ল।

[গাড়ীতে আরোহণ, নূতন-ঝির অন্তরাল হইতে আবির্ভাব]

নূ-ঝি। বাবা, কেমন? এ নইলে কি হয়?

যেমন বুনো ওল,
তেমি বাঘা তেঁতুল।—

(গীত)

সাধু সাবধান!
যেমন কর্ম্ম তেমনি হ'বে,
কার বা কবে পরিত্রাণ?

এ, বাংলা দেশের কাংলা মেয়ে
ভয়ে ভয়ে চেয়েছিল মুখ,
আর, হেলা ফেলা পায়ে ঠেলা
তার হু'বেলা সয়েছিল বুক,
কিন্তু ধর্ম্মে অত সইল না—তাই
উঠ্‌ল রুখে নারীর প্রাণ।
(এখন) রান্না, বান্না, লুকিয়ে কান্না
নয়কো নারীর ইহ-পরকাল,
(এখন) ঢেল্ মার পাট্‌কেল খাবে ধন,
হবে নাজেহাল,
এখন বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল—
দেখ্‌বে সমানে সমান।

যবনিকা পতন।

অনুরোধ

জীবন তরুর ফোটা ফুলগুলি নিঃশেষে লও তুলি
শুধু কাঁটাগুলি থাক্,
মোর পানে আর কেহ চাহিবে না মুগ্ধ নয়ন তুলি,
ফুলফোটা ঘুচে যাক্।
কেন কাঁপে হাত, নয়নে তোমার কেনগো জড়িত লাজ,
ফুটেছে যে ফুল এই বহুলাভ—ফুলে মোর নাহি কাজ,

তুমি গাঁথি মালা পর গলে আজ, আমি দেখি চেয়ে,—
সার্থক হোক্ ফুল,
জীবন প্রভাতে উঠেছে ফুটিয়া আমার মরম ছেয়ে,
হয়নিকো কিছু ভুল।
যশের প্রসূনে উগ্র গন্ধ, উজ্জল বরণ তার;
তুমি লও তুলি—অপবাদ কাঁটা থাক্ ঘিরি চারিধার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাঙ্গালায় বসন্ত

দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতাবাসী হইয়াও, বাঙ্গালায় যে বসন্ত আসিয়াছে, তাহা শীত অন্ত হইবার পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলাম। কেবল আমি কেন কলিকাতার অনেকেই দেহে ও মনে, সোজা কথায় হাড়ে হাড়ে এই ভীতিপ্রদ বসন্তের প্রাচুর্য্য ও প্রভাব অনুভব করিয়াছেন—এখনও করিতেছেন। সত্বরে সংবাদপত্রের স্তম্ভে ক্রমবর্দ্ধমান মৃত্যু-তালিকাটী দেখিলেই মনে হয়, বসন্ত বেশ জাঁকিয়া আসিয়াছে। বৎসরে একবার করিয়া বসন্ত আসিবেই প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধান!

প্রকৃতির শ্যামলতা, কোমলতা স্বাভাবিক বন্য-বর্ব্বরতা বিনষ্ট করিয়া সভ্যরকমে ইট্ পাথর দিয়া আমরা সহর গড়িয়াছি! সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যের উপর চুনকাম করিয়া আমরা খাসা আছি। তাই এই সভ্যতার কেন্দ্রে, বসন্তও সভ্যরকমে আসে। প্রকৃতির শ্যামল দেহখানি না পাইয়া, সহরবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বাহির হয়। টিকাদিয়া তাতে ভিজা নেক্ড়া জড়াইয়া নিরামিষাহারী হইয়া উদ্বেগে, শঙ্কায় একরকমে দিন কাটিতেছে, আজ ইহার গায়ে বসন্ত দেখা দিল, কাল উহার জ্বর হইল, কি জানি কি হয়, ইত্যাদি শঙ্কাজনক সংবাদের বিরাম নাই—কর্পোরেশনের বেষ্টনী গলায় পরিয়া সহরের কঠিন জঠরে আবদ্ধ আমরা এইরূপে বসন্ত অনুভব করিতেছিলাম। অতএব বোঝা গেল বাঙ্গালায়, বসন্ত পূর্ণ আয়োজন লইয়াই আসিয়াছে। এই গেল বসন্তের একদিক।

কলিকাতা সহর বাঙ্গালাদেশ নয় কলিকাতার বাহিরে সেই সোণার বাঙ্গালার শ্যামলদেহেও যে একটা বসন্ত আসিয়াছে, সহরের বসন্তের তাড়নায় তাহা ভাবিবার অবসর পাই নাই। একদিন অপরাহ্নে একখানি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার আফিসে সহকারী সম্পাদক বা আমার বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। আমাকে দেখিবা মাত্র বন্ধুবর উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই যে তুমি এসেছো? তা ভালই হয়েছে, বসো।" হাস্যমুখে আসন গ্রহণ করিলাম। বন্ধু লাল ফিতা দিয়া বাঁধা একতাড়া কাগজ আমার সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া অম্লান বদনে বলিলেন, "ভাই, একটু ব্যাগার দাও না! এই কবিতাগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটী কবিতা ফাল্গুন সংখ্যার জন্য বেছে দাও, তুমি তো কবিতা পড়্‌তে ভালবাসো কাজটা নেহাৎ আলুনী লাগ্‌বে না বোধ হয়?"

অপ্রতিবাদে তাড়াটী কোলের কাছে টানিয়া লইলাম। একঘণ্টার মধ্যে শতাধিক কবিতা পাঠ করিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

হাঁ, সহরের বাহিরে আর এক রকম বসন্ত আসিয়াছে। বাঙ্গালার দিগ্বিদিক্ হইতে পরিচিত অপরিচিত, খ্যাত ও অখ্যাত, কিশোর, যুবক ও প্রৌঢ় কবিগণ এই বসন্তের ইতিহাস নানা ছন্দে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। কত কোকিলের ডাক শুনিয়া কত হিয়া দুরু দুরু, প্রাণ উড়্ উড়্, ফাল্গুনের উতালা হাওয়ায় কত মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কত "ঘন" ও "নিবিড়" আলিঙ্গনের লজ্জা-হীন অকুণ্ঠ আকুলতা, কত "তরল" চুম্বন প্রয়াসে ইথার বাসিনী প্রিয়ার প্রতি "মৌন মিনতি"! আবার কেহবা বসন্তের রসে মশগুল হইয়া, প্রাণকে আঙুর ভ্রমে কবিতার যন্ত্রযোগে নিঙাড়িয়া রক্তরঞ্জিত প্রেমরস বাহির করিবার মৌলিক প্রণালী আবিষ্কার করিবার সঙ্গে সঙ্গে আশা দিতেছেন, ঐ রসটুকু নাকি জীবন পাত্রে ভরিয়া প্রিয়ার গোলাপী অধরে ঠেকাইলেই, একেবারে বাজীমাৎ। কোন কোন কবি, প্রিয়া ও বসন্তের যুগপৎ আক্রমণে পক্ষাঘাত গ্রস্ত হইয়াছেন,—কারণ তিনি যে দিকেই চাহেন, চোখ ফিরাইতে পারেন না, চরণ চলে না, হৃদয় স্তম্ভিত! কোন কবি বসন্তের পুষ্প-পুলকিত বনপথে আনমনে চলিতে চলিতেও যেন কাহার সম্মুখে পড়িয়া গিয়াছেন, সে যে কে তাহা বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র কি জানি কি ভাবে

কবির কোমল হৃদয়ে ফরাসী-বিপ্লব সুরু হইল। আর সঙ্গে সঙ্গে, সর্ব্বাঙ্গ বাঁচাইতে বাঁচাইতেও অজ্ঞাতসারে "আঁখি-পরে আঁখির মরণ" ঘটিয়া গেল—এই তথ্যটুকু নানারকমের বানান ভুল, ছন্দপতন ও অশ্রাব্য শব্দে গ্রথিত করিয়া বড় আশায় কবি দুই পয়সার টিকিট সহ পাঠাইয়াছেন, হয় সুবিখ্যাত পত্রিকার এককোণে স্থান দান, নয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফেরৎ দিয়া বাধিত করণ। এই রকম একঘেঁয়ে মামুলী কবিতার রাশি মন্থন করিয়া কেবল এই তথ্যটুকু পাইলাম যে সত্য সত্যই বাঙ্গালায় বসন্ত আসিয়াছে।

* * * *

বসন্ত-বিকার-গ্রস্ত কবিগণের প্রলাপ বিলাপ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনার রেশ মস্তিষ্ক উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। নিদ্রা যাইবার ব্যর্থচেষ্টা করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শয্যাপরি উঠিয়া বসিলাম। জানালা দিয়া তো কিছু দেখা যায় না,—কেবল সেই কঠিন চিরন্তন জীর্ণ প্রাচীর! বিরক্তি-বিকৃত-চিত্তে ছাদে উঠিয়া পাদচারণা করিতে লাগিলাম। বাঙ্গালায় বসন্ত আসিয়াছে,—"ভাববার কথা" বটে!

একটা অস্পষ্ট পাতলা বাষ্পাবরণ মুড়ী দিয়া নিস্তব্ধ নগরী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অদূরে একটা অপরিচিত গাছ থাকিয়া থাকিয়া তন্দ্রায় ঢুলিতেছে। তরঙ্গায়িত অগণিত প্রাসাদ-শিখর গুলি স্তিমিতপ্রায় চন্দ্রালোকে স্তম্ভিতবৎ দণ্ডায়মান। সে তরুর মর্ম্মর, ফুলের গন্ধ, কিছুই নাই। কোথায় মলয় হাওয়া—মাঝে মাঝে শুধু দমকা বাতাস হা হা করিয়া উঠিতেছে! শুব্ধ রজনীর এই পরিস্ফুট গাম্ভীর্য্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া, উত্তেজনা-ক্ষুব্ধ, জাগরণ-ক্লিষ্ট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার ভাবনা ভাবিতেছি! ক্ষুদ্র হইলেও আমি হয়তো তুচ্ছ নহি। তুচ্ছ নহি বলিয়াই আজ চার কোটী বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার বিরস চিত্রগুলি আমার মানস পটে ভাসিয়া উঠিতেছে।

আজ এই বাঙ্গালার বুকে বসিয়া ভাবুক কবিগণ ভ্রমরের গুন গুন, আর পাপিয়ার প্রাণ মাতানো মধুর ঝঙ্কার,—আর শুনিতেছেন কল্পিত বা বাস্তব প্রিয়ার অলঙ্কারের শিঞ্জন, নূপুরের রুণু রুণু, তরঙ্গায়িত কলহাস্ত, সোহাগ-বিগলিত প্রেমালাপ! গোপন-পথ-চারিণী সঙ্কুচিতা অভিসারিকার কম্পিত চরণের মৃদু-ধ্বনিও দূরাগত বংশীরবের মত ইঁহাদের দিব্যকর্ণে অজস্র মধু ঢালিয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নিরন্ন ক্ষুধিত বাঙ্গালীর এক মুষ্টি অন্নের জন্য, গভীর মর্ম্মতল হইতে উত্থিত সম্মিলিত হাহাকার হৃদয় স্পর্শ করা দূরে থাক, ইঁহাদের শ্রবন বিবর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে নাই। দুর্ভাগা দেশের হতভাগ্য কবিগণ, দেশের এই মহাদুর্দ্দিনে এই অনশন, অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট জাতিকে সান্ত্বনা দিবার মত একটা সুরও তোমাদের হৃদয়বীণায় বাজিয়া উঠিল না? তোমাদের না হৃদয় আছে? তবে গভীর সহবেদনার অনুভূতি কই? বসন্তে বিরহের জ্বালা অনুভব করিতেছ, ক্ষুধার জ্বালা অনুভব কর নাই? বাঙ্গালার, বিকশিত বসন্তের শ্যাম-শোভা, আলোক, বাতাস, আকাশ, ফুলবণ তোমাদের পাগল করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধিত, লাঞ্ছিত, ম্রিয়মান বাঙ্গালীর অসহায় ক্রন্দন, মিনতি, আবেদন তোমাদের হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানে, হৃদয়ের সেই মনি-সিংহাসনে যে কবিগণের ঈপ্সিতা, বা কল্পিতা "মানসী প্রতিমা" বসিয়া আছেন—একেবারে, সবখানি হিয়া জুড়িয়া! কাজেই কার কথা কে শোনে।

একটা জাতি ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। কোনমতে কঙ্কালসার অস্তিত্বের ভার বহন করিয়া তোমার প্রতিবেশিগণ মাটিতে পড়িয়া ধুঁকিতেছে। জীর্ণ শীর্ণ বালক বালিকাগুলি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ক্ষুধাকুঞ্চিত উদর উভয় হস্তে চাপিয়া চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতেছে—কে দুটী খাইতে দিবে? এই অবসরে তোমরা বসিয়া ললিত ছন্দে বসন্ত বর্ণন করিতেছ? দুরদৃষ্ট কাহার? আমরা কি বুঝিব, সোনার বাঙ্গালা শ্মশান হইয়া গিয়াছে? বাঙ্গালায় কি আর মানুষ নাই? একটা ক্ষুধিত জাতিকে ইন্দ্রিয় লালসার আকুল আবেগময় কবিতা শুনাইতে কাহারও হৃদয়ে একটু দ্বিধা আসিল না! লজ্জাও নাই!!

* * * *

বাঙ্গালায় বসন্ত আসিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালীর কি শোচনীয় দুরবস্থা! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই। কোন অদৃশ্য দুঃশাসন বঙ্গনারীর বস্ত্র ধরিয়া টান দিয়াছে। লাঞ্ছিতা

যাজ্ঞসেনীর মত আজ অসূর্য্যম্পশ্যা বঙ্গনারী অসহায় হইয়া মানব-সভার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। কে লজ্জা নিবারণ করিবে? বিবস্ত্রা নারীর মর্ম্মান্তিক হাহাকারে বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাস উষ্ণ হইয়া গিয়াছে। বিকশিত ক্ষুদ্র কুসুম পল্লবতল হইতে উত্থিত দীর্ঘশ্বাসে ঝলসিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দুর্ব্বল নির্জ্জীব পুরুষ-শক্তি আজ নীরব! না নীরব কোথায়? সে সহরে আসিয়া সভা করিয়াছে! উচ্চ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সে বাঙ্গালী বিধবার নৈশবিরহের গোপন লজ্জা চীৎকার করিয়া দশজনকে শুনায়, বাঙ্গালার বাল-বিধবা-গণের সে স্বয়ম্ভিক্ষু আম্‌মোক্তার! অবরোধ-প্রথা উঠাইয়া দিয়া সে স্ত্রী-স্বাধীনতা চায়! এই উলঙ্গ জননী কুলকে সে রাজপথোপরি টানিয়া আনিবে, নতুবা তাহার দেশোদ্ধার ব্রত উদযাপিত হইবে না! অসবর্ণ বিবাহের আইন করিয়া ইহারা নারীর দুঃখ ঘুচাইবে; ইহারা তো নিশ্চিন্তে বসিয়া নাই! ইতিহাস! অতীতের গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়া একবার সাক্ষ্য দাও, কোন কালে, কোন দেশের পুরুষ-শক্তি স্পর্দ্ধার ধৃষ্টতায় এত নির্লজ্জ হইয়াছে! যে নারীকে বস্ত্রদিতে পারে না, অন্নদিতে পারে না, ইজ্জত বাঁচাইবার ক্ষমতা যাহার নাই, সে আজ স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি লম্বা লম্বা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কথা বড় গলায় বলিয়া বেড়ায়!

পরাধীন পতিত জাতির নানাপ্রকার অধঃপতন হয় সত্য কিন্তু অধঃপতন লইয়া আস্ফালন একমাত্র বাঙ্গালা দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? বহুদিন বাঙ্গালায় মানুষ জন্মায় নাই। শক্তি সবল মনুষ্যত্বের দুর্দ্দমনীয় জীবন-লীলা, বহুদিন বাঙ্গালা দেখে নাই! এই জড়বৎ আড়ষ্ট আত্মবিস্মৃত জাতির সম্মুখে সে দিব্যাদর্শ যাহারা ফুটাইয়া তুলিবার নিঃশব্দ আয়োজনে ব্যস্ত; তাহারা কোথায়? কবে তাহারা মধ্যাহ্নের প্রখর দীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া বাঙ্গালার বুকে গৌরব-গর্ব্বে দণ্ডায়মান হইবে? এখনো কি সময় হয় নাই? হইয়াছে বই কি? বাঙ্গালায় বসন্ত আসিয়াছে।

বসন্ত আসিয়াছে—বাঙ্গালার জরাজীর্ণ জাতীয় জীবনের অভ্যন্তর হইতে নবীন তারুণ্য দুর্ব্বার বেগে বিকশিত হইয়া উঠিবার জন্য উন্মুখ। এ বসন্তের সংবাদ কয়জন রাখে, জানেই বা কয়জন? পুরাতন শমীবৃক্ষের মত এই প্রাচীন সমাজ পত্রপুষ্পশূন্য শীর্ণ শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পঙ্গুর মত স্তব্ধ। ইহার সমস্ত কদর্য্যতা ও অসামঞ্জস্য আচ্ছন্ন করিয়া আবার পেলব পল্লব রাজি-গাঢ় হরিৎ-শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিবে,—মলয় হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া নাচিবে! বাঙ্গালার এই অভিনব বসন্তের আগমনী গাহিবার জন্য কে আছ শক্তিমান কবি—ভৈরবমন্ত্রে এই বার্ত্তা ঘোষণা কর। ইহা অতীতের অনুকরণ নহে, পুরাতনের প্রত্যাবর্ত্তন নহে, ইহা বিগত-বৈভবের নিশ্চিন্ত রোমন্থনও নহে। এই কদাচার ও অনাচার-পঙ্কিল বর্ত্তমান বাঙ্গালী সমাজের বক্ষ হইতেই মৃণালদণ্ডে ভর দিয়া পদ্মের সহস্রদল বিকাশের মত এক তরুণ জাতি স্বমহিমায় প্রস্ফুটিত হইয়া সকলের ঊর্দ্ধে আপনাকে স্থাপন করিবে। প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মি-সম্পাতে দলে দলে হিরন্ময় জ্যোতি ঝলসিয়া উঠিবে! তাই না অতীতের সমস্ত পুনরুত্থানকে পরিম্লান করিয়া আজ এক বিশ্বব্যাপী জাগরণের উৎসাহোল্লাস! ইহা পঙ্গুর মত বসিয়া বসিয়া চিন্তা নয়, ইহা বলদর্পিত পদক্ষেপে অগ্রগমন, ইহা বৈরাগ্যের ভান করিয়া অক্ষমের স্তব্ধ জড়ত্ব নয়, ইহা লালসালুব্ধ লম্পটের জঘন্য বিলাসের কুৎসিত আড়ম্বর নয়, ইহা শক্তিমান পুরুষসিংহের প্রবল কর্ম্মশীলতার মধ্যদিয়া ভোগৈশ্বর্য্যের পর্য্যাপ্ত আয়োজন!

বাঙ্গালার দীর্ঘ হিমরজনী অবসানে আজ বসন্ত-প্রভাতের প্রথম অরুণোৎসব। বহুদিনের নিবিড় নিস্তব্ধতা কম্পিত করিয়া আজ প্রভাত-বিহঙ্গের পুলক-অধীর কাকলী-ধ্বনি জাগিয়া উঠিয়াছে। নূতন গন্ধে, নূতনরূপে ভরপুর হইয়া কত বিচিত্র কুসুম স্নিগ্ধ সূর্য্যকরে ঝলমল করিতেছে। বাঙ্গালার তরুণ-জাতির প্রাণে যে নবযৌবন সাড়া দিয়াছে, তাহা লালসার মদির চাঞ্চল্যে ভোগবঞ্চিত দুর্ব্বলের উচ্ছ্বসিত বিলাসের মধ্যে ধরা দিবে না, তাহার বলদর্পিত জাগরণ,—প্রবল যৌবনের প্রচণ্ড দুরাকাঙ্ক্ষায়, ধৈর্য্য-কঠিন বক্ষের স্তরে স্তরে নবজীবন বিকাশের গভীর আনন্দে!

বাঙ্গালার বসন্ত আসিয়াছে। তাই তো স্তব্ধ প্রভাতে একাকী দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে দেখিতেছি, অতীতের অন্ধকার যবনিকা খানি সমুৎসারিত করিয়া এক নবীন আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দের আলোক-প্লাবনের মধ্যে বাঙ্গালা আবার জাগিয়া উঠিবে—বুঝিবা উঠিয়াছে। বাঙ্গালার এই গৌরবময় বসন্ত প্রভাতের প্রাণ মাতানো পরিপূর্ণ সৌরভ মৃদু-মন্দ-মলয় দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। কে ভীরু দুর্ব্বল কাপুরুষ, বাঙ্গালার এই প্রভাত-পুলকিত কুঞ্জবনে বসিয়া বসন্ত-বিলাপের প্রলাপ বকিতেছে?

১৫ই ফাল্গুন } শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার

শম্ভুজী

ভূপতি শম্ভুজীর
জয়গানে আজ উঠিল ধ্বনিয়া মারাঠা নগর তীর।
রাজারাম ভ্রাতা বন্দী বিমাতা সয়েরাবাঈএর সনে
সহায়ীবাঈ এর পুত্র বিজয়ী হয়েছে বিপুল রণে।
পুরবাসীগণ খুলে দেছে আজ রায়গড়দ্বার তারে
সয়েরাবাঈএর সাধের কামনা লুটিল তাহার দ্বারে।
সাহসী ভীষণ নির্ভীক অতি শম্ভুজী নরপতি
তাহারে বিমুখ করিয়া রামেরে বসাবে ছিল যে মতি
টুটিয়া যাইল শম্ভু যখন হানিল দুয়ারে কর
হীরাজি সৈন্য পশ্চাতে করি' প্রবেশিল রায়গড়।

বিচার করিতে বসিয়াছে আজ শম্ভুজী অধিরাজ
বিমাতা ভায়েরে শৃঙ্খল হাতে আনিল সভার মাঝ।
দশ বছরের ছোটভাই পরে আদেশ রহিল এই—
চিরকাল তারে বন্দী রাখিবে, মার্জ্জনা তা'র নেই।
ক্ষণকাল তরে ভাবিল না কিছু, দিল কি ভীষন সাজা,
রহিল নীরব সভাসদগণ, শম্ভু যে আজি রাজা।
পুরবাসীগণ শাস্তি শুনিয়া চাহিল পরস্পর
বিস্ময়ে তারা কহিল সভয়ে, কি নিঠুর অন্তর।
রাজার উপরও রাজা আছে যে, সে কথা নেই ত মনে
তাঁহার শাস্তি আরও ভয়ানক, জানিবে উচিত ক্ষণে।

মন্দ কহিল বন্দীর বেশে সভাতে মায়েরে আনি'
মারাঠা নিশান ওড়ে নাক আর আজ, স্তব্ধ মারাঠা রাণী।
ভীষণ আদেশ হইল প্রচার সয়েরাবাঈএর পরে,
ক্ষণে ক্ষণে তার মৃত্যু হইবে মৃত্যুও যেন ডরে।

সভাসদগণ রাজারে তুষিতে কহিল, বিচার ঠিক ;
সয়েরা কহিল উচ্চৈস্বরে, "মারাঠা জাতিরে ধিক।
"শিবাজী বিহনে মারাঠা আজিকে সাহস বীর্য্যহীন,
শিবাজী পত্নী তনয়ের কাছে তাই আজি এত দীন।
জননীর এই অপমান লাজ ধর্ম্মে কভুনা স'বে
লাঞ্ছনাভার সবটুকু রাজা মাথায় করিয়া লবে।

যাহাদের তরে মারাঠার নামে কাঁপিল দিগ্বিদিক
মৃত্যুদণ্ড লইল তাহারা একে একে নির্ভীক।
রাজকাজ ত্যজি' দিনমান লাগি' মন্দ আমোদে মত্ত
বিচার আচার শম্ভুজী ভুলি' হারায়েছে রাজসত্ব।
সেনাদল সবে শৃঙ্খলাভাবে লুণ্ঠনকাজে ব্যস্ত
মোগলের সাথে বারে বারে রণে হইতেছে বিধ্বস্ত।
পাহাড়ীয়া জাতি সামান্য "সীদী" মাথা তুলি' দেয় পীড়া
শম্ভুজী ভাবে, সকলই তাহার রঙিন ঘরের ক্রীড়া।
কত ক্লেশে গড়া শিবাজী-দুর্গ একে একে গেল ছাড়ি'
স্বদেশী, বিদেশী, মোগল, পাঠান, সকলে লইল কাড়ি'।

সঙ্গমেশ্বরে আছিল মত্ত শম্ভুজী মহারাজ
এমন সময়ে দুর্গদুয়ারে হানিল মোগল বাজ।
দূত আসি' ছুটি' সংবাদ দিল মোগল এসেছে দ্বারে,
শম্ভুজী কহে—মিথ্যা এ কথা, কখনও হতে না পারে।
কুলুষের সাথে দুর্গ ভিতরে করিল রাজারে বন্দী
ইখ্‌লাস্ খাঁ করিল পূর্ণ মোগলের অভিসন্ধি।
যত অপমান সয়েছিল মাতা রায়গড়পুর দুয়ারে
দ্বিগুণের বেগে সব অপমান আসিয়া লাগিল রাজারে।
বাদসা-আদেশে তপ্ত শলাকা করিল তাহারে অন্ধ
মোগলের হাতে মারাঠা রাজের মস্তক রল বন্ধ।

শ্রীসুশীল কুমার বাগচী

"বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্ম সমাজ"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ছাত্রজীবনে কয়েক দিনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন ; পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত পরিচিত হইবার পর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনা হইতে একদল বিবেকানন্দ-বাদী * প্রমান করিতে চান যে স্বামিজীর সাধক ও প্রচারক জীবনে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অপেক্ষা কোন "গুরুমতের পরিবর্ত্তন হয় নাই।" তাহার কারণ—

(১) বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ধর্ম্মাদর্শের সমন্বয় চাহিয়াছিলেন কিন্তু "পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয় ব্রাহ্মসমাজের Programme ছাড়া আর কোথায় ও নাই।"

(২) স্বামিজী আমেরিকার "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী." "আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন," "ডায়না দেবীর ললাটস্থ তুষার কণিকার ন্যায় নির্ম্মল" ঐ রকম এক হাজার মা জগদম্বা এই দেশে তৈরী করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিবেন। "বাতুল ভিন্ন নাকি আর সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে ইহা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই আকাঙ্ক্ষা।" অতএব এই আকাঙ্ক্ষা, বিবেকানন্দের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সক্রামিত হইয়াছিল।

(৩) জাতিভেদ পরিত্যাগ ব্রাহ্মসমাজের একটী সর্ব্ব-প্রধান সংস্কার। বিবেকানন্দ জাতিভেদকে পৈশাচিক প্রথা বলিয়া তাহার উচ্ছেদ সাধন চাহিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পুনরুত্থানবাদীরা ব্রাহ্ম সংস্কারকদিগের প্রতিবাদস্বরূপ বাঙ্গালাদেশে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। পুনরুত্থানবাদিগণ ব্রাহ্মযুগের পরে আসায় তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মযুগের আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতি গতি ও তাহার পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস (১৮২৮-১৮৭৮); অন্যপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারের মূল সুর ও সেই সঙ্গে ১৯শ শতাব্দীর প্রথম তিনভাগ, রাম-মোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের যুগের সঙ্গে শতাব্দীর চতুর্থ অংশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের পরিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবাদ কি প্রতিধ্বনি।

অনেক ব্রাহ্ম গরু খায়। রামগোপাল ঘোষ গরু খাইতেন সুতরাং রামগোপাল ঘোষ ব্রাহ্ম। অনেক ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন ; কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ব্রাহ্ম। সেইরূপ ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রী স্বাধীনতা ও জাতিভেদ উচ্ছেদের পক্ষপাতী ; স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির মর্ম্ম ইহার অনুরূপ, কাজেই স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্ম। এই প্রকার যুক্তিকে লজিকের স্কুলমাষ্টার যাহাই বলুন না কেন, আমরা তাহার প্রতি বিশেষ নির্ভর করিতে পারিলাম না। স্ত্রীস্বাধীনতা ও জাতিভেদ উচ্ছেদ সম্বন্ধে ১৮২৮ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ এই স্মরণীয় ৫০ বৎসরের ব্রাহ্ম ইতিহাস প্রত্যেক ব্রাহ্মের এমন কি বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতাদের মতের ঐক্য ব্রাহ্ম-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। দেবেন্দ্র নাথ দ্বিতীয় ব্রাহ্মনেতা—তিনি জাতিভেদ মানিতেন। * রাজনারায়ণ বসু মানিতেন। অক্ষয় কুমার দত্ত মানিতেন। তবে কি ইঁহারা ব্রাহ্ম-আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট? যদি তাই হয় তবে তাহা কোন ব্রাহ্ম-আদর্শ? সে ব্রাহ্ম কাহারা? কেশবচন্দ্র নারী-জাতিকে "আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীনতা" দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ব্রাহ্ম-ইতিবৃত্তের সাধারণ পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। কেশবচন্দ্র কি ব্রাহ্ম আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট? রামমোহনের প্রসঙ্গ তুলিবার প্রয়োজন নাই, কেননা

* বিবেকানন্দ ও ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী এম. এ "নব্যভারত"—অগ্রহায়ন ও পৌষ সংখ্যা।

* "জাতিভেদ কে না থাকে তাহা কিছু আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে"—দেবেন্দ্র নাথ (পত্রাবলী—৫১পৃঃ)

তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের যোগ, কল্পনাপ্রসূত—মায়িক।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়-সম্পর্কে আর কেহ নহে, শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন রামমোহনের পরে বিবেকানন্দের নামই উল্লেখ যোগ্য। অন্য কোন ব্রাহ্মনেতা এ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আর যাহাই হউক উল্লেখযোগ্য নহে। এখন প্রশ্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ই যদি ব্রাহ্ম আদর্শ হয়, এবং দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব চন্দ্র যদি রামমোহনের সেই আদর্শ সম্যক অনুসরণ করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন তবে ইহা ব্রাহ্মসমাজের এতাবৎ একটা বড় Programme বলিয়া কেন ধরিয়া লওয়া হইবে? এখন প্রশ্ন এ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ রামমোহনের প্রতিধ্বনি কিনা? শুনা যায় নিছক হিন্দুত্বের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, আদর্শেই হউক বা কার্য্যেই হউক, উচ্চতর ও ব্যাপকতর কোন সার্ব্বভৌমিকতার উপর না দাঁড়াইলে পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয় হইতে পারে না। সম্ভবতঃ রাজা রামমোহন এই নি[illegible]ক হিন্দুত্বের ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন (ডাঃ ব্রজেন্দ্র শীল প্র[illegible] প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় রামমোহনপন্থিগণ অবশ্য এই মত সমর্থন করিবে[illegible]ন না।) কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ নিছক হিন্দুত্বের ভূমিতে [illegible] অটল ভাবে দাঁড়াইয়াই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যদি কোন সমন্ব[illegible]য়ের আদর্শ প্রকট করিয়া থাকেন, তাহাই করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শের সমন্বয়সম্পর্কেও [illegible] বিবেকানন্দ কোনক্রমে রামমোহনের অনুগামী [illegible] নহেন। প্রত্যেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিবেন, যে বৈ[illegible]ষ্ণব ও ব্রাহ্মআদর্শে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। বৈ[illegible]ষ্ণবের গন্ডিতে জাতিভেদ নাই। বৈষ্ণবীরাও সেকালে অশিক্ষিতা বা পরদানশীন্ ছিলেন না। বৈষ্ণব সমাজে ধর্ম্মে, শিক্ষায়, স্বাধীনতায় এমন সমস্ত গরিয়সী নারী বাঙ্গালাদেশ—তথা ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছেন, ঐতিহাসিক তুলনামূলক বিচারে তাঁহাদের অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। তথাপি জাতিভেদ ও স্ত্রী স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্ম আদর্শ যেমন এক নহে, তেমনি স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও এমন কি ঐ জাতিভেদ এবং স্ত্রী স্বাধীনতা সম্পর্কেও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হইতে মর্ম্মান্তিকরূপে পৃথক। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, আমরা জানি প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই হৃদগত আকাঙ্ক্ষা নহে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় যে সমস্ত ব্রাহ্মগণ প্রয়াসী, তাঁহাদের আদর্শে ও স্বামিজীর ভারতীয় নারীজাতির আদর্শে গুরুতর পার্থক্য। আমেরিকার স্ত্রীস্বাধীনতা তত্রত্য নারীজাতির একটা আধ্যাত্মিক সম্পদ, যাহা তত্রত্য সমাজ বিধানের নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক বিচিত্র আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রাহ্মগণ পাশ্চাত্য নারী স্বাধীনতার সেই বাহ্যিক প্রকাশটুকু দেশ কাল পাত্রের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া অবিকল নকল করিতে বদ্ধ-পরিকর। স্বামিজী তাহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। নিশ্চয়ই প্রত্যেক ব্রাহ্মের আদর্শ নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় বা মহাকালী পাঠশালা নয়, নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শও ব্রাহ্ম গেল স্কুল অথবা বেথুন কলেজ নয়। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় অবস্থানকালীন স্বামিজী একদিন মাতাজী তপস্বিনী কর্ত্তৃক আহুত হইয়া মহাকালী পাঠশালা পরিদর্শনার্থে গমন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালী দর্শনে স্বামিজী আনন্দিত হইয়াছিলেন। পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময় তদীয় শিষ্য শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর সহিত প্রসঙ্গক্রমে স্ত্রীশিক্ষা ও নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শরৎ বাবু আধুনিক শিক্ষিতা নারিগণ ও বেথুন কলেজের কথা উল্লেখ করিলে, স্বামিজী বিরক্তির সহিত উহার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত শিষ্যকর্ত্তৃক "স্বামী-শিষ্য-সংবাদে" লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিলাম না। ধীরেন্দ্রবাবু ইচ্ছা করিলে পড়িয়া দেখিতে পারেন। কেননা তাঁহার লেখা দেখিলে মনে হয়, স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁহার এখনও অনেক জিনিষ পড়িবার বাকী আছে।

তারপর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সর্ব্বপ্রধান সংস্কার জাতিভেদ ব্রাহ্ম-সমাজেও আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের একখানি প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে আরও তিন চার Generation থাকিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বৈদিক হইতে

যে ভাবে জাতিভেদকে আক্রমণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মগণ আজ পর্য্যন্তও সেদিকে দৃষ্টিদিবার অবকাশ পান নাই। বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ এই তিন উচ্চজাতির মধ্যেই ব্রাহ্মদের সমস্ত আলোড়ন ও বিক্ষোভন সীমাবদ্ধ। এই তিন উচ্চ জাতির বাহিরে যে বিশাল জনসঙ্ঘ দারিদ্র্যের ও অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত রহিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের দিক্ হইতেই জাতিভেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। নতুবা দেশের সমস্ত জাতির আপামরকে মিলিয়া এক টেবিলে, একসঙ্গে কালে ভদ্রে একদিন আহার করিলেই দেশ উদ্ধার হয় না। ব্রাহ্মআদর্শের জাতিভেদ উচ্ছেদ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কৃত্রিম জাতিভেদের পরিবর্ত্তে চারিটী মূল বর্ণবিভাগ অব্যাহত রাখিয়া উন্নততর সমাজ বিন্যাস, একবস্তু নহে। গত শতাব্দীর শেষভাগে দেশ ও জাতি ব্রাহ্ম আদর্শকে অতিক্রম করিয়া যে অভিনব, উন্নততর, সর্ব্বব্যাপী ও সমন্বয়মূলক জাতীয় আদর্শের মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দ সেই আদর্শের প্রথম ও প্রধান প্রচারক; অতএব প্রাচীন পরিত্যক্ত ব্রাহ্মআদর্শে স্বামী বিবেকানন্দকে বন্ধন করিয়া রাখা অসম্ভব ও অসঙ্গত।

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার

রাষ্ট্র সমস্যা ও পক্ষিতত্ত্ব

সমস্ত জগৎ জুড়িয়া একটা মহাকুরুক্ষেত্রের অভিনয় হইয়া গেল। সভ্যজগতের সমগ্র রাষ্ট্রীয় শক্তি কায়মনোবাক্যে এই সমরানলে আহুতি দিল। রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিতত্ত্ববিদের মুখর কোলাহলে আমাদের সকলের কর্ণ প্রায় বধির হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে,—এ সময়ে পক্ষিতত্ত্ববিৎ সংসারের সমস্ত কথা ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হইয়া জগৎ ভুলিয়া, জয়পরাজয় ভুলিয়া, যদি তাঁহার স্বরচিত বিহঙ্গনিকুঞ্জে স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন, তাহা হইলে অনেকে হয়ত মনে করিবেন এমন খাপছাড়া সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব—শুধু ভারতবর্ষে কেন—শুধু বাঙ্গলা দেশেই সম্ভব। হয়ত যে সমস্ত বাঙ্গলার বুধমণ্ডলী, রাষ্ট্রনীতি-সাগর মন্থন করিয়া অমৃত ও গরল তুলিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সেই নিরীহ পক্ষিপালকের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিবেন,—"তুমি কি চিরকালই স্বপ্ন দেখিবে, বাস্তব জগতের প্রচণ্ড মানবসমস্যা হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া পাখী লইয়া জীবন কাটাইবে?' বিস্মিত পক্ষিপালক হয়ত বলিবেন "কেন, আমার কি করা উচিৎ? রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হয়ত উত্তর দিবেন—"কি করা উচিৎ! দেখিতেছ না, এই মহাকুরুক্ষেত্র ব্যাপারের শেষ অঙ্কের যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে মানবসমাজের, ইউরোপীয় বিধ্বস্ত রাষ্ট্রের ও নগরীর পুনর্গঠনের আলোচনা শুনা যাইতেছে। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সমস্ত শাস্ত্র লইয়া নূতন নাড়াচাড়া পড়িয়াছে। হায় পক্ষিতত্ত্ববিৎ, তোমারই কিছু বলিবার নাই! মুটে, মজুর, চাষা, নাবিক, অশ্বারোহী, পদাতিক, সেনা, স্কুলমাষ্টার, উকীল, ডাক্তার সকলেরই মুখে ঐ একই শব্দ শুনা যাইতেছে—Reconstruction"। ইংরাজ সাহিত্যিকদিগের মুখপত্র 'এথিনিয়ম্' মাসে মাসে Reconstruction প্রবন্ধে নিজের কলেবর পূর্ণ করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট্ উইলসন্ সাহেব, যুদ্ধাবসানে মানবসমাজের পুনর্গঠন কেমন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে সেদিন মার্কিন ধনকুবেরদিগের নিকট যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেরকম সুন্দর কথা এই বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে কোন বলদৃপ্ত শ্বেতাঙ্গজাতির মুখ হইতে নির্গত

* সুবর্ণ-বণিক সমাচার হইতে।

হইতে পারে, এমন কল্পনা বোধ হয় কোন ভারতবাসী কখন করেন নাই। এ সকল খবর বোধ হয় তুমি রাখ না। যে বেলজিয়মকে লইয়া প্রধানতঃ জর্ম্মানের সহিত ইংরাজের বিরোধ বাধিয়া গেল, সেই বিধ্বস্ত দেশটার কেমন করিয়া পুনর্গঠন হইতে পারে তাহার সদুত্তর কি তুমি দিতে পার?"

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—রাজনীতির দিক হইতে তোমাদের কি বলিবার আছে?

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—আমাদের ত অনেক বলিবার আছে। কূটরাজনীতিচক্রপেষণে যে দেশ নষ্ট হইয়াছে, সে দেশত আবার রাজনীতিজ্ঞই গড়িয়া তুলিবেন।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন?

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—দেশের রাষ্ট্রীয় সীমারেখা টানিয়া, শত্রুর নিকট হইতে indemnity লইয়া, আবার গ্রাম, নগর, ঘর, বাড়ী, বাগান, পার্ক, রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইবে।

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—পুনর্গঠন প্রসঙ্গে তোমাদের মত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরও ঐ পর্য্যন্ত দৌড়? তোমরা Physics, Chemistry, অর্থনীতি, Town Planning ইত্যাদির সাহায্যে বেলজিয়মের পুনর্গঠন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইতেছ। ঐ যে Indemnity কথাটার উল্লেখ করিলে, ইহার ভিতর হইতে আমাকে কিছু তোমাদের দিতে হইবে। আমিও তোমাদের সঙ্গে ঐ রসায়নতত্ত্ববিৎ ও অর্থনীতিজ্ঞের পশ্চাতে বেলজিয়মে প্রবেশ করিব।"

রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—"ঠাট্টা রাখ। বাস্তবিক বিষয়টা খুব গুরুতর।"

পক্ষিতত্ত্ববিৎ—"আমি কি ঠাট্টা করিতেছি। তোমরা Libraryর পুস্তক-কীট। কেমন করিয়া বুঝিবে যে বেলজিয়মের মত একটা দেশের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় পক্ষিতত্ত্ববিৎ ও পক্ষিপালকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ভাবিতেছ এই নিভৃত পক্ষি গৃহে আমার আলস্যময় দিনগুলি বিচিত্র বর্ণচ্ছটাসমন্বিত পতত্রের উপর নযুত্তর দিয়া, এক প্রকার জাগ্রতস্বপ্নাবস্থায় চলিয়া যাইতেছে। তোমাদের যেমন স্বভাব, রাজনীতি বল, ধর্ম্মনীতি বল, সমাজনীতিই বল— সকল বিষয়ের কেবলমাত্র উপরকার ভাসা খবরটুকু রাখিয়া নিজেকে ও অপরকে অস্থির করিয়া তোল; ভিতরকার গুরুত্বটুকু লইয়া দেখিবার অবসর তোমাদের হয় না— তোমরা যে আমাদের জীবনের উপকার খোলসটুকু দেখিয়া আমাদিগকে মানবসমাজবিচ্ছিন্ন বিলাসী বলিয়া মনে করিবে ইহা বিচিত্র নহে। মানবের সামাজিক জীবনের সহিত পাখীর যে কত দূর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তাহার খবর ত তোমরা রাখ না। এই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন হইতে যেদিন বেলজিয়মের রাজলক্ষ্মী সমুত্থিতা হইবেন, সেদিন হয়ত সমগ্র সভ্যজগত সসম্ভ্রমে ও নতমস্তকে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও দীপ্তিতে বিমোহিত হইবেন। কিন্তু যে পক্ষীটী তাঁহার বাহন, তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি? আমি সেই দেশলক্ষ্মীর বাহনটীকে অত্যন্ত বাস্তব Symbol বলিয়া মনে করি। বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন সত্য, কিন্তু দেশের সৌভাগ্য-শ্রীর অর্দ্ধেকটা ত কৃষিকর্ম্মে নিহিত রহিয়াছে। সেই কৃষিকর্ম্মে পেচক প্রভৃতি পক্ষীর সাহায্য যে কতটুকু আবশ্যক, সেই জ্ঞানটুকু লাভ করিবার জন্য ঐ indemnityর কিয়দংশ আমার মত পক্ষিতত্ত্ববিদের অথবা পক্ষিপালকের পাওয়া উচিত। আচ্ছা, indemnityর কথা না হয় আর নাই তুলিলাম, ও সব তোমাদের politicsএর বুলি। তোমরা হয়ত শুনিলে বিস্মিত হইবে, যে বিধ্বস্ত বেলজিয়মের পক্ষ হইতে কি প্রকার আবেদন পত্র ইংরাজ পক্ষিতত্ত্ববিদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি বেলজিয়মের জনৈক রাজকর্ম্মচারী Conseil Economique Du Gouvernement Belge ম্যানচেষ্টারের Avicultural Magazineএর সম্পাদককে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার মাসিক পত্র বেলজিয়মের পুণর্গঠনে (industril reconstruction এ) যথেষ্ট সাহায্য করিবে—"With a view to making a through investigation of the possibilities regarding the industrial reconstruction of Belgium, we solicit the regular service of your Periodical." (১) পত্রান্তরে তিনি সম্পাদককে পুনরায় লিখিয়াছেন—"allow me to point out to you that a special agricultural and avicultural section has been formed among

the Belgians temporarily living in England, for the sake of investigating the problems relating to the relief of these industries." (২) সম্পাদকের সম্মতি পত্রিকায় এই মর্ম্মে প্রকাশিত হইল—"Poultry, pigeons, and canaries being outside the scope of the society, the assistance we can render the Belgian Committees will obviously lie in the study of the food of birds, in relation to their harmfulness or otherwise to crops." (৩)

এখন কেন একটা দেশের পুনর্গঠনে পাখী এতটা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে যদি তোমার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে অল্প কথায় সমস্ত বিষয়ের কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে পারি।

কথায় কথায় যে প্রসঙ্গে আমরা উপনীত হইলাম তাহাকে পাশ্চাত্য বুধমণ্ডলী Economic Ornithology আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিধিব্যবস্থায় পাখী যে কত কাজে লাগে, তাহার খোঁজ আমরা সচরাচর রাখি না। আদিম মানব যে দিন মাতা বসুন্ধরাকে ধনধান্য পুষ্পভরা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, যে দিন হইতে নবাবিষ্কৃত লৌহযন্ত্রের সাহায্যে বসুন্ধরার বুক চিরিয়া কৃষিকার্য্যে সাফল্য লাভ করিবার প্রয়াস পাইল, সেই দূর অতীতকালে তামসঘনদিনে পাখী তাহাকে অযাচিতভাবে কতটা সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, মাঝে মাঝে এক একবার স্থিরচিত্তে তাহার হিসাব নিকাশ লইতে পারিলে, তোমার মত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরও মনে একটা নূতন আনন্দ সঞ্চারিত হইতে পারে। পাখী যে শুধু আমাদের বিলাসের সামগ্রী নয়, তাহাকে যে শুধু স্বরচিত পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, নীলাভমণিমণ্ডিত দণ্ডে বসাইয়া, তাহার রূপে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া মানুষ দিন কাটাইবে, মানবের দৈনন্দিন জীবনে আর তাহার কোন আবশ্যকতা নাই, সে যে অনেকগুলি অনাবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে একটা অকেজো জিনিষ মাত্র ইহা মনে করিলে তাহার প্রতি, অথবা যদি কোন বিশ্বনিয়ন্তা থাকেন তাঁহার প্রতি মূঢ়ভাবে অত্যন্ত অবিচার করা হয়। কৃষিকর্ম্মে পাখীর উপযোগিতার কথা অবতারণা করিবার পূর্ব্বে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাযাবর মানব যখন গোধন লইয়া দলে দলে দেশ দেশান্তরে বিচরণ করিত, আদিম মানব যখন কৃষিবিদ্যার রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ হয় নাই, যখন তাহাদের কেবলমাত্র সম্পত্তি ছিল কয়েকটি পালিত পশু, সেই pastoral যুগে উত্তরকুরু-প্রদেশস্থ আমু নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মধ্য-এসিয়ার মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর-দিকে গমনাগমনে কেমন করিয়া তাহারা তাহাদিগের পালিত পশুগুলিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইত তাহার সন্তোষজনক উত্তর যদি চাও, তাহা হইলে শুধু Meteorologistএর কাছে গেলে চলিবে না তোমাকে Ornithologistএর শরণাপন্ন হইতে হইবে। দেখিতে পাইবে যে যুগযুগান্তর ধরিয়া সমস্ত মানবের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মানব-সমাজের প্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকার্য্যে বিহঙ্গজাতি তাহার প্রধান সহায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বনামধন্য Imperialist সার্ হ্যারি জনষ্টন্ এই পশুরক্ষা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"Birds are the greatest allies that man has possessed in his agelong warfare against inscets and the more harmful forms of ticks, fresh-water crustacean, centipede, trematode, worm, and leech." মানবপালিত পশুজীবনের সহিত এই চিরন্তন কীটবিহঙ্গ বিরোধের সম্পর্ক কি, তাহা বোধ হয় আরও একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক। যদি তোমার কৌতূহল হয় আর এক দিন এই কথা বলিব। আজ এই পর্য্যন্ত।"

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

(১) Avicultural Magazine (June 1918) P. 238.

(২) Ibid. P. 239.

(৩) Ibid. PP. 239—240.

বিশ্বভারতী

গান—শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ এম, এ,

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা

রামকেলী—কাওয়ালী।

জাগো নিখিলজনমনোময়ী মা।
প্রভাত অরুণ মাগে তব গরিমা।

জাগো নবভুবনের জাগরণ-ছন্দে,
জাগো শুভ প্রভাতের রূপরসগন্ধে,
হেরগো নিখিল-নর করজুড়ি' বন্দে,—
জাগো মানব-নব-বাণী-প্রতিমা।

আনো চিরমঙ্গল, আনো চিরশান্তি,
হর সুখছলনার চিরমোহভ্রান্তি,
অপহরি' সুরাসুর-মন্থন-শ্রান্তি,
জাগো অমিয়ময়ী মানস-রমা!

গাহ মহামানবের মিলনের মন্ত্র,
দেহ মুখ গায়কের নবসুরযন্ত্র,
বাঁধো সামরাগিণীর নববীণাতন্ত্র,
জাগো ভুবনমনোনিবাসিনী মা!

জাগো বাণী বিশ্বের কবিচিতকুঞ্জে
বিকশিত সিতদল সরসিজ-পুঞ্জে,
বিথারি' জীবন নব বীণারবগুঞ্জে
জাগো নিখিল-বাক্-বাদিনী ও মা!

—•—

রামকেলী সম্পূর্ণ জাতির। বাদী = গা। সমবাদী = পা। অনুবাদী ঋা, মা দা না পা।
ঠাট = সা ঋা গা মা দা না র্সা　র্সা না দা পা মা গা ঋা সা।

———০———

০ ১ ২ ৩
II মা গা মা না। না দা পা পা। দা পা মা—া।—া—পা মগা—া I
(১) জা গো নি খি ল জ ন ম ন ম য়ী • • • মা • •

০ ১ ২ ৩
I দা দা না—া। দা দা না—া। র্সা র্সা দা ঋা। র্সা না দা—া I
(২) প্র ভা ত • অ রু ণ • মা গে ভ ব গ রি মা •

০ ১ ২ ৩
I দা দা দা দা। না না র্সা—া। দা দা না না। র্সা—না র্সা—া I
(৩) জা গো ন ব ভু ব নে র্ জা গ র ণ ছ • ন্দে •
(১১) গা হ ম হা মা ন বে র্ মি ল নে র ম • ন্ত্র •
(১৫) জা গো বা ণী বি • শ্বে র্ ক বি চি ত কু • ঞ্জে •

০ ১ ২ ৩
I র্সনা র্সা—র্জ্ঞা র্জ্ঞা। ঋা র্জ্ঞা—া ঋা। র্সা না না র্সঋা। নর্সা—া নদা—া I
(৪) জাগো শু • ভ্র প্র ভা • তে র রূ প র স গ • ন্ধে •
(১২) দেহ মু • ক গা য় • কে র ন ব সুর য • ন্ত্র •
(১৬) বিক শি • ত সি ত • দ ল স র সিজ পু • ঞ্জে •

০ ১ ২ ৩
I র্সা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্সা। ঋা ঋা র্সা র্সা। দা দা না না। র্সা—না র্সা—া I
(৫) হে র গো নি খি ল ন র ক র জু ড়ি ব • ন্দে •
(১৩) বাঁ ধো সা ম রা গি ণী র্ ন ব বী ণা ত • ন্ত্র •
(১৭) বি থা রি জী ব ন ন ব বী ণা র ব গু • ঞ্জে •

০ ১ ২ ৩
I নদ দা দা—ঋা। না র্সনা দা দপা। মা—া মা মা। মগা—পা মা—গা II
(৬) জা গো মা • ন ব ন ব বা • ণী প্র ভি • মা •
(১৪) জা গো ভু • ব ন ম নো নি • বা সি নী • মা •
(১৮) জা গো নি • খি ল বা ক বা • দি নী ও • মা •

০ ১ ২ ৩
I সা ঋা মা মা। মা—া মা মা। মা মা মা মা। মা—গা—পা মগা I
(৭) আ লো চি র ম ঙ্ গ ল আ লো চি র শা • • নৃত্তি

০ ১ ২ ৩
I পা গা মা গা। ঋা ঋা গা পা। পা গা গা পা। ঋা—া সা—া I
(৮) হ র সু খ ছ ল না র চি র মো হ ভ্রা ন্ তি ০

০ ১ ২ ৩
I দা দা না না। সা সা সা সা। মা—া গা মা। পা—দা পা—া I
(৯) অ প হ রি সু রা সু র ম ন্ থ ন ভ্রা ন্ তি ০

০ ১ ২ ৩
I পা—া পা দা। পা দা পা মা। গা—া গা গা। ঋা—া সা—া IIII
(১০) আ ০ গো অ মি য় ম য়ী মা ০ ন স র ০ মা ০

—•—

পুস্তক সমালোচনা

সধবার একাদশী—৺রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক কর মজুমদার এণ্ড কোং মূল্য ১৷০।

এইগ্রন্থের প্রকাশক মহোদয় যে সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই শ্রেণীর সংস্করণ প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়; তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় দেশের একটা মহাঅভাব ঘুচিতে চলিল। বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় হইলেও বাঙ্গালায় বিখ্যাত গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলী বাজারে খুঁজিলে তাহার একটা ভদ্রবেশযুক্ত সংস্করণ পাওয়া যায়না; বঙ্কিম, দীনবন্ধু মাইকেল, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যরথিদের গ্রন্থ কোনোমতে এখন হিতবাদী, বসুমতীর দয়াদত্ত আটপৌরে পোষাক পরিয়া বর্ত্তমান আছে; ইহাদের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীর দুচারটা অভিনব বা সুন্দর সংস্করণ পাওয়া যায় না; এটা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে লজ্জাকর ও বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাদের পক্ষেও অপমানের কথা! অথচ বিলাতে আমেরিকায় আমরা দেখি তাহাদের প্রিয় গ্রন্থকারদের বিখ্যাত পুস্তকগুলি কত না বিবিধ সাজ সজ্জায় শোভিত হইয়া পাঠকবর্গের নয়ন মন রঞ্জন করিতেছে।

বিলাতের অক্সফোর্ড প্রেস্ world's classics নাম দিয়া বিশ্ববিশ্রুত যে সব গ্রন্থ তাহাদের একটী সুন্দর সুদর্শন সংস্করণ বাহির করিয়াছেন, তহাদের গঠনও যেমন শোভন, মজবুৎ দরও তেমনি সস্তা। আরো দুচারটী প্রকাশক কোম্পানী এই ধরনের সংস্করণ বাহির করিয়া বিশ্বের সাহিত্য সম্রাটদের অমূল্য রচনাবলীকে অমর করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত এরূপ কোনো চেষ্টাই হয় নাই। বর্ত্তমান প্রকাশক কোঃ কর ও মজুমদার মহাশয়েরা এই অভাব মোচনে কৃতযত্ন হইয়াছেন। আমি সর্ব্বান্তকরণে ইহাদের সাধুচেষ্টার সফলতা কামনা করি। বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর সধবার একাদশী এই

শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও গঠনপারিপাট্যে মনে হয় সেই অভাব পূর্ণ হইবে। প্রকাশকেরা এইরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যের রত্ন রাজি সংগ্রহ করিয়া পর পর প্রকাশ করিবেন। এখন বাঙ্গালার সৎ সাহিত্যানুরাগীদের নিকট উৎসাহ পাইলে ইহাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সফল হইবে।

এই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ "সধবার একাদশী" সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিবার আছে। অনেকে হয়তো জানিতে ইচ্ছুক হইবেন "এত বই থাকতে এই বইখানাই কেন এই শ্রেণীর প্রথম প্রকাশ্য হল?" বইখানি অশ্লিলতা অভিযোগে সরকার কর্ত্তৃক proscribed হইয়াছিল বলিয়া অনেকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাহিত্যের মধ্যে অশ্লিলতার অবতারণা লইয়া অনেক বাদানুবাদ মতামত প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আর দরকার নাই; কেবল এইটুকু বলিলেই হইবে যে যেখানে অশ্লিলতাকে আক্রমন করিয়া সমাজ সংস্কার বা লোকশিক্ষা দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সেখানে কম বেশী একটু অশ্লিলতার অবতারণা অবশ্যম্ভাবী। অশ্লিলতার দ্বারা চিত্তরঞ্জন করা যেখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সেখানে উহার চিত্রাঙ্কন অমার্জ্জনীয়, কিন্তু অশ্লীলতার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি উদ্দীপন করা যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে উহার পূর্ণ বা আংশিক প্রকটন সর্ব্বদা মার্জ্জনীয়। এই উপলক্ষে রুশ ঋষি টলষ্টয়ের কথা অনুধাবন যোগ্য। তাঁহার Resurrection নামক গ্রন্থ অনেকেই পড়িয়াছে। সাহিত্য হিসাবে উহা একখানি master piece। উহাতে একস্থানে একটু অশ্লিলতার অবতারণা হইয়াছে। কোনো ইংরাজ পাদরী বইখানি পড়িয়া টলষ্টয়কে পত্র যোগে জানান যে বইখানা অশ্লিল, সুরুচি বিরোধী' উহা প্রকাশ করা আপনার অন্যায় হইয়াছে। তদুত্তরে টলষ্টয় বলেন গ্রন্থে যে অশ্লীলতা আছে তা আমি স্বীকার করি কিন্তু তাতে পাঠকের কোনো ক্ষতি হবে মনে হয়না; অন্ততঃ যে পাঠক আগাগোড়া সমস্ত বইটা পড়িবেন তাঁর নয়; বরং ভালই হইতে পারে। আত্মসমর্থনার্থে এই বলিতে পারি যখন কোনো গ্রন্থ আমি পড়ি, আমি আগে দেখি গ্রন্থকার কি ভেবেছেন তাঁর রুচি পছন্দ কোন দিকে (what he likes and what he hates) আমার গ্রন্থের পাঠকরা সহজেই বুঝিবেন আমার রুচি অরুচি কোন দিকে। কামলালসাকে আমি প্রানপনে ঘৃনা করি; তাহারই বীভৎসতা এবং পরিনাম চিত্রিত করিয়া লোকের মনে সেই ঘৃণা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছি; কৃতকার্য্য হইয়া না থাকি তার জন্য দুঃখিত আছি" ইত্যাদি।

সধবার একাদশীর গ্রন্থকার ঠিক এই মর্ম্মেই আত্মসমর্থন করিতে পারেন। তাৎকালিক সমাজে পাপ ও দোষকে আক্রমন করিয়া লোকের মনে ধর্ম্ম ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবার জন্য দীনবন্ধু এই বীভৎস চিত্রের অবতারণা করেন। মদ্যপান ও বেশ্যাচার উচ্চশিক্ষিতকেও সে সময়ে কিরূপে পশুবৎ করিয়া তুলিত কবি অপূর্ব্বপ্রতিভা বলে তাহাই দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থকারের নিজ রুচি মতিগতি কিরূপ তাহা প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই পরিচয় পাওয়া যায়। অটলের পিতা জীবন তাহার শ্বশুর গোকুলের সঙ্গে যেথায় ছেলের চরিত্র লইয়া আলোচনা করিতে করিতে অসংস্কৃত হিন্দু ও সংস্কৃত ব্রাহ্ম সমাজের আচার বিচারের তুলনা করিতেছেন সেখানেই দেখি গ্রন্থকারের মনোগত ভাব ও রুচি কিরূপের। সেই কথাটী মনে রাখিলে আধুনিক রুচির শুচিবাইগ্রস্থ যাঁরা তাঁরাও এ পুস্তকের নিন্দা করিতে পারিবেন না।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাপকে কষাঘাত করিয়া, লোকের মনে প্রচলিত অনাচারের উপর অশ্রদ্ধা ও ঘৃনা জন্মাইতে গেলে এ অশ্লীলতা মার্জ্জনীয়। জগতের কোনো সাহিত্যই এই অপ্রিয় কর্ত্তব্যকে ঠেলিতে পারে নাই। প্রবন্ধ লিখিয়া সংস্কার কার্য্য করিতে গেলে ইঙ্গিতে ইষারায় ঠারে ঠোরে পাপের বর্ণনা বা উল্লেখ চলে; সাহিত্যে তাহা সম্ভব নহে। আর্ট বলিয়া একটা জিনিষ আছে; সাহিত্যের যেটা প্রান; এই আর্টকে বাঁচাইয়া কাজ উদ্ধার করিতে গেলে, অশ্লীলতার চিত্র না থাকিলে চলিবেনা।

তার পর এক কথা; কাল অনুসারে রুচির বিচার প্রয়োগ। সধবার একাদশীতে যে সব উক্তি বা

এখনকার মার্জ্জিত সংস্কারে কুরুচি বলিয়া মনে হয়, তখনকার কালে তা ছিলনা। একযুগের রুচির খাতিরে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনার বিচার করিতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক অমূল্য মণিকে জলে ফেলিয়া দিতে হয়। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পন' ও 'সধবার একাদশী' অমরগ্রন্থ। কি আর্টের দিক দিয়া, কি উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এরূপ অতুলনীয় গ্রন্থ জগৎ সাহিত্যেও খুব বিরল। আর্ট ও উদ্দেশ্যের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যে গ্রন্থদুখানি পূর্ণসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। শুনা যায় যে 'সধবার একাদশীর' পাঠে ও অভিনয় দর্শনে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তা যদি হইয়া থাকে তবে ইহার বিরুদ্ধে আর কাহারও কিছু বলিবার নাই। ইহার কুরুচি চাঁদের কলঙ্কের মত।

পরিশেষে প্রকাশক মহাশয়দের সাহসের বাহাদুরী না করিয়া থাকিতে পারিলামনা। এই মহার্ঘ্যের বাজারে সস্তায় নবেল পড়ার দিনে ফ্যাশান বিগর্হিত পুরোনো নাটকের ভাল সংস্করণ বাহির করিবার আয়োজন ও চেষ্টা খুব সাহসের পরিচায়ক বটে। প্রথমতঃ এসব বই আর বড় কেহ পড়েনা, পড়িতেও চায়না; পুস্তকাগারে শেল্ফের স্থান অধিকার ছাড়া ইহাদের আর কোনো বেশী সৌভাগ্য ঘটেনা; কাজেই এ হেন দিনে লাভক্ষতি বিচার না করিয়া এসব গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ করিতে গিয়া প্রকাশকরা একদিকে যেমন দুঃসাহসের পরিচয় দিতেছেন অপরদিকে তেমনি সৎসাহিত্য প্রচারের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগের পরিচয় দিতেছেন। এখন সৎসাহিত্যানুরাগী পাঠক পাঠিকারা ইহাদের শ্রম ও অর্থব্যয়ের মূল্য বুঝিয়া সহানুভূতি দেখাইলে সব দিক রক্ষা হয়। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

পরশ মণি। কলিকাতা শিশির পাবলিশিং হাউসের উপন্যাস সিরিজের সপ্তম সংখ্যা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। একখানি সামাজিক চিত্র। পতিত ধনী এবং দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া অধিকাংশ সময় যে অনর্থ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়ে তাহাকে প্রধান উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার গল্প রচিত করিয়াছেন। সমাজে বিলাতযাত্রা যে একটা [illegible] হইয়া [illegible] ইয়াছে তিনি সে কথাও তুলিয়াছেন। [illegible] মহাশয় কহিলেন—"শেষটা কি কর্ত্তামশায়, সাত পুরুষের পিণ্ড লোপ করবেন? সমুদ্র যাত্রায় যে সব ধর্ম্ম পণ্ড হয়।" রাধাকান্ত বাবু কহিলেন—"সমাজে কোন দিন কারো মুখের দিকে চেয়ে কাজ করিনি, সমাজকে চিরদিনই মেনে আস্‌ছি, মানবোও, তবে বেশী বাড়াবাড়ি সইব না।" গল্পের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার মহিলাগণের স্বাধীন শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন—বিমলাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন "সে আর অন্তঃপুর বদ্ধা দুর্ব্বলা নারীর ন্যায় সংকীর্ণতার নাগপাশে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতেছিল না।"

"বিজয় ভুলিয়া গেল যে সে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে, আর লীলা ভুলিয়া গেল সে ব্রাহ্ম। এইরূপ বাধা কোনরূপেই দুইটী মিলনাকাঙ্ক্ষী নরনারীর মিলনের অন্তরায় হইতে পারে না।"—গ্রন্থকার সমাজের শাসন ও সংস্কার সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন তাহা ভাল বুঝা গেল না—আর বুঝা গেল না—নীল "পরশমণি" লাভ করিয়াও শেষে কি করিলেন। যাহা মোটের উপর উপন্যাস খানি আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছে।

মুক্তি। উক্ত সিরিজের চতুর্থ সংখ্যা। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত এম, এ প্রণীত ইহাও একখানি সামাজিক সুখপাঠ্য উপন্যাস বর্ত্তমান [illegible] পিতা দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী বিদুষী কন্যা [illegible] পত্রবধূ রূপে লইতে দারুণ অপমান মনে করিলেন পুত্রের বিবাহ অন্য স্থানে হইল। দরিদ্র স্কুল মাষ্টার হরকান্ত বাবুর কন্যা পদ্মাকে সদানন্দ মা আনন্দময়ীর মত কৃতজ্ঞচিত্তে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কবে বাঙলার ঘরে ঘরে নারীর সম্মান ও গৌরব এইভাবে বৃদ্ধি হইয়া বঙ্গসমাজের এক অঙ্গের এই দুষ্ট ক্ষতকে ঢাকিয়া ফেলিবে। জনপ্রিয় কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার মধুর লেখনী চাতুর্য্যে বাঙলার দীন পরিবারের অন্তঃস্থলের কথাকে সুন্দর ও করুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পদ্মার ধৈর্য্য ও গুণগরীমা নারী মহিমায় বঙ্গ-সংসারে মর্ম্মস্পর্শী দুঃখের চিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে। বাঙলার অন্তঃস্থলে এই যে প্রধূমিত বহ্নিশিখা দাউ দাউ জ্বলিতেছে, কে ইহার [illegible] নিভাইবে। আমরা এখনও শুধু উচ্চাসনে দাঁড়াইয়া [illegible] দেখাইয়া সহস্রাধিক সমঝদারের নিকট হইতে [illegible] আহ্লাদে গদগদ হইতেছি।

শিশির পাবলিশিং হাউসের অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনা আমরা আগামী বারে করিব। পদ্মপাদ